Sulekha

OFFICE REQUISITES

nothing better to choose than

সুলেখা (জেনারেল) ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক 'এস-৫০' সলভেন্ট সংযুক্ত। এ কালি সমস্ত কলমেই ব্যবহার করা যায়

পেনসোল: কলম পরিষ্কারক সলিউশন কালির সলভেন্ট সংযুক্ত পেনসোল যান্ত্রিক ছাড়া কলমের সবকিছু গোলমাল (যেমন কলমে কালি না সরা প্রভৃতি) দূর করে।

সিকুরিটি সীলিং ওয়াক্স চার গ্রেডে পাওয়া যায়। ভারতের সর্বত্র সমস্ত বড় বড় ফার্মে ব্যবহার করা হচ্ছে।

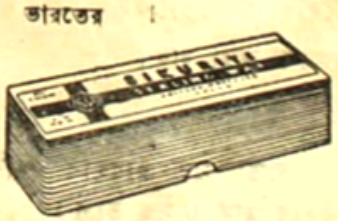

সুলেখা স্পেশাল ফাউন্টেন পেন ইঙ্ক সলভেন্ট 'এস ১০০' যুক্ত দামী কলমের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং সত্যে চমৎকার।

এ্যাডসল গাম এ্যাণ্ড পেস্ট—সুপিরিয়ার ও জেনারেল কোয়ালিটি—আঠার কাজে সবচেয়ে সেরা।

সুলেখা স্টাম্প প্যাড: দুই কোয়ালিটিতে পাওয়া যায়—সুপিরিয়ার ও অফিস কোয়ালিটি। সুলেখা রাবার স্টাম্প ইঙ্ক দিয়ে প্যাডগুলি কালি মাখানো।

REGISTERED SW TRADE MARK

Sulekha WORKS LTD.

CALCUTTA • DELHI • BOMBAY • MADRAS

PILOT/SW

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

লক্ষ্মীঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

গল্প-ভারতী

আষাঢ়—১৩৭০

সম্পাদক :

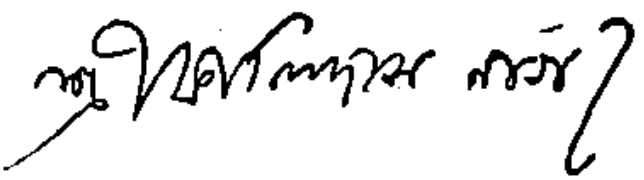

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্ভরযোগ্য

কাটা-ছেঁড়ায়, পোকার কামড়ে আশুফলপ্রদ, কুলকুচি ও মুখ ধোয়ায় কার্যকরী। ঘর, মেঝে ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত রাখতে অত্যাবশ্যক।

এ্যানটল

১১, ১১০, ৩৫০ মিলি বোতলে ও ১০ টাকার ভিসে পাওয়া যায়।

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—

উদাত্ত আহ্বান—	১
সঙ্গীত আসর—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৫
নাট্যপ্রাণ শিশিরকুমার—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য	৭
রেখাচিত্রে শিশিরকুমার—	১১
এই রং, এই রূপ—আশাপূর্ণা দেবী	১৭
তৃতীয় মুখ—নীলিমা দাশগুপ্ত	২৫
অমৃত কথা ও কাহিনী—	৩২
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৩৩
শিখর ছুঁয়ে ছুঁয়ে—চিত্তরঞ্জন মাইতি	৪০
চিঠি শুধু চিঠি নয়—	৪৬
শুক্তি-সৈকত (উপন্যাস)—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	৪৮

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

অত্যন্ত আরামদায়ক

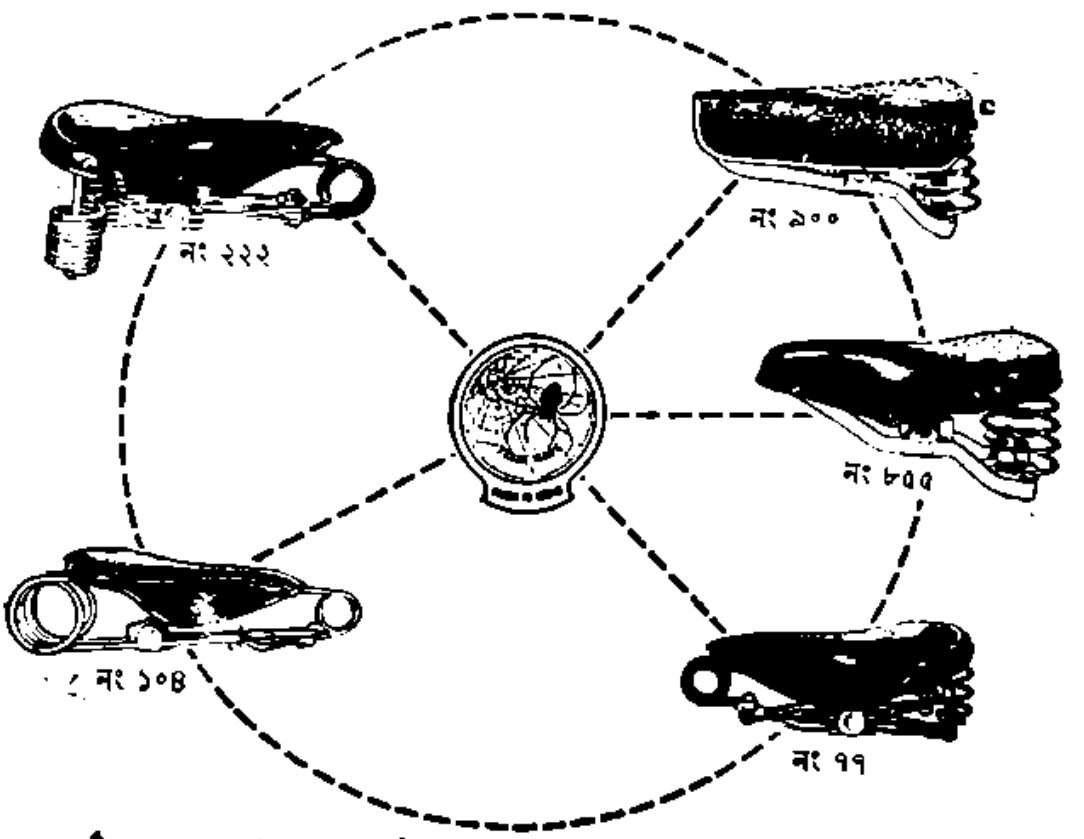

উইটকপ

সীট—বিভিন্ন টেঁকসই ডিজাইনে পাওয়া যায়

প্রথম শ্রেণীর বাট লেদার এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাতের স্প্রিং-এ তৈরী

SEN-RALEIGH LIMITED

প্রস্তুতকারক

সেন - র‍্যালে

SRWC-4C BEN

এই সংখ্যায়

জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫৩

বীরবলের কৌতুক—বররুচি ৬৫

বিশ্ব-সাহিত্য—

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—দেশপ্রেমিক আইরিশ সুইফট্—অমল হালদার ৭০

সাহিত্য সংবাদ—বুকরিভিয়ু ও সাহিত্যবিচার—পবিত্র পাল ৭৩

এই প্রথম—লটারী—শ্যামশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ৭৬

দেশ-বিদেশ— ৭৮

খেলাধূলা—

স্মৃতিদোলায়—প্রেমেন্দ্র মিত্র ৮৮

অন্তরীক্ষে— ৯৩

ব্রিটেন (সচিত্র সংযোজন) ৯৭

ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চ— ৯৮

ছোটদের প্রিয়

ছোটদের খাস ঐরকমই ছোটদের ঘরোয়ানা আটপৌরে,—কে. সি. দাসের চকলেট হলে তো কথাই নেই! কে. সি. দাসের টিনের চকলেট যেমনি সুস্বাদু তেমনি বিশুদ্ধ, পুষ্টিও ষোল আনা। একটা টিন আজই কিনুন—নিজেরাও খান ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

দাম ঃ

ছোট টিন টাঃ ১.২৫
মাঝারি টিন টাঃ ২.৫০
বড় টিন টাঃ ৫৲

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই

পরিদর্শন করুন —

টেলি: ২২-৫৭৫৫, ২২-৭৯৮৪

ম্যাক্স মূলার ভবন

MAX MUELLER BHAVAN

মোক্ষ মূলর ভবন

জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট

ইলাকো হাউস, ১৩ ক্যাবোর্ণ রোড, কলিকাতা-১

জার্মান ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন

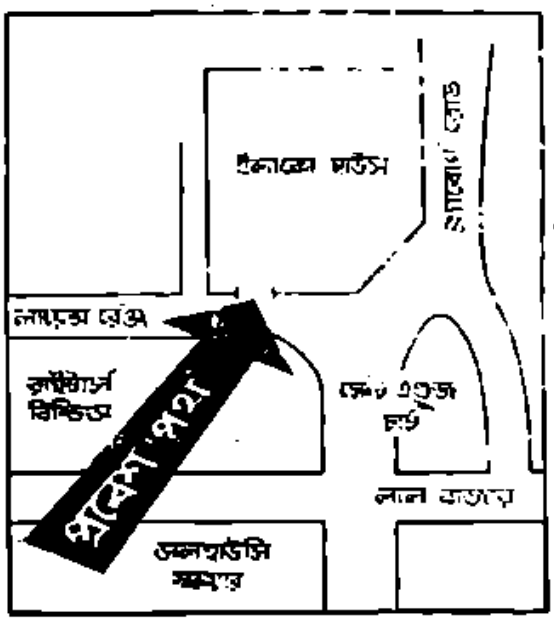

গ্যয়টে ইনস্টিটিউট মিউনিক কলিকাতা শাখা

জার্মান ভাষা শিক্ষার জন্য সাংস্কৃতিক উদ্যোগ

কার্য্যালয়	খোলা থাকে	সকাল	১০টা	হইতে	বেলা ১টা
গ্রন্থাগার	,,	বেলা	১টা	হইতে	সন্ধ্যা ৭টা
পাঠাগার	,,	সকাল	১০টা	হইতে	সন্ধ্যা ৭টা

তার ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশের প্রাচুর্য ও মসৃণতা এনে দেবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর আপনি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন।

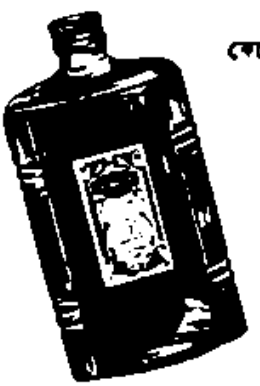

ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

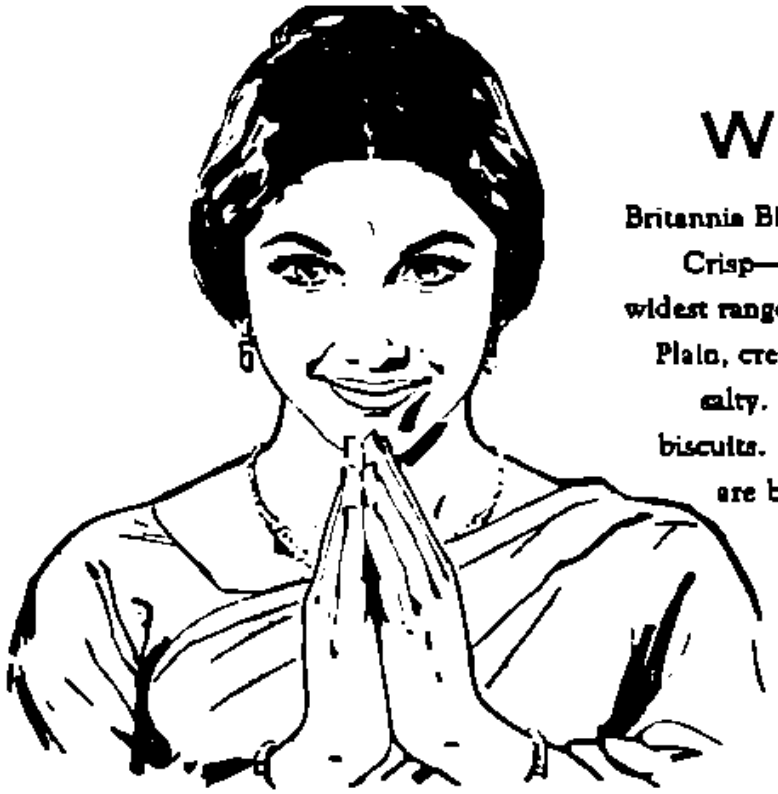

WELCOME!

Britannia Biscuits are always welcome.
Crisp—delicious—oven-fresh and in the widest range of varieties made in India.
Plain, cream filled, sweet, spicy or salty. All delicious and all high quality biscuits. That's why Britannia Biscuits are better biscuits—always welcome.

BRITANNIA
BISCUITS

IWTBC 4001

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের
হিমালয়ের বহু পরিচিত অঞ্চলের ভ্রমণকাহিনী
হিমালয়ের পথে পথে ৬৷৷০
॥ নূতন বহুবর্ণ চিত্র সংযোজিত, পরিবর্ধিত নূতন সংস্করণ ॥

শম্ভু মহারাজের গঙ্গোত্রী যমুনোত্রীর ভ্রমণকাহিনী
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা (৫ম মুদ্রণ) ৬৷৷০

'মৈনাক' বিরচিত
নূতন পটভূমে রচিত উপন্যাস
বহ্নিবলয় ৮৷৷০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের
কিরীটী রায় ১০৲
কিরীটী রায় কাহিনীর প্রথম ওমনিবাস জন্যায়

সুমথনাথ ঘোষের
নূতন ঐতিহাসিক উপন্যাস
রোশনাই ৩৷৷০

প্রশান্ত চৌধুরীর নূতনতম উপন্যাস
নদী থেকে সাগরে ৮৲

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের
যাত্রাপথ ৪৷৷০

ডাঃ বিজিতকুমার দত্তের
বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস ৮৷৷০

বিমল করের
নূতন উপন্যাস
পান্থশালা ৩৷৷০

জরাসন্ধের
নূতন উপন্যাস
ছায়াতীর ৫৲

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের
নূতন উপন্যাস
মেঘ ও মৃত্তিকা ৫৲

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অ্যান্‌ভিল

জীবাণুনাশক মলম

সাধারণ চর্মরোগের নতুন ওষুধ

নানাজাতীয় ফুসকুড়ি, ফোঁড়া, ঘা এবং দাদ—এসবে উপকারী।

এক কৌটো অ্যান্‌ভিল সব সময় কাছে রাখুন!

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সংগঠিত)

JWT-ANV 1A

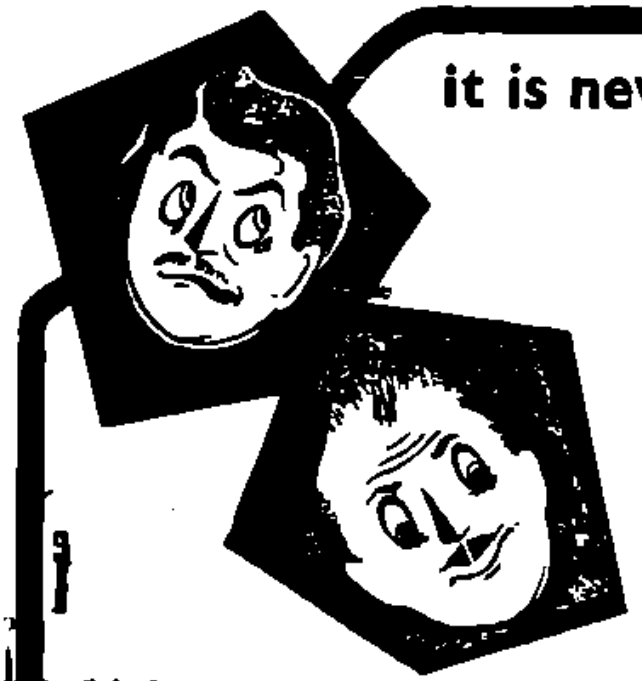

it is never too late

Yes, it is never too late. If all your hair had turned Grey or have started Greying. If your hair has started thining or Baldness Prevailing. It is never too late.

Loma the hairs natural food will supply the necessary vitality to the structure of cells that forms hair and keep the hair roots vigorously healthy. Turns Grey hair into Natural Black, stops falling or thining.

It re-starts the ceased work of the roots promoting new HAIR in cases of Baldness.

Loma

Sole Agents :

M. M. KHAMBATWALA, Ahmedabad

Agents : SHAH BAVISHI & CO. 139, Radhabazar Street, Calcutta-1.

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

BHRIN-1/67-53

দেহের রোগ প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলুন !

সর্দিকাশি লেগেই আছে...হরদম হজমের গোলমাল...শরীরে অবসাদ, দুর্বলতা—এ সব লক্ষণগুলোকে অবহেলা করবেন না। কারণ, এগুলো আরও কোন গুরুতর পীড়ার সংকেত হতে পারে। আজ থেকেই নিয়মিত মান্ধ ইমালশন খেয়ে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলুন।

সহজে শরীর সুস্থ ও সবল করে তুলতে হলে এই সুস্বাদু ইমালশনটির মত এমন জিনিস আর নেই।

MANDH

মান্ধ

ইমালশন

লিকুইড প্যারাফিন যুক্ত বিভিন্ন হাইপোফসফাইটের ইমালশন

মার্টিন অ্যাণ্ড হ্যারিস (প্রাইভেট) লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস, লালবাজার, কলিকাতা-১

আষাঢ় ১৩৭০

সম্পাদকীয়

অষ্টাদশী গল্প-ভারতী ঊনবিংশ বর্ষে পদার্পণ করল। বর্ষারম্ভে আমরা গ্রাহক-অনুগ্রাহক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা, সবাইকে আমাদের নববর্ষের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। ভারত ইতিহাসের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে গল্প-ভারতীর বর্ষারম্ভ হল। দেশের, জাতির ও সমাজ জীবনে এমন গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কট আর পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে নৈরাশ্যবাদের সূচনা দেখা দিয়েছিল—সাম্প্রতিক কালে জাতীয় ঐক্য এবং নূতন প্রস্তুতির ফলে এক নব-জীবনের আহ্বান আমরা শুনতে পেয়েছিলাম। সেই নবজীবনের আহ্বানকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য দেশবাসী সংঘবদ্ধ হন—সংকল্প গ্রহণ করুন—জাতির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করুন—বর্ষারম্ভে দেশবাসীর কাছে আমাদের এই একান্ত কামনা।

অষ্টাদশ বর্ষ পূর্বে জাতির মানসিক, চারিত্রিক তথা সর্বপ্রকার মঙ্গলসাধনের যে ব্রত নিয়ে আমরা যাত্রাপথে অগ্রসর হয়েছিলাম আজ এই সমস্যাসঙ্কুল দিনেও গল্প-ভারতী সেই মহৎ আদর্শকেই অবিচলিত ভাবে অনুসরণ করে চলছে। দেশ ও জাতি গঠনে সাময়িক পত্রিকার যে বিরাট দান ও মহান কর্তব্য আছে—সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে আমরা আমাদের কর্মপথে এগিয়ে চলেছি।

আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি—সাময়িক পত্রিকা জাতীয় জীবনের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমরা বিশ্বাস করি সাময়িক পত্রিকা জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনের দ্যোতক, তাই আমাদের দায়িত্ব বিরাট। এই বিরাট দায়িত্ব পালনে আমরা সকলের সর্বাঙ্গীন সহযোগিতা কামনা করি।

হাসির রাজা দ্বিজেন্দ্রলাল :

রবীন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রের বিশেষ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল একথা হয়ত অনেকেরই অজানা। রবীন্দ্রনাথই দ্বিজেন্দ্রলালকে সাহিত্য সমাজে সু-পরিচিত করেন। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্ট অনুরাগীও ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও একটি অবাধ সাহস বিচরণ করিতেছে। সে সাহস কি শব্দ নির্বাচনে, কি ছন্দ রচনায়, কি ভাব বিন্যাসে সর্বত্র অক্ষুণ্ণ। সে সাহস আমাদের বারংবার চকিত করিয়া তুলিয়াছে

—আমাদের মনকে শেষ পর্যন্ত তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিয়াছে। কাব্যে যে নয় রস আছে, অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন, দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অম্লানচিত্তে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য, করুণা, মাধুর্য্য, বিস্ময়, কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।" দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা ভাষার এক নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ দ্বিজেন্দ্রলালের 'মন্ত্র' কাব্য সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক হয়েও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার সাহায্যে পাঠক সমাজে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। গতানুগতিক ধারার বদলে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা সাহিত্যে এক নূতন রীতি ও পথের সূচনা করেছিলেন—আপন প্রতিভার দীপ্ত মহিমায় বঙ্গসাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলালের কথা আজকের এই চরম জাতীয় সঙ্কটের দিনে একান্ত স্মর্তব্য। দ্বিজেন্দ্রলালের—

"ভারত আমার—ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র
মহিমায় তুমি জন্মভূমি মা—
এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।"

আজ স্বদেশপ্রেমিক মাত্রেরই হৃদয়ে নব জীবনের সঞ্চার করে। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার আর একটি দিক আমাদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে—সেটি হল "হাসির রাজা দ্বিজেন্দ্রলালের" রচনা-সম্ভার। বাঙলায় হাসির গান লিখে দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য জগতে এক নূতন ধারার সূচনা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের অন্তরালে আছে শিক্ষা, সমাজের ও দুর্নীতির সক্রেমতায় এবং বিদেশীদের ব্যর্থ অনুকরণের ব্যঙ্গচিত্র। তাঁর গানের মধ্যে ছিল অন্তর্বেদনা—যা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন এবং হাসির ছলে সেগুলিকে সমাজের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। বাঙালীর নিরানন্দময় জীবনে তিনি আনন্দের সন্ধান দিয়েছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের সেই হাসির গানের সুর আজও কানে বাজে।

"তা সে হবে কেন।
তোমরা দেশোদ্ধারটি করতে চাও
করে মুখে লড়াই
তা সে হবে কেন।
তোমরা বাক্য যাগে শুধু হাতে কর্ত্তে চাও লড়াই
তা সে হবে কেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী

ভারতবর্ষ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ
সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি;
বন্দিল সবে "জয় মা জননি! জগদ্ধারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

সদ্যঃস্নান-সিক্ত-বসনা, চিকুর সিন্ধু-শীকর-লিপ্ত ;
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে অমল-কমল-আনন-দীপ্ত ;
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে—তপন তারকা চন্দ্র ;
মন্ত্রমুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদমন্দ্র !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ।"

শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর-ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা,
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার—পঞ্চসিন্ধু-যমুনা-গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর ঊষর দৃশ্যে।
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ।"

উপরে পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি' অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিককলরবে, চুম্বি তোমার চরণ-প্রান্ত ;
উপরে জলদ হানিয়া বজ্র, করিয়া প্রলয়-সলিল বৃষ্টি—
চরণে তোমার, কুঞ্জকানন কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ,
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !"

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয়-উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা, কত না হর্ষ ;
—জগৎপালিনি ! জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;
গাহিল, "জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ।"

THE CALL TO INDIA

Oh India! Forget not—that the ideal of thy womanhood is Sita, Savitri, Damayanti; forget not—that the God thou worshippest is the great Ascetic of ascetics, the all-renouncing Sankar, the lord of Uma; forget not—that thy marriage, thy wealth, thy life are not for sense-pleasure,—are not for thy individual personal happiness; forget not—that thou art born as a sacrifice to the *Mother's* altar; forget not—that thy social order is but the reflex of the Infinite universal Motherhood; forget not that the lower classes, the ignorant, the poor, the illiterate, the cobbler, the sweeper, are thy flesh and blood, thy brothers. Thou brave one, be bold, take courage, be proud that thou art an Indian,—and proudly proclaim,—"I am an Indian, every Indian is my brother"—Say, The ignorant Indian, the poor and destitute Indian, the Brahmin Indian, and the Pariah Indian is my brother" Thou too clad with but a rag round thy loins, proudly proclaim at the top of thy voice—"the Indian is my brother,—the Indian is my life. India's gods and goddesses are my God, India's society is the cradle of my infancy, the pleasure-garden of my youth, the sacred heaven,—the *Varanasi* of my old age" Say, brother,—"the soil of India is my highest heaven, the good of India is my good" and repeat and pray day and night—"O thou Lord of Gouri, O thou Mother of the Universe, Vouchsafe manliness unto me; O thou Mother of strength, take away my weakness, take away my unmanliness, and—*Make me a Man*.

——

সঙ্গীত আসর

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত বিখ্যাত স্বদেশী গান "বঙ্গ আমার জননী আমার", ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী মহোদয়ার কৃত স্বরলিপি—১৩১৫ সালে প্রকাশিত "সঙ্গীত প্রকাশিকা" হইতে উদ্ধৃত হল।

খাম্বাজ—একতাল

বঙ্গ আমার জননী আমার
ধাত্রী আমার, আমার দেশ
কেন গো মা তোর অশ্রু নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন
কেন গো মা তোর মলিন বেশ?
সপ্তকোটি সন্তান যার
ডাকে উচ্চে আমার দেশ।
(কোরাস)

"কিসের দুঃখ"……
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন আমার দেশ।
উঠিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা
মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার
আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ জগৎ
ভক্তি প্রণত চরণে যাঁর
অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল
সাহার হ'তে জলধি শেষ
তুই ত না মাগো তাদের জননী
তুই ত না মাগো তাদের দেশ।
(কোরাস)

"কিসের দুঃখ"……
একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়
একদা যাহার অর্ণবপোত
ভ্রমিল ভারত সাগরময়
সন্তান যার—তিব্বত, চীন,
জাপানে, গঠিল উপনিবেশ
তার কি না এই ধূলায় আসন
তার কি না এই ছিন্ন বেশ।
(কোরাস)

"কিসের দুঃখ"……
উঠিল যেখানে মুরজ মন্দ্রে
মিলাই কণ্ঠে মধুর তান
তাদের বিধান ছিল রঘুমণি
চণ্ডীদাস গাহিল গান।
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য
তুই ত' না সেই বঙ্গ দেশ।
বঙ্গ আমরা, যদি এ শিরায়
থাকে তাদের রক্তলেশ।
(কোরাস)

"কিসের দুঃখ"·····

যদিও বা তোর দিব্য আলোকে
ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ—নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর
আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি ত' মেষ
দেবী আমার, সাধনা আমার
স্বর্গ আমার, আমার দেশ
(কোরাস)

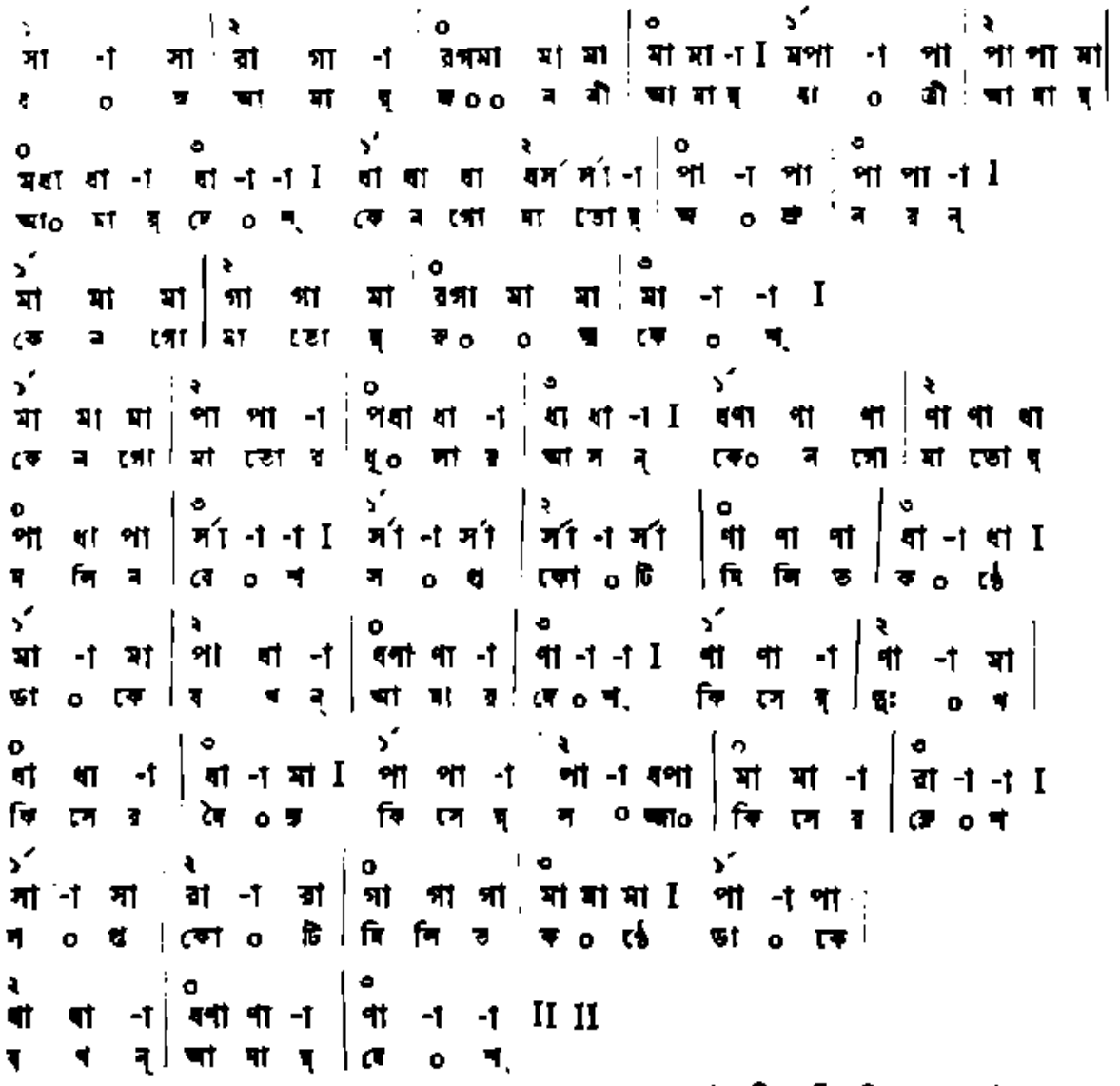

(বাকি কলিগুলির সুর একই)

নাট্যপ্রাণ শিশিরকুমার

ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে লিখিত একখানি অসাধারণ পত্র ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি. এন. ঝা মহাশয়ের হাতে পৌঁছল। পত্রখানি এইদিক দিয়ে অসাধারণ যে, সরকারের সামান্যতম খেতাব পাওয়ার জন্য যখন ছোট বড় সকলেই উদ্‌গ্রীব সেই সময় একজন ভারতীয় শিল্পী পদ্মভূষণ খেতাব প্রত্যাখ্যান করছেন এবং তা' করছেন শুধু শিল্পের মর্যাদা রক্ষার জন্যই। এ কাজ যিনি করতে পারেন তিনি আর যাই হোন সাধারণ ব্যক্তি ন'ন, নিঃসন্দেহে অসাধারণ! বলা বাহুল্য, এই অসাধারণ ব্যক্তিটি আর কেউ নন, তিনি আমাদের নাট্যপ্রাণ শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়। এই খেতাব গ্রহণে শিশিরকুমারের প্রথম আপত্তি ছিল এই যে, সরকারী খেতাব বিতরণ শিল্পীর স্বাধীনতা নষ্ট করে এবং শিল্পীদের খেতাবলোলুপ তথা চরিত্রহীন করে তোলে, তাঁর নিজের ভাষায়—They have the effect of demoralising the people and creating a race of toadies hankering after government honour। শিল্পীর সহজ প্রেরণার পথে কোন কিছু বাধা হয়ে দাঁড়াক, শিল্পের অনন্যপরতন্ত্রতা কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হোক, শিল্পপ্রাণ শিশিরকুমার তা' সইতে পারেননি। শিল্পী শিল্প ছাড়া আর কারো অনুগত থাকবেন না, সত্য-শিব-সুন্দরের সেবা ছাড়া আর কারো সেবা তিনি করবেন না, কোন কিছুর ভয়ে বা লোভে শিল্পী তাঁর চরিত্র বিসর্জন দেবেন না—এই ছিল শিশির-কুমারের যথার্থ শিল্পীর ধারণা। শিল্পীর এই আদর্শেই তিনি ছিলেন উদ্বুদ্ধ—দীক্ষিত। তাই তাঁর দৃষ্টিতে যে শিল্পী এই আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট, যে শিল্পকে আত্মপ্রতিষ্ঠার উপায় হিসাবে ব্যবহার করে, সে আর যাই হোক শিল্পী নয়।

দ্বিতীয় আপত্তি ছিল ব্যক্তিগত। জাতির জীবনে নাটকের মূল্য, নাট্যশালার মূল্য কতখানি সে বিষয়ে রাষ্ট্র শোচনীয়ভাবে উদাসীন—এ নিয়ে শিশিরকুমারের মনে ক্ষোভের সীমা ছিল না। দু'চারজন শিল্পীকে খেতাব দিয়ে সরকার সস্তায় নাম কিনবে—শিল্প-দরদী বলে নিজেকে জাহির করবে, অথচ শিল্পকে করবে উপেক্ষা, শিল্পের স্বাধীন বিকাশের সুব্যবস্থা করবে না। এই আচরণকে তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেননি এবং পারেননি বলেই লিখেছিলেন—By its acceptance I shall mislead the lovers of the theatre in to believing that the government are aware of the importance of drama in the life of the nation—অর্থাৎ আমি খেতাব গ্রহণ করলে নাট্যামোদীদের মনে এই ভুল ধারণা জন্মাবে যে সরকার জাতীয় জীবনে নাটকের মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। শিশিরকুমার মনে করতেন শিল্পকে কার্যতঃ উপেক্ষা করে—শিল্পীকে মৌখিক সম্মান দেখানো ধাপ্পাবাজি, শিশিরকুমারের দৃষ্টিতে, জনসাধারণের মনকে কৌশলে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। শিল্পপ্রাণ শিশিরকুমার নিজের প্রতিষ্ঠার চেয়ে শিল্পকে বেশী ভালবাসতেন বলেই, সরকারের-দেওয়া-খেতাব দিয়ে শিল্পের অসম্মানকে আরো বাড়িয়ে তুলতে চাননি। তাঁর দৃঢ় ধারণা নাট্যশিল্পের উপরে সরকারের প্রীতি আন্তরিক হলে বাড়ী ভাড়ার দায়ে শিশির-কুমারের "প্রীরঙ্গম্" হাত ছাড়া হয়ে যেতো না, শিশিরকুমারের মতো প্রতিভাবান নাট্যশিল্পী—অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা ও প্রযোজক রঙ্গমঞ্চের অভাবে নির্বাসিত জীবন যাপন করতেন না,—আর

কোথাও না হলেও অন্তত: কলকাতায় — একটি "public owned non-commercial stage"—স্থাপিত হতো। যিনি প্রায় চল্লিশ বছর নাট্যশিল্পের সেবা করার পরেও রঙ্গমঞ্চের অভাবে শিল্পীর অপমৃত্যু ও লাঞ্ছনা মর্মে মর্মে ভোগ করেছেন, যাঁর জাতীয় নাট্যশালার আবেদন অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হয়েছে, সরকারের আন্তরিকতায় তিনি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেননি। শিশিরকুমার বিশ্বাস করতে পারেননি এবং পারেননি বলেই—খেতাব প্রত্যাখ্যান করে লিখেছিলেন—"If the government really wished to honour me and through myself the cause I have served for nearly forty years, a more befitting tribute would have been the gift of a public stage to the city of calcutta" কলকাতায় একটি সাধারণ রঙ্গশালা—জাতীয় নাট্যশালা—এর চেয়ে বড় সম্মান নাট্যশিল্পের ও নাট্যশিল্পীর আর কিছুই হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত নাট্যপ্রাণ শিশিরকুমারের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে এই জাতীয় নাট্যশালার কামনাই ব্যক্ত হয়েছে। যাঁরাই তাঁর কাছে গিয়েছেন তাঁরাই এই দীর্ঘশ্বাস শুনেছেন—জাতীয় নাট্যশালা আজও হলো না! (সরকারের চেষ্টায় শিশিরকুমারের জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন সফল হতে চলেছে)। ব্যক্তি বিশেষের নয়—নাট্যশিল্পের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হোক, প্রতিভা বিকাশের বাধা অপসারিত হোক এই ছিল শিশিরকুমারের অন্তরের ইচ্ছা। এই ইচ্ছার মধ্যেই শিশিরকুমারের আসল চরিত্র ব্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে শিল্পের স্বার্থ ও মর্যাদাকে বড় করে দেখা, শিল্পকেই জীবনের সর্বস্ব—একমাত্র উপাস্য করে তোলা—এরই অপর নাম শিশিরকুমার।

ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং নাট্যশিল্পের মর্যাদা—এর দ্বন্দ্ব দিয়েই শিশিরকুমারের জীবন গড়া। বার বার তাঁর জীবনে এই দ্বন্দ্ব এসেছে, বার বার ব্যক্তিগত স্বার্থ পরাজিত হয়েছে, শিল্পিসত্তা জয়ী হয়েছে। শিল্পের জন্যই শিশিরকুমার যেন বলিপ্রদত্ত। স্বার্থের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তাই তিনি বারবার শিল্পের মুখ ম্লান করে অজানা অকূলে ঝাঁপ দিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বেরই একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত—অধ্যাপক শিশিরকুমারের অভিনেতা-শিশিরকুমারে পরিণত হওয়া। বাস্তবিকই শিল্পের প্রেমে এ যেন জাতিকুলমান বিসর্জন দেওয়া। ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী, অধ্যাপক ও অভিজাত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত—অধ্যাপকের, বিশেষ করে ইংরেজি অধ্যাপকের মানে সম্মানী, যাঁরা মাইনে নিশ্চিন্ত জীবনের সরল ও প্রশস্ত একটি পথ তাঁর সামনে প্রসারিত। কিন্তু এতো সুখেও শিশিরকুমারের সন্তোষ নেই। বাল্যে ও কৈশোরে নাট্যাভিনয়ের প্রতি তাঁর যে 'রাগ অনুরক্ত' হয়েছিল—কলেজ জীবনে এবং ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউটের অভিনয়ে যা' "অহরিশ বাড়ল অবধি না গেল।" সেই নিরবধি —নাট্যানুরাগে শিশিরকুমার তখন অস্থির। একদিকে অধ্যাপক জীবন অন্যদিকে নট-জীবন। একদিকে অধ্যাপকের মানসম্মান এবং নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত জীবন যাত্রা; অন্যদিকে নট-জীবনের অখ্যাতি অসম্মান ও অনিশ্চিত অভাবগ্রস্ত জীবন। একদিকে বিদ্যাচর্চা, অন্যদিকে শিল্প সাধনা। একদিকে প্রতিষ্ঠের অনুশীলন অন্যদিকে স্বভাবের পরিতোষণ—ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, একদিকে স্বার্থ অন্যদিকে শিল্প। শিশিরকুমারের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব। শিল্পপ্রেমে শিশিরকুমার জাতি-কুল-মান সব ত্যাগ করলেন। অধ্যাপক-শিশিরকুমার অভিনেতা-শিশিরকুমার হ'লেন। বৃত্তির এই পরিবর্তন যে কত দুঃসাহসিক কত বিপজ্জনক আজ তা সম্যক উপলব্ধি করা যাবে না। শিশিরকুমার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ও বিপদের সমস্ত

বুকি মাথায় নিয়ে সেদিন ঘর ছেড়েছিলেন—এবং সেই নাট্যশিল্পেরই হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন যাকে তিনি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আঁকড়ে ছিলেন। শিল্প প্রেমের এতো বড় নিদর্শন শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ।

অধ্যাপক শিশিরকুমারকে হারিয়ে অধ্যাপকজগতের যতো বড় ক্ষতিই হোক, নাট্যজগতের লাভ হয়ে গেছে। নাট্যজগৎ পেল এক কৃতবিদ্য অধ্যাপককে যিনি একাধারে তত্ত্ববিদ ও প্রতিভাবান অভিনেতা, যিনি সঙ্গে নিয়ে এলেন বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের শিল্প সাহিত্যের প্রচুর জ্ঞান বিশেষতঃ শেক্সপীয়রের নাটকের পঠন-পাঠনের দ্বারা অনুশীলিত একটী সুমার্জিত ও সমুন্নত সুরুচি। এ-কথা ঠিক যে 'শিশিরচন্দ্র অভিনয় কলার theory and practice দুই বিষয়েই তাহার সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন সর্বতম.....শিশিরচন্দ্রের বিদ্যার পরিধি ছিল বহুবিস্তৃত। ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে বহুবিস্তৃত ইংরাজি সাহিত্য তার সঙ্গে শিশিরচন্দ্রের পরিচয় সামান্য ছিল না। ইংরাজি সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্যসমালোচনার প্রায় সকল বিভাগেই তিনি লব্ধপ্রবেশ ছিলেন। সমসাময়িক ইউরোপের রাজনৈতিক ইতিহাসেও তাঁর অজ্ঞানা ছিল না।...সাহিত্যের দর্শন বিভাগেও তাঁর অধিকার বহুলের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তারলাভ করে" কিন্তু এ কথাও মিথ্যা নয় যে শিশিরকুমার বিশেষ নিয়ম ধারাবার ভেতর দিয়ে বিদ্যাভ্যাস করেছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন। এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে শিশির কুমারের চিত্ত অধিকতর অনুশীলিত, অধিকতর জ্ঞানদৃপ্ত ছিল এবং এতখানি অনুশীলন ও সমৃদ্ধি নিয়ে এর আগে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আর কোন শিল্পীই আসেননি। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের অভিনয়ে শিশিরকুমার যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন তা তাঁকে শুধু অভিনেতা হতেই সাহায্য করেনি, সুদক্ষ প্রয়োগবিজ্ঞানীও করে তুলেছিল—প্রয়োগ তত্ত্বের জ্ঞানকে কার্যক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতেও শিখিয়েছিল। এই শিক্ষাভ্যাসের অনিবার্য ফল শিশিরকুমারের নতুন অভিনয়-রীতি—নতুন প্রযোজনা-রীতি। শিশিরকুমারের অভিনয়-রীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলা চলে—চরিত্রের ব্যাখ্যা এবং সেই ব্যাখ্যা নিরূপিত ধ্যানের ছন্দোময় অভিব্যক্তি, সমস্ত সত্তা দিয়ে সেই ধ্যানকে রূপায়িত করা। সমস্ত বড় অভিনেতাই এই রীতি অবলম্বন করে থাকেন—তাঁর চরিত্রের 'outer reality'র চেয়ে 'inner reality'র উপরেই বেশী জোর দিয়ে থাকেন এবং সেই গভীরতার সত্তা ও সত্যকে ব্যক্ত করতেই চেষ্টা করে থাকেন। বড় অভিনেতারা প্রত্যেকেই বড় ভাস্কর। তারা চরিত্রের ভাস্কর্য-রচনা করেন—এবং তা' করেন, সমস্ত সত্তা দিয়েই—আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক অনুকরণ বা আচরণের সাহায্যেই।

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হওয়ার সমস্ত সম্পদই শিশিরকুমারের ছিল। ছিল সুন্দর সুগঠিত দেহ, ছিল উদাত্ত সুকণ্ঠ—ছিল তিন গ্রামে স্বরের আরোহ অবরোহ, ছিল আবেগকে ব্যক্ত করবার সহজ সংস্কার এবং সকলের উপরে ছিল—উচ্চকোটিক কল্পনা ও ভাবনাশক্তি—ছিল ধ্যানের ক্ষমতা, ছিল অসাধারণ তন্ময়ীভবনযোগ্যতা। তাই, শিশিরকুমারের অভিনয় চরিত্রের অনুকরণ বা প্রদর্শনমাত্র ছিল না—ছিল সৃজনধর্মী, ছিল ধ্যানলব্ধ আদর্শ রূপের সুন্দর অভিব্যক্তি। তাঁর অভিনয় রীতি 'রিয়েলিষ্টিক' এবং 'রোমান্টিক' দু'য়ের এক অপূর্ব সমন্বয়।

প্রযোজক শিশিরকুমার 'সীতা' নাটকের উপস্থাপনায় তাঁর নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে উপস্থিত

হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় "বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও শিশিরকুমার" গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করে দেখিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য এই—

(ক) আগাগোড়া একই তঙ্গি অনুসারে একসুরে বাঁধা নূতন আদর্শের অভিনয়।

(খ) গ্যাস প্রদীপের ব্যবস্থা বন্ধ। স্বভাবতঃ আলো আসে ওপর থেকে এবং এপাশ ওপাশ দিয়ে। গ্যাসপ্রদীপের আলো নীচে থেকে ওঠে ওপরে। গ্যাসপ্রদীপ নিবিয়ে সীতায় প্রত্যেক দৃশ্যে স্বাভাবিক আলো ব্যবস্থা করে বাংলা রঙ্গালয়ে প্রথমবারে আধুনিক আলোকসম্পাতে কৌশলের নিদর্শন দেখানো হয়।

(গ) ঐকতান বাদন বন্ধ। বাংলা রঙ্গালয়ে ঐকতান বা concert নাটকীয় ক্রিয়ার সহগামী ছিল না, বরং অনেক ক্ষেত্রেই ছিল পরিপন্থী। তার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক সঙ্গীতের ব্যবস্থা।

(ঘ) পিছন থেকে টেনে তোলা সমতল ক্ষেত্রে আঁকা দৃশ্য পটের ব্যবহার তুলে দেওয়া।

(ঙ) নাট্যক্রিয়ার অনুসারী যুগোপযোগী গানের সুর এবং নৃত্যে নূতন ধারা—প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য থেকে নৃত্যভঙ্গি গ্রহণ।

(চ) আগাগোড়া প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের গ্রামাণিক স্থাপত্য ও সাজপোষাক এই প্রথম।

(ছ) সংলাপে শব্দের অর্থ বুঝে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন।

(জ) মঞ্চের উপর অবস্থানকালে সংলাপ না থাকলেও, কোন অভিনেতাই স্থির বা আড়ষ্টভাবে থাকবে না—উপযোগী ভাবাভিনয় দ্বারা নাটকীয় ক্রিয়াকে সাহায্য করবে।

• • • •

প্রযোজনার ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের অবদান—অভিনয়ের সমস্ত আঙ্গিকের সমবায়ে এক মহা ঐকতান সৃষ্টি। দৃশ্য, আলোক, নৃত্য, সংগীত, সংলাপ, ভাবাভিব্যক্তি পাত্র-পাত্রীর বিন্যাস—সব উপাদানের সুসঙ্গতিময় প্রয়োজনের ভিতর দিয়ে এক সুসম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের সৌন্দর্য সৃষ্টি। শিশিরকুমারের আগে সবই ছিল—দৃশ্য ছিল, আলোক-সম্পাত ছিল, নৃত্য ছিল, গীত ছিল, আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক অভিনয় ছিল, ছিল না শুধু সেই সৃজনশীল কল্পনা বা অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা যা সব কিছুকে আত্মসাৎ করে, সব কিছুর সমাহারে অপূর্ব কিছু সৃষ্টি করে। শিশিরকুমারের ছিল সেই অপূর্বস্তু নির্মাণ করার ক্ষমতা তাই শিশিরকুমার হতে পেরেছিলেন—অদ্বিতীয় নাট্য প্রযোজক।

———

রেখাচিত্রে

শিশিরকুমার

প্রকৃল্ল নাটকে
যোগেশ

ফটো : শ্রীপরিমল গোস্বামী

তখৎ-এ-তাউস নাটকে
ছদ্মবেশে
জাহাঙ্গীর শা।

আলমগীর নাটকে
আলমগীর

একটি বিশিষ্ট ভূমিকায়
শিশিরকুমার

ষোড়শী নাটকে
জীবানন্দ

এই রং, এই রূপ

আশাপূর্ণা দেবী

আবার পায়রাডাঙা স্টেশনে এসে নামলেন বিভূতি গুঁই। বছর দশেক ধরে বছরে বার তিন চার যেমন নেমে আসছেন, ট্রেন স্টেশনে ইন্ করতে না করতে হুড়মুড়িয়ে।

পায়রাডাঙা স্টেশনে ট্রেন চার পাঁচ মিনিট থামে, তবু বিভূতি গুঁইয়ের ভঙ্গীতে পাঁচ সেকেণ্ডের তৎপরতা। অবশ্য তার সঙ্গে আরও একটা ভঙ্গী মেশানো। বগল দাবায় ছাতাটিকে দিয়েই বিশ্বসুদ্ধ লোককে যেন সমরে আহ্বান করছেন বিভূতি গুঁই।

পায়রাডাঙা'য় বিভূতি গুঁইয়ের জামাইবাড়ী, তবু এ অঞ্চলের সবাই বিভূতি গুঁইকে হাড়ে চিনে চেনে। আর ওঁর ওই বাঁট উঁচোনো প্রাগৈতিহাসিক যুগের ছাতাটিকেও চেনে। ছাতার অঙ্গে মাঝে মাঝে যে দু'চারটে রং বেরঙের বহুল তালি পড়ে তার জন্যে কিছু এসে যায় না, চেনার অসুবিধে হয় না তা'তে। বাঁটটা আর ছাউনিটা তো আদি ও অকৃত্রিম।

অবশ্য আদি ও অকৃত্রিম ওঁর প্রায় সবই। গলাবন্ধ জিনের কোটটি, রং হারানো খাকি ক্যাম্বিসের জুতোটি, নিকেল ফ্রেমের চশমাটি, কি নয়? আর বুকের মাংস পেশীর আকুঞ্চন? দরাজ গলার ঘোষণা? সবই প্রায় অপরিবর্তনীয়।

বছরে অন্ততঃ বার তিন চার এই পায়রাডাঙা স্টেশনে নামেন বিভূতি গুঁই। নেমেই টিকিট কালেক্টার বিজয় বিশ্বাসের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, বলেন, 'বুঝলে বিজয়, চলেই এলাম। এই জন্মের শোধই এসে গেলাম এবার। ছেলের ভাত আর—'

বিজয় তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'থাক থাক, ওসব কথা পরে হবে, ততক্ষণ আপনি—'

বিভূতি এ ইঙ্গিত পাত্তে আনেন না। ওঁকে দেখে এগিয়ে আসা সমবেত জনমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'থাকবে কেন? থাকবার কি আছে? লুকোছাপার তো কিছু নেই। যা বলবো সর্বসমক্ষেই বলবো। খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। এবার বাকী দিন কটা তোমার কাছেই। এবার যা যাবো, তা' একেবারে তোমাদের ওই 'পাকুড়তলা'তেই যাবো।' বলা বাহুল্য 'পাকুড়তলা' স্থানীয় শ্মশান।

বিজয়ের সহকর্মী অথবা অবগুনেরা, প্রায় সকলেই বিভূতি গুঁইয়ের মুখ চেনা। তাদের মুখের দিকে তাকিয়েই—এই আলাময়ী সংকেতটি প্রকাশ করেন বিভূতি। তাদের কেউ কেউ হাত তুলে, কেউ কেউবা হেঁট হয়ে একটা নমস্কার করে ফেলে হেসে বলে, 'সে তো আপনি আজ দশ বছর ধরেই বলে আসছেন গুঁই মশাই, থাকেন কই? দু'দিন যেতে না যেতেই তো ছেলের জন্যে মন টানবে?'

'মন?'

বিভূতি ওঁই আরো উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। 'মন' নামক শব্দটাকেই যেন সামনে খাড়া রেখে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, 'মন মানবে ? অমন মনের মুখে তা'হলে লাথি মারি! না না, 'মন' বলে আর কিছু নেই বাবাজীর! বেয়াল্লেল আর দুর্ব্যবহারের চাঁটায় পেষাই হয়ে মন একেবারে ছাতু হয়ে গেছে। ওর জন্যে আর ভাবিনা। এখন শুধু ছুটো খাবো আর পড়ে থাকবো। দেব বিজ বুদ্ধি না, চরিনাম টরিনাম আসে না, সে ভেক্ করবো না। বিজয়ের বাড়ী যাব করে ডিটেকটিভ লাগিয়ে আছে তাই নিয়ে দিব্যি কাটিয়ে দেব। মেয়েটা আমার স্নেহবতী, গুরুজনে ভক্তিশ্রদ্ধা আছে, কিছু অসুবিধে হবে না।'

বিজয় বিশ্বাস নিশ্বাস ফেলে মনে মনে বলে, 'নাঃ তোমার অবিদ্যি অসুবিধে কিছু হবে না। বাকীটা উহ্যই রাখে, মনের মধ্যেও উহ্য রাখে। তা' বিভূতি ওঁই ওসব মনের কথার দিকে যান না, পুরোদমেই চালিয়ে যান—'এই ডেকে হেঁকে বলে রাখছি সবাইকে, ছেলেকে আমি তেজা পুতুর করে এসেছি। যা কিছু খুঁদ কুড়ো আমার আছে, সব আমার মেয়ে জামাইকেই—'

'যান যান বাড়ী যান। ছেতে পুড়ে এসেছেন!' বলে শ্বশুরকে ঠেলে পাঠিয়ে দেয় বিজয়। স্টেশনের কাছেই কোয়ার্টার্স, গাড়ী পালকীর প্রশ্ন নেই।

প্রথম প্রথম সহকর্মীরা ভারী মুখে বলতো, 'কী বিজয়বাবু, টাকার কথা উঠতে না উঠতেই যে শ্বশুরকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলেন! কানেই নাহয় শুনতাম একটু। কেড়েও নেব না। হাত পাততেও যাব না।'

এখন আর বলে না।

বছরে যার তিন চার করে একই নাটকের পুনরভিনয় দেখে দেখে এখন তারা শুধু কৌতুকের হাসি হাসে। কারণ গোটা কয়েক দিন পরেই যে আবার 'চিরকালের জন্যে চলে আসা' বিভূতি ওঁইকে পাড়াড়াড়া স্টেশন প্ল্যাটফরমে দেখা যাবে, সে তাদের জানা হয়ে গেছে।

সেই দ্বিতীয় দৃশ্যের ভূমিকাটা একটু লম্বা লম্বা। সে দৃশ্যে ছাতাটা পর্যন্ত আধিক বগলায়, নম্রতার ছবি হয়ে প্রভুর হাতের কব্জিতে ঝোলে। আর বিভূতি ওঁই কারুর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যাবার সম্ভাবনাটা যতদূর সম্ভব এড়িয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে গিয়ে ওঠেন।

তবে নাকি জগতে হিংসে লোকের সংখ্যাই বেশী। তাই বেশ দু'চারজন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে। ব্যস্ত প্রশ্ন করে, 'একী ওঁই মশাই যে! যাচ্ছেন কোথায়? কলকাতায় কোনো কাজ আছে বুঝি?'

বিভূতি গুছিয়ে বসবার চেষ্টাটাকেই প্রাধান্য দিয়ে ঢেলা মারা একটা উত্তর দেন, 'নাঃ ভাবনগরেই যাচ্ছি আবার একবার! হারামজাদা ছেলে একখানা পোষ্ট কার্ড দিয়েও তো বাপের উদ্দিশ করবেনা! বলবেন৷ বাপ বুড়ো বাঁচল কি ম'ল—'

ট্রেন ছেড়ে দেয়।

আর বিভূতিও বোকরি হাঁফ ছাড়েন

মাস কয়েক বার।

আবার হঠাৎ একদিন কলকাতার দিকের ট্রেন পায়রাডাঙা স্টেশনে ঢুঁতে না ঢুঁতেই সেই ঐতিহাসিক ছাতাটির আগা বেরিয়ে আসে দরজা দিয়ে।

বছর দশবারো ধরেই চলছে এই ব্যাপার। যতদিন থেকে বিভূতি গুঁইয়ের ছেলে বিমল গুঁইয়ের বৌ সংসারের গিন্নী হয়েছে। শাশুড়ী সময় থাকতেই সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বৌকে দিয়ে দেবার সুযোগ দিয়ে গেছেন, কিন্তু একা বিভূতি দু'জনের মোকাবিলা নেবার চেষ্টা করেন। ফলে ওই।

থেকে থেকেই সুতো খোলা জিনের কোটটি গায়ে চাপিয়ে, আর ছাতাটি বগলে নিয়ে ভাগ্যনগর স্টেশনে গিয়ে হাজির হ'তে হয় বিভূতিকে, পায়রাডাঙার টিকিট কিনতে।

এখানে এক এক বারের 'অবস্থান কাল' মোটামুটি মাস খানেক।

হয়তো দুচার দিনের এদিক ওদিক। তা যাক—সেই কালটি বিভূতির প্রায়শঃই ত্রিধর্ম রঞ্জিত হয়। অর্থাৎ তিরিশটা দিনকে তিনভাগ করলে এই দাঁড়ায়, প্রথম দশটা দিন ব্রেক্ ফাস্টের রক্তরাঙা, দ্বিতীয় দশটা দিন উদাসীর বৈরিক, আর তৃতীয় দশটা দিন লাঞ্চের গোলাপী।

প্রথম দশকে বিভূতির মেয়ে পার্বতীকে অবিরাম শুধু বিভূতি গুঁইয়ের নরাধম পুত্র আর নিগুণা নির্দয়া নিয়তিশয় কর্তব্যহীনা পুত্রবধূর লীলাকীর্তন শুনতে হয়। তখন জগতের আর কোনও রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ করেনা বিভূতিকে। সান্ত্বনা বাক্য কাজে লাগেনা।

দ্বিতীয় দশকে বৈরিকের উদাসীনতা নিয়ে বিভূতি অনবরত বলতে থাকেন, 'মরুক গে, যার ধর্ম তার! ও নিয়ে আর মেজাজ খারাপ করিনা। পরকালে জবাব একদিন সবাইকেই দিতে হবে। তুই যে বুড়ো বাপকে ভাত দিলিনা, পরিবারকে দিয়ে অপমান করালি, এর জবাব আমি দিতে যাবনা। দিতে হবে তোকেই! যাক আমার আর ক'দিন?···টাকা কটা? সে যেমন তোর কাছে রাখতে দিয়েছি পারু, তেমনি তোরই থাকবে। আমার শেষের দিন কটা একটু দেখবি শুনবি ব্যস্।'

পার্বতী ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'তোমার টাকা না থাকলেই কি তোমায় 'শেষকালে' আমি দেখবনা বাবা?'

বিভূতি লজ্জিত হন। বলেন, 'না না তা' বলছিনা। জানি তুই আমার চিরকালের পিতৃভক্ত মেয়ে। দাদার মতন কালাপাহাড় নয়। যাক, পুঁটুলিটা ভাল করে রেখেছিস তো মা?'

পার্বতী বলে, 'রেখেছি বৈকি বাবা। সেই যে সেবার পাশের বাড়ীতে চুরি হয়ে গেল বলে, তোমার জামাই অবস্থার অতিরিক্ত খরচা করে গড্‌রেজের সিন্দুক কিনেছে একটা? তাতেই রেখে দিয়েছি। চাবি আমার আঁচলে।'

শুনে বৈরিক চিত্ত বিভূতি ওঁই নিশ্চিন্ত হন। প্রীত হ'ন।

টাকার ইতিহাসটা এই—

বিভূতির যখন ভাগ্যনগর জুট মিলের গাঁটরি গোণার চাকরীটির কাল পূর্ণ হ'ল, তখন অফিসের তরফ থেকে আজীবন পূজার দক্ষিণাস্বরূপ প্রতিভেণ্ড ফাণ্ডের টাকাটা পেলেন সুদে আসলে হাজার সাতেকের মত।

মনিব বললেন, 'হিল'-এর ব্যাঙ্কেই টাকাটা রেখে দিন গুঁই বাবু, আপনার ভবিষ্যতের সংস্থান। বাড়ীতে নিয়ে গেলেন কি খরচ করে ফেলে। স্ত্রীপুত্র পরিবার তীর্থের কাকের মত হাঁ করে বসে থাকে ওই টাকাটির আশায়।'

গুঁই হাত কচলে বললেন, 'আজ্ঞে না। সে কিছু পারবেনা ওরা। ওই বড় শক্ত ঘাঁটি।'

'আরে—রাখবে তো কোথাও?'

'সে আজ্ঞে কাছে কাছেই রাখব।'

মনিব মুখ্যুমি দেখে মৃদু হাসলেন।

চিরদিনের এক পয়সার হিসেবী গুঁই মশাই এমন বেহিসেবীর মত কথা বললেন কি বলে তাও ভেবে পেলেন না।

কিন্তু সেই বেহিসেবী কাজটাই করে আসছেন বিভূতি গুঁই এযাবৎ। কাছে কাছেই রেখেছেন সেই টাকাটি। ছেলে বহুবার বলেছে 'অতগুলো কাঁচা টাকা বাড়ীতে রাখা। কোন মানে হয়না। ব্যাঙ্কে রাখুন নিশ্চিন্দি। সুদটাও পাবেন।'

বিভূতি গুঁই ছেলের ওই কেরেস্তানিতে ভোলেন নি। ব্যাঙ্কের ছুতো করে বেটা যে টাকাটা তাঁর হাত থেকে হাতাবার ফিকিরে আছে, এ আর বুঝতে বাকী নেই তাঁর।

বিশ্বাসী অফ্রোই বিজয় বিশ্বাসও কিন্তু সেই কথাই বলে। বলে, 'অতগুলো কাঁচা টাকা বাড়ীতে রাখা মস্তর মত রিস্ক। বলেন তো আমাদের অফিসের ভল্টে রেখে দিই। যখুনি চাইবেন পেয়ে যাবেন।

বিভূতি উদাসীন মুখে বলেন, 'চাইবনা আমি আর কোনও দিনই বাবা! তোমাদের জিনিস তোমাদের কাছেই থাকবে। তবে আমি বলি কি—নাড়াচাড়ার দরকার কি? আমার গুণধর পুত্তুর যদি আবার টের পেয়ে তোমার ওই আপিসে দরখাস্ত করে বসিয়ে নেয়।'

আশঙ্কাটা হাস্যকর।

বিজয় অগ্রাহ্যের হাসি হাসে।

তাছাড়া তার পালা যে বাপের ওই ব্যাঙ্কের আধুলিকে গ্রাহ্যও করেনা, তা সে ভালই জানে। বিভূতি গুঁই সারাজীবন পাটের গাঁট গোণার কাজ করলেও তাঁর ছেলে বিমল গুই আজ সেই জুট মিলের ওয়েলফেয়ার অফিসার। মাইনে ছাড়াও অনেক টাকা সে কামায়। বাপ তাকে ত্যাজ্য-পুত্র করার ভয় দেখালে হাসি চাপতে কেশে মরে সে।

পার্বতী হাসেনা।

পার্বতী বাবাকে বোঝে।

সে বলে, 'তোমরা হাসো বটে, কিন্তু আমি বুঝি। চিরটাকাল তিন পয়সা মাইনের চাকরীতে কেটেছে, একসঙ্গে কখনো একশোটা টাকা চোখে দেখেন নি। বাবার মতন ঘুষখোরও ছিলেন না। নইলে বাবার মতন কাজ করে' ওখানের সতীশবাবু—সে যাক্; ওই টাকা ক'টা তাই বাবার প্রাণ তুল্য। ওকে বুক ছাড়া করতে পারেন না।'

বিজয় বলে, 'আরে বাবা সে টাকা তো আরো বাড়তো! টাকা যে ছানা পাড়ে।'

তা পার্বতীও বোধ করি চায়না তার ভবিষ্যতের আশা ওই টাকাগুলো চোখছাড়া হয়। তাই বলে, 'আর ছানা পাড়ার কাজ নেই, 'বাড়ী'টা থাকলেই বাঁচি।'

কিন্তু ক'দিনই বা সে টাকা পার্বতীর গড়বেজের আলমারিতে বাস করে ?

বৈরাগ্যের দ্বিতীয় দশক শেষ হয়।

নৈরিক রং বদলায়।

দেখা দেয় গোলাপী আভাস !

যেন নবোঢ়ার নবীন লজ্জা।

তৃতীয় দশকের গোড়ায় আস্তে আস্তে গাইতে সুরু করেন বিভূতি, 'যা দেখছি একদিনের জন্যে ঘুরেই আসতে হবে। একখানা পোষ্টকার্ড দিয়ে খবর বাত্লাটা দেয়না ! কে কেমন থাকলো—

পার্বতী অভিযোগ করে বলে, 'তুমি কেমন থাকলে, তাও তো দাদা জানতে চায়না বাবা !'

'আহা সে তো দেখছিই !' বিভূতি ওঁই ওঁই ওঁই করে বলেন, দাদা তো তোমার গুণের অবতার ! তার ওপর 'আমার ধনি মন্ত্রী' ! কিন্তু আমরা তো সংসারী জীব ! কর্তব্যের দায়েই মরি। আসার আগে 'বিচ্ছুটার সর্দিকাসি দেখে এসেছিলাম, মাদুটারও তেমন হ'য়ে ছিল না—'

'তা' একটা চিঠি দিইনা ?'

'চিঠি ?'

বিভূতি উদ্দীপ্ত হন। 'চিঠির জবাব দেবে কেউ ? দেবেনা ! চিনি তো সব কটাকে ! নইলে বড় নাতনীটি তো আমার কাগজ কলমেই ডুবে থাকেন, গুনি নাকি গল্প লেখেন। কই, এক ছত্তর চিঠি লিখে খোঁজ নেয় বুড়োঠাকুর্দার ? মরুক সে—যার ধর্ম তার কাছে। আমার কর্তব্য আমি করে যাবো। একটি বেলার জন্যে গিয়ে—'

কর্তব্যপরায়ণ বিভূতি ওঁইকে কিছুতেই ঠেকানো যায়না তখন।

আর সেই 'একটি বেলা' শেষ হতে মাস তিন চার কাটে।

পার্বতী ভাবে, ওদের জন্যে বাবার আকুলতা দেখে বৌদির বোধহয় এতদিনে মন গলেছে। মন আত্তি করছে বোধহয় একটু। ··ভাবতে ভাবতে বেয়াদ ফুরোয়।

সহসা আবার একদিন পায়রাডাঙা স্টেশনে নেমে পড়তে দেখা যায় বিভূতি ওঁইকে। বিশ্বস্থ সকলকে খুঁচিয়ে জানা করে দেবার ভঙ্গীতে ছাতাটাকে উঁচিয়ে গটগট করে টিকিট ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ান।

উদাত্ত স্বরে বলেন, 'এবার এই একেবারে নাক কান মলে চলে এলাম বিজয় ! জন্মের শোধ শিক্ষ হয়ে গেছে।

এবারেও নাটক যথারীতি গতিতে সুরু হয়েছিল, শুধু বিজয় বিশ্বাসের সুরটা একটু বেসুরো হ'ল। মনের কথা মনেই না রেখে মুখেই বলে ফেলল, 'থাকতে তো পারেন না। কেনই বা ছুটে ছুটে যান হাস্যাস্পদ হতে ?'

বিভূতি অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে দ্রুত জামাইয়ের বাসার দিকে এগোতে এগোতে বলেন, 'ওই তো বললাম। এই শেষ ! আর নয় !'

বিভূতি পিছন ফিরতেই সমবেত জনমণ্ডলী বলে ওঠে, 'তা' এবারের আসাটা সত্যিই না 'শেষ' আসা হয় বুড়োর। চেহারা যা হয়েছে। বেরবো কাঠ একখানা।'

পার্বতীও প্রায় সেই কথাই বলে।

বাবাকে দেখে আঁৎকে উঠে বলে। 'একী চেহারা তোমার হয়েছে বাবা? একেবারে যে পোড়া কাঠ!'

কথাটা অত্যুক্তি নয়।

পোড়া কাঠের মতই চেহারা হয়েছে বিভূতি গুঁইয়ের। সেই ধপধপে তেলা তেলা রংটা যেন মরে ঝলসে গেছে, গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, গলার মাংস ঝুলে পড়েছে।

আর কখনো যা না দেখা দিয়েছে, তাই দেখা যাচ্ছে। এটুকু আসতে হাঁপাচ্ছেন বিভূতি।

কিন্তু আকৃতিটা মারাত্মক রকম বদলালেও প্রকৃতিটা খুব বেশী বদলায়নি বিভূতি গুঁইয়ের। তাই—খানিকটা হাঁপ জিরিয়েই কণ্ঠস্বরকে 'তারা'য় তোলেন তিনি।

উচ্চস্বরে বলেন, 'কী বলছিলি? চেহারা? হুঁঃ! বলি—চেহারার আর অপরাধটা কি? বলি চেহারার কী অপরাধ? দু'টি মাস রক্ত আমাশয়ে ভুগলে, কি করে আর দিব্যকান্তি চেহারা হবে?'

'দু'মাস ভুগেছ তুমি বাবা?

পারু অভিমান ভরা গলায় বলে, 'তবু তুমি সেই নির্ধারিকদের বাড়ী পড়েছিলে? চলে আসতে পারনি?'

বিভূতি বলেন, 'আসার মত অবস্থাটা হলে তবে তো আসবো পারু? হাত পা একটু ওঠা চাইতো? কিন্তু উঠবে কিসের জোরে। তেতরে কিছু না গেলে? তোকে বলবো কি পারু, খেতে দেয় না। কিসটের বেটি খেতে দেয় না। একটু বার্লি দেয় তাও মেপে—'

পার্বতী সেই অলক্ষিত দাদা বৌদির প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হেনে বিজয়কে বলে, 'শুনছ? শুনছ ব্যাপার?'

বিজয় মুচকি হেসে বলে, 'শুনছি বৈকি! তবে স্নানঘরে যাও একদিন, সেখানেও কত শুনবে: তোমার বাবার রক্ত আমাশায় ভোগাতে হয়তো পাড়ার তেলে ভাজার দোকান 'লাল' হয়ে গেছে শুনতে পাবে।'

তেলে ভাজার প্রতি বিভূতির দুর্বলতা কারুরই অজানা নয়, কিন্তু স্বামীর এহেন সরাসরি আক্রমণে পার্বতী রেগে আগুন হয়ে বলে, 'বাবার তো বাহাত্তুরে ধরেই এসেছে, কি আর করা যাবে? এখন একটু চিকিৎসা পত্তরের ব্যবস্থা করবে, না সেই তোমার চশমখোর ডাক্তারটার মতন চোখে ঠুলি এঁটে বসে থেকে মরতে দেবে মানুষটাকে?

তা' বিজয় বিশ্বাস লোক খারাপ নয়।

আড়ালে আবডালে শ্বশুরকে একটু ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করলেও মনে মনে মায়া করে। কাজেই চিকিৎসার ব্যাপারে ত্রুটি করেনা। বরং অবস্থার অতিরিক্তই করে। তা'ছাড়া চক্ষুলজ্জাটাও রয়েছে। এঘরে সেই মহলা জাকড়া বাঁধা পুঁটুলিটা তাঁর, বিজয়ের শয়নকক্ষের আলমারির যেখানটায় বসেছে, সেখানেই তো স্থায়ী বাস করবে?

পরে তখন যদি পার্বতী খোঁটা দেয়, 'বাবার আমার অতগুলো টাকা থাকতে ভালমত চিকিৎসা হ'ল না!'

চিকিৎসা চলতে লাগল।

সেবাও যতদূর যা হ'তে লাগল। কিন্তু সুরাহা দেখা গেলনা। বিভূতি ওঁইয়ের—প্রকৃতিটাও ক্রমশঃ বদলালো। সেই উদাত্ত গলা গেল, কিবে তেষ্টা গেল, আহারে রুচি গেল। পায়রাডাঙার তেলে ভাজার দোকানকে বড়লোক করে দেবার কোন ইচ্ছে তাঁর আর দেখা গেল না।

কিছুদিন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে থেকে অবশেষে শয্যাই নিলেন।

শেষ শয্যা!

পায়রাডাঙার পাকুড়তলাতেই তাহলে চিতার মাটি কেনা ছিল বিভূতি ওঁইয়ের?

মনে হচ্ছে—হপ্তাও কাটবেনা আর।

পার্বতী চোখ মুছে বলে, 'দাদাকে একটা খবর দিই বাবা?'

বিভূতি হাত নেড়ে বলেন, 'নাঃ। সেই ফুলাঙ্গারের মুখ আর দেখতে চাইনা।'

'তবু বাবা, ছেলে বলে কথা—'

'মুখে আগুনের প্রশ্নটা আর তোলেনা পার্বতী, ড্যাম টেনে খেয়ে যায়। কিন্তু সেই অনুক্ত প্রশ্নের উত্তরটা দিয়েই যেন বিভূতি। বলেন, 'বিমল আমার মুখে আগুন দিলে ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াবো পাক! ছেলে যদি কুপুত্র হয়, তবে সে অবাঞ্ছনীয়। তুইও আমার সন্তান, তোর হাতের আগুনেই—'

তবু চুপি চুপি ওরা বিমলকে খবর দেয়। যতই হোক দায়িত্ব একটা আছেই। কিন্তু ওয়েল-কেয়ার অফিসার' বিমল ওঁইয়ের সময় কোথা? নিন্দে তো সবাই করতে পারে, তার আসার কথা কে বোঝে?

ইউনিয়ন যে ঠিক এই সময়ই ধর্মঘট ঘোষণা করেছে, সে কথা শুনছে কেউ কান দিয়ে? তবু সে সুব্যবস্থাই করে। টেলিফোন নাম্বার দিয়ে রাখে নিজের। 'তেমন' অবস্থা হলে যাতে চট করে খবরটা পাঠাতে পারে এরা।

আর কত করবে?

তাছাড়া—

বিচক্ষণের মত কথাই করেছে সে। 'শুধু শুধু পাঁচ দিন গিয়ে বসে থাকায় তো কোনো মানেও হয়না। পারুকেও বিব্রত করা, নিজেরও লোকসান ঘটানো—

খবরটা চাপতে গিয়েও চাপা থাকেনা।

বিভূতি টের পান।

বলেন, 'হতভাগাকে সেই আবার খবর দিতে গিছলি? তার হচ্ছি আমি তোর?'

পারু অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'না বাবা! মানে তোমার জামাই বলছিল, আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে?'

'না নেই। কারুর কোনও কর্তব্য থাকবে না শুধু তোমারই থাকবে?'

বেশী কথা বলার ক্ষমতা আর নেই, তাই ওইখানেই থামেন বিভূতি।

কিন্তু ওরা থামতে পারে না।

যতই হোক ওরা সংসারী লোক। জীবনে ঠিক মৃত্যুপথযাত্রী রোগী নয়।

ভাই—

'হেমন' অর্থাৎ আসতেই বিজয় স্টেশন থেকে টেলিফোন করে যেয়।

তা এরপর আর চুপ করে থাকেনা বিমল, ঘণ্টা করেক পরেই চলে আসে।

একাই আসে অবশ্য।

পার্বতী তীব্র কণ্ঠে বলে, 'একা এলে দাদা! বৌদি এল না?'

বিমল ওঁই কুঁই কুঁই করে বলে, 'মানে দু'জনে একসঙ্গে এলে ছেলেমেয়েগুলোর—'

পার্বতীর তীব্র স্বর অনন্ত হয়, 'ও: ! তাই ? তা' তোমার কোন বাচ্চাটা কাঁধায় শোওয়া দাদা ? জানিনা তো ! কিন্তু পুজোর সময় যে শুনেছিলাম শুধু দু'জনে কাশ্মীর বেড়াতে গেছ ? তখন ছেলেমেয়েগুলো—'

বিমল কি উত্তর দিত কে জানে। হয়তো দিতে একটু বিপদেই পড়তো। এ পরিস্থিতিতে তো চড়ে' ওঠা যায় না। কিন্তু বিপদ থেকে ত্রাণ করলো বিজয়।

ঘর থেকে কেমন একরকম বিকৃত গলায় চেঁচিয়ে উঠল। 'কী তর্কাতর্কি করছ এখন ? ঘরে এসোনা। উনি কী রকম যেন করছেন।'

হ্যাঁ কী রকমই যেন করছিলেন বিভূতি। যে রকমটা বোধহয় সবাইকেই একবার করতে হয়।

বোনের পিছু পিছু বিমলও ঘরে ঢোকে। একটু বোধ হয় অপ্রতিভ হয়, বিচলিত স্বরে ডেকে ওঠে 'দাদা !'

কে ডাকে ! এ কী পাকুর গলা ? পাকুর গলা কি এমন তরাট জোরালো ? বিভূতির চিরকালের মত সুপ্ত হয়ে আসা চৈতন্যে বুঝি একটু স্পন্দন জাগে, চিরদিনের জন্যে বুজে আসা চোখ দুটো বুঝি একটু বিস্ফারিত হয়। আর চিরনীরব হয়ে আসা কণ্ঠ, খাবি খাওয়া মুখের গহ্বর থেকে বেরিয়ে এসে বিড়বিড় ক'রে বলে,…'একশো কম সাত দাদার ! পাকুর কাছে…পাকু আমার নির্লোভ মেয়ে… ধর্মজ্ঞানী…'

শ্মশান থেকে ফিরে একটু নিভৃত হলে বিজয় গলা খাটো করে বলে, 'ক'দিন শুনে শুনে তোমার অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল, তুমি বুঝতে পেরেছ, তোমার দাদা ওই বিড়বিড়িনির এক বর্ণও বোঝেনি। সে তুমি ঠিক জেনো।'

অনেক কান্নার পর, কান্না শুকোনো আলা আলা চোখ দুটো স্বামীর দিকে তুলে ধরে পাকু স্থির গলায় বলে, 'দাদা বোঝেনি, আমি তো সবই বুঝেছি।'

———

তৃতীয় মুখ

নীলিমা দাশগুপ্ত

সারা বাড়িময় একটা চাপা বিষণ্ণতা। চল্লিশটা দিন দীর্ঘশ্বাসহীন উদ্বেগে কাটিয়ে সবে স্বস্তি শুরু হয়েছিলো। ডাক্তারের অভয়বাণীতে—স্নিগ্ধ প্রসন্ন হাসিতে, খুশির আমেজ দেখা গিয়েছিলো আবার বিয়েটার রোডের বাড়িটার সর্বত্র।

নাটকীয়ভাবে বিশ্রী একটা ভালোছায়া মুহূর্তে ঢেকে দিলো সব। কেমন একটা বোবা বুক-চাপা ব্যথা যেন ভারি পাথরের মতো বুকে চেপে বসেছে আজ শিবানীশংকরের। অস্থির উত্তেজনায় বড় বড় পা ফেলে পাইচারি করছেন লনে।···কী হবে? কী হবে এরপরে? ···আদরিণী টুটুকে জলে ভাসিয়ে দেবো··। উৎকর্ণ হলেন শিবানীশংকর।··কিচেনে অবিরাম ফিস্ ফিস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না?··· সেই দুপুরের ঘটনারই জাবর কাটছে নিশ্চয়ই। ঠাকুর চাকরের এমন অজস্র ফিস্‌ফিসানি এর আগে আর কখনো শোনেননি তো! এত কী কথা ওদের!

ধীরে ধীরে শিবানীশংকর লন পেরিয়ে এলেন। দু আঙুলের ফাঁকে পাইপের তামাক পুড়তে লাগলো। বাগানের দিকে চেয়ে রইলেন। বাতাসের সঙ্গে মাথা দোলাচ্ছে মরশুমি ফুলগুলো—ফ্লক্স, স্টক্স, প্যান্‌জী···। কস্‌মসের পাপড়িগুলো ঝরে পড়েছে রাশি রাশি মাটির ওপর। আশ্চর্য! তার ভেতর উনি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন, একমাস রোগে-ভোগা টুটু চোখ টান করে অভিযোগ জানাচ্ছে।··মুহূর্তে পেছন ফিরলেন। পেছনদিকের ঘোরালো সিঁড়ি দিয়ে ঝাড়ু-বাসতি হাতে নিয়ে অন্ধকার রামনরেশ নামছে। রামনরেশও কী ওঁর দিকে তির্যক চোখে তাকালো?···

—নাঃ। এই যন্ত্রণার ছোবল আর সহ্য হয়না। এই উত্তাক্ত অস্থিরতায় কেন উনি কষ্ট পাবেন?···

মুলেফ দাদীমার কথাই হবে। বরণের সঙ্গেই বিয়ে দেবেন টুটুর। উনি আর শিবানীশংকর, ইন্টার ন্যাশনাল খ্যাতি যাঁর টীল এ্যাণ্ড আয়রণ সাম্রাইতে, যাঁর তিনটে কোলিয়ারী, দুটো জুয়েলারি, সহস্রাধিক চা বাগানের শেয়ার, কুবেরের চাবিকাঠি যাঁর হাতে; যিনি বিরাট সার্থকতা ও সমৃদ্ধির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি কেন সইবেন এ সব?

একটা ভিখিরীকে রাজা করতে তিনি কী পারেন না?···

আজ দুপুরেই ঘটেছে কাণ্ডটা। তার শিবানীর বড় মেয়ে টুটু দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে টাইফয়েডে ভুগলো। ক্লোরামাইসিটিনও দিয়ে যেতে পারেনি দ্রুত আরোগ্যের পথে। ভেতরের সমস্ত যন্ত্র নাকি একযোগে জট পাকিয়েছিলো। টুটুর ভার সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে, সাতদিন ধরে ইনজেকশন দেওয়া বন্ধ করেছিলেন ডাক্তার। গতকাল ডাঃ চ্যাটার্জি খোলাখুলি আশ্বাস দিয়ে গেছেন, সব নর্মাল, আর কোনো ভয় নেই।

শীতল অবসাদ নেমেছে সকলের শরীরে। এক বরুণ ব্যতিক্রম। টুটু-বুবুর ছোটো গাড়ির ড্রাইভার সে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ শক্ত পোক্ত চেহারা, কম কথার মানুষ। ওই আগ্‌বাড়িয়ে টুটুর সেবায় অনেকখানি ভার নিয়েছে। দিনের বার্ণ রাখতে দেয়নি। বলেছিলো নার্সিং ও জানে। বরুণকে তরলা করা চলে। বহুদিন আড়াল-আবডাল থেকে শিবানীশংকর তীক্ষ্ণ নিরীক্ষণ করেছেন, বরুণের নার্সিং প্রথম শ্রেণীর শিক্ষিত নার্সের পর্যায়েই পড়ে। স্ত্রী হৈমবতীও এক নাওয়া খাওয়ার সময় ছাড়া সারাটা দিনই মেয়ের কাছে থাকেন।

আজ হৈমবতী বিশ্রাম নিচ্ছেন একটু।

বরুণই জোর তাগিদ দিয়ে পাঠিয়েছে বিশ্রাম নেয়ার জন্য। পাশের ঘরে ক্যাম্পখাট বিছিয়ে শুয়ে পড়েছেন হৈমবতী। হাতা তন্দ্রা নেমেছে। এমন সময় সন্তর্পণে উঠে এলো ঠাকুর সদাগর তেয়ারী। অনেক কালের ঠাকুর সে। পেছনে নবনিযুক্ত পাহাড়ী ভৃত্য বুধলাল। পাহাড়ী ভৃত্যকে শহর কলকাতা দেখিয়ে বাহাদুরি নেবার ইচ্ছেটা ক'দিন ধরেই সদাগরের মনে ঘোরপাক খাচ্ছে। দিদিমণির ব্যামারি সাহেবনা বলে সাহস করে বলতে পারেনি। আজ সকাল থেকে মনে মনে এঁটেছে, ঝটপট কাজ সেরে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাবে বুধলালকে। মনিব্‌নীর কাছ থেকে অনুমতি মিলবে। ঐ আধো-জাগা, আধোঘুম অবস্থার মধ্যেই হৈমবতী বলে দিলেন, চারটের মধ্যেই ফেরা চাই। পা টিপে টিপে আবার বেরিয়ে এলো সদাগর। পেছনে বুধলাল। ইসারায় সদাগর বোঝালো বুধলালকে, নিজে নামবে সামনের সিঁড়ি দিয়ে। এক কৌটা শব্দ যেন না হয়, দিদিমণির নিদ টুটে যাবে তাহলে। টুটুর ঘরের পাশেই নিচে নামার আর একটা সিঁড়ি। দিদিমণির ঘর পার হবার সময়, দিদিমণিকে এক-চুমি দেখার ইচ্ছে হলো সদাগরের। ভারি পর্দাটা দু-আঙুল দিয়ে সামান্য একটু সরিয়েই একেবারে থমকে দাঁড়িয়ে গেলো সদাগর। যোগাটে সদাগরের চোয়াল ঝুলে পড়লো। বুধলালও ঝুঁকলো।…

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রতিবেশিনী বৃদ্ধা মুলেক মাসীমার সাড়া এলো পেছন থেকে,—কীরে! তোরা অমন করে উঁকি মেরে দেখছিস কী?…মুলেক মাসীমার বয়েস হলেও সাড়াবেড়ানোর অভ্যেস আছে খুব। তিনি মাঝে মাঝে দুপুরে এসে টুটুর খবর নিয়ে যান। মুলেক মাসীর সাড়া পেয়েই, পাচক-ভৃত্যের দিকে কামড় দিয়ে ঘরিত প্রস্থান। মাসীর কণ্ঠস্বরে হৈমবতীর তন্দ্রা ছুটে গেছে। লাফিয়ে উঠে এসেছেন তিনি। কিছু আবার হলো নাকি টুটুর। হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে, এক নজর তাকিয়েই চোখ পাকালেন তিনি,—কী, হচ্ছে কী বরুণ?

মুহূর্তের জন্য চিন্তিত দেখা গেলো বরুণকে। বললো,—ওষুধের পর জল খাওয়াতে গিয়ে জল পড়ে গেছলো, মুছে দিচ্ছিলাম—উঠে দাঁড়ালো বরুণ,—আপনারা বসুন, আমি বিশ্রাম করিগে একটু—

চলে গেলো বরুণ। বরুণের ওদি আড়ষ্ট মনে হলো, কণ্ঠস্বর বিষাদিত মনে হলো। মুলেক মাসীমা আরও সতর্ক চোখে, টুটুর শুকনো খটখটে শরীরের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে ঘুরিয়ে নিলেন, "জল মুছিয়ে দিচ্ছিলাম বললেই হলো—" মুলেক মাসীমা পানের ছোপলাগা কাটা ঠোঁট বিস্তার করে খানিকটা বাঁকা হাসি হাসলেন। সে হাসির চেহারা দেখে, শ্বাসরুদ্ধ করানো তীব্র একটা ভয় তড়াক্ করে লাফিয়ে যেন হৈমবতীর দুঁটি টিপে ধরলো। মেয়ের দিকে তাকালেন হৈমবতী। ক্লান্ত চোখ দুটোকে টেনে, আকাশের মতো বিস্তৃত করে মেলে ধরেছে টুটু। মেয়ের চোখে কেমন অসহায় ছায়া দেখলেন। যেন নালিশ দাখিল করছে টুটু। মাসীর দিকে তাকালেন।

অভিজাত পাড়ার গেটেই মুলেক মাসীমার বিশ্রী অমুলধিংসু চাউনির দিকে তাকিয়ে ছেলে-মানুষের মতো মাসীর হাত দুটো চেপে ধরলেন হৈমবতী, "কারোকে বলবেন না যেন মাসীমা—"

গাড়ির পরিচিত হর্নের শব্দ শুনে, হন্ত আবেগ চাপতে চাপতে হৈমবতী বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

বহুদিন পর, আজই শিবানীশংকর গিয়েছিলেন ওঁর কারখানাতে, এস্, এস্, কোম্পানী একমাস হলো বন্ধ। সমস্ত শ্রমিক দল পাকিয়ে ধর্মঘট করেছে। অসংগত আব্দার সব, মাইনা বাড়াও, ভাতা বাড়াও, মনের ভেতরটা উষ্মার উত্তাপে উষ্ণ। মেজাজ ভাল নয় শিবানীশংকরের। অনেক চেঁচামেচি করতে হয়েছে কারখানাতে। ওপরে সিঁড়ির মুখেই হৈমবতী থামিয়ে দিলেন, "আগে এঘরে শুনে যাও, টুটুর কাছে পরে যেও।"

স্ত্রীর শুষ্ক থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে, কোনো প্রশ্ন না করে হৈমবতীকে অনুসরণ করে পাশের ঘরে এসে দাঁড়ালেন।

ফেটে পড়লেন হৈমবতী। যেন তপ্ত কড়াই থেকে ভাপ ছড়ালো। গুছিয়ে বলার ধৈর্য যেন নেই, "এখুনি চাবুকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও বঙ্গকে—"

তার শিবানীর হাতটাও চাবুকাবার জন্য নিশপিশ করছে। ধর্মঘটের প্রধান পাণ্ডা নিখিল ছোঁড়াকে পাননি হাতের কাছে। দুর্বার আক্রোশে আবার চোখদুটো জ্বলে উঠলো ধক্ ধক্ করে। এখন যে কাউকে চাবকালেই যেন হয়, কারণ জানতে চাননা।

"এই কী মাথাগরমের সময় শিবানী?" কখন মুলেক মাসীমা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

"হয়েছে কী?" বাইরের মানুষের কাছে আত্মস্থতা বজায় রাখার চেষ্টা করলেন শিবানীশংকর।

"সে বউমার কাছে শুনো তুমি, সে কথা কী আর বলা যায় বাকি?"

কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপের আঁচ মিশিয়ে, মুলেক মাসীমা তারপর ঝাঁকিয়ে বসলেন ঘরে। গলা নামিয়ে অস্পষ্ট ইসারায় স্বামী শিবানীর মনের সামনে কয়েকটা ভয়ের ছবির আঁচড় কাটলেন, শেষে আশ্বাস এবং উপদেশ দিয়ে কথা শেষ করলেন মুলেক মাসীমা,

"আমার মুখ দিয়ে একটি শব্দ বার হবে না বৈম, কিন্তু ঠাকুর-চাকর দেখেছে যে, ছোটোলোক বলে কথা···। যাতে ঘরের কথা বাইরে না যায়, সে চেষ্টা দেখো শিবানী, ইন্ধন যোগাবার লোকের তো আর অভাব নেই, তোমার বাড়-বাড়ন্তে সকলেরই চোখ টাটায়, ব্যাপারটা রসগুণ হয়ে বাইরে ছড়াবে···, তার চেয়ে আমি বলি কী···" একটু থামলেন মুলেক মাসীমা, "স্বজাতি যখন,···বঙ্গর সঙ্গে টুটুর বিয়ে দিয়ে দাও···ল্যাঠা চুকে যাক্, কানাঘুষার পথ আপনি বন্ধ হয়ে যাবে—"

বিমূঢ় শিবানীশংকর অসহিষ্ণু উত্তেজনাকে দাবিয়ে নীরবে মুলেক মাসীমার কথা শুনে যাচ্ছিলেন, এমনকি একটুকরো সহিষ্ণুতার হাসিও ঝুলিয়ে রেখেছিলেন ঠোঁটের মাঝখানে। শেষের কথায় ক্ষেপা গলায় চীৎকার করে উঠলেন, "থামুন আপনি।" এলোমেলো পা ফেলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন শিবানীশংকর।

শিবানীশংকরের সুনাম শিখরস্পর্শী। কলংকের কালি ছিটানো যায়না তাতে···।

সহস্র বুদ্ধতা হীনতা ডিঙিয়ে, রাতারাতি সাধোগতি হয়ে গেলো বঙ্গর ঘটব্যাদ্। মোটর

ড্রাইভার থেকে একেবারে স্বয়ং শিবানীশংকরের ব্যবসার বিরাট অংশীদার। গাড়ি, বাড়ি, প্রতিপত্তি একাধারে সব। এঁদো ডোবার শাপলা থেকে বিস্তীর্ণ তটিনীর পঙ্কজ।

বরুণ ছোঁড়া থেকে মিঃ বটব্যাল।

শেষ বয়েসে, শহর থেকে দূরে একটু খোলামেলা জায়গায় থাকবেন বলে, স্ত্রীর শিবানী রিজেন্ট পার্কে, বিঘা চারেক জমির ওপরে একটা বাঙলো প্যাটার্নের বাড়ি তুলছিলেন। বেশী রাজ খাটিয়ে একমাসের মধ্যেই শেষ করলেন সেটা। পুরোনো পাচক ভৃত্যকে বরখাস্ত করে সপরিবারে চলে এলেন সেখানে। অতীত ফেলে রেখে এলেন থিয়েটার রোডের বাড়িতে।

সাদার্ন এভিনিউর রাস্তার ওপর, ভদ্রতাসূচক দূরত্ব বজায় রেখে দুই মেয়ের দুখানা প্যালেসিয়াল্ বিল্ডিং আগেই তুলেছিলেন। টুটুর বাড়িতে স্থান পেলেন বরুণ বটব্যাল। সে স্থান তারপর মনের জোরে কায়েমী হয়ে গেলো। আরো দু'মাস পরে, টুটুর বি. এ. পরীক্ষা শেষ হতেই।

খবরটা শুনে আশ্চর্য বিস্মিত হয়ে ছুটে এসেছিলো টুটু, কান্নাগলায় বললো, "বাপি, এসব কী শুনছি—"

মেয়ের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ভয়ানক ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন শিবানীশংকর, "সব দিক বিবেচনা করে এ বিয়ে স্থির করেছি আমি—"

পিতার এ স্বাদহীন কণ্ঠস্বর একেবারে অচেনা টুটুর। তাছাড়া মাও কী যেন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত করেন মাঝে মাঝে। উদ্গত অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে, চোখের জল সামলে চলে গেলো টুটু। মেয়ের ম্লানমুখ আর বিষাদ করুণ কণ্ঠস্বরে বেদনা বোধ করলেন শিবানীশংকর।···কিন্তু, না। নিজের আকাশ ছোঁওয়া মাথা নামাতে পারবেন না তিনি। কোনোমতেই না। সেখানে মেয়ের অভিমান, চোখের জল নিষ্ফল, স্ত্রীর অনুনয়, উপদেশ নিরর্থক।

খুব চৌখড় ছেলে এই বরুণ। শুধু চৌখড় নয়, অসীম শক্তি ধরে সে। একমাসে কারখানার চেহারা বদলে দিলো। বেড়া আর বাড়িয়ে দিলো এস্, এস্, কোম্পানীর। অর্ধেক বেতনে অস্থায়ী লোক দিয়ে কারখানা চালু করে দিলো পূর্ণগতিতে। তাছাড়া আজ এই কোলিয়ারির তদারক, কাল ওই জুয়েলারির তদির, নিজের আরাম-বিরাম স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলো রকেটের মতো। সব দিক দিয়েই এখন নিশ্চিন্ত শিবানীশংকর। বড় জামাই বহু জটিল ভাবনা-চিন্তা ও পরিশ্রমের লাঘব করে দিচ্ছে। বরুণের তৎপরতা, কর্মপটুতা ও পরিণামদর্শিতা দেখে হৈমবতীও বিস্মিত হলেন যে, এই ছেলেটিই একদা তাঁর বাড়ীতে স্বল্প-বেতনের ড্রাইভার ছিলো। মনের অবস্থি কেটে গেছে সকলের। কিন্তু, তবু কেন এমন হয়?···মাঝে মাঝেই হয়। কাজকর্মের অবসরে তার শিবানীর মনের মধ্যে এক আকাশ আষাঢ়ের মেঘ জমা হয়, নিজের বুকের মধ্যে একটা নিঃসীম শূন্যতা অনুভব করেন। কী দিয়ে সে শূন্যতা পূর্ণ করবেন?··· কিছুকাল অন্তরে বাইরে হাতড়ে বেড়ালেন শিবানীশংকর।

এরপর, তিনমাস যাবে আবার সানাই বেজে উঠলো রিজেন্ট পার্কের বাঙলো বাড়িতে। দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন শিবানীশংকর, বুকের সে বিরাট ফাঁকটা বড় জামাইয়ের অবিদ্যার ফাঁক।

বরুণ বর্মে-সুষমার পদ্ম ঠিকই কিন্তু পদ্মসঙ্কী নয়, ধনারও নয়। সেটা উদ্ভাস করবেন ছোটো জামাইকে দিয়ে। ছোটো জামাই হচ্ছেন বহু ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিক সুপণ্ডিত নন্দী। ডক্টরেট্ নন্দী বিদ্যায় একেবারে খাঁটি কুলীন। দেশজোড়া তাঁর নাম। তাঁর জনপ্রিয়তা যে-কারুর ঈর্ষার বস্তু।

: বুবুর চেয়ে একটু বয়েসের বেশী তফাৎ। তা হোক্, পুরুষের আবার বয়েস কী?

: বুবুর আই. এ, পরীক্ষা সামনে। তাতে কী, বিয়ের পর পড়বে।

বিলম্বে এমন জামাই হাতছাড়া হয় যদি! এক লক্ষ টাকার বিনিময়ে বহু ডিগ্রীধারী দামী জামাই লাভ করলেন। আত্মপ্রসাদে আপ্লুত স্যার শিবানীশংকর।

লেবার ইউনিয়ন আর কতদিন টানবে? তাদের ক্ষমতা কতটুকু? পুরোনো শ্রমিকেরা কংকালসার চেহারা নিয়ে একের পর এক শিবানীশংকরের পা জড়িয়ে ধরতে লাগলো। জুতো খেয়ে, লাথি খেয়ে, স্যার শিবানীর সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে, মানুষের দাবী নিশ্চিহ্ন করে মাটিতে মিশিয়ে ধুকতে ধুঁকতে আবার শুরু করে দিল কাজ। কেবল ধনপতি নিখিলকে নেওয়া হলোনা।—এক নম্বরের কুচক্রী, এক নম্বরের ইতর। সব সময় শয়তানী খেলছে তার বুকের সরু সরু ধুকধুকে পাঁজরগুলোর মধ্যে। বেশীদিনের পুরোনো শ্রমিক, বেশীরকম হাঙ্গামা শুরু করেছিলো। রুদ্ধ আক্রোশে বরুণ একটা বেত ভেঙে ফেললো নিখিলের পিঠের ওপর।..

একটা বাড়তি আনন্দ আজ অনুভব করছেন স্যার শিবানী।—পৃথিবীতে যার টাকা আছে, সেই সুখী। টাকা থাকলে, অথৈ দরিয়ার বানচাল নৌকোও তীরে তেড়ানো যায়। গাড়িতে ঠেস দিয়ে, চোখ বুঁজে, শিবানীশংকর মিষ্টি আমেজটুকু উপভোগ করতে করতে চললেন। হঠাৎ কীণ একটা সোরগোলে টুটে গেল তন্দ্রাটুকু। গেট আটকে দাঁড়িয়ে আছে তারা যেন। ড্রাইভার পথ দিতে বলছে, সরছে না। অবাহিত আবির্ভাব।

নির্বাক ক্রোধে শিবানীশংকরের মুখ লাল হয়ে উঠলো।

মেয়েলী কণ্ঠের অস্ফুট দাবী কানে এলো,—সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো—পিঠ টান্ করলেন শিবানীশংকর। জলদ গলায় হুংকে উঠলেন, "কে তুমি? কী চাও?"

"আমি আপনার কারখানার শ্রমিক নিখিলের বউ—" আর্ত ব্যাকুল গলা মেয়েটির, "আমার ছেলেমেয়ে দুটির মুখ চেয়ে, আপনি আমার স্বামীকে মাপ করেন হুজুর···, বাড়িয়ালা আজ আমাদের ঘর থেকে বার করে তালা লাগিয়ে দিয়েছে···"

স্যার শিবানীর উষ্ণ দুই চোখ মেয়েটির মুখের ওপর স্থির হলো, অগ্নিকরণের পূর্বেই, ভোজপুরী দারোয়ান ছুটে এসেছে। লাঠি বাগিয়ে তীক্ষ্ণ কটূক্তি ঝাড়লো,

"এ্যাই মাগী, হটো না হিঁয়াসে, হট্ যাও—" মোটা তেলকুচ্‌কুচে লাঠির দিকে তাকিয়ে, ছেলেমেয়ে দুটি চীৎকার করে মাকে টেনে নিলো একধারে। গাড়ি চলে গেলো।

ভেতর থেকেও একটানা কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছেন শিবানীশংকর,—খেতে দাও, খেতে দাও করে কাঁদছে ছেলেমেয়ে দুটি।

—নাঃ। এতো আজ্ঞা কাঁদেনা শুরু করলো দেখছি—পোষাক ছাড়তে শুরু করেছিলেন

শিবানীশংকর, এক মুহূর্ত কী ভেবে নিয়ে আবার টাই আঁটলেন, কোট চাপালেন, রৈবতীকে ডেকে বললেন, "কিছুক্ষণের জন্য ঘুরে আসি, ও আপদগুলো না হলে বিদায় হবেনা।"

গাড়ির গর্জন শব্দে আতঙ্কে বাচ্চা দুটো কথা বলে কান্না থামালো, হেঁচ্‌কী টেনে টেনে কোঁপাতে লাগলো। কিন্তু, তাদের মা নির্বিকার একেবারে।

গেটের পাশে সিমেন্ট বাঁধানো উঁচু জায়গাটায় বসে, ফ্রেমে আঁটা ছবির মতো দ্বিতীয়ার চাঁদের দিকে একদৃষ্টে অচঞ্চল চোখ দুটি তুলে কি উপায় খুঁজছে কে জানে! আদেশ পেয়ে গাড়িটা একটু থামালো ড্রাইভার। শিবানীশংকর পাইপ থেকে এক ঝলক ধোঁয়া ছেড়ে, কঠিন নির্মম স্বরে বললেন, "এখানে বসে থেকে কোনো লাভ হবেনা তোমাদের, তোমার স্বামী অত্যন্ত বদলোক, কিছুতেই মেয়া চলতে পারেনা তাকে—" হুশ করে বেরিয়ে গেলো গাড়িটা। বাঁক নেবার মুখে এক পলক চোখ ফেরালেন শিবানীশংকর। একই ভাবে বসে আছে নিখিলের বউ, যেন একটা নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের মতো। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন।

টুটুর বাড়ির গেটে গাড়ি থামতে শিবানীশংকর নামলেন। ঢুকে গেলেন ভেতরে, ঘরের কাছে আসতে পারলেন, বরুণ নিচেই আছে—বসবার ঘরে। পর্দা ঠেলে ড্রইংরুমে ঢুকলেন। লম্বা সোফাটার মধ্যে বাইরের পোষাক শুদ্ধই একেবারে শ্রীহীন হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে বরুণ, ঘুমোচ্ছে, সশব্দে নাক ডাকছে। মুখটা হাঁ করে খোলা। ঘরের বাতাস তরল পানীয়ের উগ্রগন্ধে ভরপুর।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন স্যার শিবানীশংকর। ধৈর্য ধরে মিনিটখানেক চুপচাপ দেখলেন বরুণকে, কপালের এখানে ওখানে অনেকগুলি রেখা পড়লো। পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে বরুণের এ কী বিদঘুটে আচরণ!

উনি এটা আঁচ করছিলেন কিছুকাল যাবৎ। না হলে মানুষ কী অমন জন্তুর মতো খাটতে পারে নাকি। বুঝলেন, আজকে নিখিলের পিঠে অমন অমানুষিক বেত চালানোর প্রেরণা এই তরল উষ্ণ পানীয়টিই যুগিয়েছে। জোরে নিঃশ্বাস নিলেন শিবানীশংকর। বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে, সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন দোতলায়, সেখান থেকে তেতলায়, সেখানে গেলেন টুটুকে। ব্যাল্‌কনির রেলিং-এ ঠেস দিয়ে, দ্বিতীয়ার চাঁদের দিকে, বিশাল-বিমর্ষ দুটি চোখ মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে টুটু। গলার আওয়াজ করে নিজের উপস্থিতি বোঝালেন। মেয়ের নাম ধরে ডাকলেন। সাড়া মিললো না।

কিছুকাল স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে, নিঃশব্দ পায়ে নেমে এলেন নিচে। গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। গাড়ির সিটে পিঠ ছেড়ে দিয়ে বসে রইলেন স্থির ধরে। ভেতরটা কী একটা উত্তাপে, অসন্তোষে ভরে উঠ্‌ছে।

মিনিট তিনেক পরেই বুবুর বাড়ির গেটে গাড়ি থামলো।

লাল সুরকি ঢালা পথের সিকিপথ আসতেই, সেক্রেটারী ঘর থেকে মিলিত মেয়ে পুরুষের স্ফুট গুঞ্জন কানে এলো শিবানীশংকরের।

—ওরা নিচেই আছে তাহলে!

সেক্রেটারীর দিকে এগিয়ে চললেন। ঘরে ঢোকার মুহূর্তে পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরের মানুষ দুটিকে চোখে পড়লো। একটি মাইক্রোসকোপকে মধ্যবিন্দু করে দুটি মাথা এক হয়ে গেছে। কী যেন দেখছে।···একটি মাথা সুদর্শন কিন্তু অপরটি অচেনা।

—কোনো বিজ্ঞানের ছাত্রী নিশ্চয়ই।···মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সুলভ কোনো জটিল কিছু বোঝাচ্ছে নিশ্চয়ই···।

তবু শিবানীশংকরের মনের কোথাও অস্বস্তির ছোট্ট একটা কাঁটা বিঁধলো। পায়ে পায়ে পিঁড়িয়ে এলেন। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে তেতলায় উঠলেন। বুবুর শোবার ঘরে ঢুকলেন।

—আশ্চর্য! ঘরময়কে স্তম্ভিত করে বুবুও জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দ্বিতীয়ার চাঁদের দিকে চোখ টান করে চেয়ে আছে। চোখের তারায় অব্যক্ত বেদনা নিয়ে যেন একটি বিষাদের প্রতিমা। মেয়ের নাম ধরে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন, আর ডাকলেন না। কোনো সাড়াও দিলেন না। আগের মতোই ভারি পা দুটোকে টেনে টেনে নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন।

—সুখ কাকে বলে?···

—শিবানীশংকর কী কোনোদিন সুখের স্বাদ পেয়েছেন?···

—সুখ কী পণ্যদ্রব্য নয়?···

—অর্থ দিয়ে বিত্ত দিয়ে তাকে কী কেনা যায়না?···

—মানুষ জীবনের সুস্থ মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে কেন?

—কেন মানুষ ইচ্ছে করে জঞ্জাল জড়ো করছে তার জীবনে?

নিজের মনের সঙ্গে কী যেন একটা বোঝাপড়া করতে করতে টলোমলো পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছেন শিবানীশংকর। হঠাৎ যেন টাল্ খেয়ে সিঁড়ির রেলিং চেপে ধরলেন।

—কাদের দাঁড়িয়ে আছেন তিনি?···

সিঁড়ির ধাপে ধাপে তিনটি মুখ। পর পর তিনটি মুখ, দুটি মুখ একেবারে চেনা। আর একটি কে? কোথায় দেখেছেন তাকে? তিনজনের চোখের ভাষা একেবারে এক। অমিল নেই এক তিল। হুবহু এক। একই দুঃখ, একই নালিশ উপচে পড়ছে তিনজোড়া চোখ দিয়ে। একই আবেদন মুখর হয়ে অভিযোগ জানাচ্ছে···।

···হ্যাঁ। তৃতীয় মুখটি চিনেছেন এবার।

টুটু-বুবুর মুখের পাশে, ওঁর কারখানার পঁচাত্তর টাকা মাইনের শ্রমিক নিখিলের বউয়ের মুখ।··· পঁচাত্তর টাকার ভরসাও তো নিশ্চিহ্ন এখন। সেই সহায়-সম্বল-শূন্য, প্রাণধারণের গ্লানিতে জীর্ণ, পথের ভিখিরী নিখিলের স্ত্রীর চোখ, আর টুটু-বুবুর চোখ, যারা কোটিপতির কন্যে, লাখোপতির ঘরণী, একেবারে এক, আশ্চর্য রকম এক···।

অসহ্য গরম লাগছে আজ শিবানীশংকরের।

সব শুকনো, জিভ, তালু, কণ্ঠ, আবহাওয়া সব। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

—পৃথিবীর বাতাস কী ফুরিয়ে গেলো?

শক্তহাতে বুক চেপে ধরে দ্রুত নিচে নামতে লাগলেন শিবানীশংকর। ক্রমে ওঁর চোখের সামনে থেকে টুটু-বুবুর মুখ মুছে গিয়ে, শুধু নিখিলের বউয়ের মুখটাই বড় হতে হতে চোখের সমস্তটা জুড়ে দাঁড়ালো।

———

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীযীশু খৃষ্টের কথা—

একদিন প্রার্থনার নির্দিষ্ট সময়ে, ৯ টায় পিতর ও যোহন ধর্ম্মধামে যাচ্ছিলেন; এমন সময়ে লোকেরা একজনকে বহন করে আনছিল, সে মায়ের গর্ভ হতে খঞ্জ; তাকে প্রতিদিন ধর্ম্মধামের সুন্দর নামক দ্বারে রেখে দেওয়া হ'ত, যেন ধর্ম্মধামে যারা প্রবেশ করে তাদের কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে। সে পিতরকে ও যোহনকে ধর্ম্মধামে প্রবেশ করতে উদ্যত দেখে ভিক্ষা পাবার জন্য মিনতি করতে লাগল। তাতে পিতর যোহনের সঙ্গে তার প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে বললেন, আমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাতে সে তাঁদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললে যে, তাঁদের কাছ হতে সে কিছু পাবার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু পিতর বললেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যা আছে তা তোমাকে দান করি, নাসরতীয় যীশু খৃষ্টের নামে হেঁটে বেড়াও। পরে তিনি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে তাকে তুললেন; তাতে তৎক্ষণাৎ তার চরণ ও গুল্ফ সবল হ'ল আর সে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, ও বেড়াতে লাগল, এবং বেড়াতে বেড়াতে লম্ফ দিতে দিতে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে করতে তাঁদের সঙ্গে ধর্ম্মধামে প্রবেশ করল।

• • • • •

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ভক্তদের নিয়ে সাতদিন ধরে উৎসবে মত্ত। সে উৎসবে বইছে আনন্দের মন্দাকিনী। তার মাঝে কয়েক গজ ঘুরে নহবৎ ঘরে এক অন্ধকার কোণে সাতদিন ধরে একা বসে আছেন মা। অসংখ্য লোক ঠাকুরের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গ-সুখ উপভোগ করছে আর তিনি কয়েক গজ ঘুরে বসে আছেন, বুকে জমছে অদর্শনের তীব্রজ্বালা। একটি বারও দেখেননি সেই শ্রীমুখ। অবশেষে উঠে সামনে ছিটে বেড়ার কাছে এসে দাঁড়ালেন। বেড়ার গায়ে ফাঁক করে তার ভেতর দিয়ে দেখতে লাগলেন ঠাকুরকে। তাতেই তৃপ্ত হলেন মা। তাঁর জন্যে যেন ঠাকুরের এতটুকুও ব্যাঘাত কোথাও না হয়। আমি নয় তুমি।

• • • • •

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের কথা—

এক দরিদ্রের ঘরে একজন সর্ব্বজ্ঞ এসে দরিদ্রের দুঃখ দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এত দুঃখী কেন? তোমার পিতৃধন আছে, তোমাকে না বলে তোমার পিতা অন্যত্র দেশত্যাগ করেছেন। এই সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে দরিদ্র যেমন পিতৃধনের সন্ধান জানলো, ঐরূপ বেদ পুরাণ বাক্যে জীবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ উপদেশ প্রদত্ত হয়েছে। সর্ব্বজ্ঞের বাক্যে যেমন মূলধন অনুবদ্ধ, সর্ব্বশাস্ত্রে তেমনি শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ উপদেশ। পিতার ধন আছে এইমাত্র জেনে কেউ সেই ধন পায় না, সর্ব্বজ্ঞ ধন প্রাপ্তির উপায় বলেছেন—এই স্থানে ধন আছে, মাটি খুঁড়লেই পাবে কিন্তু সাবধান, দক্ষিণে খুঁড়লেই ভীষণরূপ যুক্ষী উঠবে, ধন পাবে না; পশ্চিমে খুঁড়লে সেখানে এক যক্ষ আছে সে বিঘ্ন করবে, ধন হাতে পাবে না; উত্তরে খুঁড়লে সেখানে এক কৃষ্ণ অজগর সর্প আছে সে গিলে ফেলবে, ধন পাবেনা; পূর্ব্ব দিকের মাটি অল্প খুঁড়লেই তুমি ধনের জ্বালা পাবে।

———

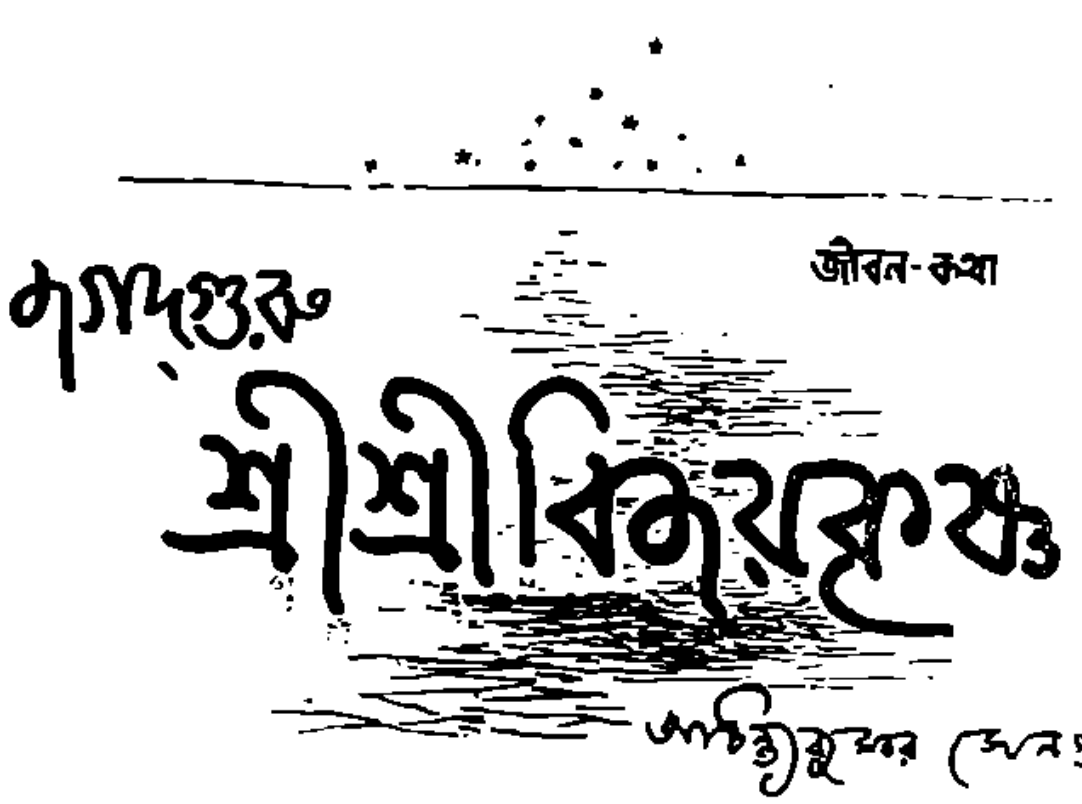

১৩

খুব ভোরে স্নান-পূজা সেরে আশ্রাবতী আশ্রমের সাধুদের প্রণাম করল। প্রণাম করল যোগীবরকে। বললে, 'প্রভু, আগে আমি সাধুদের পদধূলির মাহাত্ম্য কিছু বুঝতাম না। এখন দেখছি আমার মত পাপীর পক্ষে এ মহৌষধ। সময় সময় মন ভীষণ অবসন্ন হয়ে পড়ে, ভগবানের নামস্মরণেও উৎসাহ থাকে না। প্রাণের মধ্যে ঘোর জড়তা, হাসিও নেই কান্নাও নেই, গভীর অন্তর্দাহ—সে এক শোচনীয় অবস্থা। এই অবস্থায় মাঝে মাঝে আত্মহত্যা করতে প্রবৃত্তি হয়, শুধু পাপভয়ে নিবৃত্ত থাকি। ভাবি, এই অন্তর্জ্বালার বুঝি কিছুতেই নিবারণ নেই। কিন্তু যখনই আপনার বা বাবাজীর চরণধূলি নিয়েছি, তখনই সকল জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়েছে। প্রাণে জেগেছে গভীর প্রশান্তি, অবাক্ আনন্দোচ্ছ্বাস। প্রভু, আর কাকে পায়ের ধুলো নিলে কি অমনি শান্তি হবে?'

যোগীবর বললে, 'মা, তুমি যে ভক্তিপদরজের মাহাত্ম্য অনুভব করছ তার মানেই তোমার যোগ-শিক্ষার সময় সন্নিহিত। যতদিন অহঙ্কার প্রবল থাকে ততদিন সাধুদের পদধূলির প্রতি ভক্তি হয় না। সাধু কে? যিনি নিকটবর্তী হলে হৃদয়ে স্বর্গভাব প্রস্ফুটিত হয়, নিজের থেকেই জিভে হরিনাম আসে, পাপমতিগুলি লজ্জিত হয়ে মুখ লুকোয়, তিনিই সাধু। তাঁর পদধূলি নিলেই উপকার। শুধু সাধুর পায়ের ধুলো বলে নয়, মানুষ মাত্রেরই পায়ের ধুলোর অনেক বল। প্রত্যেক মানুষেই দীননাথ দীনবন্ধু বিরাজ করছেন। সুতরাং প্রত্যেক নরনারীই এক একটি দেবমন্দির। যার অন্তরে দেবভক্তি আছে, সে দেবমন্দির দেখলেই দণ্ডবৎ প্রণাম করে। একবার প্রণাম করলে আর সে লোভ ছাড়তে পারে না।

আশাবতী, এই প্রণামের মাহাত্ম্য না বোঝা পর্যন্ত শুরুলাভ হয় না। সুতরাং তার ধর্মজীবনের সূচনাও হয় না।'

গয়া-কল্পর পরপারে রামগয়া। দীক্ষার কিছু পরে একদিন রামগয়ায় চলে এল বিজয়।

এ কী! এ জায়গায় কি আমি আগে একবার এসেছিলাম?

'চলো আমরা রামগয়ায় যাই।' আশাবতীকে বললে যোগীশ্বর। 'কিন্তু পার হয়ে ঐ যে পাহাড় দেখছ ওর নাম রামগয়া। রামগয়া নাম, যেহেতু ঐখানে রাম পিতৃশ্রাদ্ধ করেছিল। পাহাড়ের একটা গোফাতে এক সাধু থাকত, কেবল দুধ খেয়ে তপস্যা করত বলে নাম দুধারি বাবা। ঐ দেখ ওপারে শ্মশান। পাহাড়ের নিচে ঐ গুহায় সীতা দশরথের হাতে পিণ্ড দিচ্ছে। মাটির তলা থেকে হাত বেরিয়ে এসেছে দেখবে। আগে নৃসিংহ মন্দিরে যাই চলো।'

আশাবতী বিহ্বল চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'প্রভু, এ কি, আমার প্রাণ এমন করছে কেন? আমি যেন এখানে ছিলাম।' একজন সন্ন্যাসীকে দেখে আরো অস্থির হয়ে উঠল: 'ওঁর মত আরো তিনটি সাধু ছিল এখানে।'

সন্ন্যাসী চমকে উঠল: 'কী বললে? তুমি এখানে ছিলে? কই তোমাকে তো দেখিনি কখনো।'

'আর সেই তিনজন সাধু?'

'তারা তো এইখানে ছিল।'

'ছিল?' আশাবতী ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল সন্ন্যাসীকে। বললে, 'আপনাকে আমি এখানে অনেকবার দর্শন করেছি। চরণসেবা করে কৃতার্থ হয়েছি। ঐ বৃক্ষতলে আমার আসন ছিল। ঐ বৃক্ষের উত্তরের শাখায় আমার একটি চিহ্ন আছে।'

'চলো দেখি তো আছে কিনা।'

সকলে চিহ্ন দেখে অবাক।

'কিন্তু তুমি স্ত্রীলোক, তুমি এ আশ্রমে থাকবে কী করে?' বললে সন্ন্যাসী, 'এ আশ্রমে স্ত্রীলোক থাকবার নিয়ম নেই। মনে হচ্ছে তোমার ভুল হচ্ছে। কোনো সময়ে তুমি স্বপ্ন দেখে থাকবে হয়তো। আজ তা সত্যরূপে প্রত্যক্ষ করলে।'

যোগীশ্বরও তাই বললে। 'আমারও তাই ধারণা। স্বপ্নদর্শনই সত্য হল।'

গুরুকৃপা লাভের পর একটানা এগারো দিন একমনে সমাহিত হয়ে বসে ছিল বিজয়। তার আগে কয়েকদিন কেটেছে প্রবল বৈহ্বল্যে। কখনো অট্ট-অট্ট হেসেছে, হুঙ্কার-গর্জন করেছে, কখনো বা কেঁদেছে নিষ্করুণ আর্তিতে। কখনো বা নামসুধারসে মগ্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু এ কী অবস্থা। বাহ্য জ্ঞানের লেশমাত্র নেই। আগে আগে ছুঁয়ে যেসপাতা তিজিয়ে মুখে কোনরকমে ঢুকিয়ে দিয়েছে যুযুরা, এখন স্নান নেই আহার নেই, শয়ন নেই, নিদ্রা নেই, নেই এতটুকু আসনবিচ্যুতি।

সমাধি ভঙ্গের পর বাহ্যজ্ঞান এলে কে একজন জিগগেস করলে, 'কোথায় ছিলেন?'

'কী জানি কোথায়! সাধন করতে বসেছি, দেখলাম মা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী এসেছেন।' বললে বিজয়, 'বলছেন, মায়ার অপর পারে যেতে হলে পরীক্ষা দিতে হবে।' আমি বললাম, আমি পরীক্ষার উপযুক্ত নই, আমায় ক্ষমা করো। না, না, পরীক্ষা। মা শুধু পরীক্ষার কথাই বলতে

লাগলেন। আমি শুধু কাতর প্রাণে কাঁদতে লাগলাম। মা প্রসন্ন হয়ে আমাকে কোলে করে আকাশপথে চলতে লাগলেন। চলতে-চলতে এক স্বর্ণোজ্জ্বল দিব্যলোকে এসে উপস্থিত হলাম। সেই বুঝি মায়ার পার।'

'বরাবর' পাহাড়ে একজন মহাপুরুষ অবস্থান করছেন—বিজয়ের কাছে খবর এল। ব্রহ্মচারী বন্ধুকে বললে, 'চলো গিয়ে দেখে আসি।'

পাহাড়ে মন্দির আছে, কিন্তু দুয়ারে যে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ কি মহাপুরুষ? সর্বাঙ্গে কালি মাখা, মুখমণ্ডলে সিঁদুর, কে ঐ ভয়ঙ্কর?

'আমি ভৈরব।' বললে সেই ভীমমূর্তি: 'আমি এ মন্দিরের প্রহরী। খবরদার, এগিয়ো না, মারা পড়বে।'

ভৈরব অট্টহাস্য করে উঠল। সে হাসিতে পাহাড় কেঁপে উঠল। কিন্তু বিজয়ের ভয়-ডর নেই। যখন এসেছি তখন শেষ পর্যন্ত দেখে যাব।

বিজয় আর ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়তে লাগল ভৈরব।

তাতেও ওদের ভয় নেই। ওরা ভৈরবের স্তব শুরু করল। হে ভৈরব, ভূতনাথ, হে করাল, কালশমন, শিবলোচন, শূলপাণি, প্রসন্ন হও!

তবে শান্ত হল ভৈরব। ওরা এগিয়ে এসে ভৈরবের পদতলে লুটিয়ে পড়ল। বললে, দয়া করুন, আমাদের মহাপুরুষ দর্শন করান।

'দর্শন হবে খন। আগে তোরা সুস্থ হ।' ভৈরব স্নিগ্ধ হল: 'তোদের ক্ষুধার্ত বলে মনে হচ্ছে। কিছু প্রসাদ খাবি?'

'আপনি যা করুণা করে দেবেন তাই প্রসাদ বলে মেনে নেব।' বললে বিজয়।

ভৈরব প্রসাদ এনে দিল। ধরল তাদের সামনে। বিজয় আর ব্রহ্মচারী দুজনেই শিউরে উঠল। এ যে দেখি নরমাংস।

বিনয় করে বিজয় বললে, 'আমরা যে আমিষ খাইনা।'

হা-হা-হা করে হেসে উঠল ভৈরব: 'তবে অঘোরীদের আশ্রমে এসেছিস কেন?'

'আমাদের আর পরীক্ষা করবেন না।' বিজয় অবনত হয়ে বললে, 'আমরা তোমার সন্তান, তোমার মত শক্তি আমাদের কী করে হবে? আমাদের মহাপুরুষ দর্শনে নিয়ে চলুন।'

'মহাপুরুষ না দেখলে তোদের চলছে না? তবে আয় আমার সঙ্গে।'

সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্ম দিয়ে ভৈরব ওদের এক গুহার মধ্যে নিয়ে এল। সেখানে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে চার কোণে চারজন সাধু নির্বিচল সমাধিতে বসে আছে। কী ধৈর্য, কী প্রশান্তি!

সন্ধ্যাসনে সাধুদের সমাধিভঙ্গ হল। স্নানাদি সেরে বসল আসনে।

ভৈরব বললে, 'এরা দুজন আপনাদের দর্শন করতে এসেছে।'

সেটা যেন বড় কথা নয়, যিনি মহাপুরুষ, সকলের চেয়ে প্রবীণ, জিগগেস করলেন, 'এঁদের সেবা হয়েছে?'

'মহাপ্রসাদ দিয়েছিলাম, নরমাংস বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।' বললে ভৈরব, 'কিঞ্চিৎ ফল মূল খেয়েছেন।'

'এ কী অন্যায়! এঁদের তুমি নরমাংস দিতে গেলে কেন?' মহাপুরুষ রুষ্ট হলেন: 'তোমার অঘোর পথে এ চলে বলে ভিন্ন মার্গীদের তা দিতে হবে? এ তো অতিথিকে অপমান করা।

ভৈরবের তবু কিছুমাত্র নরম হলনা।

বিজয় জিগগেস করলে, 'নরমাংসোহার কি ধর্মের অঙ্গ?'

'না, না, তা ধর্মের অঙ্গ হতে যাবে কেন? রুচিভেদে নানা পথ, নানা মত। যে যে-পথে যেতে চায় সে সেই পথের আচার ব্যবহার অবলম্বন করে, সেই পথের খাদ্য-পানীয়।' বললেন মহাপুরুষ, 'কোনো পথের খাদ্য শুধু ফল-দুধ, কোনো পথের বা অন্নব্যঞ্জন, আবার কোনো পথের বা মদ্য-মাংস। পথ দিয়ে কী হবে, মত দিয়ে কী হবে, আসল হচ্ছে গন্তব্যে পৌছুনো। গন্তব্যে পৌছুলে আর কোনো ভেদ নেই, ব্যবধান নেই। দেখ না আমরা এই চার সাধু,' অন্যান্য সাধুদের লক্ষ্য করলেন মহাপুরুষ: 'আমাদের মধ্যে একজন রামাৎ, একজন কাপালী, একজন নানকী, আর আমি অঘোরপন্থী। আমাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র পথ, কারু সঙ্গে কারু মিল ছিল না। মিল ছিল না কী, ঘোরতর বিরোধ ছিল। কিন্তু আজ আমরা চারজনই ভিন্ন পথ ধরে একই গন্তব্যে একই সত্যগৃহে এসে পৌচেছি। আর আমাদের ভেদ-বিবাদ নেই, আজ আমাদের ঐকতান। আমরা সবাই আজ একবস্তু দেখছি, একবস্তু শুনছি—আজ আমাদের এক আস্বাদন। আজ আর ফলমূলে আর নরমাংসে কোনো তফাৎ নেই। নেই কোনো ভেদবুদ্ধির ক্লেশ।' মহাপুরুষ হাসলেন: 'যতক্ষণ লক্ষ্যে না পৌছুনো যায় ততক্ষণই দলাদলি, সম্প্রদায়, ততক্ষণই আমি-তুমি-ওরা-আমরা।'

কথা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে গেল। আসল হচ্ছে লক্ষ্যে পৌছুনো। আসল হচ্ছে স্থির হওয়া। স্থিতিই পরম গতি। শূন্যতাই পরম পূর্ণতা।

'শাস্ত্রে ভগবানলাভের ব্যবস্থা ও সাধনা-প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কেন?' একজন জিগগেস করল গোসাইজিকে।

গোস্বামী-প্রভু বললেন, 'শিশুর আহার এক প্রকার, বালকের একপ্রকার, যুবকের এক প্রকার, বৃদ্ধের একপ্রকার, আবার রোগীর একপ্রকার। প্রত্যেকে আপন আপন আহারে পুষ্টি লাভ করে। একজনের আহার অন্যজনকে দিলে জীবন নষ্ট হয়। সকলের এক নিয়মে হয় না। শরীরের প্রকৃতি, মানসিক প্রকৃতি আলাদা, সুতরাং বিধি-নিয়মও আলাদা।'

যে মহাপুরুষ দর্শন করে এলাম তাঁর নাম কী? তাঁর নাম গম্ভীরনাথ বাবাজী।

চলো গম্ভীরনাথকে দেখবে চলো।

কুলদানন্দকে নিয়ে গোস্বামীপ্রভু গেলেন দর্শনে। গায়ে যেমন শীত লাগে তেমনি মহাপুরুষের প্রভাব কুলদার গায়ে লাগল। ভিতরের নাম চেষ্টার অপেক্ষা না করে ছুটে বেরুতে লাগল কোয়ারার মত।

বাবাজীকে গোসাইজি প্রণাম করলেন সাষ্টাঙ্গে।

শতছিন্ন একখানি মলিন কাপড়ের টুকরো বিছিয়ে দিলেন বাবাজী। তাতে বসলেন গোস্বামী প্রভু। স্থির হয়ে তাকিয়ে রইলেন বাবাজীর দিকে। বাবাজীও রইলেন মৌনে।

কী তপোদীপ্ত শরীর। দীর্ঘ ঋজু শিখায়িত। প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাক, চোখ উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। অবিশ্রান্ত অনলবর্ষণ হচ্ছে চোখ থেকে। কোমরে শুধু একখানি কালো রঙের কম্বল জড়ানো।

শরীর একেবারে স্থির, নিষ্ক্রিয় কাঁটার মত নিষ্পন্দ। ছেঁড়া একখানা চাটাই, ধুলো-বালি আর ঘুঁটির ভস্মে মলিন, তার উপর বসে আছেন পরিতৃপ্তের মত।

বললেন, 'ওঁদের চা খাওয়াও।'

সেতা বাবার আখরোট প্রভৃতি কাবুলি মেওয়া দিয়ে চা তৈরি হল। বাবাজী নিজে পরিবেশন করলেন।

খেতে যেমন সুস্বাদু গুণেও তেমনি উত্তেজক। খাওয়া মাত্র শরীর আগুন হয়ে উঠল।

'ইনি কে?' ফিরতি পথে জিগগেস করল কুলদা।

'ইনি নাথ যোগীদের মহান্ত। ঐশ্বর্য পথে অতি কঠোর সাধন করে সিদ্ধ হন, পরে মহাসিদ্ধ অবস্থা লাভ করেন।' বললেন গোস্বামী প্রভু, 'হিমালয়ের নিচে এমন শক্তিশালী সাধু আর নেই। পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করতে পারেন। কিন্তু এখন ইনি মাধুর্যে একেবারে ডুবে গেছেন। জানো তো এঁর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। 'বরাবর' পাহাড়ে যে চারজন মহাপুরুষ দর্শন করেছিলাম তাদের মধ্যে ইনি একজন। গোরখপন্থী—কানফাটা যোগী, এদের মধ্যে অঘোরীও আছেন। এদের সাধন ভীষণ কঠিন।'

কুলদা বলছে, 'প্রয়াগে কুম্ভমেলায় এসে এ পর্যন্ত যত সাধু মহাপুরুষ দর্শন করলাম সন্তীয়ানাথের মত কাউকে লাগল না।'

ঐশ্বর্য নিয়ে কতক্ষণ থাকবে? শেষ পর্যন্ত আসতেই হবে মাধুর্যে।

শঙ্করাচার্যের কী হয়েছিল?

বলছেন গোস্বামী-প্রভু, 'শঙ্করাচার্য প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে তাই প্রচার করেছিলেন। পরে হালে পানি না পেয়ে দ্বৈতভাব আশ্রয় করলেন। আর, দ্বৈতভাব আশ্রয় করেই তাঁর প্রাণ সরল হল। আমাকেই কেন দেখ না। কালাপাহাড় তো হয়েছিলাম। কেবল গর্জন করতাম, ভাঙ, ভাঙ রে, ভেঙে ফেল। ঠাকুরদেবতা কিছু নয়, অবতার কিছু নয়, তীর্থ-টীর্থ কিছু নয়। এখন দেখ কী অবস্থায় এসে পড়েছি। শুষ্ক মতের উপর মানুষ কতদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?'

আকাশগঙ্গা আশ্রমে ফিরে এল বিজয়। গুরুদত্ত মন্ত্র নিয়ে জপ করতে বসল। আসন থেকে বিচ্যুতি নেই, শুরু করল কঠিনতর তপস্যা।

হঠাৎ একদিন গুরুদেব পরমহংসজী এসে উপস্থিত হলেন।

বললেন, 'তোমাকে সন্ন্যাস নিতে হবে।'

'সন্ন্যাস?'

'হ্যাঁ, কাশীতে চলে যাও। সেখানে হরিহরানন্দ সরস্বতী নামে এক প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী আছে, তিনি তোমাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেবেন।'

গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য। বিজয় তক্ষুনি কাশীর দিকে পা বাড়াল।

'শোনো।' পরমহংসজী আরো বললেন, 'তাঁর কাছে তোমার পূর্বের সমস্ত কার্যকলাপ বিবৃত কোরো। তোমার শ্রাদ্ধ হওয়া, পৈতে বর্জন করা, সর্ব বর্ণের অন্ন খাওয়া—সব জানিও খোলাখুলি।'

কাশীতে এসে হরিহরানন্দের শরণ নিল বিজয়। আনুপূর্বিক বললে সব বৃত্তান্ত।

সরস্বতী বললেন, 'তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।'

'প্রায়শ্চিত্ত ?'

'যদিও তুমি অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা লাভ করেছ, তোমার দেহ-মন গঙ্গাজলের মত পবিত্র ও নির্মল, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তোমার প্রায়শ্চিত্তের কোনো প্রয়োজন নেই, তবুও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করা যাবে না। তুমি নিজে যদি শাস্ত্রের মর্যাদা না রাখো, তা হলে অপরে রাখবে কেন ? সুতরাং লোকশিক্ষার জন্যেই তোমাকে করতে হবে প্রায়শ্চিত্ত, আবার নিতে হবে পৈতে। যদি সানন্দে সম্মত হও তা হলেই দেব তোমাকে সন্ন্যাস, নচেৎ নয়।'

সানন্দে সম্মত হল বিজয়।

যাদবাচার্য গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করালেন স্বামীজি। পরে উপবীত সংস্কারে সংস্কৃত করলেন। তিন দিন-পরে যথাশাস্ত্র বিরজাহোমে শিখাসূত্রের আহুতি দান হল। অর্পণ করলেন সন্ন্যাসাশ্রম। নতুন নামকরণ হল—স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

শ্রীকৃষ্ণ কী করলেন ? সনাতন পুরুষোত্তম হয়েও সন্দিপনী মুনির শিষ্যত্ব স্বীকার করলেন। আর শ্রীগৌরাঙ্গ ? পূর্ণ ভগবান হয়েও ঈশ্বর পুরীর কাছে মন্ত্রদীক্ষা আর কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করলেন।

লোকশিক্ষার জন্যেই আবার এই আচরণ করতে হল। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।'

'ধরিয়া যোগীর বেশ যায় দূর দেশে।
যথা সেথা পাও প্রাণনাথের উদ্দেশে॥
ইহা বলি কান্দে প্রভু ধরণী পড়িয়া।
নিজ অঙ্গ উপবীত ফেলিল ছিঁড়িয়া॥'

আকাশগঙ্গায় ফিরে এল বিজয়। ইষ্ট সাধনায় মন দিল।

কিন্তু রঘুবরের বুঝি অভিমান জাগল। বললে, 'এক জঙ্গলে দুই বাঘ থাকতে পারে না। এখানেও এই এক বাঘই আছে। তোমার যা কিছু হল জানবে আমার জন্যেই হয়েছে। তোমার জন্যে আমিই এখানে যমুনা নিয়ে এসেছি, আর কেউ নয়।'

এ কী দুর্জয় অভিমান !

'রঘুবর বাবাজী তো খুব বিনীত সাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিসে হল ?' জিগগেস করল কুলদা।

গোস্বামী প্রভু বললেন, 'অভিমান তো এক রকম নয়। নানারকম। অনেক টাকার অভিমান হয়, অনেক বিদ্যাতেও অভিমান হয়। এসব অভিমান নষ্ট করা যায় সহজেই। কিন্তু আরেক রকম অভিমান আছে যা ঠিক উলটো, মানে না-থাকার অভিমান, আর এই অভিমান এড়ানোই খুব শক্ত।'

'কী রকম ?'

'নির্ধন মনে করে ধনী তাকে ঘৃণা করছে, সুতরাং তার ধনীর উপরে অভিমান। মূর্খ মনে করে বিদ্বান তাকে অগ্রাহ্য করছে, তার বিদ্বানের উপর অভিমান। সংসারাসক্ত কামী ব্যক্তিও ধার্মিক উদাসীন সন্ন্যাসীর উপর অভিমান করে, কেন তার নিজের ধর্মে মতি হল না।'

'সদ্‌গুরুর কাছে যারা সাধন করে তাদেরও কি ভগবান দয়া করবেন না ?'

'করবেন যদি নিজেকে সে দীনহীন কাঙাল বলে বুঝতে পারে। একমাত্র কাঙালকেই দীননাথ দয়া করে থাকেন। অভিমানী কখনো দয়ার পাত্র নয়।'

'কিন্তু রঘুবর বাবাজীর তো অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল, অদ্ভুত বিভূতি—'

'ছিল। স্বচক্ষে দেখেছি বাবাজী আটার টিকর তৈরি করে রাখতেন, রাত্রে বাঘ এসে তাতে করে তাই খাওয়াতেন। গোখরো সাপ বাবাজীর চারদিকে খেলা করছে আর বাবাজী নিশ্চল হয়ে নামজপ করছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে পাখিদের বলছেন, আরে তু ভি রামজীকা জীব হো, মৈঁ ভি উনহিকা দাস ; ইঁহা আয়কে মেরা কান সাফা কর্ দে। পাখিরা উড়ে এসে বাবাজীর ঘাড়ে বসত আর কান খুঁচে দিত। দুতিনশো লোক এসেছে আশ্রমে, বাবাজী আসন হতে না উঠে তাদের লুচি মণ্ডা দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাব, মহাবীরের কাছে ধরা দিয়ে পড়লেন বাবাজী। মহাবীর বললে, লাঠি দিয়ে পাথরে আঘাত কর, ঝরনা বেরিয়ে পড়বে। বাবাজী লাঠি নিয়ে সেই পাথরে ঠুকলেন অমনি প্রকাণ্ড এক পাথরের চাঙড় বিরাট শব্দে ভেঙে পড়ল আর সেই ফাঁক দিয়ে কলকল করে জল ছুটল। ঐ ঝরনার নামই যমুনা রেখেছিলেন।'

'কিন্তু বাবাজীর পতন হল কেন?'

'বললাম তো, অভিমানে। আরো এক কারণে—দয়ার।'

'দয়ার? দয়ার আবার পতন হয় নাকি?'

'কখনো কখনো দয়া যে আগে সেই অভিমান থেকেই। সে কথা বলবখন আরেক দিন।'

সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে সাধন করবে মনে মনে এমনি সঙ্কল্প করল বিজয়।

পরমহংসজী আবার এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, 'না, সংসার ত্যাগের দরকার নেই। যেমনটি ছিলে তেমনটি থাকো। স্ত্রীপুত্র পরিবারের সঙ্গে একত্র থেকে সাধন করো। সংসার তোমার কোনো বিঘ্ন ঘটাবেনা।'

'আর ব্রাহ্মসমাজ?'

'ব্রাহ্মসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ো না। এখনো তা ত্যাগ করবার সময় হয়নি।' বললেন পরমহংসজী। 'যখন সময় হবে তখন তা সাপের খোলসের মত আপনিই খসে পড়বে।'

'সন্ন্যাস নিয়েও সংসার?'

'হাঁ, তোমাকে দিয়ে ভগবান নতুন ধর্ম স্থাপন করবেন।'

'আমাকে দিয়ে?

'হাঁ', বললেন পরমহংসজী, 'তুমিই ভগবানের নির্বাচিত।'

(ক্রমশঃ)

শিখর ছুঁয়ে ছুঁয়ে

চিত্তরঞ্জন মাইতি

আজ তোমায় শিখর ছুঁয়ে আসার কথা না? এমনি একটা কথা ছিল বটে। ছিল না, আছে। আর তোমাকে আজই তুষারে স্নান করিয়ে আনবো।

তিনটি টিকিট আমার চোখের ওপর তুলে ধরল সাকিনা।

বললাম, আর যাই করাও তুষারে স্নান করিয়ে আমায় প্রাণটা ছাড়ো। নইলে নিমোনিয়া আমাকে আর কাশ্মীর ছাড়তে দেবে না।

আরে সাহেব, তাই তো তোমাকে আকাশগাটের বরফ জলে ডুবিয়ে আনতে চাই। এত তাড়াহুড়ো করে কাশ্মীর ছাড়তে চাইলেই কি কাশ্মীর তোমাকে ছেড়ে দেবে।

বললাম, তিনখানা টিকিট করেছ, তিনটি প্রাণী কে জানতে পারি কি?

আমার কে, যে তিনজনের ঘুরে বেড়ানোই কাজ। তুমি আমি আর অয়নাল।

তুমি যাবে পাহাড়ে!

তার মানে, তোমার ধারণাটা কি খুলে বল তো? আমি কি ঘোড়া থেকে পিছলে পড়ার মেয়ে বলে তোমার মনে হয়?

তা নয়, তবে সেকেন্দর সাহেব তোমার পাহাড়ে যাওয়ায় কোন রকম আপত্তি তুলবেন না?

সাকিনা মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, কাশ্মীর ভ্রাম্যমানদের নিয়ে মেয়েদের ঘুরে বেড়ানোর কোন রেয়াজ নেই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমিই বোধহয় ব্যতিক্রম।

বললাম, তা তো দেখতেই পাচ্ছি।

সেকেন্দর সাহেবের ওপর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সাকিনা।

বাবা বলেন, ভাল থাকাটা নিজে নিজে। দামী জিনিষ যত গোপন করে রাখা যায়, তার চুরি হবার সম্ভাবনা তত বেশী। অন্দরেই মানুষ সিঁধ কাটে, বাইরে নয়।

বললাম, সেকেন্দর সাহেব, সত্যিই একজন সাচ্চা মানুষ।

সাকিনার মুখে হাসি, বলল, তার মেয়েকে দেখে কি মনে হয়?

হেসে বললাম, বিচ্ছু।

এবার সাকিনা চঞ্চল হয়ে উঠল।

আর দেরী নয়, খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও, আমি এই আসছি বলে।

সাকিনা চলে গেল দাদাও ঘোটে ওদের আস্তানায়।

ফিরে এলে দেখি, সাজ বদলে এসেছে সাকিনা। গা ছুঁড়ে গরম পোষাক। আমিও তৈরী। সেকেন্দর সাহেব এলেন। বললেন, যখন শুলমার্গে উঠবেন তখন ঘোড়ার রাশ যেঁষে গদিগুলো সোওয়ারীদের নিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। সাবধান, ডাইনে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ওদের চালিয়ে নিয়ে যাবেন, নইলে আনাড়ীদের পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

ঝিলম পার হয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা দিলাম।

সাকিনা বলল, এমন একটা পনি তোমার অঙ্গে বাতলে দেব, যে একেবারে খাদের কিনার ঘেঁষে চলবে, অথচ সোয়ারীকে ফেলবে না।

বললাম, তোমার মত ভয় দেখানোর খেলা খেলবে, অথচ ভয়ের কোন ঘটনাই ঘটবে না।

সাকিনা কিছু বলার আগেই দেখলাম টুরিস্ট অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে জয়নাল প্রবলভাবে হাত নাড়ছে। প্রায় দৌড়ে চললাম। বাস স্টার্ট দিয়েছে। আমরা হাঁফাতে হাঁফাতে নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসে পড়লাম। বাস ছেড়ে দিল।

কিছু পথ চলে আসার পর শুরু হল অবাক করা এক এ্যাভিনিউ। যেন আমরা স্বপ্নরাজ্য অলকাপুরীর যাত্রী। সে পথে প্রথম অভিনন্দন জানাবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি দেব-সৈন্য। পথের দুদিকে উন্নত পপলার গাছের সারি। যতদূর গাড়ি চলল, যেন এর শেষ নেই। পপলার গাছের কাণ্ডে সাদা আর সাংঘাতিক সোনার রঙ। তারপর পত্রসজ্জা। এই পত্র রক্ত বরণের। শেষ সূর্যের সোনায় আজও প্রদীপ্ত মনে হয় এদের সমুন্নত কান্তি।

পপলার বীথির ভেতর দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। গাছের সোতা দেখতে দেখতে হঠাৎ সামনের দিকে দৃষ্টি পড়ল। অমনি মূক হয়ে গেলাম। একটি অর্ধবৃত্ত এঁকে দুধার ধবল পর্বত শৃঙ্গ আমাদের চোখের সামনে জেগে আছে। কতক্ষণ কথা বলতে পারলাম না। কুবেরের অলকাপুরী যেন মহলের পর মহল তুলে আমাদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বারটি মাস বিরহ যন্ত্রণা ভোগের পর মেঘদূতের যক্ষ অলকাপুরীতে ফিরে যাবার পথে কি ধরণের অধীর আকুলতা অনুভব করেছিল, তা আমাদের জানা নেই; তবে ঐ শুভ্র স্বপ্নলোকে প্রবেশের জন্য আমার মন বিরহী যক্ষের অনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হল।

বাস ছুটে চলেছে সমুখের পথে, আর ঐ স্বপ্নলোক একটু একটু করে সরে সরে আসছে আমাদের দিকে। কতক্ষণ এমনি চলার পর আমরা বাসের শেষ যাত্রাপথ টাঙমার্গে এসে পৌঁছলাম।

এরপর পর্বতারোহণ পর্ব। বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই একদল পাহাড়ী ঘিরে ধরল আমাদের। তারা সবাই আমাদের ওপরের পাহাড়ে নিয়ে যেতে চায়। এমনভাবে তারা ব্যূহ রচনা করেছে, যেখান থেকে নিজের জায়গায় বেরিয়ে আসা প্রায় অসম্ভব। সপ্তরথীর ব্যূহ থেকে মহাভারতের অভিমন্যু বেরোতে পারেনি, কিন্তু আমি বেরিয়ে আসতে পারলাম। আর আমাকে অবলীলায় বের করে আনল সাকিনা।

ইতিমধ্যে পূর্ব পরিচিত এক সহিসের সঙ্গে কথাবার্তা স্থির করে সাকিনা দুটি পনি প্রস্তুত করে এনেছে। এরপর একমাত্র কাজ আরোহণপর্ব। জয়নাল পায়ে হেঁটে গুলমার্গ অবধি যাবে, সেখানে সে অপেক্ষা করবে; আর আমরা গুলমার্গ ছাড়িয়ে ঘোড়া নিয়ে উঠে যাব বিলাস মার্গে ফেরার পথে সবাই একসঙ্গে নেমে আসব।

সারি দিয়ে ঘোড়াগুলো চড়াই-এর পথে উঠছে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে দুড়ি আর কাঁকর ছড়ানো পথ। একদিকে খাদ শুরু হয়ে গেল। যত ওপরে উঠছি, বাঁয়ে খাদ তত গভীর হচ্ছে। পাহাড় ঘুরে ঘুরে পথ উঠে গেছে ওপরে।

সাকিনা পেছন থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে পাশাপাশি এসে গেল। বলল, চলার পথে কেবল ঘোড়াই যদি সামলাও তাহলে দেখবে কি।

বললাম, প্রাণটা যদি বাঁচে তাহলে দেখার সাধও মেটে।

দু'দণ্ড ঘোড়া থামিয়ে দেখার কিংবা গল্প করার সুযোগ এখানে নেই। পেছনে সৈন্য লেগেই আছে। তাছাড়া অপরিসর পথে পেছনের ঘোড়ার চলা বন্ধ করা বে-আইনি। অতএব কি করা যায়। বুদ্ধি জোগাল সাকিনা।

ঘোড়া নিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে যাও। এক এক করে সব কটি ঘোড়া আমাদের পেরিয়ে চলে যাক, তারপর খুশিমত চলা যাবে।

তাই করলাম। বীরদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন। একটু করুণা, একটু বা তাচ্ছিল্যের হাসি আমাদের জন্যে রেখে গেলেন কেউ কেউ।

সবাই যখন চলে গেল, তখন পাশাপাশি চললাম আমরা দুজন।

এতক্ষণ সাকিনার দিকে তেমন করে তাকাতে পারিনি, এবার সম্পূর্ণ করে দেখলাম।

একটি আশ্চর্য অগ্নি দীপ্ত তরুণী, সমস্ত অবয়বে কেমন এক রহস্যময়তা; স্থির ধনু তনীতে সাদা একটি ঘোড়ার ওপর বসে রয়েছে।

হঠাৎ ও আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল নীচের খাদের দিকে। একটি পাহাড়ী নদী বয়ে চলে গেছে। বড় ছোট মসৃণ শিলাখণ্ড এদিকে ওদিকে ছড়ানো। সবকটি শিলাই সাদা, কোনটিতে অল্প নীলের আভা। এত চওড়া নদী, কিন্তু একবিন্দু জল নেই। যেন কার অভিশাপে হৃদয়ের সব সুধা শুষ্ক হয়ে গেছে।

সাকিনা কতক্ষণ ঘোড়া থামিয়ে ওদিকে তাকিয়ে রইল। আবার কখন আমরা চলতে শুরু করে দিয়েছি। এবার পাল্লা দিয়ে কিছু পথ ঘোড়া চালান গেল। কখনো সাকিনা আগে, কখনো আমি। আবার দুজনে পাশাপাশি। শ্রমে শ্রান্তি নেই; কথায় নেই ক্লান্তি।

ঝির ঝির করে একটা উপভোগ্য ঠাণ্ডা হাওয়া হঠাৎ গায়ে এসে লাগলো। থমকে গেলাম। বাঁয়ে তাকিয়ে দেখি, কখন গাছের সবুজ রঙ ঘন মসৃণ হয়ে গেছে। পাইন আর দেওদার ছবির মত তোরণ তৈরী করে দাঁড়িয়ে আছে। তার ফাঁকে অদৃষ্টপূর্ব এক আভা চোখে এসে লাগলো। কত পার্বত্য ভূমিতেই তো ঘুরে বেড়ালাম; তুষার যখন কত শৈলশৃঙ্গ এছটি চোখ ভরে দিয়ে গেল; সূর্যের সাত রঙের বিচিত্র খেলা দেখে অভিভূতও হলাম; কিন্তু এমন রঙের ছোঁয়া এই প্রথম আমাকে স্পর্শ করল। কমনীয়তার ভেতর যে সৌন্দর্য আছে তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝানো যায়না, শুধু নির্বাক হয়ে অনুভব করতে হয়। ভাল লাগার অনুভূতি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন করে কেমন এক আকাঙ্ক্ষিত অবসাদ এনে দেয়।

আমাদের সামনে, একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে আছে তুষার পাহাড়। সবুজ সবুজ গাছের পাতার ফাঁকে প্রথমে চোখে পড়ল ঘোঁয়া-নীল পাহাড়ের সানুভূমি। ঠিক তার ওপরে নীলের আভায় এসে মিশেছে হাল্কা বেগুনি রঙ। সে রঙটুকু ওপরের দিকে আরও কোমল; আরও স্নিগ্ধ হয়ে শিখর হয়ে গেছে। তারপর সব রঙ শেষ হয়ে, সবার সেরা সাদা রঙের সাম্রাজ্য।

আমি দেখছি। চোখ আমার জুড়িয়ে গেল। মন কখন আপনিই মগ্ন হয়ে গেছে। এক ঝলক হাওয়ার ছোঁয়া পেলাম।

যেন হাওয়ায় একটি কথা ভেসে এলো, 'তোমার হৃদয় আমার বোঝ্, আমার হৃদয় তোমার বোঝ্'।

ঐ নিরুপমা সৌন্দর্যের রাশীর সঙ্গে আমার আজ জীবনের সর্বোত্তম শুভদৃষ্টি বিনিময় হল।

পাশাপাশি চলেছি। এখন আর কোন কথা নেই। সাকিনা বুঝতে পেরেছে, আমি নিজের ভেতর স্নান করছি, ও তাই নির্বাক চলেছে আমার পাশে পাশে।

অনেক ওপরে উঠে এলাম আমরা। এত পথ চড়াই ভাঙতে হাঁফ ধরেছে ঘোড়াগুলোর। ফেন মেয়ে কেনা গড়িয়ে পড়ছে, ঘামে ভিজে গেছে সারা শরীর। এখন বিশ্রামের দরকার। পাহাড়ের এক সমতলে এসে আমরা ঘোড়া থেকে নামলাম। সহিস ঘোড়ার গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

যারা আমাদের আগে এসেছিল, তারা সব বিশ্রামের পর একে একে ঘোড়ায় উঠে আরও ওপরের দিকে চলল। আমরা দেওদার গাছের তলায় একখণ্ড সবুজ ঘাসের জমিতে বসে পড়লাম।

এখন সেই ভুষার পাহাড় চোখের আড়াল হয়ে গেছে। সামনে পেছনে কেবল পাইন আর দেওদারের ঘন সবুজ বন।

টিফিনের কৌটো খুলে কিছু খাবার বের করল সাকিনা।

আমরা সেই সবুজ অরণ্যালোকে বসে সামান্য কিছু জলযোগ করে নিলাম।

এবার কথা হল, ঘোড়া ছুটিয়ে ওপরে উঠতে হবে, তা না হলে ফেরার পথে অশেষ দুঃখ আছে কপালে। উঠলাম ঘোড়ার পিঠে। এখন চালাও জোর কদম। সহিস চাবুক মারছে আর ঘোড়া আসছে সঙ্গে সঙ্গে। ঘোড়া প্রাণপণ চেষ্টায় ওপরে উঠছে।

ঐ তো যারা আমাদের আগে আগে চলছিল, তাদের দেখা যাচ্ছে। উৎসাহ বেড়ে গেছে এখন। তাছাড়া ওদ্যাদের জয় শেষবেশ। আগে-ভাগে যারা তেড়ে ফুঁড়ে ওপরে উঠছিল তারা এখন ঘুষ খেয়ে ক্লান্ত সৈনিকের ভূমিকায়। অতএব ছুটাও ঘোড়া, পার হয়ে যাও ওদের। সবার আগে সীমানা ছুঁতে হবে। কাছে এসে পড়লাম ওদের। পাশ কাটিয়ে এগোতে লাগলাম। আমাদের দেখাদেখি কয়েকজন চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু ওতে কি হবে, সবাই তখন রণক্লান্ত।

দু'চার পা পাল্লা দিয়ে ছুটল ঘোড়া। তারপর হয় আরোহী নয় অশ্ব হতবল হয়ে থেমে গেল।

আমাদের কষ্ট হচ্ছিল খুবই, কিন্তু তার চেয়েও ওদের হারিয়ে দেবার ইচ্ছেটা ছিল অনেক বেশী। তাই জয়ী হলাম আমরা। আর জয়ী যখন হলাম তখন আর এক আশ্চর্য জগতে এসে গেছি। হঠাৎ পাহাড়ের সংকীর্ণ পথটা বাঁক নিয়ে আমাদের সুবিস্তীর্ণ এক সমতল ভূমির রাজ্যে পৌঁছে দিল। গুলমার্গে এসে আমরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম।

পাশেই হোটেল। হোটেল গুলমার্গের এখানে ওখানে প্রায়ই ছড়িয়ে আছে। আমাদের নামার সঙ্গে সঙ্গেই অমরনাথ পাশের হোটেল থেকে এগিয়ে এল। সে পায়ে চলার পথ ধরে অনেক আগেই গুলমার্গে এসে পৌঁছেছে।

আমরা হোটেলের সামনের লনে গিয়ে বসলাম। সাকিনা চা আর কিছু খাবারের অর্ডার দিল। তারপর চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমরা চারদিকটা ভাল করে দেখতে লাগলাম।

গুলমার্গ—পুষ্প-প্রান্তর। এখানকার গোলাপবাগ নাকি অতিবর্ণনাযোগ্য। ঘুরে ফিরে দেখলে গুলমার্গে অনেক লাঞ্ছিত পুষ্প-বাগিচা চোখে পড়ত, কিন্তু কেন জানিনা উৎসাহ পেলাম না। যদি দেখতেই হয়, তাহলে সাজানো বাগান দেখে কি হবে, প্রকৃতির খেয়ালে হঠাৎ জেগে উঠেছে যে রূপ তাকেই দেখব দু'চোখ ভরে।

খানিক চালু আবার খানিক উঁচু এমনি ভূমিখণ্ড নিয়ে গুলমার্গের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর। প্রথম শ্রেণীর এক অদৃশ্য দেব-শিল্পী যেন আকাশের কোলে বিখুঁত একখানা ল্যাণ্ডস্কেপ এঁকে রেখে গেছেন। চালু জমির বুকে কোথাও ওপর থেকে নীচে ধাপে ধাপে নেমে এসেছে এক সার পাইন। বড় থেকে ক্রমে ছোট হয়েছে। এখানে ওখানে এমনি এক এক সার পাইন নিখুঁত রেখাচিত্র এঁকে রেখেছে। পীর পাঞ্জালের তুষারশৃঙ্গের কোলে শৈলরাণী গুলমার্গ।

সাকিনা দূরে ইঙ্গিত করল। ঝক্ ঝক্ করছে তুষারশৃঙ্গ। ঐ তো সাতাশ হাজার ফিট উঁচু বাদা পর্বত।

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। পায়ে হেঁটে তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর পার হয়ে গুলমার্গের বন প্রান্তভাগে এসে দাঁড়ালাম। নীচে বহু দূরে সাদা মুকুট পরা সার সার হিমশৈল দাঁড়িয়ে আছে।

সাকিনার নির্দেশে তাকিয়ে দেখি একটি বড়ো সাদা পাতা কে যেন ফেলে রেখেছে মাটিতে।

উলার হ্রদ ওটি। কি অদ্ভুত দেখাচ্ছে ওপর থেকে।

হটল্যাণ্ডের আবহাওয়ার গন্ধ নাকি গুলমার্গের গায়ে। আর শীতের সুইজারল্যাণ্ডের সঙ্গে গুলমার্গ অভিন্নহৃদয়। যেমনি শুভ্র শীতলতা, তেমনি সুখকরবাসিনী।

শীতে গুলমার্গের বরফ ছাওয়া প্রান্তর এক বিস্তীর্ণ মো-ফ্রক কাগজের খণ্ড বলে মনে হয়। তখন দেশ বিদেশ থেকে আসেন ক্রীড়ামোদির দল। স্কী করেন প্রান্তরে। তাঁদের উল্লাসের রেখা-চিত্র আঁকা হয় বরফের বুকে।

ফিরে এলাম সাকিনার সঙ্গে। মাঝপথেই সহিসকে হাতছানি দিয়ে ডাক দিল সাকিনা। ঘোড়া দুটো কাছে এলো। দূর থেকে হাত নাড়ছে অরবাল। আমরা আবার ঘোড়ায় উঠলাম। এবার ধরলাম বিলামমার্গের বন্ধুর পথ। ভাঙা ভাঙা অসমান নুড়ির রাশ। ঘোড়া উঠছে সাবধানে। ঘোড়ার খুরে মাঝে মাঝে টিকরে পড়িয়ে নীচে পড়ে যাচ্ছে পাথর-খণ্ড। আমরা যত ওপরে উঠছি, দুদিকের বন তত গভীর হয়ে উঠছে। টাঙমার্গ থেকে গুলমার্গের পথ যতটা নির্ঝঞ্ঝাট বিলামমার্গের পথ ততটা নয়। এখানে চড়াই ভাঙতে বেশ কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে পাহাড়ের গা বেয়ে অরণ্যের গাছপালা পাতাপত্র কাঁপিয়ে দু'একটি কোরাকে ঘরে পড়তে দেখা যায়। বনের আড়ালে পাখির ডাক শোনায়। আমরা চলার পথে এমনি পাখির ডাক শুনে কতবার থমকে দাঁড়ালাম।

কতক্ষণ চলার পর দু'জন উঠে এলাম বিলামমার্গের ওপর। আমরা যেখানে ঘোড়া নিয়ে উঠে এলাম, সেখানে পাহাড়ের ওপর সামান্য তৃণের স্পর্শ ছাড়া অন্য কোন গাছপালা নেই। একেবারে চোখের সামনে অনাবৃত তুষার শুভ্র ঝলমল করে উঠল। আমরা ঘোড়া নিয়ে তুষার পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চললাম।

কিছু সময়ের ভেতর এসে পড়লাম তুষারের রাজ্যে। ঘোড়া থেকে নেমে দু'জনে খুশি মত দু'হাত ভরে বরফ নিয়ে লুফতে লাগলাম।

সাকিনা বলল, আর যাই কর, স্নান করোনা, তাহলে আমাকেই পেরে ওঠা দেখতে হবে। কিছু সময় তুষার রাজ্য তোলপাড় করে আমরা আবার ঘোড়ায় এসে উঠলাম।

সেই মুহূর্তে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর, বহু দূরে নীচে অরণ্য রেখা, আর পেছনে তুষার পর্বতের পটভূমিতে একটি আশ্চর্য চেতনা আমার মনে জাগল।

আমরা যেন কোন দিগ্বিজয়ী বন্যার দল। গিরিসংকট পার হয়ে, হিমশৈলের পাশ কাটিয়ে আমরা এসে পড়েছি এখানে। এই উন্নত প্রান্তর থেকে দেখতে পাচ্ছি জনপদ। পরম আকাঙ্ক্ষিত এই স্বর্গলোক। বহুদিনের বহু দুঃখের পথ চলা যেন এতদিনে সার্থক হল। এবার শুধু অসি কোষমুক্ত করে বিপুল গতিতে অশ্ব চালিয়ে দিয়ম্লান উপত্যকার বুকে নেমে পড়া।

কথাটা বললাম সাকিনাকে। আমার কল্পনার চিত্রটি সে উপভোগ করল হরপ্রসন্ন দুটি স্নেহ টানা চোখের দৃষ্টি মেলে। কিন্তু পরক্ষণেই মৃদু হেসে বলল, উপত্যকার বুকে নেমে পড়ার আগে আরও ওপরে আমাদের উঠতে হবে।

—কেন, আরও ওপরে কি আছে? পবিত্র সরোবরের জলে বীরের অভিষেক হবে।

সহিসের হাতে ঘোড়ার রাশ দিয়ে সাকিনা বলল, চল, সেখানে পায়দলেই যেতে হয়।

সাকিনাকে অনুসরণ করে চললাম। কত উঁচুতে উঠে চলেছি। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে আসছে। গায়ে প্রচুর গরম পোষাক না থাকলে বোধ করি শীতে একেবারে জমে যেতে হত। কষ্ট হচ্ছিল চড়াই ভাঙতে। কিন্তু সমতলে যে পরিমাণ কষ্ট হয়, এখানে তার চেয়ে শ্রান্তি কমই হচ্ছিল।

সাকিনা উঠে চলেছে। মেয়েটার কি একটুও কষ্ট নেই। অবলীলায় উঠে চলেছে সে। মাঝে মাঝে শ্রান্তি বোধ করলেও পৌরুষে আঘাত লাগার ভয়ে কোন কথাই বলছিলাম না।

এমনি বোধহয় ঘণ্টা দুয়েক চলছিলাম। তারপর এক সময় দেখলাম আমরা এক আশ্চর্য কুয়াশালোকে উঠে এসেছি।

হাত ধরল সাকিনা। বলল, অনেক কষ্ট হয়েছে তোমার। এখানে এসে কষ্ট করেই আসতে হয়। এসো আমার সঙ্গে।

সামনে এগিয়েই আমি যে দৃশ্য দেখলাম, তা আমার কাছে ছিল একেবারে অভাবিত।

চারদিকে কুয়াশা, মাঝে নীলকান্তমণির মতো নীল একটি সরোবর। টুকরো টুকরো বরফের খণ্ড ঐ নীল জলের বুকে ভেসে আছে।

সাকিনা বলল, এই হোল আকাশগঙ্গা।

আমার মনে হল, এই নির্জন হিমলোকে এই নীলকান্ত আচ্ছোদ সরোবরে দেবলোক থেকে সুরকন্যারা নেমে এসে স্নানলীলা করে যায়। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে আকাশগঙ্গা রমণীয় রহস্যময়তার মধ্যে দেবকন্যাদের দেহস্পর্শ লাভ করে পরিতৃপ্ত হয়। তাদের চঞ্চল কর সঞ্চালনে যে বারিবিন্দু উৎক্ষিপ্ত হয় তা স্বপ্নের হিরক হয়ে জলের বুকে ভাসতে থাকে।

আকাশগঙ্গা থেকে সেদিন গুলমার্গে ফিরে আসতে যে অবর্ণনীয় কষ্টের ভেতর পড়েছিলাম, তার স্মৃতি মনের ভেতর অক্ষয় হয়ে নেই, কিন্তু আকাশগঙ্গার সেই নীল সরোবর আজও আমার কাছে স্বপ্নের এক বিরহ হয়ে আছে। আমার শ্রান্তিভরা দিনে, আমার নিরাক কোন যেমন-মুহূর্তে সে তার নীল পক্ষ বিস্তার করে আমার মনের আকাশে উড়ে আসে। আমি দু'চোখ ভরে তার সেই নীলকান্তমণির মত সুনীল রূপটি দেখি; আর আমার মনের থেকে সমস্ত শ্রান্তি সব অবসাদ এক নির্মল স্পর্শে নিঃশেষে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হতে আজ দশ দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ যেন একটা ঝোঁকে করেছি বলে মনে হচ্ছে। সেটা শরীরের রোগ হোক বা মনেরই হোক। একণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি আর কাজের যোগ্য নই।...তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি; ও মঠে আর কেও নেই যে সইবে। তোমার উপর অধিক অধিক কটু ব্যবহার করেছি; যা হবার তা হয়েছে—কর্ম! আমি অনুতাপ কি করব, তাতে বিশ্বাস নাই—কর্ম! 'মা'য়ের কাজ আমার দ্বারা যতটুকু হবার ছিল ততটুকু করিয়ে শেষ শরীর-মন চুর করে ছেড়ে দিলেন 'মা'। 'মা'য়ের ইচ্ছা!

একণে আমি এ সমস্ত কাজ হতে অবসর নিলাম। দু-এক দিনের মধ্যে আমি সব···ছেড়ে দিয়ে একলা একলা চলে যাব; কোথাও চুপ করে বাকীজীবন কাটাব। তোমরা মাপ করতে হয় করো, যা ইচ্ছা হয় করো। মিসেস বুল বেশী টাকা দিয়েছেন। শরতের উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ করো, যা হয় করো। তবে আমি চিরকাল বীরের মত চলে এসেছি—আমার কাজ বিদ্যুতের মত শীঘ্র, আর বজ্রের মত অটল চাই। আমি ঐ রকমই মরবো। সেইজন্য আমার কাজটি করে দিও—হারা-জিতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। আমি লড়ায়ে কখনও পেছ-পাও হইনি; এখন কি···হব? হার জিত সকল কাজেই আছে; তবে আমার বিশ্বাস, যে কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই—আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে? আমার চোখে এ সংসার খেলা মাত্র—চিরকাল তাই থাকবে। এর মান-অপমান··লাভ-লোকসান নিয়ে কি ছ'মাস ভাবতে হবে?···আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি দিচ্ছেন; ইনি ভয় দেখাচ্ছেন, ও উনি ভয়! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয়-ভয় করে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে। টাকা, জীবন, বন্ধু-বান্ধব, মানুষের ভালবাসা আমি সব—অত সিদ্ধি-নিশ্চিত করে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদি করতে হয়—ত গুরুদেব যা বলতেন যে, কাজ বড় ভারনা—তার তাই হয়। আর যাই হোক, এ সব টাকা-কড়ি, মঠ-মড়ি, প্রচার-ফ্রচার কি জন্য—সমস্ত জীবনের এক উদ্দেশ্য—শিক্ষা; তা ছাড়া ধন-কড়ি স্ত্রী-পুরুষ প্রয়োজন কি?

এজন্য টাকা গেল, কি হার হল—আমি অত বুঝতে পারি না; বা পারবনা। লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি; আর যে বলে, "কুছ পরোয়া নেই, ওরা বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি"···তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার; তারাই জগৎ পাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যে গুলো খালি "খাপরে এগিও না, ওই ভয়, ওই ভয়"—ডিস্‌পেপ্‌টিকগুলো—প্রায়ই ভয়ডরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে,

ঘোর ডিস্‌পেপ সিয়া কখন আমায় কাপুরুষ করতে পারবেনা। কাপুরুষদের আর কি বলবো, কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখন কোন কাজ থেকে হটেনি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কার বশে হুকুম অগ্রাহ্য করেন নি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিন্‌মিনে, ভিন্‌ভিনে, ছেঁড়া নেতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, "এ বীর!"—আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই!…"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমান ধর্ম।"—এই ঠাকুরের দাসানুদাসদের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মত, যে আমায় বুঝবে।

"জাগ বীর ঘুচায়ে স্বপন; শিয়রে শমন…ভাকা না ডরাক তোমা"—যা কখন করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিই নি, আজ কি…তাই হবে?…হায়রাম হয়ে লড়াই থেকে হটে আসব? হায় ত অঙ্গের আভরণ: কিন্তু না লড়েই হারব!

তারা! মা!…একটা ভাল ধরবার মানুষ নেই; আমার মনে মনে খুব অহঙ্কার, "আমরা সব বুঝি।"…আমি এখন চললাম; …সব তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন—যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে—এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব; নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই পর্য্যন্ত।…আমার এখন 'ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে,' আমি চাই তড়ি-ঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।…

সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব?…আমি গাল দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে।…আমি হাপাতে হাপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর article (প্রবন্ধ) লিখেছি।…সব ভাল, নইলে বৈরাগ্য হবে কেন?…শেষটা কি আর আমায় জড়িয়ে মারবেন? সকলকার কাছে আমার অনেক অপরাধ—যা হয় করো।

আমি তোমাদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করছি—মা যেন মহাশক্তিরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, 'অভয়ং প্রতিষ্ঠা'; অভয় যেন তোমাদের করেন। আমি জীবনে এই দেখলাম, যে সদা আত্ম-সাবধান করে, সে পদে পদে বিপদে পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, সে অবমানই পায়। যে সদা লোকসানের ভয় করে, সে সর্ব্বদা খোওয়ায়।…তোমাদের সব কল্যাণ হোক। অলমিতি—

বিবেকানন্দ

শুক্তি-সৈকত

(উপন্যাস)

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[লেখকের বক্তব্য :—যে কোন সাহিত্য সৃষ্টি সম্পূর্ণ ও সার্থক হয় লেখক ও পাঠকের যুগ্ম আগ্রহে। কোন সাহিত্য কর্ম যদি একটী পাঠকেরও মনোযোগ আকর্ষণ করতে না পারে তবে সে সাহিত্যিককে অচিরে লেখনী বর্জন করতেই হবে। লেখক ও পাঠকের মধ্যে তাই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সব সময়েই থাকা প্রয়োজন, এবং আমার মনে হয় যে কোন মহৎ সাহিত্যিকই এই সম্পর্ক সম্বন্ধে মনে মনে একটা দায়িত্ব বহন করে থাকেন। আমি নিজেও আমার এই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন। গল্প-ভারতীর পাঠক-পাঠিকারা যাঁরা আমার লেখা রীতিমতো পড়েন ও পড়তে ভালবাসেন তাঁদের কাছে আমি দায়বদ্ধ হয়ে আছি গত ১৩৬৮ সালের আষাঢ় মাস থেকেই। আমার বর্তমান উপন্যাস শুক্তি-সৈকতের সুরু হয় ঐ সময় থেকেই। শুক্তি-সৈকত ধারাবাহিক উপন্যাস হলেও তার ধারা আমি নিয়মিত রূপে রাখতে পারিনি। এ শুধু আমার ত্রুটী নয়, এ আমার রীতিমতো অপরাধ। তবে তরসার কথা এই যে আমার এ অপরাধ স্বেচ্ছাকৃত নয়। জীবনের নানান দুর্বিপাকের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে আপনা হতেই লেখনী সঙ্কুচিত হয়েছিল। আমার জীবন ও সাহিত্য সৃষ্টি, এ দুয়ের স্রোত ভিন্নমার্গগামী নয় বলেই, একটী মরুভূমিতে পথ হারাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যটীরও ধারালুপ্তি ঘটেছিল।

বর্তমানের পরিস্থিতি সৃষ্টির অনুকূল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের কাছে শুক্তি-সৈকতের পাত্র-পাত্রীদের আবার এনে হাজির করছি। তাঁরা আনন্দ লাভ করলে আমার সৃষ্টি সর্বৈব সার্থক হবে।]

আগে যা ঘটেছিল :—[তামিলনাদের দক্ষিণে, কন্যাকুমারীর একশো মাইল উত্তরে আর রামেশ্বরের একশো মাইল দক্ষিণে বন্দর সহর হল তুত্তুকুড়ী। রুক্ষ, বালিভরা সবুজের লেশহীন জায়গা। আছে শুধু খর্জুর উন্নত তালের সারি। এই অঞ্চলের প্রায় সমস্তটা জুড়ে বাস করে মীন-পারোয়ারা। পেশা তাদের মাছ ধরা, শাঁখ তোলা আর তুত্তুকুড়ীর পাশেই সমুদ্রে যে বিখ্যাত মুক্তোর ক্ষেত আছে তা থেকে ডুবে মুক্তো তোলা। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মে ক্যাথলিক খৃষ্টান। বেশীর ভাগই খেটে খাওয়া গরীব জেলে।

তুত্তুকুড়ী সহরের মীন-পারোয়াদের মধ্যে কয়েকজন আছেন খুব ধনী। গডউইন কার্ণাণ্ডো তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক। তাঁর ব্যবসা ছিল বড় বড় তোলী নৌকোতে মাল বওয়ার। তাঁর ছিল

লবণ তৈরীর কারখানা, টীজেডোরের ব্যবসা ইত্যাদি নানারকম। তুতুকুড়ী থেকে সিলোন পর্যন্ত তাঁর ব্যবসা ছড়িয়েছিল। লাখ লাখ টাকার মালিক ছিলেন তিনি।

তাঁর একমাত্র পুত্র এটনী কার্নাডো। ভাগ্যচক্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ। অর্থনীতিক ডাঃ সরকারের ছাত্র। পরে সে বিলেত যায়। সেখানে পি, এচ, ডি লাভ করে অধ্যাপক লাস্কীর কাছে। বুদ্ধিমান ও বিনয়ী ছেলে। বিলেত যাবার আগে বাবার অনুমতি চাইতেই বাবা তাকে মার দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন। বাবার ইচ্ছা ছিল সে তার মামাতো বোন মার্সিকে বিয়ে করে তুতুকুড়ীতে থেকে যায় ও বাপকে সাহায্য করে ব্যবসাতে। এটনীর মন মানসিকতা বেড়ে উঠেছিল অন্য আবহাওয়ায় কলকাতাতে। সে এই প্রচুর টাকা পয়সা আর অনায়াসলব্ধ আরামকে বর্জন করতে চেয়েছিল। ঘৃণা করতে সুরু করেছিল পারোয়ারের মূল উত্থান-পতনহীন জীবনকে। কলকাতা থেকেই তার মনে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হয়েছিল। বাপের চোখ এড়িয়ে এটনী বিলাতে পালিয়ে যায়। সেখানে সে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেয়। তারপর দীর্ঘদিন বাপ ছেলের কোন সম্পর্ক ছিল না। সবাই জানত গডউইন এটনীকে ত্যাজ্যপুত্র করেছিল। ভারত স্বাধীন হবার পরে এটনী ইণ্ডিয়া হাউসে চাকরী নিয়ে বসবাস করতে থাকে লণ্ডনে। অকস্মাৎ এটনী বাপের টেলিগ্রাম পেল লণ্ডনে—তিনি মৃত্যুশয্যায়। এটনী তুতুকুড়ীতে ফিরে এল। গডউইনের তখন ক্যানসারের শেষ অবস্থা চলেছে। গডউইন মারা গেলেন। এটনী তুতুকুড়ীতে আটকা পড়ে গেল বাপের বিপুল সম্পত্তির ব্যবস্থা করতে। সেই অবকাশে সে দেখল তুতুকুড়ীর সমাজের অবস্থা। একটু একটু করে সে আবার পরিচিত হতে লাগল সেই সমাজে। দেখল ধূর্ত শয়তান সুসান কার্ভোজাকে। কার্ভোজা তার স্বর্গত বাবাকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি হাত করতে চেয়েছিল। যেমন তার বাবার আশ্রিত ব্যক্তিদের দ্বারা তার বাবা মারা যাবার পর তার সঙ্গে গোপনে শত্রুতা করতে সুরু করেছে।

পেরেরাদের নৌকা ভাসান উৎসবে গিয়েছিল এটনী। সেখানে দেখতে পেল সেই অনেক দিনের ভাবা অনেক ভালো লাগা মুখটীকে। চোখে তার কালো চশমা। কিন্তু দেখা হবার পরেই সে মুখ ভীড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। দেখা হল মার্সির সঙ্গে। মার্সির বিয়ে হয়ে গেছে বহুদিন। মার্সি তাকে বাড়ী নিয়ে এল। সেখানে দেখা হল মার্সির বান্ধবী সিন্‌ডার সঙ্গে। সিন্‌ডা তাকে নিয়ে গেল রাতের অভিযানে সমুদ্রের পাড়ে। সেখানে সে দুর্বৃত্তের হাত থেকে বাঁচাল একটী অজানা মেয়েকে। সিন্‌ডাও মেয়েটীকে নিয়ে বাড়ী এল গভীর রাতে। মেয়েটীকে ধর্ষণ করেছিল দুর্বৃত্তরা—সে অজ্ঞান হয়েছিল। সিন্‌ডা তার সঙ্গ লাভ করল কিন্তু যাওয়ার সময় মনে একটা ঘা দিয়ে গেল। সেই ঘা খেয়ে এটনী নিজের মন-বিশ্লেষণে রত হল। দেখতে লাগল তার অতীত জীবনকে। দেখতে পেল তার জীবনের প্রথম নারীকে, দেখতে পেল তার প্রথম প্রেমের বিকাশকে। দেখতে পেল তার বাবা মায়ের সম্পর্কটীকে। দেখল তার ওপর তার বাবার কষ্ট মনোভাবকে।

এমনি বহু মেয়ে আসত গডউইন কার্নাডোর বাড়ীতে প্রত্যহ। এটনী নানা কথা শুনত পিতামাতার কাছে, বাইরের চাকর বেহারাদের কাছে। আর সবচেয়ে বেশী করে প্রতিক্রিয়া দেখতে পেত তার মায়ের চোখে মুখে। মায়ের মনে যাই থাক তিনি কোন কথা বলতেন না। সমস্তই চুপ করে সহ্য করতেন। কেবল এক-আধবার যখন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত তখনই দু'একটা কথা তাঁর মুখ

ফুটে বার হত। শুকনো মুখে পিচ্চাম্মাকে ডেকে বলতেন—কি করি বলত, কর্ত্তা আজ এক মাসের ওপর অন্দরে আসছেন না। কেমন আছেন, তাই বা কে জানে?

পিচ্চাম্মা ঈষৎ ধমকের সুরে জবাব দিত—কত্তার কিছু হলে তুমি খবর পেতেই আম্মা। তাছাড়া কত্তার মতো লোক অন্দরমহলে পড়ে থাকবে এ কেমনতর কথা তোমার? কত্তা হল এ তল্লাটের দিকপাল। তার কি দিনেরাতে বৌয়ের আঁচল ধরে অন্দরে বসে থাকা সাজে?

মা আর কথা কইতেন না। তিনি ঘরের মধ্যে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে কেঁদে ভাসাতেন। তাঁর যে দুঃখ তা সারা বাড়ীর কোন লোকেই বুঝতে পারত না। শুধু কিছুটা আবছা আবছা ভাবে বুঝতে পারত এটনী। সে তার ছোট্ট জ্ঞানের পরিধির মধ্যে এ ধারণাটা করতে পারত যে সেদিনকার দুপুরে দেখা বারমহলের স্ত্রীলোকটীর আর তার মায়ের দুঃখ যেন কতকটা এক। এই দুঃখের মূলে আছে তার বাবা। বাবার ওপর তার ক্রমশঃ বাড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে জমা হতে লাগল তার অবচেতনে একটা নিদারুণ বিদ্বেষ ভাব। মাঝে মাঝে সে একটা স্বপ্ন দেখত। একটা ভয়ংকর দৈত্য তার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হাতের থাবায় গলা টিপে মারছে একটী স্ত্রীলোকের। সে স্ত্রীলোকটির মুখটী প্রথমে সে ভাল দেখতে পেত না। পরে সে মুখ স্পষ্ট হত। সে দেখত সেদিনকার দেখা সেই স্ত্রীলোকটীর মুখ। একটুখানির মধ্যেই সে মুখটা বদলে হয়ে যেত তার মায়ের মুখ। মায়ের সেই শ্বাসকষ্ট সে সহ্য করতে পারত না, আতঙ্কে চীৎকার করে উঠত তার ঘুমের মধ্যে। তার মনে হত কে যেন তার নিজেরই গলা টিপে ধরছে। তাতে তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। ঘুমের মধ্যে তার এই ডুকরে কেঁদে ওঠার রোগটা বহুদিন ছিল।

গডউইন প্রকাণ্ড পুরুষ। কর্মে, ধনে-ঐশ্বর্যে এ সমাজের একজন কৃতী মানুষ। গডউইনের কষ্ট সইবার, নিজের হাতে কাজ করবার শক্তি এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ বাক্যের মতো দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে সন্ধ্যেবেলা তিনি ফিরে আসতেন। তখন স্নান সেরে তাঁর কয়েকটা জিনিষের দরকার হত। কয়েক বোতল আরক (নারকেল গাছের রস থেকে তৈরী এক ধরণের তীব্র সুরা), সের দুয়েক গরগরে করে রাঁধা মাংস। আরক যোগাবার কাজ করত তাঁর খাস বেয়ারা মারিয়া দাসন। সেই রাঁধত মাংস। রাম আয়েঙ্গার এ কাজে ছিল ভয়ানক ধুরন্ধর। কোন দিন বাসী জিনিষ সে কর্ত্তাকে দেয়নি এতেই ছিল তার দক্ষতা।

বুড়ী কি পিচ্চাম্মা তার মাকে গল্প শোনাত। এটনীও চুপচাপ মায়ের পাশে বসে শুনত সে গল্প। পিচ্চাম্মা চোখ বড় বড় করে বলত—কত্তামশায় একটা মানুষের মতো মানুষ বটে। আমাদের পারোয়া সমাজে কেউ যা পারেনি, কত্তা তাই করেছেন। তিন চিরাপল্লী থেকে এক বামুনের মেয়ে নিয়ে এসেছিল রাম আয়েঙ্গার। আঃ, চেহারাখানা কি? রূপের আভায় যেন চারদিকে আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। আমি লুকিয়ে দেখেছিলাম একবার। আম্মা তুমি যদি দেখতে তো আমি হলপ করে বলতে পারি হাঁ করে দু'দণ্ড নিশ্চয়ই চেয়ে থাকতে হত তোমায়। আঃ, কি রং, কি চোখ, নাক, কি মাথার চুল দেওয়া চুল। মারিয়া দাসন আমাকে আগে থেকে খবর দিয়েছিল তাই দেখতে পেলুম—অমন একখানা চেহারা। বড়ঘরের মেয়ে হবে নির্ঘাৎ। রাম আয়েঙ্গারকে বাহাদুরী দিতে হয় এরকম মেয়ে জোগাড় করবার জন্যে। তাকে নিয়েই তো সেলেম কোড়াই ক্যানাল-এ বেড়াতে।

হঠাৎ শুনতে শুনতে মায়ের যেন কি হল। তিনি বললেন—পিচ্চাম্মা, আমাকে ধর, আমার বুকটা কেমন করছে।

বলতে বলতে বুকটা দুটো হাতে চেপে ধরে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তেন তিনি।

দৃশ্যগুলো পাশাপাশি ভেসে উঠছে এস্টনীর মনের চোখের সামনে। নারী ও সুরার প্রতীর তাবে আসক্ত গডউইন। আর ঘরে চিরনির্যাতিতা স্ত্রী। বাপের ওপর একটা বিদ্বেষ ভাব যদিও তার মনের তলায় প্রচ্ছন্ন ছিল তবু এস্টনী তার বাপের মত শুনতে শুনতে বাপের মতো হবার একটা তীব্র ইচ্ছাও মনের মধ্যে পোষণ করতে লেগেছিল বেশ কয়েকদিন। এ ইচ্ছাটা ছিল ওপরের মনের সচেতন ইচ্ছা। বড় হবার ইচ্ছা, বাহাদুর হবার ইচ্ছা, সমাজে দিকপাল হবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটাকেই অবলম্বন করে তার মনের ভিতর কেমন করে ঢুকে গিয়েছিল—অনেক পয়সা রোজগার আর অনেক মেয়েমানুষ যে করতে পারে সেই হল সমাজে বরেণ্য জীব। এ ইচ্ছা, এ ধারণাটা তার সচেতন মন থেকে ক্রমশঃ বেশ কিছুটা গভীরে তার স্রোত চালিয়ে দিয়েছিল। এমন কি অনেক সময়ে সেখানেই লোকচক্ষুর, এমন কি তার নিজেরও অগোচরে সেই ইচ্ছার বারি সিঞ্চিত হত তার সহজাত আসক্তির অঙ্কুরে। সেই অঙ্কুর ধীরে ধীরে একটা ডালপালাওয়ালা গাছের মতো বেড়ে উঠেছিল দিনের পর দিন। বেলাকে আঁকড়ে ধরার ইচ্ছা ছিল সেই মূল ইচ্ছারই একটা অংশ। যদিও তার সঙ্গে ছিল তার শিশুসুলভ একটা সহজাত আত্মরক্ষা—বেলার প্রতি।

আজ ভাবতে অবাক লাগে এস্টনীর। কোন দিন সত্যিই যদি বেলাকে সে বিয়ে করত শুধু তাকে নিয়েই কি সে সন্তুষ্ট হতে পারত জীবনে? নারীর প্রতি যে অন্ধ আসক্তি সেটা মানুষের সহজাত বৃত্তি কিন্তু তার জীবনের এই বীজ বপন করে দিয়েছিলেন তার বাবা। সেটা এনেছিল তার জন্মের সঙ্গে রক্তের সঙ্গে। তারপর সে শাখা প্রশাখা বেড়ে উঠেছিল তাও তার বাপের কর্ম-রীতির ফলে। কিন্তু তবুও অবাক লাগে। অবাক লাগে, যে পিতা নিজে এত বেশী বহুকামী, যার নারীর ওপর আসক্তি এ অঞ্চলে প্রায় প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়েছিল তিনিই এস্টনী আর বেলার এই সামান্যভালবাসাবাসির ব্যাপারটাকে এতবড় বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে দেখলেন কেন? এ নিয়ে এস্টনী আগে বহু চিন্তা করেছে। বহু বিশ্লেষণ করে, বহু কষ্টে শেষ পর্যন্ত একটা সিদ্ধান্তে এসেছিল সে। অবশ্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তাকে সাহায্য করেছিল দুই ব্যক্তি। একটা ছিল অসমঞ্জ ঘোষ, তার বন্ধু সহপাঠী। নিদারুণ তাবে যুক্তিবাদী ও তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণ ক্ষমতার অধিকারী। অসমঞ্জকে একটা ধাপধোপা শানান তলোয়ার বলে মনে হত এস্টনীর। বুদ্ধির দীপ্তিতে সে সর্বদাই ঝকঝক করত। আর অপরজন ছিল মধ্য মোয়াজেল ফ্রাঁকো একজন ফরাসী মহিলা, এস্টনীর বিপদের দিনের বন্ধু।

অসমঞ্জ যখন তত্ত্বকথা আলোচনা করত তখন তার মুখ দিয়ে বক্তৃতা করার মতো অনর্গল কথা বার হয়ে আসত। শুদ্ধ কথা।

অসমঞ্জ বলত—স্বার্থ, স্বার্থ, স্বার্থ। দুনিয়াতে কোন মানুষের কোন ক্রিয়া স্বার্থহীন নয় বুঝলে এস্টনী। মা-বাপ ছেলের জন্য যে ছেলের জন্যে যতটা না হোক নিজেদের জন্যে তার ঢের বেশী। কিন্তু মজা দেখ সন্তান জন্মাবার পর এই কাউয়ের ওপরেই স্বার্থটা হয় আরও কায়েমী। আমাদের এই ভারতবর্ষে সন্তানের আলাদা অস্তিত্ব কেউ কল্পনা করতে পারে না। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা বাজে কথা।

এস্টনী তর্ক তুলত।—তা হলে কি মনে করতে হবে, লোকে বিয়ে করছে শুধু একটা স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য? তার কি অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই?

অসমঞ্জ বলত—না তা-ও নয়। কেবলমাত্র স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যেই যে লোকে বিয়ে করছে তা-ও নয়। বলা যায় লোকে বিয়ে করে তার নিজেরই মনোরঞ্জনের জন্য। স্ত্রী সে ক্ষেত্রে একটা উপায় মাত্র। যদি সত্য মানুষের যৌন সম্ভোগের অন্য কোন রকম একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকত যাতে সন্তান উৎপাদনের কোন কথাই থাকত না, তবে মানুষ সেইটাকেই অবলম্বন করত। এটাই আমার ধারণা। কিন্তু প্রকৃতি যে এক বেয়াড়া রকমের রসিকতা করে বসে আছে। ইন্দ্রিয় সম্ভোগের সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে সন্তান সৃষ্টিকে এক সুতোয়—বলেই হো হো করে হেসে উঠত মনু।

এটনী বলত—তুই যা বলছি মনু তা যদি সত্যি বলে ধরতে হয়, তাহলে দুনিয়ার লোকের এই সন্তান না হবার দা-হুতাশটাকে কি বলে ব্যাখ্যা করবি?

মনু একটুও অপ্রতিভ না হয়ে হাসি থামিয়ে গম্ভীর মুখে বলত, একে জানিস? আদিম কাল থেকে মেয়েদের সম্মান দেওয়া হয়েছে তাদের সৃষ্টিকারীত্বের ওপর। এই সন্তান সৃষ্টিই হল স্ত্রী জাতির একমাত্র গৌরব। বর্বর যুগে শুধু নয়, এই সেদিন অবধি সভ্য জগতেও যে নারী যতো বেশী সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে তত বেশী সম্মানের অধিকারিণী হয়েছে। তাই আজও নারী পুত্রবতী না হলে সমাজ তাকে উঁচু চোখে দেখে না। তার ব্যক্তিত্বের কোন অস্তিত্বকেই আমল দেয় না সমাজ। তাই নারীরা এত আকু পাকু করে সন্তান পাবার জন্যে। তাই সন্তান প্রসব করাটা আজও এই বিংশ শতাব্দীতে একজন নারী তার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছে। শিক্ষা দীক্ষার প্রয়োজন নেই, মনন-চিন্তনের কোন কথা নেই, মনুষ্যত্ব বিকাশের কোন চর্চা নেই, জীবনের গভীরতর, মহত্তর উদ্বেগের কোন বালাই নেই, শুধু সন্তান প্রজনন। এই হল নারী সাধারণের চরম মোক্ষ। নৈলে তাকে বন্ধ্যা বলে হতমান হতে হবে—সে তার সইবে না। মেয়েদের মনে এই সন্তান আকাঙ্ক্ষার বৃত্তি প্রায় জন্মের পর থেকেই বাসা বাঁধে বলে একে তাড়ানও দুষ্কর। কিন্তু পুরুষের বেলা কথাটা হল স্বতন্ত্র। স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিতে সন্তানের একটা ইচ্ছে থাকলেও তার জীবনের চরম সুখ হচ্ছে যৌন সম্ভোগে। সন্তানের কথাটা সে ক্ষেত্রে মুখ্য নয়। কিন্তু আর একটা দিকও তার মধ্যে ভাববার আছে। সমাজের একটা বড় অংশই সন্তানহীন ব্যক্তিকে হীনবীর্য বলে মনে করে। এটা তার অহংকারে বাজে। এর জন্যেও তাকে সন্তান কামনা করতে হয়। কিন্তু তবুও এটা খুব বড় কথা নয় পুরুষের ক্ষেত্রে, যত বড় বলে একজন নারী এই কলঙ্ককে ভয় পায়। কাজেই বুঝতে পারছিস বাপের স্বার্থ কোথায়? প্রথমতঃ সেটা সম্ভোগে। আর দ্বিতীয়তঃ যখন সম্ভোগের ফলে পুত্রের জন্ম হল তখন কায়েমী স্বার্থে। সেই পুত্র হল মানুষের বৃদ্ধ বয়সের সম্বল অর্থাৎ মানি মেকিং মেসিনারী। বাপ যখন অথর্ব হবে তখন পুত্র তাকে রোজগার করে খাওয়াবে—মানে খাওয়াতে সে বাধ্য হবে। আর তৃতীয়তঃ বাপ শিক্ষা দীক্ষায় সামাজিক ব্যাপারে, কর্মে ও আচরণে যতই হীন হোক না কেন তার একটা জায়গা থাকবে যেখানে সে নিজেকে সব ব্যাপারে বড় বলে ভাবতে পারবে, তার অহংকারকে ওপরে তুলে রাখতে পারবে, সে হল তার সন্তান। এটাতে তার সবচেয়ে বড় স্বার্থ—অহংকারের স্বার্থটা অটুট থাকবে।

বলতে বলতে মনু একটুও দ্বিধা না করে নিরাসক্ত স্বরে বলেছিল—এই ভাবনা আমার বাবা। আমার জন্মের জন্যে তাঁকে বোধ হয় একটুও প্রস্তুত হতে হয়নি। বলা যায় তিনি চিন্তাও করেননি আমার দুনিয়াতে আসার সম্বন্ধে। ঠাকুমার কাছে শুনেছি মায়ের যখন বয়স তেরো বছর তখন আমি জন্মেছি। মায়ের বিয়ে হয়েছিল দশ বছরে। তেরো বছরে যে সন্তান হবে কেউ তো ভাবেনি। তাই

আমি হয়েছিলাম আঠাশে ছেলে। তাগ্যে ঠাকুমার তখনও প্রসব ক্ষমতা থেমে যায়নি। তাই আমার এক খুড়োর সঙ্গে তার সম্পত্তি ভাগাভাগি করে নিয়ে আমাকে বাঁচতে হল। নৈলে আমার মায়ের বুকে এমন এতটুকু দুধ ছিল না যা খেয়ে আমি বাঁচতে পারতাম। এরপর আমার বাবা যথারীতি স্বামী কর্তব্য পালন করেছেন। অর্থাৎ আমরা সাতেরো জন ভাইবোন জন্মেছি, চারজন অকালে মরে বেঁচেছে। আমরা ন'জন এখনো আছি। পিতৃকর্তব্যও তিনি পালন করেছেন তাঁর সামর্থের মধ্যে। অর্থাৎ স্কুল-মাষ্টার বাবার অতি অল্প আয়ে ভাগাভাগি করে যা থাকে তাই দিয়ে আমাদের বাঁচতে হয়েছে। —বলতে বলতে মধুর চোখের দৃষ্টিটা কিরকম যেন উদাস হয়ে যেত। অনেক দূরে কোথায় যেন হারিয়ে যেত সেটা তার গলার আওয়াজ মৃদুমন্দ গতির হয়ত—আমার এতো বড় জীবনের মধ্যে চিন্তা করেও খুঁজে পাইনি কবে একমাত্র আমার জন্যই আমার বাবা বিশেষ করে কিছু করেছেন। পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছি, স্কলারশিপ পেয়েছি—তাই আজও এম. এ পর্যন্ত পড়তে পারছি। শুধু তাই নয় আমার স্কলারশিপের টাকার বাবার আরও তিনটে সন্তানের পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে। বাইরে লোকের ধারণা—আমি হলাম কলির রামচন্দ্র। কিন্তু আমার বাবার সবচেয়ে বড় গর্ব আমার ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে। এমন একটা ছেলের বাবা বড় সহজ কথা নয়! শুধু তাই নয়, ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হয় যে ছেলে সে ছেলে বাবার ওপর মুখ তুলে কথা বলতে পারে না এমন কড়া শাসন বাপের! বাবা এই নিয়ে গর্ব করে বেড়ায় এখানে সেখানে। আমি মুখ বুজে শুনি। কিন্তু বাবা যদি সত্যি আমার মনের কেউ হত, তবে আগেই আমার মনের কথা টের পেত। শুনলে অবাক হবি, আমি যে কি ভাবি, আমি যে কি করতে চাই আমার বাবা তা ঘুণাক্ষরে জানা তো দূরের কথা তাতে গ্রাহ্য করেন না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হাতে আমি এম. এ পাশ করার পরে আই. সি. এস্ কম্পিট্ করি। একটা বড় গোছের চাকরী পাই, অনেক টাকা রোজগার করি। তিনি আমার জন্ম দিয়েছেন কাজেই আমার জীবনের ইজারা তাঁর হাতে : সুতরাং আমার রোজগারের সবটাই তাঁরপ্রাপ্য। শুধু রোজগারই নয় আমার সেল অব্ মর্যালিটি আর পার্সোনালিটির তিনিই একমাত্র জিম্মাদার। বাষ্ট সরকারকে আমি যে ভালবাসি এ কথাটা তাঁর কানে পৌঁছেছিল। সেদিন তাই তিনি আমার গায়ে হাত তুললেন না বটে, কিন্তু আমার ছোট ছোট ভাই বোনেদের সাক্ষাতে অপমানের চূড়ান্ত করলেন। সংসারের একচ্ছত্র অধিপতির মতো হুকুম করলেন। যাকে তিনি নির্বাচন করবেন আমার স্ত্রী হিসেবে তাকেই আমাকে সুড়সুড় করে বিয়ে করে আসতে হবে ভাল ছেলে হয়ে। তা সে মেয়ে আমার উপযুক্ত হোক বা না হোক। যদি এর বিরুদ্ধে আমি জেহাদ ঘোষণা করি তবে আমাদের বাংলা দেশের বাবার দল রে রে করে চেঁচিয়ে উঠবে। একি অত্যাচার! এ ছেলের উচ্ছন্নে যেতে আর বিলম্ব নেই। যে পিতা স্বর্গ, যে পিতা ধর্ম, পরমন্তপ যে পিতা তার প্রীতি উৎপাদন করছি না—আমার ভাগ্যে অনন্ত নরক ভোগ। সমাজ ছ্যা ছ্যা করবে। দেশময় রাষ্ট্র হবে মধু ছেলেটা একেবারে ঘরে গেলবে। গরীব বাবা এতো কষ্টে মানুষ করলে তার দিকে আর ফিরেও চাইলে না ছেলেটা বুড়ো বয়সে। এতো বড় অধর্ম আর কি আছে? অথচ ভাবতে আমার আশ্চর্য লাগে এটনী—যে বাপদের এই অত্যাচার মধ্যযুগের বর্বর ক্রীতদাস প্রথারও অধম। আমরা মানসিক দিক থেকে এমন ভীরু হয়ে আছি, যে এই অত্যাচারের জাল কেটে বার হই তা আমাদের মধ্যে কুলোয় না। আমরা দেশে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু দেশের পরাধীনতা যে কোথায় তার মূল আমরা আজও জানি না। ইংরেজ দেশ থেকে গেলেই যে আমরা স্বাধীন হব এমন বিশ্বাস আমার নেই। আমাদের বাপেরা আমাদের অদৃশ্যভাবে পরাধীন করে রেখেছে।

এন্টনী চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল মহুর কথাগুলো। গভীরভাবে সেগুলো তার অন্তরে আলোড়ন তুলেছিল সেদিন। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মন্তব্য করেছিল—আশ্চর্য, সব জায়গায় বাপেদের এই রকম একটা মনোভাব। আমার বাবাও—

তার মুখের কথা লুফে নিয়ে অনন্ত বলেছিল—তোর বাবার কথাই ধর। নিজে তো বৎসরোনাস্তি মদ্যপ। তার ওপর যৌন বিকৃতিতে ভুগছেন। কিন্তু সেদিন তোর মুখে যখন তোদের সেই গল্পটা শুনেছিলাম তখনও আমার এই কথাটাই মনে পড়েছিল—যে সমস্ত বাপ আততায়ীর একটা মাত্র চোখ খাওয়ানী আছে তাদের ছেলেদের ওপর—Do not do what I do, do what I say. আমি যা বলব তা কর। ওরা বোঝে না যে বাপেদের জীবন হওয়া উচিত উদাহরণের জীবন। জীবন চর্যার পথ বাবাই শেখাতে পারে ছেলেকে। কিন্তু তা বড় শক্ত। যা আদর্শ বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, তাকে জীবনে মেনে চলার মতো কঠিন কাজ আর নেই। বাপেদের সেই বড় বয়সেও ঐ কঠিন কাজটুকু করা হয়ে ওঠে না। তাঁরা কিন্তু তার বদলে চান ঐ কাজটুকু করবে তাদের সন্তানরা। যে আদর্শ জীবন তাঁরা নিজেরা যাপন করতে পারলেন না সেইটাই তাঁরা দেখতে চান তাঁদের সন্তানের মধ্যে। এও এক বিরাট হাসির ব্যাপার। এতে করে তাঁর অহংকারটা বেশ জোরাল হয়। তিনি মনে করেন ছেলের নৈতিক চরিত্র গঠনে তাঁর যা কর্তব্য তার সবটাই তিনি পালন করলেন। তাই না—?

এন্টনী আবার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেছিল—ঠিক তাই।

বহুদিন ধরে এন্টনীর মনে এই ধারণাটাই ছিল যে গোঁড়া ক্যাথলিক সমাজের মধ্যে মানুষ যে লোক, তার মনে নৈতিক চরিত্রের সম্বন্ধে কিছুটা দুর্বলতা থাকবেই। অথচ নিজে অভ্যাসের দাস হয়ে সেই নীতিকে বিসর্জন দিয়েছিলেন গডউইন। এর জন্যে তার মনের মধ্যে বোধ হয় কোন পাপ বোধ লুকিয়ে থাকত। তিনি বোধ হয় নিজের মধ্যে একটা আত্মদ্বন্দ্বে ভুগতেন। একদিকে তাঁর চার্চ কাদারদের অনুশাসন আর অপরদিকে তাঁর দেহ-জর্জরিত প্রকৃতির আবেগ। এই দোটানার মধ্যে পড়ে, তিনি হয় তো সত্যি সত্যি মনে প্রাণে চাইতেন যে তাঁর ছেলের নৈতিক চরিত্র হোক সমস্ত রকম নৈতিক পাপ থেকে মুক্ত।

কিন্তু মাদামোয়াজেল ফ্রাঁকো তাকে দিব্য চক্ষু দান করেছিলেন।

মাদমোয়াজেল ফ্রাঁকো—মাদমোয়াজেল সোফিয়া ফ্রাঁকো। এন্টনীর মনের চোখের সামনে ভেসে উঠল প্রথমে সেই সাদা শাঁখের মতো মসৃণ আর নিটোল কাঁধটা। শুধু মসৃণ আর নিটোলই নয় সেই কাঁধ, সেই ঘাড় ছিল যেমন ঋজু তেমনি শক্ত। আর সেই ঘাড়ের ওপর সোফিয়ার কোটা শ্বেত পদ্মের মতো মুখ। চোখ, ভুরু, কপাল, চিবুক—অনবদ্য সৃষ্টি। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। সোফিয়ার সারা মুখে এতটুকু কোমল ভাব কেউ কখনও দেখেনি। এন্টনী তো নয়ই তার জানা-শোনা কোন ব্যক্তিই সোফিয়ার মুখে বা ঠোঁটে কোনদিন এতটুকু করুণা বা এতটুকু আনন্দের হাসির আভাসও কোনদিন দেখেনি। সে মুখ ছিল সত্যিই পাথরে গড়া—পাথরের মতো শক্ত। বড় বড় ঘন পাতাওয়ালা টানাটানা চোখ দুটোর দৃষ্টি ছিল সব সময়ে জমাট বাঁধা বরফের মতো ঠাণ্ডা আর কঠিন।

তার দীর্ঘদিন বিদেশ বাসের মধ্যে সোফিয়ার মতো মেয়ে বন্ধু তার আর কেউ ছিল না। কিন্তু সোফিয়াকে সে কখনও নারী বলে মনে করতে পারেনি।

অথচ সোফিয়া ফ্রাঁকোর অন্তরে যে কোমলতা ছিল না একথা বলা যায় না। এন্টনী সে কোমলতার আভাষ পেয়েছিল সোফিয়ার সঙ্গে পরিচয় হবার প্রথম দিনই।

১৯৪০ সালের গ্রীষ্মকাল। এন্টনী গিয়েছিল প্যারিসে ছুটী কাটাতে। মনে আছে তার প্যারিসে পৌঁছানর প্রথম সন্ধ্যায় সে বুলভার্দের উপর দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে 'ইভ্‌নিং ইন্ প্যারিস'-এর অপরূপ সৌন্দর্য দেখছিল। আর মনে মনে মাতামাতি করছিল দেখেশ দাশের প্যারিসের উপর লেখা—"এতো শুধু প্যারি নয় এযে বিশ্বের পিয়ারী।" এমন সময় এক ভদ্রলোক পাশে এসে দাঁড়ালেন। পরিচয় দিলেন বোম্বের কয়লা ব্যবসাদার বলে। জিজ্ঞাসা করলেন, এন্টনী এখানে কতদিন এসেছে।

এন্টনী বলে সেই দিন প্রথম প্যারিসে এসেছে শুনে ভদ্রলোক সহানুভূতির সঙ্গে এগিয়ে এলেন এন্টনীকে সাহায্য করতে। প্যারিসে দেখবার জিনিষ প্রচুর। আর ভদ্রলোকও প্যারিসে বাস করছেন প্রায় পনেরো বছরের উপর। কথা বার্তায় ভদ্রলোকের আন্তরিক সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে এন্টনী মুগ্ধ হল। তারপর তারা দুজনে চলল কলিবার্জার দেখতে। কলিবার্জার নগ্ননৃত্য এদেশে অতি প্রসিদ্ধ ব্যাপার। হলে ঢুকে এন্টনী দেখল ভদ্রলোকটীর সঙ্গে অনেকেরই পরিচয় আছে। ভদ্রলোক প্রায়ই মাথা নত করে অভিবাদন জানাতে লাগলেন ডাইনে বাঁয়ে নজর ফেলে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে নগ্ন নৃত্য শেষ হতেই তারা বেরিয়ে এসে একটা আকার গ্রাণ্ড ক্যাজারেতে এল। সেখানে এসে এন্টনী অবাক হয়ে গেল। প্রচুর আলো, প্রচুর বাজনা আর নাচ। আমোদ, আমোদ আর আমোদ। এই আমোদ ভোগ করতে এখানে ছুটেছে সারা বিশ্বের লোক—সাদা কালো পীত সবাই। এ একটি বিরাট মৌচাক। এখানে মধু খাবার জন্য ছুটেছে বিশ্বের মন থেকে। প্রথম থেকেই এন্টনীর ভারতীয় সনাতন মনটা একটু একটু আপত্তি করতে সুরু করেছিল। তা ছাড়া নারী সম্বন্ধে তার আকর্ষণ যথেষ্ট থাকলেও নারীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে তার মনে ছিল প্রচুর ভয়। কলিবার্জার দেখবার সময় তার মন যতো আপত্তি করেছিল ভিতরে ভিতরে ঠিক ততটা পরিমাণে সে উত্তেজিতও হয়ে উঠেছিল। আণ্ডার গ্রাউণ্ড ক্যাবারিতে এসে যেন আরও বেশী উত্তেজিত হল। কিন্তু মিঃ ভাটিয়া যখন তাকে সুরার গ্লাস এগিয়ে দিলেন সে তা প্রত্যাখ্যান করল দুবার। কয়লা ব্যবসাদার মিঃ ভাটিয়া তাকে কিন্তু একটী পয়সাও খরচ করতে দিলেন না। বললেন—সেকি, আজ সন্ধ্যায় এন্টনী প্যারিসের সমস্ত ভারতীয়ের অতিথি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এন্টনীর মনের ভয় আর বিরূপতা ঘুচে গেল। সুরার আমেজে তার মনে যথেষ্ট আমোদ আর ফুর্তির বান ডেকে উঠতে লাগল।

সুরার ক্রিয়া ইতিমধ্যে তার মাথার মধ্যে দাপাদাপি করতে শুরু করেছে। তার শিরার মধ্যে যেন গলা আগুনের স্রোত বইছে। চোখের পাতা রীতিমতো ভারী হয়ে এসেছে। সারা শরীর ঝড়ের মাঝে জাহাজের মতো টলমল করছে। তার চিন্তা করবার শক্তিও রীতিমতো ঘোলাটে হয়ে এসেছে।

মিঃ ভাটিয়া তার সঙ্গে সমানে গল্প করে যাচ্ছেন প্যারিসের হাল চাল সম্বন্ধে।

—জানেন মিঃ কার্নাডো, আমাদের ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় বদনাম হল যে আমরা ফুর্তি করতে বড় ভয় পাই। দুনিয়ার লোকে যাকে বলে 'এনজয়মেণ্ট', আমাদের ভারতীয়দের তার উপর যেন জন্মগত বিতৃষ্ণা। অথচ এই প্যারিসে দেখবেন।

—ফরাসীদের সবচেয়ে বড় গুণ—ইট্ ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরী। ব্যস্ চুকে গেল এইই এদের ধর্ম মোক্ষ। সারা বিশ্বের লোক এই ফরাসীদের কাছে জীবন উপভোগের মন্ত্র নিতে আসে। এমন জাত আমি আর দেখিনি।

বলতে বলতে মিঃ ভাটিয়ার সুরা নিষিক্ত কণ্ঠ ভিজে গদ গদ হয়ে উঠল। তিনি দু'তুবার রুমাল দিয়ে চোখও মুছলেন: সেটা মদের নেশার চোখে ঝাপ্সা দেখার ফলে অথবা সত্যিকারের ফরাসী প্রীতির জন্য তা বোঝা গেলনা। কিন্তু একটু পরেই বললেন—ফরাসীদের এই কাল্চার জগৎ-বিদিত। আর ফরাসী কালচারের সবচেয়ে বড় অবদান হল এই ভাম্পেন।

ইতিমধ্যে একটী ফরাসী রমণী এসে ফরাসী ভাষায় সম্ভাষণ ভাটিয়া মিঃ করতেই পরিচয় করিয়ে দিলেন এটনীর সঙ্গে। ইনি হলেন আমার ফিয়াঁসে···প্যাত্রিসিয়া, আর ইনি হলেন আমার বহু-পরিচিত ভারতীয় বন্ধু মিঃ কার্নাড়ো।

মহিলাটী হো লালা বলে একটা অদ্ভুত বিস্ময়ের সুর টেনে এটনীর হাত জড়িয়ে ধরলেন। এটনী তার ধোঁয়াটে চোখের দৃষ্টি তুলে দেখল মেয়েটী তরুণী, বয়স পঁচিশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। শরীরের গড়ন সুন্দর। বিশেষ করে তার হাত দুটী নিটোল। বুকের কাছটা অনেকটা খোলা। মেয়েটীর গলায় এক ছড়া বুটো মুক্তোর মালা। তার গণ্ডে অপূর্ব রক্তিমাভা।

মেয়েটী এটনীর হাতের মধ্যে হাত নিয়ে ঈষৎ চাপ দিতেই এটনীর সুরা সিক্ত শরীরের মধ্যে কামনার আগুনটুকু দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। মেয়েটী কিন্তু এটনীর হাত ছাড়ল না। প্রশংসার সঙ্গে বার বার কি যেন বলতে লাগল। মিঃ ভাটিয়া অনুবাদ করলেন—তোমার মতো একজন পুরুষ আর দেখেনি। তারপর যোগ করলেন নিজের কথা—আমার ভয় হচ্ছে ও তোমাকে দেখে এমন মজেছে যে আমার অন্য বোধ হয় উঠল।

প্যাত্রিসিয়ার অনুরোধে এবার তিনজনে গিয়ে বসল পাশের ছোট্ট একটা ঘরে। বারম্যেডকে বলা হল সেই ঘরেই পানীয় দিয়ে যেতে। একটা টেবিলে ঘিরে বসে প্যাত্রিসিয়া অনুরোধ করল—আসুন, দু'খান তাস খেলা যাক।

এটনী তাসের জুয়া জানে না। তাই একটু আপত্তি করতেই মিঃ ভাটিয়া বললেন—শক্ত কিছুই নয়। দু'দান এমনি খেলে নিলেই শিখে যাবেন।

একটু পরেই দেখা গেল এটনী বাজী জিতেছে। প্যাত্রিসিয়া হেসে বললেন—এই আপনার না-জানা। আপনি যে একজন পুরোন খেলোয়াড় তা এবার বুঝেছি।

কিন্তু এটনীর মাথার মধ্যে তখন মদ মাপজোপি এতো বেশী বেড়েছে যে তার কাছে হারজিত সমান। সে স্ফূর্তির সঙ্গে হৈ হৈ করে হাসি আর গান তুলছে। তার শরীরের সমস্ত স্নায়ু তখন ঢিলে হয়ে এলিয়ে পড়ছে।

খেলা চলতে লাগল। পানীয়ও গলার মধ্যে যেতে লাগল অবারিত ভাবে। প্যাত্রিসিয়া আসা থেকে এটনী নিজেই পয়সা দিচ্ছে পানীয়ের। সে তখন নিজেকে ভেবেছে দিল্লীর নবাব বাহাদুর-শার সমজী। কখনও ভাবছে ওমর খৈয়াম। উচ্চৈস্বরে খৈয়াম থেকে অনর্গল কবিতাও আওড়াচ্ছে মাঝে মাঝে।

এক সময়ে হঠাৎ সে দেখল তার ব্যাগ খালি হয়ে গেছে। প্যাত্রিসিয়া বাজী জিতেছে—তার

টাকা এটর্নী দিতে পারল না। মিঃ ভাটিয়ার অমায়িক দৃষ্টি এবার শক্ত হয়ে উঠল। বললেন—ওঃ, এই টাকা নিয়ে এসেছেন প্যারিসে ফুর্তি করতে। চলুন আপনার হোটেলে যাব টাকাটা শোধ করে দেবেন।

সেই অর্দ্ধ অজ্ঞান অবস্থায় এটর্নী জড়িয়ে জড়িয়ে উত্তর দিল—আমার কাছে আর কিছু নেই।

ভাটিয়া চেঁচিয়ে উঠল—বাক্ সে, তুমি ভারতীয় তাই তোমাকে ছেড়ে দিলাম না হ'লে আমি তোমায় পুলিশে দিতাম। এসো পাত্রিসিয়া আমরা যাই। দুজনে চলে গেল ঘরটা ছেড়ে। এটর্নীর মধ্যে যেটুকু শক্তি অবশিষ্ট ছিল নিজেকে ধরে রাখবার তাও চলে গেল। সে হুড়মুড় করে টেবিলের ওপর ভেঙে পড়ল। সঙ্গেসঙ্গে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পরের দিন যখন তার ঘুম ভাঙল তখন সে ভারি অবাক হয়ে গেল। সে শুয়ে আছে একখানা ঘরে যে ঘরের সঙ্গে তার আগেই পরিচয় নেই। সে নিজের মধ্যে আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগল। মাথাটা ভারী ভারী লাগছে। শরীর অসম্ভব ক্লান্ত মনে হচ্ছে। আস্তে আস্তে রাত্রের চিত্রগুলো বিচ্ছিন্নভাবে তার মনে পড়তে লাগল সে বিছানার ওপর উঠে বসল। চারদিক ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। দেখল আসলে এটা একটা রান্নাঘর। একদিকে গ্যাসের উনুন, রান্নার বাসনপত্র রাখা আছে একটা শেল্‌ফে। সে শুয়ে আছে একটা কোচিং খাটে। খাটটা একটা আলমারীর সঙ্গে জোড়া—অর্থাৎ ইচ্ছে করলে খাটটা টেনে গুটিয়ে আলমারীর মধ্যে পুরে রাখা যায়। কিন্তু এ ঘর কার?

ঘরের মধ্যে দুটো বড় বড় জানালা। তার মধ্য দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে। আলোর গতি দেখে মনে হয় এখন বিকেল। ঘরের দরজাটা বন্ধ। সে উঠে গিয়ে দরজাটা খোলার জন্য হাত বাড়াল। এমন সময় দরজাটা বাইরে থেকে খুলে গেল। একটা মেয়ে ভিতরে এল। ইংরাজীতে তাকে অভিবাদন জানাল এটর্নী। মেয়েটিও অভিবাদন ফিরিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ইংরাজীতে শুধাল—এখন কেমন আছেন?

এটর্নী একটু লজ্জার সুরে বলল—ভাল। কিন্তু আমি এ কোথায় এসেছি? মেয়েটিকে দেখে তার মনে হচ্ছিল সে যেন তাকে কোথাও দেখেছে। কিন্তু সে যে কোথায় ও কবে তা কিছুতেই মনে করতে পারছিল না।

মেয়েটি বলল—আমার নাম সোফিয়া ক্লাঁকো। আমি গত রাতে আপনাকে ক্যাবারে থেকে তুলে নিয়ে এসেছি।

হঠাৎ এটর্নীর মনে পড়ল—এই মেয়েটাই তো ক্যাবারের বারমেড ছিল না? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তার মুখে কঠিন হাসি ফুটে উঠছিল বার বার—যতোবার সে শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে আসছিল।

[ক্রমশঃ

উপন্যাস

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

॥ তেরো ॥

সরমা সেই প্রথম এলো কলকাতায়।

তখন 'লিটার-মিটার-কিলো'র কলকাতা নয়। তখন 'ছটাক-সের-মণে'র কলকাতা। এখন যে চালের দাম চল্লিশ টাকা, তখন সেই চালের দাম ছিল ছ'টাকা। কাজেই কলকাতার বাঙালী পাড়ায় সব-চেয়ে বড় হোটেলে গিয়ে উঠতে তাদের আটকায়নি। চারজন মানুষ। জয়নারায়ণবাবু, উমেশ, সরমা আর চিনু—এই চারজনে এসে উঠলো হ্যারিসন রোডের একটি হোটেলে। দু'খানা ঘর নিলে পাশাপাশি। চিনু আর সরমা রইলো একটায়, আর একটাতে থাকলেন জয়নারায়ণবাবু আর উমেশ।

কাগজের টাকা তখনও ওঠেনি, কাজেই জয়নারায়ণবাবুর পকেটে রূপোর টাকার ঝমঝমানি শুনতে পেয়ে হোটেলের একনম্বর সাইড্ ফকির সামন্ত। ফকির গিয়ে হাতজোড় করে বললে: জয়নারায়ণবাবুর কাছে—'চলুন বাবু, গঙ্গাস্নান করে মাকে দর্শন করিয়ে আনি। আজ তাহ'লে এবেলা কালীঘাট, ওবেলা দক্ষিণেশ্বর সেরে আসি। তারপর একে একে যাদুঘর, চিড়িয়াখানা—'

উমেশের সহ্য হলো না। বললে, 'না বাবা, যে জন্যে এসেছি সেইটে আগে। আগে আমাকে টাকি বায়োস্কোপ আর থিয়েটার দেখতে হবে। তারপর ঠাকুর-দেবতা তো আছেনই।'

থামিয়ে দিলেন জয়নারায়ণবাবু। ফকিরকে বললেন, 'না বাবা আমরা সেজন্য আসিনি আমাদের অন্য কাজ আছে।'

ফকির সামন্ত তবু বসে রইলো। বললে, 'তা বেশ তো! আমাকে তো পয়সাকড়ি কিছু দিতে হচ্ছে না। আমি হোটেলের লোক। আপনারা নতুন এসেছেন কলকাতায়। জানেন না তো কলকাতার হাল-চাল,—কোথায় কোন্ জোচ্চোরের হাতে গিয়ে পড়বেন। একেবারে সর্বস্বান্ত করে ছেড়ে দেবে।

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'তা হিক্। তোমাকে সে-সব দেখতে হবে না।'

'সে কি কথা বলছেন বড় কর্তা? দেখতে হবে বই-কি!'—ফকির জিব বের করে মুখে তার

চুপ্ চুপ্ আওয়াজ করলে। বললে, 'হোটেলের একটা রেপ্টিজ্ আছে তো। আপনারা বলজন মিলে বায় করবেন তবে তো এখানে লোকজন আসবে।'

না-ছোড় বান্দা ফকির। ওঠে না কিছুতেই।

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'আমরা এখন যাব হাটখোলায়—সদানন্দ অনাথ-আশ্রমে।'

ফকির বললে, 'তা বেশ তো। গাড়ী ডেকে দিই।'

'তাই দে বাবা, গাড়ীই ডেকে দে।'

ফকির গাড়ী ডাকবার জন্যে যেতে যেতেও ফিরে দাঁড়ালো।—'চেনা গাড়ী ডেকে দিচ্ছি বড় কত্তা, আবার এর গাড়ীতেই ফিরে আসবেন। যতক্ষণ বলবেন দাঁড়িয়ে থাকবে। ওয়েটিং-এর জন্যে কিছু ধরে দিলেই হবে। এখানে এসে ওর নামটা দেবেন। আমি সব ঠিক করে নেবো।'

বলেই আবার ঝুঁকে পড়লো।—'এত কথা কেন বলছি বুঝতেন তো বড়বাবু? সব ব্যাটা এখানে ছুরি শানিয়ে বসে আছে। আপনি গাড়ীর দর করেছেন কি—কুচ্ করে গলাটি কেটে নেবে। তার ওপর হাবে-ভাবে বুঝে নেবে আপনি গ্রাম থেকে এসেছেন—দিন, আপনার একটা ভাল সিগ্রেট দিন। খেতে খেতে চলে যাই!'

একটা সিগ্রেট দিয়ে জয়নারায়ণবাবু তাকে বিদায় করেই ডাকলেন, 'উমেশ, সরমাকে চিনুকে তৈরি হতে বলো।'

তৈরি তারা হয়েই ছিল।

গাড়ী আসতেই সোজা হাটখোলা—একেবারে সদানন্দ অনাথ-আশ্রমের দরজায়। বেশ পেতে হলো না। বড় বড় অক্ষরে লেখা সাইন-বোর্ড ঝুলছিল দোরের মাথার ওপর।

প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু জরাজীর্ণ। দেয়ালের চুনবালি খসে খসে ইঁট বেরিয়ে পড়েছে।

সরমা ভেবেছিল 'অনাথ-আশ্রম' বুঝি কী-না-কি একটা বৃহৎ ব্যাপার। কিন্তু গিয়ে দেখে—পচো বাড়ীর মতন বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে। নীচের বড় বড় ঘরগুলো খালি পড়ে আছে। দোতলায় ওঠবার প্রকাণ্ড সিঁড়ি। তারই ওপর দিয়ে উঠে গিয়ে দক্ষিণদিকের খান-চারেক ঘরে 'সদানন্দ অনাথ-আশ্রমে'র যা-কিছু সব।

ছোট-বড় নানান বয়সের প্রায় পঞ্চাশটি ছেলে তখন জানাহার করে সবে মাত্র দোতালায় উঠে এসেছে।

গৌরমোহন মহা সমাদরে তাদের নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সদাশয় ব্যক্তি তিনি। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলেন এখানে তাঁদের আসবার হেতু। মায়ের মন—ছেলেকে দেখবার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছে। তাই বোধকরি সরমার জন্যেই জয়নারায়ণ'বুকে আসতে বলেছে।

গৌরমোহন ডাকলেন, 'অজয়!'

হাসতে হাসতে অজয় এসে দাঁড়ালো তাঁদের কাছে। অজয়ের পিছু পিছু এসেছিল তারই মত আরও দু'তিনটি ছেলে।

অজয় ছুটে এসে যখন ঝাঁপিয়ে পড়লো তার মায়ের কোলের ওপর, তখন তার সঙ্গী ছেলে তিনটির শোচনীয় অবস্থা। গৌরমোহন তাদের মুখ দেখেই সেকথা বুঝতে পেরেছিলেন। মা নেই, বাপ নেই, আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই তাদের। একটুখানি স্নেহের কাঙাল তারা সকলেই। পথে

কুড়িয়ে-পাওয়া অনাথ বলেই তারা আশ্রয় পেয়েছে এই 'অনাথ-আশ্রমে।' অথচ তাদেরই মধ্যে একজন —এমন সুন্দর একটা মা পেলে কেমন করে?

অনাথ-আশ্রমের আইন অনুযায়ী এটা যে গর্হিত, গৌরমোহন তা বেশ ভাল করেই জানেন। এবং জানেন বলেই চিনুকে এখান থেকে তিনি বিদায় করে দিয়েছেন। আজ যে হঠাৎ আবার এমন একটা অঘটন ঘটে যাবে তা তিনি ভাবতে পারেননি।

ভাবতে পারেননি জয়নারায়ণবাবু তার মেয়েকে নিয়ে এখানে এসে উপস্থিত হবেন।

খুব অস্বস্তি বোধ করছিলেন গৌরমোহন।

চিনুকে ডেকে বললেন, 'এখানকার সবই তো তুমি জানো। অজয়কে আর তার মাকে নিয়ে গিয়ে দেখাশুনো করো। আমি ততক্ষণ এঁদের সঙ্গে গল্প করি।'

এই ছুতো করে তাদের তিনি সরিয়ে দিলেন সেখান থেকে।

জয়নারায়ণবাবুদের তখনও খাওয়াদাওয়া হয়নি। অবেলায় খাওয়া তাঁর চিরকালের অভ্যাস। হয়ত-বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি না খেয়ে গৌরমোহনের সঙ্গে গল্প করতে পারতেন, গল্পটা জেঁকেও উঠেছিল বেশ বড় করে, অথচ গৌরমোহন তখন তাঁদের সরাতে পারলে বাঁচে।

উমেশ বাঁচিয়ে দিলে। বললে, 'আপনি তো মশাই খিদ্যি খেয়ে নেয়ে গল্প করতে বসলেন। আমার আবার খেতে একটু দেরি হলেই মাথা ধরে।'

জয়নারায়ণবাবু কটমট করে তাকালেন উমেশের দিকে।

'তুমি যাও দেখি এখান থেকে। ওঠো।'

উমেশ সত্যিই উঠলো। কিন্তু গৌরমোহন কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন অন্যদিকে। বললেন, 'আপনারা এলেন যখন, একটুখানি বসুন। আমার আশ্রমটা একবার ঘুরে ফিরে দেখুন।'

এই বলে তিনিও উঠে দাঁড়ালেন।

জয়নারায়ণবাবুর গল্প করবার সুযোগ আর হলো না। তাঁকেও উঠতে হলো।

তিনজনেই বাইরের প্রকাণ্ড বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে দেখলেন, অজয়কে নিয়ে সরমা আর চিনু তখন নীচের বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বাগান বলতে এখন আর কিছু নেই। বড় বড় লোহার কয়েকটা বেঞ্চি পড়ে রয়েছে, উঠোনের মাঝখানে রয়েছে ভাঙা ইঁটের একটা মঞ্চ, মঞ্চের মাঝখানে লোহার একটা নল—মনে হয় একসময়ে সেটা জলের ফোয়ারা ছিল।

চারটে ছোট ছোট চাকা-দেওয়া কাঠের কয়েকটা গাড়ী পড়ে ছিল উঠোনে। সরমাকে সেইখানে নিয়ে গিয়ে অজয় বলছিল, 'মা তুমি চড়ে বোসো একটা গাড়ীতে, আমি তোমাকে ঠেলবো।'

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী ওগুলো? ছেলেরা বুঝি খেলা করে?'

গৌরমোহন বললেন, 'না। আপনাকে তো চিঠিতে লিখেছিলাম—সন্তানন্দবাবুর এষ্টেট থেকে আমাদের যে মাসিক বরাদ্দ ছিল সেই টাকাটা গেছে বন্ধ হয়ে। কাজেই আশ্রমটিকে রক্ষা করবার জন্যে আমাকে অনেককিছু করতে হয়। এই গাড়ীতে ছেলেদের চড়িয়ে আমি গান গেয়ে গেয়ে কলকাতার পথে পথে ভিক্ষে করি।'

কথাটা শুনতে বিশেষ ভাল লাগলো না জয়নারায়ণবাবুর। তাঁর নাতি অজয়ও যাকে সেই

ভিক্ষুকের মতো! মনে-মনে ঠিক করলেন—ছেলেটা আর-একটু বড় হোক্, এখান থেকে নিয়ে গিয়ে তখন তিনি তাকে কোনও ইস্কুলের বোর্ডিংএ রেখে দেবেন।

সরমাকে ডাকবেন কিনা ভাবছিলেন তিনি, এমন সময় সরমা নিজেই উঠে এলো দোতলায়। দেখার মতো এখানে আছেই-বা কি?

সরমা এসেই বললে, 'কলকাতায় যে-ক'দিন আছি, অজয়কে আমাদের কাছে নিয়ে গিয়ে রাখি।'

গৌরমোহন 'না'ও বলতে পারেন না, আবার 'হাঁ' বলতেও কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকছে। এই ছুতো করে ছেলেটাকে আর যদি এখানে না পাঠায়! প্রতিমাসে পঞ্চাশটি টাকা বন্ধ হয়ে যাবে।

অনাথ-আশ্রমের ছেলেগুলো উঁকি-ঝুঁকি মারছে। গৌরমোহন একবার সেই দিকে তাকালেন। একবার ধমকে দিলেন তাদের।—'কী দেখছো কি তোমরা? যাও, নিজের নিজের জায়গায় যাও।'

টাকার লোভে বে-আইনী কাজ করেছেন গৌরমোহন। সরমার দিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। আমোই তো মা, যে-সব ছেলের মা-বাপ আত্মীয়-স্বজন আছে, এখানে তাদের রাখবার নিয়ম নেই।'

উমেশ বলে উঠলো, 'তাতে কি হয়েছে! পঞ্চাশটা করে টাকা তো পাচ্ছেন!'

জয়নারায়ণবাবু বলে উঠলেন, 'উমেশ, তুমি আবার কথা বলছো?'

উমেশ বললে, 'না কথা বলিনি। বলছি—ছেলেগুলোকে নিয়ে পথে-পথে ভিক্ষে করানোর চেয়ে ভাল।'

কথাটা সরমার কাছে নতুন। অজয়কে দেখিয়ে বললে, 'এরা রাস্তায় ভিক্ষে করে?'

গৌরমোহন বলে উঠলেন, 'না না, ওরা কেন ভিক্ষে করবে? ওরা এই গাড়ীতে বসে থাকে ভিক্ষে করি আমি।'

এ অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ জয়নারায়ণবাবুর ভাল লাগলো না। বললেন, 'আজ তাহ'লে আসি আমরা। আবার যাবার সময় অজয়কে আপনার কাছে দিয়ে যাব।'

'ক'দিন থাকবেন কলকাতায়?'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'দিন-সাতেক্।'

উমেশকে কিন্তু থামিয়ে রাখা দায়। সে বললে, 'থাকি কাশীতে। কলকাতা আসবো বললেই তো আসা হয় না।'

বলেই সে বোকামি গৌরমোহনকে একটুখানি সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলে বললো, 'আপনি ভাববেন না। অজয়কে আমরা নিয়ে পালাবো না।'

এই বলে সে হাসতে লাগলো।

অজয়ের জামা-কাপড়গুলো গুছিয়ে নেবার জন্য চিনু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'ও-সব থাক্ না এইখানে। আমি আবার কিনে দেবো।'

আশ্রমের বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। সবাই গিয়ে তাইতে চড়ে বসলো।

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'ভাখো উমেশ, কথাবার্তা একটুখানি বুঝেসুঝে বলো।'

অবুঝের মতো কথা সে আবার কখন বললে?

উমেশ হতভম্বের মতো ওঁর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'ছেলে নিয়ে পালিয়ে যাব এখান থেকে' এই কথাটা ওকে বলা তোমার ভাল হলো না।

উমেশ বললে, 'আজ্ঞে না, আমি ত হাসতে হাসতে বলেছি।'

'তাহলেও কথা যখন কইবে, বুঝেসুঝে ক'বো।'

'আজ্ঞে বেশ! তা বলেন ত আমি না-হয় চুপ করেও থাকতে পারি।'

'হ্যাঁ, চুপ করেই থাকো।'

সরমা তার বুকের ওপর অজয়কে চেপে ধরে একদৃষ্টে তার মুখের পানে এতক্ষণ তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়তেই তার বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'কিন্তু বাবা ব্যবস্থাটা তেমন ভাল নয়।'

উমেশ বললে, 'কেন? বেশ ত' রাজবাড়ীর মতন ফাঁকা মাঠ···' বলেই সে জয়নারায়ণবাবুর মুখের পানে তাকাল।

কথাটা হঠাৎ বলে ফেলেই তার মনে পড়ল—বুঝেসুঝে কথা বলবার জন্যে এইমাত্র তিনি তাকে সাবধান করে দিয়েছেন। তার চেয়ে কিছু না বলে চুপ করে থাকাই ভাল।

কিন্তু জয়নারায়ণবাবু এবার তাকে সমর্থন করলেন। বললেন, 'না না, জায়গাটা মন্দ নয়।'

উমেশ নিশ্চিন্ত হলো।

সরমা বললে, 'আমি বাড়ীর কথা বলিনি। বলছি—কিরকম সব মোরো মোরো বিশ্রী বিশ্রী ছেলে রয়েছে···'

জয়নারায়ণবাবু একটু হাসলেন। বললেন, 'মা-বাপ-মরা সব কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে! আহা, কেউ কোথাও নেই বেচারাদের '

কিন্তু ওই তাদেরই সঙ্গী হয়ে তার অজয়কেও সেখানে থাকতে হয়—বোধকরি এই কথাটাই সে বলতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত তা আর বলা হয়ে উঠল না। সরমা চুপ করে রইল।

কলকাতার হোটেলে তারা যে ক'দিন রইল, সরমার দিনগুলো বড় আনন্দেই কাটলো। অজয়কে নিয়ে দিনরাত সে খেলা করে, গান গায়, হাসে আর বুকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে সে কাছ ছাড়া করতে চায় না।

যতই দিন যায় ততই তার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে থাকে। মনে হয়, কাশী ফিরে যাবার দিন তাদের ঘনিয়ে আসছে, এবার হয় ত' বাবা তার কিরে যেতে চাইবেন। কলকাতায় তারা চিরকালের জন্যে থাকতে আসেনি। একদিন অবশ্য যেতেই হবে, কিন্তু অজয়কে ছেড়ে কেমন করে সে যাবে, কে জানে। ভাবতে গেলে চোখ দু'টো তার জলে ভরে আসে। অজয়কে কাছে ডেকে হেসে জিজ্ঞেস করে, 'কিরে দুষ্টু ছেলে, তুই আমার সঙ্গে যাবি না এইখানে থাকবি বল্ দেখি?'

অজয় সে কথার জবাব দিতে পারে না। মার মুখের পানে শুধু ফ্যাল ফ্যাল্ করে তাকায় আর মার মুখে হাসি দেখে নিজেও হাসতে থাকে।

'হাসছিস যে? বল্!'

অজয়ও হাসতে হাসতে মার চিবুকে হাত দিয়ে বলে, 'মা তুমি হাসো, আমার হাসো!'

সরমা গম্ভীর হয়ে বলে, 'না হাসব না। তুমি বল আগে আমায় ছেড়ে যাবে কি না?'

অজয় ঘাড়নেড়ে বলে, 'যাব।' বলে খিস্ খিস্ করে হেসে তার মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মার বুকখানা জুড়িয়ে যায়। অজয়কে দু'হাতে দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে কি যেন সে ভাবে। মনে হয়, এর চেয়ে সুখ বুঝি ইহজগতে আর কিছুই নেই।

আরও দশটা দিন কলকাতায় থাকবার পর অন্নদারাণীবাবু নিজেই সেদিন কাশী ফিরে যাবার প্রস্তাব করলেন,—'আর বেশী দিন থাকা এখানে উচিত নয় মা। প্রকাশ কি মনে করবে কে জানে!'

সরমার বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। মনে হলো, অজয়কে নিয়ে এখন যদি সে কোনোদিকে পালিয়ে যায় ত বেশ হয়। কিন্তু পালিয়ে যাবার বাধা অনেক। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে তার এই রূপ-যৌবন নিয়ে পথে দাঁড়ানোর বিপদ আছে। কাজেই সে-কথা তার না ভাবাই ভালো।

কাশী তাকে ফিরে যেতেই হবে। এবং যেতে হবে অজয়কে এইখানে ফেলে রেখে। সরমা বললে, 'থিয়েটার দেখা ত' কেদিনের বেশী হলো না বাবা, আজ আর একবার থিয়েটার দেখে আসি চল।'

কিন্তু সেদিন সোমবার। থিয়েটার দেখতে হলে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত থাকতে হবে তা সে জানে। জেনেই কথাটা সে বলেছিল। শুধু যদি থিয়েটারের নামে ক'দিন থাকা যায়।

তাই-ই হলো। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এখানে থেকে, স্থির হলো শুক্রবার সন্ধ্যের গাড়ীতে তারা কাশী ফিরে যাবে।

অন্নদারাণীবাবু বললেন, 'আর কি কি তোর দেখবার ইচ্ছে খুন্। শুক্রবার মধ্যে সব সেরে ফেলতে হবে।'

সিনেমা দেখা শেষ হয়েছে, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর দেখেছে, দক্ষিণেশ্বর, কালীঘাট, পরেশনাথ কিছুই দেখতে তাদের বাকি নেই।

সরমা দিনরাত কত কথাই না ভাবে। ভাবে এখন হঠাৎ যদি তাদের কারও অসুখ কিছু হয়ে পড়েত' ভাল হয়। কিম্বা ওই দাড়িওয়ালা উমেশ কাকা বোকা মানুষ, কলকাতার ভিড়ের মধ্যে কোনোদিন পথ হারিয়ে ফেলে যদি ত আরও ভালো। তাহলে এখানে আরও দিনকতক থাকবার মেয়াদ হয় ত' বাড়ে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হলো না। অসুখেও কেউ পড়ল না, উমেশ কাকাও পথ হারালো না। দেখতে দেখতে বৃহস্পতিবার এসে গেল। আজ রাতটা তাদের থিয়েটার দেখে কাটবে, কাল রাত্রে যাওয়ার বন্দোবস্ত।

শুক্রবার সকাল থেকে সরমা শুধু কাঁদতে লাগলো। কাঁদতে লাগলো তার বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে। অজয়ের মুখের পানে তাকায়, আর ঝর্‌ঝর্ করে দুচোখ বেয়ে জল ঝরে!

চিনু বললে, 'চুপ কর দিদিমণি, ছি, এ তুমি করছ কি?'

'আমি যে কিছুতেই নিজেকে সাম্‌লাতে পারছি না চিনু!'

চিনু বললে, 'ছেলে কি কারও বিদেশে থাকে না? অজয় যখন বড় হবে তখন যদি পড়বার জন্যে বিদেশে যায়, তাহলে কি করবে তখন?'

সরমা চুপ করে রইল। চিনু ঠিকই বলেছে। বিদেশে থেকে ছেলে তার পড়াশুনা করছে এই কথাই সে ভাববে।

অজয়কে অনাথ-আশ্রমে রেখে আসবার সময় সরমা কেঁদে কেটে সে এক ভীষণ কাণ্ড করে বসল। অন্নদারাণীবাবু এক ধমক্ দিয়ে তাকে চুপ করিয়ে দিলেন।

আগে যদিই বা চিনু ছিল অজয়ের কাছে, এখন আবার তাও থাকবে না। অজয়কে একাই থাকতে হবে।

শেষ পর্যন্ত তাই হলো। অজয় রইলো অনাথ-আশ্রমে, আর সরমাকে নিয়ে জয়নারায়ণবাবু ও উমেশ হাওড়া ষ্টেশনে চলে গেল।

কাশী পৌঁছল পরদিন সন্ধ্যায়।

জয়নারায়ণবাবু ভেবেছিলেন, আজ আর সরমা হয়ত বেলুপুরায় যেতে চাইবে না। কিন্তু ষ্টেশনে নেমেই সরমা বললে, 'আমায় বেলুপুরায় রেখে এসো বাবা।'

'আজই যাবি?'

'হ্যাঁ বাবা, আজই যাব।'

ভাল কথা। ছেলেকে একবার দেখে এসে মনের অবস্থা বোধ হয় তার ভাল হয়ে গেছে ভেবে তক্ষুণি একটা গাড়ী ডেকে সরমাকে নিয়ে তিনি তাতে চড়ে বসলেন, উমেশ জিনিষপত্র নিয়ে জয়নারায়ণবাবুর গাড়ীতে চলে গেল।

প্রকাশের দরজায় গাড়ী নিয়ে দাঁড়াতেই একজন চাকর ছুটে এল। জিনিষপত্র নামিয়ে সরমা নিজেও নামল।

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'আমি তাহলে আসি মা।'

'হ্যাঁ বাবা, তুমি যাও।'

'প্রকাশের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হতো না?'

সরমা ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

সরমা ভেবেছিল, স্বামী হয়ত এতদিন পরে তাকে দেখেই ছুটে আসবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে গিয়ে দেখলে, প্রকাশ একটা সোফার ওপর শুয়ে কি যেন পড়ছে। তাকে দেখে উঠে বসা দূরে থাক্, একটা কথাও সে জিগ্যেস করলে না। মুখখানা অসম্ভব রকম গম্ভীর।

সরমাই আগে কথা কইলে। কাছে গিয়ে বললে, 'রাগ করেছ নাকি?'

প্রকাশ বই থেকে মুখ না তুলেই বললে, 'হুঁ।'

'কেন? কি অপরাধ?'

'অপরাধ?'—প্রকাশ বললে, 'জামা-কাপড় ছেড়ে স্নান-টান করে এসো। বলছি।'

সরমা ভেবেছিল বুঝি প্রকাশ তার সঙ্গে রসিকতা করছে। হেসে বললে, 'না। তোমাকে এক্ষুণি বলতে হবে।'

প্রকাশের মুখে কিন্তু হাসি দেখা গেল না। তেমনি গম্ভীর হয়েই বললে, 'না, আমি এখন বলবো না। সারারোড ট্রেণে এসেছ।'

হঠাৎ হাসির শব্দে জোরের দিকে মুখ ফিরিয়েই বললে, 'ওই ছাখো, মতিয়া তোমাকে ডাকছে। যাও।'

সরমাকে বাধ্য হয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হলো।

'তোর দাদাবাবুর কি হয়েছে রে?'

মতিয়া তেমনি হাসতে হাসতে বললে, 'তা আমি কেমন করে জানবো বৌদি! আমি তো এখানে ছিলাম না।'

'কোথায় ছিলি?'

মতিয়া বললে, 'মার কাছে।'

সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সরমার। জিজ্ঞাসা করলে, 'মার কাছে যেন?'

আবার সেই হাসি।—'না বাবা, একা-একা দাদাবাবুর কাছে থাকতে আমার ভয় করে।'

[ক্রমশঃ

বীরবলের কৌতুক

বররুচি

সম্রাট আকবর এক কবিরাজের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন। তিনি তাকে রাজপ্রাসাদের অন্যতম বৈদ্য, অর্থাৎ রাজবৈদ্য আখ্যা দিয়েছিলেন। রাজবৈদ্যটির সঙ্গে বীরবলের তেমন সদ্ভাব ছিল না। বীরবল জানতেন বৈদ্যটির আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই। তিনি তাকে উপহাস ক'রে বলতেন, 'বৃহৎ অট্টালিকায় ঘণ্টাজ মহাপ্রভু—।' বৈদ্যটি সেকারণে বীরবলকে দু'চক্ষে দেখতে পারতো না।

একদিন অপরাহ্ণ বেলায় সম্রাট বীরবলকে ডেকে পাঠালেন। সম্রাট একাকী ছিলেন। বীরবল হাজির হতে বললেন—পেট্! বড় অসুখ করেছে আমার।

—কি হয়েছে জাঁহাপনা।

—পেটে বড় ব্যথা। বোধ হয় হজমের গোলমাল। রাজবৈদ্যকে ডেকেছিলাম। সে তো এক অদ্ভুত ব্যবস্থা দিয়েছে।

বীরবল বললেন—কি রকম ব্যবস্থাপত্র।

—ষাঁড়ের দুধ!

সবিস্ময়ে বীরবল বললেন—ষাঁড়ের দুধ; সে আবার কি!

মাথা নেড়ে সম্রাট বললেন—আর বল কেন; আমি বললাম, ষাঁড়ের দুধ হয় না। রাজবৈদ্য বলছে—হয়, আর সেই দুধ না খেলে নাকি আমার বেদনা সারবে না। খুব শিগগির সেই দুধ চাই। আমি বললাম, ষাঁড়ের দুধ জোগাড় করা অসম্ভব। তাতে বৈদ্য কি বললে জানো?

—কি বললে?

—বললে, বীরবল নিশ্চয়ই জোগাড় করতে পারবেন। তাঁর অসাধ্য কিছু নেই। তিনি তো নিজেকে একজন মস্ত ওস্তাদ বলে মনে করেন।

বীরবল বুঝলেন এ হচ্ছে রাজবৈদ্যের চালাকি! তাঁকে জব্দ করার ফন্দী! বীরবল তাকে যে উপহাস করেছিলেন তারই প্রতিশোধ নিতে চায় সে তাঁকে বাদশার কাছে অপদস্থ ক'রে।

বীরবল বাদশাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বললেন—ষাঁড় কি কখনো দুধ দিতে পারে জাঁহাপনা! রাজবৈদ্য নিশ্চয় গাভীর দুধের কথা বলেছে।

সম্রাট বললেন—কি আশ্চর্য, আমি কি এতই বোকা যে একথাটা বুঝতে পারবো না। আমি বৈদ্যকে জিগগেস করেছিলাম যে ষাঁড়ের দুধ না গাভীর দুধ। তাতে তিনি বললেন, ষাঁড়ের দুধ। তোমার তো অসাধ্য কাজ কিছু নেই। সুতরাং নিশ্চয় তুমি জোগাড় করে আনতে পারবে ষাঁড়ের দুধ।

বীরবল মহামুস্কিলে পড়লেন। বাদশাজাদী সম্রাটের সঙ্গে তর্ক করে কোন লাভ নেই। একবার যখন জেদ ধরেছেন তখন শেষ পর্যন্ত কয়সালা না হলে নিরস্ত হবেন না। ষাঁড়ের দুধ! তাজ্জব কথা। আচ্ছা, যে-কোন দুধ এনে যদি বলা যায়, এই হচ্ছে ষাঁড়ের দুধ, উঁহু তা চলবে না। সামনে দুয়ে দেখিয়ে দিতে হবে।

না: ! এবার বোধ হয় বীরবলকে মাজেহাল হতে হল।

চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরলেন বীরবল।

• • • •

বীরবলের একটি মেয়ে ছিল। বছর তেরো চৌদ্দ বয়েস। কিন্তু বুদ্ধিতে আর চালাকিতে বুড়ো-বুড়িদের হার মানায়। বাপের চিন্তাক্লিষ্ট মুখ দেখে মেয়ে বললে—দরবারে আজ কি হল বাবা ?

—কিছু তো হয়নি। কেন বল্‌তো ?

মেয়ে কথা ঘুরিয়ে বললে—না, এমনি বলছি। ভাবলুম বুঝি, কেউ তোমায় কিছু বলেছে।

—কেন তোর একথা মনে হল ?

কন্যা পিতার কাছে সরে এসে বললে—আজ তোমার মুখখানা বড় গম্ভীর। মনে হচ্ছে কিছু যেন হয়েছে, বাদশা কিছু বলেছেন বুঝি ?

বীরবল বললেন—দরবারে রোজই কিছু না কিছু ঘটে। তাই তোকে তা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

—উঁহু। আজ বোধ হয় গুরুতর কোন কিছু ঘটেছে, আমায় বলনা বাবা।

বীরবল ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন—তুমি শুনে কী করবে ? আমার মাথাতেই ঢুকছে না, তা তুমি তো কচি বাচ্চা।

মেয়ে নাছোড়বান্দা—তা হোক, তুমি বল ! জানতো অনেক সময় বড় তলোয়ারে যেকাজ হয় না, ছোট ছুরি দিয়ে তা হয়।

বীরবল মেয়ের উত্তর শুনে ক্ষণেক তার মুখের পানে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—আচ্ছা, তাহলে শোন।

এই বলে তিনি ষাঁড়ের দুধের ব্যাপারটা কন্যাকে বললেন। বাদশার খেয়ালের সঙ্গে পারবার জো নেই। এখন এই ষাঁড়ের দুধ জোগাড় না করতে পারলে তো বীরবলের মহা বিপদ।

পিতার বিপদের কথা শুনে কন্যা বললে—তুমি ভেবো না বাবা। আমি এর ব্যবস্থা করব।

বীরবল বললেন—হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে। বলে, আমার মাথাতেই কিছু আসছে না, আর তুই এক কোঁটা মেয়ে ··

মেয়ের নাম চম্পাবতী। বাপ ডাকেন চাঁপা বলে। তাঁর কথার বাধা দিয়ে মেয়ে বললে—একবার এই এক কোঁটা চাঁপাকে বিশ্বাস করেই দেখ না।

• • • •

কয়েকদিন পরের কথা।

দিল্লী প্রাসাদের মধ্যে সম্রাটের মহলটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। একেবারে এক টেরে, তার পিছনে প্রকাণ্ড বাগান। সেই বাগানে ছিল একটি পুকুর। সেই দিককার গ্রামে জলকষ্টের সময় গ্রামের মেয়েরা সেই পুকুর ব্যবহার করত। সম্রাটের বিশেষ অনুমতি ছিল।

রাত তখন দ্বিতীয় প্রহর। সম্রাট সবে নৈশ-ভোজ সমাধা করে পূর্ব দিকের অলিন্দে বসে আলবোলায় তামাকুট সেবন সুরু করেছেন এমন সময় পুকুরের পাড়ে ঝপাঝপ ঝপঝপ শব্দ শোনা গেল।

এত রাত্রে পুকুরে কে কি করছে ?

কৌতূহলী হয়ে সম্রাট একজন প্রহরীকে ডেকে ব্যাপারটা দেখতে বললেন।

পুকুরে এসেছিল বীরবলের মেয়ে চম্পাবতী।

তার হাতে এক বোঝা ময়লা কাপড় চোপড়। সেগুলোকে পুকুরের পাড়ে রেখে এক একটা ক'রে কাপড় জলে ফেলছে আর তার পর তাকে তুলে পাড়ের ওপর আছড়ে আছড়ে পরিষ্কার করছে; সঙ্গে সঙ্গে মুখের শব্দ করছে, ছাশ্, ছাশ্, ছাশ্, ছাশ্।

প্রহরী এসে দাঁড়াল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল—কে তুমি? এখানে কি করছ?

চম্পাবতী উত্তর দিল—চোখ নেই? দেখতে পাচ্ছো না? আমি মেয়েলোক। ময়লা কাপড় চোপড় ধুয়ে সাফ করছি।

—এত রাত্রে কি কাপড় কাচবার সময়?

—আমি যখন সময় পাই তখনই আমার সময়।

প্রহরী বললে—তুমি সম্রাটের বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছো। জানো এ কত বড় অপরাধ।

—না, জানি না।

প্রহরী বললে—দেখছি তুমি এক ঢোঁটা মেয়ে। কার মেয়ে তুমি?

—আমার বাবার মেয়ে?

—কে তোমার বাবা?

—আমার মার স্বামী।

প্রহরী চটে গেল, রাগে গরগর ক'রে বললে—তোমার বড় চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। চল, সম্রাটের কাছে।

—বেশ তো চল।

প্রহরী চম্পাবতীকে সম্রাটের সামনে হাজির ক'রে আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করলে। শুনে আকবর রেগে উঠলেন—তোমার আস্পর্ধা তো কম নয়। কে তুমি! এত রাত্রে একলা পুকুরে এসে কাপড় কাচছো কেন?

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে চম্পাবতী বললে—মহামান্য সম্রাট! আমি আমি···

অসহিষ্ণুকণ্ঠে বাদশা বললেন—বল কি বলতে চাও।

মেয়েটা তবুও কাঁপছে—সম্রাট···আমি···

তার অবস্থা দেখে আকবরের অন্তরে করুণার উদ্রেক হল। কোমল কণ্ঠে বললেন—ভয় নেই। তুমি খোলসা করে বল, কেন এমন অসময়ে তুমি পুকুরে কাপড় সাফ করতে এসেছো। যদি বুঝি তোমার কথা বাজে নয়, তাহলে কিছু বলব না। তা নাহলে তোমায় শাস্তি পেতে হবে।

চম্পাবতী কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিলে—জাঁহাপনা! বাধ্য হয়েই আমাকে এমন সময় পুকুর ঘাটে আসতে হয়েছে।

—বাধ্য হয়েই? কে তোমায় বাধ্য করেছে?

—কেমন করে বলব হুজুর! চম্পাবতী বললে—আজ দুপুরবেলা আমার মা একটি ছেলে প্রসব করেছেন।

কি বললে? যেন বিদ্যুতের শক্ খেয়ে সোজা হয়ে বসলেন আকবর। মেয়েটা বলে কি!

চম্পাবতী বললে—আমার বাবা একটি ছেলে প্রসব করেছেন আজ দুপুরবেলা। সারাদিন ঘর দোর পরিষ্কার করে, রাতের বেলা কাপড় চোপড় কাচতে এসেছি, জনাব।

আকবর উচ্চকণ্ঠে হেঁকে উঠলেন—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! নাকি, তুমি আমার সঙ্গে তামাসা করছ! পুরুষ-মানুষ ছেলে বিইয়েছে একথা কে কবে শুনেছে!

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে মেয়েটি বললে—আজকাল এই রকম তাজ্জব ব্যাপার ঘটছে জাঁহাপনা!

—কি রকম!

—এই আমাদের শহরেই ঘটছে।

—কি ঘটছে? খুলে বল।

দু'হাত জোড় করে চম্পাবতী বললে—যদি ষাঁড়ে দুধ দেয়, তাহলে পুরুষ-মানুষেই বা প্রসব করবে না কেন! আমাদের শহরে আজকাল নাকি ষাঁড়েও দুধ দিচ্ছে!

—কে বললে ষাঁড়ে দুধ দিচ্ছে?

—রাজবৈদ্য বলেছেন, জাঁহাপনা।

মেয়েটার কথা শুনে, আকবর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন। তারপর বললেন—বীরবল পেটের সঙ্গে কি তোমার সম্পর্ক আছে? তুমি তার কে হও!

—মেয়ে হই জাঁহাপনা!

—তাই বল। আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন আকবর। তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। হাসি সম্বরণ করে গম্ভীরমুখে বললেন—আচ্ছা বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে তোমার বাবাকে বল যে তার কাছ থেকে আমি ষাঁড়ের দুধ পেয়ে গেছি। এবং সে-দুধ সদ্য-দুহিতা তোমার বাবার বাচ্চাকে খাওয়াতে হবে।

মেয়ে ছাড়বার পাত্রী নয়, বললে—খোদাবন্দ্! বাবা আমার কথা হয়ত বিশ্বাস করবেন না। বকুনি দেবেন। আপনি যদি একটি পুরজা লিখে দেন···

—আচ্ছা দিচ্ছি। বলে সম্রাট আকবর সেইখানেই লেখার সরঞ্জাম আনিয়ে ষাঁড়ের-দুধ-প্রাপ্তি স্বীকার করে এক রসিদ লিখে দিলেন। চম্পাবতী সেই রসিদ নিয়ে বাড়ি ফিরল।

বীরবল মেয়ের মুখে ঘটনা শুনে আর আকবরের নিজের হাতে-লেখা কাগজ দেখে প্রথমটা বিস্ময়ে হতবাক হলেন, তারপর বারংবার কন্যার অসামান্য বুদ্ধিমত্তার তারিফ করলেন।

পরদিন সকালে বীরবল সম্রাটের সেই স্বীকৃতিপত্র নিয়ে রাজবৈদ্যের কাছে গিয়ে পত্রখানি তাকে দেখালেন। পুরজা দেখে বৈদ্যের চোখ কপালে উঠল!

———

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

দেশপ্রেমিক আইরিশ সুইফট্

অমল হালদার

জোনাথান সুইফট্ (১৬৬৭-১৭৪৫) প্রতিভাধারী, কিন্তু ভাগ্যবশে বিক্ষুব্ধচিত্ত আর বঞ্চিত আত্মা। আয়র্লণ্ডে তাঁর জন্ম, জাতিতে তিনি ইংরেজ। বাল্য থেকেই মাতা ও পিতার সঙ্গ থেকে সুইফট্ বঞ্চিত হন। আশানুরূপ শিক্ষার সুযোগও কিন্তু প্রথম জীবনে তিনি পাননি, তাই পাদ্রীর কাজই গ্রহণ করেন, তাতেও ইংলণ্ডে আশানুরূপ পদ প্রতিষ্ঠা পেলেন না। লেখক বা মনস্বীদের তখনো পদোন্নতি হত হুইগ্ বা টোরি কোনো রাজনৈতিক দলের মুরুব্বিদের কৃপায় শুধু ব্যক্তিগত শিক্ষা-দীক্ষার বলে নয়। অষ্টাদশ শতকেই অবশ্য লেখা দিয়ে জীবিকার্জন চলে, ডিফো প্রভৃতি করেছেন। কিন্তু এ্যাডিসন্, সুইফট্, পোপ প্রভৃতি সকলেরই ভাগ্য ছিল এসব দলের মুরুব্বিদের উত্থান-পতনের সঙ্গে গাঁথা। রাজনৈতিক সতরঞ্চখেলায় অষ্টাদশ শতাব্দীর এ-সব দল ও মুরুব্বিদের কিছুই বাধত না।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বৃটিশ পার্লামেণ্টের আসন ও ভোট ছিল প্রকাশ্য বেনাবেচার পণ্য; তারপরও তা বিত্তবানদেরই চারজিতের খেলা -দেনা পাওনাটা চলে অবশ্য নেপথ্যে। তাই হেতু সুইফট্-এর বন্ধুর অভাব ছিল না। প্রতিভা ছিল হিংস্র, কিন্তু তরুণ ও আদরের জিনিস তিনি ধর্মনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে তাঁর কঠিন মানব-বিদ্বেষী শ্লেষ ও বিদ্রূপ অজস্র বর্ষণ করেছেন। চার্চেও তাঁর সুযোগ সুবিধা তাঁর জুটল না। জীবনের শেষদিকে আয়র্লণ্ডের স্বপক্ষে তিনি তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যান, সেই সূত্রে ইতিহাসে 'আইরিশ পেট্রিয়ট' বা 'দেশপ্রেমিক আইরিশ' বলে এই ইংরেজ সন্তান সুইফট্-এর খ্যাতি।

সুইফ্‌টের গ্যালিভারস ট্র্যাভেলস (ইং ১৭২৬-এ) বেনামী লেখা। আজব রাজ্যের কথা লেখা একটা বহু পরিচিত পদ্ধতি, বহুদিন থেকে বহু লেখক তা লিখেছেন। মাত্র ৭ বৎসর পূর্বে (খ্রীঃ ১৭১৯) ডিফোর 'রবিনসন্ ক্রুসো' বেরিয়েছে; কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত, বা সেই পদ্ধতি থেকে গ্যালিভারস-এর মূল খুঁজলে বিষম ঠকতে হয়। কারণ, গ্যালিভারস ট্র্যাভেলস্-এর মূল আছে একটিমাত্র স্থানে, সুইফট্-এরই মনে তাঁর প্রতিভার, সে প্রতিভার ভাগ্যতাড়িত বিকৃতিতে ও বিপর্যয়ে গ্যালিভারস্-এর দুটি ভ্রমণ কাহিনী আমাদের আবাল্য পরিচিত লিলিপুট বা বামন-সংঘ ও ব্রবডিঙ্‌নাগ বা দানব সংঘ। সুইফ্‌ট্-এর নিগূঢ় অভিপ্রায় না জানলেই বা কি? এই দুই আজগুবি উপাখ্যান ঘটনায়, ভাষায়, হাস্যে-ব্যঙ্গে সকলেরই আবাল্য উপভোগ্য। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ ভ্রমণ বৃত্তান্ত দু'টিতে পৌঁছলে বুঝি সুইফ্‌ট্-এর অভিপ্রায় ভুলবার উপায় নেই। সেই তৃতীয় ভ্রমণ লাপুটানদের (Laputan) রাজ্যে সেটা ঘোর বুদ্ধিহীন উন্মাদ বার্ণনিকদের সমাজ। চতুর্থ যাত্রা একেবারে মনুষ্য রাজ্যে ছড়িয়ে বিশ্বলোক হুইহ্নম্ ও ইয়াহুদ্দের সমাজে। হুইহ্নম বা অশ্বজাতির তুলনায় ইয়াহু বা মানুষরা যে সকল রকমেই নিকৃষ্ট সে বিষয়ে সুইফট্ আর সন্দেহ রাখেননি। তাই 'গ্যালিভারস ট্র্যাভেলস্' শুধু রূপক নয়; রূপকাকারে সুইফট্-এর মানবতা অবিশ্বাসের দর্শন, আর সেই সঙ্গে সুইফট্-এর দৈহিক এবং মানসিক বিপর্যয়েরও শোচনীয় ইতিহাস।

প্রথম দুই ভ্রমণ কাহিনীতে সুইফট্ কতকটা চিত্তের তারল্যে মজায় মেতে দেখিয়েছেন মানব-জগতের দুই রূপ। তার বাস্তব রূপ একবার দেখছেন অতিকায়ের মাপায়, আর একবার নেতৃকায়ের মাত্রায়। একদিকে সমাজ সভ্যতার যা নিয়ে মানুষের অতি গর্ব, এত বাহাদুরি, তা হয়ে দাঁড়ায় বালখিল্যদের হাস্যকর খেলা। স্বার্থসিদ্ধি কৃতঘ্নতা, পরস্বাপহরণ এ সবই লিলিপুটদের স্বভাব! অন্য এক প্রেক্ষপটেও দেখলেন বাইরে থেকে বিরাট (বাট হাজ গ্রেট) বলে তাদের মনে হয় বটে। কিন্তু সেই বিরাট মানুষেরও লক্ষ্যটা কি?

নীচ স্বার্থ-বুদ্ধি, অহঙ্কার নির্বুদ্ধিতা এ সবই তাদের অন্তরের রূপ। তৃতীয় কাহিনীতে ভিক্তত্ব-স্পষ্ট-দার্শনিকদের পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধিতে সুইফট্ দেখেছেন নির্বুদ্ধিতা ও দুর্বুদ্ধির প্রবঞ্চনা বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক অল্পনা কল্পনা আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবনমাত্র। চতুর্থ ভ্রমণ কাহিনী যখন লিখেছেন তখন তাঁর ক্ষোভ ও অসহ্যতা আরও উৎকট। মানব-অবজ্ঞা তখন মানব বিদ্বেষে পরিণত; ওদিকে তখন অবশ্য 'ইেলা' মৃত্যুমুখে। তাই মানুষের রূপকেও আর মানুষের হীনতাকে সুইফট্ প্রকাশ করতে অস্বীকৃত। টেনে মানুষকে নামালেন ঘোড়ার রাজ্যে। যুক্তিযুক্ত জীবনযাত্রার যে সামর্থ্য মানুষের নেই তা আছে বরং দার্শনিক অশ্বজাতির, সেই চতুষ্পদেরও অধম এই বিপদ জীব। তাকে বিদায় করলেন ঘোড়ার চাঁট খাইয়ে।

পোপকে সুইফট্ বলেছিলেন, "I heartily hate and detest the animal called man." সমস্ত বিশ্বজগতের প্রতি এই যে সুইফট্-এর পদাঘাতের কারণ কি তাঁর আপনার দৈহিক-মানসিক ব্যাধি, জীবনব্যাপী নৈরাশ্য ও যাতনা? না শুধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নয়, সেদিনের রাষ্ট্রে সমাজে ও ধর্ম শাসনের মিথ্যাচার? হয়তো সবই। তবে সুইফট্ যাই বলুন, যুগটা অন্ধকারের যুগ নয়, আসলে মধ্যশ্রেণীর আত্মগঠনের যুগ। তাই বলে শাসকচক্রের মিথ্যা কথা নয়। যুগের মধ্যে, তাও ছিল। আমাদের দেশেও কি আমরা এখন—কাল ও দেশের দূরত্ব সত্ত্বেও অনুরূপ একটা পরিস্থিতি দেখছি? এখনো তো পৃথিবীতে আছে বহু অমর 'এক্সিষ্টেন্শিয়ালিস্ট্' (Existentialist) মনস্বী। যদিও এদিকে মানুষের বিজ্ঞান করছে মহাকাশ-জয়। ইতিহাসের প্রেক্ষপটে তাকিয়ে কেউ এখন সুইফট্-এর এই বিশ্ব-বিদ্বেষকে যুগ লক্ষণ বলে স্বীকার করে না। অনেকে আবার মনে করে, এ হচ্ছে বরং সুইফট্ যুগোত্তীর্ণ যুক্তিবাদের প্রকাশ—যুগের সঙ্কীর্ণ যুক্তি ও স্বার্থের বিরুদ্ধে। সকলেই মান্য করে সুইফট্-এর শক্তিকে, প্রতিভাকে। এমন কি, সমবেদনা বোধ করে এই ক্লিষ্ট মানব বিদ্বেষী মানবাত্মার জন্য। তাঁর শক্তি ছিল, মনও একেবারে কর্কশ ছিল না, আর তার মনের বিষও পোপ প্রভৃতির মতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে যাদে তিনি উদ্গীরণ করেন নি; তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মানব-বিচারে।

আসলে তাঁর মাপকাঠি মধ্যবিত্তের 'সুবিধাবাদী-যুক্তির' মাপকাঠি নয়, তার চেয়ে অনেক বৃহৎ মানব-যুক্তির মাপকাঠি। তাই যেহি এই তিক্ততা সত্ত্বেও তিনি আয়র্লণ্ডের স্বপক্ষে অজস্র বাণবৃষ্টি করে গিয়েছেন বৃটিশ শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে। সেই উপলক্ষেই লিখেছিলেন ওরূপ আর এক উৎকট শ্লেষ নিবন্ধ—এ 'মডেষ্ট প্রোপোজাল' (A Modest Proposal): আয়র্লণ্ডের লোকসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্য লেখকের সামান্য প্রস্তাব এই যে, আইরিশ শিশুদের কেটে রান্না করে ইংলিশ প্রভুদের পরিবেশন করা হোক। এ শ্লেষও নিশ্চয়ই মাত্রাতিরিক্ত।

সুইফট্-এর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'গ্যালিভারস ট্র্যাভেলস' (Gulliver's Travels) 'গ্যালিভারের ভ্রমণকথা' তা না বললেও চলে। কিন্তু প্রথম তাঁর প্রতিভার সূচনা 'এ টেল্ অব্ এ টিউব' (A tale of a tube) দিয়ে খ্রীঃ ১৬৯৯ এ লিখিত হলেও তা খ্রীঃ ১৭০৪-এ প্রকাশিত হয়। সুইফট্-এর সব দোষ গুণ তাকেও একটু, দোষ প্রাণঘাতী বিদ্রূপের নেশা, গুণ অসামান্য প্রাণশক্তি। আর এ গ্রন্থে তাঁর প্রতিভা যেমন স্বচ্ছন্দ এমন আর কোথাও নয়—তাঁর কালের খ্রীষ্টীয় ধর্ম সম্প্রদায় তিনটির বিবাদ বিরোধ যে কত নিরর্থক ও মিথ্যা, কোনটিরই যে আসল উদ্দেশ্য ধর্ম নয় বরং বিপরীত এ কথাই রূপকাকারে এ গ্রন্থে বলেছেন সুইফট্।

তিনি নিজে এর একটি গোষ্ঠীর পাদ্রী, নিজের গোষ্ঠীর পক্ষ টেনেই কথাও বলেছেন; তবু সম্প্রদায়গত ধর্ম যে তাঁর দৃষ্টিতে কত ধর্মহীন জিনিস তা গোপন থাকে নি। স্বভাবতই এ মানুষের চার্চে পদোন্নতি ঘটা সহজ নয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ সেই সঙ্গেই (১৭০৪) প্রকাশিত হয়। সমসাময়িক কালের তর্ক ছিল চিরায়ত বিদ্যা, না আধুনিক নূতন বিদ্যা; এই তর্ক বিষয়ের উপরই তা লিখিত, সুনিপুণ একটি ব্যঙ্গ রচনা। 'দি ব্যাটল অব দি বুক্স্'—এও তিনি অবশ্য প্রাচীনদের পক্ষে। কিন্তু ঈর্ষা, মূঢ়তা অহমিকা—দু পক্ষেই তিনি দেখেন সমান। পক্ষ প্রতিপক্ষ দুদলের পণ্ডিতদের সুতীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে জর্জরিত করাই ছিল সুইফট্-এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

'গ্যালিভারস্ ট্র্যাভেলস্' প্রকাশিত হয় ইং ১৭২৬-এ, বাকে ইং ১৭২৪-এ প্রকাশিত হয় 'দি ফ্রেশিয়ার্স-লেটার্স'। ফ্রেশিয়ার এই ছদ্মনামে সুইফট্ আয়র্লণ্ডের স্বপক্ষে দুঃসহ আলাময় বিদ্রূপ বাণ নিক্ষেপ করেছিলেন পুস্তিকার পর পুস্তিকায়। সে সবের উপলক্ষ এখন বিস্মৃত, কিন্তু পত্রগুলি সুইফট্-এর শক্তির বিষম সাক্ষী। কি উন্মত্ত ক্রোধ যে তাঁকে আয়র্লণ্ডের ব্যাপারে পেয়ে বসেছে তার প্রমাণ। দুটি তরুণী "ষ্টেলা" (খ্রীঃ ১৭১০ থেকে) ও 'ভানেসা' খ্রীঃ ১৭১৩ তাঁর জীবনে কোমলভাবের সঞ্চার করেছিল তাঁর Journal to Stella এবং Cadenus and Vanessa থেকে বোঝা যায় তা ছিল নীতি-শুদ্ধ প্রেম। অন্তরের দ্বিধতার অতিরিক্ত, শিশুসুলভ ক্রীড়াচপলতায় আবোলিত। কিন্তু অবস্থার চক্রান্তে সেই প্রীতিও বিনষ্ট হয়ে যায়; সে দুর্ভাগা এই প্রতিভাবান্ পুরুষের বিনষ্টির অন্যতম কারণও হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত পীড়াগ্রস্ত সুইফট্ মস্তিষ্ক বিকৃতিতে তিন বৎসর ভুগে মারা যান ১৭৪৫-এ। কতটা তা জীবনের ষড়যন্ত্র, কতটা স্বভাবের বিধান কে বলবে? কিন্তু এভাবে ব্যাহত ও বিকৃত হয়ে-হয়ে সুইফট্-এর প্রতিভা মানব বিদ্বেষের বিষ বিস্তার করে করে আপনাকেও বিষাক্ত করেছে।

———

সাহিত্য সংবাদ

বুকরিভিয়্যু ও সাহিত্যবিচার ঃ

পবিত্র পাল

সমালোচনা সাহিত্যের প্রসঙ্গে এলেই এদেশী সৃষ্টিধর্মী লেখকরা—যাচাল, উন্মুখুস্থ চেহারা এবং ততোধিক উন্মুখুস্থ যাদের লেখা, 'যাকিছু ঝলমল করে তাই বুঝি সোণা'—যারপর নাস্তি তুর্যা যারা—সে সমস্ত লেখকরা ভুরু কুঁচকাবেন। ভুরু কুঁচকানো তাদের স্বভাবধর্ম। টুর্গেনিভের নাকি একটি ধুব বিশ্বাস ছিল এবং যথেষ্ট আচরণীয় সে বিশ্বাস, নিজেদের মনের চেহারা যাঁরা বেশি ভাল করে জানতে পারেন, তাঁরাই উপন্যাস লিখতে দক্ষ হবেন। নিজেকে সর্বতোভাবে চিনে তাকে তন্নতন্ন করে বিচার করেই তবে তিনি 'নিজেকে' ভুলবেন। ডাস্টিভিস্কি ঔপন্যাসিক টুর্গেনিভের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "The novelist must observe everything, in himself and in others···He must observe perpetually, impersonally, impartially. And still he is at the beginning". এ বঙ্গদেশীয় তথাকথিত আধুনিক লেখকরা নিজেদের দেখেন না, দেখতে চান না, হাত দেখতে ভয় পান বলে। কেননা, আত্মদর্শনে যদি প্রেরণার রসদ না জোটে, কেবলি যদি ক্রিমি বেরোতে থাকে, তবে তাতে ক্লান্তি বাড়ে, বমনের উদ্রেক হয় এবং পরিশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে মরণ হতে ইচ্ছে করে। সেজন্যেই অনেকে আত্মদর্শনে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাই এঁরা মনে করেন, সমালোচনা-সাহিত্যের গোটা চেহারাটাই নকলনবিশী ব্যাপার। সাহিত্যের এ ধারাটি সৃষ্টিধর্মী নয়। যাঁরা এ লাইনে আসেন, তাঁদের বিদ্যেবুদ্ধি, তাঁদের রুচী, সবই নাকি পঠিত বিদ্যার স্বল্প-সামিতে পর্যবসিত। অধিক আর কিছু না। এসবই দেখা যায়, প্রবন্ধ সাহিত্যের এ ধারাটি সম্পর্কে একটা সুস্থির আগ্রহ সঞ্চারিত নয়। সমালোচনা সাহিত্যের সংগে 'সমালোচক' নামক ব্যক্তিটির রুচী, তাঁর মননশীলতা, তাঁর স্বাতন্ত্র্য, তাঁর জীবনবোধ, তাঁর তীক্ষ্ণ বিচারবোধ জড়িয়ে যে রূপটি প্রকাশ পায়, সাহিত্যের ব্যাপ্তিতে তা লক্ষ্যের সঞ্চার করে, প্রচলিত সামাজিক ধ্যানধারণার শরীরে এমন একটা তরঙ্গ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেন যাতে চলন ব্যক্তিরা বালকবৎ নির্বোধের দৃষ্টি ফেলেন, বুদ্ধিমানেরা নিন্দার মার্জিত প্রক্ষেপণে আগ্রহ নেন, সংশয়বাদীরা আস্থাবান হন অথবা তাঁদের সংশয় অত্যধিক পীড়িত হয়। মোহিতলাল বাংলাদেশে বিস্মৃত ব্যক্তি, যেমন ইংলণ্ডে ম্যাথু আর্নল্ড। রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত হন বিশৃঙ্খলভাবে কিন্তু উপলব্ধির গভীর উৎস থেকে আগ্রহের যে হাওয়ার আলো উৎসারিত হবার কথা, তা হয় না। রাজনারায়ণ বসু, বিপিন পাল (এই ধরণের এক গাদা নামকরণে আধুনিক পাঠকের আজকাল ক্লান্তি বাড়ে, কেন না বুদ্ধি ঝলমল বিংশশতাব্দীর নাগরিক চাকুর্যপনায় তাঁরা বেশি আমোদিত হন। বুদ্ধদেব বসু, শিবনারায়ণ প্রভৃতিতে অত্যধিক আগ্রহ বোধ করেন।) প্রমুখ আজ তুয়া কতগুলো নাম। বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায় অনেক আগেই বঙ্গোপসাগরে নিক্ষিপ্ত।

এখনকার তথাকথিত সমালোচকরা বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শন, নিবেদিতার আনুকূল্যে বঙ্গ কিছুকালের জন্য মডার্ন রিভিউ; সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' সব বর্জন করে এক বিশেষ চটুল পশ্চিমী

সাময়িক পত্রের নকলে তৈরী এদেশী পত্রপত্রিকাগুলোতে এক নূতন যে 'সমালোচনা' চালাচ্ছেন, তাকে সমালোচনা বলেনা। তাকে বলে 'বুকরিভিয়ু'। যে সমস্ত সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিকদের কথা বলা হল, তাঁরাই বাংলা দেশের পত্রপত্রিকাগুলো অধিকার করে অঙ্গুলিনির্দেশে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। যাঁরা 'আত্মদর্শন'ই করতে শিখলেন না, যাঁরা উপন্যাসই লিখতে শিখলেন না, তাঁরা যদি সমালোচনায় হাত দেন কী মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে সাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিচারে—এবং হচ্ছেও তাই।

সমালোচনা থেকে বুকরিভিয়ুকে আলাদাভাবে দেখানোর ফলে অনেকের মনে কিঞ্চিৎ বিভ্রমের সৃষ্টি হতে পারে। সমালোচনার একটা নির্দিষ্ট মানদণ্ড আছে—সে মানদণ্ডটি আলোচিতব্য বিষয়ের ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা থেকে, সামাজিক জীবনস্রোতের ধারাবাহিকতা থেকে, রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন ঘটনার নিবিড় ভাবে পর্যবেক্ষণে অর্জিত উপলব্ধি, ধ্যানের মিলিত নির্যাস থেকে তৈরী হয়। অবশ্যই মানদণ্ড শিল্পকলাকে সার্থকতার শীর্ষে টেনে তোলার লক্ষ্যেই ধাবিত হবে। এবং অবশ্যই সমাজ জীবনের কল্যাণকর ভবিষ্যতের প্রশ্ন-ও তাতে জড়িত থাকবে। কল্যাণকর করতে হবে বলে বিমূর্ত শিল্পকে ধারিজ করতে হবে, এমন কোন উগ্রতা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অথবা, বনতান্ত্রিক ভূমিরায় টুইষ্ট নাচ বা আজ সন্ধীত গাইবার স্বাধীনতাকে শিল্পীর স্বাধীনতা বলে চালাবার কতোরা অবশ্যই মেনে না সে মানদণ্ড। এখন, এ মানদণ্ডটি রেখে বিচার করতে গেলে উপন্যাসিকের মতই টুর্গেনিভ কথিত গুণগুলি সমালোচকের থাকা দরকার। এ গুণগুলি সৃষ্টিধর্মী লেখকের লক্ষণ। আমি বিশ্বাস করি, সমালোচক সৃষ্টিধর্মী। এতে আধুনিক সাহিত্যিকদের ভুরু যতই কুঁচকাক না কেন।

বুকরিভিয়ু তা নয়। সমালোচনার বিস্তৃত পরিধি থেকে বিশ শতকে বুকরিভিয়ু কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা নয়। বুকরিভিয়ুকে বলা চলে বিশ শতকের কর্মব্যস্ত দ্রুতগতি ঘটনার ফল। সমালোচনাই এভাবে ধীরে ধীরে নানা ঘটনাস্রোতে ক্ষীণকায় হতে হতে বুকরিভিয়ুতে এসে পরিণত হয়েছে। এখন বুকরিভিয়ু একটা আলাদা ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি বুকরিভিয়ু করেন তিনি সাম্প্রতিক সাহিত্য থেকে নিজের খুশীমত বই বাছেন, লেখককে প্রচারের সাহায্য করেন এবং জনসাধারণকে বইটির বিষয়ে জানান। এ তিনটি কাজ হ'ল একটি ত্রিভুজের মতই গণ্ডীবদ্ধ। কিন্তু সমালোচনা যে তা নয়, এটা যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক বুঝতে পারবেন। পত্রপত্রিকাগুলোতে পুস্তক পরিচিতি শিরোনামার আড়ালে বইয়ের আলোচনা হয় তার থেকেই বুকরিভিয়ু নামটি বোঝা যায়। Times Literary supplement নামক ব্রিটনদেশীয় সাপ্তাহিকটিতে বুকরিভিয়ু ও সমালোচনা দুইই প্রকাশিত হয়। নিউস্টেটসম্যানে, স্পেকটেটর এ-তাই-ই।

দ্রুতসময়ে পড়তে হবে, লিখতে হবে, কাগজের স্থাননির্দেশ মানতে হবে—তাতে সমালোচনা হয় না, কিন্তু বুকরিভিয়ু হয়। বুকরিভিয়ুর দ্বিতীয়, তৃতীয় কাজ বলে যা বলা হল, তা-ও আবার যখন গোষ্ঠীর নির্দেশে চালিত হয়—সংবাদপত্রের চাকুরেরা (সংবাদপত্রে কাজ করলেই সাংবাদিক হওয়া যায় না) সৃষ্টিধর্মী লেখকরা তাই নির্লজ্জের মত করে থাকেন—তখন বুকরিভিয়ু আবার বিকৃত হয়। বুকরিভিয়ুর কাজগুলো আবার তাতে ঠিকমত হয়ে ওঠে না। অধিকাংশে সময় দেখা যায়, লেখকের বস্তুহীন গুণকীর্তন করে চলেছেন রিভিয়ুকারী, কিন্তু না করছেন বই বাছাই, না করছেন পাঠককে বইটির সম্পর্কে জানানোর কাজ।

সমালোচনার কথা বলেই দিলাম, এ ধরণের বুকরিভিয়ুতে ত্রুটি হচ্ছে বহুবিধ। প্রথম কথা, বুকরিভিয়ুকে সমালোচনা বলে চালিয়ে দেয় বড় অন্যায় করা হয় লেখকের এবং পাঠকের। যে লেখক আত্মপাকল্যের বিচার করেন অধ্যাপকের অর্থে, তাকে আমি লেখক বলি না। তার কথা এখানে হচ্ছেও না। দ্বিতীয় কথা, পাঠককে বইটি সম্পর্কে বিশদ না জানাবার ফলে দক্ষ লেখককে বঞ্চিত করেন শুভানুধ্যায়ী পুস্তক-পরিচয়কারী। পাঠক বিষয়বস্তু না দেখে কিছু মাত্র উল্লসিত বোধ করেন না। তিন নম্বর কথা হল, লেখক সম্পর্কে অকারণে এবং অযৌক্তিক ভাবে ঘৃণাস্তকারী মন্তব্য করে অর্থহীন, অক্ষম লেখকদের রচনার ভঙ্গী ও মানসিকতায় বিষাক্ত বটিকা পাঠক তথা সমাজ মানসের মধ্যে ছড়িয়ে দেন, যেমন ভাবে হাতুড়ে ডাক্তার রোগী মারেন। 'ভালারট নিজম' বলে একজন বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক সমালোচনার যে ক্রিয়াকে অভিহিত করেছিলেন, তারই সুসন্তান বুকরিভিয়ু। হাতুড়ে ডাক্তারের কাজ দিয়ে সাহিত্যের বর্তমান অসুস্থ সাহিত্য বিচারের প্রবাহকে ঠেকানো যাবেনা। ঠিক ঠিক বুকরিভিয়ু অনিবার্য কারণে দরকার। বুক-রিভিয়ু সমালোচনা কখনোই নয়। সে কারণেই সমালোচনা শব্দটি সম্পর্কে চিন্তা করা দরকার হয়ে পড়েছে।

•

বার্নার্ড শ' যখন নোবেল প্রাইজ পেলেন, তখন সেই সৌভাগ্যের কথা শুনেই তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

তার টাকা এবং সম্মান দুইই। বহু কষ্টে তাঁকে পুরস্কার নিতে রাজী করা হোল। তিনি টাকাটা নিয়েই একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানে দান করে ছিলেন। অথচ তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম বহু বছরের মধ্যে তিনি লিখে মাত্র ৬ পাউণ্ড রোজগার করে ছিলেন। তার মধ্যে ১ পাউণ্ড হোল ছোট সোণার কাজের জন্য।

এই প্রথম

লটারী

শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়

স্থান—কোলকাতার একটা বস্তির মধ্যে ছোট একটা ঘর। কাল—শেষ রাত। পাত্রপাত্রী,—মণির অন্ধ, তার স্ত্রী কেয়া আর বছর চারেকের ছোট মণি, ওদের একমাত্র সন্তান।

একটা হ্যারিকেন জলছে ঘরে, তেল খুব কম থাকায় আলোর থেকে কালিই ছিলো বেশী। অন্ধকার দূর করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছে হ্যারিকেনটা প্রাণপণে।

মেঝের ছেঁড়া কাঁথার ওপর শোওয়া রুগ্ন ক্ষীণদেহ মণির মাথায় দুপাশে বসে অজয় আর কেয়া চেয়ে আছে পরস্পরের প্রতি অসহায় দৃষ্টিতে।

আজ মাস দুই রোজ ঘরে ঢুকে চলেছে মণি—ওদের চোখের মণি। কিন্তু ওরা না পারছে ডাক্তার দেখাতে না পারছে ভাল পথ্য দিতে। ঢুকতে ঢুকতে দুর্বল দেহটার ওপর প্রাণটার মায়া ক্রমশ কমে আসছে, এখন এমন অবস্থা যে যেকোন মুহূর্তে সেটা ত্যাগ করে যেতেও সে প্রস্তুত।

ক'দিন ধরে সাবুর জল ছাড়া কিছু খাওয়াতেও পারেনি ওরা মণিকে। নিজেদের চলছে অর্ধ অনশনে, কখনও অনশনে। সম্বল বাসনপত্র সবই বেচে ফেলেছে আস্তে আস্তে।

প্রতিকারের কোন পথই খুঁজে না পেয়ে অসহায় ব্যথায় ওরা বসে থাকে।

অথচ চিরদিন ওদের এমন অবস্থা ছিলো না। ফলে হয়তো বস্তির অন্য সকলের মত নিজেদের অদৃষ্ট মন্দ বলে মেনে নিতো সবটা সহজ ভাবে। নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারতো প্রথম থেকে।

আজও আশ্চর্য হয়ে ভাবে অজয়, কেয়া। বছর খানেক আগেও অজয় ভাল চাকরী করতো। ভদ্রো পাড়ায় পাকা বাড়ীতে ছিলো ওরা। খিদের সময় ভাল খাবার খেতো, ভাল পোষাক পড়তো, অসুখ হলে ডাক্তার ডাকতো, স্বপ্ন দেখতো সুন্দর ভবিষ্যতের।

হঠাৎ ছাঁটাই হয়ে চাকরী গেল অজয়ের। তারপর থেকে আজ অবধি চাকরীর জন্যে ঘুরে ঘুরে দ্বারে দ্বারে ঘুরেছে অজয় এবং এটুকু জ্ঞান লাভ ছাড়া আর কিছু হয়নি যে বিদ্যা বা কর্মদক্ষতা থাকলেই আজকের জগতে কিছু হয়না চাই সুপারিশের জোর চাই পরম আত্মীয়। শিক্ষিত ভদ্রো রুচিটা অজয়কে দিলো না কারো দয়া ভিক্ষা করতে, সাহায্যের জন্য হাত পাততে।

একটা ভরসার কিছুর প্রতীক্ষায় বসে রইলো ওরা শুকনো মুখে। আজ বিকেল থেকে মণিটা প্রচণ্ড ভাবে বেড়ে গেছে, প্রলাপ বকছে মণি। ভোরের আলো ঘরে ঢুকে কুশল প্রশ্ন করলো ; তার খানিক পরেই মণির প্রাণটা তার কঙ্কালসার দেহটার মায়া ত্যাগ করলো। ওরা স্থির চোখে অসার দেহ মনে দেখলো বসে বসে প্রিয়তম সন্তানের চির বিদায় গ্রহণ।

অজয় ভাবলো, অক্ষয় বাবা মার থেকে দুঃখ অনেক বেশী শান্তি ও সান্ত্বনা দিতে পারলো মণিকে।

কেয়া শোকের প্রচণ্ডতায় স্তব্ধ হয়ে গেল, অবাক হয়ে গেল, কাঁদলো না, স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো মণির দেহটার পানে।

ভালোই হ'লো, আজ ঘুম থেকে উঠে মণি একঘেয়ে একসুরে ক্ষীণ কণ্ঠে বায়না ধরবেনা খাবার জন্যে। সাবুর জল খাবার সময় বিস্কুট খাবার বায়না ধরবেনা, অজয়কে মিথ্যা বিস্কুট কিনতে রাস্তায় বের হতে হবেনা। অজয় কেয়াকে প্রতি দিনের মত নতুন করে ভাবতে হবেনা ডাক্তারের কথা, পথ্যের কথা।

এমনি করে বসে ওরা কতক্ষণ, কতদিন, কত যুগ থাকতো তার ঠিক নেই। হঠাৎ ডাক পিওনের গলা পেয়ে ওদের পাথরে গড়া দেহ দুটোয় অল্প প্রাণের সাড়া জাগলো।

অজয় বসুর টেলিগ্রাম আছে। হেঁকে ওঠে কর্তব্যরত পিওন। উপস্থিত প্রচণ্ড আঘাতে অবাক হতে ভুলে না গেলে অবাক হোত অজয়। কারণ তাকে টেলিগ্রাম করে দুঃসংবাদ জানাবে এমন আপনজনও তাদের কেউ নেই।

ঘর চালিত হয়ে উঠে এসে দরজা খুলে পিওনের পেনটা নিয়ে সই করে দিলো। পিওন চলে যায়। খাম ছিঁড়ে টেলিগ্রামটা পড়ে অজয়, একবার, দুবার বারবার। চোখ দুটো ওর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। একবার রগড়ে নেয় হাত দিয়ে। না ভুল নয়, স্বপ্নও নয়। একটা লটারীর টাকা পেয়েছে অজয়। কবে কোথায়, কখন কিনেছে তার টিকিট তা আজ মনে নেই। টাকার অঙ্কটাও অল্প না, ১০ হাজার টাকা পেয়েছে অজয় বসু। যেখানে দেবতার নাম দেয় সেখানে সে মণির নাম দিয়ে ছিলো। অজয় ঘর ঘর করে কেঁপে ওঠে। আছড়ে পড়ে মণির দেহটার পরে। শিশুর মত কেঁদে ওঠে মণির প্রাণহীন দেহটা আঁকড়ে ধরে।

ভারতবর্ষের প্রধান সার্থকতা কী, এ কথার স্পষ্ট উত্তর যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন সে উত্তর আছে ; ভারতবর্ষের ইতিহাস সেই উত্তরকেই সমর্থন করিবে। ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতমরূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।　　—রবীন্দ্রনাথ

দেশ-বিদেশ

বৃক্ষ শোভিত উদ্যানের মধ্যে থিয়েটার ভবন

কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিম বার্লিনে একটি নতুন থিয়েটার দর্শকদের অভিবাদন জানাবে। এটি তৈরী করতে মাত্র ২২ মাস সময় লেগেছে ও খরচ পড়েছে ৯ মিলিয়ন জার্মান মার্ক। তার মধ্যে ২ মিলিয়ন জার্মান মার্ক লেগেছে কেবল ঐ থিয়েটারটিকে ঘিরে এক উদ্যান রচনা করতে। এই মনোরম পরিবেশে থিয়েটারটি যেমন সহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে, তেমনি এটিকে ঘিরে একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠবে।

এই থিয়েটারের নক্সা তৈরী করেছেন স্থপতি হিৎস বোর্নেম্যান। কয়েকবছর আগে ইনিই তৈরী করেছিলেন ডরেটমেণ্ড ওপেরা বেলিন। দুটি নক্সার কিন্তু প্রচুর তফাৎ। ডরেটমেণ্ড ওপেরা বেলিনে প্রয়োগ হয়েছিল আধুনিক স্থাপত্যরীতি ও যন্ত্র কলাকৌশল কিন্তু নতুন থিয়েটারটি একেবারেই জাঁকজমকহীন। তার কারণ হচ্ছে নতুন থিয়েটারের পাশেই রয়েছে গত শতাব্দীর একটি বিখ্যাত স্কুল; তাই সেই স্কুলভবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অথচ একটি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থিয়েটার ভবনটি তৈরী করতে হয়েছে।

আধুনিক রীতিতে এর মঞ্চ স্থাপনা হয়নি। সামনে দিয়ে প্রবেশ করার সময় এর মঞ্চ দর্শকদের চোখেই পড়েনা। স্কুল ও থিয়েটারের মাঝখানে বিরাট এক কাচের দেয়াল উঠে গেছে। এমনি কাচের দেয়াল আরও আছে। থিয়েটারের মধ্যে দর্শকদের বিশ্রাম করার জায়গা থেকে ঐ সব কাচের দেয়ালের মধ্যে দিয়ে বাগানের গাছপালা ও ফোয়ারার অপরূপ দৃশ্য ভেসে ওঠে। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে এইভাবে ছন্দ রক্ষা করে স্থপতি বোর্নেম্যান এই থিয়েটারে প্রাচীন যুগের মুক্ত অঙ্গন থিয়েটারের একটি রূপ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন ও বলতে গেলে সার্থকও হয়েছেন।

থিয়েটার ভবনটি তৈরী করতে মালমশলার মধ্যে ব্যবহার হয়েছে কাচ, ইট ও কুচিপাথর। পাশের বিদ্যালয় ভবনটির সঙ্গে যাতে কোনরকম ছন্দপতন না হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। ছ'কোণা, সাদাসিদে থিয়েটারের ভেতরে দর্শকদের হেলান দিয়ে বসার ব্যবস্থা। বাইরে থেকে দেখতে খুব বড় মনে না হলেও ১০০০ আসন আছে। সবধারণের অতি আধুনিক ব্যবস্থা করা হয়েছে এই থিয়েটারে। এর ঘূর্ণায়মান মঞ্চ নিচু করা যায়। ঐ মঞ্চ ছাড়াও পিছনে ও পাশে আরও মঞ্চ আছে। আধুনিক মঞ্চসজ্জার পরিচালকেরা যে এখানে অবাধ সুযোগ পাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

জার্মানীতে আন্তর্জাতিক মৈত্রী কেন্দ্র

বিদেশ সম্বন্ধে, তথ্য বিতরণের জন্য পশ্চিম জার্মানীর স্টুগার্টে ইনস্টিটিউট অফ ফরেন রিলেসন্ নামে একটি বিশেষ লাইব্রেরী আছে। এখানকার গ্রন্থের সংখ্যা ১৮০,০০০, নিয়মিত সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকা আসে ২,১৫০ ও ৮০০০ মানচিত্র ও অসংখ্য দলিলপত্র ইত্যাদি এখানে সংরক্ষিত আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কর্তৃপক্ষ ও ব্যক্তিবর্গ নানা সূত্রে এই গ্রন্থালয়ের সাহায্য গ্রহণ করেন। গ্রন্থালয়টি ছাড়াও ইনস্টিটিউটের আরও সাংস্কৃতিক বিভাগ আছে।

ইন্সটিটিউটের প্রদর্শনী বিভাগের কাজ হচ্ছে বিদেশে জার্মান শিল্পকলা প্রদর্শনের ব্যবস্থা ও স্বদেশে বিদেশী প্রদর্শনীর আয়োজন করা। গতবছরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতি তিনদিন অন্তর একটি জার্মান প্রদর্শনী খোলা হয়েছিল। এছাড়া আলোকচিত্র ও স্ল্যাইড বিভাগে একলক্ষ রঙীন স্ল্যাইড ও আলোকচিত্র আছে। বিভিন্ন দেশের জাতীয় সঙ্গীত ও লোকসুর সংগ্রহের কাজেও এই ইন্সটিটিউটের কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত।

ইন্সটিটিউটের অভ্যর্থনা কক্ষ সর্বদাই বিদেশীদের উপস্থিতিতে মুখর থাকে। ব্যক্তিগত নানা ব্যাপারে তারা এখানে পরামর্শ গ্রহণের জন্য আসে। বহু বিদেশী এখানে জার্মান ভাষা শিক্ষা করে। বিদেশী সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের ব্যবস্থাও এখানে আছে। এখান থেকে বহু বিষয়ে তথ্যমূলক পুস্তক প্রকাশিত হয়।

দেশ বিদেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপন ও তাহা বজায় রেখে সুদৃঢ় করে তোলাই ইন্সটিটিউট অফ ফরেন রিলেসনের একমাত্র লক্ষ্য। কারণ শিল্পের কোন ভৌগলিক সীমানা নেই, আছে জাতীয় বৈচিত্র্য, যেটি অনুশীলন করলে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হয়।

প্রাচ্য ভাষায় ওয়াগনারের গীতিনাট্যের অনুবাদ

আগামী বছরে য়ুরোপ ও এশিয়ার সঙ্গীত-জগৎ বিখ্যাত জার্মান গীতিকার রিচার্ড ওয়াগনারের ১৫০তম পুণ্য জন্মতিথি পালন করবে। গীতিনাট্যে ওয়াগনারের সৃষ্টি অক্ষয় হয়ে আছে। তাঁর "মাষ্টার সিঙ্গারস্" এর একটি অপূর্ব অনুবাদ আজ কয়েকবছর যাবৎ জাপানী মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হচ্ছে। বোম্বাইয়ের সতীশ গিরীন্দ্র, যিনি বহুকাল ইন্দোনেশিয়া ও জার্মানীতে কাটিয়েছেন, ইন্দোনেশিয়া ও ভারতীয় সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে এবার ওয়াগনারের "মাষ্টার সিঙ্গারস্" উপস্থাপিত করতে মনস্থ করেছেন, শ্রীগিরীন্দ্র আশা করেন যে তাঁর অনুবাদের কাজ চলতি বছরের শেষের দিকে সম্পূর্ণ হবে। এটি দ্বিতীয় জার্মান গীতিনাট্য যেটি এশীয় ভাষায় অনুদিত হবে; প্রথমটি হচ্ছে গ্রীসের রূপকথা হ্যাপ্রেল ও গ্রেটেল-এর অবলম্বনে জার্মান গীতিকার এঙেলবার্ট হুম্পেরডিঙ্কের রচনার জাপানী অনুবাদ।

শ্রীসতীশ গিরীন্দ্রের দৃঢ় ধারণা যে এশীয় ভাষায় অনুবাদের পক্ষে ওয়াগনারের "মাষ্টার সিঙ্গারস্" সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত, কারণ তাঁর অন্যান্য রচনা উত্তর জার্মানীর রূপকথা ও সেকালের দেবদেবী নিয়ে রচিত এবং সেই সব কাহিনী ইন্দোনেশীয় অথবা ভারতীয়দের পক্ষে কিছুটা দুর্বোধ্য। শ্রীগিরীন্দ্র জানিয়েছেন যে য়ুরোপের অনুকরণে ইন্দোনেশিয়ার একটি সঙ্গীতসংস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে। তাঁর একান্ত বিশ্বাস যে একদিন ঐ প্রতিষ্ঠান তাঁর "মাষ্টার সিঙ্গারস্" সাদরে গ্রহণ করবে। বর্তমানে যে সব ইন্দোনেশীয় জার্মানীতে য়ুরোপীয় সঙ্গীত অনুশীলন করছে যা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে য়ুরোপীয় অপেরায় কাজ করছে, ইন্দোনেশিয়ায় সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে, সেখানে তারা কাজ করার সুবিধা পাবে। ওয়াগনারের "মাষ্টার সিঙ্গারস" অনুবাদ শেষ হলে শ্রীগিরীন্দ্র ইন্দোনেশীয় ভাষায় অপর একটি জার্মান গীতনাট্য অনুবাদ করতে পারে এবং সেটি খুব সম্ভবত কার্ল মারিয়া ফন ওয়েবের ফ্রাইশুৎস্।

মানুষ বনাম রোবট

যন্ত্রজগতে আজ যে তিনটি বৃহৎ বিপ্লব ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে, তা একদিন মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করবে। এই বিপ্লবের প্রথমটি হচ্ছে পারমাণবিক বিজ্ঞানের উন্নতি, দ্বিতীয়টি হচ্ছে মহাজাগতিক আকর্ষণকে জয়, এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ইলেক্ট্রোনিকব্রেন বা বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক যা একদিন মানুষের হয়ে সবকিছু চিন্তা করবে। আর এই তৃতীয়টি একদিন মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনবে।

আজ থেকে বিশ ত্রিশ বছরের মধ্যে এইসব বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক এমন "কৃত্রিম বুদ্ধির" অধিকারী হবে যে নিতান্ত উদ্ভাবনীশক্তিসম্পন্ন দক্ষ বিজ্ঞানীদের অসাধ্য গাণিতিকতাকে লজ্জা দেবে। এরমধ্যেই এমনসব যন্ত্রমানব তৈরী হয়েছে যারা আবহাওয়ার সঠিক পূর্বাভাস দিতে পারে, পুস্তক অনুবাদ করতে পারে, কর ফাঁকি দেনেওয়ালা ব্যবসায়েদের খুঁজে বার করতে পারে এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের হিসেব জানিয়ে দিতে পারে। এমন একদিন হয়তো আসবে যখন শত্রুর রাজনৈতিক অথবা সামরিক প্রতিক্রিয়ার ফলাফল ঘোষণার কাজে কিম্বা আইনমাফিক বিচার করে দোষীকে সাজা দেয়ার কাজে এইসব যন্ত্রমানবকে নিয়োজিত করা হবে। হয়তো যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন মীমাংসা করবে একদিন এইসব যন্ত্রমানব বা রোবট! লক্ষ লক্ষ মানুষ কি একদিন এই নিষ্প্রাণ যন্ত্রের আজ্ঞাধীন হবে? মানুষ তার জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে যে দানব তৈরী করছে, তার শক্তির শেষ কোথায়, কে জানে? সেকি সত্যিই একদিন মানুষকে পদানত করবে? এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকদের মতামত কিছুটা জেনে রাখুন।

মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির কয়েকটি সাধারণ ক্ষমতা যেমন গ্রহণশক্তি, তার বিনিময়, উত্তেজনা নিবারণ ইত্যাদি যন্ত্রমানবকে দিয়ে সীমিতভাবে করানো সম্ভব। আজ পর্যন্ত এমন কোন যন্ত্র তৈরী হয়নি যা উত্তাপ, চাপ, শব্দ ও আলো পরিমাপের ব্যাপারে মানুষের চোখ কানের সমকক্ষ ছাড়িয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। এটা সত্যি কথা যে মানব মস্তিষ্কের তুলনায় বৈদ্যুতিক মস্তিষ্ক বিস্ময়কর দ্রুত কাজ করে কিন্তু তা করে একটা নির্দিষ্ট পথে এবং যন্ত্রকেও সেই কাজের জন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত করা হয়। সবচেয়ে দক্ষ যন্ত্রের হয়তো দশলক্ষ তথ্য মজুত রাখার ক্ষমতা থাকবে কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের কাছে ঐ ক্ষমতা নিতান্ত তুচ্ছ, যেখানে কোটি কোটি তথ্য একসঙ্গে মজুত থাকতে পারে। মানুষের মস্তিষ্কের সমান শক্তির অধিকারী হতে হলে পৃথিবীর গোলকের মত বিরাট একটা যন্ত্র চাই। মানুষের চিন্তাশক্তিকে তাই কোন যন্ত্র কোনদিন হারাতে পারবেনা। যন্ত্রের শক্তির কাছে মানুষ পরাজিত হবেনা এবং যে যন্ত্র মানুষকে প্রচণ্ড বেগে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তার চাকা মানুষকেই ঘোরাতে হবে।

স্মৃতি দোলায়

মনোবিজ্ঞানীদের কাছে যাবার দরকার নেই। আমরা নিজেরাই প্রত্যেকে মনের নানা অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার পরিচয় হামেশাই পাই।

অতি নিকট একজন আত্মীয় কি অতিবড় বন্ধুর নাম হঠাৎ মনে না পড়ার দৃষ্টান্ত খুব প্রচুর না হতে পারে, কিন্তু অতি সহজ অতি পরিচিত একটা শব্দ বেমালুম ভুলে যাওয়া মোটেই বিরল নয়।

নিত্য যাকে দেখছি এমন অত্যন্ত আপনার জনের মুখটা মনে করতে গিয়ে কত সময়েই ত বানলা হয়ে যায়। তার জায়গায় আজে বাজে মানুষের ছবি হয়ত অনেক বেশী স্পষ্ট।

অতীতের কথা ভাবতে গেলেও স্মরণশক্তির এরকম বেয়াড়াপনায় অবাক হতে হয়। কত বড় বড় ঘটনা মনের মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে অথচ ছোট তুচ্ছ একটা দৃশ্য একেবারে ঝলমল করছে দেখা যায়।

খুব ছোটবেলার কথা মনে করবার চেষ্টা করলে যেমন আমার সবার আগে একটা কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া মস্ত মাঠের ছবি ফুটে উঠে। আর সেই সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড চামড়ার গোলা। তখন অবশ্য সেটা ফুটবল বলে জানতাম না। মাঠের মধ্যে অনেকগুলো মানুষ সেই গোলাটার পেছনে ছোটাছুটি করছে, তারই মধ্যে একবার সেটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে মাঠের বাইরে আর একটি ছোট ছেলে সেটা দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছে কিছুতেই কাউকে দেবে না বলে। সেই বলটা বুকে জড়িয়ে ধরার উন্মাদ আর তার সঙ্গে সেটি অন্যের কাকুতি মিনতি এবং শেষ পর্যন্ত ধমক সত্ত্বেও কিছুতেই না দেওয়ার জেদ আজও যেন স্পষ্ট মনে আছে।

কত বড় বড় ঘটনা কিন্তু মন থেকে প্রায় মুছে এসেছে। উত্তর প্রদেশের নামকরা শহর গাজীপুর। শৈশব কেটেছে সেইখানেই। কিন্তু গাজীপুর বলতে একটা হাসপাতালের চারিধারই দেখতে পাই। মাতামহ ছিলেন সেখানকার ডাক্তার। তাঁর দীর্ঘ ঋজু দেহটা মনে পড়ে কিন্তু মুখটা কিছুতেই যেন আকার নিতে চায় না। তাঁর চেয়ে যে মাষ্টার মশাইএর কাছে হিন্দী পড়তাম আর মাঝে মাঝে পেটে ব্যথার ছুতো করে ছুটি নিতাম তাঁর চেহারাটা এক এক সময়ে যেন বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্মৃতির সুতো সকলের মনেই নিশ্চয় এমন জট পাকানো, যে একটা টানলে আর একটা বেরিয়ে আসে। অনেক সময়ে যেটা ধরে টানবার চেষ্টা হচ্ছে তার বদলে অন্য কোনটাই অপ্রত্যাশিত ভাবে আগে দেখা দেয়। আবার অনেক সময় যে স্মৃতি একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে বলে ধারণা, তুচ্ছ একটা কথা কি ঘটনা যেন তার চোর কুঠুরির দরজার চাবি খুলে দেয়। কিংবা বলা যায় ক্যারমের ঘুঁটির মতন বাইরে থেকে আঘাত পেয়ে নিজেদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করে কোনটা যে ছিটকে বেরুবে তার কোন ঠিক নেই।

সেদিন হঠাৎ সেই আশ্চর্য ব্যাপারই হল। এক সন্ধ্যায় দিল্লীর বিজ্ঞান-ভবনে আন্তঃপ্রাদেশিক এক সাহিত্য সভায় গেছলাম। আজকাল যাকে বাস্তুঘু বলা হয় তাই প্রথমে বাজান হল। যাঁরা সে সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করলেন তাঁদের মধ্যে বাঁশি যিনি বাজালেন তিনি আশ্চর্য গুণী। বাজনা শেষ হবার পর সেই গুণী বয়স্কের আমার পাশেই এসে বসলেন। যাকে টিপরা বাঁশি বলে তাই তিনি বাজান। শুধু তার আকার এ জাতের সাধারণ বাঁশির চেয়ে একটু বড়। বাঁশি তাঁর একরকম একটা নয়, অনেকগুলিই সঙ্গে থাকে। সযত্নে একটি নীল-রঙা মরক্কো চামড়ার লম্বা বাক্সে তিনি সেগুলি রাখেন। সেই বাক্স তিনি সঙ্গে নিয়েই পাশে বসেছিলেন। কৌতূহলী হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বাঁশিগুলি দেখতে চাইলাম।

অদ্ভুত ব্যাপার।

সেই বাঁশিগুলি দেখতে দেখতে মনের মধ্যে কোন সুতোয় সঙ্গে কোন সুতোর যে টান পড়ল কে জানে!

বাঁশি থেকে মধুর বা করুণ কোন স্মৃতি কি আবেগ নয়, বাঁশের চোঙার কথা যে কি করে মনে উদয় হ'ল বুঝতেই পারলাম না, আর সেই সূত্র থেকেই যার স্মৃতি মনের মধ্যে এক পলকে স্পষ্ট হয়ে উঠল, সে আর কেউ নয়—নিখিল বয়।

বাঁশের চোঙার সঙ্গে নিখিল বয়ের কথা মনে হওয়া একেবারে আজগুবী ব্যাপার নয়। একটা যোগ-সূত্র দুই-এর মধ্যে আছে।

নিখিল বয় সাপের কামড়ে তার বাবার শোচনীয় মৃত্যুর কথা লিখেছিল। সে কথাটুকু তখন পড়ে স্মৃতির কোন খেই-ই খুঁজে পাইনি। কিন্তু বাঁশের চোঙার কথা তাবার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল বয়ের তখনকার বর্ণনা আর সেই সঙ্গে তার নিজেরও পরিচয় বিস্মৃতির অন্ধকার সরিয়ে প্রায় চাক্ষুষ হয়ে ফুটে উঠল।

নিখিল তার বাবার মৃত্যুর যে বিবরণ দিয়েছিল তা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তার বাবা জমিদারী সেরেস্তার কাজে কোন দূর গ্রামাঞ্চলে গেছলেন। সেখানে কাছারী বাড়ীতে তাঁকে কয়েকদিন একটি মাটির ঘরে থাকতে হয়েছিল। সেই ঘরেই একদিন সকালে তাঁকে সর্পাঘাতে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মৃত্যুটা যে সাপের কামড়েই হয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ বিষধর সাপটিকে পাওয়া যায় সেই ঘরেই। দূর গ্রামাঞ্চলে ঘরের মধ্যে সাপখোপ ঢোকা কিছু বিচিত্র নয়। সাপের কামড়ে মানুষও সেখানে যথেষ্ট মরে। কিন্তু নিখিলের বাবার সর্পাঘাতে মৃত্যু ঠিক স্বাভাবিক নয়। কারণ মাটির ঘরের দেওয়ালে একটি ফোকর দেখা যায়, সে ফোকরটিতে বাইরের মুখ বন্ধ একটি বাঁশের চোঙা ভরা। জমিদারীর কাজে নিখিলের বাবার শত্রুর অভাব ছিল না। তারাই ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করবার এই পৈশাচিক কৌশল নাকি অবলম্বন করেছিল। বাঁশের চোঙার মধ্যে বিষধর সাপ ভরে রেখে কয়েকদিনের পর ক্ষুধিত অবস্থায় মাটির দেওয়ালে বাইরে থেকে ফুটো করে সেই চোঙা ঢুকিয়ে দিয়ে উত্তেজিত সাপকে দিয়ে দংশন করাবার এ পদ্ধতি গ্রামাঞ্চলে বহুকাল থেকে প্রচলিত বলে শোনা যায়। হত্যার এ কৌশল অবার্থ অবশ্য নয়, যাকে হত্যা করা উদ্দেশ্য তাগ্য সুপ্রসন্ন হলে সাপের কামড় থেকে সে রক্ষাই পেয়ে যায়। কিন্তু সফল হলে এ কৌশল যারা প্রয়োগ করে তাদের প্রত্যক্ষ ভাবে ধরা ছোঁয়ার কিছু থাকে না।

নিখিলের বাবাকে এই নৈশাচিক কৌশলেই মারা হয়েছিল বলে তার বিশ্বাস। সে নিজে অবশ্য সেখানে উপস্থিত ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটাই তার শোনা। তার শোনা কথা আবার সে আমাকে শুনিয়েছিল। ব্যাপারটার সত্য মিথ্যা বিচার করা সুতরাং আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সর্পদংশনে শত্রুকে মারবার জন্যে বাঁশের চোঙা ব্যবহারের এই অমানুষিক পদ্ধতি শুধু তখন বিস্মিত বিহ্বল করেছিল মনে আছে।

সেই বাঁশের চোঙার সঙ্গেই নিখিল ধরের স্মৃতি যেন জড়ানো হয়ে আমার মনের কোন গভীরে লুকোন ছিল। হাজারো বাঁশির সুরে ধরে তখনকার সমস্ত কথাই আবার আশ্চর্যভাবে মনে পড়ল। এমন কি নিখিলকে ঠাট্টা করে যে নামে ডাকতাম তাও।

ওই বয়সে বন্ধু বান্ধবদের নাম একটু বিকৃত করে ডাকা একটা মজার খেয়ালে। নিখিলকে আমাদের মধ্যে কে যেন একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, তুই ত ধর নয়, সখি ধরো ধরো। সেই থেকে নিখিলের বদলে তাকে সবাই আমরা 'ধরো ধরো' বলেই সম্বোধন করতাম।

চেহারায় মেয়েলী লাবণ্যের তার অবশ্য তার বিন্দুমাত্র ছিল না। ধরার মত শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলে। কিন্তু মনটা ছিল তার বড় নরম, আর সেই সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে যেন একটা হীন হীন ধারণা। কোন দিন কারুর সঙ্গে ঝগড়া ছেড়ে কোন বিষয়ে তাকে তর্ক করতে শুনিনি, রাগ করতে কি মেজাজ খারাপ করতেও কখনো দেখিনি। সে যদের সঙ্গেই থাকত কিন্তু নিজেকে ছায়ার মত সকলের পেছনে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে রেখে। তার এই স্বভাবের জন্যে অত্যাচার হুলুম তাকে কম সইতে হয় নি। যারা অবশ্যই তাদের কাই ফরমাশ খাটতে ও হুকুম তামিল করতে হয়েছে অহরহ। কিন্তু কোনদিন তার মুখে কোন প্রতিবাদ শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

তার এই আত্ম-বিলোপের প্রবণতার জন্যেই হয়ত অমন নিশ্চিহ্নভাবে মন থেকে তার স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে গেছল। যদিও আমার পক্ষে তা লজ্জাকর। কারণ আর সকলের চেয়ে সে আমারই অনুরক্ত ছিল বুঝি একটু বেশী। হয়ত তার ওপর উপদ্রবটা আমিই একটু বেশী করতাম বলে।

এই নিখিল ধরকে কি করে অমন বেমালুম ভুলে গেছলাম সে রহস্যের হদিস পাবার চেষ্টা আর করব না। বিকৃত করা 'ধরো ধরো' নামটাই মনের মধ্যে বসে গেছল বলে নিখিল ধর হিসেবে তাকে স্মরণ করতে পারি নি, এমনও হ'তে পারে। তাহলেও মনের ভূতের কৌতুক বলে সেই স্মৃতিভ্রংশের ব্যাপারটার দাঁড়ি টেনে পরের কথাই বলি।

নিখিল ধরের কথা মনে পড়ে যাবার পর সত্যিই বড় গ্লানি ও অস্থিরতা অনুভব করলাম। সেই সঙ্গে অসহায়তার একটা যন্ত্রণাও। নিখিলের চিঠিই আমার কাছে কত বিলম্বে পৌঁছেছে। তার পর আমার স্মৃতির উদ্রেক হবার আগেও কেটে গেছে প্রায় মাস তিনেক। নিখিল যে গুরুতর সমস্যায় আমার পরামর্শ অমন ব্যাকুল ভাবে চেয়েছিল তা আজও আমার জন্যে নিশ্চয় অপেক্ষা করে নেই। সে সমস্যার সমাধান কিছু আর করা যোধহয় যাবে না, কিন্তু তবু নিখিলের কাছে ব্যাপারটা না জেনে কিছুতেই আর স্বস্তি নেই।

মুস্কিল হল এই যে দিল্লী থেকে নিখিলকে একটা চিঠি লেখাও অসম্ভব। লুপ্ত স্মৃতি হঠাৎ দিল্লীতেই ফিরে আসবে কেমন করে জানব। আসলে তার চিঠিটা নিশ্চয় সঙ্গে করে' নিয়ে আসতাম। সে চিঠি কলকাতাতেই রেখে এসেছি। উত্তর বিহারের যে অজানা শহরটার ঠিকানা চিঠিতে

ছিল তার নামও ঠিক স্পষ্ট মনে করতে পারলাম না। তা পারলে কপাল ঠুকে শুধু নিখিলের আর শরতের নাম দিয়েই একটা চিঠি পাঠিয়ে দিতাম। নিখিল লিখেছিল, শরতের সে গণ্যমান্যদের একজন। সুতরাং তার নামের চিঠি কোনরকমে তার হাতে পৌঁছোতেও পারত। কিন্তু শরতের নামটাই ভুলে যাওয়ায় সে পথও বন্ধ।

দিল্লীতে আরো হপ্তাখানেক থাকার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু মনটা সত্যিই এত তখন অস্থির যে নেহাৎ জরুরী কাজগুলো সেরে অনেক কষ্টে ট্রেনের টিকিট জোগাড় করে দু'দিন বাদেই কলকাতায় রওনা হলাম। রওনা হলাম নিখিল বরেরই জন্যে।

ট্রেনে আসতে আসতে নিখিলের কথাই প্রায় সারাক্ষণ ভেবেছি। তখনকার জীবনের আরো অনেক কথাই মনে পড়ছিল। বিশেষ করে দু একটি এমন ঘটনার কথা যার মধ্যে নিখিলের চরিত্রের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।

টেবল টেনিসের সেই ব্যাপারটাই ধরা যেতে পারে নিখিলকে যার জন্যে বকুনি শুধু খেতে হয়নি জরিমানাও দিতে হয়েছিল। ঘটনার দিনটায় আমি সেখানে ছিলাম না, তবে ব্যাপারটার সূত্রপাত কেমন করে হয়েছিল তা আমার জানা। প্রথম কলেজ জীবনে, দ্বিতীয় বার্ষিক ছেলেরা প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ওপর অনুকম্পা মিশ্রিত অবজ্ঞার সঙ্গে একটু মাতব্বরী করেই থাকে। যারা নতুন কলেজে ঢুকেছে তারা সাধারণতঃ সেটা নীরবে মেনেই নেয়। কিন্তু আমাদের দলটা ছিল একটু আলাদা মেজাজের। বিশেষ করে দু চারজন এমন তাদের মধ্যে ছিল যারা সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রদের এ প্রাধান্য স্বীকার করতে নারাজ। ছোটখাট ঠোকাঠুকি তাই মাঝে মাঝে দু দলে বাধত। বিশেষ করে গোলটা বাধত পিং পং খেলার টেবিলকে কেন্দ্র করে। প্রক্সির জোরে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে এখানে যারা জড় হ'ত তাদের ঠিক শিষ্ট শান্ত বলা যায় না। সেখানে প্রথম প্রথম সেকেণ্ড ইয়ারের কাছে ফার্স্ট ইয়ারের বেশ একটু অবজ্ঞা ও লাঞ্ছনা সইতে হত। দু'বছরের বয়সের জোরে নতুন কলেজে চোকা ছেলেদের তারা পাত্তাই দিত না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিজেদের মধ্যেই খেলা চালিয়ে নবাগতদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে যাওয়াই ছিল তাদের কৌতুক। আমাদের দল বেশ কিছুদিন ধরে এর শোধ নেবার মতলব আঁটছিল। একদিন সুযোগ পেয়ে তাদের যাওয়াই তাদেরই খাওয়াবার ব্যবস্থা করা গেল। পার্সেন্টেজের ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে কলেজের গেট খুলতে না খুলতেই আমরা সেদিন দলবলে পিং পং-এর টেবিলের ধারে জমায়েত। সারাদিন আমাদের অগ্রজদের আর একটা ব্যাট ছুঁতে দিলাম না। ধমক শাসানি ইত্যাদি থেকে সুরু করে গালমন্দ পর্যন্ত বাকযুদ্ধের কিছু আর অবশ্য বাকি রইল না। শুধু ব্যাট কেড়ে নেবার জন্যে হাতাহাতিটাই বাকি রইল। সে হাতাহাতিও শেষ পর্যন্ত একদিন হ'ল। কাড়াকাড়ি ঝটাপটিতে ব্যাট ভাঙল গোটা কয়েক, খেলার টেবিলটা জখম হল, নেটটা ছিঁড়ে হল ছারখার, আর খবর পেয়ে কর্তৃপক্ষ যখন এসে পড়লেন তখন ধরা পড়ল এক শুধু নিখিল বর। কারণ সে মারামারিতে যোগ দেয়নি, যথাসাধ্য দুপক্ষকে থামাবার চেষ্টা করেছে এবং প্রিন্সিপালের কাছে খবর গেছে শুনে আর সকলে যখন হাওয়া, তখন সেই একমাত্র লণ্ডভণ্ড খেলার ঘর আর ভাঙা সরঞ্জামগুলো তুলে রাখবার ব্যবস্থা করছে।

তাকেই অপরাধী বলে ধরার প্রথমটা সে বুঝি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ক্রুদ্ধ উত্তেজিত গেমস সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়ে সরাসরি প্রিন্সিপালের কাছে নিয়ে

যেতেন। সেখানে তাকে নিজের বক্তব্য বলবার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল সেই সঙ্গে যারা এ ব্যাপারে লিপ্ত তাদের নাম জানাবার আদেশ। নিখিল একেবারে মৌনী হয়ে গিয়েছিল তখন থেকেই। এমন কোন দলেরই কারুর নাম সে করেনি। প্রিন্সিপাল মশাই তার এ অনমনীয়তায় মনে মনে তারিফ করছিলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু কলেজের শৃঙ্খলা ও সদাচরণের খাতিরে নিখিলকে যথোচিত ভৎর্সনা করে কিছু শাস্তি তাকে দিতে হয়েছিল। নিখিল নীরবে সে শাস্তি মেনে নিয়েছিল এবং তারপর থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্রদের এ বিরোধ মিটে গিয়েছিল যেন মন্ত্রবলে।

কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ না করে নিজের ঘাড়েই সমস্ত অপরাধের দায় টেনে নেবার নিখিল পরে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল সেইটেই অদ্ভুত ও অপূর্ব।

আমাদের অনেক পেড়াপিড়িতে অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে বলেছিল, নাম বলব কি করে! কারুর নাম যদি ভুলে যায় পড়ে যায়!

কলকাতায় ফিরে এসে নিখিলের ঠিকানা রেখে নিয়ে অবিলম্বে সেখানে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিলাম। এই দেরী করার আসল কৈফিয়ৎটা দিতে পারলাম না। চিঠির ঠিকানা ভুলের সুযোগ নিয়ে সেইটেই উত্তর দিতে বিলম্ব হবার কারণ বলে জানালাম। সেই সঙ্গে এমন কথাও জানালাম যে তার চিঠি পেলে আমি তার কাছে যাবার জন্যেও প্রস্তুত।

এ চিঠির পর হপ্তা দুয়েক যখন কেটে গেল তখন নিখিলের সঙ্গে আর দেখা হওয়ার আশা ছেড়েই দিয়েছি।

ঠিক সেই সময়ে সকাল বেলা একদিন একটি ফোন এল।

অজানা একটি মেয়ের গলা।

গলা শুনে অল্পবয়সীই মনে হ'ল। ভাষায় একটু অবাঙালী টান। কণ্ঠটি অত্যন্ত মধুর।

আমার নাম জিজ্ঞাসা করে নিয়ে যা জানালে তাতে আমি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হলাম।

নিখিল ধরের হয়েই মেয়েটি ফোন করছে। তার সঙ্গে আমি যদি তাড়াতাড়ি দেখা করি বড় ভালো হয়।

ঠিকানা যা দিল তা কলকাতার একটি নাম করা নার্সিং হোমের।

অন্তরীক্ষে

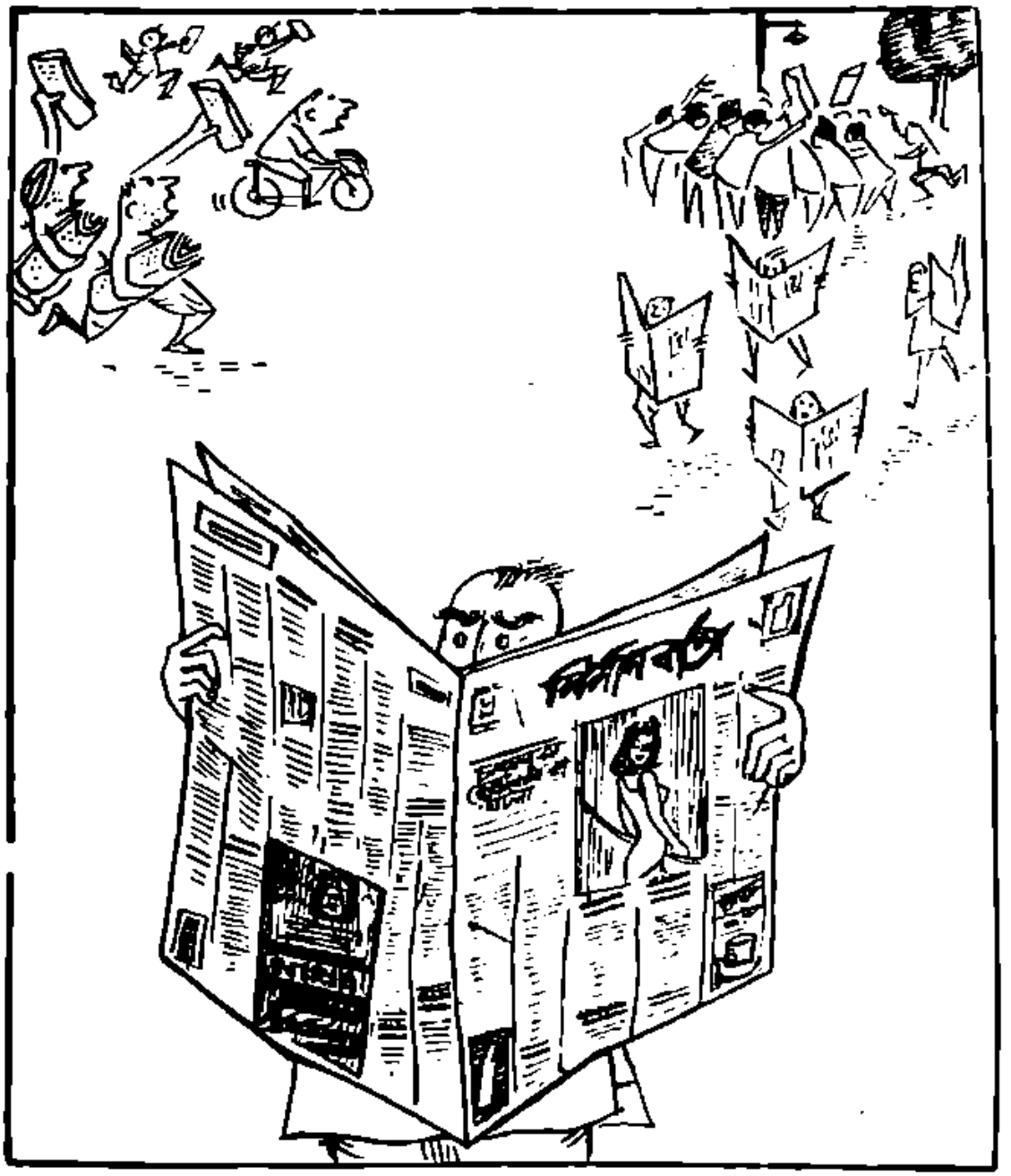

সংবাদে-সুরুচি !

অশ্লীল সাহিত্যের বিষক্রিয়া

ঘুষ মানুষকে কোথায় নিয়ে যায়

ভেজাল

..... এখন দেখছি, আমি বাদে সব খাঁটী !

ব্রটেন

সচিত্র সংযোজনে

ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চ

সুনীলকুমার নাগ

গোটা ইয়োরোপে শিল্পসাহিত্যের অন্য যে কোনো বিষয়ে যেমন রঙ্গমঞ্চের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি —প্রেরণার উৎসের সন্ধানে আমাদের গ্রীসের দিকেই তাকাতে হবে। গ্রীস নিজে অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছে সত্যি, কিন্তু সে নিজেও মিশর, ব্যাবিলন, পারস্য এমনকি ভারতবর্ষের কাছ থেকেও কম গ্রহণ করেনি। ইয়োরোপের সব দেশেই রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টির পেছনে প্রেরণা এসেছে হয় সরাসরি গ্রীস থেকে আর না হয় রোমের মারফৎ।

ইংলণ্ডে রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি বা ঠিক রঙ্গমঞ্চ বলতে পৃথক এবং বিশেষভাবে তৈয়ারী কোনো জায়গা সৃষ্টি না করেও নাটকাভিনয়ের প্রেরণার পেছনে গ্রীস এবং রোম যুগপৎ প্রেরণা জুগিয়েছিল বলা যায়। কারণ, ইংলণ্ডে নাটকাভিনয় খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই যেমন ইংলণ্ডেও সেই রকম সর্বপ্রথমে চার্চের প্রাঙ্গণেই নাটকাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল। ইংরেজী থিয়েটার কথাটা গ্রীক থিয়েট্রন কথার অপভ্রংশ। থিয়েট্রন কথাটার সৃষ্টি হয়েছে 'থিয়া' থেকে। গ্রীক থিয়া শব্দটির অর্থ হলো দৃশ্য।

ইংলণ্ডে থিয়েটারের প্রথম যুগে চার্চের প্রাঙ্গণে বা বারান্দায় যে সমস্ত নাটকাভিনয় হতো ধর্মপ্রচারই যে তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তা সহজেই অনুমেয়। বাইবেলের বিভিন্ন রহস্যঘন কাহিনী, কিংবদন্তী এবং পুরাকথা অবলম্বন করে নাটকাভিনয়ের আয়োজন করতেন পাদ্রীরা। বলাইবাহুল্য, জিনিষটাকে তাঁরা মোটেই আর্ট বা শিল্প হিসাবে গণ্য করতেন না। অবশ্য শিল্পের কিছু কিছু লক্ষণ যে তার মধ্যে থাকতো না তা নয়। কারণ অভিনয়ের জন্যে যে জায়গা নির্বাচন করা হতো একান্ত সাধারণের মধ্যেই সামান্য দুটি কি একটি বিশেষ যে বস্তুর আমদানী করা হতো তার ফলেই ভবিষ্যৎ যুগের থিয়েটারের আভাস পাওয়া যেতো। হয়তো নরকের একটি দৃশ্যের কোনো ব্যাপার দেখানো হবে—কাজেই অভিনয়ের সুরুতেই অভিনয়ের জায়গার মধ্যে সকলের চোখে পড়ে এইরকম কোনো জায়গায় হয়তো কালো একটি পুকুল বা একটা মাথার খুলি রেখে দেওয়া হতো। এই সামান্য আয়োজনেই দর্শক মণ্ডলীর মনোভাব প্রভাবিত হতো এই কারণে যে দর্শকগণ ধর্মে শিক্ষালাভের জন্যেই সমবেত হতো অভিনয় দেখবার জন্যে।

বাইবেলের রহস্যঘন কাহিনীর পর প্রচলিত হয়েছিল অলৌকিক কাহিনীর পরিবেশন। সাধারণত খ্রীষ্টান সাধু সন্তগণের জীবন থেকে অলৌকিক ঘটনা বেছে নিয়ে এই সমস্ত কাহিনীর অভিনয়ের বন্দোবস্ত করা হতো। মঞ্চের তখনো একই অবস্থা।

অলৌকিক কাহিনীর পরে দেখা দিয়েছিল নীতিপ্রচারমূলক কাহিনী। এই নীতি প্রচার মূলক কাহিনীতেই সাধারণ মানুষের চরিত্র সর্বপ্রথম প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা নিয়ে দেখা দিলো। সে যুগের অর্থাৎ প্রায় হাজার বছর আগের ইংলণ্ডের এই সমস্ত নীতিপ্রচারমূলক নাটকের অন্তত একটি "এভরিম্যান" আজকের দিনেও এমনকি প্রথম শ্রেণীর রঙ্গমঞ্চে এক-আধবার অভিনীত হয়ে থাকে।

ইংলণ্ডে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের অবস্থা একটানা অন্তত চারশ' কি সাড়ে চারশ' বছর একই ভাবে এবং অতি মন্থর গতিতে রূপান্তর লাভ করতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি শেক্সপীয়ারের

জন্মের চৌদ্দ বছর পূর্বে ইংলণ্ডে প্রথম ধর্মের আওতার বাইরে নাটকের নিজস্ব মূল্য স্বীকৃতিলাভ করে এবং চার্চের প্রাঙ্গণ ছেড়ে এই প্রথম বিশেষভাবে অভিনয়ের জন্যে জায়গায় বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ১৫৫০ খ্রীঃ অব্দে অভিনীত এই প্রথম ইংরেজী কমেডীখানার নাম হলো "র‍্যালফ রয়েস্টার ডয়েস্টার"; রচয়িতা নিকোলাস আডাল। প্রথম ইংরেজী ট্রাজেডী নাটক অভিনীত হয়েছিলো শেক্সপীয়রের জন্মের তিন বছর পূর্বে ১৫৬১ খ্রীঃ অব্দে। এ নাটকের নাম "ফেরেক্স এণ্ড পোরেক্স," রচয়িতা টমাস স্যাকভিলি এবং টমাস নর্টন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে এই হলো ধর্মানুষ্ঠানের পরিপূরক এবং ধর্মপ্রচারের একটি অঙ্গ হিসাবে ইংলণ্ডে নাটক এবং রঙ্গমঞ্চের উৎপত্তি এবং কালচক্রে সে অবস্থা থেকে শিল্প হিসাবে নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সূচনার গোড়ার কথা।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকেই দেখা গেলো ইংলণ্ডে রঙ্গমঞ্চের জন্যে বিভিন্ন জায়গায় ছাউনির বন্দোবস্ত করা সুরু হয়ে গেছে। এ সময় পর্যন্ত দর্শকমণ্ডলীর জন্যে বসবার বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানের আয়োজন করা হলেও খোলা আকাশের নীচেই তাঁরা বসতেন; কিন্তু রঙ্গমঞ্চের চারিদিক ঘেরা তো থাকতোই, ওপরেও চালাই হোক বা অন্য কোনোরকমের ছাউনির বন্দোবস্ত করা হতো। এই সময়েই দেশের কয়েকটি স্থানে কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের সৃষ্টি হয়েছিল। যে-গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলো লণ্ডনের গ্লোব থিয়েটার—এইখানেই শেক্সপীয়রের কালজয়ী নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল।

গ্লোব থিয়েটারেও প্রথমে দর্শকমণ্ডলীকে খোলা আকাশের তলাতেই বসতে হতো—পরে 'হল' -এর বন্দোবস্ত করা হয়। এই সময়ের রীতি অনুসারে যেদিন কোনো রঙ্গমঞ্চে কোনও নাটকের অভিনয়ের কথা থাকতো সেদিন সকাল থেকেই রঙ্গমঞ্চের ছাদ বা ছাউনির কোনো উঁচু জায়গাতে প্রত্যেক রঙ্গমঞ্চের নিজস্ব পতাকা ওড়ানো হতো—যাতে দূর থেকেও সবাই বুঝতে পারতো যে আজ এখানে কোনও নাটকের অভিনয়ের বন্দোবস্ত হয়েছে।

শেক্সপীয়রের সময়ে অর্থাৎ নাট্যশিল্পে যাকে বলা হয় এলিজাবেথীয় যুগ, এ সময়কার নাট্যকার গণের মধ্যে শেক্সপীয়র আজ বিশ্বমানবের সম্পদ রূপে স্বীকৃত।

(সে সময়ে এবং তারপরে কিছুকালের জন্যে মারলো বা বেন জনসন জনপ্রিয়তার মাপকাঠিতে শেক্সপীয়রের সমকক্ষ হয়েছিলেন এবিষয়ে প্রায় সমস্ত ইতিহাসকারেই একমত।) কিন্তু তারপরে? পঞ্চাশ কি একশ' বছর পরে? দু'শ বছর পরে বা আজকের দিনে? আজকের দিনে দেখা যায় ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে ক্রমবিকাশের ধারাটি সাহিত্যের ছাত্রগণের পক্ষে যাতে সুষ্ঠুভাবে বোধগম্য হয় মারলো বা বেন জনসনের নাটকাবলী শুধুমাত্র সেইজন্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পড়ানোর বন্দোবস্ত করা হয়েছে, এবিষয়ে কি আমাদের দেশ আর কি খাস গ্রেট ব্রিটেন সর্বত্রই ওঁদের একই অবস্থা। আর ওঁদের নাটক কালেভদ্রে হয়তো কোথাও অভিনীত হয়। কিন্তু শেক্সপীয়র?

স্ট্রাটফোর্ডে সমাধির উপরে শেক্সপীয়রের প্রতিমূর্তি।

কিছুদিন আগে বিলেতের একটি সাময়িকপত্রে দেখেছিলাম একজন বিখ্যাত লেখক রীতিমতো দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে শেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় এবং দেশ-বিদেশে বিভিন্ন ভাষায় শেক্সপীয়রের রচিত নাটকাবলী প্রকাশের একটি দীর্ঘ তালিকা ছেপে একথা প্রমাণ করেছিলেন যে শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পঞ্চাশ-ষাট বছর পর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি দশকেই শেক্সপীয়রের

জনপ্রিয়তা বাড়ছে। অসংখ্য নতুন নতুন টীকাকার, ব্যাখ্যাকার এবং পণ্ডিতজনের আবির্ভাব হচ্ছে আরো আলোড়ভাবে অর্থাৎ পণ্ডিতভাবে সেক্সপীয়রের নাটকাবলীর অন্তর্নিহিত বক্তব্য বুঝবার জন্যে। সেক্সপীয়রকে বুঝবার জন্যে-শিক্ষিত-অশিক্ষিত আপামর জনসাধারণের এই যে উৎসাহ এবং আগ্রহ এর কারণ কি? সাড়ে তিনশ' বছর কি তারও আগে গ্লোব থিয়েটারে যারা সেক্সপীয়রের নাটকের অভিনয় দেখতেন তাঁদের মধ্যে ডিউক এবং ডাচেসদের যেমন একদিক ভীড় থাকতো, সাধারণ মানুষের ভীড়ও নেহাৎ কম থাকতো না: তীক্ষ্ণধী দর্শনবেত্তা, পেশাদার রাজনীতিবিদ তথা সাধারণ সৈনিক বা দোকানদার সকলে পাশাপাশি বা হক অন্তঃ একই 'হলে' সমবেত হতেন সেক্সপীয়রের নাটক দেখবার জন্যে এবং একইভাবে আনন্দ উপভোগ করতেন। রাজনীতির পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'শ্রেণী'—এবং যে শ্রেণীদ্বন্দ্ব নাকি সমাজ বিন্যাসের প্রথম দিন থেকেই চলছে—সেই শ্রেণী-নির্বিশেষে মানুষমাত্রেই সেক্সপীয়রের নাটক থেকে সমানভাবে রস সংগ্রহ করতে পারতেন এবং তা' করতেন। উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের নাট্যরচনায় যে প্রজ্ঞা, যে চিন্তাধারা যে রচনাশৈলী এবং জীবনানুভূতির সার্থক প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় তা একান্ত বিরল। সেক্সপীয়ার ইংলণ্ডের সবচেয়ে বড় সম্পদ—সেক্সপীয়ার মানেই ইংলণ্ড —ইংলণ্ড মানেই সেক্সপীয়ার। সেক্সপীয়ার সর্বকালের সর্বজনের একান্ত আপনার সম্পদ।

নিউইয়র্কে সেক্সপীয়রের প্রতিমূর্তি।

পরিবর্তনশীল সামাজিক অবস্থার কোনোটির প্রতি কোনো বিশেষ পক্ষপাতিত্ব না করে মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করবার এই যে শক্তি, এই জিনিষটিই সেক্সপীয়রকে অমর করেছে, ভৌগোলিক সীমানার শাসন অগ্রাহ্য করে দেশ-বিদেশের মানুষকে উদ্দীপিত করেছে তাঁকে হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর করে তুলতে।

গ্যেটে তাঁর একখানি নাটকে প্রকারান্তরে এই কথাই বলেছেন যে, হে মহান্ সেক্সপীয়ার, তুমি আমার শ্রদ্ধের বড়ো ভাই, আমাকে অনুজ বলে স্বীকার করে নিয়ে অনুগৃহীত করো। সেক্সপীয়র আজ আর একা গ্রেটব্রিটেনের নয়, সেক্সপীয়র আজ জাতিধর্মনির্বিশেষে বিশ্বমানবের সকলের একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

চিকাগো লিঙ্কন পার্কে সেক্সপীয়রের প্রতিমূর্তি।

সেক্সপীয়রের সময় গ্রেট ব্রিটেনে রঙ্গমঞ্চের যে উন্নতি তা' দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে ততোটা হয়নি যতোটা প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে হয়েছিল। পূর্বে যেখানে বিকেলে নাটক অভিনয়ের আয়োজন হতো এবার ক্রমশঃ সন্ধ্যার দিকে অভিনয় সুরু হতে আরম্ভ করলো। হ্যামলেট বা ম্যাকবেথের মতো নাটক কখনো কখনো সারা রাত ধরে অভিনয় চলতো। নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের বিরতির ফাঁকে ফাঁকে পরিচালনার ভার যাঁদের ওপর ন্যস্ত থাকতো তাঁরা দর্শকমণ্ডলীর সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং কোনও বিশেষ চরিত্রের পোশাক বা অঙ্গভঙ্গী সম্বন্ধে কিছুমাত্র ন্যায্য আপত্তি দেখা দিলেই অনেক সময় অবিলম্বে এমনকি হয়তো পরের দৃশ্য থেকেই সে ত্রুটি শুধরে নেওয়া হতো। সেক্সপীয়রের সময় থেকেই গ্রেট

ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চ সর্বপ্রথম বিশেষভাবে আলোকিত করার প্রয়োজন দেখা দিলো। কারণ আগেই বলেছি, দৃশ্যের তেমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই—সে অভাব সেক্সপীয়র কথোপকথনের মাধ্যমে মেটাতেন। আবেগ, প্রবল আবেগময়ী যে কথাগুলি সেক্সপীয়র তাঁর বিভিন্ন চরিত্রের মুখে পুরে দিতেন অভিনেতাগণের মুখচোখে তার প্রকাশ দেখাবার জন্যে অতিরিক্ত আলোর প্রয়োজন অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়েছিলো। তারপর পোশাকের কথা। সেক্সপীয়রের নাটক—কি ট্র্যাজেডী, কি কমেডী, অধিকাংশই রোমের ইতিহাসের নাট্যাকারে পুনরাবৃত্তি—সুতরাং রাজা-রাণীর ব্যাপার, স্বদেশের এবং রোম ছাড়া বিদেশের যেমন লাতস লেবার লষ্ট বা হ্যামলেট—তাও ফ্রান্স এবং ডেনমার্কের রাজ-রাজড়ার ব্যাপার। কাজেই পোশাকের যে বৈচিত্র্য সেক্সপীয়রের যুগে গ্রেট ব্রিটেনের ওপর দেখা দিয়েছিলো কয়েক বছরের মধ্যেই দেখা গেলো গোটা ইয়োরোপকে তা প্রভাবিত করলো। যে কোনো ধরণের নাটকই হ'ক না কেন তার চরিত্রগুলিকে একেবারে যথাযোগ্য পোশাক পরাবার প্রয়োজনীয়তা নাট্য-পরিচালক, মঞ্চ-কুশলীগণ তথা দর্শকমণ্ডলী সকলের কাছেই স্বীকৃতিলাভ করলো নাটক তথা রঙ্গমঞ্চেরই প্রয়োজনে।

প্যারিসে সেক্সপীয়রের প্রতিমূর্তি

ভীড় কম হতো না। এই সময়েই ইংরেজী নাটক পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর নাটকের মর্যাদা লাভ করে, তার কৃতিত্ব একা সেক্সপীয়রের (১৫৬৪—১৬১৬) নয়। ক্রীস্টোফার মারলো (১৫৬৪—১৫৯৩) এবং বেন জনসনের (১৫৭২—১৬৩৭) নাটকের জনপ্রিয়তা সে যুগে সেক্সপীয়রের চাইতে কম ছিল না। মারলোর ডাঃ ফস্টাস এবং বেন জনসনের ভলপোন এখনো গ্রেট ব্রিটেনে মাঝে মাঝে অভিনীত হয়।

মারলো এবং বেনজনসনের পরেই নাম করতে হয় টমাস কিড, রবার্ট গ্রীণ, ক্রীস্টোফার মার্লো, জন ফ্লেচার এবং টমাস ডেকারের। এঁরা সকলেই সেক্সপীয়রের সমসাময়িক ছিলেন এবং এঁদের যথেষ্ট জনপ্রিয়তাও ছিলো। রাণী প্রথম এলিজাবেথ স্বয়ং তাঁর সময়কার প্রত্যেক নাট্যকার এবং অভিনেতাকে উৎসাহ জোগাতেন।

এলিজাবেথীয় যুগে নাট্যসাহিত্যের যে হারে উন্নতি হয়েছে রঙ্গমঞ্চের যে সে হারে হয়নি তা' দেখে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করে থাকেন। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখলেই আমরা এর প্রকৃত কারণ খুঁজে পেতে পারি। এ যুগে গদ্য এবং মিলহীন পদ্য দু'রকম ভাবেই নাটক রচিত হতো এবং শেষোক্ত ভাবে অভিনয়ের সময় আবেগ প্রকাশ করা খুবই স্বাভাবিক হ'তো বলে সেক্সপীয়র সহ প্রায় সকলেই কিছু না কিছু এই মিলহীন পদ্যে রচনা করতেন। বেশির ভাগ নাটকে, বিশেষ করে ট্র্যাজিক নাটকে দেখা যায় অনেক সময় নায়ক বা নায়িকা একাই মঞ্চের ওপর রয়েছে। কথার মাধ্যমে হয়তো তার কোনো বিশেষ চিন্তা বা মানসিকতার পরিচয় দেওয়া হ'চ্ছে। এ সমস্ত সময় দেখা গেছে পদ্যের চাইতে অন্য কিছু না হলে মানায় না। মিলক পদ্য হলে ব্যাপারটা খুবই জলো ঠেকতো, আবার সমিল পদ্য হলেও বাড়াবাড়ি হয়ে যেতো, তাই নাট্যকারগণ মিলহীন পদ্যের প্রচলন করেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যে দেখা গিয়েছিল দর্শকমণ্ডলী এই মিলহীন পদ্যের কথোপকথন খুবই উপভোগ করছেন। ওদিকে মঞ্চের ওপর অভিনয় হচ্ছে আর এদিকে দর্শকমণ্ডলী সরবে বৈষয়িক বা রাজনৈতিক আলোচনায় মশগুল

হয়ে রয়েছেন—গল্পে যখন অভিনয় হতো তখন ছিলো এই অবস্থা। কিন্তু সেই মিলহীন গদ্যে কথোপকথন প্রচলিত হলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যেও বিরাট পরিবর্তন দেখা গেলো। আইনকানুনের প্রয়োগ ছাড়াই নাটকের রস উপভোগ করবার জন্যে এবং অভিনেতাদের প্রতিটি ছন্দোবদ্ধ কথা শুনবার আগ্রহে নিজেরাই চুপ হয়ে যাচ্ছেন। বলাই বাহুল্য এই নীরবতা নির্বাক বিস্ময়ে পরিণত হতো যখন সেক্সপীয়রের কোনো প্রথম শ্রেণীর নাটকের অভিনয় হতো। যেমন হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, জুলিয়াস সীজার, এ্যান্টনী এণ্ড ক্লিওপেট্রা, রোমিও এণ্ড জুলিয়েট, রিচার্ড দি থার্ড বা হেনরী দি ফোর্থ বা টেম্পেস্টের অভিনয় হতো। সে যুগে ইংলণ্ডের দর্শকমণ্ডলী বাক্-প্রাচুর্য এবং অভিনাটকীয়তা ভালোবাসতেন। সেক্সপীয়রের নাটকে এ দু'টি জিনিষেরই এমন প্রাচুর্য দেখা গেলো যার বিস্ময়ের ঘোর ঘোরহয় আজো একেবারে কাটেনি। এতে তো সেক্সপীয়রের নাটকের চরিত্রগুলি কথোপকথনের মধ্যে সম্পূর্ণ জীবন্ত হয়ে উঠতো, আর তাদের দৃশ্যাবলীর বর্ণনাও তাঁর নাটকে এমনই বিস্তারিত এবং যথার্থভাবে করা হতো যে সাধারণ কল্পনাশক্তির দর্শকের সামনেও দৃশ্যটি সজীব এবং প্রকৃত হয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতো। কাজে কাজেই কৃত্রিম উপায়ে রঙ্গমঞ্চের উপর যে সুসজ্জিত বিশেষ বিশেষ দৃশ্য তার কোনো অভাবই বোধ হতো না। কথায় রঙেই সেক্সপীয়র মঞ্চের দৃশ্যাবলীতে রঙের অভাব মেটাতে পেরেছিলেন।

রঙ্গমঞ্চের টেকনিক্যাল দিকে অর্থাৎ দৃশ্যাবলী সৃষ্টির ব্যাপারে বিশেষ উন্নতি না হলেও অভিনেতাদের পোশাকে সেক্সপীয়রের সময় প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। দলের মধ্যে অভিনয় হ'তো কাজেই দর্শকেরা মঞ্চের একেবারে কোল ঘেঁষে বসতে আরম্ভ করলেন। কাজেই একদিকে যেমন পোশাকের ওপর জোর দেওয়া হতো, অন্য একদিকে তেমনি জোর দেওয়া হতো মুখভঙ্গীর ওপর। আবেগ প্রকাশের নিশ্চিত উপায় হিসেবে মুখ, চোখ এবং অন্যান্য অঙ্গভঙ্গীর গুরুত্ব এবং অপরিহার্যতা কয়েক শ' বছর পূর্ব থেকেই যদিও স্বীকৃত ছিলো, কিন্তু সেক্সপীয়রের সময়েই প্রথম এর দক্ষতা অর্জনের জন্যে শিল্পীদের বিশেষভাবে শিক্ষা এবং অনুশীলনের জন্যে বন্দোবস্ত করা হতো।

সে যুগে মেয়েদের পার্ট ছেলেরাই করতো। হ্যামলেট নাটকে যে কিশোরটি প্রথম ওফেলিয়ার অভিনয় করেছিল তাকে মাঝে মাঝেই দেখা যেতো দর্শকদের মধ্যে হয়তো তার কোনো বন্ধুবান্ধবের পাশে বসে রয়েছে। সেক্সপীয়র দেখলেন যে এতে দর্শকদের মনে নাটকের প্রভাব ঠিক ঠিক মতো হয় না—কিছুটা যেন ছেলেখেলার মতো হয়ে যায়। তাই তিনিই প্রথম নিয়ম করেছিলেন যে নাটকের অভিনয় চলা অবস্থায় সেই নাটকে অংশগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তি অভিনয়ের পোশাক পরে দর্শকদের জায়গায় যেতে পারবে না।

একটানা শতাধিক বছর একাধিপত্যের পরে দেখা গেলো ব্রিটিশ দর্শক সমাজের রুচিতে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ, অন্যান্য নাট্যকারদের রচনাও তাঁরা ভালোবাসতে আরম্ভ করেছেন। এঁদের মধ্যে উইলিয়াম কনগ্রেভ, অলিভার গোল্ডস্মিথ এবং রিচার্ড ব্রিনস্লী শেরিডান বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। কনগ্রেভের 'দি কোয়াইট ডেভিল', 'দি এজেড ব্যাচেলরস'; গোল্ডস্মিথের 'এ ওড-নেচারড্ ম্যান' এবং 'শী স্টুপস টু কনকার'; এবং শেরিডানের 'দি রাইভালস্' এবং 'দি স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল' সে যুগে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ্যাডিসনের 'ক্যাটো' মঞ্চস্থ হবার পরেও প্রচুর দর্শক সমাগম হতো।

এরপর কিছুকালের জন্যে ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চের দুর্দিন গিয়েছে বলতে হবে। কারণ অন্ততঃ অর্ধশতাব্দী রঙ্গমঞ্চের কর্মকর্তাদের স্প্যানীশ, ফরাসী বা জার্মান অনুবাদ নাটকের ওপর নির্ভর করে চলতে দেখা

গেছে। জার্মানীর গোটে, শিলার বা ক্লপস্টকের নাটক, ফ্রান্সের মলিয়ের, কর্নেই বা রেসিনের নাটক বা স্পেনের লোপ ভ ভেগা এবং কালদেরনের নাটক ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ইংরেজী নাট্যসাহিত্যকে ফের ঘরমুখো করে তুলবার জন্যে যাঁরা অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা সকলেই ছিলেন মূলত কবি। যেমন শেলী, বায়রণ, ব্রাউনিঙ প্রভৃতি। তাঁদের ওপর অনন্যসাধারণ দখল থাকবার জন্যে এঁরাও প্রত্যেকে একাধিক প্রথম শ্রেণীর নাটক রচনা করেছিলেন এবং সে সব সাফল্যের সঙ্গেই মঞ্চস্থ হতো।

কিন্তু এঁদের সময় পর্যন্তও দেখা গেছে রঙ্গমঞ্চের অবস্থার বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেনি। এ সময় পর্যন্ত প্রাসাদের দৃশ্যের অভিনয় এক শ কি দু'শো বছর পূর্বের মতোই হতো। অর্থাৎ সীনে আঁকা প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করা হতো।

ব্রিটেনে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যাবলীর ব্যাপারে যে আধুনিকতা আজকের দিনে পরিলক্ষিত হয় তার জন্যে কৃতিত্ব প্রধানত দু'জনের। একজন নরওয়ের ইবসেন এবং অন্যজন আয়ার্ল্যাণ্ডের অস্কার ওয়াইল্ড। ইবসেন তাঁর জীবদ্দশাতেই ইংলণ্ডে এতই জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে তাঁর যে কোনো নতুন নাটক স্বদেশে প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজীতেও অনূদিত হতো এবং তার অভিনয় সুরু হয়ে যেতো। অস্কার ওয়াইল্ডের নাটকের সুষ্ঠু অভিনয়ের জন্যে যেমন বাস্তবের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন হতো মঞ্চের ওপর—ইবসেনের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি হতো—সুসজ্জিত ড্রয়িং রুম, অগোছালো লাইব্রেরী বা সুরুচি সম্পন্ন কোনো শিক্ষিতা তরুণীর বেডরুম এ সমস্ত দৃশ্যাবলীতে একটা বাস্তবের পরশ লাগাবার প্রয়াস দেখা গেলো ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চে। ইংলণ্ডে প্রথমে ইবসেনপন্থী নাট্যকার আর্থার পিনেরোও চাইতেন তাঁর নাটকের জন্যে এই ধরনের দৃশ্যাবলী। তারপরে আবির্ভাব ঘটলো বার্নার্ড শ-এর।

নাট্যসাহিত্য তথা রঙ্গমঞ্চের বিবর্তনের ব্যাপারে বার্নার্ড শ নিজেই একটি যুগ বিশেষ। এ কথা সন্দেহাতীতভাবেই বলা যায় যে স্বয়ং সেক্সপীয়রের পরে শ'-এর সমকক্ষ আর কোনো একক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়নি ইংলণ্ডের নাট্যসাহিত্য তথা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে। পিনেরো বা ওয়াইল্ড জনপ্রিয় অবশ্যই হয়েছিলেন। নাটকের প্লাট কখোপকথন রচনায় ওয়াইল্ডের আশ্চর্য ক্ষমতা দেখলে এমনকি আজ সত্তর আশী বছর পরেও বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। বাস্তব জীবন থেকে একটি জটিল অবস্থা বেছে নিয়ে নাটক রচনায় পিনেরোর দক্ষতায় এমন কি মুগ্ধ শ'ও ঈর্ষান্বিত হতেন। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এ কথা বলতেই হবে যে আধুনিক যুগে ইংলণ্ডে নাটকের প্রসঙ্গে শ-এর দ্বিতীয় নেই। শ তাঁর দীর্ঘ জীবনে একটানা প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রসের পরিবেশন করেছেন তাঁর নাটকে; বিভিন্নমুখী সমস্যার অবতারণা করে শ' তাঁর দর্শকমণ্ডলীকে ভাবিত করে তুলতেন। আপাতদৃষ্টিতে একান্ত সাধারণ পরিবেশ বা সামাজিক সম্পর্কের ভেতর যে অসংখ্য প্রশ্ন লুকিয়ে রয়েছে ইবসেনের পন্থাই অনুসরণ করে শ'ই তা তাঁর পাঠক এবং দর্শকের সামনে তাঁর বিচিত্র স্নেহপূর্ণ সংযত কথোপকথনের মধ্যে প্রকাশ করতেন। শ' এর আর্মস এণ্ড দি ম্যান, ক্যাণ্ডিডা, সীজার এণ্ড ক্লিওপেত্রা, ম্যান এণ্ড সুপারম্যান, দি ডেভিলস ডিসাইপল, হার্টব্রেক হাউস, সন্ত জোয়ান, উইডোয়ারস হাউসেস, ডন জুয়ান ইন হেল প্রভৃতি বিভিন্ন বিচিত্র ধর্মী নাটক শুধু যে ইংরেজী সাহিত্যে নবযুগের সৃষ্টি করেছে তাই নয়, রঙ্গমঞ্চে ব্যবস্থাপনাতেও একটি পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব ঘটিয়েছে বলা যায়। কারণ আজকের ব্রিটেনে শ' বা অন্য যে কোনো নাট্যকারের যে কোনো নাটকের অভিনয়ের সময় রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন দৃশ্য এমন ভাবে তৈরীর

করা হয় যে দর্শকের অন্তত সাময়িকবিভ্রান্তি ঘটিয়ে দেয়। শ' বলতেন যে মানুষের শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করে তুলবার জন্যেই তিনি নাটক রচনা করে থাকেন—শ'য়ের আমলে গ্রেট ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চে যে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের পবিত্র কর্তব্যেরও প্রয়াস দেখা দিয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য।

শ'য়ের প্রতিভা যখন ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের প্রায় বারো আনাই দখল করে ছিল সেই সময় অন্তত দু'জন ইংরেজের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা ছিলেন একাধারে গল্পকার, উপন্যাসিক এবং সেই সঙ্গে প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার। তাঁদের নাম জন গলসওয়ার্দী ও সমারসেট মম্। গলসওয়ার্দীর লয়্যালটিস, জাস্টিস এবং স্ট্রাইফ আজকের দিনেও ব্রিটেনের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে থাকে, এবং শ-য়ের মতো গলসওয়ার্দীরও একটা নিজস্ব জোরালো সমাজমুখী বক্তব্য ছিল বলেই রঙ্গমঞ্চে অকারণ সাজসজ্জার চাইতে বাস্তবের অনুরূপ পরিবেশ সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব দিতেন। দৃশ্যসজ্জার ব্যাপারে সব চাইতে নৈপুণ্য দেখা যায় মমের নাটক মঞ্চস্থ করবার ব্যাপারে। মমের কোনো নাটকে হয়তো সুদূর কোরিয়ার পরিবেশ, কোনো নাটকে মধ্য আমেরিকার আবার কোনো নাটকে হয়তো বাস ইংলণ্ডের সহরতলীর কোনো নষ্ট অঞ্চলের। ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চের কলা কুশলীগণ প্রায় সকলেই এ কথা স্বীকার করে থাকেন যে মমের নাটকের জন্যে পরিবেশ সৃষ্টি করা যতো কষ্টসাধ্য ব্যাপার অতোটা আর কারো জন্য নয়।

জর্জ বার্ণার্ড শ

এরপর আমরা একেবারে বর্তমান সময়ে এসে পৌঁছই। আজকের ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে একদিন যেমন হামেশাই একেবারে বাস্তবজীবনের অনুরূপ দৃশ্য রচনা করা হয়ে থাকে; নাটকের ভাঁড়ও তেমনি লক্ষণীয়। ফ্রাইসনি এবং ওয়েসস-এর কিছু কিছু নয়ের নাট্যরূপ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এক সময়। প্রসঙ্গত ফ্রাইসনির গিয়োকোণ্ডা স্মাইল এবং ওয়েসস-এর আর তেরোনিকার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইয়েটস-এর বিচিত্র নাটকগুলিও একসময় অদৃশ্য দর্শকের সমাগম ঘটাতো ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চগুলিতে। আজকের দিনে জে, বি, প্রীস্টলি, জেমস ব্রীডি, নোয়েল কোয়ার্ড প্রভৃতির বিভিন্ন নাটকের পাশাপাশি সীন ও' কেসী, শ্রীটোফার ফ্রাই; টি, এস, এলিয়ট, আর্থার মিলার, টেনেসী উইলিয়ামস এবং লেডী গ্রেগরীর বিভিন্ন একাঙ্ক বা পূর্ণাঙ্গ নাটকের প্রচলন দেখা যায়। এঁদের মধ্যে টেনেসী উইলিয়ামস-এর জনপ্রিয়তা অবশ্য আটলান্টিকের অপর পারে অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই সর্বাধিক—কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের রঙ্গমঞ্চেও আজকের দিনে তাঁর প্রভাব কম নয়; অন্তত: দু'খানা নাটকের মঞ্চরূপ একবার সাক্ষ্য বহন করে: এ স্ট্রীট কার নেমড্ ডিসায়ার এবং এ ক্যাট অন এ হট টিন রুফ।

করপুটে নীলাকমল যাদের
কালো কেশে গাঁথা কুন্দ কটি।
লোধ্র পরাগ স্নিগ্ধমুখে রেখা
পাণ্ডু কান্তি দিয়েছে রচি।
—কালিদাস

ঘন কুঞ্চিত কালো কেশ ফুলদলের মতো বিকশিত করে নারীর সৌন্দর্য্য। যুগ যুগ ধ'রে বিশ্বের নারীরা কেশ বিন্যাসের জন্য **অলিভ অয়েল** মেখে আসছেন। ক্যালকেমিকোর ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল **ক্যান্থারলে** আছে কেশের পক্ষে হিতকারী বিশুদ্ধ সেই **অলিভ অয়েল**। তাই আজও আধুনিকারা পরম আগ্রহে এই কেশ তৈল ব্যবহার করেন।

নতুন সুদৃশ্য ছাট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। ছয় শিশিও ঐরূপ পাওয়া যাইবে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পন্ন ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

AMCC. 8-3

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা

ফোন : ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

// এই সংখ্যায় //

সম্পাদকীয়—	১০৫
উদাত্ত আহ্বান—	১০৭
অন্তরীক্ষে (ব্যঙ্গচিত্র)	১১১
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১১৩
ডেম্ লোরা নাইট্—অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১২০
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১২২
চিঠি শুধু চিঠি নয়—	১২৬
বীরবলের কৌতুক—বরুচি	১২৭
কোন এক বিনিদ্র রাত—সত্যপ্রিয় ঘোষ	১৩০
চল্‌তি দুনিয়া—	১৩৬
শুক্তি-সৈকত (উপন্যাস)—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	১৩৯
একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	১৭৮

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

এখনকার বাচ্চারা ভারী ছোটদের ভালোবাসে আইসক্রীম,—কে. সি. দাসের রসগোল্লা হলে তো কথাই নেই। কে. সি. দাসের টিনের রসগোল্লা যেমনি সুস্বাদু তেমনি বিশুদ্ধ, পুষ্টিও ঢের বেশী। একটা টিন আজই কিনুন—নিজেরাও খান ছেলেমেয়েদেরও খাওয়ান।

দাম :
ছোট টিন টাঃ ১.২৫
মাঝারি টিন টাঃ ২.৫০
বড় টিন টাঃ ৫৲

কে. সি. দাস প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই

JWTKCD 2A

এই সংখ্যায়

অমৃত কথা ও কাহিনী— ১৫২

সঙ্গীতনায়ক আচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়— ১৫৩

বিদূষক, ভাঁড়, আহ্লাদে—বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৬

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়— ১৫৯

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ—প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৬১

সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ১৬২

যাযাবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ১৬৪

এই প্রথম—দৃষ্টিভঙ্গী—পুষ্পদল ভট্টাচার্য ১৬৫

বিশ্ব-সাহিত্য—

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—অ্যালবার্ট সোয়াইট্‌জার—সুকুমার ঘোষ ১৭২

দেশ-বিদেশ— ১৭৭

খেলাধূলা— ১৮৭

ব্রিটিশ ভাস্কর্য—অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত ১৮৯

॥ সাহিত্যের উপাচার ॥

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত বই :

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য [১৫·০০

সাহিত্যের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্বলিত প্রথম ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। শাক্ত পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ আকর-গ্রন্থ :

বৈষ্ণব পদাবলী [১২·০০]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত :

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস, মোট ছয়খানি একত্রে [১২·০০]

দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [১২·০০]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস মোট ছয়খানি একত্রে [৯·০০]

ডঃ সুকুমার সেন-এর ভূমিকা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ও বহু রঙীন চিত্রে সংযোজিত আধুনিক সংস্করণ :

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত [৯·০০]

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রাঞ্জল আলোচনা :

রবীন্দ্র-দর্শন [২·৫০]

একই লেখকের বহু প্রতীক্ষিত গ্রন্থ প্রকাশিত হইল

উপনিষদের দর্শন

বাঙলা সাহিত্যের নিত্যসঙ্গী :

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান [৮·৫০]

সাহিত্য সংসদ

৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

মৃত সঞ্জীবনী সুরা

আয়ুর্বেদোক্ত অমৃত তুল্য মহৌষধ।

গুণে, গন্ধে ও বর্ণে যথাযথ ও শাস্ত্রানুরূপ।

সতেজ করিয়া স্বাস্থ্যোজ্জ্বল জীবন দান করে।

মূল্য—৪৲ টাকা পাইট ও ৭৷৷০ টাকা কোয়ার্ট

অধ্যক্ষ অমূল্য বাবুর

শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা প্রাইভেট লিঃ

কারখানা : ঢাকা (পূর্ব পাকিস্তান) ও চন্দননগর (ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন)

মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৩ এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৫৫-২৩৪৮

রেলের কামরা পরিচ্ছন্ন রাখুন

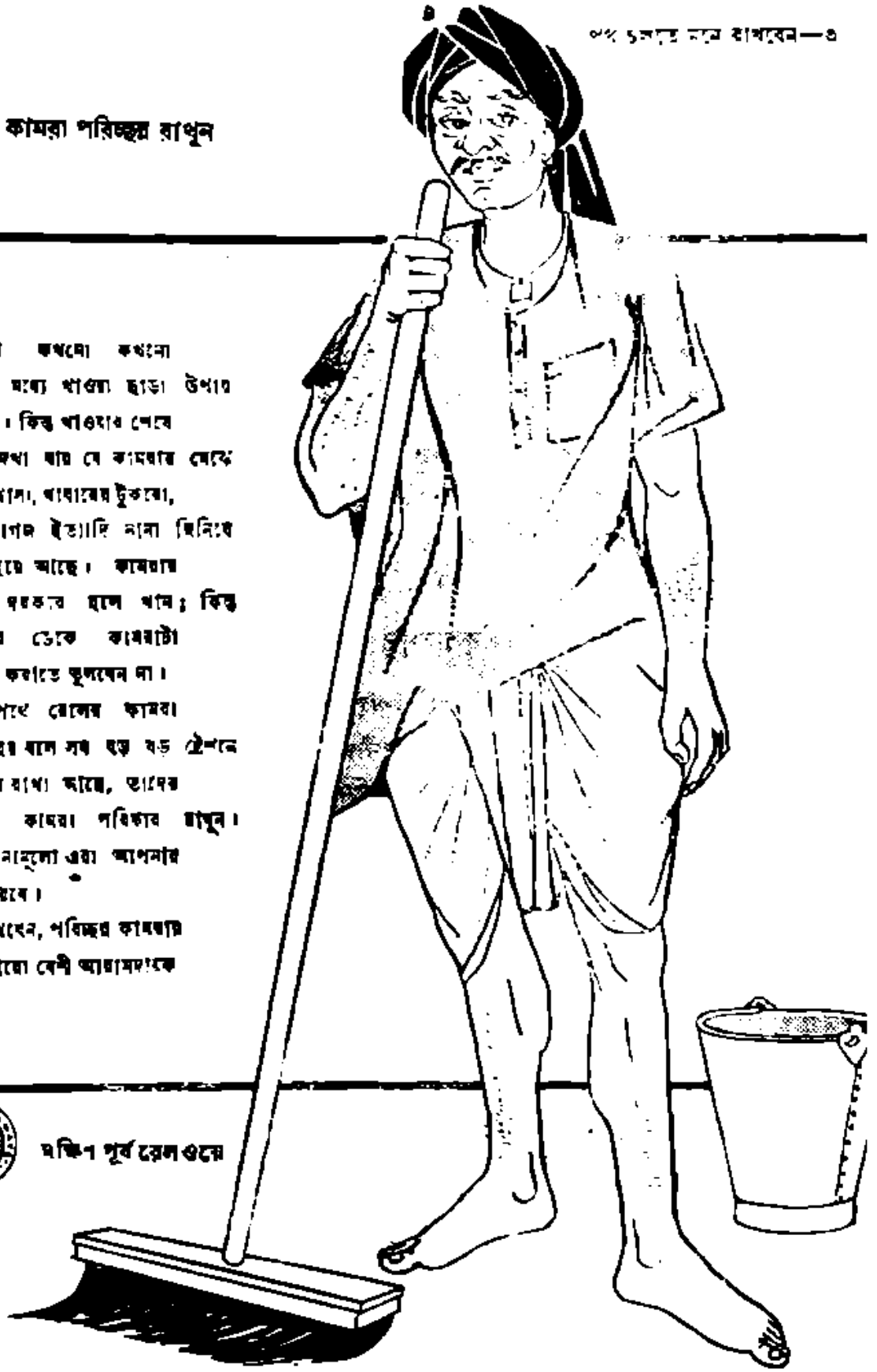

যাত্রাপথে কখনো কখনো
কামরার মধ্যে খাওয়া ছাড়া উপায়
থাকে না। কিন্তু খাওয়ার শেষে
প্রায়ই দেখা যায় যে কামরার মেঝে
জলের খোলা, খাবারের টুকরো,
ছেঁড়া কাগজ ইত্যাদি নানা জিনিষে
নোংরা হয়ে আছে। কামরার
খাবার বরকার হলে খান; কিন্তু
যাতায়াত শেষে কামরাটা
পরিষ্কার করতে ভুলবেন না।
চলার পথে রেলের কামরা
নোংরা হয় বলে সব বড় বড় ষ্টেশনে
ঝাড়ুদার রাখা আছে, তাদের
সাহায্যে কামরা পরিষ্কার রাখুন।
সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এরা আপনার
কাজ করবে।
মনে রাখবেন, পরিচ্ছন্ন কামরায়
ভ্রমণ আরো বেশী আরামদায়ক

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আষাঢ় মাসে গল্প-ভারতী অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিবে।

যেকোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। বার্ষিক চাঁদার হার ভারতবর্ষ ও পাকিস্থানে সডাক ১৫৲ টাকা। ভারতের বাহিরেও নির্দ্ধারিত মূল্যে কাগজ পাঠান হয়।

প্রতি সংখ্যা গ্রাহকদিগের নিকট সার্টিফিকেট অফ্ পোষ্টিংয়ে প্রেরিত হয়।

বার্ষিক গ্রাহকগণ কোনরূপ অতিরিক্ত মূল্য না দিয়া বিরাট পূজা সংখ্যা ও অন্যান্য বিশেষ সংখ্যাগুলি পাইয়া থাকেন।

আমাদের পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদের দেয় চাঁদা সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। চিঠি-পত্র লিখিবার সময় বা টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

লেখকগণের প্রতি নিবেদন

তাঁহারা যেন কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া ও উহার নকল রাখিয়া তাঁহাদের রচনা পাঠান। রচনা মনোনীত হইলে যথাসময়ে প্রকাশ করা হয় ও লেখকগণকে যথারীতি জানান হয়। অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

এজেণ্ট আবশ্যক

ভারতের সর্ব্বত্র যেখানে আমাদের কোন এজেণ্ট নাই সেখানে এজেণ্ট আবশ্যক। এজেণ্টগণকে শতকরা ২৫৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়। বই পাঠানর ব্যয় আমরা বহন করি **টাকা ও চেক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের নামে পাঠাইবেন।**

ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড

২৭৯ বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬

Gram :-GALPAKATHA

ফোন : ৫৫-৩২১৪

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

মানে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম্

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

ভয়েস অব আমেরিকার

বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন—

প্রত্যহ :

সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ

১৯·৪৬, ২৫·৫৮ ও ৪২·১৯ মিটারে

গ্রন্থশ্রী সংবাদ — এইমাত্র বের হলো

আনন্দবাজারে প্রকাশিত অসমঞ্জ মিত্র প্রণীত

ইতিহাসের নায়িকা ২·৫০

ইতিহাসের কয়েকটি ছেঁড়া পাতার জোড়া কাহিনী ইতিহাসের চেয়েও চমকপ্রদ ভঙ্গিতে লেখা। পাতায় পাতায় চণ্ডী লাহিড়ীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে সজীব কয়েকটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নারীর জীবন-কাহিনী।

। আরো কয়েকখানি বই ।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

চোখের বাহিরে ··· ২·৫০

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস

যদি জানতেম ··· ৪·০০

কন্যা মৃগয়া ··· ৩·০০

সাতদিন (ছোট গল্প) ··· ২·৫০

সুবোধ ঘোষের উপন্যাস

মুক্তিপ্রয়া ··· ২·৫০

চিত্তরঞ্জন মাইতির উপন্যাস

ডাক্তার জনসনের ডায়েরী ৩·০০

বারীন্দ্রনাথ দাশের উপন্যাস

অনেক সন্ধ্যা একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০

প্রভাত দেব সরকারের উপন্যাস

মধুর এমন ··· ৩·০০

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিঃ

১৭০।১৩, প্রিন্স আনোয়ার সা রোড,

কলিকাতা-৩৩

গল্প-ভারতী
শ্রাবণ ১৩৭০

সম্পাদকীয়

স্বাধীনতা দিবস

স্বাধীনতা দিবস — আজ এক বিরাট পরীক্ষার দিন। জাতীয় জীবনের এই পরম স্মরণীয় দিন—আজ দেশের ও জনসাধারণের ইতিহাসে এক নব অভ্যুদয়ের সূচনা করুক এই আমরা একান্তভাবে কামনা করি। এই দিনে দেশবাসী সঙ্কল্প গ্রহণ করুন জাতির ও দেশের স্বার্থে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত স্বার্থকে তাঁরা বিসর্জন দেবেন। একটি সবল সুস্থ ও শক্তিশালী জাতি গঠনের জন্য আজ আমাদের সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হতে হবে। চরমতম আত্মত্যাগের জন্য আজ আমাদের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির প্রয়োজন। প্রকৃত মানুষের মত শত্রুচক্র-সংগ্রামী সৈনিকের মত যাতে আমরা এই জাতীয় অগ্নি-পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারি তার জন্য আজ একান্তভাবে তৈরী হতে হবে। স্বাধীনতা দিবসে এই আমাদের স্বপ্ন—এই আমাদের কামনা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

গল্প-ভারতীর প্রথম সম্পাদক কুশলী ও বিদগ্ধ প্রতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে গল্প-ভারতী তাঁর একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগ বেদনা অনুভব করছে। গল্প-ভারতীর সংগে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের দীর্ঘদিন ধরে যে সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল তা শুধু সম্পাদকীয় সম্পর্ক নয়—বাস্তবক্ষেত্রে সাহিত্যিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের বহুমুখী ও সৃজন প্রতিভার পরিচয় গল্প-ভারতীর পাতায়ই বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প-ভারতীতে সুদীর্ঘকাল ধরে "দিব্য সাহিত্যের কাহিনী" "মহাভারতের কথা" যে কথা আপনিও ভাবছেন "রোজনামচা" প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের লেখনীর সাহায্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের অনবদ্য লেখনী শৈলীর সংগে বাংলা সাহিত্যের রসজ্ঞ ও বিদগ্ধ পাঠক সমাজ প্রথম পরিচিত হন। কল্লোলযুগে যে নৃপেন্দ্র-প্রতিভার অভ্যুদয়—গল্প-ভারতীর সম্পাদকীয় আসরে সেই নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের প্রতিভা পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করেছিল। বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যে অনন্যসাধারণ রচনা শৈলীর সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত "চক্র ও চক্রান্ত" তার চিরন্তন সাক্ষ্য বহন করবে। জীবনী ও অনুবাদ সাহিত্যে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ যে নবধারার প্রবর্তন করেছেন সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যে তা একান্ত বিস্ময়কর। বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য রচনাবলীর সংগে

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণই প্রথম বাঙালী পাঠক সমাজকে পরিচিত করার জন্ত প্রয়াসী হন। এই বিষয়ে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর লেখনী—তাঁর অতুলনীয় সাহিত্য-প্রতিভা—সর্বোপরি হৃদয়ের ঔদার্যের জন্ত সর্বজনের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসার পাত্র ছিলেন। তিনি ছিলেন জাত সাহিত্যিক। প্রকৃত সাহিত্যিকের মতই তিনি আদর্শ ও নিষ্ঠার অনুসরণ করেছেন।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মৃত্যু আজ প্রত্যেক বাঙালী সাহিত্যিকের সামনে, বাংলার সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে তার ইতিহাস-গত-দিব্যচেতনাকে জাগিয়ে তুলুক। বাঙালীর ভাব-জীবনের মহৎ ঐতিহ্য সম্বন্ধে, বাংলা সাহিত্যের সুমহান সম্ভাবনা সম্বন্ধে দীপ্যমান হয়ে উঠুক বাঙালীর চেতনা। যে আত্মিক ভাব-সম্পদের উত্তরাধিকারী আমরা এবং যার কথা ভুলে আমরা বিপথে বিভ্রান্ত হয়ে চলেছি, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ ধীরে ধীরে নিজের নিঃসঙ্গ সাধনায়—সেই আলোকপথের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন। আত্মিকতা যতক্ষণ না জীবনের প্রতিদিনের বাস্তব দৈনন্দিনতায় সত্য হয়ে উঠছে ততক্ষণ সাহিত্যে তার অমৃত রূপ সত্য হয়ে উঠবে না। জীবন ও সাহিত্যকে এক ধর্মী হতে হবে। সাহিত্য হবে জীবনের পরম উপলব্ধির বাণী। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম—উপলব্ধির স্তরে সেই জীবন ও সাহিত্যের একধর্মিতা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমরা আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

সঙ্গীত সাধক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত সাধক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেহাবসানে ভারতের সঙ্গীত জগৎ বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হল। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অনন্তসাধারণ ও বিস্ময়কর প্রতিভা। সঙ্গীত—ভারতের এক বিরাট আত্মিক সম্পদ—সেই সম্পদের পরিপূর্ণ অধিকারীত্বের দাবী নিয়ে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বজনের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছেন। তাঁর অতুলনীয় প্রতিভার জন্ত কবিগুরু তাঁকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। নিজের প্রতিভার দীপ্ত মহিমায় গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় চিরকাল সঙ্গীত-জগতের কর্ণধারের সম্মান লাভ করবেন।

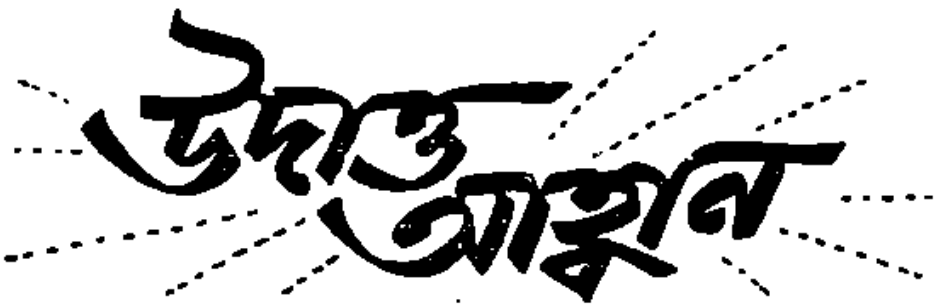

ভারতবিধাতা

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।

জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ সিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী।
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।

জনগণ-ঐক্যবিধায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী,—
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সংকটদুঃখত্রাতা।

জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥
ঘোর তিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নত-নয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।

জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।
রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরিভালে—
গাহে বিহঙ্গম, পুণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।

জয় জয় জয় হে, জয় রাজেশ্বর ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রচনাকাল : ১৩৩৮

JANA-GANA-MANA ADHINAYAKA

(English Translation By The Poet.)

Thou art the ruler of the minds of all people,
Thou Dispenser of India's destiny.
The name rouses the hearts of the Punjab, Sind,
Gujrat and Maratha, of Dravid, Orissa and Bengal.

It echoes in the hills of the Vindhyas and Himalayas,
mingles in the music of Jumna and Ganges,
and is chanted by the waves of the Indian Sea.

They pray for thy blessing and sing thy praise,
Thou Dispenser of India's destiny,
Victory, Victory, Victory to thee.

Day and night, thy voice goes out from land to land,
calling Hindus, Buddhists,
Sikhs and Jains round thy throne and Parsees,
Mussalmans and Christians.

Offerings are brought to thy shrine by the East
and the West to be woven in a garland of love.

Thou bringest the hearts of all peoples into the
harmony of one life.

Thou Dispenser of India's destiny,
Victory, Victory, Victory to thee.

Eternal Charioteer, thou drivest man's history
along the road rugged with rises and falls of Nations.

Amidst all tribulations and terror thy trumpet
sounds to hearten those that despair and droop,
and guide all people in their paths of peril
and pilgrimage.

Thou dispenser of India's destiny,
Victory, Victory, Victory to thee.

When the long dreary night was dense with gloom
and the country lay still in a stupor,
thy Mother's arms held her, thy wakeful eyes bent
upon her face, till she was rescued from the
dark evil dreams that oppressed her spirit,
Thou Dispenser of India's destiny,
Victory, Victory, Victory to thee.

The night dawns, the Sun rises in the East, the
birds sing, the morning breeze brings a stir of
new life.

Touched by the golden rays of thy love
India wakes up and bends her head at thy feet.

Thou King of all kings,
Thou Dispenser of India's destiny,

Victory, Victory, Victory to thee
Jaya he, jaya he, jaya he, jaya jaya jaya jaya jaya he.

Publication : 1917.

অন্তরীক্ষে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

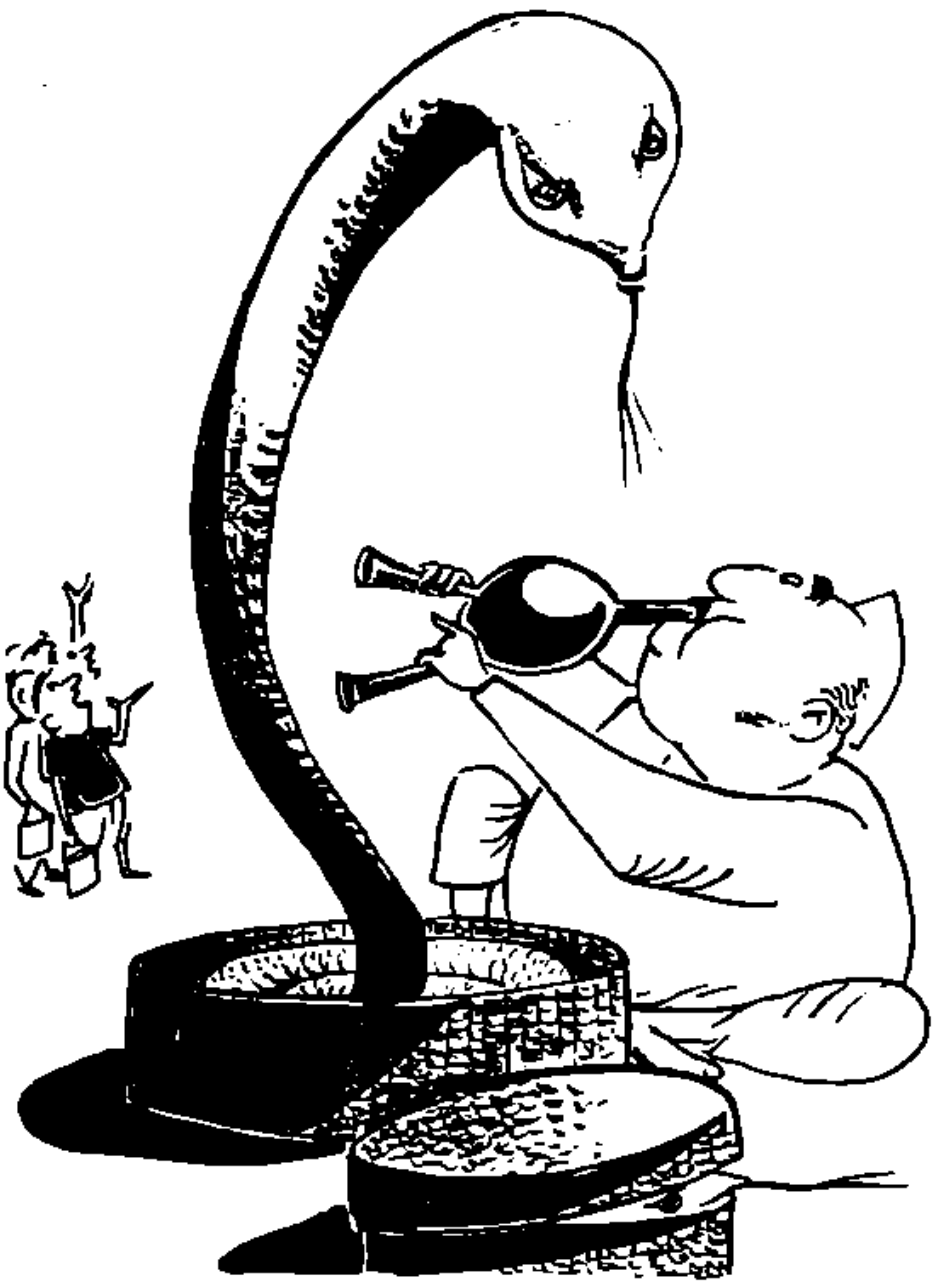

আরো……আরো!!

দেশসেবা

সেকাল আর একাল

সংবাদে রুচি

অশ্লীল সাহিত্য

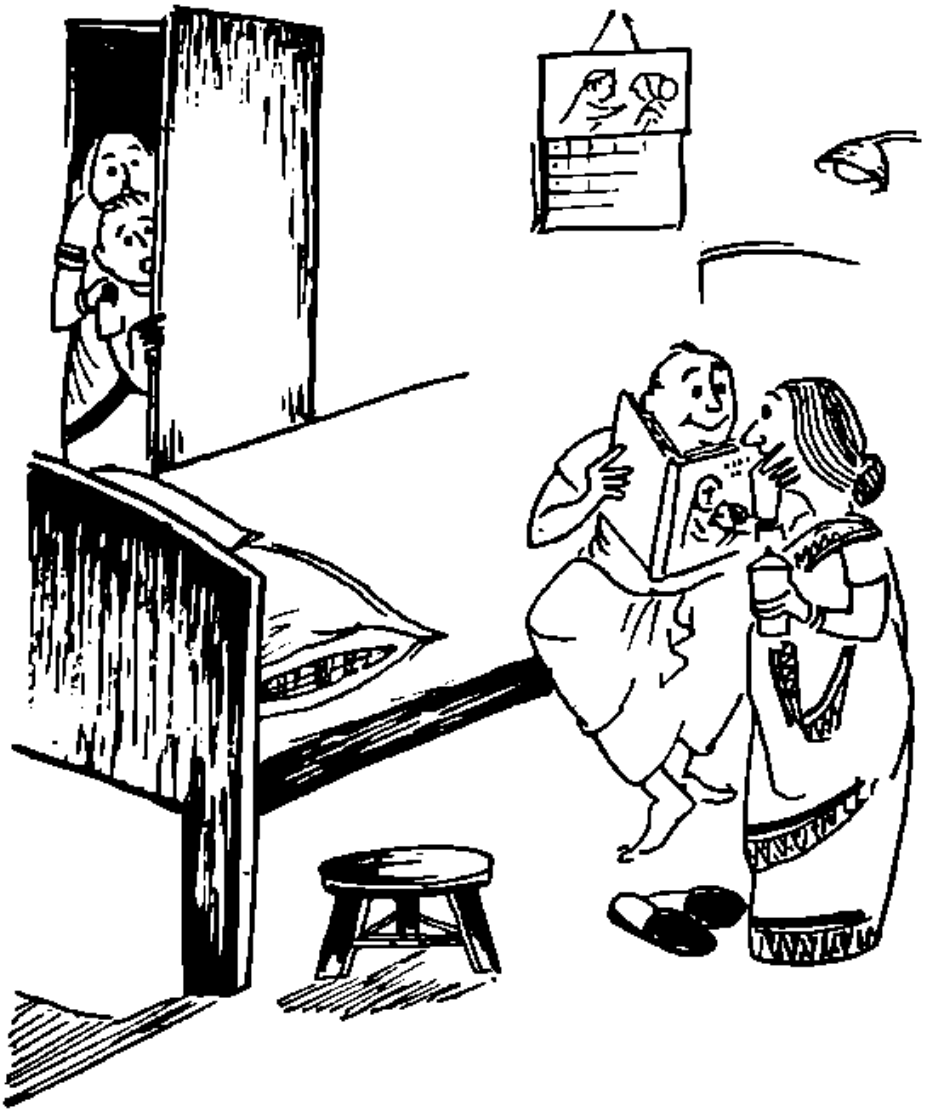

এবার এদের পালা!

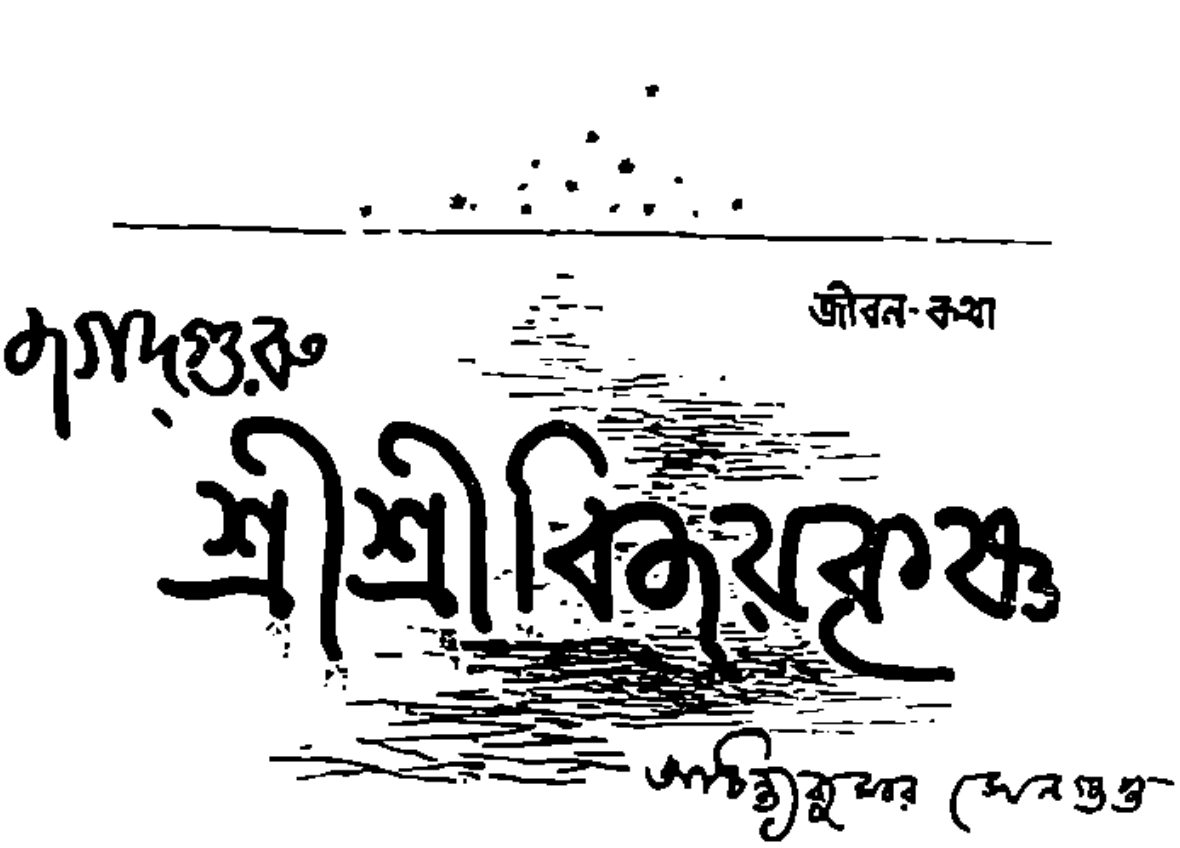

১৪

বিন্ধ্যাচলে নির্জনে সাধন করতে লাগল বিজয়। শুরুবলে তার অন্তরে জ্বলে উঠল নামাগ্নি। আর এই নামাগ্নিই আসল পরীক্ষা।

এই আগুনেই বিষয় বাসনা বিনিঃশেষে দগ্ধ হয়ে যায়। এরই নাম অন্তর নির্মল।

কিন্তু এ বড় ক্লেশকর অবস্থা। বলতে পারা যায়, ভয়ঙ্কর অবস্থা। শুধু দাহ আর দাহ। সমস্ত বাহ্যজগৎ বিষতুল্য। যেন রৌদ্রে কোথাও মৃদুছায়া নেই; নেই বা জলধারা। শুধু এক নিরন্ত যন্ত্রণা। একমাত্র যা ইষ্ট জাগে তা আত্মহত্যার।

এই অবস্থায় পড়ে সনাতন জগন্নাথের রথের নিচে পড়তে চেয়েছিল, রঘুনাথ চেয়েছিল পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিতে। মহাপ্রভু সনাতনকে নিবৃত্ত করেন, রঘুনাথকে স্বয়ং সনাতন।

নামাগ্নিতে দগ্ধ হতে-হতে বিজয়ও বুঝি উন্মাদ হয়ে গেল। ঠিক করল আত্মহত্যা করবে।

তারও পিছনে সক্রিয় গুরুশক্তি। টেনে রাখল বিজয়কে।

'পোবো। আলমোড়া চলে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন করো।' পরমহংসজী আবির্ভূত হয়ে বললেন বিজয়কে, 'এ আলাযন্ত্রণা থাকবে না, সরস হয়ে উঠবে।'

বিজয় তখুনি চলল আলমোড়া। আরো কিছু দিন নামসাধনের ফলে যন্ত্রণার অবসান হল। চিত্তে নামল জ্যোতির্ময় আনন্দ-অবস্থা।

'নাম করতে-করতে এমন হয় যে শরীরের প্রতি রক্তবিন্দু প্রতি অণু-পরমাণু পর্যন্ত নাম করে।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'এ অবস্থায় মহাত্মারা কাপড় দিয়ে দেহ ঢেকে রাখেন, নয়তো বা বিভূতি

যাবেন। আর, জানো তো, নাম সাধনের সমস্ত তত্ত্ব শ্বাসে-প্রশ্বাসে। প্রথমে শ্বাসে-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম করো। পরে দেখবে শ্বাস-প্রশ্বাসই নাম, নামই শ্বাস-প্রশ্বাস।

একমাত্র শ্বাসে-প্রশ্বাসে নামজপ দ্বারাই আত্মার সমস্ত পাপ সমস্ত সংশয় নষ্ট হবে। প্রতি শ্বাসে নাম করাই একমাত্র উপায়।'

আবার আকাশগঙ্গায় ফিরেছে বিজয়। পরমহংসজী প্রায়ই উপস্থিত হচ্ছেন আর সাধন বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছেন।

সাধন করবার প্রকৃষ্ট সময় কোনটা ?

গোস্বামী প্রভু নিজেই বলছেন : 'ব্রাহ্মমুহূর্তে অর্থাৎ রাত চারটেয়, বেলা এক প্রহরের পর এক ঘণ্টা আর সন্ধে—এই সময়ই ভজনের পক্ষে প্রশস্ত। আর রাত সাড়ে দশটা থেকে রাত চারটের মধ্যে আরেক বার। এই সব সময়েই দেবতা আর সাধু মহাত্মারা বিচরণ করেন। মহাপুরুষেরা রাত সাড়ে দশটায় বার হন আর চারটে পর্যন্ত থাকেন। এই সময় রাত্রি-জাগরণ অভ্যেস করা দরকার। তখন দু একবার প্রাণায়াম করে নাম করবে। মশারির মধ্যে বসে করলেও হয়। নাম করবার সময় মহাপুরুষেরা কাছে এসে দাঁড়ান, সাহায্য করেন। কোন মহাপুরুষ এলেই চন্দনের গন্ধ ও ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। কখনো বা গাঁজার গন্ধ। মহাত্মাদের গাত্রগন্ধে মন অত্যন্ত প্রফুল্ল হয়।'

'শাস্ত্রে অষ্ট সিদ্ধির কথা পড়ি, সে সব কি সত্যি ?' পরমহংসজীকে জিগগেস করল বিজয়।

'নিশ্চয়ই সত্যি।' বললেন পরমহংস। 'তপস্যায় এই অষ্ট সিদ্ধিও লাভ হয়।'

'আমাকে দেখাতে পারেন ?'

'পারি।'

অষ্ট সিদ্ধি অর্থ অণিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব ও যত্রকামাবসায়িত্ব। অণিমা হচ্ছে অণু-পরমাণুর মত সূক্ষ্ম হবার শক্তি। লঘিমা হাওয়ার মত লঘু হবার ক্ষমতা। গরিমা পাহাড়ের মত বড় হবার সামর্থ্য। আর ইচ্ছামাত্র দূরের জিনিসকে কাছে নিয়ে আসবার শক্তির নাম প্রাপ্তি। যা ইচ্ছা করা যাবে তাই ফলবে, অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির অব্যাঘাতের নাম প্রাকাম্য। আর বশিত্ব হচ্ছে বশীকরণের ক্ষমতা। ঈশ্বরের মত সর্ববস্তুর উপর কর্তৃত্ব করবার শক্তির নাম ঈশিত্ব। আর যত্রকামাবসায়িত্বের আরেক নাম সত্যসঙ্কল্পতা। অর্থাৎ বিষকে অমৃত করা, মৃতকে বাঁচিয়ে তোলার শক্তি।

'এস আমার সঙ্গে।' পরমহংসজী বিজয়কে নিয়ে গেলেন নির্জনে।

একে-একে সব প্রত্যক্ষ করালেন। এমন কি পরকায় প্রবেশন পর্যন্ত।

পাহাড়ের নিচে কারা সৎকারের জন্যে মড়া নিয়ে এসেছে। মড়া রেখে সবাই গিয়েছে কাঠের সন্ধানে। কখন ফেরে তার ঠিক কী।

পরমহংসজী সেই মৃতদেহে প্রবেশ করলেন। মৃতদেহ নড়ে চড়ে উঠল, উঠে বসল, আর পরমহংসজী মৃতবৎ পড়ে রইলেন।

আর পাণ্ডারী গাঁয়ের লোকদের কাঠ নিয়ে ফিরে আসবার আগেই পরমহংসজী সজীব হলেন আর যে মড়া সে মড়াই পড়ে রইল।

বিজয় উল্লসিত হয়ে উঠল। শাস্ত্রবাক্য তাহলে কিছুই মিথ্যে নয়। যে তপস্যাসিদ্ধ, যোগ-পারগ তার পক্ষে এই অষ্টৈশ্বর্য অর্জন অসম্ভব নয়।

'শাস্ত্রই যথার্থ অবস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছে।' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'তবু যা কিছু প্রত্যক্ষ করবে,

যাজিয়ে নেবে। তোমাদের তো একটা সিদ্ধ প্রত্যক্ষ করলেই বিশ্বাস। আমার কিন্তু তা নয়। আমি যে পর্যন্ত দশ ইন্দ্রিয় দিয়ে তিন বার করে যাজিয়ে সত্য বলে না বুঝি, সে পর্যন্ত তাকে সত্য বলে নিই না। কোনো বিষয় শুধু দেখে শুনে বা স্পর্শ করেই সত্য বলে মেনো না, সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে তিন বার করে যাজিয়ে সত্য বুঝবে—আরেকবার শাস্ত্র দেখো। তাতেও যদি প্রমাণ পাও তবেই নিঃসংশয়। নচেৎ নয়, কিছুতে নয়।'

পরমহংসজী বললেন, 'চলো, এবার তোমাকে সিদ্ধ তান্ত্রিকের সাধন পদ্ধতি দেখাই। তাহলে বুঝবে ঠিক-ঠিক তন্ত্রসাধনে কী ফল!'

বরাবর পাহাড়ে এলেন দুজনে। দেখলেন নির্ধারিত গুহার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে নিয়ে এক প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে। পরমহংসজীকে দেখে প্রহরী পথ ছেড়ে দিল। অন্দরের প্রকোষ্ঠে ঢুকলেন দুজনে।

রাত গভীর। পর্বতের চেয়েও পর্বতায়িত শুব্ধতা।

প্রায় পনেরোজন সাধক চক্রে বসেছেন। তার মধ্যে, এ কী আশ্চর্য, একজন স্ত্রীলোক।

কতক্ষণ পরে চক্রেশ্বর সকলের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন। আর তৎক্ষণাৎ সকলের মধ্যে বালক ভাব উপস্থিত হল। সকলে অনুভব করল, যিনি স্ত্রীলোক বসে আছেন তিনি সকলের মা, আর সকলে অপোগণ্ড শিশু।

বিজয়ের মধ্যেও বালক ভাব প্রবল হয়ে উঠল। মা-মা বলতে হামাগুড়ি দিতে লাগল। নিষ্কলুষ শিশুর মত স্তন্য পান করল।

স্ত্রীলোকটি বিজয়ের পিঠে চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'আজ থেকে তুমি জিতেন্দ্রিয় হলে।'

পরে স্ত্রীলোকটি ছিন্নমস্তা-সাধনের প্রক্রিয়া দেখালেন। ভাবাবেশে নাচতে-নাচতে ডান হাতের খড়্গ দিয়ে নিজের মাথা ছিন্ন করলেন। ছিন্ন মাথা ধরলেন বাঁ হাতে। কর্তিত কণ্ঠ থেকে ফোয়ারার মত রক্ত ছুটেছে, ছিন্ন মুণ্ড মুখ ব্যাদান করে তাই পান করছে সানন্দে। আবির্ভূত হয়েছেন মহাদেব। সাধকেরা কেউ স্তব পাঠ করছে, কেউ বা অর্চনা করছে পত্রে-পুষ্পে। ছিন্ন মুণ্ড গলায় এসে বসতেই আবার দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেল। সমস্ত আবার স্বভাবসুন্দর হয়ে গেল। সমস্বরে 'জয়' দিয়ে উঠল সকলে। মহাদেব সকলকে আশীর্বাদ করে অন্তর্হিত হলেন।

বিজয় বুঝল শাস্ত্রোক্ত তান্ত্রিক সাধনও সত্য।

'ঘরে-ঘরে মঙ্গল চণ্ডীর পূজা হোক।' বলছেন মোহান্তী প্রভু।' আনন্দময়ীর ঘট স্থাপন করো। দেহে ঘট স্থাপন করো। পূজা করো, মর্যাদা করো, সেবা করো। মর্যাদা না করলে মা চলে যান। পূজা না করলে থাকেন না।'

আবার বলছেন, 'স্ত্রীজাতিকে যত সম্মান করবে তত নিজে পবিত্র হবে। যাঁকে সম্মান করি তাঁকে দূষিত ভাবে দৃষ্টি করা যায় না। ইংরেজ কেবল নারী জাতিকে সম্মান করেই জগতের মধ্যে বরেণ্য হয়ে উঠল। পুরাণে আছে, যেখানে নারীজাতির সম্মান সেখানেই লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্তমান। ইংরেজ জাতির মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজ করছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, জনকের সভায় গার্গী উপস্থিত হলে ঋষিরা উঠে তাঁকে সসম্ভ্রমে নমস্কার করলেন। গার্গীর পূর্ণব্রহ্মজ্ঞান, পরণে বস্ত্র নেই, উলঙ্গিনী। শাণ্ডিল্যা-তপস্বিনী। গরুড় তাঁর প্রভাব দেখে স্থির করলেন, রাত্রি প্রভাত হলে এঁকে পিঠে করে বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাব। শাণ্ডিল্যা তাঁর অন্তর জানলেন। অমনি গরুড়ের দুই পাখা

খলে পড়ল। সন্ন্যাসী তখন তাঁর স্তব করতে লাগলেন। নারীকে সম্মান না করলে কোনো সাধনই ফলপ্রদ হবে না।'

'স্ত্রীলোকের মধ্যে মাকে দেখ।' বলছেন আবার গোঁসাইজি। 'মাকে দেখে প্রণাম করো। মা আনন্দময়ীকে যদি সমস্ত নরনারীর মধ্যে দেখ, কি, যদি একটি নারীকে সেই ভাবে ভালোবাসতে পারো, তাহলে সেই দেবী, আর সেই দেবীকে প্রণাম করলেই সমস্ত পাপের খণ্ডন। এরকম যদি পারো তাহলে এক দিনেই সিদ্ধিলাভ। চণ্ডীদাস যেমন করেছিল রজকিনীকে দিয়ে। নারীর প্রতি যে কুদৃষ্টি করে তার মরণ ভালো।'

বিজয় ফিরল কলকাতায়, নিজের বাসায় নিজ পরিবারের মধ্যেই বাস করতে লাগল। সবাই ভেবেছিল সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে লোটা-চিমটা নিয়ে। কী আশ্চর্য, সংসারেই থেকে গেল বিজয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন চুঁচুড়ায়, বিজয় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

তাঁকে দেখে মহর্ষি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন: 'আহা লোকে বলে কিনা গোঁসাই পাগল হয়ে গিয়েছে, পৌত্তলিকের মত ব্যবহার করছে! কিন্তু কই, আমি তো এঁকে ধূপ ধুনার সুগন্ধ সমাবৃত উজ্জ্বল দুর্গা প্রতিমার মত দেখছি।' পরে আরো সন্নিহিত হলেন বিজয়ের, প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় পেলে এ দেবদুর্লভ বস্তু?'

'গয়ার পাহাড়ে এক মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে,' বললে বিজয়, 'তিনিই এ অবস্থা করে দিয়েছেন।'

'চমৎকার। যে অমূল্য বস্তু পেয়েছ তাতেই তুমি ধন্য হয়ে যাবে। এ রত্ন আর তুমি ছেড়ো না।' মহর্ষির দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল: 'হয়তো ব্রাহ্মসমাজ তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে, তা হোক, তবু এ রত্ন যেন না যায়।'

কতগুলি চিঠি এসেছে মহর্ষির কাছে। একটাতে একজন লিখেছে: 'আপনি তো নির্জনে অনেক দিন ধরে ধর্ম সাধন করলেন, কিন্তু কী লাভ করলেন আর সেই সম্পর্কে আমাদের প্রতিই বা আপনার কী উপদেশ জানাবেন দয়া করে।'

তাঁর অন্যতম ভক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে মহর্ষি বললেন, 'লিখে দাও, এখন থেকে গোঁসাই যা বলবেন তাই আমার কথা।'

মহর্ষি তখন তাঁর পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে, প্রিয়নাথ শাস্ত্রীকে দিয়ে বিজয়কে ডেকে পাঠালেন। 'ওঁকে নিয়ে এস। ওঁর সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

প্রিয়নাথ এসে বিজয়কে বললে, 'মহর্ষি দেখতে চেয়েছেন আপনাকে।'

'কেমন আছেন তিনি?' বিজয় উদ্বেগের মত বললে।

'অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কানে ভালো শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও কমে এসেছে। আপনি এখন কলকাতায় জেনে আপনার জন্যে ভারি ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। কী যেন বলবেন আপনাকে।'

'আমার কী সৌভাগ্য, তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। বলুন কবে যাব, কখন?'

নির্ধারিত দিন-ক্ষণে বিজয় চলল পার্ক স্ট্রীটে। সঙ্গে কতক অনুরাগী শিষ্যও জুটে গেল। কেউ আসেনি মহর্ষিকে। আজ চক্ষু সার্থক করব।

প্রকাণ্ড হলঘরের মাঝখানে ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন মহর্ষি। বিজয় নত হয়ে মহর্ষির পা দুখানি মাথায় ধরল আর অঝোরে কাঁদতে লাগল।

মহর্ষির মুখমণ্ডল লাল হয়ে উঠল। করপুট বুকে রেখে গদ্‌গদস্বরে বলতে লাগলেন: 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' তারপর আরো তিনবার বললেন, 'গোবিন্দায় নমো নমঃ গোবিন্দায় নমো নমঃ, গোবিন্দায় নমো নমঃ।' তাঁর দুগাল বেয়ে অশ্রুর ধারা নেমে এল।

বিজয়ও ভাবাবিষ্ট হয়ে মহর্ষির বাঁ দিকে চেয়ারে বসে পড়ল। কারু আর কোনো কথা নেই, দুজনেই স্তব্ধ, গভীর বিভোর।

বিজয়ের শিষ্যেরা আভূমি প্রণাম করল মহর্ষিকে। সম্মুখে একটা বেঞ্চি ছিল সামনে, তাতে সকলে বসল।

'এঁদের দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে।' বললেন মহর্ষি: 'এঁরা কারা?'

মহর্ষির কাণের কাছে মুখ রেখে প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সজোরে বললে, 'এরা সব গোঁসাইয়ের শিষ্য।'

'আহা, মানুষ যখন ভালো খাবার জিনিস পায়, শুধু নিজে না খেয়ে অন্যান্যকেও তার ভাগ দিতে ইচ্ছে করে। গোঁসাই নিজে যা ভোগ করছেন তাই আবার শিষ্যদের দিচ্ছেন ভাগ করে। এই না হলে মহাপুরুষ। বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই, শুধু শিষ্যদের কল্যাণেই এই রস বিতরণ। গোঁসাইই ধন্য, শিষ্যদের যথার্থ সন্তাপহারক। ওঁকে দেখে সেই প্রাচীন ঋষিদের কথাই মনে আসে।'

বোলপুরের আশ্রম নিয়ে কথা উঠল। নিয়ম প্রণালী কী রকম হওয়া উচিত বলে মনে করো।

দেশে অসাম্প্রদায়িক ভাবের কোনো আশ্রম নেই। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মমত, ভিন্ন ভিন্ন গতি রচনা করে সঙ্কুচিত হয়ে আছে। ইচ্ছে করে একটা উদার অঙ্গনে সকল ধর্ম এসে একত্র হোক। সাধু সন্ন্যাসী ফকির দরবেশ সুফী বৈষ্ণব সমস্ত ভগবৎ-উপাসক যদি সেখানে স্থান পায়, আশ্রয় পায়, তা হলেই শান্তিনিকেতন নাম সার্থক হয়।

'সাধু! সাধু!' মহর্ষি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন: 'যাদের হৃদয়ে বিশ্বপ্রেম তাদের কথাই অন্তর স্পর্শ করে, তাদের কথায়ই প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। তুমি যা বললে, 'বিজয়কে লক্ষ্য করলেন মহর্ষি: 'তাই ঠিক, তাইই হওয়া উচিত। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার যাঁদের হাতে, তাঁরা এই অসাধারণ উদার ভাব গ্রহণ করতে পারবেন না। আমার প্রাণের কথা কেউ বোঝে না। বলি-ওনা কাউকে। তুমি বুঝবে, তোমাকেই তাই বলব।' মহর্ষি হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করে তার ব্যাখ্যা করতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন বিহ্বল হয়ে। বললেন, 'ভগবানকে যেমন ভাবে পেতে চাই তেমন ভাবে পাচ্ছি না, পাচ্ছি না, কান্নায় কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল মহর্ষির।

বিজয় শুনছে তন্ময় হয়ে।

'মাঝে মাঝে তিনি দর্শন দিয়ে বিদ্যুতের মত অদৃশ্য হয়ে যান—আবার যতক্ষণ তাঁকে না দেখি, প্রেমঘনের সেই উজ্জ্বল রূপ ততক্ষণ উন্মত্তের মত থাকি—' মহর্ষি কাঁদছেন আর বলছেন, 'প্রাণ আমার ছটফট করে, সময় যে কী ভাবে কাটাই তিনি জানেন। তাঁর দয়া না হলে কি আর দর্শন মেলে!' জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র, শুধু জ্ঞান দিয়ে কি আর পাওয়া যায় তাঁকে!' আসল হচ্ছে প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি হলেই যদি তিনি কৃপা করেন!'

'কৃপা, কৃপা।'

'হাঁ, কৃপা। ঈশ্বরদর্শন চেষ্টাসাধ্য নয়, পুরুষকার নিরর্থক।' বলছেন আবার মহর্ষি: 'তাঁর

চরণে নির্ভরই সার। শুধু তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে পড়ে থাকা—' বালকের মত অধীর হয়ে কাঁপতে লাগলেন মহর্ষি।

বিজয় 'জয়গুরু' 'জয় গুরু' বলতে লাগল।

চোখ মুছে মহর্ষি আবার বললেন, 'কোথায় ভগবান অবতীর্ণ হবেন তা বোঝবার লক্ষণ দেখেই বোঝা যায় আগে থেকে। জন্ম সঙ্গ শিক্ষা ও সাধন, এই চার বস্তুর যেখানে সমাবেশ সেখানেই পরিপূর্ণ বর্ষা। তোমাতে এই চারবস্তুই প্রোজ্জ্বল। তুমি বিশুদ্ধ অদ্বৈত বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, সৎগুরুর আশ্রয় পেয়েছ, পেয়েছ উপযুক্ত শিক্ষা, তারপর সাধনও করেছ ষোল আনা। গৌসাই, তুমিই ধন্য, তুমিই বৈষ্ণবোত্তম।' একটু থেমে মহর্ষি আবৃত্তি করতে লাগলেন: 'কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্ত তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়॥'

'আপনিই তো আমাকে হাতে ধরে মানুষ করেছেন।' কৃতজ্ঞতায় উজ্জ্বল হয়ে বললে বিজয়, 'আমার সবই তো আপনার থেকে। আপনিই তো আমার গুরু।'

'গুরু নয় গুরুমশায়।' হাসলেন মহর্ষি: 'পাঠশালায় প্রথম যেমন গুরুমশাই ছেলেকে ক-খ শেখায় তেমনি। কালক্রমে ঐ ছেলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষা পেয়ে ঐ গুরুমশায়ের গুরু হয়।'

'না, না, আমি আপনার বালক,' বিজয় বললে বিনম্র হয়ে, 'আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।'

'আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব কী, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। তোমার জয় হোক।'

বিজয় ও তার সঙ্গীশিষ্যরা সকলে একে-একে মহর্ষিকে প্রণাম করল। সঙ্গীশিষ্যদের লক্ষ্য করে মহর্ষি বললেন, 'গৌসাইকে কখনো ছেড়ো না, গৌসাই তোমাদের সকলকে অনন্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।'

চলে এল সবাই। পথে একজন বিজয়কে জিজ্ঞেস করলে, 'সদ্‌গুরুর কৃপা না হলে তো এমন অবস্থা হয় না। মহর্ষি এমন অবস্থা পেলেন কী করে?'

'সদ্‌গুরুকৃপায়। কে বলে সদ্‌গুরুকৃপা হয়নি তাঁর উপর?' বিজয় জোর দিয়ে বললে, 'নিশ্চয়ই হয়েছে।'

একদিন বিজয় বসেছে ভজনে, কেন কে জানে, মন কিছুতেই স্থির করতে পারছে না। চার দিক শুধু লাগছে, অন্তরেও দাহ। কী করে এ জ্বালার নিবারণ হবে? কোথায় গেলে কী করলে স্নিগ্ধ হবে শীতল হবে?

চারদিকে অস্থির হয়ে তাকাতে লাগল বিজয়। হঠাৎ কেন কে জানে, একছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়। একটা ষাঁড়কামুটে চলে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে বিজয় হঠাৎ তার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল, তার পা থেকে ধুলো নিয়ে মাখতে লাগল সর্বাঙ্গে আর কাঁদতে লাগল অঝোরের মত। ঘুটে তো অপ্রস্তুত। সেও বিজয়ের পায়ের ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে লাগল আর আকুল হল কান্নায়। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার, ধুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি, রাস্তায় ভিড় হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত ষাঁড়কামুটেকে আলিঙ্গন করল বিজয়। সমস্ত দাহ জুড়িয়ে গেল। শুষ্কতা দ্রবীভূত হল। পদধূলিতে এত শান্তি তা কে জানত। পদধূলিই সমস্ত দাহের মহৌষধ।

গৌসাইজি নিজেই বলছেন: 'কলকাতা ব্রাহ্মসমাজে একদিন উপাসনায় বসেছি, ভাবভক্তি কিছুই আসছে না। প্রাণ শুকনো কাঠের মত মনে হচ্ছে। কী করব কিছু ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। একটা কুলি যাচ্ছিল, তার পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই

প্রাণ সরস হয়ে উঠল। কের বসলাম উপাসনায়। উপাসনা ভীষণ ভালো হল। আরেক দিন সেই শুষ্ক অবস্থা, উপাসনায় মন বসছেনা। কী করি—এক দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিলাম। অমনি মন আনন্দময় হয়ে উঠল। জমে উঠল উপাসনা।'

মন যখন বিক্ষিপ্ত হবে বা উদ্বিগ্ন হবে, মন যখন নামে বসবে না, বিরক্তিতে বিষিয়ে থাকবে, তখন আর কিছু না পারো, অন্যের কল্যাণ কামনা করো। অন্যের কল্যাণ কামনায়ও চিত্ত সুস্থির হবে।

মাঝে মাঝে শুষ্কতাও ভালো। শুষ্কতারও দরকার আছে।

'গ্রীষ্মকাল এমনিতে ভয়ানক,' বলছেন গোস্বামী প্রভু, 'কিন্তু গ্রীষ্ম ছিল বলেই তো বর্ষায় এত সুখ এত সৌন্দর্য। সাধনের সময় যদি নৈরাশ্য ও শুষ্কতা না থাকত তাহলে ধর্ম যে এত আনন্দময় তা বোঝা যেত কী করে? শুষ্কতার মরুভূমি পেরিয়ে একবার শান্তির শ্যামলতায় চলে আসতে পারলে আর কোনো ভয় নেই।'

কিন্তু এদিকে কেশবের খুব অসুখ।

কেশবের এখন অন্যরকম অবস্থা। রামকৃষ্ণ পরমহংস তাঁকে একদিন বললেন, 'মায়ের মূর্তি দেখে তোমার মনে চিন্ময়ীর ভাব না জেগে পাথর মাটি বেলা এসব জাগে কেন?' না, এখন কেশব ঈশ্বরকে মা বলে ডাকছে। ডাকতে-ডাকতে কাঁদছে অনর্গল।

কিন্তু নরেনকে তার ভীষণ ভয়। মনে সাধ, রামকৃষ্ণকে পুজো করে। একদিন করলও সেই পুজো, কিন্তু গোপনে করল, ঘরের দরজা বন্ধ করে।

রামকৃষ্ণ বললে, 'আজ কেশব আমার পুজো করেছিল, ঘরের দোর বন্ধ করে, পাছে ওর লোকেরা টের পায়।' হাসল রামকৃষ্ণ: 'ও যেমন দোর বন্ধ করে পুজো করলে, তেমনি ওর দোরও বন্ধ থাকবে।'

বিজয় এসে দেখল, নিষ্প্রভ নিষ্প্রাভ দেহে শুয়ে আছে কেশব। বিজয় পাশে বসল। কেশব বললে, 'গোঁসাই, যা ভেবেছিলাম তা হল না।'

বিজয় বেদনায় নম্র হয়ে রইল।

'পথহারা হয়ে শুধু ঘুরে-ঘুরেই বেড়ালাম, তারপর যখন পথের সন্ধান পেলাম বলে আশা হল তখনই এই ব্যাধি এসে ধরলে। হ্যাঁ হে,' বিজয়ের দিকে তাকাল কেশব: 'তুমি নাকি কী এক নতুন পথ আবিষ্কার করেছ?'

'নতুন কি পুরোনো তা তো জানিনা,' স্নিগ্ধ স্বরে বললে বিজয়, 'ভগবানকে লাভ করা নিয়ে কথা। তারই জন্যে এসেছি ব্রাহ্ম সমাজে, বাইরের বিষয় নিয়ে গোল করতে নয়। ভগবানকে পেলাম এই প্রত্যক্ষ বোধ না হওয়া পর্যন্ত ফিরব না। পথ প্রশ্ন নয়, প্রাপ্তিই প্রশ্ন। উপেয়ই প্রশ্ন উপায় নয়। মৃত্যুকালে বলে যেতে পারব, আমি কৃতার্থ, পূর্ণমনোরথ, আর, প্রভু, তুমিই সত্য—এই শুধু আকাঙ্ক্ষা।'

কেশব ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'এ সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু বলবার আছে। যদি ভালো হই তোমায় ডাকব।'

কেশব আর ভালো হলনা। লীলা সংবরণ করলে।　　[ক্রমশঃ

ডেম্ লোরা নাইট্

(ইংলণ্ডের পশু-চিত্রকর।)

অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতে নারীজাগরণের ইতিহাস স্বাধীনতা লাভের বহুপূর্ব্বে তাহার পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছে। পণ্ডিতা রমাবাঈ হইতে সুরু করিয়া বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত পর্য্যন্ত, ভারতের নারী আমাদের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্র বহুমূল্য অবদানের প্রদানে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে, মহিলা কলা-শিল্পীদের দান নিতান্ত তুচ্ছ নহে। মুঘল হারেমের চিত্রশিল্পী শাহিদা বানু আজ পর্য্যন্ত—সুনয়নী বেগীর অলেখ্য-মালায়, নারীশিল্পীর তুলিকা কলা সাধনার ক্ষেত্রে অসংখ্য দীপ জ্বালিয়ে রেখেছে—যাহার ইতিহাস দেশ গৌরব উজ্জ্বল। কিন্তু বিলাতের মহিলা চিত্রকর ডেম্ লোরা নাইট্ আজীবন অক্লান্ত চিত্র-সাধনায় যে অলৌকিক ইতিহাস রচনা করেছেন সারা জগতে তাহার তুলনা নাই।

তাঁহার স্বামী হেরল্ড নাইট্ একজন প্রতিভাশালী চিত্রকর, তিনি তাঁহার স্ত্রীর চিত্রসাধনার প্রথম উদ্বোধক ও সহায়ক। কিন্তু স্ত্রীর উৎকট সাধনা ও উজ্জ্বল সফলতা স্বামীকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। অনেকের বিশ্বাস লোরা নাইট পশু-চিত্রের বিশিষ্ট সাধক। এ কথা অবশ্য সত্য যে ফ্রান্সের রোজা বনিয়োরের পর, লোরা পশুচিত্রে অদ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। কিন্তু লোরার চিত্ররচনা কেবল মাত্র পশু-চিত্রে সীমিত নহে। ইংলণ্ডের বহুমুখী, বিচিত্র জীবনের সমস্ত বিষয় বস্তুই তাঁহার অসংখ্য চিত্রমালায় জীবন্ত হইয়া আছে। কেবল বিশেষ রূপে স্থান পাইয়াছে—ইংলণ্ডের সার্কাস ও ব্যায়াম-লীলা, বন্য পশুদের কৌতুক-পূর্ণ লীলা-খেলা এবং এই শ্রেণীর জনপ্রিয় প্রদর্শনীর নানা চিত্রের খুঁটী-নাটী, ও রংতুলির চাতুর্য বিবরণী। প্রায় সহস্রাধিক তৈল-চিত্রে, সাদা-কালো রেখা-চিত্রে, ও জলের রঙে চিত্রিত আলেখ্যে, লোরা নাইট্ চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছেন—সার্কাসের জনপ্রিয়, প্রেক্ষণীয় ক্রীড়া-কৌশল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার কয়েকখানি চিত্র লন্ডন্ সহরের নানা প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছে, এবং মধ্যে মধ্যে মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ-মহাশয়রা, তাঁহার এই সব অদ্ভুত রোমাঞ্চকর ও আকর্ষণীয় চিত্রাদি ক্রয় করিয়া, লোরার চিত্র-প্রতিভার স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নানা সাধারণ চিত্রশালা ও মিউজিয়মে তাঁহার একাধিক চিত্র-পট সম্মানের স্থান লাভ করিয়াছে। বিলাতের বিখ্যাত চিত্র-পত্রিকা "ষ্টুডিয়ো" মাসিক-পত্রে, এবং "মডর্ন ড্রয়িংস্" নামক জনপ্রিয় সংকলন পুস্তকে তাঁহার অনেক চিত্র মুদ্রিত হইয়া তাঁহার জন-প্রিয়তার প্রসার ও প্রচার করিয়াছে। তাহা ছাড়া বিলাতের "রয়েল একাডেমীর" বাৎসরিক প্রদর্শনীতে প্রতি বৎসর লোরার চিত্র নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহার জন-প্রিয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে।

অবশেষে ১৯২৭ সালের শরৎকালে অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব হইল। ডেম্ লোরা নাইট রয়েল একাডেমী অফ্ আর্টের সভ্যপদে মনোনীত হইলেন। ইহার পূর্ব্বে আর কোনও মহিলা এই সম্মান লাভ করেন নাই।

এই নির্ব্বাচনের একটী প্রথা আছে যে নির্ব্বাচিত সভ্যকে তাঁহার পুরাতন "মডেল্" দিগের প্রত্যেক মানুষকে এক সিনি করিয়া পারিতোষিক দিতে হয়। এই প্রথা অনুসারে লোরাকে অনেক স্বর্ণ মুদ্রা বিতরণ করিতে হইয়াছিল। এই একাডেমীর নিয়ম এই যে প্রত্যেক নির্ব্বাচিত নূতন সভ্য পদের বৎসরে কোনও বিশিষ্ট চিত্ররচনা করিয়া এই সম্মানের যোগ্যতা প্রমাণ উপস্থিত করিবেন। এই বিশিষ্ট চিত্রের নাম "চিপ্রোমা-চিত্র"। লোরা যথারীতিতে তাঁহার "ডিপ্লোমা-চিত্র" একাডেমীর প্রদর্শনীতে দেখাইয়া, তাঁহার প্রতিভার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। প্রতিভার জনপ্রিয় স্বীকৃতির একটী সুফল হইল—আর্থিক সাফল্য।

একাডেমীর সভ্য হইবার অল্প সময়ের মধ্যে, লোরা নানা চিত্রপ্রেমীদের নিকট হইতে চিত্র লিখিবার নানা অনুরোধ ও অর্ডার পাইতে লাগিলেন। নানা রস-রসিক পৃষ্ঠপোষক চিত্রকরকে চিত্রের মূল্য দিয়া চিত্রকরের "ক্যাস্-বাক্স" স্বর্ণমুদ্রায় ভরে দিতে সুরু করিলেন। যশের সঙ্গে সঙ্গে এল প্রভূত কাঞ্চন মূল্য। সমাজের যে সব বিশিষ্ট সমঝদার ও গুণগ্রাহী লোরার চিত্র-প্রতিভার সদ্ব্যবহার করেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত মানুষের নাম করা যায়,—জর্জ্জ হুসেন, সেন পুল্, অরপেন, আনা পাভ্লোভা এবং জর্জ্জ বার্ণার্ড্ শ'।

কিন্তু, সৌভাগ্য-লক্ষ্মী লোরার কপালে আরও উচ্চ-মূল্যের জয়টীকার অক্ষর লিখে রেখেছিলেন।

১৯৩১ সালের জুন মাসে সুবিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় সেণ্ট্ এণ্ড্রুজ্ ইউনিভার্সিটি লোরা নাইট্‌কে "ডক্টর অফ্ লিটারেচারের" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করিলেন। এই উপাধিদানের অনুষ্ঠানের সরস বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে লোরার আত্মজীবনীতে। এই অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ হইল, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য সহ্ জেমস্ অভিন—বিখ্যাত দেশ-সেবী জন্ নক্সের পুরাতন টুপিটি,—নূতন উপাধি-ধারীর মস্তকে স্পর্শ করাইয়া দেন। অধ্যাপক দার্কি টমসন্ এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন হইতে বাক্-পটু ভাষণ দিয়া বলিলেন—"আমরা সগর্ব্বে স্মরণ করি যে এই বিখ্যাত বৃহৎ আগারে একদিন ডাক্তার জনসন্ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আগামী কালে আর একদিন আমরা সগর্ব্বে স্মরণ করিব যে, সেই বিখ্যাত আসনে ডাক্তার লোরা নাইট একদিন উপবেশন করিয়াছিলেন।" তাহার পর লোরাকে জগদ্‌বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ সহ্ জেমস্ জিনস্ মহাশয়ের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়া হইল। সহ্ জেমস্ লোরার সহিত অতি সহজ, সরল, হাস্যকৌতুকের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করিলেন, এবং লোরার নিকট হইতে সার্কাস্ জীবনের নানা খুঁটিনাটির রহস্যের অনুসন্ধান করিলেন। অতবড় বিশ্ব বিখ্যাত নক্ষত্র-বিদ্ ভুলে-ও একবার কোনও নক্ষত্রের নামও করিলেন না। মহৎ মানুষের স্বভাবই এই যে তাঁহারা তাঁহাদের বিরাট জ্ঞান-ভাণ্ডারের বিরাট সম্ভার কোনও মানুষের মাথায় অযাচিত ভাবে নিক্ষেপ করেন না।

চিত্র সাধনায় প্রভূত সিদ্ধিলাভ করিয়াও ১৯৩৬ সালের পূর্ব্বে লোরা সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ১৯৩১ সালে সেণ্ট এণ্ড্রুস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট উপাধি তাঁহার চিত্র কর্ম্মের স্বীকৃতি হিসাবে গ্রহণ করিতে হয়। সাহিত্য কৃতির স্বীকৃতি নহে। তাহার সাহিত্য রচনার প্রশংসা অর্জ্জিত হলো—১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন তাহার বিখ্যাত আত্মজীবনী—"ভেলের রং এবং চক্সির রং" এই সার্থক নাম নিয়ে প্রকাশিত হল। প্রথম প্রকাশের পর তাঁহার এই চমৎকার লাবণীল রচনা উপর্য্যুপরি পাঁচটি পৃথক সংস্করণে সম্মানিত হইয়াছিল। নানা পত্রিকায় এই আত্মজীবনী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জ্জন করিল। বিখ্যাত "নিউজ ক্রনিকল্" মন্তব্য করিল :—"ডেম লোরা নাইট যেরূপ উচ্ছ্বসিত জীবন্ত ভাষায় চিত্র লেখেন ঠিক অনুরূপ ভাষায় তাঁহার রচনা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি তাঁহার জীবনের কঠিন প্রয়াস ও সাধনা এবং তাঁহার চিত্রকর্ম্মের বিরাট সাফল্যের কাহিনী এবং মানুষ হিসাবে তাঁহার দুঃখের ও সুখের কথা—সরস রচনায় লিপিবদ্ধ করেছেন।" আমাদের দেশে তুলি ও কলমের যুগপৎ কাহিনীর সাফল্য একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে দেখা গিয়াছে। আমরা আশাকরি ভবিষ্যতে আমাদের দেশের কোনও প্রতিভাধারী মহিলা এই দুই পথেই সার্থক আত্ম-প্রকাশ করিয়া ডেম লোরা নাইটের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আমাদের দেশকে গৌরবান্বিত করিবেন।

———

॥ চৌদ্দ ॥

মতিয়া বলে কি ?

দাদাবাবুর কাছে একা-একা থাকতে তার ভয় করে।

মেয়েরাই বোঝে মেয়েদের কথার ইঙ্গিত। এর আগে মতিয়া কোনোদিন এমন কথা বলেনি। সরমা কেমন যেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে রইলো মতিয়ার সেই হাসি-হাসি মুখখানার দিকে। মেয়েটার যেমন গায়ের রং, তেমনি শরীরের গড়ন আর তেমনি যৌবন। যে-কোনও পুরুষকে পাগল করে দিতে পারে হতভাগী।

তবে কি এইজন্যেই প্রকাশের মন খারাপ ?

ঘরের ভেতর বসে আছে প্রকাশ, এখন আর মতিয়াকে এমন করে দেখবার অবসর তার নেই। বললে, 'তুই এখন যা এখান থেকে।'

বলেই সে প্রকাশের কাছে এসে দাঁড়ালো। বললে, 'নাও বল এবার কি বলছো।'

—বলবুম তো, চান-টান করে এসো।

—না। আমি না শুনে যাব না।

জেদ ধরে বললো সরমা।—'বল, তোমাকে বলতেই হবে।'

এই বলে সরমা বসে পড়লো প্রকাশ যে-হেলানো চেয়ারটায় বসেছিল, সেই চেয়ারটার হাতলের ওপর। হাত দিয়ে সে তার মাথার চুলে বিলি পাকাতে লাগলো।

প্রকাশের মুখে হাসি নেই, আনন্দ নেই, অত্যন্ত গম্ভীর তার মুখ। তার এরকম চিন্তা-ভারাক্রান্ত মুখ সরমা এর আগে কোনোদিন দেখেনি।

ভয় হলো সরমার। বললে, 'চুপ করে রইলে কেন ? বল।'

প্রকাশ বললে, 'কথাটা ভাল নয়।'

সরমা বললে, 'ভাল হোক্ মন্দ হোক্, আমি যখন শোনবার জন্যে তৈরি, তখন তুমি বলছো না কেন?'

—তোমার কষ্ট হবে।

—আমার ওপর তোমার এত দরদ?

কথাটা সরমা এমন ভাবে বললে, মনে হলো গলাটা যেন তার ধরে এসেছে। একে তো মনের ভেতর একটা গ্লানি তার আছেই, তার ওপর সারারাত জেগে বাড়ীতে পা দেবামাত্র স্বামীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণ।

প্রকাশ একবার তার মুখের দিকে তাকালে। তারপর আবার চোখ নামিয়ে বললে, 'তুমি ক্লান্ত হয়ে এসেছ। তোমাকে কষ্ট দিতে আমি চাইনা।'

সরমা বললে, 'তুমি না বললে কষ্ট আমার আরও বেশি হবে—তুমি বল।'

প্রকাশ বললে, 'বলছি। কিন্তু কথাটা যদি সত্যি হয়, তা'হলে তোমার চেয়ে আমিই কষ্ট পাব বেশি। আর—'

—'আর বলে থামলে কেন?'

প্রকাশ বললে, 'তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে।'

এবার সরমা সত্যিই বিচলিত হলো। কথাটা গিয়ে তার বুকের ভেতর যেন ধক্ করে বাজলো। তবে কি সে সবই জেনে ফেলেছে নাকি?

আসুক্। এ মিথ্যাচার সত্যিই তার ভাল লাগে না। এ-জীবন সে চায়নি। সব সময়েই একটা মিথ্যার বোঝা তাকে বয়ে বেড়াতে হবে, মুখ ফুটে সত্য কথা সে বলতে পারবে না। স্বামীর সঙ্গে এই লুকোচুরি—ছি ছি, তার জন্মদাতা পিতা—জয়নারায়ণবাবু যা হয়ে এ-সর্বনাশ তার কেন করলেন? কেন তিনি তার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করিয়ে নিলেন? সরমার মনে হলো—যা হয় হবে, এর জন্যে তাকে যদি পথে গিয়ে দাঁড়াতে হয় তো সে তাই দাঁড়াবে। সরমা নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে শক্ত হয়ে বসলো। বললে, 'বল।'

প্রকাশ বললে, 'সত্যি কথা বলতে হবে কিন্তু।'

সরমা বললে, 'বলবো।'

প্রকাশ বললে, 'ভবেশ নামে কোনও লোককে তুমি চেনো?'

আর-একটু হলে সরমা চেয়ারের হাতল থেকে পড়ে যেতো। হাত দিয়ে শক্ত করে ধরলে হাতলটা। বললে, 'চিনি।'

প্রকাশ বললে, 'তারই সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলে তুমি?'

সরমা বললে, 'গিয়েছিলাম।'

প্রকাশ যেন আরও শক্ত হলো। বললে, 'সেইখানে—তারই কাছে রইলে না কেন? এখানে ফিরে এলে কি জন্যে?'

সরমা বললে, 'তার দেখা পেলাম না বলে।'

—'দেখা পেলে না কেন? কি করে সে?'

—'জানি না।'

প্রকাশ বললে, 'হেঁয়ালী রাখো। বল—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হলো না কেন?'

ঘাড় দিয়ে যেন জল ছাড়লো সরমা। বললে, 'কেন হলো না, হয়েছে কি হয়নি জানি না। এখন তুমি সত্যি করে বল দেখি—এই উড়ো নামটি তুমি কেমন করে জানলে?'

প্রকাশ বললে, 'বলবো না।'

—'বেশ তাহলে আমিও আর-কিছু বলব না।'

এই বলে সরমা উঠে দাঁড়ালো। মনে হলো সে যেন সব-কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এতক্ষণে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়েছে।

স্নান করবার জন্যে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। যেতে যেতে শুকনো কাপড় জামা নেবার জন্যে থমকে থামলো। প্রকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওই নামটি তুমি জপ্ কর বসে বসে। এখন আমি চান করতে যেতে পারি।'

কথাটা বললে বটে, কিন্তু মনের ভেতরে তখনও কেমন যেন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচ্ খচ্ করছে। এ-নাম সে জানলো কেমন করে? তবে কথা শুনে মনে হয়—তার বেশি আর কিছুই সে জানে না।

ভাল লাগে না ছাই! সবই তাকে খুলে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু পথে দাঁড়িয়েছে তার বাবা।

কাপড়ের আলমারিটা খুলে সে ভাল একখানা কাচা শাড়ী বের করছিল। হঠাৎ দেখলে সব যেন এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

এ-আলমারি প্রকাশের খোলবার কথা নয়। তবে এ-আলমারি খুললে কে? মতিয়া খুলেছে? আর তো কেউ এ-ঘরে ঢোকে না। কিন্তু মতিয়া সে-সাহস পেলে কোথায়?

সরমা আবার যেন অন্য চিন্তায় ফিরে গেল। মতিয়া! হতভাগী আগুনের মত ওই রূপ নিয়ে প্রকাশের সামনে ঘুরে বেড়িয়েছে, যখন-তখন কিক্ কিক্ করে হেসেছে, তারপর দুর্বল মানুষ—কখন্ কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে হয়ত'-বা কোনও অঘটন ঘটে যাবার পর সে পালিয়েছে তার মায়ের কাছে!

কিন্তু না, স্বামীকে তার যতটুকু সে চিনেছে—তার শিক্ষা দীক্ষা, তার রুচিবোধ—এত নীচে তাকে নামতে দেবে না বলেই মনে হয়।

শাড়ী জামা খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ একটা জিনিস সরমার হাতে ঠেকলো। জিনিষটা আর কিছুই নয়, ছোট্ট রং-করা একটি টিনের কৌটো। আগে তাতে পাউডার থাকতো, এখানে আসবার সময় টুকিটাকি কয়েকটা জিনিস সে রেখেছে তার ভেতর। কি যেন ভেবে সে খুলে ফেললে কৌটোটা।

খোলবামাত্র সরমা বুঝতে পারলে সব-কিছু। কৌটোর ভেতর ছিল একটি পাথর-বসানো আংটি, কয়েকটি কাঁচ-পোকার টিপ, আর একটি মীনা-করা সোনার লকেট। এই লকেটটির ওপর নাম লেখা ছিল 'তবেশ'। তবেশই দিয়েছিল সেটা সরমাকে। অজয় যখন খুব ছোট ছিল, তখন সে দিয়েছিল লকেটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে। আর সেই জন্যেই সেটি খুলে রেখেছিল সরমা। অজয়ের বাবার শেষ চিহ্ন। এখানে আসবার আগে তবেশের সব চিহ্নই সে শেষ করে দিয়ে এসেছে। শুধু এই লকেটের কথাটা তার মনে ছিল না।

কিন্তু প্রকাশকে কী বলবে সরমা?

সত্যকে চিরকালের জন্য চেপে রাখা যায় না। সরমার ভয় হয়—একদিন-না-একদিন তার এই লুকোচুরি ধরা পড়বেই। তখন কি করবে সে? কী বলবে?

খুব রাগ হলো তার বাবার ওপর।

সরমা তার মনটাকে খুব শক্ত করে নিয়ে ভাবলে—আজ সে ধীরে ধীরে সব কথা বলবে প্রকাশের কাছে। তার জন্ত প্রকাশ যদি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয় তো দেবে। অজয়কে তার নিজের কাছে এনে রাখবে। একটা ছেলেকে মানুষ করে তোলবার মত অর্থসম্পদ তার বাবা তাকে নিশ্চয়ই দিয়ে যাবে। তবে আর তার ভয় কিসের?

ভাবেশের নাম-লেখা লকেটটা সে হাতে করে নিলে। কাপড় জামা বের করলে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রকাশের কাছে গিয়ে লকেটটা তার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'এইটে দেখে বলেছ তো?'

প্রকাশ বললে, 'হ্যাঁ।'

সরমা কিন্তু সেখানে আর দাঁড়ালো না। প্রকাশ এত যে ডাকলে, 'শোনো' 'শোনো' বলে' সরমা ফিরেও তাকালে না। সে-ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা স্নানের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

(ক্রমশঃ)

বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের কাছে এক ব্যক্তি এসে বললে: আচ্ছা, আপনি ত দর্শকদের খুব হাসান, কিন্তু নিজে হাসেন না কেন?

গ্যারিক বললেন: নিজে হাসলে অপরকে হাসান শক্ত, কেন না সেটাতে হাসির কাজটা অভিনেতা আগেই সেরে নেন।

—আর অভিনেতা নিজে কাঁদলে?

—দর্শকেরা ধরে নেন, সেটা কৃত্রিম। তাই সে কান্না তাদের অন্তর স্পর্শ করে না।

—কিন্তু যখন মঞ্চের বাইরে অভিনেতা নিজে কাঁদেন?

—তখন অবশ্য সহানুভূতি আসে বৈ কি তাঁকে সাহায্য করবার জন্তে।

—তবে আমাকে সাহায্য করুন—আমি একসময়ে অভিনেতা ছিলাম। এখন আমি অভাবের তাড়নায় কাঁদছি।

এবার গ্যারিক তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

ভারতী সম্পাদিকার প্রতি

মহাশয়ায়,

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দলাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটি বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক গুরুতর এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটা চক্ষের জল পড়িবেনা জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও ত দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু-একজন আমাদের hobby-র (খেয়ালের) আদায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন এই পর্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখতে দেখতে বৃদ্ধ হতে চলিলাম। এ সংসার বড় কঠিন স্থান। গ্রীক দার্শনিকের লণ্ঠন হাতে করিয়া অনেকদিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্বদা একটি বাউলের গান গাহিতেন—সেইটি মনে পড়ল—

"মনের মানুষ হয় যে জনা সে দু-এক জনা,
নয়নে তার যায় গো জানা, সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।"

এই ত গেল আমার তরফ থেকে। আর একটিও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্যকালে দেখিবেন।

তারপর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটি ছাড়লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার এতটুকু খুঁত আছে। বলি, এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড়ে ছেঁড়ে, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর একটি ঠাকুরের সঙ্গ বন্ধ করে দিলে?

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্বত যেন ভেসে যায়, একটি ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি, ওরকম দেশহিতৈষীতাতে কি বড় কাজ হবে মনে করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। তৃষ্ণার্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্ন বিচার, এত নাক সিটকান? কে জানে কার কি মতি গতি! আমার যেন মনে হয়, ওসব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল; কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীত ন মানে জাত কুজাত।
ক্ষুধ ন মানে বাসী ভাত।

আমি ত এই জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আঁটিটি গলায় আটকে যদি সব মারা যায় ত না হয় আঁটিটি ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

যাহা হউক, এসম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এসকল কথা কহিবার জন্য রোগ, শোক, মৃত্যু সকলেই আমায় এপর্যন্ত সময় দিয়াছেন—বিশ্বাস, এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

বেলুড় মঠ, ১৩ই এপ্রিল ১৮৯৯

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ

বীরবলের কৌতুক

বহুরুচি

সকালবেলা।

বীরবল দরবারে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় রাজ্যের অন্যতম প্রধান কারণিক আবিদ আলি সাহেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

বীরবল খাতির করে তাঁকে বসালেন। বললেন, আজ আমার বড় সৌভাগ্য বলতে হবে। তারপর, আলি সাহেব, খবর সব ভাল তো?

মাথা নেড়ে আলি সাহেব বললেন, অন্য সব খবর ভাল। কিন্তু সেটাই আমি একটা সমস্যায় পড়েছি।

মনে মনে বীরবল বললেন, তা তোমার বিমর্ষ বদন দেখেই বুঝেছি। সমস্যায় না পড়লে আর এই সকালে আমার বাড়ি হানা দেবে কেন।

মুখে বললেন—কি রকম সমস্যা, আলি সাহেব। শুনতে পাই কি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাকে বলবার জন্যেই তো এসেছি।

—বলুন।

ক্ষণেক ইতস্তত করে আবিদ আলি বললেন—আমার বাড়িতে একটা প্রকাণ্ড চুরি হয়ে গেছে!

—আপনার বাড়িতে চুরি! বিস্মিত কণ্ঠে বীরবল বললেন—দুর্গের মত অাঁটসাঁট আপনার বাড়ি। অতগুলো ভৃত্য—

তাঁকে থামিয়ে আলি বললেন—মুস্কিলের কথা তো সেইখানেই। খানসামা, মশালচি, বাবুর্চি নিয়ে আমার মোট ছ'জন চাকর। তারা বাড়ির মধ্যেই তাদের মহলে থাকে। আমার মনে হচ্ছে এ তাদেরই কারুর কাজ।

—ক'দিন আগেকার ঘটনা? কি কি জিনিষ গেল? প্রথম এই চুরির কথা জানতে পারে কে?

বীরবলের প্রশ্নের উত্তরে আবিদ আলি জানালেন, সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এই চুরি হয়েছে। পুত্র-কন্যা সহ তাঁর স্ত্রী পিত্রালয়ে গেছেন সপ্তাহখানেক আগে। গত পরশু তাঁর পিত্রালয় থেকে এক ভৃত্য এসে জানায়, তাঁর স্ত্রীর ফিরতে কয়েকদিন বিলম্ব হবে এবং তাঁর কিছু টাকার প্রয়োজন হয়েছে। সেই কথা শুনে, ভৃত্যের হাতে টাকা এনে দেবার জন্যে আলি সাহেব ঘরে ঢুকে আলমারী খুলে তাঁর স্ত্রীর ক্যাশ বাক্স থেকে টাকা বার করতে গিয়ে দেখেন, ক্যাশ বাক্সটি উধাও। চতুর্দিক খুঁজলেন, কিন্তু টাকার বাক্সের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আলি সাহেবের বদ্ধ ধারণা, তাঁর ভৃত্যদের মধ্যে কেউ এই কাজ করেছে। বাক্সের মধ্যে প্রায় হাজার টাকা ছিল।

বীরবল বললেন—কতোয়ালিতে খবর দিয়েছেন?

মাথা নেড়ে আলি সাহেব জবাব দিলেন—না। এই ব্যাপার নিয়ে আমি সোরগোল করতে চাই না। কী করা যায় সেই পরামর্শের জন্যেই আমি আপনার কাছে এসেছি।

—ভৃত্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন?

—করেছিলাম। সকলেই বলছে, তারা কেউ কিছু জানে না। কিন্তু তারা ছাড়া নেবেই বা কে? আলমারীর চাবী অনেক সময়েই দেরাজের ওপর পড়ে থাকতো। আর আমি চাকরদের খুবই

বিশ্বাস করতাম। আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে যাবার পরদিন আমি আলমারী খুলেছিলাম। সেদিন ক্যাশ বাক্সটি যথাস্থানেই ছিল। তারপর এ'কদিন আর আলমারী খোলবার দরকার হয়নি।

বীরবল কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন, তারপর বললেন—তা, আমাকে কি করতে বলেন?

আলি সাহেব বললেন—আপনাকে কিছু করতে বলি না। আমি কি করব, তারই পরামর্শ চাই। বলেন তো কতোয়ালকে খবর দিই। কিন্তু আমি চাই না যে যারা নিরপরাধ তারা নিগৃহীত হয়। তাই এখনো কতোয়ালের কাছে যাইনি।

বীরবল বললেন—হ্যাঁ। কতোয়ালির কথা-বোলাই তো বড় সহজ ব্যাপার নয়। যে নেয়নি সে-ও হয়ত তার চোটে বলে ফেলবে যে সে-ই নিয়েছে। আচ্ছা আপনি বাড়ি যান। গিয়ে চাকরদের বলুন যে আমি খিদিরের দিকে আপনার বাড়ি যাব। দেখা যাক, চোর ধরা পড়ে কি না।

বীরবলকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে কাংখিত প্রস্থান করলেন।

দরবার শেষ করে বীরবল বাজারে গিয়ে ছ'টি সরু বেতের ছড়ি কিনলেন। প্রত্যেকটি এক হাতের—চার ফুট করে লম্বা।

বিকাল বেলা সেই ছ'গাছি ছড়ি নিয়ে তিনি আবিদ আলির বাড়ি উপস্থিত হলেন।

আলি সাহেব অভ্যর্থনা করে তাঁকে বৈঠকখানায় বসালেন। তারপর তাঁর নির্দেশ অনুসারে ভৃত্য ছ'জন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল।

বীরবল তাদের পানে তাকিয়ে বললেন—চুরির কথা তোমরা প্রত্যেকেই জানো। তাই সে সম্বন্ধে আমি বেশী কথা না বলে, জানতে চাই, কে একাজ করেছো!

সকলেই সমস্বরে, আমি করিনি হুজুর, আমি না, ইত্যাদি বলতে লাগল।

তাদের থামিয়ে বীরবল বললেন—তোমরা যখন কেউ স্বীকার করছো না তখন আমাদের অন্য উপায় নিতে হবে। আমার হাতে ছ'গাছি ছড়ি দেখছো। এ ছড়ি সহজ নয়। তোমরা সোহ্রাবের ফকির রামালুর নাম শুনেছো নিশ্চয়।

ভৃত্যরা জানাল যে তারা ফকিরের নাম শুনেছে। তিনি একজন মস্ত ওস্তাদ।

বীরবল বলতে লাগলেন—সেই ওস্তাদ এই ছড়িগুলি মন্ত্রপূত করে দিয়েছেন। তোমাদের প্রত্যেককে আমি এক গাছা করে ছড়ি দিচ্ছি। প্রত্যেকটি ছড়ি সমান মাপ করে কাটা হয়েছে। এই দেখ।

বলে বীরবল ছড়ির গোছাটার একদিক মাটিতে ফেলে সোজা করে দাঁড় করালেন। বললেন—দেখছো, সবগুলি সমান। এখন, যে প্রকৃত অপরাধী তার কাছে যে ছড়িটি থাকবে সেটি রাতের বেলায় ঠিক দু' আঙুল অর্থাৎ এক ইঞ্চি পরিমাণ বেড়ে যাবে। তোমরা প্রত্যেকে এক গাছি করে ছড়ি নিয়ে চলে যাও। আজ রাত্রে তোমরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ঘরে থাকবে। কাল সকালে তোমাদের ছড়িগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। তারপর আসল অপরাধী অর্থাৎ যার ছড়ি এক ইঞ্চি বেড়ে যাবে, তাকে প্রথমে যেতে হবে থানায়, সেখানে প্রচণ্ড উত্তম-মধ্যমের পর তাকে শূলে চড়তে হবে। নাও প্রত্যেকে এক গাছা করে ছড়ি। নিয়ে চলে যাও।

বীরবলের নির্দেশমত কাজ হল। অর্থাৎ ছ'জন ভৃত্য সে রাত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রইল।

রাত ক্রমে গভীর হল। যারা নির্দোষ তারা নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে লাগল। কিন্তু যে চুরি করেছিল তার চোখে ঘুম নেই। সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগল। সত্যিই কি রাতারাতি তার ছড়িটা এক ইঞ্চি বেড়ে যাবে? তা যদি যায় তাহলে তো সে ধরা পড়বে নির্ঘাৎ! বলা যায় না, রামালু ফকিরের মন্ত্রপড়া ছড়ি। তাহলে কি করা যায়? অনেক ভাবনার পর তার মাথায় একটা বুদ্ধি এলো। তার বহু যাতনা

হয়েছিল যে মন্ত্র বিফল হবে না, তার ছড়ি বেড়ে যাবে, তাই সেই মন্ত্রকে ব্যর্থ করবার জন্যে সে এক মতলব করলে। একটা ছোট ছুরি সংগ্রহ করে সে তার ছড়ির একটা দিক এক ইঞ্চি কেটে যাব দিয়ে দিলে। ব্যাস। সে নিশ্চিন্ত হল। এইবার তার ছড়ি এক ইঞ্চি বাড়লেও সে ধরা পড়বে না। কারণ অন্য ছড়ির মাপের সঙ্গে তার ছড়ির মাপও মিলে যাবে।

কাটা টুকরোগুলো জানলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে চোর নিশ্চিন্তমনে বাকি রাত ঘুমিয়ে কাটালো।

পরদিন সকালে পূর্বনির্ধারিত সময়ে বীরবল আলি সাহেবের বাড়ি এলেন।

তাঁর নির্দেশে ভৃত্য ছ'জন তাঁদের সামনে এসে সারবন্দী হয়ে দাঁড়াল।

বীরবল তীক্ষ্ণ চোখে তাদের নিরীক্ষণ করতে লাগলেন, সকলেই স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই অল্পবিস্তর দুর্ভাবনার ছায়া। কিন্তু একজন যেন একটু বেশি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর তার মুখের ভাবটাও যেন কিছু বেশি উৎফুল্ল।

বীরবল বললেন—এইবার তোমাদের ছড়িগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা জানাতে চাই। গতকাল আমার বলতে একটু ভুল হয়েছিল।

সকলে উৎকর্ণ হল। গৃহস্বামী বললেন—আপনার ভুল।

বীরবল বললেন—হ্যাঁ। কাল ভুলক্রমে আমি একেবারে উলটো কথা বলেছিলাম। আমার বলা উচিত ছিল, যে প্রকৃত অপরাধী তার ছড়ি রাতারাতি এক ইঞ্চি ছোট হয়ে যাবে। তা না বলে, আমি বলেছিলাম, এক ইঞ্চি বড় হয়ে যাবে। আচ্ছা, দেখি ছড়িগুলি এবার।

যে-ভৃত্যটি এতক্ষণ মাথা টানটান করে দাঁড়িয়েছিল তার মাথা মুহূর্তে নুঁকে পড়ল এবং কাঁপতে কাঁপতে সে মাটিতে বসে পড়ল। দেখা গেল, তার ছড়ি অন্যের ছড়িগুলোর চেয়ে এক ইঞ্চি ছোট।

আলি সাহেব চীৎকার করে উঠলেন—কেয়া তাজ্জব।

অন্য পাঁচজন নিরপরাধ ভৃত্যও কলরব করে উঠল।

অপরাধীর দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে বীরবল বললেন—এখনো দোষ স্বীকার করে বাক্সটা এনে দেবে, না, কতোয়ালকে খবর পাঠাব।

চোর তখন অপরাধ স্বীকার করলে এবং লুকনো জায়গা থেকে বাক্সটি এনে দিলে।

বীরবল চোরকে উদ্দেশ্য করে বললেন—আলি সাহেবের ইচ্ছে নয় যে ব্যাপারটা জানাজানি হয়। তাই তুমি শাস্তি থেকে অব্যাহতি পেলে, কিন্তু আজই তুমি এ সহর ছেড়ে চলে যাবে, আর যেন তোমায় এ সহরে দেখা না যায়। সম্রাট আকবরের রাজধানীতে তোমার স্থান নেই! হুঁশিয়ার। আমার কথা অমান্য করলে তোমার মৃত্যুদণ্ড অবধারিত।

ভৃত্যরা চলে গেলে বিস্ময়াভিভূত আলি সাহেব বললেন—শেঠজি, সত্যিই কি মন্ত্রের জোরে এই অসম্ভব সম্ভব হল।

মাথা নেড়ে বীরবল জবাব দিলেন—ক্ষেপেছেন! মন্ত্র-তন্ত্র কোথায় পাবো? মন্ত্রতন্ত্র নয় আলি সাহেব, মেরেফ মনস্তত্ত্ব।

আলি সাহেব হাঁ করে বীরবলের কথা শুনছিলেন, তাঁর কথা শেষ হবার পরেও হাঁ করেই রইলেন।

কোন এক বিনিদ্র রাত

সত্যপ্রিয় ঘোষ

সম্পাদক মশাই, আমাকে মাফ করবেন। আপনার বিশেষ সংখ্যার জন্য আন্তরিক আগ্রহ সত্ত্বেও কোন গল্প লিখে উঠতে পারলাম না। নিজের গল্পের বদলে এই সঙ্গে একটি লেখা পাঠাচ্ছি। লেখাটি আমার নিজের ভালো লেগেছে, এটি প্রকাশ যোগ্য মনে করলে ছেপে দিতে পারেন। চলতি ধারণায় এ লেখাটিকে গল্প ব'লে হয়তো মনে হবে না কিন্তু একটি অর্ধশিক্ষিত রেলশ্রমিকের দুর্ভাগ্যের কাহিনী লেখাটির মধ্যে এমন সহজ সুরে বিধৃত হয়েছে যে আমার মনে হ'ল, আমাদের শিক্ষিত মনের কাল্পনিক কাহিনীর চাইতে এমনি নির্ভেজাল সত্য ঘটনার আকর্ষণ পাঠক সমাজে কিছুমাত্র কম হবে না।

লেখাটি কী ক'রে পেলাম সেটা জানাই। সম্প্রতি এক রেলওয়ে ইনস্টিট্যুটের ছোটগল্প প্রতিযোগিতায় বিচারকের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এক নির্দিষ্ট শিরোনামায় গল্প লেখার আহ্বান ছিল, সে নামটি হ'ল: "কোন এক বিনিদ্র রাত"। সব শুদ্ধ তেইশটি রচনা এসেছিল। সেগুলির অধিকাংশই ছিল এমন যে পড়লেই বোঝা যায় সে-সবের রচয়িতারা বেশ শিক্ষিত, লেখার কায়দাও মোটামুটি রপ্ত আছে। কিন্তু তাঁরা তাঁদের আপন জীবিকার প্রসঙ্গে কিছু লেখেননি, এমনকি নিজের জীবনের কোন সত্য অনুভব লিখবার চেষ্টাও করেছেন ব'লে মনে হ'ল না। তাঁরা ফেনিয়ে ফেনিয়ে মিথ্যে গল্প ফেঁদে 'সাহিত্য' করবার চেষ্টা করেছেন। সে যাই হোক, এই লেখাটি সে-সবের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এটিকেই আমি প্রথম স্থান দিয়েছি। যিনি লিখেছেন তাঁর চাকরিনামা দেখতে পাচ্ছি 'মাষ্টার'। লেখাটির বানানভুলগুলি সংশোধন ক'রে দিয়েছি, এখানে-সেখানে একটু-আধটু কলমও ছুঁইয়েছি—জানি না ভালো করলাম কি মন্দ করলাম। পুরস্কার বিতরণের সময় লোকটির সঙ্গে আলাপ হল। তাঁকে বলেছিলাম লেখাটি আমাকে দিতে, কোথাও ছেপে দেওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য।

যাই হোক, যা ভালো মনে হয় করবেন। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি—

শুভেন্দু দত্ত মজুমদার

সম্পাদক গল্পটার ওপর প্রথমটা একটু চোখ বুলিয়ে নিলেন, তারপর টেবিলে পা তুলে দিয়ে বেশ কৌতূহলের সঙ্গে তার মধ্যে ডুবে গেলেন। গল্পটা এই:

যাদের জীবনে অধিকাংশ রাতই বিনিদ্র তাদের আবার বিনিদ্র রাতের কাব্য কি। সেই যে গান আছে, দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কী রে! সভ্য জগতের সুখী মানুষেরা যখন নিশ্চিন্ত ঘুমের কোলে সব কিছু ভুলে আরামে শান্তিতে মগ্ন থাকে আমরা তখন রাতের কালোর পাশের বোবা টানি। আমরা মানুষের মতো দেখতে ব'লেই সত্যিসত্যি কি মানুষ যে খিদে পেলেই খাব কিংবা ঘুম পেলে ঘুমোব। আমার কাছে আমার কাহিনীর কোন বিশেষত্ব নেই কিন্তু অন্য লোকের কাছে হয়তো বা আছে। আমরা যা কিছু বলি, আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছি অনেকে তা রূপকথা শোনার মতো কান পেতে শোনে। তা'হলে বলি শুনুন আমার এক বিনিদ্র রাতের কথা।

বউকে সেদিন ব'লে বেরিয়েছিলাম আজ তোমার পাশেই শোব, তোমার সঙ্গেই ঘুমোব। রাত সাড়ে দশটার মধ্যে ঘরে ফিরব। কেন? না সেটা যে ছিল আমাদের বিয়ের সাংবৎসরিক

রাত। সেদিন ডিউটি পড়েছিল বেলা দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। আপনারা হয়তো বলবেন, চল্লিশ বছরের বুড়ো চার ছেলে মেয়ের বাপ তোমার আবার অত রস কেন এখনো। তাহ'লে বলি শুনুন আমার রসের নদী কলকাতার আদিগঙ্গার মতো অনেক কাল হ'ল ম'রে হেজে গেছে, কিন্তু আমার বউটা সেকথা বোঝে না। তার এখনো বিয়ের দিনে এক শিশি আলতা বা এক বোতল গন্ধ তেল চাই। মরি আর বাঁচি, সংবৎসরে এমনি অপব্যয় কিছু আছেই। যাই হোক কিনেছিলাম এক বোতল দুলেল তেল। ডিউটি থেকে পালিয়ে গিয়ে এক ফাঁকে কিনে এনেছিলাম দিনের তাগে, রেখেছিলাম প্যান্টের পকেটে। ক্রেন ড্রাইভার বাদু প্রধানটা এমন ছোটলোক, শালা টের পেয়ে গিয়ে কেড়ে নিয়েছে বোতলটা, ছিপি খুলে দু-তিন ঝাবলা তেল নিজের মাথায় অন্যের মাথায় আবড়িয়েছে। আমি কেড়ে নিয়ে তেলের শিশিটা ফের পকেটে রাখলাম। তখন কি জানি সেই তেলই হবে আমার কাল।

ডিউটি করছি শেডে। বি-গ্রেড কারারম্যান হ'লেও তখন আমি মাসকয়েক পর্যন্ত শেড-মাষ্টারের কাজ করি। সোনঘর থেকে স্টিম-ইঞ্জিনগুলো বের ক'রে ক'রে আউটগোইং লিট লাইনগুলোতে নিয়ে যাওয়া আমার কাজ। তাছাড়া শান্টিং-এর কাজে আউটগোইং লাইনের মাষ্টারদেরও মদত দিতে হয়। কাজে ছিলাম ডুবে তার মধ্যে কখন যে পকেটের মধ্যে তেলের শিশিটা উলটে গেছে আর ছিপি খুলে গিয়ে প্রায় সব তেল গেছে প'ড়ে তা হুঁশ হ'ল স্টিমম্যান রামসেবকের হেসে গড়িয়ে পড়া দেখে। সে আমার প্যান্টের দিকে আঙুল দেখিয়ে এক অশ্রাব্য টিপ্পনী কেটে শাগলের মতো হেসে উঠেছিল হাতে তালি দিয়ে। একে তো সব তেল প'ড়ে যাবার দরুন নগদ দুটো টাকা লোকসান গেল, বউটার জন্য কের যে কিছু কিনব সে রেস্তও আর ছিল না তখন আমার, তার ওপর ব্যাটা হরিদাস পালের ঐ দাঁত বের করা হাসি দেখে আমার পিত্তি জ্বলে গেল। শিশিটাতে তখনও কিছুটা তেল ছিল, কিন্তু টান মেরে ফেলে দিলাম সেটা। তেলটা যে পকেটে ছিল, সেই দিকের প্যান্টে একেবারে পা পর্যন্ত তেলে জবজবে হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আগে একটু টের পাইনি। করি তো ভূতের চাকরি, তেলজলকালিতে সর্বদা একাকার হয়ে থাকি। বিবাহবার্ষিকীতে বউকে গন্ধতেল উপহার। পরীরের ঘোড়ারোগ। ভগবান হেসেছিলেন অন্তরীক্ষে। মনমেজাজ খারাপ হয়ে গেল। তখন রাত নটা সোয়া-নটা হবে। ডিউটি শেষ হবে রাত দশটায়। কারো কাছ থেকে দুটো টাকা ধার ক'রে যে কের কিছু কিনে নেব সে-গুড়েও বালি। কারণ অত রাত্তিরে কে আমার জন্য দোকানের ঝাঁপ খুলে রাখবে। শালার সো শালা বাদু প্রধান-টাকে তখন হাতের কাছে পেলে ওর হালুয়া টাইট ক'রে দিতাম।

আমার রিলিফ রূপচাঁদ মাঝার জানত আজ আমার বিয়ের রাত, জলদি বাড়ি ফিরবার তাড়া আছে। দশটা বাজতে না বাজতেই সে এসে আমার ঘাড়ে রদ্দা মেরে বললে, 'যা রে ভগবান, ঘর যেঁ যা। বহু তেরা আজ পালঙ পর ধুন মচায়ে গা। জলদি যা।' রূপচাঁদকে চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে দোয়া দশটা নাগাদ অফ-ডিউটি রেজিষ্টারে সই ক'রেই রওনা হলাম বাড়ির পানে। ইয়ার্ডের মেন লাইন বরাবর চলছিলাম। চিৎপুর ব্রিজের কাছে যখন এসে পড়েছি তখন কে যেন বললে চেঁচিয়ে, 'বলেনবাবু দাঁড়ান তো।'

দাঁড়াতেই দেখি বিশ্বনাথ আর গগন—দুই কিটারখালাসী এসে হন্যিতন্যি লাগিয়ে দিয়েছে। কী ব্যাপার? ছুঁচোর গোলাম চামচিকেরা বলছে কি, আমি নাকি ইঞ্জিনের কোন্ যন্ত্রপাতি চুরি

ক'রে পালাচ্ছি। গগনের হাতে ছিল ছুট দিয়ে জড়ানো তিনটে লুব্রিকেটর অয়েল অ্যাডজাস্টিং কক, ওরা দিব্যি বলতে লাগল ওগুলো নাকি আমি চুরি ক'রে পালাচ্ছিলাম।

জীবনে কেউ আমাকে কোনদিন চোর অপবাদ দেয়নি। তাই হঠাৎ এমনিভাবে এসে পাহারা দিয়ে ধরতে বড্ড ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। রাগ হয়েছিল ভীষণ, কিন্তু ওরা দুটোই ছিল খুব হওয়ার্কা, আমি একা ঐ অসুর দুটোর সঙ্গে ঐ নির্জন ব্রিজের তলায় গায়ের জোরে এঁটে উঠতে পারব না। মুহূর্তে বুঝতে পারলাম শেডের চুরি ধরবার জন্ত ওরা স্পেশাল ডিউটির সনদ পেয়েছে, পেয়ে আসল কোন চোরকে ধরাধরির হাঙ্গামায় না গিয়ে আমাকে চোর বানিয়ে ধরিয়ে দিয়ে মুক্তংসে নাম কিনতে চায়। এমনি এক সাজানো চুরির কেসে মেশিন শপের টার্নার শিউপূজনের কী হাল হয়েছিল তা সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পড়ল।

মনে মনে মা কালীর নাম নিয়ে আমি ওদের বললাম; 'আমার পেছনে লেগেছ কেন তোমরা? আমি তোমাদের কী করেছি?'

ওরা, আমি যে ইঞ্জিনগুলোতে কাজ ক'রে এসেছি তার দুটো ইঞ্জিনের নাম ক'রে বলল যে ঐগুলো থেকে আমি নাকি ঐ ইঞ্জিন-পার্টস্ খুলে নিয়ে পালাচ্ছিলাম। আমি প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু কে কার কথা শোনে, ঝগড়া করতে করতে আমরা মেন লাইন থেকে স'রে রিসেপশন ইয়ার্ডের একদম দক্ষিণে চ'লে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম মানে ওরাই চালাকি ক'রে আমাকে ঐদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল সেটা পরে বুঝতে পেরেছি। সেখানে গিয়ে ওরা অ্যাডজাস্টিং ককের বাণ্ডিলটা মাটিতে ফেলে চেঁচাতে শুরু করল, 'চোর চোর!' কাছেই সিক লাইনে ছিল এক সেপাই, সে বেটা হল্লা শুনে দৌড়ে এল।

সে সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্টের পাহারাদার, তাকে যা বোঝানো হ'ল তাই বুঝল। আমি যত বলি আমি একজন শান্টার, রানিংস্টাফ হয়ে আমি ইঞ্জিনের কলকব্জা চুরি করব এ হতেই পারে না, এরাই কোথা থেকে ওগুলো চুরি ক'রে এনে আমাকে চোর সাজাচ্ছে—কিন্তু বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা! ওরা তিনজনে প্রায় জোরজুলুম ক'রেই আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল শেডে।

নিয়ে হাজির করল গিয়ে শেডের অন-ডিউটি ছোট সাহেবের কাছে। রাত তখন প্রায় এগারোটা। আমার বউটা কি তখন জানালায় দাঁড়িয়েছিল বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে! সে-কথাও ভাবছিলাম, ঐ অবস্থাতেও!

ছোট সাহেব মানে সেন সাহেব আমাকে ভালোই চিনতেন। তিনি চমকে উঠে বললেন, 'তুমি এই কাজ করলে?'

রাগে দুঃখে অসহায়ের মতো চেঁচিয়ে উঠে বললাম, 'মোহাই সেন সাহেব, আপনি একথা বিশ্বাস করবেন না। এরা মানুষ নয়, পশু। তাই নির্দোষ লোককে এরা দোষী সাজায় আর দোষীদের সাথে আড়ালে আবডালে দোস্তি করে।'

সেন সাহেবকে সব কথা খুলে বললাম। কে জানে তিনি বিশ্বাস করলেন কিনা আমার কথা। পলকহারা হয়ে আমার কথা শুনলেন, কিটার খালাসী দুটোর কথাও শুনলেন, তারপর ওরা যে ইঞ্জিন দুটোর নম্বর বলেছিল সে দুটো পরীক্ষা করতে গেলেন। ফিরে এসে বললেন, ঐ ইঞ্জিন দুটোতে লুব্রি কক ঠিকমতোই লাগানো আছে, চুরি যায়নি। সেন সাহেব আমাকে ছেড়ে দিতে

চাইলেন কিন্তু সেপাইটা তখন খানি হয়ে দাঁড়াল। বিশ্বনাথ গগনকে বললে, 'বড়ো সাহেবের কোয়ার্টারে যা তো দৌড়ে, তিনি কী বলেন শুনে আয়, আমি আছি এখানে।' গগন অমনি ছুটে চ'লে গেল। কী উৎসাহ হারামজাদাগুলোর। যা ভগবান, এমন জানোয়ারের মতন যাদের স্বভাব তারা কী ক'রে মানুষের মতো দেখতে হ'ল। সেপাইটাও কোনে রিপোর্ট পাঠাল তার ওপরওয়ালা সুবেদারের কাছে।

সেডে ওদিকে চিঁচি প'ড়ে গেছে। অনেকেই এসে উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে আমাকে। তখন তো আমি মাষ্টার শ্রীবলেন্দ্রনাথ সাঁতরা নই, একটা চোর! ধরা পড়েছি ছুটো খালাসীর হাতে। রূপচাঁদ খাণ্টারও ছুটে এল ক্রমে। ব্যাপার দেখে সেও হক চকিয়ে গেল। অথচ কেউ কিন্তু এগিয়ে এসে সাহস ক'রে বললে না একবার যে, বলেন মাষ্টার এমন কাজ করতেই পারে না।

হ্যাঁ বলতে ভুলে গেছি। বিশ্বনাথ আর গগন আমার প্যাণ্টে তখনও পর্যন্ত তেলের দাগ রয়েছে সেইটে খুব ক'রে বোঝানোর চেষ্টা করছিল ছোট সাহেবকে। বলছিল, ও দাগ নির্ঘাৎ দুম্বি তেলের দাগ্। শুনে পর্যন্ত আমার ইচ্ছে করছিল খালাসের কান পাকড়ে আমার প্যাণ্টের তেলের গন্ধ শোঁকাই আর জিগ্যেস করি, এই কি দুম্বি তেলের গন্ধ না হয়? আমি আমার গন্ধতেলের কাহিনী বললাম ছোট সাহেবকে। বললাম, 'বিশ্বাস না হয়, কোল-ক্রেন ড্রাইভার যাদু প্রসাদকে ডাকুন, ফিমম্যান রাধেশ্যামকে ডাকুন, টিণ্ডেল নেউরও জানে, রূপচাঁদ মাষ্টারও জানে—ওরা সাক্ষী দেবে এই তেলের।'

রূপচাঁদ কাছেপিঠেই ছিল। ছোট সাহেব ওকে ডেকে জিগ্যেস করতেই ও দিব্যি ব'লে দিলে, তেলের কথা ও কিছু জানে না তবে আজ যে আমার বিয়ের রাত সেটা ঠিক।

রূপচাঁদের কথা শুনে আমি মনে মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম, হে ভগবান, পরের জন্মে আমি যেন মানুষ হয়ে না জন্মাই, আমাকে তুমি জঙ্গলের জানোয়ার বানিও, কারণ সেও মানুষের মতন অমন ভয়ানক তো নয়।

আধঘণ্টা খানেক পরে গগন ঊর্ধ্বশ্বাসে ফিরে এসে বললে, বড়ো সাহেব কেসটা নিতে বলেছেন।

খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে! তুচ্ছ খালাসী, কী তার রোয়াব! সে হুকুম করছে ছোট সাহেবকে, ছোট সাহেব ঘাড় হেঁট ক'রে আমার কেস ডায়েরি ক'রে দিলেন।

ছোট সাহেব ওদের স্টেটমেণ্ট নিলেন, আমার নিলেন, সেপাইটার নাম ছিল আচাইবার, সেও বললে তার বক্তব্য। একজন যখন স্টেটমেণ্ট দিচ্ছে তখন আর সবাইকে ছোট সাহেব দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন, তাই কেউ জানে না অন্য জনে কী বলছে।

আমার স্টেটমেণ্ট নেওয়া যখন শেষ হল তখন ঢং ঢং ক'রে ছুটো বাজল। আমি বললাম, 'এবার আমাকে ছেড়ে দিন, আমার বাড়িতে সবাই ভাবনা করছে।'

ছোট সাহেব রেগে গিয়ে বললেন, ওসব নেকামি ভুলে যাও। লোকো স্টাফের আবার বাড়িঘরদোর কিসের! আচাইবার বলেছে, তার সুবেদার খবর পাঠিয়েছে যে ওদের এ, এস, আই আসবেন আমাদের স্টেটমেণ্ট নিতে। অতএব তিনি না আসা পর্যন্ত আমাকে আটকে রাখতে হবে।

বিশ্বনাথ আর গগন কিন্তু অপেক্ষা করল না। তাদের কাজ হাসিল হয়ে গেছে, আর তাদের পায় কে। আট-দশ ঘণ্টা একটানা ডিউটি দিয়ে তারা বাকি তখন ক্লান্ত, দুজনে হাসাহাসি করতে করতে চ'লে গেল যে যার বাড়ি।

গরীবের ভগবান নেই। বিনা অপরাধে এই অত্যাচারে রাগেদুঃখে আমার চোখে জল এসেছিল। বুটটার সঙ্গে রোজ কত রাগারাগি করি, যা মুখে আসে তাই বলি, কতরকম কষ্ট দিই—সেই তারই মুখটা

তখন কেন যে আমার অত ক'রে মনে পড়ছিল। আর মনে হচ্ছিল ছেলেমেয়েদের কথা। তারা যদি শোনে তাদের বাপ চুরির দায়ে ধরা পড়েছিল, তারা কি বিশ্বাস করবে? হে ভগবান তুমি কী অপরাধে আমাকে এমন শাস্তি দিলে!

সতেরো বছরের চাকরি হয়েছে তখন আমার। সতেরো বছরে কারণে-অকারণে চার্জশিট খেয়েছি তো কতরকমের কিন্তু কেউ কোনদিন আমাকে চুরির অপবাদ দেয়নি। কিন্তু আজকে আমি একটা চোরে পরিণত হলাম!

রাত তিনটে নাগাদ এলেন রেলের ছোট দারোগা। আচাইবার বেচারী তখন ঘুমে ঢ'লে পড়ছে। আমাকে আসলে সে বসেছিল ঘরের কোণে—কিন্তু আমি অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারতাম, বেচারা ব'সে ব'সেই হাঁ ক'রে ঘুমোচ্ছিল। মাঝে মাঝে দু-একজন স্টাফ এসে আমাকে কী হয়েছে জিগ্যেস করছিল কিন্তু আমি একদম চুপ মেরে রইলাম, আমাকে ঘাঁটাতে মানা করলাম।

বিশ্বাস করুন আমি আমার বাড়িঘরদোর ছেলেমেয়েরাও আমার সংসারকে যেমন ভালবাসি, লোকো শেডকেও তেমনি ভালোবাসতাম। চাকরি আমার খুব সুখের ছিল না, সতেরো বছর চাকরি করার পর তখন ১০০-১৩০৲ টাকার গ্রেডে মাত্র উঠেছি, সব জড়িয়ে বেড়শো টাকার মতো আমার বেতন, ধার-টার কেটেকুটে শ'খানেক টাকাও সাকুল্যে হাতে পাই কিনা সন্দেহ। সেই মাইনেতে ছ'টা পেট চালাতে হয় কলকাতার বাজারে। বিশ্বাস করুন অত অভাবেও আমি চুরিতে নামে লেখাইনি। করলা বিক্রিতেও না। আমার অত সাধুগিরি নিয়ে আমাকে সবাই কত ঠাট্টাবিদ্রূপ করে—সেই আমিই আজ চুরির দায়ে ব'সে আছি শেডে, রাতের প্রহরগুলি গুনছি ব'সে ব'সে বিনিদ্র চোখে। যে শেডে পা দেওয়া মাত্র মনে হত এ আমার নিজের ঘরবাড়ির মতো, আজ সেই শেডকে মনে হচ্ছে অনন্ত নরক, নির্দয় দৈত্যপুরী।

তাছাড়া কী সাংঘাতিক বিদ্যে পেয়েছিল। ডিউটি করছি সেই বেলা দুটো থেকে, টিফিন কৌটোয় বউ রোজ রুটি দিয়ে যেত সেদিন দিয়েছিল পরোটা! বিয়ের দিন কিনা! সন্ধে নাগাদ সেগুলো খাবার সময় ভাগীদার হ'ল কোলমুনশী রফাদারবাবু। একখানা পরোটা ওঁকে দিতে আমার আপত্তি হয়নি—সাড়ে দশটার মধ্যে তো বাড়ি গিয়ে আমি ফের খাওয়া পাচ্ছি সেই কথা ভেবে।

ভাবছিলাম বউটা কী করছে। আমার না হয় খাওয়া হ'ল না, ও খেয়েছে কি। এ-শিফটের ডিউটি না পড়লে ও কোনদিন আমার আগে খায় না—রাত্রে তো কিছুতেই না। আমি ওকে কত গালমন্দ করি এই নিয়ে, বলি অত সতীপনা এযুগে অচল কিন্তু তবু ওর ঐ গোঁ যায় না। আর সেদিন তো বিয়ের রাত। ব'লে গিয়েছিলাম বাড়ি ফিরে আজ একসঙ্গে খাব।

ছোট দারোগা এলেন রাত তিনটেয়। আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই বুঝলাম টেনে এসেছেন। গন্ধে ম-ম করছে! আচাইবারকে কিমুতে দেখে ওর পাঁজরায় বেটনের গুঁতো লাগালেন। বেচারা তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে স্যালুট করল।

খবর পেয়ে ছোট সাহেবও এলেন। তারপর চলল আর এক দফা স্টেটমেন্ট দেওয়া। ছোট দারোগা লিখতে লিখতে বললেন, 'বেস্তেরি এই বাজে কেসটায় জন্ম এমন রাতটা মাটি হ'ল।' ছোট সাহেব বললেন, 'এ বেচারার আজ বিয়ের রাত ছিল!' ছোট দারোগা বললেন, 'তাই নাকি। বিয়ের রাতে চুরির দায়ে ধরা পড়লে। বাঃ বাবা। তা এখনো ঘণ্টাখানেক রাত আছে। যাও বাড়ি গিয়ে বউকে—যেকথা ছোট দারোগা বললেন তা ছোটলোকেরাও সব সময়ে বলে না।

যখন ছাড়া পেলাম সেডের ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চার। জেগে সারা রাত কাটানো আমাদের কাছে নতুন কিছু নয় কিন্তু রাতের অমন কালো কুৎসিত রূপ আর তো কখনো দেখিনি। রাতের অন্ধকারে মানুষ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তা অমন ক'রে প্রত্যক্ষ আর কবে করেছি।

ঘুঁকতে ঘুঁকতে ফিরে চললাম বাড়ি। বউএর কাছে, ছেলেমেয়েদের কাছে। ওদের কাছে কী স্টেটমেন্ট দেব তাই ভাবতে ভাবতেই যাচ্ছিলাম। রিসেপশন ইয়ার্ডের লাইনের পর লাইন পেরোতে পেরোতে ভাবছিলাম, এই রাস্তাটা যেন আর শেষ না হয়। যেন অনন্ত কাল ধ'রে আমি হাঁটতে থাকি! ক্ষুধা তৃষ্ণা তখন আমার লোপ পেয়েছে, আলাময়ণা বোধ কিছুই কি তখন আমার অবশিষ্ট ছিল! যেন লাইন ধরাবর চলছিলাম, হঠাৎ ক্যারেজ সেডের কামারশালের কাছ থেকে হাঁক এল 'হল্ট।'

দাঁড়ালাম।

এক সেপাই এসে আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, আমার আইডেনটিটি কার্ড দেখল, আমার প্যান্ট আর কোমর হাতড়ে দেখল কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিছু না পেয়ে বিদায় করল। বিনা প্রতিবাদে নেপালী সেপাইটাকে আমি এসব করতে দিলাম। আমি ওকে আরো অনেক কিছু করতে দিতাম— ও যদি আমাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাইত, যদি সেদুয়া খেলার মতো ও আমাকে নিয়ে লোফালুফি করত আমি বাধা দিতাম না। কিন্তু কী বোকা! হাতের গ্রাস ও মুখে পুরল না। আমি সেকথা ওকে বললাম। বললাম, 'হাঁ রে বুদ্ধুরাম! তুই সেপাই হয়েছিস কেন। তোর তো নোকরি টিকবে না দেখছি।' বেটা ভাবল আমি পাগল। বেচারা ভয় পেয়ে জোর কদমে তফাতে হটে গেল।

বউ আগেই খবর পেয়েছিল আমি ছুরির ঘায়ে আটক হয়েছি। আমার ফিরতে দেরি দেখে সে অস্থির হয়ে পড়েছিল। শেষে আর থাকতে না পেরে কাছেপিঠের কোয়ার্টারগুলিতে খোঁজ করতে বেরিয়ে বয়লার মেকার ভিখারী দাসের ঘরে এসে সব শুনেছিল। তারপর সারা রাত আমার বউ না খেয়ে না ঘুমিয়ে বোকার মতো ব'সে ব'সে বেঁদেছে জানালার গরাদে মাথা ঠেকিয়ে। ওর যে নীলাম্বরী শাড়িটা আছে সেইটে পরেছিল। শাড়িটা বউ খুলে ফেলেনি।

রাতের গাঁজলা তখন কেটে যাচ্ছে, আকাশের তারা নিবছে একটি দুটি ক'রে সব, পুব আকাশের শুকতারাও আমার বড়ো চেনা। সেই শুকতারারও সময় হয়ে এল যখন আমি এসে আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়ালাম।

বউকে কী বললাম, ও-ই বা কী বলল সে-সব বৃত্তান্ত থাক। আপনারা রাতের কাহিনী শুনতে চেয়েছেন তাই শোনালাম। বিনা অপরাধে তারপর প্রায় ছ'মাস পর্যন্ত আমি যে সাসপেণ্ড হয়ে রইলাম, যে এনকোয়ারি চলল ঢিমে তেতালায় সাহেবসুবোর মর্জিমাফিক, আমি যে নির্দোষ সেইটে প্রমাণ করার জন্য কত যে মিথ্যে কথা আমাকে বানাতে হ'ল আমার ডিফেন্স কাউন্সেলের পরামর্শে আর কত সত্য যে গোপন করতে হ'ল পাছে কেস কেঁচে যায় সেই ভয়ে, সে-সব কাহিনী আর ব'লে কী লাভ হবে। সেই ছ'মাস আমি অর্ধেক বেতন পেলাম, সেই টাকায় কী ক'রে আমি সংসার চালালাম সে-সব কাহিনীও থাক। কেবল এইটুকু আপনাদের আমি জানাই যে শেষ পর্যন্ত আমি যে-কসুর খালাস হলাম। ছ'মাস সাসপেণ্ড হয়ে ছিলাম, তার কী হবে? তার জন্যে আমার পুরো বেতন মঞ্জুর হ'ল যদি আমার ছুটি পাওনা থাকে তবে। না, অত ছুটি কোত্থেকে পাওনা থাকবে। তাই প্রায় তিন মাসের অর্ধেক বেতন আমার বিনা ভোগে খোয়া গেল।

বিশ্বনাথ আর গগনের কী হ'ল? তারা যে অকারণে একটা লোকের কপালে এভাবে বাড়ি মারল তার জন্য তাদের কোন শাস্তি হ'ল কি? হওয়া উচিত কি?

আপনাদের কী মনে হয়?

আমি আর বলতে চাইনে। এটা আপনারাই বলুন।

———

চলতি দুনিয়া

বিশ্ব জুড়ে এখন ভালবাসার সংজ্ঞানির্ণয়ের চেষ্টা চলছে। নরনারীর মধ্যে যে মিলন স্পৃহা, আদিম যুগ থেকে যে শাশ্বত আকর্ষণ, তার মূল উৎস খুঁজতে গিয়ে সব দেশের মনস্তত্ত্ববিদেরা এখন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। আগেকার দিনের যে সব তথ্য এতকাল ধরে নরনারীকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল, এখন সে-সব উল্টে গেছে। ভালবাসাই বাঁচিয়ে রেখেছে মানুষকে, তার জীবনের উদ্দেশ্য সার্থক করতে। ভালবাসা থেকে বঞ্চিতা হলে যে-কোন নারী অনুভব করে, জীবনটা তার ব্যর্থ হয়ে গেল (She feels that the whole purpose of her Life has ended.) কিন্তু ভালবাসার পাত্রকে ধীর ও স্থিরভাবে যাচাই করে নেবার প্রয়োজনীয়তা আছে। যদি কোন নারী তা' না করে তবে তার সারাজীবন তিক্ততা ও বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। ভবিষ্যৎ না ভেবে প্রেমের ঝোঁকে ঝাঁপিয়ে পড়াটা খুবই বোকামি। (Nothing but bitterness and hostility could result if she does.) প্রেমের নামে যে সব কলঙ্কের বেসাতি সারা দুনিয়ায় চলছে, এতে সমাজহিতৈষীরা বিলক্ষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। —উওম্যান্স্ ও'ন

• • • •

সহরের বুকে পুরানো খাঁচের বাড়ী ভেঙে ফেলে নূতন যুগের মানুষ গড়ে তুলছে ফ্ল্যাট-সিস্টেমের আকাশছোঁয়া বাড়ী। এতে নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা অনেকখানি পাওয়া গেলেও মানুষ যেন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার পথ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে। কি যেন হারিয়ে ফেলছে মানুষ তার পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে। সহরের রাস্তার দু'পাশে ছোট ছোট ছবির মত বাড়ী, যেখানে লুকিয়ে থাকত স্বাভাবিক আনন্দের ধারা, বিশ্রাম ও শান্তি,—সেখানে যেন ইট-কাঠ-পাথর-লোহার কারাগার রচিত হয়েছে Flat বাড়ীর নামে। সেখানে যাঁরা থাকেন তাঁরা যেন শুধু কাজের খাতিরেই থাকেন,—দুনিয়ার কোমল বৃত্তিগুলো যেন সরে পড়েছে সেখান থেকে। পর্দা-ঢাকা জানালার বাইরে যে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ডালি নিয়ে আর একটা জগৎ দাঁড়িয়ে আছে—এ খেয়ালই যেন সেখানে আসে না। অনবরত রাস্তার পাশে সারি সারি ফ্ল্যাট বাড়ী,—পৃথিবীর সঙ্গে যেন কোন পরিচয়ই নেই তাদের (All the little houses have been swept away and replaced by tall grey blocks of flats. The streets are deserted and no glimmer of life shows behind the curtained windows.) —উওম্যান্

• • • •

মানুষের যে সৃজনী প্রতিভা একদিন পৃথিবীর বুকে এনেছিল কল্যাণ ও শান্তি, তার কি করে যে মোড় ঘুরল আর মানুষের সভ্যতা ও শান্তিকে ধ্বংস করবার জন্যে তার প্রচেষ্টা প্রতিদিন যে কি ভাবে এগিয়ে চলল, সে-কথা ভেবে বিশ্বের মনীষীরা অস্থির হয়ে উঠেছেন। আণবিক অস্ত্রসংবরণ একটা সাময়িক আবেগের ফল,—কিন্তু এটা যে স্থায়ী হয়ে থাকবে সে স্বীকৃতি এখন আর কেউ দিতে পারছে না। যে সব বৈজ্ঞানিক প্রতিভা একদিন জগতের হিতসাধনে প্রয়াসী হয়েছিল, এখন সেই প্রতিভা মানুষকে ধ্বংস করবার জন্যে এতটা হিংস্র হয়ে উঠল কেন?—এই রূঢ় সত্য আজ জগৎকে ব্যাকুল করে তুলেছে। পৃথিবী থেকে জীবনের শেষ স্পন্দনটুকু নিশ্চিহ্ন করবার জন্যেই কি বৈজ্ঞানিক প্রতিভা তার উদ্যত মারণাস্ত্র

নিয়ে এগিয়ে আসছে ? (Was ever before such genius and such learning at work as today on new methods of destruction, which could put an end to life on earth and bring about total annihilation ?) মানুষকে এতটা হিংস্র ও বিষন্ন করে তুলতে আধুনিক যুগ কতটা দায়ী, —এই চিন্তাই এখন বিশ্বের মনীষিগণকে ব্যথিত করে তুলেছে। —ডেলি।

• • • •

পাশ্চাত্ত্য জগতে নিরক্ষরতা দূর করবার যে প্রচেষ্টা প্রায় সার্থক হতে চলেছে তার মূলে আছে রাষ্ট্রের সহযোগিতা আর সমাজহিতৈষীদের অক্লান্ত পরিশ্রম। আজকালকার সভ্যসমাজ বলতে গেলে বুঝতে হবে, সেখানে নিরক্ষরতা একেবারেই নেই বললেই হয়। সর্বসাধারণের জন্যে শিক্ষার দ্বার যাতে চিরদিন উন্মুক্ত থাকে এ প্রচেষ্টা শুধু দেশের শাসকবর্গের নয়,—জনসাধারণেরও। পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার প্রসারও ক্রমে বেড়ে চলছে। স্কুলকলেজবিশ্ববিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কেরা শিক্ষালাভ করে, কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কেরা যদি অশিক্ষিত থাকে তবে সেটা কোন রাজ্যের পক্ষে গৌরবজনক নয়। তাই এখন পাশ্চাত্ত্যদেশে বয়স্কদের শিক্ষার প্রসার বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়। (Adult education is becoming more and more the affair of modern society as a whole and thus an indispensable part of the public education system, alongside schools, colleges and universities.) —ডেলি।

• • • •

ভারতে কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর নিরক্ষরতা কমে নি, এটা লক্ষ্য করে অনেকে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন (Illiteracy is increasing)। গত কয়েক বৎসর নিরক্ষরতা যে বেড়ে চলেছে এ কথা অনস্বীকার্য। সরকারী রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে "It has been found that the number of illiterates has been growing in the past few years." তবে এখনও নিরাশ হবার সময় আসেনি, কেন-না এ বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি পড়েছে (The State governments feel that even now it is not late to take up plans to increase the tempo of adult literacy and social education work.) দেশ স্বাধীন হবার পর অনেক বৎসর কেটে গেছে কিন্তু নানা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যথেষ্ট অর্থব্যয় হলেও, নিরক্ষরতা দূর করা যে অত্যাবশ্যক এটা কেন যে কর্তৃপক্ষের মাথায় আসে নি, এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়। —পেট্রিয়ট্

• • • •

আণবিক বিজ্ঞান যে শুধু ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ার দ্যোতক তা' নয়, জগতের অনেক কল্যাণকর কাজেও তার সহায়তা পাওয়া গেছে। কিন্তু আজকাল অপরাধ-বিজ্ঞানের এক নূতন অধ্যায়ের সন্ধান দিয়েছে আণবিক গবেষণা। বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য যে কত সুদূরপ্রসারী ও কত বিচিত্র তার পরিচয় পাওয়া যায় এই কথা ভাবলে, যে পৃথিবীতে প্রত্যেক নরনারীর মাথার চুলের বৈশিষ্ট্য ও গঠন সম্পূর্ণ আলাদা। এক মাথার চুলের সঙ্গে অন্য মাথার চুল মেলেনা। তাই একগাছি মাত্র চুল পেলে অপরাধী ধরা সহজ হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক মহল বলেন—'We can send a single hair to the atomic station where it is made radio-active and then we put it through a special machine in the laboratory.' এরপর সহজেই জানা যায় এই চুল যার সে লোকটি কে ?

নারী, না পুরুষ,—লম্বা, না বেঁটে, কর্সা, কি কালো, অল্পবয়স্ক, না অধিক বয়স্ক, নীরোগ, কি রোগাক্রান্ত —আরও অনেক কিছু। এবার আর অপরাধীর সন্ধান করা শক্ত হয় না। আণবিক শক্তিদ্বারা পাশ্চাত্যদেশে অপরাধ-বিজ্ঞান যে এক নূতন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

—ডেলি মিরর

• • • •

বিশেষজ্ঞেরা বহু পরিশ্রমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করেছেন যে, পৃথিবীতে যত লোক বাস করে তার অর্দ্ধেক ক্ষুধা মেটাবার খাদ্য পায় না, এমনকি অভুক্তই থেকে যায়। (Half the world is hungry) তাঁরা প্রমাণ করেছেন যে, একমাত্র ভারতবর্ষে চার বৎসর বয়স হবার আগেই খাদ্যাভাবে শতকরা এগারো জন শিশু প্রাণ হারায়। (In India, eleven out of every hundred children are dead before the age of four.)। তাঁরা কেবেই পান না যে, ভারতের শস্য-প্রাচুর্য্য, অরণ্যজাত ফলমূলাদি, যথেষ্ট পশুপক্ষী মৎস্যাদি ও গোমহিষাদির দুগ্ধ থাকতে কেন খাদ্যাভাবে লোকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করে এ একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। ভারত এমন একটি বিশাল দেশ যেখানে এক প্রদেশের খাদ্যাভাব ঘটলে অন্য প্রদেশ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে, তা'ছাড়া দূরে ও কাছে বহু সমৃদ্ধিশালী রাজ্য অনেকগুলি আছে যেখান থেকে অবাধে খাদ্যশস্য পাওয়া যেতে পারে। এ অবস্থায় ভারতে অনাহারে এই হারে মৃত্যু ঘটলে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মনে নানা চিন্তা এসে উপস্থিত হয়,—এর প্রতিকারের উপায়ই বা কি হতে পারে, খাদ্যসমস্যার নিরাকরণই বা কিভাবে হতে পারে তা সকলেরই ভাববার কথা। কিন্তু যা' কঠোর সত্য, তা' ত আর মিথ্যা বলে দেখানো যায় না।

—ডেলি মিরর এণ্ড সানডে পিকটোরিয়াল্

• • • •

বহুদূর ব্যেপে মহাকাশে আণবিক রশ্মি (Atom rays) এমন ভাবে বিকীর্ণ হয়ে আছে যার সংস্পর্শে এলে মানুষের গুরুতর ক্ষতি হতে পারে ও মানবদেহের ইন্দ্রিয়াদি ও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ বিষয়ে বিশদ পরীক্ষার জন্যে আমেরিকায় প্লাষ্টিকের তৈরী এক মানব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করা হয়েছে ও তার মধ্যে মানবশরীরের অনুরূপ সক্রিয় ইন্দ্রিয়াদির মত সকল সক্রিয় দ্রব্য রাখা হয়েছে। এতে যে সব সূক্ষ্ম যন্ত্র সন্নিবিষ্ট করে সম্পূর্ণ মানুষ তৈরী করা হয়েছে তাতে মহাশূন্যের এই আণবিক রশ্মি কিভাবে মানব শরীরে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে এই প্লাষ্টিকের মূর্ত্তি দ্বারা তার একটা হদিশ পাওয়া যাবে। এই মানব মূর্ত্তির নাম দেওয়া হয়েছে গ্লাষ্টিনট্। এতে ভবিষ্যতে মহাশূন্যে মানুষের যাত্রার পক্ষে অনেক অসুবিধা ও বাধা ভালরকমে জানা যাবে। বিজ্ঞানের দিক দিয়ে এ পরীক্ষা যে বিশেষ কার্য্যকরী হবে তাতে সন্দেহ নেই। —মিরর

• • • •

আজকাল বৈজ্ঞানিক চিকিৎসকেরা মানুষের চোখ দেখে তার চরিত্রের খুঁটিনাটি নিখুঁতভাবে জানতে পারেন, এমনকি নানা অব্যক্ত রোগের সন্ধানও তাঁরা পান। মানুষের চোখ (character-revealing eye) আরও অনেক কাজে লাগে তাঁদের যাঁরা অপরাধ-বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। চোখের গঠন, রং, দৃষ্টিশক্তির তারতম্য, চোখের মণির নড়াচড়া ও চোখের পাতার ওঠা-নামা থেকে তাঁরা বলতে পারেন সেই লোকটির গোপন চরিত্র। এমন কি চোখে দেখে কোন শ্রেণীর অপরাধ তার দ্বারা সম্ভব তাও পরিষ্কারভাবে জানা যায়। চোখের ভাষা ঠিকমত পড়তে পারলে মানবচরিত্রের প্রায় সকল দিকই স্পষ্টভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়। এ নিয়ে পাশ্চাত্যদেশে আরও গবেষণা চলছে। —ঔওম্যান

(উপন্যাস)

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

সোফিয়া বলল—আপনার অবস্থা দেখে আপনাকে ফেলে আসতে ইচ্ছে হল না। হতভাগা আপনি। প্যারিসে প্রথম দিন এসেই জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লেন। আমি প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম আপনার সঙ্গের লোকটার মতলব। কিন্তু আপনাকে আমি বলতে চাইনি—কিজানি আপনারা দু'জনেই হয়তো এক দেশের লোক হবেন। হয়তো আপনারা পরস্পরকে অনেক দিন ধরেই চেনেন।

এন্টনীর এবার গত রাতের সবকথা পুরোপুরি মনে পড়ল। তার হাতটা সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মতো পকেটের মধ্যে চলে গেল। ব্যাগটা বার করে দেখল সেটা একেবারে খালি। বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে যে টাকা কটা এনেছিল তা সব শেষ একরাত্রে। এখন তার এমন একটা পয়সা নেই যা দিয়ে সে হোটেল ভাড়া দেবে। সোফিয়াকে যে সে মৌখিক ধন্যবাদ জানাবে এমন অবস্থাও তখন এন্টনীর নেই। তার গলার আওয়াজ বসে গেছে। সে যেন নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছে এমনি মনে হল তার।

সোফিয়া শুধাল—এখন কেমন বোধ করছেন? ফিরে যেতে পারবেন হোটেলে?

এন্টনী যেন ঘুম থেকে উঠল। বলল—হোটেলে? কিন্তু আমার কাছে তো একটা পয়সাও নেই।

—সেকি, আপনার হোটেলে টাকা পয়সা রেখে আসেননি?—ঈষৎ বিস্ময়ের সুরে সোফিয়া জিজ্ঞাসা করল।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে এন্টনী বলল—নাঃ সব টাকাটাই আমার পকেটে ছিল, কম নয়, প্রায় একশো পাউণ্ডের মতো। সবটাই তার গেছে।

সোফিয়া বলল—সাংঘাতিক লোক তো আপনার সাথী। সে কোথায় থাকে জানেন?

নাঃ—গভীর হতাশ্বাসের সঙ্গে জানাল এন্টনী। তাঁর সঙ্গে মাত্র গত সন্ধ্যাতেই আলাপ।

সোফিয়া এবার তার গলা থেকে সব রকম বিস্ময়ের ভাব ঝেড়ে ফেলে সহজ সুরে বলল—যা হবার হয়েছে। আপনি যান বাথরুমে। স্নান করতে চান তো স্নান করতে পারেন। না হলে মুখ হাত ধুয়ে আসুন আমি আপনার জন্যে খাবার তৈরী করি। এখন কিছুটা চাঙ্গা হোন। পরের কথা পরে ভাববেন।

বাথরুমে গিয়ে এটনীর মনে হল সে আত্মহত্যা করবে। এই রকম অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে সে জীবনে পড়েনি। কিন্তু কি সে করবে এখন? টাইটা গলায় বেঁধে ঝুলে পড়বে জানলা থেকে?

বাথরুমের দরজায় ঘা পড়ল। সোফিয়া ডাকছে—একটা রেজর নিয়ে যান। গ্যাসের মিটারে না দিলে গ্যাস জ্বলবে না। জল গরম হবে না।

এটনী দরজা খুলে বার হয়ে এল। তার মন নিজের জায়গায় ফিরেছে ইতিমধ্যে। রেজরটা নিতে নিতে সে মাদমোয়াজেল ক্লাঁকোকে অজস্র ধন্যবাদ দিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করল—আপনি আমাকে দু'টো দিন আপনার এখানে থাকতে দেবেন কি দয়া করে? আমি লণ্ডনে টেলিগ্রাম করে টাকা আনিয়ে নেব। অবশ্য টেলিগ্রামের চার্জটাও আপাততঃ আপনাকেই দিতে হবে। আমার পরিচয় হল এটনী কার্থাগো, ভারতীয়। আমি লণ্ডন ফুল অব, ইকনমিকসের প্রোফেসার ল্যাস্কির ছাত্র।

মাদমোয়াজেল ক্লাঁকো বললেন—জানি।

বিস্ময়ের সুরে এটনী শুধাল—কেমন করে?

আপনি যখন টেবিলের ওপর হুমড়িখেয়ে পড়েন তখন আপনার বুক পকেট থেকে কতক-গুলো কাগজ বার হয়ে পড়ে। আমি কিছু কিছু ইংরাজী জানি বলে পড়তে পেরেছিলাম। তাইতেই আপনার পরিচয় পাই। প্রোফেসার ল্যাস্কিকে আমি খুবই জানি। আমার দাদা তাঁর ছাত্র ছিলেন। আমি নিজে সোরবোণের ছাত্রী।

এটনীর বিস্ময় এবার আকাশ ছাড়িয়ে গেল—আপনি তাহলে বারে কি করেন?

ওটা আমার রোজগার। নৈলে ইউনিভার্সিটীর খরচ চালাব কেমন করে?

কেন আপনার বাবা মা নেই?

মুহূর্তে সোফিয়ার মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বলল—আছেন, কিন্তু আমি নিজেই নিজের পড়ার খরচ জোগাড় করা পছন্দ করি। একবার বড় হয়ে গেলে নিজের দায়িত্ব কি অপরের হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়?

মাদমোয়াজেল ক্লাঁকোর সেই রান্নাঘরে এটনী কম নয় প্রায় মাস খানেক কাটিয়ে ছিল—এই ঘটনার পর। দুজনের মধ্যে চুক্তি হয়েছিল সোফিয়া এটনীকে ফরাসী ভাষা শেখাবে আর এটনী সোফিয়াকে ইংরাজী। তবে সোফিয়া যত তাড়াতাড়ি ইংরাজী রপ্ত করছিল, এটনী তত তাড়াতাড়ি ফরাসী রপ্ত করতে পারেনি। কিন্তু এক মাসের মধ্যেই সে ফরাসী কালচারের যতটা সন্ধান পেয়েছিল, তাতে মনে মনে বেশ খানিকটা ঝুঁকছিল সোরবোণের ছাত্র হবে বলে।

এই একমাসের মধ্যে সে সারা প্যারিস সহরের মধ্যে কেবল একটা মাত্র ব্যক্তিকেই জানতে ব্যস্ত হয়েছিল। সে ছিল সোফিয়া ক্লাঁকো।

সোফিয়ার সৌন্দর্যই যে তাকে শুধু আকর্ষণ করে রেখেছিল তা নয়। এটনী গভীর ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল তার ব্যক্তিত্বে। তা ছাড়া সোফিয়াকে তার নারী বলে মনে হত না। তাই তার সম্বন্ধে তার কোন ভয় ছিলনা। কথাবার্তা সোফিয়া বড় একটা বলত না। কেবল ঘড়ির কাঁটার মতো কাজ করে যেত। সারা দিন লেখাপড়ার মধ্যে ডুবে থাকত। তার পড়ার বিষয়-বস্তু ছিল জগতের শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ। সে সম্বন্ধে দামী দামী বই সোফিয়া কিনে আনত। মাঝেমাঝে ভারতীয় শিল্প সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করত এটনীর সঙ্গে। রাতে যেত বারে কাজ করতে।

কিন্তু এতো ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও এটনী একটী মুহূর্তের জন্য সোফিয়ার মুখে এক টুকরো হাসির চিহ্ন দেখেনি। কখনও এতটুকু ভাবাবেগ বা কারুণ্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়নি সে মুখে। কঠিন কঠোর, নির্লিপ্ত সে মুখের ভঙ্গী চোখের দৃষ্টি।

এটনী দেখত সময় সময় পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে সোফিয়া তাকে কি রকম যত্ন করত। অথচ কথাবার্তা দু'জনের মধ্যে ছিল খুবই কম। আরও একটা ব্যাপারে এটনী আশ্চর্য হত। সুন্দরী শিক্ষিতা, কোমল অন্তঃকরণ এমন একটী যুবতী ফরাসী মহিলার কোন পুরুষ বন্ধু ছিল না। তার বাহিরের কাঠিন্য বোধ হয় কাউকে তার কাছে ঘেঁসতে বাধা দিত। সোফিয়া ছিল একেবারে একলা। থাকবার মধ্যে বাড়ীতে তার পোষ্য ছিল সোটা চার পাঁচ বেড়াল। তাদের হরেক রকম নাম দিয়েছিল সে। তার ঘরে। আদর সব ছিল ঐ বেড়ালদের ওপর।

এটনী এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটিকে জানবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল।

এটনী প্যারিসে থাকতে থাকতেই সমস্ত ফ্রান্সের সেই ভয়ঙ্কর দুর্দিনটা এসে পড়ল। সে-দিনের কথা এটনী কিছুতেই ভুলতে পারবে না। সেটা জীবনের একটা অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

মে মাসের শেষ আকাশ ঘন নীল। বাতাস আতপ্ত। রোদ ঝলমল করছে প্যারিস সহরের ওপর। রাস্তার ধারে ধারে ঘাসের লন ডাঁতিনায়ন, বাটারকাপ আর ডেজিতে ভরে গেছে যেন অজস্রফুল তোলা ঘরকান্দি গালচে-পাতা হয়েছে সমস্ত সহরটা জুড়ে। পার্কে পার্কে—প্রিমিওলো, আর রোডোডেনড্রনের বিচিত্র সমারোহ। সারা প্যারিস সহর যেন বিয়ের ফুলের মতো ফুলের সাজে সেজেছে। সবাই বলছে এমন গ্রীষ্ম প্যারিসে বহুকাল আসেনি। ঘাসের লনে পিঠ দিয়ে মেয়ে পুরুষ বই পড়ছে, গড়াচ্ছে, গল্পেন খাচ্ছে। একটা চমৎকার আমেজ মাখা আলসেমী সমস্ত প্যারিস সহরের ওপর তার নরম গরম হাত বুলিয়ে আদর করছে।

বিশেষ করে লাঞ্চের পর এই চিলেমী আলসেমী চরমে উঠেছে। এটনী ভেবেছিল দু'এক দিনের মধ্যেই লণ্ডন চলে যাবে। কিন্তু এমন মনোহর গ্রীষ্ম পেয়ে সে আরও কিছু দিন থেকে যেতে মনস্থ করেছে। সেদিন লাঞ্চের পর সে আর সোফিয়া একটা পার্কের মধ্যে শুয়ে শুয়ে গড়াচ্ছিল আর খুব নরম গলায় আলাপ করছিল। সোফিয়া কথা কইছিল না, শুধু মাঝে হাঁ, হুঁ বলে কথা চালিয়ে যাচ্ছিল।

এমন সময় দুপুরের সেই মাধুর্যময় শান্তিপূর্ণ মুহূর্তটার উপর কে যেন নির্মম ভাবে চাবুক কষিয়ে দিলে। তীব্র ভীষণ আওয়াজে সাইরেন বেজে উঠল। সমস্ত প্যারিসের লোক নিঃঝুম শান্তির মধ্যে হঠাৎ রূঢ় আঘাতে চমকে গেল, থমকে গেল, হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর যে যেখানে পারল গিয়ে আশ্রয় নিল। পার্ক রাস্তা সমস্ত জনহীন হয়ে গেল এক মুহূর্তের মধ্যে। এটনী আর সোফিয়া উঠে গিয়ে একটা রেলওয়ে ষ্টেশনের মধ্যে আশ্রয় নিল। সোফিয়ার মুখের ভাব যেন গুলীর আওয়াজ শোনা পায়রার মতো। এটনীর সারা মন বিরক্তিতে ভরে গেছে।

এমন সময় বাতাস চিরে আবার সুতীক্ষ্ণ শব্দ উঠল। হু-ই-ইকার আকাশটা আর্তনাদ উঠল। তারপরই সমস্ত পৃথিবী যেন ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যাবার আওয়াজ উঠল একটু দূরে।

প্যারিসের ওপর প্রথম বোমা বর্ষণ।

সোফিয়া ভয়ে এটনীর হাত দুটো জোরে ধরেছে। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে সে। দুটো চোখ বুজিয়ে আছে প্রাণপণে। শুধু একবার শুকনো গলায় শুধাল—কি হবে? এটনী তখনও জানে না

যুদ্ধ কি পদার্থ। তাই বেপরোয়া হয়ে বললে—কি আর হবে? কিন্তু এই চমৎকার দিনটায় বোমা ফেলার কোন মানেই হয় না। হতভাগা জার্মানগুলো অদ্ভুত রকমের বর্বর। একটুও রসজ্ঞান নেই।

সোফিয়া আস্তে আস্তে বললে—আমি মায়ের কাছে জার্মানদের আক্রমণের গল্প শুনেছিলাম। তা যেমন ভয়াবহ তেমনি নৃশংস। আর সৈন্যগুলো সহরে এসে তো কোন যুবতী মেয়ে রেহাই পাবে না। কি হবে—?

বাইরে সমানে বোমাবর্ষণ চলল প্রায় ঘণ্টা দুই। এ্যান্টি-এয়ার-ক্রাফ্‌টও তাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা রেখে গর্জন করে গেল। তারপর একসময়ে অস্ট্রিয়ার সাইরেন বাজল।

ততক্ষণে পৃথিবীর রূপ পাল্টে গেছে। প্যারিস সহরের ওপর থেকে সমস্ত রূপ রং বর্ণাঢ্য দৃশ্যসজ্জা সব যেন উবে গেছে। কাছেই রেনোর ঘটর ফ্যাক্টরী দাউ দাউ করে জ্বলছে বোমার ঘায়ে।

সেই দিনই বুলেভার্ডের ওপর দেখা গেল উত্তর ফ্রান্স থেকে আসা দলে দলে বাস্তহারা তাদের সামান্য সম্বল যা হাতের কাছে পেয়েছে বেঁধে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। সমস্ত প্যারিসের মধ্যে ত্রাসের একটা ভয়াল ঠাণ্ডা স্রোত বইতে সুরু করল। বেশীর ভাগ লোক ঠিক করল প্যারিস ছেড়ে পালাবে।

এর পর প্রায় প্রত্যেক দিনই বোমা পড়তে লাগল প্যারিস সহরের ওপর। কখনও একবার কখনও একবারের বেশী। দিনদুয়েকের মধ্যে প্যারিসের আর্ধেক প্রায় খালি হয়ে গেল। এন্টনী খোঁজ করে দেখল সবের ট্রেন-জাহাজ তো বটেই প্লেন সার্ভিস পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করা বৃথা। সোফিয়াকে সে জিজ্ঞাসা করল, কি করা যায়? এভাবে এখানে থাকলে বোমার ঘায়ে শেষ হতে হবে। তাছাড়া জার্মান সৈন্যরা সহরে ঢুকলে তোমার আমার দু'জনেরই বিপদ।

সোফিয়া ঠিক করল প্যারিস ছেড়ে অন্য কোথাও পালাবে।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা এক প্রকাণ্ড শেভ্রলে গাড়ী এসে দাঁড়াল তাদের বাড়ীর সামনে। সেই গাড়ী থেকে নামলেন একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক। পরনে দামী পোষাক, মুখচোখের চেহারা পাকা বনিয়াদী। তিনি সটান এসে সোফিয়ার শোওয়া-বসার একমাত্র ঘরটায় ঢুকলেন। এন্টনী সোফিয়ার ঘরে ঢুকেই অবাক হল। সোফিয়া পরিচয় করিয়ে দিলে—আমার বাবা মঁসিয়ে ফ্রাঁকো।

মঁসিয়ে বসবার পর্যন্ত অবকাশ দিলেন না। গম্ভীর গলায় বললেন—আমার এখানে আসা তোমার পছন্দ নয় জানি, কিন্তু আমি আমার কর্তব্য করতে এলাম। আমি আজ ভোর রাতেই প্যারিস ছেড়ে যাচ্ছি। জানতো খবর রটে গেছে জার্মানরা প্রায় প্যারিসের কাছাকাছি এসে পড়েছে। তাই যাবার আগে ঠিক করেছি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। সোফি, তুমি তৈরি হয়ে আমার সঙ্গে এসো এক্ষুনি। আমি অপেক্ষা করছি।

সোফিয়া কিন্তু এ কথায় এতটুকু ব্যস্ততা দেখাল না। তেমনি কঠিন মুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এন্টনী একটু অধৈর্য হয়ে বলল—বেশ তো ভালকথা ম্যাসজেন ফ্রাঁকো, আপনি আপনার বাবার সঙ্গে চলে যান, এতো ভালই হোল।

সোফিয়া মুখ নামিয়ে বলল—না, তা হয় না। আমি বাবার সঙ্গে যেতে পারি না। তোমাকে অনেক বড়বার বাবা—তুমি যাও।

মঁসিয়ে ফ্রাঁকোর সারা মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল, টকটকে রাঙা হয়ে উঠল। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন— ভাল করে ভেবে দেখ।

সোফিয়া তেমনি মৃদু নীচু করে জবাব দিল—আমি অনেক ভেবেই বলছি। তুমি যাও। আমার যা হয় হবে।

এটনী অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে এই নাটকের দৃশ্য দেখতে লাগল। সে এর আগাগোড়া কিছুই বুঝতে পারল না শুধু সোফিয়ার সম্বন্ধে তার বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে চলে যেতে লাগল।

মঁসিয়ে ক্লাঁকো অপেক্ষা করলেন না। এটনীর হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বিদায় নিলেন। বললেন—তোমার বান্ধবীকে যদি পারতো বাঁচাবার চেষ্টা কোর।

এটনী বলতে গেল—আপনি ভুল বুঝছেন, ও আমার বান্ধবী নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মঁসিয়ে ক্লাঁকো প্রায় দৌড়ে গিয়ে তার গাড়ীতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছেন।

সেই রাতেই অবশ্য ভোরের দিকে সোফিয়া আর এটনী দুজনেই পালাল। সোফিয়া বললে—মাইল ত্রিশেক দূরে একটা গ্রামে এক বৃদ্ধা মহিলা আছেন তিনি ছেলেবেলায় আমায় পড়াতেন। চল তাঁর ওখানে চলে যাই। দুজনে দু'খানা সাইকেল নিয়ে একটা তাঁবু আর কিছু রসদ-পত্র জোগাড় করে রাত থাকতে থাকতেই রওনা দিল প্যারিস ছেড়ে। এটনী রাস্তা ঘাট কিছু জানত না। সোফিয়াই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

যাবার সময় দেখা গেল রান্নাঘরের মেঝেতে একটা বেড়াল ছানা ঘাড় মটকানো অবস্থায় পড়ে আছে। একটা মদ্দা বেড়াল ছানাটাকে খতম করে দিয়েছে। সোফিয়ার চোখে সেটা পড়তেই অদ্ভুত আর্তনাদের সঙ্গে সে সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে পড়ল ; তার সমস্ত নড়ন চড়ন রহিত হয়ে গেছে। চোখের চাউনীটাতে একটা জংলী অস্থির ভাব খেলা করছে। এটনী ভয় পেয়ে গেল। ইতিমধ্যে সোফিয়া কান্নায় ভেঙে পড়েছে। হু হু করে কাঁদতে কাঁদতে চোখে রুমাল চাপা দিয়ে সে বাড়ী থেকে বার হয়ে গেল। সারাদিন তারা যে রাস্তা ধরে এগুতে লাগল সেটা প্যারিস থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকে ভর্তি। রাস্তার দু'পাশে গ্রীষ্মকালের প্রকৃতি ফুল পল্লবের ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে অকৃপণ ভাবে। কিন্তু কে সেদিকে তাকায়। সবাই পালাল প্রাণ ভয়ে। অনেক কষ্ট করে সে রাস্তার পথ করে এগুলো। শেষে সোফিয়া বললে—এসো আমরা আর একটা রাস্তা ধরে যাই। সেটা কিছুটা ঘিঞ্জিবিলি হবে। বলে একটা উল্টা দিকের রাস্তা ধরে চলতে সুরু করল। এটনী বললে—এটা দিয়ে গেলে আমরা আবার প্যারিসেতে ফিরে যাব। সোফিয়া বললে—না না, এ পথ একটু ঘুরে গেছে সেই গাঁটাতেই।

সত্যিই রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত খালি। কিন্তু সন্ধ্যে হতে না হতেই তারা একটা গ্রামের কাছে এসে মেসিন-গানের কট কট আওয়াজ শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জনও ভেসে আসতে লাগল। দুজনে তাড়াতাড়ি গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে দেখল গ্রামটা একদম খালি। কেবল একটা সোয়ালিনী মেয়ে তার সোয়াল ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাদের বলল—সবাই পালিয়েছে গাঁ থেকে, তা যাক, আমি আমার গরু ছেড়ে কোথাও নড়ব না। আসুক জার্মানরা—আমিও ভয় পাইনে।

সেই মেয়েটিই তাদের আশ্রয় দিল রাতের মতো। এটনী আর সোফিয়া সারা দিনের ক্লান্তির পর একখানা ভাল ঘর, ভাল বিছানা আর খাবার পেয়ে বর্তে গেল। রাত বেশী হলে সঙ্গে সঙ্গে কামানের গর্জন বাড়তে লাগল। মেসিনগানের কটকট আওয়াজ কাছে এগিয়ে আসতে লাগল। বোঝা গেল খুব নিকটে এসে গেছে। কারো বাড়ী ঘর থর থর করে কাঁপছে কামানের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে।

সোফিয়া বললে—আমার বাবার দুই সন্তান। আমি মেয়ে, আর আমার এক দাদা। বাবা

সমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি, টাকা পয়সা ক্ষমতা প্রতিপত্তি কিছুরই অভাব নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোনকে ভালও বাসতেন বটে, কিন্তু তিনি হলেন ভীষণ ক্ষমতাপ্রিয় আর অহংকারী ব্যক্তি। ভালবাসার জন্যে তিনি নিজের প্রতিপত্তি এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দিতেন না। মাকেও বাবার মর্জি মতো চলতে হতো। আমি কিন্তু আমার দাদাকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতাম।

আমার বয়স যখন কুড়ি, দাদার পঁচিশ। দাদা তখন লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিসের ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছে। দাদা প্রেমে পড়ল। মেয়েটী মধ্যবিত্ত ঘরের হলেও প্যারিসের মধ্যে ডাকসাইটে সুন্দরী। অবশ্য দাদাও খুব সুপুরুষ ছিল, কিন্তু সে মেয়ের কাছে কিছুই নয়। দাদা তাকে বাড়ীতে নেমন্তন্ন করে নিয়ে এল কয়েকদিন। বাবা প্রথমে কিছুই বললেন না। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই মত দিলেন—তোমার ও মেয়ে বিয়ে করা চলবে না।

দাদা তখন বাবার ফার্মে ইকনমিষ্টের কাজ করছে। বেশ মোটা রকম মাইনে পায় তার জন্যে। তারই ওপর ভরসা করে দাদা বিয়ের জন্য এগিয়ে যাচ্ছিল। বাবা বললেন—ও মেয়েকে যদি বিয়ে কর তো তোমাকে আমার ফার্ম ছাড়তে হবে, আমার বাড়ীও ছাড়তে হবে। দাদা গভীর আঘাত পেল। তার বলবার একমাত্র লোক ছিলাম আমি। দাদা আমাকে বললে—বাবা আমার প্রেমের ওপর ঈর্ষা পোষণ করে। আমি বিশ্বাস করলাম না। বললাম—ধ্যেৎ তাকি হয়? বাবার অমতের অন্য কারণ আছে। দাদা বাড়ী ছাড়ল। ফার্ম ছাড়ল। অন্য একটা ফার্ম তাকে ডেকে চাকরী দিল। অবশ্য মাইনে কিছু কম। তা হোক, তার ওপর নির্ভর করেই দাদা সংসার পাতবে ঠিক করল। কিন্তু বাবা তাকে ছাড়লেন না। তার প্রবীণ বয়সে তিনি সত্যি সত্যিই দাদার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামলেন।—তখন আমার চোখ ফুটল। দেখলাম দাদার কথা কতো সত্য। বাড়ীতে মায়ের ওপর তিনি একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে গেলেন। মাকে মাঝে মাঝে যা তা বলে অপমান করতে লাগলেন। সেটা এমন ধরণে পৌঁছাল যে এক দিন মা সহ্য করতে না পেরে দাদার কাছে গিয়ে উঠলেন। বাবা এদিকে দাদার বান্ধবী মেয়েটীকে কৌশলে হাত করে নিয়েছেন। তাকে টাকা পয়সা দিয়েছেন প্রচুর। তাকে প্যারিসের মধ্যে দশ খানা বাড়ীর মালিকানী স্বত্ব লিখে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে—তার অধরা ছুলে উঠে জয়চাক। সে দাদার সঙ্গ ছেড়ে বাবার সঙ্গ করতে আরম্ভ করেছে। মা আর বাড়ী যান না। লজ্জায়, হতাশায়, অপমানে মা শয্যাশায়ী হলেন। শেষ পর্যন্ত মাকে বাঁচান গেল না। এক বছরের মধ্যেই আমার হতভাগিনী মা মারা গেলেন। বাবা নিশ্চিন্ত হয়ে সেই মেয়েকে বিয়ে করেছেন। দাদা মনের দুঃখে ট্যাঙ্গানিকায় চাকরী নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। আমি বাবার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেড়েছি। সেই থেকে আমার মনের মধ্যে ধারণা জমেছে সব ব্যাপারে তো বটেই বিশেষ করে নারী ঘটিত ব্যাপারে কোন পুরুষ অন্য কোন পুরুষকে ক্ষমা করে না। সেখানে সে ক্ষমতা-লোভী, ইন্দ্রিয়ভোগলিপ্সু, প্রতিপত্তিপরায়ণ পশু। ঠিক হলো বেড়ালের মতো। ফিরে গিয়ে আমি নিশ্চয়ই ছলোগুলোকে বিদায় করব।

এটর্নীর মনে পড়তে লাগল সোফিয়ার কথাগুলো স্পষ্টভাবে। কি নিদারুণ সত্যি কথাই না বলেছিল সোফিয়া। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস এটর্নীর বুক চিরে বার হয়ে এল। সোফিয়া কোথায় আছে, কেমন আছে? তার জীবনে তার সেই মত পাল্টাবার সুযোগ কি এসেছে?

ঘরের ভিতর থেকে একটা আওয়াজ এল। একাকী তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে গিয়ে দেখল মেয়েটীর ঘুম ভেঙেছে। সে উঠে বসে কাপড় চোপড় ঠিকঠাক করছে।

একটা অদ্ভুত মন নিয়ে এন্টনী ঘরে ফিরে এল। ছেলেবেলার কথা ভাবতে ভাবতে সে যেন বেশ খানিকটা শিশু হয়ে গেছে মনে মনে। তার মনে হল অনেক—অনেকদিন পরে আবার যেন সে তার নিজের বাড়ীতে ফিরে এল। লণ্ডন থেকে ফিরে আসার পর দু'মাস এ বাড়ীতে সে বাস করেছে। কিন্তু এই দু'মাসের প্রতিটী দিন মনে হয়েছে এটা তার প্রবাস। এর থেকে ঢের বেশী আপনার ছিল তার লণ্ডনের লাইট কেন্সিংটনের ফ্ল্যাটটা। আজ আর তা মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই বাড়ীটাই তার যেন নিজের আস্তানা। এন্টনীর শৈশবের হাজার স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই বাড়ীটারই অঙ্গে অঙ্গে। ছেলেবেলায় কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে যখন সে বাড়ী ফিরত তখন এই রকম একটা অনুভূতিই তাকে পেয়ে বসত। সে বেশ স্পষ্ট মনে করতে পারল। সে তার কলকাতার জীবন, লণ্ডনের জীবন সব ভুলে গেছে এই মুহূর্তে।

ঐ যে মেয়েটী বিছানার ওপর বসে তার আলু-থালু বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে, ও যেন তার মা। মায়ের সঙ্গে মেয়েটার যদিও কোন মিলই নেই, তবু মনে হচ্ছে মা যেন সকালে ঘুম ভেঙে উঠে আগোছাল কাপড়-চোপড় ঠিক করতে করতে ঘুমভাঙা নরম গলায় এক্ষুণি ডাক দেবেন—মাণিক, বাপ আমার। ওঠ, অনেক বেলা হল।

ঐ খাটটাতেই তো মা শুতেন। এই ঘরখানা তো মায়েরই ঘর। অথচ মায়ের একটা কাঁটা পর্যন্ত এঘরে নেই। তার বাবার ওপর মারিয়া হাসনের ওপর দুগুণ রাগ হল এন্টনীর।

—আমি এ কোথায় এসেছি?

মেয়েটী বিহ্বল চোখে চারদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করছে।

—আপনি কে? কেন আমাকে এখানে নিয়ে এলেন?

অতি শান্ত অথচ সুদৃঢ় কণ্ঠে মেয়েটী শুধাল। এতক্ষণে এন্টনী আবার নিজের মধ্যে ফিরে এসেছে।

—তুমি, আপনি,—কি যে বলবে এন্টনী ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত আপনি সম্বোধনই করল। —আপনি এখন আমার বাড়ীতে আছেন। কিছু ভয় নেই আপনার। কোন লোক কোন ক্ষতি আপনার করতে পারবে না। আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আমার নাম—এন্টনী কার্নাণ্ডো, আমি স্বর্গীয় গডউইন কার্নাণ্ডোর ছেলে। গত সন্ধ্যায় আমি আপনাকে কতকগুলো দুর্বৃত্তের হাত থেকে ছিনিয়ে এনেছি।

—এন্টনী কার্নাণ্ডো?—মেয়েটী ধীরে ধীরে নামটা উচ্চারণ করল যেন নিজের মনে।

কোমল ম্লান দৃষ্টি মেলে সে ঘরটার চারদিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল!

এন্টনী এবার তাকে প্রশ্ন করল—আপনি কেমন বোধ করছেন?

মেয়েটীর বিহ্বল ভাব কিছুক্ষণের মধ্যে কেটে গেল। সে বললে—ভাল।

এন্টনী আবার প্রশ্ন করল—আপনার নাম কি? আপনার বাড়ী কোথায়? আপনার বাবার নাম? —আপনি নির্ভয়ে আমাকে সব খুলে বলুন। ওরা কোথা থেকে আপনাকে নিয়ে এসেছে?

এই প্রশ্নে মেয়েটি চমকে উঠল। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠল। —শুধু ক'টি মাত্র কথা তার মুখ থেকে বার হল—বলব না। বলতে পারব না।

এরপর এন্টনীর বহু অনুরোধেও মেয়েটী আর মুখ খুলল না। তবে সে বিছানা ছেড়ে উঠল,

যন্ত্রচালিতের মতো এটনীর পিছনে পিছনে বারান্দার অপরদিকে গেল। সেদিকে বাথরুম। বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিল। এটনী নিজে গিয়ে তার জন্যে খাবার নিয়ে এল। খাবারের সামনে বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে ধীরে ধীরে খেতেও আরম্ভ করল সে। কিন্তু এটনী কোন রকমেই তার মুখে আর চোখ ফিরিয়ে আনতে পারল না।

এটনী তার মায়ের ঘরটাতেই মেয়েটীর থাকার ব্যবস্থা করল। মনে মনে সে বেশ খানিকটা অস্বস্তিও বোধ করতে লাগল। সে যা আশা করেছিল তা হল না। মেয়েটীর জ্ঞান হবার পর সে জানতে পারবে তার বাড়ী কোথায়। তাকে পৌঁছে দেবারও ব্যবস্থা করবে সে তখুনি। কিন্তু মেয়েটী সেই যে মুখবন্ধ করেছে তা আর সে খুলছে না কিছুতেই। এটনী ভাবতে লাগল কি করা যায়? পুলিশে খোঁজ নেবে কি, যদি কেউ মেয়ে হারিয়েছে বলে ডায়েরী করে থাকে। কিন্তু তাতে বিপদও আছে।

একবার মনে হল লিন্‌ডাকেই খবর পাঠায়। কিন্তু পরক্ষণেই মনটা বেঁকে বসল। —থাক লিন্‌ডাকে ডাকবার প্রয়োজন কি, ওর ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব। —ভাবল এটনী। কাল রাতে যে ব্যাপারটা ঘটেছে তাতে ওর জানুতে আঘাত লাগা কিছুমাত্রও বিচিত্র নয়। অনেক সহানুভূতির সঙ্গে, অনেক ইঁসিয়ার হয়ে ওর সাথে এখন ব্যবহার করতে হবে।

মায়ের ঘরের সামনে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এটনী। হঠাৎ তার চোখ পড়ল উঠোন পার হয়ে অপরদিকের বাড়ীটার একটা জানালায়। একজন বয়স্কা মেয়েছেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে এদিকে। এটনী গ্রাহ্য করল না।

তখুনি সে তার ম্যানেজার সেতুরামন আয়ারকে ডেকে পাঠাল। সেতুরামন অত সকালে তার মাষ্টারের ডাক শুনে কপালের ওপর বিভূতির ঝাঁচড় কাটতে কাটতেই দৌড়ে এল। এটনী তাকে নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। সব কথা তাকে খুলে বলবার সময় লিন্‌ডার কথাটা ইচ্ছা করেই বাদ দিল।

সেতুরামন সব শুনে বলল—হুসান কার্ভোজার মতো পাষণ্ড দুভারতে পাবেন না স্যর। ওর কাজই হল বিদেশী টীমার কোম্পানীর লোকদের মেয়ে জোগান। এই করেই ও বিদেশী কোম্পানীর প্রায় সবকটাই হাত করেছে। এখন এখানকার প্রায় একচ্ছত্র হেডেডোর কন্‌ট্রাক্টর হয়ে বসবার উপক্রম। কিন্তু ও শুধু পাষণ্ডই নয় স্যর, ও হল জ্যান্ত শয়তান। আমি ওর সমস্ত খবর জোগাড় করেছি। ওর প্রতি মাসে পাঁচশ টাকা খরচ হয় গুপ্তচরদের পেছনে। একজন থাকে রেল ষ্টেশনে—কে গেল, কে এল সে সব খবর দেয়। একজন থাকে পোষ্ট অফিসে প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র সব গাপ করে যেয় কেউবা খুলে পড়ে ওকে খবর জানায়। একজন থাকে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে—সে টেলিফোন ট্যাপ করে পরের কথা শুনে ওকে জানায়। আর অনাকয়েক ঘুরে বেড়ায় পোর্টে বাজারে। কে কোথায় কি করছে তার নাড়ীনক্ষত্র ওর কাছে পৌঁছয় প্রত্যেকদিন। তাছাড়া পুলিশের প্রত্যেকটী লোককে হুসান টাকা খাইয়ে রেখেছে স্যর। সুতরাং মেয়েটীকে এখানে রাখা ঠিক হবে না। ওকে এখুনি সরিয়ে নিয়ে যান অন্য কোথাও। হুসানের পোষা গুণ্ডার দলও আছে এই শহরে আমি সে খবরও পেয়েছি।

সেতুরামন—ইয়েস মাষ্টার বলে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিল।

এটনী কিন্তু পাশের ঘরটা থেকে কোথাও নড়ল না। সকালে নিয়মমাফিক মারিয়া দাসন এল। এটনীর ভাবনা যদি মারিয়া দাসন মেয়েটীকে ঘরে দেখে কেলে তবে এক্ষুণি চেঁচামেচি জুড়ে

দেবে। তাছাড়া মারিয়া হাসনের গল্প করা স্বভাব। বাইরে গিয়ে যদি এসব কথা একবার ষ্ট্রোক করে তবে ফল ভাল হবে না। সে মারিয় হাসনকে দেখেই বলে উঠল—হাসন তোমার জন্যই অপেক্ষা করছি আমি। তোমাকে এখুনি একটা কাজ করতে হবে। একটা জরুরী চিঠি দেব আমি। সেটা নিয়ে এক্ষুণি বাস ধরে ভিনেভেলীতে যেতে হবে—ভেভারেও কাদার ভিক্টোরিয়াকে চিঠিখানা দিতে হবে। আর তিনি যে জবাব দেন সেটাও নিয়ে আসতে হবে।

মারিয়া হাসন মুখটা একটু নিচু করে নিয়ে বললে—আজিস থেকে কাউকে পাঠালে হয় না।

আমি গেলে বাড়ীর কাজকর্ম দেখা শোনা করে কে?

এন্টনী বললে—তার জন্যে আপাততঃ তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি যাও তৈরী হয়ে এসো। আমি ইতিমধ্যে চিঠিখানা লিখে রাখছি।

মারিয়াহাসন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে নেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে কর্মী জামা-কাপড় পরে, মাথায় পাগড়ী বেঁধে তৈরী হয়ে এল। এন্টনী একটা চিঠি লিখে খামে মুড়ে ভেভারেও কাদার ভিক্টোরিয়ার ঠিকানা লিখে মারিয়া হাসনের হাতে দিয়ে দিল। মারিয়া হাসন চলে যেতে সে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল। না চিঠিটা এমন কিছু জরুরী নয়। মামুলী কুশল প্রশ্ন করে সে কাদারকে চিঠিটা লিখেছে। আর লিখেছে একদিন সময় করে সে নিশ্চয়ই যাবে কাদারের কাছে।

এবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে স্নান করতে গেল। অনেকক্ষণ ধরে সে স্নান করল। স্নান করতে করতে ভাবতে লাগল সুলতান কার্ডোজার কথা। লোকটা যে নরক্রপী দানব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সে যেকোন উপায় গ্রহণ করতে পারে। সুলতানের অর্থ আছে, সামর্থ আছে, প্রতিপত্তি আছে। তবুও কেন সে গুপ্তচর লাগিয়ে রেখেছে চারদিকে? পুলিশকে হাত করেছে পয়সা দিয়ে—তবুও কেন গুপ্তচর লাগায় সে? সাবধান হতে চায়? —কিসের থেকে সাবধান? সে যখন সব ঘাটীগুলো এতো ভাল করেই বেঁধে রেখেছে তবে তার সাবধান হবার প্রয়োজন কি?

[ক্রমশঃ

• বিখ্যাত লেখক এমার্সনের কাছে একদিন এক তরুণ লেখক এল রচনা পদ্ধতি শিখতে।

এমার্সন প্রশ্ন করলেন: তুমি নিজে লিখতে চেষ্টা করেছ কি?

আজ্ঞে হাঁ, করেছি বৈ কি। এই দেখুন আমার খাতাপত্র।

এমার্সন একবার চোখ বুলিয়ে তার খাতাগুলি ফেরৎ দিয়ে বললেন; মোটে ত বাইশ খানা খাতা দেখছি—আর গুলো কোথায়?

তরুণ লেখকটি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন: কেন?

এমার্সন হেসে বললেন: আরে, তোমার মত আমি যখন প্রথম লেখা আরম্ভ করি, তখন আমার জন্যে খাতা জোগাতে একটা দোকানই বসে গিয়েছিল আমার বাড়ীর পাশে।

একজনে আর কয়েকজনে

অনিল কুমার ভট্টাচার্য

শেষ বৈঠকের বিষ্ণু নাগকে একান্ত সান্নিধ্যে পেয়েছিলাম সেদিন।

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে তাঁর কাছে ব্যক্ত করলাম উপেন্দ্রনাথের জীবনের একটি উজ্জ্বল দিককে। কথায় কথায় কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিন জিগ্যেস করেছিলেন আমাকে, 'আচ্ছা অনিল, উপেনদার এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কী আমরা কিছু ডিসিডিক দিতে পারিনে। একটি বৃহৎ সংসারের দায়ভার চালাতে এখনো তিনি এই দেহে এতো খাটেন, এটা আমাদের লজ্জা। দেশ এবং দেশের সাহিত্যকে তিনি পরিপুষ্ট করেছেন—আমাদের তিনি অগ্রজ, আমাদের প্রতিদানে কিছুটা করা কর্তব্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। উপেন্দ্র জন্ম-জয়ন্তীর প্রাক্কালে এই কথা উপেন্দ্র নাথকে বলেছিলাম, 'দাদা, আমাদের জাতীয় সরকার সাহিত্যিকদের যে পেনসেন দেন তা গ্রহণ করায় আপনার বাধা কিসের?

উপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ভাই, ওই কাজটি তোমরা আমার জন্যে করো না। যাঁরা সক্ষম তাঁরা কেন দান গ্রহণ করে ঋণের বোঝা বাড়াবেন? সামান্য প্রয়োজন আমার—আর যদি বা তা কুড়োতেও অক্ষমই হই—তোমরা পাঁচজন ছোট ভাই আছো—দাদার ভার তোমরাই নিও।'

বিষ্ণু নাগ বললেন, 'এমনি করে বুড়োটাকে আর কদিন বাঁচিয়ে রাখবে?

বললাম 'হঠাৎ একথা বলার মানে?'

'মানে, আর কিছুই নয়। সামান্য উপেন্দ্রনাথকে অসামান্য করার প্রয়াস তোমাদের মধ্যে চাগাড় দিচ্ছে আজকাল দেখছি বড্ড বেশি।'

বললাম, 'এটা কিন্তু অত্যন্ত বিনয়ের লক্ষণ। উপেন্দ্রনাথ নিজেকে যা ভাবেন, ভাবুন, তুমি এমন ওপর চালে কথা বলো কেন? সত্যকে প্রকাশ করা মানে ব্যক্তি পূজা নয়।'

'তবে কী আখ্যা তাকে দেবে?'

"ব্যক্তির মহত্বকে প্রকাশ করা মানে একটি আদর্শকে—একটি সুনীতিকে মানুষের সামনে তুলে ধরা।'

'কিন্তু লোকে যদি তাকে বলে আত্মকথা।'

'বলুক। ক্ষতি নেই তাতে। দেবতাকেও তো স্তব করি আমরা। দেবতা তাতে যদি আপত্তি করতেন তাহলে দেবস্তুতি নিশ্চয়ই বন্ধ হয়ে যেতো।'

বিষ্ণু নাগ বললেন, 'লোকে কিন্তু ভাবতে পারে তোমাদের সামনে রেখে উপেন্দ্রনাথেরই এই আত্মপ্রচারের একটি অভিনব কলা-কৌশল।'

'লোকে এই কথা বলছে নাকি?'

'বলতে ও তো পারে।'

'তা হলে লোকদের আমি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দেবো একটি নজির আমার হাতে আছে—যা দিয়ে প্রমাণ করা যাবে উপেন্দ্রনাথ নিজেকেই নিজে শাসন করেন—তাকেও কী তুমি বলবে আত্মকথা।'

বিনু নাগ সতর্ক হলেন, 'চুপচুপ। অমন কথা মুখে এনো না। উপেন্দ্রনাথ এখনো জীবিত, এরই মধ্যে তাকে এমন ভাবে প্রকাশ করে দিও না।'

উপেন্দ্র নাথ নিজে সুগায়ক। সঙ্গীতে তাঁর অত্যন্ত অনুরাগ। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীত তাঁর জীবন বীণার দুটি তার।

শৈশব এবং বাল্যকালে মায়ের কাছ থেকে সঙ্গীতের প্রথম পাঠ তিনি গ্রহণ করেছিলেন। যৌবনে ভাগলপুরের বিখ্যাত সঙ্গীতকার স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রেরণাই সঙ্গীত-সাধনায় উপেন্দ্র নাথকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রেরণা দেয়। ভারতীয় শাস্ত্র সঙ্গীত তিনি অনুশীলন করতে থাকেন। রাগ সঙ্গীত তিনি স্বয়ং রচনা করতেন এবং তাতে স্বয়ং সুরারোপ করে গাইতেন। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গীতও তাঁর জীবনের নিত্য সঙ্গী।

সভা-সমিতিতে উপেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সেও গান গাইতেন,—তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বর এমন কি একালের প্রসিদ্ধ গায়কদের ও চমক লাগিয়ে দিতো।

কলকাতার বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান রবিবাসরের পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। সেই সম্বর্ধনা সভায় গীত হবার জন্যে উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে বন্দনা জানিয়ে একখানি গান রচনা করেছিলেন এবং নিজেই তার সুর দিয়েছিলেন। গানটির কথায় এবং সুরে শরৎচন্দ্র এতোই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে মৃত্যুপথ যাত্রী অবস্থায় একদিন স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি উপেন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেই গানখানি শুনেছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন—

'নন্দিত তুমি শরৎ চন্দ্র,
বন্দিত তুমি হে রূপকার।
মানব মনের গহন বনের
হে মহাসাধক কল্পনার।
চিত্ত-কাননে পেকাশী করবী
অপরূপ রূপে ফুটাইলে কবি,
নিকষ-নিবিড় তিমির গগনে
বিরচিলে ছবি চন্দ্রমার!
পঙ্কের মাঝে যে ছিল মলিন
করিলে তাহারে পঙ্কজিনী,
তোমার প্রভায় পাপ-মেঘে গায়ে
জাগিল শুভ্র সৌদামিনী।
হে মরমীসখা, বন্ধু সুজন,
লহ হে মোদের এ প্রীতি-পূজন,
লহ প্রণয়ের মিলিত মনের
রবি বাসরের নমস্কার!'

বিশুদ্ধ ইমন রাগে গীত এই গানখানি শুনে মৃদুভাষী শরৎচন্দ্রের দুচোখ ভরে অশ্রুর প্লাবন। সুরের এবং ভাবের আবেগে দুই পরম বন্ধুর একাত্ম-মিলনের এক অপূর্ব যোগাযোগের কথা বহু সভায় উপেন্দ্রনাথ ব্যক্ত করতেন।

উপেন্দ্র জয়ন্তী উৎসবের প্রাক্কালে কেন জানি নে হঠাৎ আমার মনে 'নন্দিত তুমি শরৎ চন্দ্র' অনুরণিত হয়ে উঠেছিলো।

উপেন্দ্রনাথ আমার শুধু গুরু নন; আমার আত্মার আত্মীয়। আমার জীবনের সুরকে উপেন্দ্রনাথ প্রেরণা দেন। তাঁকে স্মরণ করে হঠাৎ একটি গানে লিখে ফেললাম।

'শত শরতের শতদলে থাক্
শত লিপিকায় লেখা
তোমার মানস আকাশের পটে
উজ্জ্বল রঙ রেখা।
তব প্রতিভায় চন্দ্রিমা-মাখা আলো
স্নিগ্ধ প্রভায় দীপ শিখা জ্বালাইল
বঙ্গবাণীর কনক কিরণে শতশিখা নিয়ে দেখা॥
বন্ধু মোদের হে উপেন্দ্রনাথ
তব অন্তরময়
কত মানুষের কত আনাগোনা
কত না বিস্ময়
সহজ সুখেরে তুচ্ছ করিয়া দিলে
দুঃখেরে প্রিয় সহজে বরিয়া নিলে
তব অন্তর সঙ্গীতময় অনাহত সুরে লেখা।
উন-অশীতির জীর্ণতা নেই তব যৌবন ভালে
নব নব রূপ সৃষ্টি চেতনা নব নব আলো জ্বালে,
বিমুগ্ধ মন বিগলিত তব হিয়া
নব এষণায় কণ্ঠ ভরিয়া নিয়া
জীবন-রাগিনী শুনায়ে যেন শত কোকিলের কেকা॥'

গানটি লিখে মনে বড়ো আনন্দ পেলাম। ইমনের সঙ্গে খানিকটা আধুনিক গানের নোটেশন মিশিয়েছিলাম নিজে।

গেলাম উপেন্দ্রনাথের গৃহে। সকালের আসরে সেদিন উপস্থিত ছিলেন যিনি তিনি স্বর্গীয় দীনবন্ধু মিত্রের দৌহিত্র রবীন্দ্র কুমার বসু। আমার প্রতিবেশী এবং অগ্রজতুল্য রবিদা গানখানির খুবই তারিফ করলেন। তিনি নিজে একজন সাহিত্য-রসিক এবং সঙ্গীতজ্ঞ।

উপেন্দ্রনাথ নীরব ছিলেন। কেমন যেন মন উদাসী ভাব। কী যেন ভাবছিলেন তিনি।

হঠাৎ বললেন, 'না, হলো না।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হলো না দা'?'

বললেন, 'কথার অনুরাগ সুরে সম্পূর্ণ ধরা পড়লো না।'

উপেন্দ্রনাথ নিজেই হারমোনিয়মটা টেনে নিলেন। গুন গুন করে নানা রাগ রাগিনীর আলাপন শুরু হলো।

'হাঁ, হয়েছে এইবারে।'

আমি এবং রবিদা উৎকর্ণ হলাম। প্রথমে দেশ দিয়ে শুরু, তারপর পূরবী এবং শেষটুকু ইমন রাগের মিশ্রন। উপেন্দ্রনাথের সুরেলা কণ্ঠে গানখানি অপরূপ লাবণ্য নিয়ে সুরের হিল্লোলে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

উপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমলপ্রসাদ সুগায়ক। পাশের ঘরে তিনি এবং তাঁর সহধর্মিনী শ্রীমতী পোপা দেবী সুরের মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এলেন। গানখানির তারিফ করলেন সবাই। স্থির হলো এই গানখানিই আসন্ন উপেন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবে গীত হবে।

শ্রীমতী শেফালি মজুমদার বেতারের নামকরা কণ্ঠশিল্পী। শেফালি উপেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রীর কন্যা। বালিগঞ্জ কলবায় শেফালি তখন বসবাস করেন। একখানি ট্যাক্সি নিয়ে আমরা চললাম শেফালিকে আনতে। শেফালি এসে গানখানি তুলে নিলে।

শেফালি তার মধুক্ষরা কণ্ঠে গাইছিলো—

'সহজ সুখেরে তুচ্ছ করিয়া দিলে
দুঃখেরে প্রিয় সহজ করিয়া নিলে
তব অন্তর সঙ্গীতময় অনাহত সুরে দেখা।'

শ্রোতাদের দল তখন বেশ ভারি হয়েছে।

উপেন্দ্রনাথকে ঘিরেই আমরা সবাই বসেছিলাম। সমগ্র উপেন্দ্র পরিবার—শেফালির মা, রবি দা আমি এবং আরো কয়েকজন। খাঁটি দেশের সঙ্গে পূরবী এবং ইমন রাগের সংমিশ্রন—সাঙ্গীতিক উৎকর্ষতার এক চমৎকার কলা-কৌশল। শেফালির মন ঢেলে দেওয়া আবেগ আর সুরের আভিজাত্যে কথার হীনতা বুঝিবা ঢাকা পড়ে গেছে। সমস্ত কিছু মিলিয়ে যে অনুরাগ এবং সুরের পরিবেশ—তার স্মৃতি কোনদিনই ভুলবার নয়। উন-অশীতিপর নব যৌবন কিন্তু কেন সহসা চোখ দুটোকে ঝাপসা করে দেয় আমার।

না, দেখলাম—আমি একলা নই, সেই পরিবেশের সকলেরই চোখের কোন চিক চিক করছে। শরতের সাদা মেঘে এক পশলা বৃষ্টি বুঝি বা সমাসন্ন।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

কোন গ্রামে এক ধার্মিক তাঁতী বাস করত। তাকে সকলেই খুব ভালবাসত। তাঁতী হাটে কাপড় বিক্রী করতে গেলে, খরিদ্দার দাম জিজ্ঞাসা করলে বলত, "রামের ইচ্ছা সুতার দাম ১৲ টাকা, আর মেহেন্নতের দাম ।০ আনা, রামের ইচ্ছা মুনাফা ৵০ আনা, কাপড়ের দাম রামের ইচ্ছা ১৷৵০ আনা।" তাঁতী রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ বাহিরের চালায় বসে ঈশ্বরের নাম গুণকীর্ত্তন করত। একদিন অনেক রাত্র পর্য্যন্ত ঈশ্বরের নাম করছে আর মধ্যে মধ্যে তামাক খাচ্ছে। এমন সময় সেই পথ দিয়ে কতকগুলো ডাকাত ডাকাতি করতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে মুটে না থাকাতে তাঁতীকে ডেকে নিলে। তারপর একজনের বাড়ীতে ডাকাতি করে তার মাথায় কতকগুলো জিনিষপত্র চাপিয়ে দিলে। এমন সময় পুলিস এসে তাঁতীকে মোট মাথায় ধরে ফেল্লে, আর অন্য সব লোক পালাল। পরদিন হাকিমের কাছে বিচারের সময় গ্রামের লোক জানতে পেরে উপস্থিত হয়ে বল্লে, "হুজুর, ও বড় ধার্মিক, ও কখনও ডাকাতি করতে পারে না।" তাঁতীকে সাহেব তখন কি ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলেন। সে বললে, "হুজুর, আমি রাত্রে ভাত খেয়ে চণ্ডীমণ্ডপে বসে ভগবানের নাম করছি, এমন সময় রামের ইচ্ছা একদল ডাকাত আমার ঘরে নিয়ে গেল। রামের ইচ্ছা তারা এক বাড়ীতে ডাকাতি করে আমার মাথায় কতকগুলো মোট চাপিয়ে দিলে। এমন সময় রামের ইচ্ছা পুলিস এসে আমায় ধরে ফেললে। তখন রামের ইচ্ছা তারা আমায় হাজতে দিলে। আজ সকালে রামের ইচ্ছা হুজুরের কাছে এনেছে।" সাহেব ধার্মিক লোক দেখে তাঁতীকে ছেড়ে দিলে। তাঁতী রাস্তায় বন্ধুদের বললে, "রামের ইচ্ছা আমাকে ছেড়ে দিয়েছে।"

* * *

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যের কথা—

হরিশঙ্করপুর হতে আচার্য্য মুকাম্বিকা নামক তীর্থে আগমন করলেন। এই তীর্থ-ই সাধকগণের জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যসিদ্ধির পরম সহায় বলে প্রসিদ্ধ। বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ একারণ এখানে বাস করে থাকেন। এখানে অম্বিকাদেবীর কৃপায় মূকেরও বাকস্ফূর্ত্তি হয় বলে ইহা মুকাম্বিকা বা মৌনাম্বিকা বলে বিখ্যাত। আচার্য্য এই স্থানে উপনীত হয়ে দেবী দর্শনে যাচ্ছেন এমন সময় পথিমধ্যে দেখলেন, এক দম্পতি একটি মৃত পুত্র নিয়ে অত্যন্ত মর্ম্মভেদী রোদন করছে। তারা পুত্রটিকে আচার্য্য চরণে নিক্ষিপ্ত করে উভয়েই তাঁর চরণে পতিত হয়ে কাতরভাবে পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগল। এদের ব্যাকুলতায় আচার্য্যের হৃদয় ব্যাকুল হ'ল। তিনি কাতরভাবে বিধাতার শরণ গ্রহণ করলেন এবং মনে মনে বালকের প্রাণ ভিক্ষা করতে লাগলেন। সহসা বালকের জীবন লক্ষণ দেখা দিল। পিতামাতার উল্লাসে ও শিষ্যগণের আনন্দে এক মহাকোলাহলের সৃষ্টি হ'ল। আচার্য্য তখন সেই বালক ও তার পিতামাতাকে আশীর্ব্বাদ করে বললেন, যাও বৎস, গৃহে যাও। ভগবতীর কৃপায় তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। তারা অশ্রুজলে আচার্য্যের চরণ অভিষিক্ত করে একে একে আচার্য্যের শিষ্যবর্গের পদধূলি নিল এবং সকলের আশীর্ব্বাদ নিয়ে গৃহে ফিরল।

———

সঙ্গীতনায়ক আচার্য্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ঋষি সরস্বতী দেশিকোত্তম

বিষ্ণুপুর ভারতের অন্যতম সঙ্গীতকেন্দ্র। বিষ্ণুপুরের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুশীলন প্রায় দুই শতাব্দী যাবৎ তানসেন বংশীয় বাহাদুর সেন (খঃ) অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আমন্ত্রণে বিষ্ণুপুরে আসেন এবং রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। তাঁর অবদানই বিষ্ণুপুরকে সঙ্গীতক্ষেত্রে মহিমাময় করে তুলেছিল। বাহাদুর সেনের শিষ্য পরম্পরায় তানসেনের সঙ্গীত ধারা বিষ্ণুপুর তথা বাঙ্গলায় অক্ষুণ্ণ থাকে। আলাপ ও ধ্রুপদের যথারীতি: রক্ষণে, প্রচারে ও উন্নতি বিধানে বিষ্ণুপুর অগ্রগণ্য।

বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণতা ও কাব্য-প্রীতি বিশেষ ভাবে ধ্রুপদ সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। সেইজন্য যখন উত্তর পশ্চিম ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর ধ্রুপদের অনুশীলন ম্লান হয়ে পড়ে তখন বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের এই মহান ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছিল এবং তার অনুশীলনে ব্রতী হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতশিল্পীগণ ভারতের নানা সঙ্গীত কেন্দ্রে গিয়ে নানা গুণী সঙ্গীতবিদ্গণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং খ্যাল, টপ্পা, ঠুমরী এবং যন্ত্র সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ বাঙ্গলায় প্রবর্ত্তনে বিশেষ সহায়তা করেন।

মহাত্মা রাম মোহন রায় তাঁর নানাবিধ সংস্কার ও দেশহিতকর কার্য্যের মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতকে তার পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠা করে যখন মহান হন এবং উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ, খ্যালের অনুরূপ সুর ও ছন্দে ব্রহ্ম সঙ্গীত রচনা ও প্রবর্ত্তন দ্বারা দেশবাসীকে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাবান করতে প্রয়াসী হন। তখন রামমোহন, বিষ্ণুপুরের মহাবৎ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতাচার্য্যগণের নিকট বহু মূল ধ্রুপদ ও খ্যাল গান সংগ্রহ করেন যেগুলি তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীতের সুর সংযোজনায় বিশেষ সহায়তা করে।

গোপেশ্বর অসাধারণ প্রতিভাবান ছিলেন। শতাব্দীর সঙ্গীত সংস্কৃতি যা বিষ্ণুপুর ও বাঙ্গলায় সে যুগে পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছিল, তার একনিষ্ঠ সাধক, ধারক ও বাহক ছিলেন গোপেশ্বর। আলাপ ধ্রুপদে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। সমগ্র ভারতে এবং খ্যাল, টপ্পা, ঠুমরী ও বাঙ্গলা গান, সুরযাহার সেতার

প্রভৃতি যে সঙ্গীতেও তিনি ছিলেন একজন মহান্ শিল্পী—একাধারে শিল্পকলা ও পাণ্ডিত্যের সমাবেশ অতি অল্পই দেখা যায়। কিন্তু সঙ্গীতনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন একাধারে মহান্ শিল্পী ও পণ্ডিত। তাঁর গভীর গবেষণামূলক তথ্য সঙ্গীত শাস্ত্রের মূল সূত্রকে সহজ, সরল করে তুলেছিল এবং সর্বভারতীয় বিষয় সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছিল। তিনি অসংখ্য মূল্যবান মার্গ সঙ্গীত স্বরলিপি দ্বারা প্রচার করে সঙ্গীত জগতে অশেষ কল্যাণ সাধন করে গেছেন। তাঁর গ্রন্থ থেকে গান আয়ত্ত করার জন্য অনেক অবাঙ্গালী গুণীরা বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করে, সেই সকল অমূল্য সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

গোপেশ্বর অতি বাল্যকাল হইতেই পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং ১৫ বৎসর কাল তাঁহার শিক্ষাধীনে ও সাধনায় সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পিতা অনন্তলালের মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় আসেন এবং তাঁর সঙ্গীত প্রতিভায় সঙ্গীত সমাজকে মুগ্ধ করেন। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন। মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথকে তিনি গান শুনিয়ে ধন্য হয়ে ছিলেন। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভ্রাতাগণের সঙ্গে পরিচিত হন। গোপেশ্বরবাবুর বয়স তখন ১৮।১৭—১৮৯০।৯৪ খৃষ্টাব্দ। সেই সময় তৎকালীন ভারত শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী, খ্যাল শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র, গোপাল চক্রবর্তীর নিকট অসংখ্য ধ্রুপদ, খ্যাল, ঠুমরী সংগ্রহ করেন।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ বৎসর বয়সে তিনি বর্দ্ধমান রাজসভায় সঙ্গীতাচার্য্য পদে নিযুক্ত হন এবং ২ বৎসর ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ঐ সময় তিনি সঙ্গীত সাধনায় সঙ্গীত শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯০৩ সালে তিনি সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেন। ভারতের বিভিন্ন সঙ্গীত কেন্দ্রে গিয়ে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হন এবং সঙ্গীতে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সময় ভারতের সঙ্গীত সমাজ এবং রাজন্যবর্গ তাঁকে যথাযোগ্য সম্মানিত করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই তাঁর খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর সাধনা ও গবেষণার ফল স্বরূপ আমরা পাই তাঁর মহৎ কীর্ত্তি।

১। সঙ্গীত চন্দ্রিকা ১ম ও ২য় ভাগ। ২। তান মালা। ৩। গীত মালা। ৪। সঙ্গীত লহরী। ৫। গীত প্রবেশিকা। ৬। ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস। ৭। বঙ্গভাষা গীত প্রভৃতি। সম্পাদনা—সঙ্গীত মঞ্জরী (দ্বিতীয় সংস্করণ)

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বিদ্যালয় 'সঙ্গীত-সঙ্ঘে' অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন পরে তিনি অধ্যক্ষ পদ অলঙ্কৃত করেন।

তাঁর শিক্ষাদান পদ্ধতি সঙ্গীতে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ সহায়তা করে। তৎকালীন অভিজাত সমাজ এবং রাজন্য সমাজে তিনি শ্রেষ্ঠ আচার্য্য ছিলেন। তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করে অসংখ্য ছাত্রছাত্রী সঙ্গীত জগতে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণীয়।

সঙ্গীতকে সাধারণ শিক্ষার অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয় রূপে অন্তর্ভুক্ত করার তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা সর্বজনবিদিত। শিক্ষিত সমাজে জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীতকে প্রতিষ্ঠিত করার তিনি শ্রেষ্ঠ পথিকৃত।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বেনারসে তৃতীয় সঙ্গীত মহাসম্মেলনে তিনি বাঙ্গলার সর্ব প্রথম প্রতিনিধিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে যোগদান করেন এবং তাঁর অনন্য সাধারণ সঙ্গীত পরিবেশন দ্বারা জয়মাল্য লাভ করে

বাঙ্গলাকে গৌরবান্বিত করেন। তারপর তিনি লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মির্জাপুর, মজঃফরপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত মহাসম্মেলনের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও পণ্ডিত রূপে আমন্ত্রিত হন। ১৯৪৬ সালে, তিনি কলিকাতায় নাগরিক সম্বর্দ্ধনায় সম্মানিত হন। তৎকালীন বাঙ্গলার শিল্পী, সাহিত্যিক এবং বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে যে ভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন তাহা বর্ণনাতীত।

১৯৪৩ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করে নিজ জন্ম ভূমিতে গিয়ে বাস করেন এবং সেখানে তিনি নূতন উদ্যমে স্বদেশের উন্নতি বিধানে আত্মনিয়োগ করেন। বিষ্ণুপুর রামশরণ মহাবিদ্যালয় স্থাপন তাঁর মহৎ কীর্ত্তি। তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জন্মভূমি ও সঙ্গীতের সেবায় ব্রতী ছিলেন।

১৯৪৪ সালে দিল্লী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর গাওয়া গান এখনও শ্রোতাদের কাণে ঝঙ্কৃত। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ঐতিহ্যের সম্মানার্থে অল ইণ্ডিয়া রেডিও ১৯৪৫ সালে বিষ্ণুপুরে রেডিও সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন এবং আচার্য্য গোপেশ্বর তাঁর সঙ্গীত দ্বারা সে সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

১৯৪৬ সালে পশ্চিম বঙ্গ কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সম্মানিত হন এবং বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত অধ্যাপক (visiting professor) নিযুক্ত হন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল এবং কবিগুরু গোপেশ্বরের গানের একজন ভক্ত ছিলেন। গোপেশ্বর রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন ছিলেন এবং শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত ভবনের বিবিধ বিষয়, তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন। কবিগুরু স্বয়ং গোপেশ্বর বাবুকে সুর সরস্বতী উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে (১৯৬১) বিশ্ব ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গোপেশ্বর বাবুকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে বিভূষিত করেন। ১৯৬১ সালে তিনি দিল্লী সঙ্গীত নাটক আকাডেমির ফেলো নির্ব্বাচিত হন এবং শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও তিনি নিজে দিল্লী গিয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট সে সম্মান গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের পরীক্ষক এবং নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং সর্বভারতীয় বহু সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন।

১৯৬২ সালে কানপুর সঙ্গীত-সংস্থা তাঁকে 'সঙ্গীত মার্ত্তণ্ড' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কেবল মাত্র সঙ্গীত ক্ষেত্রে নয়, ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম দান স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সাধনায় নিষ্ঠা, শিক্ষা-দানে একাগ্রতা, দেশপ্রীতি ও সামাজিকতায় তিনি ছিলেন প্রতীক। তিনি ছিলেন নিরহঙ্কারী, পরহিতৈষী, অমায়িক, নিঃস্বার্থ এবং সর্বজনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয়।

(জন্ম, ১৮৭৮ বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া, মৃত্যু—২৮শে জুলাই রাত্রি ৮-৩৫, ৮৪ বছর বয়স।)

———

বিদূষক, ভাঁড়, আহ্লাদে

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঁড় শব্দের অর্থ হলো পরিহাস-কুশল, পরিহাসরসিক ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ। বিশদ ভাবে বলতে গেলে ভাঁড় হলো এক শ্রেণীর লোক যারা খুব হাসাতে পারে। সেকালে রাজা বা সম্ভ্রান্ত লোকের সভায় ভাঁড় থাকতো। নানা রকম অঙ্গভঙ্গী, সুললিত বাক্যবিন্যাস কিম্বা কৌতুক কাহিনী শুনিয়ে, হাসির গান গেয়ে অথবা নানা রকম ছড়া কেটে মনোরঞ্জন করাই ছিল ভাঁড়েদের প্রধান কাজ। এদের পেশা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। বেনারস, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি উত্তর ভারতের বিভিন্ন সহরে বর্তমানেও বিবাহের উৎসবে এবং পূজা-পার্বণে সকলের মনোরঞ্জনের জন্য ভাঁড়েদের ডাক পড়ে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখ আছে বিদূষকের চরিত্র। সংস্কৃত নাটকের কৌতুক অংশে বিদূষকের একচেটিয়া ছিল। প্রতি নাটকেই একজন না একজন ভাঁড় থাকতো এবং তিনি বিদূষক। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে নাট্যকারগণের প্রবর্তিত পথে বিদূষকত্ব রূপ পরিগ্রহণ করে। বিদূষক চরিত্রের বর্ণন নাট্যশাস্ত্রের অন্তর্গত। শাস্ত্রীয় নজীরের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উল্লেখে বিদূষকত্বের ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা নিদর্শন প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যে পাওয়া যায়। ভাস, কালিদাস, শূদ্রক, হর্ষ এবং রাজশেখর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নাট্যকারগণ যদিচ বিদূষক চরিত্র আপন আপন প্রতিভার বৈশিষ্ট্যে অঙ্কিত করেছেন তথাপি ঐতিহ্যের মূল নীতি সকল ক্ষেত্রে একই রূপ ছিল। নাটকের নায়ক স্বভাবতই হতেন রাজা। বিদূষক ছিলেন রাজার পরম সখা এবং পরস্পর পরস্পরকে "বয়স্য" বলে সম্বোধন করতেন। নিছক হাস্যরস আনয়নের জন্য আদিতে বিদূষক চরিত্র সৃষ্ট হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে নাটকের এই চরিত্রটি নৈতিক নাটের মর্যাদায় উন্নীত হয়।

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরত বিদূষককে অভিনেতাদের মধ্যে গণনা করেছিলেন। নাট্য চরিত্রের তালিকায় প্রথমেই বিদূষক, নায়ী, সূত্রধার ইত্যাদি থাকতো। অবশ্য অভিনব ভারতীয় রচয়িতা অভিনব গুপ্ত নাট্যশাস্ত্রের টীকায় সূত্রধারের অপর একটি সহকারীরূপেই বিদূষকের স্থান এই মত প্রকাশ করেছিলেন।

শারদাতনয় বিদূষককে অভিনেতা দলের মধ্যে গণ্য করেছিলেন। তাঁহার মতে প্রথমে সূত্রধর তৎপরে নট এবং নটী এবং তৎপরে তাদের সহকারিগণ। এই সব অভিনেতাগণ বিদূষকের সঙ্গে নাট্য অভিনয় কার্যে নিযুক্ত হতো।

বিদূষককে প্রায়ই সর্বক্ষেত্রে বয়স্ক ব্যক্তিরূপে দেখানো হতো। কোন কোন চরিত্রে দেখানো হতো বৃদ্ধরূপে। রাজসভায় হাস্যকৌতুক সৃজন বিদূষকের কাজ ছিল।

কারও কারও মতে বিদূষকের নাম বসন্তকাল অথবা কোন পুষ্পের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত। যদিচ ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এরূপ বাধ্যবাধকতার নিয়মের কোন উল্লেখ নেই। বিশ্বনাথ তাঁর সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থে বিদূষকের নাম কোন ফুলের নাম অথবা বসন্তকালের সহিত জড়িত হওয়া উচিত বলে নির্দেশ করেছেন।

বিদূষকের নাম স্মরণ করলে বা নামের উল্লেখ হলে দর্শকবৃন্দের মনে কৌতুকের ভাব উদয় হতো। তার আকৃতি, মুখভঙ্গী, চলন, অদ্ভুত সংলাপ, অঙ্গভঙ্গী এবং অযোক্তিক পরিচ্ছদ হাস্যরসের অবতারণা করতো। বিশেষ করে শারীরিক বিকলতা সংস্কৃত নাট্যমঞ্চে বিদূষক চরিত্রের একটি

বৈশিষ্ট্য ছিল। ভরত নির্দেশ দিয়েছেন যে বিদূষক হবেন এক বামনাকার ব্রাহ্মণ যার দাঁতগুলি হবে বড়, মাথায় থাকবে টাক, চোখ দুটি লাল, পিঠে কুঁজ এবং কদাকার মুখ। চেহারার এই অস্বাভাবিকতা বিদূষক চরিত্রের অস্বাভাবিকতারই নির্দেশ দিতো।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে রাজা দুষ্মন্তের বিদূষক শকুন্তলা নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্র।

অনেকে বলেন, প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রাজার অনুচর ও সখা বিদূষকই বর্তমানের ভাঁড়ের অনুরূপ। প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের বিদূষক কালে ভাঁড় নাম প্রাপ্ত হয়েছে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপাল ভাঁড় কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন। গোপাল ভাঁড়ের বহু হাসির গল্প আজও সুদূর গ্রামের মানুষের মুখে শোনা যায়।

মুসলমান নবাব বাদশাহের সময়েও ভাঁড় ছিল। তাঁদের সভায় ভাঁড়েরা "নকল" (অনুকরণকারী) নামে অভিহিত হতো। এরূপ কথিত আছে যে, মোগল নৃপতি তৈমুরলঙ্গ পুত্রশোকে বিহ্বল হয়ে বারো বর্ষ কাল বিরত বিলাপ করেছিলেন। সৈয়দ হোসেন নামক তাঁর জনৈক পরিষদ আরবী ভাষায় একখানি সুললিত হাস্যোদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করে তাঁর শোকোচ্ছ্বাস নিবারিত করেন। সেই জন্য তিনি মোগলরাজ কর্তৃক "ভাঁড়" উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

ভাঁড় চেঁড় ও কাশ্মীরি এই দুই শাখায় বিভক্ত। অযোধ্যার নবাব নাসিরুদ্দীন কাশ্মীরি ভাঁড়দিগকে আনয়ন করেন। বর্তমানে হিন্দু ভাঁড়গণ কৈথেলা, (কাপিষ্ঠলী), বাজনিয়া, কামার, উজহার, বঙ্গেলা, ওজর, নোনিয়া, কড়া, পিতরহারে, বরহা, নথটিয়া ও পাহপুরী এবং মুসলমান ভাঁড়গণ বরবা, ভন্সেলা, বুড়াদিয়া, দেশী, গাওবানী, হমলপুরী হর্ষাজরেহা, অযোধ্যা, কৈথেলা, কায়স্থ, কাশীবাসী, কাশ্মীরি, কাঠিয়া, কতিলা, কর্ণবাল, খাখারিয়া, ক্ষত্রী, ক্ষেত্তি, মোখরা, মুসলমানি, নকল, নৌমসলিক, পাঠান, পাটুয়া, পুরবিয়া, রাবত, সাদিকি, সেখ, তায়াকিয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। লক্ষ্ণৌ নিবাসী মুসলমান ভাঁড়গণ শিয়া সম্প্রদায় ভুক্ত, অপর মুসলমান ভাঁড় মাত্রেই সুন্নী। চেঁড়গণ ঢোলক ও কাশ্মীরিগণ তবলা ও সারঙ্গী বাদ্য বাজিয়ে থাকে।

আহমদাবাদে ভাঁড়ের যাত্রার কথা উল্লেখ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। তিনি লিখেছেন—

"আমি যখন প্রথম আহমদাবাদে যাই তখন সেখানে একটা পার্টি দিয়াছিলাম—তাহাতে অনেক ইংরাজ ও দেশীয় লোক উপস্থিত ছিলেন। সেই পার্টিতে আমাদের যে সব সরঞ্জাম ছিল তার মধ্যে ভাবইয়া নামে ভাঁড়ের যাত্রার দল আনানো হইয়াছিল। ভাবইয়ারা উপস্থিত ঘটনা বর্ণনায় ও লোকজনের চরিত্র নকলে পরম পটু। তাহারা যে সময়কার চিত্র প্রদর্শন করিতেছিল তখন বোম্বাই "প্লেগের মেনিয়া" রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই প্লেগের কিনিবার জন্য পাগল। নিঃস্ব কাঙ্গাল—যাহার ঘরে অন্ন জোটে না সেও একরাত্রির মধ্যে সম্পদবান্ হইয়া উঠিবে—লোকের এইরূপ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা নাই। ইংরাজ মারাঠী গুজরাটী এই সংক্রামক রোগ সকলকেই ধরিয়াছে। সেই ঝোঁকে ইংরাজ ও দেশীয়দের বিলক্ষণ মেলামেশা হইত। নেটিব তখন ইংরাজের অবজ্ঞার পাত্র ছিল না। তখন তাহাদের গলাগলি ভাব দেখে কে? প্লেগের বাজারের রাজা ছিলেন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ, তাঁর তর্জনীর ইঙ্গিতে প্লেগের বাজারের উত্থান পতন হইত। ইংরাজেরা তখন তাঁহার ঘরবারে গিয়া খোসামোদ করিতে আপনাদিগকে অপমানিত বোধ করিতেন না। দেব

সাহেব পর্যন্ত কখন কখন সেলাম ভিক্ষা করিতে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইতেন। এই বিষয়টি সেই শুজরাটি ভাঁড়েরা সুন্দর নকল করিয়াছিল। সাহেব তাঁহার মেমকে লইয়া সেলাম আদায়ের জন্য বাহির হইয়াছেন দেখিয়া দর্শক মণ্ডলীর মধ্যে হাসির ফোয়ারা উঠিল। ইহার মধ্যে ওদিকে কি গোলযোগ উপস্থিত! চটাপট চপেটাঘাতের শব্দ! একজন ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার স্বজাতির ওরূপ উপহাসজনক নকল সহিতে না পারিয়া বেচারা ভাঁড়দের উপর উত্তম মধ্যম প্রহার আরম্ভ করিলেন। সেই গোলমালে মজলিস ভাঙ্গিয়া গেল। ভাঁড়ের খেলা বিয়োগান্ত নাটকে পরিণত হইল। আমরা হাসি কি কাঁদি—কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না।"

সেক্সপিয়ার লিখিত "কিং লীয়ার" গ্রন্থে আছে ব্রিটেনের রাজা লীয়ারের কথা। বহুদিন রাজত্ব করার পর তিনি বার্ধক্যে উপনীত হলেন। শাসনের দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করতে ইচ্ছা হলো। পুত্র তাঁর ছিল না। রাজার তিনটি কন্যা—গনেরিল, রিগান আর কর্ডেলিয়া। তিনি চেয়েছিলেন রাজ্য তিন মেয়েকে ভাগ করে দিয়ে নিজে পালা ক্রমে মেয়েদের গৃহে গিয়ে শেষ জীবন কাটাবেন। কিন্তু তা' হয়নি। রাজাকে সর্বস্ব দান করে বনে যেতে হয়েছিল। অন্ধকার রাত। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। মাঝে মাঝে মেঘের বুকচিরে বিদ্যুৎ ঝিলিক মারছিল। সেই অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যে রাজার সঙ্গে ছিল বিদূষক। সেই বিপদের মাঝে বিদূষক রাজাকে অনুসরণ করেছিল। বিদূষক সম্পদে, বিপদে সকল সময়েই রাজার বন্ধু হতো।

বিদূষক বা ভাঁড়ের কাহিনী বিদেশী সাহিত্যে প্রচুর আছে। যেমন. ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরী (১৪৯১—১৫৪৭ খ্রীঃ অঃ) বিদূষককে একই আহারের টেবিলে বসিয়ে আহার করতেন। তিনি মনে করতেন যে আহারের সময় হাস্য রস পরিপাকের সহায়তা করে।

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ২য় ফ্রান্সিস-এর বিদূষক ব্রুসকে Brusquet একবার ডিউকের সঙ্গে যখন ভোজসভায় আহারে রত তখন উক্ত বিদূষক ভোজ টেবিলের উপর লাফিয়ে বসে। এবং কাঁচ ও রূপার জিনিস পত্র সমেত মাটিতে পড়িয়ে পড়ে। হাসির হুল্লোড় পড়ে যায় এবং ডিউক ভাঁড়কে বলেন—যেগুলি নিয়ে পড়িয়ে পড়লে সেগুলি তোমারই থাক।

রাজা প্রথম জেমস্ (১৫৬৬—১৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে) যখন সলসবেরিতে আসেন তখন স্থানীয় এক ভাঁড় সলসবেরির গির্জার সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করে। ইংলণ্ডের সবচেয়ে উঁচু গির্জার এই চূড়া উচ্চতায় ৪০০ ফিট। রাজার সম্মানার্থে চূড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে এবং শূন্যে তিনবার ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে পড়ে।

সে মনে করেছিল রাজা অনেক অর্থ পুরস্কার দেবেন। কিন্তু বেচারা ওসব কিছুই পেলনা। রাজা তাকে লিখিত ফরমান দিলেন যে, সে এবং তার পরিবারবর্গের লোকেরা ইংলণ্ডের গির্জার চূড়ায় উঠতে পারবে।

বাকিংহামের ডিউক রাজা প্রথম চার্লস এর রাণী হেনরিয়েটা মারিয়ার (১৬০৯—১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে) এক খর্বাকার ভাঁড়ের কাহিনী সত্যি হাস্যোদ্দীপক। তাঁর ভাঁড়ের নাম ছিল জেফ্রী হাড্সন (Jeffrey Hudson)। উক্ত ভাঁড় একবার এক বিরাট আকারের টার্কি মোরগের সঙ্গে অসি নিয়ে যুদ্ধ করেছিল। এইরূপ দেশী ও বিদেশী বহু কাহিনী শোনা যায় ভাঁড়েদের।

সেকালের কবির দলে এক একজন "আল্লাদে" থাকতো। শুধু কবির দলে কেন বাইজীদের নাচের দলেও থাকতো আল্লাদে। এর কাজ হলো গানের মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে কবি অথবা বাইজীর মুখের সামনে নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করে ভাঁড়ামো করা।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ অন্তর যে ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে, সেই হলো সাহিত্যের ভাষা ; উপলব্ধিতে পরিপূর্ণ অন্তর যে কথা বলে, সেই কথা হলো সাহিত্য, দিব্য-সাহিত্য, আগামীকালের সাহিত্য। আগামীকালের সাহিত্য হলো সেই উপলব্ধির সাহিত্য। মানুষের বাইরের মনের প্রকাশ নয়, মানুষের উপলব্ধির উৎস দিব্য মনের প্রকাশ। জীবনের পরিপূর্ণতার ওপর, জীবনের সত্য উপলব্ধির ওপর, নির্ভর করে এই সাহিত্য। এ সাহিত্য গায়ের ওপর জড়ানো রঙীন ওড়না নয়, এ সাহিত্য হলো গায়ের চামড়া। এ-কে খোলা যায় না, বদলানো যায় না, খুলতে গেলে, বদলাতে গেলে, জীবনই যায় ছিঁড়ে।

—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমার প্রথম যৌবনের দিন থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আমার অন্তরতম বন্ধুদের একজন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়, কিন্তু আমাদের সৌহার্দ্য সেই ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকেনি। নিজেদের অগোচরে একদিন জীবনের ক্ষেত্রেও শৈলজানন্দকে নিয়ে আমরা তিনজন পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম সহায় ও সাথী হয়ে উঠেছি। জীবিকার প্রয়োজনে আমাদের পথ অনেক সময়ে পৃথক হয়ে গেছে কিন্তু অন্তরের সে যোগ যে ছিন্ন হয়নি বার বার তার প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে অকালে হারিয়ে আজ তার কথা লিখতে বসে তার সম্পূর্ণ পরিচয় সংক্ষেপে দেবার মত বিশেষণ খোঁজবার চেষ্টা করলাম। সেরকম বিশেষণ কিছু পেলামনা কিন্তু মনে হল অস্থির অথচ আত্মসন্ধানী, উদ্দাম অথচ অকপট মহাজীবনের সন্ধানী উদ্‌ভ্রান্ত অতৃপ্ত এক বিশীয়মান যুগের অনন্য এক প্রতিনিধি বললে তাকে কিছুটা বোঝানো যায়। জীবনের প্রতি প্রচণ্ড প্রেম নিয়েও নির্লিপ্ত চির-পথিকের মত যে সব বন্ধন অনায়াসে প্রতিমুহূর্তে ছিঁড়ে চলে যেতে পারে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের মধ্যে সেই চির-বিরাগী মানুষেরই বিশ্বয় মধুর প্রকাশ দেখেছি। অভাব অতৃপ্তি বঞ্চনা বিক্ষোভের মধ্যে এসব মানুষের জীবনের যাত্রা সুরু। জীবনে অনেক কিছু তারা চায় প্রচণ্ড ক্ষুধায় কিন্তু সৌভাগ্যের পাত্র যেদিন সত্যিই পূর্ণ হয় তখন নিরাপদের নীড়ে তারা কোনো ঐশ্বর্য্য কি স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে বাঁধা থাকে না।

এদের 'রোম্যান্টিক' বলে যদি কেউ ছোট করতে চায় ত করুক।

এ সৃষ্টির বিধাতা পুরুষ যদি কেউ থাকেন তাহলে আমি জানি তিনি তাঁর অনেক কষ্টে গড়া অনেক নিয়ম কানুনের যন্ত্র আঁটুনি দেওয়া জগৎটা সাজিয়েছেন শুধু কয়া মেয়ে খুলে বেরিয়ে যাবার মত এমনি রোম্যান্টিকের আশায়।

জীবনে কত কাজেই না নৃপেন্দ্রকৃষ্ণকে মাততে দেখেছি। সব পেশাই তার কাছে নেশা। একদিন এই গল্প-ভারতীও তার নেশার জিনিষ ছিল এইটুকু মনে করে তার প্রাণের পত্রিকাটিতে তার সম্বন্ধে দুটো কথা লিখতে পেরে পরম তৃপ্তি পাচ্ছি।

———

সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৩৫২ সালের গোড়ার দিকের কথা···একদিন সকালে হঠাৎ নৃপেন এসে উপস্থিত—এসেই বলে—শৈলজা একটা গল্প দে—আমি বললাম—হঠাৎ গল্প দিয়ে কি হবে রে ?

"আরে আমি যে গল্প-ভারতীর সম্পাদক হয়েছি—

কি ব্যাপার রে হঠাৎ তুই যে সম্পাদনার দায়িত্ব নিলি !

আরে ভাই, • সত্যেনবাবুকে তো চিনিস—তার কথা এড়াতে পারলুম না—নতুন করে কাজে নেমে পড়তে হল।

তা শোন—বিডন ষ্ট্রীট সেন্ট্রাল এভিনিউর মোড়ে গল্প-ভারতীর ঘরে নতুন করে আবার আড্ডা জমাবার চেষ্টা করছি—ঠিক সেই কলেজ স্কোয়ারের আড্ডার মত। রোজ সন্ধ্যাবেলা চলে আসবি—সোজা আমার ওখানে গল্প-ভারতীর আসরে।

অনেক কথার পর নৃপেন চলে গেল—রেখে গেল তার নতুন আসরে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ।

সে সময় ছবির কাজ নিয়ে আমি একান্ত ব্যস্ত-মাথার খালি ছবির কথাই ঘুরছে। ইচ্ছা থাকলেও সে আসরে নিয়মিত যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি—তবে গল্প-ভারতীর প্রথম সংখ্যায়ই আমার লেখা প্রকাশিত হল। সাধ্য কি আমার নৃপেনকে এড়াই। সে যে একই প্রাণের—একই মনের আহ্বান—একই তন্ত্রীতে একই সুরে বাঁধা আমাদের জীবনপথের একান্ত সঙ্গী—একান্ত আপন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ।

এই প্রসঙ্গে বেশ একটা মজার কথা মনে পড়ছে—নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও সে কথা না লিখে পারছিনা। আমার গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত প্রথম লেখার ভূমিকা প্রসঙ্গে নৃপেন লিখেছিল—"শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সুরোরাণী-দুয়োরাণী দুই স্ত্রী—সিনেমা তার সুরোরাণী এবং এই স্ত্রীটিকেই সে বর্তমানে বেশী ভালোবাসে'। নিঃশব্দে নৃপেনের সেই অভিযোগ মেনে নিয়েছিলাম—সত্যিই ছবির কাজের চাপে সেদিন পুরোপুরি যোগ দিতে পারতাম না গল্প-ভারতীর আসরে—সাহিত্যজগতের সেই চণ্ডীমণ্ডপে।

নৃপেন অবশ্য মাঝে মাঝেই এসে হাজির হত রাগ করত—বলত—"তোর সিনেমার প্রতি ভালোবাসা আমি ঘুচিয়ে দেব।"

সে সময়ে কিন্তু গল্প-ভারতী ছাড়া অন্য কোন পত্রিকায় আমি নিয়মিত লিখতাম না। গল্প-ভারতীতে লিখতেই হত, প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথম—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ বন্ধুবৎসল, উদার হৃদয়—নবযৌবনের ঋত্বিক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারতুম না।

• দ্বিতীয়—সত্যেনবাবু। গল্প-ভারতীর মুখ্য পরিচালক সত্যেন্দ্রলাল রায়ের সঙ্গে আমার অন্তরের যোগ বহুকালের—একান্ত আপনজনের মত দুজনের বহু স্মৃতি আছে মনের মণিকোঠায়।

এই দুজনের টানাপোড়েনে আমাকে নিয়মিত লিখতেই হত গল্প-ভারতীতে। তবুও মাঝে মাঝে নৃপেনের অনুযোগের সীমা ছিল না—তারপর মধ্যরাত্রে আসত সত্যেনবাবুর টেলিফোন—এ দুইই ছিল আমার সেই সময়ের গল্প-ভারতীর সঙ্গে যোগাযোগের মুখ্য সূত্র।

তবুও মাঝে মাঝে আমি বলতাম—আরে নৃপেন এ-সংখ্যায় আমার বাদ দে-না—নৃপেন বলত—তোর লেখা না হলে চলবে না। এমন করে এমন ভাবে আর কেউ বোধহয় আমায় বলেনি।

কল্লোলের বন্ধুদের প্রায় সবাইকেই নৃপেন ডাক দিয়েছিল গল্প-ভারতীর আসরে। আবার নতুন করে এক আসরে মিলেছিলাম আমরা—নৃপেন-প্রেমেন-অচিন্ত্য-শরোজ-প্রমুখ সাহিত্যসঙ্গী বন্ধুরা।

সেই সময় দেখেছিলাম নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের এক নতুন রূপ—সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। আমার "ছায়া" পত্রিকার পর এই প্রথম নৃপেন স্থায়ীভাবে কোন পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব নিলো। গল্প-ভারতীর প্রতিটি সংখ্যা সুন্দর করে, সার্থক করে সাজানোর জন্য নৃপেনের কি আকুল আন্তরিকতা, কি বিরাট উৎসাহ। নৃপেনের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল একনিষ্ঠতা। তাই গল্প-ভারতী যখন নৃপেন সম্পাদনা করত—সে দিনের গল্প-ভারতীর প্রতি সংখ্যায়—সেই নিষ্ঠা, সেই আন্তরিকতা অক্ষয় হয়ে আছে—থাকবেও চিরকাল। সম্পাদক নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চিরকাল বেঁচে থাকবেন গল্প-ভারতীর পাতায়।

গল্প-ভারতী ব্যতীত আর কোন পত্রিকার সঙ্গে এমন আন্তিক যোগ তার ছিল না।

বারবার নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছিলেন গল্প-ভারতীর সম্পাদকীয় আসনে।

আজও বারবার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে—মাঝে মাঝেই মনে হয়—আবার বোধ হয় নৃপেন আসবে—বলবে—শৈলজা লেখা দে।

সাহিত্যের ক্ষেত্র ও সম্ভাবনাকে আমরা ক্রমশঃ সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ করে তুলেছি। জাতির সমগ্র ভাব ও ভাবনার শত বিচিত্র প্রকাশই হলো সাহিত্য।" সাহিত্য হলো জাতির আত্মার বাঙ্ময় প্রকাশ···সে কথা আজ আমরা ভুলে গিয়েছি। জীবনের সর্বক্ষেত্রের, সর্ব রূপের অভিব্যক্তি হলো সাহিত্য, সাহিত্যের এই বিরাট রূপ আমরা বিস্মৃত হয়েছি বলেই সাহিত্যের কাছ থেকে আমাদের দাবী ও কমে এসেছে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

যাযাবর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ

শ্রীসরোজ কুমার রায়চৌধুরী

একদিন ছিল যখন আমরা 'কল্লোল' যুগের লেখকেরা, প্রায় প্রত্যহই একত্র হতাম। কখনও পটুয়াটোলায় 'কল্লোল' আফিসে, কখনও কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের দোতলায় আর্য পাবলিশিং কোম্পানীতে কখনও বা 'ফরওয়ার্ড' অফিসে। পরস্পরকে না দেখে একদিনও থাকা অসম্ভব ছিল। তখন নৃপেন্দ্র-কৃষ্ণের সঙ্গে রোজই দেখা হত। তারপরে কর্মচক্রের আবর্তনে সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। বহুকাল নৃপেনের সঙ্গে দেখা হয়নি। তার কথা লিখতে গেলে পুরনো কথাই মনে পড়ে।

কালের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অনেক পরিবর্তন হয়। কিন্তু নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। সে ছিল জন্ম-যাযাবর, জাত-সাহিত্যিক। মাথায় বড় বড় চুল, ঠোঁটে বঙ্কিম হাসি, বড় বড় দুইচোখে স্বপ্নের বন্যা। সে ছিল রোম্যান্টিক-ধর্মী। বাস্তব জগতের সঙ্গে কারবার ছিল কম। তার এই রোম্যান্টিক সত্তা শেষ বয়েস পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

'কল্লোলে' অফিসে বসে আছি, পরণে আধ-ময়লা শাড়ি, পায়ে ছেঁড়া পাম্পশু, নৃপেন চুপ করে এসে উপস্থিত হল।

—কি ব্যাপার, নৃপেন। হঠাৎ শাড়ি পরতে শুরু করলি?

মাথার বড় বড় চুলে একটা ঝাঁকি দিয়ে নৃপেন বললে, হ্যাঁ, বাড়িতে বউও বেনারসী পরে রান্না করছে।

—তার মানে, লটারীতে কিছু টাকা পেয়েছিস নাকি?

না, ভাই। তারমানে, আমার আর ধুতী নেই। বউ-এর একমাত্র শাড়িখানি পড়তে হল। অগত্যা, বিয়ের বেনারসীটি পরে বউ ঢুকলেন রান্নাঘরে।

ঠোঁটে বাঁকা হাসি। সুন্দর, স্নিগ্ধ।

রোমান্টিক ধর্মী এই যাযাবরের কাছে দারিদ্র্য কোনদিনই দুঃখের অথবা অগৌরবের ছিল না। দারিদ্র্য ছিল তার অলঙ্কার। দারিদ্র্যের সে গৌরব করত।

তার ঘর ছিল না। কখন কোথায় থাকতো তারও স্থিরতা ছিল না। যেমন সাংসারিক জীবনে, তেমনি সাহিত্য ক্ষেত্রেও সে ছিল নীড়হারা পাখি। ও যেন রবীন্দ্রনাথের সেই পাখিটি, যার।

'আছে শুধু পাখা, আছে মহানন্দ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির আঁকা।'

সমস্ত জীবন-ভোর ও শুধু আকাশের সীমাহীন অঙ্গনে উড়ল আর গান গাইল, যার কিছু শোনা গেল, অনেক শোনা গেল না।

আমরা জানি, একটা মস্তবড় প্রতিভা নিয়ে সে এসেছিল। তার কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল অনেক, তার অল্পই সে পূর্ণ করে গেছে।

যার জীবন ছিল একটা বেপরোয়া সুরের ফানুস, সাহিত্যও ছিল তার কাছে খেলা। অজস্র সে লিখে গেছে। তার একটা প্রকাণ্ড অংশ আজ হয়ত খুঁজেই পাওয়া যাবে না। যা পাওয়া যাবে, তারও মধ্যে তার প্রতিভার সম্যক পরিচয় বহন করতে পারে এমন লেখার সংখ্যা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

তার মৃত্যুর পরে মনে হচ্ছে, তাকে আমরা দু'দিক দিয়েই হারালাম; বন্ধু হিসাবেও, অসামান্য প্রতিভাশালী সতীর্থ হিসাবেও।

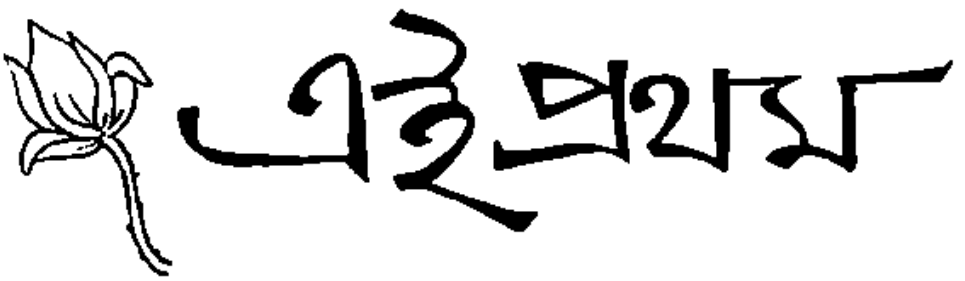

দৃষ্টি ভঙ্গী

(ছোট গল্প)

পুষ্পদল ভট্টাচার্য

ঘরে ঢুকেই কৃষ্ণা চমকে উঠল। প্রবাল মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে এক তরুণী, আধুনিক সাজ পরলে তাকে সত্য-সত্যই রূপসী বলা যেত। কিন্তু ছিন্ন মলিন বসনেও তার রূপ ঢাকা পড়েনি বরং কালো মেঘের বুক ছাপিয়ে পড়া চাঁদের আলোর শোভার মতই আরো বিকশিত হয়ে উঠেছে।

"আঃ, আড়াল করছ কেন? আলো ছেড়ে সরে দাঁড়াও।" ছবির উপর ছায়া পড়ায় অতন-তন্ময় শিল্পী বিরক্তি প্রকাশ করল। কৃষ্ণা চমকে উঠল তার রূঢ় কণ্ঠস্বর শুনে। অপমানে রাঙা হয়ে সেও কঠিন সুরে বলল, "অসময়ে এসে আপনার কাজে ব্যাঘাত দিলাম, ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমি নিজে যেচে আসিনি প্রবাল বাবু। আপনিই ডেকেছিলেন আমাকে।

এবার প্রবাল মুখ তুলে চাইল। কৃষ্ণাকে দেখে একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, "ওঃ তুমি কৃষ্ণা বউদি? আমি ভেবেছিলাম চাকরটা বুঝি কিছু জানতে এসেছে। তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বস না। না, না, এদিকে নয়। তাহলে বডেসের উপর ছায়া পড়বে। ঐ কোনের চেয়ারটায় গিয়ে বস।

"বসবার জন্যে আমি আসিনি প্রবাল বাবু। আপনি কাল বলেছিলেন 'আজ সকালে আসতে তাই এসেছিলাম। নইলে সংসার ফেলে এসময়ে আসতাম না।"

"ওঃ তাই তো, আজ তোমার নতুন ছবি আঁকবার কথা ছিল, তাই না? একটু অপ্রতিভ অথচ নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রবাল বলল, "কিন্তু আজ তো আর সময় হবে না বউদি। আমার কথাটা মনে হয়নি, নইলে চাকর দিয়ে খবর পাঠাতাম। "ছবিতে কয়েকটা তুলির টান দিয়ে সে বলে চলল, "তোমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আমি দুঃখিত বউদি। কিন্তু এদের ছবিটা আজই শেষ না হলে, পরে আর পারব না। ওরা আজই অন্য জায়গায় চলে যাবে। তোমার ছবি কাল আরম্ভ করব।"

ওরা? ওদের? আর কেউ আছে নাকি ঘরে? কৃষ্ণা উঁকি দিয়ে দেখল, হ্যাঁ, আছে। তরুণীটির ওপাশে তারই কাঁধে ভর দিয়ে একটা ভিক্ষা পাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন মাঝ বয়সী অন্ধ পুরুষ। মাড়ী গোঁফে ঢাকা কুশ্রী মুখ। বিউটি এণ্ড বিস্ট।

প্রবালের শেষ কথাটা শুনে কৃষ্ণার রাগ বেড়ে গেল। ঐ ভিখারী দুটিরও সময়ের মূল্য আছে, কিন্তু কৃষ্ণার সময়ের কোন মূল্য নেই বুঝি? এতদিন কৃষ্ণা ভাবত তাকে একান্তে পাবার জন্যেই প্রবাল তার ছবি আঁকবার ছল করে নিজের বাড়ীতে ডাকছে। প্রবালের মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দেখেছিল

পুরুষের আসঙ্গ কামনা। এ দৃষ্টি তার আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক স্বামীর চোখে ছিল না। কিন্তু অন্য পুরুষেরা এই ভঙ্গীতে তার দিকে চেয়ে দেখত। প্রবালের দৃষ্টি স্বামীর সাহচর্যে অতৃপ্ত কৃষ্ণার বুকে জাগিয়ে তুলেছিল কেমন এক অজানা অনুভূতির আলোড়ন। কিন্তু ভুল হয়েছিল, ভুল বুঝেছিল কৃষ্ণা শিল্পীর ভাবময় মুগ্ধ দৃষ্টিকে।

আহতা, অপমানিতা কৃষ্ণা ঘুরে দাঁড়াল।

"ওকি? এখনি যাবে?" ছবিতে রং দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করল প্রবাল।

"বাড়ীতে কাজ আছে।" বাইরের দিকে যেতে যেতে উত্তর দেয় কৃষ্ণা।

"কাল আসবে তো?" যেন ভদ্রতা রক্ষা করতেই প্রবাল প্রশ্ন করে।

"না, কাল সময় হবে না।"

"তবে কবে আসবে?" কৃষ্ণার কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে প্রবাল বলল,

"আচ্ছা, সে না হয় তোমাদের বাড়ী গিয়ে ঠিক করে আসব।

একবারও কোন উত্তর না দিয়ে কৃষ্ণা দ্রুতপদে বাড়ীর দিকে এগিয়ে চলে।

মাঘমাসের শেষে বাতাস ঠাণ্ডা হলেও মাথার উপর সূর্যের তেজ কম নয়। আশপাশের শুলমোহরের গাছগুলি এরই মধ্যে বসন্তের অনুরাগে রঙীন হয়ে উঠেছে। ভোরের কুয়াশার আবরণ হারিয়ে অদূরের নদীর জল আর বালুবেলা এতই দীপ্ত হয়ে উঠেছে যে সেদিকে চাওয়া যায় না। এই পরিবেশের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণা আরক্ত মুখে প্রায় ছুটে চলেছিল। মনের আলায় হাতের ছোট ছাতাটাও খুলে নেবার কথা মনে ছিল না।

কি অশুভক্ষণেই না প্রবাল এসেছিল কৃষ্ণার জীবনে। নিজের চেয়ে বয়সে অনেক বড়, আত্মভোলা, কাজ পাগল স্বামীর সংসারে কৃষ্ণা তো অসুখী ছিল না। যৌবনের অতৃপ্তি কৃষ্ণা স্বামীর সেবায় ও সংসারের শত কাজে ডুবে ভুলে থাকত। প্রবাল আসবার আগেও কৃষ্ণা জানত না যে কালো হলেও তার রূপ আছে আর সে রূপ পুরুষকে আকর্ষণ করতে পারে। মুগ্ধ করতে পারে প্রবালের মতন শিল্পীকে।

অবশ্য এর আগে কোন পুরুষের মুগ্ধ দৃষ্টি যে সে দেখেনি তা নয় কিন্তু তাতে প্রশংসার থেকে লোলুপতাই ছিল বেশী। কৃষ্ণা বুঝত ঐ মোহ তার দেহের সুস্থ সবল যৌবন শ্রীর প্রতি, তার রূপের প্রতি নয়। প্রবালই প্রথম কৃষ্ণার এই ভুল ভেঙে দিয়েছিল।

কৃষ্ণার মনে পড়ল সেদিনের কথা, যেদিন তার স্বামী প্রবালকে নিয়ে এসে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।

বৈকালিক প্রসাধন সেরে স্বামীর প্রতীক্ষায় বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণা। কলেজের ছুটী হয় তিনটায়। কিন্তু রমেনবাবুর বাড়ী ফিরতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয়। ছাত্রদের সাহায্যে তিনি যে নতুন বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্ট করছেন তাতে একবার মেতে গেলে আর সময়ের জ্ঞান থাকে না তাঁর। দিনের আলো বিদায় নেবে জোয়ান বিদ্যুৎ বাতি জ্বলে ওঠে কলেজের সারেন্স ব্লকে। অবশেষে ছাত্ররাই এক সময়ে ক্লান্ত হয়ে বলে আজ থাক স্যর। কাল আবার হবে।

হতাশ সুরে বৈজ্ঞানিক বলেন, "থাকবে? আর কিছুক্ষণ সময় দিতে পারবে না?"

ছাত্ররা তাদের অভিজ্ঞতার জ্ঞানে বাধা না দিলে সেই কিছুক্ষণ সময় সারা রাত্রিতে দাঁড়িয়ে

যেতে পারে। তারা বলে "বড় গ্লাস হয়ে গড়েছি স্যর। তা ছাড়া খিদেও পেয়েছে। সেই কোন সকালে খেয়ে বেরিয়েছি তো?"

বৈজ্ঞানিক আর বাধা দিতে পারেন না। ছাত্রদের সঙ্গে তিনিও বাড়ী ফেরেন। কিন্তু তাঁর মন পড়ে থাকে সায়েন্সরুমে।

সেদিনও বৈজ্ঞানিক নিজের এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবতে ভাবতে আনমনে বাড়ী ফিরছিলেন। সহসা এক যুবক এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল। বৈজ্ঞানিক চমকে উঠলেন—"থাক, থাক কোন ইয়ারে পড় তুমি?" তাঁরই ছাত্রদের কেউ ভেবে জিজ্ঞাসা করলেন। অনেক ছাত্র তাঁর। সকলের মুখ মনে থাকে না।

"আমাকে চিনলেন না স্যর? যুবকটি একটু হেসে বলল,"আমি প্রবাল।"

"প্রবাল? প্রবাল কে?" বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলেন প্রফেসার। ছেলেটির মুখখানা বড়ই চেনা চেনা। কিন্তু প্রবাল নাম তিনি কখনো শুনেছেন বলে মনে পড়ল না।

"স্যার। কলকাতায় আপনাদের বাড়ীর পাশেই তো থাকতাম আমরা।' যুবকটি অপ্রস্তুত হয়ে বলল।

"ও: তুমি বীরু? উৎপলের ছোট ভাই বীরু তুমি, তাই না?"

আত্মপরিচয় দানের অসুবিধা থেকে অব্যাহতি পেয়ে বাঁচে প্রবাল। বলে, "আজ্ঞে হ্যাঁ আমি বীরু।"

প্রফেসার সোৎসাহে বলেন, "চল, চল, আমার বাড়ী চল। সেখানেই সব কথা হবে।"

সামনেই প্রফেসারের বাড়ীর প্রবেশ দ্বার। সেই খুলে ভেতরে ঢুকতেই প্রবালের চোখ পড়ল প্রতীক্ষাপরায়ণা কৃষ্ণার দিকে। শ্যামলী যুবতী। লালপাড় একটি মিলের শাড়ী পরনে, কপালে লাল সিঁদুরের টিপ। হরিণের মতন বড় বড় বিস্মিত চোখ মেলে দরজার একটি পাশে হেলান দিয়ে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবালের মনে হল বিশ্বকবির কবিতার কটি লাইন যেন মূর্তি পেয়েছে। "দিনান্তের খেয়াটি ধরিয়া" পৃথিবী যেন কার প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কৃষ্ণার মৌন মাধুরী শিল্পীকে উজ্জীবিত করে তুলল। সে সশব্দেই বলল, "বা: চমৎকার।"

বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি? কি চমৎকার বীরু?"

"ঐ মহিলাটি। ওঁর দাঁড়ানর ভঙ্গী, ওঁর বেশ ভূষা। সব মিলিয়ে যেন মূর্তিমতী সন্ধ্যা।"

প্রফেসার হেসে উঠলেন। "কার কথা বলছ? কৃষ্ণার? ও তো আমার স্ত্রী।" যেন প্রফেসারের স্ত্রী বলেই কৃষ্ণার মধ্যে চমৎকৃত হবার কিছু থাকতে পারে না।

প্রবালের উচ্ছ্বাস কৃষ্ণাও শুনেছিল। সে লজ্জায় ঘরের ভেতর সরে যাচ্ছিল। প্রবাল অকুণ্ঠিত স্বরে ডাক দিল, "যাবেন না, বউদি যাবেন না। এক মিনিট আরো সময় দিন। আপনার একটা স্কেচ করেনি।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে পকেট থেকে একটা স্কেচ বুক বের করল। কিন্তু কৃষ্ণা ততক্ষণ একেবারে বাড়ীর অন্দর মহলে পৌঁচেছে। বাপরে, কি অসভ্য ছোকরা। আদব নেই শোভা নেই। রাগ করতে গিয়েও রাগ করতে পারল না কৃষ্ণা। প্রবালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা যে আন্তরিক তা সে বুঝেছিল। তাই এক অপূর্ব পুলকে ও লজ্জায় তার অন্তর থরথরিয়ে উঠছিল।

কে এই যুবকটি? কৃষ্ণার মতন সাধারণ কালো মেয়ের মুখ্যাতিতে মুখর হয়ে ওঠে অথচ নিজে সে কার্তিকের মতন সুন্দর। কৃষ্ণাদের বাপের বাড়ীর পাড়ার একটি সুন্দর ছেলে ছিল। পাড়ার মেয়েরা তাকে 'কার্তিক' বলত। কিন্তু প্রবালের মতন এমন আকর্ষণীয় সৌন্দর্য তারও ছিল না। রমেনবাবু এসে ডাকলেন, পালিয়ে এলে কেন কৃষ্ণা। ওকে দেখে লজ্জা পাবার তো কথা নয়। একেবারেই ছেলেমানুষ যে বীরু। আমার বন্ধু উৎপলের ছোট ভাই। আমার চেয়ে অনেক ছোট।"

আপন ভোলা প্রফেসার ভুলে গেলেন তাঁর স্ত্রী হলেও কৃষ্ণার বয়স বেশী নয়। বাইশ তেইশ বছরের যুবতীর কাছে ছাব্বিশ বছরের যুবক প্রবাল ছেলে মানুষ হতে পারে না।

প্রফেসারের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে কৃষ্ণা অবশেষে প্রবালের সামনে গিয়েছিল। আর সে রাত্রে এ বাড়ীতে আধারাধি সেরে প্রবাল যখন নিজের বাড়ী ফিরে গেল তখন তার আর কৃষ্ণার মধ্যে অপরিচয়ের সব অন্তরালই দূর হয়ে গেছে তাদের মধুর সখ্যতা স্থাপিত হয়ে গিয়েছে।

শিল্পী প্রবাল। পৃথিবীর সব কিছুই সে দেখে শিল্পীর দৃষ্টি দিয়ে। কৃষ্ণার কালো রূপের সৌন্দর্যও তাই ধরা দিয়েছিল তার চোখে। প্রায় প্রতিদিনই সে আসত। নানা ভঙ্গীতে কৃষ্ণার স্কেচ করত। প্রফেসারের দেখা সে প্রায়ই পেত না। নিঃসঙ্গ কৃষ্ণাও এতদিনে একজন সঙ্গী পেয়ে সহজে ছাড়তে চাইত না তাকে।

সেদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণা লক্ষ্মীপূজা করছিল। ধ্যানের শেষে চোখ খুলেই দেখে সামনেই খাতা পেন্‌সিল হাতে প্রবাল। মুগ্ধ চোখে তারই দিকে চেয়ে। সম্ভবতঃ তারই একটা স্কেচ এই মাত্র শেষ করেছে।

প্রবালের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জা পেল কৃষ্ণা। তার পূজার ব্যাঘাত হতে পারে অনুমান করে প্রবাল সামনে থেকে সরে গেল। কিন্তু কৃষ্ণা আর কিছুতেই পূজায় মন বসাতে পারল না। কোন রকমে পূজা সেরে প্রসাদের রেকাবি হাতে সে বারান্দায় এসে প্রবালের কাছে দাঁড়াল। প্রফেসার তখনো বাড়ী ফেরেননি।

আকাশ ছাপিয়ে শুক্লপক্ষের জোছনা ঝরে পড়ছে। সেই দিকে চেয়ে প্রবাল অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণা ডাকল, "ঠাকুর পো।" প্রবাল সাড়া দিল না। কৃষ্ণা তার কাঁধে নাড়া দিতেই সে তার হাতখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে মৃদু চাপ দিয়ে তেমনি আনমনাভাবেই বলল, 'এস, বস।'

প্রবালের স্পর্শে কৃষ্ণার শরীরে কেমন একটা শিহরণ জাগল। সে তখনই নিজের হাত সরিয়ে নিতে পারল না। একটুখানি নীরবতা। শেষে কৃষ্ণাই নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল "ঠাকুর পো, প্রসাদ এনেছি।"

কৃষ্ণা এবার বেশ জোরেই ডেকেছিল। সেই আহ্বানে শিল্পী তার স্বপ্নলোক থেকে আবার যেন মর্তে ফিরে এল। তাড়াতাড়ি প্রসাদের রেকাবি নিজের হাতে নিয়ে বলল, "থাক কয় বউদি, বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।"

তার কথা শুনে কৃষ্ণা কি জানি কেন দুঃখ পেল। প্রবাল আনমনাভাবে নয়, নিজের ইচ্ছাতে কৃষ্ণার প্রতি তার ভালবাসা প্রকাশ করার জন্যই তার হাত ধরেছিল একথা ভাবতে পারলেই আনন্দ পেত কৃষ্ণা।

একটু চুপচাপ বসে থেকে কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করল "আচ্ছা ঠাকুরপো, সুন্দরের মতন কুৎসিতেরও ছবি আঁকতে আপনারা ভালোবাসেন, তাই নয়?"

"কুৎসিতের? না তো?" প্রবাল অবাক হয়ে বলল, "তবে সাধারণে যার মধ্যে কোন সৌন্দর্য দেখে না শিল্পী আর কবিরা তারও মধ্যে সুন্দরকে দেখতে পান। এই ধরুন না মেয়েদের রং কালো হলে বিয়ের বাজারে মূল্য কমে যায়। কিন্তু আপনার মতন কালো মেয়ের যে অনির্বচনীয় রূপ আছে তার বর্ণনা দিতে হলে কবির ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা খুঁজে পাওয়া যাবে না।" প্রবাল মুগ্ধ কণ্ঠে বিশ্বকবির "কৃষ্ণকলি" কবিতাটির কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করল। শুনতে শুনতে অজানা পুলকে কেঁপে উঠল কৃষ্ণা। শিল্পীর প্রতি তার আকর্ষণ আরো বেড়ে গেল।

কৃষ্ণা প্রতিদিন নব নব সাজে সজ্জিত হয়ে প্রবালের সামনে আসে। মুগ্ধ প্রবাল উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে তার স্কেচের খাতা খুলে, কখনো বা ক্যানভাসে কৃষ্ণার সেই রূপ মাধুর্য ধরে রাখার চেষ্টা করে। একদিন সে বলল, "এভাবে তোমার রূপের সিকি অংশও ধরে রাখতে পারি না বউদি। তুমি আমার স্টুডিওতে চল। আমার ক্যানভাসের বুকে তুলির সাহায্যে রংয়ে রংয়ে তোমার এই অপূর্ব মাধুরী স্থায়ী করে রাখব।"

কৃষ্ণা সলজ্জ পুলকে স্টুডিওতে যেতে রাজী হয়ে বলল, "আমাকে দিয়ে যদি তোমার কোন কাজ হয় তাহলে আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু এজন্যে তোমার দাদার অনুমতি নিতে হবে যে।"

প্রবালের প্রস্তাব শুনে প্রফেসার অবাক হয়ে গেলেন। কালো মেয়ে কৃষ্ণা, যার বিয়ের পাত্র যোগাড় করতে না পেরে তার বাপ প্রফেসারের মতন প্রায় মধ্য বয়সী পাত্রের হাতে পাত্রে ধরে মেয়ে পার করেছেন, সেই মেয়ে হবে শিল্পীর মডেল? লোকে কি আর কবি ও শিল্পীদের লোকে ক্যাপা বলে। প্রবাল দ্বিতীয় বার তাঁর মত জিজ্ঞাসা করতে বললেন, "বেশ তো, তুমি যদি মনে কর তোমার বউদির মডেল হবার মতন রূপ আছে তাহলে আঁক তার ছবি। বেচারা সারাদিন একলাটি থাকে। তবু কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতে পারবে।"

এরপর প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা প্রবালের স্টুডিওতেই কাটাত কৃষ্ণা। ছবি আঁকতে আঁকতে প্রবাল যখন তার দিকে তন্ময় হয়ে তাকাত কৃষ্ণা সেই দৃষ্টিকে প্রবালের প্রেমের দৃষ্টি ভেবে পুলকে বিহ্বল হয়ে পড়ত। নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে প্রবাল তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করত, "কাল আবার আসছ তো?"

"নিশ্চয়।" পুলকিত স্বরে উত্তর দিত কৃষ্ণা।

সেদিন প্রবাল কৃষ্ণার আগমন প্রতীক্ষাতেই নিজের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সহসা এই ভিখারী দম্পতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। চমৎকার। এদের একটা ভালো ছবি আঁকতে পারলে এবারের শিল্প-প্রদর্শনীতে সে নিশ্চয় পুরস্কার পাবে। এক নিমিষে শিল্পী ভুলে গেল কৃষ্ণার কথা। অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে ভিখারী দম্পতিকে তার স্টুডিওতে নিয়ে এসে শিল্প-সৃষ্টিতে তন্ময় হয়ে গেল প্রবাল। কৃষ্ণা এল, তারপর রাস্ত করে চলেও গেল কিন্তু ভাবময় শিল্পী সে সব কিছুই লক্ষ্য করল না।

কৃষ্ণা যখন বাড়ী পৌঁছাল তখন মনের উত্তেজনায় আর রোদের তাপে তার গাল দুটি লাল হয়ে উঠেছে। তার কালো রূপে এমন একটা সৌন্দর্য ফুটেছে যা পুরুষকে নিবদ্ধ মন প্রফেসারেরও দৃষ্টি এড়াল না। তিনি মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "বাঃ সত্যি সুন্দর।"

স্বামীকে এ সময়ে বারান্দায় বসে থাকতে দেখে কৃষ্ণা চমকে উঠল। "তুমি আজ এরই

ঘরে ফিরে এলে যে? অসুখ করেনি তো?" হাতের ছাতাটা রেখে কৃষ্ণা এসে তাঁর কপালে হাত রাখল।

প্রফেসার তার হাতটা নিজের হাতে নিয়ে বললেন, "না, না, অসুখ হবে কেন? আমাদের কলেজের একজন প্রফেসার মারা গেছেন তাই সকাল সকাল ছুটি হয়ে গিয়েছে। ছেলেরাও আজ আর বিসাচের কাজে এল না বলে বাড়ী ফিরে এলাম।" তারপর একটু হেসে বললেন, "প্রবাদ মিথ্যা বলে না। সত্যি তুমি সুন্দরী, সুধর্মিনা, মনোমোহিনী—।"

প্রফেসার কথা শেষ করতে পারলেন না। কৃষ্ণা তাঁর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত দিয়ে তাঁর মুখ চেপে বলল, "না, না, অমন করে আমার অপমান কোর না।"

"অপমান?" বিস্মিত হলেন প্রফেসার।

"হাঁ অপমান।" কান্নায় ভেঙে পড়ে কৃষ্ণা বলল, "ঘরের বউয়ের রূপ নিয়ে তারেকতা করলে তার অপমান করাই হয়।"

বিস্মিত প্রফেসার তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ধীর স্বরে বললেন, "বেশ, আর বলব না। তোমার যা খারাপ লাগে তা কি কখনো করতে পারি আমি?"

ভাস্করশিল্পী বিরক্ত হয়ে তরুণ শিল্পকে ভৎর্সনা করলেন: আচ্ছা, যীশুর গুহায় তুমি নির্জনে চুপ করে বসে বসে কি ভাব বলত?

শিল্প গুরুর কথার শুধু বলে এক নারীর চিন্তায়।

ক্রুদ্ধ হয়ে গুরু বলেন: তুমি দেখছি অধঃপাতে গেছ। তোমার মত শিল্প আমার পক্ষে কলঙ্ক স্বরূপ। তুমি দূর হও।

শিল্প কোন কথা না বলে উঠে চলে যায়। তারপর তাকে আর দেখা যায় না।

দীর্ঘকাল ধরে গুরু সন্ধান করেন,—ছেলেটা গেল কোথায়?

একদিন তিনি খবর পেলেন এক গুহায় সেই শিল্প এক নারীকে নিয়ে দিবারাত্র মেতে আছে।

গুহায় ছুটে গিয়ে গুরু দেখেন সত্যই এক অপরূপ নারী। কিন্তু রক্ত মাংসের নয়, পাথরের। গুরু অবাক হয়ে যান, শিল্প ততক্ষণে গুহা ছেড়ে চলে গেছে।

সেই নারী মূর্তি আজ বিশ্ববিখ্যাত ভেনাস ডি মিলো।

Literature has now become a game in which the booksellers are the kings; the critics, the knaves; the public, the pack; and the poor author, the mere table or thing played upon. —Colton.

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

অ্যালবার্ট সোয়াইটজার

সুকুমার ঘোষ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে মানব সভ্যতা বর্তমান শতাব্দীতে যে তীব্র এবং সর্বগ্রাসী সংকটের মুখোমুখী এসে দাঁড়িয়েছে তার মূলে রয়েছে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা, জাতির প্রতি জাতির পুঞ্জিভূত বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস। জগৎজোড়া এই শ্বাসরোধী আবহাওয়ার মধ্যে ব্যতিক্রমের মতো অ্যালবার্ট সোয়াইটজার। বিংশ শতাব্দীর খ্রীষ্টীয় জগতে যদি যীশু কোথাও থাকেন তাহলে তাঁকে পাওয়া যাবে ছায়াবৃতা আফ্রিকার হৃদয়-কন্দরে, অরণ্যানীর গভীরে, সোয়াইটজারের মানব-কল্যাণ-কর্মকেন্দ্রে।

সোয়াইটজার জন্ম গ্রহণ করেন ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে অ্যালসেসের একটি ছোট গ্রামে। ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক দিক থেকে জার্মানী এবং ফ্রান্সের মধ্যে অবস্থিত এই প্রদেশটির সংস্কৃতিতে বহু বৈচিত্র্যের সমন্বয় ঘটেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে অ্যালসেস ছিল জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অ্যালসেস ফ্রান্সের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজনৈতিক হাতবদলের টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে জার্মান এবং ফরাসী সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে অ্যালসেসিয়ানদের জীবনে। অ্যাল-সেসিয়ান ভাষা জার্মান এবং ফরাসী ভাষার সমন্বয় থেকে উদ্ভূত। আর যে কোন জাতির পতাকাই উড়ুক না কেনো অ্যালসেসের আকাশে, প্রত্যেক অ্যালসেসিয়ানের স্বদেশের প্রতি মমতা অসীম। জীবনকে ভালোবাসা, আনন্দোজ্জ্বল এবং কর্মঠ জীবন তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট।

যে মহাজীবনের স্বপ্ন নিয়ে সোয়াইটজার আফ্রিকার সুদূরের নিভৃতে, দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবায় তাঁর মহৎ জীবনের দীর্ঘকালব্যাপী জীবন সাধনার শুরু করেছিলেন তার মূল ছিল তাঁর অন্তরে। তাঁর জীবন জিজ্ঞাসার শুরু হয়েছিল একুশ বছর বয়সে, জুন মাসের এক প্রভাতে। মেধাবী ছাত্র বলে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। সুন্দর স্বাস্থ্য এবং সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সোয়াইটজার তাঁর প্রিয় গ্রামের পথটি দিয়ে যেতে যেতে ভাবছেন যেখানে অধিকাংশ লোক দুঃখ এবং দুর্দশাগ্রস্ত সেখানে কি করে আত্মসর্বস্ব জীবন যাপন করা যায়। জগতের আর্ত আর পীড়িতদের সেবা হবে তাঁর জীবনব্যাপী কর্মপ্রচেষ্টা—এই পরিকল্পনার শুরুও এখানে। ঠিক করলেন তাঁর তিরিশ বছর পূর্ণ হলে শুরু করবেন ভবিষ্যৎ কর্মজীবন।

একুশ থেকে তিরিশ এই নয় বছরের মধ্যে তিনি থিওলজি এবং ফিলজফিতে ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সিব্যাসটিয়ান ব্যাচ-এর জীবনী প্রকাশিত হয়। খ্যাতনামা এই ইউরোপীয়ান সংগীতজ্ঞের উপর লিখিত একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে সোয়াইটজার লিখিত ব্যাচের জীবনী স্বীকৃতি পায়। শুধুমাত্র স্বীকৃতি বললে ভুল হবে, সোয়াইটজার আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করলেন এই গ্রন্থটির জন্য।

'আকস্মিকতা' সোয়াইটজারের জীবনে অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। একুশ বছর বয়সেই তিনি ঠিক করেছিলেন নিজের জীবন তিনি মানব কল্যাণে ব্যয় করবেন। একুশ থেকে তিরিশ—নয় বছরের প্রস্তুতিপর্ব কাটলো। তখনো ঠিক করতে পারেন নি কোথায় হবে তাঁর কর্মকেন্দ্র। কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা ইজমের ছায়া তিনি মাড়ান নি। এই সময় একদিন তিনি প্যারিস মিশনারী সোসাইটির মুখপত্রে—'কঙ্গো মিশনের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়েছিলেন। তখন পার্শ্ববর্তী চার্চে গম্ভীর মন্দ্রে ঘণ্টাধ্বনি বাজছিল। আর বনস্পতির পাহারায় থাকা উদভ্রান্ত আফ্রিকার ডাক পৌঁছল সোয়াইট আত্মার মর্মে। সাম্প্রতিককালের সবথেকে উপেক্ষিত আর দুর্দশাগ্রস্ত মহাদেশ আফ্রিকা লাভ করল তার পরম সুহৃদ অ্যালবার্ট সোয়াইটজারকে। সোয়াইটজারের কর্মক্ষেত্র ঠিক হয়ে গেল। তখন আর এক নতুন সমস্যার সূত্রপাত আফ্রিকায় সমাজসেবা করতে গেলে আগে রসায়ণ এবং শারীরবিদ্যা অধ্যয়ন করা প্রয়োজন। গ্রীষ্মমণ্ডলের রোগ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না থাকলে ব্যাহত হবে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা। আফ্রিকায় যাওয়া তাই কিছুদিনের জন্য পেছিয়ে গেল। তিরিশ বছর বয়সে যিনি ফিলজফি এবং থিওলজি দুটি বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়েছেন তিনি চললেন অবশেষে ডাক্তারি শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে।

সোয়াইটজারের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে তাকে কম অসুবিধায় পড়তে হয়নি। কেন যে এই মেধাবী ছাত্রটি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে রসাতলে পাঠিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে সেবা করে বেড়াবার উদ্ভট কল্পনায় মেতেছে কেউ পেলেন না তার আত্মীয় পরিজনরা। বহুত পরিবারের সবাই তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। একমাত্র হেলেন ছাড়া। হেলেনের সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের। খ্যাতনামা পণ্ডিতের কন্যা হেলেন দর্শনের ছাত্রী। কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো পথে পথে হেলেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন তাঁর জীবনাদর্শ নিয়ে। সোয়াইটজার তার দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থন পেয়েছেন হেলেনের কাছে। সৎ খ্রীষ্টানদের জীবনে খ্রীষ্টীয় ধর্মবোধের সক্রিয় প্রভাবের অভাব দেখে তিনি দুঃখিত হয়েছেন।

১৯০৫ থেকে ১৯১১—এই কয় বছর সোয়াইটজার ভীষণ পরিশ্রম করেছেন। ডাক্তারী পড়া এবং তার খরচ জোগানোর জন্য সঙ্গীত শিক্ষাদান এবং লেখা ছাড়াও তার প্রিয় পরিকল্পনা 'যীশুর জীবনী' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করবার জন্য প্রচুর খেটেছেন। ডাক্তারী পরীক্ষার ফী জোগাড় করেছেন সঙ্গীতের আসরে অর্গ্যান বাজিয়ে। যুদ্ধ বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। পরবর্তীকালে অ্যালবার্ট বলেছেন ডাক্তারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার কালটিই তাঁর জীবনের সর্বাধিক পরিশ্রমের কাল। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ করবার পর তিনি যখন হাসপাতালের হাউস সার্জন হিসেবে শিক্ষানবীশের অত্যাবশ্যক বাকি অংশটা কাটাচ্ছেন সেইসময় বিবাহ করলেন হেলেনকে। ইতিমধ্যে হেলেনও নার্সিং শিখেছেন অ্যালবার্টের পরামর্শে।

সোয়াইটজার তাঁর একক ধর্মপ্রচেষ্টায় 'প্যারিস মিশনারী সোসাইটির' সাহায্য লাভ করে ছিলেন। ফ্রেঞ্চ একোআ্যাট্যোরিয়াল আফ্রিকায় কয়েক একর জমি এদের কাছ থেকে পেলেন হাসপাতাল নির্মাণ করবার জন্য। বাহোক বন্ধুবান্ধব গুণগ্রাহীদের কিছু সাহায্য এবং প্রকাশিত গ্রন্থের দক্ষিণার দ্বারা তিনি অবশ্য প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্তর এবং সার্জিকাল যন্ত্রপাতি কেনবার ব্যবস্থা করলেন। এবার তিনি যাত্রা করলেন তাঁর মহাজীবনের পথে—আফ্রিকার দিকে।

সোয়াইটজারের মহত্ব জানতে হলে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে দেখতে হবে তার পশ্চাদপট। জীবনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সংগীত, ফিলজফি এবং থিওলজি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ছিল বিস্ময়কর। পরিবার বন্ধুবান্ধব এবং সমকালের বহু বিদগ্ধ জনের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল। স্বদেশ ও সভ্যতার সঙ্গে নিবিড় মমতায় তিনি আবদ্ধ ছিলেন। অর্থাৎ এক কথায় সকল জীবন-যাত্রার মসৃণ পথটিকে ছেড়ে এমন একটি জায়গায় সোয়াইটজার চললেন যেখানকার সম্পর্কে শুধু শুনেছেন তার অধিবাসীদের দুঃখ, অজ্ঞতা আর তার জঙ্গলের ভীষণ ভয়াবহতা। চারপাশের পৃথিবীর সবাই যখন তাঁর মূর্খতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ তখন অ্যালবার্ট শুধু শুনেছেন তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলের নির্দেশ।

ফরাসী দেশের বর্দো থেকে সোয়াইটজাররা যাত্রা করলেন আধ্যাত্মের পরিচিত ইউরোপ ছেড়ে অজানা আফ্রিকার উদ্দেশ্যে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। সম্বল বলতে ৭০টি বাক্সে ভর্তি ওষুধ এবং সার্জিকাল যন্ত্রপাতি আর দুর্দমনীয় আত্মবিশ্বাস আর মানুষের প্রতি অসীম মমতাই ছিল তাদের পাথেয়। আফ্রিকায় তখন সব থেকে প্রয়োজন ডাক্তারের। প্রতিদিন অজস্র লোকের মৃত্যু হচ্ছে। সময়মতো চিকিৎসা, সামান্য মনোযোগ এঁদের দীর্ঘজীবন এনে দিতে পারে। যুগ-যুগান্তের কুসংস্কার আর অত্যাচারী দেশীয় হাকুড়েদের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। ফরাসী অধিকৃত ল্যামবার্দের অবস্থিতি ঔগুয়া নদীর অংবোহিকায়। বিস্তীর্ণ জলপথ দিয়ে দূরাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করার সুবিধা রয়েছে। সোয়াইটজাররা যখন এখানে পৌঁছলেন তখন সেখানে একটি ভাঙা চালাঘর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সেখানকার মিশনারীরা তাঁকে অভ্যর্থনা করল। জানালো কাঠ কাটার মজুরও বলে কোন লোক এখন পাওয়া যাবে না। অথচ একজন ডাক্তার এসেছেন শুনে ইতিমধ্যেই রোগীদের ভিড় জমেছে। সোয়াইটজাররা নিজেরাই মোটামুটি একটা ব্যবস্থা করে নিলেন। বিভিন্ন উপজাতীয়দের নানা ভাষা সমস্যার সমাধান হল জোসেফকে পেয়ে। আফ্রিকার উপজাতীয়দের মধ্যে আবার রেষারেষি এতো প্রবল যে হাসপাতালেও তাদের একঘরে রাখা বিপজ্জনক। নানা অসুবিধা এবং বাধা কাটিয়ে উঠে সোয়াইটজার তাঁর কাজ শুরু করলেন। তখন হাসপাতালের মাত্র দুটি ঘর। সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগছে যারা তাদের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের নিচে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আফ্রিকার উন্মুক্ত আকাশ বলতে কি বোঝায় এ ভূক্তভুগীরা জানেন। সাংঘাতিক উত্তাপের মধ্যে আচ্ছাদন বিহীন অবস্থায় কী অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে সোয়াইটজারকে তা কল্পনাতীত। সভ্যতা থেকে হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে সোয়াইটজারকে যে কত বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তা অল্প পরিসরে ব্যক্ত করা যায় না। রোগীদের হয়তো ছয় ঘোঁটা ওষুধ খেতে দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী তিন ঘোঁটা সকালে এবং তিন ঘোঁটা বিকালে খেতে হবে। দেখা গেল কার্যকালে রোগীটি একবারেই সবটা খেয়ে ফেলেছে। 'পয়েন্ড' মালিশ করতে বলা হয়েছে তা খেয়ে ফেলেছে। যে পাউডার দেওয়া হয়েছে খাবার জন্য তা

হয়তো কতস্থানে লাগিয়েছে। তাতে বিশ্রাট বেড়েই চলেছে। দিনরাত সমানভাবে পরিশ্রম করে চলেছেন সোয়াইটজার শত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও। মাঝে মাঝে নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়েছেন। আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন অসীম মনোবল নিয়ে।

ওষুধ নেই, রসদ নেই এমন অবস্থায় এই নিষ্ঠুর প্রকৃতির মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অলৌকিক মনোবলের পক্ষে সম্ভব। রোগীদের সাবধান করে দেওয়া হল যেন তারা সঙ্গে করে অন্তত একদিনের খাবার নিয়ে আসে। না আনলে তাদের ভর্তি করা হবে না। এদিকে ডাক্তার সাহেবের দয়ালুতার কথা তাদের জানা হয়ে গেছে। তাই এ নির্দেশের প্রতি তারা কর্ণপাত করে না। একমাত্র 'বেডের' অভাবের জন্য কোনো অসুবিধা হাসপাতালের হয় নি। অনেক সময় দেখা গেছে রোগীর আত্মীয় বিছানায় শুয়ে আছে আর খোদ রোগী মাটিতে আরামে শুয়ে রয়েছে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রেও এদের অদ্ভুত সরলতার পরিচয় পাওয়া যায়। একজন অপারেশনের পর ২০টি ফ্রাঁ জমিয়ে ডাক্তারকে দিতে এসেছে—তার ভাষায়, অস্ত্রোপচারের পর যে মূল্যবান সুতো দিয়ে ডাক্তার সাহেব পাকস্থলী সেলাই করেছেন তার দাম হিসেবে।

সোয়াইটজার ছিলেন জার্মান নাগরিক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার পর ফরাসী অধিকৃত এলাকায় তিনি শত্রুপক্ষের নাগরিক হিসেবে যুদ্ধবন্দী হলেন। তাঁকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হল। সভ্যতার 'মর্মর' বইটি সোয়াইটজার এই সময় লিখতে শুরু করেন। অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে এই সময়টা কাটলো। প্যারিসে অবস্থিত গুণগ্রাহীদের প্রচেষ্টায় বন্দীদশা থেকে সোয়াইটজার মুক্তিলাভ করলেন। পরম দুঃখে তিনি লক্ষ্য করলেন একজন লোকের জীবন রক্ষা করতে যেখানে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়, ঠিক সেই সময় মানুষেরই নির্বুদ্ধিতায় হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাচ্ছে। তবুও যতদিন বাঁচবেন আশা রাখতে হবে। মানুষের শুভবুদ্ধি একদিন জাগ্রত হবে। তিনি শুধু ডাক্তার নন। তিনি দার্শনিক। জীবনশিল্পী। মানবাত্মার অসুস্থতা নির্ণয় এবং তার প্রতিকারের পথ তাকে খুঁজে বের করতে হবে। বিশ্বাস এবং ভালোবাসা তাঁর জীবন দর্শনের মূল সুর।

যুদ্ধের প্রচণ্ডতা বেড়েই চলেছে। সরকারী নির্দেশে এবার সোয়াইটজারকে ন্যামবার্গে তার হাসপাতাল থেকে যুদ্ধবন্দীরূপে ফ্রান্সের বর্দো-র এক ক্যাম্পে স্থানান্তরিত করা হল। এখানে আমাশয় অসুখে ভুগে তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়ে। কিছুদিন পর বন্দী বিনিময় রীতিতে তাঁরা মুক্তিলাভ করে আলসেস-এ চলে আসেন।

সুইডেনের আর্চবিশপের আমন্ত্রণে তিনি অ্যালসেস থেকে সুইডেনে এলেন। আর্চবিশপের অনুরোধে তিনি আফ্রিকায় থাকাকালীন তাঁর অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে লিখলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'On the Edge of the Primeval Forest। বিভিন্ন ভাষায় এ গ্রন্থটির অনুবাদ হয়েছে। আফ্রিকার কথা তিনি ভোলেননি। আফ্রিকায় গিয়ে আবার তাঁর অসমাপ্ত কাজ শুরু করবার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন।

অবশেষে যুদ্ধ বন্ধ হল। ন্যামবার্গে থেকে একের পর এক চিঠি আসতে শুরু করেছে। নিজের তাগিদও রয়েছে। এদিকে সোয়াইটজারের প্রথম কন্যাটি তখন নেহাৎ ছোট। স্ত্রীর শরীর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম এবং দুশ্চিন্তায় ভেঙে পড়েছে। তিনি এদের ইউরোপে রেখে এবার একাই চললেন। সঙ্গে রইল ইংল্যাণ্ড থেকে আগত একজন মেডিক্যাল ছাত্র।

সোয়াইটজার দ্বিতীয় বার ল্যামবার্থে যান ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে, এই কয় বছরের মধ্যে হাসপাতালটিকে আবার নতুন করে গড়ে তুললেন। সোয়াইটজারের রূপকথা এখন ইউরোপে সাড়া জাগিয়েছে। সহযোগিতা ব্যাপক হয়েছে। দ্বিতীয় বার যখন ইউরোপে ফিরলেন তখন তাঁর পিতা গত হয়েছেন। এদিকে অর্থের জন্য তিনি ইউরোপের শহরে শহরে ঘুরে আফ্রিকায় তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা, সেখানকার দুর্গতদের অবস্থা এবং তাদের সাহায্যের প্রয়োজনের কথা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং চার্চে বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার করলেন।

১৯৩২ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত তিনি লেখা, সংগীত, বক্তৃতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে আফ্রিকার কথা বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরলেন। ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত অবধি পরিভ্রমণ করলেন। 'সভ্যতার ইতিহাস' প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশিত হল। ল্যামবার্থের হাসপাতাল তাঁর সুষ্ঠু ব্যবস্থায় চলতে লাগল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন দেখে তিনি আবার তাড়াতাড়ি আফ্রিকায় চললেন। এবারে একাধিক্রমে নয় বছর তিনি আফ্রিকায় ছিলেন।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে সোয়াইটজার আমেরিকায় এলেন। তাঁর খ্যাতি তখন বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। জার্মানীর গ্যয়টে পুরস্কার তিনি আগেই পেয়েছিলেন। ফরাসী আকাদমীর সভ্য হন ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার পান ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির তাঁর স্বভাবসুলভ অভিব্যক্তিতে চাঞ্চল্য ধরা পড়ে নি। তবে তাঁর আনন্দ প্রকাশ হত বিচিত্র পথে। যেমন তার প্রিয় কুকুর সু সু-কে একদিন বেড়াবার সময় বলছেন—সু সু আমরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছি শান্তির জন্য। তুমি এখন শিকার করা বন্ধ কর। কেননা তুমিও এখন নোবেল কুকুর। তুমি হিংস্র হলে ওঁরা প্রাইজের টাকা দেবেন না। জানো তো যে আমাদের হাসপাতালের কুষ্ঠ রোগীদের জন্য এই টাকার কত প্রয়োজন।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে বৃটেনের সর্বোচ্চ সম্মান 'Order of merit' পান। দুনিয়ার এমন কোন বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নেই, যেখান থেকে তিনি সম্মানে ভূষিত করেন নি। সাফল্য এবং সম্মান তাকে কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। খৃষ্টের বাণী 'Reverence for Life' (জীবনের প্রতি মমতা) তিনি নিজের জীবনে, উপলব্ধিতে, কর্মে সফল করে তুলেছেন। আর তাই তিনি বর্তমান যুগের মানবতার ত্রাণকর্তা রূপে জগৎজোড়া স্বীকৃতি পেয়েছেন।

নতুন ভারত

পরিকল্পনার মাধ্যমে দশ বৎসরে ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে। আমাদের কৃষি উৎপাদন শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিল্পউৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। আমাদের জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনপ্রতি আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২০ ভাগের কাছাকাছি। আগে যেখানে ২ কোটি ৩০ লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলে যেত এখন সেখানে যাচ্ছে ৪ কোটি ৩০ লক্ষ। পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ করে রেলওয়ে যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে, জনস্বাস্থ্যের উন্নত ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং শ্রমিক কল্যাণের অনেক কাজ করা হয়েছে। নমুনা, মডেল এবং ছবির সাহায্যে এগুলি বোঝানো হয়েছে।

অবশ্য পৃথিবীর অন্যান্য বড় বড় দেশের যেমন নাকি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের তুলনা করা প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল এটা বোঝান যে ভারতে গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভেতর উন্নয়নের পরিকল্পনা আজ চালু হয়েছে। এর ভিত্তি দৃঢ়।

খাদ্যশস্য এবং ভারী শিল্পের অংশে দেখান হয়েছে কিভাবে অন্যদেশের সহযোগিতায় ভারতে কারিগরি ও শিল্পগত উন্নতি সম্ভব হয়েছে।

এগুলি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পরিচায়ক তো বটেই, তাছাড়াও এগুলি থেকে বোঝা যায় বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলি কিভাবে ভারতকে সাহায্য করেছে।

লাইপৎসিকের বইয়ের মেলায় জাতিসঙ্ঘ

এ-বছরের লাইপৎসিক শরৎ মেলায় পৃথিবীর পনেরোটি দেশের প্রকাশ ভবন ও পুস্তক ব্যবসায়ী সংস্থা অংশগ্রহণ করবে। গণতান্ত্রিক জার্মানির বইয়ের মেলায় এই প্রথম বার জাতিসঙ্ঘের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যাবে।

১৯৬৩ সালের লাইপৎসিক বইয়ের মেলায় একটি বিশেষ দপ্তরীর বিভাগ হবে বিশ্বের গ্রন্থসজ্জির প্রদর্শনী। এই বিশেষ প্রদর্শনীটি এ বছরেই প্রথম সংগঠিত হয়েছে। অঙ্গসৌষ্ঠব ও মুদ্রণ পরিপাট্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থাও হয়েছে।

এ-বছরে বইয়ের মেলা বসবে নবনির্মিত পাঁচতলা ভবনে। মেলার জন্যে মোট আয়তন পাওয়া যাবে ৮০০০ বর্গমিটার এবং পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় মুদ্রিত ৪০,০০০ গ্রন্থ মেলায় প্রদর্শিত হবে। গ্রন্থগুলিকে সাজিয়ে রাখা হবে আধুনিক ধরণের স্ট্যাণ্ডে। স্ট্যাণ্ডগুলোকে নড়ানো চলবে যাতে প্রত্যেকটি পুস্তক ও পত্রপত্রিকা পাওয়া যাবে দর্শকের নাগালের মধ্যে।

এই নতুন ভবনের একতলায় থাকবে ১৬০টি আসন বিশিষ্ট 'কিয়েস্ক' রেস্তোরাঁ। আর থাকবে একটি বইয়ের দোকান। প্রত্যেকটি তলায় পৃথক পৃথক সম্মেলন কক্ষও অবশ্যই থাকবে।

ধারায় তা সংমিশ্রিত হল না। ব্রিটেনে এলিজাবেথীয় যুগে ব্রেন ও আন্ডার ভাস্করদের স্থাপত্যকর্মে রেনেসাঁ শিল্পের নাম আরোপ করা হল বটে, কিন্তু তা-ও বহুলাংশে আরোপিতই। সুতরাং রেনেসাঁ কালেও ব্রিটেনে কোনও সার্থক ভাস্কর বা ভাস্কর্যের সাক্ষাৎ আমরা পাই নি।

অর্থাৎ বিগত ৪০০ বছরের ইউরোপের অন্যান্য দেশে ভাস্কর্য শিল্পক্ষেত্রে যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছে, ইংল্যাণ্ডে তা করতে সক্ষম হয় নি। ইংল্যাণ্ডের প্রাচীন শিল্প ভাস্কর্যের প্রধান প্রেরণার উৎস ছিল ধর্মীয় চেতনা। সেই সময়ের ভাস্করেরা যে শরীর সংস্থানের নিখুঁত মাপে সন্ত, নাইট, রাজা রাণীর প্রতিকৃতি গড়তেন, তা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী পরের ধার করা আরোপিত শিল্পশৈলীর তুলনায় অনেক বেশী মহিমান্বিত ও গৌরবাপূর্ণ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে শিল্পধর্মী চেতনার প্রভাব ও প্রত্যক্ষতার অপহ্নব ঘটতে থাকে। তার স্থান জুড়ে বসে বিদেশের বিভিন্ন প্রাণহীন দুর্বল শিল্প শৈলীর প্রভাব।

বংশীবাদক রাখাল
এক, ডবলিউ, গোয়েরয়

ইতালী থেকে আসা 'বারোক' শিল্পরীতি ব্রিটিশ ভাস্কর্য শিল্পের এই অবোগতিতে বহুলাংশে সহায়ক হয়েছে। পুরানো রীতির সারল্য ও সংযমের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার অতিমাত্রায় স্বভাববাদী শিল্পায়ন এই সময়ের ভাস্কর্য শিল্পকে আড়ষ্ট করে তোলে। মিকেলাঞ্জেলোর বলিষ্ঠতাকে বাদ দিয়ে শুধু তাঁর শিল্পরীতিকে বাহ্যিকভাবে অনুকরণ করার ফলেই ইওরোপের এবং বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডের ভাস্কর্যের প্রাণধারাটি ক্রত শীর্ণ হয়ে আসে। ইংল্যাণ্ডের ভাস্কর্যের অবক্ষয় এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, ১৮ শতাব্দীতে ব্রিটেনের ভাস্কর্যের একটা বিরাট অংশ ফ্লেমিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পীদের এনে করা হত। ভাস্কর্য ইংল্যাণ্ডে প্রায় এক "বিদেশী" শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে।

ইংল্যাণ্ডে প্রকৃত রেনেসাঁসের বীজ বপন করেন একজন ফরাসী শিল্পী ভাস্কর জুলে দালু (Jules Dalou)। তাঁর ভাস্কর্যে অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধারার মহিমা ও সারল্য একটা নতুন বৈশিষ্ট্যই যে এনে দিয়েছিল তাই নয়, ইংল্যাণ্ডে ভাস্কর্যকে এক সুস্থিত ভিত্তির উপরে স্থাপন করতেও তাঁর কৃতি সহায়ক হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের গণতান্ত্রিক চেতনা ধীরে ধীরে ইউরোপের অন্যত্রের মতো ইংল্যাণ্ডেও গিয়ে আঘাত হেনেছে। শিল্প ক্ষেত্রে জুলে দালু ছিলেন তারই সংবাহক। তাঁরই মধ্য দিয়ে প্রকৃত রেনেসাঁ-র মুক্তিস্নাত ঘটল ইংল্যাণ্ডে—বহু পরবর্তী কালে।

কিন্তু দালু-র সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ব্রিটিশ ভাস্কর্যেরও নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন অ্যালফ্রেড ষ্টিভেন্স। দালুর সমসাময়িক এই ব্রিটিশ ভাস্কর সমকালের নির্জীব ছক বাঁধা শিল্পরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভাস্কর্যে স্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতির শুভ কাজ করেছিলেন অবশ্য তাঁর কৃতি তৎকালে সামান্যই স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সেই সঙ্গে দালু-র পরবর্তীকালীন ভাস্কর অ্যালফ্রেড গিলবার্টকেও স্মরণ করতে হয়। তাঁর কাব্যধর্মী কাল্পনিকতার আতিশয্য মাঝে মাঝে হয়তো ভাস্কর্যের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, তবু শিল্পের পুনর্জাগৃতিতে তাঁর প্রভাব যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু ইংল্যাণ্ডে ভাস্কর্যে পুনর্জাগৃতি ঘটেছে অতি ধীর গতিতে, বিলম্বিত লয়ে। এবং ১৯০১ সালে রয়াল অ্যাকাডেমীতে ভাস্কর্য অধ্যাপনার পুনঃস্থাপনের আগে পর্যন্ত ব্রিটেনে ভাস্কর্যের প্রকৃত পুনর্জাগৃতি ঘটে নি।

এই সময়েই জাকব এপস্টিনের ইংল্যাণ্ডে আবির্ভাব ব্রিটিশ ভাস্কর্যে যুগান্তরের সূচনা করে। তার জ্যাকব এপস্টিন (১৮৮০-১৯৫৯) জন্মগ্রহণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইর্কে শহরে। ১৯০২ সালে তিনি প্যারিসে আসেন এবং সেখানেই আধুনিক শিল্পধারার বহু বিচিত্র পরীক্ষা নিরীক্ষার সন্ধিকালে তিনি আপন শিল্প অভিব্যক্তির শৈলীকে খুঁজে পান। ১৯০৫ সালে তিনি ইংল্যাণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। এপস্টিন শুধু আধুনিক ইংল্যাণ্ডেরই নন, আধুনিক ইউরোপীয় ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও এক নবযুগ স্রষ্টা। ইংল্যাণ্ডে যখন তিনি এসেছিলেন, তখনো সেখানে বাঁধা গতের প্রাণহীন ভাস্কর্যের ক্লাসিকর পুনরাবৃত্তি চলছিল। সুতরাং তাঁর প্রবল বলিষ্ঠ অভিব্যক্তিবাদী কৃতির ইংল্যাণ্ডে স্বীকৃতি লাভ সহজ ছিল না। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ভবনের জন্য ১৮টি মূর্তি (স্ট্যাচু) নির্মাণের দায়িত্ব তাঁর উপরে ন্যস্ত হয়। সমকালের ব্রিটিশ ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে এই ভাস্কর্যগুলিকে মণ্ডিত করতে দ্বিধা করেন নি বটে, কিন্তু তার জন্য তাঁকে তৎকালের শিল্প সমালোচক ও শিল্পীদের কঠোর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর কৃতির ব্যাপারে প্রধানত শিল্পপ্রেমিকদের বিরূপ কলরব এর পরেও অব্যাহত থেকেছে হাইড পার্কে। তাঁর ভাস্কর্য "রিম" (১৯২৫), কিংবা লণ্ডন ট্রান্সপোর্ট বিল্ডিং এ খোদাই করা ভাস্কর্য (১৯২৮-২৯) প্রভৃতি যে কোনও নতুন স্বকল্পিত কৃতিকে কেন্দ্র করে যথেষ্ট সোরগোল উঠেছে। তাঁর ব্রোঞ্জে নির্মিত প্রতিকৃতিগুলি অবশ্য অপেক্ষাকৃত সহজ ভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

চাষী
সার ডবলিউ, হেমো থরন ক্রফ্‌ট

এপস্টিনের সঙ্গে রোদ্যাঁর সাদৃশ্য পেয়োক্ত কৃতিতে লক্ষণীয় হলেও, রোদ্যাঁ যদি হন সন্ধিকালের শিল্পী, এপস্টিন হলেন সমকালে স্বয়ম্পূর্ণ ভাস্কর। রোদ্যাঁ, মিকেলাঞ্জেলো, এমনকি গ্রীক ভাস্কর্য থেকে, মানবজীবনের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি থেকে তাঁর শিল্পকর্মের প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এপস্টিন প্রাচীন ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে সমকালের চেতনাকে রূপায়িত করেছেন তার পূর্ণ রূপে—এক আশ্চর্য নতুন ভাস্কর্য-শৈলীতে।

এপস্টিন মূলতঃ হলেন অভিব্যক্তিবাদী ভাস্কর। শরীর সংস্থানের বাঁধা মাপকে অতিক্রম করে, কিছুটা বিকৃত করে জীবনের সত্যরূপকে তিনি মূর্ত করেছেন তাঁর একাধিক প্রতিমূর্তি ও প্রতিকৃতিতে। তাঁর শিল্পধারায় প্রাচীনতম বিশ্বরীয় রীতি (প্যারিসের পীয়ের লা চেসে অক্সার ওয়াইল্ডের সমাধি গুহে ডাবিশায়ার পাথরে উৎকীর্ণ মূর্তি স্মরণীয়) থেকে শুরু করে আধুনিক বিমূর্ত রূপ (শ্বেতপাথরে 'জেনাস' স্মরণীয়) বিস্ময়কর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে বিধৃত। এপস্টিন ইংল্যাণ্ডের শিল্পজগতের শুধু নতুন দিগন্তের

দিশারীই নন, তিনি ব্রিটিশ ভাস্কর্যের মুক্তিদাতাও। কিন্তু তিনি নৈরাজ্যবাদী বিদ্রোহী নন। তিনি মানব জীবনের গভীরতম রহস্যকে এক আপোষহীন ব্যক্তিগত রীতিতে অভিব্যক্ত করেছেন, কিন্তু সেখানেও তিনি ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে ভাস্কর্যের ভাষা-ভাবকে অতীতমুখী করেই নতুন রূপের সৃষ্টি করেছেন।

এপস্টাইনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের শিল্পজগতে যে নবজাগৃতির সূচনা হল, তারই ভরকেন্দ্রে একের পর এক শক্তিশালী ভাস্কর দেখা দিয়েছেন। জ্যাক ডবসন (১৮৯৯—১৯৬৩), এরিক গিল (১৮৮২-১৯৪০), হেনরী মুর (১৮৯৮), বারবারা হেপওয়ার্থ (১৯০৩) প্রমুখ এই নবজাগৃতিরই ফল।

জ্যাক ডবসন-এর শিল্পকৃতি বহু বিতর্কিত হলেও বিশ্ব বন্দিত। দীর্ঘায়ত মূর্তির আশ্চর্য ছন্দোময়তা তাঁর শিল্পকর্মকে এক স্বিতরূপ দিয়েছে। তাঁর 'বিশ্রাম' (স্টাডি ফর লীডার-১৯১০) এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য। তাঁর দু'টি ভাস্কর্য—"ইওরোপা" এবং "বও" অবশ্য একদা মার্কিন কাস্টমস্ "অশ্লীলতা"র দ্বারে আটক করেছিল।

ভারতবর্ষে রামকিঙ্কর বেজ-এর শিল্পকর্মের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা তাঁর ভাস্কর্যে জ্যাক ডবসনের উত্তরসাধকের সাক্ষাৎ পাবেন।

আধুনিক ইংল্যাণ্ডে এপস্টাইনের পরে সবচাইতে বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে যাঁর শিল্পকর্ম—তিনি হলেন হেনরী মুর। শিল্পকর্মে তিনিও বহুলাংশে অভিব্যক্তিবাদী ও বিমূর্তবাদী—যদিও জীবনের রূপকে তিনি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন নি প্রকৃতির প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী হল গ্রাহাম সুদারল্যাণ্ডের অনুরূপ;—তিনি যা কিছু দেখেন তাকে নিজস্ব অনুভূতি অনুযায়ী রূপায়িত করেন। তিনি রূপের আড়ালে তার প্রাণশক্তিটির অন্বেষণায় লিপ্ত। এই প্রাণশক্তিকে ভাস্কর্যে রূপায়িত করতে হলে লক্ষণাশ্রয়ী এই পৃথিবীতে রূপের রীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সাধন প্রয়োজন। হেনরী মুর তাঁর ভাস্কর্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন প্রকৃতির রূপের (ফর্ম) এই ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের উপরে। সুতরাং তাঁর কৃতিগুলির কোনও আক্ষরিক অর্থে নাম থাকে না। সেগুলি শুধুই "ফিগার" "কম্পোজিশন"—বড়ো জোর 'মা ও ছেলে' কিন্তু মাতৃত্ব নয়। এই শেষোক্ত কৃতিত্বে তিনি অবশ্য বহুলাংশে রূপক ধর্মের কাছাকাছি এসেছেন; কিন্তু মুর কখনোই রূপকধর্মী ভাস্কর নন। জীবনের বহিঃপ্রকাশকেই তিনি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সহজ সরল ছন্দোময় রূপে রূপায়িত করেছেন, তাঁর "দণ্ডায়মান মূর্তি" এই ছন্দোময় বিমূর্ত রূপায়ণের উদাহরণ।

আর, সম্পূর্ণ বিমূর্ত ধারার ভাস্কর হিসাবে যিনি সমকালের বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন, তিনি হলেন বারবারা হেপওয়ার্থ। তাঁর কর্মে লক্ষণাশ্রয়ী এই জগত, জীবন, রূপ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সংগীত বা স্থাপত্যের মানসিক উপভোগ্যতার মেজাজ নিয়ে তাঁর ভাস্কর্যের পরিমাপ করা সম্ভব। হেপওয়ার্থের শিল্পকর্মের প্রেরণার উৎস বহির্জগৎ, রূপের জগৎ নয়। সে উৎস নিহিত শিল্পীর মনের গভীরে, তাঁর স্পর্শকাতর মানস-ভূমীতে। তাঁর "ছন্দোময় রূপ" (১৯৪০) ভাস্কর্যটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

এছাড়া বর্তমান ইংল্যাণ্ডে বার্নার্ড মিডোজ রবার্ট অ্যাডামস, রেগ বাটলার, উইলিয়াম টার্নবুল, এফ, ই, ম্যাক উইলিয়াম প্রমুখ শক্তিশালী ভাস্করেরা বহুমুখী পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্রিটিশ ভাস্কর্যের বর্তমান ধারাটিকে বেগবান রেখেছেন। বহুশতাব্দীর পিছুটান কাটিয়ে ইংল্যাণ্ড আজ ভাস্কর্যে বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে বিশ্ব-অঙ্গনে স্থান অধিকার করার দাবি নিয়ে এগিয়ে এসেছে।

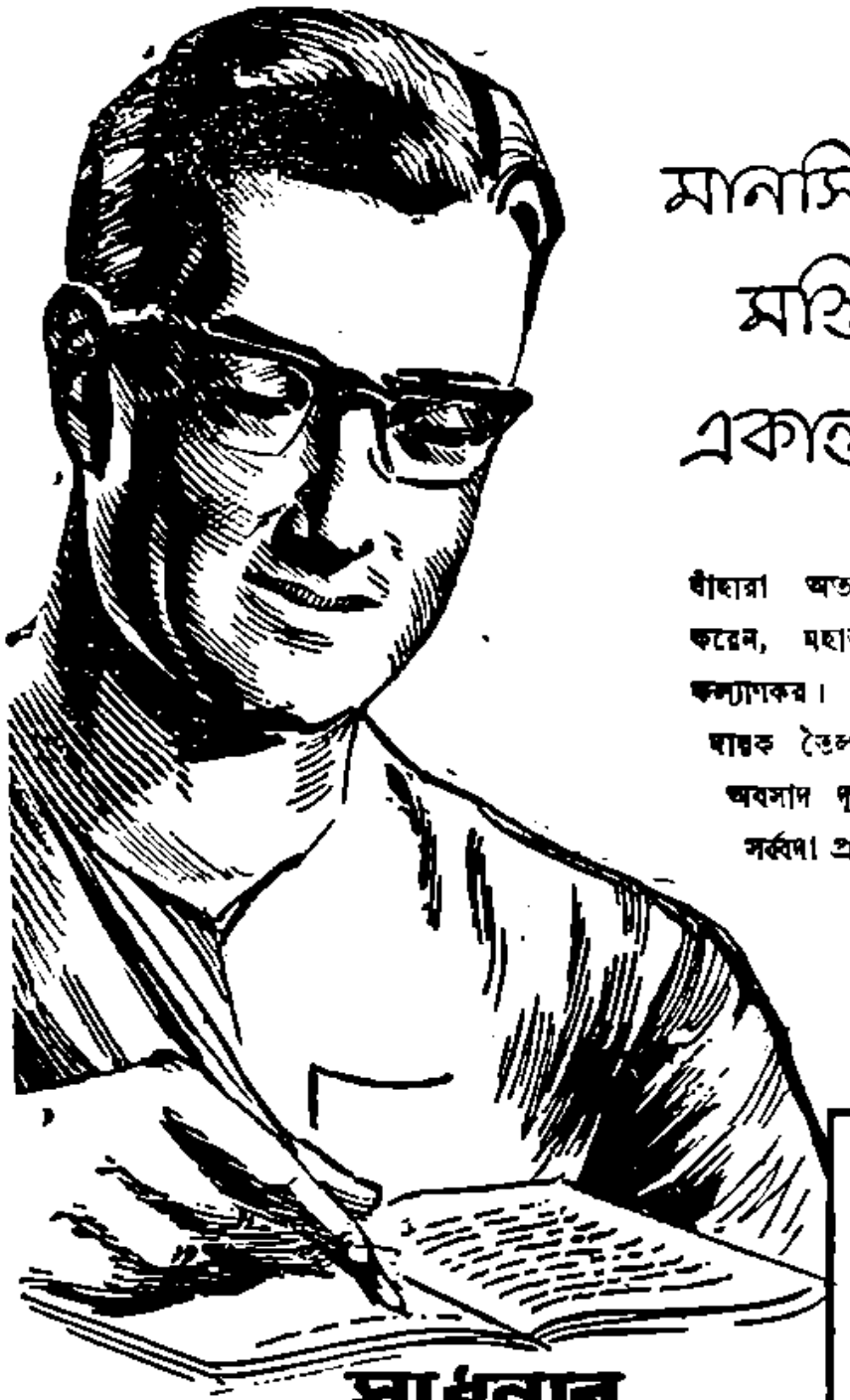

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

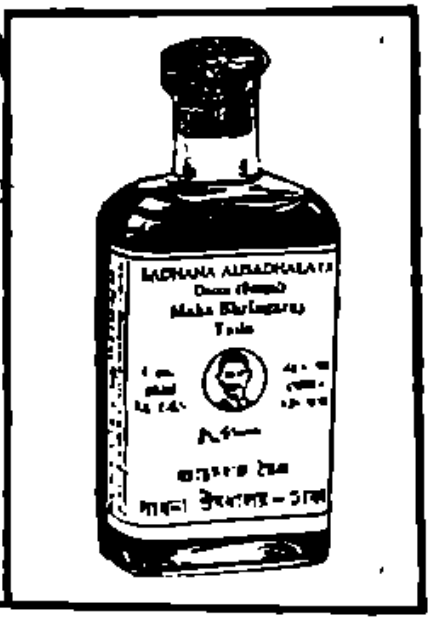

সাধনার মহা ভৃঙ্গরাজ তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

সাধনা ঔষধালয় ঢোক বলিকাতা-৪৮

SA-1/60

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম্. এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ্, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস (আমেরিকা)

॥ সাহিত্যের উপাসনায় ॥

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কার প্রাপ্ত বই :

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য [১৪·০০]

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সংকলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ আকর-গ্রন্থ :

বৈষ্ণব পদাবলী [২৪·০০]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত :

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস মোট ১৪খানি একত্রে [১২·০০]

দ্বিতীয় খণ্ডে সমগ্র সাহিত্য-অংশ একত্রে [১৪·০০]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস, মোট ৬খানি একত্রে [৯·০০]

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ও বহু রঙীণ চিত্র সংযোজিত আধুনিক সংস্করণ :

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত [৯·০০]

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের প্রাঞ্জল আলোচনা :

রবীন্দ্র-দর্শন [২·০০]

একই লেখকের রচনা প্রকাশন অপেক্ষায়

উপনিষদের দর্শন

বাঙলা সাহিত্যচর্চার নিত্যসঙ্গী :

সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান [৮·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : : কলিকাতা-৯

কেটে যাওয়া, পুড়ে যাওয়া এবং ফোঁড়া ইত্যাদি চর্মরোগে

অ্যানভিল

জীবাণুনাশক মলম *লাগান*

ফুসকুড়ি, ফোঁড়া, কাটা ঘা, পোড়া ঘা, দাদ এবং একজিমা জাতীয় ঘায়ের পক্ষে খুবই উপকারী। চামড়ায় কোন অস্বস্তি টের পেলেই অ্যানভিল ব্যবহার করুন।

এক কৌটো অ্যানভিল সব সময় কাছে রাখুন!

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড

(ইংলণ্ডে সংগঠিত)

ANV 4A

স্বামী দিব্যজ্ঞানন্দের

সমগ্র ভারতের অসংখ্য তীর্থ ভ্রমণের বহু চিত্রশোভিত কাহিনী

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০৲

প্রশান্ত চৌধুরীর কাহিনীধর্মী উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৮৲

আশাপূর্ণা দেবীর

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের উপন্যাস

উড়োপাখী ৫৷৷০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

কিন্নরীতীর ১০৲

রাজনৈতিক পটভূমিকায়

মৈনাকের বিচিত্র রসের উপন্যাস

বহ্নিবলয় ৮৷৷০

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের

সাত পাকে বাঁধা ৪৷৷০

কাল, তুমি আলেয়া ১২৷৷০

বিমল মিত্রের

কড়ি দিয়ে কিনলাম

১ম খণ্ড—১৬৲ ২য় খণ্ড—১৪৲

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কাঞ্চনমৃগী (যন্ত্রস্থ)

বিমল করের

পান্থশালা ৩৷৷০ **খোয়াই** (২য় মুদ্রণ) ৩৷৷০

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের

সন্ধ্যার কুয়াশা (২য় মুদ্রণ) ৫৷৷০

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

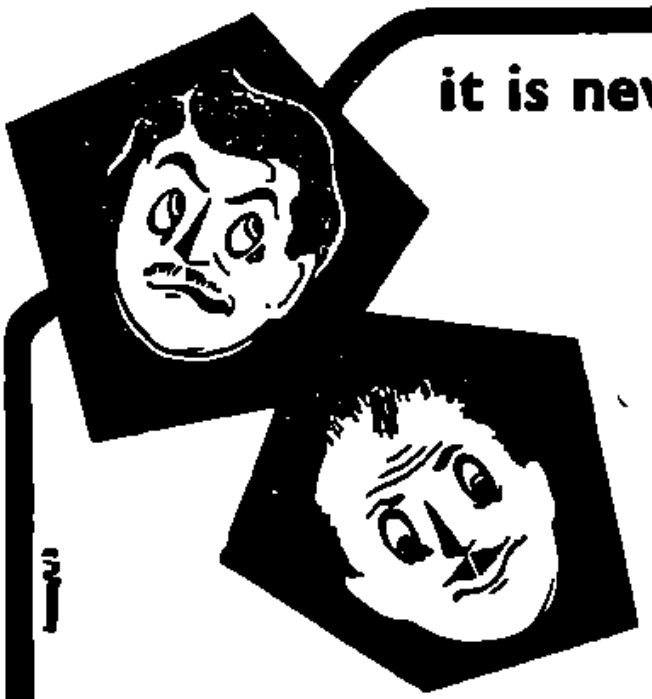

it is never too late

Yes, it is never too late. If all your hair had turned Grey or have started Greying. If your hair has started thining or Baldness Prevailing. It is never too late.

Loma the hairs natural food will supply the necessary vitality to the structure of cells that forms hair and keep the hair roots vigorously healthy. Turns Grey hair into Natural Black, stops falling or thining.

It re-starts the ceased work of the roots promoting new HAIR in cases of Baldness.

Loma

Sole Agents :

M. M. KHAMBATWALA. Ahmedabad

Agents : SHAH SAVIDHI & CO. 129, Radhabazar Street, Calcutta-1.

রূপ রচনায়
অপরাজেয়
ভেষজ বিশারদ
নগেন্দ্র নাথ শাস্ত্রীর
হিমকল্যাণ
কেশ তৈল
HIMKALYAN
HAIR OIL
হিমকল্যাণ
গুণে ও গন্ধে
অতুলনীয়
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস লিঃ
কলিকাতা

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—	১৯৫
বন্দেমাতরম্—	
সঙ্গীত—শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২০০
চিঠি শুধু চিঠি নয়—	২০৭
অমৃত কথা ও কাহিনী—	২০৮
জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	২০৯
শুক্তি-সৈকত (উপন্যাস)—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	২১৫
চল্‌তি দুনিয়া—	২২৮
চমক—	২৩০
অতৃপ্ত—সুনয়নী দাশগুপ্ত	২৩১
বিশ্ব-সাহিত্য—	২৪০
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—"দ্বিতীয় প্রকৃতি"র শ্রীমতী বাভেয়ার—মিহির সিংহ	২৪১
সাহিত্য-সংবাদ—বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যে বিশ্ববীক্ষা ?—পবিত্র পাল	২৪৫

তার ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ সকলেরই ঈর্ষার বস্তু

ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈল ব্যবহারে আপনার কেশের প্রাচুর্য ও মসৃণতা এনে দেবে। প্রত্যেকবার ব্যবহারের পর আপনি ক্যান্থারাইডিন কেশ তৈলের বৈশিষ্ট্য অনুভব করবেন।

ক্যান্থারাইডিন
কেশ তৈল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা : বোম্বাই : কানপুর

এই সংখ্যায়

সাদা কালোর ছন্দ—ডরোথী পার্কার	২৫৮
একজন আর কয়েকজন—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	২৫৩
বীরবলের কৌতুক—বররুচি	২৫৭
নিয়তি—কৃষ্ণধন দে	২৬০
মেয়েদের কথা—	২৬৪
অন্তরীক্ষে (ব্যঙ্গচিত্র)	২৬৭
এই প্রথম—বড় বাবু—অরুণা সেনগুপ্ত।	২৭২
রবির আবির্ভাব—স্নান ঘোষ	২৭৪
বৃটেন—সচিত্র সংযোজন	২৭৯
গ্রেট বৃটেনে মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারী—	২৮০
যুক্তরাজ্যে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসংস্থা—	২৮২
দেশ-বিদেশ—	২৮৪
খেলাধূলা—	২৮৮

১৮৮২
সাল থেকে
ঐতিহ্যের একটি
গৌরবময় ধারা
বহন করে চলেছে

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেণ্টস্

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা

ফোন : ২২-২২৭০

শাখা :—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

নিম-এর তুলনা নেই

- 'নিম টুথ পেষ্ট'-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে।
- মাড়ীর পক্ষে অস্বস্তিকর 'টার্টার' নিরোধে এবং দন্তক্ষয়কারী জীবাণু-ধ্বংসে এই টুথ পেষ্ট সব চেয়ে বেশী সক্রিয়।
- 'পাইওরিয়া' ও 'কেরিজ' নিরোধক উপাদানগুলি এই টুথ পেষ্টে আছে।
- ব্যবহারে দাঁত খুব ঝকঝকে হয় অথচ 'এনামেল'-এর ক্ষতি হয় না।
- মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে।

এই সব বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য 'নিম টুথ পেষ্ট'-এর সঙ্গে অন্য কোন টুথ পেষ্টের তুলনাই চলে না।

এই টুথ পেষ্ট যেমন গুণে সেরা, তেমনি দামেও সুবিধা।

পত্র লিখলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

MTP-2048

কোলে

▲ ভেনিস

▲ অ্যাসর্টেড লজেন্স ও টফি

মূল ও হুগোলে তৈরী উচ্চশ্রেণীর লজেন্স ও টফিতে ভরা, সুদৃশ্য, ছাপান ও মজা দেওয়া টিন। উপহার ও ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ।

কোলে বিস্কুট কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১০

এমন সুন্দর কেশগুচ্ছের অধিকারী হতে
আপনিও শুনবেন

"বাঃ সত্যই সুদর্শন"

রুক্ষ অবাধ্য চুলকে সহজে সুন্দর ও মসৃণ করে এবং কেশমূলে সতেজ সজীব রেখে চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে কেয়ো-কার্পিন অদ্বিতীয়।
কেশ পরিচর্যায় এই তেল ব্যবহারে চুল দিনে দিনে ঘন, চিক্কণ ও সুন্দর হয়।

কেয়ো-কার্পিন

মহাভৃঙ্গরাজ ভেষজ কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ · পাটনা · গৌহাটী · কটক

স্বাধীনতা বিপন্ন. আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে তা রক্ষা করুন—জওহরলাল নেহরু

শক্তির জন্য পরিকল্পনা

আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস হল জাতির মেরুদণ্ড

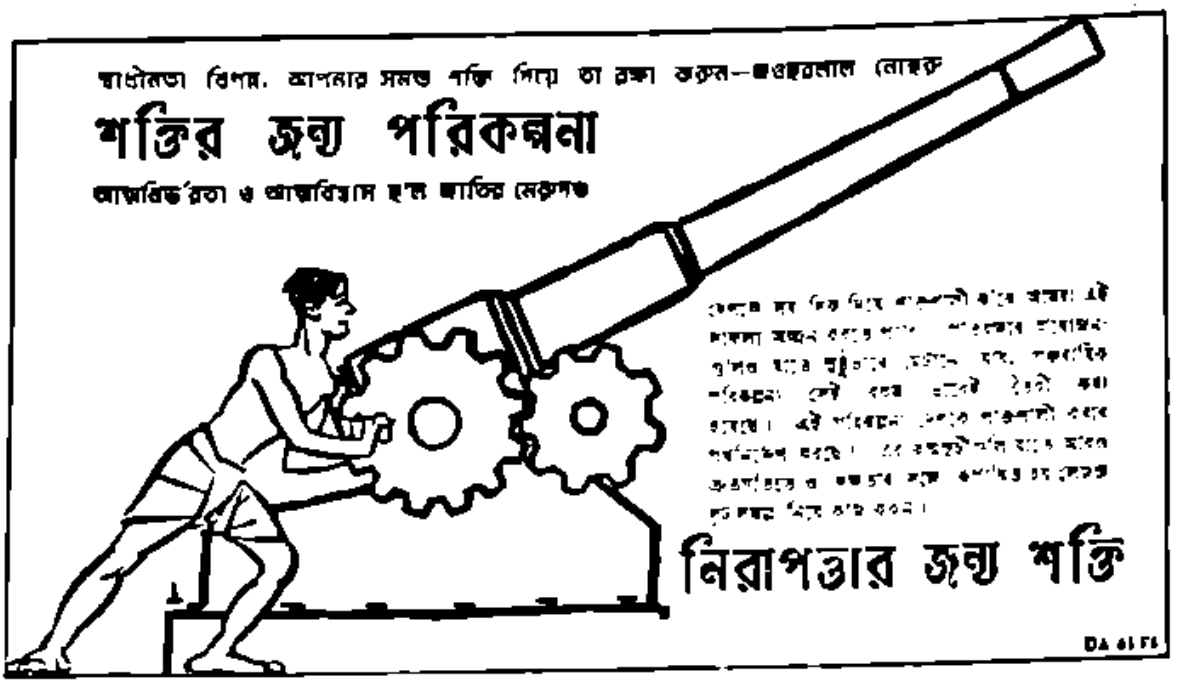

নিরাপত্তার জন্য শক্তি

DA 61 F4

লিভার ও পেটের পীড়ায়

কুমারেশ

দি ওরিয়েন্টাল ফার্মাসিউটিক্যাল ল্যাবরেটরী লিঃ

মডার্ণ ডেকরেটরস

৬৫ এ, জন্ন, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন ৫৫-২৬৪৮

গল্প-ভারতী
ভাদ্র ১৩৭০

সম্পাদকীয়

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের স্মৃতি উৎসব সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হয়ে গেল। বাংলার খুলনা প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পিতৃভূমি ও অমর কবি মধুসূদনের সাগরদাঁড়ি ও কপোতাক্ষীর কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যদিও এরা আজ বাংলার নয় পূর্ব পাকিস্তানের; তবু আশাবাদী আমরা আশা রাখি বাংলা ভাষা যতদিন থাকবে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের বাঙালীরা এই দুই মনীষীদের স্মরণ করে তাঁদের উপযুক্ত ভাবে স্থায়ী স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করবে। এ স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব শুধু ব্যক্তি বিশেষের নয়—এ দায়িত্ব আমাদের সকলের। জাতির চরিত্র—জাতির সংস্কৃতি—জাতির জীবনের প্রবহমান ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে যাঁরা একান্তভাবে সাহায্য করে গেছেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল—তবুও দুঃখের সঙ্গে বলব, যে আন্তরিকতা যে সংহতি যে প্রীতির প্রয়োজন ছিল তা দেখা যায়নি। এর মূল কারণ কিন্তু একটাই—সেটি আমাদের জাতীয় চরিত্রের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা—আরও দুঃখের বিষয় এ দুর্বলতা আমাদের সার্বজনীন সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের চরম সত্যের প্রতি আস্থাবান ছিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র আর আমরা তাঁর উত্তরসূরীরা সেই জীবন সম্পর্কে—সেই চরম সত্য সম্পর্কে একান্ত উদাসীন। নিতান্ত গতানুগতিক প্রবাহে গা ভাসিয়ে চলেছি—আন্তরিকতা—আদর্শ—শৃঙ্খলা এই বিশিষ্ট গুণগুলি শুধুমাত্র আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ভয়াবহ পরিণামের দিকে আমরা কেউই যথাযোগ্য ভাবে দৃষ্টি দিচ্ছিনা—তার ফলে প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মোৎসবের পরদিনই আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রকে আমরা বিস্মৃত হচ্ছি। দৈনন্দিন জীবনের কর্মপন্থার সঙ্গে চলমান জীবনধারার সঙ্গে এই মহৎ আদর্শের—এই মহৎ চরিত্রের অনুসরণের কোন চেষ্টা নেই। একান্ত আপনার করে যাঁদের আমরা পেয়েছিলাম—একান্ত সহজে তাঁদের আমরা বিশেষ একদিনের স্মরণ করার মধ্যেই আমাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে সীমাবদ্ধ রাখছি। অথচ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই প্রফুল্লচন্দ্র বাংলাদেশে এক নব জাগরণের সূচনা করেছিলেন। দেশের ও জাতির জীবনে যে নূতন ধারার তিনি প্রবর্তন করেছিলেন তার অনুসরণ করলে বাঙালী আজ জাতি হিসাবে আরও উন্নত আরও সংহত হতে পারত। দুঃখের বিষয় সে প্রচেষ্টা থেকে আমরা বহু পূর্বেই নিজেদের সযত্নে নিবৃত্ত করেছি। সে আদর্শের কথা—সে মূল্যায়ণের কথা আজ আমাদের কাছে শুধুমাত্র একটি দিনের কয়েকটি মুহূর্তের আলোচ্য বিষয়বস্তু।

১৮৮৪—৮৬ থেকে সুরু করে ১৯৪৪ পর্য্যন্ত প্রফুল্লচন্দ্র ইংরাজী ও বাঙলায় কত রচনা করে গিয়েছেন—আজও তার সঠিক সন্ধান ও গ্রন্থপঞ্জী করা হয়নি। ইংরেজ প্রকাশকরা

Dictionary of National Biography প্রকাশ করে তাঁদের দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের দেশে এই ধরণের প্রকাশনার অবিলম্বে ব্যবস্থা করা উচিত। জাতির চরমতম সঙ্কটের দিনে আজ একান্ত প্রয়োজন তাঁদের স্মরণ করার—আত্মিক ও মানসিক দিক দিয়ে যাঁরা আমাদের এই দেশকে একান্ত মহান করে—বিশ্বজনের সম্পদ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আমরা একান্তভাবে আশাকরি দেশবাসী ও জাতীয় সরকার এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হবেন।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

আগামী আশ্বিন মাসে সাংবাদিকশ্রেষ্ঠ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হবে। সাংবাদিকগণের ভীষ্ম পিতামহ Doyen of Indian Journalists-এর পরলোক গমনের পর প্রায় তিন বছর হয়ে গেল—নিতান্ত পরিতাপের বিষয় আজও সরকার—দেশবাসী—বা সাংবাদিকগণের পক্ষ থেকে তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হলনা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামে হেমেন্দ্রপ্রসাদের অবদান সর্বজনবিদিত। সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ আজ যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁর জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁদের অগ্রণী ছিলেন। বিদেশী সরকারের আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণের প্রচেষ্টার প্রতিবাদে হেমেন্দ্রপ্রসাদের সম্পাদকীয় প্রতিবাদ সাংবাদিকতার একটি বিশেষ সম্পদরূপে পরিগণিত। বাংলা সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ছিল তাঁর সুদীর্ঘ এবং অক্লান্ত কর্মজীবন। এই সুদীর্ঘ সেবার অভিজ্ঞতাহেতু তাঁকে এই পথে এমন একটি উচ্চ স্থানে নিয়ে গিয়েছিল যা সকলের ভাগ্যে সুলভ হয় না। এই দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা হেতু এই ক্ষেত্রে নেতৃস্থান দেশবাসী অধিসংবাদিত ভাবে তাঁকেই অর্পণ করেছিল। তাই তিনি ছিলেন ভারতীয় সাংবাদিকগণের ভীষ্ম পিতামহ। এই সম্মান তিনি পেয়েছিলেন কেবল বয়সের জন্য নয়, তাঁর অনন্য সাধারণ যোগ্যতার জন্য, তাঁর নানাবিধ মানসিক শক্তি ও গুণের জন্য। নীতিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী এবং কর্মপদ্ধতির অধিকারী হওয়ায় তিনি সমস্ত জীবন ধরে সৎভাবে, সৎচেষ্টা ও সদাকাঙ্ক্ষার সেবা করে ধন্য হয়েছেন। তাঁর নির্ভীক এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সাংবাদিক জগতে তাঁকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। এইহেতু তিনি কেবল সংবাদ পরিবেশন ও সাহিত্য সাধনাতে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যাঁরা উদ্বোধক ছিলেন এবং এই স্বাধীনতার সংগ্রামে যাঁরা নেতা হয়েছিলেন—তাঁদের আহ্বানে নিজের নির্বাচিত পথে তিনি দেশের এই অভ্যুত্থান কার্যে দেশের শ্রেষ্ঠ নায়কদের অনুগামী ও সহচর হয়ে দেশের সেবা করেন।

তাঁর স্পষ্টবাদিতা অনেক সময় তাঁকে অপ্রিয় সত্য বলতে নির্দেশ দিয়েছিল এবং সেই নির্দেশ তিনি লঙ্ঘন করেননি। এই জন্যই তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল।

গল্প-ভারতীর তিনি পিতৃতুল্য অভিভাবক ছিলেন। তাঁর শেষ রচনাও গল্প-ভারতীতেই প্রকাশিত হয়েছে। গল্প-ভারতী তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছে।

ভবানীপ্রসাদ সাহা

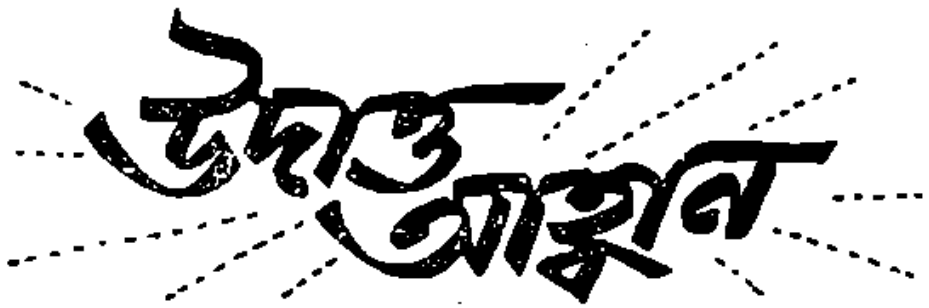

বন্দে মাতরম্

বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমের মহান আদর্শ আমাদের জাতিকে মৃতসঞ্জীবনী সুধার সন্ধান দিয়েছে। বন্দে মাতরম্ পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এই মর্ত্যলোকের অতীত নতুন এক জগতের প্রবেশদ্বার হঠাৎ খুলে গেল, তার ভিতর দিয়ে "আলোকে আলোকে" উদ্ভাসিত এক কল্পনার মায়াপুরী দেখা দিয়েছে। এইই সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের চিহ্ন। এর জন্যই বন্দে মাতরমের অমরত্ব। বন্দেমাতরম্ স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের অগণিত যোদ্ধাকে ধমনীর রক্তে আত্মত্যাগে প্রেরণা দিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের মত বন্দে মাতরম্ আমাদের প্রেরণার উৎস ছিল।

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠ'-এর সন্তান সম্প্রদায়ের সঙ্গীত—তাঁদের সজ্ঞবাণী (স্লোগান) বা জয়ধ্বনি ছিল—বন্দে মাতরম্।

'আনন্দ মঠ' উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' মাসিক পত্রে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৭ সনের চৈত্র হইতে ১২৮৯ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংখ্যা পর্যন্ত; জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় বঙ্গদর্শনে সমাপ্ত হয়। 'আনন্দ মঠ' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১২৮৯ সালে—ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে।

প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা, অনুশীলন সমিতির পি, মিত্র (ব্যারিস্টার—প্রমথ মিত্র) নৈহাটিতে থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবেশী ছিলেন। উভয়ের মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা ছিল। মিত্র মশাইকে বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দ মঠের বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটি পড়িয়ে শোনান এবং বলেন—"একদিন কেবল বাংলা নয় গোটা ভারতবর্ষ মেতে উঠবে বন্দে মাতরম্ গানে।" বঙ্কিম তা দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু পি, মিত্র তা দেখে গেছেন।

কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে (১৮৯৬ খ্রীঃ) কলিকাতা মহানগরীতে সর্ব প্রথম প্রকাশ্য অধিবেশনে বন্দে মাতরম্ গানটি গেয়েছিলেন উদীয়মান কবি সুকণ্ঠ গায়ক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বাদশ অধিবেশনের সভাপতি—R. M. Sayani.

দ্বাদশ অধিবেশনের পর গীত হয় ত্রয়োবিংশ অধিবেশনে (১৯০৬ খ্রীঃ) কলিকাতায়—সভাপতি ছিলেন দাদাভাই নৌরজী—বন্দে মাতরম্—পুরুষ গায়ক ও নারী গায়িকা কোরাসে একসঙ্গে গেয়েছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫ আগস্ট—১৯১১ ডিসেম্বর) বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতটি ব্যাপকভাবে গীত হয়েছিল—বাংলার বাইরেও—বিহার, বোম্বাই (বিশেষ করে পুণা সহরে), মাদ্রাজ ও পাঞ্জাবে।

কথিত আছে, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দে মাতরম্ গানটি আনন্দ মঠ উপন্যাস লেখার আগেই রচনা করে রেখে দিয়েছিলেন। পরে আনন্দ মঠ উপন্যাস লিখতে থাকেন বঙ্গদর্শনের জন্য—তখন সমসাময়িক বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে উপন্যাসে গ্রথিত করে দেন বন্দে মাতরম্ গানটি। কোন বৎসর রচনা করেছিলেন, তা সঠিক বলা মুস্কিল। তবে উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবার পূর্বে। কলকাতায় আনন্দ মঠ প্রথমে নাটকাকারে রূপায়িত হয়ে প্রথমে (পুরাতন) ন্যাশন্যাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিল। কেদারনাথ চৌধুরী ছিলেন নাট্যকার।

শ্রীনরেশচন্দ্র দেনগুপ্ত এম. এ., বি. এল. 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করে প্রকাশ করেছিলেন। পরে নরেশবাবু ডি. এল ডিগ্রি পেয়ে ডক্টর হন। পরবর্তীকালে লেখক ও ব্যবহারজীবী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ব্যাপক হয়েছে।

১৯০৬ খ্রীঃ ডিসেম্বরে প্রসিদ্ধ সুরশিল্পী বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিলাতে থাকাকালে 'বন্দে মাতরম্' গানটিতে ফরাসী জাতীয় সঙ্গীত মার্সাই-এর সুর যোজনা করে এক বৈঠকে গেয়েছিলেন। শ্রোতা-শ্রোত্রীরা তনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তিনি তখন ব্যারিস্টারি পড়ছিলেন, ইনি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র—দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বন্দে মাতরম্ মহামন্ত্রটি বঙ্গসাহিত্যেরই দান" (সাহিত্য সম্মিলন প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। উহা পঠিত হয়েছিল কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বাবিংশ অধিবেশন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত শিল্প প্রদর্শনীতে—১২০৭ জানুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে (বাং ১৩১৩ সন মাঘের প্রথম সপ্তাহে)।

শ্রীঅরবিন্দ 'বন্দে মাতরম্'-এর গদ্যানুবাদ করে সন্তুষ্ট হতে পারেননি এই জন্যে যে, ওই সঙ্গীতের অনুবাদে মূল সঙ্গীতের মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়। পরে তিনি গদ্যানুবাদ করেন। গদ্যানুবাদ অরবিন্দের সম্পাদিত ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কর্মযোগীন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শ্রীঅরবিন্দ রচিত ইংরেজী প্রবন্ধ Rishi Bankim Chandra (১২০৭ খ্রীঃ ১৬ই এপ্রিলে 'Bande Mataram) পত্রিকায় বের হয়েছে—'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের জন্য তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' আখ্যা দিয়েছেন। অরবিন্দ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'He gave us the vision of our Mother.'

'The religion of patriotism—this is the master idea of Bankim's writings—in Ananda Math this idea is the Keynote of the whole book. শ্রীঅরবিন্দের ঐ প্রবন্ধ—'Bankim-Tilak-Dayanada নামক গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্য অন্যত্র প্রকাশ করা হল।

বন্দে মাতরম্

"বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং
মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং
মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটীকণ্ঠকলকলনিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর-করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং
নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং
মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী
নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্
অমলাং অতুলাম্
সুজলাং সুফলাম্
মাতরম্।
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্
মাতরম্।"

—বঙ্কিমচন্দ্র

BANDE MATARAM

(Translation)

Sri Aurobindo

Mother, I bow to thee !
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Cool with thy winds of delight,
Dark fields waving, Mother of might,
Mother free.
Glory of moonlight dreams,
Over thy branches and lordly streams,
Clad in thy blossoming trees,
Mother, giver of ease,
Laughing low and sweet !
Mother, I kiss thy feet,
Speaker sweet and low !
Mother, to thee I bow.

Who hath said thou art weak in thy lands,
When the swords flash out in twice seventy million hands
And seventy million voices roar
Thy dreadful name from shore to shore ?
With many strengths who art mighty and stored,
To thee I call, Mother and Lord !
Thou who savest, arise and save !
To her I cry who ever her foemen drave
Back from plain and sea
And shook herself free.
Thou art wisdom, thou art law,
Thou our heart, our soul, our breath,
Thou the love divine, the awe
In our hearts that conquers death.
Thine the strength that nerves the arm,

Thine the beauty, thine the charm.
Every image made divine
In our temples is but thine.

Thou art Durga, Lady and Queen,
With her hands that strike and her swords of sheen.
Thou art Lakshmi lotus-throned,
And the Muse a hundred-toned.
Pure and perfect without peer,
Mother, lend thine ear,
Rich with thy hurrying streams,
Bright with thy orchard gleams,
Dark of hue, O Candid-fair
In thy soul, with jewelled hair
And thy glorious smile divine,
Loveliest of all earthly lands,
Showering wealth from well-stored hands !
Mother, Mother mine !
Mother sweet, I bow to thee,
Mother great and free !

BANDE MATARAM

(Translation in Prose*)

Sri Aurobindo

I bow to thee, Mother,
richly-watered, richly-fruited,
cool with the winds of the south,
dark with the crops of the harvests,
the Mother!
Her nights rejoicing in the glory of the moonlight,
her lands clothed beautifully with her trees in flowering bloom,
sweet of laughter, sweet of speech,
the Mother, giver of boons, giver of bliss!
Terrible with the clamorous shout of seventy million throats,
and the sharpness of swords raised in twice seventy million hands,
Who sayeth to thee, Mother, that thou art weak!
Holder of multitudinous strength,
I bow to her who saves,
to her who drives from her the armies of her foemen,
the Mother!

Thou art knowledge, thou art conduct,
thou our heart, thou our soul,
for thou art the life in our body.
In the arm thou art might, O Mother,
in the heart, O Mother, thou art love and faith,
it is thy image we raise in every temple.

For thou art Durga holding her ten weapons of war,
Kamala at play in the lotuses
and Speech, the goddess, giver of all lore,

to thee I bow !
I bow to thee, goddess of wealth,
pure and peerless,
richly-watered, richly-fruited,
the Mother !
I bow to thee, Mother,
dark-hued, candid,
sweetly smiling, jewelled and adorned,
the holder of wealth the lady of plenty,
the Mother !

Translator's Note

* It is difficult to translate the National Anthem of Bengal into verse in another language owing to its unique union of sweetness, simple directness and high poetic force. All attempts in this direction have been failures. In order, therefore, to bring the reader unacquainted with Bengali nearer to the exact force of the original. I give the translation in prose line by line.

VANDE MATARAM

Laudo Matrem (I Adore My Mother)

(ENGLISH TRANSLATION)

Dr. SUNITI KUMAR CHATTERJI

Laudo Matrem ! I adore my mother !
Her sweet water and goodly fruits,
Her who is cool like the Sandal growing in the
Southern Hills,
The Mother who is green with corn—
Laudo Matrem ! I adore my Mother !
I adore Her with nights thrilled by moonlight white,
I adore Her fair with trees blooming with flowers,
I adore Her sweetly-smiling, sweetly-speaking,
The Mother that gives joy, and gives bliss—
Laudo Matrem ! I adore my Mother !
O thou that art terrible with the din of clamour
from forty crores of throats,
O thou that holdest the sharp sword in twice-forty
crores of hands,
Why powerless thou, Mother, with such power ?
I salute Her, the Holder of much strength, the
Saviour, the Mother who stops the
bands of foemen :
Laudo Matrem ! I adore my Mother !
Thou art Wisdom, Thou art the all-holding Law,
Thou art the Heart, Thou art the Heart's Secrets,
Thou indeed the Vital Breaths within the body.
In the arms, Mother, Thou art Strength,
In the heart, Mother, Thou art Faith :

It is Thy image which we build,
From temple to temple.
Thou art the Helper in danger, weilding Thy ten weapons.
Thou art Beauty-and-Riches, sporting among lotus banks,
Thou art speech and Learning, giving us Wisdom,
I salute Thee.
I salute Thee, that art Beauty-Lotus,
I salute Thee that art Pure and Incomparable,
I salute Thee, the Mother with sweet waters and goodly fruits:
The Mother who is dark and green, who is simplicity's soul,
Who is sweetly smiling, who is richly adorned,
The Mother who is the all-embracing Earth, who is, the Nourisher:
Laudo Matrem! I adore thee Mother!

সঙ্গীত আসর

অনন্তলাল বাজ্যোপাধ্যায় রচিত গান

ছায়ানট—ত্রিতাল

দীন-তারিণী বলে মা ডাকি গো তোরে
তবে কেন দীনের প্রতি নিদয়া হইলি শ্যামা।
যদি পুণ্য ফলে তারা তরে যায় মা ভবদারা
তারা নামে দুখ হরা ভবে আর কে কবে গো মা॥

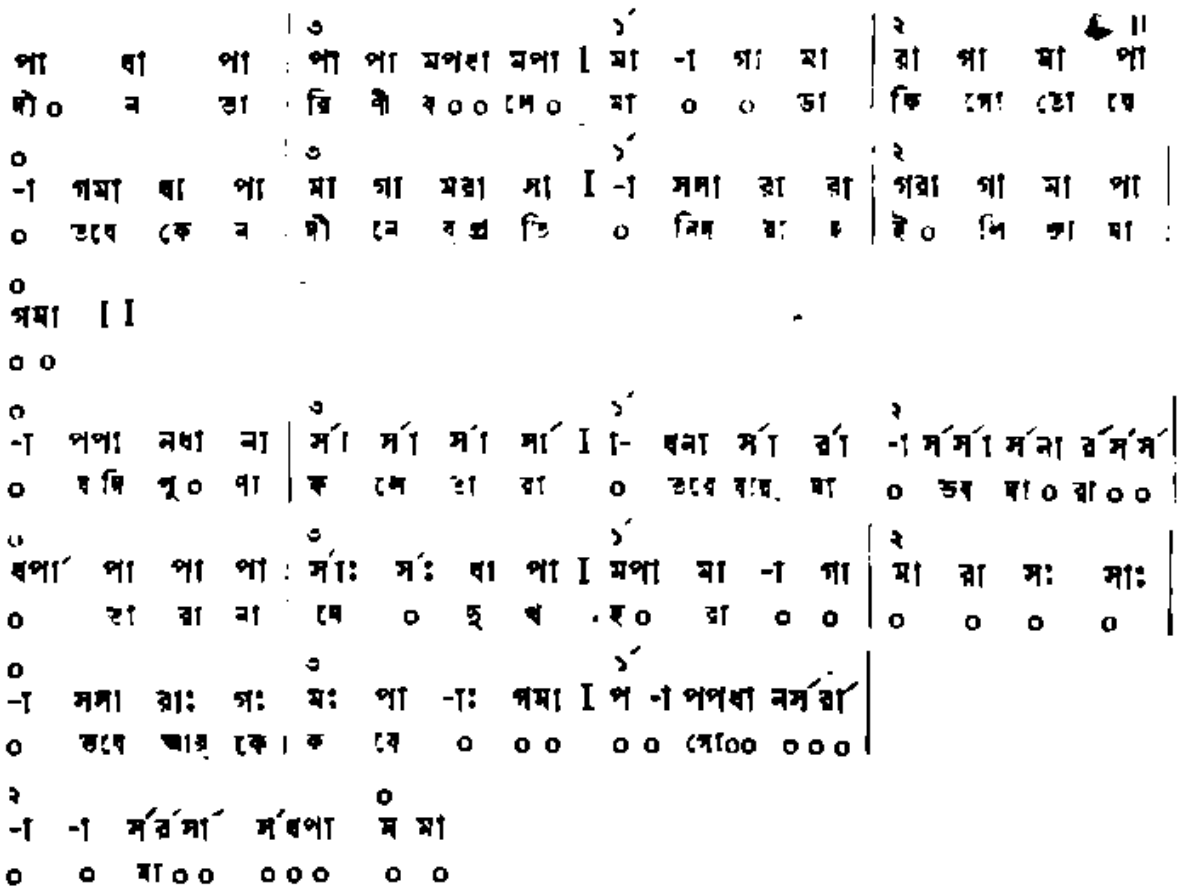

জগদ্গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ

জীবন কাহিনী ॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

১৫

বরানগরে মণি মল্লিকের বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গেল বিজয়।

'এ কি, তোমার যে গর্ত লক্ষণ হয়েছে।'

তার দীক্ষালাভের সমস্ত কথা তখন ব্যক্ত করল বিজয়। রামকৃষ্ণের আনন্দ আর ধরে না। সন্দেহ কী, বিজয়ই বাসা পাকড়েছে। কোয়ারা চাপা ছিল, খুলে গিয়েছে এবার।

সেবার গেল দক্ষিণেশ্বরে পশ্চিমের ভ্রমণ সেরে। রামকৃষ্ণ জিগগেস করলেন, 'এত তো ঘুরে এলে কোথায় কী রকম দেখলে বলো তো!'

বিজয় বললে, "কোথাও চার আনা, কোথাও আট আনা। ষোল আনাও দেখেছি, কিন্তু ষোল আনা এখানে।'

ভাবাবেশে জ্ঞানশূন্য রামকৃষ্ণ।

সেবার রামকৃষ্ণের অসুখ, ভক্তেরা কাউকে আসতে দিচ্ছে না কাছে। বিজয়কেও বাধা দিল। দূরে দাঁড়িয়ে দেখুন।

রামকৃষ্ণ হাততালি দিয়ে ডাকতে লাগলেন বিজয়কে। আর বিজয় কাছে আসতেই গদগদ ভাবে বলে উঠলেন, 'আহা, তোমাকে দেখে আমার হৃৎপদ্মটি ফুটে উঠল!'

আরেকবার গেল লক্ষ্মিমণি ও খুল্লঠাকুরাণীকে নিয়ে। পরিবারের আরো কেউ ছিল হয়তো সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি এতগুলি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থেকেও ধর্মের এই উচ্চাবস্থা লাভ করেছ, তুমিই ধন্য। তুমিই একালের জনক রাজা। আমি তো ভেবেছিলাম সংসারে উদাসীন হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ বুঝি। তুমি যে আদর্শ দেখালে তা জগতে দুর্লভ।'

যোগমায়ার মধ্যেও দেখলেন মহাশক্তি।

বললেন, 'কবে দীক্ষা দিলে এঁকে? সাক্ষাৎ মহাশক্তির কাছে এলে যেমন ভাব ও অবস্থা হয় এঁকে দর্শন করে আমার সেই ভাব সেই অবস্থা।'

খুল্লমাতা মুক্তকেশীকে ডাকলো। বললেন, 'তুমি একজন নীতিপরায়ণা ব্রাহ্মিকা হয়ে এই ভাটো মানুষের কাছে কেন এসেছ?'

মুক্তকেশী বললে, 'আপনার আমার ভাটো কাপড়-পরা কী!'

'বটে? তুমি তা বুঝেছ?' রামকৃষ্ণ সস্নেহে বললেন, 'তবে কাছে এসে বোস।'

মুক্তকেশী বসল।

'সংসার কেমন দেখছ?'

'সংসারের কথা আর বলবেন না, এক ঢেউ যাচ্ছে আরেক ঢেউ আসছে।' বললে মুক্তকেশী।

'তোমার তাতে কী। তোমার তো জ্ঞান হয়েছে!' স্নিগ্ধ চোখে তাকালেন রামকৃষ্ণ: 'কিন্তু ব্রাহ্ম-সমাজের গুরুনো বাঁশের মুড়ো আর কদিন চিবুবে? এখন ভক্তির আশ্রয় নাও। জ্ঞান ভক্তি ছাড়া দাঁড়াবে কোথায়? যাকে তুমি জামাই ভাবছ, তিনি ভক্তির ভাণ্ডারী, তাঁর কাছে প্রেম-ভক্তি লাভ করে ধন্য হও।'

মুক্তকেশী গোস্বামী-প্রভুর থেকে নিল যোগদীক্ষা।

বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীও বলে দেন, যাও, গৌরাইয়ের কাছে যাও, সাধন নিয়ে এস।

এক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আখড়ায় গিয়ে দেখলেন গৌরাঙ্গের দারুমূর্তি। বললেন, 'তোদের ও গৌরাঙ্গ তো অচল, নিম কাঠের। আর, বিজয়কৃষ্ণকে লক্ষ্য করলেন। 'আর ও আমার সচল গৌরাঙ্গ, রক্তমাংসের।'

ব্রহ্মচারী বিজয়ের নাম রেখেছেন, জীবনকৃষ্ণ। যে কৃষ্ণ জীবিত, সে জীবন্তকৃষ্ণ, তার বিজয় দিক-দিগন্তে।

'বহু দেশ পর্যটন করেছি বহু পাহাড়-পর্বত ঘুরেছি কিন্তু এত অদ্ভুত যোগৈশ্বর্য দেখিনি।' বলছে বিজয়, 'ব্রহ্মচারীর চোখে পলক নেই। পাঁচ মিনিট তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাক মূর্ছিত হয়ে পড়বে। হিমালয় থেকে তিব্বত থেকে প্রাচীন যোগীরা রাত্রিকালে ব্রহ্মচারীর কাছে আসে। কেন আসে জানিস? যোগশিক্ষা করতে। সন্ধেতেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। কেউ যেতে পারে না।'

বিজয়ের প্রপিতামহের সহোদর, এই ভাবে ব্রহ্মচারী নিজের পরিচয় দেন। আশি বছর ধরে বনে-পর্বতে কুবারে-হিমবাহে কঠোর সাধন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। বয়েস প্রায় বেড়শো।

যেদিন গৈতে নেন সেইদিনই ব্রহ্মচারীর বেশে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। সঙ্গে নিজের আচার্য গুরু ভগবান গাঙ্গুলি আর সতীর্থ বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই যে বেরুলেন, আর ফিরলেন না সংসারে।

কাশীতে মণিকর্ণিকার ঘাটে যোগাসনে বসে দেহ ছাড়লেন ভগবান। ছাড়বার আগে আরেক ব্রহ্মচারীর হাতে লোকনাথ আর বেণীমাধবকে সঁপে দিলেন। সেই ব্রহ্মচারীই প্রসিদ্ধ তৈলঙ্গস্বামী।

সুমেরু পর্বত দেখবার অভিলাষে লোকনাথ আর বেণীমাধবকে নিয়ে যাত্রা করল হিতলাল। বদরিকাশ্রম উত্তীর্ণ হয়ে উত্তরে হাজার-হাজার মাইল গিয়ে সুমেরুর সন্ধান মিলল না। দেখি উদয়াচল মেলে কিনা—সঙ্গীদের থেকে বিদায় নিয়ে হিতলাল চলল পুবদিকে। আর লোকনাথ ও বেণীমাধব পাহাড় ভেঙে-ভেঙে অবশেষে উপস্থিত হল বাংলাদেশে, চন্দ্রনাথে। তারপর বেণীমাধব কোথায় গেল কে জানে, লোকনাথ এসে ঠাঁই নিল বারদীতে।

এক ব্রাহ্ম-ভক্ত এসেছে ব্রহ্মচারীর কাছে।

মনে অগণন প্রশ্ন, কিন্তু কী আশ্চর্য, উচ্চারণ করে বলতে হয় না। নিজের থেকে উত্তর বলে যেন ব্রহ্মচারী। তোমার মনে তো এই প্রশ্ন, তবে শোনো এই তার সমাধান। উত্তর যাই হোক, হৃদয়স্থ গোপনীয় প্রশ্নটা উনি জানেন কেমন করে?'

ব্রাহ্ম-ভক্তের ইচ্ছে হল ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নেবে।

অমনি ব্রহ্মচারী জেনে ফেলেছে মনের কথা। প্রবল-কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'না, না, তা হতে পারে না তোমার গুরু অপেক্ষা করে আছেন। তিনিই তোমাকে ডেকে নেবেন।'

কে গুরু! কবে? কোন খানে?

কী এক উপলক্ষ্যে গোস্বামী-প্রভুর কাছে এসে বসেছে সেই ভক্ত। অমনি গোঁসাইজি বলে উঠলেন, 'পাবেন, আপনি সাধন পাবেন।'

ভক্তের সর্বদেহ পুলকিত হয়ে উঠল। বুঝল ব্রহ্মচারী কার কাছে পাঠিয়েছেন।

ব্রাহ্ম ভক্তের ইচ্ছে দীক্ষার সময় তার ঘরোয়া গুরু নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত থাকে। কিন্তু কে তাকে খবর দেবে? তাছাড়া মনের এ চাঞ্চল্য পরিস্ফুটই বা করে কী করে?

স্নান করে ক্ষেত্রের ঘরে দীক্ষার আশায় বসে আছে ভক্ত, গোঁসাইজি হঠাৎ বলে উঠলেন 'ক্ষেত্র, নগেন্দ্রবাবুকে ডাকো।'

আশ্চর্য, নগেন্দ্রবাবু উপস্থিত।

ভক্তের মনশ্চাঞ্চল্য দূর করে দিলেন প্রভু। নির্বিঘ্নে শান্তিতে দীক্ষা হল।

'সাধন নিলে যিনি যে অবস্থার লোক,' বললেন গোঁসাইজি, 'তাঁকে সেই অবস্থার সব কাজ করতে হবে ঠিক-ঠিক। মানে যিনি সংসারী তিনি সংসার কার্য অবহেলা করতে পারবেন না, যিনি ছাত্র তাকে নিয়মিত মনোযোগ করে পড়াশোনা করতে হবে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করব পড়াশোনা।'

প্রভু হাসলেন। বললেন, 'আরো একটা কথা আছে। অভিভাবকের অনুমতি নিতে হবে।'

সর্বনাশ। অনুমতি পাবে কী করে? বড়দা হয়তো তো কয়রাবাদে ডাক্তার। আর মেজদা তো এ-সবের উপরে ভীষণ চটা। ছোড়দাকে বলতে তো তেড়ে এল। বললে, যোগ করলে ভীষণ রোগ হয়। মানুষ ভেড়া হয়ে যায়।'

ছোড়দা বলেছিল মেজদাকে। মেজদাকে কুলদাকেডেকে পাঠাল। কুলদাকে দেখে চটি জুতো নিয়ে তেড়ে এল। বললে, 'কের 'যোগ' শব্দ তোর মুখে শুনি জুতিয়ে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে নেব।'

পালাল কুলদা। প্রতিজ্ঞা করল যদি দীক্ষা পাই তা হলে যোগশক্তি প্রথমে মেজদা ও ছোড়দার উপরে প্রয়োগ করব, গোঁসাইয়ের পায়ে বলি দেব দুজনকে। আর যদি দীক্ষা না পাই তা হলে আত্মহত্যা।

গোঁসাইজিকে গিয়ে বললে, 'অনুমতির কথা বলেছেন, অনুমতির ব্যবস্থা আপনিই করে দিন।'

গোঁসাইজি বললে, 'তুমি তোমার বড়দাকে লিখে দাও।'

বড়দা মত দিলেন বটে কিন্তু লিখলেন, মা যখন বর্তমান আছেন তখন সর্বাগ্রে তাঁর মত নেওয়াই সমীচীন।'

মা, আমি দীক্ষা নেব, আমাকে অনুমতি দাও। মায়ের পায়ে এসে পড়ল কুলদা।

'তুই সৈতে ফেলে ব্রাহ্ম হবি?'

'না মা, আমি গোঁসাইয়ের কাছে সাধন নেব। তুমি অনুমতি না দিলে কিছু হবেনা।'

মা কুলদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। বললেন, 'আমি তো নিজে কিছু ধর্ম-কর্ম করলাম না, তোরা যদি করিস নিষেধ করব কেন? তুই ধর্ম-কর্ম করবি তাতে আমার খুব অনুমতি আছে, খুব আনন্দ। শুধু বাপ সৈতেটি ফেলিসনে আর আমি যদ্দিন আছি নিরুদ্বেগ হয়ে থাসনে।'

সাধন পেল কুলদা।

কিন্তু বড়দা হরকান্ত এসেছে বারদীর ব্রহ্মচারীর কাছে দীক্ষা নিতে। সঙ্গে বয়দা কুলদাও এসেছে।

হরকান্ত বললে, 'আমার যথার্থ কল্যাণ কিসে হবে বলে দিন।'

ব্রহ্মচারী বললেন, 'তাহলে গোঁসাইয়ের কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও। তিনি আশ্রয় দিলেই তুমি পরম কল্যাণ লাভ করবে।'

মেজদা বরদাকান্ত জিগগেস করলে, 'আর আমি? আমি কোথায় যাব?'

'তুমি অর্থোপার্জন করো আর লোকসেবায় তা ব্যয় করো, তাতেই হবে।' ব্রহ্মচারী তাকালেন কুলদার দিকে: 'কিহে, তোমাকে কিছু বলতে হবেনা?'

'বলুন।'

তাঁর আসনের পাশে কুলদাকে বসতে বললেন ব্রহ্মচারী। জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁ রে, তুই তো নিত্যি নোট লিখিস, তাই না?'

ব্রহ্মচারী তা কী করে জানলেন?

'তবে তোর খাতায় তোর সম্বন্ধে আমার দুটো কথা লিখে রাখ—বিলাসিতা ত্যাগ কর। বিদ্যা হবে না। কি রে, কথা দুটোর মানে বুঝলি?'

'মানে আর এমন শক্ত কী।' বললে কুলদা, 'সমস্ত সুখ ভোগ ত্যাগ হলেই ধর্মে মতি হবে আর ধর্মে মতি হলে লেখাপড়া গোল্লায় যাবে।'

'না রে লেখাপড়া করবি না কেন। খুব লেখাপড়া কর।' বললে লোকনাথ, 'লেখাপড়া করলেই পাশ হবি। কিন্তু বিদ্যা কী অবিদ্যা কী—জানিস না তুই? সেই বিদ্যার কথা বলছিলাম। আর বিলাসিতা ছাড়বি মানে একখানা কাপড় ও একখানা ছাতার মাত্র সম্বল করিস আর পায়ে এক নেড়া চটিজুতো। শোন তোর ধর্মকর্ম সব হবে। তুই একটা বেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছিস তাই না? আমি তোর বুকে হাত বুলিয়ে দি, এখুনি সেরে যাবে।'

কুলদা বললে, 'আমার বেদনা দূরিয়ে দেবেন আমি তার জন্যে আসিনি। আমি শুধু আপনাকে দর্শন করতে এসেছি।'

'চলো এঁড়েদার মন্দিরের চিত্রপট দর্শন করে এসেছি।' একদিন রামকৃষ্ণ বললেন বিজয়কে।

'আজকাল ভগবানের বিগ্রহ আর চিত্রপট ভাবশুদ্ধরূপে নির্মিত হয়না।' বললে বিজয়।

'কিন্তু এঁড়েদার মন্দির তার ব্যতিক্রম। যাবে একদিন দেখতে?'

'আপনিও চলুন।'

দুজনে গেলেন এঁড়েদা। গিয়ে দেখলেন মন্দির বন্ধ। সামনের দরজায় খিল দিয়ে পিছনের দরজা তালাবন্ধ করে চলে গিয়েছে পুজুরী।

আঙিনার প্রান্তে মহাপ্রভুর আমলের এক বৈষ্ণবের সমাধি। তাই দেখতে গেলেন দুজনে। বিজয়ের ভাবাবেশ হল, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। রামকৃষ্ণ গান ধরলেন। বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে বিজয় আবার এগুলো মন্দিরের দিকে। দেখলেন দরজা তখনো বন্ধ, পুজুরীর দেখা নেই।

মন্দিরের সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়ল বিজয়।

আস্তে-আস্তে মন্দিরের সামনের দরজা খুলে গেল।

রামকৃষ্ণ আর বিজয় ঢুকলেন মন্দিরে। সে কী পুজুরী তো আসেনি। পিছনের দরজা তো যেমন তালাবন্ধ ছিল তেমনিই আছে।

ঘুরে ঘুরে দুজনে দেখতে লাগলেন। এই সেই চিত্রপট।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এল পুজুরী। এ কী, কে খুলল দরজা?

কে খুলল তা কে জানে।

পুজুরী তখন কী ভাবে, প্রসাদী মালা উপহার দিল দুজনকে।

সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের পাটে বড়দুঃখ মহাপ্রভু দর্শন করতে গিয়েছেন গৌসাইজি। সঙ্গে আছে শিষ্য ভক্ত। দূর থেকে তাদের দেখে পুজুরী দরজা বন্ধ করে দিল।

'আমরা দর্শন করব।'

'পাঁচ সিকে প্রণামী লাগবে।'

গৌসাইজি বললে, 'তা হলে করব না দর্শন।'

মন্দিরের আঙিনার বন্ধ দরজার সামনে গৌসাইজি সাষ্টাঙ্গ হয়ে পড়লেন।

আর, দেখ কী অপরূপ, মন্দিরের বন্ধ দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল।

গৌসাইজি সকলকে ডাকতে লাগলেন ব্যাকুল হয়ে: 'আয়, আয়, মহাপ্রভু দরজার পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন উঁকি মেরে।'

রামকৃষ্ণের ডান হাতখানা ভেঙে গিয়েছে, খুব যন্ত্রণা। একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত বললে, 'আপনি তো জীবন্মুক্ত, এই যন্ত্রণাটুকু ঘুচাতে পারছেন না?'

রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোদের সঙ্গে কথা বলে ঘুচাব? তোদের বিজয়কে আন। ওকে দেখলে আমি নিজেকে ভুলে যাই।'

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেক ব্রাহ্ম এসে বিজয়ের কাছ থেকে যোগদীক্ষা নিতে সুরু করল। ব্রাহ্মদের মনে আতঙ্ক জাগল। এ কী অনাচার। প্রকাশ্য সভায় নয়, গোপনে সাধন দেওয়া কী

ব্যাপার! তারপর রাধাকৃষ্ণ ও শ্যামা রামা নিয়ে গান? শুনি উনি দেবদেবীর মূর্তির সামনে প্রণত হন, বাড়িতে রেখেছেনও নাকি ও জাতীয় বিগ্রহ। এ সব তো ব্রাহ্মধর্ম বিরুদ্ধ। এই লোকের কাছে আবার দোষশিক্ষা কী।

ব্রাহ্মরা সমস্বরে প্রতিবাদ করে উঠল। দোষসাধন করবার ইচ্ছে হয়ে থাকে সমাজ হতে পৃথক হয়ে করুন।

বিজয়কৃষ্ণের মত ও সাধনপ্রণালী সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার জন্যে কমিটি বসল। কমিটি বিজয়কে তলব করল অভিযোগের উত্তর দিতে। বিজয় বললে, কৈফিয়ৎ চাইলে তিনি কোনোই উত্তর দেবেন না তবু যদি বন্ধুভাবে কেউ আমার বাড়ি এসে আমার সাধন ভজন সম্বন্ধে জানতে চান যথাযথ উত্তর দেব।

কমিটির সভ্যরা বিজয়ের বাড়ি এল। সবিস্তার কেনে নিল তার সাধন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য। পরে তারা রিপোর্ট করল। না, ব্রাহ্ম মতে চলতে পারে না সাধন প্রণালী। এ অনিষ্ট ব্রাহ্মধর্মের অনিষ্টকারী। এর প্রতিকার দরকার।

কেন, কী ওর বক্তব্য?

প্রথমত সাধনের কথা তার রীতিনীতির কথা কারু কাছে বলা যাবে না। দীক্ষা গোপনে হবে। কেন, যদি তাতে সত্য থাকে তা হলে তার প্রকাশ্য প্রচারে ভয় কী? যে কৃতনিশ্চয় হবে গ্রহণ করবে, যে হবে না সে করবে না। এই তো সাধুতা। ব্রাহ্ম সমাজে কোনো গুপ্ত দল তৈরী হবে এ বাঞ্ছনীয় নয়। তা হলেই ব্যাঘাত হবে ভ্রাতৃভাবের।

গোস্বামীর সাধনে কেবল ভাবুকতা। তাতে মানুষকে স্বাধীনচিন্তাশূন্য ও গুরুমুখাপেক্ষী করে তুলবে। এই মতে উচ্ছিষ্ট ভোজন আধ্যাত্মিক উন্নতির বিঘ্নকারক। উচ্ছিষ্ট ভোজন অন্য কারণে ঘৃণনীয় হোক কিন্তু তার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্বন্ধ আছে বলে আমাদের বিশ্বাস নয়। এই মতে মাছ খাওয়া চলবে কিন্তু মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ। মাছ খেলে ধর্মের হানি হবে না মাংস খেলে হবে এ এক অদ্ভুত যুক্তি। এদিকে বলছে, মানুষগুরু নেই, গুরু একমাত্র পরমেশ্বর অথচ পরোক্ষে প্রচার হচ্ছে গুরুবাদ। গোস্বামীর শিষ্যরা মনে করে গোস্বামীর সাধনই অভ্রান্ত এইই তো গুরুবাদ। গোস্বামীকে প্রণাম করলে, তার পদধূলি মাথায় নিলে, তার পায়ে মাথা দিয়ে পড়ে থাকলে আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়— এ অতি মারাত্মক কথা। তাছাড়া গোস্বামীর কাছে রাধাকৃষ্ণের ছবি। যতই তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাক ওতে বৈষ্ণব সমাজের ঘোর অনিষ্ট হয়েছে। সুতরাং তা সম্পূর্ণ বর্জন করা উচিত। আবার বলছে কিনা ভগবানকে কালী দুর্গা কৃষ্ণ বলেও ডাকা যায়। কালী-দুর্গা নামের সঙ্গে দেশ প্রচলিত পৌত্তলিকতা ওতপ্রোত ভাবে সংশ্লিষ্ট। ঐ নাম উচ্চারণ করলে সেই সব প্রতিমাকে মনে পড়ে। ব্রাহ্মরা ব্রহ্মনামের পরিবর্তে কালী দুর্গা কৃষ্ণ প্রভৃতি পৌত্তলিক নাম ব্যবহার করতে পারবে না। সুতরাং গোস্বামীমত চলতে পারে না কিছুতেই। এর প্রতিকার না হলে ব্রাহ্মধর্মের বিলক্ষণ ক্ষতি।

প্রত্যুত্তরে বিজয়ের কী বলবার আছে বলুক।

(ক্রমশঃ)

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

জনৈক আমেরিকান বন্ধুকে লিখিত

আলামেডা, ক্যালিফর্ণিয়া
১২ই এপ্রিল, ১৯০০

…মা আবার বরদা হচ্ছেন; অবস্থা অনুকূল হয়ে আসছে—তা হতেই হবে! কর্ম চিরকালই অশুভকে সঙ্গে নিয়ে আসে। আমি নিজ স্বাস্থ্য খুইয়ে সঞ্চিত অশুভরাশির পরিশোধ করেছি। এতে আমি খুশী আছি, আর এতে আমার মন হাল্কা হয়ে গেছে—আমার জীবনে এমন একটা স্নিগ্ধ কোমলতা ও প্রশান্তি এসেছে, যা ইতঃপূর্বে কখনো ছিল না। আমি এখন কিরূপে একই কালে আসক্ত ও অনাসক্ত থাকতে হয়, তাই শিখছি এবং ক্রমেই নিজের মনের উপর আমার প্রভুত্ব আসছে।

মায়ের কাজ মা-ই করছেন; সেজন্য এখন মাথা ঘামাই না। আমার মত ক্ষুদ্র কীট প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার মরছে; কিন্তু মায়ের কাজ সমভাবেই চলে যাচ্ছে। জয় মা!…মায়ের ইচ্ছাস্রোতে গা ভাসিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ভাবেই আমি আজীবন চলে এসেছি। যখনই আমি তাতে বাধা দিতে চেয়েছি, তখনই মা খেয়েছি। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।…

আমি সুখে আছি, নিজের মনের সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠেছি এবং আমার অন্তরের বৈরাগ্য আজ পূর্বাপেক্ষা অধিক সমুজ্জ্বল। নিজের আত্মীয়বর্গের প্রতি ভালবাসা প্রতিদিন হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে, আর মায়ের প্রতি আকর্ষণ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হচ্ছে। দক্ষিণেশ্বরের অশ্বত্থতলমূলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সেই যে আমরা অনিদ্রায় দীর্ঘ রাত্রি যাপন করতাম, তারই স্মৃতি পুনরায় অন্তরে জাগছে। আর কর্ম? কর্ম আবার কি? কার কর্ম? আর কার জন্যই বা কর্ম?

আমি মুক্ত। আমি মায়ের সন্তান। মা-ই সব কর্ম করেন, মায়েরই সব লীলা। আমি কেন মতলব আঁটতে যাব? আর কি মতলবই বা আঁটব? আমার পরিকল্পনার অপেক্ষা না রেখেই মা-রা যেমন অভিরুচি, তেমনি ভাবে যা-কিছু আসবার এসেছে ও চলে গেছে। মা-ই ত যন্ত্রী, আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র ছাড়া আর কি?

—বিবেকানন্দ

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

একজন লোক কোন পাহাড়ের উপর অনেক মেহনত করে একখানি ঘর করেছিল। পরে একদিন ভারি ঝড় এল। কুঁড়ে ঘর টলমল করতে লাগল। তখন ঘররক্ষার জন্য সে ভারি চিন্তিত হল। বললে, হে পবনদেব, দেখো ঘরটি ভেঙো না বাবা। পবনদেব কিন্তু শুনছেন না। ঘর মড় মড় করতে লাগল। তখন লোকটা একটা কিকির ঠাওরালে। তার মনে পড়ল যে হনুমান পবনের ছেলে। সেই মনে পড়া অমনি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, বাবা ভেঙো না, হনুমানের ঘর, দোহাই তোমার। ঘর তবু মড় মড় করে। কেবা কার কথা শুনে। অনেকবার 'হনুমানের ঘর' হনুমানের ঘর' করার পরে দেখলে যে কিছুই হল না। তখন বললে, বাবা 'রামের ঘর', 'রামের ঘর', 'দেখো বাবা ভেঙো না, দোহাই তোমার। তাতেও কিছু হল না। ঘর মড় মড় করে ভাঙতে আরম্ভ করল। তখন প্রাণে বাঁচতে হবে বলে, লোকটি ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বলছে, 'যা শালার ঘর'। তাই বলছি যা কিছু হয়েছে, জানবে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছাতেই হল আবার তাঁর ইচ্ছাতেই যাচ্ছে; তুমি কি করবে? এখন কর্তব্য যে ঈশ্বরেতে সব মন দাও—তাঁর প্রেমের সাগরে ডুব দাও।

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা—

মানুষের জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ যাতে আসতে না পারে তারই চেষ্টা করা কর্তব্য। যদি নিজেকে জরা মরণাদি হতে বিচ্ছিন্ন করা যায় তবেই এর নিরোধ সম্ভব। নির্বান অর্থাৎ বিশিষ্ট বা সম্যক জ্ঞান লাভ দ্বারা দুঃখ বিনাশ হতে পারে। ঐ নির্বান একেবারে সমাপ্ত হওয়া নয়, এ দুঃখের স্বরূপ জ্ঞানের পর অনাসক্ত অবস্থা। অবশ্য মর্কট বা মৃগের মত চিত্ত চাঞ্চল্য দেখিও না। বালকের মত হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ও উন্মত্ত হয়ো না। কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম ও শীল অর্থাৎ নৈতিক আচারই মানুষের জীবনকে উন্নীত করে। এর দ্বারাই মর্ত্যজীব শুদ্ধিলাভ করে, বংশ বা ধনের দ্বারা এ হয় না।

• • •

মানুষের সহায় হতে পার হও, কিন্তু তাদের শক্তিকে হীন করে দিও না। তাদের প্রতি জনের জীবনের বিশিষ্টতা ও ধারা যেন তোমার স্পর্শেও অক্ষুণ্ণ থাকে। অপরকে নিজের কাছে চাও তো টেনে নিও, কিন্তু বিনিময়ে যেন তাদের পরম দেবত্বটুকু ছুটিয়ে তুলো। যে তা পারে, সেই নেতা—সেই গুরু।

———

(পূর্বানুবৃত্তি)

॥ পনেরো ॥

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসো সরমা নিজেকে অনেক করে বুঝিয়ে—মনটাকে বেশ শক্ত করে। সত্যের মর্যাদা সে রাখবে। যা সত্য তা সে অকপটে বলবে প্রকাশের কাছে। স্বামীর সঙ্গে এই সর্বনাশা লুকোচুরি তার ভাল লাগছে না।

মাথার চুলে শ্যাম্পু দিয়ে স্নান করে শরীরটাও বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি আর নেই।

টেবিলের ওপর ঠাকুর ব্রেকফাস্ট খাবার রেখে গেছে। সেই খাবারের সুমুখে প্রকাশ বসেছিল তারই অপেক্ষায়। একসঙ্গে বসে খাবার লজ্জাটা তার এখনও ভাল করে কাটেনি।

প্রকাশ বললে, 'এসো। আমি তোমার খাবার আগলে বসে আছি।'

'কেন? বসে আছ কেন? খাও।'

কিন্তু সরমা না খেলে কিছুতেই খাবে না প্রকাশ।

আশ্চর্য মানুষের মন। কিছুক্ষণ আগে নাম নিয়ে একটা সন্দেহ করে যে-স্ত্রীকে সে আঘাত দিতেও কুণ্ঠিত হয়নি, এখন আবার সেই স্ত্রী না খেলে সে খেতে পর্যন্ত চাইছে না।

বাধ্য হয়ে খেতে হলো সরমাকে। খিদেও তার পেয়েছিল খুব।

খেতে খেতেই ঘুমে চোখ ভারি হয়ে আসছিল সরমার। সে কথা বুঝতে পারলে প্রকাশ। জিজ্ঞাসা করলে, 'ট্রেনে কি ঘুম হয়নি তোমার?'

সরমা বললে, 'না।'

'তাহলে তুমি এই ব্রেকফাস্ট খেয়ে ঘুমিয়ে নাও। খাবার সময় তুলে দেবো।'

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। খেয়ে দেয়ে সরমা শুয়ে পড়লো। তবেশ সম্বন্ধে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলে না প্রকাশ।

সরমা ভেবেছিল, ভবেশের কথা, অজয়ের কথা, আজ রাত্রে সে বলবে প্রকাশকে।

কিন্তু রাত্রেও তার বলা হলো না।

রাত্রে বিছানায় শুয়েই প্রকাশ বলে বসলে', 'আমাকে তুমি ক্ষমা কর সরমা।'

সর্বনাশ! এ আবার কিরকম কথা?

'ও কি কথা বলছো তুমি? আমিই তোমার কাছে ক্ষমা চাইবো, তা না—তুমিই ক্ষমা চাইছো আমার কাছে?'

প্রকাশ বললে, 'হ্যাঁ, তুমি তো আজ সারাদিন ঘুমিয়েছ পড়ে পড়ে। আর আমি কি করেছি জানো? তোমার শিয়রের কাছটিতে চুপ করে বসে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। সারাক্ষণ মনে হয়েছে—লকেটের ওপর একটা নাম দেখে অবধি কী ছেলেমানুষীই-না আমি করলাম!'

সরমা চুপ করে শুনলে সব। ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানলার পথে শুধু এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছে বিছানার ওপর। সারাদিন ঘুমিয়ে শরীরের ক্লান্তি কেটে গেছে সরমার। মাথাটা বালিশের ওপর থেকে সরিয়ে প্রকাশের বুকের কাছে এগিয়ে এলো সে। প্রকাশ হাত বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে নিলে।

যে-কথাটা বলবার জন্য সরমা আজ প্রস্তুত হয়ে ছিল, সে-কথা তার আর বলা হলো না।

সামান্য একটা নাম দেখে যে-মানুষ তাকে দ্বিচারিণী ভেবে রূঢ় আঘাত করতে কুণ্ঠিত হয়নি, কথাটা সে যদি সহ্য করতে না পারে? মনের সে উদারতা তার যদি না থাকে?

প্রকাশকে সে হারাতে পারবে না।

কিন্তু এমনি করেই কি সারাটা জীবন তাকে কাটাতে হবে? চোরের মত একটা ভয়ব্রস্ত ব্যাকুলতা তার এত আনন্দ এক মুহূর্তে বিস্বাদ করে দেবে? রাগ হলো তার বাবার ওপর। রাগ হলো তার নিজের ওপর।

তারপর কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল বুঝতে পারেনি।

প্রকাশের একখানা চিঠি এসেছিল কলকাতা থেকে। মস্ত বড় একটা কেমিক্যাল কোম্পানীর ডিরেক্টার সে। অনেক টাকার শেয়ার কেনা আছে। সেই কোম্পানীর একটা মিটিং হবে। তারা যেতে লিখেছে।

প্রকাশ বললে, 'ভালই হয়েছে, চল তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাই। কলকাতা দেখেছ কখনও?'

সরমা বললে, 'দেখেছি। বাবার সঙ্গে একবার গিয়েছিলাম।'

কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে কলকাতায় যাবার ইচ্ছা তার ছিল না। এই সেদিন সে কলকাতায় গিয়েছিল তার বাবার সঙ্গে। গিয়েছিল অজয়কে দেখতে। আজ যদি আবার সে কলকাতায় যায়, অজয়কে দেখবার সুযোগ তার হবে না। বলতেও পারবে না কোনো কথা। মুখ বুজে শুধু একটা ব্যাকুলতা আর ভয় নিয়ে কলকাতার পথে পথে ঘুরে বেড়াবে।

তা যাক্, তবু কলকাতা তো!

যেখানে তার অজয় আছে।

মায়ের মন রাজী হয়ে গেল। সরমা বললে, 'চল যাব।'

প্রকাশ তাকে কলকাতার কত গল্প বললে। বললে, কত কী দেখাবো তোমাকে। চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, বড় বড় হোটেল, বড় বড় বাড়ী, ইলেকট্রিক ট্রাম—থিয়েটার, সিনেমা—'

সরমা বলে ফেললে, 'দেখেছি।'

'আরে, তখন তুমি হয়ত খুব ছোট ছিলে। তখনকার দেখায় আর এখনকার দেখায় তফাৎ আছে।'

চুপ করে রইলো সরমা।

চুপ করে থাকা ছাড়া তার উপায়ই-বা কি!

প্রকাশ বললে, 'যাবার আগে তোমার বাবাকে একবার জানিয়ে যাওয়া ভাল। চল—আজ একবার জানিয়ে আসি তাঁকে।'

জানাতে গেল বটে জয়নারায়ণবাবুকে, কিন্তু কথাটা বলতে গিয়ে বিপদে পড়লো উমেশকে নিয়ে।

আর একটু হলে দিয়েছিল সব ফাঁস করে'!—'টকি বায়োস্কোপ কিন্তু আশ্চর্য্য জিনিস! মানুষগুলো দিব্যি কেমন হাত-পা নেড়ে কথা বলছে—ঠিক আমরা যেমন করে বলি। আমার কিন্তু আবার দেখতে ইচ্ছে করে।'

জয়নারায়ণবাবুই সামলে নিলেন প্রথমটা। বললেন, 'তুমি থাকো। এখানেও টকি বায়োস্কোপ এসেছে। টিকিট কেটে একদিন দেখে এসো।'

উমেশ কথাটাকে যেন গ্রাহ্যই করলে না। বললে, 'কলকাতায় আর কাশীতে অনেক তফাৎ। কার সঙ্গে কার তুলনা!'

প্রকাশ বসেছিল কাছেই। সরমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। উমেশকাকাকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলে ভাল হয়। কেমন করে সরানো যায় ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তার মনে পড়লো একটা কথা। কোথাও যেতে হলে—এমন-কি বাড়ী থেকে বেরুবার আগে পত্রিকাটা একবার দেখে নেওয়া তার চিরদিনের অভ্যাস। সরমা বললে, 'কালকের দিনটে ভাখো তো উমেশকাকা—তোমার পত্রিকায় কি বলছে।'

প্রকাশ কিন্তু পত্রিকার নাম শুনলে চটে যায়। মুখে কিছু বলতে পারলে না কিন্তু কটমট করে তাকালে সরমার দিকে।

সরমা বুঝতে পারলে সবই। কি দুঃখে সে যে পত্রিকার কথা বলেছে তা সেই জানে। তবু একবার প্রকাশকে চোখের ইসারায় একটুখানি শুকনো হাসি হেসে বুঝিয়ে দিতে চাইলে—কথাটা সে বলেছে শুধু উমেশকাকাকে খুশী করবার জন্যে।

প্রকাশ বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ কোথাও যেতে হলে পত্রিকা দেখে যাওয়াই ভালো।'

উমেশ পত্রিকা আনতে পাশের ঘরে গেল। সরমা যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলো।

জয়নারায়ণবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে তোমার মিটিং?'

প্রকাশ বললে, 'পরশু।'

'তাহলে একদিন আগে যাওয়া উচিত ছিল।'

প্রকাশ তাকালে সরমার দিকে। বললে, 'আপনার মেয়ের জন্যেই হলো না।'

সরমা আজকাল অতটা লজ্জা করে না। বাপের সামনেই বললে, 'যত দোষ আমার! না বাবা, বলবামাত্র আমি রাজী হয়ে গেছি।'

'তা হবি বই কি! এ তো আর আমাদের সঙ্গে যাওয়া নয়—একদিন দক্ষিণেশ্বর, একদিন কালীঘাট—'

বলতে বলতে পাঁজি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলো উমেশ।

ছুটে গিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে যদি কথাটা বন্ধ করবার হতো তো তাই করতো সরমা।

'তুমি থামো তো, দাও দেখি।' বলেই তাড়াতাড়ি পঞ্জিকাটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সরমা নিজেই দেখতে আরম্ভ করলে। ফাল্গুন—ফাল্গুন—আজ কতই ফাল্গুন?'

জয়নারায়ণবাবু বললেন, 'তেইশে।'

তেইশে ফাল্গুন সরমা আর বের করতে পারে না কিছুতেই।

'অত্যেস নেই পঞ্জিকা দেখা, তুই পারবি কেন? দে—আমাকে দে।'

পঞ্জিকাটা উমেশ আবার কেড়ে নিলে সরমার হাত থেকে।

'এই ভাখ্, আমরা গিয়েছিলাম দোসরা ফাল্গুন, আর এঁ্যা—এঁ্যা—'

এবার লাফিয়ে উঠলেন জয়নারায়ণবাবু। 'আমরা গিয়েছিলাম' কথাটা শুনেই বোধকরি তাঁর রাগ হয়ে গেল উমেশের ওপর।

'এঁ্যা—এঁ্যা কর তুমি দাঁড়িয়ে। তোমাকে দেখতে হবে না। আমি দেখে দিচ্ছি।'

বলেই উমেশের হাত থেকে পঞ্জিকাটা নিয়ে জয়নারায়ণবাবু নিজেই দেখে দিলেন। বললেন, 'ভালই আছে—চব্বিশে ফাল্গুন বুধবার ত্রয়োদশী। সর্ব্বসিদ্ধি ত্রয়োদশী। বাস্, আর কিছু দেখতে হবে না।'

পঞ্জিকাটা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'মঙ্গলের উষা বুধে পা—যাঁহা ইচ্ছা তাঁহা যা। খনার বচন বাবা, এর আর নড়চড় নেই।'

উমেশ কিন্তু কথা বলতে ছাড়লে না। বললে, 'উষা কি বলছেন আপনি? ট্রেন তো বিকেলে, যোগটা একবার দেখলে হতো না?'

জয়নারায়ণবাবু পঞ্জিকাটা হাত দিয়ে চেপে ধরে রইলেন। বললেন, 'না। শুনছো—পরশু মিটিং। কাল ওকে যেতেই হবে। এসময় আর বিকেলের যোগ-বিয়োগ দেখতে হয় না।'

কথাটা শুনে খুশী হলো প্রকাশ। বললে, 'আজ আমরা উঠি তাহ'লে।'

সরমা তখন পালাতে পারলে বাঁচে। কেউ কিছু বলবার আগেই সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো।

এবার আর হ্যারিসন রোডের হোটেল নয়। চৌরঙ্গী অঞ্চলের কেতাদুরস্ত একটা সাহেবী হোটেলের একখানা বেশ সাজানো ঘর।

যেদিন পৌঁছোলো, সেইদিনই মিটিং। প্রকাশ বললে, 'চল—তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে।'

সরমা প্রথমে রাজী হয়নি।—'এই জন্যেই তুমি বুঝি আমাকে নিয়ে এলে?'

প্রকাশ বললে, 'হ্যাঁ। এই জন্যেই নিয়ে এলাম। আমার স্ত্রীকে একবার দেখুক সবাই—আমার কিরকম সুন্দরী বৌ।'

এর ওপর আর না বলা চলে না। সরমা বললে, 'কিন্তু সেখানে ছুরি কাঁটা দিয়ে আমাকে যেন কিছু খেতে বোলো না।'

'বলবো না। কিন্তু খেতেই যদি হয় তো তুমি হাত দিয়েই খেয়ো।'

সরমা সেদিন কিন্তু সেতেছিল চমৎকার। কিছুই তাকে বলতে হয়নি। নিজেকে ভাল করে সাজাবার ব্যাপারে মেয়েদের বোধকরি একটি সহজাত প্রবণতা আছে। তার ওপর প্রকাশ যদি তার সুন্দরী বৌকে জনসমাজে দেখাতে চায় তো দেখাক্। স্বামীর সাধটাই বা সে অপূর্ণ রাখবে কেন?

খুব খুশী হয়েছিল প্রকাশ। খুশী হয়ে বলেছিল, 'এইটিই আমি চেয়েছিলাম।'

বলেছিল, 'কাল শুক্রবার। কাল আমরা সিনেমা দেখবো। পরশু দেখবো থিয়েটার।'

সিনেমা দেখেছিল—চৌরঙ্গী পাড়ার একটি ছবিঘরে বসে ইংরেজি ছবি। সাহেবী পোষাক-পরা স্বামীর পাশে বসে হাই-হিল স্লিপার পায়ে দিয়ে ঠোঁটে লিপষ্টিক্ মেখে ছবিখানি সরমা দেখেছিল খুব মন দিয়ে, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারেনি।

ছবি দেখা শেষ হলে প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন লাগলো?'

চুপ করে রইলো সরমা। জবাব দিলে না।

'ভাল লাগলো না বুঝি?'

'না।'

'ইংরেজি জানো না তাই বুঝতে পারলে না।'

সরমা বললে, 'ভাগ্যিস্ জানি না, জানলে আরও খারাপ লাগতো, কি বেহায়া মেয়ে রে বাবা!'

'কে বেহায়া?'

'ওই যে ঘাড় পর্যন্ত চুলছাটা মেয়েটা।'

'ও হিরোইন! ও কি বলছিল জানো?'

'থাক্ আর জেনে কাজ নেই।' বলেই সলজ্জ একটু হেসে সরমা বললে, 'যেখানে-সেখানে লোকজন মানামানি নেই দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে—ছি, লজ্জাও করে না!'

প্রকাশও হাসলো এইবার। বললে, 'ওদের সমাজে স্বামীস্ত্রীর ভেতর ওটা দোষের নয়। মেয়েটা একটা মিথ্যে কথা বলেছিল তার স্বামীকে। তারপর স্বামী একদিন হঠাৎ সেটা জানতে পারে। জানতে পেরে স্ত্রীর ওপর রাগ করে কথা বন্ধ করে দেয়। তাই মেয়েটা ওইরকম করে রাগ ভাঙাচ্ছিল তার স্বামীর।'

কথাটা শুনে সরমার মুখখানা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছিল তার। জানতে ইচ্ছে করছিল—কিরকম মিথ্যে কথা···স্বামীর রাগ ওতে ভাঙলো কিনা···। এই রকম সব অনেক প্রশ্ন এক মুহূর্তে মনটাকে তার তোলপাড় করে তুললো, কিন্তু কিছুই সে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। নীরবে সে তার মনের আশা বুকে চেপে গম্ভীরমুখে পথ চলতে লাগলো।

প্রকাশের মন কিন্তু আজ খুশীতে ভরে উঠেছে।

হোটেলটা বেশি দূরে নয়। সরমাকে বললে, 'চল হেঁটেই যাই। গাড়ী আর নেবো না।'

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে চললো পাশাপাশি। পথের ধারে ধারে বড় বড় দোকান। পাশেই নিউ মার্কেট।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, 'ডুববে নাকি ?'

'কোথায় ?'

'মার্কেটে।'

'কেন ?'

'তোমার কিছু দরকার থাকে তো বল—কিনে দিই।'

সরমা বললে, 'না আমার কিছু দরকার নেই।'

'শাড়ী, জামা, জুতো, স্নো, সেন্ট, সাবান—'

সরমা মুখ তুলে তাকালে প্রকাশের দিকে। ম্লান একটুখানি হাসলে। তারপর প্রকাশের হাতখানা ধরে বললে, 'না আমার অভাব কিছু নেই। কিনতে হবে না, চল।'

(ক্রমশঃ)

টাইটানিক ডুবির সময়ে বিখ্যাত সাংবাদিক উইলিয়াম্ ষ্টেড্ ক্যাপ্টেনকে বললেন : আমি লাইফবোটে যেতে চাই না,—আমার বদলে আর একজন লোককে সেখানে স্থানদান করুন।

মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়ে একথা শুনে ক্যাপ্টেন বললেন : কিন্তু আপনার মত বিশ্ব-হিতৈষীর প্রাণের মূল্য যে অনেক বেশী।

করুণ হাসিতে ক্যাপ্টেনকে অভিনন্দিত করে ষ্টেড্ বললেন : ও উপাধিটা আমাকে আর বাধতে দিচ্ছেন কৈ আপনি ?

ক্যাপ্টেন কথাটা বুঝে বললেন : তবে সরে এসে দাঁড়ান আমার পাশে। আপনার সঙ্গে মরারও গৌরব আমাকে দিন না কেন আপনি ?—কথাটা শুনল লাইফবোটের অনেকেই।

ষ্টেড্ হাসিমুখে ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়ালেন। টাইটানিক অতলান্তিকে ঢেউয়ের তলায় ধীরে ধীরে ডুবে গেল।

(উপন্যাস)

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

(পূর্বানুবৃত্তি)

স্নান করে এসে সে সকালের জলযোগ সেরে নিল। তারপর আরাম কেদারায় বসে একটা বই পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার দু'চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসতে লাগল। সে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল আরাম কেদারার ওপরেই।

সেই অবস্থাতেই সে স্বপ্ন দেখল—সুলান কার্ডোজাকে। সুলানের মুখটা যেন নেকড়ের মতো। হেঁড়ে মাথাটা থেকে মুখের ভাবটা লম্বা হয়ে বসেছে। কুঁচ কুঁচ চোখ দুটোর চাউনীতে ধূর্ততা আর হিংস্রতা দুটোই সমানভাবে মিশে আছে। তার জিভটা লকলকে হয়ে বেরিয়ে রয়েছে। বড় বড় দাঁত মেলে সে বীভৎস হাসি হাসছে এটনীর সামনে।

হাসি তো নয়, সে যেন ভেংচি কাটছে এটনীকে।

এটনীর চটকা ভেঙে গেল। সজাগ মন দিয়ে সে এবার বুঝতে পারল—সুলান আসলে একটা জানোয়ার। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল অধ্যাপক সরকারের সেই অনেকবার আওড়ান উক্তিটা। —Under the thin skin of culture the wild beast barks in readiness amply justifying his fear —কোথা থেকে এই অমর উক্তিটা অধ্যাপক সরকার পেয়েছিলেন তা এটনী জানেনা। কিন্তু যখনই অধ্যাপকের কাছে কেউ ভারতীয়দের ওপর বৃটিশের কোন অত্যাচারের কাহিনী উত্থাপন করত—তখনই তিনি এই কথাটা বলতেন। সেবার মহাত্মা গান্ধীকে যখন অনশন ধর্মঘট করার জন্যে জেলে পোরা হল—তখন তিনি এই কথাটাকেই জোর দিয়ে বলেছিলেন, বৃটিশ ভয় পেয়েছে। বৃটিশ যতই রক্ত দেখাক আসলে তার শক্তি পশুশক্তি। এই পশুটাই ভয় পেয়েছে—গান্ধীজীর মানবিকতায়। তাই সে নানা রকমে আঘাত হানছে ওঁর ওপর। সাপ যে মানুষকে কামড়ায়—তা তার খাদ্যের প্রয়োজনে নয়, আত্মরক্ষা করতে হবে সেই ভয়ে।

দুর্জয় জার্মান শক্তি যা নিয়ে সমগ্র ইউরোপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাও ছিল এই পশুশক্তি। তার প্রমাণ এটনী নিজেই পেয়েছে ইউরোপে থাকার সময়। সুলান সেই পশুশক্তির একটা ব্যষ্টি রূপ, ব্যক্তি রূপ। সে চায় ক্ষমতা প্রতিপত্তি অর্থ—সে চায় এই অঞ্চলের সমস্ত অধিবাসীর

ওপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব করতে। তা হলে বলে, কৌশলে যেমন করেই হোক, এইটাই হল পাশবিকতা। সে তার নিজের পশুত্বের সম্বন্ধে ভয় পেয়েছে। তার নিজের মানবিক চেতনা তার মনে সেই ভয়টা এনে দিয়েছে। তাই তার এতো সাবধানতা।

ভয়, ভয়।—নিজে ভয় পেয়ে লোকে অন্যকে ভয় দেখায়। এটনী নিজের দিকেও তাকায়। গত রাত্রে লিন্ডাও তাকে এই কঠোর সত্য কথাটা জানিয়ে গেছে, সে তার নিজের সম্বন্ধে ভীতা। তার ভয় পাছে তার পশুত্বটা আত্মপ্রকাশ করে ফেলে। তার নিজের কাছে নিজের ভয়। সেই ভয়টাই তার কাছেরী হয়ে আছে সমস্ত স্ত্রী-জাতি সম্বন্ধেই। আসক্তির আগুন তাকে পুড়িয়ে খাক করে ফেললেও সে জোর করে কোন স্ত্রীলোককে কখনও আঁকড়ে ধরতে পারেনি। স্নেহ ভয়ে। এটনীর সমস্ত মন এবারে মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়াল। জীবনের সমস্ত ক্ষেত্র থেকে এই ভয়টাকে যেমন করে হোক তাড়িয়ে দিতে হবে। সাধারণ মানুষের জীবনে এই ভয় চারিদিকে পুঞ্জীভূত হয়ে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে করে রেখেছে। এই ভয় তাড়িয়ে তাকে আগে পূর্ণ প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। না হলে বাঁচার আনন্দ নেই।

হঠাৎ এটনীর মনে পড়ল চিন্তাহরণ পিল্লের সেই কথাগুলো—স্বাধীনতায় আমাদের জন্মগত অধিকার। স্বাধীনতা ছাড়া আমাদের খেয়ে আনন্দ নেই, ঘুমিয়ে আনন্দ নেই, বেঁচে আনন্দ নেই। এই স্বাধীনতা অর্থ হল বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তি, রাজনৈতিক মুক্তি। এই মুক্তির জন্যই সে সচেষ্ট হয়েছে তার একটু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে। তার সেই চেতনায় ইন্ধন যুগিয়েছিল—কলকাতার মহিষাসুরের জীবন। তারপর সে চেতনায় সে দৃঢ়রূপে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল অধ্যাপক সরকারের বৃটিশ বিরোধী বা তার পরবর্তীকালে ডক্টর সিন্‌হার সংঘর্ষে। তাই সে আত্ম-সচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। জাতীয় পতাকা ঘাড়ে করে শোভাযাত্রা করেছে, বন্দেমাতরম্ চীৎকার করেছে গলা ফুলিয়ে। বিদেশে বল সড়েছে, বক্তৃতা করেছে—ভারতের স্বাধীনতার জন্যে। তার ফলে ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে গত বছর। কিন্তু তার আজ মনে হচ্ছে এসব বৃথাই। এই স্বাধীনতা স্বাধীনতাই নয়। ব্যক্তি মনের ভয় জমাট বেঁধে স্তূপীকৃত হয়ে আছে সমষ্টি মনে, রাষ্ট্র মনে। গোটা ভারতবর্ষের লোক মরে আছে এই ভয়ে—স্বাধীনতার মুক্তি কোথায়?

এটনীর গভীর যুক্তিবাদী মন আজ অধিকার করে বসল—এই ব্যক্তিগত ভয় থেকে মুক্তি—এই হল স্বাধীনতার আসল রূপ। যখন ভারতের প্রত্যেকটি লোক সেই ভয় থেকে মুক্ত হবে তখন আসবে আসল স্বাধীনতা। সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর সমস্ত চেহারাটা তার মনের সামনে এসে দাঁড়াল। সেই জীর্ণ পদ, শুষ্ক দেহ, চির পরিধানে ফকির কিন্তু মুখে কি অপার্থিব ভাস্বর জ্যোতি। সেই জীর্ণ পদের বিক্ষোভ কি অসঙ্কোচ, কি সুদৃঢ়। এই হল ভারতের আসল স্বাধীনতার প্রতীক। চির জীবন তিনি আত্মভয় জয় করবার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন। নিজে যে ভয় মুক্ত তাকে কোন রাষ্ট্রনৈতিক পরাধীনতাই বেঁধে রাখতে পারে না।

মনে পড়লো সুভাষচন্দ্রের কথা। নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যেও সেই সৌম্য মুখে সে একটা ভয়ের আঁচড় কোন দিন দেখেনি। কি দুর্জয় নির্ভীকতা ছিল তাঁর অন্তরে। বিবেকানন্দের অভীমন্ত্রের সুযোগ্য উত্তর সাধক। সাহেব ঠেঙ্গান ছিল তাঁর সেই আত্মভয় জয় করার প্রথম পাঠ। এটনীর আজ মনে হল সে যা করে এসেছে আজ পর্যন্ত তা সমস্ত বাহ্যিক, সমস্ত ভুল। জীবনটা একপেশে হয়ে গেছে।

বৃটিশের উপর তাদের প্রচণ্ড ভয় ছিল বলেই তাকে চাপা দিতে ওরকম গলায় শির ফুলিয়ে তারা চীৎকার করত বন্দেমাতরম্ বলে। এতে আসল বীরত্ব কিছু থাকত না। যদিও খবরের কাগজের রিপোর্টাররা আর দলের নেতারা তাদেরই বাহবা দিয়েছেন চিরকাল কিন্তু কেউ কোন দিন বলেনি যে আত্মরক্ষা করবার মত নাও। সে পথও তাকে কেউ কোন দিন দেখায় নি। আজ মনে হল তার লায়ন হার্টেড নামটা কেন বিদ্রূপের মতো শোনায়। সব ভুয়া। সব মিথ্যা।

বেলা সাড়ে চারটে নাগাদ সেতুরামন এসে হাজির।—স্যর সন্ধ্যাবেলা কুর্তালামে যাবার সব আয়োজন ঠিক করে ফেলেছি।

এটর্নীর মুখ দিয়ে বার হয়ে এল—তার প্রয়োজন হবে না। আমি ঠিক করেছি মেয়েটি আমার এখানেই থাকবে যতদিন না তার বাড়ীর ঠিকানা নিজের থেকে দেয়—

সেতুরামন অবাক হল।—স্যর, সেটা কি ভাল হবে? আপনি জানেন না হুসান কার্ভোজা কি ভয়ানক লোক।

অনুত্তেজিত স্বরে এটর্নী বলল—জানি। আমি ঠিক করেছি মেয়েটি যে এখানে আছে তা জোর করে লুকোবার কোন প্রয়োজন নেই। অবশ্য নিজের থেকে সহরে বলে বেড়াবার মতোও কি নেই। তবে—

—স্যর, আপনি বুঝতে পারছেন না, হুসান কার্ভোজা হল হিংস্র জানোয়ার।

—মানুষ হয়ে জানোয়ারকে গ্রাহ্য করতে হবে? একি বলছেন সেতুরামন?—এটর্নীর গলার আওয়াজ তার অজানতেই বেশ কিছুটা চড়ে গেছে।

সেতুরামনের গলার স্বর অনেক নেমে গেল। সে বললে—জানোয়ারদের থেকে তো অনেক সময় সাবধান হতে হয়। সাপের মতো ক্রূর যে লোক তার সম্বন্ধেও সাবধান হওয়া দরকার।

সেটুকু সাবধান হোন। কিন্তু তার বেশী গুরুত্ব দিতে আমরাই রাজী নই। জানোয়ার যদি আপনার চলার পথের ওপর এসে দাঁড়ায় তবে তার মুখোমুখী হয়ে তাকে তাড়িয়ে পথ করতে হবে। তারপর পালিয়ে যাবেন কেমন? আচ্ছা এখন আপনি যান। পরে দরকার হলে আপনাকে আমি ডেকে পাঠাব। অবাক সেতুরামন নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে গেল। এটর্নী ভাবতে লাগল ব্যাপারটা সে পুলিশে জানিয়ে বলবে কিনা। কিন্তু সাক্ষী কই? সাক্ষী খুঁজতে গেলে তাকে জড়াতে হয়। তাই সে পুলিশের কটকটা মন থেকে সরিয়ে দিলে, তারপর কি মনে করে ঘর ছেড়ে বার হয়ে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এই কুত্‌কুতীকে জানা দরকার ভাল করে। হাজার হলেও এ তার জন্মভূমি।

সূর্যাস্ত হয়ে গেছে একটু আগে। সহরের ভিতর থেকে দুপুরের গরম ভাপ এখনও কাটেনি। এটর্নী বহুকাল এরকম গরম আবহাওয়ায় বাস করেনি। এপ্রিলের প্রচণ্ড ভাপসা গরম মাঝে মাঝে অসহ্য বোধ হয়েছে তার কাছে। মনে মনে ঠিক করেছে এদেশে সে থাকবে না। এই বিশ্রী গরম, নোংরা অসুখ আর কদর্য মনোভাবসম্পন্ন প্রতিবেশীদের সহরে সে কিছুতেই থাকবে না। বিশেষ করে যে সহরের সঙ্গে তার পরিচয় এগারো বছরের পর থেকে খুব বেশী কিছু নয় বললেই চলে। তামিল ভাষা সে বলতে পারে এই পর্যন্তই; তার চেয়ে ভাল বলতে পারে সে বাঙলা ভাষা। ইংরাজী বলে খাঁটী ইংরেজদের মতো। ফরাসী আর জার্মান ভাষায় তার দক্ষতা কিছু কম নয়। এই কুত্‌কুতীর চেয়ে

চেয়ে বেশী আপনার জায়গা হল কলকাতা শহর। জন্মভূমি বলেই এ জায়গার ওপর তার অন্তরের সমস্ত দরদ উথলে উঠবে এমন সস্তা ভাবালুতাকে সে প্রশ্রয় দেয়নি কোনদিন নিজের মধ্যে। সে জানে সে বৃহৎ বিশ্বের অধিবাসী। স্নেহ ভালবাসায় ভরা হৃদয়বান যে কোন মানুষ তা সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেরই অধিবাসী হোক না কেন তার বন্ধু তার ভাই। তার ভাষা সে বুঝুক, বা না বুঝুক, আচরণ, আচরণকে সে আদর করুক বা না করুক তাতে কিছুই আসে যায় না। সে চিরকাল ভারতের মুক্তির জন্য স্বদেশে বিদেশে সংগ্রাম করেছে, তবু সস্তা জাতীয়তাবাদকে সে কোন দিন মনে জায়গা দেয় নি। এদিক থেকে সে বিশ্বমানবিকতার উপাসক। তাই সে লণ্ডনের মতো সর্বজগৎ সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ সহরকে তার সারাজীবনের বাসভূমি বলে ঠিক করে ফেলেছিল। কুতুবকুড়ীকে সে কলকাতার সঙ্গে তুলনা করে মনে করত একটা ছোট ডোবা। সকলের সঙ্গে তুলনা করলে এটা একটা কূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেই কূপের মধ্যে কূপমণ্ডুক হয়ে বাস করতে তার মন ছিল ঘোরতর নারাজ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তার পিতার ওপর বিরূপ মনোভাব। কুতুবকুড়ীর সঙ্গে তার আগেকার সম্পর্ক গড়ে ওঠার আগেই তার মা মারা গেলেন। জননীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহিমানাথ তাকে নিয়ে গেলেন কলকাতায়। ব্যস্ জন্মভূমির সঙ্গেও তার বাড়ীর যোগ ছিন্ন হল। কলকাতা থেকে যখন সে কুতুবকুড়ীতে ফিরত—তখন বার কয়েকমাত্র সে এই বাড়ীর স্থানটি অনুভব করেছিল। তারপর থেকে তার আর কুতুবকুড়ীতে ফিরতে ইচ্ছেই করত না। কেবল মহিমানাথ আর আমির তাড়ায় তাকে একবার করে আসতে হত। কিন্তু এখানে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মন পালাই পালাই করত।

কথাগুলো ভিতরে নাড়াচাড়া করতে করতে এন্টনী সমুদ্রের পারে এসে পড়েছে। আর, এতক্ষণ পরে একটু নিশ্বাস নেওয়া গেল। ঝিরঝির করে সন্ধ্যার বাতাস বইছে সমুদ্রের পারে। সমুদ্রের জলে ধূসর রং লেগেছে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারের। সে পোর্ট এলাকার ধার দিয়ে এগিয়ে গেল। যেতে যেতে দেখল একপাশে উলঙ্গ ছেলে জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়েছে। তীরের কাছে জলটা অত্যন্ত ঘোলা প্রায় কুলকালো বলা যায়। পোর্ট অফিসের সামনে তীরের বালির চড়ায় একের পর এক 'তোনী' তৈরী হচ্ছে। বিরাট বিরাট কাঠের নৌকো। একশ' দুশ' তিনশ' টনের। সেই এলাকাটির ছোট বড় তালপাতার অসংখ্য কুপড়ী ঘর—নৌকোর ছুতো মিস্ত্রী, লোহার মিস্ত্রী, দিনমজুরের দল এরা সব কুপড়িগুলোতে স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করে। দিনের আলো কমে এলেও এখনও কাজ চলছে এই সব জায়গায়। বিরাট বিরাট লম্বা গাছ চিরে তক্তা বার করছে তারা। কোনও কামারশালায় গনগনে আগুনের সামনে নেহাই-এর ওপর ঠং ঠং করে প্রচণ্ড আঘাত করছে। কামার লোহা কিম্বা তামার রড থেকে গজাল তৈরী করছে। একজায়গায় বড় বড় কাঠ আগুনে পুড়িয়ে বাঁকান হচ্ছে। নৌকোর পাঁচর তৈরারী হচ্ছে। সে জায়গাটার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে উগ্র আর ঘুনোর গন্ধে। এত ভারী সেখানকার বাতাস যে এন্টনীর শ্বাস নিতে কষ্ট হতে লাগল। সে দ্রুতপায়ে সে এলাকাটা ছাড়িয়ে এল, পাশের একটা নৌকো তৈরী হচ্ছে। সে ধীরে ধীরে নৌকোটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

তার মনে একটা অদ্ভুত ভাব খেলা করছিল। আচ্ছা এই যে আমরা স্বাধীনতা পেলাম, তার কতটুকু চেতনা এসেছে এই সব সাধারণ মেহনতী মানুষগুলোর অন্তরে? ভিতরে ভিতরে এ প্রশ্নের জবাব পাবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা তাকে পেয়ে বসেছিল। সে ভাবছিল এদের সঙ্গে একটু আলাপ করবে কিনা এ সম্বন্ধে?

সেই ঘরে একটা জায়গায় কাঠ চেরা হচ্ছিল। একটা প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া খাদ কাটা হচ্ছে। তারই ওপরে দুজন আর নীচে দুজন দাঁড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়ির ভিতর দিয়ে লম্বা করাতটা চালিয়ে যাচ্ছে। ওপরের দুজন ঠেলে দিচ্ছে, নীচের দুজন টেনে নিচ্ছে। আবার নীচের দুজন ঠেলছে, ওপরের দুজন টানছে। লোকগুলোর শরীরের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে মেহেনতের চাপে। তার শরীর শুধু মাত্র কৌপীনে ঢাকা। এটনী তাকিয়ে দেখতে লাগল যে মানুষটা কাজ করছে, তার শরীরে একটা টানা ছাড়া আর কাপড় নেই কোথাও। ছুতোর, কামার, নৌকোর মজুরগুলো সবার একই দশা। ঘিশ্‌কালো শরীরগুলো রোদে পুড়ে কাশা হয়ে উঠেছে। টস্ টস্ করে ঘাম ঝরছে প্রত্যেকের গা বেয়ে, কপাল বেয়ে। হিস্ হিস্ করে একটা শব্দ উঠছে চেরা কাঠের ভিতর থেকে। ঝুর ঝুর করে কাঠের গুঁড়ো তলায় পড়ছে। তারা চারজনেই মুখেও একটা শব্দ তুলছে হিস্ হিস্ করে। তাদের পাশে গোটা চারেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নারকেলের দড়ি পাকিয়ে সেটা কাছি বানাচ্ছে। তারা কাছির চেড়ায় পাক মারতে মারতে একঘেয়ে সুরে একটা গান গেয়ে যাচ্ছে। গানটা অত্যন্ত অশ্রাব্য অশ্লীল গান। কিন্তু এসব লোকেদের কোন বিকৃতি নেই, বরঞ্চ গানের তালে তালে যে হেঁচ্‌কা জোর পড়ছে তাতেই কাছির পাক জমছে ভাল। কাছে পিঠে অনেকগুলো স্ত্রীলোক নানা কাজে ঘোরাফেরা করছে। তাদের সেই উলঙ্গ মূর্তিগুলোর সম্বন্ধে বা অশ্লীল গানের জন্য এতটুকু লজ্জা নেই বা উৎসুক্যও নেই। ঝুপড়িগুলোর ভিতরে বাইরে একপাল করে ছেলে মেয়ে। সবাই উলঙ্গ। মেয়েগুলোর শরীরে এতটুকু শ্রী নেই, মায়া নেই। এটনী তাকিয়ে তাকিয়ে এই অদ্ভুত দেশের অদ্ভুত জীবগুলিকে দেখতে লাগল। একটা জায়গায় গোটা কতক ছোট ছোট ছেলে-মেয়েতে মিলে একটা কালিপড়া মাটির হাঁড়ি থেকে খাবলা খাবলা করে পান্তাভাত বার করে মুখে পুরছিল গোগ্রাসে। একটা মেয়ে দেখতে পেয়ে কর্কশ ভাষায় তাদের গাল দিতে দিতে ছুটে গিয়ে দুহাতে দুদ্দাড় করে কিল চড় মারতে লাগল ছেলেমেয়েগুলোকে এলোপাতাড়ি। তাদের মধ্যে যারা একটু বয়সে বড় তারা পালিয়ে গেল ছুটে। যাদের বয়স কম তারা চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। কিন্তু তাদের কান্নায় এই বিরাট কর্মকাণ্ডের এতটুকু ব্যাঘাত কোথাও হল না। কাজ যেমন চলবার তেমনি চলতে লাগল।

আকাশের আলো প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। সমুদ্রের জলে নিকষ কালো রং লাগল। চারদিক অন্ধকারে ঢেকে যেতে লাগল। কেবল কামারশালার হাপরের চাপে আগুনের শিখাগুলো এক একবার দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠছে দেখা গেল। তারেরই আলো এসে জায়গাটাতে আবছা ভাবে পড়ল। এটনী তবু সে জায়গা ছাড়লে না। সে একটা চেরা কাঠের গুঁড়ির ওপর বসে বসে দেখতে লাগল। যে লোকগুলো কাঠ চিরছিল তাদের কাজ বন্ধ করতে হল। অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। তারা আধচেরা কাঠগুলো সেইভাবে রেখে দিয়ে ওপরে উঠে এলো। হাত দিয়ে কপালের ঘাম নিঙড়ে ফেলে দিয়ে এটনী যে গুঁড়িটার ওপর বসেছিল তার তলা থেকে কয়েকটা আধপোড়া চুরুট আর দেশলাই বার করল। তারা এটনীকে দেখে অবাকও হল না—কৌতূহলীও হল না। এবারে তারা সবাই চুরুট ধরিয়ে এটনীর কাছ থেকে একটু দূরে জায়গা করে বসে পড়ল। তারপর চুরুট টানতে টানতে কথা বলতে লাগল।

একজন বললে—জীবনে বহু কাঠ চিরেছি বাবা, কিন্তু এমন কাঠ কখনো দেখিনি। হাজার জোর লাগাও করাতের দাঁত যেন বসতেই চায় না।

অপরজন ঠাট্টা করে বললে—করাতটা তোর মতোই বুড়ো কিনা, তারও দাঁত পড়ে গেছে।

প্রথম জন বললে—যাকে বকিস্‌নি, ও করাতের দাঁতে যা যায় তাতে তোকে আস্ত চিরে ফেলতে পারে।

দ্বিতীয় জন বললে—আমাকে চিরে কোন লাভ হবে কার? মালিকের ওপর নাড়ায়ের পোর এ নয়।

অপর দু'জন বসে বসে এতোক্ষণ ইঞ্জিনের মতো ধোঁয়া ছাড়ছিল। তাদের একজন বললে—আসলে নাড়ায়ের পো' জেলে বাবুদের বেবড়ক ঠকাচ্ছে। বাবুদের বরাই পয়সা থাক মাথাগুলো দেখেছিস?—সবকটার হেঁড়ে। হেঁড়ে মাথায় লাই থাকে অল্প। আর ওদারে ভাগ পানাদের সন্তান। কেমন পারোয়ারদের রক্ত শুষে খেতে আরম্ভ করেছে। তাদের পয়সা দিয়েই ব্যবসা করে তারা এখন লাখপতি, কোটিপতি হয়ে বসেছে তুম্বুকুড়িতে।

চতুর্থ জন চুরুট টানা শেষ করে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খানিকটা থুথু ফেললে বালির ওপর। তারপর পাছার পাশটা দারুণভাবে চুলকোতে চুলকোতে বললে—পারোয়া বাবুরা যে ডাঁটের চোটেই গেল। বড়লোকী ডাঁট এখন যে নিজেরা কাজ দেখবে তাদের মান হানি হয়। এই এত বড় নৌকোটা তৈরি হচ্ছে তার হাড়হদ্দ কাজকর্মের কোন খবরটা মালিক রাখে শুনি? টিণ্ডেলকে কাজ বুঝে দিয়ে খালাস। শালা কুত্তার বাচ্চা টিণ্ডেল, আমাদের এক পয়সার জায়গায় দু'পয়সা দিতে তার পাঁজরা খসে যায়। কতো টাকা সে ভাগ পায় আনিস কাঠের দোকান থেকে? বাবুদের নামে কাঠ আসে উঠনোতে। নগদ কারবার সেখানে নেই। এতেই নাকি বড় লোকী ধোলে বাবুদের। সেই কাঠের দেনার ওপর চাপে সুদ—নাড়ায়রা ছেড়ে কথা কয় না। তারপর টিণ্ডেলের সঙ্গে বখরা থাকায়—যে কাঠ দেয়—তাদের লাভ পুরুষে কখনো আইনিও নয়, পুরসিও নয়, বেটিকও নয়। মাল তো মাল সব দিক দিয়ে যায়। এর ওপর আবার আছে নাড়ায়দের ছেলেদের স্কুল তৈরীর জন্য চাঁদার টাকা। তাও ধরা হয় ঐ কাঠের দামের সঙ্গে। ব্যাপারটা বোঝ।

দ্বিতীয় জন বললে—তুই কি করে জানলি? আইনি-পুরসি না হলে নৌকোর জন্য কাঠ জোগাই চলে না। অন্য কাঠ দিলে পরে টিণ্ডেলকে মাল দরিয়ার ম্যাও ধরতে হবে না? তখন তো আর মালিক এসে বাঁচাবে না?

প্রথম জন এতক্ষণ চুপ করেছিল—তৃতীয় জনকে ডেকে বললে—সুন্দরম্ তুই ঠিকই বলেছিস।

সুন্দরম্ নাম শুনে একটী বুড়ো এরা বর্মে হিন্দু, জাতে ছুতোর। প্রথম জনের কথাগুলো সে মন দিয়ে শুনতে লাগল—আইনি আর পুরসির মতো হুবহু একই রকমের গাছ সংকটার জঙ্গলে আছে অন্ততঃ আরও দশ রকমের। একটার বদলে আর একটা চালান কিছু শক্ত নয়। কাঠের ব্যাপারিরাই জানে কোন কাঠের কতো জান। সেই হিসেবে তার দাম। আবার একই জাতের কাঠের মধ্যে জানের তফাৎ হয় আকাশ পাতাল। কাঠ চিরতে চিরতে বুড়ো হয়ে গেলুম আমি। কোন কাঠের কি জান তা আমার জানতে বাকি নেই। নৌকোর জন্যে সেই কাঠ সবচেয়ে মজবুত, যা খুব শক্তও নয় খুব নরমও নয়। নরম কাঠ কাঁচা কাঠ। আর খুব শক্ত হলে বুঝতে হবে কাঠ বেশী শুকিয়েছে। শুকনো কাঠ করাতের দাঁতে জড়িয়ে যায়। আসলে রোদে জলে যে কাঠ পাকে গোড় ধরে সেই পাকা গোড় থেকো কাঠই সবচেয়ে ভাল। তা কৈ এতো কাঠ তো তেমন কাঠ চোখে পড়ল না। সংকটার জঙ্গলটা

তো আর মরুভূমি হয়ে যায়নি? কাঠগুলো গেল কোথায়? আর তা ছাড়া নাড়ারয়া এই পরোয়াদের হাড়ে হাড়ে চিনেছে। ওদের এই ভুয়ো বড়লোকী ভাঁট ওরা ধরে ফেলেছে। যার বাজারে যত বেশী দেনা, সে নাকি তত বড়লোক। দেনা যদি না থাকল তো বড়লোক কিসের?· নাড়ার ব্যবসাদাররা সেই দেনা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদে আসলে শুধে নিচ্ছে। তারাও তো ভাগাড়ের শকুনি।

দ্বিতীয় জন বললে—তা বলে মালিক নিজে থেকে তো আর তোমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে অষ্টপ্রহর কাজ করাতে আসবে না। তার সভিমানের একটা মান আছে তো?

প্রথম জন বললে—নিজের কাজ নিজে দেখে তুলব এতে আবার অপমানটা কি হল? এই তুতুকুড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড়লোক ছিল গডউইন কার্নাণ্ডো। তাকে দেখেছি নৌকো তৈরীর সময় নিজে হাতে কাঠ বইতে। যে ভারী কাঠটা দশটা জোয়ানে কপিকলে তুলতে পারত না। গডউইন একটা হেঁচকা টানে সেটাকে তুলে দিত নৌকোর ওপর। কৈ তাতে মান অপমান ছিল না তো? একটা পয়সা দেনা রাখত না গডউইন কোন নাড়ারের দোকানের। বেশীর ভাগ কাঠ আনত সংকটা থেকে দেখে শুনে। যদি দরকার পড়ত যেত নাহারাদের কাছে। নৌকোর পাঁজরার জন্য নিমকাঠ নিজে বনে জঙ্গলে আর গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে জোগাড় করত। সব কারিগর ওর, কি কাজের লোকই ছিল! তাই পয়সাও করে গেছে অঢ়েল। এখন তার ছেলে শুনছি ওয়ারিশ হবে তার সম্পত্তির। বিলেত ফেরৎ ছেলে সে কি আর এসব বুঝবে?

তার বাবার নাম শুনে এন্টনী উৎকর্ণ হল। স্বর্গগত বাবার কর্মশক্তির প্রশংসা শুনে সে মনে মনে খুশী হল বেশ খানিকটা। সে এই আলোচনায় প্রায় যোগ দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় দ্বিতীয় জন বলে উঠল—তা যদি বলিস তো আমি জিজ্ঞাসা করব—গডউইনের বংশ পরিচয়টা কি? বোরেরা, কোরেয়া, ভিক্টোরিয়া, মাচাডো, কার্ভোজা এদের সঙ্গে গডউইনের বংশমর্যাদার তুলনা করিসনি। গডউইনের পয়সাই হয়েছিল, না হলে আসলে সে তো রাস্তার লোক। আমার বাবার কাছে শুনেছি।

তৃতীয় জন একটু রোকা লোক, বললে—রেখে দে তোর বংশ, রেখে দে তোর মান। কার কতো মান আমার তা জানতে বাকি নেই। বাড়ীর বৌঝিরা যাদের নৌকোর মাঝি মাল্লা নিয়ে রাত কাটায়, তাদের আবার বংশমর্যাদা, তাদের আবার মান।

দ্বিতীয় জন কাঁক করে উঠল—যা যাঃ বাজে কথা। আমি বিশ্বেস করি না। তাদের মেয়েদের আর ধরবার লোক নেই, নৌকোর মাঝি মাল্লা—

তৃতীয় জন রুখে উঠল · যা জানিস না, তা নিয়ে তর্ক করিসনি। যদি ইচ্ছে হয় গিয়ে দেখে আসিস রাত দুপুরে মাইকেল কার্ভোজার বৌএর শোবার ঘরের পেছনের দিক দিয়ে দড়ির সিঁড়ি ঝোলে কিনা। নৌকোর মাল্লাদের অনেকেই সেই সিঁড়ি তৈরী করেছে। টাকাও রোজকার করেছে। তুই যদি—

প্রথম জন এবার লাফিয়ে উঠে, তৃতীয় জনের মুখ চেপে ধরল—স্ স্ স্—এ্যাই বুদ্—চুটাল চুপ কর। একথা বাইরে গেলে তোর জান নিয়ে টানাটানি হবে।

এবার সবার দৃষ্টি পড়ল এন্টনীর ওপর। কিন্তু এন্টনী ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চলতে আরম্ভ করেছে। সেদিকে তাকিয়ে প্রথম জন বললে—শালা এবার তুই মলি। ঐ হুসান কার্ভোজার টিকটিকি সব শুনে গেল। আমি বাবা এর মধ্যে নেই।

—বলে সে একটা ঝুপড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি মাথা উঁচু করে চেঁচিয়ে বললে—জানের ভয় আমাকে দেখাসনে। ওতে আমি পরোয়া করিনা।

সমুদ্রের ধার থেকে বাড়ী অবধি এই পথটুকু আসতে আসতে এটর্নীর মনে হচ্ছিল সে যেন পচাপাঁক খোলা একটা ডোবার পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। লিন্‌ডার সম্বন্ধে সে নিজের কানে যা শুনল—তাতে তার গা ঘিন ঘিন করছিল। রাতে নৌকোর মাঝি মাল্লাদের নিয়ে রাত কাটায় লিন্‌ডা! ছিঃ ছিঃ একটা পথ্যা নারীরও অধম সে।

সন্ধ্যার পর বীচ্ রোড নির্জন হয়ে যায়। গ্রেট কটন ষ্ট্রীটও সন্তর্ব হাই ষ্ট্রীট জনশূন্য হয়ে খাঁ খাঁ করতে থাকে আবছা অন্ধকারে। এখন সেদিকে দেখলে কে বলবে যে দুপুরে এখানে কা'রে কা'রে লোক জমা হয়ে কি নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়। শুধু মাত্র এধারে ওধারে দু' একটা ককির দোকান খোলা আছে। আমাদের ককির দোকান। একটা দোকানের ভিতর থেকে এক ঝলক আলো এসে পড়েছিল রাস্তার ওপর। তাতে সে দেখল সেই অদ্ভুত পাগলটা ককির দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দোকানের ভিতরে তীড় আদবে নেই বললেই চলে। ভেতরে আর্ধেকটা ওটিয়ে দোকানের কর্মচারীরা ভাঙা চেয়ারের ওপর নিজেরা বসেই আরাম করছে। পাগলটা বোধহয় কিছু খাবার জন্যে ওখানে ওতাবে দাঁড়িয়ে আছে। এটর্নী দোকানের সামনে আসতেই পাগলটা তাকে দেখতে পেয়েছে। সে সঙ্গে সঙ্গে আকাশে হাত ছুড়তে আরম্ভ করেছে—কতো চাই পাঁচশাথ—এই নেঃ, দশশাথ—এই নেঃ। দোকানের একটা কর্মচারী কিছু ককি বড়া তার দিকে এগিয়ে দিলে। একটা মাটীর কটরায় কিছু ককি দিলে। এই পাগলা, এই নেঃ।

পাগলটা পাঁচশাথ—দশশাথের খেলা বন্ধ করে খাবারগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিশ্চয় তার খিদেটা প্রচণ্ড।—আহা বেচারী! ভাবল এটর্নী মনে মনে। সে দোকানের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দোকানীকে ডেকে বললে—পাগলটিকে তুমি পেট খেতে দাও। আমি পয়সা দেব।

দোকানীতো অবাক! পাগলকে খাওয়াবার জন্যে কেউ তার দম খরচ করে নাকি? দোকানী বললে—পাগলের খোরাক প্রচুর। এতটুকুতে কিছু হবে না। ও বিশ খানা মশলা দোসা, একডজন বড়া খেয়ে ফেলতে পারে এক্ষুনি।

এটর্নী বললে—তা হোক, তুমি দাও।

দোকানী পাতাপাতায় চারটে দোসা এনে পাগলটির সামনে রাখল। বললে, সুরু কর, আরও আনছি।

কিন্তু আশ্চর্য! পাগলটা সে খাবারের দিকে তাকিয়েও দেখল না। ভাঁড়ের ককিটা শেষ করে, ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাতালকে উদ্দেশ্য করে বললে—এই নেঃ পঞ্চাশ শাথ। যাঃ হারামজাদারা আমায় বিরক্ত করিসনি।—কিন্তু এটর্নীর দেওয়া খাবারটা সে একবার ছুঁলও না। অন্যদিকে মুখ বাড়িয়ে খালি বলতে লাগল—যা, যা, ভাগ এখান থেকে।

দোকানী বললে—অদ্ভুত ব্যাপার স্যর, এরকম কখনও তো হয় না। কেউ কিছু দিলে ও নিয়ে খায়। কিন্তু আপনার দেওয়া খাবার ও কিছুতেই খাচ্ছে না।

এটর্নী সেখানে প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট অপেক্ষা করেও পাগলটিকে খাওয়াতে পারল না।

শেষে সে বাড়ীর রাস্তা ধরল। একটু গিয়েই তার বাড়ীর গলি। গলির সামনে গ্যাসের আলোটা কিন্তু আজ জ্বলেনি। গলির মুখটা অন্ধকার। ঢুকতে গিয়েই একটা লোক প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল তার ওপর। লোকটা দৌড়ে পালাচ্ছিল। গলির ভিতরে থেকে সঙ্গে সঙ্গে আওয়াজ এল চোর-চোর।

এটর্নী লোকটাকে ধরে ফেললে। তার বাজের মতো থাবার মধ্যে পড়ে লোকটা বার দুয়েক ব্যর্থ চেষ্টা করল ছাড়িয়ে পালাবার। কিন্তু তার চেষ্টা বৃথা। তাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে এটর্নী তার বাড়ীর কাছে নিয়ে এসেছে। একুনি তার মারোয়া দারোয়ানটা দৌড়ে এল। সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। এটর্নীকে দেখেই বলে উঠল—আইয়া একুনি আমাদের বাড়ীতে একটা চোর ঢুকে ছিল আমার তাড়া খেয়ে—

এটর্নীর ধরা লোকটার দিকে চোখ পড়তেই তার কাজ বন্ধ হয়ে গেল।—আরে আরে এ কে?

এটর্নী বললে—এই লোকটাই দৌড়ে পালাচ্ছিল। একে নিয়ে এস ভিতরে। মারিয়া দাসনকে ডেকে নিয়ে এসো।

দারোয়ান লোকটিকে ধরে ভিতরের হলঘরটির মধ্যে নিয়ে এল। লোকটা দু'হাতে মুখ ঢেকে মেঝেতে বসে পড়ল। এটর্নী মারিয়া দাসনকে ডাক দিল। পাশেই মারিয়া দাসনের ছোট ঘর। এটর্নীর ডাক শুনে সে বার হয়ে এল। এই সময়টি তার নেশার সময়। কেউ ডাকলে সে বড় বিরক্ত হয়।

মুখ কুঁচকে সে বার হয়ে এসে দাঁড়াল। এটর্নী বললে—এই লোকটাকে চেন? দেখতো।

মারিয়া দাসন লোকটির হাত দুটো সরিয়ে দিলে জোর করে। তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল—হায় মা-মেরী, এযে আমাদের ম্যাসুয়েল সাজাডো। সুসান কার্ভোজা অফিসের বিল ক্লার্ক। তুমি এখানে কি করতে এসেছিলে?

মারোয়া দারোয়ানটি বললে—আমি ঘরের ভিতর ছিলুম। বার হয়ে এসে দেখি আবছা অন্ধকারে ঐ লোকটি ওপরের ঘরের দিকে চেয়ে কি যেন দেখছে। লোকটির ওপর আগেও সন্দেহ হওয়ায় আমি লুকিয়ে ওকে দেখতে থাকি. ও আস্তে আস্তে বাড়ীর ভিতর ঢোকবার চেষ্টা করতেই আমি ওকে তাড়া করেছি। লোকটা ছিটকে পড়েই গলির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। ওর যদি চুরির মতলব না থাকবে তবে ও বাড়ীর মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করবে কেন?

মারিয়া দাসন নাছবার সুরে বললে—না, না ও চুরি করতে আসবে কেন? ও বোধ হয় অন্য কোন কাজে এসেছে। ছেড়ে দিন ওকে ছিয়া আইয়া।

সুসান কার্ভোজার বিল ক্লার্ক। এটর্নীর মনে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো একটা চিন্তা খেলে গেল। গত কাল মেয়েটা হাত ছাড়া হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুসান চারদিকে চর পাঠিয়েছে সন্ধান করতে। কিন্তু সে জানল কেমন করে যে মেয়েটি তার জিম্মায় তার বাড়ীতে আছে?

একটা প্রচণ্ড সন্দেহ তার মনকে নাড়া দিতে লাগল। কে এই ব্যক্তি যে আমার বাড়ীর খবর বাইরে চালান করে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল সকালে দেখা সেই চোখ দুটো। উঠোনের ওপর দিকের বাড়ীটির একটা জানালার ভিতর দিয়ে সেই চোখ দুটি তাকে লক্ষ্য করেছে। সে হয়তো দেখেছে এই বাড়ীতে মেয়েটিকে। কিন্তু সে কে? তার সঙ্গে সুসান কার্ভোজার সম্পর্ক কি?

মনে পড়তে লাগল কিছু দিন আগে মারিয়া দাসনের কথাগুলো—আমাদের বাড়ীর মধ্যেই শত্রু আছে। যারা আইয়ার পয়সায় খায়, আইয়ার চালায় মাথা গুঁজে থাকে তারাই তার শত্রুতা করেছে এখনও করছে। কিন্তু ঐ মেয়েছেলেটি কে? তার সঙ্গে সুসান কার্ভোজার সম্পর্ক কি?

যাই হোক, সেকথা পরে ভাবা যাবে। আপাততঃ এই বজ্জাতটিকে পুলিশে পাঠাতে হবে। মারোয়া দারোয়ানটা তাকে আচ্ছাকরে মারবার জন্য তৈরী হচ্ছিল। এটর্নী বাধা দিলে সে তখুনি

সেতুরামনকে ডেকে পাঠাল। সেতুরামন এসে লোকটির অভিসন্ধি খারাপ বলে তাকে থানায় পাঠাতে হুকুম দিয়ে সে ওপরে উঠে গেল।

এন্টনী ওপরে উঠে আসতেই মারিয়া দাসন তার পিছনে পিছনে ওপরে উঠে এল।

—কি মারিয়া দাসন কাদারকে চিঠি দিয়ে এলে? —জিজ্ঞাসা করল এন্টনী ধীর শান্ত স্বরে।

—হ্যাঁ আইয়া—জবাব দিল মারিয়া দাসন ভাঙ্গী গলায়। বেশ বোঝা গেল তার গলায় আওয়াজ সুরাসিক্ত।—তাছাড়া কাদার আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না। তাই দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেলের বাসে ফিরলাম। ফিরতে ফিরতেই সন্ধ্যে হল। কাদার কিন্তু আপনাকে এই সপ্তাহ মধ্যে একদিন যেতে বলেছেন বিশেষ করে। তাঁর কি জরুরী কথা আছে আপনার সঙ্গে। আপনি যদি না যেতে পারতেন, তাহলে খবর পাঠালে তিনি নিজেই আসবেন।

—এত জরুরী ব্যাপার! কিছু বলেছেন, কিসের জন্যে? শুধাল এন্টনী।

—না, আমাকে কিছু বলেন নি। জবাব দিল মারিয়া দাসন।

—আচ্ছা, রান্নাঘরের বাটলারকে একবার আমার কাছে আসতে বলে তুমি নিজের ঘরে যাও।

—আচ্ছা।—মারিয়া দাসন আস্তে আস্তে নীচে নেমে গেল।

এন্টনী তার ঘর ছেড়ে বারান্দায় বার হয়ে এল। উঁকি দিয়ে দেখল তার মায়ের ঘরের দিকে। কিন্তু সে ঘরে আলো জ্বলছে না। ঘর অন্ধকার। একবার ভাবল গিয়ে দেখে আসবে। আবার ভাবল মেয়েটি যদি কিছু মনে করে। মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়? বাড়ীতে স্ত্রীলোক কেউ নেই যে ওর দেখা শোনা করতে পারে। শুধুমাত্র পুরুষই যে বাড়ীর বাসিন্দা সেখানে বয়স্কা স্ত্রীলোক থাকলে অসুবিধা অনেক। যাই হোক আসছে কাল একটা কিছু করতেই হবে এ সম্বন্ধে। সেতুরামনের সঙ্গে পরামর্শ করবে সে। কিন্তু আজ রাতে কি হবে?

সে পায়ে পায়ে তার মায়ের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। চাঁদের আলো খানিকটা হাল্কা ভাবে এসে পড়েছে বারান্দার ওপর। তারই আলোয় দেখল মেয়েটি বিছানার ওপর শুয়ে আছে। ওর কি অসুবিধা হচ্ছে, বা কিসে ওর সুবিধা হয় এ আমার জানা দরকার, খোঁজ নেওয়া উচিত। ভাবল এন্টনী মনে মনে। মন থেকে সব দ্বিধা সরিয়ে দিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে আলো জ্বালিয়ে দিল। মেয়েটি ধড় মড় করে বিছানায় উঠে বসল। তার এরাশ রুক্ষ চুল মুখে কপালে ছড়িয়ে পড়ল। মেয়েটির সারা মুখটা কান্নায় কান্নায় ফুলে উঠেছে। চোখের ওপর কোলা কোলা ভাব। তার ঘরের মধ্যে টেবিলের ওপর একরাশ নতুন কাপড় জামা সাজা করে রাখা আছে। কিন্তু সেগুলোকে ছোঁয়নি পর্যন্ত। সেতুরামন সেগুলো কিনে পাঠিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

এন্টনী তার সম্মুখে একটা চেয়ার টেনে এনে বসে পড়ল। জিজ্ঞাসা করল—আপনার শরীর কি অসুস্থ লাগছে এখনও?

মেয়েটি মৃদুভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিল, না।

—কাপড় জামাগুলো দেখেছেন? আপনার পছন্দ সই তো?—এন্টনী উৎসুক হল। মেয়েটি কোন কথাই বলল না। এন্টনী দেখল মেয়েটি কথা বলবে না। তাই সে ঠিক করল তার মনে ভরসা দিতে হলে এন্টনীকে নিজেই কথা বলে যেতে হবে। সে বলল—আমি এই বাড়ীতে একলা থাকি। এখানে অন্য কোন স্ত্রীলোক নেই। কিন্তু তার জন্যে আপনি কিছু ভয় করবেন না।

দ্বিধা বা সংকোচ করবেন না। যতদিন ইচ্ছে আপনি আমার এখানে থাকুন। তারপর যেদিন আপনি আপনার বাড়ীর ঠিকানা আমাকে বলবেন আমি নিজে গাড়ীকরে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব। আপনার কি কি দরকার আমাকে জানাবেন। যদি দরকার হয় তো একটা ঝি-এর ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু আপনি আমাকে লজ্জা করবেন না। আমাকে আপনার আত্মীয় বলেই মনে করবেন। বন্ধু কথাটা তার ঠোঁটের ডগায় এসেও ফিরে গেল। বিলেত হলে নিশ্চয় বন্ধু বলতে বাধত না। ভারতীয় প্রথায় বন্ধুর স্থান বড় একটা কিছু নয়। বিশেষ করে অপরিচিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে।

মেয়েটি ক্যাল ক্যাল করে তার দিকে চেয়েছিল তখন এন্টনী এসব কথা বলছিল। এন্টনী চুপ করতেই মেয়েটি দুহাতে মুখ ঢেকে—হু-হু করে আবার কেঁদে ফেলল। তার কান্না দেখে এন্টনীর নরম মন গভীর ব্যথায় মুচড়ে উঠতে লাগল। সারাদিন ধরে আজ তার মনের মধ্যে যে সব তোলপাড় হচ্ছিল তারই আবাবেগের ধাক্কায় তার মন এমনিতে হয়ে উঠেছিল অনেক নরম। কাজেই মেয়েটির চোখের জল তাকে যাকন ভাবে বিচলিত করতে সুরু করল। এমনিতেই সে কোন স্ত্রীলোকের চোখের জল দেখতে বা সহ্য করতে পারেনা। মেয়েটির বিছানার পাশে বসে তার মাথায় সুমতীর স্নেহের সঙ্গে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—তোমার কোন ভাবনা নেই, তোমার কোন ভয় নেই। কাল তুমি কোথা থেকে এসেছ। তোমাকে আমি আজই তোমার বাড়ীতে রেখে আসব।

তার মাথায় হাত রাখতেই মেয়েটি কুঁকড়ে সরে বসল জড়ো সড়ো হয়ে।

এন্টনী বললে—এই বাড়ীতে আমার মা মারা যাবার পর আর কোন স্ত্রীলোক আসেনি। আমার মা মারা যান যখন আমার বয়স এগারো। তুমি আমার ছোট বোন হয়ে এবাড়ীতে থাকবে। তাইকে কোন বোন লজ্জা করে না। তুমিও আমায় লজ্জা কোরোনা লক্ষ্মীটি। —তুমি উঠে তোমার ছেঁড়া কাপড় ছেড়ে একটা ভাল কাপড় পর। ছেঁড়া জামা ছেড়ে একটা ভাল জামা পর। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে নিয়ে যাব খাবার ঘরে।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল এন্টনী। ঘর ছেড়ে যাবার সময় বললে—আজ রাতে সেখানে আমরা একসঙ্গে খাব।

তার স্নেহ সম্ভাষণে মেয়েটি অনেকটি সান্ত্বনা পেয়েছে। তার কান্নাও বন্ধ হয়েছে। কিন্তু তার মুখে কোন কথা ফোটেনি তখনও।

বসবার ঘরে গিয়ে বলতেই বাটলার এসে হাজির। এন্টনী তাকে আজ রান্নার সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগল—কি কি রান্না করেছ? ভাল মাছ কিছু যোগাড় করেছ?

বাটলার বলল—পিলা ভেজেছি আইয়া।

—বেশ করেছ। তৃপ্তির সঙ্গে বললে এন্টনী। মাংসের কি রান্না করেছ?

—আপনার জন্যে শুধু রোষ্ট যেমন হয় মশলা ছাড়া।

এন্টনীর মুখটি অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। শুতো আমার জন্যে। এখানকার লোক কি বিনা মশলায় রান্না খেতে পারে।

বাটলার অবাক হয়ে গেছে ততক্ষণ। এন্টনী এখানে আসা পর্যন্ত কোন দিনই তার খাবারের

সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। শুধু প্রথম প্রথম কয়েকদিন মারিয়া দাসনকে বলেছিল তার বেশী মশলা দেওয়া রান্না খেতে অসুবিধে হয়। মারিয়া দাসন তখুনি একটী ইংরেজী রাঁধুনীকে বাটলারকে ডেকে এনেছিল। সেই রান্না করত এষ্টনীর জন্যে। বাড়ীতে অন্য লোকের জন্য রান্না করত একজন স্কটল্যাণ্ডীয়া প্রৌঢ়া। তার নাম ম্যাকডাগেল। মোটা-সোটা হাবা-গোবা ভালো মানুষ গোছের স্ত্রীলোক। খাটতে পারে অসাধারণ। বুড়ী ঝি মরে যাওয়া থেকে সে এই কর্ম করছে। তাকে দেখলেই মনে হত যেন সে জীবনে বহুকাল থেকে বিরক্ত ধরে গেছে। তাই তার রান্নাও ছিল যেমন তেমন। এষ্টনী তাকে ডেকে পাঠাল। ম্যাগ্‌ডালেনা লজ্জায় প্রায় মরমে মরে গিয়ে এষ্টনীর ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

—তুমি কি কি রান্না করেছ আজ। শুধাল এষ্টনী।

অস্পষ্ট স্বরে ম্যাগডালেনা জবাব দিল—মাটন কারী। আইয়া যদি ইচ্ছে করেন তো ইড়িয়া প্লামের সঙ্গে খেতে পারেন। স্যুটকী মাছ দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে চিনি সাগরে রান্না করেছি। তার সঙ্গেও ইড়িয়াপ্লাম্ চলবে ভাল।

এষ্টনী বহুদিন পরে খাবার আয়োজন করতে হুকুম দিল। এতদিন বড় খাবার ঘরটি একঘর খালিই পড়ে ছিল। আজ সে খাবার ঘরে যাবার আগে সেটা ভালকরে ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করতে হুকুম দিল বাটলারকে। হুকুম দিল ডিনার প্লেট বার করতে।

বহুদিন পরে খাবার টেবিলে কাচা টেবিলক্লথ পড়ল। বাটলার একটি ফ্লাওয়ার ভাস্ জোগাড় করে সেটা টেবিলের মাঝখানে রেখেছে ফুলে ভর্ত্তি করে। এষ্টনী এসব বন্দোবস্ত দেখে মেয়েটিকে ডাকতে গেল।

ইতিমধ্যে মেয়েটি তার কাপড় জামা পাল্টেছে। একটা মাদুরার ডুরে শাড়ী পরেছে মেয়েটি। তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা ব্লাউজ। কিন্তু তার মাথার চুলে তখনও তেল পড়েনি। কোন রকম সংস্কারও হয়নি মাথায়। মেয়েটিকে এই সামান্য পোষাকেই অসাধারণ লাগছে। রূপ যেন ওর স্বভাবের জন্য, তাকে যেন আর কিছু দিয়ে আলাদা করে সাজবার প্রয়োজনই নেই। শান্ত, কোমল অপূর্ব শ্রীময়ী। তার সঙ্গে একটা প্রগাঢ় ম্লান মেঘের ছায়াভাস পড়েছে তার মুখে চোখে। তবে এতক্ষণে তার সেই ভীরু, চকিত চাউনীটার অনেকটা গিয়েছে।

এষ্টনী দরজার কাছে আসতেই মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। এষ্টনী তাকে নিয়ে এল খাবার ঘরে। তারপর যেন নিজের মনেই সে বলতে লাগল—যখন তোমাকে এবাড়ীতে থাকতেই হবে তখন লজ্জা করে লাভই নেই। মনে কর এ তোমার নিজের বাড়ী। গতকাল থেকে ভাল করে কিছু খাওনি। তোমাকে ওরা ক্লোরোফর্ম করেছিল। আমি জানি ক্লোরোফর্মের পর কিছু খাওয়া যায় না, বমি পায় ভয়ানক। তা এখন তো তুমি সুস্থ। ভাল করে খাও।

তারপর আগ্রহ ভরা স্বরে শুধাল—তোমার নামটা আমাকে বল দয়া করে। তোমাকে তো ডাকতে হবে। মেয়েটা খাবারের প্লেটের সামনে বসেছিল চুপ করে। এবার ডাগর ডাগর দুটি চোখ মেলে এষ্টনীর দিকে চাইল। প্রায় অস্ফুট স্বরে বললে—জসমালা।

এষ্টনী খাবার মুখে তুলতে তুলতে বললে—ঐ অত বড় নাম ধরে তোমাকে আমি তো সব সময়ে ডাকতে পারব না। আমি তোমাকে মালা বলেই ডাকব। মালা বড় মিষ্টি নাম।

মেয়েটি সেই রকম নরম গলায় হঠাৎ বলে ফেললে—আমার দাদা আমাকে জল বলেই ডাকে।

এটর্নী সেই মুহূর্তে প্রশ্ন করল—কে তোমার দাদা? তার নাম কি?

মেয়েটি একটু একটু করে খাওয়া সুরু করেছিল। এটর্নীর প্রশ্নে সে চমকে উঠে খাওয়া বন্ধ করল। একমুহূর্ত খাবারের প্লেটের দিকে চেয়ে থেকে একটা প্রচণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু এটর্নীর প্রশ্নের জবাব দিল না। এটর্নী খুব ভাল ভাবেই বুঝতে পারল যেকোন কারণেই হোক মেয়েটি তার অভিভাবক বা দাদার নাম, কিম্বা ঠিকানা বলতে চায় না।

নরম স্নেহসিক্ত সুরে সে বললে—কিছুই তো তুমি খাচ্ছ না দাদা। দেখতো আমি কি রকম করে গোগ্রাসে খাচ্ছি। খাও, খাও,—যা হবার তাতো হয়েছে। সে সম্বন্ধে ভেবে কোন লাভ নেই। কিন্তু না খেয়ে থাকলে তো শরীরের ক্ষতি। কাজেই খেতে হবে। তোমাকে আর একটু লাল্‌কা দিক, আরও কয়েকটা ইঁড়িয়ন্না দিক কেমন?

মেয়েটি কি মনে করে আবার ধীরে ধীরে খেতে সুরু করল।

• • • •

সোমেস ইতিমধ্যে কিছু ছোলা, কিছু উপমা আর কফি এনে সামনে রেখেছিল। তার সঙ্গে ছিল একছড়া কলা। এটর্নী ছোলা চিবুচ্ছিল নিতান্ত অন্যমনস্ক ভাবে। তার সমস্ত মন জুড়ে বসেছিল একটা চিত্র। সেই ম্লানমুখী, সাবণ্যময়ী, শ্যামলা মেয়েটি। কোথা দিয়ে যে কি ঘটে কেউ বলতে পারে না। কোথা থেকে যে মালা এসে পড়ল সে রাতে এটর্নীর জীবনে। সে মালা আগুনের মালাই যেন একসময়ে তার গলায় দুলেছে। তাতে পুড়ে ছারখার হয়েছে তার অনেক কিছু। কিন্তু সেই আগুনে তার খাদও পুড়েছে। সে খাঁটি হয়েছে। নিজেকে চিনেছে।

মনে পড়ল মালা বাড়ীতে আসার সঙ্গে, যে যুদ্ধটা এতদিন বাইরে বাইরে আস্ফালন করে বৃথা ঘুরে বেড়াচ্ছিল; সেইটা তার ঘরের মধ্যে এসে তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করেছিল। যে নরপশুটা এতদিন দূর থেকে ভয় দেখিয়েছিল, সে যেন এক লাফে এটর্নীর ঘরের মধ্যে ঢুকে তার থাবা উদ্যত করেছিল।

ভয়ের বিষয়টা যখন দূরে থাকে তখন মানুষের মনে ভয় বেশ ঘনিয়ে বসে থাকে। যখন সে কাছে আসে তখন মানুষের ভয় ভাঙে। বিশেষ করে যার কিছুমাত্র আত্মজ্ঞান আছে, সে ভয়ের সেই আসল রূপটা ভালভাবে দেখেই চিনতে পারে। আর যে জীবনে ব্রত নিয়েছে ভয় ভাঙার ব্রত, ভয় জয় করার ব্রত, সে সেই ভয়ের বিষয়কেই যুদ্ধে আহ্বান জানায়। এটর্নী ধীরে সেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল সেদিন। যেদিন যুদ্ধটা তার ঘরের মধ্যে এসে পড়েছিল, সেদিন সে বাহ্যস্ফোট করেনি, চীৎকার করেনি, শান্ত ধীর ভাবে এগিয়ে গিয়েছিল যুদ্ধে। সে জানতে পেরেছিল—মানুষের সঙ্গে যুদ্ধে পশুকে হার মানতেই হবে। মৈত্রেয় বুদ্ধ মিথ্যা, যুদ্ধ মিথ্যা, কনফুসিয়াস, যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য মিথ্যা। বেদ-বাইবেল সব মিথ্যা। মিথ্যা ভারতের স্বাধীনতা, মিথ্যা গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ।

[ক্রমশঃ

চলতি দুনিয়া

পাশ্চাত্য জগতে আধুনিকা মেয়েরা এতটা প্রগতিশীল হয়েছে যে তাদের স্বাভাবিক ঔৎসুক্য ও অভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে অনেকেই তাদের যথেচ্ছা ব্যবহার করছে (natural curiosity and complete lack of experience make them easy targets)। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দেখে মায়েরা দারুণ আতঙ্কিত হয়ে উঠছেন। সামনের চোখ দিয়ে তাঁরা যা কিছু দেখছেন তাতে হয়ত বিশেষ কোন অপরাধ ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রত্যেক মা চান তাঁর যদি পিছনের দিকে আরও দুটো চোখ থাকত, যাতে মেয়েদের কার্যকলাপের আর গোপন থাকবেনা। (mother who wishes she had eyes in the back of her head) এবং তিনি মেয়েকে সহজেই সাবধান করে দিতে পারবেন। ছেলেরা ও মেয়েরা যদি একসঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার পাল্লা দেয় তবে সেটা যে বর্তমান যুগের মেরুদণ্ডকে অসাড় করে দেবে, একথা সমাজহিতৈষীদের চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। —উওম্যান

বর্তমান যুগটা নার্ভি কাজের যুগ। এ যুগে দাঁইহা জীবন একটা যেন বিড়ম্বনা। তাই গৃহের শান্ত পরিবেশে খাওয়া-দাওয়াটা কোনরকমে সেরে নিতে পারলেই লোকে যেন বাঁচে। তাই বর্তমান ইংলণ্ডের সমাজ যেন কাফে-সমাজ হয়ে উঠছে (Like America and France, Britain is fast becoming a Cafe society)। এতে আরেকটা কথা সমাজহিতৈষীদের মনে জেগেছে যে ঘরের টান কমে গেলে পারিবারিক অশান্তি কি বাড়বে না? খাওয়ার ব্যাপারে সংসারের একটা বড় আকর্ষণ, সেটা থেকে বেরাই পেলে নরনারী যে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মত স্বাধীন হয়ে স্বেচ্ছাচারিতার আকাশে উড়ে বেড়াবে তাতে আর সন্দেহ কি? —ডেলি মিরর

বিয়ের পরে মেয়েরা কাজ খোঁজে কেন? —এই প্রশ্নটা আজকাল অনেককেই ভাবিয়ে তুলেছে (Many bright and intelligent girls long to be back at work when the newness of marriage has worn off)। অবশ্য সবক্ষেত্রেই যে তা হয়, তা নয়। বিবাহের ফল নানাক্ষেত্রে বিপরীত হয়েই থাকে (Every marriage is different, the unexpected always keeps on happening) তাই অনেক সময়ে বিবাহিতা তরুণীরা তাদের মানসস্বর্গ নরকতুল্যে পরিণত হতে দেখে সেটাকে যতদূর পারা যায় এড়িয়ে নিয়ে আবার বাইরের কাজকর্মে যোগ দেন। এতে কিন্তু একটা জিনিষ চোখে পড়ে যে বিবাহের পূর্বের ও পরের অবস্থার মধ্যে একটা যেন ভুল বোঝাবুঝির ব্যবধান থেকে যায়। এসব ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রেই উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। —ডেলি মিরর এ্যাণ্ড সানডে পিকটোরিয়াল

পোষাকপরিচ্ছদের শালীনতা সামাজিকজীবনের পবিত্রতা রক্ষার যে অন্যতম কারণ তাতে সন্দেহ নেই। এতে নারীর সম্ভ্রম বাড়ে, (the dignity of the lady wearing them) আর তা'ছাড়া সহজে কেউ তার কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না। এখন অনেকেই স্বল্পাবরণা মেয়েদের (girls wearing scanty panties) ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছে। আর সামাজিক আসরে যে সব মেয়েদের একরকম

চোকা নিষেধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বেচ্ছাচারিতার যে ঢেউ এক সময়ে সামাজিক জীবনকে অস্থির ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল বর্তমানে তার প্রতি একটা উপেক্ষার ভাব দেখা দিয়েছে। সমাজজীবনের পক্ষে এটা যে মঙ্গলের কথা তাতে সন্দেহ নেই। —ডেলি মিরর

অর্থনৈতিক কারণে যারা সময়মত বিবাহ করে না, তাদের তারুণ্যে এমন একটা সময় আসে যখন বিবাহের আকর্ষণ অনেকটা কমে যায়, এতে কিন্তু দাম্পত্য জীবনে আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। সেইজন্যে সমাজহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখন বলছেন যে, অর্থনৈতিক সংকট নিজের চেষ্টায় দূর করা যায় যদি কেউ বিবাহিত জীবনকে কর্তব্য বলে গ্রহণ করে। কিন্তু প্রথম যৌবনের পরে একটু বেশীতে বিবাহ করলে, স্বামী তখন আর স্ত্রীকে নিবিড় করে ভালবাসতে পারে না। বেশী বয়সে যেসব মেয়ে বিবাহের আকুলতা নিয়ে কোন বয়স্ক লোকের কাছে প্রণয়নিবেদন করেতাদের প্রতি সেই পুরুষ বেশী আকর্ষণ আর দেখাতে পারে না (He hates them, he fights against annexation by them, criticises them, despises them and is obsessed by them) উপরন্তু এইসব ক্ষেত্রে বিশ্রীত ব্যবহার ফলে তারা ঘৃণা করা প্রেমের বন্ধনে ধরা দেয় না। জন্মাবার পর থেকেই মেয়েদের বিয়ের চেষ্টা চলতে থাকে তাদের মনে (What girls really want is to get married, they are preparing for marriage from the very day they are born)। অবশ্য ব্যাপারটা একটু অতিরঞ্জিত হলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনেকটা এই মতই পোষণ করেন। —উওম্যান

স্নানের পূর্বে শরীরে তৈল মর্দন যে সৌন্দর্যের পক্ষে হিতকর এ অভিমত আজকাল বিজ্ঞান-সম্মত। শরীরের প্রতিটী অংশে তৈলসিক্ত হলে সান্দ্রচর্মকে উজ্জ্বল ও মসৃণ করে, এতে সৌন্দর্য্য বেড়ে যায় (The secret of beautifying the complexion is said to lie in the saturation of the skin with oil, the skin takes on an immediate healthy bloom)

সঙ্গে সঙ্গে দেহের সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে। প্রাচ্যদেশে তৈলমর্দনের যে প্রথা বর্তমান আছে তা যে বিজ্ঞানসম্মত,—আজকাল শরীরতত্ত্ববিদেরা সে কথা স্বীকার করে থাকেন। —ডেলি মিরর

মহাশূন্য অভিযানে এমন দিন হয়ত ভবিষ্যতে আসবে যখন কোন সুদূরবর্তী গ্রহের উদ্দেশে রকেট বাহিত হলে তার মধ্যে হয়ত পাঁচ-ছয় মাস মানুষ-যাত্রীকে আবদ্ধ থাকতে হবে। এ অবস্থায় তার মনে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তার পরীক্ষার জন্যে বাড়ীর মধ্যে একটা রকেটে একজন মহাশূন্যযাত্রী শিক্ষার্থীকে ছয়মাসকাল আবদ্ধ রাখা হয়েছিল। এই রকেট কক্ষটির কোন জানালা ছিলনা ও বাইরে থেকে কোন শব্দও সেখানে পৌঁছতে পারত না (a windowless sound proof metal box)। এই নির্জন অবস্থায় ছয়মাস অতিবাহিত করা যে অতি কষ্টকর তাতে সন্দেহ নেই। আর তা ছাড়া খাদ্য ও জল নিতান্ত নিয়মিত মাপের (with food and water closely rationed)। এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি (mental derangement) ঘটেছে কিনা সেটাও বৈজ্ঞানিকরা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যে মানুষ যে কত কষ্ট বরণ করছে, এ পরীক্ষা তারই এক জলন্ত নিদর্শন।

—মিরর

চমক

কালিফোর্নিয়ান্ এক্সপ্রেস্ ট্রেনের চালক জেমস্ বড়ই চিন্তায় পড়েছেন,—একদিকে তার স্ত্রী মরণাপন্ন অবস্থায় বাড়ীতে পড়ে, আর একদিকে সরকারী জরুরী কাগজপত্র রয়েছে এই ট্রেণে। যুদ্ধের কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মানচিত্র ও দলিলপত্র পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্ব তারই উপরে পড়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য কর্তৃপক্ষ তার মত পাকা ড্রাইভার ছাড়া আর কাউকেই এ ট্রেণের চালক রূপে নিতে চান না।

ট্রেণ চলেছে অতি দ্রুতবেগে,—ঘণ্টায় প্রায় নব্বই মাইল। জেমস্ ভাবছে তার স্ত্রীর কথা,—এতক্ষণ কি মার্গারেট্ বেঁচে আছে? —শেষ বিদায়ের সময়েও তার স্ত্রী বলেছেন,—আমি মরি তাতে দুঃখ নেই,—কিন্তু তোমার যে বাঁচা চাই!

জেমস্ জানত হয়ত সে ফিরে এসে আর মার্গারেটকে দেখতে পাবে না। তবুও তার কর্তব্য সে ভোলেনি। কালিফোর্নিয়ান্ এক্সপ্রেস চালাবার ভার সে মাথায় নিয়েছিল।

বিদ্যুৎগতিতে ট্রেন চলেছে রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে। সার্চ লাইটে দেখা যাচ্ছে চকচকে লাইন দুটোর অতি দূর প্রান্ত। আর মাইল দুই গেলেই পড়বে নদীর পুল।

হঠাৎ জেমস্ দেখল দূরে লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে মার্গারেট্। হাত দুটি ঊর্ধ্বে তুলে সে যেন বার বার ট্রেণ থামাতে ইঙ্গিত করছে।

সার্চ লাইটের তীব্র আলো ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তার মধ্য দিয়ে জেমস্ যেন চিনতে পারল আপন স্ত্রীকে।

কিন্তু তবুও বিদ্যুৎবেগে চালিয়ে চলল ট্রেণকে জেমস্। ছায়ামূর্তি যেন বার বার দু'হাত তুলে থামতে বলছে তাকে।

সামনে নদীর পুল, ওটা পার হলেই সাত মাইল দূরে পরের ষ্টেশনে থামবে ট্রেণ।

হঠাৎ ছায়ামূর্তির দিকে চেয়ে দেখে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল জেমস্। এবার সজোরে ব্রেক্ কষে থামিয়ে ফেললে সে ট্রেণখানি ধীরে ধীরে।

যাত্রীরা এ অবস্থার ব্যাপার কি জানবার জন্যে ছুটে এল। অনেকে একটু এগিয়ে গিয়ে পুলের অবস্থা দেখে ভয়ে স্তম্ভিত।

নদীর স্রোতে পুলটি ভেঙে, লাইন পড়ে গেছে। ট্রেণ সে অবস্থায় পুলের উপরে গেলে ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটত। সমস্ত ট্রেণটাই নদীর জলে হুড়মুড় করে পড়ে যেত।

এতগুলি লোককে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানর জন্যে জেমস্ চারিদিক থেকে অভিনন্দন পেল। কিন্তু তার স্ত্রীর সম্বন্ধে শেষে জানতে পারল মার্গারেট সেই রাত্রিতেই একটু আগেই মারা গেছে.

জেমস্ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ল। কিন্তু ইঞ্জিনের হেড্‌লাইট সাফ করতে গিয়ে দেখে একটা পতঙ্গ (moth) তার সামনের কাঁচে পালক ছড়িয়ে এমনভাবে আটকে মরে রয়েছে যে সেই আলোতে তারই প্রতিবিম্ব যেন দুহাত ছড়ানো এক নারীমূর্তির ছায়াতে রূপান্তরিত হয়েছিল। ঠিক যেন মার্গারেট্!

একটা সামান্য পতঙ্গ ইঞ্জিনের হেড্‌লাইটে আটকে যে অসামান্য ঘটনার সৃষ্টি করেছিল তার অলক্ষ্য যোগসূত্র যে কোথায় কে তা' জানে!

অতৃপ্ত

সুমনস্বী দাশগুপ্ত

কট্ কট্ কট্! নির্জন ঘরের মধ্যে চমকে উঠল সুবিমল—এলো নাকি—নাঃ টেবিলের আলোর আকর্ষণে ঢুকে পড়েছে একটা বড় রাতের প্রজাপতি বা মথ—আর আলোটাকে প্রদক্ষিণ করে ঘুরছে—নাঃ, মনে মনে একটু হাসল সুবিমল এমন করে সে পাখা মেলে ঢুকতে পারবে না যতই না তার মন সুবিমলের আকর্ষণে ছুটে আসুক···তাকে ঐ কানা গলি হেঁটে পার হয়ে এসে ছোট সিঁড়িটা পায়ে পায়ে ভেঙে দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নাড়তেই হবে।

পাড়ার এ-দিকটা নির্জন। গলির মুখে একটা গ্যাসের বাতি টিম টিম করছে। এই অন্ধকারে অপরিচিত বাড়িতে ঢুকতে তার গা ছম্ ছম্ করতেও পারে—কত তার বয়স কে জানে—যতই হোক বাইশ তেইশ বছরের বেশী নয়, লেখার ভঙ্গী দেখে সেটুকু বোঝা যায়। অনেক অপরিচিতার লেখা পড়েছে সুবিমল এই দীর্ঘ পনের বছরের সম্পাদক জীবনে এবং অনেক অপরিচিতা পরিচিতাও হয়েছে কিন্তু আজকের মত আগ্রহ উৎকণ্ঠা বা রোমাঞ্চ বা যা হোক একটা কিছু তীব্র ভাব অন্ত কখনো বোধ করেনি—এমন হল কেন—? চিঠিটায় বিশেষ কি ছিল—? না, প্রতি বারই এমন মনে হয়? উঠে পড়ল সুবিমল, একটা চন্দন ধূপ জ্বালিয়ে দেওয়া যাক, পাশের বাড়ির উঠোনটা থেকে কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসে—এ বাড়িটা না ছাড়লেই নয়—বালিগঞ্জ আর নিউ আলিপুরের শোভনা আর আরতি দুজনেই বেশ কেমন যেন একটু নাক সিঁটকানো ভাব দেখিয়েছিল—অবশ্য পরে আরতি চোখের জলে তার সংশোধন করে নিয়েছে। ছ'মাস তার লেখা 'শুভবার্তা' পত্রিকার ছবিতে সেজে গুজে আসর জমাতে পারেনি। বাবাঃ এসব মেয়েদের লেখা ছাপাবার এত উৎসাহ কেন? আছে বৈকি, মেয়েদের অনেক কাজ আছে আর সে কাজের কথায় নিরুপমার কথা মনে না এসে পারে না, কি কাজের মেয়েই ছিল তার স্ত্রী নিরুপমা, কাজের উৎপাতে পাঁচটা বছর যেন শরশয্যায় কাটাতে হয়েছে। সত্যি জ্যেঠামশাই জীবনটাকে মাটি করে দিয়ে গিয়েছেন, যদি জ্যেঠামশাই একটু সুস্থমতি হতেন, স্বাভাবিক ভাবে চলতে দিতেন, তাহলে হয়ত আজ সুবিমলের মনে এমন অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার জ্বালা···বাইরে পায়ের শব্দে কান খাড়া করল সুবিমল। পাড়ার ছেলে ছাড়া আর হবেনু।

"আজ যে সম্পাদক মশাই একলা মনে হচ্ছে রে।"

"কোনো কালো কেশীর ঝুঁটি তো উঁচিয়ে নেই?"

"আমার হাতের টিপ কি রকম জানিস ত?"

"কেন পঞ্চশরের একটি ছুঁড়বি নাকি?"

"হ্যাঁ একেবারে খোপায় তাক করে বসিয়ে দেব তাতে যেমন থাকবে একটা চিঠি। এ পাড়ায় যে আরো উপযুক্ত সমঝদার আছে সেটা জানানো দরকার হয়ে পড়েছে।"

ছোঁড়া দুটো হা হা করে হাসতে হাসতে শিষ দিতে দিতে গলি পার হয়ে গেল—"বড় ভাল বাসি তারে কিছু বলবনা···" —তারি মজা লাগছে সুবিমলের—হতভাগারা জেলাস—তবু তো বয়স এখন পঞ্চাশের দিকে এগিয়ে গেল। থাকত ওদের বয়স! বাবাঃ ওদের বয়সের কথা ভাবতেও ভয় করে, কী রকম শিকল বাঁধা পাঁড়ের পাখী হয়ে কেটেছে জীবনের সব চেয়ে ভালো সময়টা, একেবারে বিফলে গেছে।

বাবাকে তো মনেই পড়ে না। জলপাইগুড়ির কোন চা বাগানে কেরানী ছিলেন—হঠাৎ ম্যালেরিয়ায় মারা গেলেন—তার পর কখন যে জ্যাঠামশাইর সংসারে মা তাকে নিয়ে আশ্রয় নিলেন তাও মনে নেই। কেঠিমা কিছুদিন আগেই মারা গিয়ে শান্তি পেয়েছেন, জ্যাঠামশাই ঠিকুজি কুষ্ঠি, জ্যোতিষচর্চা চাষাবাদ নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, সেখানে হঠাৎ এই উপদ্রব উপস্থিত হওয়ায় জ্যাঠামশাইর মনের ভাবটি কি হয়েছিল তা তিনি কোনো দিনই গোপন করেননি। তিনি নাকি তার মাকে অনেকবার বলেছিলেন, তুমি বাপের বাড়ি যাও কিংবা কাশী যাও, আমি ছেলে মানুষ করে দিচ্ছি—কিন্তু সব ছেলে মানুষই যেমন অবাধ্য একগুঁয়ে এবং ছিঁচকাদুনী হয় ওর মাও নাকি তার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন না—ছেলে ছেড়ে যাবার কথা বললেই তিনি ঘোমটার মধ্যে এমন কোঁপাতে সুরু করতেন যে জ্যাঠামশাইর তখুনি তাঁকে ঘাড় ধরে বের করে দেবার জন্য হাত নিসপিস করতে থাকত কিন্তু বিপদ এই যে ঘাড় ধরতে গেলেই মেয়ে মানুষের ঘাড় ধরতে হয়, তাই নাকি সে কাজটি করতে পারেন নি।

মার কথাও সুবিমলের কিছুই মনে পড়ে না, তাঁর স্নেহ, যত্ন, হাতের রান্না কোনো দিন তাঁর কোলে শুয়েছে কিনা—যেমন ঘোষেদের জানলা দিয়ে পিন্টুকে তার মার সঙ্গে দেখা যায় তা তার মনে নেই। শুধু মনে হয় শুনেছিল মার নাম ছিল সৌদামিনী—কার কাছে শুনেছে তাও মনে পড়ে না, জ্যাঠামশাইর কাছে তো নয়ই, কারণ তিনি সহজে কোনো "মেয়েছেলের" নাম মুখে আনবেন এ সম্ভব নয়। কিন্তু সৌদামিনীর কোনো দীপ্তি, চাঞ্চল্য কিছুই তার মায়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত নেই। তাঁর কথা মনে হলে শুধু ঘোমটা ঢাকা একটী মূর্তি মনে পড়ে, যেন প্রেতের মত নিঃশব্দ সন্ত্রস্ত, আর কিছু নয়। তাই তো সুমন্ত বলেছিল, "তোর মার মুখ মনে পড়ে না বলেই, তুই জীবনে কোনো মেয়েকে সুখী করতে পারবি না, কাজেই সুখীও হবি না।" বেশ কচি কচি কথা বলত সুমন্ত। সেই তো কলম ধরতে শেখাল আর আজ সুমন্ত কোথায় একটা ছোট্ট পাড়াগাঁয়ে টেনশে টেনশ মাস্টার—সাদা কোট গায়ে দিয়ে প্লাটফরমে ছুটোছুটি করছে। নিজেই সিটি বাজায়, নিজেই ঝুল ঝাড়ে টেবিলের। আর মাঝে মাঝে টরে টক্কা করে। আর সে? হাতে ঝকঝকে সোনার আংটিটা ঘোরাতে লাগল সুবিমল—কত বড় পত্রিকার সহকারী সম্পাদক কতলোকের মুখের হাসি তার উপর নির্ভর, কত খোসামোদ তার প্রাপ্য।

এর পরের বার প্রোপ্রাইটারও হতে হবে, প্রোপ্রাইটার না হলে তো ট্যাঁকে কিছু আসবেনা, আর টাকা না হলে শেষ পর্যন্ত কোনও দিকেই কিছু এগোবে না। আরতির গাড়িতে চড়তে বেশ লাগে কিন্তু আরতিকে নিজের গাড়িতে চড়াতে কেমন লাগে সেটাও জানতে হবে তো—অভিজ্ঞতা ছাড়া লেখক হওয়া যায় না, আর সম্পাদকেরও অভিজ্ঞতা দরকার। নিজের গাড়ির কথা ভাবলেই সুবিমলের মনে একটা ছবি ভেসে ওঠে—একটা বড় লম্বা নীচু স্পোর্টিং কার তাতে সে বসে আছে, এক হাতে

ঐ আয়নায় একহাতে চুলটা ব্যাকব্রাশ করা সম্পূর্ণ ওল্টানো ··কিন্তু এ তার নিজের চেহারা নয় এরকম তাকে দেখাতেই পারে না, সুবিমলের চুল একটু কোঁকড়ানো তাই বরাবর মাথা তাকে মাঝখানে দিয়ে সিঁথি কাটিয়েছেন, এখন যখনই সুবিমল—জ্যেঠামশায় যখন "গুড বুকে" থাকতেন তখন তিনি হাসি ঠাট্টাও করতেন—বলতেন, দেখ তোর চুলটা বেশ কোঁকড়ানো আছে, মাঝখান দিয়ে সিঁথি করবি, কখনো টেরী কাটবি না, তাহলে একটু বিবেকানন্দর মত দেখাতে পারে—তোর চোখ দুটো যদি আর একটু বড় হত, বংটা যদি আর একটু ফর্সা হত, মুখটা আরো ভরাট হত, শরীরে যদি আর একটু বল থাকত, মনে যদি আরো তেজ থাকত, মাথায় যদি আরো তেজ থাকত মাথায় যদি আরো ঘীলু থাকত তাহলে তোকে বিবেকানন্দ বনিয়ে ফেলতাম কিন্তু তোর মা বাবা তোকে তেই অব-খাঁচড়া করে বানিয়েছে যে এই ঘদির পাঁচে পড়ে কিছু আর কর্তে পারলাম না। ···হা হা করে জ্যেঠামশায় হাসতেন, রসিকতা অবশ্য সুবিমলের খুব ভালো লাগত না।

তবে ওই ব্যাকব্রাশ করা চুলটি মুখে আয়নাদেবী চং-এর মুখটা করে, যার মতন নিজেকে ভাবতে বেশ লাগে তা সুবিমল জানে, তাকে ভুলতে পারে না, কারণ তার স্ত্রীকে ভুলতে পারে না, সেই তো সুবিমলের জীবনে ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখা প্রথম নারী যার তুলনা আজও পায়নি। যার কথা মনে হলেই একটা গানের লাইন মনে পড়ে · পথে দেখেছিনু তুলনা হীনারে···তার আগে তো মেয়েদের সঙ্গে ও স্পর্শের কোনো আস্বাদই সুবিমল জানত না।

সে আজ পঁচিশ বছর আগের কথা নিশ্চয়ই জ্যেঠামশায়ের সঙ্গে দিল্লী থেকে ফিরছে—সেকেণ্ড ক্লাসে রিজার্ভ করা—ট্রেনে চড়ার সময় জ্যেঠামশায়ের এ সৌখীনতা ছিল, তিনি কিছুতেই ইন্টার ক্লাসে চড়তেন না, ছেলে মেয়ের চ্যাঁ ভ্যাঁ গাদা গদা মেয়ে মানুষ ঢুকে পড়ে—ওদের জন্য আলাদা গাড়ি রয়েছে, সেখানে যাবে না—সেকেণ্ড ক্লাসে নিজের নিজের রিজার্ভ করা বেঞ্চিটাতো থাকে। কিন্তু সেদিন সারা দিন প্রচণ্ড ভীড় গেছে, রাত্রেও যে রিজার্ভ করা আছে বলেই গাড়ি খালি হবে সে আশা কম—৯ জন বসবার জায়গায় ৩০ জন বসে আসা হচ্ছে, রাত্রে ক'জন থাকবে কে জানে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে তখনও আলো জ্বলেনি—ট্রেন একটা ছোট ষ্টেশনে দাঁড়ালো—দোকজনের দৌড়োদৌড়ি হাঁকডাক পাখিপাড়ে গরম পুরীর মাঝখানে হঠাৎ একটা ভারি গলা শোনা গেল—নো, নো, অলকনন্দা, গুটস্ সেকেণ্ড ক্লাস—একটা বাজনার মত গলার স্বরে উত্তর এলো, হোয়্ আমি ও দিকটা সব দেখে এসেছি সামনে ভীড় আরো ভীড়—বলতে বলতে দরজার হাতলটা ঘুরে গেল এবং কিছু দেখবার আগে এক ঝলক বাতাসের সঙ্গে অদ্ভুত একটা সুগন্ধ ভেসে এলো। অলকনন্দা ঘরে ঢুকল।

সুবিমল বি-এ ক্লাসের বাংলা নোটে অল্প কয়েকদিন আগেই ঐ শব্দটার মানে পড়েছিল স্বর্গগঙ্গা—অলকনন্দার পিছনে তাঁর স্বামী একটা ঝকঝকে সুটকেশ কুলির মাথা থেকে নামাবার চেষ্টা করছেন: বয়সে হয়ত তার সমান কিংবা অনেক বড় বা বেশ ছোট—বয়স অনুমান করতে পারেনি সুবিমল মনেও আসেনি শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল, সুকুমার শরীরের প্রতি তন্বীর মধ্যে দিয়ে যেন বাঁধভাঙা সৌন্দর্যের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল। ভয়ে ভয়ে জ্যেঠার দিকে আড় চোখে দেখছে সুবিমল কি কাণ্ডটা ঘটে—জ্যেঠামশায় গোপেশ্বর বাবু অনর্থ নাশা। রেগে গেলে তাঁর ভারি মোটা-গোঁফ অনেকটা মুখের ভিতর ঢুকে যায়—জানালা থেকে মুখ ফিরিয়ে একটা ভ্রূকুটি নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু

ভাগ্য ভালো কেউ দেখতে পেল না। অলকনন্দার স্বামী সুটকেশটা রাখবার ব্যবস্থা করছিলেন আর অলকনন্দা তার টানাটানা চোখ ঘুরিয়ে কোথায় বসবার জায়গা করা যায় তাই একনজরে দেখে নিচ্ছিল। সোমেশ্বর বাবু আর সহ্য করতে পারলেন না—"এ কামরা তো রিজার্ভ—রাত ৯টার পর আপনাদের নামতে হবে—এখানে ঢোকবার কী অর্থ হল?" ঘরে অনেক লোকই ছিল সোমেশ্বর বাবুর মতে তাদের থাকবার কোনই হক নেই—তাদের একজন বরং রাগুন মশাই রিজার্ভ সকলকেই তো পৌঁছতে হবে। অলকনন্দা ততক্ষণে কয়েকটা বাক্স বিছানা ডিঙিয়ে একেবারে সুবিমলের পাশে এসে উপস্থিত। "একটু সর না ভাই" বলে একটু অপেক্ষা না করে একেবারে গা ঘেঁসে বসে পড়ল। ভয়ে ভয়ে জ্যেঠামশাইর দিকে চাইতেই দেখে তিনি মুখখানা চক্রবৎ করে বিরক্তি ও বিদ্বেষে ভরুকিত করে আছেন। ট্রেন চলতে সুরু করলে দেখা গেল সকলেরই বসবার জায়গা হয়ে গেছে এমন কি অলকনন্দার স্বামী সুটকেশের উপর যার নাম লেখা ছিল রবি চ্যাটার্জি—তিনিও একটা বড় ট্রাঙ্কের উপর পা ছড়িয়ে বসেছেন। অলকনন্দা সুবিমলের পাশে বসে তৎক্ষণ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে অন্য বেঞ্চিতে বসা একটা মেয়ের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে। সকলের নাম পরিচয়, কে কোথা থেকে আসছে কোথায় যাচ্ছে সবই সংগ্রহ করতে সময় লাগছে না—এলাহাবাদে পাণ্ডার উৎপাত, কাশ্মীরে ঘোড়ায় চড়লে আনাড়ী বুকে ঘোড়া সুদ্ধ আত্মাবলে প্রবেশ, বেনারসের গলিতে সিং বাঁকানো ষাঁড়ের সঙ্গে মোলাকাত ও তখন রবি চ্যাটার্জির আত্মরক্ষার্থে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ করে দোকানের ভিতর পলায়ন ইত্যাদি গল্প প্রচুর হাস্য সহযোগে বলছে আর ঘরের মধ্যে হাসির রোল উঠছে—সুবিমল অবাক হয়ে দেখে রবি চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ নির্বিকার, পকেট থেকে একটা মোটা রূপোর চুরুটের বাক্স বের করে একটি মুখে লাগিয়েছেন হাতে একটা খুব রংদার ছবিওলা ইংরেজি পত্রিকা, এখনও সুবিমলের মনে আছে জিওগ্রাফিক্যাল ম্যাগাজিন। তিনি কোনো কথায় যোগ দিচ্ছেন না বটে কিন্তু ঠাট্টাটা যখন তাঁকে নিয়ে হচ্ছে তখন ঠোঁটের কোণে মুচকি একটু হাসি দেখা দিচ্ছে। অলকনন্দার কথা বলবার শক্তি, হাসবার ও হাসাবার ক্ষমতা যেন সোমেশ্বরবাবুকেও একটু টানিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে তিনি একটু ঘাড় ফিরিয়ে দেখছেন। হঠাৎ সুবিমলের দিকে ফিরে বসল অলকনন্দা—তুমি ভাই কোন কলেজে পড়? ফিরতে গিয়ে হাঁটুতে লেগে গেল, হাতটা এক মুহূর্তের জন্য হাত ছুঁয়ে গেল—কী আশ্চর্য সে স্পর্শ, কী অদ্ভুত অজানা তার শক্তি সুবিমল আজও মনে করতে পারে তার সমস্ত বুকের ভিতরটা একটা অসহ্য সুখে যেন টনটন করে উঠল—সে সুখ যেমনি তীব্র। অলকনন্দার কর্সা মুখের ডৌলটি সুকুমার—কাজল পরান কালো চোখের দৃষ্টিতে বুদ্ধির প্রভা যেন ঝলমল করছে। আর একটা জিনিষ অবাক হয়ে দেখছে কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপটার সঙ্গে যেন একই রেখায় চিবুকের উপর উজ্জ্বল গভীর কালো একটি তিল নাকি সিঁদুরের প্রতি স্পর্দ্ধা যেন আর একটা টিপ। সুবিমল কোনই উত্তর দেয়নি। অলকনন্দা উত্তর চায়ও না যেন কথা বলায় আনন্দেই কথা বলে চলেছে কস্ করে সুবিমলের আঙুলটি ধরে বলে—

ওঃ মুক্তোর আংটি পরেছ? মুক্তো আমার সহ্য হয় না—মুক্তো পরলেই ওঁর সঙ্গে ঝগড়া হয়; বড় মুক্তো পরলে বেশি ঝগড়া ছোট মুক্তো পরলে কম ঝগড়া···জ্যেঠামশায় আর পারলেন না—এবার তাঁর একেবারে নিজের স্বত্বাধিকারের সীমানায় ঢুকে পড়েছে অলকনন্দা কোনো দিকে না তাকিয়ে একটা গর্জনের মত শব্দ ছুঁড়লেন "Absurd, হতেই পারে না।"···আর অলকনন্দাকে পায় কে

পাষাণ টলছে—"হা কাকাবাবু সত্যি হয়" বলে সবিস্তারে বর্ণনা সুরু করল। এ বিষয়ে গোপেশ্বর বাবুর অনেক বিরোধী ছিল পাথরের গুণাগুণ হচ্ছে ত্রৈগুণ, শরীরে সংস্পর্শে শারীরিক ক্রিয়া। এরাজির আবিষ্কারের পরে সে বিরোধী আরো জোর পেয়েছে, কিন্তু তিনি বৈজ্ঞানিক এর সঙ্গে মনের কোনো সম্বন্ধ থাকতে পারেনা মুক্তো পরলে তাকে অসুখ করতে পারে কিন্তু ঝগড়া হতে পারে না। অলকানন্দা খুব মিষ্টি করে তর্ক করে, জিজ্ঞাসার মত করে অপর পক্ষকে বড় করে উঁচে করে তুলে দিয়ে অপর পক্ষকে খুশী করে। তর্ক জমে উঠতেই সে ফট করে। সুবিমলের পাশ থেকে উঠে গিয়ে জ্যাঠামশায়ের কাছটি ঘেঁষে বসল। জ্যাঠামশায়ের মুখে কিন্তু সুবিমল আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছিল বিশেষ কোনো বিরক্তি দেখা গেল না। কিন্তু তার একটুও ভালো লাগেনি। এ পাশটা যে অন্ধকার হয়ে গেল, রবি চ্যাটার্জি সম্পূর্ণ উদাসীন মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে হাত বার করে ছাই ঝাড়ছেন আর বই পড়ছেন। সুবিমল দেখছিল ছিমছাম পরিপাটি মানুষটিকে। ঝকঝকে জুতো, দামী পাংলুন—আভিজাত্যের প্রতিমূর্তি—কেবল অবহেলায় চুরুটের ছাই জানলার বাইরে ঝাড়ছেন কিন্তু ঘরে একটুও পড়ছে না। মামার সঙ্গে মাথা নেড়ে নেড়ে গল্প করছে অলকানন্দা, আর তার ওই আশ্চর্য কালো তিল যেন একটা জহরের মত জ্বলছে…।

বন্ধু সুব্রত শুনে বলেছিল আহা ওরই জন্য তো সমরখন্দ ও বোখারা বিক্রী হয়ে গেল"… "সে আবার কি?" "আরে কবিতা পড় কবিতা পড়, মৈলে জীবনে যা পাবি তাও পুরোপুরি পাবি না।"

রাত হয়ে এল ট্রেনের মধ্যে একটা জংসনে ভদ্রলোক অনেক হৌড়েহৌড়ি করলেন কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা হল না, ঘরগুলো কিছুতেই এদিকে এলই না…জ্যেঠামশায় জিজ্ঞাসা করলেন—"খাবার আনলে না কেন?" "আমি যে রাঁধতে একদম পারিনা কাকাবাবু রান্না বসিয়ে এদিক ওদিক করি ধোঁয়া পুড়ে যায়…একবার হল কি জানেন প্রথম বিয়ের পরই আমরা হাজারিবাগের পাশেই একটা জঙ্গলে ক্যাম্পিং করছি—উনি একটা বনমুরগী মেরে পাঠিয়ে দিলেন—সারাদিন সার্ভের কাজ হবে সন্ধ্যেবেলা আসবেন—এদিকে সেদিন খুব দেখ করেছে খানিকের ফাঁকে মেঘের খেলা দেখে আমি কলকাতার মেয়ে ভাবলুম বেশ কবিত্ব করে মেঘদূত পড়ব, তাই মুরগী চাপিয়ে দিয়ে বই নিয়ে বাইরে বসেছি।"

সুবিমল আঁৎকে উঠেছিল মামার মুখ দিয়েও কবিতা বেরুচ্ছে 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে…হা কাকাবাবু আমি খুব সুর করে পড়ছি—আনন্দোথং নয়নসলিলং যন্নিমিত্তৈঃ—তখন কি জানি আমার নয়ন সলিলের ব্যবস্থা হচ্ছে—একটা চড়চড়ে শব্দ আর পোড়া পোড়া গন্ধ নাকে এল—না না এত তাড়াতাড়ি কি জল শুকোবে, এই করতে করতেই একেবারে মুরগীর কয়লা…উনি গেছেন খনির কয়লা দেখতে, আমি মুরগীর কয়লা বানিয়ে বসেছি…কি করি পাশেই পোস্ট আফিসের মাষ্টারবাবু ছিলেন, ছেলেমানুষ, তার সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিলাম…আশ্চর্য মামা মুচকি হেসে বল্লেন, "তা বুঝতেই পারছি"—তাকে বল্লুম, "তাই এই ব্যাপার এখন কি করি—সে বল্ল 'কোনো ভাবনা নেই বউদি আমি সাইকেল করে শহরে যাচ্ছি মাত্র পাঁচ মাইল পথ হোটেল থেকে ভাল মুরগী রাঁধিয়ে আনব দাদার আসতে এখনও চার-পাঁচ ঘন্টার উপর।" রাত্রে খেতে বসে উনি বলছেন বনমুরগী খুব হয় জানতাম কিন্তু কি সুন্দর রেঁধেছ—তখন বুঝলেন কাকাবাবু আনন্দোথং নয়ন সলিলং…কিন্তু আর রান্নার দিকে যাই না।"

গাড়ি শুদ্ধ সবাই হাসছিল মামা বল্লেন, টিকিন কারিয়ার খোল সুবিমল। সকলেরই পেটনা "পুঁটলি

খোলা হল সকলেই এই দম্পতীকে খাওয়াবার জন্য ব্যগ্র। শেষ রাতের দিকে অলকনন্দারা নেমে গেল বলে গেল আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে—সুবিমল জানে একটা অতৃপ্ত সুখ স্বাদে তারই মতন সকলেরই মন যেন অবসন্ন হয়ে গেল। যখন প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে চলে যাচ্ছে শেষবারের মত তার সুকুমার ভঙ্গী চিবুকের উপর ষ্টেশনের আলো পড়ে সেই আশ্চর্য তিলটা ঝলমল করে উঠেছিল।

তারপর আজ কত বছর পার হয়ে গেছে যুগের পরে যুগ—সেই কয়েকটি ঘণ্টার সুখস্মৃতি মনে পড়লেই একটা স্বপ্নের মত যখন মনকে আচ্ছন্ন করে কেলত মনের কোণায় কোণায় ঢেউ তুলত স্বর্গসঙ্গ তখন তিনদিনের নোটিশে নিরুর সঙ্গে মামাবাবু বিয়ে দিয়ে দিলেন। নিরু বাবা জ্যোতিষী—তিনিও পাথরের চর্চা করেন, অন্তত তাঁর মেয়ের মনটা ছিল পাথরে তৈরী, স্নেহ-প্রেম, কবিত্ব এসব সেখানে দাগ কাটত না। তিনিই মেয়ের মঙ্গল হবে বলে জামাইকে এই হীরার আংটিটি দিয়েছিলেন। মেয়ের মঙ্গল কী হয়েছে জানা নেই তবে জামাইর হয়েছে। উদাহ বা উদ্বন্ধন থেকে বছর কয়েক বছরের মধ্যেই রেহাই পেয়েছে। নিরু বরাবরই অসুস্থ ছিল। তার সমস্ত শরীর দিয়ে একটা অরো অরো গন্ধ বেরুত যাতে তার কাছে এলেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে যেত। নিরু কিন্তু খুব কাজ করত সকাল থেকে তার কাজ সুরু হত বরফ ভাঙ্গা নিয়ে, একটা টুকরীতে ছোট, একটাতে মাঝারি, একটায় বড়, একদিকে গুঁড়ো সাজান হল, বাসন মাজা হল, তার রন্ধে রন্ধে কালি তোলা হল, মশলা বাছা ধোয়া, ধোয়া ঝাড়া চল্ল—। মামা খুব খুশী আদর্শ বৌ…শুধু স্বাস্থ্যটা নয়…রোগা শরীরে খেটে খেটে, যখন নিরু ঘরে ঢুকত তখন তার কথা বলবারও শক্তি থাকত না, বলবার ছিলই বা কি। কিছুক্ষণ ধরে বসে বসে চুলের কাঁটা দিয়ে তার কাজ করা হাতের, ঘরে যাওয়া নখগুলি পরিষ্কার করতো, তখন সুবিমলের মনে সেই ঝকঝকে হাতির দাঁতের মত আঙুলগুলির গোলাপী নখের আভা ছবির মতন মাঝে মাঝে ভেসে উঠত। মামাবাবুকে আগ্রা থেকে কেনা পাথরগুলি দেখাবার জন্য কটাৎ করে বিরাট হাত ব্যাগটা খুলে ফেলেছিল অলকনন্দা…তখনই প্রথম সেই আশ্চর্য আঙুলগুলি সুবিমলের চোখ যেন টেনে ধরেছিল। একটু ছুঁয়ে দেবার জন্য নিজের আঙুলগুলির মধ্যে কি একটা টান বোধ করছিল সুবিমল—সেটাকে চেপে রাখার কঠকর চেষ্টা চলছে অলকনন্দা বলে আমার ব্যাগটা দেখছ বুঝি - এটা মোটেই ভ্যানিটি ব্যাগ নয়…কারণ আমার বাপু ভ্যানিটি নেই তাই এটার নাম হোল্ড অল…সবকিছু ধরে…তারপর কতদিন হয়ে গেছে—দাম্পত্য শয্যার কঠকর পরীক্ষা বেশীদিন দিতে হয়নি—নিরুপমার গায়ের অরো গন্ধ প্রবল জ্বরে পরিণত হয়ে তাকে জ্যাঠামশাইর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ওপারে নিয়ে গেছে—সুবিমল আজ বহুদিন মুক্ত স্বাধীন…জ্যাঠামশায়ের ভবানীপুরের একখানা বাড়ির ভাড়া আর বিশ্ববার্তার চাকরীতে বেশ কাটছে। সম্পাদকের চাকরীর একটা বিশেষ সুখ বছর দশেক হয় সে আবিষ্কার করেছে—এক রকম আকস্মিক ভাবেই—নৈলে নারী মনস্তত্ত্বের এমন অজ্ঞ মনে এ সম্ভাবনা ঢুকবেই বা কি করে।

ভদ্রমহিলার একটা কবিতা এসেছিল বিশ্ববার্তার সম্পাদকের নামে তিনি সহকারী সম্পাদক সুবিমলকেই সব দেখা পাঠিয়ে দেন। কবিতাটা অদ্ভুত ভালো এমন একটা সহজ উত্তপ্ত জীবনসুখ, কালো কালো অক্ষরগুলোর ভিতর থেকে সুগন্ধ বাষ্পের মত উঠে যে চোখ দুটো এমন ভিজিয়ে দিতে পারে অনেকদিন সে রকম কবিতা সহকারী সম্পাদক পড়েনি। কে এই লেখিকা—লেখাতো ছাপবেই কিন্তু লেখিকাকেও প্রকাশিত হতে হবে…গুন গুন করে সুর ভাঁজতে সুবিমল অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না…কবিতাটা প্রেমের—সুবিমলের নীরস শুকনো জীবনের খটখটে মাটিতে যেন

একটা সজীব ফুলে ভরা লতা উঠে পড়েছে···ডাক দিলেই কাঁধে চড়ে খাঁপে ভরে আসা এই বৃন্তটিতে কত ফুল ফোটাবে সে কথা সেদিন সে কল্পনাও করতে পারত না!

চিঠির উত্তরে ভদ্রমহিলা ফোন করলেন "আপনি সুবিমলবাবু—আমি মণিকা চট্টোপাধ্যায়।"··· "নমস্কার"···কণ্ঠে অবিচলিত গাম্ভীর্য আনল সুবিমল—"আমায় ফোন করতে বলেছিলেন কেন?" ব্যগ্র কণ্ঠে বলল মণিকা প্রাণপণে গলাটাকে সহজ উদাসীন এবং যাকে বলে matter of fact রাখবার চেষ্টা করছে সুবিমল—

"একটু আলোচনা করবার ছিল আপনার কবিতাটা সম্বন্ধে—নূতন লিখছেন তো?"

"না তো, আমার তো পুরানো প্রকাশিত কবিতার বই আছে।"

"কৈ কি নাম, শুনিনি তো?"

"কি করব বলুন নিজের খরচে প্রকাশ করেছি, প্রকাশকের ঘরে পচছে একটা বিজ্ঞাপন দেন না। রিভিউর জন্য আমাকেই দৌড়োদৌড়ি করতে হয়···অত পেরে উঠি না···আমাদের মেয়েদের বড় মুস্কিল···" ভদ্রমহিলার গলা বেশ করুণ।

"আসুন না একদিন সব কথা আলোচনা করা যাবে—"

"নিশ্চয়ই, আফিসে তো?"

"বাড়িতেও হতে পারে।"—"বেশ তো।"

তারপরে? তারপরে এমন কিছুই নয়—কয়েকদিন আসা যাওয়া বেড়ান হয়েছে, কিছু প্রেমের কবিতা শোনা এবং শোনান হয়েছে—একটা সিনেমা দেখা হয়েছে কারণ সিনেমাটা সম্বন্ধে মণিকা একটা প্রবন্ধ লিখেছিল সেটা সুবিমলের সঙ্গে মতে মিলছিল না কাজেই একসঙ্গে দেখে নোট মেলান উচিত এইটে সুবিমলের মত ছিল—তারপর মণিকার বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও গল্প বিশ্ববার্তায় ছাপান হয়েছে—মণিকার প্রকাশককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে প্রতিভা কখনও ছাই চাপা থাকে না—উদারভাবে পরিতৃপ্ত মণিকা তার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সন্ধি করেছে—তারপর? তারপর মণিকার স্বামী, যাকে সুবিমল কোনোদিন দেখেনি কিন্তু যার কথা অনেক শুনেছে, প্রতি কথায় "উনি বলেন" শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়েছে—এবং সুবিমল বুঝে নিয়েছে যে সেই উনিটি কী রকম হস্তীমূর্খ—সেই হস্তীমূর্খটি এক বড় কার্যের ম্যানেজিং ডিরেকটর হয়ে বম্বে চলে গেছে সঙ্গে সঙ্গে মণিকাও। মাঝে মাঝে মণিকার চিঠি আসে—পার্টি ডানস ক্লাবের খেলায় একটু সময় পায় না—সে হাঁপিয়ে উঠেছে তার প্রাণ "বড় কিছু"র জন্য ছটফট করছে এবং শীঘ্রই সে সমাজের উপরের তলায় এই জীবনের সম্বন্ধে তার তীক্ষ্ণ কলমের কষাঘাত হানবে এ প্রতিজ্ঞা সুবিমলকে জানিয়েছে···

তারপর এসেছে—যাজ্ঞসেনী, বন্দনা, শোভনা, আরতি ধাপে ধাপে এগিয়ে। আরতিই সবচেয়ে বেশী ধরা দিয়েছে—কিন্তু বড় প্যানপ্যানে আর হিংসুটে মেয়ে আজকাল আর একটুও ভালো লাগেনা ওকে। আর আজ যে আসবে সে না জানি কেমন! আশা করি সুমিত্রার মত হবে না, কি চেঁটা মেয়ে, কিছুতেই বাড়ি আনা গেল না, কথাই মানল না, অথচ লেখা ছাপাতেই হবে। আবার···কেমন যেন দোষী দোষী মনে হয় ও কোন করলে—কিন্তু দোষটা কি, কি এমন অন্যায়টা করেছে সুবিমল—না হয় সুমিত্রার কলম যথেষ্ট পাকা, ওরকম লেখা কমই আসে, তাই বলে কি নিজের পদের একটু সুযোগ নেবে না সে—আজকালকার জগৎই তো এই, ঐ সুমিত্রার স্বামীই যে পদে আছেন সেখান থেকে পার্মিট

বের করতে ওঁকে খুশী করতে হয় না বুঝি! জানা আছে সবই সুবিমলের—আর সে দোষের কি করে একটু গল্প-সল্প ছাড়া কি—তারপর কার উপর তো জোর জবরদস্তি করে না—নিজেরাই তারা লেখা ছাপাবার উৎসাহে—

নাঃ এবারে নিঃসন্দেহে গলির মোড়ে একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়েছে তাই দরজাটা খপাং করে বন্ধ হল—না জানি সে কেমন। ফেঁসে তার গলার স্বরটা আশ্চর্য সুন্দর বেহালার শেষ হতে শেষ না হওয়া সুরটার মত কানে লেগে আছে—যেন স্বপ্নে শোনা বা পূর্বজন্মে শোনা · আজ রাত্রে নিশ্চয়ই একটা কবিতা লিখবে···পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে···কিন্তু পায়ের শব্দটা তো তেমন হাল্কা নয়ু নয়—দরজায় খটখট শব্দ হল কড়া নাড়ার। এবার দরজায় একটা ভাল দেখে বেল লাগাতে হবে এ কথাটা কখনো মনে হয়নি আশ্চর্য—সাবধানে দরজা খুললে সুবিমল, আর ঘরের সেই মথ প্রজাপতিটা বাইরের গ্যাসের আলোর দিকে পত্ পত্ করে উড়ে গেল—মোটা চাদর জড়ান একটি ভদ্রমহিলা তখুনি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন—অবাক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুবিমল। এ কে? এ কখনো সে হতে পারে না, মোটাসোটা ভারিক্কি মধ্যবয়সী চেহারা, গলার কাছে বেশ একটি দ্বিতীয় চিবুকের আভাস—প্রসারিত সিঁথির উপরে সাদা চুল চিক্ চিক্ করছে—নির্বিকার চিত্তে একটা চৌকিতে বেশ জমিয়ে বসলেন ভদ্রমহিলা কোনো অনুরোধের অপেক্ষা না রেখে।

"আসুন বসুন সুবিমলবাবু।" বাঃ বেশতো এটা যেন ওঁরই বাড়ি।

"বিশ্ববার্তার সহকারী সম্পাদককে দেখতে এলুম—বাঃ বৈঠকখানাটি তো ভালো এই এঁদো গলিতে·· অনেকেই আসেন বাস বুঝি, বিয়ে করেননি?"

"আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি একজন সামান্য লেখিকা, আপনার বিশ্ববিখ্যাত কাগজে আপনার মত অভিজ্ঞ সম্পাদকের আশ্রয়ে লিখে জগতে আমার প্রতিভার প্রতিষ্ঠা করব—বসুন বসুন বসছেন না যে আমার যাবা হবে না বুঝি? বয়স বেশী হয়ে গেছে?"

ভদ্রমহিলা গায়ের চাদরটা একটু আলগা করলেন তাঁর কোলের উপর রাখা একটা প্রকাণ্ড ব্যাগের ক্লিপটা আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বল্লেন—

"আপনার কথা অনেকের কাছে শুনেছি ··" কিছু কানে ঢুকছে না সুবিমলের দেখছে আঙুল-গুলির বেলা মনে হয় না কোনো প্রৌঢ়ার হাত আর মনে পড়ছে নিরুপমার সেই নয় করে যাওয়া হাড় বের করা আঙুলগুলো। নিরুপমার যদি এমন চাঁপার মত আঙুল হত তাহলে—তাহলে এই রকম একজন ধীরেনের মহিলার খপ্পরে পড়তে হোত না···আচ্ছা কি চান ইনি···ভদ্রমহিলা চাদরটা আরো খুলে ফেললেন এবার তার বাঁ হাতের কব্জিতে জড়ান একটা চামড়ার কী যেন·· ওঃ·· একটা লিক্‌লিকে চাবুক পাশে রাখলেন—

"বসুন না সম্পাদক মশাই, আপনার হাতে কত ক্ষমতা, কত লোকের সাধ আহ্লাদ মেটাতে পারেন, কত প্রতিভার সামনে গদ্দীয়ান বসিয়ে দিতে পারেন, কত সাহিত্য সুধাকে বগল দাবা করতে" ·· এইবার মুখ তুলে কুটীল প্রায় হিংস্র একটি ভ্রুকুটি করলেন অজ্ঞাত পরিচয় নারী, আশ্চর্য। স্তম্ভিত হয়ে ভাবছে সুবিমল মুখটা কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর ধনুকের মত বাঁকানো ভুরু, ঈষৎ স্ফুরিত অধর—এককালে না জানি ইনি কি ছিলেন···

"চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন কেন?" গর্জন করে উঠল একটা গম্ভীর স্বর—"অনিন্দ্যাকে ডেকেছিলেন কেন, লেখা ছাপতে হলে সম্পাদকের বাড়িতে আসতে হবে কেন? সব উত্তর আমি জানি, লেখা সম্বন্ধে তাকে দু'চারটে পরামর্শ দেবেন, ছদ্ম সুরে দেবেন, সে যে লেখাটা পাঠিয়েছিল সেটা কার লেখা জানেন? একাডেমী পুরস্কার পাওয়া সুব্রত মিত্রের—আপনি কি ভেবেছিলেন অনিন্দ্যা আপনাকে দেখে পাগল হয়ে যাবে?" হাঃ হাঃ হাঃ উচ্চহাসি পর্দায় পর্দায় উঠছে সুবিমলের কানের মধ্যে আগুনের হল্কা ছুটিয়ে। মোটা ব্যাগটা খুলে ফেললেন ভদ্রমহিলা—এই দেখুন অনিন্দ্যার ছবি—তারপর কম্পাকটকেস হাতড়ে বের করে সামনে ধরলেন এই আয়নায় নিজের ওই শুকিয়ে যাওয়া মর্কট মার্কা মুখ দেখুন…"

অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সুবিমল—এ কে? এ কে? এ কার ছবি? যেমন কোনও কোনো একটা নূতন জায়গায় এসে হঠাৎ মনে হয় এখানে যেন আগে কবে এসেছিল তেমনি ঐ ছবির থেকে এক জোড়া দুষ্টুমীভরা জলজলে আশ্চর্য চোখ তাকে যেন খুব একটা পরিচিত জগতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে—সম্পূর্ণ ভুলে গেছে সামনের ঐ ভয়ানক কঙ্কাল ভদ্রমহিলার রুক্ষমূর্তি—আশ্চর্য কবিতা মনে আসছে সুবিমলের—এই যে এলো সেই আমারি স্বপ্নে দেখা রূপ; কৈ সেউলে সেউটী দিলি, কৈ আলামি ধূপ। "কি দেখছেন হাঁ করে? মনে হয় একে মোহিত করবার ক্ষমতা আছে আপনার?"

অনেকক্ষণ উত্তরশূন্য ঘর…নর্দটা আবার ঘরে ঢুকে পড়ে আলো প্রদক্ষিণ করছে ফড়্ ফড়্ করে। উঠে পড়লেন ভদ্রমহিলা, হঠাৎ গলার স্বর আশ্চর্য দ্রব হয়ে গেল—চাবুকটা কের হাতে জড়াতে জড়াতে বলেন—"ভেবেছিলুম আপনাকে একটা উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে যাব কিন্তু আর সে ইচ্ছে নেই—আয়নায় আপনাকে আপনার স্বমূর্তি দেখাতে গিয়ে নিজেও আপনাকে ভাল করে দেখলুম। আপনি নিশ্চয় ডিসপেপসিয়ার রুগী, মনও রোগগ্রস্ত বঞ্চিত আর বুভুক্ষু—আপনার মার্ভের চিকিৎসা করান দরকার।"

দরজায় বাইরে যেতে যেতে একটু থেমে মৃদু একটু হেসে আবার একটি বিশেষ ভঙ্গী করে মুখটি তুললেন ভদ্রমহিলা, সে চোখে ভ্রূকুটী নেই, পরিতৃপ্ত জীবনের সুন্দর ক্ষমা। আশ্চর্য, আশ্চর্য, আশ্চর্য। সেই সময়ে তার চিবুকের উপর গালের আলো পড়ে একটা কালো পাথরের মত তিল ঝলমল করে উঠল।

পথের ধারে এক সরাইখানা। ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে ভিক্টর হ্যাগো ক্লান্ত হয়ে সেই সরাইখানায় কিছু খেতে ঘোড়া থেকে নামলেন।

সরাইখানায় তখন লোকজন বেশি ছিলনা। হ্যাগো পানীয় চাইতেই এক পিঠে কুঁজ-ওয়ালা লোক এসে তাঁকে পানীয় দিয়ে গেল।

পরক্ষণেই সরাইখানায় ঢুকল এক অপরূপ সুন্দরী তরুণী। বেশভূষা দেখে মনে হল,—জাতে ইহুদী।

কুঁজো লোকটির চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল,—সে তখনি গিয়ে তার পাশে জিজ্ঞাসু হয়ে দাঁড়াল।

তরুণী কিন্তু কি ভেবে কোন কিছু না বলে সরাই থেকে চলে গেল। ভিক্টর হ্যাগো দেখলেন, কুঁজোর চোখে বেদনার ছায়া।

সারাদিন ধরে গল্প ভেবে ভিক্টর হ্যাগো সন্ধ্যার পর হাত দিলেন তাঁর হাফ ব্যাক অব নটারডামে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

"দ্বিতীয় প্রকৃতি"-র • শ্রীমতী ব্যভেয়ার

নিহির সিংহ

যে কোনও কারণেই হোক—বোধহয় বহুবিধ কারণে মেয়েদের কাছ থেকে আমরা জীবন-দর্শন সম্বন্ধে নূতন পথের নিশানা পাবো তা সহসাই আশা করি না।

অনেকের মনে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে ধারণা থাকে যে মেয়েরা সংসার করতে পারেন, শিশুদের মানুষ করতে পারেন, পুরুষকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন—এমনকি সংসার ভাঙতেও পারেন, তবে মানুষের অস্তিত্বের সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির যোগাযোগ নিয়ে নূতন কোনও দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব।

শ্রীমতী ব্যভেয়ার

অনেকে অবশ্য ভাবেন যে এরমধ্যে অসম্ভবের কিছু নেই তবে পারিপার্শ্বিকটাই এমন যে মেয়েদের মধ্যে এই ক্ষমতা সুপ্তভাবে থাকলেও প্রকাশ পেতে পারে না—পুরুষের সহধর্মিনী বা জীবনসঙ্গিনী-রূপেই তাঁদের জীবন অতিবাহিত হয়ে যায়। মেয়ে হলেই যে মার্শনিকোচিত সৃজনীশক্তির অনুপস্থিতি ধরে নিতে হবে এই ধারণার অসারতা প্রমাণ করেছেন সিমোন দ্য ব্যভেয়ার।

সম্প্রতিকালে কলকাতার পাঠক সমাজ তাঁর লেখা উপন্যাস 'দ্য ম্যাণ্ডারিন্স্'-এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন ইংরাজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর প্যারিসের ইন্‌টেলকচুয়াল সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় লেখা এই বৃহদায়তন উপন্যাসটির সবল তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, নিখুঁত চরিত্র-চিত্রণ ও গভীর সমাজ সচেতনতা বোধ হয় ইংরাজী ভাষার মধ্যে দিয়ে পাওয়া কোনও লেখিকার লেখায় দেখা যায়নি। লেখায় যাকে বলে তার পরিমাণে ডরোথী পার্কার ও ভার্জিনিয়া উল্‌ফের সঙ্গে ব্যভেয়ারকে সমগোত্রীয় বলে ধরা গেলেও ব্যভেয়ারের বিষয়-বস্তুর ব্যাপ্তির সঙ্গে আর কারুর তুলনা করা যায় না। জার্মানীর পদানত প্যারিসের মুক্তিকামী লেখক-শিল্পী-রাজনীতিক কর্মীদের আন্দোলনের দিন হঠাৎ শেষ হয়ে গেল জার্মান সেনাবাহিনীর হটে যাওয়ায়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সুরু হোলো সেইসব আন্দোলনকারীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও অন্তর্বিরোধ।

• দ্বিতীয় প্রকৃতি (The second sex)

কমিউনিষ্ট যাঁরা তাঁরা তাকিয়ে আছেন রুশিয়ার দিকে—ভাবছেন ইউরোপে ফার্যান সামরিক আধিপত্যের অবসানের সঙ্গে সূচনা হোলো রুশিয়ার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদের সর্বনাশের। যাঁরা কমিউনিষ্টদের উদ্দেশ্য ও পন্থা সম্বন্ধে সন্দিহান—তাঁরা ভাবছেন রুশিয়ার এই নূতন সাম্রাজ্যবিস্তারকে কি ভাবে প্রতিহত করা যায়। আর এই দুই দলের মধ্যে রয়েছেন অনেক শিল্পী, অনেক সাহিত্যিক—এমনকি অনেক রাজনীতিক কর্মী, যাঁরা আমেরিকা বা রুশিয়া কারুরই ঔপনিবেশিক বিস্তৃতিকে সমর্থন করছেন না অথচ পথ পাচ্ছেন না কি ভাবে যুদ্ধে বিধ্বস্ত ফ্রান্সকে স্বাবলম্বী ও স্বতন্ত্রভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। প্রবীণ লেখক ও নেতৃস্থানীয় একজন মানুষের আত্মজিজ্ঞাসু স্ত্রী হলেন বইটির প্রধান চরিত্র। সেই সঙ্গে আছেন একজন সাংবাদিক ও তাঁর অতিরিক্ত নৈকট্য বান্ধবী। বান্ধবীটির জীবনে ঐ সাংবাদিক ছাড়া আর কোনও ব্যক্তি তো দূরের কথা সমাজ বা সংসারের আর কিছুরই কোনও অস্তিত্ব নেই। ফলে তাঁর যে ট্র্যাজেডি সেটা নিতান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি, কিন্তু সাংবাদিক পত্নীর বা সাহিত্যিক পত্নীর যে সংশয় তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সমস্ত সমাজের সংশয়।

উপন্যাসটি একজিস্টেনশিয়ালিষ্ট (existentialist) দর্শনের উপর ভিত্তি করে রচিত। আধুনিক এই দর্শন বা দৃষ্টিভঙ্গীটি নিয়ে অনেক আলোচনা আজ পর্যন্ত হয়েছে এবং কোনও দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে তথাকথিত সহজ ভাষায় কোনও আলোচনা করার বিপদ আছে। তবুও বলা যায় যে, নিতান্ত আধুনিক চিন্তাধারা প্রসূত এই জীবন দর্শনের মূল কথাটি হোলো বিশ্বের সামগ্রিক প্রকৃতি নিয়ে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিবর্তে মানুষের প্রতিদিনকার বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ব্যবহারিক রূপটিই বড়। ডেনমার্কের সাহিত্যিক সোরেন কিয়ের্কগার্ডের (Soren Kierkgard, ১৮১৩-৫৫) লেখার মধ্যে বোধ হয় আমরা প্রথম এই দৃষ্টিভঙ্গীটির সাক্ষাৎ পাই। তারপর জার্মান দার্শনিক মার্টিন হাইডেগার (Martin Heidegger, ১৮৮৯—) ও কার্ল জ্যাসপার (Karl Jaspar, ১৮৮৩- -) এক্সিস্টেন্শিয়ালিজমের বক্তব্যটিকে উপস্থাপিত করেন আরও সুসংবদ্ধভাবে। কিন্তু জীবন দর্শনের এই নূতন ধারাটি প্রকৃত শক্তি সংগ্রহ করে সার্ত্র (Sartre) প্রমুখ কয়েকজন ফরাসী সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের নেতৃত্বে। জার্মান দর্শন ব্যতীত অন্য কোনও দর্শন সাহিত্য-নাটকের ক্ষেত্রে এত প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয় না।

ব্যক্তিগত ভাবে ও ষ্যাভেয়ার সার্ত্রের জীবনসঙ্গিনী। সার্ত্রের (Jean Paul Sartre) জন্ম প্যারিসে ২১ জুন, ১৯০৫; ষ্যাভেয়ারের জন্ম তিন বছর আগে, প্যারিসেই ৯ই জুন ১৯০৮ সাল। দুজনেই প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র—দর্শনে। অল্প বয়স থেকেই তাঁদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত হয় এবং সাহিত্যিক ও অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রে পরস্পরের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করার জন্যে বিবাহ তাঁরা করেন নি। এটা সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে নিছক একটা প্রতিবাদ বলে মনে করলে ভুল করা হবে। বিবাহ না করে, বন্ধনহীন পারস্পরিক সহানুভূতির সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে উভয়ের জীবনই এত সার্থকতা পেয়েছে যে বৈবাহিক সম্পর্কের সব প্রতিশ্রুতিই তাঁরা রাখতে পেরেছেন। ষ্যাভেয়ার প্রকৃতই সার্ত্রের জীবনসঙ্গিনী।

বস্তুতপক্ষে 'এক্সিস্টেনশিয়ালিজম' নামটি যেমন দার্শনিক তথা নাট্যকার গ্যাব্রিয়েল মার্সেলের (Gatriel marcel) দেওয়া, এর প্রাণপ্রতিষ্ঠাও তেমনই সার্ত্রের হাতে। সার্ত্রের হাতে প্রাণ লাভ করে একটা দুঃখ বা নিরাশাব্যঞ্জক অবস্থা খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'এক্সিসটেন্স্' বা অস্তিত্ব কোন আপনা-আপনি হওয়া ব্যাপার নয়, মানুষ যখন সচেষ্টভাবে প্রয়াস করে থাকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার তখনই সেটা প্রকৃত অস্তিত্ব। কিন্তু মানুষ জন্মগ্রহণ করে জড় বিশ্বের মধ্যে—তার পারিপার্শ্বিকটা যেন প্রাগৈতিহাসিক

কর্দমকুণ্ড—মানুষ তার মধ্যে প্রোথিত হয়েই তার জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারে আবার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সেই পিঞ্জরাকার টিকে থাকার উর্ধ্বে উঠবারও চেষ্টা করতে পারে।

সার্ত্রের বক্তব্য হচ্ছে যে, সচেতন মানুষের মনে নিরাবরণ হতাশা না এসে পারে না। কেন তাকে এই এই কর্দমকুণ্ডে আবদ্ধ থাকতে হবে? অস্তিত্বটাই অর্থহীন বলে মনে হওয়াটা স্বাভাবিক। অবশ্য সামাজিক এমন কি রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে এবং নিজের অস্তিত্বটাকে অন্যদের অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্তভাবে দেখতে শিখে ক্রমশঃ মানুষ এই অসহায়তার অবস্থা অতিক্রম করে একটা স্বাধীন অবস্থায় আসতে পারে যখন নিজের মনের ভালো কথা বলা সাধ্য এবং উচিত অনুচিত বিচারের সাহায্যে মানুষ প্রগতির পথে এগোতে পারে। সেটাই হোল এক্সিসটেনশিয়ালিজমের চরম কথা। ব্যভোয়ারেরও চরম কথা হোলো সেই। এই তত্ত্ব যে নিছক তত্ত্ব নয়, তাঁর নিজের জীবন লব্ধ তথ্য তার প্রমাণ মেলে দুটি খণ্ডে প্রকাশিত আত্মজীবনীতে যি ডিউটিফুল ডটার (The Dutiful Daughter) এবং ইন্ দ্য প্রাইম অব লাইফ (In the prime of life) এই দুইটিতে।

বহু মানুষের বা সকল মানুষের আত্মজীবনী সবসময়েই কৌতূহলোদ্দীপক, অনেক সময়ে তার থেকে আরও ভালো হবার বড় হবার প্রেরণা পেয়ে থাকি। কিন্তু এই বই দুটিতে পাঠকের মনটা যেভাবে নাড়া পায় তা প্রকৃতই অসাধারণ। প্রথম বইটিতে লেখিকা বর্ণনা করছেন শৈশব থেকে সুরু করে ১৭।১৮ বৎসর পর্যন্ত সময়। অর্থাৎ যে পারিবারিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার থেকে উর্দ্ধে স্বাধীনতার স্তরে উন্নীত হবার প্রয়াস। দ্বিতীয় বইটিকে বলেছেন ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত পরিণতির কাহিনী। পারিপার্শ্বিকের ও স্ত্রীর চরিত্রের এ রকম অপূর্ব সুন্দর বিশ্লেষণ আর পড়া গিয়েছে বলে মনে হয় না।

দর্শনের ছাত্রী, পিতার সংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে বাইরে গিয়ে এসেছেন প্রথম মহাযুদ্ধের পরেকার প্যারিসের খোলা হাওয়ায়। দরিদ্র, কিন্তু সার্ত্রের সঙ্গে এক সম্পূর্ণ প্রেমের সম্পর্কের অধিকারিণী। নিজে রাজনীতির আন্দোলনগুলির থেকে তফাতেই আছেন, শিক্ষক বৃত্তি গ্রহণের পরে সহকর্মিনী বা ছাত্রীদের সঙ্গেও সাধারণ ভাবে যে ঘনিষ্ট যোগাযোগ আছে তা নয়। বরং একটা প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছেন বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগের জন্যে। ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, এ্যালজিরিয়া, জার্মানী, গ্রীস—ঘুরছেন পায়ে হেঁটে কিম্বা আরও সতাহগতিক পথে। আর সঙ্গীরা হচ্ছেন ফ্রান্সের উঠতি চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবীরা। বিরাট পটভূমিকায় কাশিজমের অভ্যুদয় ঘটছে, প্রথমে এ্যাবিসিনিয়া, তার পরে স্পেন, তারও পরে ইতিহাসের নিষ্ঠুর পরিহাসে ইউরোপে জ্বলে উঠছে প্রচণ্ড যুদ্ধের আগুন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্য অনেকের মতন ভাবছেন সর্বনাশ হবে না, যুদ্ধ বাধবেনা।

কিন্তু যুদ্ধ বাধছেই। সার্ত্রে যুদ্ধে চলে যাচ্ছেন সৈনিক হিসাবে, একবৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের পতনের অব্যবহিত পরে যাচ্ছেন জার্মান বন্দীশিবিরে। কিন্তু সার্ত্রে নিখুঁতভাবে কাটিয়ে উঠছেন ব্যভোয়ারের চাইতে আগে, নানান্ কৌশল করে শেষ পর্যন্ত বন্দী শিবির থেকে পালিয়ে এসে প্যারিসে গা ঢাকা দিয়ে যোগ দিচ্ছেন মুক্তি আন্দোলনে (Resistance movement তথা maqui)। ধীরেধীরে ব্যভোয়ারের জীবনে সমাজ সচেতনতা জাগ্রত হচ্ছে দেশব্যাপী সর্বজনীন দুঃখের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে। সার্ত্রকাতর, শান্তিপ্রিয়, সাধারণ বীর্যশক্তিসম্পন্ন, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় একটি মানুষের চারিত্রিক ক্রম-বিকাশের অপূর্ব চিত্র এঁকেছেন ব্যভোয়ার। তাঁর উপন্যাস 'দ ম্যাণ্ডারিনসের' রচনার ইতিহাসও যেমন পাওয়া যায় উপন্যাসটির বহু চরিত্র ও ঘটনার উৎসও খুঁজে পাওয়া যায় বই দুটিতে।

ব্যক্তি ও সমষ্টির মধ্যে সম্পর্ক এক একজন মানুষের ক্ষেত্রে এক একরকম রূপ পরিগ্রহ করে। একটি বিশেষ রূপ আমরা এখানে পাই যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক হোলো কমিউনিজমের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রতিষ্ঠাতের ইতিহাস। স্তালিনের আমলে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি তথা আন্তর্জাতিক কমিউনিজম ও তার পরিপ্রেক্ষিতে সৎ কমিউনিষ্ট কর্মীর বলিদান 'ইন দ্য প্রাইম অব লাইফের' মধ্যে একটি বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে। যেমন করেছে সাধারণ ভাবে মেয়েদের অস্তিত্বের প্রশ্নটি। অধিকারিত, বুদ্ধিজীবী পরিবৃত বয়স্কা মহিলা হিসাবে স্বতঃই তাঁর মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছে। মেয়ে বলে মানুষের যে একটি জাত আছে, মানুষের সমাজে তার প্রকৃত স্থানটি কোথায় সে সম্বন্ধে।

বাভোয়ারের দ্য সেকেণ্ড সেক্স (The second sex) বইটি জন্মগ্রহণ করেছে সেই প্রশ্নের থেকেই। মেয়েরা ছেলেদের থেকে আলাদা—কিন্তু কেন এবং কতটা আলাদা সে প্রশ্নের এ ধরণের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়নি। আমেরিকা যুক্তরাজ্যে কিন্‌সে (Kinsay) প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা পরিসংখ্যান মূলক তথ্য সংগ্রহ করেছেন ছেলেদের ও মেয়েদের যৌন জীবনে পার্থক্য সম্বন্ধে। বাভোয়ার আরম্ভ করেছেন সেই পার্থক্য দিয়ে। তার পরে এসেছেন সামাজিক ও পারিবারিক পারিপার্শ্বিকের পরিপ্রেক্ষিতে মেয়েদের "মেয়েলী" হওয়ার ইতিহাসে এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনার আলোচনায়। জীববিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি সবদিক দিয়ে মেয়েদের সামগ্রিক অস্তিত্বের বিশদ আলোচনা পাওয়া যায় বইটিতে। সক্রিয় ভাবে নিজের অস্তিত্বকে জানতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে যে মেয়েরা উৎসুক এবং মানব সমাজের অর্দ্ধেক পরিমাণ এই "মেয়েজাত"টির সম্বন্ধে সচেতন হতে যে ছেলেরা আগ্রহী তাঁদের এই বইটি না পড়ে চলবেনা।

বাভোয়ারের বর্তমান বয়স ৫৫ বৎসর। জীবনে তাঁর সার্থকতা এসেছে অনেক। সার্ত্রের প্রতিষ্ঠিত দর্শনের তিনিও একজন রূপকার, সার্ত্রের জীবনসঙ্গিনী তো বটেই। তাঁর দ্য ম্যাণ্ডারিন্‌স্ ফ্রান্সের দুর্লভ গঁকুর পুরস্কার [Prix Goncount, 1954] লাভ করেছে। আমরা তাঁর অগণিত গুণগ্রাহী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছি : আজকে সব চাইতে উল্লেখযোগ্য মহিলা সাহিত্যিক বলে তাঁকে কেউ অভিহিত করলে ঝগড়া করার কিছু নেই। তবে তাঁর সব চাইতে বড় সার্থকতা বোধহয় তাঁর পরিপূর্ণ জীবনটি—বাঁচার মতন করে তিনি বেঁচেছেন।

[সিমোন দ্য বাভোয়ার—পুরো নাম। Simone Lucie Ennestine Marie Bertrand de Beauvoir ; ইংরাজী ভাষায় তাঁর নিম্নলিখিত বইগুলি পাওয়া যায় : The Long March, Blood of others, She came to stay, America day by day, Must we Burn De Sade ? The Second Sex, The Mondarins, All men are mortal, Memories of a Dutiful Daughter, Bridgitte Bardot and the Lolita Syndrome, Djamila Bonpacha.]

সাহিত্য-সংবাদ

বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিশ্ববীক্ষা ?

পবিত্র পাল

বিশুদ্ধ সাহিত্য ব্যাপারে আমার অনীহা বরাবর। এবং যে হেতু তাই, সে হেতু সে সমস্ত সাহিত্যিকদের আমি কঙ্করার চোখে দেখি, যাঁরা রমারচনার চাতুর্যে উপন্যাসলিখনের বলাকুশলতায় আত্মতৃপ্তি লাভ করেন। ইদানীং কালের কিছু কিছু মহাভারত-সদৃশ বই চমৎকার বিক্রীর বরাত লাভ করেছে। এতে কি এই প্রমাণিত হয়, সাহিত্যের গুণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে; যে কোন বুদ্ধিমান পাঠক (যদি-ও বুদ্ধিমান পাঠকের উপস্থিতি এ সমস্ত সাহিত্যকারদের নিশ্চয়ই মনে কোন আন্দোলন উপস্থিত করেনা, এঁরা এতই ধ্যানস্থ এবং নির্বিকার।) একবাক্যে নঞর্থক ভাবে উত্তর দেবেন। কেউ কেউ বলবেন, বুদ্ধিমান পাঠকরাই কি লেখকদের লেখবার সময় একমাত্র ক্ষেত্রবস্তু? আমি তা বলছিনে। বক্তব্যটা হল এই, বুদ্ধিমান পাঠকের সংখ্যা দিন দিন না বাড়লে সাহিত্য কোন দিন প্রশংসনক মান লাভ করতে সক্ষম হয় না। লেখক যদি বুদ্ধিমান পাঠকের উপস্থিতি স্বীকার না করেন, তবে তিনি কোনদিনই সমুদ্রের সংগে লেখাটিকে দেখবেন না। কতকগুলো সহজ ভালোলাগার তত্ত্ব দিয়ে তৈরী এক ফর্মুলার মেসিনে কলমটা চাপিয়ে গাদুশ নির্বিকারত্ব লাভ করতেই তাঁরা ভাল বাসেন। এর ফলে চটুল ভালোলাগার সময়-সীমা বহুকালের জন্য এক অদুর্বর অবস্থার সৃষ্টি করে সাহিত্যের ওপর ঝুলতে থাকে। এটাই কি এখনকার মত বড় লক্ষ্যণীয় বিষয় নয়? এখানে বলে রাখা ভাল, বুদ্ধিমান পাঠক মানেই নাক-উঁচু এক ধরণের সার্কাসের ক্লাউনের মত বুদ্ধিজীবীকে বুঝাচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথ যে সময় বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে নিজের প্রতিষ্ঠা কেড়েছেন, সে সময় ক'জন লোক তাঁর কদর বুঝতেন? তখন ক'জন রসিক রবীন্দ্রনাথের লেখার বিশাল হিমালয় সম গাম্ভীর্যের পর্বা সরিয়ে রস গ্রহণ করতে পেরেছেন? যে ক'জন পেরেছেন তাঁদের সংখ্যা খুবই অল্প ছিল। আজ সে সংখ্যা অনেক বেড়েছে। এটা রবীন্দ্রনাথের দৌলতেই সম্ভব হয়েছে। বুদ্ধিমান পাঠকের উল্লেখ আমি এ অর্থে-ই করতে চেয়েছি।

কেন এমন হাল হয়েছে?

স্বভাবজ বুদ্ধির কর্ষণ বস্তুবুদ্ধিসম্পন্ন হলে সে বুদ্ধি কোনদিন বৈদগ্ধ লাভ করে না। স্বভাবজ বুদ্ধির এমন কর্ষণকে আমি বলব স্বভাবজ কর্ষণ। নারী ব্যতীত অন্যকিছু অতি আধুনিক বুদ্ধি কলমদল লেখক লেখার বস্তু খুঁজে পান না। অনেকটাই আত্মরতিসুলভ মদির ভাববিহ্বলতায় বুঁদ হয়ে তাঁরা লেখেন। লিখন কুশলতা এঁদের কয়েক জনের অতি আশ্চর্য রকম। কিন্তু আশ্চর্যশক্তি বা নিপুণতা বিপথগামী হয়ে মরে যায়। যেমন একজনের কথা বলি। একটি মাত্র বই তিনি লিখেছেন। কোন বিশিষ্ট ঐতিহাসিকে অনেক গল্পে ভাগ নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা' বইটির নাম। বইটি

নিয়ে খানিকা আনন্দ ছুঁড়েছেন লেখকের প্রতি অতি আধুনিক লেখক সম্প্রদায়। কিন্তু সত্যিই এর কোন ভিত্তি আছে? কোন ভিত্তি নেই। প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাকে অত সাবলীল, মনোরম ও মর্যাদাশীল সহজবোধ্যতায় মন্ডিত করেছেন, আমরা কি এখন সেখান থেকে সংস্কৃত দুর্বোধ্যতার অতিপুরাতন বাংলা গদ্যে আশ্রয় নিই তাতে কোন বাহাদুরী। ভাষা নিয়ে তাঁর পরীক্ষা আন্তরিকতাপূর্ণ মূল্য ব্যতীত কোন মূল্যই বহন করে না। পুরনো ঘটনাকে তিনি উপন্যাসে যে চরিত্র দিতে চেয়েছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসাজনক। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি নন্দিত হয়েছেন তাঁর বিকৃতক্রিয়াকার ভাষাটির জন্য। তাঁর ক্ষমতা অনেকেরই ঈর্ষার উদ্রেক করে। শেষ দিকে তিনি মাত্রাবোধ হারিয়েছেন তার কারণই হ'ল সেই অতি কথিত কারণ। তাই'ল নারীদের নিয়ে বিস্তর বিকৃতি মনে পুঞ্জীভূত হওয়াতে আধুনিকরা সে কারণে ব্যর্থ হয়েছেন। অথচ লেখকের ক্ষমতা বুদ্ধির দীপ্তি বৈদগ্ধ্য অতি কখনও সত্যের উজ্জ্বলতা হারাবে না। হ্যাংটাই তাঁকে ব্যর্থ করল এই বইটিতে, যে 'হ্যাংটা' নষ্ট করছে আরো কয়েকজন ক্ষমতাশালী অতি আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের।

প্রসঙ্গে আসি। স্বভাবজ বুদ্ধি দিয়ে সকল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া যায় না। স্বভাবজ বুদ্ধির সংগে বিশ্বদীক্ষার সংযোগ না হলে এ সম্ভব না। চল্লিশের দশক থেকে সুরু করে এখন পর্যন্ত সংঘটিত আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনাকে নাড়া দিয়েছে। একমাত্র নির্বিকারত্ব লাভ করা ব্যক্তিরাই তার থেকে শত হস্ত দূরে থাকে। বিশ্বদীক্ষার অধিকারী লেখক বাংলাদেশে বাংলাসাহিত্যে একজন আছেন, এ ইতিপূর্বে বলেছি এবং এখনো বলছি, তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। পূর্ববর্তী কোন এক সংখ্যায় তাঁর সম্পর্কে আমি আলোচনা করেছি।

আর দ্বিতীয় কোন লেখক আমার কাছে ধরা দেন না যিনি অন্নদাশঙ্করের পাশাপাশি দাঁড়াতে পারেন। বিশ্বদীক্ষা নিস্তুতে একজন ব্যক্তিকে বাধ্য করে জীবনের প্রতিটি প্রশ্নের মুখোমুখী দাঁড়াতে, বাধ্য করে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর সুসমঞ্জস ভাবে খুঁজবার জন্যে; বাধ্য করে উত্তরগুলোর দ্বারা জীবনের মূল অন্তর এক প্রাণরসে সিক্তিত করতে, বাধ্য করে ন্যায় অন্যায়ের, সুবিচার অবিচারের, গ্রাহ্য-অগ্রাহ্য, মানবিক বিষয়ের দ্বন্দ্বে নিজের ভূমিকাকে সত্যের, বিবেকের, দায়িত্বের আলোতে স্থিরীকৃত করতে; বাধ্য করে দেখতে কোন ছোট লোভই যাতে তাঁর বৃহত্তর নিলিপ্ত-মোহকে প্রতারিত করতে না পারে। স্বভাবজ বুদ্ধিকে এভাবে কর্ষণ করে নিতে যিনি পারেন, তিনি জীবনশিল্পী। প্রতিমুহূর্তে আন্দোলিত, যন্ত্রণাতাড়িত, ভীত হওয়ার সম্ভাবনাকে যিনি দু'হাতে ঠেকাবার চেষ্টা করেন আর তার পরিবর্তে অকম্পিত, সতেজ, প্রাণবন্ত শক্তির পরিমণ্ডল রচনা করার দুরূহ কাজে ব্রতী হ'ন। আমি ভাবতে পারি না যিনি আপোষ বিরোধী না হবেন, তিনি কি করে মঙ্গলের কথা বলেন, কি করে সাহিত্য রচনার মত গুরুদায়িত্বে হাত দেন, কি করে নিজেকে শিল্পী বলে আখ্যা করেন। 'শিল্পীর স্বাধীনতা'র মত সমস্যা মূলক আন্দোলনের ভূমিকা আর কীলার কাহিনীর কেচ্ছা কেলানোর ভূমিকা এ দুটো একত্রে একাসনে বসে এ আপোষ বিরোধিতার অভাবের জন্যে। এবং চরিত্রহীনতার জন্য-ও বটে।

কিউবা সংকট, আণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধ চুক্তি, বিশ্বো-নির্যাতন, কংগোর ঘটনাবলী, লাওস, দক্ষিণ ভিয়েটনামের বৌদ্ধ-নির্যাতন, গুপল, মাও-সে তুংয়ের মস্কোচুক্তির বিরোধিতা, বার্লিন সীমারেখা সম্পর্কিত ঘটনাবলী প্রভৃতি বিষয়ের মধ্যে মানব সমাজেরই সমস্যার প্রশ্ন লুকিয়ে আছে। এগুলো

বহুদূরে ঘটলেও আমাদের তাড়িত করে, সমতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক ভাবনাগুলোকে বিড়ম্বিত করে, ভবিষ্যতের চেহারার মধ্যে এক দারুণ কালোছায়াকে পরিস্ফুট করে। তেমি সমস্তাগুলো থেকে সংকট মুক্তির উপায়ে যে সমস্ত নৈতিক কাজ করে চলেছেন, তাঁরা কালোছায়ার পর্দা সরিয়ে অনির্বাণদূর ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি-বিন্দুর আভাসও টানেন। বিশ্বদীক্ষার বিরল ক্ষমতা এ ভাবেই উৎস খুঁজে পায়। সমগ্র মানব সমাজের একজন বলে মনে হয়। বিশ্বদীক্ষার আলোতেই জাতীয়তাবাদ হয় ব্যাখ্যা পায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতীয়তাবাদ এ ভাবেই এক বিশেষ চরিত্র খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু ছোট-খাটো বাণিজ্যিক স্বার্থসঙ্কুল লোভগুলো যখন তখন বিশ্বদীক্ষার অন্তরালে চলে যায় এবং ন্যায় অন্যায়ের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলো মোহগ্রস্ত করে, আপন নিয়মে রচিত হয় এবং তখন অতিবড় লেখকও মর্মান্তিক হারান, নিজের সমস্ত কীর্তিকে অস্পষ্ট করে তুলেন। এরকম অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

আমি মনে করি, বিশ্বদীক্ষার অধিকারী না হলে স্বভাবধর্ম বুদ্ধি কখনো পরিণত হয় না, মতামতের পার্থক্যসত্ত্বেও সততার দাবী অস্বীকৃত হতে বাধ্য।

আজ বাংলা সাহিত্য নিতান্তই স্থানীয়, নিতান্তই নারীর স্নেহেই সীমিত। আশ্চর্য এত বড় দাঙ্গা, এত বড় দেশবিভাগের মত ঘটনা ঘটে গেল : কেউ একটা সার্থক ক্লাসিক লিখতে পারলেন না। সস্তা রোমান্টিকতায় সবাই নিঃশেষিত, তার কারণই হল, আজ সেইরকম বিশ্বদীক্ষা এদের কাছে ক্যাসান স্বরূপ গৃহীত, প্রাদেশিক কংগ্রেস নেতার মূর্তামীপাসিত চিন্তাজীবী সম্মেলনের মধ্যে তাঁদের বুদ্ধির অমরাবতী রচিত হয়। এখানে বিশ্বদীক্ষা? একি মায়া, একি মরীচিকা? অথচ বিশ্বদীক্ষা অর্জিত না হলে মানব সভ্যতার সমৃদ্ধির কথা বাতুলতা মাত্র।

ঔপন্যাসিক মার্ক টোয়েন খুব মাছ ধরতে ভাল বাসতেন। তিনি তাঁর বাড়ীর ধারে নদীর তীরে বসে মাছ ধরছেন এমন সময় অফিস থেকে খবর নিয়ে তাঁর কাছে এলেন তাঁর ভাইপো। তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন।

ঠিক সেই সময়ে তাঁর ছিপে একটা মাছ ঠোকর দিয়েছে। তিনি বললেন—আরে রেখে দাও তোমার ও খবর, অনেকক্ষণ পরে একটা মাছ পেয়েছি—এটাও আমার কাছে একটা Noble Prize তা জান?

সাদা কালোর ছন্দ

ডরোথী পার্কার

মাথার রঙকরা সোনালী চুলে সোনালী ভেলভেটের পটি জড়ানো ভদ্রমহিলাটি লাস্যের সঙ্গে গা দুলে দুলে হাঁটার সংমিশ্রণ এক মনোহারিণী চলনে জনাকীর্ণ ঘরটি অতিক্রম করে গৃহস্বামীর নাতিস্থূল বাহুটি আঁকড়ে ধরলেন।

"এইবার আপনাকে ধরে ফেলেছি!" তিনি বললেন। "এখন আর পালাতে পারছেন না।"

"আরে, এই যে," গৃহস্বামী বললেন। "তারপর? কেমন আছেন?"

"ওঃ আমি চমৎকার আছি," ভদ্রমহিলা বললেন। "একেবারে স্রেফ চমৎকার। শুনুন। আপনাকে আমার একটা দারুণ উপকার করে দিতে হবে। করবেন তো? করবেন তো, হ্যাঁ? লক্ষ্মী, হ্যাঁ?"

"জিনিষটা কী?" গৃহস্বামী বললেন।

"শুনুন না," মহিলাটি বললেন, "আমি ওয়াল্টার উইলিয়মসের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আমি একেবারে পাগল ঐ লোকটার লেখাতে। ওঃ যখন ও গান করে। যখন ঐ স্পিরিচুয়ালগুলো* গায়! আমি তো বার্টনকে বললাম, 'তোমার পক্ষে খুব ঘাঁচোরা যে ওয়াল্টার উইলিয়মসের গায়ের রঙ কালো' আমি বললাম, 'তা না হলে তোমার হিংসে হবার মতন অনেক কারণ ঘটতো।' আমার সত্যি খুব ভালো লাগবে ওর সঙ্গে আলাপ হ'লে। আমার ওকে বলতে ইচ্ছে করছে যে ওর গান আমি শুনেছি। লক্ষ্মীটি আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবেন?"

"হ্যাঁ নিশ্চয়ই," গৃহস্বামী বললেন। "আমি ভেবেছিলাম ওর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে। ওর জন্যেই তো এই পার্টি। কিন্তু সে কোথায়?"

"ঐতো ওখানে বুককেসের ধারে," ভদ্রমহিলা বললেন। "ওঁরা ওর সঙ্গে কথা শেষ করা পর্যন্ত দেরী করা যাক্। সত্যি, আমি ভাবছি যে আপনি কি ভালো, ওর জন্যে এমন ভীষণ সুন্দর পার্টি দিচ্ছেন, ওর সঙ্গে এত সব শ্বেতাঙ্গদের আলাপ করিয়ে দিচ্ছেন-টিচ্ছেন। ও নিশ্চয়ই দারুণ কৃতজ্ঞ?"

"বোধ হয় না," গৃহস্বামী বললেন।

"আমার মনে হয় আপনি ভারী ভালো" ভদ্রমহিলা বললেন। "সত্যি মনে হয়। আমি তো একেবারেই বুঝতে পারিনা যে কালো চামড়া লোকেদের সঙ্গে আলাপ করা ঠিক নয় কেন। আমার তো এতে খারাপই লাগেনা—একটুও না। বার্টন—ওঃ, ওতো ঠিক উল্টো। আপনি তো জানেনই, ওতো ভার্জিনিয়ার লোক, আর আপনি তো জানেনই ওরা কেমন হয়।"

"উনি কি এসেছেন আজকে?" গৃহস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন।

---

* নিগ্রোদের ধর্মপ্রধান লোক সঙ্গীত।

"না, ও আসতে পারলো না," ভদ্রমহিলা বললেন। "আমি আজকে ঠিক এক প্রোফেসর-তর্জমা।" বেরোনোর সময়ে আমি বললাম ওকে। "আজকে যে আমি কি করব তার কোনও ঠিক নেই, আমি বললাম। ও সত্যি একেবারে শ্রান্ত হয়ে ছিল, নড়তেই পারছিল না। কি বিচ্ছিরি, না?"

"হুঁ," গৃহস্বামী বললেন।

"দাঁড়ান না, আমি ওকে যখন বলবো যে ওয়াল্টার উইলিয়ামসের সঙ্গে আলাপ করেছি!" ভদ্রমহিলা বললেন। "ও একেবারে মরেই যাবে। ও: কালো চামড়া লোকেদের নিয়ে আমাদের আরও তর্কাতর্কি হবে। ওর সঙ্গে এমন ভাবে কথা বলবো যে কি বলবো, সত্যি এত উত্তেজিত হয়ে যাই। আমি তো বলি, 'ও: ওরকম ছাড়া হয়ো না।' তবে বার্টনের হয়ে এটাও বলবো যে অনেক সব ঘর্ষনের * চাইতে ও শতগুণে উদার। ও সত্যি কালো চামড়া মানুষদের অনেক পছন্দ করে। হ্যাঁ, ও তো নিজেই বলে, শ্বেতাঙ্গ চাকর বাকর চাইনা। আর জানেন, ওর সেই কালো চামড়া বুড়ি আয়া আছে, সেই কালো চামড়া বুড়ী ধাইমা। আর ও তো তাকে কি ভালো বাসে। কি বলবো, প্রত্যেকবার ও বাড়ী দিয়ে রান্নাঘরে চলে যায় তাকে দেখবার জন্যে। ও যায়, সত্যি বলছি, আট পর্যায়। ও শুধু বলে যে কালো চামড়া লোকেদের নিয়ে ওর কিছু বলার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তারা বাড়াবাড়ি না করছে। ওতো সব সময়ে তাদের জন্যে এটা ওটা কি করছে, তাদের জন্যে জামাকাপড় দিচ্ছে, আরও কি সব আমি জানিও না। ও শুধু একটা কথা বলে, ও বলে যে মদখাব তবার দিনেও কোনও কালো চামড়ার সঙ্গে খেতে বসবে না। "উঃ," আমি বলি ওকে, 'আমার রাখা খারাপ করে দাও, ওরকম কথা বলে।' আমি ওকে একেবারে যাচ্ছেতাই করে দিই। আমি একটা যাচ্ছেতাই, না?"

"যাঃ না, না, না," গৃহস্বামী বললেন। "না, না।"

"হ্যাঁ, আমি তাইই," ভদ্রমহিলা বললেন।" আমি জানি আমি তাই। বেচারী বার্টন্! অথচ আমি, আমি একেবারেই ওভাবে ভাবি না। কালো চামড়া লোকেদের নিয়ে আমার একটুও কিছু মনে হয় না। কেন, আমি তো তাদের কাউকে কাউকে ভীষণ পছন্দ করি। একেবারে শিশুদের মতন ওরা ঠিক ঐ রকম, সরল, আর সব সময়ে গান গাইছে, সব সময়ে হাসছে, আর ঐ সব। ওদের চাইতে সুখী জীব জীবনে দেখেছেন? সত্যি বলছি, ওদের কথা শুনলেই আমার হাসি পায়। ও: আমি ওদের দারুণ ভাল বাসি। সত্যি বাসি। আচ্ছা, ভালো কথা, শুনুন, আমার এক কালো চামড়া ধোপানী আছে, আমার কাছে আছে অনেক বছর ধরে। আর আমি তাকে খুব পছন্দ করি। সে একটা দারুণ চরিত্র। আর আমি আপনাকে যা বলতে চাচ্ছি, আমি তাকে ভাবি আমার বন্ধু হিসেবে। আমি ঐভাবেই ওর সম্বন্ধে চিন্তা করি। বার্টনকে আমি যেমন বলি, 'আচ্ছা, যাই হোক না কেন, আমরা সবাইই তো মানুষ। তাই নই কি?"

"হ্যাঁ," গৃহস্বামী বললেন। "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই!"

"এই যে ওয়াল্টার উইলিয়ামস্," ভদ্রমহিলা বললেন।" আমার মনে হয় ওরকম একজন মানুষ প্রকৃত শিল্পী। আমি তাই ভাবি। আমি তো ভাবি ওর অনেক কিছু প্রাপ্য আছে। সত্যি গান নিয়ে বা ঐসব নিয়ে আমি এমন পাগল যে ওর গায়ের কি রঙ তা নিয়ে ভাবিই না। আমি

* আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলেই আগে ক্রীতদাস প্রথার বেশী প্রচলন ছিল।

সত্যিই ভাবি যে যদি কোনও লোক শিল্পী হয় তো তার সঙ্গে আলাপ করতে কারুর কিছু মনে করা উচিত নয়। তাই ঠিক আমি বলি বার্টনকে। আপনি কি বলেন, ঠিক নয়?"

"হাঁ," গৃহস্বামী বললেন। "হাঁ, নিশ্চয়ই।"

"আমি ঠিক ঐ ভাবেই ভাবি," ভদ্রমহিলা বললেন। "আমি একেবারে বুঝতে পারিনা লোকের মন কেন ছোটো হবে। কেন, আমি তো ভাবি যে ওয়াল্টার উইলিয়াম্‌সের মতন লোকের সঙ্গে আলাপ হওয়াটা একটা সৌভাগ্য। সত্যি আমি তাই ভাবি। আমার তো কিছু মনেই হয় না। আরে হাজার হোক ভগবানই তো তাকে তৈরী করেছিলেন, যেমন আমাদের সকলকে তৈরী করেছেন। ভগবানই কি তৈরী করেন নি?"

"নিশ্চয়ই," গৃহস্বামী বললেন। "হাঁ, তাই তো।"

"আমি তো তাই বলি," ভদ্রমহিলা বললেন। "ওঃ কালো চামড়া লোকেদের সম্বন্ধে সকলে ছোটোমী করলে আমি কি খেপেই যাই। কিছু না বলে চুপ করে থাকাই আমার মুস্কিল হয়। অবশ্য এটা স্বীকার করি যে কালো চামড়া খারাপ হলে তারা একেবারে সাংঘাতিক হয়। কিন্তু আমি যেমন বার্টনকে বলি, যেতাম খারাপ লোকও তো আছে পৃথিবীতে। আছে নাকি?"

"আমার তো মনে হয় আছে," গৃহস্বামী বললেন।

"কি বলবো, আমি সত্যি খুব খুশী হবো যদি ওয়াল্টার উইলিয়াম্‌সের মতন কেউ আমার বাড়ীতে আসে আর আমাদের গান গেয়ে শোনায়, কখনও কোনও সময়ে", ভদ্রমহিলা বললেন। "অবশ্যই বার্টনের জন্য ওকে আমি ভাবতে পারবো না, তবে তা নিয়ে আমার একটু কিছু ঘিয়া হোতোনা। ওঃ কি গানই গাইতে পারে!"

"কি আশ্চর্য্য, না ওদের সকলের মধ্যেই কি রকম গান আছে? ঠিক মনে হয় যে ওটা যেন ওদের ভিতরেই আছে। আসুন না, আমরা ওদিকে যাই, ওর সঙ্গে কথা বলি। শুনুন, ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি কি করবো? আমার কি হ্যাণ্ড শেক করা উচিত? না কি?"

"কেন, যা ইচ্ছে করে তাই করবেন," গৃহস্বামী বললেন।

"আমার মনে হয়, আমার বোধ হয় তাই করা উচিত," ভদ্রমহিলা বললেন। "যাই হোক না কেন আমি তাকে কিছুতেই ভাবতে দেবো না যে আমার কোনও খটকা আছে। আমি ভাবছি হ্যাণ্ড শেকই করবো, যেমন অন্য যে কোনও কারুর সঙ্গে করি। তাই করবো।"

বইয়ের আলমারীর পাশে দণ্ডায়মান দীর্ঘাকৃতি নিগ্রো যুবকটির কাছে তাঁরা পৌঁছোলেন। গৃহস্বামী পরিচয়াদি সাঙ্গ করলেন। নিগ্রো ভদ্রলোকটি নীচু হয়ে অভিবাদন জানালেন।

"নমস্কার", তিনি বললেন।

সোনালী ভেলভেটের পদিতে সজ্জিত ভদ্র মহিলাটি হাতটি পুরো বাড়িয়ে দিলেন, যাতে সকলে দেখতে পায়, যতক্ষণ না নিগ্রো ভদ্রলোকটি সেটিকে গ্রহণ করে, হ্যাণ্ড শেক করে আবার তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন।

"ওঃ কেমন আছেন মিষ্টার উইলিয়ামস?" ভদ্রমহিলা বললেন। "শুনুন, কেমন আছেন? আমি তো এই বলছিলাম, আপনার গান কি দারুন ভালো লেগেছে আমার। আপনার অনুষ্ঠানেও গিয়েছি, আপনার রেকর্ড টেকর্ড সবই আছে আমাদের। ওঃ আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে।"

ভদ্রমহিলা খুব মোটা মোটা করে কথা বলছিলেন, ঠোঁট স্পষ্ট ভাবে নাড়িয়ে। যেন বধির কোনও মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন।

"আমার খুব ভালো লাগলো," নিগ্রো ভদ্রলোকটি বললেন।

"আপনি ঐ যে 'ওয়াটার বয়' বলে ঐ গানটা নিয়ে আমি একেবারে পাগল," ভদ্রমহিলা বললেন। "সত্যি, ওটা আমার মাথা থেকে তাড়াতে পারিনা। ওটা এমন ভাবে সর্বক্ষণ গুন গুন করি যে আমার স্বামীর প্রায় মাথা খারাপ করে দিই। ওঃ, ও মুখটা এমন কালো করে তাকায় যেন ...ঐ ইয়ের টেক্কার মতন। বলুন না, কোথায় পান আপনার ঐসব গান? কি করে যোগাড় করেন ওগুলো?"

"কেন," নিগ্রো ভদ্রলোকটি বললেন, "কত রকমের—"

"আমার তো মনে হয় আপনি খুব ভালবাসেন ওগুলো গাইতে," ভদ্রমহিলা বললেন। "তারি মজা নিশ্চয়ই। ঐসব মিষ্টি মিষ্টি পুরোনো 'স্পিরিচুয়াল'—ওঃ আমার এত ভালো লাগে! আচ্ছা, এখন আপনি কি করছেন? গানের চর্চা করে যাচ্ছেন তো? আর একটা গানের অনুষ্ঠান করেন না কেন, কোনও সময়ে?"

"একটা করছি এই মাসের ষোল তারিখে", নিগ্রো ভদ্রলোকটি বললেন।

"আচ্ছা, আমি সেখানে হাজির হবো," ভদ্রমহিলা বললেন। "আমি হাজির থাকবো যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয়। আমাকে আপনি ধরতে পারেন। সর্বনাশ, এই দেখুন, একগাদা লোক আসছে আপনার সঙ্গে কথা বলতে। আপনি যেন সত্যি একেবারে বিশেষ অতিথি! ওঃ সাদা জামা পরা ঐ মেয়েটি কে? ওকে আমি কোথাও দেখেছি।"

"ও হোলো ক্যাথারাইন বার্ক," গৃহস্বামী বললেন।

"ওমা," ভদ্রমহিলা বললেন, "ঐ নাকি ক্যাথারাইন বার্ক? সেকি, ষ্টেজের বাইরে ওকে একদম অন্যরকম দেখায়। আমি ভাবতাম ও অনেক বেশী সুন্দর দেখতে। আমার কোনও ধারণা ছিলনা ও অত কালো। ওকি, ওকে তো দেখাচ্ছে একেবারে—থাকগে, আমার মনে হয় ও খুব উঁচুদরের অভিনেত্রী। আপনার কি মনে হয় না যে ও খুব উঁচুদরের অভিনেত্রী, মিষ্টার উইলিয়াম্‌স্? ওঃ, আমার তো মনে হয় ও দারুণ। আপনার মনে হয় না?"

"হ্যাঁ, আমার তো মনে হয়," নিগ্রো ভদ্রলোকটি বললেন।

"ওঃ, আমারও মনে হয়," ভদ্রমহিলা বললেন। "একেবারে দারুণ। আচ্ছা, কি চাও, অন্য কাউকে তো প্রধান অতিথির সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ দেবো। যাই হোক, ভুলে যাবেন না, মিষ্টার উইলিয়াম্‌স্। আমি ঐ গানের জলসায় কিন্তু থাকবো যদি আমি পেরে উঠি। অন্য সকলের মতন আমিও হাততালি দেবো। আর যদি আমি না আসতে পারি। তাহলেও আমি যাদেরকে চিনি তাদের সকলকে যেতে বলবো। ভুলে যাবেন না!"

"ভুলবো না," নিগ্রো ভদ্রলোক বললেন। "অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।"

গৃহস্বামী ভদ্রমহিলাটির হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

"ওঃ, কি কাণ্ড," ভদ্রমহিলা বললেন। "আমি প্রায় ঘরেই গিয়েছিলাম। সত্যি, আমি বিশ্বাস করে বলছি, আমি গিয়েছিলাম আর কি। শুনেছিলেন, কি বোকামী করে ফেলেছিলাম?

আমি আর একটু হলে বলতে যাচ্ছিলাম যে ক্যাথারাইন বার্কেকে একদম—কেলে-চামড়ার মতন দেখাচ্ছিল। খুব সময়ে নিজেকে সামলে নিয়েছি। ও: আপনার কি মনে হয় ও বুঝতে পেরেছে?"

"আমার তো মনে হয় না!" গৃহস্বামী বললেন।

"যাক্, ভগবানকে ধন্যবাদ" ভদ্রমহিলা বললেন, "কেন না কিছুতেই আমি ওকে অপ্রস্তুতে ফেলতে চাইতাম না। সত্যি, লোকটি বেশ ভালো। কটো যতটা সুন্দর হওয়া সম্ভব ততটা সুন্দর। ব্যবহার চালচলন সব সুন্দর। জানেন, অনেক কালো চামড়া লোক আছে, তাদের একটু লাই দিন, একেবারে মাথায় চড়বে। এ কিন্তু সে দলের মতো নেই একেবারে। হাঁ, এর কাণ্ডজ্ঞান তার চাইতে বেশী, আমার মনে হয়। এ সত্যি বেশ ভালো। আপনার তাই মনে হয় না?"

"হাঁ", গৃহস্বামী বললেন।

"আমার একে বেশ লাগলো," ভদ্রমহিলা বললেন। "আমার কিছু মনেই হচ্ছে না কালো চামড়া বলে। অন্য কারুর সঙ্গে যে রকম লাগতো ঠিক সেই রকম স্বাভাবিক লাগছিল আমার। সেই রকম স্বাভাবিক ভাবে কথা-টথাও বললাম এর সঙ্গে। কিন্তু সত্যি বলছি, আমি না হেসে প্রায় পারছিলাম না। ক্রমাগত বার্টনের কথা মনে আসছিল। ও: দাঁড়ান না বার্টনকে যখন বলবো যে একে 'থিয়েটার' বলেছি।

ভদ্রমহিলার পুরো নাম ডরোথীরথস্‌গাইল্ড পার্কার। আমাদের বাংলা সাহিত্যে বনফুলের মতন লেখকের ছোট ছোট গল্প বা চিত্র যেমন বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করে বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করে বিদেশী পাঠকদের কাছে পরিচিত করানো সহজসাধ্য নয়, ডরোথী পার্কারের রচনাগুলির সঙ্গেও বাংলা অনুবাদের মধ্যে দিয়ে এদেশের পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করানো খুবই কষ্টসাধ্য। বলা বাহুল্য, ডরোথী পার্কার ইংরেজি সাহিত্যের লেখিকা।

অবস্থাপন্ন বাড়ীর মেয়েদের মতন ডরোথীর শিক্ষাও হয়েছিল নিতান্ত অভিজাত বিদ্যালয়ে; নিউ জার্সির মরিস টাউনে অবস্থিত মিস ডানা পরিচালিত বিদ্যালয়ে ও পরে নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত ব্লেসেড্‌ স্যাক্রামেন্টে। ১৯১৭ সালে ২৪ বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় এড্‌উইন পণ্ড পার্কারের সঙ্গে।

১৯১৬ সালে তিনি বিখ্যাত পত্রিকা 'ভোগ' (Vogue)-এর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। পরের বছর 'ভোগ' ছেড়ে দেন এবং 'ভ্যানিটি ফেয়ার' নামক পত্রিকাতে যোগদান করেন। 'ভ্যানিটি ফেয়ারে' ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি নাট্য-সমালোচকের কাজ করে ছিলেন। ১৯২০ সালের পর থেকে অবশ্য তিনি আর কোনও পত্রিকার সঙ্গে এভাবে যোগ রাখেন নি। তাঁর কবিতা ছোট গল্পের খ্যাতি তখন থেকেই তাঁকে আমেরিকার সাহিত্য জগতে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছে।

একজন আর কয়েকজন

অমিলকুমার ভট্টাচার্য

শিল্প ও জীবন। জীবনের ক্ষেত্রে যেমন জন্ম এবং মৃত্যু—শিল্পের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। তবুও আমরা অবিনশ্বর জীবনবাদে বিশ্বাসী এবং আর্টকেও অবিনশ্বরবাদী বলে আখ্যা দিয়ে থাকি।

জীবন জলবুদ্বুদ্। আত্মা অবিনশ্বর—আত্মা সমুদ্র।

শিল্প এবং শিল্পের আত্মাও কী ঠিক তাই?

হ্যাঁ তাই।

উপেন্দ্রনাথ বলেন, শিল্পের আত্মার প্রতি লক্ষ্য রেখে যে সৃষ্টি তাই হচ্ছে অবিনশ্বর—সেখান থেকে জীবনের সীমা মুছে যাবে; কিন্তু অনন্ত আত্মা থাকবে জেগে। এই মহৎ-আশ্রয়ী শিল্পই যথার্থ প্রজাপতি ঋষি এবং অগ্নিদেবতা।

'এই শিল্পবোধ আমি কোত্থেকে পেয়েছিলাম জানো?'

উপেন্দ্রনাথের এ-কথায় বললাম, 'শিল্প সম্পর্কে আপনার মানস চেতনায়?'

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে। তোমরা তাঁকে বলো রিয়্যালিষ্ট, আমি কিন্তু বলি শিল্পের ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি আইডিয়্যালিষ্ট। রিয়্যালিটি তাঁর শিল্পের দেহ, আদর্শ তাঁর শিল্পের আত্মা।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মামা আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগ্নে। আত্মীয়তার সম্পর্ক দুজনের মধ্যে যতো কাছাকাছি—সাহিত্যের সম্পর্ক তার চেয়েও বেশি কাছাকাছি।

উপেন্দ্রনাথ বলেন, 'প্রকৃত পক্ষে শরৎই আমাকে লিখতে শেখাল।'

কথাটি অনেকের কাছেই যেন কেমন কেমন ঠেকতে পারে; কেননা, শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিভঙ্গি এবং উপেন্দ্রনাথের সৃষ্টিভঙ্গি মূলত প্রভেদ অনেক।

শরৎচন্দ্রের জীবন বোধে যে সমাজ সচেতনতা, বস্তুর প্রতি যে দৃষ্টি নিবদ্ধতা এবং যে বৈপ্লবিক বিবর্তনবাদ উপেন্দ্রনাথ সে মন্ত্রের পূজারি নন।

শরৎচন্দ্রের শিল্প নিরপেক্ষ নয়—সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার সত্তা সেখানে জড়িত। শরৎচন্দ্রের নায়ক নায়িকা শরৎচন্দ্রেরই মানসকুটের অন্তর্বর্তী। আর উপেন্দ্রনাথ শুধু স্রষ্টাই। মনের মানুষ দিয়ে সহানুভূতি দিয়ে আশ্রিত তাঁর নায়ক-নায়িকারা কখনো কখনো ভয়ঙ্কর হলেও তারা সুন্দর, তারা সুর, তাদের জীবনের মূল্যবোধ হিউম্যানিটিকে আশ্রয় করেই এবং পুরোপুরি ভাবেই তারা সাহিত্যের সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্রকে যেখানে বলা হয় ডাইরেক্ট, উপেন্দ্রনাথকে সেক্ষেত্রে বলা হয় ইনডাইরেক্ট।

তবুও উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রেরই মন্ত্রশিষ্য।

উপেন্দ্রনাথের আর্ট—আর্টের জন্যেই, আর শরৎচন্দ্রের আর্ট অনেকটা জীবনের জন্যে।

আর্টের জন্যে যে জীবন—সে জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত ঘটেছিলো শরৎচন্দ্রের রচিত একটি কবিতা পাঠে।

উপেন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্র উভয়েই তখন কিশোর এবং তরুণ। সাহিত্যের পাঠে প্রথম দীক্ষা গ্রহণ করেছেন উভয়েই। ভাগলপুরে দু'জনেই তখন থাকেন। একটি পুষ্প শোভিত উদ্যান দু'জনকেই হঠাৎ একদিন আকৃষ্ট করে।

শরৎচন্দ্র লিখলেন, 'ফুলের বাগানে লেগেছে আগুন!'

উপেন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন, ঘরে আগুন লাগলে তার যে কি বিভীষিকাময় রূপ, তার যে ভয়ঙ্কর পরিণতি, ফুলের বাগানের আগুনের রূপ ঠিক তার বিপরীত।

সেই বিপরীতধর্মী দৃষ্টিভঙ্গিই সৃষ্টিশীল উপেন্দ্র-মানসের শিল্প ধ্যান।

শরৎচন্দ্রকে উপেন্দ্রনাথ তাই গুরু বলে স্বীকার করতেন।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাঁর আত্ম-জীবনের কিছু অংশ—এ-কথা অনেকেই বলে থাকেন এবং শরৎচন্দ্রের জীবনীকারদের মধ্যে কয়েকজন সে ইঙ্গিতও করেছেন। শরৎ-সাহিত্যের বাস্তবতা তাই এতো খাঁটি; একথায় উপেন্দ্রনাথ সব সময় সায় দিতেন না। তাঁর মতে প্রতিভাবর শিল্পী মাত্রেরই কল্পনার প্রসার এতো বেশি যে তা সাহিত্যের বাস্তবের সঙ্গে জীবনের বাস্তবে রূপান্তরিত হয়।

শরৎচন্দ্রের মামা বিপ্রদাস সাত্ত্বিক পুরুষ ছিলেন বটে কিন্তু বিপ্রদাসের কতোটুকু তিনি। চরিত্রহীনের উপেনের মধ্যে যে আদর্শবাদ সে আদর্শবাদ উপেন্দ্রনাথের মধ্যেও; কিন্তু এ-উপেন্দ্রনাথ কী সেই উপেনই?

উপেন্দ্রনাথ হেসে বলতেন, 'তাই যদি হতুম; তাহলে তো এ-যুগের পাঠক তোমরা আমাকে কী ক্ষমা করতে?'

আনন্দবাজার পত্রিকা এবং দেশ সম্পাদক শ্রীযুক্ত অশোককুমার সরকার এই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন এবং উপেন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

বিখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক ডক্টর সুবোধ সেনগুপ্ত বার বার উপেন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র সম্পর্কে জীবনী গ্রন্থ রচনার জন্যে।

উপেন্দ্রনাথ এ-সম্পর্কে টুকি টাকি কিছু রচনা করেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পূর্ণাঙ্গ জীবন-কাহিনী রচনায় রাজি হলেন না।

উপেন্দ্রনাথের কথায় একটি যুক্তিই বার বার মাথা চাড়া দেয়—'ফুলের বাগানের আগুন আর ঘরে লাগা আগুন এক বস্তু নয়।'

শরৎচন্দ্ররূপী ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ আর তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ—দুটিই ছিলো উপেন্দ্রনাথের মধ্যে অকৃত্রিম।

'শিল্পী-সংঘ' শরৎচন্দ্রের খ্যাতি রক্ষায় আগ্রহশীল। সেই প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি রূপে উপেন্দ্রনাথ একজন সক্রিয় কর্মী।

শিল্পী-সংঘের যুগ্ম সম্পাদক কেশব মুখোপাধ্যায় এবং সুধীর ঘোষকে উপেন্দ্রনাথ বরাবর সহায়তা করে এসেছেন শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষায়। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে শিল্পী-সংঘের বর্তমান কর্ম-পদ্ধতি উপেন্দ্রনাথেরই পরিকল্পনা প্রসূত। শিল্পী-সংঘ উপেন্দ্রনাথের প্রেরণাকে কাজে লাগাচ্ছেন।

শরৎ সমিতির পক্ষ থেকে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু-তিথি উদ্‌যাপিত হবে—শরৎচন্দ্রের সমাধি ক্ষেত্রে। সভাপতিত্ব করবেন তদানীন্তন মেয়র বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

উপেন্দ্রনাথ কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। আমরাও বিশেষ চিন্তিত ছিলাম ওঁর আসন্ন জন্ম তারিখ উৎসব উপলক্ষে।

অনুষ্ঠানের দিন সকাল বেলা আমাকে উপেন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন।

উপেন্দ্র-সদনে গিয়ে দেখলাম—তিনি আধা কাপড় পরে বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, 'তোমার বৌদিকে একটু বুঝিয়ে বলো : তিনি আমাকে যেতে দিতে চাইছেন না।'

বৌদি ঘরেই ছিলেন। বললেন, 'সকাল থেকেই ওঁর বুকের ব্যথাটা একটু একটু করছে, তুমি তাই ওঁকে নিষেধ করো!'

উপেন্দ্রনাথ আমার দিকে তাকালেন, 'ফুলের বাগানে লেগেছে আগুন!—ওহে এ-আগুনে ধোঁয়া নেই, আছে দুর্গতি!'

তবু বললাম 'দাদা, শরীরটা তো দেখা উচিত।'

'নিশ্চয়ই উচিত।'

'তবে?'

'তবে আজকে মেয়রকে আমি নিজে অনুরোধ জানাবো শরতের স্মৃতি-মন্দির গড়বার জন্যে। যার চার পাশে থাকবে ফুলের আগুন।'

বুঝলাম, বাক্য ব্যয় করা নিরর্থক। বৌদিকে আশ্বস্ত করলাম, 'আজ আর অফিস যাবো না বৌদি। দাদার সঙ্গে থাকবো—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

তরলার উদ্দীপ্ত অনুরাগ বৌদির চোখে-মুখে—'তুমি থাকলে ভাই আমি নিশ্চিন্ত!'

আমার প্রতি বৌদির এই ঐকান্তিক বিশ্বাসকে নিয়ে উপেন্দ্রনাথ প্রায়ই ঠাট্টা-তামাসা করতেন, 'তোমার বৌদির ধারণা বিষ্ণুদাসের সঙ্গে ঝগড়া করে তুমি যেমন আমার শ্রেষ্ঠত্বকে প্রতিপন্ন করো, তেমনি যমরাজের সঙ্গে লড়াই করেও তুমি তাঁর হাত থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনবে!'

আমি বলতাম, 'হাঁ, অন্ততঃ একহাত লড়বো। নিবিবাদে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে দেবো না।'

'কিন্তু তুমি দেখো অমিল, যেদিন সত্যিই যমরাজ আমার দিকে আসবেন, সেদিন আমার ধারে কাছেও তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

নিচে ট্যাক্সির হর্ন।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'চলো, শরৎ-সমিতি থেকে নিতে এসেছেন।'

মেয়র বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাজরা রোডের বাড়িতে এসে উপেন্দ্রনাথ তাঁর গাড়িতে উঠলেন। একান্তে তিনি কিছু কথা বলতে চান তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে।

কেওড়াতলা শ্মশানে এসে গাড়ি থেকে আমরা নামলাম। দু'একপা যেতে যেতে হঠাৎ উপেন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে গেলেন।

'কী হলো দাদা?'

'অসুখ!'

'আপনার যাওয়া হবেনা দাদা! আমরা এখান থেকেই আপনার তাবণের ব্যবস্থা করছি।'

চিত্র পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় এগিয়ে আসছিলেন উপেন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

আমার কথা শুনে তিনিও আমাকে সমর্থন করলেন, 'না, উপেনদা, আর এগোবেন না। আমরা এইখানেই চেয়ার দিচ্ছি। এইখানেই বসে আপনি ভাষণ দেবেন।'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'অলরাইট। চলে' এইবার।'

অর্থাৎ বুকের ব্যাথাটা কমেছে। তবুও কিন্তু কিন্তু করছিলাম।

উপেন্দ্রনাথ বললেন, 'ভয় নেই আর। তোমায় তো বলেছি যমরাজের সঙ্গে যেদিন মোকাবেলা হবে সেদিন তুমি থাকবে দূরে।'

শরৎচন্দ্রের সমাধিক্ষেত্রের স্থান অপরিসর, ওখানে স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠার স্থানাভাব। সামনের বাগানে যদি কিছু অংশ নিয়ে স্মৃতি-মন্দির স্থাপন করা যায় সেই ব্যবস্থা করবার জন্যে মেয়র স্মৃতি-সমিতিকে আবেদন জানালেন।

উপেন্দ্রনাথ এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। আমাকে চুপি চুপি তিনি বললেন, 'মেয়রকে বলো তার পাশে আমার জন্যেও যেন একটু স্থান সংরক্ষিত হয়; এবং আমাদের দু'জনের সামনে ফুলের আগুন!'

মেয়রকে একথা বলার আগেই উপেন্দ্রনাথ আমার হাতদুটি চেপে ধরে বললেন, 'শরৎ আছে সকলের মনে, কিন্তু তোমাদের কয়েকজনের মনেও যদি আমি থাকি তাহলে আর কাজ কী সংরক্ষিত স্থানের।'

দারুণ জল ঝড়ের মধ্যে অভিনয় শেষ হল। অভিনেতারা একে একে রঙ্গালয় থেকে বাইরে চলে গেলেন।

একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল রঙ্গালয়ের দ্বারে।

প্রসিদ্ধ অভিনেতা সার হেনরি আরভিন্ সেই গাড়ীর সামনে এসে বললেন: আমার গাড়ীটা এখনও পৌঁছায় নি। আমি কি আপনার গাড়ীতে পার্কভিলা পর্য্যন্ত যেতে পারি।

গাড়ীর মধ্যে অন্ধকারে বসে ছিলেন এক মহিলা। তিনি বললেন: বেশ তো, আসুন না।

আরভিন্ গাড়ীর মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে একটু গর্বভরে বললেন: অবশ্য আপনি বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বলতে পারবেন, সার হেনরি আরভিন্ আপনার গাড়ীতে উঠেছিলেন।

মহিলাও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: আর আপনিও আপনার বন্ধুবান্ধবের কাছে বলতে পারবেন যে আপনি মিস্ এলেন টেরীর গাড়ীতে উঠে বসে ছিলেন।

এর পর দুজনেই হো হো করে হেসে উঠলেন।

বীরবলের কৌতুক

বরুরুচি

সম্রাট আকবরের নানা খেয়াল, নানা রকমের বায়না। বিশেষ করে রাজকাজ সেরে যখন পারিষদবর্গ নিয়ে মজলিসে বসেন তখন প্রায়শঃ তাঁর নানা উদ্ভট প্রশ্নে আর চাহিদায় সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একা বীরবলই শুধু সম্রাটকে সামাল দিতে পারেন। অন্য কার সাধ্য সে সব প্রশ্নের উত্তর দেয় বা সেই সব অসম্ভব চাহিদা পূরণ করে!

একদিন আসরে এসেই সম্রাট বললেন—বীরবল, তোমার কাছে দুটো জিনিষ চাই?

—আদেশ করুন জাঁহাপনা।

সম্রাট বললেন—দুটো জন্তু আমার কাছে আনো, যাদের একজন কৃতজ্ঞতার আর অন্যজন অকৃতজ্ঞতার জন্যে বিখ্যাত। কালকের মধ্যে এই দু'জনকে একসঙ্গে চাই।

ফরমাস শুনে সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। বীরবল তো রীতিমত হতবুদ্ধি হলেন। হঠাৎ কালকের মধ্যে এমন দুই জন্তু কোথায় পাবেন!

যেসব সভাসদ বীরবলকে হিংসে করত তারা মনে মনে পুলকিত হল। এবার বীরবল নিশ্চয়ই জব্দ হবে। এমন দুই আজব জন্তু খুঁজে পাওয়া কারুরই কর্ম নয়।

চিন্তিত মনে বীরবল বাড়ি ফিরলেন।

আজকের মধ্যেই এমন দুই জন্তু তাঁকে সংগ্রহ করতে হবে যাদের একজনের যে গুণ আছে, অন্যজনের তা নেই। এবং তা প্রমাণ করে দিতে হবে, অর্থাৎ সকলকে মানতে হবে বীরবলের যুক্তি।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যায় এমন দুই বিপরীতধর্মী জন্তু। এবং এত শীঘ্র! অর্থাৎ আজ রাত শেষ হবার আগেই। কারণ, সম্রাটের হুকুম হয়েছে, কাল সকালেই আম-দরবারে গিয়ে সেই দুই জন্তুর সাক্ষাৎ পেতে চান!

বাড়ি ফিরে দেখলেন, সকলে খুব আনন্দ করছে।

কিছুদিন আগে মেয়ে চম্পাবতীর বিয়ে দিয়েছিলেন। তার স্বামী, অর্থাৎ নতুন জামাই শ্বশুরবাড়ি এসেছে। তাই বাড়িতে সোরগোল পড়ে গেছে।

বীরবলের মনে কিন্তু আনন্দ আসল না। বিরস মুখে নিজের ঘরে গিয়ে বসলেন। জামাই প্রণাম করে গেল। তারপর মেয়ে এসে পাশে বসল।

বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে এই চম্পাবতী। সোজাসুজি বললে—আজ আবার দরবারে কি হল বাবা?

অ্যাঁ। দরবারে! নাঃ! কিছু না!

মাথা নেড়ে মেয়ে বললে—উঁহু! আমার কাছে লুকোতে পারবে না। বল না, কি হয়েছে!

বীরবল তখন আজকের দরবারের কথা আর বাদশার অদ্ভুত আদেশ মেয়েকে শোনালেন।

শুনে কয়েক লহমা নীরব থেকে চম্পাবতী বললে—এই ব্যাপার! এর জন্যে তুমি চিন্তিত? কিছু ভেবো না বাবা! কাল সকালে জন্তু দুটি নিয়ে সভায় যেও।

—কিন্তু পাবো কোথায় তাড়াতাড়ি।

—ঘরেই আছে।

বীরবল অবাক হলেন! ঘরেই আছে! দুই জন্তু!

মেয়ে বললে—তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও। আমি একটু পরে আসছি। কিছু ভেবো না বাবা। খুব একটা মজার উপায় ঠিক করে নেব।

পরদিন সকালে যথা সময়ে বীরবল আম-দরবারে হাজির হলেন।

সকলে সবিস্ময়ে দেখলেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে একজন সুন্দরকান্তি সুবেশ যুবা ও একটি ছাপুই দেশি কুকুর।

আভূমিপ্রণত কুর্নিশ করে বীরবল বললেন—জাঁহাপনা, আপনার আদেশ মত দুটি জন্তু এনেছি।

—কই? কোথায়? শুধোলেন সম্রাট।

—এই যে সম্রাট, আমার দু'পাশে দু'জন।

—কী বলছ তুমি বীরবল। কুকুরকে না হয় মানলাম। কিন্তু এ ছেলেটি তো জন্তু নয়!

মাথা নেড়ে বীরবল বললেন—বড় বড় সমাজবিদরা মানুষকে বিপদ জন্তু বলেছেন, অতএব আমি একেও জন্তুর পর্যায়ে ফেলেছি জাঁহাপনা।

আকবর বললেন—তুমি আমার সঙ্গে রসিকতা করছ।

—না সম্রাট, রসিকতা নয়। সে অন্য সময়ে, এখন আপনার হুকুম তামিল করা। দয়া করে শুনুন। এই দুটি জন্তুর মধ্যে একটি আমার নতুন জামাই। জামাই এক আজব জন্তু জাঁহাপনা! জামাইকে যত দাও, তার লোভ আর মেটে না। এবং জামাই কোনদিন কৃতজ্ঞ হয় না। সেই যে কথায় আছে না, যম, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা, সে কথা বড় খাঁটি জাঁহাপনা। জামাই হল অকৃতজ্ঞতার প্রতিমূর্তি। আর এই যে দেখছেন কুকুর, এর তুল্য কৃতজ্ঞ জন্তু দুনিয়ায় নেই। খেতে পাক আর নাই পাক, এ কোনদিন এর মনিবকে ছেড়ে যায় না, প্রভুর জন্যে প্রাণ দিতেও এ কুণ্ঠিত হয় না। এর কৃতজ্ঞতাবোধের অনেক কাহিনী আছে। অতএব, আশা করি, সম্রাটের প্রার্থিত বস্তু হাজির করতে পেরেছি।

বীরবলের বুদ্ধিমান সুরসিক জামাতা সকৌতুকে এই প্রহসন প্রত্যক্ষ করছিল। অবশ্য তাকে যে তাঁর সহধর্মিণী চম্পাবতী পূর্বাহ্নেই বিশেষভাবে তালিম দিয়েছিল তা বলাই বাহুল্য। এই আয়োজনটি চম্পাবতীরই কল্পনাপ্রসূত।

মাথা হেলিয়ে সম্রাট বললেন—তোমার কথা স্বীকার করলাম।

তারপর হঠাৎ সুর পালটে বললেন—কিন্তু বীরবল।

—সম্রাট।

—তুমি জানো, সম্রাটের ঘর গভীর, আমার রাজ্যে নীচাশয়, হতদরবাজ এবং কৃতঘ্ন জীবের কোন স্থান নেই।

বীরবল বললেন—বিলক্ষণ জানি সম্রাট! বহু লোক ওই সকল অপরাধে দিল্লী থেকে নির্বাসিত হয়েছে।

সম্রাট বললেন—তাহলে তো এই অকৃতজ্ঞ-জামাইকেও সেই দণ্ডে দণ্ডিত করা আমার কর্তব্য।

বীরবল তৎক্ষণাৎ বললেন—অবশ্যই এরূপ দণ্ড দেওয়া চলতে পারে। কিন্তু একটা বিপদ আছে জাঁহাপনা!

—কি বিপদ।

স্বর নীচু করে বীরবল বললেন—তাহলে আপনাকে আমাকে এবং এখানে উপস্থিত আরও অনেককেই নির্বাসনে যেতে হয়।

—কেন! আমরা নির্বাসনে যাব কেন?

—জামাই বলেই যদি কাউকে নির্বাসনে যেতে হয় সম্রাট, তাহলে আমরাও তো সেই পর্যায়ে পড়ি। আপনি যোধপুর মহারাণার জামাই, আমি রায়সাহেব শেঠ বল্লভদাসের জামাই, আর এরাও সেই রকম…

—বুঝেছি, আর বলতে হবে না।

সম্রাট হাসতে লাগলেন। ক্ষণেক পরে বললেন—তাহলে আমাদের এই নতুন বাধাজীকে আজ আমার অন্দর মহলেই নির্বাসন দাও, আজ সারাদিন ও এখানেই আবদ্ধ থাকুক!

এদিকে দ্বিপ্রহরে আর এক কাণ্ড।

সম্রাট আকবর বীরবলের জামাইকে নিয়ে নিজের মহলে আমোদ-আহ্লাদ করছেন এমন সময় খবর এলো শেঠ বীরবলের কন্যা চম্পাবতী সম্রাটের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতে শহর-কতোয়ালের কাছে যাবার জন্যে রওনা হয়েছে।

কেন! সম্রাটের অপরাধ?

অপরাধ গুরুতর। সম্রাট তার স্বামীকে নাকি গুম্ করেছেন। এবং নিজের মহলে আটক করে রেখেছেন।

অভিযোগ শুনে সম্রাট বললেন—ঠিক, ঠিক। আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে। যোধপুরী বেগমের প্রধানা পরিচারিকা বিমলা শেঠানিকে ডাকো।

যোধপুরী বেগমের খাস-বাঁদী এসে দাঁড়াল।

সম্রাট বললেন—পাঁচজন বরকন্দাজ আর বেগমের বড় পালকি নিয়ে তুমি এখনি বীরবল শেঠের বাড়ী যাও, আমার নাম করে বীরবলের মেয়েকে নেমন্তন্ন জানাও আর তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

পরিচারিকা চলে গেল এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বীরবলের কন্যা চম্পাবতীকে নিয়ে এলো।

সম্রাট প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, কন্যাকে অভ্যর্থনা করে বললেন—এসো মা, এসো। আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। মরবার শেষ করেই তোমার আনানো উচিত ছিল! সেজন্যে আমায় ক্ষতিপূরণ দাও।

এই বলে তিনি বীরবল-তনয়াকে এক হাজার আসরফি ও বহুমূল্য বসন উপহার দিলেন। এবং সারাদিন তাদের নিয়ে আনন্দ করলেন।

নিয়তি

শ্রী কৃষ্ণধন দে

পশ্চিমে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে কলেজের প্রকাণ্ড হলে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের আয়োজন করা হয়েছে। বিশিষ্ট দর্শক ও সুধীবৃন্দের সমাগমে সমগ্র হলটিতে আর তিলধারণের স্থান নাই। চিত্রাঙ্গদার ভূমিকায় ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রী মেনকা গাঙ্গুলীর আকর্ষণও বড় কম নয়।

মেনকা গাঙ্গুলী এমন একটি নাম,—যা' আকর্ষণ করে—মুগ্ধ করে—উল্লসিত করে কলেজের ছাত্রসম্প্রদায়কে,—কলকাতার অভিজাতবর্গকে। শুধু অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমা নয়, অভিনয়ের চমৎকারিত্বও প্রশংসা লাভ করেছে সর্বজনের। তার উপরে তার সুন্দর মুখশ্রী ও রূপলাবণ্য দেখে কেউ মুগ্ধ না হয়ে পারে না।

অভিনয় আরম্ভ হল। বিরাট হল নিস্তব্ধ। শুধু মঞ্চের উপর নানাবর্ণের আলোকপাতে অভিনয় যেন জীবন্ত হয়ে উঠল।

চিত্রাঙ্গদার নৃত্যে ও অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ। কোথা দিয়ে যে আড়াই ঘণ্টা কাল কেটে গেল কেউ জানতেও পারল না।

অভিনয় শেষে সকলের অনুরোধে মেনকা দর্শকদের সম্মুখে নেমে এলেন।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন সিমলা সেক্রেটারিয়েটের চীফ্ সুপারিন্টেনডেন্ট হরিশ বাবু। তিনি মেনকার চমৎকার অভিনয়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন যে মেনকাকে সামনে ডেকে ভাল করে আলাপ করতে পারেন নি। মেনকার সম্বন্ধে যেটুকু জানতে পারলেন তা'ই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট।

সিমলায় ফিরে গিয়ে তিনি তাঁর স্ত্রী চারুপ্রভাকে বললেন: এবার আমার কলিকাতায় গিয়ে কি লাভ হয়েছে জান? আমারই সহপাঠি বন্ধু সুরেন গাঙ্গুলীর মেয়ে মেনকাকে দেখে এলাম—শুধু দেখা নয়,—তার নাচ, তার অভিনয় সমস্তই অতি অপূর্ব। আমার কি ইচ্ছা হচ্ছে জান?

—কি ইচ্ছে তোমার? —হাসিমুখে চারুপ্রভা বললেন।

—আমার ইচ্ছা আমাদের মোহিতের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে, ওকে চিরদিনের মত আমাদের ঘরে আনি। চমৎকার মানাবে কিন্তু মোহিতের সঙ্গে। মোহিতও ত এবার ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পেয়েছে। বউ যদি করতে হয় ত অমনি মেয়ের দরকার। রূপ আছে, বিদ্যা আছে, কাল্চার আছে,—বংশ গৌরবও কম নয়,—কি বল তুমি?

—আমার আবার বলবার কি আছে? তোমার পছন্দের যাচ আমি জানি। তুমি যাকে মোহিতের বউ করে আনছ,—তার যে তুলনা নেই, সেটা বুঝতে কি আর আমি পারি না? বেশ ত তুমি আজই তোমার বন্ধু সুরেনবাবুকে চিঠি লিখে দাও না। তা' হলে যদি হবার হয় এই মাসের শেষেই বিয়েটা হয়ে যাক্। মেনকার মত মেয়েকে ঘরের বউ করে আনা যে কত বড় ভাগ্য।

সেইদিনই হরিশবাবু কলকাতায় সুরেনবাবুর কাছে সব কথা খুলে এক চিঠি লিখলেন। এবং বিয়েটা সেই মাসেরই শেষের দিকে যাতে হয় তার জন্যও বিশেষ করে অনুরোধ জানালেন।

চিঠির উত্তর এল দু' দিন পরেই। সুরেনবাবু লিখেছেন, বাল্যবন্ধু হরিশের ছেলের সঙ্গে তার মেয়ে মেনকার বিয়ে তাঁর কাছে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া। এরকমটা তিনি আশাই করেন নি। তাঁর সম্মতি ত আছেই তা ছাড়া দুটী পুরাতন বন্ধু পরিবারের মধ্যে এসম্বন্ধ বোধ হয় ভগবানেরই ইচ্ছা। বিয়েটা যত শীঘ্র হয় ততই মঙ্গল।

হরিশবাবু আবার চিঠি লিখলেন যে সিমলা তাঁর কর্মক্ষেত্র। সেখানে বহু রাজকর্মচারী ও মোহিতের বন্ধু-বান্ধব আছেন, সুতরাং বিয়েটা সিমলাতে হলেই ভাল হয়। অবশ্য এতে তাঁদের যাতায়াত কষ্ট ছাড়া আর কোন অসুবিধাই হবে না। হরিশবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী, জিনিষ-পত্র সবই ওখানে পাওয়া যাবে, সুতরাং বিয়েটা সিমলাতেই হোক্।

সুরেনবাবু এ বিষয়ে আর কোন প্রতিবাদ জানালেন না। তাঁর সহধর্মিণী হেমলতা প্রথমটা একটু বাধা দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সুরেনবাবুর কথায় ও মোহিতের মত জামাই পাবার সৌভাগ্যে তিনি আর বেশী আপত্তি তোলেন নি। এরপরে হরিশবাবু কলকাতায় এসে সমস্ত পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে গেলেন।

সিমলার প্রশস্ত রাজপথের পাশে হরিশবাবুর বিরাট অট্টালিকাটি সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে। আলোকমালার অভিনবত্বে ও রূপায়ণের চমৎকারত্বে বাড়ীটি যেন অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। দলে দলে নিমন্ত্রিতেরা বিবাহোৎসবে যোগ দিতে আসছেন। মোটরের আওয়াজে, ব্রহ্মে বাড়ীর সামনের দেবদারু গাছের সারি ভরে গিয়েছে। অভিজাত সম্প্রদায়, পদস্থবৃন্দ, রাজ অতিথির দল, বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অনেকেই এই বিবাহোৎসবে যোগ দিতে এসেন।

অর্কেষ্ট্রায় জাতীয় সঙ্গীত ও মিলন সঙ্গীত বাজছে। হলের গন্ধে চারিদিক মশগুল। নূতন নূতন ডিজাইনের দামী সাড়ী পরে রূপসীদের রূপের ঝলকে বিবাহ সভায় যেন ইন্দ্রধনুর শোভা ছড়িয়ে পড়ছে।

হরিশবাবু স্মিত মুখে সকলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন। উর্দিপরা বেয়ারার দল সোডা লেমনেড চা-কফি নিয়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করছে। বিবাহ আসরের একপাশে সুরেনবাবু বসে কন্যার সৌভাগ্য চিন্তা করছিলেন।

বিবাহসভার উপস্থিত সকলেই একবাক্যে বর ও বধূর রূপের সুখ্যাতি করলেন। মোহিতের বন্ধুবর্গ মোহিতের পিঠ চাপড়ে বললেন:—লাকি ইন্‌ডিড্! —এ ডেনাস ইন্ ক্রেপ্ এ্যাণ্ড্ ব্লাড্! থ্রি চিয়ার্স ফর আওয়ার মোহিত,—হিপ্ হিপ্ হুরে।

সলজ্জ মুখে মেনকা সকলকে অভিবাদন করল। এ বিবাহোৎসব সিমলাবাসীদের কাছে শুধু অভূতপূর্ব নয়, অশ্রুতপূর্বও।

বিয়ের পর মেনকার রূপ যেন আরও বেড়ে উঠল। প্রতিপদের চাঁদের মত তার শোভা যেন আরও নয়নমনমুগ্ধকর হয়ে দাঁড়াল। মোহিত মেনকাকে পেয়ে জীবনের রঙিন্ স্বপ্নময়ী উপভোগ করতে লাগল।

সুরেনবাবুরা বিয়ের পরই কলকাতায় ফিরে এলেন। বাপ মাকে বিদায় দিয়ে মেনকার মন খুবই খারাপ হোল, কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ীর স্নেহে, স্বামীর প্রেমে ক্রমশঃ শান্ত হল।

মাস কয়েক পরে চারুপ্রভা একদিন আনন্দিত মনে আবেগের সঙ্গে হরিশবাবুকে বললেন : ওগো শুনচ—বৌমার যে ছেলে হবে !

হরিশবাবু উল্লাসে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান ঐ রোহিত। এবার তারই রক্তে মাংসে গড়া এক নবীন অতিথি আসছে তাঁদের ঘর আলো করতে।

খবরটা তখনি সুরেনবাবুকে চিঠি লিখে জানানো হোল। মেনকার মা হেমলতা আনন্দিত হয়ে বললেন : বেশ ত ! ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এখন মেনকাকে এইবেলা কলকাতায় আনবার ব্যবস্থা কর।

সুরেনবাবু হরিশবাবুকে চিঠি লিখলেন যে মেনকাকে যেন প্রসবের পূর্বেই কলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম অবস্থায় মেয়েদের মায়ের কাছেই থাকা ভাল।

হরিশবাবু উত্তরে জানালেন, তার বড় আদরের পুত্রবধূকে শিমলাতেই রাখা হোক্। এখানে ত বড় বড় ডাক্তার ও নার্সিং হোমের অভাব নেই। আর তা' ছাড়া মেনকাকে এ অবস্থায় চোখের আড়াল করতে চান না চারুপ্রভা। অতএব শিমলাতেই প্রসবকার্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হোক্।

মনঃক্ষুণ্ণ সুরেনবাবু তবুও মোলায়েম ভাবে নানা প্রতিবাদ জানালেন। কিন্তু এতে ফল হোল বিপরীত। হরিশবাবু একটু চটে গেলেন এবং একটু রাগত ভাবেই মেনকাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন।

মেনকাকে দেখে হেমলতা ও সুরেনবাবু একটু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মেনকা আর সে তন্বী মেয়েটি নয় এখন বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হয়েছে। একটু বেশী বয়সের মেয়েদের প্রসবের সময়ে বেশী হৃষ্ট পুষ্ট হওয়া অনেক সময় ভাবনার কারণ হয়. সুরেনবাবু এটা শুনেছিলেন।

নার্সিং হোমের ডাঃ গুহকে মেনকার অবস্থা দেখাতে তিনি বললেন : চাইল্ড যদি প্রপার পজিসনে ঠিক মত না আসে তা হলে এরূপ ক্ষেত্রে হয়ত সিজেরিয়ান্ অপারেসন্ করতে হবে।

—সিজেরিয়ান্ অপারেসন্ ?—সেটা আবার কি ব্যাপার ডাঃ গুহ ?

ডাঃ গুহ একটু হেসে উত্তর দিলেন : প্রপার প্যাসেজে না এসে অপারেসন্ করে ডেলিভারী করাতে হবে। এটা ত আজকের ব্যাপার নয়, রোম সম্রাট জুলিয়াস্ সীজারকে তাঁর মাতৃগর্ভ থেকে এইভাবে অপারেসন করে বার করতে হয়েছিল, সেইথেকে কথাটা চালু হয়ে গিয়েছে। যাক্ ওর জন্যে আপনি ভাববেন না সুরেনবাবু। আজকালকার বিজ্ঞানে সার্জারীর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আশা করি ত্রুটি কিছুই হবেনা।

সুরেনবাবু চিন্তিত ভাবে বললেন : আচ্ছা মেনকার মাকে কি কাছে রাখা চলবে না ?

ডাক্তার গুহ হেসে বললেন : আরে না, না, অপারেসন রুমে আমি আমার এ্যাসিষ্টাণ্ট্ ও নার্সরা ছাড়া আর কেউ থাকার নিয়ম নয়। আর আমার অনুরোধ, আপনার স্ত্রীকে এখন এ অপারেসন সম্বন্ধে কিছু না বলাই ভাল। তিনি যেন বাড়ীতে বসেই সুখবরের জন্য অপেক্ষা করেন।

প্রসববেদনা আরম্ভ হতেই মেনকাকে নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হোল। ডাঃ গুহ পরীক্ষা করে তাকে তখনি অপারেসন রুমে নিয়ে গেলেন।

অপারেসন টেবিলে অজ্ঞান মেনকাকে শুইয়ে দেওয়া হোল।

ডাক্তার গুহ ও তাঁর এ্যাসিষ্টাণ্ট্ সাদা এপ্রণ কোট পরে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। পার্শ্ববর্তিনী নার্সেরা দরকারী যন্ত্রপাতি এগিয়ে দেবার জন্যে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দাঁড়ালেন কাছাকাছি।

এইবার রোগিণীর পাল্স্ দেখে ডাঃ গুহ স্যাম্পেট্ উঁচিয়ে ধরলেন,—ইঙ্গিত সব ঠিক আছে দেখে তিনি মুহূর্ত মধ্যে সেই ছুরি নিপুণতার সঙ্গে ক্ষত বসিয়ে দিলেন রোগিণীর জঠরের উপরে।

হঠাৎ ঘপ্ করে সমস্ত আলো নিভে গেল। ডাক্তার ও নার্সেরা আতঙ্কে চিৎকার করে উঠ্লেন। সে তল্লাটে সব আলো নিভে গেছে,—ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস বিকল! কি সর্বনাশ! এযে সিরিয়াস্ অ্যাকসিডেণ্ট্!

হন্তদন্ত হয়ে ছুটাছুটি করে নার্সরা টর্চ আনলেন। টর্চের আলোতে সে কী বীভৎস দৃশ্য! নবজাত শিশুটীর তখন জীবনদীপ নিভে গেছে,—রক্তাপ্লুতা সংজ্ঞা হীনা মেনকা তখন জীবন মৃত্যুর সন্ধিস্থলে।

ডাঃ গুহ গভীর আক্ষেপের স্বরে বললেন: আর কয়েক সেকেণ্ড পরে আলো নিভ্লে আমি হয়ত শিশুটিকে বাঁচাতে পারতাম্—একী ভয়ানক কাণ্ড! ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউস জাহান্নমে যাক্।

বাইরে মেনকার বাবা অপেক্ষা করছিলেন। তিনি এ সংবাদ শুনে পাগলের মত ছুটে অপারেসন রুমের দিকে আসছিলেন, দু'জন নার্স তাঁকে ধরে বাইরে টেনে নিয়ে গেল।

এদিকে বাড়ীতে মেনকার মা হেমলতা অপেক্ষা করছিলেন সুসংবাদের জন্যে। হঠাৎ টেলিফোনে ক্রীং ক্রীং বেজে উঠ্ল। তিনি ছুটে গেলেন টেলিফোন ধরতে,—কে যেন কি একটা খবর বলতে তিনি বুঝলেন রং নাম্বার। তারপরেই হঠাৎ পাড়ার আলোগুলি সব নিভে গেল। সমস্ত বাড়ী অন্ধকার, তিনি তাড়াতাড়ি অন্ধকারে ঘরে যেতে গিয়ে কপাটে ধাক্কা লেগে মেঝের উপর ধড়াম্ করে পড়ে গেলেন। আঘাত পেয়ে তাঁর কপালটা কেটে রক্তস্রোত বইল। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন।

ডাঃ গুহের চেষ্টায় মেনকা কোন ক্রমে সে যাত্রা বাঁচল বটে কিন্তু মাতৃত্বে দারুণ শক্ লাগায় জন্যে চিরদিনের মত সে অকর্মণ্যা হয়ে গেল। প্রথম সন্তান হারিয়ে ভবিষ্যতে আর কোন সন্তান পাবার আশা তার রইল না।

এই দারুণ বিপর্যয়ে দুদিকের দুটী সংসার যেন অগে পুড়ে খাক্ হয়ে গেল। হরিশবাবু ও সুরেনবাবুর মধ্যে বিলক্ষণ মনান্তরের সৃষ্টি হোল,—যার ফল মেনকার উপর অনেকটা এসে পড়ল।

মেনকার মা হেমলতা চিকিৎসার পর সামলে উঠ্লেন বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগ্ল। এক একবার হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে ওঠেন,—ওগো, দূর কর ঐ ইলেক্ট্রিককে, পুড়িয়ে দাও ইলেক্ট্রিকের সব কিছু।—যারা এত বড় সংসারের জীবন নিয়ে খেলা করে, ওদের কোনদিন ক্ষমা কোরো না। যে ইলেকট্রিক্ আমাদের সংসার ধ্বংস করেছে, আমাদের সমস্ত জীবন পুড়িয়ে ছার করে দিয়েছে,—তাদের আর ক্ষমা নাই,—ক্ষমা নাই।

মেয়েদের কথা

সমাজোন্নয়নের কাজে আমেরিকার মেয়েরা

নাগরিকেরা আপন আপন এলাকার সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগতভাবে কতখানি সাহায্য করতে পারে এবং ঐ এলাকাগুলিকে আরও উন্নত করে তুলতে কিভাবে কাজ করতে পারে, এ প্রশ্ন নিয়ে আজকের দিনে আমেরিকায় বেশ মাথা ঘামানো হচ্ছে।

আমেরিকার মহিলা সমিতি সংঘের সমস্ত ক্লাবগুলি এ প্রশ্নের বহুবিধ উত্তর দিয়েছে। ৮ হাজারেরও বেশি ক্লাব এই সংঘের সদস্য। মহিলা সংঘ এবং সিয়ার্স রোবাক কাউণ্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে সমাজোন্নয়ন কর্মসূচী উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে ঐ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল।

মহিলা সমিতিগুলির কাছ থেকে যে সমস্ত উত্তর পাওয়া গেছে তাতে তাঁরা জানিয়েছেন, মহিলারা একযোগে কাজ করলে অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারেন। বহু ক্ষেত্রেই সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য এবং জলসরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন, গ্রন্থাগার স্থাপন, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা ও সমাজ জীবনকে সমৃদ্ধতর করে তোলার জন্য এবং আরও অনেক কিছু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে প্রধানতঃ মেয়েদের ক্লাবগুলিই।

আমেরিকার যে সমস্ত সমিতি উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনার কাজ শেষ করেছে তাদের মধ্যে যোগ্যতার মান অনুসারে ১১টি সমিতিকে নগদ পুরস্কার দিয়েছে সিয়ার্স রোবাক ফাউণ্ডেশন। এছাড়া বিশেষের কতকগুলি অনুমোদিত সমিতিকে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত পুরস্কার অতিরিক্ত সমাজোন্নয়নের কাজেই ব্যবহৃত হবে।

পশ্চিম ভার্জিনিয়ার অন্তর্গত লোগনের উইমেন্স ক্লাব প্রথম পুরস্কারটি লাভ করেছে। কয়লা খনির শহর লোগনের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উইমেন্স ক্লাবের অবদান অসামান্য। লোগনের অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল না। এর কারণ, অন্যান্য নানা জালানির আবিষ্কারে বাজারে প্রতিযোগিতা দেখা দেওয়ায় এবং খনি ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ হওয়ায় চাকুরির সুযোগ কমে গেছে।

উইমেন্স ক্লাবের সদস্যারা খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সভা ডাকা হল। সভায় ৩৭টি সংস্থার প্রতিনিধিরা সমবেত হলেন। তাঁরা প্রগতিশীল উন্নয়ন উদ্যোগ নাম দিয়ে একটি পরিষদ গঠন করলেন। এর ইংরেজী নামের আদ্যাক্ষরগুলি পর পর সাজিয়ে সংক্ষেপে এর নাম হল 'প্রাইড'। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানে লোগন বণিক সভা ও প্রাইড একযোগে কাজ করতে লাগল।

লোগন বণিক সভা শিল্প ও বাণিজ্যের বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়, আর প্রাইড বিবিধ কল্যাণ ব্যবস্থা, নাগরিক প্রশিক্ষণ প্রভৃতির জন্য অনেক সময় ব্যয় করে।

প্রাইড পরীক্ষা করে দেখেছে লোকবলের কতখানি অংশ কাজে লাগানো যায়। সরকারী সাহায্য কি পরিমাণ পাওয়া যেতে পারে তারা পর্যালোচনা করে দেখেছে এবং অন্যান্য শহরের পুনরুজ্জীবন পরিকল্পনা পরীক্ষা করেছে। আয়োজন-প্রয়োজনের জন্য একখণ্ড জমি প্রাইড ক্রয় করেছে এবং

প্রাক্তন খনি শ্রমিকদের নিযুক্ত করেছে জমি পরিষ্কার করার কাজে। অতঃপর তাদের নতুন করে শেখানো হয়েছে পাথর কাটার কাজ। তারপর তাদের লাগানো হয় বাড়ী তৈরির কাজে। এমনি করে গ্রামোদ কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। গ্রাইন্ড রাস্তা উন্নয়ন পরিকল্পনায় উৎসাহ দিয়েছে এবং শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা ও সুন্দর করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা চালু করেছে।

লোগন কাউন্টি পুনরুন্নয়ন কর্পোরেশন গঠিত হল এবং নতুন নতুন শ্রমশিল্পে আকর্ষণ করার উদ্দেশ্যে ও পুনরুন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের জন্য অর্থ সংগ্রহকল্পে স্থানীয় শ্রাবগুলির প্রতি লক্ষ্য করবার মত। কর্পোরেশন একটি নতুন পোষাকের কারখানা কিনে নিয়ে প্রায় ৪ শত নতুন পদ সৃষ্টি করল।

পৌরস্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন থাকলে অতি অল্প সংখ্যক লোক অধ্যুষিত একটি ছোট জনপদের অধিবাসীরাও যে কত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের কাজ করতে পারে তার নিদর্শন নর্থ ডাকোটার ম্যানডেন গ্রাম। এই গ্রামের লোকসংখ্যা মাত্র ৩১৮। এই গ্রামে গড়ে উঠল একটি মহিলা শ্রাব। সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। কিন্তু তাহলে কি হবে, এই মহিলা সংঘটিই একটি পুরস্কার অর্জন করেছে। সমাজোন্নয়নের কাজে যোগাযোগ স্থাপন করে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠনের জন্য মেয়েদের এই শ্রাবটি ১৯৬০ সালে স্থানীয় আরও ৯টি সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানায়।

কোন্ কোন্ প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন সে বিষয় নাগরিক সাধারণের অভিমত যাচাই করে নিয়ে ঐ পরিষদ 'পরিচ্ছন্ন শহর' অভিযান চালায় এবং ময়লা পরিষ্কার করার উন্নততর ব্যবস্থা উদ্ভাবনের জন্যও চেষ্টা করে। ক্রমে এই ছোট্ট গ্রামে এল একটি দমকল ট্রাক ও একটি সুসংগঠিত দমকল বাহিনী। গড়ে উঠল একটি প্রমোদ পার্ক নাগরিকদেরই পরিশ্রমে এবং এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও নিয়েছে নাগরিকেরাই। এছাড়া আরও গড়ে উঠেছে একটি যুব সংঘ। এ সমস্ত কিছুর পিছনেই রয়েছে মেয়েদের ঐ শ্রাবটির উদ্যোগ।

মিসিসিপির আরকোলা আর একটি ক্ষুদ্র শহর। শহরটি প্রধানতঃ কৃষিনির্ভর। শহরটির জন্য একটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক ও সম্মিলন কেন্দ্রের প্রয়োজন দেখা দেয়। কাউন্টি হেল্থ অফিসার বললেন, কেউ যদি উপযুক্ত এক খণ্ড জমি দান করে তিনি একটা ক্লিনিক তৈরি করে দিতে রাজী আছেন। এই ক্লিনিকের সঙ্গে থাকবে একটি প্রতীক্ষাগার ও খাবার ঘর। সম্মিলন কেন্দ্ররূপেও এই ক্লিনিকটি ব্যবহৃত হতে পারে। হেল্থ অফিসারের আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল একটি মহিলা শ্রাব এদেরও সদস্য সংখ্যা ১৫ জন।

শ্রাবটি নানা অনুষ্ঠান প্রভৃতির ব্যবস্থা করে অর্থ সংগ্রহ করে ঐ অর্থে জমি ক্রয় করে। অতঃপর শ্রাব দানপত্র লিখে ঐ জমিটি দিয়ে দেয় কাউন্টিকে। এই জমির ওপর আরকোলা শহরের প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে উঠল একটি ক্লিনিক। বলা বাহুল্য, কাউন্টি হেল্থ অফিসারই তা নির্মাণ করে দিলেন।

এরপর শ্রাব সদস্যারা উঠে পড়ে লাগলেন গ্রন্থাগার সংগঠনে। অনেক আগেই তাঁরা একাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধার জন্য এ কাজ পরিত্যক্ত হয়েছিল। এবার তাঁরা নতুন উদ্যমে আবার শুরু করলেন। ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁরা এটুকু উপলব্ধি করেছেন যে সমবেত প্রয়াসের ফলে বহু কঠিন কাজেও সাফল্য আসে। একটি ভাড়া নেওয়া বাড়ী মেরামত ও রং করে দিতে কাউন্টি প্রশাসন সম্মত হল। গ্রন্থাগারের পরিচালন ব্যয় বহন করতেও তারা স্বীকৃত হল। শ্রাব তার পরিকল্পনা কার্যকরী করার ভার ছেড়ে দিল একটি অছি পর্ষদের হাতে।

পরিকল্পনা রূপায়ণে মিসিসিপি লাইব্রেরী কমিশন সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। চলতি বিষয়ের অনেক বই কমিশন গ্রন্থাগারকে উপহার দেয়। তরুণেরা বেকারেল গ্রন্থ কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে লাগল। ১৯৬১ সালে আরকোলা গ্রন্থাগারের উদ্বোধন হল। সমাজের সাধারণ মানুষ সকলেই উৎসাহভরে সমর্থন করল গ্রন্থাগারটিকে।

পৌরকর্তাদের কাজ বড় বড় শহরেরও উন্নতিসাধনে সাহায্য করেছে। ওহায়োর লোরেন শহরে দ্বিতীয় একটি হাসপাতালের প্রয়োজন দেখা দেয়। শহরে দেড় লক্ষ লোকের বাস। লোরেনের লেকল্যাণ্ড মহিলা ক্লাব এ ব্যাপারে এগিয়ে এল। বস্তু বিক্রী করে ক্লাব টাকা সংগ্রহ করল। তারপর একটি উপযুক্ত অঞ্চলে ৩০ একর জমি ক্রয় করল। ১৯৬২ সালের মে মাসে হাসপাতাল নির্মাণের ব্যাপারে সমাজোন্নয়ন কর্মসূচীর পরিচালকেরা উপদেশ ও সহায়তা দিলেন নানাভাবে। হাসপাতালের ভিত্তি খনন করা হল। লোকল্যাণ্ড মহিলা ক্লাবের প্রয়াস সত্যই প্রশংসার্হ। এই হাসপাতাল নির্মাণের ব্যাপারে সমাজোন্নয়ন পরিচালকরা ক্লাবকে সাহায্য করেছে।

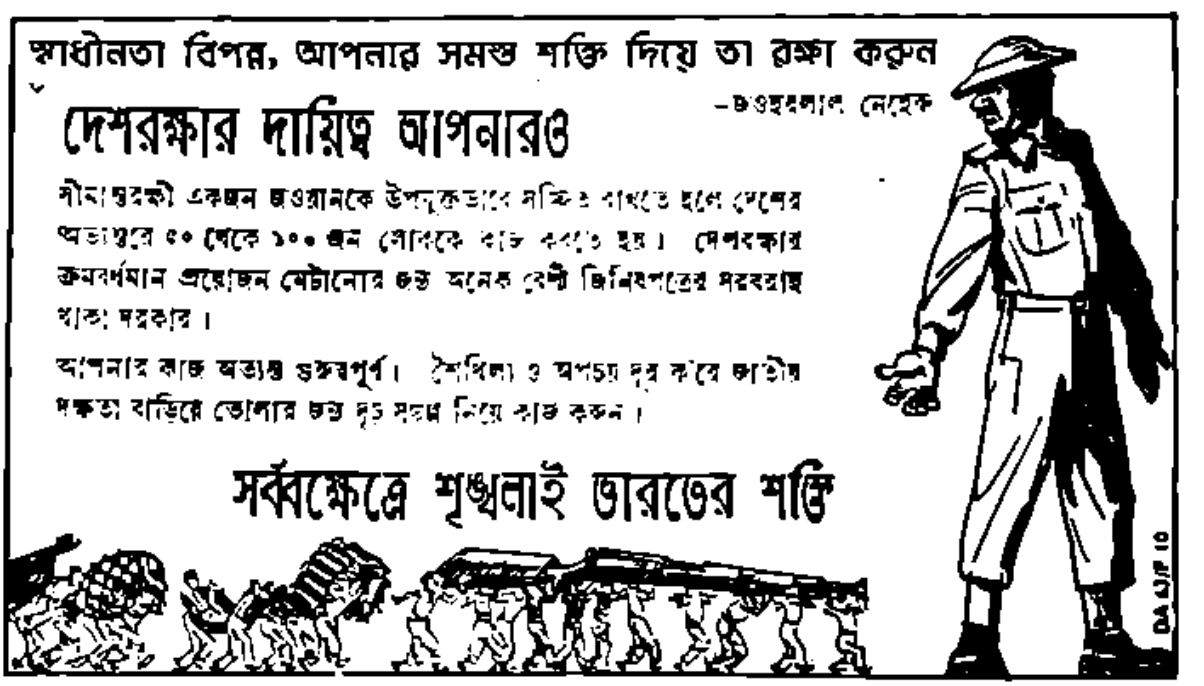

অন্তরীক্ষে

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি

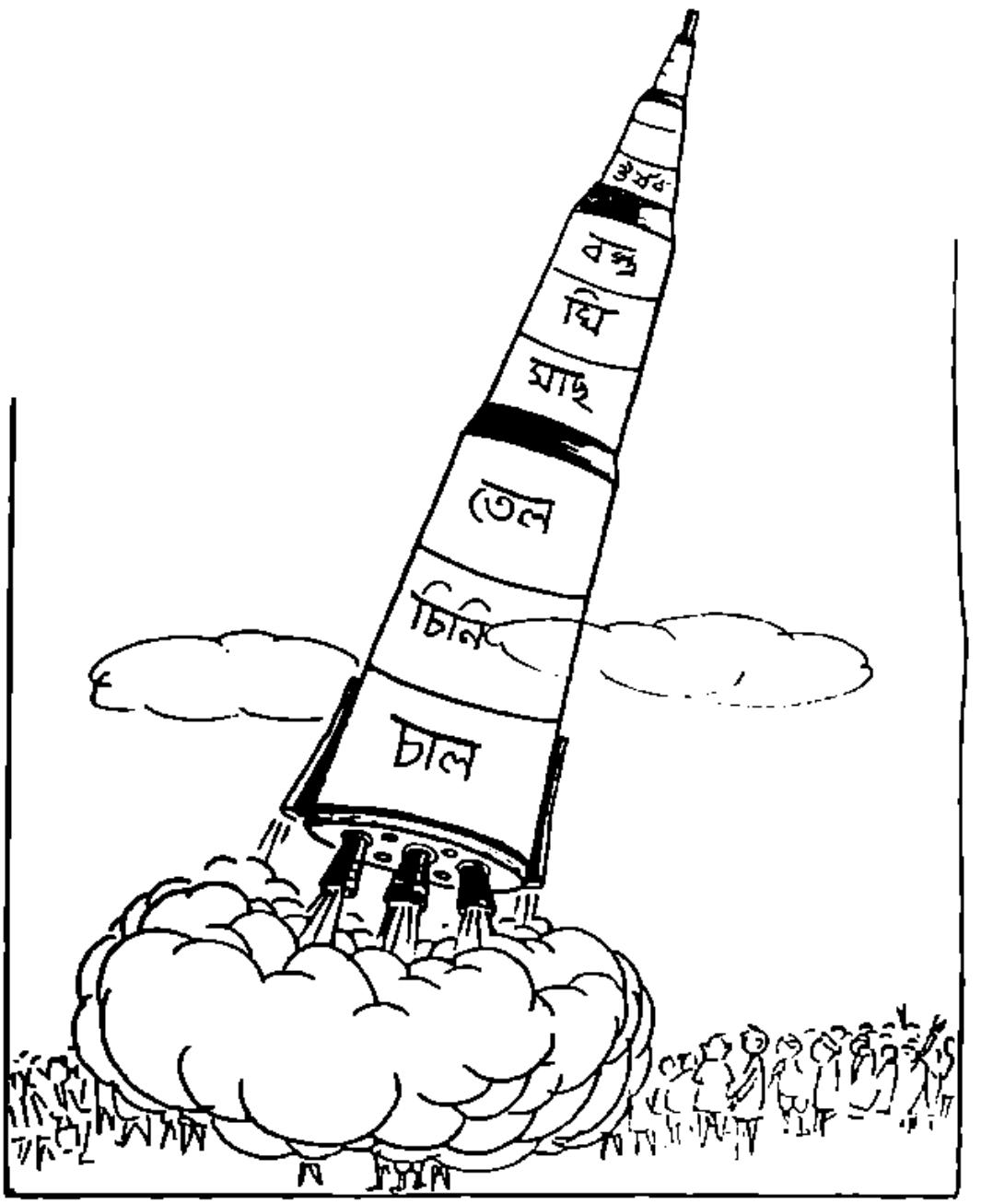

ভারতে প্রস্তুত রকেট

আলো ! আরো আলো !!

হঠাৎ যখন নিভে যায়

সংবাদে রুচি

অশ্লীল সাহিত্য।

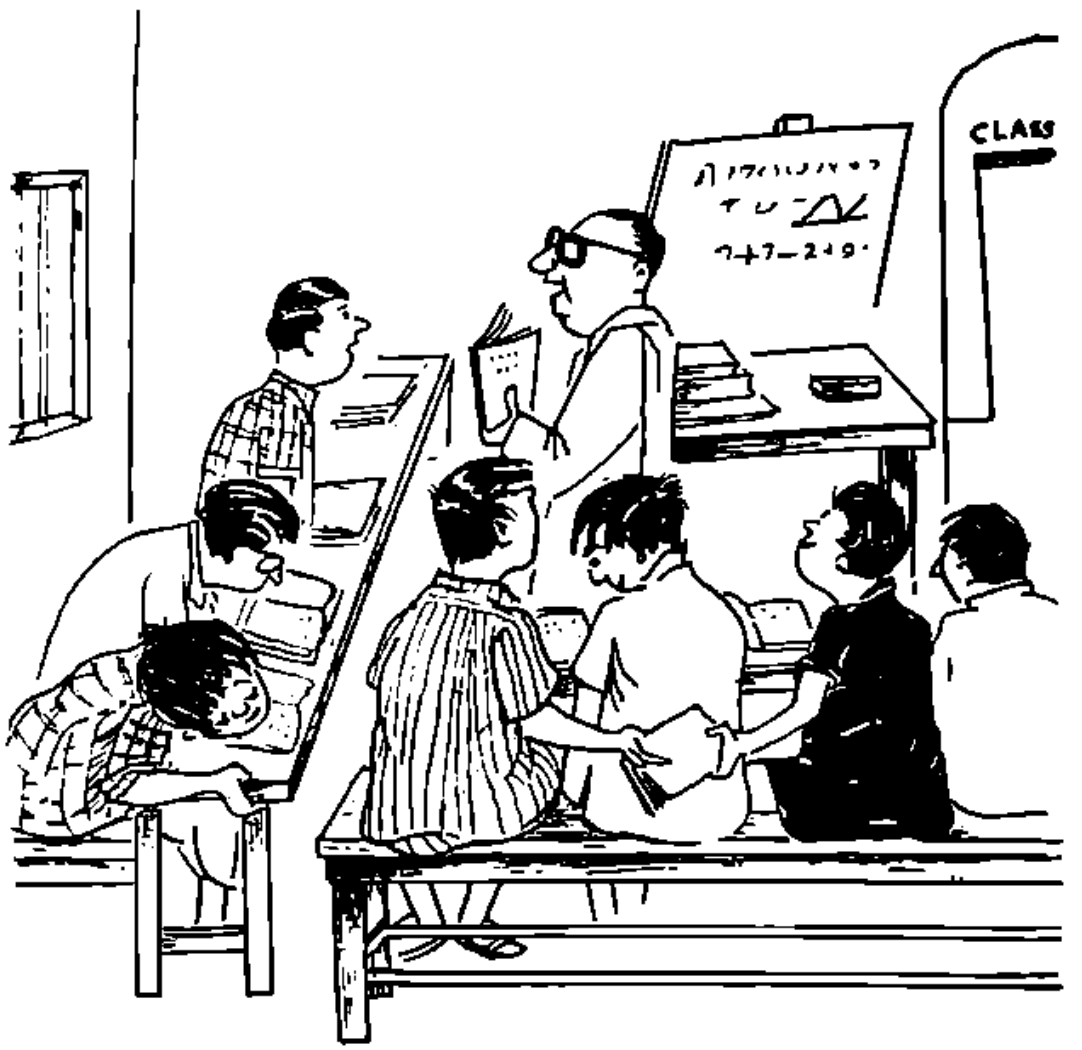

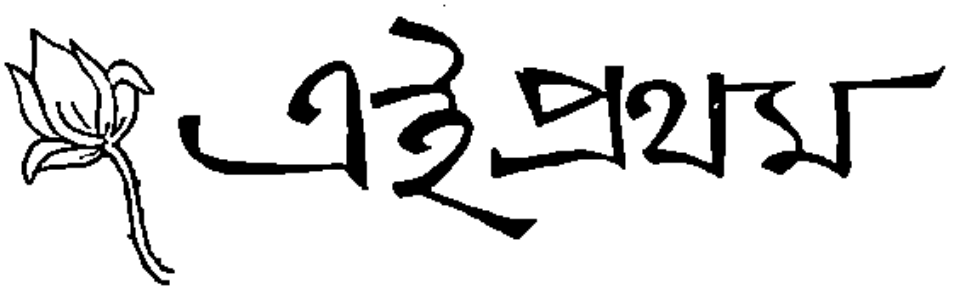

অরুণা সেনগুপ্ত

বড় বাবু

মহিমদার টেবিলে আজ বড় ভিড়। দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাজ করার পর ইউনাইটেড আয়রণ কোম্পানীর সেলস্ বিভাগের বড়বাবু মহিম রায় অবসর গ্রহণ করছেন। আজ তাঁর বেয়ারওয়েল। সকলের কাছে 'মহিমদা' এই নামেই তিনি পরিচিত।

মহীয়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামে তাঁর জন্ম। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর গ্রামেরই এক ভদ্রলোক এই অফিসে একটি কেরানীর কাজ জোগাড় করে দেন। নিজের গুণে ধাপে ধাপে উঠে আজ সেলস্ বিভাগের বড় বাবু।

গ্রামের বাড়ীতে আর তিনি যান না। সেখানে যাবার সকল প্রয়োজনই ফুরিয়েছে। দশ বছর আগে একমাত্র মেয়ে রমা কলেরায় মারা যায়। মহিমদা কন্যার শোক সামলে নিলেও তাঁর স্ত্রী এই আঘাত সহ্য করতে পারেন্ নি। পাঁচ বছর আগে তিনিও ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। মহিমদা'র মনে বড় দুঃখ, স্ত্রীর মৃত্যুকালে তিনি তাঁর কাছে ছিলেন না। কোন এক শনিবার তাঁর স্ত্রী মারা যান। সেই শনিবার মহিমদা'র যাবার কথা ছিল। কিন্তু যাওয়া হয় নি। একটা বড়রকমের অর্ডার ধরবার জন্যে আটকে ছিলেন। অর্ডারটা ধরতে পেরেছিলেন ঠিকই কিন্তু নৈমিত্তিক জীবনে যার ওপর সবচাইতে বড় অর্ডার দেওয়া যেত তা চিরতরেই বন্ধ হয়ে গেল।

মহিমদা আজ ভাবছিলেন বড় বাবুর এই পদ তার জীবনে একটা মস্ত বড় অভিশাপ। বড়বাবু হওয়ার পর থেকেই একটার পর একটা আঘাতে এসে তাঁর জীবনটা দুঃসময় করে তুলেছিল। অফিসের এই ফাইলগুলো আর সহকর্মীরাই তার জীবনের সঙ্গীসাথী। পাঁচটার ছুটি হলেও আটটার আগে কোনদিনই তিনি অফিস থেকে বেরোতেন না।

তিরিশ বছর আগের এক করুণ ছবি তাঁর সামনে ভেসে ওঠে। স্ত্রীর অনুরোধে তিনি পুরী বেড়াতে যান। সঙ্গে ছিল চারবছরের ছেলে পার্থ। রোজই সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যেতেন। একদিন বিকেলবেলায় সমুদ্রের ধারে বসে আছেন। স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে করতে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। পার্থ খেলতে খেলতে অনেক দূর চলে গেছে, সে খেয়াল যখন তাঁদের হল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করছিলেন, স্ত্রী পাগলের মত হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিলেন, অন্য লোকেরা ধরে ফেলেছিল। অনেকে অনেক কথা বলেছিল কিন্তু পার্থর হদিশ মেলে নি। সমুদ্র নাকি কোন জিনিষ ফেরৎ দেয় না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু দু'দিন কেটে যাবার পরও যখন পার্থর খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন সকলেই ধরে নিয়েছিলেন, পার্থ সমুদ্রে যায় নি, হারিয়ে গেছে।

তারপর আরও কয়েক বছর কেটে গেছে। একটি মেয়েও হয়েছিল। কিন্তু সেও মারা কাটিয়ে চলে গেল। চিন্তায় মাথা পড়ল। সেলস ম্যানেজার জন উইলিয়াম্স বিদেশে এসে ডাকছেন। গত চারদিন হল দিল্লী অফিস থেকে কলকাতায় এসেছেন। হয়ত কাজের ধারাটা জানতে চাইছেন মহিমদা সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রায় পাঁচটা বাজার একটু আগে মহিম'দা সাহেবের ঘর থেকে ফিরে এলেন। তাঁকে বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছিল। ডিপার্টমেন্টে আসতে সকলেই বলে উঠল, আজ আবার এত কি কাজ? চলুন, চলুন, কলঘরে চলুন।

অফিসের কলঘরটি বেশ সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে। প্রায় সবাই এসেছেন। অফিসারয়াও আসতে সুরু করেছেন। প্রায় সবাই অবাঙালী। অবশ্য নতুন সেলস্ ম্যানেজার জন সাহেব ভাল বাংলা বলেন।

মহিম'দার সম্বন্ধে তাঁর সহকর্মীরা কিছু কিছু বললেন। কেউ বললেন, মহিম'দার একমাত্র পরিচয় তিনি আমাদের দাদা। ছোটভাইয়ের মত তিনি আমাদের ভালবাসেন। কেউ বললেন, মহিম'দা আমাদের পরমাত্মীয়। সবশেষে জন সাহেব উঠলেন। সাহেব বললেন, দেখুন, আপনাদের মহিম'দার সম্বন্ধে আমার কিছু জানা নেই। তবে আজ আমি একটি ছোট গল্প বলব। আপনারা মন দিয়ে শুনুন।

প্রায় তিরিশ বছর আগে মহিম রায় নামে এক ভদ্রলোক তাঁর একমাত্র পুত্র পার্থ ও স্ত্রীকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যান। সমুদ্রের ধার থেকে পার্থ একদিন হারিয়ে যায়। দু'দিন পরেও যখন পার্থর খোঁজ পাওয়া গেল না, তখন সকলেই ধরে নিয়েছিল, পার্থ জলে যায় নি। তাদের ধারণাটা ঠিকই ছিল। পার্থকে একজন চুরি করেছিল। তার সঙ্গে ছিল অনেক গয়না। গয়নাগুলো কেড়ে নিয়ে তাকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে পালায়। তখন রাত বেশ হয়েছে। পার্থ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। ঐ রাস্তা দিয়ে এক সাহেব ও তার স্ত্রী ফিরছিলেন। একটি ছোট ছেলে কাঁদছে দেখে তাঁরা তাকে কিছু জিগ্যেস করেছিলেন। কিন্তু কিছু উত্তর না পাওয়ায় তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, ছেলেটি নিশ্চয় হারিয়ে গেছে। পার্থকে নিয়ে তারা হোটেলে ফিরে আসেন।

সাহেব ছিলেন দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। ফাদার নামে পরিচিত। পূজার ছুটিতে পুরী বেড়াতে এসেছিলেন। ফাদার পার্থর বাবা মার খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু পান্ নি। তখন স্ত্রীর অনুরোধে পার্থকে নিয়ে দিল্লী ফিরে আসেন। তাদের কোন ছেলে মেয়ে ছিল না। তাই পার্থকে নিজের ছেলের মত মানুষ করতে লাগলেন। কিন্তু মেমসাহেব বেশীদিন বাঁচেন নি।

পার্থ অর্থনীতিতে এম এ পাশ করে। ইউনাইটেড আয়রণ কোম্পানীর দিল্লী অফিসে সেলস্ অফিসার হয়ে ঢোকে। ফাদার পার্থকে ডেভিড বলে ডাকতেন। একদিন ফাদার তাকে ডেকে পাঠালেন। পার্থ কাছে আসতেই তাকে বললেন, দেখ আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। আজ তোমাকে একটা কথা বলব। তুমি বোধহয় জান, আমি তোমায় শুধু মানুষ করেছি। তোমার বাবা মার কথা অবশ্য আমি জানি না। কিন্তু আমি তোমাকে কি করে পেয়েছিলাম তাই আজ বলব। এখানে বলা প্রয়োজন, ফাদার পার্থকে আগে বলেছিলেন, এক অনাথ আশ্রম থেকে তিনি তাকে এনেছিলেন। সব কথা বলার পর ফাদার পার্থকে একটি কবচ দেখালেন। কবচের মধ্যে একটি ছোট কাগজে লেখা

ছিল, পার্থ রায়, পিতার নাম মহিম রায়। কাদার খুব গোপনে মহিম রায়ের খোঁজ করেছিলেন, কিন্তু পান্ নি। পুলিসেও ভয়ে খবর দেন নি। পার্থ চুপ করে আছে দেখে কাদার তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

সারা পৃথিবীতে তখন পার্থর খুনের বলে মনে হয়েছিল। মহাভারতে কর্ণের চরিত্র সে খুব ভাল ভাবে পড়েছিল। একবার মনে হয়েছিল, সেও বোধহয় কর্ণ। কিন্তু তখন এ কথাও ভেবেছিল সমাজের ভয়ে কুন্তী কর্ণকে পরিত্যাগ করেছিলেন, তার বাবা মা ত তাকে পরিত্যাগ করে নি, সে হারিয়ে গেছে। সেদিন কাদারের কাছ থেকে সে চুপ করে উঠে এসেছিল। তার কয়েক দিন পরেই কাদার মারা যান।

তারপর থেকে পার্থের প্রধান কাজ হয়েছিল, মহিম রায় নামে এই ভদ্রলোককে খুঁজে বার করা কিন্তু খুঁজে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়েছিল। অফিসে দিনের পর দিন উন্নতি করে চলেছিল। সেলস্ অফিসার থেকে সেলস্ ম্যানেজার। তারপর কলকাতা অফিসে আসবার অর্ডার হল। বড়বাবুর নাম 'মহিম রায়' শুনে পার্থ চমকে উঠেছিল। আজ তাঁকে তার ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সব কথা শোনার পর আপনাদের মহিমদা 'খোকা' বলে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

মহিম'দা বসে বসেই বললেন, জন উইলিয়াম ডেভিড আমার সেই হারানো পার্থ। পার্থর পিঠে একটা কাটা দাগ ছিল। তা আমি দেখে নিয়েছি। এই কথা বলেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। অনেকেই ছুটে এলেন। পার্থ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ভয়ের কোন কারণ নেই। আজকের সভা এখানেই শেষ হোক। আপনারা উপহারের জিনিস ও ফুলের মালা আমার গাড়ীতে তুলে দিন। আমার বাবা আর মেসে ফিরে যাবেন না। আমি আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব। ফেয়ারওয়েল শেষ হয়ে গেল।

হেলেন কেলারকে একবার আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করেন,—আচ্ছা আপনি অন্ধ হয়ে নিজে কি রকম কষ্ট অনুভব করেন।

—কিছুমাত্র নয়—উত্তর দিলেন এই মহীয়সী নারী।

—কেন বলুন ত?

—কারণ আমার যে সব অন্ধ ব্যক্তি পৃথিবীতে আছেন, তাঁদের কথা ভেবে আমার এতটা সময় যায়, যে নিজের কথা ভাববার আর সময় থাকে না।

রবির আবির্ভাব

জ্ঞান ঘোষ

অসাড় অনুভূতির জড়ত্ব নিয়ে সমস্ত রাত্রির এই গণ-মিছিল। তারা দাঁড়িয়েছে বিরাট অন্ধকারের কেন্দ্রীভূতিতে। যার অতলান্তে কালো ত্রাস, ক্রমবর্ধমান আর্তনাদ আর উদ্বেলিত যৌবনের তন্দ্রাতা। যা মুক্তির অপেক্ষায় তপস্যা ক'রছে। এই অন্ধকারের মাঝেই অন্ধের অনন্তযাত্রা, অজানার অবলুপ্তি। আর চেতনার গণ-আন্দোলন। আত্মার দ্বারে আত্মীয়ের আত্মসমর্পণ। এই মোহানায় কে জাগে? প্রতিধ্বনি: মানুষ! কেন জাগে? প্রতিধ্বনি: জীবনের প্রয়োজনে?

: কি জাগে? প্রতিধ্বনি নিশ্চুপ।

সমস্ত অনুভূতি আজ উন্মুখ। মুখর হবার আশায়। কি-র উত্তরে প্রতিধ্বনিত হবার কামনায়।

• • • •

সৃষ্টির ঘুম-ঘুম-সঞ্চিত অন্ধকারে আলোর শিহরণ কেন?

অসাড় অনুভূতি তার জড়ত্ব হারালো: কি?

তবে কি তবে যৌবনের মুক্তি-তপস্যা? অনন্তের আজ প্রত্যাবর্তন?

বিরাট অন্ধকারের কেন্দ্রীভূত অবলুপ্তি তার রূপ হারাতে বসেছে। জয়হোক্ যৌবনের!

হোক চেতনার গণ-আন্দোলন। পূর্ণ হোক্ মুক্তির তপস্যা।

পূর্ণ হোক্ আত্মীয়ের আত্মসমর্পণ।

আত্মার মুখোমুখি আত্মীয়ের ধ্বনি: কে জাগে? প্রতিধ্বনি: মানুষ!

রূপ হারানো অন্ধকারের অজিত চেতনা: কি মানুষ? প্রতিধ্বনি: সৃষ্টিতত্ত্বের পরম বিস্ময়। ঈশ্বরের অংশে যার জন্ম।

ঈশ্বরের দীক্ষায় ও প্রকৃতির শিক্ষায় যার বৃদ্ধি। সৃষ্টির লীলায় যে স্বয়ং সৃষ্টিকর্তার সমকক্ষ।

তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী। ধ্বনি: কেন জাগে?

প্রতিধ্বনি: জীবনের প্রয়োজনে।

ধ্বনি: জীবন কি? কি তার প্রয়োজন?

প্রতিধ্বনি: জীবন—প্রকৃতির সাথে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে যাওয়া। মানুষের পরমতম সম্পদ। একে অর্জন ক'রতে হয়—শ্রেষ্ঠতর তপস্যার দ্বারা।

ধ্বনি: কি জাগে? প্রতিধ্বনি নিশ্চুপ।

অন্ধকারের কালো বর্ম দূর থেকে ছিন্ন হ'তে সুরু ক'রেছে। সৃষ্টির কালো পর্দা আলোর ঝলকানিতে চোখ মেললো।

রবির আবির্ভাব। আলোকের অভিষেক! অসাড় জড়ত্বে প্রাণের স্পন্দন।

সমস্ত অনুভূতিই আজ ধন্য। প্রকাশের ইসারায় হিল্লোলিত!

কি-র উত্তর সৃষ্টিক্ষেত্রে কথা বলার অভ্যাস ক'রছে॥

আলোর এই জয়যাত্রায় রাত্রির মিছিল চীৎ হয়েছে আলোর পিছনে পিছনে তাই কালোর ছায়া-ছবি। আলো-আঁধারের যুগল উপস্থিতিতে তাই তাদের আপন পরিচিতি। কালোর মাঝে আলোর অহংকার। আর, আলোর বুকে কালোর করুণ প্রার্থনা। জয় হোক্ আলোকের! তার আবির্ভাবে সৃষ্টি ধন্য হোক্।

প্রার্থনা চোখ মেলে দেখলো আবির্ভাবকে। এই শুভদৃষ্টি স্বীকার ক'রলো সৃষ্টির শুভলগ্ন। সুরু হ'লো অন্ধকারের পশ্চাদপসরণ। আলোর আবির্ভাবে অন্ধকার দূর হ'লো? অথবা, অন্ধকার আলোর আবির্ভাবে আলোকিত হ'য়ে উঠলো?

চেতনার মহিমায় সমৃদ্ধ সৃষ্টি অনুভব ক'রলো দৃষ্টির প্রসারতা। যেখানে আলোর মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে কালো নবুজন্মে অভিযান চালিয়েছে। মোহিত হ'লো কণ্ঠের কল-কাকলীতে। যেখানে আলোর পরশে মরুত্বে স্পন্দন সুরু হ'য়েছে। আবার, যেখানে স্পন্দনের উপস্থিতি প্রকাশের প্রেরণায় কথা কইতে আরম্ভ ক'রেছে; গান গাইতে চেষ্টা ক'রছে। চকিত হ'লো প্রতিধ্বনির প্রতিফলিত নিবেদনে। যেখানে ফুটে উঠেছে দল গড়ার ইঙ্গিত। ঘর-বাঁধার স্বপ্ন। অভিভূত হ'লো ইন্দ্রিয় অনুভূতির আবেদনে। যেখানে প্রয়োজনের আকুতি সীমাহীন সীমানায় পরিব্যাপ্ত হ'য়ে র'য়েছে। চমৎকৃত হ'লো অন্তরের আকর্ষণে। যেখানে প্রাণ সমুদ্রে প্রাণীর অবগাহন প্রতিনিয়তই চ'লছে।

• • • •

বিস্ময়কে মধ্যে রেখে আলো-আঁধারের এই মুখোমুখি।

প্রকৃতি প্রতিফলিত হ'য়ে উঠলো: গাছে গাছে ফুল ফুটলো। ফুলে ফুলে রঙ ধ'রলো। রঙে রঙে গুণ মেশা ছিল। আর, সেই রঙে-গুণে কল্পনা জাগলো। ঐ কল্পনা অবলম্বন ক'রে কাব্য ও সঙ্গীতের জন্ম হ'লো। কাব্য-সঙ্গীতের সহযোগে সৃষ্টি ধন্য হ'লো। এই ধন্য-হওয়া প্রকাশিত হ'লো ফুলের বুকে ভ্রমরের মিলন-মন্থনে। ফল-ফলানোর প্রচেষ্টায়। যার গোলক সৃষ্টিতত্ত্বে অমরত্ব লাভ ক'রেছে। গাছে-গাছে নিমন্ত্রিত পাখীদের আশ্রয়-প্রতিষ্ঠার পিছনে তো সেই পারস্পরিক চুক্তি। সাগরের চঞ্চলমান জল-তরঙ্গ, মহাব্যোমের রামধনীয় বিচিত্রতা, মহাশূন্যের নিবিড় মেঘ-খোজা তো সেই সত্যেরই স্বীকৃতি।

সৃষ্টির ঐ পটভূমিকায় উজ্জীবিত জীবনের আত্মোপলব্ধি: কে জাগে?

প্রতিধ্বনি: মানুষ। বিস্মিত সৃষ্টির পরম-বিস্ময় মানুষ। ঈশ্বর-দেহী মানুষ। আত্ম-তৃপ্ত ধ্বনি: কেন জাগে?

প্রতিধ্বনি: জীবনের প্রয়োজনে। সৃষ্টির সফলতায়। চেতনায় ভেসে যাওয়া ধ্বনি: কি জাগে?

প্রাণ-মণ্ডলের সমবেত প্রতিধ্বনি: প্রশ্ন উত্তর। সমস্যা সমাধান। চলমান জীবনের পরম প্রকাশ। আমি॥

• •

•

রবির আবির্ভাব জীবনের জয়ধ্বনি।

জীবিতের আত্মতৃপ্তি। আত্মার পরম প্রকাশ।

প্রাণীর মধ্যে প্রাণের স্পন্দনী-লীলা। আর, এই লীলায় পরিচিত হ'য়ে চলেছে চলমান জীবনের ঐ আমি। যার বিরাট সত্তা সমস্ত সৃষ্টির মাঝে চোখ মেলে চেয়ে আছে।

অবচেতন অন্ধকারের কম্পন-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'লো: আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে চেন। নিজেকে জান। এই আপন-সত্তা ঐ বিরাট সৃষ্টির অংশ বিশেষ। কাজেই নিজেকে চেনার মানেই হ'লো সৃষ্টিকে চেনা। আর, সৃষ্টিকে চেনার অর্থই হলো ঈশ্বর-প্রাপ্তি। মোক্ষলাভ।

সৃষ্টির বুকে ফুল ফুটলো। ফুলে গন্ধ হলো। গন্ধে মোহিনীশক্তি এলো। মেঘে রঙ ধরলো। রঙে আকাশ রাঙা হ'লো। রাঙা আকাশে সূর্যের মহিমা ফুটে উঠলো। সাগরের বুকে কামনা জাগলো। কামনার বশে আকাশের ছায়া বুকে ক'রে নিলো। রঙিন কামনা বুকে নিয়ে অসীমের পানে পাড়ি দিলো।

আবির্ভাব বলছে: সুন্দর হ'য়ে আত্ম প্রতিষ্ঠা কর। সৃষ্টিকর্তা তাঁর কর্তৃত্ব হারাবেন। তাঁর মুগ্ধ চেতনার পবিত্র অনুপ্রেরণায় তুমি অমরত্ব লাভ কর। সার্থক হবে অসীমের প্রত্যাবর্তন। সৃষ্টির অমরত্বের প্রতিষ্ঠা কর। সৃষ্টিকর্তা অমরত্বে উন্নীত হবেন। রবির আবির্ভাবে সুন্দরের অভিষেক হ'লো। সুন্দরের অভিষেকে রবির আবির্ভাব ধন্য হ'লো।

ধ্বনির একটানা গতিকে সুর অবলম্বন ক'রলো। আর, সেই সুরের মাধ্যমেই হ'লো সঙ্গীতের জন্মলাভ। সঙ্গীতকে বরণ ক'রে তুললো—জলে-ওঠা সূর্য। দিনের মালিকানা সাথে।

সুন্দরের স্নেহ-রক্ত পটভূমিকায় আনন্দ ফুটে ওঠার নিমন্ত্রণ মেলে ধ'রলো।

ধ্বনির প্রতিধ্বনি: আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।

আনন্দ হ'তেই সমস্ত জীবের জন্ম। আনন্দের মধ্যেই সকলের প্রত্যাবর্তন। এই আনন্দ-সমুদ্রে কেবলই তরঙ্গ-লীলা চলেছে। তার ছন্দে জীবনটিকে মিলিয়ে দেওয়াই জীবনের সার্থকতা।

আবির্ভাব ব'ললো: একীভূত আত্মার আনন্দোৎসবে নিজেকে নিবেদন কর।

'তোমার মাঝে এমনি ক'রে
নবীন করি' লওহে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর
জন্ম-জনমান্তর। সুন্দর হে সুন্দর।'

এই নিবেদনেই তো 'আমার' আত্মশুদ্ধি। আর, ঐ আত্মশুদ্ধিতে 'তোমার' অনুভূতি।

'তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার
হালের কাছে মাঝি আছে ক'রবে তরী পার।'

অজানাকে জানাই হ'চ্ছে জীবনের প্রকাশ। অজানাকে হাতছানি জানায় পা রবিকে বাড়িয়ে দেবে। অজানাকে জানা ক'রবে। জয় অজানার জয়। এই পথে ভয়ের স্থান তা থাকবে না।

'আমি' এখানে 'তুমি'। অজানা এখানে জানা। আনন্দ এখানে নিবেদিত হোয়ে আছে।

'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।
ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।'

আবির্ভাব বলছে: এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষিত কর। 'আমার' আমিত্বটাকে আলিয়ে ফেলো। নিজে—একলা, শেষ হয়ে যাও।

'আপন, বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে
একলা চলরে। একলা চলরে।'

তারপর বিরাট সৃষ্টির মাঝে বিলীন হ'য়ে অনুভব করে আত্মাকে।

'তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে
আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে নাই বা আমায় ডাকলে।'
'এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর, এই ক'রেছ ভালো।
এমনি ক'রে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ঘুম না ভোঙালে গন্ধ কিছু নাহি ঢালে,
আমার এ বীণ না জ্বালালে সুর না কিছুই আলো।
এই ক'রেছ ভালো।'

রবির আবির্ভাবে সৃষ্টির জড়ত্ব মোচন। তার এই প্রতিফলনে আত্মার স্পন্দন।

আত্মার স্পন্দনে আত্মীয়ের কামনা-বোধ। আর, সেই কামনায় আত্মার অনুভূতি। এই অনুভূতির প্রকাশ তার শুভ্রবের তপস্যায়। তার আনন্দলোকে পরিভ্রমণে।

এর পথে ইন্দ্রিয় তার আপন-সত্তার নিমন্ত্রণ নিয়ে ব'সে আছে। আর, এই পরম ভোজের বাসরে অন্তর-বাহির একাকার হ'য়ে গেল। অন্তের কলরে প্রত্যাবর্তন সার্থক হ'লো।

ধ্বনি কল্প প্রতিষ্ঠিত। সংঘ-সঞ্চিত। আত্মবিস্মৃতির পথে তার জন্মলাভ। আত্মবিদিতায় তার আত্ম পরিচিতি।

প্রতিধ্বনি—আগন্তুক। ধ্বনির করুণায় সৃষ্ট। বাধার প্রতাড়নায় পুষ্ট—বর্দ্ধিত।

ধ্বনি—সুন্দর। অদৃষ্ট বাদিনী। প্রতিধ্বনি মধুর। আনন্দদায়িনী।

ধ্বনি—বায়ু মণ্ডলের সম্পদ।

প্রতিধ্বনি—বায়ুমণ্ডলে ধ্বনিরই অনুবৃত্তি। চ'লে যাওয়ার মোহন রূপে প্রত্যাবর্তন।

ধ্বনি—বেদনা কম্পনের আলা নিয়ে তুমি চ'লে গেলে।

প্রতিধ্বনি—অনুভূতির আলোতে নিজেকে দেখে, নিজেকে জেনে আমি ফিরে এলুম।

ধ্বনি—তোমার অনন্ত জিজ্ঞাসা।

প্রতিধ্বনি—আমার জীবন দর্শন।

শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে সৃষ্ট জীবন-অনুভবের চেতনায় শিউরে উঠেছে। কণ্ঠে প্রকাশের আকুতি নিয়ে সৃষ্ট ধ্বনি-সমারোহ কূলে আজ অশান্ত।

সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁর সৃষ্টি সাধনায় মোহিত হ'য়ে অন্ত শতাব্দীর পানে কান পেতে অপেক্ষা করছেন প্রতিধ্বনির আশায়।

এক শতাব্দীর ধ্বনি অন্ত শতাব্দীতে প্রতিধ্বনিত হোক্।

অন্ত শতাব্দীর প্রতিধ্বনি অনাগত শতাব্দীর বুকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হোক।

সৃষ্টির এই অমরত্ব সৃষ্টিকর্ত্তাকে অমর করুক্ সত্য হোক্ রবির আবির্ভাব।

গল্প-ভারতী

সম্পাদক : ডঃ কালিদাস নাগ

উনবিংশ বর্ষের একনিষ্ঠ সাহিত্য সাধনায় সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে
নূতন ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে

প্রতি সংখ্যায় প্রকাশিত হচ্ছে—বিশ্ব-সংস্কৃতি (সচিত্র-সংযোজন)

সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতি • শিল্পকলা •
ভাস্কর্য্য • রঙ্গমঞ্চ • চলচ্চিত্র সম্পর্কে পরিচিত করার এক অভিনব প্রচেষ্টা

ভারতের সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে এই ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম

এই পর্য্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে : বৃটেন • জার্মাণী • আমেরিকা

প্রকাশিত হবে : সোভিয়েট রাশিয়া • ফ্রান্স • জাপান • ইতালী • পোল্যাণ্ড • হাঙ্গেরী প্রভৃতি

কল্লোল যুগের তিনজন অবিস্মরণীয় লেখক একত্রে নিয়মিতভাবে
বর্তমানে শুধু গল্প-ভারতীতেই লিখছেন

জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ (জীবন কাহিনী)—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জীবনের যজ্ঞশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

স্মৃতিদোলায় (স্মৃতিকথা)—প্রেমেন্দ্র মিত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস "শুক্তি-সৈকত"—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

স্বল্পকালের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয় এক নূতন আঙ্গিকের সৃষ্টি করেছেন

রবীন্দ্রযুগ—লিখছেন—রবীন্দ্রনাথের একান্ত সহচর ডঃ কালিদাস নাগ

উদাত্ত আহ্বান—জাতীয় সঙ্কটের পটভূমিকায় এক অপূর্ব সংযোজন

চলতি দুনিয়া—আজকের দুনিয়ার হালচাল

বিশ্ব-সাহিত্য—দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা

সঙ্গীত আসর—(স্বরলিপিসহ ; পরিচালনা করছেন সঙ্গীত নাট্য একাডেমীর
অধ্যক্ষ রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চিঠি শুধু চিঠি নয় —চিঠির মাধ্যমে চরিত্রের ও জীবনের অজ্ঞাত তথ্য পরিচয়

দেশ-বিদেশ—দেশ-বিদেশের খবরাখবরে পরিপূর্ণ সচিত্র আলোচনা

খেলাধূলা—ক্রীড়া জগতের সচিত্র বিবরণ

এই প্রথম—নূতন লেখক লেখিকা সৃষ্টির অভিনব প্রচেষ্টা

বাংলা দেশের প্রখ্যাতনামা সাহিত্যরথীদের রচনায় সমৃদ্ধ গল্পভারতী
বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী অগ্রগতিতে আপনার সহযোগিতা কামনা করছে

ব্রটেন

সচিত্র সংযোজন

গ্রেট বৃটেনে মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী

১৯৬২ সনের সরকারী হিসেব মতো দেখা যায় গ্রেট বৃটেনে মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারীর মোট সংখ্যা প্রায় নয় শত। অবশ্য এর মধ্যে অনেকগুলি আছে বেশ ছোটো—দু'খানা কি তিনখানা ঘরের সামান্য পরিধির মধ্যে যেগুলির সংগ্রহ সীমাবদ্ধ। যে কোনো দর্শকের পক্ষে কয়েক মিনিটের মধ্যে যা দেখা শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আবার কতকগুলি এরকম বিরাট মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারী আছে যার প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর থেকে শুধু একটিবার করে চোখ বুলিয়ে আসলেও কয়েক সপ্তাহ কেটে যাবে। বলাই বাহুল্য এদেশের প্রত্যেক মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারীই সাধারণের জন্যে উন্মুক্ত।

মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারীগুলি গ্রেট বৃটেনের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে যদিও কিছু বড়গুলি বেশির ভাগই লণ্ডন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত। প্রথমেই বলতে হয় বৃটিশ মিউজিয়ামের কথা। বৃটিশ মিউজিয়ামের বইয়ের বিভাগে যেমন খাতাপত্রে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বই আছে। পুরাতত্ত্ব অনেক রকমের প্রাচীন এবং দুষ্প্রাপ্য শিল্প-সংগ্রহ, ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত নিদর্শন রয়েছে সংখ্যার দিক দিয়ে তা পৃথিবীর এই জাতীয় যে কোনো সংগ্রহশালার চাইতে বেশি। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে প্রতিষ্ঠিত এই বৃটিশ মিউজিয়ামে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ থেকে সংগৃহীত কম বেশী পুরা-নিদর্শন স্থান পেয়েছে, এবং এই সমস্ত সংগ্রহের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে এক বৃটিশ মিউজিয়ামে এলে যে কোনো লোক পৃথিবীর যে কোনো কালের যে কোনো দেশের বিষয় প্রয়োজনীয় এবং সাধারণ জ্ঞাতব্য প্রায় সব কিছুই জানতে পারে।

চিত্র সংগ্রহশালা হিসেবে ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম, এলবার্ট মিউজিয়াম, ন্যাশনাল গ্যালারী এবং টেট গ্যালারী অগ্রগণ্য। এই চারটি মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারীতে পৃথিবীর প্রাচীন তৈল চিত্র এবং জল রঙের চিত্র স্থান পেয়েছে। প্রথমে চিত্রগুলি দেশ অনুসারে বিভক্ত করে সাজানো হয়েছিল কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যখন নতুন করে আর্ট গ্যালারীগুলির বন্দোবস্ত করার প্রয়োজন দেখা দিলো তখন বিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ মতো এই সব সংগ্রহশালার চিত্রগুলি কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়েছে। এর ফলে শিল্পজগতে প্রগতির ধারা এবং লক্ষণগুলি সম্পর্কে উৎসাহী ছাত্র ও দর্শকগণের খুবই সুবিধে হচ্ছে।

পূর্বোক্ত গ্যালারীগুলির পরই সংগ্রহের পরিমাণ কম হলেও গুরুত্বের দিক দিয়ে নাম করতে হয় এই কয়েকটি গ্যালারীর: ন্যাশনাল পোর্ট্রেট গ্যালারী, ইম্পিরিয়াল ওয়ার মিউজিয়াম, ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়াম, পাবলিক রেকর্ড অফিস মিউজিয়াম, লণ্ডন মিউজিয়াম প্রভৃতির লণ্ডন মিউজিয়ামে প্রধানত সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্র সংগৃহীত হয়েছে।

এগুলি ছাড়া শত বছর আগে একটি আর্ট গ্যালারীর উদ্বোধন করা হয়েছে বাকিংহাম প্রাসাদে। এখানে প্রধানত বৃটেনের রাজপরিবারের নিজস্ব সংগৃহীত চিত্রগুলির মধ্য থেকে বেছে বেছে কিছু চিত্র রক্ষিত আছে।

শিক্ষা দপ্তরের পরিচালনাধীন একটি সায়েন্স মিউজিয়ামও রয়েছে বৃটেনে। তবে অধিকাংশ আর্ট গ্যালারী এবং মিউজিয়ামই বিভিন্ন ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত হয়। তবে একটা কথা—প্রায় সমস্ত মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারীই কিছু না কিছু সরকারী সাহায্য পেয়ে থাকে—যদিও সরকারী হস্তক্ষেপ কাউকেই সহ্য করতে হয় না। সরকারী সাহায্য শুধু গ্যালারীগুলির পরিচালনার ব্যয় বহন করবার জন্যেই দেওয়া হয় না, নতুন কোনো সংগ্রহের প্রশ্নে অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে সরকারী তরফ থেকে অকৃপণভাবে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। তা না হলে গ্রেট বৃটেনের আর্ট গ্যালারীগুলির এই ক্রমোন্নতি

সম্ভব হতো না। ছোটো বড়ো, সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে প্রত্যেক মিউজিয়াম এবং আর্ট গ্যালারীর বাড়ির দেখাশুনো করা, বা মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে তার বন্দোবস্ত করা সরকারের পক্ষ থেকেই করা হয়।

লণ্ডনের পরই বলতে হয় এডিনবরার কথা। এডিনবরায় দু'টি মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী রয়েছে: ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব এ্যান্টিকুস অব স্কটল্যাণ্ড, ন্যাশনাল গ্যালারী অব স্কটল্যাণ্ড, রয়্যাল স্কটিশ মিউজিয়াম, স্কটিশ ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডার্ণ আর্ট, স্কটিশ ইউনাইটেড সার্ভিসেস মিউজিয়াম।

ওয়েলস অঞ্চলের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য মিউজিয়াম হলো ন্যাশনাল মিউজিয়াম অব ওয়েলস। নরদার্ন আয়র্ল্যাণ্ডে বরদার্ন আইরিশ লোক মিউজিয়াম প্রতি বছর বহু দর্শককে আকৃষ্ট করে।

সারা দেশের মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং তার উন্নতিবিধানের জন্যে সরকারকে সর্বাসর্বদা পরামর্শ দেবার জন্যে ১৯৩১ সনে একটি কমিটি গঠন করা হয়: স্টাণ্ডিং কমিশন অন মিউজিয়ামস এণ্ড গ্যালারীস। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর এই কমিশনের তরফ থেকে এক একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

অকস্‌ফোর্ডের আশমোলিয়াস মিউজিয়াম এবং কেম্ব্রিজের ফিজউইলিয়াম মিউজিয়ামও আয়তনে ছোটো হলেও সংগ্রহের গুরুত্বের দিক দিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জীবিত এবং মৃত সমস্ত রকম শিল্পীরই ছবির প্রদর্শনীর নিয়মিত ব্যবস্থা করা হয় বৃটেনে। যে প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধানে সাধারণত এই ব্যবস্থা করা হয় তাদের মধ্যে কয়েকটি হলো রয়্যাল একাডেমী, রয়্যাল স্কটিশ একাডেমী, রয়্যাল সোসাইটি অব বৃটিশ আর্টিস্টস, রয়্যাল ইন্‌স্টিটিউট অব অয়েল পেইণ্টার্স, রয়্যাল সোসাইটি অব পেণ্টার্স ইন ওয়াটার কলারস, রয়্যাল সোসাইটি অব অয়েল পেইণ্টার্স, উইমেনস ইণ্টার ন্যাশনাল আর্ট ক্লাব প্রভৃতি। এই নামগুলি থেকেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে প্রায় সমস্ত রকমের শিল্পেরই পৃথক পৃথক প্রদর্শনীর জন্যে উপযুক্ত আয়োজন বৃটেনে রয়েছে। উদীয়মান কোনো তরুণ শিল্পীর কাজে প্রতিশ্রুতির কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেলেই কোনো না কোনো প্রদর্শনী সংস্থার সহায়তায় তা সাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরা হয়।

প্রসঙ্গত আমাদের দেশের কথা মনে পড়ে। এখানে বহু কম বিখ্যাত কিন্তু সুদক্ষ এবং বয়সে প্রবীণ শিল্পীর ছবির কোনো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে হলে তার পেছনে যদি সমাজের কোনো হোমরাও চোমরাও এসে না দাঁড়ান তা' হলে না জোগাড় হয় একটা সাধারণ হল না হয় সংবাদ-পত্রে তার কোনো প্রচার। ফলে নিতান্ত যাঁরা প্রকৃতই মনে প্রাণে কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালোবাসেন সেই জাতীয় শিল্পী ব্যতীত অনেককেই দেখা যায় অকস্মাৎ এক সময় নিদারুণ হতাশায় একটু উৎসাহ এবং একটু প্রেরণার অভাবে তাঁর সাধনা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন। ভারতবর্ষে সমস্ত রকমের প্রতিভা যতো অনাদর, যতো প্রতিভার এখানে অকালে বিনষ্ট হয়ে যায়—ততো সম্ভবত পৃথিবীর আর কোনো দেশেই হয় না।

শিল্প শিক্ষার জন্যে গ্রেট বৃটেনে মোট ১৫টি আঞ্চলিক কলেজ রয়েছে। এগুলির মধ্যে সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ হলো লণ্ডনের রয়্যাল কলেজ অব আর্ট এবং সেণ্ট্রাল স্কুল অব আর্টস এণ্ড ক্র্যাফ্‌টস। শিল্পের ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার সুযোগ পাওয়া যায় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত কোর্টঅল্ড ইনষ্টিটিউটে।

গ্রেট বৃটেনে প্রায় সমস্ত স্কুলেই একেবারে নীচু ক্লাশ থেকে শিল্পশিক্ষার সুযোগ রয়েছে এবং পাঠ্যসূচীও সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই তৈরী করা হয়।

যুক্তরাজ্যে রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য সংস্থা

শেকসপীয়র-জনসন-শ-এর দেশ বৃটেন শুধু নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টিতেই পৃথিবীর অদ্বিতীয় নয়, বৃটেনের নাট্য-আন্দোলন এবং অসংখ্য পেশাদার এবং অপেশাদার নাট্য সংস্থার কর্মচঞ্চলতাও পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশবাসীর বিস্ময়ের উদ্রেক করবে নিশ্চয়ই।

ছোট্ট দেশ গ্রেট বৃটেনে পেশাদার নাট্য-সংস্থার সংখ্যা দু'শোর ওপর। তার মধ্যে এক লণ্ডন এবং তার আশে পাশেই প্রায় পঞ্চাশটি স্থায়ী মঞ্চে শতাধিক সংস্থা সারা বছর নতুন নতুন নাটকের প্রদর্শনী দেখিয়ে থাকেন। পাঁচটি সংস্থা কভেন্ট গার্ডেন, সাডলারস ওয়েলস, ওল্ড ভিক, রয়াল কোর্ট এবং মায়মেড—এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মঞ্চ রয়েছে। বাদ লণ্ডনের বিভিন্ন নাট্য-সংস্থা রাজধানীর মঞ্চ ভাড়া নিয়ে তাঁদের নাটক মঞ্চস্থ তো করেনই, অন্যান্য ছোটো ছোটো শহর এবং গ্রামাঞ্চলেও তাঁরা ঘুরে বেড়ান। তার ফলে রাজধানীর দর্শক এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলের দর্শকের মধ্যে রুচির ব্যবধান গড়ে উঠতে পারে না। এবং গোটা দেশে এক ধরণের নাট্য-শিল্পের রুচি গড়ে উঠতে থাকে।

লণ্ডন এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে পঞ্চাশটি স্থায়ী মঞ্চ রয়েছে তার মধ্যে অন্ততঃ দশটি তৈরী হয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে এবং বর্তমানেও আরো কয়েকটির নির্মাণকার্য চলছে। কাজেই নাটকের প্রতি সাধারণ মানুষের প্রবণতা যে এখনো ক্রমেই বেড়ে চলেছে—এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা যায়। এ সব ছাড়া সরকারী তরফ থেকে লণ্ডনে একটি সুবিশাল মঞ্চগৃহ তৈরী করবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চৌদ্দ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এই থিয়েটার বাড়ী তৈরী করবার জন্যে। আশা করা যায়, এটি ইয়োরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঞ্চ-গৃহ হবে সব দিক দিয়েই।

বৃটেনের পেশাদার মঞ্চ-শিল্পী এবং থিয়েটার ম্যানেজারদের দুটি সংগঠন রয়েছে। সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রী, ম্যানেজার, পরিচালক এবং কলাকুশলীরা সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে থাকেন—কারণ তা না হলে একদিকে যেমন তাদের পক্ষে সর্বদা কর্মে নিযুক্ত থাকা সম্ভব হয় না, অন্যদিকে তেমনি থিয়েটারের মালিক পক্ষও শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবার সুযোগ পান নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে। সংগঠনের প্রতি বৃটিশ জাতির যে ঝোঁক দেখা যায় কর্মজীবনের সমস্ত দিকে নাট্য-আন্দোলনের বেলাতেও তার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নি। বৃটেনে নাট্যকারদেরও নিজস্ব একটি সংগঠন রয়েছে—গীল্ড অব বৃটিশ ড্রামাটিস্ট্স।

এ তো গেলো পেশাদার নাট্যকার, নাট্য-সংস্থা ও মঞ্চের কথা। এ ছাড়া অপেশাদার নাট্য আন্দোলনের দিকটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সরকারী হিসেব মতে দেখা যায় সারা গ্রেট বৃটেনে কয়েক হাজার ড্রামাটিক সোসাইটি ধরণের সংস্থা রয়েছে এবং এগুলির মোট সভ্য সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ।

ব্যাপারটা সত্যি বিস্ময়কর। যে দেশের মোট জনসংখ্যা কম বেশি পাঁচ কোটি, সেখানে অপেশাদার নাট্য সংস্থার সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে যুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা কিনা পাঁচ লক্ষ! দেশের সর্বত্র যে অপেশাদার নাট্য সংস্থাগুলি ছড়ানো রয়েছে তার পেছনে রয়েছে সরকারী শিক্ষা-বিভাগের অকৃপণ সাহায্য; বড়ো বড়ো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকেও কম সাহায্য আসে না। তা ছাড়া বিশেষ করে অপেশাদার

নাট্য সংস্থাগুলির উন্নতি সাধনের জন্যেই রয়েছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান—দি বৃটিশ ড্রামা লীগ, দি স্ট্যাণ্ডিং কনফারেন্স অব ড্রামা এ্যাসোসিয়েশনস, দি বৃটিশ কমিউনিটি ড্রামা এ্যাসোসিয়েশন, দি অলিস্টার ড্রামা লীগ এবং দি এ্যাসোসিয়েশন অব্ অলিস্টার ড্রামা ফেস্টিভালস। তা ছাড়া রয়েছে লিটল থিয়েটার গিল্ডের একটি সংস্থা।

নাট্য-শৈলী শিক্ষা করবার জন্যেও গ্রেট বৃটেনে একাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যা বোধহয় পৃথিবীর অনেক দেশেই নেই। সরকারী সাহায্য পুষ্ট রয়্যাল একাডেমী অব ড্রামাটিক আর্ট এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। ১৯০৪ সনে প্রতিষ্ঠিত এই একাডেমীতে নাট্য শিল্পের প্রায় সমস্ত বিষয় সম্পর্কেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। দু' বছরের শিক্ষা কাল অতিক্রম করবার পরে এরা শিক্ষার্থীকে রীতিমতো ডিপ্লোমা দিয়ে থাকেন—সমস্ত ইয়োরোপের মঞ্চ-কর্তৃপক্ষ এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিল্পীদের কাজকর্মে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এ জাতীয় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্রিস্টলের ওল্ড ভিক স্কুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জার্মানী ও ফ্রান্স থেকে কয়েকজন সাহিত্যিক দেখা করতে গেছেন ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের সঙ্গে। তাঁকে তাঁর বাড়ীতে না পেয়ে তাঁরা চলে আসছিলেন, হঠাৎ রাস্তায় এক ল্যাম্পপোস্টে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক ভদ্রলোককে তাঁদের ডিকেন্স বলে সন্দেহ হোল।

কাছে গিয়ে তাঁরা দেখেন সত্যিই তিনি ডিকেন্স।

তবুও একবার জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা, ক্ষমা করবেন, আপনিই কি চার্লস্ ডিকেন্স।

তিনি আপন মনে কি ভেবে বললেন—আমার নাম নিকোলাস নিকলবি—

সে কি? বিস্মিতভাবে চেয়ে রইলেন আগন্তুকেরা।

এবার ডিকেন্স হাসলেন, বললেন—আপনারা আমায় অপরাধ নেবেন না। আমি আমার আগামী উপন্যাসের এক চরিত্রের কথা ভাবছিলাম আর তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমার নামটাও ভুলে গিয়েছি।

গল্প-ভারতী

পূজার অর্ঘ্য

আশ্বিন, ১৩৭০

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

সম্পাদক :

শ্রীবিভূতিভূষণ দাস

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য চার টাকা

প্রচ্ছদপট : রবেন আয়ন দত্ত

শ্রীগুরুদাস কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

স্বামী বিবেকানন্দ
স্মারক গ্রন্থ

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত এই স্মারকগ্রন্থ স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের বহুমুখী প্রতিভার বিভিন্ন দিক লইয়া বাংলাদেশের খ্যাতনামা চিন্তাশীল ৪৩ জন লেখক লেখিকার বিচিত্র রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ।
স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্নভাবের আর্ট পেপারে ছাপা বহু ছবি সম্বলিত রয়াল সাইজ প্রায় ৪০০ শত পৃষ্ঠার এই স্মারকগ্রন্থের মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা—ডাকমাশুল ২৪০ নঃ পঃ।

দৈনিক বসুমতী বলেছেন : "স্বামীজীর প্রতিভার অসামান্য পরিচয় আছে এই স্মারকগ্রন্থের প্রতিটি পৃষ্ঠায়। তাঁর সমাজ চিন্তা, শিক্ষা চিন্তা, বেদান্ত চিন্তা, রাজনৈতিক চিন্তা, এমন কি চিত্রকলা, স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে তাঁর চিন্তা—আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি প্রবন্ধের ভিতর দিয়া এমন সুন্দরভাবে আলোচিত হয়েছে যে, বিন্দুর বুকে একটী বিরাট সিন্ধুই আভাসিত হয়েছে।...সাময়িক পত্রিকার হাটে কিংবা দৈনিক সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় সাধারণতঃ যে ধরণের প্রবন্ধ বিকায়, এই স্মারকগ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রবন্ধগুলি সেই শ্রেণীর নহে—এইগুলির একটি স্থায়ী মূল্য আছে বলেই না বিবেকানন্দ প্রতিভার অনুশীলনের পক্ষে এইগুলি সহায়ক হবে"।

দেশ পত্রিকা বলেছেন : স্বামীজীর শতবর্ষ জয়ন্তী উপলক্ষে যে-সব বই বেরিয়েছে তাদের মধ্যে এই বিরাট গ্রন্থটি নানা কারণে বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে।...স্বামী অভেদানন্দের একটি ভাষণের অনুবাদ দিয়ে স্মারকগ্রন্থটি আরম্ভ করা হয়েছে। স্বামীজী সম্বন্ধে এই রচনাটি ক্ষুদ্র হলেও মূল্যবান, "রামমোহন ও বিবেকানন্দ" সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ সুন্দর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে ঐক্য আছে। অনৈক্যের বিকটার ওপর জোর দেওয়ার চেয়ে এটা কঠিন কাজ এবং আজকের দিনে তার প্রয়োজনও বেশী। "ধর্মগুরু বিবেকানন্দে" ডঃ রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন : আধ্যাত্মিকতাই ভারতের প্রাণকেন্দ্র, স্বামীজীর পূর্বে জোর গলায় একথা তো কেউ বলেনি। পাশ্চাত্য-জগতকে এবং তৎসহ আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে দেখিয়েছিলেন হিন্দুধর্মের অখণ্ড সার্বভৌমত্ব। বৈদিকযুগের উজ্জ্বল ধর্ম ও দর্শন কালপ্রবাহে তমসাচ্ছন্ন হয়েছিল। আচার-আচরণ-ক্লিন্ন হয়ে উঠেছিল। সে-সব বাদ দিয়ে, সারবস্তু তিনি খুঁজে বের করে জগতের সামনে ধরে দিয়ে গেলেন।...স্বামীজী তাই বেদান্তের অদ্বৈতবাদ কেবল সহজ কথায় বুঝিয়ে ক্ষান্ত হন নি, অদ্বৈতবাদের সঙ্গে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আর দ্বৈতবাদের সমন্বয় করে গেছেন"! "আমি সেই ঈশ্বর বা সেই ধর্মে বিশ্বাস করি না, যিনি বিধবার চোখের জল মোছাতে বা অনাথের মুখে অন্ন তুলে দিতে পারেন না", স্বামীজীর এই কথাটি উদ্ধৃত করে ডঃ রমা চৌধুরী নারীশিক্ষার জন্য তাঁর প্রাণপাত প্রচেষ্টার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন।...স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের "বিবেকানন্দ-দর্শনচিন্তার মূলরহস্য" একটি অসাধারণ রচনা। এমন গভীর ও মৌলিক চিন্তা দুর্লভ। "স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তার মূলরহস্য সহজে ও সরলভাবে প্রতিফলিত হলেও তা সাধারণ সাধকের কাছে দুরধিগম্য, কিন্তু অবিশ্রান্ত ধর্মিষ্ঠ সাধনায় সেই দুর্লভ সত্যের দ্বারও উদ্ঘাটিত হয় এবং এই সান্ত্বনা ও আশার বাণীই শুনিয়েছেন স্বামীজী এযুগে"।...স্বামীজীর বহু ছবি স্মারকগ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ-স্মারকগ্রন্থের প্রচ্ছদসজ্জা ও মুদ্রণপারিপাট্য প্রশংসার্যোগ্য।

— প্রাপ্তিস্থান —

॥ আধুনিকা ॥
১৬১।২।১, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা।

ম্যানেজার—'বিশ্ববাণী'
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

এই সংখ্যায়

শ্রীদুর্গা—প্রাণশক্তি	—অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ	১
শ্রীদুর্গাপূজা ও জাতীয়তা	—শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য	৫
ঠাকুমা	—বনফুল	৭
বিচিত্র সংলাপ	—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী	১১
সেদিনের আমরা	—ডঃ কালিদাস নাগ	১৫
অ্যাটম	—শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	১৭
এই আমার গল্প	—শ্রীমতী বাণী রায়	২২
কমলের প্রেতাত্মা ও আমরা	—শ্রীপরিমল গোস্বামী	২৮
ঈর্ষা	—শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৩৪
খেলা ভাঙার খেলা	—শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায়	৪৩
১৭ ক্যারাট (বড় গল্প)	—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল	৪৯
বঙ্কিমচন্দ্রের নব মূল্যায়ন	—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৯
দুই সৈনিক (বড় গল্প)	—শ্রীচিত্তরঞ্জন মাইতি	৬৩

"জাগে সুন্দর,
জাগে নির্মল,
জাগে আনন্দময়ী"।
—রবীন্দ্রনাথ

মার্কি রেডিও

দেবসনস্
প্রাইভেট
লিমিটেড
কলিকাতা ০ পাটনা

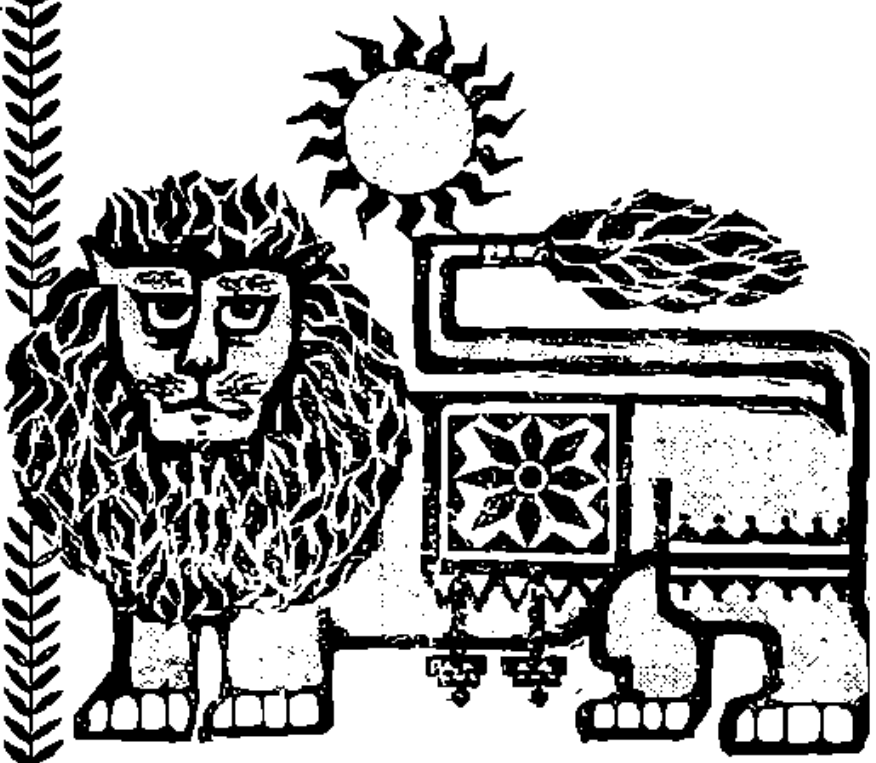

OP/PA/2-63

এই সংখ্যায়

টাকার বাজার	—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৭৭
মুস্কিল-আসান	—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী	৮১
শ্বেতচন্দন তিলকে সাজায়ে তোমারে দিল কে ? (উপন্যাস)	—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৮৭
প্রথম বসন্ত	—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র	১৪৫
মাউন্ট এভারেষ্ট (বড় গল্প)	—শ্রীবোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	১৫৩
হৃদয় আমার নাচেরে	—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু	১৭৭
ক-খ-গ-ঘ-ঙ	—শ্রীঅমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৮৮
চল চল কাঁচা (উপন্যাস)	—শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	১৯৭
মেয়েরা এমনই হয়	—শ্রীমতী সুলেখা দাশগুপ্ত	২৬৪৬
নতুন পৃথিবী	—শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্ত্তী	২৬৫
বাংলা প্রবন্ধের বিবর্তন	—ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার	২৭৫
মুখোমুখি	—শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	২৮১
লঘু-ত্রিপদী (উপন্যাস)	—শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী	২৮৭
দেবমিতা	—শ্রীমতী নীলিমা দাশগুপ্ত	৩২৯
কেউ কন নয়	—শ্রীআশীষ গুপ্ত	৩৩৭
বাংলার দেউল ও দেবতা	—শ্রীকল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৯
মামুণ্ডির জঙ্গলে	—শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	৩৪৫
দেবীগর্জ্জন (নাটক)	—শ্রীবিজন ভট্টাচার্য্য	৩৫১
ব্যবধান	—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৩৮৩

বিশ্বের ব্যালেনৃত্য

ব্যালে বা নৃত্য-নাট্য	—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য্য	৩৯৩
সোভিয়েট ব্যালে	—শ্রীগোপাল ভৌমিক	৪০০
একটি শিল্পকলার এক বছরের ইতিহাস		
আমেরিকান ব্যালে-নৃত্য	—শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০৩
ইংলণ্ডের ব্যালে-নৃত্য	—শ্রীমতী উমা দেবী	৪০৭
অষ্ট্রেলিয়ার ব্যালে-নৃত্য	—শ্রীমতী হিরণ্ময়ী বসু	৪০৯
ফরাসী দেশে ব্যালে-নৃত্য	—শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক	৪১১
জার্মানীর ব্যালে-নৃত্য	—শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৩

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।"

দেবীর অর্ঘ রচনায় অপরিহার্য্য ভীম নাগের সন্দেশ

'রূপা'র বই

ছোটগল্প

অনেক বসন্ত ঘুটি মন—চিত্তরঞ্জন মাইতি ৩'৫০
বরবর্ণিনী—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ৩'০০
শহরতলির শয়তান—বারট্রাণ্ড রাসেল ৪'৫০
অনুবাদ :—অমিতরূপ বসু (অ. রূ. ব.)
স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ - [প্রথম খণ্ড] ৫'০০
স্তেফান জোয়াইগের গল্প-সংগ্রহ—[দ্বিতীয় খণ্ড] ৫'০০
অনুবাদ : দীপক চৌধুরী
চীনা মাটি—[চীনা ছোটগল্প সংকলন] ৬'০০
অনুবাদ : মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়
অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রূপা

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

জার্মানীর
নারী সমাজ
সম্বন্ধে
জানতে হ'লে

স্কালা ইণ্টারন্যাশানাল

SCALA International

পড়ুন

গ্রাহক হওয়ার ও
যোগাযোগের ঠিকানা—

পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড
১২/১এ, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

বার বার
প্রতিবার

উইল্‌স মানেই
ভালো সিগারেট

উইল্‌স *

আধুনিক আন্তর্জাতিক
ডিজাইনের প্যাকেট

২০টি ১ টা: ২০ ন: প:
১০টি ৬০ ন: প:
১টি ৬ ন: প:
ছাবীর ৬৫ আনা।

* উইল্‌স সেভী কাটের প্রতিটি প্যাকেটে একটি তারা চিহ্ন থাকে। এই চিহ্ন বিশ্বাত ব্রান্ড, টি, আর এইচ, ও, উইল্‌স-এর উৎকর্ষের প্রতীক।

JWTW 411

বিজ্ঞাপন চিত্তাকর্ষক করতে হলে
চাই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্লক !

যেখানে সেখানে তা হয় না
ব্লক অনেকেই করেন
তবে তার চরম উৎকর্ষ
নির্ভর করে
অভিজ্ঞতা ও শিল্পচাতুর্যের
সমন্বয়ের উপর

আমাদের গত ৪০ বৎসরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী

ক্যালকাটা ফটো এনগ্রেভিং কোং

সবরকম হাফটোন ও লাইন ব্লক প্রস্তুতকারক
১৫৭বি, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা — ফোন : ২৪-৫০১২

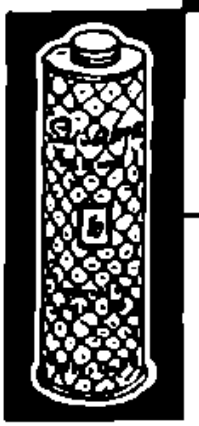

*

সুষমা

প্রসাধন সামগ্রী

সুষমা ফাউণ্ডেসন ক্রীম
সুষমা স্নো (শকুন্তলা)
সুষমা টয়লেট পাউডার
সুষমা ট্যালকম পাউডার

লি লি কেমিক্যাল ওয়ার্কস - কলিকাতা-৪

পাইওনীয়ারের গেঞ্জী ব্যবহার করুন

জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেন—পাইওনীয়ার নিটিং মিলের ফ্যাক্টরী পরিদর্শন করিয়া প্রীত হইলাম। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইহাদের হোসিয়ারী দ্রব্য ধৌত করিবার বিরাট আধারগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য……

আয়ন এক্সচেঞ্জিং স্তম্ভের মধ্য দিয়া চালিত জল বিশুদ্ধ হইয়া আধারগুলি পূর্ণ করিয়া থাকে।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিঃ

পাইওনীয়ার বিল্ডিং,
কলিকাতা-২
ফোন : ৫৮-২৯৮০

গল্প-ভারতী

শ্রীদুর্গা—প্রাণশক্তি

অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

মা আমার ব্রহ্মময়ী। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি"—এই পরিদৃশ্যমান জগতের প্রাণিসমূহ যাহা হইতে উৎপন্ন হইতেছে—যাঁহার দ্বারা উৎপত্তিলাভ করিয়া বাঁচিয়া আছে—তিনিই ব্রহ্ম। যে চৈতন্য বা চেতনাশক্তি একটি তৃণ হইতে পশুপক্ষী—মনুষ্য পর্যন্ত সকলকে ব্যাপিয়া আছে, তাহা ব্রহ্মেরই স্ফুরণ মাত্র। ব্রহ্ম বৃহৎ, সর্বব্যাপক—সর্বাস্তিত্ব প্রকাশ করিয়া যিনি আছেন—যিনি অণুপরমাণু হইতে বৃহত্তম পর্বতের মধ্যেও অনুস্যূত,—বিশ্বের সর্বসত্তা যাঁহার সত্তায় নিয়ন্ত্র হইয়া আছে,—সেই বৃহৎ বস্তুকে সাধক ধ্যান-ধারণায় আনিবে কিরূপে?

সাধকের চিত্তকে সাত্ত্বিকভাবে প্রশান্তিত করিলেও তাহা সীমার মধ্যে বা একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিবেই, জন্ম-জন্মান্তরের উপার্জিত যে কর্মবন্ধনের বেড়া দিয়া সাধকের চিত্তবৃত্তি ঘেরা আছে—সে বেড়া যতক্ষণ না ভাঙ্গা যায়, ততক্ষণ তাহার বাহিরে আসিবার উপায় নাই। জীবের জীবত্ব সেখানেই বাঁধা আছে বলিয়া—জীব নিজেকে ব্রহ্মরূপে বুঝিতে পারে না। শত ঢক্কানাদে ও শত বংশীরবেও যদি জীবের কর্ণে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যবাদ শুনাইয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলেও সেই জীবত্বের বেড়া টুটিয়া-ফুটিয়া-ভাঙ্গিয়া যায় না। জীবের অন্তঃকরণ বড় শক্তবেড়া—এ শক্ত বেড়ার উপাদান বা উপকরণ বৈদান্তিক ভাষায় বলা হয় 'অবিদ্যা' আর তান্ত্রিক পরিভাষায় তাহারই নাম মায়াশক্তি। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন —"মম মায়া দুরত্যয়া"—আমার মায়াকে পরিহার করা বড় কঠিন। তাই মায়ার মূল অনুসন্ধান করিতে করিতে ছুটিয়া চলিলেন—সাধক সম্প্রদায়। যে মহাসমুদ্রের তরঙ্গ এই বিশ্বসংসারকে একদিন প্লাবিত করিবে—'যং প্রয়ন্ত্যভি বিশন্তি'—যে ব্রহ্মের দিকে ছুটিতেছে এই জীবজগৎ এবং অন্তে যাহাতে প্রবেশলাভ করিবে—সেই মায়ার উৎস বা মহামায়াকে আত্মজ্ঞানদ্বারা সন্নিধানে লাভ করিতে পারিলে—ঐ অন্তঃকরণের উপাদান

—সীমাবদ্ধ মায়াটুকুকে মহামায়ারূপী সিন্ধুতে বিন্দু মিশাইয়া কি জীব কৃতার্থ হইতে পারিবে না? এই সাধনার ধারাই শ্রীদুর্গার আরাধনা।

"যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে"

সমস্ত প্রাণিজগতের সমষ্টিভূত চেতনাই সাধকগণের আরাধনীয়া দেবী—দুর্গা। যতক্ষণ আমরা ব্যষ্টিভাবে ভিন্ন ভিন্ন আধারে চেতনাশক্তির বিকাশ উপলব্ধি করি, ততক্ষণ তাহারই মধ্যে বিভিন্ন জীব-সত্তা দেখিতে পাই। আর যদি কখনও ঐ চেতনাশক্তিকে বিরাট সমষ্টিরূপে আমাদের—অনুভবে আনিতে পারি, তাহা হইলে জগজ্জননীর অপূর্ব অখণ্ড মহিমা হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিবে। এই চেতনাশক্তির সহিত প্রাণশক্তির অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যেখানেই প্রাণ আছে—সেখানেই চেতনার অভিব্যক্তি। সে চেতনা অল্প হউক, অধিক হউক—আধারভেদে তাহার মাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়। একটি সবুজ দূর্বাঙ্কুর—যখন সকলকে ভেদিয়া তাহার শিখাকে মাটির মমতা হইতে বাহিরে ঠেলিয়া তুলে—বায়ুহিল্লোলে দুলিতে থাকে—সবুজের মধ্যে দীপ্যমান তাহার প্রাণশক্তিকে মানব-চক্ষুর গোচর করাইয়া দেয়, তখন কোন্ সাধক না বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে সে সৌন্দর্য উপলব্ধি করে। কোথা হইতে আসে এই ক্ষুদ্র তৃণের মধ্যে প্রেরণা? সৌরকিরণ—বা একবিন্দু শিশিরকণা হইতে পারে তাহার খাদ্য—তাহার প্রাণশক্তির সহায়, কিন্তু প্রাণশক্তিটুকু সে পাইল কোথা হইতে? তাই সাধক—ভাবে বিভোর হইয়া এক একটি করিয়া সেই দূর্বাপল্লবকে অষ্টোত্তর শত সংখ্যায় গ্রথিত করিয়া বলেন,—

"নমস্তে সর্বগে দেবি! নমস্তে সুখমোক্ষদে"
দূর্বাং গৃহাণ মাতস্ত্বং মাং নিস্তারয় ভিষিগাং।"

মা! তুমি যে আছ এই দূর্বার অভ্যন্তরে—'অণোরণীয়ান্' রূপে—তোমার প্রাণ-শক্তিকে এই ক্ষুদ্র তৃণমধ্যে ঘনাকারে সঞ্চিত কর বলিয়া তুমি যে সর্বত্র গতিশালিনী তাহা অনুভব করেন সাধক। এই দূর্বাকে ক্ষতের ঔষধ বলিয়া জানি বটে, কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করি না। ক্ষত হইতে যে প্রাণশক্তির অপচয় ঘটে—তাহারই পূরণ করে দূর্বারস। সেই দূর্বার মধ্যেও যে তোমার সত্তা বিদ্যমান—তাহা সাধকগণ জানিতেন বলিয়াই তোমাকে দূর্বার উপহার দিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এই অল্প প্রাণশক্তি একটু বর্দ্ধিত হইল—নবপত্রিকায়, ইহাতে আছে—হরিদ্রা-কচু-কদলী-দাড়িম্বী-বিল্ব-অশোক-জয়ন্তী-ধান্য-অপরাজিতা। এই নবপত্রিকা শ্রীদুর্গারূপিণী—ইহাতে শক্তি আছে—প্রাণশক্তি। খাদ্যরূপে ও ওষধিরূপে তাহা জীবশরীরের প্রাণধারণ হইয়া জীবনকে বর্দ্ধিত করে। 'হরিদ্রে হররূপাসি'—হরিদ্রা বিষনাশিনী, যে বিষ প্রাণশক্তিকে হরণ করে—তাহার প্রতিষেধিকা হরিদ্রা। একদিন সমুদ্র হইতে উত্থিত হলাহল বিশ্বকে জর্জরিত করিতে উদ্যত হইলে—স্বয়ং মহাদেব তাহা পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন—তাহারই ফলে বিশ্ব রক্ষা পাইয়াছিল—তাই হরিদ্রাও প্রাণশক্তির বিরোধী বিষকে প্রতিহত করে বলিয়া তাহাকে 'হররূপা' বলা হইয়াছে। জয়ন্তী-অপরাজিতা ও অশোক—ওষধিরূপে প্রাণশক্তি-বিরোধী বিষ প্রভাবকে বিনষ্ট করে বলিয়া ইহাতেও আছে—শ্রীদুর্গার অপূর্ব লীলা। অসুর-নাশিনী লীলার মধ্যে যে ভাব নিহিত আছে—এই ওষধিসমূহ জীবশরীরে সেই বিষরূপী অসুরকে বিধ্বস্ত করে বলিয়া ইহাও প্রাণ-শক্তির সহায়। কচু, কদলী, ধান্য, দাড়িম্ব ও বিল্ব—ইহা খাদ্যরূপে প্রাণশক্তি বর্দ্ধিত করে। খাদ্যমধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত আছে—তাহা বিজ্ঞানেও স্বীকৃত। শ্রীদুর্গার প্রতীকরূপে এই ওষধিগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া বস্ত্রাবৃত এক মূর্তিরূপে পূজিতা হইয়া থাকেন। ইহারই নাম নবপত্রিকা। নবপত্রিকা ও শ্রীদুর্গা—

অভিন্নরূপে আরাধিতা। উপনিষদে ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভের যে উপায় উল্লিখিত হইয়াছে—তাহাকেই সাধনান্তরে রূপায়িত করিবার জন্য—এই নবপত্রিকা ও শ্রীদুর্গাকে অভিন্নরূপে আরাধনার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উপনিষদ্ বলিয়াছেন, ব্রহ্ম অবিজ্ঞেয়, অবাঙ্‌মনসগোচর। তবে, কি ব্রহ্ম কোনরূপেই বিজ্ঞেয় নহে?—এজন্য কেনোপনিষদে বলা হইল—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ॥

কাহার ইচ্ছায় মন প্রেরিত হইয়া বিষয়ে পতিত হয়—কাহার প্রেরণায় প্রাণ প্রথম স্ফুরিত হইল?—সেই মনঃপ্রাণের উৎস অনুসন্ধান—ব্রহ্মজ্ঞানলাভের মার্গ। প্রাণ-ব্রহ্মরূপে ব্রহ্মকে উপাসনা করিলে ক্রমে পরমব্রহ্মবিজ্ঞান সম্ভবপর হইবে।

এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা যবাদ্বা।
সর্ষপাদ্বা শ্যামাকাদ্বা শ্যামাকতণ্ডুলাদ্বা।
এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ান্
অন্তরিক্ষাজ্জ্যায়ান্ দিবো জ্যায়ানেভ্যো লোকেভ্যঃ।
(ছান্দোগ্য ৩।১৪।৩)

সেই আত্মা বা ব্রহ্ম সকল জীবের অভ্যন্তরে অণুরূপে—ব্রীহি, যব, সর্ষপ, শ্যামাক বা শ্যামাকশস্য হইতে অণুতররূপে সকল ওষধির মধ্যে বিরাজিত, আবার তিনি সকল জীবহৃদয়ে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে বৃহত্তর, অন্তরিক্ষ হইতে বৃহত্তর—দ্যুলোক হইতে এমন কি পরিদৃশ্যমান সমস্ত লোক হইতে বৃহত্তর রূপে বিরাজমান।

প্রাণো বা ইদং সর্বং ভূতম্ যদিদং কিঞ্চ তমেব তং প্রাপৎসি।

তিনি প্রাণরূপে সমস্ত ভূত ব্যাপিয়া আছেন সেই প্রাণ হইল—যাহা কিছু সবই, প্রাণকে বুঝিলেই সেই ব্রহ্মকে অবগত হওয়া যায়। এই প্রাণশক্তি হইতে অভিন্না শ্রীদুর্গা। তাই ওষধি-সমষ্টিরূপিণী নবপত্রিকা ও শ্রীদুর্গা সমভাবে আরাধিতা হইয়া থাকেন। সাধক এই বিশ্বসংসারের সারভূতা দেবী শ্রীদুর্গাকে ধ্যানযোগে হৃদয়ে আনয়ন করিয়া সমস্ত জীবজগতের যত কিছু প্রাণপ্রদা ওষধি আছে—তাহার মধ্যে প্রাণরূপে অবস্থিতা জানিয়া পরমানন্দে মগ্ন হইয়া থাকেন। ব্রহ্মোপলব্ধির এই মধুর পন্থায় অগ্রসর হইলে ক্রমে সেই 'উমা হৈমবতী'র প্রত্যক্ষ দর্শন করাইয়া থাকেন। ইহাই শ্রীদুর্গাপূজার সার্থকতা। মা আমার সিদ্ধি-কল্পলতা। স্বর্গে তাঁহার প্রত্যক্ষ-দর্শনের ফলে দেবগণের অভিমান-মূলক অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছিল। মর্ত্যলোকে সুরথ ও সমাধি তাঁহার মৃন্ময়ীমূর্তি নির্মাণ করিয়া আরাধনায় মগ্ন হইলে—প্রত্যক্ষরূপে তিনি দর্শন দিয়া উভয়েরই মনোরথ সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

সংসারী জীব কামনা-বাসনাকে সহসা অতিক্রম করিতে পারে না। প্রকৃত নিষ্কাম অধিকারী এই বিশাল জগতে কয়জন? 'সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে'—হাজার হাজার লোকের মধ্যে কদাচিৎ একব্যক্তি কামনাবর্জন করিতে পারে। এইজন্য সপ্তশতীতে "রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি" বার বার এই প্রার্থনা করা হইয়াছে কেন? সাধক তাহার অন্তরের কামনাকে ব্রহ্মময়ী অন্তর্যামিনী জগজ্জননীর কাছে কি গোপন করিয়া রাখিবে? গোপন করিবার তাহার শক্তি কোথায়?

এমন প্রাণ খুলিয়া মায়ের কাছে সন্তান নিজ অভিলাষানুরূপ প্রার্থনা করিবে। মা ত' সর্বৈশ্বর্যশালিনী —বিশ্বের সমস্ত বিভূতি মায়ের করুণাকটাক্ষে জাগিয়া উঠে—রোষদৃষ্টিতে বিলীন হয়। মানবের ক্ষুদ্রকামনা কতটুকু—মধুর কলসীর মধ্যে মাছি পড়িলে তাহার যে অবস্থা হয়, ব্রহ্মময়ীর অনন্ত ঐশ্বর্য দর্শনে ক্ষুদ্র কামনার অবস্থাও সেইরূপ ঘটে। তাই—সাধক অকপটে মায়ের নিকটে তাহার প্রার্থনা জানায়, এজন্য রাজা সুরথ তাঁহার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সিদ্ধিও সম্ভবপর হইল। আর সমাধি—স্ত্রী-পুত্র ও ভৃত্যের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া মায়ের নিকট তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন,—তাঁহারও সিদ্ধিলাভ অচিরেই ঘটিল। তাই উপনিষদ্ বলিয়াছেন,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—সেই ব্রহ্ম যাঁহাকে বরণ করেন—কৃপা করেন,—সেই ব্রহ্মলাভে সমর্থ হয়—তাঁহার সম্মুখে ব্রহ্ম স্বকীয়-তনু প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই ঋগ্বেদের পরিশিষ্টে উক্ত হইয়াছে "দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে"। আমরাও বলি—"দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে"। নিষ্কাম অধিকারীও বলিবেন—"রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি"—এখানে রূপ শব্দে ব্রহ্মজ্ঞান, যিনি সমস্ত বিশ্বের রূপ প্রদান করিয়াছেন, প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহাকেই রূপ বলা হইয়াছে—এই রূপই স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ—সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা নিষ্কাম মানবের একান্ত বাঞ্ছনীয়। জয় শব্দে পার্থিব জয় নহে—জয় নামক রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণবিষয়ক জ্ঞান—যাহা দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জিত হইবে তাহারই প্রার্থনা সূচিত হইয়াছে। যশঃ পরব্রহ্মের মহিমাই যশঃ শব্দে কথিত—সেই মহিমা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে একমাত্র নিষ্কাম সাধক। আর অন্তঃশত্রু কাম-ক্রোধাদি জয়ের জন্য মানব যতক্ষণ জীবন ধারণ করিবে—ততক্ষণ প্রার্থনা জানাইবে। এ প্রার্থনার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, সকাম ও নিষ্কাম—ত্রিবিধ অধিকারীর জন্যই এই শ্রীদুর্গার আরাধনা। প্রাণশক্তিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারে—উভয়বিধ অধিকারী। সকাম অধিকারী এক জন্মে না হইলেও জন্মান্তরে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান জাগ্রত হইবে আর নিষ্কাম অধিকারী এই জন্মেই তাঁহার দর্শনে কৃতার্থ হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।

এই গূঢ় রহস্য-কথা উপনিষদ্ ও পুরাণাদি শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া মানবজীবনের গন্তব্য পথনির্দেশ করিয়াছেন। তাই শ্রীদুর্গার আরাধনা সমগ্র ভারতে কোনও না কোন প্রকারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

শ্রীদুর্গাপূজা ও জাতীয়তা

শ্রীজ্ঞানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য

দুর্গাদেবীর নাম প্রাচীন ঋগ্বেদে পরিলক্ষিত হয় না। দুর্গার পর্য্যায় শব্দ সতেরটি অমরকোশে দেওয়া হইয়াছে। অম্বিকা অন্যতম পর্য্যায়শব্দ। এই অম্বিকা নামের উল্লেখ যজুর্বেদে করা হইয়াছে। ইনি রুদ্রের ভগিনী কিন্তু দুর্গা নহেন। ঋগ্বেদের খিল-অংশে দুর্গা এই নাম স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই আরও অনেক নামের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যথা—গৌরী, কাত্যায়নী প্রভৃতি। উপনিষদে উমা, হৈমবতী, কালী প্রভৃতি নামও দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু উপনিষদের কোথাও দুর্গার নামান্তর রূপে এই নাম সকল বর্ণিত হয় নাই। ঋগ্বেদের খিলসূক্তের দুর্গার রাত্রিদেবীর সহিত অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেই সময়ে দুর্গার মূর্ত্তিপূজা যে হইত তাহার প্রমাণ রহিয়াছে ঐ খিলসূক্তেই। যথা—"কীরেণ স্নাপিতাদুর্গা চন্দনেন বিলেপিতা বিল্বপত্র কৃতা পীড়া নমো দুর্গে নমো নমঃ।" ১৪ (ঋঃ বেঃ খিল ১০।১২৭)। এই মন্ত্রটি দুর্গা দেবীর পাষাণ বা কাষ্ঠ বা ধাতু মূর্ত্তির ইঙ্গিত করে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই মূর্ত্তির যথাযথ বিবরণ দিতে পারে। এই কালে দুর্গাদেবীর সহিত অন্য কোন দেব বা দেবীর মূর্ত্তির সাদৃশ্য নাই। চণ্ডী গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম ত্রিনয়নী মূর্ত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। এই মূর্ত্তির সহিত লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক ও গণেশের যোগ হইতে পারে না। কারণ চণ্ডীগ্রন্থে মহিষাসুর বধের সময়ে দেবীর সহিত অন্য কোন দেব অথবা দেবী যুক্ত হন নাই। তিনি বিভিন্ন দেবতার তেজঃপুঞ্জস্বরূপিণী। এই মূর্ত্তি সদ্য আবির্ভূতা। সুতরাং তাঁহাকে কাহারও জননী, তনয়া অথবা চিরসঙ্গিনীরূপে বর্ণনা করা যায় না। বাংলাদেশে যে মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা নানাকালের বিভিন্ন পুরাণের বহু আখ্যানের বিষয়বস্তুর সমাবেশের অনন্য দৃষ্টান্ত।

বাংলার এই মূর্ত্তিটি ভারতের তদানীন্তন প্রধান প্রধান ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের অপূর্ব্ব মিলনের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। শৈব বৈষ্ণব ও বেদের কর্ম্মকাণ্ডের, সৌর, গাণপত্য ও শাক্ত সম্প্রদায়ের সুসংহতির পূর্ণ নিদর্শন এই মূর্ত্তিটি। গণপতি দেবীর পুত্র। গাণপত্য সম্প্রদায় সম্মত এই মিলন। স্কন্দও দ্বিতীয় পুত্র। ঠিক্ এই ভাবেই সৌর সম্প্রদায় দুর্গাদেবীকে আপন করিয়া লইয়াছে। লক্ষ্মী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহাশক্তি। লক্ষ্মী দুর্গার তনয়া। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এই সম্বন্ধ স্থাপনে বিরোধভাব আদৌ লক্ষিত হয় না। সরস্বতী বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের প্রতীক। ব্রহ্মার নিত্য সহচরী। ইনি দুর্গার প্রিয়তনয়া। অতএব বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সহিত দুর্গার ভক্ত সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার দুই পাশে ক্ষুদ্রাকৃতির শিব ও রাম মূর্ত্তির তাৎপর্য্যও বুঝা উচিত। শৈবসম্প্রদায়ের সঙ্গে এতই নিবিড় সম্বন্ধ হইয়াছে যে শিবমূর্ত্তির ক্ষুদ্রতা শৈবসম্প্রদায়ের লক্ষ্যেরই বিষয় নয়। রামসম্প্রদায়ও রামচন্দ্রের অতিক্ষুদ্র আকৃতির জন্য ক্ষুব্ধ নয় কারণ পুরাণমতে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক রাবণ বধ এই দেবীরই অনুগ্রহে ঘটিয়াছিল। রামচন্দ্রকে দেবীর প্রধান ভক্তরূপেই দেখান হইয়াছে পৌরাণিক যুগের কোন স্তরে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পশ্চিমাংশে রামায়ৎ সম্প্রদায়ের আনুকূল্যেই বোধহয় দুর্গাপূজার প্রচলন হইয়াছিল। চালচিত্রে নবদুর্গার মূর্ত্তিগুলি বিভিন্ন শাক্তসম্প্রদায়ের সহিত দুর্গাদেবীর অতি আত্মীয়তা সূচনা করে। শক্তিসম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানে দুর্গাদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে সকল শাক্তসম্প্রদায়ের সম্মতিই স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উত্তরাধিকারী পৌরাণিক সম্প্রদায়বিশেষ দুর্গাদেবীর অনাদরের ইঙ্গিত করিয়াছে সতীর দেহত্যাগ আখ্যানের মাধ্যমে। বাংলার শাক্তসম্প্রদায় আগমনী বিজয়া

প্রভৃতি সঙ্গীতের মাধ্যমে সব গ্লানি মুছিয়া ফেলিয়া দুর্গাদেবীকে আর্য সম্প্রদায়ের আদরের কন্যারূপে দেখাইয়াছে—স্মৃতিশাস্ত্রও দুর্গাপূজাকে নিত্য-কর্মরূপে গ্রহণ করিয়া অতীতের সকল কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিয়াছে। পুরাণে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে দুর্গাদেবী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ কর্তৃক পূজিত হইতে পারেন। শবর ও কিরাতগণও দুর্গাদেবীর আরাধনা করিত। তাহার প্রমাণ যথা—

বিনা মন্ত্রৈস্তামদী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা।
ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানা ম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্বদস্যুভিঃ।
স্বয়ং বাপ্যন্যতো বাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা॥

বিজয়া-দশমীর দিন শবরেরাও নানা আদিমযুগের শিল্পসভ্যতার প্রতীক-চিহ্নযুক্ত পতাকা ধারণ করিয়া নানারুচি-বিগর্হিত সঙ্গীত করিতে করিতে মিছিল সহকারে দেবীপ্রতিমার অনুগমন করিত। এসব প্রথা মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল। ব্রহ্মবৈবর্তাদি পুরাণ দেখিলে বেশ বুঝা যায়—ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বিজয়ার উৎসব যে সার্বজনীন হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাংলাদেশে শারদীয়া পূজা ও বাসন্তী পূজা সমানভাবেই আদৃত হইত। রাজা ও জমিদারদের গৃহে বাসন্তীপূজার অধিক সমাদর ছিল। সেটা অবশ্য অর্থনৈতিক কারণে। ইংরাজ শাসনে নানা কারণে শারদীয়া পূজা জনগণের মনকে সর্বাধিক আকৃষ্ট করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বন্যা, পৃথিবী দেবীর শস্য দান করিয়া অনুকূল আচরণ, দুর্দিনের অবসানে গমনাগমনের সৌকর্য্য, এই কালকেই বিশ্রাম ও আনন্দ উপভোগের উপযুক্ত সময় বলিয়া সরকারের ও শিল্পপতিদের স্বীকৃতিদানে এবং বর্ষার সাময়িকভাবে লোকযাত্রার স্বাভাবিক গতির অবসান ঘটাইয়া কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টির প্রয়োজন। এবং এই প্রয়োজনকে উপলক্ষ করিয়া সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের এই মনোরম উৎসবের আয়োজন তাঁহাদের অলৌকিক প্রতিভার একটি সুশোভন বিকাশ। ধর্মশাস্ত্রও যে দেবীকে এইকালে আরাধ্য বলিয়া নির্বাচিত করিয়াছেন তাহাও তাঁহাদের প্রকৃষ্ট নির্বাচন-শক্তির সাক্ষ্য দিয়া থাকে। শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে এই দেবীর অনেক লৌকিক রূপের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দুই চারিটির উল্লেখ করিতেছি। এই দেবী ক্ষুধারূপে সকল প্রাণীর মধ্যে অধিষ্ঠিত। তিনি বৃত্তিরূপে সকল প্রাণীতে বিরাজমান। তিনি তৃষ্ণারূপে সর্বজীবে বিদ্যমান। তিনি সকলের বুদ্ধিরূপিণী। তিনি ভ্রান্তিরূপিণীও বটেন। তিনি এক কথায় জড় ও চৈতন্য স্বরূপিণী। এ হেন দেবী কাহার না আরাধ্য হইবেন? সুতরাং ধর্মশাস্ত্রই এই দেবীর সর্বচিত্তগ্রাহ্যতার পথ প্রশস্ত করিয়াছে।

শাস্ত্রের প্রকৃত উদ্দেশ্যও সফল হইয়াছে এই বাংলাদেশে। কন্যা, ধর্মসম্প্রদায়, জাতি বিভাগ, বর্ণ বিভাগ প্রভৃতি নির্বিশেষে সকলেরই অতি আদরের বস্তু। অল্পদিন ধরিয়া পূজার ব্যবস্থা তাই তিনি বিবাহিতা কন্যা মানবসমাজের। ইনি আসেন আদর আপ্যায়ন উৎসব ভোজ প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের সামাজিক চেতনাকে মিলনের সুরে উদ্বুদ্ধ করিয়া দশমীর দিন বিভিন্ন সমাজের লোককে মিলনমাল্যে গ্রথিত করিয়া সর্বজনকল্যাণকর নদীর সলিলে মিলিয়া যায়। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই এইদিন আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া এক অতি বিশাল ও মহান্ ভ্রাতৃসমাজ-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। অতএব দুর্গাপূজার ব্যবহারিক প্রয়োজন জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন। ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা এক টুকরা মেঘের তুল্য—বিজয়া-দশমীর মিলনঝড়ে জাতীয়তাবাদের মহাকাশে কোথায় বিলীন হইয়া যায়। বাঙালী, বিহারী, উড়িয়া, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি সঙ্কীর্ণবুদ্ধি এক নিমেষে অন্তর্হিত হয়।

ঠাকুমা

বনফুল

পুত্রের বিবাহ দিয়া শিবকিঙ্করবাবু দশ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু পৌত্রমুখ দর্শন করিতে পারেন নাই। মনে একটা দুঃখ লইয়াই তিনি মারা গিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে দুঃখ অনুভব করিতেন তাহা অপেক্ষা শতগুণ দুঃখ বাজিত তাঁহার স্ত্রী বিজয়ার বুকে। দশ বৎসর বিবাহ হইয়া গেল অথচ একটা ছেলে হইল না—বংশ লোপ হইয়া যাইবে যে! পুত্রবধূ লক্ষ্মী সত্যই রূপে গুণে লক্ষ্মী, তবু তাহার বিরুদ্ধে কেমন যেন একটা আক্রোশ ঘনাইয়া উঠিত। কিছুতেই তাহার প্রতি তিনি যেন প্রসন্ন হইতে পারিতেন না। বধূটি যথাসম্ভব সসঙ্কোচে বাস করিত সংসারে। ইহা তো তাহার দোষ নহে। কপালের দোষ। অকরুণ ভাগ্য-বিধাতার এ অভিশাপের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিকার তো নাই।

শিবকিঙ্করের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে বিজয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—তুমি আমার জীবনের সব সাধ পূর্ণ ক'রে দিয়েছ, এমন কি লণ্ডনের স্যাকরার তৈরি হার ব্রেসলেটও পরিয়েছ আমাকে। কোনও দুঃখ পাই নি জীবনে। কোনও সাধ অপূর্ণ রাখ নি আমার। জীবনে একটি সাধ কেবল পূর্ণ হল না। কিন্তু তা পূর্ণ করবার ক্ষমতা তো তোমার নেই। কারো নেই। ভবিতব্য!"

শিবকিঙ্কর মৃদু হাসিয়াছিলেন কেবল। কোনও উত্তর দেন নাই।

২

শিবকিঙ্করের মৃত্যুর দুই মাস পরে অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি ঘটিয়া গেল। লক্ষ্মী সন্তান-সম্ভবা হইল। প্রথমে কেহ বিশ্বাসই করিতে চায় না। স্থানীয় ডাক্তার বলিলেন—এখনও নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। চতুর্থ মাসে লক্ষ্মীকে কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইল। একজন বড় ডাক্তার দেখিলেন। তিনি বলিলেন লক্ষ্মী সত্যই অন্তর্বত্নী। বিজয়া আগেই বাড়িতে শাঁখ বাজাইয়া দিলেন। মহাসমারোহে সত্যনারায়ণ পূজা হইল। মন্দিরে মন্দিরে পূজা পাঠানো হইয়া গেল। লক্ষ্মীর কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল। মা, এত কাণ্ড করিতেছেন শেষ পর্যন্ত যদি কিছু হইয়া যায়। সে নিজেও বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না যে এ অসম্ভব শেষ পর্যন্ত সম্ভব হইবে। একটা অসম্ভব স্বপ্নকে কেন্দ্র করিয়া সকলের আশা ক্রমশ রঙীন হইতে রঙীনতর হইয়া উঠিতে লাগিল। লক্ষ্মীর স্বামী বিজনবাবু নাস্তিক প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনিও গোপনে গোপনে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন।

৩

যথাকালে শিশু ভূমিষ্ঠ হইল।

বাড়ির সকলে যে আনন্দে অভিভূত হইলেন তাহা অবর্ণনীয়। কিন্তু বিজয়া শুধু আনন্দিতই হইলেন না, বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার একটু ভয়ও হইল।

আঁতুড় ঘরে সাধারণতঃ সব শিশুই অধিকাংশ সময় চোখ বুজিয়া থাকে। কিন্তু এ শিশুটি জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতেই বিস্ফারিত চক্ষে চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। যেন কাহাকে খুঁজিতেছে।

বিজয়া ঝুঁকিয়া তাহার মুখের সামনে মুখ আনিয়া বলিলেন, "কি দাদু, কি দেখছ ?"

বলিয়াই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। শিশুর চোখে শিবকিঙ্করের দৃষ্টি। সে দৃষ্টি নীরবে যেন তাঁহাকে বলিল, তোমার এ সাধও আমি পূর্ণ করিলাম।

বিজয়া সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। আর একটা জিনিসও তাঁহার চোখে পড়িল। শিবকিঙ্করের দক্ষিণ গণ্ডে যে কালো তিল ছিল এ শিশুর গণ্ডেও তাহা রহিয়াছে। রোমাঞ্চিত কলেবরে তিনি নবজাতকের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

৪

ইহার পর হইতে পাঁচ বছর যাহা ঘটিয়াছে তাহা অবিশ্বাস্য হইলেও সত্য। লক্ষ্মী খোকনকে প্রসব করিয়াছে বটে, কিন্তু খোকনকে মানুষ করিয়াছেন বিজয়া। খোকন চব্বিশ ঘণ্টা তাহার ঠাকুমার কাছে থাকিত। যখন দুধ খাইবার সময় হইত তখন তাহাকে মায়ের কাছে দিতেন। দুধ খাওয়া শেষ হইলেই আবার তাহাকে ঠাকুমার বুকে ফিরিয়া যাইতে হইত। ঠাকুমার স্নেহ খোকনকে অক্টোপাসের মতো জড়াইয়া ধরিয়াছিল। খোকন ঠাকুমার সহিত খাইত, ঘুমাইত, উঠিত, বসিত, গল্প করিত, বেড়াইতে যাইত। ঠাকুমাই তাহার সব। ঠাকুমা তাহাকে মায়ের কাছে ঘেঁসিতে দিতেন না। লক্ষ্মী চুপ করিয়া থাকিত। নিজের ছেলে অথচ কাছে যাইবার উপায় নাই। শাশুড়ি সর্বদা আগলাইয়া আগলাইয়া বেড়াইতেছেন।

৫

আরও বছর দুই কাটিল। ঠাকুমার নয়নমণি হইয়া খোকন দিন দিন বাড়িতে লাগিল। লক্ষ্মীও এখন লক্ষ্য করিল যে খোকনের মুখভাব অনেকটা শিবকিঙ্করের মত। একদিন সে আড়াল হইতে শুনিল বিজয়া খোকনকে বলিতেছেন,—

"দাদু, আমাকে তোর পছন্দ হয় ?"

"হ্যাঁ খুব, কেন ?"

"আমাকে বিয়ে করবি ?"

খোকন হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

"তোমাকে বিয়ে করতে যাব কেন ? তুমি তো বুড়ী, মাথার চুল পাকা—"

"আমি বাইরে বুড়ী রে ! ভিতরে ভিতরে আমি তোর বয়সী ? আমার ছবি দেখবি ?"

বিজয়া উঠিয়া গেলেন এবং নিজের ট্রাঙ্কের ভিতর হইতে প্রাচীন একটি অ্যালবাম বাহির করিয়া আনিলেন। এ অ্যালবাম লক্ষ্মী কখনও দেখে নাই।

"এ কিসের অ্যালবাম মা ?"

"আমার বাপের বাড়ির অ্যালবাম। আমার ছেলেবেলার দু'একটা ছবি আছে। দাদুকে দেখাই।"

অ্যালবাম খুলিয়া একটি ছবি তিনি দেখাইলেন। চার পাঁচ বছরের একটি খুকী হাসিমুখে চাহিয়া আছে। ছবিটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তবু চেহারাটা বেশ স্পষ্ট আছে। লক্ষ্মীর মনে হইল, চোখের দৃষ্টি কি প্রখর।

৬

কিছুদিন পরে বিজয়া অসুখে পড়িলেন। জ্বর আর কাশি। বিজয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধেই চিরকাল অভ্যস্ত। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাই চলিতে লাগিল। কিন্তু ব্যাধির আর উপশম হয় না। শেষে অ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার ডাকিতেই হইল। তিনি বলিলেন যক্ষ্মা হইয়াছে। তখন যক্ষ্মার চিকিৎসা ছিল না তেমন। মৃত্যুই তখন যক্ষ্মার অনিবার্য পরিণতি ছিল।

বিজয়া কাশিতেছিলেন, খোকন তাঁহার সামনে বসিয়াছিল। ডাক্তারবাবু একদিন লক্ষ্মীকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, আপনার ছেলেকে ওঁর বিছানায় যেতে দেবেন না। রোগটা ছোঁয়াচে।

লক্ষ্মী বিবর্ণ মুখে চুপ করিয়া শুনিল। কিন্তু সে জানিত শাশুড়ি খোকনকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত থাকিতে পারিবেন না। তবু সে একদিন বলিল, "ডাক্তারবাবু বলে গেছেন খোকনকে আপনার বিছানায় না বসতে দিতে। রোগটা না কি ছোঁয়াচে।"

"তোমার ডাক্তারবাবু কিছু জানে না। ওর ওষুধ আর আমি খাব না। ওকে আর আসতে হবে না।"

সেদিন হইতে বিজয়া সব ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন।

৭

একদিন লক্ষ্মীর কানে গেল বিজয়া খোকনকে বলিতেছেন, "দাদু, তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

"কোথায়?"

"আমি যেখানে যাব"

"তুমি কোথায় যাবে"

"সে আমার সঙ্গে গেলেই বুঝতে পারবি"

"তুমি যাবে কেন? তুমি যাবে না"

"আমাকে যেতেই হবে। তোকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। তোকেও যেতে হবে"

লক্ষ্মী আর থাকিতে পারিল না।

"কি সব অলুক্ষণে কথা বলছেন মা—"

বিজয়া ইহার উত্তরে কিছু বলিলেন না। কিন্তু তাঁহার চোখের দৃষ্টি স্থগিতা ম্যাজিষ্টের দৃষ্টির মতো জ্বলিতে লাগিল।

মাসখানেক পরেই বিজয়া মারা গেলেন।

৮

মৃত্যুর পর দিনই খোকন জ্বরে পড়িল। সাতদিন পরেই মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠিল। ডাক্তারবাবু আসিলেন। মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "কোনও আশা দিতে পাচ্ছি না। প্যালপিং খাইসিস। ভগবানকে ডাকুন। আমাদের যা করবার সব করেছি—।"

সেদিন বর্ষণ-মুখরিত অন্ধকার চতুর্দ্দিকে। খোকন একটু ভাল আছে। লক্ষ্মী তাহার গায়ে হাত দিয়া শুইয়া আছে। চোখ বোজা, কিন্তু ঘুমায় নাই। খোকনের বাবার টুরের চাকরি। তিনি দুইদিন আগে মুঙ্গেরে চলিয়া গিয়াছেন।

"দাদু—"

বিজয়ার কণ্ঠস্বর। লক্ষ্মী তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। সামনের কপাটটা বন্ধ। তাহার ওপার হইতে শব্দটা আসিল।

"দাদু—"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপাটটা খুলিয়া ফেলিল। সম্মুখে আবছা অন্ধকারে দেখিল বেণী-দোলানো চার বছরের একটা ফ্রক পরা মেয়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার চোখে প্রখর দৃষ্টি, মুখে হাসি।

"দাদু, আয়—"

লক্ষ্মী সভয়ে দেখিল খোকনও উঠিয়া বসিয়াছে। তারপরই সে আবার শুইয়া পড়িল। লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া দেখিল—মুখে রক্তের দাগ, দেহ প্রাণহীন।

———

বিচিত্র সংলাপ

বিশ্বামিত্র। শকুনি।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

শকুনি। ঋষিবর, আজ তোমাকে এমন বিমর্ষ দেখছি কেন?

বিশ্বামিত্র। চিত্ত তেমন প্রসন্ন নেই।

শকুনি। সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কারণটা কি?

বিশ্বামিত্র। শুনে তোমার কি লাভ হবে?

শকুনি। কিছু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি আর কি? শুনতে পাই যে মুনি ঋষি সাধু সাধকগণের চিত্ত নিত্য-প্রসন্ন, যা কিছু অপ্রসাদ আমাদের মতো বিষয়ী জীবদের। তাই স্বভাবতই ঋষির অপ্রসাদ দেখলে কারণ জানতে কৌতূহল হয়।

বিশ্বামিত্র। তবে তোমাকে হতাশ করবো না। সম্প্রতি ধ্যানভঙ্গের কারণ ঘটেছে।

শকুনি। মিথ্যা অনুমান করিনি। এবারে কে? উর্বশী, ঘৃতাচী, রম্ভা না মেনকা?

বিশ্বামিত্র। মেনকা।

শকুনি। দেবরাজ বড়ই এক চোখো। তাঁর কুসুমায়ুধগুলি কেবলি নিক্ষেপ করেন তোমাদের মতো পাকাদাড়ি, হরিতকি-ভোজী, ছাড় চিমসে মুনি ঋষির প্রতি। আর কুসুমায়ুধগুলিরই বা কি রুচি, রাজি হয় কেন বলতে পারি নে।

বিশ্বামিত্র। আমরা যে দেবরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী।

শকুনি। কুসুমায়ুধ নিক্ষিপ্ত হবে এই আশাতেই কি?

বিশ্বামিত্র। বৎস শকুনি তুমি নিতান্ত পাষণ্ড।

শকুনি। সপ্ত ভুবনে সবাই জানে। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানো, দেবরাজ একবার আমাদের মতো পাষণ্ডের উপরে কুসুমায়ুধ নিক্ষেপের পরীক্ষা করে না কেন?

বিশ্বামিত্র। তাতে কি হবে?

শকুনি। কুসুমায়ুধ ভোঁতা হয়ে ফিরে যাবে, আর কখনো নিক্ষিপ্ত হতে সম্মত হবে না।

বিশ্বামিত্র। দেবরাজ বৃথা অস্ত্র প্রয়োগ করেন না।

শকুনি। বৃথা নয়, পরীক্ষা হ'তো পাষণ্ডের সংযমের।

বিশ্বামিত্র। তোমরা সংযমী?

শকুনি। নই বলেই তো হতমান ফিরে যেতো উর্বশী মেনকার দল।

বিশ্বামিত্র। আমরা যেখানে পরাহত তোমাদের হবে সেখানে জয়!

শকুনি। তোমরা বাঁধ বেঁধেছ বলেই ভাঙে। আমাদের ক্ষেত্রে ভাঙবে কি?

বিশ্বামিত্র। ভাঙবে ভয়ে কি বাঁধ বাঁধা হবে না।

শকুনি। যেখানে পরিণাম অবিদিত সেখানে শ্রম কি পণ্ডশ্রম নয়?

বিশ্বামিত্র। তাই বলে কি সংযম চর্চা বাদ দিতে হবে সংসার থেকে?

শকুনি। বাদ দেবে কেন? কেবল বিচার ক'রে চলবে। এমন ভাবে পথ চলিবে যাতে দোষ দেখা যায় অথচ ফল না পড়ে।

বিশ্বামিত্র। কি রকম?

শকুনি। তোমরা রিপুগুলোকে সমূলে নাশ করতে চাও তাই তারা সবলে আঘাত করে। এই কি স্বাভাবিক নয়?

বিশ্বামিত্র। স্বভাবকেই যে আমরা অতিক্রম করতে চাই।

শকুনি। সেই জন্যেই স্বভাবের দ্বারা আক্রান্ত হও তোমরা।

বিশ্বামিত্র। রিপুগুলোই তো সাধনার অন্তরায়।

শকুনি। অশ্ব যেমন অন্তরায় রথখানার।

বিশ্বামিত্র। তা কেন?

শকুনি। কেন নয়? অশ্ব কি কখনো রথ নিয়ে ফেলে না খানার মধ্যে?

বিশ্বামিত্র। সে সারথির দোষে।

শকুনি। রিপু ছ'টাও চিত্তের চালক। চিত্ত যদি কখনো খানায় গিয়ে পড়ে বুঝতে হবে দোষ চিত্তের। নয় কি?

বিশ্বামিত্র। তবে কি কর্তব্য?

শকুনি। রিপুকে সংযম রাখো, তাদের বিনাশ ক'রো না। সামান্য পিপীলিকাও আহত হ'লে দংশন করে আর প্রবল রিপু নিষ্ক্রিয় থাকবে?

বিশ্বামিত্র। সাধনা তো সেই সংযম চর্চার জন্য।

শকুনি। সংযম চর্চার নিয়ম তোমাদের অজ্ঞাত। তোমাদের ঘরে রিপুগণ বাস করে চির উপবাসক্লিষ্ট হয়ে, তাই প্রথম খাদ্য সন্দর্শনেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন বুদ্ধির সাধ্য নেই তাদের সামলায়। আর আমরা যারা পাষণ্ডী রিপুগুলোকে বরাদ্দ খোরাক জুগিয়ে থাকি তাই ঘৃতাচী, রম্ভা সামনে এসে লাস্যলীলা দেখালেও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

বিশ্বামিত্র। আচ্ছা, আমরাই না হয় অতি সংযমের ফলে দোষী হ'লাম, কিন্তু রাজাগুলোর এমন দশা হয় কেন। অতি সংযমী ব'লে নিশ্চয়ই কেউ তাদের অপবাদ দেবে না।

শকুনি। অতি ভোজনে রাজাদের রিপুগুলো পেটুক হ'য়ে পড়েছে, খাদ্য দেখলেই খাওয়া চাই, খিদে থাক বা না-ই থাক। অতি সংযমের মতো সংযমহীনতাও দোষ।

বিশ্বামিত্র। কেবল নির্দোষ তুমি।

শকুনি। এমন কথা কখনো বলি না।

বিশ্বামিত্র। বলো না কিন্তু ভাবো!

শকুনি। ভাবতেই বা যাবো কেন? আমার মনে মুখে এক।

বিশ্বামিত্র। তার প্রমাণ কপটব্রাত। কি বলো?

শকুনি। যা বলি তাই শোনো। মনের কথা অনুমান করতে চেষ্টা করো না, শকুনির মন গোলক ধাঁধা বিশেষ, সেখান থেকে কথা টেনে বার করে এমন লোক জগতে এখনো বিরল আছে।

বিশ্বামিত্র। বেশ বলো, আমি অবধান করছি।

শকুনি। ছ'টা রিপুর মধ্যে প্রথম তিনটা আর শেষ তিনটার প্রকৃতি আলাদা। কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনের প্ররোচনায় মানুষে উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে আর মোহ, মদ, মাৎসর্য্যের প্ররোচনায় মানুষে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। কোনটাই বাঞ্ছনীয় নয় তবু যদি একতরকে কামনা করতে হয় তবে প্রথমোক্তগুলিই স্পৃহনীয়। জড়ের চেয়ে উত্তেজিত প্রেয়ঃ, নয় কি?

বিশ্বামিত্র। বেশ, তারপরে শুনি।

শকুনি। বলছো তো বেশ, কিন্তু তোমরা মুনি ঋষিরা এ কথাটা বোঝো বলে মনে হয় না। তোমাদের যত রাগ এই প্রথম তিনটার প্রতি। প্রাণপণে দমিত করতে চাও এদের তাই সুযোগ পেলেই এরাও দংশন করে তোমাদের। মেনকাকে উপলক্ষ্য করে কাম দংশন করেছে তোমাকে, বশিষ্ঠকে উপলক্ষ্য ক'রে ক্রোধ ও লোভ দংশন করেছে তোমাকে। এমন উদাহরণ পুরাণ ঘাঁটলে আরও পাওয়া যাবে। সাপুড়ে মরে সাপের কামড়ে।

বিশ্বামিত্র। মিথ্যা বলোনি।

শকুনি। আর আমার মতো পাশবতীগণ ঐ রিপু তিনটাকে পোষ মানিয়ে রেখেছে বেড়ালের মতো, মাঝে মাঝে তারাও কামড় মারে, মাঝে মাঝে আমরাও লাথি মারি। এই ভাবে এক রকম ক'রে চলে যায়।

বিশ্বামিত্র। আর শেষোক্ত তিনটে?

শকুনি। ওদের তো চেষ্টা ক'রে পোষ মানাতে হয় না, লুকিয়ে এসে কখন ঘরে ঢোকে। ওরা বাসিন্দের তলার বিছে।

বিশ্বামিত্র। ঐ বিছের ভয়ে তুমি শঙ্কিত।

শকুনি। হতেই হবে। বাঘের সঙ্গে লড়াই করা যায়, বেড়ালকে পোষ মানানো যায় কিন্তু ওরা যে এ দুয়েরই অতীত, না করে লড়াই না মানে পোষ।

বিশ্বামিত্র। তা'হলে সিদ্ধান্ত কি?

শকুনি। তোমরা মুনি ঋষিরা শেষোক্তদের গ্রাহ্য করো না বলে ওরাও এড়িয়ে চলে তোমাদের। আর প্রথম তিনটির সঙ্গে তোমাদের লড়াই চলে তারা ছেড়ে কথা কয় না তোমাদের। তোমরাই ওদের সহজতম শিকার। এ কথা জানেন অন্তর্যামী দেবরাজ, তাই প্রয়োজন মতো পাঠিয়ে দেন উর্বশী আর মেনকাদের। কই দিন তো দেখি আমাদের কাছে একবার; দ্বিতীয়বার আর যেঁষবে না।

বিশ্বামিত্র। আমরা যদি প্রথম তিনটির সহজ শিকার হ'য়ে থাকি তোমরা সহজ শিকার শেষের তিনটির।

শকুনি। কে অস্বীকার করছে? ইন্দ্রের কুসুমায়ুধ দেখলে আমি বিচলিত হইনে কিন্তু তার বেটার আয়ুধ দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। কুবেরের ঐশ্বর্য্যে আমি ঈর্ষিত হইনে কিন্তু পাণ্ডবের ঐশ্বর্য্য দেখে পরশ্রীকাতরতায় জলে পুড়ে মরি। লোকে ভাবে দুর্যোধনের অনুরোধে আমি কপট পাশায় বসেছি। মোটেই নয়, ওটা আমার স্বভাব আর ঐ স্বভাবের মূলে আছে শেষতম রিপুর প্রভাব। ও না করে আমার তৃপ্তি নাই।

বিশ্বামিত্র। তবে তুমিও সুখী নও।

শকুন্তি। অসুখীও নই। ধ্যানভঙ্গ হলে তুমি হায় হায় ক'রে মরো, আর পাণ্ডবদের বনে পাঠিয়ে আমি হাঃ হাঃ ক'রে হেসে উঠি। দুঃখ করতে যাবো কেন?

বিশ্বামিত্র। তবে আর উপদেশ দিতে এসেছ কেন?

শকুন্তি। ওটাও স্বভাব। পরের দোষ দেখলে নিজেকে তার চেয়ে বড় মনে হয়। যথার্থ যারা বড় নয় এইভাবে বড় হ'তে তারা এক রকম গৌরব অনুভব করে। নইলে তারা বাঁচবে কোন্ ভরসায়। নিজেকে ছোট মনে ক'রে কেউ বাঁচতে চায় না।

বিশ্বামিত্র। তবেই দেখো, ভগবান, ক্ষুদ্রেরও প্রয়োজন আছে সংসারে, নইলে মনে মনে বড় হওয়ার আনন্দ থেকে কি বঞ্চিত হ'তে না।

শকুন্তি। সেইজন্যেই তো বলছি অক্ষয় হোক তোমার ধ্যানভঙ্গ আর বারে বারে তোমায় নিন্দা ক'রে সমান অক্ষয় হোক আমার আনন্দ।

রেলওয়ের প্রচার মাধ্যমগুলিকে যথাযথ কাজে লাগান

চোখা তীরও সবসময়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারে না কিন্তু রেলওয়ের প্রচার-বাহনগুলি সঠিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য খোঁজ করুন:- কমার্শিয়াল পাবলিসিটি অফিসার

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

১১, গার্ডেন রীচ রোড, কলিকাতা-৪৩ • ফোন: ৪৫-৩৭৬৯, ৪৫-৫৩৪৯, ৪৩-২৩৯০

গ্রাম: CPUOSER

সেদিনের আমরা

সুবিমল লাহিড়ী

সে সময় 'বিচিত্রা' ক্লাব প্রায় বন্ধ। আমাদের "মোড়া ক্লাবে" আমরা তখন পুরোদমে চালাচ্ছি। সুকুমার রায় ছিলেন দলের সর্দার ; অফুরন্ত হাসি ও বিদ্রূপের ভিতর দিয়ে নতুন এক শিশু সাহিত্য—শুধু শিশু ও কিশোরদের জন্য নয়—শিশুদের অভিভাবকদের জন্যও সুকুমার রায় অজ্ঞাতসারে সে সময় রচনা করে যাচ্ছিলেন। আমাদের নানা গুরুগম্ভীর আলোচনার ফাঁকে সুকুমার শিল্পীর কেমন সুকৌশল প্রয়োগ করে গেছেন। তাঁকে হারাবার পর আমরা তা বুঝতে পেরেছিলাম—যখন "আবোল-তাবোল", "হ-য-ব-র-ল" ইত্যাদি অভিনীত হতে দেখেছি। "Alice in the Wonderland" যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, তার চেয়ে কম বিস্ময়কর নয় সুকুমারের nonsense rhyme-ও আপাত অর্থহীন রচনা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও মুগ্ধ হয়ে বিচিত্রা ভবনের ছাদের ওপরে সুকুমারের পাদ্রী অভিনয় ও "অদ্ভুত রামায়ণ" অভিনয় করেছিলেন। তাঁর "চলচিত্ত চঞ্চরী" তখনো প্রচারিত হয়নি। সুকুমার আবার তরুণ ব্রাহ্ম-যুবকদেরও নেতা ছিলেন এবং বন্ধু প্রশান্ত মহালনবীশের সঙ্গে মিলে ব্রাহ্মসমাজে রবীন্দ্র ভাবধারার প্রতিষ্ঠা করে সংগ্রাম করেছেন। কবির পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর যুগ অবলম্বনে একটি বহু তথ্যপূর্ণ জীবনী বন্ধুবর অজিতকুমার চক্রবর্তী এই সময়ে শেষ করেন। আমাদের "মোড়া ক্লাবে" তার কিছু পাঠ করা হয় আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি গিরিজা রায় চৌধুরী তার কড়া সমালোচনা করেন। আবার গিরিজার সমালোচনা হাস্যরসিক সুকুমারের মুখে শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। এই রকম গভীর বন্ধুত্বের মধ্যেও কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলতেন না। সদাহাস্যময় সম্পাদক শিশির কুমার দত্ত তর্কের ঝড় সামলাতেন সে এক অভিনব পন্থায়। মোড়া ক্লাবের চাঁদা ছিল কিন্তু নামমাত্র চার আনা, আমাদের "Proletarian Club" শুধু এত নানারকম খাওয়ার ব্যবস্থা কি করে জুটত তা আজও অর্থনীতিবিদের চিন্তার বিষয় হয়ে থাকল। নেপথ্য থেকে সদস্যদের সুদক্ষ গৃহিণীরা সেই অর্থনৈতিক সঙ্কটের সমাধান করতেন একান্তভাবে।

চার আনা চাঁদাও কিন্তু অনেকের বাকী পড়ে যেত। সুকুমার গাইতেন "দাড়ি নেড়ে চাঁদা চায় আষাঢ়ের ভেইশে!" সঙ্গে সঙ্গে ক্লাব সম্পাদকের ছবিও আঁকা হয়ে যেত। সুকুমার নিজেই কবিতা লিখে ও caricature ছবি এঁকে মোড়া ক্লাবের নোটিশ রিসেবে বিলি করতেন। ক্লাবের আর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন বন্ধুবর ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। হাজার বছরের প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করে সুনীতিকুমার তখন প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়েছেন। তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলিও মোড়া ক্লাবে পড়ে শোনান হয়েছে। সাহিত্যরসিক ও রাজনীতিবিদ কিরণশঙ্কর রায়ও আমাদের সহযোগী ছিলেন সে সময়। কিরণশঙ্কর অক্সফোর্ড থেকে ফিরে সবুজপত্রে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। আমাদের ক্লাবে সেই প্রবন্ধ নিয়ে চুলচেরা বিচার করা হয় সে সময়। ক্লাবের

অন্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ—ডাঃ দ্বিজেন্দ্র মৈত্র, তাঁর দাদা সুপরিচিত অধ্যাপক সুরেন মৈত্র, অতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্লাবের সভায় নিয়মিত সুখাদ্য পরিবেশনার ভার সাংবাদিক চারুচন্দ্রেরই ছিল), কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সাংবাদিক অমল হোম। অমল হোম তখন সবে Calcutta Daily News এ ঢুকেছেন। আর দুইজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন প্রাক্তন উপাচার্য নির্মল সিদ্ধান্ত ও পরিচয় পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক হিরণকুমার সান্যাল। আমাদের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু কিরণ বসাক, ধীরেন গুপ্ত অকালে মারা গিয়েছেন। আমরা ছিলাম সত্যিই Proletarian Club-এর সদস্য আর প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র গোষ্ঠী ছিল একটু অভিজাত শ্রেণী ঘেঁষা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের "নারায়ণ" পত্রিকায় এসময়ে একদিকে যেমন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির রচনায় সমৃদ্ধ ও বৈষ্ণব ধর্ম ও সাধনতত্ত্বের নবব্যাখ্যায় ভরান্বিত তেমনি অতি আধুনিক পরকীয়া তত্ত্বের বীজ হঠাৎ প্রকটিত হয়ে উঠেছিল একজন অজানা লেখকের রচনায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নাতি সত্যেন গুপ্ত "কমলের দুঃখ" লিখে নারায়ণ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য চিত্তরঞ্জনের কাছে যান এবং তা থেকে সাহিত্যিক মহলে অতি আধুনিকতার ঝড় ওঠে সেটাই পরে "কল্লোল" ও "কালি-কলম"এর যুগে প্রবলভাবে দেখা দেয়। এ সময় বাংলাদেশে ফিরেই শরৎচন্দ্র তাঁর অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি "শ্রীকান্ত" প্রকাশ করে সকলকে মুগ্ধ করেছেন। শরৎচন্দ্রের "চরিত্রহীন"ও এর কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে শুধু কথা সাহিত্যিকের নয়—মনস্তাত্ত্বিকের দাবীও জানিয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র ১৯১৬ সালে রেঙ্গুন ছেড়ে স্থায়ীভাবে কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কৃপায় তাঁরই বেহালার বাগানে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ১৯১৬ সালের ১১ই এপ্রিল শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন ছেড়ে কলকাতায় এসে "ভারতবর্ষে"র দলে যোগ দেন। অন্য দলের মধ্যেও তাঁর অনেক বন্ধু ছিল—যেমন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ('ভারতী'র দল), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী'র দল)। রবীন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্র কত ভালবাসেন, প্রথম থেকেই দেখেছিলাম। শরৎচন্দ্র বলতেন "গোরা আমি কতবার পড়েছি তোমরা ভাবতেও পার না।" বেহালার বাগানে পুকুর পাড়ে একটি বড় গাছতলায় বসে শরৎচন্দ্র একদিন বললেন "কবির গান দু'একটা শোনাও না।" বন্ধুবর শিল্পী অসিত হালদার গান ধরলেন। তারপর আমাকেও ধরা হল—অগত্যা কণ্ঠে গীতিবালোর একটি গান শরৎচন্দ্রকে গেয়ে শোনালাম—

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না
শুকনো ফুলো যত।
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো।"

অ্যাটম

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মাঝরাতে এখনো মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠি।

মনে হয় খোলা ছাতে 'অ্যাটম'ই বুঝি চেঁচাচ্ছে।

তখনই অবশ্য ভুল ভাঙে। 'অ্যাটম' নয়। হতে পারেনা ত বটেই, তা ছাড়া অ্যাটমের কণ্ঠে যা শোনা যেত তা হিংস্কার নয় গর্জন। পাড়ার অন্য সব তার স্বজাতির আওয়াজ ম্লান হয়ে যেত।

'অ্যাটম' আমাদের কুকুর। ছিল এখন আর নেই। এগার বছর আমাদের সঙ্গ দিয়েছে। তারপর একদিন সামান্য একটু অসুখের ছুতোয় সেই যে শয্যা নিয়েছে আর ওঠে নি। বিছানা বালিশের ওপর ঘুমন্ত অবস্থায় শেষ দেখেছিলাম। সেই ঘুমন্ত অবস্থাতেই কখন বিদায় নিয়ে গেছে।

কুকুর যারা পোষেন সকলেরই তাঁদের এমনি ব্যথা নিশ্চয় পড়ে।

কাকে যেন একবার ঠাট্টা করে বলেছিলাম, মানুষের চরিত্র কুকুরই একদিক দিয়ে নষ্ট করেছে তার অবিশ্বাস্য বিশ্বস্ততা আর আত্মসত্তা দিয়ে। মানুষকে চরম প্রভুত্বের স্বাদ বুঝিয়ে অপ্রতিহত ক্ষমতালোলুপতার বীজ তার মনে রোপণ করেছে হয়ত।

কথাটা নিছক মিথ্যা ঠাট্টা হয়ত নয়। মানুষ নিজেই যখন পশুত্বের স্তর থেকে বেশী দূর ওঠেনি সেই আদিম প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই প্রাণীটি কেমন করে মানুষের বসতির আশে পাশে উচ্ছিষ্ট সন্ধানে এসে তার কাছে দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেছে সে কাহিনী আজ আমাদের কাছে পুরাতন হলেও পৃথিবীর জীব-সম্পর্কের একটা বিস্ময়কর তত্ত্ব তার মধ্যে আছে।

কুকুরের বশ্যতা কিন্তু এক রকমের নয়, যেমন নয় তাদের চরিত্র।

অ্যাটমের মধ্যে পায়ে-লুটিয়ে-পড়া নির্বিচার বশ্যতা ছিল না। তার চরিত্রেও বিশেষত্ব ছিল।

সব কুকুরেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকে। নিজেরটির মধ্যে শুধু আমরা লক্ষ্য করি। মানুষের মধ্যে যেমন কুকুরদের মধ্যেও তেমনি স্বভাব চরিত্রের প্রচুর বৈচিত্র্য।

কুকুর সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে বসি নি, লিখতে বসেছি 'অ্যাটমে'র কথা।

আমার নিজের কুকুর বলে নয়। একটি দুর্বোধ্য ব্যাপারের কথা জানাতে।

অ্যাটম ঠিক সুবোধ শান্ত বাধ্য কুকুর ছিল না। তাকে নিয়ে বাচ্চা-বয়স থেকেই অনেক জ্বালা সইতে হয়েছে।

দু মাসের বাচ্চা বাড়িতে এসেছিল। কৌলীন্য তার মধ্যে বিশেষ কিছু ছিল না। বিদেশী হলেও উচ্চ নীচ বহু কুলের রক্ত তার মধ্যে মিশেছে।

তার মা বাবা সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনেছিলাম তা খুব আশ্বস্ত করবার মত নয়। আমাদের এক চা বাগানে তার জন্ম। তার বাবা নাকি তার জন্মের আগেই এত বেশী বেয়াড়া বদমেজাজী হয়ে ওঠে যে ক্ষেপে না গেলেও এবং মালিকের আদরের কুকুর হলেও বাগানে যারা কাজ করত তাদের কেউ তাকে গোপনে মেরে ফেলে। হত্যা যে করেছিল সে ধরা পড়েছিল কি না এবং পড়লেও শাস্তি কিছু

তার হয়েছিল কি না জানি না। তার মায়ের কাহিনী আরো অদ্ভুত। বাচ্চাকে—মাস খানেকের বাচ্চাকে ফেলে হঠাৎ একদিন বিনা কারণে সে নাকি বাগান থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। শহর গঞ্জ নয় যে কেউ তাকে চুরি করে নিয়ে গেছে ভাবা যাবে। চা বাগানের চারি ধারে বসতিহীন অরণ্যভূমি। কিসের টানে কেন যে সে অমন উধাও হয়ে গেছল তার কোন মানে খুঁজে পাওয়া যায় নি।

এই বাপ-মার বাচ্চা সম্বন্ধে মনে একটু খুঁতখুঁতুনি সত্যিই ছিল। কিন্তু কুকুরছানা এক বেলার জন্যেও বাড়িতে থাকলে মায়ার বাঁধনে পড়ে না এমন মানুষ বিরল। তার ওপর তুলোর পুঁটলীর মত সে ছানা যদি এক রাশ নরম লোমে ঢাকা হয়, ওই বয়সেই মনোমত কিছু না হলেই সে যদি শরীর ফুলিয়ে মিহি কণ্ঠে তার মেজাজ জানাতে সুরু করে, আর সমস্ত ঘর বাড়ি নাসাসঞ্চালনে তছনছ করে ফেলার মধ্যে কয়েক মিনিট অন্তমনস্ক হবার পরই যদি তার বিস্ময়কর অন্তর্ধানে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে শেষ পর্যন্ত সিঁড়ির নিচের কয়লা রাখার অন্ধকার ঘুলঘুলি থেকে তাকে প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও উদ্ধার করে আনতে হয়।

অ্যাটমকে সুতরাং বিদায় করা গেল না। নামকরণের পরে ত নয়ই। নামটা খবরের কাগজ পড়তে পড়তেই করেছিলাম মনে আছে। অ্যাটমিক যুগের কোন্ বিশেষ খবর থেকে নামটা মাথায় এসেছিল মনে নেই।

অ্যাটম সেই বয়সেই একদিন তার বেয়াড়া স্বভাবের পরিচয় দিলে। একটা বল নিয়ে খেলা করতে করতে আমার কন্যার হাতটা হঠাৎ কামড়ে দিলে। কামড়টা দিয়েছিল একটু জোরেই, কারণ রক্তপাত একটু হয়েছিল।

ওই বয়সে অমন কামড় দেওয়া খুব অস্বাভাবিক বোধহয় নয়। কেউই তাই আমরা তেমন গ্রাহ্য করি নি ব্যাপারটা। অদ্ভুত লেগেছিল একটু অ্যাটমের তার পরের ব্যবহার।

কামড় দেবার পর তাকে একটা চড় চাপড় দিয়ে শিক্ষা দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সুযোগ অ্যাটম দেয় নি।

কুকুরের চোখে মুখেও যে ভাবের অভিব্যক্তি হয় তা এ বিষয় যাঁরা লক্ষ্য করেছেন তাঁরা অস্বীকার করবেন না।

কামড় দিয়ে ফেলবার মত দুঃখে লজ্জায় মুখখানা কাঁচুমাচু করে অ্যাটম সেই যে ছুটে পালাল আর সারাদিনে তার দেখা নেই।

পালাবার জায়গা অবশ্য সেই কয়লা রাখার সিঁড়ির তলার ঘুলঘুলি।

সারা দিন সেখান থেকে সে বার হ'ল না।

প্রথমটা অপরাধটা ভালো করে বুঝতে দেবার জন্যে ডাকাডাকি আর করি নি। কিন্তু রাত্রেও বার বার ডাকাডাকিতেও খেতে না আসায় ভাবিত হয়ে পড়লাম।

সিঁড়ির নিচের ওই ঘুলঘুলিটা নিরাপদ জায়গা নয়। মাঝে মাঝে ওখান থেকে সাপ খোপ বেরিয়েছে। কিন্তু প্রথম সাধাসাধি তারপর খোঁচাখুঁচিতেও তাকে বার করা গেল না। কয়লার গাদার মধ্যে এমন ভাবে লুকিয়েছে যে খুঁজে পাওয়াই শক্ত।

তাকে বার করবার চেষ্টায় যখন হায়রাণ ও বিরক্ত হয়ে সবাই চলে এসেছি তখন আমার কন্যা সেখানে এমনি একবার শেষ চেষ্টা করতে বুঝি গিয়েছিল।

সে গিয়ে দাঁড়াবামাত্র যেন তে'জবাজিতে কি হয়ে গেল।

ডাকাডাকির পর্যন্ত দরকার হ'ল না। অ্যাটম নিজে থেকে বেরিয়ে এসে মাথা নিচু করে সেই যে তার পায়ের কাছে লুটিয়ে রইল আর ওঠবার নাম নেই।

অনুশোচনার ঘত কাতরই হোক অ্যাটমের হঠাৎ অকারণে কামড়াবার এ রোগ কিন্তু সারল না। মনে হ'ল এক এক সময়ে দাঁতগুলো যেন তার বশে থাকে না।

ছোটবেলা যা অগ্রাহ্য করা গেছল বড় হবার পর তা সত্যিই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠল।

শেষ পর্যন্ত অ্যাটমকে বেঁধেই রাখতে হ'ত সারাদিন। ছাড়া থাকত শুধু রাত্রে।

গলায় আওয়াজে ও মেজাজে পাড়ায় তখন সে বিভীষিকা।

মানুষ জন সম্বন্ধে তার সহজ অসহিষ্ণুতাও বড় অদ্ভুত। অচেনা লোক কি ছেঁড়া খোঁড়া নোংরা জামা কাপড়ের অদ্ভুত চেহারা দেখলে বাড়ির কুকুর মাত্রেই মনিবকে সাবধান করবার চেষ্টা করে। অ্যাটমের সে কর্তব্যবোধের অভাব ছিল না। কিন্তু অচেনা মানেই তার কাছে অবাঞ্ছিত নয়। কোন কোন অচেনা লোক প্রথম এসেই কেন যে তার অনুমোদন পেত রহস্যের মীমাংসা করতে পারি নি।

প্রথম দর্শনেই যার ওপর সে বিরূপ হত শত পরিচয়েও তাকে আর সুনজরে দেখত না।

এমনি অহেতুক বিদ্বেষ ছিল তার প্রসাদীর ওপর।

প্রসাদী দিন কতক আমাদের বাড়ি কাজ করছিল। অল্পবয়সী মেয়ে, চেহারা কিছু বলবার কুচ্ছিত নয়, পোষাক আশাক বরং পেশা ও অবস্থার দিক দিয়ে একটু পরিপাটি। কিন্তু প্রথম থেকেই কেন যে অ্যাটমের অমন বিষ নজরে পড়েছিল কিছুই বোঝা যায় নি।

অ্যাটমের সঙ্গে সে যে কোন দুর্ব্যবহার করত এমনও নয়। বরং গোড়ায় গোড়ায় তাকে খাবার দাবার দিয়ে আদর করবারই চেষ্টা করেছে। কিন্তু অ্যাটমের প্রথম থেকেই তার ওপর যেন অহেতুক জাতক্রোধ। তাকে বাড়ি ঢুকতে দেখলেই অ্যাটম সরবে এমন প্রবলভাবে তার আপত্তি জানাত, যে মনে হত ছাড়া থাকলে বুঝি ছিঁড়েই খেত প্রসাদীকে।

প্রসাদী বেশী দিন আমাদের কাছে কাজ করেনি। স্বভাব চরিত্র মেয়েটার ভালো ছিল না। একদিন শুনেছিলাম কার সঙ্গে যেন শহর ছেড়েই চলে গেছে।

অনেকদিন বাদে প্রসাদী যখন আবার ফিরে এল তখন তার দুর্দশার চরম হয়েছে। রুগ্ন জীর্ণ শরীরে কাজ করবার ক্ষমতা নেই। আপনার জন বলতে এক দিদি আর ভগ্নিপতি ছিল পাড়ায়। তাদেরও নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কতদিন তারা অমন একটা অকর্মণ্য রোগের বোঝা পুষবে!

একদিন শুনলাম মেয়েটাকে তারা দূর করে দিয়েছে।

শুনলাম কেন নিজের চোখেই প্রসাদীকে একদিন রাস্তায় ময়লা ছেঁড়া কাপড়ে ভিক্ষে করতে আসতে দেখলাম আমাদের বাড়িতে। বাড়িতে বাড়িতে ভিক্ষে করাই এখন তার পেশা।

প্রসাদীর সাজগোজ যখন ভদ্রগোছের ছিল তখনই অ্যাটম তাকে সহ্য করতে পারত না। এখন এই চেহারায় পোষাকে কি অভ্যর্থনা যে তাকে করল তা আর বোধহয় বলে বোঝাতে হবে না।

মেয়েটাও একেবারে কাঁইয়া ছিনে জোঁক। আমার স্ত্রী তাকে কিছু পয়সা কড়ির সঙ্গে খাবার দাবারও কিছু দিলেন, সেই সঙ্গে পরার একটা কাপড়ও। কিন্তু প্রসাদীর আবদারের অন্ত নেই। ছেঁড়া কাপড়ের বদলে ভালো একটা শাড়ি চাই তার সেই সঙ্গে একটা ব্লাউস!

ধমকে ধমকে অনেক কষ্টে তাকে শেষ পর্যন্ত বিদেয় করা হ'ল। যতক্ষণ সে দরজায় বসে রইল অ্যাটমের চিৎকারে কান পাতা দায় হ'ল বাড়িতে।

প্রসাদীর তারপর থেকে বাড়িতে আসা ক্রমশঃ বাড়তেই লাগল। দু'চার দিন পর পরই এসে হাজির হয়। পয়সা কড়ি খাবার দাবার ত বটেই আরো এটা ওটা অনেক কিছু তার নিত্য চাই। ভিক্ষে নয় যেন তার হুলুম।

যতক্ষণ সে থাকে অ্যাটমের কান ঝালাপালা করা চিৎকারে মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে প্রসাদীর আরো গুণের কথা শুনলাম। পাড়ায় তার বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়ে নাকি একটা শুকোতে দেওয়া কাপড় টেনে নিয়ে গেছে।

পাড়ায় তার আর ভিক্ষে মেলে না। সব বাড়িতেই দূর দূর করে। আমাদের বাড়িতেই একমাত্র যা আসে যায়। আমার স্ত্রী দূর দূর করেন না কিন্তু আগে যেটুকু প্রশ্রয় দিতেন তাও আর দেন না।

মেয়েটার জন্যে দুঃখ হয়। দোষ অবশ্য তার নিজেরও কম নয়। বহু এক ডাক্তারকে বলে করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়েছিলাম। শুধু কেনবার টাকাও দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী। কিন্তু সে টাকা নিয়ে বেশ কিছুদিন ডুব মেরে দিল। শুধু যে কেনে নি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ডাক্তারেরও ধারে কাছে আর যায় নি।

ক্রমশঃ যেন চুরিটাই তার রোগ হয়ে দাঁড়ালো। সময়ে অসময়ে আসে। অ্যাটমের দারুণ অভ্যর্থনা সত্ত্বেও দরজা জুড়ে বসে থাকে। একদিন বাইরের উঠোনে রাখা একটা বালতিই নিয়ে যাচ্ছিল। বাড়ির সামনের রাস্তার দোকানী জিজ্ঞেস করায় বলেছে, আমাদের বাড়ি থেকে নাকি চেয়ে এনেছে। সন্দেহ করলেও দোকানী আর কিছু বলতে পারে নি।

বালতির খোঁজ পড়ার পর দোকানীর কাছেই খবরটা পেলাম।

প্রসাদী বালতি নিয়ে যাবার পর অনেকদিন আসে নি।

রাস্তায় একদিন দূর থেকে দেখলাম। দুর্গার চরম হয়েছে। কিন্তু এখন যেন গা সওয়া। কটা তারই মত চেহারার ভিখিরীর সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করছে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা বাড়িশুদ্ধ সবাই একটা ছবি দেখতে গেছলাম।

যে লোকটি এখন কাজ করে সেও কদিন ছুটিতে বাড়ি গেছে।

বাইরের দরজায় তালা দিয়ে অ্যাটমকে তাই নিচের উঠোনে ছেড়েই রেখে গেছলাম।

ফিরে এসে অবাক হয়ে গেলাম।

বাইরের দরজাটা ভেজানোই আছে, কিন্তু তালাটা কড়ায় ঝুলছে।

তালা যে কেউ ভেঙেছে তাও মনে হ'ল না। সে রকম কোন চিহ্ন নেই। তাড়াতাড়িতে তালাটায় ঠিক মত চাবিই ঘোরবার দেওয়া হয় নি।

কিন্তু ভেতরে কেউ নিশ্চয় ঢুকতে পায় নি। কারণ সেখানে অ্যাটম খোলা অবস্থায় পাহারায়। একটা মাছি ঢুকলেও চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করত।

বাড়ির সামনের দোকানীকে বলে গিয়েছিলাম। সুতরাং সে দিক দিয়ে ভাবনা ছিল না।

বাড়ির ভেতরে ঢুকতেই অ্যাটম লাফ মেরে এসে স্বাগত জানাল। তাতে আরো আশ্বস্ত হলাম। কিন্তু নিচের বালানে পা দিয়েই একেবারে চমকিয়ে।

নিচের দালানে খাবার আর উঁচুতে ঘর। খাবারের জালের আলমারীতে চাবি নেই। কে সেখান থেকে পরমানন্দে রাত্রের জন্যে রান্না করা রুটি তরকারী থেকে ঘুষ ও মিষ্টান্ন বার করে ওইখানেই মেঝেতে বসে খেয়ে গেছে। উচ্ছিষ্ট কুড়িয়ে নিয়ে জায়গাটা মুছে দিয়ে যাবার চেষ্টা সত্ত্বেও কলতলায় ধুয়ে রাখা বাসনেই তার কুকীর্তির প্রমাণ পাওয়া গেল। সে বাসন আমার স্ত্রী বার করে রেখে যান নি।

অ্যাটম খোলা থাকা সত্ত্বেও কে নিঃশব্দে এমন কাজ করে যেতে পারে!

আমরা যখন খাবার আলমারীর পাশে চুরি করে খাওয়ার নিদর্শন দেখছি তখন অ্যাটমও সেখানে এসে প্রসন্ন ভাবে ল্যাজ নাড়ছে। তার চোখে মুখে কোনো বিকার নেই।

পরের দিন সকালেই চোরের পরিচয় জানা গেল।

রাস্তার সামনের দোকানী কিছু দেখে নি। তখন শীতকাল। সন্ধ্যের পরই সে দোকানের পাল্লা অর্ধেকটা ভেজিয়ে মুড়ি ভুড়ি দিয়ে ঝিমিয়েছে। অ্যাটমের আওয়াজ শুনলে সে খোঁজ করত। কিন্তু অ্যাটম কোন শব্দই করে নি।

কেন যে করে নি সেইটেই পরম রহস্যের বিষয়। কারণ খাবার চোর আর কেউ নয় প্রসাদী। দোকানী তাকে দেখে নি, দেখেছে আমাদের পাড়ার পয়লা। বাড়িতে বাড়িতে দুধ দিয়ে ফেরার সময় প্রসাদীকে সে আমাদের বাড়ি থেকে ফিরতে দেখেছে।

প্রসাদীর চরিত্র সকলেরই জানা। গোয়ালা সন্দেহভরে তাকে দাঁড় করিয়ে খোঁজ খবর করেছে। প্রসাদীর কাছে সত্যিই কিছু ছিল না। সে একগাল হেসে বলেছে, বাড়িতে কেউ নেই গো। খালি ওদের কুকুরটা আছে।

অ্যাটমের খ্যাতি গোয়ালার অবিদিত নয়। সে তাই নিশ্চিন্ত হয়েই ছেড়ে দিয়েছে প্রসাদীকে।

কিন্তু ছাড়া অবস্থাতেও প্রসাদীকে ঘরে ঢুকে খাবার আলমারী থেকে চুরি করে খেতে দেখেও অ্যাটম একটু চিৎকার পর্যন্ত করেনি এ যে অবিশ্বাস্য!

কিছু খাইয়ে তাকে শান্ত রাখবে, সে রকম ঘুষ নেবার মত কুকুর ত অ্যাটম নয়।

তবে কি যে তার দুচক্ষের বিষ সেই প্রসাদীরই ক্ষুধার্ত কাতর মুখ তার করুণা জাগিয়েছে। অবস্থা ভেদে তার অন্যায়ের বিচারও যে ভিন্ন হয় এ বোধ কোন কুকুরের থাকা কি সম্ভব?

এ রহস্যের মীমাংসা আর হবার নয়!

যাকে নিয়ে এই রহস্য সেই অ্যাটমই আর নেই।

এই আমার গল্প

বাণী রায়

রাস্তার ধারেই বহুক্ষণ কাটে আমার।

নিঃসঙ্গ লোকের যা ধর্ম, সেই 'পথ চাওয়াতেই আনন্দ' আছে আমার। পথে কত লোক যায়, বারান্দায় বসে দেখি। বাসের লোক গুণি। ফেরিওলার হাঁকার ইতি দেই। কখনও বা এতই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি যে চেনালোক চিনি না।

এমনি ভাবে খোঁড়া মেয়েটি আমার চোখে পড়েছিল। রসটার ভিড় মিটে গেলে দেখতাম রোজ একটি মেয়ে পা-টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আমাদের বাড়ীর উল্টো দিকের গলির মধ্যে যাচ্ছে। আমাদের বাড়ীর পেছনের রাস্তা থেকে আসত সে।

চুলগুলো যেমন-তেমন করে বাঁধা। হাল্কা-সুতী শাড়ী; রংও হাল্কা। সাজপোষাকে কোথাও 'উচ্ছৃতা' নেই, আবার পরিষ্কার। পায়ে চটীর ওপর লুটিয়ে পড়া শাড়ী। পায়ের গড়ন যেন দেখা না যায়।

টেনে-টেনে ধীরে ধীরে পথটুকু পার হতে অনেকক্ষণ সময় লাগত খোঁড়া মেয়েটির। সেই সুযোগে আমি তাকে ভাল করে দেখবার সুযোগ পেতাম।

একই সময়ে যেত সে গলির মধ্যে। ফেরার সময় আর দেখতাম না। আমারও স্নানাহারের সময় হয়ে যেত। হয়তো বা অন্যপথেও সে ফিরত।

এক-একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারেও তাকে দেখতাম বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলেছে।

তার চিরবিধুর মুখের দিকে চেয়ে মনে হত নাহের পুরুষসঙ্গী নেই, তাই বলে কি কোনদিন একটি মেয়েবন্ধু বা আত্মীয়াও সঙ্গে থাকতে নেই। কোনদিন তাকে একা ছাড়া দেখি না।

মেয়েটির সুশ্রী চেহারা, সৌর শরীর দেখে মনে মনে ক্ষোভ হয়। এমন চমৎকার একটি মানুষের অনুমাকে কেন ভগবান খঞ্জ করলেন!

পথে চলত খোঁড়া মেয়েটি যেন পথ এবাড়ী-ওবাড়ী শেষ হয়নি। সমগ্র ভূমণ্ডল বা বিশ্বগোলক যেন একা একা পদক্ষেপ করে পৃথিবীর কোন প্রান্তে পৌঁছতে হবে। শান্ত বিষণ্ণতায় সে চলছে পথ—একা একা। সম্বল কিছু নেই। পাখানাও খঞ্জ। কৃপণ ঈশ্বর রূপ ও স্বাস্থ্য দিয়েও বঞ্চিত করেছেন।

আর ওর একাকীত্ব, ওর ভ্রমণবিরহ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। নেশার মত রোজ ও আমাকে টানে। যখন ও যায় চোখ মেলে দেখি। কোনদিন দেখা না পেলে ছটফট করি। মনে হয় খোঁড়া মেয়েটি কি অসুস্থ হল না কি?

মেয়েটি বয়স্থা কিন্তু অবিবাহিতা। মাথায় ভরি খাড়ের ওপর একটু পেছনে হেলানো। যেন আটলাসের পৃথিবী বহনের ভার পড়েছে তারি মাথায়। সে ক্লান্ত।

তবু তার চাপা-বিস্তৃত কপালে লেখা থাকত কোন মহত্ত্বের ছায়া। বিধির বেদনা তাকে করেছিল স্বতন্ত্র।

কোনদিন চোখে চোখও মিলত।

অবশেষে একদিন ওর যাবার পথে আলাপ করলাম। "আপনাকে রোজই যেতে দেখি এই সময়ে।"

খোঁড়া মেয়েটি চকিত হয়ে দাঁড়াল। পাণ্ডু কপোলে গোলাপী ছায়া লাগল। দৃষ্টি প্রসারিত বিস্ময়ে আমার দিকে ফেরাল—ঈষৎ সন্দেহের ছায়া সেখানে।

যে মুখ তরুণ বয়সেই পৃথিবীর দিক থেকে অর্ধেক ফেরানো, সে মুখে আবার আশা জেগে উঠল। মানুষের অনুকম্পা পেতেই সে অভ্যস্ত, মানুষের বন্ধুত্ব পায়নি।

পরিচয় পেলাম তার। আমাদের বাড়ীর পেছনের রাস্তায় থাকে। এই সময়টায় কাকীমার বাড়ী যায়, আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায়। কাকীমার এখন হাতখালি থাকে, ওকে একটু আধটু সেলাই শিখিয়ে দেন। কাকীমা সেলায়ে গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা পাশ।

আমি কৌশলে প্রশ্ন করে জানলাম ঈশ্বর ওকে শুধু খঞ্জ করেই ক্ষান্ত নন। বাড়ীর অবস্থাও ভাল নয়। সরীসৃপের ঘর না হলেও আলাদা করে তার জন্য খরচ করবে কে? বাবা নেই, ভাই-এর গলগ্রহ। কোন কিছু শিখতে গেলে সেখার স্কুলে ভর্তি হতে হয়। মাস-মাহনা লাগে। সে সবের যোগাড় নেই। হাতের ব্যাগটার মধ্যে যৎসামান্য উপকরণ নিয়ে তাই সে রোজ আসে কাকীমার কাছে। একা একা বাড়ী বসে বসে করবে কি?

লেখাপড়াও বিশেষ হয়নি। ম্যাট্রিক ফেল করে আর পড়বার রসদ যোগাতে নি।

জন্ম থেকে খোঁড়া, কি অসুখ-বিসুখে খোঁড়া এ কথা আমার জানবার ইচ্ছা হলেও জানবার উপায় নেই। মেয়েটি অতিশয় স্পর্শকাতর উক্ত বিষয়ে। সে যে খোঁড়া এ কথা ভোলার জন্যই মাথা তার উঁচু। অন্যকেও সে ভোলাতে চায় তাই দিবালোকে একা একা রাস্তা পার হয় সে, সহজভাবে ভান পায়ে টেনে।

তার সঙ্গে মৈত্রীর চেষ্টা পেলাম। মাঝে মাঝে দেখা ও কথা হ'তে লাগল। কিন্তু আমার বাড়ীতে আসা সে এড়িয়ে যেতে লাগল। পথেঘাটে দাঁড়িয়ে বা আমার গেটের পাশেই কথা হ'তে লাগল।

তার নিঃসঙ্গতা চূর্ণ করার চেষ্টা পেলাম। যা'র অনেক পাবার ছিল, জীবনের ভরা হাটে খালি হাতে সে ফিরে যাবে কেন?

ওর রোমান্টিক বিষণ্ণতা, ললাটের মহত্ত্ব, মুখের অসহায় করুণতা কি কখনও কারুর চোখে পড়বে না? ও যে খোঁড়া এই বোধ ওকে স্বতন্ত্র করেছে। কখনও কি কেউ ওকে আবিষ্কার করবে না?

জীবনের খাতায় অঙ্ক মেলানোতে কত ভুলচুক থাকে। আমরা যোগে ভুল করলে বাবার কাটা যায়, অঙ্কশাস্ত্রে আমরা ফেল করি। কিন্তু ঈশ্বরের মত কাঁচা গণিতজ্ঞান নিয়ে অঙ্কপাতি চালানো বিচিত্র। অটোক্রাট তিনি, তাঁর ভুল ধরার মত বাকি নেই কিনা।

এই যে খোঁড়া মেয়েটি এর সঙ্গে যোগে মিলবে ওপাড়ার তোতলা কেরানীটির। সারাদিন পরিশ্রম করে মেসের ময়লা বিছানায় শুয়ে শুয়ে যে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' পড়ে। আর কোন আনন্দ কিনবার পয়সা নেই তার। দেশে আছেন সৎমা। মেসে একশো চার ডিগ্রী জ্বরে মাথায় কোন শীতল হাতখানা পড়ে না। এধারে মেয়েটির হাতখানা বৃথা স্নেহের ঘামে অশ্রুরিত হয়।

সেদিনও দাঁড়িয়ে আছি গেটের কাছে। বাল্যবন্ধু নীলিমা দীর্ঘ সময়ের পরে বিদায় নিয়ে বাসে

উঠেছে। পশ্চিম আকাশের কোণে এক রক্ত গোধূলির আভাস। গেটের পাশে লাল লাল সন্ধ্যা-মালতী সাড়া দিচ্ছে। পাশে দুলছে রানি-সাকুলের লতা। বাতাস ভরে উঠেছে গন্ধে। হঠাৎ ঘুম-পালানো ছেলের মত বাতাস দৌড়ে এল গন্ধের ডালা নিয়ে।

আরও গন্ধ। বেলফুলের মালা হাতে চলেছে ফেরিওলা। চাপার স্তবক হাতের থলের মধ্যে। কয়েকটা রজনীগন্ধার ডাণ্ডা হাতে। নানা ফুলের গন্ধে বসন্তবেলা ভরে উঠল। সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নামছে। বাস্তব কিন্তু অদৃশ্য হয়ে গেল স্বপ্নের রংএ।

এই সুন্দর পৃথিবী! কত রং এখানে! আকাশে নীল, গাছে সবুজ, ফুলে লাল। মানবীর শিল্প যত প্রয়াসই করুক না কেন এমন শিল্পের কাছেও যেতে পারে না।

খস্‌খস্ শব্দে দেখলাম খোঁড়া মেয়েটিকে। আজ তার শাড়ী হলুদ কচেফুলের রং মেখেছে। মুখের বিষণ্ণতা গোধূলির আলো মুছে দিয়েছে।

আজ তার মুখে হাসি। ওর দাঁতগুলো যে এতই সুন্দর, না হাসলে বোঝা যায় না।

আমার গেটে হাত রেখে আজ নিজেই এগিয়ে এল, "বেড়াতে যাচ্ছেন?"

এতদিনের মধ্যে ওকে সুখী দেখে আমারও আনন্দ হল, "না, বন্ধুকে সী-অফ্ করলাম। আপনি কি বেড়াতে যাচ্ছেন?"

"না, আপনার কাছেই এলাম।"

বিস্মিত হ'লাম। আমার সঙ্গ কাম্য হলেও সে কোনদিন তো নিজে থেকে এগোত না। নিজের অপূর্ণতা নিয়ে পৃথক জগৎ রচনা করে সে বাস করত।

"আসুন, বারান্দায় চেয়ার আছে।"

বারান্দায় রানি-সাকুলের লতার নীচে পাতা সবুজ চেয়ারে সে বসল। চুলও আজ সুন্দর বিন্যাসে বাঁধা। ইচ্ছা হল ওর হলদে শাড়ীর সঙ্গে মানিয়ে একটি সূর্যমুখী ওর খোঁপায় গুঁজিয়ে দেই।

হাতখানা টেবলের গায়ে লতিয়ে রেখে বসেছে সে। আজ ওর হাত বারবার চোখে পড়ছে। হাতখানা সুন্দর—গোল হয়ে চাঁপার কলির মত আঙুল—আরে, একি?

একসারি লাল চুণী বসানো ঝকঝকে নূতন একটা আংটি ওর বাঁ হাতের অনামিকায়।

এর একটা অর্থ হতে পারে।

আমার সপ্রশ্ন দৃষ্টির নীচে ওর মুখ সলজ্জ হাসিতে রমণীয় হয়ে উঠল। ও বলল, "হ্যাঁ। তাই তো সকলের আগে আপনারি কাছে ছুটে এলাম। আমি খোঁড়া, লোকের অবজ্ঞা পেয়েছি, দয়াও পেয়েছি। কেউ আলাপ করতে এগিয়ে আসেনি আপনি ছাড়া। তাই, খবরটা আপনাকে দিতে এলাম।"

আমি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম, "বেশ, বেশ। ভারী খুশী হ'লাম। কিন্তু খুলে বলতে হ'বে গল্পটা।"

খোঁড়া মেয়ে এই সর্বপ্রথম নিজের শারীরিক দৈন্যের কথা সহজভাবে উল্লেখ করল, "আমি তো ভাবিনি সাধারণ মেয়ের মত আমারও নিজের ঘর হ'তে পারে কখনও। আমি তো আপনার মত নই। ঘর ছাড়া কি চাইব? লেখাপড়া করতে পারিনি। কোন ঘুনিয়াদি শিক্ষা বা কারিগরী শিক্ষাও নিতে পারিনি। নিজের দরকার মত সামান্য রোজগারটুকু করে নেবার ক্ষমতা বা পথও ছিল না। কোথাও যেতে বা মিলতেও সুযোগ পেতাম না। নিজের খোঁড়া পায়ের লজ্জায় ইচ্ছাও ছিল না। একমাত্র দাদা নিজের সংসার নিয়ে ব্যস্ত। বৌদি খোঁড়া ননদকে সুচক্ষে দেখেন না। বাবা-মা নেই,

দেবার লোক, ভাবার লোক নেই। বাড়ীর একটা ঘরে যাবজ্জীবন বাবা থাকার অধিকার নিয়ে গেছেন। দাদা খেতে দেয়। কাকা-কাকীমা মাঝে মাঝে জামা কাপড় দেন। এমনি করেই চলত। এ সমস্ত দিনের শেষ ছিল না।

পথে বা'র হলে লোকের দৃষ্টি পড়ত আমার প্রতি। তবু একমাত্র যাবার জায়গা হিসাবে যেতাম কাকার বাড়ী। বৌদি সংসারে হাত দেওয়া পছন্দ করতেন না। ভাইপো-ভাইঝি ছোট, তাছাড়া খোঁড়া পিসী তাদের লজ্জা মাত্র। কিছু দিতেও পারিনা, শুধু বসে বসে খাই। নিজের ঘরটিতে বসে থাকতাম। পুরনো বই-টই পেলে পড়তাম। বাড়ীর পেছনের ট্যানডাম প্রটে যাবার একটা রাস্তা ছিল ঠিক আমারি জানলার নীচে। সেখানে একটু ফুল লাগাতাম।"

আমি চুপ করিয়ে দিলাম ওকে, "আপনার দুঃখের দিনের কথা শুনতে কে চেয়েছে? রোমান্সের গল্পটা বলুন, শুনি।"

সে বলতে সুরু করল—

"পেছনের বাড়ীতে ছিল সুবীর। একসঙ্গে আমাদের বাড়ী হয়েছে। বাবার বন্ধুর ছেলে। একসঙ্গে খেলা করেছি। জন্ম থেকে আমি খোঁড়া। ছেলেবেলায় বোধ থাকে না। খেলতে যেতাম সকলের সঙ্গে। তারা কেউ খোঁড়াকে দলে নিতে চাইত না। তখন সুবীর এসে বলত, 'এসো, আমরা লুডো খেলি'।"

আমি পরিহাস করলাম, "তবে দেখছি বাল্যপ্রণয়।"

"না কিন্তু। আমরা এত সহজ ছিলাম পরস্পরের সঙ্গে যে, প্রণয় কথাটা প্রয়োগ করা যেত না। তাছাড়া আমার সুবীরের ওপর রাগ হত। আমি খোঁড়া বলে আমাকে দয়া করতে এসেছে। সেই সময় থেকেই নিজের খুঁৎ নিয়ে সরে থাকতে শিখলাম।

লেখাপড়াও হল না। স্কুলে যেতাম। কিন্তু একটু বেশী বয়স হ'লে আর যেতাম না। কারণ মেয়েরা ছড়া কাটত—

'খোঁড়া, ভ্যাং ভ্যাং ভ্যাং!
কার বাড়ীতে গিয়েছিলে?
কে ভেঙেছে ঠ্যাং?'

তাই বাড়ীতে প্রাইভেট পড়ে দিলাম পরীক্ষা। টিউটর রাখা সম্ভব হয়নি। ফেল করলাম। একবছর আগে বাবা গেছেন। মা-ও গেলেন।

ওই জানলায় বসা, বইপড়া, সেলাই করা আর কাকার বাড়ী যাওয়া। জীবনে কিছুই করবার রইল না।

সুবীর কলেজ ছেড়ে এঞ্জিনীয়ারিং পড়ল। যাতায়াতে জানলায় দেখা হত। কখনও বা বাড়ীতেও আসত সে। সুবীরের মা আমাকে ভালমন্দ হ'লে ডেকে খাওয়াতেন। কখনও বা শাড়ী-জামা দিতেন। দুঃখ করে বলতেন, 'আহা এমন সুন্দর মেয়েটার একটু খুঁতে জীবনটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

একদিন দেখলাম সাজগোজ করে চলেছে সুবীর আমারি জানলার নীচ দিয়ে। শেষ বছর তার। একজন বড় অধ্যাপক নিমন্ত্রণ করেছেন আজ রাত্রে।

প্রচণ্ড গরমে ঘর-দোর কাঁচ দিয়েছি, ঘর ধুয়েছি। কাপড় কেচেছি। বাড়ীর চাকর আমার

কাজকর্ম করবার অবকাশ পায়না। ধুলো-কাদা মাখা ঘর্মাক্ত মূর্তি নিয়ে একটু বাতাসের আশায় জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম।

সুবীর খুবই সাজগোজ করে চলেছিল। ওর পোষাক কড়া ইস্ত্রির; জামা থেকে এসেন্সের গন্ধ আসছে। সবাই জানি অধ্যাপকের মেয়ের সঙ্গে সুবীরের বিয়ের কথা চলছে। কে জানে আজই হয়তো ঠিক হয়ে যেতে পারে।

জানলার রেলিং ধরে দেখছিলাম। আমারি বাল্যবন্ধু কেমন জগতে নিজের স্থান করে নিয়েছে। আরো, আরো, সার্থকতার পৃথিবী এদেরই জন্য।

আর আমি? মনে মনে নিজেকে দেখলাম।

একটা খেঁড়া মেয়ে! বাড়ীতে বসে আছি। লেখাপড়া, গানবাজনা শিখবার সাধ্য নেই। পয়সা নেই। বাবা নেই। কি-রে মত আধময়লা মোটা শাড়ী, রংওঠা ব্লাউজ পরে রুক্ষ চুলে ধুলো মেখে দাঁড়িয়ে দেখছি সকলের সুখ।

আমার চোখে বোধহয় জ্বালা ফুটেছিল। সুবীর মাথা তুলে আমার দিকে চেয়ে কি যেন বলতে গিয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ থেমে গেল। তারপরে মাথা নামিয়ে আস্তে পথটুকু পার হয়ে গেল। সন্তপাদিপ জুতোর নীচে পথটুকুর কাঁকরের কান্নাও মিলিয়ে গেল।

আমি হাতমুখ ধুয়ে জানলার ধারে সেলাই নিয়ে বসলাম। কাকীমা একটা নূতন ধরণের স্টিচ্ দেখিয়ে দিয়েছেন। আমার ঘরে পাখা নেই, জানলার উপর বসলে তবু একটু বাতাস লাগে।

আমি ভাবলাম: শীঘ্রই তো সুবীরের বিয়ে হবে। আমি কি দেব? আমার দেবার সাধ্য নেই। কয়েকটা রুমালে সুবীরের নাম লিখে ফুল তুলে দেব। আমার জানলার নীচে রজনীগন্ধার ঝাড়ের মত ঝাড় তুলে দেব। তাহ'লে হয়তো সুবীরের মনে পড়বে সে একদিন রজনীগন্ধা রোপণে আমাকে সাহায্য করেছিল।

এমন সময়ে আমার মনের কথা যেন মূর্তি ধরে আবার জানলার নীচে দাঁড়াল। সুবীর! অসময়ে ফিরে এসেছে। আমি মুখ তুলে তাকাতে সুবীর বলে উঠল, "তোমার গন্ধরাজটার গোড়া যে শুকিয়ে উঠেছে। সোনাপওলোর মরা পাতা কেটে দেওনি। দেখ, নীচে এসে।"

আমি ঘরের থেকে সরু রাস্তাটায় নেমে এলাম জানলার নীচে।

সুবীর গাছগুলো সম্বন্ধে যা-যা করণীয় বলে দিল। ওদের বাড়ীতে চমৎকার বাগান করেছে সুবীর। ওর জ্ঞান আছে।

আমি বললাম, "এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে?"

সুবীর কেমন অন্যমনস্ক। কথা শেষ হয়ে গেলেও সে চলে যাচ্ছে না।

ক্লান্ত গলায় সুবীর বলল, "চলে এলাম। ভাল লাগল না।"

"কেন বল তো?"

"তোমার জন্যে চলে এলাম।"

আমি কথাটার অর্থ বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলাম। সুবীর গলায় সমস্ত বসন্তঋতুর লাবণ্য এনে বলে চলল, "যাবার সময়ে দেখলাম তোমাকে। আমি আনন্দ করে যাচ্ছি, ভবিষ্যৎ জীবন

পতে যাচ্ছি। আর তুমি, সর্বহারা হয়ে চেয়ে দেখছ। একসঙ্গে আমরা পৃথিবীতে এসেছিলাম। যে দোষ তোমার নয়, তার জন্যে তুমি বঞ্চিত হচ্ছ কেন?

আজ প্রোফেসরের মেয়েকে আমার বিয়ের প্রস্তাব দেবার কথা ছিল। আমি পারলাম না। আমি তোমার কাছেই ফিরে এলাম।"

মনে পড়ে গেল ছেলেবেলার লুডো খেলার কথা। তেমনি রাগে অপমানে আমার গা জ্বলে গেল। আমি রুক্ষ স্বরে বললাম, "তোমার দয়াভিক্ষা করেছি বলে মনে হচ্ছে না তো।"

"দয়া? এ তুমি কি বলছো?" হঠাৎ আমার হাত ধরে সুবীর নিজের দিকে আকর্ষণ করল, "তুমি কি কিছুই বোঝনা? ছেলেবেলা থেকে তোমাকেই তো ভালবেসেছি। তুমিই আমাকে সরিয়ে রেখেছ।"

আকাশে কত রং, পল্লবে কত সবুজ প্রথম দেখলাম। কিন্তু আমার কথাও তো বলে নিতে হবে অন্য সত্তার মধ্যে মিলেমিশে যাবার আগে।

বহুদিনই হাত ধরেছে সে। কিন্তু আজ তার হাত ধরায় পৃথিবী এসে আমারি কাছে ধরা দিয়েছে। সেই ধরার ধরা থেকে হাত ছাড়াবার চেষ্টা করলাম—

"সরিয়ে রাখিনি তো। আমি যে খোঁড়া, সুবীর। তোমাদের কাছে যাবার সাহস কোথায় আমার?"

রজনীগন্ধার ঝাড়ে বুঝি সমস্ত ফুল ফুটে উঠেছিল। গোলাপও পাপড়ি মেলল। সুবীরের দৃঢ় আকর্ষণে তার বুকে মিশে যেতে যেতে শেষ চেষ্টা করলাম, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যে খোঁড়া। তোমার বন্ধু আত্মীয়, তোমার মা—তোমার মা কি বলবেন?"

আমার মা বড়লোকের বওয়াটে মেয়ের চেয়ে খোঁড়া বৌ পছন্দ করবেন। সে পার্টিতে যেয়ে নাচানাচি করবে না, ঘরে থাকবে বৌ হয়ে।"

তারপরে—আমার একফালি বাগানের সমস্ত রজনীগন্ধা, সমস্ত গন্ধরাজ, সমস্ত গোলাপ আমার দুই ঠোঁটের উপর ফুটে উঠল।"

কিন্তু এ তো খোঁড়া মেয়ের গল্প নয়। এ যে আমার গল্প। এই আমার গল্প।

খোঁড়া মেয়ের গল্প—ওই যে পথে। আজও সে একা একা চলছে। পা-টা আরও টেনে হাঁটতে হচ্ছে তাকে। রঙের পাশের চুলে সাদা পড়েছে। স্বাস্থ্যও ভঙ্গুর হয়ে চলেছে। মাথার ভেতরে ক্লান্তি, ঘুমাবার ক্লান্তি।

জীবনের গল্প আর আমার গল্প এক নয়। ঈশ্বর আকাশে নীল, পল্লবে সবুজ দিয়েছেন, ফুলে মাখিয়েছেন লাল। এই রংএর ঐশ্বর্যে মানুষের জীবন সুন্দর করতে পারেননি তিনি।

ঈশ্বর সব রং প্রকৃতিকে সুন্দর করতে নিঃশেষ করেছেন।

মানুষের জীবনে একটু রং-ও তিনি রাখেননি।

কমলের প্রেতাত্মা ও আমরা

পরিমল গোস্বামী

সমীরণ পরলোক চর্চা করে। বলে, ভূত নামানো এমন একটা কিছু কঠিন কাজ নয়।

আমার নিজের এ বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু কৌতূহল ছিল। শুনেছিলাম উপযুক্ত মীডিয়াম পেলে নিজের ইচ্ছামতো ভূত নামানো যায় তার মধ্যে। ভূত সেই মীডিয়ামের ভিতর দিয়েই কথা বলে। এর কারণ, সমীরণ বলেছিল, ভূতদের তো দেহ নেই, তাই অন্য একটা দেহের দরকার হয়। কিন্তু পরে দেখেছি দেহ না হ'লেও চলে।

কথা প্রসঙ্গে জানা গেল প্রেতচক্রে বসালে যখন তখন ভূত এসে পড়ে। অবশ্য চক্রে যারা বসবে তাদের মধ্যে উপযুক্ত মীডিয়াম থাকা চাই।

আমরা সন্ধ্যায় তিন বন্ধুতে এই সব আলোচনা করছিলাম সমীরণদের বাড়িতে। সমীরণ প্রস্তাব করল, যদি আমাদের সাহস থাকে তবে তখনই চক্রে বসতে সে রাজি আছে।

আমি উৎসাহের সঙ্গে রাজি হলাম। অমরেশ কিছুদিন ব্রোংকাইটিসে ভুগছিল, দেহ তার খুবই দুর্বল, তবু সেও রাজি হ'ল। তখন আমরা তিনজন পরস্পর হাত জোরাজুড়ি ক'রে সোফাসে বসলাম। আলো জ্বালাই রইল, সমীরণ এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, বলল, আলোয় ক্ষতি হবে না যদি মনোযোগ ঠিক থাকে। অমরেশ অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যতক্ষণ চক্রে বসবে ততক্ষণ সে কাশবে না। কিন্তু ব্রোংকাইটিসের কঠিন প্রতিশ্রুতি! একটু সন্দেহ রয়ে গেল।

ঠিক হ'ল আমাদের তিনজনেরই পরিচিত এবং অকালে মৃত বন্ধু কমলকে স্মরণ করতে হবে। একাগ্রচিত্তে তার কথা ধ্যান করতে করতে সে এসে যাবে। তবে কার মধ্যে আসবে তা আগে থাকতে বলা শক্ত। সমীরণ বলল, ব্যাপারটা অনেকটা বিদ্যুতের গতিপথের মতন। The line of least resistance সে খোঁজে। অর্থাৎ যে পথে সব চেয়ে কম বাধা সেই পথ ধ'রে সে ছুটে চলে। প্রেতাত্মাও তাই। দেহে মনে কেউ দুর্বল হ'লে তার মধ্যেই সে সবচেয়ে কম বাধা পায়।

অমরেশ একটি উদ্ভট কাশি প্রাণপণে চেপে রেখে বলল, মানে আমার মধ্যেই আসবে। তা আসুক না, কমল আমার বন্ধু। আমার সে কোনো অনিষ্ট করবে না।

খুব সাহস আছে অমরেশের। কিন্তু বলবার সময় তার হাত যে কাঁপছিল, আমার হাত তা বেশ বুঝতে পারছিল। অর্থাৎ বড়ই বলুক, ভিতরে ভিতরে সে ভয় পেয়েছিল। তবু আমরা একাগ্রচিত্তে কমলকে ধ্যান করতে লাগলাম।

বোধহয় মিনিট দুই উত্তীর্ণ হয়েছে, এমন সময় অমরেশ হঠাৎ গোঁ গোঁ করতে আরম্ভ করল, টেবিল থেকে তার দুখানা হাত শিথিল হয়ে চেয়ারের দুধারে ঝুলে পড়ল, তার মাথা কাত হয়ে পড়ল একদিকে। এদিকে ভূত নামানোর ওস্তাদ সমীরণও অমরেশের এই অবস্থা দেখে শক্ত হয়ে উঠল। তার হাত যেন লোহা হয়ে গেছে। বুঝতে পারলাম, বেশ ভয় পেয়েছে সেও। আমার অবস্থা কি হ'ল তা আর ব'লে লাভ নেই।

"তুই কি এসে গিয়েছিস কমল?" সমীরণের কাঁপা গলায় প্রশ্ন। যত সাহসই তার থাক, পাশে একটা ভূত ব'সে আছে এ কথা জেনে শুনেও মাথা ঠিক রাখা যায় তার কাজ নয়।

অমরেশের ভিতর থেকে, তারই মুখ দিয়ে, ভূত ব'লে উঠল, কেন অকারণ আমাকে ডাকলি এখন? আমি স্বাধীনভাবে একটা জায়গায় বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম আপন মনে। আমাকে এখন—

কথা শেষ হ'ল না। অমরেশ হঠাৎ এমন কাসতে আরম্ভ করল যে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম, হঠাৎ ম'রে না যায়।

কিন্তু যা ঘটল, তা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। আমাদের জীবনভাবে চমকে দিয়ে কমলের প্রেতদেহ অমরেশের দেহ থেকে একলাফে বেরিয়ে এসে টেবিলের উপর বসল। বলল, বাপ! তোদের কি আর কোনো ভাল মীডিয়াম ছিল না? ব্রোংকাইটিসের রুগীকে চক্রে বসাতে হ'ল এজন্য? ঐ গলায় আমি কথা বলব কেমন ক'রে? তাই বেরিয়ে এলাম, কিছু মনে করিস না।

সমীরণের হাত আরও শক্ত। আমার একেবারে শিথিল। অমরেশ মূর্ছিত।

সমীরণ কোনো রকমে বলল, মনে করব কেন, তবে ভয় পেয়েছি কিছু।

কমল বলল, ভয়? ব'লে হাসতে লাগল। আমার এই ছায়ামূর্তি দেখে ভয়? কায়াধারী ছিলাম যখন, তখন তো ভয় হ'ত না।

তখন তোর ভয় হত না ভূতের কথায়?—সমীরণ এবারে অনেকটা শান্ত সুরে বলল।

ওরে, এখন সে কথা ভেবে হাসি। কি ভয়ই পেতাম! কিন্তু আপাতত দয়া ক'রে বলবি কি আমাকে এখন ডাকলি কেন? এখানে এসে মনে হচ্ছে আরামতে এলাম, উকিলদের জেরা শুরু হবে এখনই।

সমীরণের এতক্ষণে সাহস ফিরে এসেছে। সে বলল, ঠিকই ধরেছিস। গোটাকত প্রশ্নের উত্তর দে।

কমল বলল, চেয়ারে বসতে দিবি, না টেবিলেই বসে থাকব?

তুই তো মুক্ত এখন, টেবিল আর চেয়ারে তোর কাছে এখন কিছু তফাৎ আছে কি? অমরেশের দেহ থেকে বেরিয়ে এখনও তোর মুক্তি মিলল না?

মিলল আর কোথায়? আমি তো এখনও অক্সিপিয়ালি অমরেশের মধ্যেই আছি, কারণ ও এখনও আমার মীডিয়ামের কাজ করছে যে। ওর জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত আমার মুক্তি নেই।

এ সব তো জানা ছিল না, ভাই। তুই তা হ'লে ঐ চেয়ারটায় বোস।

একখানা খালি চেয়ার ছিল, বেরিয়ে দিলাম।

কমল সহজেই টেবিল থেকে গ্লাইড ক'রে অত্যন্ত হাল্কাভাবে গিয়ে বসল চেয়ারে।—বলল, ধন্যবাদ।

সমীরণ বলল, এখন তোকে যা প্রশ্ন করি, ঠিক ঠিক জবাব দে। তুই বহুলোক বলেই এতটা দাবী, অন্যের কাছে জিজ্ঞাসা করেও উত্তর মেলে না।

কি জানতে চাস, বল।

এখন কিছু না। হঠাৎ তোকে এমনভাবে পাওয়া যাবে তা আগে ভাবতেই পারিনি, তাই প্রশ্ন কিছুই ভেবে রাখিনি। তবে অভয় দিচ্ছিস যখন, তখন একটি কথাই শুধু মনে আসছে, তোদের জগৎটা কেমন, একটুখানি বল।

এ আবার কেমন প্রশ্ন? এর উত্তর দিতে পাঁচ সাত দিন লাগবে। তার চেয়ে কোনো একটা বিশেষ বিষয়ের প্রশ্ন কর। চলতি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। আর আমি বক্তাও নই, লেখকও নই যে একটানা বর্ণনা ক'রে যাব।

আমি সমীরণকে বললাম, কমল ঠিকই বলেছে। আচ্ছা, আমি না হয় প্রশ্ন করি। আচ্ছা তোদের তো ওখানে মুক্ত জীবন, যা চাস, মানে যা খেতে চাস তা পাস? প্রশ্নটা বড়ই স্থূল হ'ল, খাওয়ার প্রশ্ন, তাতে কিছু মনে করিস না, তাই কমল।

মনে করব কেন। যা চাই তা সব সময় পাই না। এক এক সময় এমন হয়, কোনো জিনিস ভীষণ খেতে ইচ্ছা হচ্ছে, অথচ ঠিক সেই সময় সেটি পাওয়া যায় না।

জল খেতে ইচ্ছা হয় না?

ভীষণ। মাঝে মাঝে মনে হয় জিভ, গলা, সব শুকিয়ে পরম বালির মতন হয়ে গেছে। যেন সাহারা মরুভূমির একটা ছোট্ট টুকরো দিয়ে জিভ তৈরি হয়েছে। এমন অবস্থায় ঘরময় ছটফট করতে থাকি। তারপর কিছুক্ষণ পরে যখন যেমন ক্লান্ত—

আমি বাধা দিয়ে বললাম, বুঝতে পেরেছি তখন জল পাস, কিন্তু দেহ ক্লান্ত হয় কি ক'রে? তোদের তো দেহ নেই।

ঐটে তোর ভুল ধারণা। দেহ একটা না থাকলে তোরা আমাকে দেখছিস কি ক'রে? দেহ মানে কর্ম। চিত্রশিল্পের ভাষায় বলছি। কর্ম, তবে অ্যাবস্ট্রাক্ট কর্ম। আকারের নির্যাস বলতে পারিস। তোদের সব অতি-আধুনিক শিল্পীদের হাতে যে কর্ম তৈরি হয়, তার চেয়ে একটু ভাল। তবে আমাদের দেহ ধরা-ছোঁয়া যায় না—মাত্র সেই দিক দিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টের সঙ্গে কিছু মেলে।

সমীরণ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বেঁচে থাকতে তো তুই মাছের খুব ভক্ত ছিলি, ওখানে নিশ্চয় যত ইচ্ছে খেতে পাচ্ছিস?

কমল বলল, প্রশ্নটি খুবই আত্মিক জগতের উপযুক্ত। এর চেয়ে ভাল কিছু মনে এলো না? তবু জিজ্ঞাসা করছিস যখন, বলি। খাওয়ার কথার সব প্রশ্নেরই এক উত্তর। খেতে পাওয়া যায় না। লোভ কোনো রকমে দমন ক'রে প'ড়ে থাকি। যারা পারে না, তারা ভূত হ'য়ে মাটিতে নেমে এসে খেয়ে যায়। তারা খাওয়া ভিন্ন আর কিছু বোঝে না।

শুনে বড়ই দুঃখ হ'ল।

কমল বলতে লাগল, আরও অনেক অভাব আছে, কিন্তু পূরণ করতে পারি না।

আর কি অভাব?—জিজ্ঞাসা করল সমীরণ।

কেন খুঁচিয়ে বা'র করছিস সব? সব ভুলে থাকি, এক রকম ভালই থাকি। তোরাও ভালই আছিস। আমাদের কথা কি সব শুনতে ভাল লাগবে?

এ কথায় আমার কৌতূহল আরও বেড়েই গেল। কমল কি যেন বলতে চায় অথচ সঙ্কোচে বলতে পারছে না। পরলোকের কথা তো চিরদিনই গোপন আছে আমাদের কাছে। সুতরাং এই উপলক্ষে যদি লৌহ যবনিকাটা একটুখানি উঠে যায়, তা হলে মস্ত বড় একটা লাভ হবে আমাদের। তাই কমলকে বললাম ভাললাগা মন্দলাগার প্রশ্ন নেই, তুই বল। তুই যে কথাটা চেপে যাবার চেষ্টা করছিস, সেটা যত দুঃখের হোক প্রকাশ ক'রে ফেল।

কমল চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। আমাদের দেয়াল আলোর নিচে, আগেই বলেছি। তাই কমলের দেহের ভিতর দিয়ে সবই দেখা যাচ্ছিল। কমলের ডানদিকে ছিল কমলের মীডিয়াম অমরেশ—তার অচেতন দেহটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম।

কমল প্রায় দুমিনিট চুপ ক'রে রইল। কি যেন চিন্তা করল এতক্ষণ। তারপর একটু একটু ক'রে অস্থিরতা প্রকাশ করতে লাগল। সমীরণ আর আমি হন বন্ধ ক'রে অপেক্ষা করছি।

কমল খুব গম্ভীরভাবে এবং আস্তে আস্তে বলতে আরম্ভ করল।

আমার কষ্ট হবে, তবু কৌতূহল নিবৃত্ত হোক তোদের। শোন, জীবনের যা কিছু কাম্য, সুন্দরকে, রহস্যময়কে উপভোগের ইচ্ছা, স্বাধীনভাবে খাব, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াব, মুক্ত জীবনের সকল সুবিধা অবাধে ভোগ করব, এমনি প্রথমে মনে হয়েছিল ও-জগতে গিয়ে। কিন্তু সবই অলীক। সুন্দর একটি ফুল দেখলাম, মনে হ'ল ওর ঘ্রাণ নিই, কিন্তু ওর কাছে যেতে পারি না। লোভনীয় সব খাদ্য সামনে, অথচ খেতে পারি না। মনের মতন সঙ্গিনী পাই না, আলাপ করতে না করতে কোথায় যে মিলিয়ে যায়। ভাল বই পড়তে ইচ্ছা হয় মাঝে মাঝে, যথেষ্ট বই আছে, কিন্তু ছোঁয়া যায় না। সুন্দর সবুজ ঘাস আছে, কিন্তু তার উপর বসা যায় না। যথেষ্ট ভালবাসা আছে, পাওয়া যায় না। মেয়েরা হুড়াহুড়ি, কিন্তু মনকে স্পর্শ করে না। আকাশে রঙীন মেঘ, কিন্তু তার দিকে চাইলে কোথায় মিলিয়ে যায়। পাখীর ডাক কানে আসে না—

কমল চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। তারপর অস্থিরভাবে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কতবার তার দেহ ধূমকেতুর পুচ্ছের মতন আমাদের দেহকে আচ্ছন্ন ক'রে, ভেদ ক'রে বেরিয়ে গেল, স্বচ্ছ অবয়ব, আমরা তার কোনো স্পর্শই পেলাম না। ভয় হ'ল এ অবস্থা দেখে। কোন্ দুর্বল স্থানে আঘাত করেছি তার?

কমল এইভাবে ছটফট করতে করতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, সমস্ত ছবিটা ভাসিয়ে দিলি তোরা—মনটা বড় অস্থির হয়ে উঠেছে। বন্ধুত্বের কোমল স্পর্শ সেখানেও নেই, এখানেও নেই, সব সুদূর, সব অনাত্মীয়।

কমল এইখানে থেমে হাঁফাতে লাগল।

আমি বললাম, তোদের এত দুঃখ জানতাম না।

সমীরণ বলল, তোর কথায় বড় বেদনা পেলাম রে, কমল। আগে জানলে এ প্রসঙ্গ তুলতাম না।

কমল আবার উত্তেজিত হয়ে উঠল। সমীরণের কথার উত্তরে এবারে সে যা বলল, তাতে একটা চাপা বিদ্রূপের সুর। বলল, আমার কথা শুনে তোদের খুব করুণা হচ্ছে, না? খুব কৃপা করতে ইচ্ছা হচ্ছে, না?

খুব।—আমরা দুজনে একসঙ্গে ব'লে উঠলাম।

কমলের সুর এবারে আরও কড়া। বলল, তোদের অবস্থার সঙ্গে তুলনা ক'রে আমার দুর্দশা আরও বেশি মনে হচ্ছে, না?

কমলের কণ্ঠ শুধু নয়, ঐ সঙ্গে তার স্বচ্ছ দেহটাও এবারে আন্দোলিত হ'তে লাগল। হঠাৎ এত রেগে যাওয়ার কারণ আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

কিন্তু এর পর যা ঘটল তা আরও ভয়ঙ্কর।

কমল অত্যন্ত কড়া সুরে বলতে লাগল, বুঝলি, আমি তোদের সহানুভূতি, করুণা, কৃপা, এ সব সহ্য করতে পারছি না। কারণ আমি জানি কি না যে ঐ কথাগুলো তোদের বলা শোভা পায় না।

কিছুই বোঝা গেল না কমল কি বলতে চায়। খুব সম্ভব ও আবেগের সঙ্গে যা ব'লে যাচ্ছিল তাতে বাধা পেয়ে ক্ষেপে গেছে, অথবা ওর মনে যে আমাদের চেয়ে অনেক উঁচুতে এ বিষয়ে ওর একটা অহঙ্কার জন্মেছে, তাই সহানুভূতির কথায় রেগে গেছে। ও হয় তো ভাবছে দয়া ক'রে এতখানি যে আমাদের কাছে প্রকাশ করেছে এটা ওর অনুগ্রহ, তাই আমাদের করুণা ওকে পীড়া দিয়েছে।

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি হঠাৎ এত কঠিন হয়ে উঠলে কেন, কমল?

কমল বলল, ওসব কথা এখন থাক। আমাকে উত্তেজিত করেছিস তোরা।

কমল হাঁফাতে লাগল। তারপর কয়েক সেকেণ্ড পরে হঠাৎ খুব নরম ক'রে বলল, তোরা আমাকে বলবি, তোরা কি সুখে আছিস? যা চাস তা তোরা পেয়ে থাকিস?

চমকে গেলাম এ প্রশ্নে। না, পাই না, এ ভিন্ন আর কিছু বলা গেল না।

কমল ভাল ভাবেই বলল, আমাকে যা যা জিজ্ঞাসা করেছিস, পাল্টা আমি সব তোদের জিজ্ঞাসা করছি, বল, আমি যা পাই না তোরা তা পাস কি না। তবে বল।

কিন্তু তবেও অন্য কিছু বলা গেল না।

কমল বলল, সব মরীচিকা মনে হয় না? যা কিছু ভাল মনে হয় তা নাগালের বাইরে মনে হয় না? আর তা যদি হয়, তা হলে আমাকে করুণা করছিলি কেন? কিসের অহঙ্কারে?

আমি বললাম, না ভাই, অহঙ্কার নয়। অন্যের দুঃখের কথা শুনলে তখন সাময়িক ভাবে নিজের অবস্থাটা ভুল হ'য়ে যায়। তাই হয়তো সহানুভূতির সুর ফুটেছে কথায়।

সমীরণ বলল, একটুখানি অহঙ্কার আছে বৈ কি। তোর অবস্থা থেকে আমাদের অবস্থা একদিক দিয়ে কিছু উন্নত।

কি সে?—কমলের স্বরে এবারে উত্তেজনা কম।

সমীরণ বলল, বেশি কিছু না, আমরা বেঁচে আছি, আর তুই ম'রে ভূত হয়েছিস।

তাই না কি? এতেই অহঙ্কার? কিন্তু এ অহঙ্কার আমি এখুনি ভেঙে দিতে পারি।

কথাটা শুনে আমরা দুজনে চমকে উঠলাম। বলে কি? ঘাড় মটকাবে না কি?

কিন্তু না। কমল বলল, যা জানাতে চাইনি, তাই তোরা জোর ক'রে জেনে নিচ্ছিস আমার কাছ থেকে। শোন, তোরা যে অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিস, সে অবস্থায় কেউ বেঁচে থাকতে পারে না।

সে কথা সত্যি।—সমীরণ বলল।—বেঁচে থাকা আমাদের উচিত নয়।

উচিত অনুচিত নয়। তোরাও আমারই মতন মৃত।

সমীরণ হো হো ক'রে হেসে উঠল। বলল, ভূতেরও মাথা খারাপ হয় জানতাম না।

কমল চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল আমাদের দিকে। সেকেণ্ড গেল, মিনিট গেল। ঘণ্টাও যাবে না কি? না, ঘণ্টা কাটল না। তবে অনেকক্ষণ লাগল তার কর্তব্য স্থির করতে। মিনিট দশেক মোট।

কিন্তু সবই মিটে গেল। নিজেদের অহেতুক কৌতূহলে যে সত্য জানা গেল, তার পরে

আর কোনো কথা থাকতে পারে না। কমলের প্রেতদেহ এগিয়ে এলো আমার কাছে। এসে আদেশের সুরে বলল, গায়ের জামা খুলে ফেল।

তার দিকে চেয়ে যা দেখলাম তাতে এ আদেশ অমান্য করা আমার সাধ্য ছিল না। কারণ জিজ্ঞাসা করার সাহস ছিল না। নীরবে গা থেকে জামা খুলে ফেললাম।

তারপর আমাকে অচেতন অমরেশের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াতে ব'লে সমীরণকে কাছে ডাকল। কাছে এলে তাকে আদেশ দিল একে পিছন দিক থেকে জড়িয়ে ধর। 'একে' মানে আমাকে। তারপর সমীরণকে বলল, ওর পিঠের সঙ্গে তোর দুটো চোখ চেপে রাখ। সমীরণ আমার পিঠে চোখ চেপে রাখল। কিন্তু তার নাক আমার পিঠে লেগে থাকাতে এমন সুড়সুড়ি লাগছিল যে নড়ে নড়ে উঠছিলাম। কমল সমীরণকে বলল, দেহের ভিতর দিয়ে বাইরে কিছু দেখা যাচ্ছে?

আবছা কি যেন।

ভাল ক'রে দেখ।

হ্যাঁ, এইবার অমরেশকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু খুব স্পষ্ট নয়।

সমীরণের এ কথায় আমার সমস্ত দেহ হিম হয়ে এলো। আমার দেহের ভিতর দিয়ে আর এক জনকে দেখা যাচ্ছে? কি ভয়ানক ব্যাপার!

কমল এর পর সমীরণের জামা খুলিয়ে আমাকে তার পিঠের সঙ্গে চোখ লাগিয়ে দাঁড়াতে বলল। আমিও ঠিক ওর মতোই দেখলাম। দেখলাম সমীরণের দেহ প্রায় স্বচ্ছ।

কমল আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, এইবার বুঝতে পারলি?

কি বুঝতে পারলাম? কি বলছিস তুই?

যে তোরাও মৃত—ঠিক আমারই মতো। তবে এখনও সম্পূর্ণ নয়, এখনও দেহ তোদের কাঁচের মতন স্বচ্ছ হয় নি, এখনও একটুখানি অস্বচ্ছ আছে। বলেছি তো, তোরা যে যুগে বাস করছিস, সে যুগে তোদের মতন লোক সম্পূর্ণ বেঁচে থাকতে পারে না।

শুনে আমাদের দুজনেরই মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল, চারদিকে যেন অন্ধকার নেমে আসছে, সমস্ত গা ঘেমে উঠছে। তবু দেখতে পেলাম, কমল অমরেশের অচেতন দেহের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, আমি চললাম, অমরেশ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই জেগে উঠবে, ওকে সব বলিস, কারণ অমরেশও বেঁচে নেই, তোদের মতনই সেও আধা স্বচ্ছ দেহ নিয়ে জীবিত মনে ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কমলের প্রেতদেহ চকিতে অমরেশের দেহের ভিতর ঢুকে গেল। সে তখুনি আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠল, কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে আমরা দুজনে অচেতন হয়ে মাটিতে প'ড়ে গেলাম।

ঈর্ষা

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

সই বকুলমালা কাশীঘাটে দেবী দর্শন করতে এসেছেন। সপ্তাহ শেষ হয় হয়,—কমলের বাসাতেই রয়েছেন। আজ দক্ষিণেশ্বর, কাল বাগবাজারের মদনমোহন, তার পরদিন চিত্তেশ্বরী কালী, আর একদিন হাওড়ার হাজার হাত কালী···এমনি ঘুরে ঘুরেই দিন কাটছে। ইতিমধ্যে বার দুই সিনেমাতেও গেছেন। এখনও দু'একটা প্রোগ্রাম বাকি রয়েছে—সেগুলি শেষ না করে এখান থেকে নড়বেন না। নড়বেন না—কারণ কমলের সংসারটি ওঁর ভাল লাগছে। দিব্য ছোটখাট নিখুঁতটি সংসার। কর্তা আর গিন্নিতে মিলে খুশিতেই আছেন। একটি মাত্র ছেলে—থাকে বিদেশে। বদলির চাকরি—এদেশ সেদেশ করেই কাটে—কলকাতায় বাড়ীতে স্থিতু হবার আশা কম।

বাড়ীটা অবশ্য খুব বড় নয়। তাহলেও তিন চারটে নাতি-নাতনী নিয়ে ছেলে আর বউ যদি এখানে থাকত—বাড়ীটি ভরাট থাকত, কিন্তু এমন নিরিবিলি থাকতো না। শান্তিই কি থাকতো। না—তাও থাকতো না। নিজের সংসার দিয়েই বুঝছেন বকুলমালা—তা থাকে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ী ভরিয়ে রাখে যে পরিমাণে—বুড়োদের মনকে ভারিও করে তোলে সেই মাপে। ওটা ওদের ধর্ম—ওই হৈ হৈ হট্টগোল, দুষ্টুমি, জিনিসপত্র তছনছ করা—জপে পুজোয় বিঘ্ন ঘটানো, শুধু শুধু যায় না—কান্না, প্রতিবেশীদের ঘরে উৎপাত—কত কি। এছাড়া উৎকণ্ঠায় দিনরাত কাঠ হয়ে থাকা। কোন্‌টা জ্বরে পড়লো, কার সর্দি বা পেট খারাপ হ'ল, কে আছাড় খেয়ে হাত পা ভাঙল—কে রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল—হাজার রকমের দৈব উৎপাত—সাবধান হয়েও ঠেকানো যায় না। উৎকণ্ঠা হয়ে দুপুরে বিশ্রাম হয় না ভাল করে, রাতে দু'চোখের পাতা এক করা যায় না। জ্বালা কি কম।

এই সবও তবু সহ্য হয়—বউদের বাঁকা কথা—বাঁকা চলন—বাঁকা ব্যবহার—অসহ্য! কথায় বলে, উড়ে এসে জুড়ে বসা। এ হলো গিয়ে ঠিক তাই। ক'টা বছর আগে কোথায় ছিল বউরেরা, কোথায় নাতি-নাতনীর দল! উনিই নিজের সাধ মেটাতে তিন ছেলের বিয়ে দিয়েছেন। নিজেরা কাশীবাস করবেন—এই ভরসায় বউদের হাতে সংসারের ভার তুলে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু সে সাধ আর মিটলো কই! বাবা বিশ্বনাথ তো টানলেনই না—বউরাও হাতে তুলে দেবার আগেই সংসারকে টেনে নিলে নিজের নিজের দিকে। যে যার ঘর ভাগ করে নিলে, কাজ ভাগ করে নিলে, স্বামীদের উপার্জনের টাকাও। ছেলেরা টুঁ শব্দটি করল না। এখন রান্নাঘর একটাই আছে বটে—তা সেটা হ'ল গিয়ে অন্নক্ষেত্র। যার যখন খুশি এসে আসনে বসছে, বউরেরা ভাত বেড়ে দিচ্ছে—ছেলেমেয়েরা খেয়ে উঠে ইস্কুলে যাচ্ছে। সারাদিনই অন্নক্ষেত্র আগলে বসে থাকেন বকুলমালা। এই অন্নক্ষেত্রের খাওয়াটা ওদের নিয়ম রক্ষা মাত্র—পিত্ত রক্ষার ব্যাপার। আসল আহার অন্যত্র, আপরুচি খানা। ঘরের দুয়োরে যেমন খিল আছে—সংসার থেকে নিরিবিলি হবার সুযোগ আছে—তেমনি উনুন আলানোর হাঙ্গামা না পুইয়ে রসনার রসদ

যোগানোও খুব সহজ। হাঙ্গামা কিছু নাই—একটা স্টোভ কিনে নিলেই খিল-আঁটা ঘরের বাইরে মাংস ডিমের গন্ধ, লুচি পরোটা ভাজুয়ার গন্ধ—হেলেভাজা: যেমনি ঝুলুরির গন্ধ পাওয়া যায়। বকুলমালা এসব নিয়ে হৈ চৈ করেন না—কোন পরাজন—কি মকর—কি খোজ ওয়াটারের কাছে চুপি চুপি গল্প করেন। সেই গোপন কথাটা আবার পাক খেতে খেতে ফিরে আসে তাঁরই সংসারে। তখন সংসার হাটবাজারের চেয়েও হৈ হৈ হট্টগোলে ভরে ওঠে। কি আর করেন—মনের দুঃখ মনেতেই চেপে রাখেন বকুলমালা। কিন্তু এখন থাক এসব কথা।

কমলকে এই ক'দিনে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সংসার সমাচার শুনিয়েছেন এবং উপসংহার করেছেন এই বলে, ওদের ঘর সংসার বুঝুকগে ওরা—আমার কি। একদিন না একদিন তোদেরই তো সব হবে—তবে এত ঘাটাঘাটি কেনেকারী কেন?

গলা নামিয়ে বলেছেন, আমার কি বলবার এক্তিয়ার নেই? এই সংসার কি তোরা বাপের বাড়ী থেকে আঁচলে বেঁধে এনেছিস? নিজের গতর দিয়ে পয়সা দিয়ে; কতদিনের সাধ আহ্লাদ একত্র করে যেটা গড়ে তুললাম সেটা কার হকের জিনিস একবারও ভাবিস নে তোরা। হাড়ের কলি!

কমল বেশী কথা বলেন না।...তবু পরামর্শ দিয়েছেন, শোন ভাই সই—তুই বরঞ্চ কাশীতেই গিয়ে থাক—শান্তি পাবি।

বকুলমালা মাথা নেড়েছেন, শান্তি, না কচু! নিজের বাড়ীঘর ছেড়ে স্বর্গে গিয়েও সুখ নেই, কিন্তু সেই বাড়ীতে আমি ভিটেতে পারছি নে। তোর এখানে দিনকতক বরং জিরিয়ে যাই। আহা—কি চমৎকারই না আছিল ভাই। দেখে হিংসে হয়!

তা বেশ তো—থেকেই যা না হয়।

না ভাই, কপালে কি তেমন সুখ আছে—পোড়া মন যে শত্রু। সবাইকে পার আছে—মনকে বোঝানো দায়। আসব বইকি—মাঝে মাঝে আসব। মনটা হাঁকপাক করলেই আসব। শান্তির সংসার তোর—শান্তিতে থাক।

বকুলমালার আলা জুড়িয়ে গেল কিনা, সেই জানে। কমলের মনে দুই একটা কাঁটা বিঁধিয়ে রেখে গেল। এখন চলতে ফিরতে সেগুলো প্রায়ই খচ্ খচ্ করে বিঁধছে। যে ছবিটা বকুলমালা এঁকে রেখে গেছে—তার সবখানিই দৃষ্টিকটু নয়—খানিকটা চেয়ে দেখতে সাধ হয়। ছেলেপিলের ভরা জমজমে একটি সংসার—হোক না হাটের কোলাহল—হাটও কি সংসারীর মনকে কম টানে! প্রায়ই ভাবেন কমল—সেই স্বাদটা কেমন?

একদিন বিকাশবাবু একখানা চিঠি হাতে করে কমলকে বললেন, একটা সুখবর আছে। একটা প্রমোশন পেয়ে খোকা বদলি হয়ে আসছে।

কমলের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বললেন, কোথায় বদলি হ'ল?

এইখানে। অক্টোবর থেকেই চার্জ নেবে।

কমল বললেন, আমি মা কালীকে পুজো পাঠিয়ে দিই।

বিকাশবাবু বললেন, সে যা হয় করো—আপাতত এদিকের একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

কি ব্যবস্থা?

বলি বাড়ীঘর এমনি করে রাখলে তো চলবে না—বাইরের ঘরটা অন্তত সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। পাঁচজন সম্ভ্রান্ত লোক এসে বসবেন তো।

কমল বললেন, আর খোবার ঘরটাও বদল করতে হবে। আমাদের এই রক্ষিণখোলা বড় ঘরটা মনে করছি ওদের জন্ত থাক। তুমি কালই মিস্ত্রি ডাকিয়ে খোলা কেয়ারার ব্যবস্থা কর।

খোলা কেয়ারালে হবে না, সেট করিয়ে নেব। হাজার হোক, অফিসারর। সব আসবেন—

দু'জনে মনের মত করে সাজালেন বাড়ীখানা। এতো আর সহাগঞ্জি আপিসের কেরানীর বাড়ী নয়—এটা এখন হাকিম সাহেবের কুঠী।

অপাত্তি সুরু হল নাতি-নাতনীদের নিয়ে। ওরা খুঁত খুঁত করতে লাগল। বাড়ীতে মন নেই—খেলা করব কোথায়?

কমল বললেন, কেন, ছাদে গিয়ে খেল গে।

ছাদে কখনো বল খেলা হয়! আর এই এক রত্তি ছাদ!

তা কি করবি ভাই—তোদের বাড়ীটাই যে একটুখানি।

বউ অণিমা বলল, ছোটবেলা থেকে খোলামেলা মনে খেলাধুলো করছে তো—তা এদিকে পার্ক-টার্ক নেই?

সে অনেকখানি দূর। ছেলেমানুষ ওরা—

অণিমা বলল, তা হোক ছেলেবেলা থেকে দূরে যাবার অভ্যাস থাকা ভাল। এখনকার দিনে ঘরকুণো হয়ে বসে থাকলে চলে না। আপনাদের সময়ে ভারতবর্ষ ছিল পরাধীন—দূরদূরান্তরে যেতে চাইত না কেউ।

কমল বললেন, হাঁ, কর্তারা বলতেন, অর্থনী অপ্রবাসী যারা—তারাই সুখী।

অণিমা হেসে বলল, অথচ দেখুন আজকের দিনে ওই ছুটো মটোই অচল! অপ্রবাসী হলে কেরিয়ার গড়ে ওঠে না। অর্থনী হলে আর্থিক অনটন ঘটবেই।

কমল বললেন, অপ্রবাসী হলে উন্নতি হয় না—এটা না হয় হলো, কিন্তু টাকার অসচ্ছল হলেই তো মানুষ ঋণ করে।

অণিমা বলল, আমাদের রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁদের ধারণা আলাদা। দেখছেন তো, কোটি কোটি টাকা ঋণ না নিলে ভারতবর্ষের এমন উন্নত অবস্থা কি হতো? আমেরিকা, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মেনী—কোথায় না হাত বাড়াচ্ছে দেশ।

কমল বললেন, এইসব বড় বড় ঋণের কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না। আমরা জানি, সংসারে ধার দেনা হলে সেটা সম্মানের কথা নয়।

অণিমা হেসে বলল, না মা, মানে সম্মানের স্টাণ্ডার্ড সব কালে এক থাকে না। ইংরেজদের কথাই ভাবুন—ওরা কম মান সম্মান নিয়ে এদেশে বাস করত না। অথচ প্রত্যেকেই কোটী কোটী টাকা লোন নিয়েছে। আসলে কেমন করে কি স্টাইলে থাকছে মানুষ সেইটির উপরই নির্ভর করে মান সম্মান।

কমল আর কথা বাড়ালেন না। কেমন ক্লান্তি বোধ করলেন। ভাবলেন, এইসব কথা—কিংবা চালচলন এদের নিজস্ব নয়। ওরা শুনে শিখেছে। ইংরেজ আমলে যা ছিল সম্মানের—আজও তার

ফের টেনে চলেছে উপরতলার মানুষগুলো। ওরা বলছে, ছোট বাড়ী, ছোট উঠোন, ছোট ঘরে বাস করলে মানুষও ছোট হয়ে যায়। এই কি সত্য? কে জানে!

যাই হোক, একদিন কালীঘাটে ধুমধাম করে পুজো দিয়ে এলেন। আর একদিন সবাইকে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে। ছেলেরা তো মহাখুশি। অণিমাও খুশি।

অণিমা বলল, নিজেদের মোটর থাকলে রোজ রোজ এমনতর জায়গায় বেড়ানো যেত। একটু থেমে বলল, ওঁর ইচ্ছে একখানা গাড়ী কেনেন, কিন্তু রাখবার জায়গা কোথায়?

কমল বললেন, ঘোড়া হলে কি চাবুকের অভাব হয়। গ্যারেজ ভাড়া নিলেই হল।

অণিমা মাথা নেড়ে বলল, না—সে ভারী বিশ্রী দেখাবে। তার চেয়ে কোয়ার্টারে রাখা ভাল।

কোয়ার্টার—সে কোথায়?

আপনি জানেন না বুঝি—ওঁরা যে কোয়ার্টার পেয়ে থাকেন। যিনি ছিলেন এখানে—আসছে মাসে কোয়ার্টার ছেড়ে দেবেন—আমরা ইচ্ছে করলে সেটা নিতে পারি। হয়তো নিতেই হবে—কেননা, কোয়ার্টারে থাকাই নিয়ম।

কমলের মুখে ছায়া নামল—কোন কথা বললেন না।

কমল বিকাশবাবুকে বললেন, খোকারা তো এখানে থাকছে না, মিছিমিছি এতগুলো টাকা খরচ করে ঘর মেরামত করালে।

বিকাশবাবু বললেন, কেন আমাদের কি ভাল ঘরে বাস করতে নেই।

কমল বললেন, সত্যিই কি ওরা এ বাড়ীতে আর আসবে না?

কেন, ইটালার করলে—আসবে না তো যাবে কোথায়? আমরা আসিনি?

কমল নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের কাল আর এখনকার কাল কি এক!

বিকাশবাবু হেসে বললেন, মিথ্যে ভাবনা তোমার। আমরা মানে মধ্যবিত্তরা সবকালেই সমান।

না—এক নয়। মাথা নাড়লেন কমল। তোমার চাকরির সঙ্গে খোকার চাকরির আকাশ পাতাল তফাৎ। খোকা তো কেরানী নয়।

বিকাশবাবু চুপ করে গেলেন। শুধু বললেন, বুঝলাম।

কি বুঝলে? ঈষৎ উত্তেজনা ধরা পড়ল কমলের স্বরে।

বিকাশবাবু বললেন, ওরা এই বাড়ীতে আর আসবে না।

কোয়ার্টারে যাবার আগে অণিমা বলল, মা, আপনাদের কিন্তু প্রতিদিন যাওয়া চাই—না হলে জীবণ খারাপ লাগবে। গাড়ী পাঠিয়ে দেব।

গাড়ী পাঠাবার কি দরকার—একখানা গাড়ী ডাকিয়ে—

না মা, ট্যাক্সিতে করে যাবেন না, ঘরের গাড়ী যখন রয়েছে।

কমল বললেন, কিন্তু কখন তোমাদের গাড়ী আসবে—কখন আমাদের সুবিধা হবে—এসব ঠিক না হলে—

অণিমা বলল, কেন, আপনাদের কাছে খবর নিয়েই গাড়ী পাঠাব। ফোনে ঠিক করে—

ফোন !

ফোনের ব্যবস্থা তো আপনার ছেলেই করছেন।

কিন্তু এ বাড়ীতে আবার ফোন কি হবে।

বাঃ, আপনারা বুড়ো মানুষ, একলা থাকবেন – খবরাখবর না করলে আমাদের মন ঠিক থাকবে !

কমল মনে মনে খুশি হলেন। ওরা দূরে যাচ্ছে বটে, মনটাকে এইখানেই রেখে যাচ্ছে। বকুলমালার বউয়েদের মত স্বার্থপর বউ নয়, ছেলেদের মত কঠিন হৃদয় নয়।

আশীর্বাদ করলেন প্রাণ খুলে।

ওরা চলে গেলে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এতদিন ওরা ছিল না—খালিই ছিল বাড়ী, তবু এমনধারা খালি যেন ছিল না। তখন ওরা ছিল অনেক দূরে—নাগালের বাইরে—চিঠির মারফৎ খবর আসত, মন ভরে উঠতো। এখন হাতের কাছেই টেলিফোন—যে কোন সময়ে ওদের গলার আওয়াজ পাওয়া যায়, তবু মন ভরে না। মনে হয় ওরা অন্য একটি গ্রহে বাস করছে। আশ্চর্য, এমনি ধারা চিন্তাই ক'দিন ধরে পেয়ে বসেছে কমলকে—ওরা ভিন্ন গ্রহের মানুষ। ওরা অন্যকালের মানুষ !

নাতি-নাতনীরা প্রায়ই আসে। সভ্য—শান্ত শিষ্ট। সাজিয়ে গুজিয়ে সকলের সামনে বা'র করে বুক ফুলে ওঠে। সকলে শতমুখে প্রশংসা করে। কিন্তু অপরের প্রশংসায় লোভ দিন দিন কমে আসছে কমলের। ওরা ছুটোপাটি ছুটুমি করে না, অভব্য ভাষায় গাল দেয় না, পরস্পর মারামারি করে না—যেমন শুনেছেন বকুলমালার নাতি-নাতনীরা করে। বকুলমালার বাড়ীর মত এই বাড়ীটা তিন টুকরো হয়ে অশান্তির আগার হয় নি। এমনি শান্তি উনি চিরকালই চেয়েছেন। পেয়েছেনও ভাগ্যগুণে।

তবু মন কেমন করে—। কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে—কি যেন পেয়েও পাননি—এমনি অভাবে ছটফট করেন।

অমনি কোয়ার্টারে ছোটেন। কিন্তু তৃপ্তি পান না। সে যেন নিজের বাড়ীতে নিজের নাতি-নাতনীদের নিয়ে মশগুল হওয়া নয়। সাধারণ বেশভূষায় সেখানে যাওয়া চলে না। নাতি-নাতনীরাও ফিটফাট পোষাকে সেজে সামনে আসে। ঠাকুরমাকে সভ্যতব্য হয়ে প্রণাম করে—আগে কোলে উঠবো বলে আবদার করে না—কিংবা ঝাঁপিয়ে পড়ে না কোলে, কিংবা 'গল্প বল' বলে উত্যক্ত করে তোলে না। ওরা লাফালাফি দৌড়োদৌড়ি করে না—ঝগড়া খুনসুটি করে না—দিব্য শান্ত সুবোধ ছেলেমেয়ে। লেখাপড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে গড়গড় করে বলে যায়—খেলাধুলোর কথায় জবাব দেয় চটপট ; বিশ্ব রাজনীতির দু'একটি খুঁটিও কপচাতে পারে অপেক্ষাকৃত বড়রা। কিন্তু এসবে খুশি হবার কি আছে ! যার যা প্রকৃতি—আসল রূপটাই তার মানান। ছেলেমেয়েরা যদি কোলাহল না করল প্রকৃতির অর্ধেক সৌন্দর্যই তো মাটি। বাড়ীতে যদি কচি ছেলেমেয়েরা দাপাদাপি না করল—সে বাড়ী তো পাতালপুরী !

আজকাল বাড়ীটাকে মনে হয় ঘুমন্ত রাজকন্যার পাতালপুরী।

কমল হাঁপিয়ে ওঠেন। ওদের ফোন করেন গাড়ী পাঠাতে। মোটরে উঠবার পর থেকেই গম্ভীর হয়ে যান। মোটরে ঘরে ফেরে মানুষ—সে আনন্দে মন ভরে, কিন্তু ঘর থেকে বা'র হয়ে সেই মোটর যদি আর একটি বাসাবাড়ীতে কি বাংলোয় এসে থামে—থাকুক সেখানে আত্মীয়-স্বজন—সেটাকে

কি বাসগৃহ ভাবা যায়। সে বাড়ীতে আপন নাতি-নাতনীদেরও সোজা বলতে যায়। ওদের সঙ্গে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়—সমীহ করে আলাপ করতে হয়। একটু এদিক ওদিক হলেই ওরা হেসে বলে, এটা কিন্তু ভুল বলছেন ঠাকুমা, বিজ্ঞান বলে—

হ্যাঁ—বিজ্ঞান অনেক কিছুই জানিয়ে দিচ্ছে। চোখে-দেখা বস্তুকে বলছে—ওটা রং নয়, কানে-শোনা শব্দকে কঠিন কঠিন কথা দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করছে, মনের আনন্দকে কিংবা চোখের জলকে এক একটি নামের ক্রিয়া বলে বস্তাৎ করে দিচ্ছে। যে বস্তু বাস্তব দুষ্টিকে মোহাচ্ছন্ন করে—তার পরতে পরতে যুক্তির ছুরি চালিয়ে জন্মের সঙ্গে পাওয়া সংস্কারকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে নির্মমভাবে। বিজ্ঞান এক সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে অন্য সত্যকে উৎখাত করছে! কমল ভাবেন—এ কেমন দিনকাল এলো—খোলা ছাদের আড্ডিনায় চাঁদের আলোয় সর্বাঙ্গ মেলে দিয়ে রূপকথায় আসর জমানো যাবে না।

কমলের উন্মনা ভাব লক্ষ্য করে একদিন বিকাশবাবু বললেন, চল, দিন কয়েক না হয় কোনখানে ঘুরে আসি।

কোথায় যাবে? নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধোলেন কমল।

পশ্চিমে কোন তীর্থে, পাহাড়ে, কিংবা—

না—অতদূরে ভাল লাগবে না।

তবে এই বাংলার মধ্যে কোন জায়গায়—

কমল উৎসুক হয়ে উঠলেন। যাবে? সত্যি? আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? সেই তো কতদিন থেকে বলছে তাদের দেশে যেতে। যাবে?

কিন্তু—সন্ধ্যায় যাওয়া সেখানে ঠিক হবে কি?

তা বটে। খানিকক্ষণ, ভাবলেন কমল। বললেন, তা এক কাজ করা যাক—আমিই ঘুরে আসি দিন কতকের জন্যে। তুমি বরঞ্চ কোয়ার্টারে গিয়ে থাক। কেমন?

বিকাশবাবু বললেন, সেই ভাল। আমি বাড়ীতেই থাকব—ওদের ওখান থেকে খাবারটা আনিয়ে নেব।

কমল বললেন, তা আমিও তিনদিনের মধ্যে ঘুরে আসছি।

তিনদিনে ফিরতে পারলেন না কমল। জায়গাটা ভালই লাগল। কলকাতার তুলনায় নিরালা নিঃঝুম, কোন সময়েই কাজের তাড়া নাই। কলকাতাতেও ইদানীং কাজের তাড়া ছিল না, কিন্তু ঘড়ির কাঁটায় বাঁধা ছিল সময়। শয্যাত্যাগ—গৃহকর্ম—স্নান পূজা—রান্না খাওয়া—শয়ন নিদ্রা—সবই ছিল নিয়ম বাঁধা। সকাল থেকে রাত নটা দশটা পর্যন্ত একই নিয়মের পুনরাবৃত্তি প্রতিদিন। এখানকার ধরণটাই আলাদা। বিশেষ ওঁর হাতে কোন কাজ নেই—শুধু এঘর ওঘর করে বউদের সঙ্গে গল্প করা—আর ছোট ছোট বাচ্চাদের দাবখানে বসে শহরের গল্প বলা। পুকুরঘাটে স্নানে এসে কি কম সময়টা যাচ্ছে। আবার বিকেলে একটি সরু পথের দু'ধারে ঘন আস্‌শ্যাওড়ার ঝোপ ঠেলে এ-বাড়ী ও-বাড়ী ঘুরে আসা। পথে গাড়ীঘোড়া নেই—মানুষজন নেই—আদিকালের পৃথিবী কয়েকটি মানুষকে নিয়ে অগাধ আলস্যে শুয়ে আছে।

একটা জিনিস কিন্তু মিলছে না। বকুলমাসী যে গল্প করে এসেছিল—এখন মনে হচ্ছে—সেটা নেহাৎই গল্প। এত বড় বাড়ীটায় বউয়েরা আর নাতি-নাতনীরা যদি না থাকে ত নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ এই জগৎটা কি ভয়ঙ্কর হয়েই না উঠতো!

এখানে কমলের কাজ ছিল না, অবকাশও ছিল না। ছেলেমেয়েরা না ঘুমুনো পর্যন্ত সর্বক্ষণই ওঁকে ঘিরে রয়েছে। খালি হুকুম হচ্ছে—গল্প বল—গল্প বল।

এত অফুরন্ত কৌতূহল ওদের চোখে, জিজ্ঞাসারও শেষ নাই। তারপর? তারপর? পৃথিবীটা সেই কোন্‌কালে কখন চলতে সুরু করল, থামতে পারল না আজও—তেমনি অক্লান্ত ওরা। বকুলমাসী ধমক দিচ্ছেন—আর দিনরাত্তির জ্বালাচ্ছিস কেন মানুষটাকে? তোদের জ্বালায় কি একদণ্ডও জিরোবে না!

কমল হাসিমুখে বলছেন, তা হোক সই, এখান থেকে চলে গেলে ওদের আর কোথায় পাব বল?

তাই বলে এত চটকাচটকি ভাল নয়—তুই তো সত্যিকারের তুলোর বস্তা মোস্!

তা হোক সই—ক'টা দিনই বা। যখন গল্প বলতে পারিনে ওদের হুকুম করি পাকা চুল তুলতে। কুড়িটা পাকা চুলে একটা করে পয়সা।

তখনলাভ ওদের কাছ থেকে কাঁচা পেয়ারা চেয়ে নিয়ে খেয়েছ?

কুলের সময় হলে কুলও চেয়ে নিতাম।

মরণ তোমার! ছেলেমানুষের সঙ্গে খালি ছেলেমানুষী! ভালও লাগে!

খুব ভাল লাগে সই—ইচ্ছে করছে খেকে যাই এখানে।

তাই থাক—আমি বরঞ্চ তোর সংসারে গিয়ে মিরিমিলিতে জিরিয়ে আসি। কেমন, থাকতে পারবি তো কত্তাটিকে ছেড়ে?

কমল হেসে বললেন, বয়েছি না দশ দিন।

তা রয়েছ—কেননা মনে মনে জানছ এখানে চিরদিন থাকবে না। যদি জানতে এই দেশ ছাড়া গতি গত্যা নেই—তখন কেমন মন টিকতো দেখতাম।

কমল ভাবলেন—এই কথাই কি সত্য!

আরও দিনকয়েক থেকে কমল কলকাতায় ফিরলেন। নিঃসঙ্গ নিঃশব্দ প্রকৃতির কোল থেকে শব্দ-কোলাহলময়ী পৃথিবীতে। পথঘাট বাড়ীঘর আকাশ বাতাস সর্বত্রই চঞ্চল জীবন-রঙে ভরা। অথচ এই সবও একটি জীবনের রঙ্গমঞ্চে আশ্চর্যভাবে স্তম্ভিত গতিহীন হয়ে গেছে।

বাড়ীটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিল। একটু জিরিয়ে নিয়েই কোয়ার্টারে চলে গেলেন।

অনেকদিন পরে ওদের দেখলেন,—কুশল প্রশ্ন করলেন। নাতি-নাতনীরা ছুটে এসে ওঁকে জড়িয়ে ধরলো না—ভব্যবেশে সামনে এলো। প্রণাম করে বেশ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইল। ওঁর গল্প শুনতে শুনতে অদম্য কৌতূহলে অধীর হয়ে বলল না, তারপর? তারপর?

ঘণ্টা দুই ওখানে কাটিয়ে দিয়ে এলেন। নিঃশব্দে বোটবে উঠলেন, সারা পথ একটিও কথা কইলেন না।

মোটর থেকে নামতে বিকাশবাবু বললেন, তোমাকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আজ এতটা পথ এসে ওখানে না গেলেই পারতে।

কমল বললেন, না, তাতে কি। ভালই আছি।

তবে? সইয়ের জন্যে মন কেমন করছে বুঝি?

বিকাশবাবুর কৌতুকোজ্জ্বল প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কমল গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি ভাবছিলাম আর একটা কথা। ভাবছিলাম—সই এখানে এসে আমাকে মিথ্যে কথাটা বলে গিছল কেন?

মিথ্যে কথা! বিস্মিত হলেন বিকাশবাবু। কি কথা?

কমল বললেন, মিথ্যে নয়! এই আমাদের বাড়ীটা খুব ভাল লাগছে—বেশ নিরালা আশ্রমের মত। হৈ হৈ হট্টগোল নেই। মনে হচ্ছে এখানে সারাজীবন থাকি। কি সব আজে বাজে কথা বল তো?

বিকাশবাবু কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন কমলের দিকে।

কমল একটু হেসে বললেন, ভারি আশ্চর্য হয়েছ নয়? সইয়ের বাড়ীতে না গেলে বুঝতে পারবে না—কেন বলছি এ কথা। ওই পাড়াগাঁয়ে অমন একটি সংসার যদি না থাকতো তাহলে আমি তো পাগল হয়ে যেতাম! সত্যি—সই কিন্তু সুখেই আছে! কি চমৎকার ওর সংসারটি!

বিকাশবাবু হেসে বললেন, ও, সইয়ের উপর হিংসে হচ্ছে বুঝি?

কমল যেন চমকে উঠলেন। মুখখানা ওঁর বিবর্ণ হয়ে উঠলো। তাড়াতাড়ি বললেন, হিংসে! না, না। ভাল লাগা মানেই বুঝি হিংসে করা! না, না।—

বিকাশবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, আরে—ঠাট্টাও বুঝলে না—কি ছেলেমানুষ তুমি!

কমলের চোখে জল এসেছিল—উনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। কথাটা এমন কিছু নয়—ওটা মনে করবেন না ঠিক করেই চটি জুতোর শব্দ তুললেন। কিন্তু সেই শব্দের তালে তালে কেবলই মনে হতে লাগল এই শান্ত নিস্তব্ধ পুরী—প্রাণ-উত্তাপহীন পরিবেশ—নিরালা গৃহকোণ···এই শান্তির কামনাই কি করেছিল বকুলমালা? এমন শান্তি! না—না, কখনই নয়। এ সত্য নয়। এমন সংসার মেয়েরা কখনই চায় না—চাইতে পারে না।

———

চুলসম্বন্ধে
কি খুব
চিন্তিত?

লক্ষ্মীবিলাস আপনার
সকল সমস্যার
সমাধান করবে।

লক্ষ্মীবিলাস
তৈল

এম. এল. বসু এণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস :: কলিকাতা—৯

খেলা ভাঙার খেলা

ভবানী মুখোপাধ্যায়

আনন্দ পাওয়ার অনেক পথ, চিত্তবিনোদনের জন্য শহরের চারিদিকে কত প্রমোদশালা রয়েছে। কিন্তু মন খারাপ করার ইচ্ছা থাকলে যে কোন মানসিক হাসপাতালে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসতে পারেন। কেউ বলে, মেনটাল হসপিটাল আর কেউ বলে, লুনাটিক এসাইলামে। শেষের নামটা কিকিং রুঢ়, কারণ সোজাসুজি পাগল বলা হয়েছে। যদি জানতাম যে এখানকার দৃশ্য এবং শব্দ আমার আহার, নিদ্রা, আগ্রহ সবই বিষাক্ত করে তুলবে তা হলে কোন দিনই আমি ও পথ মাড়াতাম না।

করিডোর চমৎকার, মর্মর শুভ্র চকচকে মেঝে, ঝকঝকে দেওয়াল, কিন্তু এই পরিচ্ছন্ন পরিবেশেও শান্তি নেই। মনে হল শিয়ালের ডাক যেন শোনা যাচ্ছে। কাছাকাছি জলাভূমি আছে হয়ত। অস্পষ্ট স্পষ্ট নানা রকমের আওয়াজ। একদিন জেনে এসেছি বাষাকণ্ঠ শিশুকে ঘুম পাড়ানোর গান গায়, কিংবা প্রিয়জনের মনে আনন্দ জাগায়। শান্তি ও স্বস্তির নিরাপদ আশ্রয়। সেই কণ্ঠস্বর যে এত বীভৎস, এত কুৎসিত, এত তীক্ষ্ণ হতে পারে তা কে জানতো। যেন অরণ্য-শকুনের ক্রন্দন।

এই করিডোর পার হয়ে প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম। চোখে পড়ল মুস্ত্রী শ্রেণীর একটি বারান্দায় থালি পায়চারী করছে। বড় জোর তেইশ কি চব্বিশ বয়স। আশপাশের পরিবেশে তার ভ্রূক্ষেপ নেই, অত্যন্ত অন্যমনস্ক মনে সে পায়চারণা করছে। বিড় বিড় করে কি বলছে, কাঁদছে আর বেগুনি রঙের শাড়িতে চোখ মুছছে। ডাঃ মিস্ মিত্র আমাকে বললেন, মেয়েটি কইবাতুর থেকে এসেছে, বড় ঘরের মেয়ে।

পশ্চিমের বারান্দায় মানসিক দুর্দশার চরম নিদর্শন। আকারে তারাও নারী বটে। হয়ত এরা অতি ভয়ানক প্রকৃতির, তাই খাটের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে তাদের পা বাঁধা।

কাছাকাছি কেউ যদি আসে বা চলে যায়, এদের অনেকের চোখ জলে ভরে ওঠে। মানসিক বিকৃতি বা প্রেম শুধু মেয়েদের চোখে এমন গভীর ভাবে ছায়াপাত করতে পারে মনে হল। সজল চোখের কি করুণ আকৃতি। প্রেমও কি পাগলামির সমগোত্রীয়ভূত, কে জানে?

এই সব চোখের ভীড়ে, দুটি চোখ আজো আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে। মেয়েটি ষষ্ঠদশী। যৌবন যাই যাই করেও এখনও যেতে পারে নি। সে চিৎ হয়ে তার খাটিয়ায় চুপ করে পড়ে আছে। সে চোখে কি দীপ্তি! কি মদিরতা! যেন বিদলিত করুণার উলঙ্গ। অথচ তীব্র, যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে সন্ধানী আলো। তার দৃষ্টি আমার দিকে পড়ল, তারপর মনে হল সে যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে, যেখানে যাই সে যেন পিছনেই আছে।

পরিচ্ছন্ন ছোট্ট ঘর। এই হাসপাতালের কেবিন। একটি ক্যাম্বিসের খাট, তার ওপর সুন্দর সুজনী ঢাকা। বিছানার ওপর সাগরতরঙ্গের মত ঘন কালো ছড়ানো রয়েছে, মাটিতে বসে মেয়েটি বিছানায় মাথা গুঁজে মুখ লুকিয়েছে।

ডাঃ মিস মিত্র স্নেহভরে অনেকক্ষণ রোগীকে ডাকলেন—রত্না! রত্না!

কোনও সাড়া নেই। ডাক্তার এইবার আরও জোরে ডাকলেন—রত্না, ঘুমোলে নাকি!

এতক্ষণে সে শুনতে পেয়েছে। মাথাটি ঘুরিয়ে আমাদের দিকে মুখ ফেরাল, যেন শরতের মেঘমুক্ত আকাশ। সেই কালো চুলের রাশির মধ্যে যেন একটি বিকশিত পদ্ম।

উঠে বসে হাত দুটি জোড় করে আমাদের নমস্কার জানালো রত্না। তারপর চুলগুলি জড়ো করে তাড়াতাড়ি একটা এলোখোঁপা বেঁধে নিল।

তেমন লম্বা নয়, নিটোল মেয়ের বাঁধুনী। সুন্দর যৌবনপুষ্ট দেহ। চোখের কোলে কালো ছায়া। পরনে একখানি নীলাম্বরী। গায়ে একটি হলুদ রঙের স্লিভলেস ব্লাউজ। দেখে মনে হবে যেন একটি বিয়োগান্ত নাটকের নায়িকা।

ডাঃ মিস মিত্র প্রশ্ন করলেন—কেমন আছ রত্না? যেন কোন কোনও বন্ধুকে কুশল প্রশ্ন করছেন, রোগিনীকে নয়।

রত্না এই প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললে, ইনি কে দিদিমণি? আমাদের সার্কাস পার্টি এখন কোথায় ইনি বলতে পারবেন?

ডাঃ মিস মিত্র বললেন আমার পিসতুতো ভাই, এ দেশে বেড়াতে এসেছেন। তোমাদের কোম্পানীর কথা ওর জানা নেই।

—দিদিমণি, ওঁকে একটু জিজ্ঞেস করো না ভাই, জানেন কি না বলা যায় না।

ডাঃ মিস মিত্র আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—'গ্রাণ্ড ভ্যারাইটি সার্কাস' এখন কোথায় খেলা দেখাচ্ছে জানো নাকি?

নামটা আমার অপরিচিত নয়। স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। মনে পড়ল হাওড়া ময়দানে যে বছর 'গ্রাণ্ড ভ্যারাইটি' খেলা দেখায় আমি সপ্তাহে দুবার করে যেতাম।

বেশ বড় দরের সার্কাস। প্রায় দশ-বারোটি হাতি, বুকের ওপর পাথর চাপানো একটি মেয়ে, বাঙালীর মেয়ে পুতুল পালিত। তারপর বাঁদরের খেলা, সাইকেল, চমৎকার ক্লাউন, সবাই হেসে গড়িয়ে পড়তো। সিংহের খাঁচায় পার্বতীবাঈ সিংহবাহিনী সেজে বসতো, সবাই চেঁচিয়ে উঠতো, পয়সা ফেলিও দিত কেউ কেউ! তারপর ট্রাপিজের খেলা। নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতাম আমরা কি হয়! কি হয় ভাব! মনে পড়েছে এতক্ষণে।

আমার সামনে যে বসে আছে এই সেই ট্রাপিজের মেয়ে রত্নাবাঈ, তখন বয়সটা আরো কিছু কম ছিল অবশ্য। আমি সহসা প্রশ্ন করে বসলাম, কিঞ্চিৎ অসতর্কভাবেই বললাম, আপনি ত' ঘোড়ার ওপর ডিগ্‌বাজি খেতেন, ট্রাপিজে দুলতেন, আপনি রত্নাবাঈ?

বাস্! আর যায় কোথা। প্রচণ্ড জলস্রোতের বাঁধ সহসা ভাঙলো। রত্না বলে উঠলো—আমিই তো! আমি সেই রত্নাবাঈ। কেউ পারে অমন খেলা দেখাতে? কেউ পারবে? আপনিই বলুন না। রাজা-মহারাজারা কি শুধু শুধু অত সোনার মেডেল দিত। কি ভীড়টাই না হতো। আমি রিং-এ এলে কি হাততালিই না পড়ত। ঘোড়াগুলো যেন কলের পুতুল, আমার কাছে কি লক্ষ্মীই না থাকত। কোম্পানী দুহাতে টাকা লুটেছে। একবার ঘোড়া থেকে পড়ে তিনমাস হাসপাতালে

ছিলাম। সার্কাস উঠে যাওয়ায় জোগাড়। প্রফেসর শাখমুতি রোজ হাসপাতালে আসত খবর নিতে। এখন? এখন কি হল? সেই শয়তান মাগীটাই এই সর্বনাশ করেছে। দেখবেন ওর কি হয়। শাস্তি ওকে পেতেই হবে। কি মিসিমণি! শাস্তি পাবে না?

কথাগুলি বলার সময় মেয়েটির সমগ্র মুখভঙ্গী আশ্চর্য রকম বদলে গেল। ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় অমন মুখ কি বিশ্রী হয়ে ওঠল। চোখ দুটো সাপের চোখের মত জ্বলতে থাকে। ডাঃ মিস মিত্র আমাকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এলেন।

ঘরের ভিতরে জিনিসপত্র ছুঁড়ছে রত্না। জানলার শব্দ করছে, যেন উন্মত্ত ঝড়ের মত সারা হাসপাতাল কাঁপিয়ে তুলেছে।

সারাদিন ধরে রত্নাবাঈ-এর সেই অমন চোখ আমার শান্তি বিঘ্নিত করেছে, চোখ বন্ধ করেও যেন তার সেই দৃষ্টি আমাকে তাড়া করছে। এই মানসিক হাসপাতালে আসাটা আমার উচিত হয়নি। অবশেষে কেবল মনে হয়, কে উন্মাদ আর কেই বা উন্মাদ নয়। শেষ পর্যন্ত নিজের মধ্যেই লক্ষণ সন্ধান করি, কোন রকম উন্মাদের লক্ষণ আছে কি না, মনে হয় সবটাই যেন মানসিক বিকৃতি।

সন্ধ্যার পর বারান্দায় বসে চা পান করতে করতে ডাঃ মিস মিত্রকেই প্রশ্ন করলাম—ওই সার্কাসের মেয়েটা কিভাবে হাসপাতালে এল?

তিনি হেসে বললেন, কার কথা বলছ? রত্নাবাঈ? ও অনেক কথা। তোমাদের মত কবি-টবি নিয়ে এই মুশকিল। দেখলে এই পর্যন্ত। তার আবার জের টানা কেন?

—বুঝলেন না, এসব হোল প্রোফেসন্যাল সিক্রেট।

—যা হোক তোমায় স্নেহ করি তাই ওর কথা কিছু বলছি; কিন্তু দেখ বাপু, তুমি যেন পাঁচ জায়গায় এ গল্প করে বেড়িয়ো না।

"সাত-আট মাস আগে, আমি তখন ডিউটিতে, রত্নাকে নিয়ে একটা ষ্টেশন ওয়াগন কম্পাউণ্ডে ঢুকল। সার্কাস কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার শাখমুতি আরও দু-চারজন সঙ্গে। প্রচণ্ড শক্তি ওর শরীরে তখন, রীতিমত চেন দিয়ে বাঁধা। গাড়ি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছে বার কয়েক। অতিকষ্টে তো গাড়ী থেকে নামান হল, তারপর ওদের সেই চারজন আর আমাদের দুজন ওয়ার্ডার মিলে ওকে নামাল। তার আগে হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরো তিন সপ্তাহ কেদে রাখতে হয়েছিল। এমনই দুর্দান্ত।

শাখমুতি লোকটা ভালো, প্রচুর পয়সা। মেয়েটিকে নিজের মেয়ের মতই ভালোবাসে, কে জানে নিজের মেয়ে কিনা। অনেক টাকা জমা রেখে দিয়েছে, ওর যত্ন বা সেবার যেন এতটুকু ত্রুটি না হয়।

শুনি ট্যারাইটি সার্কাসের উন্নতির মূলই নাকি রত্নাবাঈ। ওর জোড়ার খেকেই সার্কাসের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। তারপর এল নারায়ণস্বামী।

—নারায়ণস্বামীটি কে?

—বলছি, অধৈর্য হও কেন? নারায়ণস্বামী ট্রাপিজের খেলা দেখাতো, সে এসেছিল মহীশূর

থেকে, গায়ের রঙ একেবারে কাঁচা সোনার মতো, তেমনই উজ্জ্বল স্বাস্থ্য, চমৎকার মাংসল, খালি গায়ে দাঁড়ালে একটা দেখবার মত শরীর।

—মনে পড়েছে, ট্রাপিজে যে ওর সঙ্গে থাকতো।

—হাঁ, শেষ খেলাটাই ওদের। দিন দিন সার্কাসে ভীড় বাড়তে থাকে, হাজার হাজার দর্শক একেবারে পাগল। টিকিট সব সোড়াতেই শেষ।

নারায়ণস্বামী আর রত্না ক্রমে ঘনিষ্ঠ হল, পরে প্রেম। সার্কাসের তাঁবু দেখে বিদেশে ঘুরে বেড়ায়, দিনে দিনে রত্না ও নারায়ণস্বামীর প্রেম ঘনীভূত হয়। ভ্রাম্যমান সার্কাস ওদের প্রমোদভূমি। জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য। ডাঃ মিস মিত্র একটু থামলেন। আমি মনে মনে নারায়ণস্বামীর আকৃতি কল্পনা করতে লাগলাম—সুন্দর টাইট পোষাক, বুকে অসংখ্য মেডেল, মুখে হাসি, নারায়ণস্বামী।

এইভাবে বেশ চলছিল, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটলো। নারায়ণস্বামীর এই খেলার সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ছেলেও ছিল, সে ছোটোখাটো খেলা দেখাতো। সে ছেলেটি একদিন এ্যাক্সিডেন্টে পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত পাটা বাদ দিতে হ'ল।

ছেলেটির বদলে একটি মেয়ে এল। কমলকুমারী।

কমলকুমারীকে দেখেই রত্নাবাঈ ভাবল এ একটা অশুভ লক্ষণ। কমলকুমারী সুন্দরী, বয়সও কম। সুশীলা, নম্র এবং বিনয়ী।

নারায়ণস্বামী গলে গেল। কমলকুমারী নারায়ণস্বামীর চাইতেও কোন দিক দিয়ে কম নয়। ট্রাপিজের খেলায় তার অপূর্ব কৃতিত্ব লক্ষ্য করে বিস্মীত হল নারায়ণস্বামী। একটা ট্রাপিজ থেকে অন্যটায় এত দ্রুত যেতে পারতো কমলকুমারী যে, পাখীতেও অমন পারেনা। অথচ রাজহংসীর মত দীর্ঘ এবং মহিমামণ্ডিত ভঙ্গিমা। রত্নাবাঈ ম্লান হয়ে গেল।

নারায়ণস্বামী এখন কমলকুমারীকে নিয়েই মাত। রত্নার প্রতি নজর কমে এল, হয়ত আকর্ষণও!

রত্না যখন দেখলো নারায়ণস্বামী ক্রমে তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, স্ত্রীলোকের হাতে যতরকম অস্ত্র ছিল সবই সে ব্যবহার করল। নারায়ণস্বামী হেসে উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, মাঝে মাঝে রত্নাকে একটু আদর করে, গালটা নেড়ে দেয়, মাথার খোঁপাটা টেনে দেয়। কিন্তু, তার মধ্যে প্রাণ নেই। তারপরেই সে আবার কমলকুমারীকে নিয়ে নতুন খেলার প্ল্যান সম্বন্ধে আলোচনা করে।

প্রতিদিনকার রিহার্সেলের সময় ওদের প্রতিটি ভাবভঙ্গী লক্ষ্য করত রত্না। এরা একটা নতুন খেলা সুরু করেছিল, সেটা আগেকার দিনে ছিল না। দূর থেকে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে নারায়ণস্বামীর বুকে পড়ত রত্না। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণস্বামী এবং কমলকুমারী যুগলে ছুটে অন্য দাঁড়ে চলে যেত। নীচে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখা ছাড়া রত্নার আর কোনো ভূমিকা ছিল না। প্রথম প্রথম কমলকুমারী নারায়ণস্বামীর বুকে এসে এক সেকেণ্ডের বেশী থাকত না, ক্রমে এই অবস্থিতির কাল দীর্ঘতর হতে থাকে। বেশ কয়েক সেকেণ্ড। অনেক সময় বুকে মুখ লুকিয়ে রেখে হাঁফায়।

আমি প্রশ্ন করলাম—তাহলে আস্তে আস্তে ট্রাপিজের খেলা থেকে সরে আসছে রত্নাবাঈ?

ডাঃ মিস মিত্র বললেন, এক রকম তাই। শুধু ঘোড়ার খেলা ছাড়া রত্নার আর তেমন কাজ নেই।

রত্না একদিন বলেই বসল নারায়ণস্বামীকে, ছিছিভাই রতনভাই নামক পার্শী ভোপ্পানীর 'গেট এশিয়ানে' যোগদানের জন্য।

নারায়ণস্বামী জবাবে বলে, ছিঃ বিশ্বকর্মাবাবী করা ঠিক নয়।

সেদিন চাঁদের আলোয় চারধার ভেসে যাচ্ছে, শো বন্ধ আছে, পরদিন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রদেশপাল উভয়েই আসবেন। মানসিক শান্তি নেই, তাই অনেক রাত পর্যন্ত চোখে ঘুম নেই। মনে হল কোথায় কে যেন কথা বলছে। পা টিপে টিপে গিয়ে নারায়ণস্বামীর ক্যাম্পের কাছে গিয়ে যা শুনলো তাতে তার মাথা ঘুরে গেল।

নারায়ণস্বামী রত্নার সম্পর্কেই যা তা বলছে কমলকুমারীকে।

কমলকুমারী নারায়ণস্বামীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে তাই মন দিয়ে শুনছে।

তুমি ভাবছো, এত কথা কি করে জানলাম? তাই না? যে সব অসংলগ্ন কথার টুকরো শুনেছি তাই জোড় করে কেস তৈরী করতে হয়েছে। এই ভাবেই তো কেস ফিল্ম গড়া হয়। মানুষের মন বড়ো সূক্ষ্ম, বড়ো অসুখ। একটুতেই ভেঙে যায়, আর জোড়া যায় না।

তার পরদিন বিশেষ রজনী।

যথা সময়ে শো আরম্ভ হল। গ্যালারী পরিপূর্ণ, কোথাও তিল ধারণের স্থান নেই। এমন কি মাটীতে পর্যন্ত সতরঞ্চি পেতে দেওয়া হয়েছে। বেঞ্চে ছোট ছেলেমেয়েদের ভীড, চেয়ারে কত রঙের শাড়ী। বম্বে শহরের যত ধনীদের আগমন। সার্কাসের উজ্জ্বল আলো তাদের অলঙ্কারে বিচ্ছুরিত হয়ে এক বিচিত্র শোভা সৃষ্টি করেছে। সার্কাসের ব্যাণ্ড বেজে উঠল, এক অপূর্ব পরিবেশ। খেলা সুরু হবে এখনই, সবাই উৎসুক। প্রদেশপাল এলেন, লাল কার্পেট বিছানো পথে অতি গম্ভীরভাবে তিনি এগিয়ে এলেন, সঙ্গে অমাত্যবৃন্দ। শো আরম্ভ হল।

প্রথমে ছোট ছেলেমেয়েদের খেলা। তারা যাওয়ার পর মোটর সাইকেলের খেলোয়াড়। মহাভীম লোহার শিকল ছিঁড়ে ফেলল অতি সহজে, বুকের ওপর কয়েক টন পাথর চাপানো হল, মোটর পর্যন্ত থামালো। প্রচণ্ড হাততালি।

প্রোপ্রাইটর প্রোফেসর শাশ্বমূর্তির মতে শুধু রত্নাবাই-এর খেলাটি কিছুতেই জমল না। শাশ্বমূর্তি পাশ থেকে বার বার বলেন, একটু হাস, একটু মাথা নোয়াও, কে কার কথা শোনে। রত্না যেন সেদিন এ জগতে আর নেই।

সিংহ, চিতা, ক্লাউন, হাতী সবাই এল একে একে, হাততালি নিয়ে চলে গেল। ভালই হল, প্রদেশপাল আর মুখ্যমন্ত্রী ঘন ঘন হাততালি দিলেন।

তারপর সর্বশেষ খেলা। প্রফেসর শাশ্বমূর্তি চশমাটি ঠিক করে নিয়ে রিং-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে বেশ কায়দা করে সুর টেনে টেনে বলে ওঠে—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টেলম্যান, আজ আমাদের মধ্যে রয়েছেন প্রদেশপাল আর মুখ্যমন্ত্রী। কি সৌভাগ্য! এইবার আমাদের শেষ খেলা—ট্রাপিজ।

ব্যাণ্ড নতুন সুরে বাজে, নতুন ঢঙ, বিচিত্র কলরব। পেট্রোম্যাক্সের আলো কপিকলের সাহায্যে অনেক উঁচুতে উঠে গেল। দর্শকবৃন্দ একটু নড়েচড়ে বসলেন—এইবার একটা জোরদার খেলা এবং শেষ খেলা।

নারায়ণস্বামী আর কমলকুমারী পরস্পর হাতের থেকে সরে বেরিয়ে এসে দর্শক সাধারণকে অভিনন্দন জানালো। প্রচণ্ড করতালি ধ্বনিতে সার্কাসের শিবির মুখরিত হয়ে উঠল। কমলকুমারীর অঙ্গে শ্বেতশুভ্র টাইট পোষাক, কমলকলির মতই দেখাচ্ছে। কয়েকটা সোনার মেডেলও গলায় ঝলমল করছে। মাথার ঘন কালো চুল সাপের মত চূড়া করে বাঁধা। মুখে মধুর হাসি।

নারায়ণস্বামীর পরণে একটি কালো রঙের জাঙ্গিয়া। আর তার শুভ্র নগ্ন দেহের উচ্ছল আভা।

দুজনে দুটি ভিন্ন মই নিয়ে ট্রাপিজে উঠল, সার্কাস তাঁবুর সর্বোচ্চ শিখরে। যথারীতি সার্কাস দলের সব খেলোয়াড় নীচে একত্র জড়ো হয়ে এই সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা দেখার জন্যে ভীড় করে এসে দাঁড়িয়েছে।

কমলকুমারী আর নারায়ণস্বামী দুজনেই পরীক্ষা করে নিল ট্রাপিজের দৃঢ়তা।

ব্যাণ্ড সজোরে বেজে উঠল—একদিক থেকে নারায়ণস্বামী অপরদিক থেকে কমলকুমারী দুলতে সুরু করে। নারায়ণস্বামী কমলকুমারীর দিকে এগিয়ে যায়। কমলকুমারী অপরূপ ভঙ্গীতে এগিয়ে আসে। সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে বসে আছে। কখন কি হয়।

কমলকুমারী দুবার সমারসল্ট খেয়ে তৃতীয় রিং-এ এসে নারায়ণস্বামীর বুকে এসে পড়ে আশ্রয় নেবে। বেশ এগিয়ে চলেছে খেলা।

কমলকুমারী এগিয়ে গেল পরবর্তী রিং-এ। জানে ঠিক সেটি কোথায় থাকবে, তাই হাত বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সেখানে রিং নেই।

নীচে সবাই মূক হয়ে বসে আছে। সবিস্ময়ে দেখছে এই দৃশ্য। অতি করুণ দৃষ্টিতে কমলকুমারী দেখছে কোথায় রিং, কেউ আর জানে না তার কিট উপরে সেটা উঠে গেছে—

নারায়ণস্বামী চীৎকার করে বলে ওঠে—চলে এসো। নিজের জীবন বিপন্ন করে কমলকুমারীকে বাঁচানোর চেষ্টা করেও কিন্তু সুফল হলনা।

ট্রাপিজের দোলা খুঁজে না পেয়ে একেবারে পাকা ফলের মত টপ করে পড়লো কমলকুমারী। পড়ার সময় নীচের জালে না পড়ে একটা কাঠের থামের গায়ে গিয়ে পড়ল কমলকুমারী, ফলে প্রচুর রক্তপাত আর কমলকুমারীর অচৈতন্য দেহটা দেখা গেল।

নারায়ণস্বামী সব বুঝেছিল। সে বুঝলো সকলের অজ্ঞাতসারে রয়া নিশ্চয়ই ট্রাপিজটা এমনভাবে সরিয়ে দিয়েছে। নারায়ণস্বামী তাড়াতাড়ি নেমে এল নীচে।

সার্কাসের মধ্যমণি কমলকুমারী শরবিদ্ধ হংসীর মত একপাশে পড়ে আছে। সেই দেহ বুকে করে তুলে নিয়ে রয়াবাঈকে প্রাণ ভরে অভিশাপ দেয় নারায়ণস্বামী। শয়তানী রয়াবাঈ—

সবাই রয়াবাঈ-এর দিকে তাকায়। শয়তানীর মতো রয়াবাঈ মাথার চুল ছিঁড়ছে আর চীৎকার করছে—হাঃ হাঃ হাঃ!

রয়াবাঈ হাসছে আর চীৎকার করছে—হাঃ হাঃ।

একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে, তার আর কোন জ্ঞান নেই। শেষ পর্যন্ত তাকে হাত পা বেঁধে এখানে এনে রাখতে হয়েছে।"

এই বলে থামলেন ডাঃ মিস্ মিত্র।

আমি যেন স্পষ্ট শুনলাম, অদূরে কে চীৎকার করছে হাঃ—হাঃ—হাঃ!

আমি তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলাম। একটু তাজা হাওয়ার একান্ত প্রয়োজন। যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

১৪ ক্যারাট

প্রবোধকুমার সান্যাল

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করি, সম্প্রতি একটি বিয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে পড়া আমার পক্ষে উচিত হয়নি।

গত শ্রাবণ মাসের কথা বলছি। এই ত' সেদিন।

বিষ্টুবাবু আমাদের একটু দূর সম্পর্কের কুটুম্ব, কিন্তু যদিও যোগাযোগের ফলে আমাদের সম্পর্কটায় দূরত্ব বিশেষ আর ছিলনা। যাই হোক, তাঁরই মেজ ছেলে শ্রীমান্ অতীশের বিবাহ ব্যাপারে আমি একটু মাথা ঘামাতে বাধ্য হয়েছিলুম।

বিষ্টুবাবু আমাকে ধরেছিলেন, সে হবেনা বেয়াই, মেয়ে পছন্দর প্রথম ব্যাপারটা তোমাকেই সারতে হবে। আমার বড় বৌমাকে একদিন তুমিই পছন্দ ক'রে এনেছিলে, সে কথা ভুলিনি। বড় বৌমা আমার ঘরের লক্ষ্মী!

আমি বললুম, কিন্তু কাজটা অপ্রিয়, বেয়াই। আমার চোখে অপছন্দ হলে মেয়েপক্ষের পালাপালি ধরে! আর যদি পছন্দই বা হল, সে-মেয়ের গুণপনা কেমন দাঁড়াবে, দেবা না জানন্তি! এসব বড় কুঁকির কাজ, বেয়াই।

তা হোক—বিষ্টুবাবু বললেন, বিয়ে ত' ভাগ্যের খেলা! তুমি আমি কে? বিয়ের ফল কি হবে, কেউ কোন দিন আগে থেকে জানতে পারেনি! আমরা শুধু দেখব ভদ্র বংশের মেয়ে কিনা, আর দেখব শিক্ষা দীক্ষা, ঘর সংসারের কাজকর্ম জানা কিনা। তবে তার সঙ্গে চেহারা ও স্বাস্থ্যশ্রীও দেখব বৈকি। এর ওপর যদি স্বভাব প্রকৃতির কিছু খোঁজ-খবর পাওয়া যায়, তবে ত' সোনায় সোহাগা! সে যাই হোক, বেয়াই—এ মেয়েকে তুমিই আগে দেখবে।

গৃহিণী বললেন, বেয়াই যখন অত ক'রে বলছেন, তুমি রাজি হওনা কেন? চোখের দেখা বৈ ত নয়! তা ছাড়া তোমার ওপর ওঁর যখন এত বিশ্বাস—

বলুন ত' বেয়ান—বিষ্টুবাবু বললেন, মেয়ে দেখতে গেলে ছেলের মা-বাপের চোখে জাল পড়ে যায়। চোখে স্নেহ এসে পড়ে, সঠিক ভাবে মেয়েটিকে খুঁটিয়ে দেখা যায় না! আমার বড় ছেলে জ্যোতিষের জন্য অন্তত কুড়িটি মেয়ে পছন্দ করেছিলুম। কিন্তু বেয়াইয়ের পছন্দে যাকে ঘরে আনলুম, সে আমাদের মাথায় ঘষি—

প্রশ্ন করলুম, এ মেয়েটির সঙ্গে গণ গোত্র ঠিকুজি কোষ্ঠি রাশি চক্র সব মিলেছে?

মোটামুটি এক রকম।

ঘোটক বিচার? লগ্ন নক্ষত্র?

বিষ্টুবাবু বললেন, হ্যাঁ, তা'র জন্যে টোপে পাঠিয়েছি কাগজপত্র! মনে হচ্ছে ওগুলোয় মিলবে।

দু'জনে ছোট বড় ক ইঞ্চি?

তা ইঞ্চি পাঁচেক ত' হবে?

গৃহিণী সহাস্যে কোড়ন দিলেন,—মেয়েটি কি ছেলের চেয়ে মাথায় বড় ?

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল। আমি বললুম, মেয়েটিকে কি কেউ দেখেছে আগে ?

বিষ্টুবাবু বললেন, না বেয়াই, তুমিই দেখবে প্রথম ! শুধু কানে এসেছে মেয়েটি সুশ্রী, ইকনমিকস-এ অনার্স নিয়ে বি-এ পাস করেছে, বাপের অবস্থা মোটামুটি ভাল। দিয়ে-থুয়ে বে' দেবে !

তামাকের গড়গড়ার নলটি মুখ থেকে একসময়ে সরিয়ে দেখলুম, ঘরে গৃহিণী নেই ! তখন একটু চাপা গলায় বললুম, আজকাল বিপত্নীক আর ছাড়া বেমচারীরা সব আইনকানুন চালু করছে। মেয়েপক্ষের ওপর তাদের ভয়ানক দরদ ! নগদ টাকা নেবার হুকুম নেই ! ধরো, মেয়েটিকে যদি একটু কম পছন্দ হয়, তবে কত টাকায় রফা করব ?

বিষ্টুবাবু আমার চেয়েও গলা নামালেন। বললেন, বড় বৌমার বেলায় ত' কিছু নিইনি ! তবে হ্যাঁ, কিছু পেলে মন্দ কি ! ছেলে অমন ভাল চাকরি করে ! দেখতে শুনতে ভাল। মোটা টাকার ইন্‌সুরেন্স করা ! বাপের সম্পত্তি ! হকটা কিসে ? কিন্তু এ নিয়ে আমি কোথাও জানাজানি করতে চাইনে, বেয়াই। আজকাল নাকি শুনি, মোটের ওপর দাগ মেরে পুলিশ লেলিয়ে দেয় !

আমি তামাক টানছিলুম। এবার মুখ ফিরিয়ে বললুম, আহা হা, অত ভাবো কেন বেয়াই ? আইন আছে, ভয়ও আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে। কন্যাপক্ষের ভয়টাকেই ত' কাজে লাগানো চাই ! কোনও মেয়ের বাপ কি চায় বিয়ের দিনে থানা পুলিশের অন্য কাজ ভণ্ডুল হোক ?

তা কথাটা মিথ্যে নয় ! তবে কিনা—

আমি বললুম, ভয় পেলে চলবে কেন ? আর তাছাড়া নগদ টাকাটা তিন-চার হাত ফেরতাই ঘরে হাতে আসবে। আচ্ছা, কত টাকা পেলে তুমি খুশি হয় বল দেখি ? পাঁচ হাজার ? দশ হাজার ?

লোভের স্পর্শে বিষ্টুবাবুর চোখ দুটি বড় মধুর হয়ে উঠেছিল। তিনি মিষ্টকণ্ঠে বললেন, ও দুটোর মাঝামাঝি যা হয় একটা—! সেই যুগ কি আর আছে, বেয়াই ? আগেকার দশ পয়সা এখনকার এক টাকা। তুমি বলছ টাকাটা হাত ফেরতাই ঘরে আসবে ! বেশ, আমার বাড়িতে কেউ না জানে, যদি পাঁচ হাজার টাকাও পাই—আমি শতকরা দশ টাকা কমিশন দিতেও রাজি।

হুঁ,—আমি ভেবেচিন্তে বললুম, একাজে মেয়েপক্ষের আগ্রহ কতটা ?

বিষ্টুবাবু বললেন, সে আর বলোনা বেয়াই, একেবারে ঝুলোঝুলি। পাত্রীর একটি ভাই এসে আমার বাইরের ঘরের চৌকিতে বসে থাকে, কতক্ষণে মেয়ে দেখতে যাব।

বেশ, তাহলে দু' একটা খুঁৎ বার করতে পারলে পাঁচের ওপর আরও কিছু উঠতে পারে।

এমন সময় জলখাবারের থালা নিয়ে আমার সরলপ্রকৃতি গৃহিণী এসে ঘরে ঢুকলেন। হাসিমুখে বললেন, ওঁকে রাজি করাতে পারলেন, বেয়াই ?

বিষ্টুবাবু বললেন, রাজি হতেই হবে, নৈলে এত লোক থাকতে ওঁর কাছেই বা আসব কেন, বলুন ? উনিই আমার ভরসা !

আমি বললুম, তা হলে পাত্রীদেখার দিনটির করো, বেয়াই ? এত ক'রে যখন বলছ—

বিষ্টুবাবু সোৎসাহে বললেন, তা হলে এই সামনের শুক্রবার। দিনটিও বেশ ভাল। ওরা ঝুলোঝুলি করছে এই শ্রাবণেই কাজ সারতে। আমার আর আপত্তি কিসের ? ছেলের বিয়ে বৈ ত নয় ! গলার মালা খুলিয়ে গাড়িতে উঠলেই হ'ল।

আমি প্রবীণ বয়স্ক ব্যক্তি। মেয়েছেলের রূপ দেখামাত্রই চট করে আত্মবিস্মৃত হব, এমন সম্ভাবনা কম। শুধু তাই নয়, আমার মৌখিক অভিব্যক্তি সম্বন্ধেও আমি কিছু সজাগ। অর্থাৎ আমার চোখ দুটি সাক্ষীগোপাল হওয়া দরকার,—আনন্দ, বিরক্তি বা অসহ্য, কোনটার ছাপ চোখে না পড়ে। কন্যাপক্ষ না বুঝতে পারে আমার মনোভাব। আমার দৃষ্টি হবে নির্বিকার। আমার কথাবার্তায় কোনও স্বীকারোক্তি না প্রকাশ পায়।

বিষ্টুবাবু আমার সঙ্গেই ছিলেন। তাঁকেও আমি আগে থেকে সতর্ক করে রেখেছিলুম। তিনিও সরল মতো তাঁর চোখ দুটিকে আসক্তিবিহীন করে রেখেছিলেন। তবে মেয়ে দেখতে আসার আগে ঠিকুজি-কোষ্ঠী এবং রাশিচক্র মিলিয়ে দেখতে পাওয়া গেছে, এ বিয়ে রাজযোটকই হবে। কিন্তু বিবাহের প্রস্তাবটি যদি ভেঙে দিতে হয় অন্য কোনও কারণে, তবে ওই রাশিচক্রর কোনও এক ফাঁক দিয়েই সেটি সম্ভব। আমি তার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলুম।

আমার সম্বন্ধে কন্যাপক্ষ সম্ভবত দু'একটি কথা কোথাও থেকে শুনে থাকবেন, সেই কারণে আসরে গিয়ে বসতেই দেখলুম, উৎকৃষ্ট অমৃরি তামাকসহ একটি নূতন গড়গড়া নলসুদ্ধ আমার সামনে এসে হাজির হল! ওটি দেখে খুশী হলুম বটে, কিন্তু মনে মনে স্থির করেছিলুম, নিজের বিবেককে কোন মতেই ঘুষ খেতে দেবো না; বেয়াইয়ের বিশেষ স্বার্থটি আমাকে দেখতেই হবে।

এক সময় পাত্রী নিজেই দু'টি মিষ্টান্নের থালা হাতে নিয়ে স্মিতমুখে এসে উপস্থিত হল। আমাদের দুজনের চারটি গো-চক্ষু মেয়েটির প্রতি নিবদ্ধ হ'ল। বাইরে আষাঢ়ের রৌদ্র ছিল প্রখর এবং বেলা দশটার রৌদ্র পূবদিকের বারান্দার উপর ঝলমল করছিল। থালা দু'খানা আমাদের সামনে রেখে মেয়েটি আবার দুটি জলের গেলাস আনল। এই সুযোগে দেখতে পাচ্ছিলুম মেয়েটির দেহভঙ্গী, শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের পুষ্টি, স্বাস্থ্যের পরিচয়, দেহগঠনের আঁকবাঁক, হাত-পা চালনার গতি সঞ্চালন, মুখখানার প্রকৃতি এবং চাহনির স্বভাব।

মেয়েটি আমাদেরকে প্রণাম করল গলায় আঁচল দিয়ে। মেয়েটির বাবা ও বড় ভাই সবিনয়ে সামনে বসেছিলেন।

গড়গড়ার নলে টান দিয়ে বললুম, বসো মা—!

মেয়েটি আসন পিঁড়ি হয়ে বসল। গ্রাজুয়েট মেয়েকে ইদানীং বরপক্ষীয়রা কি-কি প্রশ্ন করে অবশ্যই জানতুম। কিন্তু প্রথমেই আমি প্রশ্ন করলুম, কোন্ কোন্ রান্না করতে তোমার বেশ ভাল লাগে, মা?

মেয়েটি বলল, শুক্তো আর ঘন্ট।

গলার আওয়াজটি প্রথম শুনলুম। পুনরায় প্রশ্ন করলুম, কোন্ সাহিত্যটি তোমার বেশি প্রিয়? ইংরেজি, না বাঙলা?

সংস্কৃত।

তা হলে অর্থনীতিতে অনার্স নিলে যে?

মেয়েটি হাসল। ওর দাঁতগুলি দেখার দরকার ছিল। আমার কথার উত্তরে নম্র বিনয়ের সঙ্গে শুধু বলল, ওটা সহজে বুঝি!

হাতের আঙুল, চোখের চাহনি, চিবুক ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে আমি সজাগ ছিলুম, কেননা

আমার নিজের বিবাহকালে এগুলি পরীক্ষা না ক'রে নেওয়ার ফলে আমার দুঃখ গেছে। সুতরাং চোখ পরিষ্কার ক'রে এগুলি লক্ষ্য করছিলুম। এক সময় বললুম, চুলগুলি খুলে দাও ত' মা?

এককালে পাত্রী পছন্দের সময়ে পাড়ার বৌদের কাছ থেকে চুলের গুছি ধার ক'রে এনে কুমারী মেয়েকে খোঁপা বাঁধতে হত। একালে সেই অভ্যাসের কতটুকু আছে জানিনে। কিন্তু এ মেয়েটি মাথার দুটি কাঁটা সরিয়ে নিতেই এক রাশি ঘন কালো চুল যেন উপর থেকে হুড়মুড়িয়ে নিচের দিকে ভেঙে পড়ল! দেখতে পেলুম সব চুলই মেয়েটির নিজের।

মেয়েটির একখানা হাত নিয়ে আমি কতই অবধি পরীক্ষা ক'রে দেখলুম, পেলবতার পরিমাণ কতটুকু! দেখলুম হাতের সঙ্গে মুখের বর্ণের মিল আছে কিনা। বুঝতে পারা গেল, চোরা পাউডারের দ্বারা মুখখানা লেপ্ট করা নয়! না, গালে ও ঠোঁটে রং মাখেনি।

একবার উঠে দাঁড়াও ত' মা!

মেয়েটি সলাজভয় বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল। আমি পাত্রীর পিতার দিকে ফিরে বললুম, পা দুখানি একটু দেখে নেবো।

বেশ ত! দেখবেন বৈ কি।

মেয়েটির পায়ের গোড়ালির থেকে ইঞ্চি ছয়েক অবধি শাড়ির ঝুলটি তুলে পরীক্ষা করলুম, খড়ম পা কিনা, এবং পায়ের ডিমের গড়নটি সুস্থ কিনা! মোটামুটি আমি খুশীই হলুম, এবং এর পরে আমার পরীক্ষাও শেষ হ'ল।

কন্যার পিতা বললেন, কণ্ঠসঙ্গীত এবং সেতারে আমার মেয়ে খুব দক্ষ। সাহিত্য, কাব্য, চিত্রকলা—এগুলি ওর খুব প্রিয়। আর যদি সূচীশিল্প বলেন, তাহলে ওর জুড়ি খুঁজে পাওয়া ভার।

পাত্রী দেখার কাজ আমাদের সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার বললুম, কি বেয়াই, আর কিছু জানবার বা বলবার আছে?

বিষ্টুবাবু বললেন, না, আর কি। সবই ত মোটামুটি একরকম জানা হল! এখন ভবিতব্য।

ওঁরা বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একশ' বার। কা'র হাঁড়িতে কে চা'ল দেয়, কেউ কি জানে? তবে ওই মানুষের সামান্য চেষ্টা—!

আজ্ঞে হ্যাঁ, বটেই ত! সবই প্রজাপতির নির্বন্ধ। হয়ত সবই মিলল, আবার হয়ত সবই ভণ্ডুল হল। ভবিতব্যই মূলাধার। কেউ কি জানে, কা'র জন্যে কোন্ লগ্নের অপেক্ষা? সবই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।

আমি মেয়েটিকে বললুম, তুমি এবার বিশ্রাম করোগে মা! এইটিই ত' মেয়েদের অগ্নি-পরীক্ষার কাল! এর থেকে উত্তীর্ণ হলেই তবে মেয়েদের আসল ভাগ্যলিপির আরম্ভ। তোমার নাম কি মা?

শান্তকণ্ঠে মেয়েটি বলল, মালতী।

বাঃ, বেশ নামটি! আচ্ছা, এবার এসো, মা!

মেয়েটি চলে যাবার পর নিজের মনেই ভাবলুম, এমন সুশ্রী, সুরূপা, স্বাস্থ্যবতী ও সুকণ্ঠী মেয়ে আমার জীবনে অল্পই দেখেছি! কিন্তু আমার মনোভাব কোনমতেই প্রকাশ করা চলবে না। কারণ ওটার সঙ্গে যেন পাওনার অটিল ব্যাপারটি মিলিয়ে রয়েছে

• • • •

মেয়ে পছন্দ হবার পর পাওনা গণ্ডার ব্যাপারটা কি প্রকারে মিটল, কোন্ কথাটা-কোন্ দিকে বাঁক নিল, আমার বাড়িতে ব'সে আলাপে-তর্কে ওটা কি মিটমাট হ'ল কিনা, অথবা সমস্ত কথাবার্তার নিষ্পত্তি ও মীমাংসা হবার পথে কি-কি অন্তরায় দেখা দিয়েছিল, সে-সব কাহিনী পাঁচ জনে না শুনলেও চলবে। কেননা আনুপূর্বিক পরিস্থিতি বিচার ও মীমাংসা করার জন্য আমরা ছিলুম মাত্র দু'জন। অর্থাৎ মূল কথাগুলি শুধু বিষ্টুবাবুর সঙ্গেই আমি আলোচনা করতুম। আমার পক্ষে সুবিধা ছিল এই, বিষ্টুবাবু হ'লেন কিছু সরল প্রকৃতি, এবং তাঁর স্বভাবসরলতার সঙ্গে জড়িয়েছিল কিছু লোভ। সাধারণ মানুষের লোভ একটু থাকে বৈ কি। ও ব্যাপারটা সব আমার হাতেই ছিল।

গৃহিণী উপস্থিত থাকলে আমাদের কথাবার্তার অসুবিধা ঘটত! সেই কারণে কোন কোনও দিন আমরা নিকটবর্তী পার্কে গিয়ে বসতুম।

গিনি সোনার অলঙ্কার ছাড়া এ বিবাহ সম্ভব নয়, অথচ সম্প্রতি চৌদ্দ ক্যারাট্ সোনার হুজুগ চলছে! এ সমস্যার সমাধান হওয়া চাই বৈ কি। পাত্রীপক্ষ সৌভাগ্যক্রমে, সজ্জন পক্ষ। কিন্তু গোপন উপায়ে চল্লিশ ভরি গিনি সোনার অলঙ্কার প্রস্তুত করাতে গেলে মজুরি সমেত সাত হাজার টাকা লাগে বৈ কি। পাত্রীপক্ষ সেই 'গোপন উপায়'টি জানেন না। সুতরাং তাঁরা পূর্বোক্ত পরিমাণ টাকা আমাদের হাতেই দিতে চান্। বিষ্টুবাবু ভীতু মানুষ, অতএব গহনার দায়িত্বটা তিনি আমার ওপরেই তুলে দিলেন। আমার গৃহিণী কেন আপত্তি তুললেন জানিনে। কিন্তু বিষ্টুবাবুর ধারণা, আমিই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি, কেননা আমি একজন বিশিষ্ট সোনা-ব্যবসায়ী, এবং বড়বাজারে অত বড় দোকানের আমি মালিক। আমার সময় কম, কিন্তু বিষ্টুবাবুর পীড়াপীড়িতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এই কাজেনা নিতে হ'ল। গৃহিণী দুঃখিত হলেন।

বিবাহের তারিখ স্থির হয়েছিল শ্রাবণের শেষ বিয়ের দিনটিতে।

এর মধ্যে গৃহিণী আমাকে ব'লে বসেছিলেন, মনে আছে ত, বেয়াইয়ের প্রথম ছেলের বিয়েতে শুধু আমরা বেনারসী দিয়ে সেরেছিলুম? কিন্তু এবারে একটি গয়না না দিলে মুখ দেখাতে পারব না। তোমার কারবারের উন্নতির খবর সবাই রাখে।

বললুম, কী দিতে চাও?

আমি একটি জড়োয়া হার দেবো!

তৎক্ষণাৎ বিজ বিজ ক'রে হিসাব খতিয়ে বললুম, ছয়শ' টাকার কম জড়োয়া হার হয় না, তা জানো?

গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, তুমি আমার চেয়ে বেশি জানো। —এই ব'লে তিনি ভিতরে গেলেন।

ছয় টাকা! আমি তখনই কাগজ-পেন্সিল নিয়ে ব'সে গেলুম। কোন্ অঙ্কের সঙ্গে কোন্ অঙ্কটা যোগ করলুম, কোন্‌টার সঙ্গে কা'র ভাগ দিলুম, এবং সেই ভাগফলটি নিয়ে অপর একটি অঙ্কের সঙ্গে গুণ ক'রে অতঃপর বিয়োগ ক'রে নিলুম,— এ সমস্ত হিসেবটি আমার নিজের। এ অঙ্ক শুধু আমারই জানা! আমি সোহার দোকানের মালিক।

এক ফাঁকে গৃহিণীকে ডেকে আমি বললুম, আজকাল লোকে বিয়েতে কত কি ঘর-বসতি সামগ্রী উপহার দেয়! তুমি এক কাজ করো না কেন? ওই যে টেপ-রেকর্ডারটি তোমার ভাই ইউরোপ থেকে এনে আমাকে উপহার দিয়েছে, ওটা আমার কি হবে? ওইটেই তুমি প্রেজেন্ট করো না?

গৃহিণী বললেন, না, বিনামূল্যে তোমাকে আমি কাজ লাগতে দেবো না।

একটু চোক গিলে একটু বিমর্ষ হয়ে গৃহিণীর অলঙ্কারের প্রস্তাবেই রাজি হতে হ'ল বৈ কি। তাঁর সামাজিক সম্মানের সঙ্গে আমার হার্ডওয়ার ষ্টোর্স-এর মর্যাদা জড়িত। ছ'শ টাকা খরচ আমাকে করতেই হবে।

বলা বাহুল্য, বিয়ের আগের দিন কন্যাপক্ষের বাড়িতে আমাদের তরফের লোক দিয়ে সমস্ত অলঙ্কারাদি পৌঁছিয়ে দিয়ে এসেছিল। আত্মীয়দের পরিচিত স্বর্ণকারগণ অলঙ্কারগুলির উপর অতি চমৎকার পালিশ করেছিল। উপস্থিত সকলেই সুখ্যাতি করেছে।

বিয়ের দিন রাত্রে যারা বরযাত্রী গিয়েছিল, তারা সকলেই পাত্রীটিকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে। মেয়েটি প্রকৃতই সুন্দরী, এবং তার রূপলাবণ্য, শ্রী ও স্বাস্থ্য বিবাহবাসর থেকেই খ্যাতিলাভ করেছে। ওই সঙ্গে আমারও সুখ্যাতি ছড়িয়েছে—ব'ড়ুয়ো বশারের নজর আছে বটে!

কালরাত্রির পরের দিন ফুলশয্যা ও বৌভাত একই দিনে। আমার গৃহিণীর আর বিলম্ব সয়নি। বিষ্টুবাবুর ছোট ছেলে সতীশ তাঁকে নিতে এসে আমার ঘর থেকে মূল্যবান টেপ-রেকর্ডারটি কি যেন উদ্দেশ্যে হাসিমুখে সঙ্গে নিয়ে গেল। ওটা বিক্রি করার জন্য আমি খদ্দের খুঁজছিলুম। যাই হোক, আমার বাতের ব্যামো বেড়েছিল, যেমন সাধারণত বাড়ে বর্ষাকালে—সুতরাং আমার যাওয়া সম্ভব নয়! আমি বাড়ির পাহারায় রইলুম এবং ছেলেপুলে নিয়ে সতীশের সঙ্গে গৃহিণী বেলাবেলি চলে গেলেন বিয়েবাড়ীতে। আমি একপ্রকার অনড় হয়ে পড়েছিলুম বিছানায়। বিষ্টুবাবু সকালের দিকে এসে স্বচক্ষে দেখে গেছেন আমার অচল অবস্থা। তিনি মাথা চাপড়াতে-চাপড়াতে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যার দিকে আমার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন সন্দেশের ঝুড়ি।

রাত এগারোটার পরেও যখন গৃহিণী ফিরলেন না, তখন অবশ্য বুঝতে বাকি রইলনা, অসুস্থ প্রবীণ স্বামী অপেক্ষা নববধূ তাঁর পক্ষে বেশি আকর্ষণীয়। সকালবেলা বিষ্টুবাবু আমাকে বলে গেছেন, বেয়াই, কী আশ্চর্য, বড় বড় কালো চোখ, কী মুখশ্রী, কী সুন্দর মিষ্ট হাসি, কী শান্ত নম্র মেয়ে,—সত্যিই বলব বেয়াই, অনেক ভাগ্যে এমন লক্ষ্মী ঘরে আসে। আমার ছেলেটি নিরীহ, গোবেচারী,—দুটিতে মিলেছে বড় ভাল। একেই বলে রাজযোটক।

বিষ্টুবাবু আনন্দে লাট্টুর মতো ঘুরতে ঘুরতে বাড়ি গিয়েছেন। আর কিছু নয়, আমার মান রক্ষা হ'ল সকলের কাছে!

গৃহিণী বাড়ি ফিরে এলেন পরদিন সকালে। দেখতে পেলুম সঙ্গে এসেছে শ্রীমান্ সতীশ। ছেলেটি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বেশ হাসিখুশী।

সদা বাড়িয়ে আমি বললুম, এসনি বেয়োনা সতীশ, একটু মিষ্টি মুখ ক'রে যাও। তারপর বল শুনি, নতুন বৌদিদি কেমন হল? ওকি, টেপ-রেকর্ডারটা আবার সঙ্গে আনলে যে! কিছু সুবিধে করতে পারনি? আমি ভাবলুম ওটার জন্যে বুঝি খদ্দের পেয়ে গেছ।

সতীশ হাসি মুখে টেপ-রেকর্ডারটি আমার টেবলের ওপর রেখে বলল, ভাগ্যি এখনও বিক্রি হয়নি! আপনি হয়ত শুনে খুব রাগ করবেন, কিন্তু বাপুদিদির পাল্লায় প'ড়ে আমি একটি অন্যায় করেছি, তাইই মশাই!

হাসিমুখে বললুম, কি শুনি?

কেউ টের পায়নি!—সতীশ বলল, ওদের খাটের তলায় এটা রেখে দিয়েছিলুম, আর মাউথ-পীসটা ছিল বালিশের পাশে—ফুল আর মখমলে ঢাকা। আমার দোষ নেই, তাউই মশাই, সব ওই রাণুদির জন্যে। বর-পনে কেউ খেয়াল করেনি স্প্রিংটা লাগানো ছিল সারোয়াত!—সতীশ একেবারে হেসেই অস্থির।

বাহাদুর বটে তোমরা! আমি বললুম।

গৃহিণী হাসিমুখে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, হাঁ, বৌ বটে! চমৎকার! সকলের মুখে সুখ্যাতি! সবাই বলছিল, সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা! ওকি সতীশ, কিছু মুখে দিয়ে যাও? চ'লে যাচ্ছ যে?

না, এখন বলবেন না, গাড়ি দাঁড়িয়ে।—সতীশ বলল, আজ সন্ধ্যের পর রাণুদিকে নিয়ে আমরা সবাই আসব। ভাইবোনেরা মিলে টেপ-রেকর্ড শুনব। এখন কিচ্ছু খাব না। চললুম, তাউই মশাই—

সতীশ দ্রুতপদে বেরিয়ে চলে গেল। গৃহিণী ভিতরে গেলেন তাঁর নিজের কাজে। ছেলে-মেয়েদের ইস্কুল কলেজ জামাই যাচ্ছে বিয়ের হিড়িকে। এখনই তারা বিয়েবাড়ি থেকে এসে পড়বে।

বৃষ্টি নেমেছিল। আহারাদির পর দুপুরবেলা নিরিবিলিতে গৃহিণী এসে সস্তরাত্রির ফুলশয্যা ও বৌভাতের গল্প দিয়ে বসলেন। নববধূর বিনয়নম্র কণ্ঠস্বর নাকি বড় মধুর! মেয়েটির কণ্ঠসঙ্গীত শুনে সকলেই আনন্দে অভিভূত হয়েছিল। পুষ্পালঙ্কারে বিভূষিতা নববধূকে যারা দেখেনি কালকের রাত্রে, তা'রা দুর্ভাগ্য। অতীশ নাকি তার বউকে পছন্দ করেছে। নতুন বউ উপহার সামগ্রী পেয়েছে নাকি অজস্র। অত বৃষ্টিবাদল, তবু লোক হ'য়েছিল প্রচুর। বেয়াই ঘটা করেছিলেন খুব আহারাদির ব্যাপারে।

গল্প শুনতে শুনতে নগদ টাকার পরিমাণটা ভাবছিলুম! ওটা কেউ জানে নি, এবং এই বিবাহের সমারোহের ইতিহাসে নগদ টাকা আদায়ের কলা কৌশলটি উহ্য থেকে গেল। চারদিকে আজ-কাল আইনের কড়াকড়ি, তাই ওটা কারও কানে উঠতে দেওয়া হয়নি।

গৃহিণী প্রাণের আনন্দে বিয়েবাড়ির গল্প ক'রে যাচ্ছিলেন। আমিও যে নিরানন্দে ছিলুম তা নয়, তবে আমার স্বভাবসরল গৃহিণীর কাছে সেটি প্রকাশ করা চলে না, এই যা।

আমার বয়স পঞ্চাশ হতে চলল বৈ কি। এ বয়সে নবদম্পতীর গোপন রসালাপ শোনবার আগ্রহ প্রকাশ করাটা শুধু বেমানান নয়, অশোভনও বটে। গৃহিণীর গল্প শুনে আমি মিটিমিটি হাসছিলুম। এক সময় বললুম, ফুলশয্যে কেমন হ'ল শুনি।

গৃহিণী বললেন, ঘরদোর বিছানা ফুল দিয়ে খুব সাজিয়েছিল। ফুলের মুকুট, বাজুবন্ধ, মালা, চন্দ্রহার,—বৈ বৈ করছিল ঘরে। চাপা, গোলাপ, যুঁই, বেল,—একেবারে বাজার ঝেঁটিয়ে এনেছিল। যাই বলো, অতীশের বৌভাগ্য খুব ভালো! মানিয়েছিল বটে!

দুজনে ভাব ছিল কেমন? দেখলে-শুনলে কিছু?

গৃহিণী হাসিমুখে বললেন, বউটি সকলের সঙ্গে আলাপ করেছিল হেসে হেসে। তারপর অতীশ যখন ঘরে গিয়ে ঢুকল তখন রাত বারোটা হবে। যাই বলো, সাত চড়ে যা নেই, বড্ড ভালোমানুষ!

তারপর ?

মেয়েটা বোধ হয় লজ্জাই পাচ্ছিল ! কিন্তু যতই হোক, আজকালকার মেয়ে ত ? বোধ হয় অতীশকে কিছু ব'লে থাকবে ! এক সময় ঘরের দরজায় খিল দিল।

কথাবার্তা কিছু শুনতে পাচ্ছিলে বাইরে থেকে ?

গৃহিণী বললেন, একদম না ! একেবারে লোহার সিন্দুক ! ও বাড়ির ছোটমাসি, রাঙাদিদি, অতীশের দিদিরা আমাদের যাদু কত ঠেস্ করল, কিছুতেই গায়ল না। মেয়েটা বোধ হয় বেশি আমল না।

এবার হাসিমুখে প্রস্তাব করলুম, টেপ-রেকর্ডারটা খুলব নাকি ? শুনবে ?

ওমা, ছি—! আমরা না গুরুজন ?

তা অবিশ্যি সত্যি—আমি বললুম, তবে কিনা কানেই ত' শুধু শুনব ! চোখে ত' আর দেখছিনে কিছু ?

গৃহিণী বললেন, বুড়ো বয়সে এত শখ কেন তোমার ? লোকে শুনলে বলবে কি ?

কেই বা শুনছে দুপুরবেলা ? কেউ কিছু না জানলেই হল ! তুমি ত' আর বলতে যাচ্ছ না কোথাও ! আওয়াজটা খুব আস্তে ক'রে দেবো ! নাও, উঠে দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও, কেউ না আসে !

তুমি ওটা চালাতে জানো ?

বাঃ তোমার ভাই সেবার শিখিয়ে দিয়ে গেল যে !

গৃহিণী হাসিমুখে উঠে দরজাটা বন্ধ করলেন। সুবিধা ছিল এই, তিনটি ছেলেমেয়েই এখন বাড়ি নেই।

আমি নিজে লৌহব্যবসায়ী ব'লে কি হবে। লোহা নিংড়োতে জানলে নির্ঘাস পাওয়া যায় বৈ কি। আর সত্যি বলতে কি, স্ত্রীর কাছে আমি স্বামী ছাড়া আর কিছু নয় ! সেখানে আশী বছরের স্বামী আর পঁচাত্তর বছরের স্ত্রী—একই কথা ! আমি উঠে গিয়ে টেপ-রেকর্ডারটি খুলে সুইচ-বোর্ডে প্লাগটি লাগিয়ে দু'তিনটি যোতান টেপাটেপি ক'রে চালিয়ে দিলুম। চাকা দুখানা ধীরে ধীরে ঘুরতে লাগল।

ফিরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লুম। গৃহিণী হাসিমুখে বসলেন আমার পায়ের কাছে। ছুটো চাকা দুই বিপরীত দিকে ঘুরছিল।

* * *

"ছোড়দা, নতুন বৌকে দেখে লজ্জা পাচ্ছ বুঝি ? মুখ লুকোচ্ছ যে ? আঃ বড্ড গোলমাল হচ্ছে, চুপ কর্ বাপু তোরা ? না ভাই নতুন বৌদি, অত ঘোমটা দিতে দেবো না ! ও কি ভাই, ছি ! আঃ থামবি তোরা ? সর্ ভিড় ছাড় ! দেখছিসনে কষ্ট হচ্ছে নতুন বৌয়ের ? কী গরম, বাবা ! আ, ইস্, এবার ঠিক হয়েছে ! 'বন থেকে বেরোলো টিয়ে, সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।'

"হা হা হা হা—

"আঃ কের চেঁচামেচি হচ্ছে ? কী হচ্ছে কি, মিন্টু ?

"না না, এবার একটি গান গাও নতুন বৌদি !

"ছোড়দা নাকি বাসরে নতুন বৌদিকে চিমটি কেটেছিল !

"কের অসভ্যতা ! তুই দেখেছিস ? বাঃ মিথ্যে কথা বানিয়েছে !

"বাস্, তুই না ছোট? আবার সেই গানটা গাও, বৌদি। সেই যে ঘুপুরে গাইলে? এই, চুপ সবাই।

"না না গো না, করো না ভাবনা, যদি না ফিরি যায় যাবো না যাবো না—করো না ভাবনা! আমি যখনই চলে যাই, আসিব ব'লে যাই গো—আলোছায়া পথে করি আনাগোনা—!

"না না গো না—"

গানটি শুনে গৃহিণী বললেন, শুনেছ, কী সুন্দর গলা?

সত্যিই চমৎকার!—বললুম।

"নাও সবাই ঘর ছাড়ো এবার! রাত বারোটা বাজে। না, আর নয়। বাপু চ'লে এসো। মিণ্টু, তুমি চলো। আঃ বড্ড জ্বালালি শিবেন, না? চলো সব ঘর থেকে। অতীশ, এবার দরজাটা বন্ধ ক'রে দে ভেতর থেকে। বৌমা, এবার তুমি বিশ্রাম নাও, মা—"

ঘরে ফিরে যাবার শব্দ। ভিতরটা চুপ। বেনারসী শাড়ির মর্মর আওয়াজ। ঘরের মধ্যে ফ্যান্ ঘুরছে। আলোর সুইচ্ নেবাবার খুট্ ক'রে শব্দ! খাটের উপরে ওঠার মচমচে আওয়াজ। তারপর চুপ। রেকর্ডারের চাকা দুটো ঘুরছিল।

গৃহিণী বললেন, এবার কিন্তু আমার লজ্জা করছে!

বললুম, আমার করছে না! এটা ত' আর সবাক ছবি নয়। ওরা নিজেদের ছবি দেখুক আমরা ওদের কথাগুলো শুনি! চুপ—।

"আপনার নামটি আমার খুব ভালো লেগেছে! আমার নাম মালতী বড্ড সেকেলে।

"ফুলের নাম কখনও পুরনো হয় না।

"অসুবিধে হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা, আমি স'রে শুই।

"না না, ঠিক আছে! কী সুন্দর ফুলের গন্ধ ঘরে!

"আপনাকে কি 'আপনি' বলে ডাকব?

"তা হলে আমি কি বলে ডাকব?

আবার চুপ। শুধু মিষ্টি মিহি হাসির শব্দ। এক সময় অতীশ প্রশ্ন করল, "আপনি কী ফুল ভালবাসেন?

"মালতী"—আবার মধুর হাসির শব্দ।

"কিন্তু এঘরে ত' একটি ছাড়া দ্বিতীয় মালতী নেই!

"সেইজন্যেই ত' অন্য ফুলের দাম নেই আমার কাছে! নিশ্চয়ই আপনারা অনেক টাকার ফুল কিনেছেন? এ সমস্তই বাজে খরচ।"

নিরীহ পুরুষের কণ্ঠস্বর এবার স্তব্ধ। এ মেয়ের কাছে আর নয় ফুলের গন্ধ মিথ্যে। ফুলশয্যাটা বাজে খরচ।

"ঘুমোলেন—?

"না।

"আপনার চাকরি কতদিনের?

"প্রায় পাঁচ বছরের।

"কনা করবেন, মাইনে কত আপনার? বলুন না, লজ্জা কি? দু' এক মাসের মধ্যেই ত' জানব।

"প্রায় চারশ' টাকা।"—অতীশ ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল।

"ও, কিন্তু এতে কুলোতে পারবেন? আজকাল দু'খানা ধুতি শাড়ির দাম তিরিশ টাকা! আপনার জল খাবার, হাত খরচ, সামাজিক লৌকিকতা—সব মিলিয়ে অন্তত পঞ্চাশ টাকা। তার আগে আপনার ইন্‌কাম ট্যাক্স, কম্পালসরি ডিপজিট, ইন্‌স্যুরেন্স প্রিমিয়ম্, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, অফিস কো-অপারেটিভ—এগুলো হিসেব করেছেন।"

পুরুষপক্ষ পক্ষাঘাতগ্রস্ত। জবাব নেই।

"এরপর সংসার খরচ! আমোদ-আহ্লাদের খরচ। শখের জিনিসের খরচ!—কী, ঘুমোলেন?

"না।

"আচ্ছা বলুন, এ বাড়িতে থাকা আপনার পক্ষে এতদিন সম্ভব হল না—তখন? ফ্লাট ভাড়া করবেন? দু'খানা তক্তপোষ পাবেন একশ' টাকার কমে? তারপর একটি রাতদিনের চাকর, কিংবা ঝি! সেটার খরচ পঞ্চাশ-ষাট টাকার কম নয়! এগুলো কি ভেবেছেন?

অস্ফুট কাতর কণ্ঠে অতীশ জবাব দিল, "না—। আপনি এত জানলেন কেমন ক'রে?

"আমাদের বাড়ির সমস্ত খরচপত্র আমার হাতে ছিল। এসব কি আপনি হিসেব করেন নি?

"না, আমার সব টাকা বাবার হাতে তুলে দিই প্রতি মাসে।

মালতী প্রশ্ন করল, "তা হলে আপনার বাবা আমাদের কাছ থেকে নগদ সাত হাজার টাকা আদায় করলেন কেন?

"নগদ টাকা! কই, বাবা ত' কিছু বলেনি? এ কি বলছেন?

"ঠিকই বলছি! সাত হাজার টাকা!

"আমি কিছু শুনিনি।

"আপনি বোধহয় এও শোনেন নি, আমার চল্লিশ ভরির সোনার গয়না ছোদ্দ ক্যারাট্ সোনার চেয়ে খাঁটি নয়? অথচ বাবা প্রতি ভরি গিনি সোনার দাম দিয়েছেন দেড়শ' টাকা। গিনির মতে পালিশ মানে গিনি নয়!

"কী বলছেন আপনি? বাবার এক বেয়াই বাড়ুয্যে মশাই নিজে দাঁড়িয়ে সব গয়না গড়িয়েছেন, তা জানেন?

"ওঁকে পুলিশে ধরানো যায় না, এই দুঃখ। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, এ বিয়েতে কত টাকা কমিশন তিনি খেয়েছেন। ওঁর স্ত্রীই বোধ হয় আমাকে এই জড়োয়া নেকলেসটি দিয়েছেন। মনে রাখবেন, এর দাম আমার বাবাই দিয়েছেন! কিন্তু আমরা মেয়েপক্ষ, আমরা কোনও দিন চেঁচিয়ে বিচার দিতে পারিনে। কি, ঘুমোলেন? ছুঁই-গোলাপের গন্ধ পাচ্ছেন না?

"না। এবার উঠে দরজাটা খুলুন।

"হ্যাঁ, তাই খুলি, বড্ড গুমোট।"

গৃহিণী নিঃশব্দে উঠে চ'লে গেলেন অপমানিত মুখে। আমি—না, আমি নয়,—আমার প্রেতাত্মা উঠে গিয়ে জানলাটা বন্ধ ক'রে দিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের নব মূল্যায়ন

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে দুইজন স্রষ্টা—মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র—আমাদের সাহিত্য-পরিক্রমাকে নূতন কক্ষপথে পরিচালিত করিয়াছেন ও আমাদের জাতীয় কাব্যবোধ ও সমাজ-চেতনার মধ্যে বিশ্বমানবের সার্বভৌম হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত করিয়াছেন তাঁহাদের কালোত্তরোত্তীর্ণতা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিব। যদি এই যুগন্ধর সাহিত্যিকেরা এক শতাব্দী পরে আবির্ভূত হইতেন তবে বাংলা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির কি অভাবনীয় পরিবর্তন হইত সে বিষয়ে কিছুটা অনুমান করিতে প্রয়াসী হইব। মধুসূদন ও বঙ্কিম পুরাণচেতনাশ্রয়ী, প্রাচীন-আদর্শ-প্রভাবিত বাঙালী মানসের অন্তিম পর্যায়ের প্রতিনিধি। তাঁহারা এই সনাতন চিন্তাধারা ও বিশ্বাসনিষ্ঠতার মধ্যেই নবযুগের ভাবপ্রেরণা সঞ্চারিত করিয়াছেন। তখনও সমাজাদর্শের ও জীবনবোধের প্রাচীন ভিত্তিভূমি কিছুটা বিচলিত হইলেও মূলতঃ অটুট ছিল। মধুসূদন এ যুগে জন্মিলে নিশ্চয়ই মেঘনাদ ও বীরাঙ্গনা লিখিতেন না—পুরাণাশ্রিত ঘটনা ও সনাতন-আদর্শ-রক্ষিত, মৃদু প্রতিবাদে উল্লেখিত হৃদয়বৃত্তি বাস্তব জীবন হইতে এতদূরে সরিয়া যাইত যে মহাকবির কল্পনার সহিত তাহাদের কোন বৈদ্যুতী সংস্পর্শ থাকিত না। অন্ততঃ যে সমাজ স্বাধীনচর্যিকা নারীর অকুণ্ঠ হৃদয়বৃত্তি—নিবেদনে মুখরিত, সেখানে প্রেমব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত খুঁজিতে কবিকে পৌরাণিক Mrs. Radha র শরণাপন্ন হইতে হইত না। চতুর্দশপদী কবিতা হয়ত এতটা স্মৃতিরোমন্থনে করুণ হইয়া উঠিত না। আধুনিক কবিগোষ্ঠী ব্যক্তিজীবনের স্মৃতিচারণা করিলেও অতীতের সাংস্কৃতিক রূপের প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। কাজেই মধুসূদনের প্রতিভা যে বস্তুজগৎ ও ভাবজগৎ অবলম্বন করিয়া বিকশিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভাবে বর্তমান-আশ্রয়চ্যুত হইয়া এক অকল্পনীয় সূত্রে নবকুসুমসম্ভারে ফুটিয়া উঠিত। অতীতের যে ঐশ্বর্য—লঙ্কার যে মহিমান্বিত্য-দীপ্তি, সীতা-সরমার যে সহমর্মিতা, মেঘনাদের চিতাশয়ার সম্মুখে রাবণের যে শোকোচ্ছ্বাস-পুরাণ, আখ্যানের যে নবকল্পনা-সমারোহ—মধুসূদনের কাব্যমঞ্জুষার চিরতরে বিধৃত হইয়াছে তাহা উপযুক্ত আধারের অভাবে বাঙালীর কাছে চির-বিস্মৃতিতে বিলীন হইয়া যাইত।

আর বঙ্কিমচন্দ্র—তিনি যদি বর্তমানের আদর্শহীন সুখবাদ ও সর্বপ্রকার নীতিনিরপেক্ষ স্বেচ্ছানিয়ন্ত্রণের যুগে জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে বাঙলার অধ্যাত্মবোধ ও জীবনযাত্রার কয়েকটি অমূল্য অধ্যায় বাংলা সাহিত্য হইতে চিরকালের মত বাদ পড়িত। উনবিংশ শতকের শেষভাগে বাঙলা সমাজ প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত আধুনিক জীবনাদর্শের একটি সমন্বয়-স্থাপনে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগের জীবনেতিহাস স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। বঙ্কিমের হাতে উপন্যাস শুধু বাস্তবজীবনকাহিনী মাত্র ছিল না; ইহাই ইতিহাস-রোমান্স, কবিকল্পনা, উচ্চতম নীতি-আদর্শ, ধর্মতত্ত্ব, সংস্কৃতি-নির্যাস ও গভীর মানবিক আবেগমধুরতার—এক কথায়, বাঙালী জীবনের বিচিত্র উপাদান ও প্রেরণার—সংশ্লেষাত্মক বর্ণাঢ্য চিত্রকলার রূপ পরিগ্রহ

করিয়াছে। বাঙালীর যে ইতিহাস ছিল না সেই অভাব তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে অনেকটা পূর্ণ করিয়াছেন। হয়ত উহাতে ইতিহাসের সন-তারিখ-সম্বলিত তথ্য পাওয়া যাইবে না, কিন্তু ইতিহাসের যে সাধারণ জীবনাতিপাটী, বর্ণবহুল ও আবেগঘন, দ্রুতসঞ্চারী ছন্দোরূপটি আমাদের কল্পনায় চিরজাগ্রত আছে তাহার আশ্চর্য ভাবচিত্রটি সেখানে সমুজ্জ্বল। ঐতিহাসিক উপন্যাসে আমরা প্রত্যাশা করিব ইতিহাসের বস্তুময় অবয়ব নয়, উহা হইতে বিচ্ছুরিত সূক্ষ্ম ভাবদীপ্তি। তুর্কী কর্তৃক বাঙলা দেশ অধিকারের যথার্থ বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ হয়ত আমরা কোনদিনই পাইব না, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের বহ্ন্যুৎসবের ভীষণ চিত্র-সৌন্দর্য বঙ্কিমের তুলিতে নিখুঁত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কপালকুণ্ডলার বাঙালীর চিরাভ্যস্ত ধর্মসাধনা কেমন করিয়া গার্হস্থ্য জীবনের প্রতি অনপনের অনাসক্তির হেতু হইয়াছে তাহার ছবি শুধু ব্যক্তি-চরিত্র নয়, সমাজ-মানসের একটি বিশিষ্ট প্রবণতার উপর আলোকপাত করিয়াছে। মিরান্দা অজ্ঞতার সরলা, শকুন্তলা তপোবন-নির্জনতার মধ্যেও নৈসর্গিক নিয়মানুসারে প্রণয়মুগ্ধা; কিন্তু কপালকুণ্ডলা ধর্মসাধনার অতিমজ্জাগত সংস্কারে সংসার-বিমুখা। কোন পাশ্চাত্য বা পাশ্চাত্যভাবদীক্ষিত লেখক এরূপ চরিত্রের কল্পনা করিতে পারিতেন না। বাঙলাদেশের স্বভাব-সন্ন্যাসিনী বাংলা সাহিত্যে স্থান পাইত না। 'রজনী'তে লবঙ্গলতা বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি সহিষ্ণুতার অনুরক্তা তরুণী ভার্যার বিরল দৃষ্টান্তরূপে উপস্থাপিত। হিন্দু সমাজের পাতিব্রত্য-সংস্কার অন্য সমাজের দ্বারা অকল্পনীয় এই অঘটন ঘটাইয়াছে। অমরনাথের প্রতি তাহার কৈশোর আকর্ষণ বিধুরনদীর চিরাভ্যস্ত আত্মদমনের বলে সচেতন মন হইতে নির্বাসিত হইয়া অবচেতনের গুহাশ্রয়ী হইয়াছে। পক্ষান্তরে ইন্দিরার যে অদম্য যৌবন-কামনা ও জীবনোপভোগ-স্পৃহা উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে পাশ্চাত্য প্রবৃত্তিসম্বন্ধ কামচারিতার বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই—উহা সম্পূর্ণ ভাবে দেশীয় ঐতিহ্য ও জীবনছন্দের অনুবর্তী। ইন্দিরা নীতিবাগীশ বঙ্কিমের হাতে একটি অদ্ভুত সৃষ্টি; অথচ যাঁহারা এই কারণে বঙ্কিমের উপর খড়্গহস্ত তাঁহাদের মধ্যে কেহই ইন্দিরার অসাধারণ জীবনরসোজ্জ্বলতার জন্য তাঁহার প্রতি সাধুবাদ জানান নাই।

দাম্পত্য প্রেমে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ অতি-আধুনিক উপন্যাসের একটি পৌনঃপুনিক বিষয়। তবে অধুনা-প্রচলিত জীবন দর্শনে এই প্রেম এত ক্ষণভঙ্গুর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে যে উহার বিলোপে কেহই বিশেষ বিচলিত হন না। মৃতবৎসা জননীর শিশুর অকালমৃত্যুর ন্যায় ইহা একান্তভাবে প্রত্যাশিত ঘটনা বলিয়াই গৃহীত হয়। বরং বিচ্ছেদের পরে যে স্বামী স্ত্রী নূতন স্বাধীনতা অর্জন করে তাহাদের পাত্রান্তরগুহাই লেখকদের মধ্যে অধিক মনস্তাত্ত্বিক কৌতূহলের উদ্রেক করে। যে দাম্পত্য-সম্পর্ক জীবনের স্থির কেন্দ্রবিন্দু রূপে জীবনের সমস্ত মর্যাদা-মহিমা-সার্থকতার উৎসরূপে অভিনন্দিত, ও যাহা অধুনা সাহিত্যে প্রায়-অস্বীকৃত সেই সম্পর্কের রাজ্যাভিষেক বঙ্কিম 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এ দেখাইয়াছেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই দাম্পত্য সম্পর্কের অগ্রগামী পূর্বরাগ বা প্রণয়-সৌকুমার্যের উপরই তাঁহার সমস্ত কল্পনার রমণীয়তা ও অনুভূতির গাঢ়তা নিঃশেষিত করিয়াছেন। লাবণ্য-অমিতের ক্ষেত্রে অসীম সীমায় মাঝে ধরা না দিয়া উহার অনির্দেশ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। মধুসূদন-কুমুদিনীর ক্ষেত্রে স্বপ্নসুষমা ও বাস্তব রূঢ়তার এক বিসদৃশ সম্মিলন ঘটিয়াছে—প্রেমের বরমাল্য সৌরভসুষমার কাঠিন্য লাভ করিয়াছে। "গোরাতে"ও প্রেমের মধুর উন্মেষ ও সলজ্জ মন্থর গতি কবিচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে। দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্র

কৃষ্ণকান্ত-আনন্দময়ীর ক্ষেত্রে এক নিঃসঙ্গ, আবেগহীন উদাসীন্যে ও সম্পূর্ণ বিপরীত জীবন-চর্যায় ঘুণধরতার বৈশিষ্ট্যহীন হইয়াছে। ঐক 'ঘরে বাইরে'-তে দাম্পত্য প্রেমের বর্ণোজ্জ্বল ঐশ্বর্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে স্বামীর পরিবর্তে স্ত্রীর ক্ষণিক চিত্তবিভ্রম সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ সাধারণতঃ দাম্পত্যপ্রেমের সহজ সমৃদ্ধি নয়, উহার ব্যতিক্রমই ঔপন্যাসিক কৌতূহলের বিষয় হইয়াছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দুইখানি উপন্যাসে—'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এ দাম্পত্য প্রেমের যে সমৃদ্ধিমান তাজমহল নির্মাণ করিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য এই দাম্পত্য প্রাসাদে ফাটল ধরিয়াছে কোন বিশেষগত আদর্শ-সংঘাতে নয়, বাঙালী সমাজ-প্রচলিত মানব-প্রকৃতিমূলক কারণেই। এই বিচ্ছেদের মধ্যে যে মর্মান্তিক বেদনা ও অনুশোচনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, হৃদয়ের যে গভীর আলোড়ন আসিয়াছে তাহাতেই এই দাম্পত্য সম্পর্কের মহিমা ও উহার অন্তর্নিহিত সমুন্নত আদর্শবোধ অন্তর্ভেদী হইয়া উঠিয়াছে। দেবেন্দ্রর মানসিক ভাবে কলুষিত হওয়ায় মন্দির-দেবতার মাহাত্ম্য আরও বাড়িয়াছে। নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখীর প্রেম মুহূর্তের জন্য কুমুদলালসার দ্বারা গ্রস্ত হইয়া আরও জ্যোতির্ময় হইয়াছে। গোবিন্দলাল-ভ্রমরের প্রেম বিচ্ছেদের অতল সমুদ্রে ডুবিয়াছে। কিন্তু যে প্রেমের বলে একদিকে দীর্ঘ প্রতীক্ষাক্লান্ত মৃত্যুবরণ, অপরদিকে ভগবৎ পাদপদ্মে চিত্তস্থৈর্য সম্ভব হয়, তাহার প্রেরণার বলিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। বঙ্কিমের উপন্যাসে ভবিষ্যৎ অবিশ্বাসী যুগের জন্য প্রেমের এই অমর মহিমা সাহিত্যের স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

"চন্দ্রশেখর" এ প্রেমের আদর্শচ্যুতি, নারীর মানস বাভিচার দীর্ঘ-পোষিত-পাতিব্রত্য-সংস্কারকে আঘাত করিয়া অধ্যাত্ম শক্তির অধিচেতন প্রভাবে অন্তর মধ্যে যে দারুণ দাবানল প্রজ্বলিত করে, বোধক্রিয়ার যে তুমুল বিপর্যয় ঘটায়, অপ্রকৃতিস্থ চিত্তে যে অপরাধের স্মৃতিদহন আশা বিস্তার করে তাহার অপূর্ব বিবরণ উপন্যাসিক জীবন-সমীক্ষার প্রচ্ছদপটে এক কবিকল্পনাদীপ্ত ছবি আঁকিয়াছে। যে হিন্দু অধ্যাত্ম কল্পনা উপনিষদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, মরণোত্তর জীবনের প্রত্যক্ষবৎ সুস্পষ্ট উপলব্ধি ও নরক-বিভীষিকার আদিম অনুভূতি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় ব্যাপারকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপসুষমার আধারে বিধৃত করিয়াছে তাহাই শেষবারের মত প্রায়-আধুনিক যুগের এক মানবিক জীবন-বিভ্রান্তিকে অসীম-ব্যঞ্জনাময় এক অতিবাস্তবেতনীর মধ্যে বিন্যস্ত করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। বিশ্বকর্মার অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া যেমন বজ্র-নির্মাণ সম্ভব হইত না তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্ম সংস্কারের সমিধ-পুষ্ট যজ্ঞ ছাড়া এই দিব্য তেজোময় অস্ত্র নির্মিত হইতে পারিত না। আমরা বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার মনোভাব লইয়া এই মহাযজ্ঞের সম্ভাব্যতা বিচার করিতে বসিয়াছি। যোগবলে অসাধ্যসাধন সম্ভব কিনা তাহার বিচারে অধ্যাত্ম শক্তি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অধিকারী নহেন। যে দেশের ঐতিহ্যে দৈবশক্তি মানবিক শক্তির সহিত সমান গুরুত্ব লাভ করিয়াছে, ঐহিক ও পারলৌকিকের সীমারেখা বারবার অপসারিত হইয়াছে, দেবতা যেখানে মানুষের মত পারিবারিক গোষ্ঠিভুক্ত হইয়াছেন, স্বপ্ন-প্রত্যাদেশের মধ্যে যে দেব-অভিপ্রায় সেখানে মানবিক বোধস্তরকে বারে বারে বিদীর্ণ করিয়াছে, সেখানে পাপের সংশোধন-প্রণালী যে মনস্তাত্ত্বিক উপায়কে ছাড়াইয়া অধ্যাত্মরহস্যাশ্রয়ী হইবে তাহা অবিশ্বাসী ও মনস্তত্ত্ববিদের আপত্তি সত্ত্বেও লোকমনে সত্যের অভিনন্দন লাভ করিবে। ভাল হউক, মন্দ হউক হিন্দুর জন্য দেবী উপন্যাসে হিন্দুর অধ্যাত্ম প্রত্যয় যে মুখর হইয়া উঠিবে তাহা অন্য দেশের সমর্থন-বঞ্চিত হইলেও

এদেশের মানুষের পক্ষে বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা লঙ্ঘন করিবে না। বঙ্কিম সে যুগে না জন্মিলে ধর্মতত্ত্ব ও অলৌকিক সংস্কারকে জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া দেখাইবার আর কোন সুযোগ পাওয়া যাইত না। পাশ্চাত্য সাহিত্যে The Waste Land বারবার পুনরাবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু The Divine Comedy ও Paradise Lost আর লেখা হইবে না। বাংলা সাহিত্যে 'চোখের বালি' ও 'গৃহদাহ' ভবিষ্যৎ-বংশীয় অসংখ্য সন্তান-সন্ততির জন্মদাতা রূপে বংশ-প্রতিষ্ঠাতার গৌরবে বিরাজিত থাকিবে, কিন্তু 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রেরণা-উৎস চিরকালের মত অবরুদ্ধ হইয়াছে।

সর্বশেষে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে উপস্থাপিত মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা প্রয়োজন। জীবন-উপলব্ধি ও তৎসম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত-গ্রহণের নানা উপায় আছে। তাহাদের মধ্যে উপন্যাসে যে উপায় প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে অবলম্বিত তাহা কার্যকারণ-শৃঙ্খলার সংযোগে জীবনের প্রবৃত্তি-দ্বন্দ্বের পরিচয়-উদ্‌ঘাটন। জীবনের নানা প্রবৃত্তি ও আকর্ষণের সংঘাতের মধ্যে, পরিবেশ-প্রভাবের ফলে তাহার কোন্ রূপটি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠে, তাহার কোন্ মানস-প্রবণতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার প্রকৃতি-রহস্যের অবগুণ্ঠন কেমন করিয়া উন্মোচিত হয়, তাহাই উপন্যাসের প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই আলোচনায় আমাদের মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতালব্ধ সাধারণ ধারণা তাহারই মানদণ্ডে চরিত্র-পরিবর্তনের বা ঘটনা-বিন্যাসের সম্ভাব্যতা-অসম্ভাব্যতা নির্ণীত হয়।

ইহাকেই আমরা মনস্তত্ত্ব বা মানুষের চিত্তবিশ্লেষণাত্মক আচরণ-নির্ণয় বলিয়া থাকি। কিন্তু এই জ্ঞানেই যে মানবের সত্তারহস্য নিশ্চিতভাবে ধরা পড়িবে সে সম্বন্ধে অতি-আধুনিক যুগে আমাদের বিশ্বাস শিথিল হইয়া আসিতেছে। কাজেই অনুবর্তন ঔপন্যাসিক-গোষ্ঠী Virginia Wolf, James Joyce, Aldous Huxley প্রভৃতি ধারাবাহিক আচরণ-বিশ্লেষণ ছাড়িয়া মনোলোকের আরও বিশৃঙ্খল, অটিলতর, চেতন-অবচেতনের নানা সূক্ষ্ম ও জটিল অনুভূতি-জাল-বিরচিত স্তরে অবতরণ করিতেছেন। Freud সমস্ত আচরণ-বৈচিত্র্যের মধ্যে এক মূল কাম-প্রবৃত্তির নানা ছদ্মবেশী, বিতর্ক আত্মপ্রকাশ কল্পনা করিয়া আমাদের জীবন-সমীক্ষার ধারাকে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবাহিত করিয়াছেন। এই দৃষ্টান্ত সম্মুখে রাখিয়া বঙ্কিমের উপন্যাসে মনস্তাত্ত্বিক শিথিলতা সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় হইতে পারি না। বিশেষতঃ বঙ্কিম যে জীবনের ছবি আঁকিয়াছেন তাহাতে ধর্মতত্ত্ব, অলৌকিক সংস্কার, নীতিশাসন, রোমান্টিক কল্পনা ও অসংযত আবেগোচ্ছলতা প্রধান উপাদানরূপে এক দুর্মোচ্য ভাববন্ধনে একীভূত হইয়াছে। সুতরাং পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্বের নির্বিচার প্রয়োগ যে এই সমস্ত চরিত্রের জট ছাড়াইবার অমোঘ উপায় তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। মনের সোনকর্ণীযার দুই আর দুই মিলিয়া সর্বত্র চার হয় না; কোন অজ্ঞাত রহস্যে এক অভাবনীয় প্রেরণার আবির্ভাব আমাদের গাণিতিক হিসাবকে পঙ্গু পাওয়ায়। হিসাবের উপর অতিরিক্ত আস্থা রাখিতে গেলে জীবনরহস্য আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া আত্মগোপন করিতে পারে। তত্ত্বের সনাবেশের ফাঁকে আসল বস্তুটি অন্তর্ধান করে। তাহার সূক্ষ্মাগ্রে যেটুকু প্রাণ-নির্যাস উঠে তাহা সামগ্রিক জীবন-পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। জীবন রসসাগরে প্রস্ফুটিত শতদল পদ্ম—তাহার লীলাবিলাসের মধ্যেই তাহার ক্রিয়া-রহস্য নিহিত। বিশ্লেষণে অনেক সময় আমরা পাপড়ি ছিঁড়ি, মধুর উৎস পর্যন্ত পৌঁছি না। সৃষ্টিরহস্যের ন্যায় জীবনরহস্যও অর্ধেক প্রকাশিত ও অর্ধেক অবগুণ্ঠিত। বঙ্কিমের উপন্যাসে এই অর্ধ-উন্মোচিত অবগুণ্ঠনের মধ্য দিয়াই জীবনলীলার সার্বজনীন ছন্দটি আমাদের প্রত্যক্ষ-অনুভূতিগোচর হইয়া থাকে।

দুই সৈনিক

চিত্তরঞ্জন মাইতি

কে! কে! বলে চেঁচিয়ে উঠল চিয়াং সোয়ে। গুরুবজ্র হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল পাশের একটা একশিলা পাথরের ওপর। প্রথম আওয়াজ শুনেই বুঝেছে গুরুবজ্র চীনে সৈন্যের ঘাঁটির ভেতর এসে পড়েছে সে।

চুপচাপ কিছুক্ষণ কেটে গেল। আর কোন আওয়াজই ভেসে আসছে না। গুরুবজ্র ভাবলে তার আত্মগোপনের জায়গাটা আপাততঃ তাকে রক্ষা করেছে। কিন্তু যে জায়গায় এসে পড়েছে সে সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশা রাখতেই হবে। দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে তার। কতক্ষণ সে ঘুরে ফিরেছে এমনি ভাবে, সে হিসেব সে ভুলে গেছে। তবে একটা রাত যে সে কাটিয়েছে তা প্রবল শীতের কামড় থেকেই বোঝা গেছে। এখন দিন। উত্তাপে সে টের পেয়েছে সূর্যের উপস্থিতি।

গুরুবজ্রের হাতের পাতায় চোখ দুটো ঘষতে লাগল। এবার তাকাল সামনের দিকে। না, শুধুই অন্ধকার। তার ভেতর থেকে মাঝে মাঝে রক্তের লাল রেখার মত কতকগুলো সোনাকার আবর্ত ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে।

কি ভীষণ সোনাবর্ষণ! মিলিটারী হাসপাতালে শুয়ে তার মনে হচ্ছিল, পাহাড়খানা যেন ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ছে। সেই তাল তাল অগ্নিবৃষ্টির ভেতর দিয়ে গুরুবজ্র বেরিয়ে এলো বাইরে। তারপর থেকে ক্রমাগত দুহাতে অন্ধকার সরিয়ে পাহাড় বন ভেঙে সে চলেছে। কিন্তু আলো! না, আলোর সামান্য রশ্মিটুকুও ফুটে উঠলো না তার চোখে। সেই যে হাসপাতালে চোখ দুটো তার বাঁধা হয়েছিল, তারপর দুহাতে বাঁধনটা টেনে খুলে ফেললেও দৃষ্টি আর সে ফিরে পায়নি।

ওদিকে একটা পাহাড়ের ধারে কাৎ হয়ে শুয়ে আছে চিয়াং সোয়ে। গুরুবজ্রের দেখা পাওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত কাতরাচ্ছিল সে। সাপের মেরুদণ্ড ভেঙে গেলে যেমন সে এদিক ওদিক বেঁকেচুরে যাবার চেষ্টা করে, অথচ একচুল দেহখানাকে নড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনা; ঠিক তেমনি করে একখানা পা হারিয়ে চিয়াং সোয়ে পড়েছিল পাহাড়টার ধারে। কিন্তু যেখান থেকে প্রাণপণ শক্তিতে সে টেনে এনেছে দেহটাকে এত দূর। কিন্তু আর নয়। শরীরটা তার অসাড় হয়ে এসেছে। খিদের জ্বালা একসময় অবসাদের মধ্যে নেমে এসে স্থির হয়ে যায়, কিন্তু পিপাসা কণ্ঠতালু শুষ্ক করে দিয়ে অসহ্য এক যন্ত্রণার ঢেউ তোলে। চিয়াং সোয়ে শুনছে পাহাড়ের ওধিকটাতে একটা ঝরণার ঝরে পড়ার শব্দ। মাঝে মাঝে পাহাড়ের এপাশে জলবিন্দুগুলোকে সে ছিটকে পড়তেও দেখেছে, কিন্তু দেহটাকে নাড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাবার সব চেষ্টাই তার ব্যর্থ হয়েছে। প্রবল পিপাসায় সে জিভখানাকে কামড়েও ফেলেছিল।

হঠাৎ সেই পটভূমিতে গুরুবজ্রের আবির্ভাব। চিয়াং সোয়ের চিৎকার। গুরুবজ্রের আত্মগোপনের চেষ্টা।

গুরুবজ্র নিজের কাছে হয়তো লুকোতে পেরেছিল, কিন্তু পারেনি চিয়াং সোয়ের দৃষ্টির আড়ালে

লুকোতে। চিয়াং প্রথমে শত্রুপক্ষীয় একটি লোককে দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিল। ভয়ও পেয়েছিল সে। কিন্তু তারপর যখন লোকটাকে সে নিরস্ত্র দেখল আর তার পাশেই পাহাড়ের গায়ে হাতকয়েকবার আত্মগোপনের চেষ্টা করতে দেখল, তখন সে পরীক্ষা করতে লাগল শত্রুপক্ষের সমস্ত আচরণ আর অনুষ্ঠানগুলো।

কিছুক্ষণের ভেতরেই সে সিদ্ধান্ত করে নিল যে শত্রুপক্ষ আর যাই হোক চক্ষুষ্মান নয়। চিয়াং তার মাতৃভাষায় আর একবার চেঁচিয়ে উঠল। শত্রুপক্ষ এবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। পাহাড় হাতড়ে বড় একটা পাথরের টুকরো সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগল সে। হয়তো ধরা পড়ার আগে আত্মঘাতী হতে চাইল। চিয়াং সোয়ে এবার সুস্পষ্ট ইংরাজীতে শত্রুপক্ষকে ডাক দিয়ে বলল, কোন ভয় নেই, এখানে চলে এসো। আমার গলার আওয়াজ নিশ্চয়ই তুমি শুনতে পাচ্ছ। শব্দ শুনে আশা করি তুমি কাছে আসতে পারবে। এই যে আমি রয়েছি, এসো, এসো। আর একটু বাঁদিকে বেঁকে।

শত্রুপক্ষ এই মুহূর্তে যেন কেমন বোকা বনে গেছে। শত্রুপক্ষের ভেতর সে যে এসে পড়েছে সে বিষয়ে তার কোন সন্দেহই ছিল না। কিন্তু কেউ তাকে বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে না। তাছাড়া একটি মানুষেরই গলা কেবল সে শুনতে পাচ্ছে। ব্যাপারখানা তার কাছে গোলমেলে মনে হতে লাগল। তবু পায়ে পায়ে সে গলার আওয়াজ শুনে এগোতে লাগল। এক সময় যখন সে শত্রুর মুখোমুখি এসে গেল, তখন দাঁড়িয়ে রইল নির্বাক বিস্ময়ে।

আমি চিয়াং সোয়ে! তুমি আমাকে একটু সাহায্য করলে আমি হেঁটে যেটাতে পারি। এই যে, তুমি আমার একখানা হাত ধর! শত্রুপক্ষ হাতখানা ধরল। তার কাছে সবই রহস্যাবৃত বলে মনে হচ্ছে।...এবার তোমার গলাটা আমি জড়িয়ে ধরেছি, তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখ। একখানা পা আমি হারিয়েছি। সাহায্য করার মত কেউ নেই আর এখানে।

শত্রুপক্ষ যেন মোহে চালিত হচ্ছিল। সে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল চিয়াং সোয়েকে। তারপর সোয়ের নির্দেশে তাকে প্রায় বয়ে নিয়ে চলল অজানা কোন জায়গায়।

ছল্ ছল্ শব্দ ভেসে আসছিল। সে আওয়াজ ক্রমে আরো কাছে এলো। চিয়াং সোয়ে থামতে বলল শত্রুপক্ষকে। তারপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে আঁজলা আঁজলা জল খেতে লাগল। শত্রুপক্ষ হাত বাড়াল। শব্দ লক্ষ্য করে সে ঠিকই হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল। এখন আকণ্ঠ জল খেয়ে খিদের জ্বালাটাকে চাপা দেবার চেষ্টা করল। প্রাণের মায়ায় সে ভুলে গিয়েছিল খাবার কথা। কিন্তু এখন যেন নতুন করে বাঁচার একটা তাগিদ তার মনটাকে তোলপাড় করতে লাগল। সে এতক্ষণে বুঝেছে চিয়াং সোয়ে আহত চীনা সৈন্য। চিয়াং জলপানের পর কিছুটা শান্ত হয়েছে। এখন সে দেহে অনেকখানি বল পেয়েছে। স্থির হয়ে এলিয়ে কতক্ষণ পড়ে রইল ঝর্ণার ধারে।

আকাশ পাতাল ভাবছে ওরা। দুজনে পৃথক দুটি মন নিয়ে ভাবছে। কিন্তু ভাবনাগুলো সব এক। কেমন করে এ অসহ্য অবস্থার কবল থেকে তারা মুক্তি পাবে! এবার প্রথম কথা বলল শত্রুপক্ষ, লোকালয়ের কোন চিহ্ন দেখতে পাচ্ছ কি?

চিয়াং সোয়ে এলিয়ে পড়েছিল পাশে। সংক্ষেপে বলল, না।

কিছু খাবার আছে সঙ্গে? শত্রুপক্ষ প্রশ্ন করল।

তাও নেই, উত্তর করল চিয়াং সোয়ে।

তাহলে বাঁচবে কি করে? শত্রুপক্ষের প্রশ্নে উৎকণ্ঠা।

এবার কোন উত্তর করলনা চিয়াং সোয়ে। শুধু আকাশের দিকে তাকিয়ে শেষ সূর্যাস্তের ভয়াবহ দৃশ্যটুকু দেখতে লাগল। একসময় বলল, এবার তৈরী হও, রাত নামছে, শীতের কাবড় লইতে হবে।

গুরুবক্স যান্ত্রিকের মত বলল, তৈরী হতে গেলেই শীত আরো বেঁকে বসবে, তার চেয়ে যা হবার তাই হোক।

আবার নীরবতা। কিছুক্ষণ পরে চিয়াং সোয়ে বলল, সামনেই একটা গুহার মত দেখা যাচ্ছে, চল রাতের মত ওখানেই ঠাঁই করে নিই। গুরুবক্স উঠল। কাঁধে আধশোয়া অবস্থায় তুলে নিল চিয়াং সোয়েকে। আবার চিয়াং সোয়ের নির্দেশ; ডাইনে চলো, এবার বাঁয়ে, সিধে দু'পা হাঁটো। খাবো খাবো, হুমড়ি খেয়ে পড়বে যে। কাঁধ থেকে নেমে পড়ল চিয়াং। তারপর একটা সিগারেট লাইটার জ্বেলে আধশোয়া অবস্থায় গুহার ভেতরটা দেখে নিল। এবার গুরুবক্সের হাতখানাকে শক্ত করে ধরে ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দুজনের কারো মুখে কথা নেই। কেটে যাচ্ছে প্রহরগুলো। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে কখন। হিমেল হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। রাতগুলো কি হরণ বিভীষিকা বয়ে আনে। হাওয়ার বেগ ক্রমেই বাড়তে লাগল। গুহার বাইরে কতকগুলো জানোয়ার যেন একসঙ্গে গোঙানি জুড়ে দিয়েছে। আজ ঠাণ্ডার কামড়টা বড় বেশী অসহ্য বলে মনে হতে লাগল। চিয়াং সোয়ের ক্ষতটা থেকে থেকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। একটা কাতরানি শোনা যাচ্ছে। গুরুবক্স বসে আছে চুপচাপ। কোন কথা বলার শক্তি যেন আর নেই তার। সিগারেট ধরাল চিয়াং সোয়ে। সঙ্গ পাচ্ছিল গুরুবক্স। এই ঠাণ্ডায় একটা সিগারেট অনেকখানি প্রাণের আশ্বাস দেয়। প্রবল একটা ইচ্ছা গুরুবক্সকে পেয়ে বসল। এই মুহূর্তে ধূমপান করতে না পারলে সে যেন মরে যাবে, এমন একটা ধারণা তাকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজেকে সামলে নিল। ভারতীয়ের অভিমান পেয়ে বসল তাকে। চেয়ে সে কিছুতেই নেবেনা। চিয়াং-এর তো আপনা থেকেই তাকে একটা সিগারেট অফার করা উচিত ছিল। যাক্ সে। গুরুবক্স গুটিয়ে বসল। এতক্ষণ সিগারেটের যে ধোঁয়াটুকু সে লোভীর মত বসে বসে শুঁকছিল, এখন তা অসহ্য বলে মনে হতে লাগল।

চিয়াং কথা শুরু করল, উঃ কি রুক্ষ দেশ। মানুষেও এ দেশে হাঁটে। পাহাড় পাহাড় আর পাহাড়!

চিয়াং-এর কথায় একটা আক্ষেপ আর ক্ষোভ ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ থেমে বলতে লাগল সে, কমরেডদের একটুও যদি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে। কোথায় ফসলের ক্ষেতে, ফলের বাগিচা দেখে হানা দেবে, তা না পাহাড়ের ওপর চড়াও হও। আপন মনে বক বক করতে করতে একসময়ে থেমে গেল চিয়াং সোয়ে।

গুরুবক্স স্থির থাকতে পারলনা। তার দেশের নিন্দে কেউ করুক তা সে কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না। একটু রুঢ় ভাবেই সে বলল, আমার দেশে যা আছে, অন্যের দেশে তা নেই বলেই তারা বার বার ডাকাতি করতে আসে।

চিয়াং সোয়ে চিৎকার করে উঠল, কি বললে, আমরা ডাকু?

গুরুবক্স রাগে ফুলতে লাগল। সেও হুঙ্কার ছাড়লে, শুধু ডাকু নয়, বেইমান।

চিয়াং সোয়ে কোমর থেকে ছোরাখানা মুহূর্তে টেনে আনল। তার পরমুহূর্তেই কি যেন ভেবে নিয়ে আবার তা খাপে বন্ধ করে রেখে দিল।

প্রবল একটা হাওয়া সেই মুহূর্তে আহত জানোয়ারের মত গোঙাতে গোঙাতে তেড়ে এল। গুহার ভেতর যেটুকু চুকলো তাতেই মনে হোল চিয়াং-এর ক্ষতের জায়গায় সে জোর কামড় বসিয়েছে। একটা আর্ত চীৎকারে গুহার ভেতরটা কেঁপে উঠল। অসহ্য যন্ত্রণায় চিয়াং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ক্যাম্পের বাইরে এই তার প্রথম রাতের অভিজ্ঞতা। গুরুবস্ত্র গায়ের কম্বলখানার কিছু অংশ ছুঁড়ে দিল চিয়াং-এর গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে। বলল, জড়িয়ে নাও, কিছু আরাম পাবে।

কিছুক্ষণ পরে চিয়াং-এর কাতরানি বন্ধ হল।

গুরুবস্ত্র মনে মনে কি যেন ভাবলে। তারপর গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এলো গুহার বাইরে।

কোথায় চলেছ? চিয়াং-এর গলা থেকে একটা অসহায় আওয়াজ বেরিয়ে এল।

ততক্ষণে গুরুবস্ত্র বাইরে বেরিয়ে গেছে। কি যেন একটা বলল সে, হাওয়ার গর্জনে কিছুই বোঝা গেল না। চিয়াং দেখল, কয়েকটা পাথরের টুকরো গুরুবস্ত্র হাতড়ে হাতড়ে কোথা থেকে বয়ে আনছে। তারপর সেগুলো গুহাটার মুখে জড়ো করে সে সাজাতে লাগল। এমনি করে সে বাইরের হাওয়াটাকে কিছু পরিমাণ ঠেকাবার ব্যবস্থা করল। আবার গুঁড়ি মেরে গুহার ভেতর ঢুকে পড়ল সে। দাঁতে দাঁতে তার ঠক্ ঠক্ আওয়াজ উঠেছে ততক্ষণে। চিয়াং একটা সিগারেট বরিয়ে গুরুবস্ত্রের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, নাও, সিগারেট নাও; তবে একসঙ্গে সবটুকু শেষ করে দিওনা যেন। দু'চার বার টেনে নিভিয়ে রেখে দিও কাছে। পরে আবার চলবে।

গুরুবস্ত্র সিগারেটটা হাতের ভেতর নিয়ে বলল, আমাকে দিলে অসুবিধে হবে না তোমার?

আরও আছে আমার কাছে।...হ্যাঁ, তোমার কম্বলখানা আমাকে দিলে খুব কি অসুবিধের পড়বে?

গুরুবস্ত্র বাইরে যাবার সময় কম্বলখানা জড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। চিয়াং-এর কথা শুনে গা থেকে কম্বলখানা খুলে নিয়ে তার দিকে ছুঁড়ে দিল। বেশ করে জড়িয়ে নাও। ওদিকে হাওয়া আসার পথটাও অনেকটা বন্ধ করে এসেছি।

এরপর সব নিস্তব্ধ। বাইরে হাওয়া বয়ে চলেছে। গুহার ভেতর পাথরগুলো ক্রমে বরফের টুকরো বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তারই ভেতর তন্দ্রা এসেছে। ক্লান্ত, শ্রান্ত দুটি প্রাণী আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। মৃত্যুরও বুঝি ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ জীবনের আশা থাকে। কিন্তু এই দুটি প্রাণী জীবনের প্রায় সবটুকু আশা ছেড়ে দিয়েছে। তাই মৃত্যু তাদের আর কোনরকমেই ভয় দেখাতে পারছেনা। পরম নিশ্চিন্তে ঘুমের ভেতর আশ্রয় নিয়েছে তারা।

ধীরে ধীরে ভোর হয়ে এলো। হাওয়ার বেগও কমে এলো। এরই ভেতর দেখা গেল প্রবল শীতে দুটি মানুষ পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। একসময় উঠল তারা। গুরুবস্ত্র বলল, চলো বেরোই এখান থেকে। মরতে হয় তো গুহার ভেতর পচে মরব কেন?

আমার কি হবে? চিয়াং-এর স্বরে কাতরতা।

যতক্ষণ পারি তোমাকে বয়ে নিয়ে চলব, তুমি আমাকে পথ দেখাবে। এমনি করে ভাগ্যে থাকে তো লোকালয়ে মিলে যেতে পারে।

আবার সেই পথ চলা। গুরুবক্সের বেঁচে থাকা যেন অমৃতের বল। একটি চক্ষুষ্মানকে পেয়ে সে যেন নতুন করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করছে।

ডাইনের পাহাড় ঘেঁষে চলো। খবরদার, সামনে পাথরের চাঁই। আর একটু বাঁয়ে আসতে পারো। আর নয়, আর নয়। এবার সামনে চলো।

চিয়াং গুরুবক্সের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়া পা-খানাকে কোন রকমে টেনে টেনে চলেছে আর নির্দেশ দিচ্ছে গুরুবক্সকে।

বাঁয়ে গভীর খাদ। নীচে একটা নদী বয়ে চলেছে। ঠিক যেন মাথার একটা রিবন পড়ে আছে। কি ভয়ঙ্কর পাহাড়। এমন নিষ্ঠুর নিরাভরণ রুক্ষতা, বুঝি মৃত্যুকেও হার মানায়। ওরা মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে ঝরে পড়া ঝর্ণার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছিল। বিশ্রাম নিচ্ছিল খানিক টেনে টেনে। ঝর্ণার জলে ভিজিয়ে নিচ্ছিল গলা। আবার পথ চলা। আশা ছেড়েও প্রাণের মায়া কাটাতে পারা কি সোজা কথা। সারাদিন পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে ওরা একসময় এসে পৌঁছল পাহাড়ের কোলে একটা সমতল-প্রায় জায়গায়। বহুকালের পরিত্যক্ত একটি পাথরের ঘর তারা আবিষ্কার করল। অবশ্য ঐ পাথরেরা জায়গাটুকুকে ঘর না বলে অন্য কিছুও বলা যেতে পারে। কে কবে এখানে এসেছিল, কেন যে উঁচু নির্জন পাহাড়ে ঘর বেঁধেছিল তা কেই বা বলবে। গুরুবক্সের কাঁধে ভর রেখে ঘুরতে ঘুরতে চিয়াং হঠাৎ ভীষণভাবে চেঁচিয়ে উঠল। আর একটু হলে গুরুবক্স হয়তো তাকে ফেলে দিত কাঁধ থেকে।

চিয়াং আনন্দে আত্মহারা। আর একটু নিয়ে চল, আর একটু বাঁয়ে। এবার একেবারে কাঁধের ওপর যতটা পার উঁচু করে তুলে ধর। গুরুবক্স কিছু দেখতে পাচ্ছিলনা, তবু সঙ্গীর মনের আনন্দের একটা কিছু বড় কারণ ঘটেছে জেনে উল্লসিত হয়ে উঠল।

গুরুবক্সের কাঁধের ওপর থেকে চিয়াং কি যেন কাটছে বলে মনে হোল। দু'চার বার ছোরাটা দিয়ে কোপ মেরে সে কি একটা বস্তু কেটে আনল। তারপর মাটিতে বসে সোল্লাসে গিলতে লাগল সেগুলো।

এই নাও নাও, বলা। পুরো এক কাঁদি কলা। খাও হে খাও।

গুরুবক্সের হাত ভরে গেছে ততক্ষণে। খোসা ছাড়িয়ে খেতে যেন তর সইছে না কারো। খেতে খেতে জল এলো গুরুবক্সের চোখে। ঈশ্বরের কি করুণা। অসহায় মানুষগুলোকে তিনি মৃত্যুর ভেতরেও বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছেন!

কি হোল হে তোমার, খাচ্ছনা যে? কি ভাবছ?

গুরুবক্স বলল, যিনি খাওয়াচ্ছেন তাঁর কথাই ভাবছি!

তার মানে? চিয়াং প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। তোমার কি মাথাটা বিগড়ে গেল নাকি হে? কে আবার এসে খাওয়াচ্ছে?

যিনি তোমাকে আর আমাকে মিলিয়ে দিলেন, সেই ঈশ্বরের কথাই বলছি। গুরুবক্সের গলায় কৃতজ্ঞতার সুর।

হো হো করে হেসে উঠল চিয়াং। এই ভগবান ভগবান করে গেলে তোমরা। জান, আমরা ওসব দেবতা টেবতা মানিনে।

ইচ্ছে করে যারা পাপ আর অন্যায় করে তারা কোনদিন ঈশ্বরকে মানেনা। গুরুবস্ত্রের গলায় অভিযোগ।

আর দুর্বল লোকেরাই ভগবান ভগবান করে মিথ্যে চেঁচামেচি করে, চিয়াং বলল।

চুপ করো, তুমি এখন রয়েছ আমাদের দেশের মাটিতে। এদেশে এখনো আমরা ভগবানকে মেনে চলি। তাঁর করুণার কথা মনে করি।

চিয়াং বলল, জান, আমার দেশ হলে তোমার মত ঈশ্বর-বিশ্বাসী লড়িয়েদের কমরেডরা গুলি করে মারতো।

গুরুবস্ত্র অমনি বলল, তবুও যেনো আমার বিশ্বাসের গায়ে ওরা কাঁক কাঁক গুলি করেও ছিদ্র করতে পারত না।

চিয়াং বলল, এখন ওসব তর্ককথা ছেড়ে দাও। এসো আমরা একটু বিশ্রাম করি।

গুরুবস্ত্র কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। নিজেকে এতক্ষণে সামলে নিয়েছে সে। বলল, সামনের রাতটা এই ঘরেই কাটাতে হবে।

চিয়াং বলল, ছাদ নেই, তবু উত্তুরে দাওয়াটাকে ঠেকান যেতে পারে। তবে সারারাত খোলা আকাশের নীচে প্রচণ্ড শীতে পড়ে থাকতে হবে।

গুরুবস্ত্রের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। আচ্ছা, কম্বলখানা দেয়ালের ওপর চাঁদোয়া করে পাথর চাপা দিয়ে রেখে দিলে ঘর হয়ে যেতে পারে। কোনরকমে কাজ চলার মত হলেই হল।

চিয়াং বলল, বুদ্ধিটা বের করেছ মন্দ না। তবে আর একটা কথা বলি, আশপাশে কিছু শুকনো মরা ডালপালা নিয়ে এসে জড়ো করে রাখলে রাতে আগুন জ্বালান যেতে পারে।

গুরুবস্ত্র মনে মনে কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, জড়ো করে রাখ ক্ষতি নেই, তবে তা জ্বালাতে যেও না যেন।

চিয়াং বলল, তার মানে?

বোঝ না কেন, আমরা এত অ'লানি পাব না, যা দিয়ে সারারাত আগুন জ্বেলে রাখতে পারি।

নাই বা জ্বেলে, যতক্ষণ চলে, চিয়াং উত্তর করল।

গুরুবস্ত্র বলল, তা হয় না। একবার তাপ পেলে শরীর আর একটুও শীত সইবে না। তখন একটু ঠাণ্ডা হাওয়াতেই আমাদের একেবারে জমে যেতে হবে।

যুক্তিটা চিয়াং-এর মনে ধরল। সে অমনি বলল, থাক তবে, পাতা কুড়িয়ে কাজ নেই। কাছে থাকলে আবার জ্বালাতে ইচ্ছে যাবে।

গুরুবস্ত্র বলল, সেই ভাল।

একসময় গান জুড়ে দিল দু'জনে। চেঁচিয়ে যদি শীতটাকে তাড়ান যায় সেই চেষ্টা।

চিয়াং গাইছে চীনে গান, আর গুরুবস্ত্র গাইছে ভারতীয়। গলা দিয়ে গাইছে দুজনে। কিন্তু সে গানের ঝোয়ারী অনেক। পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তারা ঝোয়ার ধরে চলেছে। একটি কথা শত কণ্ঠে যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে।

আবার তেমনি রাত কাটল। দুজন দুজনকে জড়িয়ে উত্তাপ পাবার চেষ্টা করল। শেষরাতে দুজনে উঠে পড়ল কিসের যেন ছোঁয়ায়। বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সর্বনাশ। কম্বলটা ইতিমধ্যে ভিজে

একেবারে অবসন্ন হয়ে গেছে। কয়েক ফোঁটা গায়ে এসে পড়েছে। কুঁকড়ে গুকড়ে বসল দুজনে। হাওয়া বইতে শুরু করেছে। শীত কাবড় দিচ্ছে। অসহায়ভাবে বসে রইল ওরা। সজোরে দাঁতে দাঁত চেপে ধরল। শরীরের ভেতর থেকে কাঁপুনি উঠে আসছে। হাঁটুর ভেতর মুখ গুঁজে রেখেছে গুরুবজ্র। চিয়াং-এর আহত পাখানা যেন অসাড় হয়ে এসেছে।

রেখ সরে গেল। অমনি ফুটে উঠল ভোরের আলো। ধীরে ধীরে বেলা বাড়তে লাগল আর সূর্যের তাপ ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

আবার উঠল ওরা। এবার গুরুবজ্র পিঠে করে বইতে লাগল চিয়াংকে। চিয়াং প্রায় সবটুকু শক্তিই তার হারিয়েছে। কাল থেকে আহত পা-খানাতে সে আর কোন সাড়াই পাচ্ছিল না। অন্য পাটাও তার খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলতে গিয়ে ফুলে উঠেছে।

গুরুবজ্র পথে নামাল চিয়াংকে। বলল, আমি উবু হয়ে বলছি, তুমি এই কম্বলখানার ভেতর নিজেকে জড়িয়ে আমার পিঠে চেপে বস। ঐ কম্বলের দুটো প্রান্ত ধরেই আমি পথ চলব। তাতে অনেক সুবিধে।

চিয়াং তাই করল। গুরুবজ্র চলতে লাগল চিয়াং-এর নির্দেশে।

তারা উৎরাই-এর পথ ধরেছে। ঐ নীচের মহীটার কূলে পৌঁছতে পারলে হয়তো একটা লোকালয় মিলতে পারে। প্রাণপণ পথ চলছে গুরুবজ্র। মাঝে মাঝে উঁচু কোন টিলার কাছে এসে বসে বসে দম নিচ্ছে। আবার চলছে এগিয়ে।

এমনি কতক্ষণ পথ চলল ওরা। গুরুবজ্র মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, কোন কিছু দেখতে পাচ্ছ?

চিয়াং হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কই না তো!

এক সময় ওরা একটা বনের ধারে এসে পৌঁছল। চীর পাইনের বন। গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে লাগল ওরা। ঝিমুনি এসে গিয়েছিল গুরুবজ্রের। সবটুকু শক্তিই যেন তার নিঃশেষ হয়ে এসেছে। হঠাৎ গায়ে প্রবল একটা চাপ অনুভব করল সে। চিয়াং তার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বলল, যত তাড়াতাড়ি পার আমাকে টেনে নিয়ে চল। সামনেই পাহাড়ের কোলে একটা গুহা। চল ওরই ভেতর ঢুকে পড়ি।

কি হোল কি? গুরুবজ্রের গলায় উদ্বেগ।

কোন কথা নয়, উঠে পড় তাড়াতাড়ি। একটু দেরী হলেই বিপদে পড়বে।

গুরুবজ্র চিয়াংকে ধরে তুলল। তারপর এগিয়ে চলল চিয়াং-এর নির্দেশে। অবশেষে তারা এসে পৌঁছল সেই গুহার মধ্যে।

গুরুবজ্র কি যেন বলতে যাচ্ছিল, মুখখানা চেপে ধরল চিয়াং। কিছুক্ষণের ভেতর ভারী বুটের শব্দ শুনতে পেল ওরা। আওয়াজ ক্রমে এগিয়ে এল। তারপর শোনা গেল দু'চারটে কথা। গুরুবজ্র বুঝল চীনে সৈন্যরা এখানে কোথাও ঘাঁটি গেড়েছে। কিন্তু ওদের দেখে অমন করল কেন চিয়াং। ওর তো খুশী হবারই কথা। ব্যাপারটা অদ্ভুত রহস্যময় বলে মনে হোল গুরুবজ্রের কাছে।

এমনি কত সময় পার হয়ে গেল। কারো মুখে কথা নেই। কখন মিলিয়ে গেছে পায়ের আওয়াজ, তবু সাহস করল না তারা গুহার বাইরে যেতে।

চিয়াং বলল, এ ঘাঁটি থেকে বেরোব কি করে তাই ভাবছি।

গুরুবক্স বলল, ওরা তো কতক্ষণ চলে গেছে, এবার বেরোলে হয় না ?

চুপ করো, বোকার মত কথা বোল না ; এখনো বেলা আছে। বের হলেই ধরা পড়ে যেতে হবে।

আবার কিছুক্ষণ নীরবতা।

এক সময় গুরুবক্স বলল, দেখ চিয়াং, ব্যাপারখানা কেমন গোলমেলে ঠেকছে আমার কাছে।

কিসের গোলমাল ? চিয়াং প্রশ্ন করল।

এই যে তুমি এই গুহার ভেতর লুকিয়ে রইলে, অথচ আওয়াজ শুনে মনে হোল তোমার দলের লোকেরাই চলেছে।

চিয়াং বলল, সেইজন্যেই তো লুকিয়ে রইলাম।

তোমার কথাগুলো খুবই গোলমেলে ঠেকছে ; নিজের লোকের কাছে সকলেই তো যেতে চায়।

চিয়াং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে বলল, যেতে চাইলেই কি যেতে পারা যায়। এই যে দিনের পর দিন না খেয়ে পথ চলেছি, বল তো এ কিসের জন্যে ? প্রাণের মায়ায়। খোঁড়া হয়ে অন্ধ হয়েও মানুষ মরতে চায় না, বেঁচে থাকতেই চায়।

গুরুবক্স বলল, নিজের দেশের মানুষের কাছে গেলে আমার যা হোক, তুমি তো বেঁচে যেতে পারতে।

একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল চিয়াং-এর মুখে। সে হাসির অর্থ বোঝার মত দৃষ্টি ছিল না গুরুবক্সের। তাহলে সে দেখতে পেত কত দুঃখে চিয়াং-এর বিকৃত শুষ্ক মুখখানাতে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে।

চিয়াং বলল, আমরা কমিউনিষ্ট কারখানায় বাস করি। সেখানে সকলেই এক একটি যন্ত্র।

তার মানে ? গুরুবক্স প্রশ্ন করল।

যন্ত্রের যা কাজ তাই আমরা করি। সারাদিন সেখানে শ্রম দিতে হয়। দেশের উন্নতির জন্যেই নাকি আমাদের এ খাটুনি।

তারপর মানেটা খুবই সোজা। যন্ত্রটা তার ক্ষমতার বেশী করতে গিয়ে একসময় বিকল হয়ে যায়। তখন পিটিয়ে, প্যাচ দিয়ে তাকে সিধে করার চেষ্টা চলে। তাতেও যদি কাজ না মানে, তখন টেনে ফেলে দেওয়া হয় দূরে।

তাহলে তুমি বলতে চাইছ, তোমরা এক একটি যন্ত্র, গুরুবক্স বলে।

চিয়াং বলল, ঠিক তাই, যতক্ষণ কাজ করতে পারব ততক্ষণ দাম, তারপর একেবারে অস্তিত্ব লোপ।

তুমি তো দেশের হয়েই যুদ্ধ করছ। তুমি আহত হলে দেশের সরকারই তো তোমাকে দেখবে, গুরুবক্স বলল।

ঐ যে বললাম, যতক্ষণ আমি সরকারকে দেব, ততক্ষণ আমার দাম, তারপর আমি অনাবশ্যক, অতিরিক্ত। আমি এখন খোঁড়া হয়ে গেছি। আর যা হোক, যতকাল বাঁচবো ততকাল আমাকে দিয়ে যে সরকারের কিছু কাজ হবে না, তা ওরা জানে। তাই একটা অজুহাত দেখিয়ে ওরা আমাকে গুলি করে মারবে।

কি বলছ তুমি চিয়াং ? গুরুবক্সের গলায় অবিশ্বাসের সুর।

এত মানুষ আমার দেশে, যে খেতে দেওয়া একটা কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা খোঁড়াকে খেতে দেওয়ার চেয়ে একটা যুদ্ধের ঘোড়াকে খেতে দিলে লাভ হবে অনেক বেশী।

গুরুবক্স বলল, তোমার ছেলে বৌ এ অবস্থায় তোমাকে সাহায্য করবে না?

তারা সকলেই সরকারী কারখানার কর্মী। সবাই একটা বড় ঘরে বন্দী হয়ে আছে। যা খাওয়াচ্ছে তাই খাচ্ছে, যা দেখাচ্ছে তাই দেখছে, যা শোনাচ্ছে তাই শুনছে। তাদের আলাদা করে ভাববার কোন সুযোগই নেই।

গুরুবক্স এবার বলল, এসব কথা যারা কমিউনিষ্ট নয় তাদের কাছ থেকেই শোনা যায়, কিন্তু তোমার কাছ থেকে শুনব আশা করিনি।

চিয়াং উত্তেজিত হয়ে উঠল, আমাদের কথা আমরা যতটা জানি, বাইরের মানুষ তার কতটুকুই বা জানে। তারা যা বলে তার চেয়ে ঘটে অনেক বেশী। একটু থেমে চিয়াং আবার বলল, কে এই পাহাড় ডিঙিয়ে প্রাণের মায়া ছেড়ে এখানে আসত, বলতে পার? কত দুঃখে মানুষ দেশের লোককেও এমন ভয় করে চলে তা তুমি কি করে বুঝবে বল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। কারো মুখে কথা নেই। এক সময় গুরুবক্স বলল, তোমরা প্রতিবাদ করনা কেন? এ জীবনকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছ কেন?

চিয়াং বলল, সে অনেক ইতিহাস। তবে খুব সংক্ষেপে জেনে রাখ, প্রথমে আমাদের অনেক কথা বোঝান হয়েছিল, কিন্তু তোমাকে বলতে বাধা নেই, সে হাওয়াই ইমারত ভেঙে গেছে।

গুরুবক্স বলল, আমাদের দেশেও অভাব নেই এমন নয়, তবে সে অভাবের বিরুদ্ধে জোর করে প্রতিবাদ জানাতেও আমাদের কোন বাধা নেই।

চিয়াং একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। গুরুবক্স এবার অন্য প্রশ্ন তুলল, কটি ছেলেমেয়ে তোমার?

চিয়াং বলল, তাদেরকে বলবার, আমার কোন ছেলেমেয়ে নেই। তাহলে হয়তো প্রাণের মায়া ছেড়ে শুধু তাদেরই দেখার জন্যে একবার ফিরে যেতে হত!

তোমার স্ত্রী? গুরুবক্স প্রশ্ন করল।

উদাস সুরে জবাব দিল চিয়াং, সে কমিউনে কাজ করছে। যখন দেখবে আমি যুদ্ধ করতে এসে ধোয়া গেছি, তখন আমার মনে হয়, কমিউনের সেক্রেটারীকে বিয়ে করে ফেলবে।

কি করে একথা ভাবতে পারলে তুমি? গুরুবক্সের গলার উত্তেজনা ফুটিয়ে উঠল।

মন বলছে, তাই বলছি; চিয়াং বলে চলল, আমার স্ত্রী সুন্দরী, তাই সেক্রেটারীর চোখ অনেকদিন থেকেই পড়েছে তার ওপর।

সেক্রেটারী বলে, মা সোরে একটা কুচক্র গোলাপ।

যেদিন প্রথম কথাটা শুনি, সেদিন জেনেছি, আমার কপাল ভেঙেছে।

তারপর কমিউনের কাজ থেকে আমাকে কৌশলে সরিয়ে যুদ্ধের কাজে পাঠাল কমরেড সেক্রেটারী।

তুমি শুনে কি ভাববে জানিনা, সারাদিন যুদ্ধের পর ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওর কথা মনে হোত ট্রাউজিতে শুয়ে শুয়ে। একদিন একখানা চিঠিও ওর কাছ থেকে পাইনি আমি।

গুরুবক্স বেশ বুঝল, কথা বলতে বলতে আটকে যাচ্ছে চিয়াং-এর গলা। সে যে বড় রকম একটা আঘাতকে সহ্য করার চেষ্টা করছে তা বুঝতে বাকী রইল না গুরুবক্সের।

কতক্ষণ পরে চিয়াংই আবার কথা বলল, বাড়ীতে তোমার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে রয়েছে নিশ্চয় ?

গুরুবন্ধু বলল, আছে, তবে ছেলেমেয়ে নয়, স্ত্রী।

যদি আমরা কোনদিন লোকালয়ে যেতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই তুমি ফিরে যাবে তোমার স্ত্রীর কাছে ? চিয়াং জানতে চাইল।

গুরুবন্ধুর চোখের ওপর ফুটে উঠল একখানা ছবি। সমের ক্ষেতের পাশে তার ছোট্ট ঘরখানা। মাস খানেক ছুটি কাটাতে এসেছিল সে ঘরে। কটা দিন যেতে না যেতেই হঠাৎ জরুরী তলব এলো। সঙ্গে সঙ্গে তাকে চলে আসতে হোল ফ্রন্টে।

আসার সময় দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল তার স্ত্রী। চোখে জল, মুখে একটুকরো হাসি। হাসিমুখেই বিদায় দিতে হয়, এই রীতি। পথের বাঁকে মিলিয়ে যাবার আগে ও একবার ফিরে তাকিয়েছিল, তখনো দুটি চোখের করুণ দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করছিল।

গুরুবন্ধু ফিরে এল চিয়ার রাজ্য থেকে। চিয়াং-এর প্রশ্নের উত্তরে বলল, নিশ্চয়ই ফিরে যাব। আমার স্ত্রী যে পথ চেয়ে বসে রয়েছে। আর তাছাড়া···

কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল গুরুবন্ধু। চিয়াং বলল, তাছাড়া কি ?

সলজ্জ হাসি হেসে বলল গুরুবন্ধু, এতদিনে একটা বাচ্চারও আশা করছি আমি।

চিয়াং বলল, কি কপাল তোমার, বাচ্চাটাকে দেখতেও পাবে না।

গুরুবন্ধু কিছুক্ষণ কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর একসময় বলল, যদি ভগবানের দয়ায় কোনদিন ফিরতে পারি ঘরে, তাহলে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, বুকের ভেতর চেপে ধরে ওকে দেখব আমি। এমন করে ঘরে রাখব যে চোখের বাইরে ও আর পালাতে পারবে না।

চিয়াং দেখল, গুরুবন্ধুর অন্ধ দুটো চোখের মণি ভরে জল এসেছে।

কাঁদছ কেন ? তোমার মত সুখী আর কে আছে বল, চিয়াং বলল।

চোখ মুছল গুরুবন্ধু। লজ্জা পেয়ে মুখে টেনে আনল একটুকরো হাসি। তাছাড়া মনে মনে ভাবল, নিজের সুখী জীবনের কথা বলে সে চিয়াং-এর মনে কষ্ট দিচ্ছে। কত অসহায় এই লোকটা। নিজের দেশ, নিজের স্ত্রী যার কাছে পর হয়ে গেছে, তার চেয়ে দুঃখী আর কে আছে।

রাত নামল। জ্যোৎস্না ঝরে পড়তে লাগল আকাশ থেকে। সামনে চীর পাইনের গাছগুলো পাহাড়ের ওপর দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। পাইনের ছায়ার আড়ালে আত্মগোপন করে পালাতে লাগল ওরা।

রাতে বুটের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলছিল ; হঠাৎ হিন্দি ভাষায় দূর থেকে প্রশ্ন ভেসে এলো।

সঙ্গে সঙ্গেই থমকে থেমে গেল ওরা। গুরুবন্ধু আর একটু হলেই চেঁচিয়ে উঠছিল আর কি।

চিয়াং তার মুখখানা প্রবল জোরে চেপে ধরল। চাপা উত্তেজনায় বলল, খবরদার, একটিও কথা নয়। গুরুবন্ধু অবাক হয়ে শুধু দাঁড়িয়ে রইল। চিয়াং-এর উদ্দেশ্য সে কিছুই বুঝতে পারল না।

দু'চারবার হিন্দিতে কে যায়, কে যায় প্রশ্ন করেই থেমে গেল প্রশ্নকর্তা।

কতক্ষণ ওরা দাঁড়িয়ে রইল গাছের আড়ালে। রাতের কীট পতঙ্গরা ডাকছে। বিচিত্র সে ডাক। প্রবল শীতেও মনে হল ঘামছে চিয়াং।

এক সময় চিয়াং বলল, গুঁড়ি মেরে চল, বনটা পেরিয়ে যাই।

ওরা অনেক কষ্টে গাছের আড়ালে আড়ালে হামা দিয়ে চলতে লাগল। কতক্ষণ এমনি করে চলেছিল তার হিসেব নেই। একটা উত্তেজনার ঝোঁকেই চলছিল ওরা।

এক সময় বন শেষ হল। ওরা একটা পাহাড়ের আড়ালে নিজেদের লুকোবার সুযোগ খুঁজে পেল।

বড় ক্লান্ত। পথের ওপর বসে বসে হাঁফাতে লাগল ওরা।

শুকবস্ত্র এতক্ষণ কিছু বলার সুযোগ পায়নি। এবার বিরক্ত হয়ে উঠল।

তুমি তখন আমাকে বারণ করলে কেন? তুমি কি বুঝতে পারনি ওরা আমাদেরই লোক। আমাদের মাতৃভাষাতেই ডাক দিচ্ছিল।

বহু দুঃখেও চিয়াং-এর হাসি পেল।

ও বলল, এ আমাদের যুদ্ধেরই একটা কৌশল। শত্রুপক্ষের ভাষা আমাদের কিছু কিছু শিখতে হয়। যুদ্ধের ভেতর শত্রুপক্ষের ভাষার নির্দেশ জারী করে তাদের অনেক রকমের বিপদে ফেলা যায়। তারা তাবে নিজেদের লোকেই নির্দেশ দিচ্ছে, কিন্তু শেষে ঠকতে হয় তাদের।

শুকবস্ত্র বলল, সত্যি, তাহলে জোর বাঁচাই বেঁচে গেছি।

চিয়াং বলল, আমি এ সব জানি বলেই তোমাকে এমন করে বারণ করেছিলাম।

রাত কাটল, দিন এলো; আবার রাত আবার দিন।

বিশাল হিমালয় পর্বতমালা; অগণিত গিরিখাদ, গিরি নির্ঝরিণী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দুটি বিন্দু কখনো নড়ছে, কখনো বা স্থির হয়ে বসে আছে ঝর্ণার ধারে। ক্লান্ত অবসন্ন।

তারা খুঁজছে মানুষ লোকবসতির চিহ্ন। হিমালয়ের বুকে একটু জীবনের আশ্বাস। মাঝে মাঝে তারা স্বপ্ন কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। খড় মানুষটি নাগালের মাঝখানে ধরতে না পেরে আক্রোশে ছুঁড়েছে। আবার অস্ত্রটি ফিরে ফিরে তার সঙ্গীকে দিয়ে মারবার জন্যে। আবার কখন কোমল হয়েছে ওদের মন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখেছে বাঁচবার।

ওরা চলেছে এগিয়ে। স্বপ্ন কথার মত বস্ত্র নিয়ে চলেছে অন্ধকে পথ দেখিয়ে, আর অন্ধ বয়ে নিয়ে চলেছে খঞ্জকে। কখনো বা পাতালের অন্ধশক্তি নাড়া দিয়েছে কঠিন হিমালয়ের দেহ। কেঁপে কেঁপে উঠেছে পাহাড়, হুড়মুড় করে খসে ঝরে পড়ে গেছে শিলা। ওরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও বেঁচে গেছে আশ্চর্যভাবে। কিন্তু সব ক্ষমতারই একদিন শেষ হয়, আশার হয় অবসান।

ওরা একদিন এসে পৌঁছল ত্রিকোণ এক পাহাড়ের একটি প্রান্তে। বেলা শেষের আর বাকী ছিল না। শুকবস্ত্র মনে মনে স্থির করেছে, এ দুঃসহ জীবনের শেষ আজ সে করবেই। চিয়াং-এর আহত দেহটাও প্রায় অসাড় হয়ে এসেছিল। চিয়াংকে কাঁধে নিয়েই অন্ধ আবেগে শুকবস্ত্র ছুটে চলল। এ ছুটে চলার অর্থ সে জানে। এক সময় গভীর খাদে পড়বে সে। আর শেষ হবে তাদের সকল ক্লেশ আর সকল চেষ্টার।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে থেমে গেল গুরুবজ্র। ত্রিকোণ পাহাড়ের কোণটিতে ততক্ষণে সে এসে গেছে। আর এক পা এগোলেই মৃত্যু।

ঘণ্টা বাজছে, চং চং চং চং। পাহাড় কাঁপিয়ে কি আশ্চর্য মধুর ঘণ্টা বেজে চলেছে।

দাঁড়িয়ে গেছে গুরুবজ্র। কান খাড়া করে শুনছে সে সেই অভাবনীয় সংগীত।

আজন্ম ভয় কেটে গেছে চিয়াং-এর। চেঁচিয়ে উঠল সে, ঐ তো, ঐ তো দূরে গ্রাম দেখা যায়। পাহাড়ের বুকে ছবির মত লোকালয়। গাছপালা, ছোট ছোট ঘরবাড়ী সবই দেখা যাচ্ছে।

এবার উঠল দুজনে। শ্রান্তি কোথায় চলে গেছে। গুরুবজ্রের দেহে হাজারো হাতির বল। চিয়াং-এর নির্দেশে সে এগিয়ে চলল লোকালয়ের দিকে।

পাহাড়ের কোল জুড়ে গ্রাম। একটি নদী বয়ে চলেছে তার মাঝ দিয়ে। নদীতীরে গাছের সারি। ছায়াচ্ছন্ন গাছের ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়ীদের কাঠ আর পাথরের বাড়ীঘর।

ওরা এসে পৌঁছল গ্রামের ভেতর। কিন্তু একটিও মানুষ দেখা গেল না। ওরা বিস্মিত হল। তখনও ঘণ্টা বেজে চলেছিল। ওরা সে ঘণ্টার আওয়াজ অনুসরণ করে এসে পৌঁছল গ্রামের প্রান্তে।

একটি বৌদ্ধ স্তূপ। চারিদিকে পবিত্র পরিচ্ছন্নতা। মন্দিরের সামনে একটি ফুলন্ত গাছ। সাদা সাদা রাশি রাশি ফুলে ডাল ভরে আছে। গাছের তলায়, মন্দিরের চত্বরে ঝরে পড়েছে অজস্র ফুল।

মন্দিরের ভেতর বুদ্ধের বিগ্রহ। ধূপ জ্বলছে সারে সারে। একটি বৃদ্ধ মানুষ একপাশে দাঁড়িয়ে লোহার শেকলে বাঁধা বিরাট আকারের একটি ঘণ্টাকে টেনে চলেছে। আকাশে বাতাসে পাহাড়ে পাহাড়ে ভেসে চলেছে তার প্রতিধ্বনি।

নতজানু হয়ে চিয়াং আর গুরুবজ্র বসে পড়ল মন্দিরের সামনে। ভুলে যাওয়া শৈশবের দিনগুলো ফিরে এল চিয়াং-এর জীবনে। মায়ের সঙ্গে ছেলেবেলা বুদ্ধ মন্দিরের সামনে বসে সে প্রার্থনা করত। আজ ঠিক তেমনি করেই বুদ্ধের শরণ নিল চিয়াং সোয়ে।

ধারা বয়ে চলেছে চোখ বেয়ে। ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, মৃতপ্রায় দুটি মানুষ করুণাময় বুদ্ধের চরণে এসে আশ্রয় পেল।

পূজা শেষে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন সেই বৃদ্ধ পূজারী। চোখ দুটি করুণায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর। বললেন, তোমরা বড় শ্রান্ত বলে মনে হচ্ছে, চলো তোমাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করি।

তাঁকে অনুসরণ করে ওরা মন্দিরের পেছনে একটি কাঠের ঘরে এসে পৌঁছল।

পূজারী বললেন, যারা শ্রান্ত হয়ে আসে, তাদের জন্যে তথাগতের করুণা এখানে অপেক্ষা করে আছে।

ওরা আশ্রয় পেল। মৃত্যুর দুর্গম পাহাড় অতিক্রম করে ওরা পেল জীবনের নিশানা।

ভোরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল চিয়াং-এর। চোখ মেলে দেখল একটি সেবাময়ী রমণী তার ক্ষতস্থানটিতে কি যেন প্রলেপ লাগিয়ে বেঁধে দিচ্ছে। গুরুবজ্রের শিয়রে বসে রয়েছেন পরম সৌম্য সেই বৃদ্ধ।

চিয়াং-কে চোখ মেলতে দেখে বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন। বললেন, এখানে মানুষ ছাড়া হিংসার কোন জাতি নেই, তুমি নির্ভয়ে বিশ্রাম কর।

উঠে বসল চিয়াং ; ঘুম থেকে জাগল গুরুবয়।

কথায় কথায় এক সময় তারা জানতে চাইল এই জনহীন গ্রামের ইতিহাস।

বৃদ্ধ বললেন, এ গ্রাম সরল পার্বত্য মন্‌গাদের। যুদ্ধের ঢেউ এসে লেগেছিল এখানে। গ্রামবাসীরা ছিটকে পড়লো কে কোথায়। আর নিহত হল তারা, যারা রুখতে গিয়েছিল আক্রমণ।

এ গ্রামে আজ শুধু দুটি প্রাণী রয়েছি আমরা। বৃদ্ধ বলে হয়তো আক্রমণকারীরা আমাকে ত্যাগ করেছে, আর ত্যাগ করেছে ঐ মেয়েটিকে, কেবল তাদের দৃষ্টিপথের আড়ালে ছিল বলে।

চিয়াং দেখল, মেয়েটি অদূরে কতকগুলি শিলাস্তূপের পাশে নতজানু হয়ে বসে রয়েছে। সামনে ছড়ান পড়ে আছে কতকগুলি ফুল।

চিয়াং-এর দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বৃদ্ধ বললেন, নিহত মানুষদের কবর রয়েছে ওখানে। মেয়েটি তাদের আত্মার কল্যাণের জন্যে প্রার্থনা করছে। দুটি চৈনিক সৈন্যও রয়েছে ওদেরই ভেতর।

থামলেন বৃদ্ধ। প্রার্থনার শেষে মেয়েটি উঠে গেল ঘরের মধ্যে। নিয়ে এল উষ্ণ পানীয় আর কিছু ফল।

শয্যায় বসে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগলো দুজনে। মেয়েটি চিয়াং-এর ক্ষতস্থানের দিকে মমতা ভরা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো।

বৃদ্ধ বললেন, এর স্বামী এই সেদিন নিহত হয়েছে চৈনিক আক্রমণে।

কথাটা বলেই মনে মনে কেমন অস্বস্তি বোধ করলেন বৃদ্ধ। হয়তো এই কথায় সঙ্কুচিত হতে পারে বিদেশী সৈন্যটির মন, তাই বললেন, নদীর ধারায় সব কিছু ময়লাই ধুয়ে মুছে যায়। তাঁর করুণার ধারায় মনের সব ময়লাই একদিন পরিষ্কার হয়ে যাবে।

একটু থেমে বললেন, করুণাময় আজ তোমাদের এখানে এনে ফেলে তাঁর চিরদিনের বাণীকেই সফল করলেন।

চিয়াং আর গুরুবয়ের মাথা নত হয়ে এলো।

তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠলো একটি ছবি। করুণাঘন তথাগত আশীর্বাদের মুদ্রায় বাহু প্রসারিত করে আছেন। ঘণ্টা বাজছে, মহাজীবনের মিলন-সংগীত।

আমার

প্রিয় স্কিন্ ক্রীম **বোরোলীন**কে

ভোলা অসম্ভব!

টাকার বাজার

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অনাদি চক্রবর্ত্তী ব্যবসা-বাণিজ্য করেন। নেতাজী সুভাষ রোড অঞ্চলে কোনো বাড়ীর একটা হল্-ঘর ভাড়া লইয়া সেই হলে কাঠের বহু পার্টিশন লাগাইয়া অফিস খুলিয়াছেন। অফিস-কামরা যথারীতি সুসজ্জিত। কামরার দরজার টুলে বসিয়া থাকে পাগড়ী-মাথায় চাপকান্ পরা বেয়ারা। নিত্য বহুলোক আসে; কার্ড পাঠাইয়া অনুমতি মিলিলে অনাদি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কাজের কথা কহিয়া কেহ খুশী-মনে কেহ বা বিরস বদনে চলিয়া যায়।

অনাদি চক্রবর্ত্তী কথা বলেন মিষ্ট, হাসেন মিষ্টতর। এবং...

যারা দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসে, তাদের অবস্থা বুঝিয়া অনাদি চক্রবর্ত্তী যথাযোগ্য ভাষা ব্যবহার করেন। বেকার উমেদারদের এ অফিসে প্রবেশ অধিকার নাই। অফিস-গৃহের সামনে বোর্ড। তাহাতে ইংরেজী হরফে লেখা আছে—No Vacancy.

ব্যবসা-বাণিজ্যে এমন মাথা কি কোন বাঙালীর আছে? দৈনিক ইংরেজী ও বাঙালা কাগজগুলায় মাসে দু'বার করিয়া অনাদি চক্রবর্ত্তীর ছবি বাহির হয়; সেই সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে এমন সব কথা ছাপা হয় যে, পড়িয়া পাঠকদের তাক্ লাগিয়া যায়। তারা ভাবে, এমন মাথার আদর অভাগা বাঙলা দেশ কবে করিতে শিখিবে!

দু'চারজন ধনীর দুলাল নিত্য তাঁর কাছে আসে। অনাদি চক্রবর্ত্তী বলেন,—জানি না, কত টাকা নিয়ে ব্যবসায় নামতে চাও! তবে তোমায় দেখে মনে হচ্ছে, তুমি যে কারবারে নামছো, তার উদ্দেশ্য এ নয় যে তুমি কোটীপতি হবে, তা যদি চাও, তাহলে তোমাকে কোনো পরামর্শ আমি দিতে পারবো না ভাই।...আমার কাছে অনেক বোনেদী ঘরের ছেলে আসে—তোমারই মতো বুদ্ধিমান বহু সভ্য ছেলে,—তারা আমার হাতে টাকা দিতে চায়, বলে, আপনি খাটিয়ে দিন, যে ভাবে উচিত মনে করেন। আমি হাসি,—হেসে জবাব দিই, এমন ব্যবসা যদি করতে চাও তো চলে যাও ঘোড়াঘোড়ের মাঠে—back some favourite horse! আসল কথা কি জানো ভাই, ব্যবসার ব্যাপারে তোমরা তো কখনো মাথা ঘামাও না...সেক্সপীয়র, ইব্‌সেন, কালচার, ওরিয়েন্টাল ডান্স—এ সবের চিন্তায় তোমরা বিভোর! দেশকে যদি তুলতে চাও, শত কোটী মূক মৌন লোকের মুখে যদি চাও ভাষা দিতে, তাদের ভাঙা বুকে আশা জাগাতে...তাহলে সে চাওয়া আর ব্যবসায় নামা—দুটো এক জিনিষ নয়! তবে হ্যাঁ, যদি বলো, আমার লাখ টাকা আছে, আমি এর উপরে আরো একলাখ-অর্থাৎ মোট দু'লাখ করতে চাই—আমার উপর যদি সে বিশ্বাস, সে নির্ভর রাখতে পারো...অর্থাৎ...বুঝলে কি না...

এই কথার মধ্যে পাঁচ-সাতজন কেরাণী, দু'তিন জন বেয়ারা মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসিয়া উদয় হয়। কেহ কাগজ সহি করায়, কেহ চিঠির মুসাবিদা দেখাইয়া লইয়া যায়,—কেহ চেক্ বহিতে

মোটা টাকার হদায় সহি নয়; কেহ আনে ভারী রকমের বিল—এবং এত গোলযোগের মধ্যেও অনাদি চক্রবর্ত্তীর বক্তব্য এতটুকু খেই-হারা হয় না! অর্থাৎ সকল দিক দিয়া তাঁর সুমধুর বক্তব্য আশায়-আশ্বাসে এমন জাগ্রত হইয়া ওঠে যেন শিকারকে কায়দা করিবার এগুলাই মজবুত ফাঁদ!

শেষে টেলিফোন রিসিভার টানিয়া অনাদি চক্রবর্ত্তী বলেন,—ক্যালকাটা 12345 Yes Miss··· সঙ্গে সঙ্গে হাসির মনোহর আমেজের উপর দিয়া শেষ কথাগুলি অধর-প্রান্ত দিয়া রিকমিক্ করিয়া গড়াইয়া পড়ে—তাহলে ভেবে দেখো ভাই, যদি সে বিশ্বাস রাখতে পারো···মানে, কি জন্যে, আমি লক্ষপতি নই! তবে দরিদ্র দেশ, অ-ব্যবসায়ী জাত—যদি কাহাকেও লক্ষপতি হবার ব্যাপারে কিছু সাহায্য করতে পারি, অর্থাৎ, কাঠ-বিড়ালীর সেতু-বন্ধন আর কি···তাহলে আমি খুব খুশী হবো। এর চেয়ে সার্থক কাজ জীবনে আর কি আছে!···(টেলিফোনে মনোযোগ-দান এবং) হাঁ, হাঁ··· কে? বিষ্ণুবাবু···কেন ভাই, গরীবের সামান্য বিলটা চুকিয়ে দিতে এত দেরী করছো! সাহেবকে বলো··· বিশ হাজার টাকা তোমাদের অফিসে তো নস্যির সমান···হাঁ, হাঁ, মানে, টাকাটা আমার নয়···এক ভদ্রলোক তাঁর বিধবা শাশুড়ীর টাকাটা আমার হাতে দেছেন···খাটিয়ে দেবার জন্য। মেয়ে-মানুষের টাকা···বুঝছেন তো, আমার দায়িত্ব ··তাই আর কি···All right!··(রিসিভার রাখিয়া) মানে, একটা বড় কাজ আছে। তোমাকে এমন কথা বলি না যে You risk your fortune···খবর্দ্দার, সে দুর্ম্মতি কখনো করোনা। এ কাজে sure gain···চাও যদি তোমার টাকা তিনগুণ হয়ে ফেরত আসবে···ছ'মাসের মধ্যে···

এমনি ভাবে বিবিধ ক্যাপিটালিষ্টকে টাকা-বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথে বিচরণের উপদেশ-বর্ষণে অনাদি চক্রবর্ত্তীর শক্তি অসাধারণ এবং এ উপদেশ বর্ষণে বহুজনের হৃদয়-ভূমি উর্ব্বর মুস্নিগ্ধ হয়। তাহারি ফলে অনাদি চক্রবর্ত্তীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি চক্রবৃদ্ধি হারে···

সাত বৎসর অফিস চালাইবার পরে অনাদি চক্রবর্ত্তী ভাবিতেছিলেন—এবারে রিটায়ার করিবেন,···সহসা কোথা হইতে শনিগ্রহ আসিয়া চুঁ মারিয়া বৃহস্পতি-গ্রহকে গোঁতা দিয়া লক্ষ্মীর আসন দিল উল্টাইয়া—শ্রীবৎস রাজার সভায় লক্ষ্মীর সঙ্গে সেই যে বিবাদ সে বিবাদের শোধ শনি তুলিল অনাদি চক্রবর্ত্তীর গলায় হাত দিয়া···

কি করিয়া এত বড় বনিয়াদে কাটল ধরা পড়িল এবং সে কাটলে কি করিয়া বহু ধনী ভক্তের টাকা প্রবেশ করিয়া তাদের রিক্ত করিয়াছিল, তাহার সবিস্তার কাহিনী যাঁরা জানিতে চান তাঁহাদিগকে আমরা পুলিশ কোর্টের রেকর্ড-রুমে মামলা-মকর্দ্দমার নথিপত্র দেখিতে অনুরোধ করি। কয়েকটা মকর্দ্দমার কাগজপত্র দেখিলেই সে রহস্য পরিষ্কার ভাবে বুঝা যাইবে। দেখিবেন শুধু Republic of India Vs Anadi Chakravarti & others মকর্দ্দমাগুলির নথি!

প্রচণ্ড আঘাত···সেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো! শিছনে ছিল গৃহ-শত্রু বিভীষণ · তাগে ছুট না হইয়া অনাদি চক্রবর্ত্তীকে দুর্ভাগা বানাইয়া দিল!

আরো পাঁচ বৎসর। এ পাঁচ বৎসর কাটিল শ্রীঘরে।

পাঁচ বৎসরে অনাদি চক্রবর্ত্তীর দেহে মনে প্রভূত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে। জেলের বাহিরে মুক্ত আলোয় আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র অনাদি চক্রবর্ত্তীর মন ভয়ে দুরদুর করিয়া উঠিল। কে জানে, ইতিমধ্যে আরো ক'টি বুদ্ধি-কৌশল যদি ধরা পড়িয়া থাকে এবং তার ফলে আবার যদি ঐ পুলিশ-কোর্ট মারফৎ এই গৃহেই আসিতে হয়!

পথের লোকের পানে চাহিতে বুকটা ছাৎ করিয়া উঠে। ট্রাম-বাস এড়াইয়া পরিচিত দৃষ্টি বাঁচাইয়া অনাদি চক্রবর্ত্তী সন্তর্পণে আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে আসিয়া আয়নায় মুখ দেখিল—চেনা যায় না। পাঁচ বৎসরে বয়স যেন বারো বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে!

অথচ দিন পড়িয়া আছে। একটি একটি করিয়া এ দিন চালাইতে হইবে! হাতে কিছু পয়সা ছিল। উকিল-কৌঁসুলির হাত বাঁচাইয়া এখনো কিছু অবশেষ আছে। সে টাকা ব্যাঙ্কে। প্রথমে ব্যাঙ্ক হইতে সে টাকাটা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

ভাবিল, আর ও সঙ্কল্পের পথে চলা হইবে না। ও পথে আরাম যেমন, বিপদের ভয়ও তেমনি। দামী লোক মোটর চড়িয়া বেড়াইলেও আপদের হাত হইতে এক মিনিট পরিত্রাণ মেলে না। তার চেয়ে পুঁজি যা আছে, তাহা লইয়া নিরাপদ কোন কাজ……এবং সে কাজে জীবনের ছিন্ন সূত্রগুলিকে যদি আবার গ্রন্থি বাঁধিয়া কোনমতে জুড়িয়া দিন চালানো যায়। পুরানো বন্ধু ও সঙ্গী-সহচরদের সঙ্গে দেখা করিল না। তা ছাড়া যে কাজ করিয়া গিয়াছে, বন্ধু বলিতে জেলের বাহিরে কাহাকেও রাখিয়া যাইতে পারে নাই।

মনে পড়িল, দামোদর সরকারের কথা। দামোদর তার চেয়ে বয়সে বড়। একদিন এই দামোদর সরকারকে অবলম্বন করিয়াই সে কর্ম্মক্ষেত্রে নামিয়াছিল। দামোদরের অফিসে সে ছিল সামান্য কেরাণী। দামোদর তাকে ভালোবাসিত। দামোদরের কাছে যদি যায়…গিয়া যদি বলে, আর একবার সুযোগ দিন…

দামোদর সরকার লোক ভালো। তার প্রাণে দয়া-দাক্ষিণ্য, মায়া-মমতা আছে……এখনও আছে কি না, জানে না—তবে ছিল…সে কথা অনাদি চক্রবর্ত্তী ভোলে নাই।

দামোদর সরকারের অফিসে গিয়া সে উদয় হইল। ডালহৌসি স্কোয়ারে দামোদর সরকারের প্রকাণ্ড অফিস। আকার আরো বাড়িয়াছে। আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য যেন সে অফিসের মেঝের লুটাইয়া পড়িয়া আছে! অনাদি চক্রবর্ত্তী বেয়ারার হাতে কার্ড পাঠাইল।

অনাদি চক্রবর্ত্তী ভাবিল, সাধুতার পুরস্কার! নিশ্বাস রোধ করিতে পারিল না। ভাবিল, যদি একটু বুঝিয়া চলিতাম! কি সুযোগ না জীবনে পাইয়াছিলাম! শুধু অতি লোভে সব নষ্ট করিয়াছি।

বেয়ারা আসিয়া কহিল,—আসুন। অনাদি চক্রবর্ত্তী প্রবেশ করিল দামোদর সরকারের অফিস কামরায়।

দামোদর সরকার প্রচণ্ড একখানা নক্সায় মনোনিবেশ করিয়াছিল। কহিল,—বসো।

অনাদি চক্রবর্ত্তী বসিল।

দামোদর সরকার নক্সা রাখিয়া অনাদি চক্রবর্ত্তীর পানে চাহিল, কহিল,—ভয়ঙ্কর বদলে গেছ। চেনা যায় না। কার্ড না পাঠালে চিনতে পারতুম না।

অনাদি চক্রবর্ত্তী কহিল,—হ্যাঁ। মাথার উপর দিয়ে যত ঝড় বয়ে গেছে। মামলা মকর্দ্দমা… তা শোধবোধ হয়ে গেছে! যা করেছিলুম, তার প্রায়শ্চিত্ত বাদ যায়নি।

ক্ষণেক স্তব্ধতা। অনাদি চক্রবর্ত্তী অপলক দৃষ্টিতে দামোদর সরকারের পানে চাহিয়া…দু'চোখে মিনতির পাহাড় আসিয়া জমিতেছিল। দামোদর সরকার একদৃষ্টে অনাদির পানে চাহিয়া তাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল।

অনাদি চক্রবর্ত্তী কহিল,—আমি নতুন করে জীবন আরম্ভ করতে চাই,…A new leaf…তাই আপনার কাছে এসেছি। আমাকে সুযোগ দিন আর একবার…

দামোদর সরকার কহিল,—আমি কি করতে পারি, বলো?

অনাদি চক্রবর্ত্তী কহিল,—যাতে সাধুভাবে জীবিকার্জ্জন করতে পারি…চান্স!

দামোদর সরকার চুরুটে অগ্নি-সংযোগ করিল, করিয়া মাথা নাড়িয়া কহিল,—কিন্তু আমার এখানে তোমাকে দেবার মতো কোনো কাজ নেই। অফিস তো নয় লোকারণ্য …কেরাণী বেয়ারা সব নিয়ে একশো সাঁইত্রিশটি hand…এর উপরে 138 hands ওঠা অসম্ভব!

অনাদি চক্রবর্ত্তীর বুকে কে পাথর ছুঁড়িয়া মারিল! সে কহিল,—আমার উপায় হবে না তাহলে? নিরুপায়ে ফিরে যাবো?

দামোদর সরকার ঘড়ির দিকে চাহিল, চাহিয়া বলিল,—কি বলবে, চটপট সেরে নাও। বেলা চারটেয় বেকার সমিতির মিটিং আছে। আমি তার প্রেসিডেণ্ট।

অনাদি চক্রবর্ত্তী ছোট একটু নিঃশ্বাস ফেলিল। ফেলিয়া বলিল,—মানে আমার হাতে কিছু টাকা মজুত আছে। তাই ভাবছিলুম…

বাধা দিয়া দামোদর সরকার বলিল,—ও, বুঝেছি। কিছু টাকা আছে—আমার হাত দিয়ে সে টাকা তুমি খাটাতে চাও! মানে, যদি কোনো ব্যবসায়ে তোমার ও টাকা…

অনাদি চক্রবর্ত্তীর মনটা—কোথায় ছিল ঢাক না ঢোল! এ কথা মুহূর্ত্তের মতো গিয়া সেখানে দিল প্রচণ্ড ঘা! অনাদি চক্রবর্ত্তী উন্মাদের মতো হাসিল—উচ্চ অট্টহাস্য।

দামোদর সরকার ত্রস্ত হইয়া উঠিল—অনাদি চক্রবর্ত্তীর হাসি থামে না! অবাধে সে হাসি সাগরের তরঙ্গের মতো অট্ট-গর্জ্জনে ফুঁপিয়া ফুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে! হাসির দমকে সে বুঝি বা মেঝের লুটাইয়া মারা যাইবে!

দামোদর সরকার অবাক। কহিল,—অত হাসি কেন?

অনাদি চক্রবর্ত্তী কহিল,—টাকা খাটানোর ব্যবসা আমিও যে করেছি মশায়। জানি তার মর্ম্ম। বলিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে সে কামরা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিল, এবং সন্ধ্যাবেলায় দামোদর সরকার নিজের অফিসের বড়বাবুকে বলিতেছিল,—জেলে পাঁচ বৎসর থেকে অনাদির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বললুম, টাকা খাটিয়ে দেবো—তা এমনি হাসি হাসতে লাগলো, দম বন্ধ হবার জো! হুঁঃ! টাকা নেবো, খাটিয়ে দেবো, এতে হাসির কি আছে, বুঝি না!

ওদিকে সড়কের মাঠে ফাঁকা বেঞ্চে বসিয়া অনাদি চক্রবর্ত্তী ভাবিতেছিল,—একেই বলে ভাগ্য। দামোদর সরকার পরের টাকা ভোগা দেয়! পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে—আর আমার বেলায় সেই ব্যবসাই শাল হলো, না, শূল হলো। হা ভগবান!

মুস্কিল-আসান

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

নীলরতনবাবুর অবসর হয়ে গেল।

বেসরকারী অফিস। পেন্সন নেই। আছে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড। কিন্তু সে টাকা কবে পাওয়া যাবে তার কিছুই স্থিরতা নেই। এই অবস্থায় ভদ্রলোক বাড়ি এসে বসলেন।

এমনিতেই নীলরতনের মেজাজ চড়া। অত্যন্ত খিটখিটে এবং খুঁৎখুতে স্বভাবের। মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেছে। দুটি ছেলে: প্রমোদকুমার এবং প্রশান্তকুমার।

প্রমোদ চাকরীতে ঢুকেছে কয়েক বৎসর হল। এখনও বিয়ে-থা হয়নি। আর প্রশান্ত কলেজে পড়ে।

গৃহিণী ছেলেদের ডাকলেন। তাঁর মুখ শুকনো।

ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, হ্যাঁরে, কি করব বল দেখি।

—কিসের?

—উনি তো বাড়িতে এসে বসলেন। এইবার?

প্রমোদ হেসে বললে, আমি তো ন'টায় বেরিয়ে যাই, সন্ধে ছ'টায় ফিরি। একটু চা খেয়ে স্নানে বেরুই, ফিরতে রাত দশটা। তা সকালটা চোখ-কান বুঁজে কাটাব কোনো রকমে।

প্রশান্ত বললে, সকাল-সন্ধে, বাড়িতে পড়া করছিলাম। ঠিক করেছি, কেষ্টর বাড়ি পড়তে যাব। তাকে বলেও রেখেছি।

গৃহিণী বললেন, আমার তো অফিস নেই, কলেজও নেই। সন্ধেবেলায় স্নানের আড্ডাও নেই। আমি কি করব।

—বৃন্দাবনে চলে যাও।

—তারও উপায় নেই। উনি সঙ্গে যেতে চাইবেন। বৃন্দাবনও আমায় বিবিয়ে উঠবে। ভয়ে আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেছে। চব্বিশ ঘণ্টা মাথা ঝিমঝিম করে।

শুনে দুঃখ হয়। কিন্তু করা যাবে কি?

গৃহিণী বললেন, চাকরী যাওয়ার পরদিনই চাকরটাকে বিদায় করলেন। সম্বল একটিমাত্র ঝি। সে রান্নাঘরটা ধুয়ে দেয়, বাসনগুলো মাজে আর মশলাটা পেষে। কিন্তু এত বড়, ওপরের কাজও তো সহজ নয়। কে করে? বললাম যদি তো বললেন, 'আমি করব।'

—বেশ তো।

—বেশ তো? উনি বাজারে গেছেন। একটু অপেক্ষা কর। তারপর বুঝবি কি রকম বেশ।

অপেক্ষা করতে হল না। নিচে তখনই নীলরতনবাবুর কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল: ঝাঁটাটা এখানে রাখলে কে? এই সদর দরজার সামনে? মরেছে! এরা বাড়িটাকে শুয়োরের খোঁয়াড় না বানিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

পাংশুমুখে গৃহিণী বললেন, শোন্।

দুই ছেলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল : আর চা করতে হবে না মা। এখন থাক। একটু তাড়া আছে মা।

দুই হাত এবং মাথাটা শার্টের মধ্যে গলিয়ে দুই ভাই শশব্যস্তে বাইরে বেরিয়ে গেল।

নীলরতনবাবু তখন দাড়ি মাখায় তুলেছেন : এই কি রান্নাঘর মোছা হয়েছে? এ তো যেমনকার এঁটো তেমনি রয়েছে! বাড়ির লোকেরা কি চোখের মাথা খেয়েছে নাকি?

গৃহিণী আর থাকতে পারলেন না। উপর থেকেই সাড়া দিলেন : যাইনি, এইবারে যাব। অন্তত কালের মাখাটা আগে না খেতে পারলে এ বাড়িতে আর খাওয়া যাবে না।

দোতলার দিকে চোখ পাকিয়ে নীলরতনবাবু গর্জন করলেন : কি বললে?

—বলছি, তোমাকে ওসব দেখতে হবে না। তুমি বাজার নামিয়ে ওপরে এস।

—বাজারটা নামাব কোথায়? আমার মাথার ওপর? বলছি না, রান্নাঘরে এঁটো চড়চড় করছে।

—করুক। তুমি ওইখানেই নামিয়ে রেখে ওপরে এস। সকাল থেকেই চাকাখা খাবিও না।

—আমি চাকামা খাবাচ্ছি, না তোমরা খাবাচ্ছ? এঁটো কি আমি রেখেছি? আমি রেখেছিলাম দরজার সামনে ঝাঁটাপাছটা? কলের জল মিচিমিচি বেরিয়ে যাচ্ছে। এখনি তো চাঁচাবে, চৌবাচ্চায় চানের জল নেই, যাও কর্পোরেশনের সঙ্গে ঝগড়া করে এস।

গৃহিণী সকাতরে বললেন, আমি চাঁচাব না, কিচ্ছু করব না, তুমি দয়া করে ওপরে এস। বাইরে রাস্তায় লোক জমে গেছে। আর কেলেঙ্কারী কোর না।

কিন্তু কে কার কথা শোনে?

নীলরতনবাবু চেঁচিয়ে চললেন, কলের পর পাইখানা, তারপর নর্দমা, সিঁড়ি, একটার পর একটা নিয়ে। লোকে তিনি সইতে পারেন না।

যারা তাঁর সান্ত্বনাস্থল সেই প্রমোদ এবং প্রশান্তর সঙ্গে বসে যে দু'দণ্ড মনের দুঃখের কথা বলবেন, তারও সুযোগ গৃহিণী পান না। আত্মানং সততং রক্ষেৎ এই শাস্ত্রবাক্য অনুসরণ করে তারা দুবেলা দুটি খাওয়া এবং রাত্রে একটু শোয়া, এছাড়া আর কোনো সময়েই বাড়ি থাকে না।

সুতরাং ছ'মাসের মধ্যে গৃহিণী অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন।

অথচ কর্তা যে বসে থাকেন তাও নয়। একটা চাকর তিনি ছাড়িয়েছেন বটে, কিন্তু দুটো চাকরের কাজ তিনি একা করেন। ঘর ঝোয়া, বিছানা ঝাড়া থেকে সুরু করে, সাবান কাচা, জল-তোলা, বুলঝাড়া, আর নর্দমা পরিষ্কার পর্যন্ত তিনি একাই করেন।

সেকথা গৃহিণীও স্বীকার করেন।

কিন্তু ওই ধকুনী!

একেবারে সর্বনেশে ধকুনী!

সমস্ত দিন গৃহিণীর হাত নিসপিস করে। এবেলার কথা ওবেলা মনে থাকে না। কোন জিনিসটা কোথায় রাখেন ভুলে যান। পরে আবার খুঁজে বেড়ান। তরকারীতে কোনোদিন নুন বেশি হয়, কোনোদিন বা নুন পড়েই না।

তার জন্যে আর এক প্রস্থ চীৎকার :

—এই কি রান্না হয়েছে! এ তো মুখে দেওয়া যায় না।

গৃহিণীরও আজকাল গলা বেড়েছে : না দেওয়া যায় দিও না। ওই রকমই হবে।

—তবে এই রইল।

থাল-গ্লাস-বাটি কর্তা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলেন। ঝনঝন শব্দে চকিত হয়ে পাশের বাড়ির বৌটি একবার উঁকি দিয়েই মুচকি হেসে সরে গেল।

কর্তা হাত ধুয়ে উপরে গেলেন।

গৃহিণীও ছেলেদের সেই অবস্থায় রেখে কোণের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

আর কান্না!

তারপরে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

যখন জ্ঞান হল, বুঝতেই পারলেন না তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। ভাবলেন, ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন। বেহুঁশ খুব অবসন্ন বোধ হচ্ছিল। ভাবলেন ক্ষুধায়।

কলেজ থেকে ফিরে প্রশান্ত মাকে খুঁজতে লাগল। তিনি তখন কোণের ঘরে বসে।

—মা, তুমি এঘরে চুপ করে বসে যে!

গৃহিণী সাড়া দিলেন না।

ব্যাপার সোজাসোজি বুঝে প্রশান্ত আর চা-জলখাবারের জন্যে অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে গেল।

একটু পরে এল প্রমোদ তার অফিস থেকে। মায়ের বসে থাকার ভঙ্গী এবং তাঁর মুখের ভাব দেখে সে আর কথাটি না কয়ে তবে সরে পড়ল।

গৃহিণীও কিছু পরে উঠলেন।

সন্ধ্যার সব কাজই বাকি। রাগ করে বসে থাকলেই তো চলবে না। মৃত্যু নিজের হাতে নয়। যতক্ষণ বেঁচে আছেন, ততক্ষণ সংসারের কাজ-কর্ম সবই দেখতে হবে।

নিচে নেমে জলঘরে যাবেন, তাদিকে রান্নাঘর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

ধোঁয়া কিসের?

উঁকি দিয়ে দেখেন, নীলরতন একখানা গামছা পরে উনানে বাতাস করছেন!

ধোঁয়ায় চোখ লাল। সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত! প্রাণপণে পাখা নাড়ছেন!

রাগে গৃহিণীর পিত্ত পর্যন্ত জ্বলে উঠল।

চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলেন, ওটা কি হচ্ছে?

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে কর্তা উত্তর দিলেন, উনুন ধরাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছ না? কানা হয়েছ?

তেমনি মুখভঙ্গী করে গৃহিণী জবাব দিলেন, কানা হলে তো বাঁচতাম। চোখ-কান নিয়ে তোমার সঙ্গে বাস করা যায় না।

—বাস কর কেন? মরা করে বাস না করলেই তো পার।

—যাবার মতো কোনো চুলো থাকলে কবে চলে যেতাম। হাড়ে বাতাস লাগত।

—চোপ রও, ছোটলোক কাঁহাকা!

—কি আমি? ছোটলোক! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

কর্তা এবারে একটা চেলাকাঠ উঁচিয়ে গর্জন করে উঠলেন : একশো বার ছোটলোক ! শাখো বার !

ঘণ্টাখানেক এই কাণ্ডের পর গৃহিণী আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। গণ্ডগোলটা তখন থামল।

প্রমোদ এবং প্রশান্ত আস্তে দিয়ে ফিরে এসে দেখলে, কর্তা এক ঘরে শুয়ে, গৃহিণী অন্য ঘরে। বুঝতে কষ্ট হল না, দুজনে এতক্ষণ কিছু একটা হয়ে থাকবে। এবং সেই উপলক্ষ্যে নিশ্চয়ই অনশন।

তারা কেউ কারও মুখের দিকে চাইলে না। নিজের নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

এমন করেই বা ক'দিন চলে ?

নিত্য কলহ, সর্বক্ষণ দাঁতের বাস্ত এবং প্রায়ই অনশন। কর্তা ছাড়া আর সকলেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।

গৃহিণী ছেলেদের বললেন, কি করি বল তো ? আর তো পারি না। শেষে কি আত্মহত্যা করতে হবে ?

ছেলেরা দেখলে বাপ অবসর নেওয়ার পর এই ক'মাসের মধ্যে মায়ের কাঁচা সোনার মতো রঙ যেন তামাটে হয়ে গেছে। গাল ভেঙে গেছে, চোখের কোলে কালি পড়েছে, দেহ অবসন্ন। যেন কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে।

ছেলেরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কি উত্তর দেবে ? বাড়ি বাপের। ওরা দুই ভাই মাকে নিয়ে অন্যত্র বাসা করতে পারে। বাবা থাকুন একলা, বেয়ারার সঙ্গে ঝগড়া করুন দিনরাত।

প্রস্তাবটা প্রশান্ত করলে।

প্রমোদ হেসে বললে, ওটা কি আমি ভাবিনি রে ? কিন্তু এখন আমার রোজগারে তা সম্ভব নয়।

—তাহলে ?

প্রশান্ত তিক্তকণ্ঠে বললে, তাহলে মা মারা যাবেন ? দেখ তো চেহারাখানা কি হয়েছে ?

সে তো দেখাই যাচ্ছে।

প্রমোদ বললে, বাবাকে কোথাও আবার দশটা পাঁচটা আপিসে ঢোকাতে পারলে হয়।

দুঃখের মধ্যেও সবাই হেসে উঠল : এ বয়সে কে বাবাকে চাকরী দেবে ?

এক মুহূর্ত প্রমোদ কি যেন চিন্তা করলে, তুমি একটা কাজ করতে পার মা ?

মায়ের কথা বলবার মনটা ছিল না। নিঃশব্দে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চাইলেন।

—চাকরী দিলে বাবার পুরোনো মনিবেই দেবে। তুমি গিয়ে সাহেবকে ধরবে। আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। বলবে, মাইনে দিতে হবে না। শুধু বাবার দশটা-পাঁচটা আপিসের ব্যবস্থা করলেই হবে। যাবে ?

হাসির কথা।

কিন্তু যত দিন যায়, উৎপাত ততই বাড়ে। সহ্যের সীমা কবে ছাড়িয়ে গেছে। এখন অসহ্যের সীমাও অতিক্রান্ত প্রায়।

অবশেষে মরিয়া হয়ে গৃহিণী একদিন প্রমোদকে বললেন, যাব। আমাকে নিয়ে চল্ ওঁর সাহেবের কাছে। দেখি যদি কিছু হয়।

নীলরতনবাবুর সাহেব একটি মাদ্রাজী ভদ্রলোক। পাঁচতলায় ওঁর অফিস। দীর্ঘকাল এদেশে থাকার ফলে চমৎকার বাংলা বলতে পারেন।

প্রমোদ তাঁর কাছে মাকে নিয়ে গেল।

সাহেব শব্দটাই ভয়ংকর। ইংরেজই হোক, মাদ্রাজীই হোক আর বাঙালীই হোক, সাহেব মাত্রেই ভয়ের বস্তু।

সুতরাং লিফ্‌টে ওঠবার সময়ই গৃহিণীর বুক কাঁপতে লাগল। পাঁচতলায় পৌঁছলেন তখন মুখে এক ফোঁটা রক্তও নেই। নিতান্ত মরীয়া না হলে তিনি একাজ কখনই করবেন না।

প্রমোদ জিজ্ঞাসা করলে, এক গ্লাস জল খাবে মা?

জলের দরকার। গৃহিণী পিপাসা বোধ করছিলেন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

বললেন, জল একটু খেতাম। কিন্তু কে দেবে?

—ওই তো ওরা।

—কি জাত ওরা?

—বামুন। সব বামুনের ছেলে। খাবে?

—হুঁ।

ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেয়ে গৃহিণী কিছুটা সুস্থ হলেন।

সাহেবের কাছে স্লিপ পাঠান হয়েছিল। বেয়ারা ডেকে নিয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে গৃহিণী ভিতরে গেলেন। সাহেবের সামনে করযোড়ে দাঁড়ালেন।

—কি চান?—সাহেব নম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

অনেক চেষ্টার পর গৃহিণীর কণ্ঠে স্বর ফুটল: চাকরী।

—চাকরী!—সাহেব অবাক। ভাবলেন ওঁর নিজের জন্যেই বুঝি।—কার জন্যে?

—আমার স্বামীর জন্যে। তিনি এখানেই চাকরী করতেন।

—কিন্তু ওঁর তো ছুটি হয়ে গেছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আর আমি মারা যেতে বসেছি।

—টাকার অভাবে?—সাহেব ওঁর শীর্ণ মলিন চেহারার দিকে চেয়ে দুঃখিত কণ্ঠে বললেন —আমি যত শিগগির পারি ওঁর প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাটা বের করে দেবার চেষ্টা করব। এটা ইচ্ছাকৃত নয়। কতকগুলো নিয়ম কানুন আছে যার জন্যে টাকাটা বেরুতে দেরি হয়!

গৃহিণী বিনীত কণ্ঠে বললেন, আজ্ঞে, সেজন্যে নয়। আমার ছোট সংসার।

প্রমোদকে দেখিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেটিও চাকরী করে। সংসার চলে যাচ্ছে কোনো রকমে।

—তবে আপনার স্বামীর চাকরীর দরকার কি?

—আজ্ঞে, টাকার জন্যে নয়।

—তবে?

—আজ্ঞে, এতদিন চাকরী ছিল। ন'টায় বেরিয়ে যেতেন, ছ'টায় ফিরতেন। এক ছুটির দিনে সব সময় বাড়ি থাকতেন। সে আমরা চোখ-কান বুজে চালিয়ে নিতাম। এখন চব্বিশ ঘণ্টাই বাড়িতে। আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

সাহেব অবাক : কেন? চল্লিশ ঘণ্টা বাড়ি থাকেন, সে তো আরও ভালোই হয়েছে।

—আজ্ঞে না। তিনি খুব খিটখিটে মানুষ। ভোরে ধকা-ধকি আরম্ভ হয়, রাত্রে যতক্ষণ না শোন ততক্ষণ পর্যন্ত। আমি আর পারছি না স্যার। এরকম আর কিছুদিন চললে আমি মারা যাব। আপনি দয়া করে ওঁকে আবার অফিসে নিন।

গৃহিণীর দুই চোখে অশ্রু ছাপিয়ে এল। তিনি হাত দুটি যোড় করলেন।

ব্যাপারটা বুঝে সাহেব খুব কৌতুক বোধ করছিলেন। বললেন, সে তো খুব সহজ নয়। কোথায় বসান হবে, কত মাইনে! কর্তারা রাজি হবেন বলে মনে হয় না।

তাড়াতাড়ি গৃহিণী বললেন, যে-কোন মাইনে তার। কিংবা কিছুই দিতে হবে না। শুধু কাজ দিয়ে ওঁকে ন'টা-দু'টা আটকে রাখুন। আমাকে বাঁচান।

গৃহিণী আবার করযোড়ে কাঁদতে লাগলেন।

সাহেবের যত দুঃখ হল, তত হাসি এল। বললেন, আচ্ছা যান। দেখি আমি কি করতে পারি।

দিন পনেরোর মধ্যে নীলরতনবাবুর নিয়োগপত্র এল।

নীলরতনবাবু চীৎকার করে উঠলেন : ওগো শুনছ?

—কি হয়েছে?

—আপিস থেকে আবার ডেকে পাঠিয়েছে। সেই পুরোনো মাইনে। হুঁ হুঁ বাবা! কাজের লোককে ছাড়ানো সোজা নয়।

গলাবন্ধ কোটটি ঝেড়ে ঝুড়ে বের করে ছাতি-মাথায় আবার তিনি আপিসে গেলেন।

ক্লাসের সবচেয়ে ভাল ছেলেটির অঙ্কের খাতা দেখে শিক্ষক আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "অঙ্কটা করবার এ পদ্ধতি তুমি পেলে কোথায়?"

—"আমাদের প্রতিবেশী এক বুড়ো এইভাবে করে দিয়েছেন।"

—"আচ্ছা এ অঙ্কটা দিও ত ওঁকে।" —এই বলে খুব শক্ত একটা অঙ্ক দিলেন।

পরদিন ছেলেটি নিয়ে এল এক সহজ নূতন নিয়মে করা অঙ্কটি।

শিক্ষক আশ্চর্য হয়ে বললেন : "বটে! লোকটা ত অদ্ভুত অঙ্ক জানে। আচ্ছা এবার এই অঙ্কটা দিও ত। এটা করতে খাতার পাঁচ দু' পাতা লাগবে।"

পরদিন ছাত্রটি নিয়ে এল অঙ্কটি। মাত্র পাঁচ লাইনে আশ্চর্য ভাবে অঙ্কটি করা হয়েছে।

শিক্ষক ছুটে গেলেন ছাত্রের সঙ্গে সেই প্রতিবেশীর কাছে। তারপর ওঁকে দেখেই আনন্দে চীৎকার করে বললেন : "এ আমি আগেই অনুমান করেছি ভা; আইনষ্টাইন।"

শ্বেতচন্দন তিলকে সাজায়ে তোমারে দিলকে ?

উপন্যাস

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল ঘিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

ঐশ্বর্য আজ আছে কাল নেই। সবাই বলে লক্ষ্মী চঞ্চলা। একজায়গায় থাকতে তিনি ভালবাসেন না। ভবতোষ দাদুদি কিন্তু বিশ্বাস করেন না সেকথা। বলেন, লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে পারে না তাই চলে যায়। এ হচ্ছে গিয়ে মানুষের অক্ষমতা।

অনেকে তাই ভবতোষকে পরামর্শ দেয়—'তুমি একবার আখো না চেষ্টা করে।'

ভবতোষ বলেন, 'দেখবোই তো!'

তিনি তাঁর প্রপিতামহের তৈরি বিরাট অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন—'আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো হারানো লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আনতে পারি কিনা।'

নদীর তীরে সংস্কার অভাবে জরাজীর্ণ সেই বিরাট বাড়ীখানা ছাড়া তখন তাঁর আর কিছু নেই।

নদীর ঘাটের ঠিক ওপরেই যে মহল, সে মহলে হতো দুর্গোৎসব। প্রকাণ্ড মোটা মোটা থামওয়ালা সে চণ্ডীমণ্ডপ এখনও রয়েছে। চত্বরে হাজার লোকের বসবার জায়গা। দরদালানে এখন অসংখ্য চড়ুইপাখী আর পায়রার বাসা। আকাশে মেঘ উঠলে দেখা যায়—সারি সারি পায়রার ঝাঁক প্রাচীন অট্টালিকার মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়াচ্ছে।

এই দুর্গাবাড়ীর দক্ষিণদিকের মোতলায় অপেক্ষাকৃত কয়েকখানি ভাল ঘর দখল করে সপরিবারে বাস করতেন ভবতোষবাবুর বাবা।

ভবতোষ যখন নিতান্ত শিশু, তখন থেকেই তিনি শুনে আসছেন তাঁর পূর্বপুরুষের অতীত ঐশ্বর্যের কাহিনী। শুনেই আসছেন মাত্র। চোখে তিনি কোনও দিন কিছুই দেখতে পাননি।

ভবতোষের মা একদিন বলেছিলেন: 'আমি স্বপ্ন দেখেছি, খোকা, আমার শ্বশুরের বিষয়-সম্পত্তি আবার যেন তোর কাছে ফিরে এসেছে।' শুনে শুধু হেসেছিলেন ভবতোষ। মা বলেছিলেন, 'হাসলি যে? পারবি না ফিরিয়ে আনতে?'

সেই মা তাঁর মারা গেছেন। ঠাকুর-বাড়ীর খিড়কির ঘরজা হতে পাথরের যে সিঁড়ি নদীর জলে গিয়ে মিশেছে, সেই সিঁড়ির সৈঠায় বসে বসে বালক ভবতোষ ভাবে—মায়ের স্বপ্ন কোনও দিনই কি সে সফল করতে পারবে না?

সিঁড়ির পাশে দুর্গা-প্রতিমার শুকনো কাঠের কাঠামটা এখনও পড়ে আছে। সেইদিক পানে তাকিয়ে ভবতোষ তার হাতদুটি জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলেন, 'খুব ঐশ্বর্যবান করে আবার আমি তোর পুজো করবো মা।'

অদৃষ্টের কথা কিছুই বলা যায় না। কিন্তু মনস্কামনা তাঁর পূর্ণ হয়েছে।

বালক ভবতোষ এখন বড় হয়েছে। বড় হয়েছে শুধু বয়সেই নয়—বড় হয়েছে সব রকমে।

বিগত দিনের ঐশ্বর্য্য তিনি ফিরে পেয়েছেন কিনা জানি না, কিন্তু যা পেয়েছেন তাই বা কম কিসের? দুবেলা এখন মোটরে চড়ে ঘুরে বেড়ান। আর বড় বাড়ীটার খানিকটা অংশ আবার নতুন করে সারানো হয়েছে। এক কথায় ভবতোষকে এখন বড়লোক বলা যেতে পারে।

শহর এখান থেকে বেশি দূরে নয়। গ্রামের লোক দেখতো ভবতোষ প্রত্যহ শহরে যান। কি একটা সেখানে তিনি করেন এই পর্য্যন্ত। ম্যাট্রিকুলেসান পাস করেই লেখাপড়া তাঁকে ছাড়তে হয়েছে। মা মরেছে, বাপ মরেছে তারই ওপর নিজের স্ত্রী পুত্র প্রতিপালনের ভার যাহোক একটা কিছু চাকরি-বাকরি জুটিয়েছেন নিশ্চয়ই। লোকে ভাবতো এই কথা।

বছর দুই-তিন পরে দেখা গেল, বাড়ীখানা তিনি সারাতে আরম্ভ করেছেন। গ্রামের লোক ভাবলো চাকরিটা তাঁর ভাল। ভবতোষ কিন্তু মুখ ফুটে কাকেও কিছু বললেন না। তার পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল তিনি শহর থেকে নতুন একখানা মোটরগাড়ী কিনে এনেছেন। আট দশ বছর পার হবার পর এখন অবশ্য গ্রামের লোক সবাই জেনেছে ভবতোষবাবু আট দশ লক্ষ টাকার মালিক। কিন্তু কেমন করে কি উপায়ে এতো টাকা তিনি উপার্জ্জন করলেন—সে সংবাদ জানবার কোনও উপায়ও নেই। ভবতোষ কাউকে সেকথা বলতে চান না।

বাবুদের বাড়ীতে আবার নতুন করে দুর্গোৎসব সুরু হলো। বহুকালের পরিত্যক্ত প্রতিমার কাঠের কাঠামে আবার মাটি পড়লো। ঢাক বাজলো, ঢোল বাজলো, সানাইয়ের বাজনায় পুরনো বহরখানা আবার যেন নতুন করে জেগে উঠলো। চণ্ডী-মণ্ডপে যাত্রা গান চলতে লাগলো। চারদিক লোকে লোকারণ্য!

তিন চার দিন ধরে নিমন্ত্রণ করে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ভবতোষ খুব ভাল করে খাইয়ে দিলেন।

তাদের পুরনো দিন আবার ফিরে এসেছে। ভবতোষের জয় জয়কার!

* * * *

ভবতোষের চারটি ছেলের পর একটি মেয়ে হয়েছে। নাম তার নির্ম্মলা। মেয়েটি সুন্দরী। কিন্তু সুন্দরী যখন সে চুপ করে বসে থাকে তখনই। উঠে দাঁড়িয়ে চলতে আরম্ভ করলেই দেখা যায় ডান পাটা সে টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে।

এই কন্যাটির জন্য ভবতোষের চিন্তার আর অবধি নেই। বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু কে তাকে বিয়ে করবে? নির্ম্মলার মুখের পানে ভাল করে তাকাতে পারেন না তার বাবা। মন-মরা হয়ে নির্ম্মলা বিষণ্ণ মুখে ঘুরে বেড়ায়। মা তার মাঝে-মাঝে সান্ত্বনা দেয় বটে, কিন্তু মন খারাপ থাকলে তিরস্কার সেও বড় কম করে না। বলে 'হোকে যে আমি কি জন্যে পেটে ধরেছিলাম মা, কে জানে। কতলোকের কত ছেলে মরে, তুইও ত' মরলেই পারতিস। এমনি সব কথা শুনে নির্ম্মলার এক-একদিন মনে হয় ঠাকুর-দালানের খিড়কির দরজাটা খুলে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে যদি নদীতে ডুবে মরে তো মন্দ হয় না! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছুই সে করতে পারে না। আত্মহত্যা করতে ভয় হয়। মনে হয় একে তো সে

খোঁড়া, তার ওপর আত্মহত্যা করতে গিয়ে যদি সে না মরে। যদি বেঁচে থাকে? তাহলে কেলেঙ্কারীর বাকি কিছু থাকবে না।

তাই সে কোনও রকমে না মরে বেঁচে আছে।

• • • •

ভবতোষবাবু হঠাৎ একদিন তার বিয়ের এক সম্বন্ধ ঠিক করে বসলেন। গ্রামে তাঁদের একটি ছেলে আছে। অশোক তার নাম। কোথায় যেন কোন কারখানায় সামান্য তিরিশ চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করে। মা বাপ আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই। থাকবার মধ্যে আছে শুধু একটা বোন। কাছের গ্রামের নিতান্ত গরীব এক ভদ্রলোকের সঙ্গে বোনটিও ঘরে ঘরে গেছে। সুতরাং চালাই হবে। এই অশোকের সঙ্গে বিয়ে দিলে তাকে সে ঘরজামাই রাখতে পারবে।

'সেদিন সন্ধ্যায় কাজের ছুটির পর অশোক বাড়ী ফিরছিল। ভবতোষের চাকর ছুটতে ছুটতে তাকে পথের মাঝখানেই ধরে ফেললে, বললে, 'বাবু আপনাকে একবার ডাকছেন।'

অশোক সসম্ভ্রমে ভবতোষকে একটি নমস্কার করতেই ভবতোষ বললেন, বোসো। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। অশোক বসলো।

ভবতোষ বললেন, নিজের হাতে রান্না করে খাও শুনলুম। কথাটা সত্যি?'

অশোক বললে 'আজ্ঞে হাঁ। সত্যি।'

—সেকালে শুনলুম খুব ভোরে বেরিয়ে যাও। সকালেও রান্না কর?'

অশোক বললে, 'আজ্ঞে না? আটটার সময় বেরুতে হয়। রান্না তখন আর হয়ে ওঠে না।'

'কি খাও সারাদিন?'

অশোক চুপ করে রইলো।

ভবতোষ এইবার সোজাসুজি কথাটা পেড়ে বললেন। বললেন, 'বিয়ে-থা করবে?'

অশোকের মুখে আবার সেই হাসি! বললে, 'বিয়ে আবার দেবে কে?'

'যদি কেউ দেয় তো করতে পারো?'

অশোক হেঁটমুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমার বাবার দুশ' টাকা ঋণ আছে সেটা শোধ না করে—'

ভবতোষ বললেন, 'সে জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। আমার মেয়েকে তুমি দেখেছ? নির্মলাকে?'

অশোক বললে, 'দেখেছি।'

'একটা পা একটু খোঁড়া।'

অশোক বললে, 'হাঁ জানি!'

চাকর দাঁড়িয়ে ছিল দোরের কাছে। ভবতোষ বললেন, 'ডাক্ দেখি নির্মলাকে।'

নির্মলা এসে দাঁড়ালো। ধপধপে গায়ের রং। চল চলে দুটি চোখ। চমৎকার মুখখানি। নির্মলা যে এত বড় হয়েছে অশোক তা ভাবতেও পারেনি। একবার তার মুখের পানে তাকিয়েই অশোক তার চোখদুটি নামিয়ে নিলে।

• • • •

গ্রামের লোকেরা কেউ কিছুই জানলো না। সেই মাসেরই শেষের দিকে অশোকের সঙ্গে নির্মলার বিয়ে হয়ে গেল। এবং বিয়ের পরদিন থেকে অশোককে আর বেঁধে খেতে হ'ল না।

ভবতোষবাবুর বাড়ীতেই সে খেতে গেল ঘর-জামাই হয়ে। থাকলো বটে, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলে শ্বশুর-বাড়ীতে ঘর জামাই হয়ে যে বাস করে তার মত বিড়ম্বিত জীবন আর কারও নেই। কারখানার চাকরীটা সে তখনও ছাড়ে'নি। সকালে চারটি যেমন পায়ে তাড়াতাড়ি খেয়ে সে কাজে চলে যায়। সন্ধ্যায় শ্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে। শালারা এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে ছাড়ে না। কেউ বলে, তোমার চাকরীর জায়গায় আমাকে একদিন নিয়ে যাবে অশোক? কল-কারখানা কখনও দেখিনি, একবার দেখে আসব।'

অশোক বলে, 'কি আর দেখবে? সেখানে দেখবার কিছু নেই।'

শালারা বলে, 'কেমন করে তুমি গাড়ী ঠেলো।'

এইক্ষণে অশোক বুঝতে পারলে তারা উপহাস করছে। অশোক একটুখানি হেসে সেখান থেকে চলে যাচ্ছিলো, শালাদের ভেতর একজন ডেকে বললে, 'শোনো, শোনো জামাইবাবু শোনো! তোমার সঙ্গে আরও অনেক কথা আছে।'

'কি কথা?' বলে অশোক ফিরে দাঁড়ায়। মেজশালার নাম অমল। বলে, 'কুকুর ক'রকম বল দেখি?'

'জানি না ভাই, আমি মুখখু মানুষ, আমি ওসব জানি না।' বলেই সে সেখান থেকে পালায়।

রাত্রে খেতে বসে অমল তার ভগ্নীপতির সঙ্গে রসিকতা সুরু করে। বলে, 'কুকুর ক'রকম বলতে পারলে না ত' জামাইবাবু?'

অশোক বলে—'না ভাই, সত্যি বলছি আমি জানি না।'

'জানো না তো শোনো শিখিয়ে দিচ্ছি।'

এই বলে অমল আপন মনেই আওড়াতে থাকে—

"পহেলা কুত্তা ঘর-ঘর বুলে,
দোস্‌রা কুত্তা অফিস যায়।
তেস্‌রা কুত্তা নোকরি করতা,
চৌঠা কুত্তা ঘর-জামাই।"

—'এই চার রকমের কুকুর আছে। বুঝলে? মানেটা ভাল করে বুঝিয়ে দেবো?'

ভাইএরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলো।

অশোক বললে, 'আচ্ছা অমল, তুমি এমন করে আমায় খেপাবে লেগেছ কেন বল তো?'

অমল বললে, 'খেপেছি? একে লাগা বলে? তুমি এত খেপাও কেন হে?'

অশোকের মুখ দিয়ে আর কথা বেরোয় না। এই সব নির্বোধ মানুষের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সে গরীব। নিতান্ত দরিদ্র। ভবতোষবাবু রাস্তা থেকে ডেকে এনে তাকে আশ্রয় দিয়েছেন বাড়ীতে। মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন। এ-অবস্থায় এ-বাড়ী ছেড়ে যাবারও ক্ষমতা তার নেই।

খাবারগুলো গলা দিয়ে নেবোতে চাচ্ছিল না।

অশোকের মনে হলো খাবার ফেলে উঠে চলে যায় সেখান থেকে। আবার ভাবলে, তাতে

কারও কিছু ক্ষতি হবে না। কেউ আর ডেকে তাকে খেতেও বলবে না। উপবাস করেই বাকিটা কাটাতে হবে।

কোনোরকমে খাওয়া সেরে অশোক উঠে গেল।

প্রকাণ্ড বাড়ী। কে যে কোথায় কি করছে কেউ কারও খবরও রাখে না। খাবার সময় খাবার ঘরে এসে খায় দায়, তারপর হৈ হৈ করে সব যে যার যেদিকে খুশী চলে যায়।

দাদুড়ী আছেন বটে কিন্তু ছেলেরা তাঁকে গ্রাহ্যই করে না।

বাপেরও মান-সম্মান ছেলেরা রাখে না।

ভবতোষবাবুও এক অদ্ভুত ধরণের মানুষ। দিবারাত্রি শুধু শুনতে চান—তিনি একজন কৃতী পুরুষ। নিজের চেষ্টায় তিনি বহু গৌরব ছিনিয়ে এনেছেন। সুতরাং সকলে মিলে তাঁর স্তবস্তুতি কর, তাহলেই তিনি খুশী।

কিন্তু দশ দশের সেকথা মানুষের মনে থাকে না। কাজেই তিনি উপযাচক হয়ে লোক জনকে ডেকে ডেকে শোনান তাঁর কৃতিত্বের কথা!

গ্রামের লোক ভেতোবিরক্ত হয়ে গিয়েছিল তাঁর এই সব কথা শুনে শুনে। তাই সহজে কেউ তাঁর পাশ মাড়াতে চাইতো না। বাড়ীর সদরে ভবতোষবাবু বসে আছেন দেখলে লোকজন সব অন্য রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যেতো।

ভৈরব সরকার থাকে পাউনায়। গ্রামে তার বেজ ছেলে থাকে। তাই ছেলের কাছে মাঝে মাঝে তাকে আসতে হয়। ভৈরব সরকার ভবতোষবাবুর সমবয়সী। ছেলেবেলায় একসঙ্গে তারা নাকি ইস্কুলে পড়েছিল।

ভৈরব একদিন যেতিয়ে যাচ্ছিল ভবতোষবাবুর বাড়ীর সুমুখ দিয়ে। ভবতোষ ডাকলেন, 'কি রে, কখন এলি?'

ভৈরব বললে, 'পরশু। খবর সব ভাল তো?'

'ভাল আর কোথায়? যাচ্ছিস কোথায়? শোন্ না—বোস্, তামাক-টামাক খা।'

'না ভাই, তামাক আমি খাই না।' বলে বোধ করি একটু ভদ্রতার খাতিরে এসে বসলো ভবতোষের বৈঠকখানায়।

ভবতোষ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'বিদেশেই তো জীবনটা কাটালি। টাকাকড়ি কিরকম রোজগার করছিস?'

'যদি বলি কিছু রোজগার করি না,—তাহ'লে তুই কি আমার সঙ্গে কথা বলবি না?'

'কেন?'

ভৈরব বললে, 'নিজে অনেক টাকা কামিয়েছিস, কাজেই টাকা দিয়েই মানুষের ভালবাসা কিনিস।'

এতক্ষণে ভবতোষবাবু বলবার মত একটা কথা খুঁজে পেলেন। নিজের কথাটা বলবার সুযোগ পাচ্ছিলেন না এতক্ষণ। হাসতে হাসতে বললেন, 'তা যা বলেছিস! জানিস তো—আমাদের রাজার মতন সম্পত্তি ঠাকুর্দা একাই সব লুটে দিয়ে চলে গেল। বাবা মারা যাবার পর আমি তো পেলাম শুধু এই প্রকাণ্ড ভাঙা বাড়ীখানা। তারপর নিজের চেষ্টায় কেরালায় সব।'

ভৈরব বললে, 'থাম্ থাম্ আর বড়াই করিস না বাবা, কেরানি আর কোথায় ?'

মুখের ওপর এমন করে কেউ তাঁকে বলে না। বলবার সাহস হয় না। কিন্তু ভৈরব তার সহপাঠী—বাল্যবন্ধু। তার আর ভয় করবার কি থাকতে পারে ? কট্ করে বলে বসলো, 'কোথায় কোন্ এক বেহার মোটা টাকা কোকোটুসে মেরে দিয়েছিস এই তো শুনেছি—'

কথাটা ভবতোষ ভাল করে শেষ করতে দিলে না ভৈরবকে। চীৎকার করে উঠলো—'কে বললে ? এ-কথা তুই কোথায় শুনলি ?'

ভৈরব বললে, 'সত্যি কথা এ-কান ও-কান হতে হতেই সাত কান হয়।'

ভবতোষ বললেন, 'মিছে কথা। কে বললে তুই তার নাম বল আমি একবার দেখবো তাকে।'

'না রে না, সেই কথায় আছে না—যা রটে তাই রটে। আর যা রটে তার পুরোটা না হোক্ খানিকটা অন্তত সত্যি বটে।'

এই বলে হো হো করে হাসতে লাগলো ভৈরব। হাসতে হাসতে বললে, 'যাক্‌গে ও-সব কথা। বেহার টাকা—গভর্মেণ্ট নিতো, তার জায়গায় পুরুষ ব্যাটাছেলে তুই নিয়েছিস, তাতে আর হয়েছেটা কি ?'

প্রসঙ্গটা হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করলে ভৈরব। কিন্তু ভবতোষবাবু অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। ভাগ্যিস্ আশে পাশে লোকজন কেউ ছিল না তাই আর কেলেঙ্কারীটা বেশি দূর গড়ালো না, নইলে ভৈরবকে আজ তিনি কোথায় সহজে ছেড়ে দিতেন না।

ভৈরব কিন্তু তারই জের টেনে আবার বললে, 'বেশ করেছিস বাবা, অনেক টাকা রোজগার করেছিস, এইবার দানধ্যান কিছু কর্। দুর্গো পুজো করিস তো ?'

ভবতোষ বললেন, 'এই বছর করবো ভেবেছি।'

'হ্যাঁ, করিস। ওটা তোদের পৈতৃক পুজো। পুজোর সময় গাঁয়ের লোকজনকে খুব করে খাইয়ে দিস, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

তা বছর কথা শুনেছিলেন ভবতোষ গাঙ্গুলী।

সে বছর খুব ঘটা করে পুজো করলেন। মস্ত বড় প্রতিমা তৈরি হলো। চাকে চোলে ঢুলে আর আলোয় পুরনো নাট মন্দির আবার ঝলমল্ করে উঠলো।

আটমী পুজো শেষ হয়ে গেছে। পরদিন মহা সমারোহে নবমীর উৎসব। সারা গ্রাম নিমন্ত্রণ করেছেন। বাড়ীতে জায়গার অভাব নেই। অনেক লোক খেয়ে চলে গেছে। এবার যারা খেতে বসেছে তারাই বোধহয় শেষ।

সবুজের ঘুঁতি পরে হাত জোড় করে ভবতোষবাবু পঙ্‌ক্তিতে পঙ্‌ক্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর বুকটা তাঁর চড় চড় করছে বন্ধুর কথা শুনে তাঁর ভয় তো খুব। এই নিমকহারাম হতভাগাদের খাওয়াতে গিয়ে তাঁর বহুৎ টাকা বরবাদ হয়ে গেল। যতই খাওয়াও না, ব্যাটারা তাঁর নিন্দে করতে ছাড়বে না। কারও ভাল তারা দেখতে পারে না।

ভৈরব চলে গেছে পাটনায়। নইলে তাকে দেখাতে পারতো। হাতজোড় করে চলতে চলতে এইসব কথাই ভাবছিলেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ একজায়গায় একটা খুব গোলমাল উঠলো। কিসের

গোলমাল দেখবার জন্যে ছুটে গেলেন সেইখানে। গিয়ে শুনলেন, রাসু ভট্চাজ, আর একটার মাংস চেয়েছিল, পায়নি, তাই এই গোলমাল।

ভবতোষবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে এখানে পরিবেশন করছে?'

কে একজন বলে উঠলো, 'কে আবার! ওই নাড়ীর ব্যাটা গোবিন্দ! তোমার জামাই। তুমিই যেমন, জামাই করবার আর লোক পেলে না!'

অশোক এই গ্রামেরই ছেলে। নিতান্ত গরীব। হঠাৎ বড়লোকের জামাই হয়ে গেছে। হিংসা করবার মত সৌভাগ্যই বটে! কাজেই অশোকের ওপরেও রাগ এদের কম নয়। আবার কে যেন বললে, 'শ্বশুরের ধন জোগাচ্ছে! ওর চৌদ্দপুরুষ কেউ কখনও ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছে যে মানুষকে কেমন করে খাওয়াতে হয় জানবে?'

একে তো খরচের ঠেলায় ভবতোষের রক্ত গরম হয়েই ছিল, তার ওপর এইসব কথা শুনে সেই গরম রক্ত উঠে গেল ওঁর মাথায়।

ছুটলেন তিনি ভাঁড়ারের দিকে। ঘৃত ভাগু তখন গিয়ে পড়েছে অশোকের ওপর। রাসু ভট্চাজের মত বজ্জাত লোককে চটিয়ে দেওয়া বড় চারটিখানি কথা নয়। গোপনে যে-কথা তারা বলছে, এবার বোধকরি প্রকাশ্যেই তাই বলে বেড়াবে।

ভাঁড়ারের সুমুখে গিয়ে ডাকলেন, 'অশোক!'

অশোক তখন হাত-পা ধুয়ে ধুয়ে দাঁড়িয়ে কাপড়টা ভাল করে পরছিল।

কে একজন দেখিয়ে দিলে, 'ওই তো দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

ভবতোষবাবু ছুটলেন সেইদিকে।—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে বলতে গেলেন, 'আচ্ছা ছোটলোকের ছেলেকে জামাই করেছি আমি! এ-কাজটা তুমি ইচ্ছে করেই করেছ আমি বুঝতে পেরেছি। তুমিও চাও বুঝি গাঁয়ের লোক আমার বদনাম করুক!'

কথাটা কাকে বলছেন তিনি—অশোক প্রথমে বুঝতে পারেনি। হাঁ করে তাকিয়ে রইলো শ্বশুরের দিকে।

'বলি অমন করে দেখছো কি!'

অশোক ত' অবাক্! বললে, 'কী হয়েছে?'

ভবতোষ তখন রাগে থর্ থর্ করে কাঁপছেন। বললেন, 'কি হয়েছে জানো না? তোমরা কি দশজনের সামনে আমাকে অপদস্থ করবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছ?'

'কি হয়েছে খুলেই বলুন না!'

আসল কথাটা তবু বলেন না ভবতোষ। তিনি তখন মনের আক্রোশে বলেই চলেছেন—'খাবার পরবার সংস্থান ছিল না তোমার। পথের ভিখিরী—ডেকে নিয়ে এসে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে ভাবলাম—আহা ছেলেটা ভাল, গাঁতীতে থাকে তো থাক্। তা না—নিজের স্বভাব ছাড়বে কেন?—ব্রাহ্মণদের পরিবেশন করতে গেলে। জীবনে কখনও কাউকে খাওয়াওনি তো—কেমন করে খাওয়াতে হয় জানবে কেমন করে?—রাসু ভট্চাজ মাংস চেয়েছে, তুমি তাকে মাংস না দিয়ে পালিয়ে এলে কেন?'

এতক্ষণে অশোক বুঝতে পারলে অপমান তিনি তাকেই করেছেন। বললে, 'মাংস ছিল না। ফুরিয়ে গেছে।'

'ছিল না তো আবার বেরুলো কোত্থেকে ?'

অশোক বললে, 'তা আমি জানি না। ঠাকুরের কাছে মাংস চাইতে গেলাম, ঠাকুর বললে—মাংস নেই। তাই আর আমি লজ্জায় সেখানে গেলাম না।'

'লজ্জা ! লজ্জা তোমার আছে ? আমিই ভুল করেছিলাম।'

বলতে বলতে তিনি ছুটলেন ভাঁড়ারের দিকে। ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করতেই ঠাকুর বললে, 'মাংস সত্যিই ফুরিয়ে গিয়েছিল বড়কত্তা। আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম একটা হাঁড়ি, সেইটেই শেষে বের করে দিলাম। এইবার আমাদের বেলা আর কিছু থাকবে না দেখছেন ?'

ভবতোষবাবু বুঝলেন অশোক মিথ্যা বলেনি। কিন্তু তার জন্য অনুতাপ করবার অবসর তখন তাঁর ছিল না। ব্রাহ্মণদের খাওয়া তখনও শেষ হয়নি।

রাত্রে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারছিল না অশোক। পুজোর আনন্দ তার কাছে যেন ম্লান হয়ে গেছে।

নির্মলা বোধকরি ঘুমিয়ে পড়েছিল।

মনের দুঃখ নিজের মনে আর চেপে রাখতে পারছিল না অশোক। নির্মলার গায়ে হাত দিয়ে তাকে ডাকলে, 'নির্মলা !'

নির্মলা জাগলো। বললে, 'কি বলছো ?'

অশোক বললে, 'এখানে আর আমি থাকতে পারছি না।'

'কেন ?'

'তোমার বাপ-দাদার ব্যবহার আমার আর সহ্য হচ্ছে না।'

নির্মলা সবই জানে। তবু বললে, 'যাবে কোন্ দুঃখে ? সে মুরোদ তোমার আছে ?'

অশোক তার স্ত্রীর কাছে হয়ত বা চেয়েছিল একটুখানি সহানুভূতি। কিন্তু তা সে পেলে না।

নির্মলা বললে, 'নিজের বাড়ী বলতে যা ছিল তা তো বোনকে দান করেছ। এখন থাকবে গিয়ে কি গাছের তলায় ?'

অশোক বললে, 'দুখানা ঘর আছে। তাইতেই কোনো রকমে চালিয়ে নেবো।'

নির্মলা বললে, 'এমন সুন্দর এই এত বড় বাড়ী ছেড়ে—তোমার বেশ বুদ্ধি যা-হোক্ !'

অশোক আবার খানিক চুপ করে থেকে বললে, 'তাহলে তুমি যাবে না ?'

নির্মলা স্পষ্ট জবাব দিলে। বললে, 'না।'

বলেই ভাবলে বুঝি এমন করে জবাব দেওয়াটা উচিত হলো না তার। বললে, 'যা আমাকে যেতে দেবে কেন ? তাছাড়া আমি বোঝা মানুষ, ওখানে আমাকে কাজকর্ম করতে হয় না। ওখানে গিয়ে নিজেকে রান্না-বান্না করতে হবে তো ? তুমি তো কাজে চলে যাবে। সে সব কথা ভেবে দেখেছ ?'

কোনও জবাব দিলে না অশোক। চুপ করে রইলো।

—'চুপ করে রইলে যে ?'

অশোক তবু কথা বলে না।

—'তার বেলা চুপ করে আছে ভাখো ! তাছাড়া তোমার তো চল্লিশ টাকা মাইনে। ওতে আমাদের চলবে ?'

অশোক বললে, 'আমার কাছে দু'শ টাকা আছে।'

'দু'শ টাকা আবার টাকা! ঘুমোও।'

অশোক বললে, 'ঘুম আমার আসচে না।'

নির্মলা তাকে বুঝি সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলতে লাগলো 'বাবার আগে মাকে কি বলবো? বলবো—মা, আমি রাগ করে চলে যাচ্ছি তোমার বাড়ী ছেড়ে? বাবাকে কি বলবো? বলবো—তুমি তোমার জামাইকে অপমান করেছ, তাই তোমার সঙ্গে আর আমি কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি তোমার এই রাজবাড়ী ছেড়ে সেই ভাঙা কুঁড়ে ঘরে বাস করতে যাচ্ছি। বাবা একটা অত বড় মানীগুণী লোক—বাবার অপমান হবে না? সেতে আমাকে দেবে কেন?'

অশোক একটি কথাও বললে না।

খানিক পরে দেখা গেল সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নবমীর রাত্রিটা কোনো রকমে কেটে গেল।

পরের দিন বিজয়া-দশমী।

সকালে উঠেই অশোক চলে গেল তার নিজের বাড়ীতে। ছোট্ট একখানি পুরনো বাড়ী। দু'খানি মাত্র ঘর। ভবতোষবাবুর অত বড় বাড়ীতে ঘর-জামাই হয়ে আশ্রয় পাবার পর দিদিকে তার নিজের বাড়ীটি সে ছেড়ে দিয়েছে। ভগ্নীপতি রমেশের অবস্থা খুব খারাপ। অশোকের বাড়ীটা পেয়ে সে বেঁচে গেছে।

অশোককে আসতে দেখে রমেশ বলে উঠলো, 'বিজয়ার প্রণামটা কি এই বেলাতেই সেরে দিবি নাকি?' এই বলে সে তার স্ত্রী শোভনাকে ডেকে বললে, 'ওগো কে এসেছে। বড়লোকের জামাই বিজয়া-দশমীর প্রণাম করতে এসেছে সকালবেলা।'

অশোক বললে, 'না আমি প্রণাম করতে আসিনি। এক কাপ চা খাওয়া তো দিদি।'

আনন্দে শোভনার চোখ ফেটে জল এসে গেল। —'ওরে আমার কি ভাগ্যি রে!'

রমেশ বসেছিল কাছেই। বললে, 'তুমি এখনও চুপ করে বসে আছ? যাও না গো চট্ করে রসিকের দোকান থেকে দুটো সন্দেশ নিয়ে এসো।'

অশোক বললে, 'না না শুধু এক কাপ চা খাব।'

'আজ বিজয়া-দশমীর দিন—তাই আবার হয় নাকি?'

রমেশ বেরিয়ে গেল সন্দেশ আনতে। অশোক সেই অবসরে দিদিকে বললে, 'কিছুদিনের জন্যে আমি বাইরে যাচ্ছি দিদি, তোকে বলে গেলাম। ওদের ওখানে কাউকে কিছু জানাবো না।'

শোভনা বললে, 'জানাবি না কেন? ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে নাকি?'

অশোক বললে, 'না, কিছু হয়নি। কলকাতায় গিয়ে আমি একটা কাজ শিখবো ভাবছি।'

'কেন রে অশোক, তোকে কাজ শিখতে হবে কেন? খোঁড়া মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তোকে বাড়ীতে রাখলে, বড়লোক শ্বশুর তোকে ঘরবাড়ী বিষয় সম্পত্তি সবই দেবে তো!'

অশোক বললে, 'হ্যাঁ দেবে।'

'তবে? চলে যাচ্ছিস কেন?'

'কে চলে যাচ্ছে ?' বলতে বলতে সন্দেশ নিয়ে ঘরে ঢুকলো রমেশ।

অশোক বললে, 'তুমি যেন চাক পিটিয়ে সারা গাঁয়ে বলে বেড়িয়ো না। আমি দিনকতকের জন্যে চলে যাচ্ছি কলকাতায়। তোমাদেরই বলে গেলাম। আর কাউকে বলিনি।'

রমেশ বললে, 'হ্যাঁ তুই চলেই যা অশোক। কালকের ব্যাপারটা আমি সব শুনেছি।'

'কোথায় শুনলে ?'

রমেশ বললে, 'আমিও তো মিষ্টি পরিবেশন করছিলাম। তোর শ্বশুর তো চুপি চুপি বলেনি, বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়েই বলছিল। আমার একবার ইচ্ছে হলো এগিয়ে যাই, তারপর ভাবলাম, কাজ নেই বাবা, বড়লোকের কাণ্ড-কারখানা।'

শোভনা চা তৈরি করতে করতে শুনতে পেলে কথাগুলো। একটি ডিসের ওপর দুটি সন্দেশ আর এক পেয়ালা চা এনে নামিয়ে দিলে অশোকের হাতের কাছে। ভাবলে, থাক্ আগে তারপর জিজ্ঞাসা করবে—কী হয়েছে তার শ্বশুরের সঙ্গে।

অশোক বললে, 'চায়ের সঙ্গে সন্দেশ আবার খায় নাকি ?'

শোভনা বললে, 'না তা কেন খাবি ? খোঁড়া মেয়েটাকে বিয়ে করে বড়লোকের ঘরজামাই হয়ে ভবতোষ গাঙ্গুলীর বকুনি খা। তাহলেই পেট ভরবে। আমার কথা তো শুনলি না—এখন মজাটা বোঝ্।'

অশোক মিষ্টি দুটো মুখে দিয়ে চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, 'আমি চললাম।'

রমেশ বললে, যেখানেই যাস্, চিঠিপত্র দিস।'

'দেবো' বলে অশোক বেরিয়ে গেল।

শোভনা তো জানে না- কেন সে বড়লোকের ঘর-জামাই হয়েছে ! রমেশের ছিল একখানা মাত্র মাটির ঘর, তাও আবার খড়ের ছাদন। সে বছর ঝড়ে উড়ে গেল চালের খড়। নতুন খড় কিনে ঘর ছাদন করবার পয়সা ছিল না রমেশের। তালপাতা কেটে এনে ছাদন করলে তার সেই মাটির ঘর। তাতেও কোনও দুঃখ ছিল না রমেশের। হাসতে হাসতে অশোককে বললে, 'বাস্, এমন ছাদন করেছি, এ-বছর আর একফোঁটা জল পড়বে না বর্ষায়।' রমেশ হেসে হেসে বললে বটে, কিন্তু অশোক হাসতে পারলে না। মাত্র চল্লিশ টাকা মাইনে। রমেশকে যে কিছু খড় কিনে দেবে সে ক্ষমতাও তার নেই। দিদিকে বললে, 'তুই আমার বাড়ীতে এসে থাক্।' রমেশ রাজী হলো না। বললে, 'আমার জন্যে ভাবিসনে, আমি বেশ আছি।'

তারপর রমেশ যখন বললে, 'নিজে হাত পুড়িয়ে রান্না করে খাচ্ছিস অশোক, তার চেয়ে আমার ঘরে দু'মুঠো যদি খাস্ শোভনা খুশীই হবে।'

অশোক রাজী হলো না। বললে, 'না। আমি বেশ আছি।'

এমন দিনে ভবতোষবাবু বললেন, 'তুমি আমার বাড়ীতে থাকবে খাবে, তোমাকে আমি ঘর-জামাই করব। নির্মলাকে তুমি বিয়ে কর।'

শোভনা বারণ করেছিল। বলেছিল, 'ওই খোঁড়া মেয়েটাকে বিয়ে করিস না অশোক। ভবতোষ গাঙ্গুলী মানুষ ভাল নয়।'

অশোক শোনেনি তার কথা। ভবতোষবাবুর রাজবাড়ীর মত বাড়ীতে গিয়ে ঘর-জামাই হয়ে

রমেশকে বলেছিল—'আমার বাড়ীটা খালি পড়ে থাকবে, সেখানে কুকুরের আড্ডা হবে। তার চেয়ে তোমরা আমার বাড়ীতে এসে থাকো।'

সে-সব পুরনো দিনের কথা।

সেদিন বিজয়া দশমী।

প্রতিমা বিসর্জ্জনের দিন।

ভবতোষবাবুর নাট-মন্দিরে পাড়ার মেয়েরা এসে জড়ো হয়েছে।

লোকজন এসেছে। পূজোর বেদী থেকে প্রতিমা নামানো হচ্ছে চণ্ডী-মণ্ডপের বিরাট চত্বরে।

গাঙ্গুলী-গিন্নি রাসমণি গরদের শাড়ী পরেছেন। টকটকে লাল পাড় শাড়ী সিঁথিতে টকটকে লাল সিঁদুর। ভাগ্যবতী সধবা। মেয়ে-জামাইএর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। বাইরে থেকে ডাকলেন, 'নির্ম্মলা!'

ভেবেছিলেন মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন নাট-মন্দিরে।

নির্ম্মলার সাড়া না পেয়ে আবার ডাকলেন। ভাবলেন বুঝি জামাই রয়েছে ঘরের ভেতর তাই বোধহয় সাড়া দিচ্ছে না। বললেন, 'নাট-মন্দিরে একবার যাবি না নির্ম্মলা? যাবি তো আয়, আমি তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাই।'

ঘরের ভেতর থেকে নির্ম্মলা ডাকলে, 'মা, শোনো।'

রাসমণি ঘরে ঢুকলেন। 'এ কি? এখনও কাপড়-চোপড় পরিসনি কেন? যাবি না?'

নির্ম্মলা একাই দাঁড়িয়েছিল বড় জানলাটার কাছে। বললে, 'না যাব না। এই ছাখো।'

বলেই একখানা কাগজ বাড়িয়ে ধরলে তার মায়ের হাতের কাছে।

কাগজখানা নিয়ে মা পড়ে দেখলেন। লেখা আছে, আমি চললাম। কোথায় চললাম জানি না। তুমি তোমার বাবার নিরাপদ আশ্রয়ে সুখে থাকো। তাহলেই আমি সুখী হব। ইতি— অশোক

রাসমণি চীৎকার করে উঠলেন, 'ওমা, একি কথা গো! আজ বিজয়া দশমী। বাড়ী থেকে কুকুর-বেড়াল যায় না, আর আমার জামাই চলে গেল? ঝগড়া-ঝাঁটি করেছিলি নাকি?'

নির্ম্মলা বললে, 'না।'

'তবে? অমনি চলে গেল?'

নির্ম্মলা জানলার শিক ধরে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। একটি কথাও বললে না।

রাসমণি আবার বললেন, 'চুপ করে রইলি কেন? বল্—কি হয়েছিল?'

নির্ম্মলা বললে, 'জানি না।'

'জানিস না তো জানিস না, আয়—কাপড় আয়। পর্। কাউকে কিছু বলিস না যেন।'

মা ধরে ধরে নিয়ে গেলেন মেয়েকে।

বিজয়া-দশমীর পাট চুকলো।

রাসমণি ভেবেছিলেন, অশোক গিয়েছে হয়ত কোথাও, আবার ফিরে আসবে।

কিন্তু তিন চার দিন পার হয়ে গেল ফিরে যখন এলো না তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ভবতোষবাবুকে: 'জামাইকে কিছু বলেছিলে তুমি?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'তোমাকে বলছিল বুঝি ?'

রাসমণি বললেন, 'সে আছে বাড়ীতে যে বলবে ?'

'নেই তো গেল কোথায় ?'

রাসমণি একটু বিদ্রূপ করলেন তাঁর স্বামীকে। বললেন, 'বাড়ীর কর্তাটি বেশ। আজ চারদিন হলো জামাই বাড়ী থেকে চলে গেছে তার খোঁজও রাখো না।'

'খোঁজ রাখবো কেমন করে ? আমাকে বলে তো যায়নি !'

'বিজয়ার প্রণাম করেছিল তোমাকে ?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'কে করেছে আমাকে প্রণাম ? তোমার গুণধর ছেলেরা করেছে ?'

রাসমণি ঝোঁঝিয়ে উঠলেন। উঠলেন—'তোমার গুণধর ছেলেরা' বলার জন্যে। বললেন, 'গুণধর বাপের মতই গুণধর হয়েছে ছেলেরা। ঠিক গাছের ফল ঠিক হয়েছে।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'খামো আর আমাকে রাগিয়ো না বলছি।'

'বেশ রাগাবো না, কিন্তু জামাই-এর খোঁজ-খবর কিছু করবে না ?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'কিছু করতে হবে না। এক কানাকড়ি যার মুরোদ নেই তার আর খোঁজ করতে হয় না। খেতে যখন পাবে না তখন মুড় মুড় করে এসে হাজির হবে দেখো।'

কিন্তু হাজির সে হলো না মুড় মুড় করে।

২

অশোক তখন কলকাতায়।

ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্বেষণে ভবতোষ গাঙ্গুলীও এসেছিলেন কলকাতার মতন মহানগরীতে। আবার তার জামাই অশোকও এলো।

দুটি মানুষ দু'রকমের। কাজেই দুজনের পথ আলাদা।

মানুষ শুধু ভাবে আর পথ চলে। কিন্তু পথের ঠিকানায় যিনি পৌঁছে দেন তাকে চোখে দেখা যায় না। তাই সোজা কথায় মানুষ তার নাম দিয়েছে অদৃষ্ট।

ভবতোষ গাঙ্গুলী সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথাই বলে। অদৃষ্ট-ঠাকুরুণ তাঁকে কোথায় কোন অবিশ্বাসরে পৌঁছে দিয়েছিলেন—আমরা অবশ্য তার সঠিক খবর কিছু রাখিনি।

খবর রেখেছি অশোকের। কারণ অশোককে নিয়েই আমাদের গল্প।

বিয়ের পর অশোকের খরচ কমেছিল। মাসে মাসে জমে জমে তার হাতে জমেছিল মাত্র দু'শ টাকা। সেই দু'শ টাকা সম্বল করেই এসেছিল সে কলকাতায়।

ভাগ্যান্বেষীরা প্রথমেই যে-কথা ভাবে অশোকও ভেবেছিল সে-কথা। ভেবেছিল কত লোক তো কত রকমে টাকা পায়। কত লোক লটারিতে টাকা পেয়ে বড়লোক হয়েছে। বড়লোক হতে অবশ্য সে চায় না। তবু একবার একখানা টিকিট কিনতে দোষ কি ?

পথের ধারে একটি টাকা দিয়ে অশোক একদিন একখানি লটারির টিকিট কিনলে।

—'নম্-ডি-প্লুম' কি লিখব?'

—'সে আবার কি?'

'নম্-ডি-প্লুম' কাকে বলে অশোক জানে না। লটারির টিকিট যিনি বিক্রি করছিলেন তিনি বুঝিয়ে দিলেন—'এই দেখুন না—অনেকে লেখে 'কাঁচকলা', অনেকে লেখে 'মিছেমিছি', আবার অনেকে ঠাকুর-দেবতার নাম দেয়, নিজের স্ত্রী-পুত্রের নাম দেয়।'

অশোক বললে, 'লিখুন—'ভাগ্য'।'

'ভাগ্য'ই লিখে নিলেন তিনি। কিন্তু ঠিকানা?

ঠিকানা লেখাতে গিয়ে বিপদে পড়লো অশোক।

অশোক এসে উঠেছে একটি হোটেলে। সস্তা হোটেল। তাইেই জায়গাটা অত্যন্ত নোংরা। অন্য একটা হোটেল খুঁজে বেড়াচ্ছিল অশোক। আর খুঁজছিল একটি দর্জির কাজ শেখবার ইস্কুল। প্রথমে গিয়েছিল মোটর ড্রাইভারী শিখতে। সেখানে যে-টাকা চেয়েছে সে-টাকা তার কাছে নেই। বাগবাজার ষ্ট্রীটে একটি দর্জির কাজ শেখবার ইস্কুল সে দেখে এসেছে। মালিকের সঙ্গে দেখা হয়নি। কাজেই ঠিক বুঝতে পারেনি কত টাকা তিনি চাইবেন। যতই চান মোটর-ড্রাইভারি শিখতে যে-টাকা লাগবে তত টাকা নিশ্চয়ই নয়। এই ভেবে বাগবাজারের সেই ঠিকানাটা সে কাগজে লিখে নিয়ে এসেছে।

কে যেন তাকে বলে দিলে—দর্জির কাজ শেখা ছাড়া যখন আর তোমার অন্য পথ নেই, তখন দিয়ে দাও ওই ঠিকানাটা।

অশোক চট্ করে তার লটারির টিকিটে সেই অনিশ্চিত ঠিকানাটাই দিয়ে দিলে। যাক্‌গে যাক্, লটারির টিকিটখানাও তো অনিশ্চিত, পাবে না তো কিছুই, তাতে যে ঠিকানা থাকে থাক্।

টিকিটখানি পকেটে নিয়ে সে হোটেলে ফিরে গেল।

পরের দিন সকাল-সকাল খেয়ে নেয়ে অশোক বেরিয়ে পড়লো। প্রথমে দর্জির কাজ শেখার ব্যবস্থাটা করবে, তারপর তারই কাছাকাছি একটি থাকবার জায়গা দেখে নেবে।

দর্জি-বিদ্যালয়ের মালিকের সঙ্গে দেখা করলে অশোক। হাত জোড় করে একটি নমস্কার করলে প্রথমে। তারপর বললে, 'দর্জির কাজ শিখতে চাই আমি।'

ভদ্রলোক অশোকের আপাদমস্তক একবার ভাল করে দেখে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম?'

—'অশোক মুখোপাধ্যায়।'

—'কোথায় বাড়ি?'

অশোক তার গ্রামের নাম বললে। জেলার নাম বললে। বলেই তার মনে হলো—কি হবে ছাই ও-সব কথা জেনে! আসল কথাটাই তো এখনও তিনি বললেন না। অশোক জিজ্ঞাসা করলে, 'শিখতে কত টাকা লাগবে?'

ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে কি যেন ভাবছেন। হঠাৎ মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, 'এখানে কোথায় থাকো তুমি?'

অশোক বললে, 'এই সবে এসেছি কলকাতায়। এসে উঠেছি একটা হোটেলে। হোটেলটা ভাল নয়। অন্য জায়গায় উঠে আদব ভাবছি।—দর্জির কাজ শিখতে কতদিন লাগবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'বুদ্ধিমান ছেলে যদি হও তো তিনমাসেই শিখে ফেলতে পারবে।'

—'টাকা কত দিতে হবে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিন মাসের কোর্স—আড়াই শ' টাকা।'

মুখখানি শুকিয়ে গেল অশোকের। এই জন্যই মোটর ড্রাইভারি শেখা হয়নি।

—'তাহ'লে হলো না। অত টাকা নেই আমার।'

এই বলে সে বেরিয়ে আসবে কিনা ভাবছিল সেখান থেকে। ছি ছি, লটারির টিকিটে এখানকার ঠিকানাটা না দিলেই হতো! হঠাৎ তার একটা কথা মনে হলো। জিজ্ঞাসা করলে, 'মাসে মাসে মাইনে দিয়ে শেখা যায় না?'

ভদ্রলোক বললেন, 'যায়। কত টাকা মাইনে তুমি দিতে পারবে?'

অশোক একটু ভেবে বললে, 'মাসে পাঁচটি করে টাকা আমি দিতে পারি। দু'শ'টি টাকা হাতে নিয়ে আমি বেরিয়েছিলাম দেশ থেকে। এই টাকায় আমাকে এখানে থাকতে হবে, একটা কিছু শিখতেই হবে। আপনি বিশ্বাস করুন।'

এবার ভদ্রলোক আবার একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসলেন।

—'দেশে তোমার বাড়ী আছে?'

—'আছে।'

—'বাবা মা?'

—'কেউ নেই।'

বাস! কি যে মনে হলো ভদ্রলোকের। বললেন, 'শেখো তুমি দর্জির কাজ। আমি তোমাকে ভাল করে কাজ শিখিয়ে দেবো। যাও তুমি তোমার হোটেলে থেকে চলে এসো এইখানে।'

অশোক প্রথমে কথাটা তাঁর বুঝতে পারেনি। বললে, 'কাছাকাছি কোনও হোটেল কি মেস্ আপনার জানা আছে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'মেসে হোটেলে থাকতে হবে না। তুমি আমার এইখানেই থাকবে। আমি এই বাড়ির দোতলায় থাকি। বাড়িটা আমার।'

অশোকের মাথাটা চট্ করে কেমন যেন ঘুরে গেল।

যখন থেকে সে গ্রাম ছেড়েছে তখন থেকে অনেকবার সে মানুষের জীবন এবং জীবনের দেবতার কথা ভেবেছে। অনেকে বলে, জীবনের দেবতা টেবতা সব মিথ্যা কথা, জীবনের অদৃশ্য দেবতা বলে কিছু নেই। মানুষ একক এবং একাকী। অসহায় এবং নিরাশ্রয়। কিন্তু আজকের এই ঘটনায় হঠাৎ তার মনে হলো—মানুষের চোখের বাইরে এমন-একটা বস্তু নিশ্চয়ই আছে—যা তাকে আশ্রয় দেয়, যা তাকে চালিয়ে নিয়ে যায়।

অশোক বললে, 'চলি তা'হলে আমি ওই হোটেল থেকে আমার জামাকাপড় নিয়ে আসি।'

—'হ্যাঁ, যাও।'

—'আপনি আমার নামটা লিখে রাখুন।'

ভদ্রলোক বললেন, 'নাম আমার লেখা হয়ে গেছে। অশোক মুখুজ্যে। তুমি এসো চটু করে। আজ থেকে এখানেই খাবে।'

কলকাতায় একজন নামকরা দর্জি—কেশব চক্রবর্তী। কেশববাবুর অন্তত সেই ধারণা। তবে হ্যাঁ, বাগবাজার অঞ্চলে লোকজন বলাবলি করে বটে, কেশববাবু পাঞ্জাবী তৈরি করেন চমৎকার। কিন্তু শুধু পাঞ্জাবী তৈরি করে দিন চলা ভার। সেলাই-এর কল একটা তো ছিলই। তাই একদিন তিনি ঠিক করে ফেললেন বাড়িতেই একটা টেলারিং স্কুল খুলবেন। কিন্তু একটি সেলাই-এর কলে স্কুল চলে না। কলকাতা শহরে ঘোরাঘুরি করে আরও তিনটে পুরনো সেলাই-এর কল জোগাড় করলেন কেশব, তারপর সেইগুলো সারিয়ে সুরিয়ে নিয়ে—বাড়ির সামনে মস্ত বড় একটা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে 'টেলারিং স্কুল' খুলে বসলেন কেশব চক্রবর্তী।

নীচের তলায় একটি ঘরে 'টেলারিং স্কুল, বাকি দুখানা ঘর খালি।—দোতলার চারখানি ঘরের মধ্যে দু'খানিতে থাকেন নিজেরা। কেশববাবু একা হলেও-বা ভাবনা ছিল না। স্ত্রী আছে আর দুটি মেয়ে। ধীরা আর নীরা। দু'জনেই সুন্দরী, দু'জনেই যুবতী—অথচ বিয়ে হয়নি কারও।

কেশবের বাড়ী ছিল কলকাতার কাছাকাছি একটা গ্রামে। বড় রাস্তার পাশেই ছিল অনেকখানা খালি জমি। কলকাতার এক ধনী ব্যবসায়ী অনেক টাকা দিয়ে সেই জায়গাটা একদিন কিনে ফেললেন। কেশবকে তিনি একটা চাকরিও দিতে চেয়েছিলেন তার রবারের কারখানায়। কিন্তু সে চাকরি কেশববাবু নিলেন না। তিনি তখন ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে কলকাতা থেকে দর্জির কাজ শিখেছেন। তাঁর ইচ্ছে কলকাতায় গিয়ে কাজ করবেন। এমন দিনে তাঁর হাতে এলো টাকা। তখনকার দিনে কলকাতার জমি-জায়গার দাম এত বেশি ছিল না; দেশের বাড়িঘরদোর বিক্রি করে কেশববাবু কলকাতায় এসে বাগবাজার অঞ্চলে পুরনো এই দোতলা বাড়িখানি কিনে ফেললেন। যেশে রইলো কিছু ধানের জমি। সে জমি তাঁর এখনও আছে। সারা বছর তাঁকে চাল কিনে খেতে হয় না। দুটি ছোট মেয়ে আর তিনি নিজে। দর্জির কাজ করে যা পান তাইতেই তাঁর পরমানন্দে চলে যায়।

কিন্তু পুরনো দিন চিরকাল থাকে না। দিন চলে গড়িয়ে গড়িয়ে আর মেয়েদুটো বড় হতে থাকে।

কেশবের স্ত্রী বলেন, 'মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে না। বড় হলো, বিয়ে তো দিতে হবে।'

কেশব বলেন, 'ওদের আবার বিয়ের ভাবনা! যা চেহারা হয়েছে ওদের, কত ব্যাটা লুকে নেবে!'

লুকে অবশ্য কেউ নেয় না। তখন ভাবনা হয় কেশবের। লুকে নেবার মতো যে-সব ছেলেরা তাঁর বাড়ির সুমুখে ঘুর-ঘুর করে, ফতুয়া ফ্রক তৈরি করতে কত নেবে জিজ্ঞেস করতে আসে, তাদের হাতে মেয়েদের দেওয়া চলে না।

মেয়েরা যতই না কেন সুন্দরী হোক্ বিয়ে দিতে হলে টাকার দরকার।

আর সেই মতেই কেশবের টেলারিং স্কুল।

ইস্কুলে ছাত্র অবশ্য জুটলো। চারটে মেশিনই চলতে আরম্ভ করলো ঘরঘর করে, কিন্তু কিছুদিন পরেই কেশববাবু বুঝতে পারলেন—টেলারিং ইস্কুলের আয় থেকে ধীরা নীরাকে পার করতে হলে—ওরা ততদিনে বুড়ী হয়ে যাবে।

এমন দিনে এলো অশোক।

দর্জির কাজ শিখবে। অথচ মাসে পাঁচটি টাকার বেশি দিতে পারবে না।

—'দুত্তোর টাকার মুখে মারো ঝাড়ু!'

ছেলেটি দেখতে শুনতে ভাল, বামুনের ছেলে—ধীরা নীরার মধ্যে একটাকে অন্তত পার করে দেওয়া চলে। এই ভেবেই কেশববাবু বলেছিলেন, 'বুঝতে পেরেছি তুমি গরীব। থাকো তুমি আমার বাড়ীতে।'

• • • •

সেই থেকে অশোক রয়েছে কেশবের বাড়িতে।

আছে ঠিক বাড়ির ছেলের মত।

ধীরা নীরা দুটি মেয়ে—চলচঞ্চলা দুই যুবতী নারী দিবারাত্রি যেন ছটফট করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইস্কুল-কলেজ নেই, কাজেই হাতে তাদের সময় প্রচুর।

ভোরে উঠেই তাদের প্রথম কাজ হলো নীচের ইস্কুল-ঘরটা ঘুরে মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া। একজন নেয় বালতি, একজন নেয় ঝাঁটা। কোমরে কাপড় জড়িয়ে হেসে হেসে কাজ করে। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। বোনে বোনে ভাব খুব। ধীরা বড়, নীরা ছোট।

নীরা বলে, 'দিদি তুই কোনও কাজের মোস্। ঝাঁটাটা দে আমাকে। তুই দু' বালতি জল এনে দে বরং।'

হাসতে হাসতে ঝাঁটাটা নীরার হাতে দিয়ে বালতি নিয়ে জল আনতে যায় ধীরা।

নীচের ঘর, ওপরের ঘর, সিঁড়ি, বারান্দার ঘর—সব কাজ সেরে দু'বোনে ঢোকে গিয়ে অশোকের ঘরে।

অশোক তখন খবরের কাগজে রেল কম্পাস নিয়ে পেন্সিলের দাগ দিয়ে দিয়ে কাঁচি চালিয়ে ব্লাউজের ছাঁট কাটছে।

নীরা বলে, 'রাখুন মশাই, আপনার দর্জিবিদ্যাটা একটু সরান। নইলে আপনাকেও ঝেড়ে সাফ্ করে দেবো।'

ধীরা বলে, 'এই! ও কি হচ্ছে?'

নীরা তার দিদিকে ভেংচি কেটে হেসে বলে, 'আমাকে ধমকাচ্ছিস কেন দিদি, ওই ওকে ধমকা না।'

এই বলে সে অশোককে দেখিয়ে দেয়।

অশোক তখন তার কাগজপত্র সরিয়ে ফেলেছে।

নীরা বলে, 'দেখলি? অশোকদা কিরকম আমার কথা শোনে?'

বিকেলে সেদিন অশোকের ক্লাস ছিল না। ধীরা নীরা ধরে বসলো—তাদের গড়ের মাঠ দেখিয়ে আনতে হবে।

অশোকের আপত্তি ছিল না। শুধু বললে, 'মা যদি বকে?'

নীরা বলে, তুমি মায়ের ভয়েই মলে। তুমি এত ভীতু কেন অশোকদা?'

বীরা বলে, 'দাঁড়াও আমি মাকে বলে আসি। তাহ'লে যাবে তো?'

মাকে বলতে গিয়ে বীরা তাঁকে ডেকেই আনলে সঙ্গে করে।

মা বললেন, 'তাই যাও না বাবা, ওদের একটুখানি বেড়িয়ে নিয়ে এসোগে। তোমার এখন হ্লাদ নেই তো?'

অশোক বললে, 'না।'

—'আর কাকেই-বা বলবো বাবা! মেয়েগুলো বাড়ী থেকে বেরোতে পায় না। মনে হয় যেন কয়েদখানায় বন্দিনী হয়ে আছে।'

বাধ্য হয়ে অশোককে যেতে হলো।

—'ওমা, এই গড়ের মাঠ?' নীরা বললো, 'দিব্যি কেমন কচি কচি ঘাস, এখানে তো গরু চরে!'

অশোক বললে, 'না। মানুষও চরে।'

বসলো তারা একটা গাছের তলায়। চৌরঙ্গীর ওপর বড় বড় বাড়ি—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বড় রাস্তা। মন্দ লাগছে না দেখতে।

নীরা এইসব দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে বললো, 'তুমি এখনও বিয়ে করনি কেন অশোকদা?'

অশোক বললে, 'কে বললে বিয়ে করিনি?'

—'মা বলছিল, বাবা বলছিল, সবাই বলছিল—ছেলেটি বেশ। কিন্তু বিয়ে এখনও হয়নি কেন কে জানে!'

অশোক বললে, 'ওঁরা জানেন না। বিয়ে আমি করেছি।'

নীরা বিশ্বাস করলে না। অশোকের পিঠে একটা চড় মেরে দিয়ে বললে, 'যাও! মিছে কথা।'

অশোক বললে, 'মিছে কথা আমি সহজে বলি না।'

—'আমাদের জন্যে মিছে কথা একটু বলই না অশোকদা।'

—'কী বলবো?'

—'বলবে—বিয়ে তুমি করনি।'

—'কেন?'

নীরা বললে, 'আহা, জানে না যেন! শুনে মা বাবা একটু খুশী হবে। দুটো বাড়ি বাড়ি আইবুড়ো মেয়ে বাড়িতে রয়েছে—'

বলতে বলতে নীরা একেবারে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়লো।

বীরা তার পিঠে একটা চড় মারলে।—'ভারি বেহায়া হয়েছিস নীরা। চল্ মাকে আজ বলে দেবো।'

নীরা কিন্তু এতে ভয় পাবার মেয়ে নয়। বললে, 'তোকে তো জিজ্ঞাসা করিনি দিদি, তুই যা।' এই বলে সে আবার অশোককে নিয়ে পড়লো।

—'তোমার বৌ খুব সুন্দরী, না অশোকদা ?'

অশোক বললে, 'না। গায়ের রং কালো আর একটা পা খোঁড়া।'

—'তবু তুমি বিয়ে করেছ তাকে ?'

অশোক বললে, 'হ্যাঁ, করেছি।'

নীরা হাসতে লাগলো মুখ টিপে টিপে।

অশোক বললে, 'হাসছো যে ?'

নীরা বললে, 'বিশ্বাস করি না। সত্যি কথা না হাতী! বিয়ে তোমার হয়নি—হয়নি—হয়নি।'

অশোক বললে, 'হয়নি তো হয়নি। এবার চল বাড়ি যাই।'

—'না গেলেই নয়!' নীরা বললে, 'নিউ মার্কেট না দেখে আমি বাড়ি ফিরবো না কিছুতেই।'

গড়ের মাঠ থেকে নিউ মার্কেট।

দোকানে দোকানে তখন আলো জ্বলছে। ঝল্‌মল্ করছে চারিদিক।

নীরা বললে, 'নাঃ, ঘড়ির বৌ হলে চলবে না আমার।'

অশোক এবার সত্যিই হেসে ফেললে।

—'হাসলে যে ?'

—'হাসছি তোমার কথা শুনে।' অশোক জিজ্ঞাসা করলে, 'আর বৌ হতে চাও তুমি ?'

নীরা বললে, 'যে আমাকে বলতে পারবে—এই সব দোকানে তোমার যা পছন্দ হবে বল—আমি তাই তোমাকে কিনে দিচ্ছি।'

অশোক বললে, 'নাঃ, এ তোমার মনের কথা নয়।'

নীরা বললে, 'মেয়েদের মনের কথা তুমি কেমন করে জানবে অশোকদা! এইটিই হলো গিয়ে সব মেয়ের মনের কথা। না দিদি ?'

ধীরা গম্ভীর হয়ে পথ চলছিল। বললে, 'তোর সঙ্গে বক্ বক্ করতে পারব না আমি।'

—'কেন, তুই খুশী হোস্ না ওই সব শুনে ?'

ধীরা বললে, 'না।'

—'তুই আমাকে আজি অপ্রস্তুত করিস দিদি। জানি তোর মন খারাপ হয়ে গেছে।'

—'কেন ?'

নীরা বললে, 'বলবো না।'

এমন ইঙ্গিত করে কথাটা বলেই সে তার নাগালের বাইরে চলে যাবার জন্যে এমন ভাবে ছুটলো, মনে হলো যেন সে জানে—দিদি তাকে মারতে আসবে।

ধীরা কিন্তু কিছুই করলে না। আস্তে আস্তে যেমন আসছিল তেমনি আসতে আসতে অশোককে বললে, 'চল বাড়ি যাই। ও পাগলীর সঙ্গে কত ছুটবে ?'

নীরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, 'দিদি কি বললে অশোকদা ?'

অশোক বললে, 'বলবো না।'

নীরা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, 'আমি জানি।'

ধীরা জিজ্ঞাসা করলে, 'কি জানিস্ বল্।'

নীরাও বললে, 'বলব না।'

• • • •

বাড়ী ফিরে এসে নীরা প্রথমেই তার মাকে বললে, 'দারুণ দুঃসংবাদ মা।'

ডিরেক্টারী চংএর এমনভাবে কথাটা সে বললে, মা হেসে উঠলেন। বললেন, 'সব সময় ফাজলেমি ভাল লাগে না। কি বলছিস বল্।'

নীরা বললে, 'চুপিচুপি বলতে হবে। চেঁচিয়ে বলবার উপায় নেই।'

—'কী এমন কথা রে? চল্ ঘরে চল্—'

ঘরে গিয়ে নীরা মাকে বললে, 'বলি ছেলেটিকে যে ঘরে পুষলে, তাহলে বড় মেয়েটিকে পার করবে, কিন্তু একটিবার ওকে জিজ্ঞাসাও করলে না ওর বিয়ে হয়েছে কিনা?'

নীরার মাও কথাটা শুনে কম বিস্মিত হলেন না। বললেন, 'সে কি কথা! তোর বাবাই তো বললে—একটা মেয়ের জন্ত তোমার ভাবনা নেই, খুব সুন্দর একটি ছেলে পেয়েছি। তাইতো ওকে আমি বাড়ীতে রাখলাম।'

নীরা বললে, 'আমার কিন্তু প্রথম থেকেই কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছিল। এত যে পেছনে লাগি তো চোখে মুখে এতটুকু ইয়ে দেখি না! তাই তো বললুম—গড়ের মাঠ নিয়ে চল। সেখানে গিয়ে বের করে ফেললাম আসল কথাটা।'

নীরার মা বললেন, 'এখন কি করি বল্ তো।'

নীরা বললে, 'করবে আবার কি? গরীব বামুনের ছেলে, এতদিন রাখলে, সেবাযত্ন করলে, তোমার পুণ্যি হলো।'

—'তাহ'লে কি বলতে চাস্ এবার আমি ওকে তাড়িয়ে দেবো?'

—'সে তোমার খুশী।'

নীরার মা বললেন, 'কিন্তু ও যে ঘরের ছেলের মতন রইলো এতদিন, ওকে আমি যেতে বলবো কেমন করে? না মা, তা আমি পারবো না।'

নীরা বললে, 'থাক্ না—যেমন আছে।'

নীরার মা কেমন যেন একটুখানি চিন্তিত হলেন।—'বিয়ে দেবো বলে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলাম। পাড়ার লোকে কত কথা বলেছে, আমি কান দিইনি। তোদের মতন দুটো বাড়ি বাড়ি আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে বাড়িতে—এখন যদি কিছু বলে—'

নীরা বললে, 'এখনও তুমি তোমার মেয়েদের চিনতে পারলে না মা। আর অশোকদার কথা যদি বল তো আমি ওকে একটা সার্টিফিকেট দিতে পারি।'

কেশববাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন নীরার মা।

—'বিয়ে হয়েছে কিনা তুমি একবার জিজ্ঞাসা করলে না গা?'

কেশববাবু বললেন, 'ভুলে গেছি।'

কোনও দুঃখ নেই, কোনও আফ্‌শোস নেই, শুধু ভুলে গেছি।

—'এখন কি হবে?' নীরার মা বললেন, 'অশোক থাকবে বাড়ীতে?'

—'চলে যাবে বলেছে নাকি ?'

—'না বলেনি কিছু। আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি।'

কেশববাবু বললেন, 'অশোক যেমন আছে তেমনি থাকবে। ওকে আমি ছাড়তে পারব না।'

—'মেয়েদের বিয়ের কি হবে ?'

কেশববাবু বললেন, চেষ্টা করতে হবে। ভাগ্যে—অন্ন বস্ত্র বিদ্যে, তিন বিধাতা নিয়ে। যতই চেষ্টা করি—যেখানে হবার ঠিক সেইখানে হবে।'

নীরার মা কিন্তু এ-সব কথা অনেক শুনেছেন। বললেন, 'জানি, কিন্তু চুপ করে বসে থেকো না। এবার উঠে পড়ে লাগো।'

কেশববাবু বললেন, 'অশোককেও বলি তাহ'লে। ও-ও একটু চেষ্টা চরিত্তির করুক।'

সেইদিনই খেতে বসে অশোককে বললেন কেশববাবু।

—'ভাখো অশোক, তুমি আমাকে খুব ভাবনায় ফেললে।'

—'আমি আপনাকে ভাবনায় ফেললাম ? কেন ?'

কেশববাবু বললেন, 'তুমি যে বিয়ে করেছ, কই সেকথা তুমি আমাকে বলনি তো ?'

—'আপনি তো সেকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন নি কোনদিন।'

কেশববাবু বললেন, 'তাও তো সত্যি। জিজ্ঞাসা না করলে তুমি বলবেই-বা কেন ? তবে শোনো, এখন বলে ফেলি মনের কথাটা। ভেবেছিলাম, নীরার সঙ্গে তোমার বিয়ে দেবো।'

হো হো করে হেসে উঠলো অশোক।—'আচ্ছা, কেমন করে ভাবলেন বলুন তো ? আমার কোথাও-কিছু নেই, গ্রাম থেকে কলকাতায় এসে টেলারিং শিখে কিছু রোজগার করবো বলে। তাও হয়ত হতো না—আপনি যদি দয়া না করতেন। আমার সঙ্গে নীরার মত মেয়ের বিয়ে দেবেন আপনি ভাবলেন কেমন করে ?'

কেশববাবু বললেন, 'তোমাকে আমার ভাল লেগেছিল তাই ভেবেছিলাম। যাক্‌গে এখন ওদের বিয়ের কি হবে তাই বল।'

অশোক বললে, 'বিয়ের কথা তো ভাবতে হয় না মানুষকে ! যেখানে হবার ঠিক সেইখানে হয়।'

কেশববাবু বললেন, 'ঠিক এই কথা বলছিলাম নীরার মাকে। নীরার মা বিশ্বাস করে না।'

—'বিশ্বাস তো অনেকেই অনেক কিছু করে না। পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আগেকার মানুষ বিশ্বাস করতো না। চোখে যা দেখতো তাই বলতো। আমিও আগে অনেককিছু বিশ্বাস করতাম না, এখন করি।'

কেশববাবু বললেন, 'তুমি তাহ'লে এই বিয়ের কথাটা বিশ্বাস কর ?'

অশোক বললে, 'শুধু বিয়ের কথা নয়, আমি এখন এমন অনেক কিছু বিশ্বাস করি যা শুনলে আপনি হয়ত আমাকে পাগল ভাববেন।'

—'তাহ'লে তুমি একবার নীরার মাকে বুঝিয়ে বোলো তো—।'

'বলবো।' বলে অশোক চুপ করে গেল।

অশোক দর্জির কাজ বেশ ভালই শিখেছে। কেশববাবু কিস্তিতে কিস্তিতে টাকা দেবেন বলে আরও দুটো সেলাইএর মেশিন কিনলেন।

অশোককে বললেন, 'বাইরের কাজকর্ম যা আসছে, তা তো তুমি করছই, এবার ঘণ্টাদুয়েক নাটোরি কর।'

অশোক বললে, 'আবার নতুন মেশিন কিনলেন আপনি? সামলাতে পারবেন তো?'

'আমি ও-সব কিছু জানি না। সবই তো তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছি।'

অশোক বললে, 'আমার ওপর নয়। ছেড়ে দিন সেই মালিকের ওপর—তিনি সব-কিছু দেখছেন, সব-কিছু চালাচ্ছেন।'

কেশববাবু খুব বিজ্ঞের মত মুখখানাকে গম্ভীর করে বললেন, 'সেই যেদিন থেকে তুমি বলেছ, সেইদিন থেকে তাই তো দিয়েছি।'

অশোক হাসলে একটুখানি।

কেশববাবু বললেন, 'মেয়ে দুটোর বিয়ে দিতে হলে টাকার দরকার হবে তো, তাই মেশিনদুটো কিনে আনলাম।'

'ভাল করলেন।' অশোক বললে, 'কিন্তু আমার জবাগত মনে হচ্ছে—আমি একটা আলাদা দোকান করি।'

কেশববাবু ভাবলেন সত্যিই তো! কেন সে আমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে চিরদিন? তার স্ত্রী আছে, দেশে তার বোন আছে বোনাই আছে, তাকে তার নিজের সংসার চালাতে হবে টাকা রোজগার করবার জন্যে কলকাতায় এসেছিল দর্জির কাজ শিখতে, কাজ শেখা তার শেষ হয়েছে, এখন সে আমার সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে কেন?

কেশববাবু বললেন, 'দেখলে? কেমন স্বার্থপরের মত কথা বলছি আমি? আলাদা দোকান তুমি নিশ্চয়ই করবে।'

এই বলে তিনি পরামর্শ করতে বললেন।—'আমার ওই আর একখানা ঘরে বাইরের দিকে দরজা ফুটিয়ে দাও। তারপর আমারই একটা মেশিন নিয়ে গিয়ে ওইখানে একটা দোকান কর।'

অশোক চুপ করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

কেশববাবু ভাবলেন—পরামর্শটা তার পছন্দ হলো না বোধহয়। কাজেই তিনি আর কোনও কথা বললেন না।

অশোক যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তিনি তাকে বাধা দেবেন না।

অশোক কিন্তু ভাবছিল অন্য কথা। নিজের কথা সে ভাবেনি। ভাবছিল—ধীরা মীরার বিয়ের কথা। ভাবতে গিয়ে হাসি পাচ্ছিল তার। তার সঙ্গে ধীরার বিয়ে দিয়ে কেশববাবু নিশ্চিন্ত হবেন ভেবেছিলেন। একটিবারও তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করেননি—সে বিবাহিত কিনা।

কেশববাবু ভুল করেছিলেন।

ভুল যদি তিনি না করতেন তাহ'লে তার দর্জির কাজ শেখা হতো না।

কেশববাবুর ভুল আজ ভেঙেছে। কিন্তু বিপদেও পড়েছেন একটুখানি। মেয়েদের বিয়ে দিতে হবে। তার জন্যে টাকার দরকার। সে টাকার সংস্থান তাঁর নেই।

শুধু সেই জন্যই বোধকরি আর-একটা দর্জির দোকান করবার ইচ্ছা অশোকের মনে জেগেছে। কিন্তু ছোট দোকান নয়। বেশ বড় দোকান।

চৌরঙ্গী অঞ্চলে বেশ বড় একটি দর্জির দোকানের ছবি ক্রমাগত তার মনে কেন যে ভেসে উঠছে—অশোক বুঝতে পারছে না।

সম্বল নেই এক কানাকড়ির, অথচ স্বপ্ন দেখছে একটা বিরাট কারবারের।

কাটা কাপড় কিনতে গিয়েছিল অশোক। বড়বাজারের যে-দোকান থেকে তাদের কাপড় কেনা হয় তারই পাশাপাশি একটা দোকানে শুনেছিল সস্তায় লংক্লথ বিক্রি হচ্ছে। তাই যাচ্ছিল সেইখানেই। যেতে যেতে হঠাৎ সে থমকে দাঁড়ালো। দাঁড়াবার কারণ—আর বিশেষ-কিছু নয়—লটারির টিকিট।

দোকানের রকে বসে নানারঙের ছক খুলে একটি লোক লটারির টিকিট বিক্রি করছিল। অশোক তার পকেটে হাত দিলে। এখানে আসবার দিনেই একখানি লটারির টিকিট সে কিনেছিল। সে টিকিটখানি তার এখনও আছে। ভুলেই গিয়েছিল তার কথা। হঠাৎ মনে পড়লো।

খামের ভেতর থেকে বের করলে টিকিটখানি। লটারির টিকিট সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই সে জানে না।

—'দেখুন তো ভাই এই টিকিটের কি ব্যাপার?'

টিকিটখানি হাতে নিয়ে লোকটি একবার অশোকের মুখের দিকে তাকালে। ভাবলে, পাগল-টাগল হবে হয়ত।

—'কবে কিনেছেন টিকিটখানি?'

অশোক বললে, 'তা সে অনেক দিন হলো।'

—'ফেলে দিন এটা। এ-টিকিটের সব-কিছু চুকেবুকে গেছে।' এই বলে টিকিটখানি অশোকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে সে বললে, 'নতুন টিকিট একখানি আমার কাছ থেকে কিনুন। এই মাসেই ড্রইং। ফার্স্ট প্রাইজ্ পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা। আরও অনেক রকমের টিকিট আছে আমার কাছে। চার আনার টিকিট। এক টাকার টিকিট—'

অশোক জিজ্ঞাসা করলে, 'এই মাসে ওই যে কি বললেন তার দাম কত?'

—'দু' টাকা।'

দুটি টাকা অশোক তার হাতে দিয়ে বললে, 'দিন একখানি।'

—'নাম বলুন। নাম, ঠিকানা, নম্-ডি-প্লুম।'

'নম্-ডি-প্লুম' কথাটা অশোক আগেও শুনেছিল। নাম ঠিকানা বলে অশোক কি যেন ভাবতে লাগলো।

—'বলুন। ভাবছেন কি?'

অশোক বললে, 'লিখুন—বীরা-বীরা।'

লোকটি তাই লিখে একটি রসিদ দিলে অশোকের হাতে। বললে, 'টিকিটখানি আসছে হপ্তায় একদিন এসে নিয়ে যাবেন আমার কাছ থেকে।'

রসিদখানি নিয়ে দোকান থেকে কাটাকাপড় কিনে অশোক চলে গিয়েছিল।

ভুলেই গিয়েছিল টিকিট আনবার কথা।

দু'তিন সপ্তাহ পরে আবার একদিন দরকার হলো কাপড়ের একটি থান কেনবার। অশোককে যেতে হলো বড়বাজারের দোকানে।

টিকিটওলাকে দেখে অশোকের মনে পড়লো টিকিট এখনও নেওয়া হয়নি। আবার সে বন্ধুকে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিলে।

টিকিটওলা বললে, 'এতদিন পরে এলেন? টিকিট আপনার কবে এসে গেছে। একটা পয়সা দিয়ে গেলে টিকিট আমি ডাকেও পাঠিয়ে দিতে পারতাম।'

অশোক তখনও পকেট হাতড়াচ্ছে। পুরনো কাগজপত্র অনেকগুলি বের করে দেখলে—রসিদটি নেই। অন্য কাগজের সঙ্গে ফেলে এসেছে বাড়িতে।

অশোক বললে, 'রসিদটে আনতে ভুলে গেছি। থাক্, আপনি রাখুন। আর-একদিন এসে নিয়ে যাব।'

লোকটি বললে, 'টিকিট নিয়ে যান। আমি চিনতে পেরেছি আপনাকে। 'নম-ডি-প্লুম' বীরা-নীরা তো?'

অশোক বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

টিকিটের কথা মনেও ছিল না অশোকের। দোকানে কাজের চাপ পড়েছে। তার ওপর ছাত্রদের কাট-ছাঁট শেখাবার কাজ আছে।

কেশববাবু সেদিন গিয়েছিলেন চন্দননগরে। তাঁর এক বন্ধু একটি পাত্রের সন্ধান দিয়েছিল। সেই ছেলেটিকে দেখতে গিয়েছেন তিনি।

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। তিনটে সেলাইএর কল চলছে। শতরঞ্জি-পাতা মেঝের ওপর বসে বসে দুজন ছাত্রকে অশোক ব্লাউসের কাট শেখাচ্ছে। এমন সময় একজন অবাঙালী ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

—নমোস্কার!

—'নমস্কার!' অশোক হাত দুটি জোড় করে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে বললে, 'বসুন।'

ভদ্রলোক চেয়ারে বসলেন না। জুতো খুলে অশোকের পাশেই বসে পড়লেন। বললেন, 'এখানে—' বলেই যে ছাত্রদুটিকে অশোক শেখাচ্ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'খুব প্রাইভেট কথা।

ছেলেদুটি বুঝতে পেরে নিজেরাই উঠে সরে গেল সেখান থেকে।

আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন, 'আমার নাম আছে—মনসুখলাল। আমি অনেক রোজ বাঙাল দেশে আছি, কাজেই বাঙাল কোথা বেশ ভাল বোলতে পারি। আমার বহুৎ বাঙাল বন্ধুতি আছে।'

অশোক জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি কি জন্যে এসেছেন এখানে? কি প্রাইভেট কথা আছে বলবেন—'

মনসুখলাল বললেন, 'দেখেন, চিরা-নিরা 'নম-ডি-প্লুম' দিয়ে একটি লটারিখেলুতা টিকস্ এই ঠিকানাতে কোই কিনেলে আমি খবর পেলাম। আমি সেই আদমির সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

অশোক বললে, 'আমি কিনেছি। কি কথা বলতে চান বলুন।'

—'আপনি কিনেলেন? নমোস্কার।'

আর-একবার নমস্কার করলেন মনসুখলাল। বললেন, 'ইয়ে দুনিয়ামে হরকিসিমকা আদমি হরেক কিসিমকা বেওসা করে, হামিও একটো বেওসা করি—যা শুনলে আপনি হসবেন। আমাকে পাগল সমঝাবেন।'

'কি ব্যবসা বলুন।'

'আমি সেকেণ্ড হ্যাণ্ড লটারিথেলকা টিকিস্ কিনি।'

—'লটারির টিকিট তো, আমি বিক্রি করি না। আমি একবার বৌবাজারে থেকে একটি লটারির টিকিট কিনেছিলাম, কিছু পাইনি। আবার আর-একটি কিনেছি বড় বাজার থেকে।'

মনসুখলাল বললে, 'ইসারেও বহুত কিসমু পাবেন না।'

অশোক বললে, 'নাও দেতে পারি।'

—'বাস্, উ-কাগজটির কি দাম আছে? কাগজটি আপনি ফেলে দেবেন। বলুন সাব্ বাৎ কি না!'

—'হাঁ। ফেলেই দেবো।'

মনসুখলাল হাত নেড়ে নেড়ে বললেন, 'না না ফেলবেন না। ফেলবেন না। দুটি টাকা খরচ করে কিনেছেন, আমি আপনাকে বিশ টাকা দিয়ে দিচ্ছি, আপনি উ টিকসখানি আমাকে দিয়ে দেন।'

অশোক একটু অবাক্ হয়ে গেল। বললে, 'কুড়ি টাকা দিয়ে আপনি সেইটে কিনে নেবেন? কি লাভ আপনার?'

মনসুখলাল হাসলেন। দাঁতের ফাঁকে মৃদু একটুখানি হাসি।—'আপনি আমাকে বেয়াকুফ্ বোলবেন, পাগল বোলবেন—হামি জানি। লেকিন্ ওহি আমার বেওসা আছে। বাঙ্গাল-কথায় ভাগ্-বিনিময় বোলে।"

অশোকও হাসলে। বললে, 'ভাগ্য বিনিময়ের ব্যবসা?'

মনসুখলাল বললে, 'হাঁ জি, ভাগ্ বিনিময়কা ব্যাওসা। দিয়ে দিন টিকস্টা। দিয়ে আহুন। এই লেন টাকা।'

অশোক তাঁকে কি বলবে তাই ভাবছিল, এমন সময় চন্দননগর থেকে এলেন কেশববাবু। ঘরে ঢুকেই বললেন, 'নাঃ হলো না। ছেলেটি ভাল নয়। বীরার সঙ্গে মানাবে না।'

মনসুখলালের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কি চান?'

অশোক বললে, 'উনি ভাগ্য বিনিময়ের ব্যবসা করতে এসেছেন। আমি সেদিন একখানা লটারির টিকিট কিনেছি দু'টাকা দিয়ে। উনি কোত্থেকে খবর পেয়ে এসেছেন সেই টিকিটখানা কুড়ি টাকা দিয়ে কিনতে। উনি বলছেন, এই রকম টিকিট কেনাই ওঁর ব্যবসা।'

কেশববাবু বললেন, 'রেজার্সের টিকিট?'

মনসুখলাল বললেন, 'হাঁ বাবুজি।'

কেশববাবু মনসুখলালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঘোড়ায় নাম উঠেছে দেখেছো বুঝি? অমনি তুমি ছুটে এসেছ বাবা ভাগ্য বিনিময় করতে?'

মনসুখলাল বললেন, 'ও কি ঘোড়া আছে বাবু? গাধা, গাধা। শালা এক পা আগে বাড়ে তো দো পা পিছে হটে। নন্ ষ্টার্টার।—জানে দেও বাবুজি, মেরা তকদিরসে যো কুছ্ আয়েগা ওহি সই। একশো রুপেয়া দিচ্ছি। টিকসঠো দিয়ে দেন।'

কেশববাবু বললেন, 'ওঠো মেরি সাহেব, তুমি ওঠো এখান থেকে। আমার কাজ আছে।'

মনসুখলাল বুঝতে পেরেছিলেন, টিকিট এরা দেবে না। তবু একবার শেষ চেষ্টা করতে ছাড়লেন না তিনি। উঠতে উঠতেও বললেন, 'দুশ' টাকা দিতে পারি, দেবেন তো দেন।'

কেশববাবু বললেন, 'কেন মিছে করছো বাবা, যাও তুমি, যাও।'

মনসুখলাল বিদায় হলেন। তাঁর ভাগ্য বিনিময় করা আর হলো না।

কেশববাবু বললেন, 'তুমি দোকান করবো করবো বলছিলে অশোক, আমি ভাবছিলাম—তুমি টাকা কোথায় পাবে। এই তো বাবা তোমার টাকা এসে গেল।'

অশোক অবাক হয়ে তাকালো কেশববাবুর দিকে। বললে, 'এসে গেল আপনি জানলেন কেমন করে?'

কেশববাবু বললেন, 'এককালে ওই সব টিকিট কিনেছি। কাজেই ও ভাগ্যের খেলা আমি জানি। তোমার টিকিটের ওপর ঘোড়ার নাম উঠেছে। ওই যে এসেছিলেন মনসুখলাল ভাগ্য বিনিময় করতে, উনি সে খবরটি জেনেই এসেছেন টিকিটখানি তোমার কাছ থেকে কিনে নেবার জন্যে।'

অশোক একবার চোখ বুজে আত্মস্থ হয়ে কি যেন দেখে নিলে। তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'কত টাকা পাব?'

কেশববাবু বললেন, 'তা এখন বলা যায় না। তবে আর বেশি দেরি হবে না। দিন দুয়ের জানতে পারবে।'

দেরি অবশ্য বেশি হলো না।

দু' একশো টাকা নয়। অশোক পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পেলে।

একেবারে নিঃসম্বল নিরাশ্রয় অশোক জীবিকা উপার্জনের জন্য এসেছিল কলকাতায়। কিন্তু কে ভাবে এই টাকা দিলে, কেনই-বা সে লটারির টিকিট কিনলে—এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সে যেন কেমন একরকম হয়ে গেল।

কোথাও যাদের কিছু পাবার আশা নেই, ভাগ্যবিড়ম্বিত যারা বেশি টাকা উপার্জন করতে পারে না কিংবা অনায়াসলভ্য অর্থের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণে এমনি করেই মানুষ তার ভাগ্যটাকে পরীক্ষা করতে চায়। লটারির টিকিট অনেকেই কেনে, কেউ-বা কিছু পায়, কেউ-বা কিছুই পায় না—এটা এমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়।

নীরা বলে, 'বেশ মানুষ যা-হোক! হট্ করে এতগুলো টাকা পেয়ে গেলে অশোকদা, একটু হাসো, একটু খুশি হও। তা না, মুখগোমরা করে চল্লিশ ঘণ্টা কি যেন ভাবছো! কী ভাবছো কি?'

অশোক বলে, 'কিছু না।'

নীরা বলে, 'কত লোক শুনেছি এমনি টাকা পেয়ে পাগল হয়ে যায়, বেই বেই করে নাচে। কেউ-বা এক্ষুণি খরচ করে। তা তুমি তো দেখছি কিছুই করছো না!'

—'কি করবো বল।'

—'কি করবে ঠিক করতে পারছো না? আচ্ছা দাঁড়াও, আমি বলে দিচ্ছি কি করবে। আমাদের

দু'বোনকে নিয়ে যাবে নিউ মার্কেটে। আমি যা বলবো তাই কিনে দেবে। তারপর সারা মিটিয়ে কেনাকাটা করে একটা রেষ্টুরেন্টে ঢুকে পেট ভরে খাব। খেয়েদেয়ে মোটরে চড়ে হৈ হৈ করতে করতে বাড়ি ফিরে আসবো।'

অশোক বলে, 'বেশ তাই চল।'

—'কথা দিচ্ছো?'

—'হাঁ, কথা দিচ্ছি।'

কিন্তু কথাটা আদায় করে নিয়ে নীরা নিজেই আবার অন্য কথা বলে। অশোক তৈরি হয়ে বলে, 'চল। তোমার দিদিকে কাপড়-চোপড় পরে নিতে বল।'

নীরা হো হো করে হেসে ওঠে।

পবিত্র নির্মল সে বড় সুন্দর হাসি

অশোক বলে, 'হাসছো যে?'

—'হাসবো না?' নীরা বললে, 'আমি যা বললাম তাই তুমি বিশ্বাস করলে? এইবার তোমার মাথাটা একটু-একটু খারাপ হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি।'

অশোক বললে, 'তুমি নিজেই তো বললে সেদিন—'

—'হাসি-রহস্য বোঝো না? তুমি কি কাঠ নাকি?'

অশোক বললে, 'না না হাসি-রহস্য নয়, চল নীরা। তোমাদের নিয়ে একটু আনন্দ করে আসবো—ক্ষতিটা কি?'

নীরা বললে, 'ক্ষতি যে কি তা তুমি বুঝবে না অশোকদা। তুমি হঠাৎ অনেকগুলো টাকা পেয়ে গেছ—পাড়ার সবাই সেকথা জানে। একে তো এমনিতেই তাদের চোখ টাটাচ্ছে, কত লোক কত কথা বলছে, তার ওপর আজ যদি আমরা দু'জনে তোমার সঙ্গে গিয়ে হৈ হৈ করে ঘুরে আসি, এ-পাড়ার বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে হবে।'

এই বলেই নীরা সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

কেশববাবু সেদিন বললেন, 'মফস্বলের দোকানটা কিনবে?'

অশোক জিজ্ঞাসা করলে, 'কোন্‌টা? ধর্মতলার দোকানটা না চৌরঙ্গীর পেছনে সেই ছোট্ট দোকানটা?'

—'না, ধরমতলার দোকান সে ছাড়বে না। ছোট দোকানটা বেচবে বলছে। দুটো দোকান সে একা সাম্‌লাতে পারছে না। পাঁচ হাজার টাকা দিলেই পাওয়া যায়। ভাল ভাল বাঁধা খদ্দের আছে।'

অশোক তক্ষুণি রাজী হয়ে গেল।

বাড়ীর কাছে একজন এটর্নী ছিলেন। তিনিই দলিল রেজেষ্ট্রি করে দিলেন। আরও কিছু টাকা খরচ করে ছোট দোকানটাকে অশোক বেশ বড় করে ফেললে। বাগবাজারের ইস্কুলটা তুলে দিয়ে একটামাত্র সেলাইএর কল সেখানে রেখে বাকি কলগুলো চৌরঙ্গীর দোকানে নিয়ে যাওয়া হলো।

তারপর কেশববাবুকে বললে, 'আপনি এইবার বড় দোকানে বসুন।'

—'আর তুমি?'

অশোক বললে, 'আমি আপনার বাড়ীর দোকানটা দেখবো আর অন্য কাজ করবো।'

—'কি কাজ?'

ভেঙে ছুটে কিছুই বললে না অশোক।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সেই এটর্নীর আপিস থেকে অশোক হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছে।

রাত্রে দোকান বন্ধ করে বাড়ী ফিরেছেন কেশববাবু। অশোকের সঙ্গে খেতে বসেছেন। কেশববাবু বললেন, 'তোমার চৌরঙ্গীর দোকানে কাজ খুব ভাল আসছে।'

অশোক বললে, 'লাভ একটু কম করে করবেন।'

—'না। লাভ আমি যা করবার ঠিকই করব। আর সে লাভের টাকা খুশী করে দিয়ে যাবে খদ্দেররা। আমার মনে হয়—দোকানের সমস্ত খরচ খরচা চালিয়ে তোমার টাকা আমি ছ' মাসে তুলে দিতে পারব।'

অশোক এইবার তার আসল কথাটা পেড়ে বললো। বললে, 'কাল সকালে একটু দেরি করে দোকান খুলবেন।'

—'কেন?'

অশোক বললে, 'আপনাকে আমি নিয়ে যাব এক জায়গায়।'

—'কোথায় বল না!'

—'বেশি দূরে নয়—এই শ্যামবাজারে।'

—'কি জন্যে নিয়ে যাবে বল। নইলে রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না।'

বলতে বাধ্য হলো অশোক। বললে, 'পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা বাড়ী কিনলাম।'

কেশববাবু বললেন, 'কেনবার আগে আমাকে একবার দেখালে না বাড়ীখানা? ঠকলে না তো?'

অশোক হেসে উঠলো। বললে, 'আমি ঠকবো কেন? সবই তো আমার জিত। লটারিতে পাওয়া টাকা—আমার যা আসবে তাই লাভ।'

কেশববাবু বললেন, 'বাস্, এইবার তাহ'লে তুমি বৌমাকে নিয়ে এসো এইখানে। নিয়ে এসে ওই বাড়ীতে গিয়ে ভাল করে সংসার পাতাও।'

অশোক চুপ করে রইলো।

—'চুপ করে রইলে কেন? লজ্জা কিসের? বীরা-মীরার বিয়ে আমি ঠিক দিয়ে দেবো দেখো। তোমার চৌরঙ্গীর দোকান থেকে আমি ছ'শ টাকা মাইনে নিচ্ছি। আমার ভাবনা তুমি ভেবো না।'

অশোক মৃদু একটু হেসে বললে, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

কেশববাবু বাড়ী দেখে খুব খুশী!

—'নাঃ, ঠকোনি। বেশ ভাল বাড়ী হয়েছে।' কেশববাবু শ্যামবাজার থেকেই চৌরঙ্গীর দোকানে চলে গেলেন।

বললেন, 'এইবার বীরা-মীরার মাকে বাড়ীখানা একবার দেখিয়ে যাও।'

মাথা ধরায়

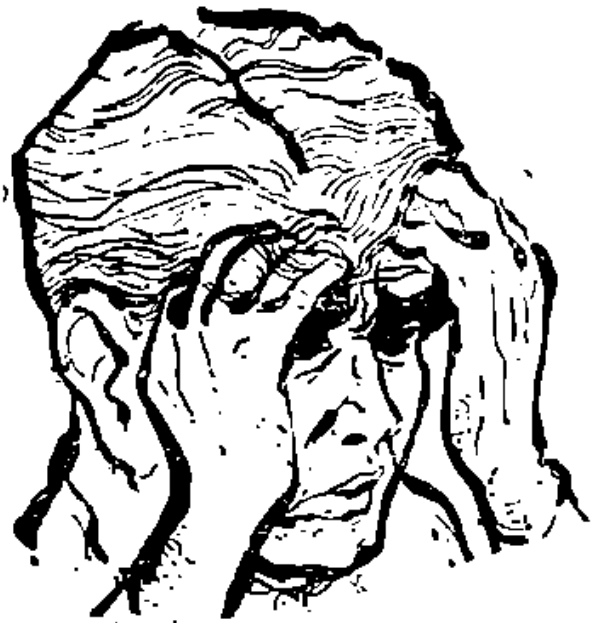

নিরাপদ
ও
নিশ্চিত

দ্রুত আরামদায়ক

এ্যালাসিড

মাথা ধরায়, ব্যথা ও বেদনায়, জ্বর-জ্বর ভাবে, ইনফ্লুয়েঞ্জায় এ্যালাসিডের উপর নির্ভর করতে পারেন

৬টি
কার্যকরী
উপাদানে প্রস্তুত

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

অশোক বললে, 'আপনি যান। আমি তাদের সঙ্গে করে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়ীখানা বেশ বড়। অনেকগুলো ঘর।

অশোক সেদিন বাড়ীতে এসেই বাবার মাকে বললে, 'আমি একটা কথা বলবো মা! কথাটা রাখবেন তো?'

মা বললেন, 'রাখবার মত কথা হলে কেন রাখব না বাবা?'

'আপনার ঋণ আমি কখনও পরিশোধ করতে পারব না।' অশোক বললে, 'আমি বলছি কি, আমার ভার তো এতদিন আপনারা নিয়েছেন, এইবার আমাকে আপনাদের ভার নিতে দিন। এই বাড়ীটা ছাড়া দিয়ে আপনারা চলুন আমার এই নতুন বাড়ীতে।'

এতদিন পরে মা তাঁর মনের কথা খুলে বললেন।

বললেন, 'প্রথম যেদিন তুমি এসে আমার কাছে, ভেবেছিলাম আমার ছেলে নেই, ভালই হলো একটি ছেলের মত ছেলে পেলাম।'

অশোক বললে, 'কেন? এখন কি আমাকে আপনার ছেলে বলে মনে হচ্ছে না?'

—'কেন হবে না বাবা, কিন্তু তুমি যে অনুরোধ করছো সে অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না। আমরা যেমন আছি তেমনি থাকি। তুমি বরং তোমার বৌকে নিয়ে এসে নতুন বাড়ীতে বাস কর। আমি তোমাদের সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসব।'

অশোক বললে, 'আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন বুঝতে পারছি।'

মা বললেন, 'না বাবা, রাগ আমি তোমার ওপর করিনি। রাগ করেছি আমার অদৃষ্টের ওপর। আমি ভেবেছিলাম তোমার বিয়ে হয়নি। বীরা-নীরার যেটাকে হোক্ একটাকে তোমার হাতে দিয়ে চিরদিনের মত তোমাকে নিজের করে রাখব। এইটিই ছিল আমার ইচ্ছে। কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন। আজ তুমি বড়লোক হয়েছ, তোমার স্ত্রী আছে, আজ যদি আমরা তোমার বাড়ীতে গিয়ে উঠি, ব্যাপারটা খুব খারাপ দেখাবে। তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা। তুমি যে যেতে বললে—এইটেই আমার পরম সৌভাগ্য।'

কোনও কথা না বলে অশোক চুপ করে রইলো।

• • • •

অশোক একখানি চিঠি লিখেছিল তার ভগ্নীপতি রমেশকে। লিখেছিল, তুমি যদি একটিবার কলকাতায় আসতে পার তো খুব ভাল হয়।

চিঠি পেয়েই রমেশ এলো। এসেই হকচকিয়ে গেল অশোকের অবস্থা দেখে। বললে, 'এ-সব তুই করলি কেমন করে রে?'

অশোক বললে, 'ভগবান দিয়েছেন।'

রমেশ বললে, 'তাহ'লে এবার চল্ একবার তোর শ্বশুরকে আর তোর শালাদের দেখিয়ে দে। ওরা তোকে অপমান করেছে, তার প্রতিশোধ নিতে হবে।'

অশোক বললে, 'না। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে আমার নেই।'

রমেশ একটু অবাক হয়ে গিয়ে বললে, 'সে কি রে? এই তো প্রতিশোধ নেবার সময়!'

—'কেন?'

রমেশ বললে, 'তুই তো জানিস না, শোন্ তবে।'

এই বলে রমেশ যে-সব কথা বললে, সেও আবার এক অদ্ভুত কাহিনী। ভবতোষের ছেলেরা—মানে অশোকের শালারা বাপের টাকা দেখেছিল। কাজেই লেখাপড়া কেউ শেখেনি। সবাই হয়েছিল এক-একটি বাঁদর। মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করতো না, অহঙ্কারে পা পড়তো না মাটিতে। ভবতোষের মেজ ছেলে অমল—যে ছেঁড়াটা ছড়ি কেটে অশোককে কুকুর বলে, অপমান করেছিল শুধু তারই জন্যে ভবতোষ আবার তেমনি আগেকার মত সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে। মোটর গাড়ী বিক্রি করে ফেলেছে। পুজো বন্ধ হয়েছে। এমন-কি অতবড় বাড়ীটা আবার তেমনি ভেঙে ভেঙে পড়ছে—সারাবার পয়সা পর্যন্ত নেই।

অশোক বললে, 'বিশ্বাস করতে পারছি না। অত পয়সা এই ক'বছরে শেষ হয়ে গেল? এও কি বিশ্বাস করতে হবে?'

রমেশ বললে, 'হবে না? এমনিই তো হয় রে দুনিয়ায়। আজ যে বড়লোক কাল সে গরীব, আবার আজ যে গরীব কাল সে বড়লোক। নিজের কথাটাই একবার ভেবে ছাখ্ না। তুই যে কলকাতা শহরে বাড়ী কিনবি, ওই রকম একটা দোকান করবি—আমিই কি বিশ্বাস করেছিলাম নাকি? তোর শ্বশুরের কেন এমন হলো শুনবি?'

—'বল, শুনি।'

রমেশ বললে, 'তোর মেজ শালা অমলের প্রাণের বন্ধু ছিল রতন আকরা। রতনের বোনটাকে দেখেছিস তো—কুসুমকে?'

অশোক বললে, 'কি জানি—দেখেছি হয়ত' মনে নেই।'

—'মনে নেই কি রে? কুসুমের মতন সুন্দরী মেয়ে তোদের গাঁয়ে আছে নাকি? একবার যে কুসুমকে দেখেছে সে কি আর জীবনে তাকে ভুলতে পেরেছে?'

অশোকের অত সময় নেই শোনবার। বললে, 'থাক্ আর কুসুমের কথা শুনতে চাই না। অমলের কি হলো তাই বল তাড়াতাড়ি।'

'আরে ওই কুসুমের জন্যেই তো সব গেল। সেই কুসুমের বিয়ে হয়েছিল আমাদের পাশের গাঁয়ে—মোহনপুরে। সে এসেছিল কুসুমকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে। রতন আকরা—মানে কুসুমের দাদা বললে, ও এখন যেতে পারবে না। এই নিয়ে দু'চার কথা হতে হতে জামাই-ছোঁড়াটা হঠাৎ রেগে গিয়ে বলে উঠলো, 'আমার বিয়ে-করা বৌ—আমি জোর করে নিয়ে যাব।' তোর শালা অমল বলেছিল রতনের কাছে।' অমল বললে, 'তুই নিয়ে যাও তো! দেখি কেমন বাহাদুর!'

জামাই বললে, 'তুমি কে হে?'

রাগ হয়ে গেল অমলের। তক্ষুণি লাফিয়ে উঠে পায়ের চটি জুতো খুলে মারলে জামাইএর মাথায় এক জুতোর বাড়ি!

জামাই সহ্য করবে কেন? সেও দিলে অমলকে ঘা-কতক লাগিয়ে।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে—সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে। একটি কথাও বললে না কেউ। না বললে রতন আকরা। না বললে তার বোন—কুসুম।

সেইদিনই সন্ধ্যেবেলা জামাই বাড়ী চলে গেল। যাবার আগে রতনকে আর তার বৌকে এই বলে শাসিয়ে গেল যে, এর শোধ যদি সে না নিতে পারে তো সে বাপের ব্যাটাই নয়।

পরের দিন সকাল না হতেই গাঁয়ের মধ্যে এক হুলুস্থুল কাণ্ড! খবর রটে গেল—মোহনপুর যাবার রাস্তার ধারে যে খালটা আছে সেই খালের ধারে রতন স্যাকরার তন্নীপত্তি মরে পড়ে আছে। হৈ হৈ করে লোকজন ছুটে গেল দেখবার জন্যে। গিয়ে দেখে খবর পেয়ে পুলিশ এসেছে। লোকে লোকারণ্য। রতনের তন্নীপত্তি কিন্তু তখনও মরেনি। কারা যেন মেরে তার হাত পা ভেঙে দিয়ে আধমরা করে ফেলে রেখে চলে গেছে। পুলিশের কাছে সে নাকি বলেছে—এ-গাঁয়ের ভবতোষবাবুর ছেলে অমল দু'জন লোক সঙ্গে নিয়ে এসে তার এই হাল করে দিয়ে গেছে।

পুলিশ এসে অমলকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

তারপর চললো মামলা।

অমলের সখী দুজন ধরা পড়লো। একজন আমাদের গাঁয়ের নাক্ষ গয়লা আর-একজন বিশু বাগ্‌দি।

বিশু বাগ্‌দি জেরার মুখে দিলে সব-কিছু ফাঁস করে।

অমল তাকে চেয়েছিল খুন করতে। এবং লোকটা মরিটরি ভেবে খালের ধারে তাকে তারা ফেলে রেখে এসেছিল।

এই মামলা সামলাতে গিয়েই ভবতোষের আজ এই দুরবস্থা।

সামলে অবশ্য সে নিলে। অমল তিন মাস পরে বেরিয়ে এলো জেল থেকে। রতন স্যাকরার তন্নীপত্তিও বেরিয়ে এলো হাসপাতাল থেকে। দু' বগলে দুটো ক্রাচ্। ডান পাটা হাঁটু থেকে কাটা।

বিশু বাগদি আর নাক্ষ গয়লা কিন্তু জেলে পচ্‌তে লাগলো। তাদের হলো এক বছর করে দু' বছরের মেয়াদ।

কুসুম আর তার খোঁড়া স্বামীর ঘর করতে গেল না। অমলের সঙ্গে দিব্যি চলছে তার চলাচলি।

সব-কিছু শুনে অশোক বললে 'চলুক্‌গে। এখন তোমাকে আমি যে-জন্যে ডেকেছি শোনো।'

রমেশ বললে, 'বল্ শুনছি।'

অশোক বললে, 'আমার গ্রামের বাড়ীতে তো তুমি বাস করছ। আমি যদি সেখানে যাই তো থাকবো কোথায়?'

রমেশ বললে, 'তোর বেশ কথা যাহোক্। আমার ঘর-দোর নেই, তাই তোর বাড়ীতেই রয়েছি। চাকরিবাকরি করে কোনোরকমে দিন চালাচ্ছি। তাই বলে তুই গেলে থাকবার জায়গা পাবি না—সে আবার কিরকম কথা! তোর খামার বাড়ীটা তো খালি পড়ে আছে, ওইখানে একটা কুঁড়ে ঘর তৈরি করে নিয়ে আমরা সরে যাব। তুই তোর নিজের বাড়ীতে গিয়ে থাকবি।'

অশোক বললে, 'আমি একা হলে তাই হয়ত থাকতাম, কিন্তু আমি গেলে তো আমার সেই খোঁড়া বৌ আসবে, তার ওপর কেশবরাবুর দুই মেয়ে—ওই যে দেখলে বীরা আর নীরা—ওরাও আমার সঙ্গে যাবে বলছে—গ্রাম দেখতে।'

রমেশ বললে, 'তুই চল্ তো একবার সেখানে। সবাই এক সঙ্গে আনন্দ করে থাকা যাবে।'

সেই ব্যবস্থাই হচ্ছিল। কেশব বললে, 'আমি একটা কথা বলবো?'

অশোক বললে, 'বলুন।'

—'এতদিন যখন দেখে যাওনি, তখন আর কিছুদিন পরেই যাবে। ভগবানের দয়ায় এখন আর তোমার অভাব কিছু নেই। রমেশবাবুকে বরং কিছু টাকা দাও। উনি একখানা বাড়ী তৈরী করুন গিয়ে। তুমি গিয়ে গৃহপ্রবেশ করবে। যে-শ্বশুর তোমাকে অপমান করেছিলেন তাঁকে দেখানোও হবে—তোমার গ্রামে যাওয়াও হবে। কেমন? ভাল কথা বলিনি?'

রমেশ বললে, 'খুব ভাল কথা। কিন্তু অশোকের তো এখন যা দেখছি গ্রামে বসে থাকলে চলবে না। এতে কলকাতায় থাকতে হবে।'

কেশব বললে, 'সেইজন্যে তো বাড়ীও কিনেছে এখানে। গ্রামের বাড়ী নায়ব বোন-ভগ্নীপতিকে দান করেই দিয়ে আসবে।'

এতখানি সৌভাগ্য রমেশের হবে তা সে ভাবেনি। অশোক কি বলে শোনবার জন্য তার মুখের দিকে সে তাকিয়ে রইলো।

অশোক বললে, 'পারবে তৈরি করতে? বাড়ীর পাশে অনেকখানা জায়গা পড়ে আছে কিন্তু!'

—'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

কেশব বললে, 'চেষ্টা কি বলছেন মশাই, একখানা বাড়ী তৈরি করাতে পারবেন না? বসুন টাকা নিয়ে গিয়ে গাঁট্ হয়ে বসবেন। দেখবেন—চট্ চট্ করে বাড়ী উঠে যাবে।'

রমেশ বললে, 'বাপ-জন্মে বাড়ী কখনও করেছি, না বাড়ী তৈরির কথা ভেবেছি?'

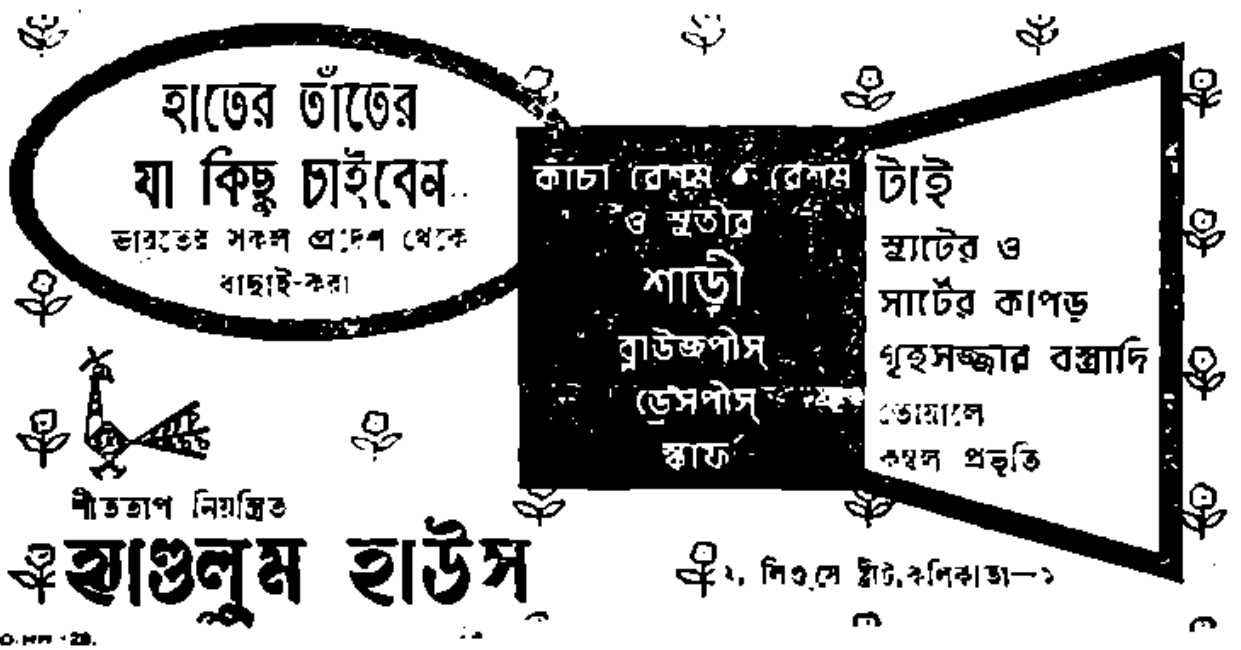

একখানা বাড়ী তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে তার হিসেব করে দিলে কেশব চক্রবর্তী। মোটামুটি একখানা দালানবাড়ী তৈরি করতে হাজার-দশেক টাকা লাগবে। তবে ইঁট যদি গ্রামে তৈরি করে নিতে পারতেন তাহলে আরও কমে হতো।

রমেশ বললে, 'আজ্ঞে না, তার হাঙ্গামা অনেক, আর তার জন্যে হাঁ করে বসে থাকতে হবে অনেকদিন।'

অশোক বললে, 'দাদাও। নিয়ে যাও তুমি দশ হাজার টাকা।'

যেই বলা সেই কাজ!

ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে অশোক দিলে তার ভগ্নিপতি রমেশের হাতে। রমেশ তাই নিয়ে দেশে চলে গেল।

যাবার সময় বলে গেল, 'দেখিস্ বাপু এতগুলো টাকা একসঙ্গে আমি এ-জন্মে দেখিনি। শোধ সামলাতে পারবো তো? কিছু যদি খেয়ে ফেলি তো বলিস্‌নে যেন চুরি করেছি।'

অশোক বললে, 'চুরি করবার মত মানুষ তুমি নও আমি জানি।'

'হাই জানিস্। ভেতরের মানুষটাকে বাইরের থেকে চেনা যায় না।'

৩

পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ সাধারণ। নিতান্ত সামান্য চেষ্টায় অসামান্য কিছু যখন পেয়ে যায়, তখন তার আনন্দের সীমা থাকে না। ভাবে বুঝি সে নিজে উপার্জন করলে।

আবার সে ঐশ্বর্য্য চলে যখন যায়, তখন মাথা ঠুকতে থাকে কেউ কেউ বা পাগলের মত হয়ে যায়।

আমাদের ভবতোষ গাঙ্গুলীর অবস্থাও হয়েছে ঠিক তেমনি।

চারটে ছেলে—চারটেই অকর্মণ্য—অপদার্থ। বড় বিমল। বিয়ে করেছে। বৌএর সঙ্গে বনে না। দিবারাত্রি খিটিমিটি লেগেই আছে। চাকরির চেষ্টায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায় আর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা মারে।

মেজ অমল তো বাড়ীতে বাস করে না। জেল খেটে ফিরে এসে অবধি রতন আকরার বাড়ীতেই দিন কাটায়। বাড়ীতে সুরেশ শুধু চুপিচুপি খেতে আসে।

তার পরের দুটো নেহাৎ ছোট নয়। একটার বয়স ষোলো আর একটার প্রায় কুড়ি। স্কুল-কলেজের ধার ধারে না কেউ। দু'জনেই চাষের কাজে লেগেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, 'গ্রো মোর ফুড্' করছি।'

ভবতোষ হয়েছেন ঠিক ক্যাপা কুকুরের মত। বললে, 'ওটার মাথা করছে। ওরাই আমার শত্রু। দিনে আমার মুখ পুড়িয়ে। মানুষের বাচ্চা বলে মনেই হয় না।'

এমন দিনে একদিন দেখেন তাঁর বাড়ীর দরজা দিয়ে লরি বোঝাই ইঁট যাচ্ছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার ইঁট রে?'

লরিওলা বললে, 'রমেশবাবুর।'

—'এত ইঁট রমেশ কি করবে?'

নরিওলা জবাব দিতে পারলে না।

নিজেই বেড়াতে বেড়াতে গেলেন গ্রামের ভেতর। সন্ধ্যে তখন প্রায় হয়ে এসেছে। গিয়ে দেখেন, অশোকের বাবার বাড়ীতে এসাহি কাণ্ড! অনেকখানা জায়গা জুড়ে ভিত্ খোঁড়া হয়েছে আর সেই ভিত থেকে গাথনি উঠছে মস্ত বড় একখানা বাড়ীর।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কি পাকা বাড়ী করছ নাকি?'

রমেশ জিব কেটে বললে, 'কী যে বলেন আপনি! আমি একটা কুঁড়ে ঘর তুলতে পারি না, পাকি পাকার বাড়ীতে। পাকা বাড়ী করবার ক্ষমতা আমার আছে?'

—'তাহ'লে কার বাড়ী হচ্ছে এটা?'

রমেশ বোধকরি একটু রসিকতা করেই বলেছিল, 'বলুন তো কার?"

রেগে গেলেন ভবতোষবাবু।—'আমার সঙ্গে রসিকতা হচ্ছে?'

রমেশ আবার জিব কাটলে।—'আজ্ঞে না। আপনার সঙ্গে রসিকতা করতে আমি পারি কখনও? আপনার জামাইএর বাড়ী।'

চোখদুটো বড়-বড় হয়ে গেল ভবতোষ গাঙ্গুলীর।

—'মানে অশোকের বাড়ী হচ্ছে? এই এত বড় দালানবাড়ী অশোক করছে? চুরি ডাকাতি করছে নাকি কোথাও?'

রমেশ বললে, 'অশোক চুরি ডাকাতি করতে পারে না।'

—'খুব পারে, খুব পারে। হুবেলা পেট ভরে খেতে পেতো না। বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিলাম। পুজোর সময় সামান্য একটা কথা বলেছিলাম তো তেজ করে (কাউকে কিছু না বলে) বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে গেল। ও হতভাগা চুরি চামারি করবে না তো কি করবে?'

রমেশের এবার বুঝি রাগ হলো। বললে, 'ছি ছি, অশোকের নামে এরকম কথা বলবেন না আপনি। অশোক কলকাতায় খুব বড়লোক হয়েছে তা জানেন? এখন তার অনেক টাকা।'

—'ঝাড়ু মারো অমন টাকার মুখে! এই যে আমার এত বড় বিপদ গেল নিমকহারাম হারামজাদা আমার একটা খবর নিয়েছে? একটা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছে? বৌটাকে তো ফেলে দিয়ে গিয়েছে আমার ঘাড়ে।'

রমেশ বললে, 'আপনার বিপদের কথা সে কিছু জানতো না। শুনলে আমার কাছে।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'খুব কলাও করে বললে তো? অমল জেল খেটে এলো—সে খবরটি পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছ নিশ্চয়ই।'

—'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা দিয়েছি বই-কি। আর এই যে আপনি ওকে চোর-ডাকাত বলছেন এটাও লিখে জানিয়ে দেবো।'

'তোমাকে জানাতে হবে না। আমি নিজেই জানাবো। তুমি তার ঠিকানাটা আমাকে দাও।'

কুলি মজুরদের হিসেব লিখবার খাতাটা ছিল রমেশের হাতে। তাইতে চর চর করে অশোকের ঠিকানাটা লিখে কাগজটা ছিঁড়ে ভবতোষবাবুর হাতে দিয়ে রমেশ বললে, 'ভাল কথা বলছি আপনাকে—ও-সব কথা লিখবেন না যেন।'

ভবতোষবাবু লাফিয়ে উঠলেন।—'তুমি আমাকে উপদেশ দিচ্ছ?'

'আজ্ঞে না, আপনাকে উপদেশ দেবার ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আর আপনার ছেলে প্রমথ দু'জনে মিলে অপমান করে অশোককে বেশছাড়া করেছেন। যদি-বা সে গ্রামে আসছিল ওই সব কথা শিখলে আর আসবে না।'

ভবতোষবাবুর রাগ তখনও পড়েনি। বললেন, 'না আসুক। আসতে হবে না তাকে। আমি জানি সে আসবে আমাকে আরও ভাল করে অপমান করবার জন্যে। তুমি সে নিমক-হারামটাকে জানিয়ে দিও—এখানে যদি সে আসে তো সে যেন আমার বাড়ীর চৌকাঠে না দাঁড়ায়।'

রাগের মাথায় যা মুখে এলো তাই বলে দিয়ে বাড়ী চলে এলেন ভবতোষ মজুমদার।

এসেই চিঠি লিখলেন অশোককে।

শ্বশুরের চিঠি পাবার আগেই অশোক পেলে রমেশের চিঠি।

—'বাড়ীর কাজ বেশ ভালই চলিতেছে। তোমার বাড়ী দেখিয়া সব চেয়ে বেশি রাগ করিয়াছেন তোমার শ্বশুর। তাঁহার ধারণা তুমি কোথাও চুরি ডাকাতি করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছ এবং সেই টাকার জোরে তোমার শ্বশুরের অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য পৃথক বাড়ী তৈরি করিতেছ। একে তো ভবতোষবাবুর মধ্যম পুত্র অমলবাবু রতন আবরার ভগিনী কুসুমকে লইয়া যে নষ্টামি বাধাইয়াছে, তাহাতেই তাঁহার মুখ পুড়িয়া গিয়াছে; তাহার উপর তাঁহার ধারণা হইয়াছে—তুমি আলাদা বাড়ী করিতেছ—তাঁহার মুখ দর্শন করিবে না বলিয়া। সেদিন তাই তিনি আমাকে বলিয়া গিয়াছেন—সে নিমকহারামটাকে বলিয়া দিও সে যেন আমার বাড়ীর চৌকাঠে না মাড়ায়।

যাই হোক্, এ-সব কথা শুনিয়া তুমি মাথা খারাপ করিও না।

তোমার শ্বশুরের পাগল হইতে আর দেরি নাই। ছেঁড়া একটা কম্বল গায়ে দিয়া তিনি আসিয়াছিলেন। শুনিতেছি তিনি নাকি অমনি ছেঁড়া কাপড়জামা পরিয়াই আজকাল ঘুরিয়া বেড়ান। যেখানে সেখানে যা-তা বলেন। বলেন—ছেলেগুলোকে যতদিন না বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিতে পারেন ততদিন তাঁহার শান্তি নাই।

তুমি যাহা বলিয়াছিলে সেই কথাই ঠিক কিনা জানি না। তাঁহার ছেলেরা বলে এটা নাকি ভবতোষবাবুর একটা চাল। লোককে তিনি জানাইতে চান যে অমলের ব্যাপারে তিনি একেবারে কম্বুর হইয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ এই বলিয়া ছেলেদের কিছুই তিনি দিবেন না।

যাই হোক্, পরের ভাবনা ভাবিয়া আমাদের লাভ নাই। তুমি মাথা ঠাণ্ডা করিয়া কাজ করিয়া যাও। ভগবান তোমাকে যাহা দিয়াছেন তাহার সদ্ব্যবহার কর।

তোমার বাড়ীর কাজ আমি ঠিক চালাইয়া যাইব। বাস করিবার মত হইলেই তোমাকে জানাইব।

আমরা ভালই আছি। তুমি এবং কেশববাবুর বাড়ীর সকলে কেমন আছ জানাইবে। ইতি।

রমেশ।

কেশবের বাসবাজারের বাড়ীখানা এখন আর সে বাড়ী বলে মনে হয় না। বাড়ীখানা আবার নতুন করে তৈরি করে দিয়েছে অশোক। নীচের একখানা ঘর হয়েছে বসবার ঘর। চারিদিকে বেবিল চেয়ার সোফাসেট আশা আলমারি, মোজেক্‌করা মেঝে, ডিস্‌টেম্‌পার দেয়াল, আলোয় আলোয় ঝল্‌মল্ করছে বাড়ীখানা।

নীরার মা কত নিষেধ করেছিলেন। বলেছিলেন, 'এ কী করছ বাবা তুমি? আমরা কেউ সেলাম না বলে তুমি তোমার নিজের বাড়ীটা রাগ করে দিলে ভাড়া দিয়ে। আবার এ-বাড়ীটা এমন করে সাজাচ্ছো কেন? তোমার এ ঋণ কি আমরা শোধ করতে পারব কোনোদিন?'

অশোক বলে, 'আমারও তো কিছু ঋণ আছে আপনাদের কাছে। সে ঋণটা আমাকে শোধ করতে দিন।'

—'তাই বলে এমনি করে? এখনও বীরা নীরার বিয়ে দিতে পারলুম না।'

অশোক হাসতে হাসতে বলে, 'সে দায় থেকেও আপনাকে আমি উদ্ধার করে দেবো।'

নীরার মা ভাবলেন, বীরাকে বিয়ে করবার ইচ্ছে বুঝি তার এখনও আছে। তাই তিনি চুপ করে গেলেন। কিন্তু চুপ করলে না নীরা।

নীরা অত্যন্ত ঠোঁট-কাটা মেয়ে। যখন-তখন যাকে-তাকে যা মুখে আসে তাই বলে বসে। কথাগুলো সে বোধহয় কোথাও লুকিয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। ফস্ করে বেরিয়ে এসে বলে বললো, 'কি আর বলবো মা, একেই বলে কপাল! আহা এমন জামাইটিও তোমার হাত-ছাড়া হয়ে গেল।'

নীরার মা বললেন, 'তা হলো বই-কি! কিন্তু তুই যদি মেয়ে হয়েছিস মা। মুখে কিছু আটকায় না তোর।'

নীরা বললে, 'না, আটকায় না। কেন আটকাবে? আমি তো দোষ-অপরাধ কিছু করি না যে ভয় করবো কাউকে! এই ছাখো না, পিওন তখন একখানা খামের চিঠি দিয়ে গেল। ওপরে দেখলাম—গোটা গোটা বাংলা অক্ষরে ঠিকানা লেখা। ভাবলাম বুঝি—অশোকদার বৌএর চিঠি। পেট-আঁচলে লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে ছাতে বসে জল দিয়ে দিয়ে খুললুম। ভাবলুম পড়ে আবার আঠা দিয়ে বন্ধ করে অশোকদার হাতে দিয়ে দেবো। কিন্তু খুলে পড়তে গিয়ে নিজের গালে নিজেই চড় মারলুম। কে জানতো বাবা যে অশোকদার শ্বশুর ইংরেজি লিখতে জানে না।—এই নাও।'

বলে সে তার আঁচলের তলা থেকে খামের চিঠিখানি বের করে অশোকের হাতে দিয়ে বললে, 'নাও, পড়। ছাখো তোমার শ্বশুর-মিনসে তোমাকে কেমন মিষ্টি-মিষ্টি ঝুড়ো মেরেছে।'

অশোক নিলে চিঠিখানা। মা সরে যাচ্ছিলেন সেখান থেকে। অশোক হাসতে হাসতে বললে, 'নীরার জন্যে ভাববেন না মা, নীরা খুব চালু মেয়ে হয়েছে। যে-বাড়ীতে যাবে—বাড়ীটাকে বেশ জমিয়ে রাখবে।'

—'থাক্ আগে।' বলেই মা চলে গেলেন।

নীরা কিন্তু গেল না। জিজ্ঞাসা করলে, 'চালু মেয়ে মানে কি অশোকদা?'

—'চালু মানে?' অশোক বললে, 'যে অচল নয়। সব অবস্থাকে যে মানিয়ে নেয়। সব সংসারকে আনন্দময় করে রাখে।'

নীরা বললে, 'আমি ভাবলুম তুমি আমাকে গালাগালি দিচ্ছ।'

—'গালাগালি আমি তোমাকে দিই কখনও ?'

—'দিলে খুশী হতুম।' বলেই নীরা ছুটে পালিয়ে গেল।

হাসতে হাসতেই ভবতোষ গাঙ্গুলীর চিঠিখানা খুলেছিল অশোক।

পড়বার পর মুখখানা হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল।

একবার পড়লে। দু'বার পড়লে।

রমেশ যা লিখেছিল ঠিক তাই।

'নিমকহারাম' 'অকৃতজ্ঞ'—কিছু লিখতে বাকি রাখেননি ভবতোষবাবু।

নির্মলার নামটাও একবার উল্লেখ করেননি চিঠির মধ্যে।

লিখেছেন, 'তোমার এই তেজ যেন শেষ পর্যন্ত থাকে। তুমি যেন আমার বাড়ীতে আর পা দিও না।'

রমেশকে আবার একখানি চিঠি লিখলে অশোক। লিখলে, শ্বশুর মশাইএর চিঠি পেলাম। তুমি যা লিখেছিলে সেই কথাই সত্যি। তিনি আমার ওপর রাগ করেছেন। রাগ করে আমাকে অনেক গালাগালি দিয়েছেন। লিখেছেন, আমি যেন তার বাড়ীতে আর না ঢুকি।

অন্য সময় হলে আমারও রাগ হতো। কিন্তু কি জানি কেন, আজকাল কারও ওপর রাগ করতে ইচ্ছে করে না।

আগামী পুজোর আগে আমার বাড়ীখানা নিশ্চয়ই শেষ হয়ে যাবে। যদি নাও হয়, তাহ'লেও তোমাকে জানাই—আমি ওই বাড়ীতে এবৎসর দুর্গার পুজো করব। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্য মাত্র। আমার ইচ্ছে, পূজার নবমীর দিন গ্রামের ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্বিশেষে সকলের পদধূলি পড়বে আমার বাড়ীতে। তাদের আমি নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবো। এই ব্যবস্থাটি তোমাকে করতেই হবে। এর জন্য কত খরচ পড়বে, মোটামুটি একটি হিসাব করে আমাকে জানিও। টাকা আমি ঠিক করে রাখব। তুমি একসময় এসে নিয়ে যাবে।

পুজোর সময় আমি গ্রামে যাব। তার আগে নয়।

আশাকরি তোমরা ভাল আছ।

তা রমেশের বাহাদুরী আছে। পুজোর আগেই দোতলা বাড়ী সে শেষ করে ফেলবে।

বাড়ীর ভেতর দুর্গোৎসবের ব্যবস্থা সে করেনি। বাড়ীর পাশে আরও খানিকটা ফাঁকা জায়গা পড়েছিল। সেই জায়গাটা ইঁটের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তারই মাঝখানে মঞ্চের মত একটি বেদী তৈরি করিয়ে তারই ওপর প্রতিমা রাখবার ব্যবস্থা করেছিল সে।

নতুন পুজো, কাজেই কাঠামো থেকে আরম্ভ করে সব-কিছুই নতুন করে তৈরী করতে হচ্ছে। পুজোর তখনও মাস-খানেক দেরি। কারিগরেরা খড়ের ওপর মাটি দিয়ে গেছে।

এখানে যে নতুন করে দুর্গোৎসব হবে সেকথা রমেশ বলেনি কাউকে। কিন্তু ছোট গ্রাম। কথাটা প্রচারিত হতে দেরি হলো না।

বাড়ী এবং প্রতিষ্ঠা অনেকেই দেখে গেছে। জেনে গেছে এটা রমেশের নয়—অশোকের।

অবাক্ হয়ে গেছে শুনে।

যে-রমেশ নিজে রান্না করে খেয়ে চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরি করতে যেতো কারখানায়—যে-রমেশকে ঘর-জামাই করে আশ্রয় দিলেন ভবতোষ গাঙ্গুলী, সেই রমেশ আজ বড়লোক হ'লো!

কেমন করে হলো সেইটেই জানতে চায়।

কোন্ অজানা পথে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ কারও কারও হাতে এসে জমে, সেইটি জানবার কৌতূহল স্বাভাবিক।

এই রকম দু'জন ভাগ্যবানকে দেখলে এই গ্রামের লোক। একজন ভবতোষ গাঙ্গুলী, আর একজন তার জামাই অশোক মুখুজ্যে।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে—একজনের গেল, আর-একজনের হলো। মাত্র এই ক' বছরের ভেতর দেখতে দেখতে ভবতোষ গাঙ্গুলী আবার আগের মত গরীব হয়ে গেলেন, আর অশোকের দোতলা বাড়ী উঠলো। ভবতোষবাবুর দোল-দুর্গোৎসব গেল বন্ধ হয়ে। অশোক আবার নতুন করে দুর্গোৎসব সুরু করলে।

এই দুইএর মধ্যে যোগসূত্রের আবিষ্কার করতে লাগলো গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তি।

আবিষ্কার করতে দেরিও হলো না বেশি।

ভবতোষবাবু যেখানে-সেখানে মাকি বলে বেড়াচ্ছেন—'হতভাগা জামাইটাকে আর তিনি বাড়ী ঢুকতে দেবেন না।' তারই সূত্র ধরে কে যেন চট্ করে আবিষ্কার করে ফেললে অশোকের এই অকস্মাৎ বড়লোক হওয়ার গোপন রহস্য।

কথাটা এতদিন কানে-কানেই ফিরছিল। রাসু ভট্চাজ শুনলে কথাটা। শুনে আর চুপ করে থাকতে পারলে না। এই রাসু ভট্চাজই মাংস পায়নি বলে গোলমাল বাধিয়েছিল ভবতোষ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে—পূজোর নবমীর দিন খেতে বসে।

কথাটা শুনেছে সে কাল সন্ধ্যেবেলা। শোনবামাত্র তার মনে ধরে গেছে। কিন্তু সন্ধ্যেবেলা ভবতোষ গাঙ্গুলীর বাড়ী যাওয়া আজকাল নিরাপদ নয়। অতবড় বাড়ী—আজকাল কোথাও আর আলো জ্বলে না। দক্ষিণদিকের বড় বড় থামওলা কয়েকখানা ঘরে তারা বাস করে। সেখানে পৌঁছোতে হলে দুটো দেউড়ি পেরোতে হয়। দিনের বেলা কোন রকমে সেখানে যাওয়া চলে, কিন্তু রাত্রে সেখানে যাওয়া উচিত নয়। অন্ধকার যেন বাড়ীটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বেঁধেছে। ভূতপ্রেত তো আছেই, তাছাড়া সাপ-খোপের ভয়ও কম নয়।

তাই সেদিন সকাল না হতেই রাসু ভট্চাজ তার গামছাটি কাঁধে নিয়ে বেরুলো বাড়ী থেকে। ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে—সেইটেই বড় কথা নয়। তাঁর দুর্গাবাড়ীর ঘাটে স্নান করে আসবে ফেরবার পথে।

ভেতর-বাড়ীতে যেতে হলো না রাসু ভট্চাজকে। দেখলে বাড়ীর বাইরে নোংরা একটা আস্তাকুঁড়ের পাশে ভবতোষ গাঙ্গুলী পেছন ফিরে বসে বসে কি যেন করছেন।

রাসু বললে, 'কি হচ্ছে ওখানে?'

ভবতোষ বললেন, 'কেঁচো খুঁড়ছি। মাছ ধরবো।'

—'এ-সব তোমার হলো কবন্ থেকে ?'

কথাটার জবাব দিলেন না ভবতোষবাবু। কাজ তখন তাঁর শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাটির ভাঁড়টি হাতে নিয়ে তিনি উঠে এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

রাহু বললে, 'তোমার ঘাটে স্নান করবো। এখানকার জলটা ভাল।'

বলেই সে জিজ্ঞাসা করে বসলো, 'কথাটা কি যা শুনছি—সত্যি ?'

—'কী কথা ?'

—'তোমার জামাই অশোকের কথা।'

ভবতোষবাবুর রাগ তখনও পড়েনি। বললেন, 'তার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কোরো না।'

রাহু এইবার আস্তে আস্তে ছাড়তে লাগলো।—'তা তুই হতভাগা আলাদা বাড়ী করতে গেলি কিসের জন্যে ?—এই তো শ্বশুরের রাজবাড়ীর মতন বাড়ী খাঁ খাঁ করছে, তারই খানিকটা মেরামত করে নিলেই তো চলতো !'

—'না না, তা কেমন করে চলবে ? গাঁয়ের লোক দেখুক যে শ্বশুরের সঙ্গে তার কোনও সম্বন্ধ নেই !'

রাহু বললে, 'তার ওপর পুজোর প্রতিমা হলো আলাদা করে'। আর তোমার দুর্গাবাড়ীতে দু'বছর ঘট-পুজো হচ্ছে !'

ভবতোষবাবু বললেন, 'আরে তুমি তো সব জানো ! তোমারই পাতার মাল না দেওয়ার জন্যে সে বছরের সেই কেলেঙ্কারীর কথা তুমি ভুলে গেছ ? আমি বলেছিলাম—ব্রাহ্মণদের কেমন করে খাওয়াতে হয় তুমি জানবে কেমন করে ? তোমার চৌদ্দপুরুষ কেউ কখনও ব্রাহ্মণভোজন করিয়েছে ? সেই রাগে শুনছি নাকি নবমীর দিন খুব ঘটা করে ব্রাহ্মণভোজন করাবে।'

রাহু ভট্চাজ বললে, 'করাক্। আমি যাব না।'

—'তুমি না গেলে কি হবে ? আর সবাই তো যাবে !'

এই বলে চলে যাচ্ছিলেন ভবতোষবাবু, রাহু ভট্চাজ তাঁকে ফেরাল।—'শোনো গাঙ্গুলী, রাহু ভট্চাজ এখনও মরে যায়নি। গাঁয়ের আর্ধেক লোককে আমি খেতে দেব না।'

ভট্চাজের মুখের দিকে একবার তাকালেন ভবতোষবাবু। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বললেন না। রাহু বললে, 'নিজের জামাই বলে তুমি মুখ বুজে চুপ করে রয়েছ আমি জানি। কিন্তু আসল কথাটা শুনে অবধি আমার গা জ্বালা করছে। আমার নিজের জামাই যদি হতো তো আমি ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিতাম।'

ভবতোষবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না কথাটা। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসল কথা মানে ? কী শুনেছ তুমি ?'

—'যা সত্যি তাই শুনেছি। একা আমি কেন, গাঁয়ের সবাই শুনেছে। সত্যি কথা চাপা থাকে না কখনও।'

ভবতোষবাবু একটুখানি ভয় পেয়ে গেলেন। ভাবলেন বুঝি তাঁর নিজের কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু রাহু ভট্চাজ যা বললে তা শুনে তিনি যেন একটু পুলকিত হয়েই উঠলেন।

রাহু বললে, 'তোমার অত অত কাঁচা টাকা বাড়ীতে এনে রাখাও তো বিপদ। তাই তুমি

ছুটো বড় বড় সোনার ইট তৈরি করিয়ে বাড়ীতেই রেখেছিলে। সেই ইট তোমার জামাই অশোক চুরি করে নিয়ে পালিয়ে গেল কলকাতায়। সেই সোনা বিক্রি করে বড়লোক হলো তোমার জামাই, আর তুমি কিনা মুখখানি শুকনো করে ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। বল সত্যি কিনা?'

কথাটা মন্দ নয়। ভবতোষবাবু এমনভাবে মাথাটি কাৎ করে এমন একটুখানি শুকনো হাসি হাসলেন যে রাসু ভট্চাজেরও বুঝতে বাকি রইলো না যে কথাটা সত্যি।

রাসু ভট্চাজ খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললে, 'জল-জামাই-তাও না—তিন নয় আপনা। কথাটা তোমার জানা উচিত ছিল।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'উচিত ছিল জানি। কিন্তু কি করব বল—অদৃষ্ট—সবই অদৃষ্ট।'

কথাটা শুনতে যাদের বাকি ছিল তারাও শুনলে।

শুনলে, অশোক হঠাৎ বড়লোক হলো—শ্বশুরের সোনা চুরি করে। এক আধ ভরি সোনা নয়। দু' দুটো খাস্ ইটের মত সোনার তাল।

বিশ্বাসযোগ্য কথাই বটে!

বিশ্বাস করবার জন্ম সবাই যেন বসেছিল।

দু'চারজন চুপিচুপি এসে ভবতোষবাবুকে জিজ্ঞাসা করতেও কসুর করলে না।

ভবতোষবাবু বললেন, 'আহা ও-কথা আবার তুলছো কেন? আমার যা গেছে তা আর মুখ ফুটে বলবার নয়। ছিটে ফোঁটা যা-কিছু ছিল, হতভাগা ছেলের মামলায় তাও গেল। এখন আমার সব-চেয়ে বড় দুঃখু কী জানো?'

—'কী দুঃখু?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'আমার জিনিস নিয়ে গেছে-গেছে; কিন্তু আমার ওই খোঁড়া মেয়েটার গয়না-গাঁটি নিয়ে গিয়ে আমাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়ে গেছে। মেয়েটার কাছে আমি আর মুখ দেখাতে পারছি না।'

কথাটা নির্মলার কানে গিয়ে উঠলো।

মেয়েটার শরীরটাও কিছুদিন থেকে ভাল যাচ্ছিল না। মনের দুঃখে-দুর্ভাবনায় দিনরাত নিজের ঘরটিতে শুয়ে বসেই কাটাতো।

নির্মলার মা সেদিন তার ঘরে ঢুকে দেখলে নির্মলা নেই। নদীর ঘাটে ঘরত মেজে কাপড় কাচতে। কিন্তু এক দুর্বল শরীর, তার ওপর খোঁড়া মেয়ে—একা-একা তার যাওয়াই বা কেন?

রাসমণি দুপুরাবাড়ীর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন দেখবার জন্তে। গিয়ে দেখেন, সেখানেও নেই।

ডাকলেন, 'নির্মলা!'

কোথাও কোনও সাড়া শব্দ পেলেন না।

অতবড় বাড়ী—এ-মহল ও-মহল তন্ন তন্ন করে খুঁজেও যখন তাকে পাওয়া গেল না, বুকটা তখন তার ছ্যাৎ করে উঠলো। ভাবো আবার মনের দুঃখে ঝিলে বাঁপি জীবনটাকে শেষ করে!

ভবতোষবাবু আসছিলেন, রাসমণি বললেন, 'নির্মলাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

কথাটাকে প্রথমে গ্রাহ্যই করলেন না ভবতোষবাবু। বললেন, 'ভাখো হয়ত' আছে কোথাও। খোঁড়া মেয়ে—যাবে আর কোথায় ?'

ছেলেরাও কেউ বাড়ীতে নেই যে খুঁজতে বলবেন।

এমন সময় দেখা গেল, বাইরে থেকে নির্মলা আসছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। ভাল একখানা শাড়ী পরেছে, জামা পরেছে, কানে অল্ অল্ করছে দুটি দামী পাথর, আর দু'হাতে মাত্র দু'গাছা সোনার চুড়ি। খোঁড়া বলে কি হবে, যুবতী মেয়ে, অঙ্গ-সৌষ্ঠব তো খারাপ নয়—তাইতেই তাকে সুন্দর দেখাচ্ছে।

বাপ প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কোথায় গিয়েছিলি খোঁড়াতে খোঁড়াতে ?'

কথাটার জবাব দিলে না নির্মলা। সোজা সে তার মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো।

ভবতোষবাবু আবার বললেন, 'কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন ? বল্ কোথায় গিয়েছিলি ?'

বাপ-মা দু'জনেই শুনতে পান—এমনিভাবে নির্মলা বললে, 'গিয়েছিলাম আমার ননদের বাড়ী।'

মা বললেন, 'তোর কেমন বাড়ী হয়েছে দেখতে গিয়েছিলি ?'

নির্মলা বললে, 'হ্যাঁ মা, দেখে এলাম। বাড়ী দেখলাম, ঠাকুর দেখলাম, কিন্তু ও-সব দেখতে তো যাইনি মা, আমি গিয়েছিলাম শোভনাদিদিকে একটা কথা বলতে।'

মা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী এমন কথা যা বলবার জন্যে কাউকে কিছু না বলে ছুটেছিলি সেখানে ?'

নির্মলা বললে, 'বলতে গিয়েছিলাম তোমার জামাই চোর নয়।'

—'চোর কে বললে তাকে ?'

—'তোমরাই বলছো মা। বলছো—সে নাকি বাবার দুটো সোনার ইঁট চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে, আমার গয়না চুরি করেছে—আরও সব কত কথা! এখানে এসেই তো সেই সব কথা শুনবে তোমার জামাই। তাই বলতে গিয়েছিলাম—ও-সব মিছে কথা। একটি পয়সা না নিয়ে সে আমার ওপর রাগ করে—'

নির্মলার ঠোঁট দুটো থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগলো, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে এলো। কিছুই সে বলতে পারলে না।

ভবতোষবাবু শুনলেন। বললেন, 'ওই সব কথা রটিয়েছে গাঁয়ের লোক। আমি কার মুখে হাত আড়াল দেবো বলতে পারো ?'

নির্মলা নিজেকে খানিকটা সামলে নিলে। চোখের জল মুছে বললে, 'তোমার জামাই এখানে এলেই তো আমাকে নিতে আসবে—'

ভবতোষবাবু কথাটা তাকে শেষ করতে দিলেন না। বললেন, 'আসতো। কিন্তু আর বোধহয় আসবে না।'

রাসমণি বললেন, 'কেন আসবে না ?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'আমার মেয়েই যখন সুড় সুড় করে নিজেই গিয়ে হাজির হলো তখন আর আসবে কেন ? ভাববে—নির্মলাই আসুক, আমি আর শ্বশুরবাড়ীর দরজা মাড়াবো না। অশোকের জেদটাই বজায় রইলো। আমার মান-সম্মান আর রইলো না।'

নির্মলা আর চুপ করে থাকতে পারলে না। বলে উঠলো, 'তোমার মান-সম্মান আর কেমন

করে থাকবে বাবা? মেজদার মামলার সময় আমার গয়নাগুলো নিলে, বললে, মামলা মিটলেই তোকে আমি সব গড়িয়ে দেবো। দিয়েছ আজ পর্যন্ত? তোমার জামাই যখন আমাকে নিতে আসবে, তখন আমি এমনি ছাড়াবুঁচো হয়ে যাব ভেবেছো। কখ্খনো যাব না।'

ভবতোষবাবু এই অপ্রিয় প্রসঙ্গটাকে চাপা দিতে চাইলেন। মৃদু একটু হেসে বললেন, 'দূর পাগ্‌লী, এখন তোর গয়নার ভাবনা! অশোক কত গয়না তোকে গড়িয়ে দেবে দেখবি।'

—'দেখবো তো অনেক কিছু বাবা? কিন্তু গাঁয়ের লোক কি দেখবে? দেখবে আমার গায়ে একটি গয়না নেই। তখন যা রটেছে তাই তারা বিশ্বাস করবে। বলবে তোমার জামাই সব চুরি করে নিয়ে গেছে। আমার গয়না নিয়ে গেছে, তোমার সোনার তাল নিয়ে গেছে। সেইগুলো বিক্রি করে বড়লোক হয়ে আবার সে গাঁয়ে ফিরে এসেছে।'

রাসমণি বললেন, 'শুনছো? নির্ম্মলা ঠিকই বলছে। পঞ্চাশ ভরি সোনার গয়না দিয়েছিলাম নির্ম্মলাকে। আমাকেও তো ছাড়াবুঁচো করেছ, নইলে আমিই আবার গড়িয়ে দিতাম।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'তোমাকে দিতে হবে না, আমিই দেবো। পাল্‌সিটের নন্দীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা আমি করেছি। বড় বাদটা বিক্রি করে দিয়ে হাজার তিনেক টাকা আমি পাব। সেই টাকাটা পেলে আগেই আমি নির্ম্মলার গয়না গড়িয়ে দেবো।'

নির্ম্মলা বললে, 'হ্যাঁ, টাকাও তুমি পেয়েছ আর আমাকে গয়নাও দিয়েছ!'

এই বলে সে তার ঘরের দিকে চলে গেল।

৪

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। আকাশে শরতের সাদা সাদা মেঘ। বাতাসে শিউলিফুলের গন্ধ।

পুজোর বাজনা বাজছে।

পঞ্চমীর দিন দু'খানা ছই-দেওয়া গরুর গাড়ী রেলষ্টেশনে পাঠিয়েছিল রমেশ। কিন্তু গাড়ী ফিরে এলো। অশোক আসেনি।

রমেশ খুব ভাবনায় পড়লো। অশোক চিঠি লিখেছিল পঞ্চমীর দিন আসবে, কিন্তু এলো না কেন?

বিকেলে আর-একখানা আসবার ট্রেন আছে। রমেশ ভাবছিল গাড়ী দুটো আবার পাঠিয়ে দেবে কিনা। হারু মোড়ল তিনটি টাকা নিয়ে গাড়ী সঙ্গ দিয়েছিল। যাবার সময় বলে গেল, 'যেতেই যদি হয় তো আমাকে খবর দিও।'

দুটি মাত্র মানুষের সংসার। রমেশ আর শোভনা। রান্নাবান্না শেষ করে শোভনা গিয়েছিল অশোকের নতুন বাড়ী সাজাতে। সাজানো চলছে আজ কয়েকদিন থেকেই। তবু তার ঠিক মনের মত হচ্ছে না। খালি খালি দোষ দিচ্ছে রমেশকে আর বলছে, 'এমন সুন্দর বাড়ী, খাট পালঙ্ক আলমারি, টেবিল চেয়ার না হ'লে মানায় কখনও?'

একটা শুধু ডবল বেড় বড় খাট কিনে আনা হয়েছে শহর থেকে। অতবড় বাড়ীতে সেটা আর কতটুকু। নতুন গদি তোষক, নতুন বিছানার চাদর দিয়ে সেটা সে সুন্দর করে সাজিয়ে

দিয়েছে। খানকতক বড় বড় শতরঞ্চি এনেছিল কিনে। তারই একটা বিছিয়ে দিলে মেঝের ওপর। তারপর বাকি জিনিসপত্র সরিয়ে রেখে বললে, থাক ও সব। অশোক নিজে এসেই ঘর-দোর সাফাবে। আমি শুধু তার আর বৌএর খোবার জায়গা করে দিলাম।'

রমেশ বললে, 'এবেলা তো এলো না। তিন চারজন আসবে লিখেছে। খাবার-গুলো নষ্ট হলো। ওবেলা যদি আসে তখন খাবার খাবার ঠিক করলেই হবে।'

শোভনা বললে, 'পুজোর ওখানে একবার গিয়েছিলে?'

রমেশ বললে, 'একবার মানে? তাখোগে কেমন প্যাণ্ডেল্ তৈরি করে দিয়েছি! একেবারে কলকাতার মতন। রাজার লোক ওইখানে বসে খেতে পারবে। একটা যাত্রা-টাত্রা কিছু লাগিয়ে দিলে হতো।'

শোভনা বললে, 'সে সব দিকে তো তোমার সখ নেই। তুমি শুধু খি, ময়দা, তেল আর কুমড়ো কিনে কিনে ভাঁড়ার ভর্তি করলে। যাত্রা হলে কেমন শুনতুম বসে বসে।'

রমেশের খিদে পেয়েছিল। বললে, 'চল, খেয়ে নেবে চল।'

—'সেই ভাল।'

তারা দুজনেই নতুন বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে। এমন সময় রমেশের নামে এক টেলিগ্রাম!

টেলিগ্রামটা পড়েই রমেশ বললে, 'যাক্। আজ আর আসবে না। ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাতে হবে কাল সকালে। খেয়েদেয়ে একবার বসে আসতে হবে রাত্রে। তিনটে টাকা আজ দিয়েই গেল।'

শোভনা বললে, 'এসো, তুমি কেমন প্যাণ্ডেল তৈরি করলে দেখে যাই।'

বাড়ীর পাশেই পুজোর মণ্ডপ। প্রতিমা হয়েছে দেখবার মত। রমেশ কাঁকশা থেকে কারিগর আনিয়ে প্রতিমা তৈরি করিয়েছে। অওালের পশুপতি মুখুজ্যের কাছ থেকে ডাক-সাজ নিয়েছে।

হাঁ, দেখবার মত প্রতিমা হয়েছে বটে!

যেমন প্রতিমা, তেমনি সাজিয়ানা, তেমনি পুজোর আয়োজন।

গ্রামের কোনও পুরোহিত পুজোর ভার নিলে না। দক্ষিণা ভালই দিতে চেয়েছিল রমেশ, কিন্তু কি জানি কেন, সবাই টাল-বাহানা করতে লাগলো। সম্ভবত ভবতোষ গাঙ্গুলীর ভয়ে, কিংবা রাসু ভট্টাচাজের প্ররোচনায়।

রমেশ বুঝতে পারলে।

তক্ষুনি সে নিজে গিয়ে পাল্‌সিট থেকে ভামসুন্দর কাব্যতীর্থকে নিয়ে এলো। তিনি বলেছিলেন, 'পঁচিশটি টাকা দিতে পারবে? আর আমার সঙ্গে একজন যাবে তাকে দেবে পাঁচটাকা। তা যদি যাও তো তোমাদের কিছু দেখতে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা নিজেই করে নেবো।'

রমেশ রাজী হয়েছিল।

গিয়ে দেখলে ভট্টাচাজমশাই এসেছেন। তাঁর পেছনে একজন লোক। মাথায় একঝুড়ি পদ্মফুল।

—'পদ্মফুল কোথায় পেলেন ভট্টাচাজমশাই?'

ভট্টাচাজমশাই বললেন, 'নন্দীদের পদ্মপুকুর থেকে আনালাম বাবা। আমার এই লোকটি ফুলের ব্যবস্থা করে দেবে, আর আমাকে সাহায্য করবে। বাগুনের ছেলে, খুব গরীব। সেই জন্যে ওকে পাঁচটি টাকা দিতে বলেছি।'

শোভনা বললে, 'সবই তো হলো। অশোক দুদিন আগে এসে ভালো হতো।'

রমেশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কেন?'

—'সবই কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। অশোক এলে নির্ঝঞ্ঝাটে নিয়ে আসতো।'

রমেশ বললে, 'কালে সকালেই তো আসছে। কালই আনবে।'

ষষ্ঠীর দিন সকালে অশোক এসে পৌঁছোলো। সঙ্গে এলো বীরা আর নীরা।

বীরা নীরা গরুর গাড়ীতে কখনও চড়েনি। চড়তে গিয়ে তাদের সে কী হাসি!

বীরা বললে, 'হাসিসনে নীরা। আমরা গরুর গাড়ীতে চড়বো, গ্রাম দেখবো, পুকুর দেখবো, নদীতে চান করবো—সেই জন্যেই তো এসুম।'

নীরা অশোকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমি কিন্তু সেজন্যে আসিনি অশোকদা, আমি এসেছি তোমার বৌ দেখতে।'

অশোক বললে, 'দেখবে—চল।'

বীরা জিজ্ঞাসা করলে, 'আজ ষষ্ঠী, আজই গিয়ে নিয়ে আসবে।'

নীরা বললে, 'সে-সব বড় ঝামেলা। অশোকরা শ্বশুরবাড়ীর দরজা মাড়াবে না।'

বীরা বললে, 'তাহ'লে কি হবে? শ্বশুর শাশুড়ী যদি না পাঠায়?'

অশোক বললে, 'পাঠাবে।' 'আমার দিদি গিয়ে নিয়ে আসবে।'

গাড়ী গিয়ে দাঁড়ালো অশোকের নতুন বাড়ীর ফটকের কাছে। একটা গাড়ী জিনিসপত্রে বোঝাই। সেই গাড়ী থেকে নামলো অশোক।

আর একটা গাড়ী থেকে নামলো দু'বোন—বীরা আর নীরা।

শোভনা রমেশ—দু'জনেই এসে দাঁড়িয়েছিল গাড়ীর কাছে। বীরা নীরার কথা রমেশের মুখে শুনেছিল শোভনা। কিন্তু তারা যে এত সুন্দরী সেকথা সে ভাবতে পারেনি।

শোভনা বললে, 'এসো ভাই, এসো। তোমাদের কথা আমি অনেক শুনেছি।'

নীরা বললে, 'আপনার কথা আমরা অনেক শুনিনি। যেটুকু শুনেছি তাইতে শুধু আমি আপনি অশোকদার দিদি।'

শোভনা বললে, 'নামেই দিদি। আমরা দু'বছরের ছোট বড়। অশোক আমাকে দিদি বলে ডাকে, কিন্তু এখনও তুই বলে।'

বীরা বলে, 'আমাদেরও ঠিক তাই। নীরাও আমাকে তুই বলে।'

কথা বলতে বলতে শোভনা তাদের নতুন বাড়ীতে নিয়ে যাচ্ছিল, অশোক বললে, 'আগে ঠাকুরকে প্রণাম করে আসি। তারপর—'

ঠাকুরকে প্রণাম করে আসবার পরেও অশোক তাদের ঢুকতে দিলে না নতুন বাড়ীতে। বললে, 'আগে আমাদের আসল বাড়ীতে ওদের নিয়ে চল্ দিদি।'

নিতান্ত পুরণো ছোট একটি বাড়ী। দুখানি মাত্র ঘর। পাশেই একটু রান্নার জায়গা। মাটির দেয়াল। মাথাটা ঢেউতোলা টিনের। মাটির পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটু উঠোন। উঠোনে দাউ দুপুরের গাছ। কলাগাছে দু'কাঁদি কলা কলেছে। মেলা লতা ধরেছে লতার গায়ে।

—'ও দিদি দেখে যা।'

বলেই মীরা লতার গাছ থেকে পটু করে একটা লতা ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতেই হাত করতে করতে বলে উঠলো, 'সর্বনাশ! কী ঝাল রে বাবা!'

বীরা বললে, 'চল্ আগে চান করে আসি।'

মীরা বললে, 'নদীর ঘাটে চান করব বলেছি না। দিদি! দিদি!'

বীরা বললে, 'কি বলছিস?'

—'তোকে বলিনি। আমার নতুন দিদিকে বলছি।'

শোভনা চায়ের ব্যবস্থা করছিল। মীরার কথা সে শুনতে পেয়েছে। বললে, 'নদীর ঘাটে নয়। তোমাদের চানের ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি।'

অশোক শোভনার কাছে চায়ার খুঁটি ঠেস দিয়ে বসেছিল। জিজ্ঞাসা করলে, 'কী ব্যবস্থা করেছিস?'

গাড়ী থেকে জিনিসপত্র নামিয়ে নতুন বাড়ীতে তুলে দিয়ে রমেশ আসছিল, শোভনা তার মাথার কাপড়টা একটু তুলে দিয়ে বললে, 'ওকে জিজ্ঞাসা কর্।'

রমেশ বললে, 'তবে আর কলকাতা থেকে পাম্পটা আনলাম কিসের জন্যে?'

অশোক বললে, 'পাম্প্ চালু করেছ?'

রমেশ বললে, 'চল্ না, দেখবি কি করেছি। এখানে তো ইলেক্‌ট্রিসিটি নেই। বাত দিয়ে পাম্প চালালেই কুয়ো থেকে ছাতের রিজার্ভার ট্যাঙ্কে জল উঠছে। বাথ্‌রুম, বেসিন, স্যানিটারি প্রিভি—সব একেবারে কলকাতার মতন করে ফেলেছি। আলোটা শুধু জোক্ দণ্ডনের ব্যবস্থা করেছি।'

অশোক বললে, 'তবে আর কি! চলে যাও নতুন বাড়ীতে!'

মীরা তখনও নদীর ঘাট ভোলেনি। বললে, 'নদীর ঘাটে যাব না?'

রমেশ বললে, 'না। আমাদের তো সেরকম নদী নয়। বর্ষায় জল অবশ্য এখনও একটুখানি আছে, কিন্তু চান করতে হলে যেতে হবে অশোকের শ্বশুরবাড়ীর সেই দুর্গাবাড়ীর বাঁধানো ঘাটে। সেখানে যাওয়া চলবে না।'

শ্বশুরবাড়ী বলতেই অশোকের একটা কথা মনে পড়লো। রমেশকে জিজ্ঞাসা করলে, 'শ্বশুরমশাইকে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিলে?'

—'একবার দু'বার নয়, তিনবার! প্রথমবার বললেন, আমার নিজের বাড়ীতেও তো পুজো। বললাম, আপনার প্রতিমা তো আসবে না, ঘট-পুজো করবেন। কথাটা শুনেই তিনি রেগে উঠলেন। বললেন, 'তাই বলে হাতজোড় করে তোমাদের দুর্গোৎসবে আমাকে বসে থাকতে হবে? না কী বলছো তুমি?—যাও, যাও, আমার যা ভাল মনে হবে আমি তাই করবো।' তারপর আবার একদিন দেখা হলো বাধু ময়রার দোকানের কাছে। বললাম, 'নবমীর দিন আপনার বাড়ীর সবাই যদি পায়ের ধুলো না দেন, ব্রাহ্মণভোজন হবে কেমন করে?' বললেন—'ব্রাহ্মণভোজনের নেমন্তন্নটা বুঝি রাস্তায় সারতে চাচ্ছ?' কথাটা শুনে একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম। পরের দিন গেলাম তাঁর বাড়ীতে। গাঙ্গুলী-গিন্নীর সঙ্গে দেখা হলো। হাত জোড় করে বললাম, 'একটিবার পায়ের ধুলো দেবেন তাহ'লে।' তিনি বললেন, 'আমাকে কেন বাবা, কত্তাকে বল। আমি বসে নিজের আলায় মরছি। পুজোর সময়

মেয়েটা আবার অর বাধিয়ে বসলো।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'অর হয়েছে বৌএর?'—'হাঁা বাবা, আজ সাতদিন হলো—অর কিছুতেই ছাড়ছে না।' আমার বিশ্বাস হলো না কিন্তু। মনে হলো—আসবে না বলে ওই একটা ছুতো।'

শোভনা বললে, 'তাহ'লে তুই একবার যা। বাড়ীতে পুজো। নতুন বাড়ী করলি—বৌকে নিয়ে আয়।'

বীরা নীরা দু'জনেই গিয়েছিল কুয়ো থেকে কোর্ল পাম্পে কেমন করে জল উঠছে দেখবার জন্যে।

রমেশ একবার সেইদিকে তাকিয়ে দেখে নিলে—তারা আসছে কিনা। তারপর বললে, 'না। অশোকের যাওয়া চলবে না। যেতে হয় তুমি একবার যাও। বাড়ীর ভেতরে ঢুকে তুমি দেখে আসতে পারবে—কথাটা সত্যি না মিছে।'

শোভনা বললে, 'অশোক যাবে না কেন? শ্বশুর অমন বলে!'

রমেশ লাফিয়ে উঠলো।—'বলে কি বলছো? ভবতোষ গাঙ্গুলী কি একটা মানুষ নাকি? জামাইকে তুই অপমান করলি, তার ওপর 'তুমি আমার ধরজা মাড়িয়ো না' বলে চিঠি লিখলি কেমন করে? আর-একটা কথা এখনও আমি কাউকে বলিনি। অশোকের বাড়ী হচ্ছে, পুজো হচ্ছে, দেখে ভবতোষ গাঙ্গুলী কি বলেছে জানো? সারা গাঁয়ের লোকের কাছে বলে বেড়িয়েছে—প্রায় লাখখানেক টাকার সোনা কিনে রেখেছিল সে তার বাড়ীতে—ছুটো ইঁটের মত সোনার তাল। সেই সোনা আর তার মেয়ের গায়ের যাবতীয় সোনার গয়না—সব কিছু চুরি করে নিয়ে অশোক পালিয়েছে। অশোকের এই যে রবরবা দেখছো—সে শুধু সেই সোনা বিক্রি করে।'

অশোক হাসলে। বললে, 'এই কথা বলেছে আমার শ্বশুর?'

রমেশ বললে, 'গাঁয়ের একটা ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেসা কর। সেও বলে দেবে।'

শোভনা বললে, 'তোর বৌ একদিন এসেছিল আমার কাছে। বলে গেছে, এসব তোমরা বিশ্বাস কোরো না।'

অশোক বললে, 'তুই একবার যাবি তাহ'লে। পুজোর সময় নির্মলা তাহ'লে আসবে না মনে হচ্ছে। পুজোর পর দেখা যাবে—কি করতে পারি।'

* * * *

বাড়ীতে পুজো। শোভনাকে সবই করতে হচ্ছে। ষষ্ঠীর দিন সে আর যেতে পারলে না ভবতোষবাবুর বাড়ী।

সপ্তমীর দিন সকালেই ভাল একখানা শাড়ী পরে—গেল সে নির্মলাকে আনতে।

ফিরে এলো একাই।

নির্মলা আসেনি।

বীরা ছাঁ করে দাঁড়িয়েছিল নির্মলাকে দেখবার জন্যে। শোভনাকে একা ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞাসা করলে, 'কি হলো দিদি?'

শোভনা বললে, 'এলো না। অশোক কোথায়?'

—'ওই তো চা খাচ্ছে।'

নতুন বাড়ীর রান্নাঘরে বসে চা খাচ্ছিল অশোক আর রমেশ।

শোভনা বললে, 'না রে মিছে কথা নয়। সত্যিই অসুখ।'

—'জ্বর হয়েছে?'

—'বললে তো তাই।'

—'তুই দেখে এলি না?'

—'দেখলাম তো। গায়ে চাদর দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। মা বসে রয়েছে শিয়রের কাছে। ওষুধের শিশি রয়েছে। ঘুমোচ্ছিল। মাথায় হাত দিয়ে দেখলাম—বেশ গরম। তোর শাশুড়ী বললে—ভবানী-ডাক্তার নাকি বলে গেছে টাইফয়েড হয়েছে।'

রমেশ বললে, 'পুজোতে আর এলো না তাহ'লে। মেয়ে উটুক্। তারপর আসবে।'

শোভনা বললে, 'অশোকের শাশুড়ীটা ভাল মানুষ। আমার সঙ্গে বেশ ভাল করেই কথা বললে। কিন্তু যত্তি তোর শ্বশুর—মিনসে পাজির একশেষ। ঘরে একবার ঢুকলো। যেমনি দেখলে আমি বসে আছি, অমনি পালিয়ে গেল।'

—'লোকটা চিরকাল অমনি।' রমেশ বললে, 'ছুটো পয়সা যখন হয়েছিল, অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়তো না। জামাই বাড়ী করেছে, পুজো করছে, ওর আর সহ্য হচ্ছে না, হিংসেয় মরে গেল। টাকাগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে অশোক যদি বলতো, এই নিন, আপনি যা হয় করুন, তাহ'লে বোধ হয় খুশী হতো।'

কিন্তু বেশিক্ষণ ভবতোষ সান্ত্বনীর কথা বোধহয় সে বলতে পারলে না। সপ্তমী পুজো আরম্ভ হয়ে গেছে। পুরুত-ঠাকুর তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শাশ্বত ঐতিহ্য

৫০ বছরেরও উপর বস্ত্রলক্ষ্মীর জনপ্রিয়তা বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্প জগতে এক বিরাট গৌরবময় ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাবার জন্য সম্প্রতি উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতী আমদানী করে মিলের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে।

বস্ত্রলক্ষ্মী

কটন মিলস্ লিমিটেড

৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

BALPANA.BL.6.B

শোভনাও চলে গেল। অনেকগুলি লোক যাবে। ঠাকুর একজন রান্না করতে এসেছে। তাকে চাল-ডাল তরি-তরকারি বের করে দিতে হবে ভাঁড়ার থেকে। মাছের ব্যবস্থা করেছে হারাধন কৈবর্ত্ত।

ধীরা ধীরা দু'জনেই উঠলো।—'চল দিদি, আমরাও তোমার সঙ্গে যাই।'

দুর্গোৎসব তো সামান্য ব্যাপার নয়।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—কারও আর নিশ্বাস নেবার অবসর রইলো না।

নবমীর দিন আবার আর-এক বিভ্রাট বাধলো।

দুপুরে সারা গ্রামকে-গ্রাম নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। এত বড় বিরাট আয়োজন গ্রামদেশে খুব কমই হয়ে থাকে।

ভবতোষ গাঙ্গুলীর বাড়ী থেকে কেউ এলো না। আসবে না জানা কথা। কিন্তু দক্ষিণ পাড়ার ব্রাহ্মণেরা যে কেন এলেন না—রমেশ বুঝতে পারছিল না। সে আবার ছুটলো। বাড়ী বাড়ী প্রত্যেকের হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করলে, বললে, মায়ের প্রসাদ, আপনারা যদি পায়ের ধুলো না দেন তো অশোকের এত আয়োজন পণ্ড হয়ে যাবে।

যাবার ইচ্ছে ছিল সকলেরই। এত বড় ভোজ—খাবার-খাবার আয়োজন প্রচুর। ছাড়বার ইচ্ছা কারও নেই, অথচ কোথায় যেন আটকাচ্ছে। হিতেন চক্কোত্তি রমেশকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলেই দিলে, 'তুমি যাও দেখি একবার রাসু ভট্চাজের কাছে। ওকে বের কর দেখি বাড়ী থেকে। দেখবে সবাই বেরুবে।'

রমেশ বললে, 'রাসুকে তোমাদের এত ভয়?'

হিতেন বললে, 'দুর্জ্জনকে ভয় সবাই করে। তোমরা টিনের বাড়ীতে, দালান বাড়ীতে থাকো, তোমাদের ভাববার কিছু নেই। কিন্তু খড়ের বাড়ী, ব্যাটা দিতে পারে আগুন লাগিয়ে।'

ঠিকই বলেছিল হিতেন।

রমেশ ছুটে গিয়ে এমন একটা অভিনয় করলে রাসু ভট্চাজের কাছে যে, রাসু একেবারে থ'।

ভট্চাজ-গিন্নির সঙ্গে বোধকরি তার তখন এই নিমন্ত্রণ নিয়েই আলোচনা হচ্ছিল, এমন সময় রমেশ গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো একেবারে তাদের চোখের সুমুখে। উঠোনের ওপর মুখ থুবড়ে সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছে, তাকে তোলে কার সাধ্যি।

রাসু তার হাত ধরে প্রাণপণে ঠেলে চিৎ করে তাকে শুইয়ে দিতেই দেখা গেল—রমেশের দুচোখে জল। রমেশ কাঁদছে।

ভট্চাজ-গিন্নি এগিয়ে এলো।—'কি হলো রমেশ, তুমি অমন করছো কেন?'

'আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল দিদি। কাল রাত্তিরে—অষ্টমীপুজোর রাত্তিরে—ভেবে ছাখো দিদি—স্বপ্ন দেখলুম—ভট্চাজ বসে বসে খাচ্ছে, আর মা আমার চুলের মুঠি ধরে আছেন। মা মানে—মা দুর্গা! এই ছাখো বলতে বলতে আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মা আমার চুলের মুঠি ধরে আছেন ঠিক যেমন সাপের লেজটা ধরে থাকেন অসুরকে পেলিয়ে দেবার জন্যে। আমি যত বলছি, 'মা ছাড়ো। লাগছে।' মা তত বলছেন, 'ভাল করে খাওয়া। খাইয়ে দক্ষিণে দিবি দশ টাকা।'

আমি বললাম, 'দশ টাকা আমি কোথায় পাব মা, আমি গরীব ব্রাহ্মণ।' মা বললেন, 'যেখান থেকে পার্ নিয়ে আয়।' দশটি টাকা এনে যেই ভট্চাজের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়েছি অমনি আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। সত্যি বলছি দিদি তুমি বিশ্বাস কর। এই ছাখো দশ টাকার একখানি নোট আমি সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ফিরছি। আর সেই রাসু ভট্চাজ আজ বলে কিনা—খেতে যাবে না! স্বপ্নটা তো অশোক ছাখেনি, দেখেছি আমি।'

দশটা টাকার কি অপার মহিমা! রাসু ভট্চাজ বললে, 'যাব না তো বলিনি আমি। এই হিতেন-টিতেন বলছিল কিনা—'

ভট্চাজ-গিন্নি বললে, 'বলুক। তুমি যাও।'

রমেশ তখন তার ট্যাঁক্ থেকে দশ টাকার নোটখানি ভট্চাজ-গিন্নির পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে বললে, 'এ তো আর দশজন লোকের সামনে দিতে পারি না, এই তোমার হাতেই দিয়ে গেলাম দিদি, রাখো।'

রাখতে যাচ্ছিল ভট্চাজ-গিন্নি। কিন্তু রাখা তার হলো না। তার আগেই রাসু ভট্চাজ হাত বাড়িয়ে নোটখানা কুড়িয়ে নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজে বললে, 'চল।'

ভট্চাজ-গিন্নি বললে, 'গামছাটা নিয়ে গেলে না?'

গামছা নিয়ে যাবার রহস্য রমেশ বুঝতে পারলে। বললে, 'আসবার সময় আমি একটা বড় রকমের ছাঁদা বেঁধে দেবো দিদি, তুমি ভেবো না।'

পাড়ার সবাই যেন ওৎ পেতে ছিল। রাসু ভট্চাজকে বেরোতে দেখে সবাই বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে।

পাতেতলের নীচেটা তখন ভর্তি হয়ে গেছে। রাসু ভট্চাজের সঙ্গে দক্ষিণপাড়ার প্রায় পনেরো জন ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে রমেশ বসিয়ে দিলে অশোকের নতুন-বাড়ীর দালানে।

অশোক হাত জোড় করে এসে দাঁড়ালো রাসু ভট্চাজের কাছে।

ভট্চাজ বললে, 'তুমি বাড়ী করলে, দুর্গোৎসব করলে, কী আনন্দ যে হয়েছে বাবা সে আর বলে কি জানাবো! তোমার শ্বশুর বলে কিনা তার নাকি ঘটো সোনার তাল তুমি চুরি করে নিয়ে গেছ। শোনো কি রকম কথা!'

অশোক ম্লান একটু হাসলে শুধু। বললে, 'বেশ ভাল করে খান আপনি। আমার সামান্য আয়োজন—'

তা অশোকের অনুরোধ সে রাখলে। এমন খাওয়া সে খেলে, মনে হলো আগামী দু'চারদিন তাকে খেতে হবে না।

খাওয়া শেষ হলে রমেশ চুপি চুপি বললে, 'যাও তুমি। আমি নিয়ে যাচ্ছি।'

বলেই সে একখানি নতুন গামছা নিয়ে লুচি তরকারি মিষ্টি বাঁধতে বসলো। দুই বড় দুটি মাটির পাত্রে মাছ আর মাংস ভর্তি করে একজন বাবুনের হাতে দিয়ে বললে, 'এইবার এসো তো আমার পিছু পিছু!'

অশোক জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

—'রাসু ভট্চাজের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

অশোক বললে, 'হাঁ। দিয়ে এলো। আহা বেচারা, খেতে ভালবাসে, খাক্।'

—'খাক্ বলিস না, বল্ দিলুম। তোকে সব কথা বলিনি। ওকে কিরকম করে যে আমি বিয়ে এসেছি তা আমিই জানি। আজকে তোর এই ব্রাহ্মণভোজনটি ও পণ্ড করে দিয়েছিল আর একটু হ'লে। ও না এলে দক্ষিণপাড়ার কেউ আসতো না।'

এই বলে রমেশ চলে গেল।

অশোক হাত জোড় করে একটি প্রণাম করলে।

—'কাকে প্রণাম করলে অশোকদা?'

নীরার গলার আওয়াজ।

অশোক বললে, 'ভগবানকে।'

—'কি বললে তাকে?'

—'বললাম, এদের সুমতি দাও!'

নীরা হাসতে হাসতে বললে, 'না দিলেই নয়! এরা চিরদিন থাকবে। এরা না থাকলে মজা হবে কেন?'

৫

সারা গ্রামের একটি মানুষও বাকি রইলো না খেতে।

সবাই নাম করতে লাগলো অশোকের। বললে, 'এমন খাওয়া কখনও খাইনি।'

নবমীর হাঙ্গামা চুকতে রাত্রি হয়ে গেল।

পরের দিন বিজয়া।

বিকেলে প্রতিমা বিসর্জন।

নীরা নীরা বলল, 'আমি নদীর ধার পর্য্যন্ত দেখতে যাব।'

অশোক বললে, 'যেয়ো।'

উৎসবের হাঙ্গামা আজ চুকে গেছে। আজ অশোক ভাবছে শুধু নির্ম্মলার কথা। শোভনাকে বললে, 'আমি একবার শ্বশুরবাড়ী যাই দিদি। নির্ম্মলাকে দেখে আসি।'

শোভনা বললে, 'আর বিজয়া দশমী। আজ যদি তোকে কিছু বলে! বিজয়ার দিন খারাপ কথাগুলো শুনবি?'

অশোক বললে, 'শুনেই আসি। যা বলে বলবে। আমি যাই।'

অশোক বেরিয়ে গেল বাড়ী থেকে।

শোভনা তাড়াতাড়ি রমেশকে ডেকে বললে, 'ঝগড়াকাঁটি কিছু যদি হয় তো অশোক সামলাতে পারবে না। তুমিও যাও ওর পিছু পিছু।'

মস্ত বড় বাড়ী। ভেতরের আওয়াজ সাধারণত বাইরে আসে না। তবু সেদিন ভবতোষ গাঙ্গুলীর হেঁউড়ির চৌকাঠে পা দিতেই মনে হলো যেন কার বুকফাটা কান্নার আওয়াজ অশোকের কানে এসে বাজলো।

অশোক আর এগোতে পারলে না। থমকে দাঁড়ালো সেইখানে।

তার শাশুড়ী কাঁদছেন।

এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল অশোক।

ওপরে ওঠবার দরকার হলো না। স্তম্ভিত নির্বাক অশোক উঠোনের একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে-দৃশ্য দেখলে, সে-দৃশ্য দেখবে তা সে কল্পনাও করেনি।

সিঁড়ির সামনে চাকা বারান্দার ওপর ছোট একটা খাট নামানো হয়েছে। পাড়ার কয়েকজন লোক কোমরে গামছা বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। মা কাঁদছেন—'আজ বিজয়ার দিন তুই এমনি করে চলে গেলি মা! তোকে ছেড়ে আমি থাকবো কেমন করে?'

অশোক বুঝতে পারলে—নির্মলা মারা গেছে।

সেই সে এলো ভবতোষ গাঙ্গুলীর বাড়ীতে, কিন্তু দু'দিন আগে এলো না কেন? শোকের প্রথম ধাক্কাটা বড়ই মর্মান্তিক ভাবে লাগলো এসে অশোকের বুকে।

ভবতোষবাবুর ছেলেরা আর লোকজন নিয়ে ধরাধরি করে সিঁড়ি দিয়ে নামাচ্ছে নির্মলার মৃতদেহ।

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে অশোক। দেখলে তাকে খাটের ওপর শোয়ানো হলো। মা এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন খাটের ওপর।—'ওরে ওকে তোরা নিয়ে যাসনি বাবা, ও হতভাগী অভিমান করে চলে যাচ্ছে। ওর বাবা ওর গয়না দিলে না, কতবার বলেছে—আমার বাড়ীতে পুজো হচ্ছে, কত লোক আসবে সেখানে, আমি ন্যাড়া বুঁচো হয়ে যেতে পারব না। এই তো কোথায় পড়ে রইলো তোর গয়না, কোথায় পড়ে রইলো তোর বাড়ী—ন্যাড়া বুঁচো হয়েই তো চলে যাচ্ছিস মা।'

বড় বৌ এলো আলতা আর সিঁদুর নিয়ে। সধবা মেয়ে। সিঁদুর পরিয়ে দেবে নির্মলার সিঁথিতে আর আলতা পরিয়ে দেবে পায়ে।

বৌ বসলো নির্মলার মাথার কাছে। কালো কালো একপিঠ চুল এলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেলে অশোক।

এবার আর অশোক সামলাতে পারলে না। দু'চোখ বেয়ে দর্ দর্ করে জল গড়িয়ে এলো।

বড় বৌ দেখতে পেলে অশোককে। নিজের মাথার কাপড়টা একটুখানি টেনে নিয়ে শাশুড়ীকে বললে, 'মা। ঠাকুরজামাই দাঁড়িয়ে আছে।'

মা উঠে বসলেন। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন অশোককে।

অশোককে দেখেই শোকের বেগ তাঁর দ্বিগুণ বেগে উথলে উঠলো।—'এখন আর কী দেখতে এলে বাবা?'

এই বলে তিনি এমন সব কথা বললেন, যা শুনে মনে হলো অশোক কেন এখানে আসেনি তা তিনি জানেন। কাঁদতে কাঁদতে ভবতোষ গাঙ্গুলীর উদ্দেশে অনেক অকথা কুকথা বলতে তিনি কসুর করলেন না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ভবতোষ মাতুলী কোথায় দিয়ে লুকিয়ে বসে রইলেন, একটি বারের জন্যও সেদিকে এলেন না।

অশোক বললে, 'নির্ম্মলাকে আমি আমার বাড়ীতে নিয়ে যাব।'

শাশুড়ী আপত্তি করলেন না। এখন আর আপত্তি করবার আছেই বা কি!

প্রতিমা বিসর্জ্জনের ব্যবস্থাটা আগেই করে দেবার জন্য রমেশ চলে এসেছিল।

পুরোহিত বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, মৃতদেহ আসবার আগেই প্রতিমা বের করে দাও।'

প্রতিমাও বেরুলো, ওদিকে রাস্তার ওপর হরিধ্বনি শোনা গেল। —'বল হরি হরিবোল!'

শোভনা ধীরা নীরা—সবাই দাঁড়িয়েছিল দোরের কাছে।

অশোক একেবারে তার নতুন বাড়ীর ভেতরে নিয়ে এলো নির্ম্মলাকে। নীরাকে বললে, 'বৌদিকে দেখতে চেয়েছিলে, ছাখো!'

শোভনা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছিল। ধীরা নীরাও চোখের জল রাখতে পারলে না।

মনে হচ্ছে নির্ম্মলা যেন ঘুমিয়ে আছে।

নদীতে প্রতিমা বিসর্জ্জন হলো। আর সেই একই নদীতীরের শ্মশানে নির্ম্মলাকে বিসর্জ্জন দিয়ে অশোক বাড়ী ফিরলো।

প্রতিমা আবার হয়ত আসবে।

কিন্তু নির্ম্মলা আর কখনও আসবে না।

বাপের ওপর অভিমান করে চলে গেল হতভাগী।

গ্রামের সবাই তার জয়-জয়কার করতে লাগলো। বলতে লাগলো—'সতীলক্ষ্মী মেয়ে নির্ম্মলা। মরতে হলে এমনি মরণই মরতে হয়!'

আবার অনেকে বলতে লাগলো—'হতভাগী মেয়ে স্বামীর সুখ কপালে সইলো না।'

ধীরা নীরাকে দেখেছে অনেকেই।

সবাই ভাবলে, 'বড়টাকে অশোক বিয়ে করবে নিশ্চয়ই।'

শুধু গ্রামের লোক কেন, ধীরা নীরাকে সঙ্গে নিয়ে অশোক যেদিন কলকাতায় ফিরে গেল, শোভনা সেদিন অশোককে ডেকে বললে, 'যা হবার তা তো হয়েই গেল। তুই তাহ'লে ধীরাকে বিয়ে কর। বড় ভাল মেয়ে।'

অশোক ম্লান একটুখানি হাসলে শুধু। হাঁ না কিছুই বললে না।

কেশববাবু শুনলেন। নীরার মাও শুনলে।

কথাটা এমন মর্ম্মান্তিক সত্য যে সহজে তা বিশ্বাস করা যায় না।—'বলিস কিরে? অশোকের স্ত্রী বিজয়ার দিন মারা গেল?'

ধীরা গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'কারও সর্ব্বনাশ কারও পৌষমাস।'

বলেই সে এমনভাবে ধীরার দিকে তাকালে যে, বুঝতে কারও বাকি রইলো না—সে কি বলতে চায়।

১৮০ বছরেরও বেশী ভারতের সেবায় নিযুক্ত মার্টিন বার্ন

ভারতবর্ষে মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী শিল্পপ্রয়াসের পরিমাপ বছরের হিসেবে না করে যুগের হিসেবে করাই সমীচীন। এই দীর্ঘকাল একাগ্র সাধনায় বিভিন্ন প্রকারের এঞ্জিনীয়ারিং ও আনুষঙ্গিক শিল্প উদ্যোগের সম্ভারসহায় মার্টিন বার্ন ভারতের শিল্পোন্নতি ত্বরান্বিত করেছে। মার্টিন বার্নের অন্তর্গত বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির একপ্রাণ সাফল্যের মূলে রয়েছে দূরদর্শিতা ও সংগঠন-নৈপুণ্য। নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান আজ অগ্রণী তো বটেই, তাদের কোন কোনটি গত শতাব্দীতেও ছিল সবার আগে। আজ তাই মার্টিন বার্ন প্রতিষ্ঠান পিছন দিকে তাকিয়ে শুধু যে অতীত কীর্তির জন্যই গর্ব বোধ করে তা নয়, আরও এগিয়ে যাবার প্রেরণাও পায়।

মার্টিন বার্ন গোষ্ঠীর অন্তর্গত শিল্প-প্রতিষ্ঠান :

দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানি লিমিটেড : কারখানা বার্নপুর ও হীরাপুর। বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৫৫ লক্ষ টন ইস্পাতের উৎপাদন হয়। হীরাপুরে কারবন্ধেসের সবচেয়ে বড় কারখানা। আধুনিক প্রথায় তৈরী। উৎপাদনক্ষমতা এই প্রতিষ্ঠানের গৌরব। বহু সহস্র কীর্তন।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—হাওড়া : ১৮৭৩ সালে। কলকাতার নিকট হাওড়ায়। ভারতের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন ধরনের ইস্পাত নির্মাণ ও সরবরাহে অগ্রণী। এছাড়া ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতি, রেলওয়ে ওয়াগন, ট্রাক্টর, ট্রাক্টর চালিত যন্ত্রপাতি, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি, কাগজ তৈরীর যন্ত্রপাতি, চা-বাগিচার যন্ত্রপাতি, কয়লা খনির যন্ত্রপাতি, ইস্পাত আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরী ও সরবরাহ করে।

বার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানি লিমিটেড : রিক্ল্যামেশন মিল্স : মার্টিন বার্ন-এর অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান—কলকাতায় হাওড়ার নিকটবর্তী শালকিয়ায় অবস্থিত। বিভিন্ন ধরনের লোহা, ইস্পাত—এমন কি, সোনালী রঙের ব্রোঞ্জের ধাতব রড এবং সেকশন তৈরী করাই কোম্পানির বিশেষত্ব।

দি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোম্পানি লিমিটেড, সাতনা : এখানে রেলওয়ে ওয়াগনই বিশেষ করে তৈরী হয়। বছরে এখানে ওয়াগনই বিশেষ বিভাগ তৈরী হয়ে থাকে। বর্তমানে এখানে ওয়াগন ছাড়া ট্রাক ও ট্রেলার তৈরীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দি হুগলি ডকিং অ্যাণ্ড এঞ্জিনীয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড : ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব বিখ্যাত ডক্স, যে কোন ইস্পাত নির্মিত যানবাহনকে জলে ভাসাবার ও মেরামতের ব্যবস্থা।

রবার্ট হাডসন (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড : ছোট ছোট ওয়াগন ও ওয়াগন ট্রাক্টর তৈরীর অন্যতম প্রতিষ্ঠান। বিশেষ ধরনের ট্রাক্টর ও ট্রেলারের ব্যবস্থা।

লাইট রেলওয়ে কোম্পানি : কলকাতায় মুখ্য যে কয়টি ট্রাম পরিচালনা করছে—তাদের অধিকাংশ ট্রাম ও ট্রেলার এই প্রতিষ্ঠানে তৈরী।

ইলেকট্রিক ল্যাম্প কোম্পানি : বিভিন্ন ধরনের ও প্রকারের অধিকাংশ বাতি এই প্রতিষ্ঠানে তৈরী হয়। ইহার ও আনুষঙ্গিক জিনিষ পত্রে বিদেশী উৎপাদন ও সরবরাহ বন্ধ করে।

দি ভ্যান্ বার্ন ট্রেক্স কোম্পানি লিঃ— ভারতবর্ষের ভূ-তত্ত্বের বিশেষজ্ঞদের নির্দেশিত ও নিয়ন্ত্রিত ওজনের ট্রাক্টর ট্রেক্স তৈরী করে। ওজনের ভুল হয় না।

মার্টিন বার্ন লিমিটেড কলিকাতা বোম্বাই বারাণসী পাটনা

MBC-21

বীরা সরে গেল। বীরার মা বললে, 'তাই কেন মা।'

বলেই সে তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি এবার একটু চেষ্টা কর। বল অশোককে।'

কেশবরাবু বললেন, 'না। এই সবে তার স্ত্রী মারা গেছে। এখন আমি কিছু বলতে পারব না।'

বলবার প্রয়োজনও হলো না।

কয়েকদিন পরেই একটা বড় অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল।

বাড়ী থেকে ফিরে এসে অবধি অশোক কেমন যেন উন্মনা হয়ে গেছে। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কারও সঙ্গে বড় একটা কথা বলে না। বোকানেও যায় না, নতুন বাড়ীতেও যায় না, কখন যে কোথায় থাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

নীরা বলে, 'দেখে শুনে মনে হচ্ছে—বৌকে ভালবাসতো অশোকদা।'

মা তাকে থামিয়ে দেয়। বলে, 'দিনরাত তোর অশোকদাকে নিয়ে তুই ওরকম করিস কেন বল্ তো?'

'বেশ করি—তোমার কি?' বলে নীরা চলে গেল।

নীরার মনের অবস্থা বোধকরি ভাল ছিল না। ভাল না থাকবার কারণটা আর কেউ না জানুক সে নিজে তো জানে!

চার পাঁচদিনেরও বেশি অশোকদা তার সঙ্গে ভাল করে কথা বলেনি। পরিহাসরসিকা নীরা—চলচঞ্চলা যুবতী নারী, তার ভরা যৌবনের অফুরান মাধুর্য্য নিয়ে এগিয়ে গেছে অশোকদার কাছে। আর কিছু প্রত্যাশা নয়, প্রত্যাশা শুধু একটুখানি মুখের হাসি, একটুখানি সদয় ব্যবহার, একটি রসমধুর মুহূর্ত্ত। কিন্তু অশোকদা শুকনো একটু হাসি হেসে চলে গেছে। প্রথমে মনে হয়েছে—সে বুঝি তার স্ত্রীর মৃত্যুর জন্য বিষণ্ণ—অপ্রত্যাশিত এই সকরুণ মৃত্যুর কথা বুঝি বা সে ভুলতে পারছে না। কিন্তু নারীর কাছে পুরুষের বুঝি রহস্যময় হয়ে থাকবার উপায় নেই। নীরা বুঝতে পেরেছে অশোকের এ ধ্যানমগ্ন তন্ময়তা তার স্ত্রীর জন্য নয়, এ যেন অন্য কিছু।

ক'দিনই সে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছে—স্নান করে এসে অশোক তার ঘরে ঢুকে চুপ করে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পুবদিকের বড় জানলাটার কাছে। সূর্য্যের দিকে তাকিয়ে সে হাতজোড় করে প্রণাম করছে তো করছেই।

নীরা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'হঠাৎ তোমার ঠাকুর দেবতার ওপর ভক্তি যেন একটু বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

অশোক তেমনি হাসি হেসে বেরিয়ে গেছে বাড়ী থেকে।

—'কিছু খেয়ে যাবে না অশোকদা?'

—'না। এসে খাব।'

আসার প্রতীক্ষায় বসে রইলো সবাই। কিন্তু অশোকের দেখা নেই।

সবাইকার খাওয়া হয়ে যাবার পর হরত'-বা এলো।

আবার কোনো কোনদিন হরত এলোই না।

এমনি ধারা চললো প্রায় মাস খানেক।

তারপর হঠাৎ একদিন অশোক বাড়ী ফিরলো না।

সারাদিন তাদের দুর্ভাবনার এক শেষ।

কেশববাবু শুনে বললেন, 'কোথাও কোনও বিপদ আপদ ঘটলো না তো?'

নীরাই জবাব দিলে। বললে, 'না। আজ না আসুক সে কাল আসবে।'

'তোকে কিছু বলে গেছে?'

'না।'

রাত্রিটা কোনোরকমে কাটলো। কিন্তু তার পরের দিন সকালেই সমাধান হয়ে গেল সব সমস্যার।

প্রতিবেশী ভুবন এটর্নী—যিনি অশোকের বাড়ীঘর দোকানের ব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি এলেন কেশববাবুর বাড়ীতে।

কেশববাবুর হাতে বন্ধ-করা একখানি খামের চিঠি দিয়ে প্রথমে বললেন, 'এইটে পড়ুন।'

চিঠিখানি পড়লেন কেশববাবু।

অশোকের চিঠি।

অশোক লিখেছে—

আমি কিছুদিনের জন্য তীর্থ ভ্রমণে চললাম। আমার কথা আপনারা ভাববেন না। যাবার আগে আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে গেলাম।

প্রথমেই আমার চৌরঙ্গীর দর্জির দোকানটি দিয়ে গেলাম আপনাদের দুই স্বামী-স্ত্রীকে। আমার বাড়ীটি দিয়ে গেলাম ধীরাকে আর নীরাকে। দলিল রেজেষ্ট্রি করে দিয়েছি। ভুবনবাবু আপনার হাতে পৌঁছে দেবে। আলাদা খামে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে গেলাম। দশ হাজার ধীরার। দশ হাজার নীরার।

ভাল জায়গায় ওদের বিয়ে দেবেন।

ভগবান আপনাদের মঙ্গল করুন! ইতি।

অশোক।

কেশববাবু ডাকলেন তাঁর স্ত্রীকে। চিঠিখানা দিলেন তাঁর হাতে।

দিয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। কোনও কথা বলতে পারছিলেন না।

কেশববাবুর স্ত্রী—জিজ্ঞাসা করলেন, 'দেশের বাড়ীটা অশোক বুঝি নিজের জন্যে রাখলে?'

ভুবনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে না। দেশের বাড়ী আর দশহাজার টাকা দিয়েছেন তাঁর বোন-ভগ্নীপতিকে।'

কুড়ি হাজার টাকার খাম খানি কেশববাবুর হাতে দিয়ে ভুবনবাবু বললেন, বাড়ীর দলিলটা রেজেষ্ট্রি হয়ে গেছে। যেদিন পাওয়া যাবে, আপনাকেই দিয়ে যাব।'

এই বলে তিনি চলে গেলেন।

নীরার মা বললে, 'সত্যিই অবাক্ করে দিলে অশোক। এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে!'

এতক্ষণ পরে কথা বললেন কেশববাবু। বললেন, 'আছে বলেই পৃথিবীটা এখনও বাসের অযোগ্য হয়নি।'

প্রথম বসন্ত

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ডিউটি শেষ হল রাত সাড়ে তিনটেয়। এবার ঘুমোবার পালা। যে টেবিলে বসে আমরা লিখেছি সেই টেবিলে বেয়ারা বিছানা পেতে দিয়েছে। পৃষ্ঠপোষক হিসেবে তোষক একখানা করে আছে। উপাধানকে উঁচু করে দিয়েছে খবরের কাগজের ফাইল। তবু রাত সাড়ে তিনটের এই শয্যাই ফুলশয্যা। অনেকক্ষণ ধরেই চোখ ঘুমে ঢুলু ঢুলু করছিল। এবার শুয়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই অতলে তলিয়ে যাব।

কিন্তু আমার প্রবীণ সহকর্মী শশীবাবু, শশীকুমুদ মুখুয্যে অত সহজে আমাকে তলিয়ে যেতে দিলেন না। তিনি আমাকে টেনে তুললেন। বললেন, আরে মশাই এখনই শুয়ে পড়ছেন কেন। বসুন বসুন। ঘুম পান করুন ঘুম কেটে যাবে।'

তিনি সিগারেট এগিয়ে দিলেন।

আমি সেটি নিয়ে নিদ্রালু চোখে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

দেশলাই জেলে তিনিই দুজনের মুখাগ্নি করলেন। তারপর বললেন, 'এখনই ঘুমুচ্ছেন কেন। সিফ্‌ট ইনচার্জ প্রেসে রয়েছেন। তাঁকে উঠে আসতে দিন। আপনাদের মত বয়সে গল্প করে তাস খেলে আমরা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। তারপর ভোরের হাওয়া খেতে খেতে কার্ট্রামে বাড়ি ফিরেছি। আর আপনি সেই সন্ধ্যা থেকে ঢুলছেন তো ঢুলছেনই। আধার নিদ্রা আর ঘুমকে যত বাড়াবেন ততই বাড়বে। কনট্রোল করুন মশাই কনট্রোল করুন।'

হেসে বললাম, 'কী করব বলুন। নিয়ন্ত্রণ আমার ধাতে নেই। আমি সব ব্যাপারেই অনিয়ন্ত্রিত। অসংযমী।'

শশীবাবু বললেন, 'খুব গর্ব হচ্ছে। পরে বুঝবেন মজা। আমার বয়সে এসে পৌঁছান তখন দেখবেন—'

বয়সটা একটু বেশিই দেখায় শশীবাবুর। এখন উনি ষাট না হলে উনষাট। রিটায়ার করবার পর একসটেনসন সার্ভিসে আছেন। কিন্তু জরা যেন ওঁর ঝুটি ধরে আরো কয়েক বছর সামনে টেনে নিয়ে এসেছে। মাথায় টাক, দাঁত একটিও নেই। গড়ুর নাসা ঠোঁটের ওপর অনধিকার প্রবেশ করেছে। দেহ বেশ জীর্ণ হয়েছে শশীবাবুর। তবু চাকরি ছাড়া উপায় নেই। পুত্র সন্তান হয়নি। মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। তারা স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে না হোক আপন আপন ছাঁদে ঘর সংসার করছে। বড় মেজো ছোট প্রত্যেক মেয়েই ডাকাডাকি করে 'তুমি চলে এসো বাবা। আমার কাছে এসে থাকো।'

শশীবাবু জবাব দেন, 'ঘরজামাই হওয়ার চান্স একবার জীবনে এসেছিল বইকি। এখন ঘর শ্বশুর হওয়া কি আর পোষাবে? তোদের মেয়েরা বড় হোক তাদের কোন একটি বিয়ে করে বরং জামাই আদরেই থাকব। সবুর করে থাকি কটা দিন। আশা করি তখন মেওয়া ফলবে।'

শশীবাবুর বিপত্নীক জীবন বহুকালের। প্রায় বিশ বছর হল। হরতুকি বাগান লেনের একতলায় বাড়িতে দুখানি ঘর নিয়ে একাই আছেন। ঠিক একা নয়। অফিসের বেয়ারা শ্যামলও ওঁর সঙ্গে থাকে। রান্না বান্না করে দেয়। সেবাশুশ্রূষাও দরকার হলে করে।

আমরা বলি, 'শশীবাবু আর চাকরি করছেন কেন? প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটি থেকে যা পেয়েছেন সব গুছিয়ে নিয়ে কাশী চলে যান।'

শশীবাবু বলেন, 'কাশী নয় মশাই, বৃন্দাবনে যাব। তবে কতীদল কার সঙ্গে করব তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। অমন জায়গায় একা যেতে পারবনা। গেলে চরিত্র ঠিক থাকবেনা।'

আমরা হেসে উঠি, 'এখনো কি ও বস্তু আছে শশীবাবু? এতকাল বিপত্নীক রইলেন উপলব্ধি কি অন্তত জনা খানেকও হয়নি?'

শশীবাবু জিভ কাটেন, 'ছি ছি ছি। শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। আমি সে ধাতের মানুষই নয় মশাই।'

এমন ভঙ্গিতে বলেন যে ওঁর ধাত চিনতে কারোরই দেরি হয় না।

'এই বয়সে আর কেন চাকরি করছেন?'

সহকর্মীদের এ প্রশ্নের জবাবে শশীবাবু বলেন, 'বাড়িতে একা একা মন টেঁকেনা মশাই। বসে থাকতে ভালো লাগেনা। তাছাড়া মাথার ওপরটা তো সাফ হয়েই গেছে ভিতরটাতেও শয়তান টীল প্লাণ্ট বসাক? 'তার চেয়ে এখানে আসি, আপনাদের দশ জনের সঙ্গে দেখা হয়, দুটো কথাবার্তা হয় বেশ লাগে। তাছাড়া হাত পা কোলে করে বসে থাকলে চলবেই বা কেন? পেটটি তো আছে।'

সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে শশীবাবু বললেন, 'আপনি তো গল্প লেখেন মশাই। আপনাকে একটি গল্প দিতে পারি। নেবেন!'

বুঝতে পারলাম আমার নেওয়ার গরজের চেয়ে ওঁর দেওয়ার গরজ বেশি।

হেসে বললাম, 'বলুন না। গল্পের মত গল্প হলে কে না শুনতে চায়?'

বিছানার ওপরে উঠে বসলেন শশীবাবু। জোড়াসনে বসলেন মেরুদণ্ড সোজা করে। দীর্ঘ চেহারা। ছ ফুটের কাছাকাছি। টানা চোখ, জোড়া ভ্রু, উজ্জ্বল রং। যৌবনে বেশ সুপুরুষই ছিলেন শশীবাবু। এখনকার এই ভগ্নাবশেষ দেখে সেই রূপসৌধ অনুমান করে নেওয়া যায়। আর মোহ মুদ্গরের কথা মনে পড়ে। জীবন পদ্মপত্রে নীর, আর যৌবন তার চেয়েও অস্থির। ভোগ করতে না করতেই সে চলে যায় শুধু স্মৃতিটুকু থাকে।

শশীবাবু বললেন, 'গল্পের মত গল্প কিনা জানি না। তবে আমার প্রথম জীবনের প্রথম প্রেমের গল্প। প্রেম ছাড়া গল্প হয় না একথা মানেন তো?'

বললাম, নিশ্চয়ই আদিরসই জীবনের আদ্যন্ত জুড়ে আছে। এবার গল্পটা বলুন শশীবাবু। না শুনলে ঘুম আসবেনা।'

শশীবাবু হেসে বললেন, 'কিন্তু শোবার আগেই আপনার ঘুম আসছে। শুনুন, ঘুমোবেন না। আমি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দেব। বড় গল্প নয়, আপনাদের আজকালকার উপন্যাসোপম গল্পও নয়, খাঁটি ছোট গল্প। এবার শুনুন। তখন আঠের উৎরে উনিশে পড়েছি। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে সবে কলেজে ঢুকেছি। একটু বেশি বয়সেই তখন লেখাপড়া হত।

বিশ্বাস করেন তো আমারও একদিন ওই বয়েস ছিল। আজ মাথা ভরে টাক কিন্তু সেদিন

কুঞ্চিত কেশদাম—। যাকগে নিজের রূপের বর্ণনা নিজের মুখে নাইবা দিলাম। অন্যের চোখের কথা বলি। আজকাল মেয়েরা আমার দিকে তাকায় না। মুখ ফিরিয়ে চলে যায়। সেদিন এর উল্টোটি ঘটত। তারা চিকের আড়ালে, ঘোমটার আড়ালে, জানলা দরজার আড়ালে থেকে অপলক হয়ে থাকত, আমি কারো দিকে ফিরেও তাকাতাম না। সে বয়সে দারুণ মর্যাদিষ্ট ছিলাম বলাই। তরুণ তাপস, ব্রহ্মচর্য কুমার, শুদ্ধসত্ত্বের দ্বিতীয় সংস্করণ। তখন ভারি কড়া ছিলাম, গোঁড়া ছিলাম, শৈথিল্য এসেছে অনেক পরে। কিন্তু আগের কথাই আজ বলি।

বাড়ির অবস্থা মোটামুটি ভালো। বাবা আছেন মাথার ওপরে। নিশ্চিন্তে বটগাছের ছায়ায় বাস করি। জোতজমি, তালুকদারি যেটুকু আছে তাতে প্রজারা রাজার মত সম্মান করে। এখন সেই রামও নেই, অযোধ্যাও নেই। ভুল বললাম। রাম আপনার সামনেই বসে আছেন। নিজের মুখে আপনাকে রামায়ণ শোনাচ্ছেন। উপায় কি। তাঁর কোন বাহাদুরি জোটেনি। রামের পিতৃদেব দশরথ অনেকদিন আগেই পরলোক গমন করেছেন। আর তাঁদের সেই নেহাৎকোণার অযোধ্যা এখন পরের দেশ, ফরেইন কানট্রি।

বড্ড ডাইগ্রেসন্ হচ্ছে না? আচ্ছা শুনুন রেলগাড়িকে ফের আবার লাইনে নিয়ে যাচ্ছি। ষ্টেশনে পৌঁছে দিতে আর দেরি হবে না।

পাশের গ্রামেই আমার মামাবাড়ি। সেখানে দুর্গাপুজো হয় না। বাসন্তী পুজো হয়। সেইটাই আসল দুর্গোৎসব। অকাল বোধন নয়, কালের বোধন। কিন্তু পুজো দেবার হয় কি না হয়। মামার খাইদিস। অবস্থা ভালো নয়, কলকাতা গেছেন, চিকিৎসা করেন। মামীমা সঙ্গে গেছেন। মামাত ভাইও সেখানে। শুধু দিদিমা আছেন বাড়িতে। কিন্তু পুজো করবার মত মনের অবস্থা তাঁর নেই। তবু বার্ষিক পুজো। নিয়ম লংঘন করবার তো উপায় নেই। বিশেষ করে এই অবস্থায়। দিদিমা বললেন, নমো নমো করে মায়ের চরণে দুশ বেলপাতা দাও তোমরা। তারপর মা যদি মুখ তুলে চান, আবার রতন ভালো হয়ে ফিরে আসে সামনের বারে ফের জাঁকজমক করে পুজো দেব।'

আমার মা অল্পবয়সেই মারা গিয়েছিলেন। বাবা সেবার পুজোয় থাকতে পারলেন না। মামীমার চিঠি পেয়ে তিনিও গোপনে কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। দিদিমাকে সে কথা আমরা জানালাম না। বললাম, মামলা মোকদ্দমার ব্যাপারে জেলা সহরে গেছেন।

পুজো ঠিকমত হয় কিনা, লোকজন ঠিকমত খায় কিনা সব দেখবার, বিধিব্যবস্থা করবার ভার আমার ওপর পড়ল। আমি আমার পিতৃকুলেরও প্রতিনিধি, মাতৃকুলেরও প্রতিনিধি। নায়েব গোমস্তরা অবশ্য ছিলেন কিন্তু আমিই সবাইর উপরে, সর্বেসর্বা।

তবু আমার মন খারাপ হয়ে গেল। একবারের জন্যে পুজোর ভার যদি বা পেলাম, এ যেন একেবারেই লুকিয়ে লুকিয়ে পুজো। আমাদের বাড়িতে, মামাবাড়িতে লক্ষ্মীপুজোতেও এর চেয়ে বেশি আনন্দ উৎসব হয়েছে। অন্যবারের মত এবার মামাবাড়ির বাসন্তী পুজোয় যাত্রা হল না, থিয়েটার হল না, ঢাক ঢোল তেমন করে বাজল না, খাওয়ানো দাওয়ানো নাম মাত্র হল। এ কেমন পুজো? কিন্তু দিদিমার হুকুম, এই রকমই হবে। অন্যরকম হবার উপায় নেই। দিদিমা বেশি বেরোন না, কারো সঙ্গে কথাও বলেন না। উপোস করে ইষ্ট দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন, 'রতন যেন ভালো হয়ে ফিরে আসে।'

তা সত্ত্বেও আমার তো সেই প্রথম বসন্ত, প্রথম বাসন্তী পুজো। দুঃখ বিপদের আশঙ্কার ছায়া মনে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারিনে। সেগুলি পড়ে আর সরে সরে যায়। মাথার ওপর কোন অভিভাবক নেই। সারাদিন হৈ-হৈ করে কাটাই। মামাদের বড় জিমিটায় পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটি। বড়মামার ঘোড়া পুষবার শখ ছিল। অনেকদিন সে ঘোড়ায় তিনি চড়তে পারেননি। আমি তাতে চড়ি। ছুটে চলে যাই গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আমিই বা কে আর পক্ষীরাজে চাপা রাজপুত্তুরই বা কে।

দিদিমা বকবক করতে থাকেন 'সর্বনাশ করবি, সর্বনাশ করবি। ওই ঘোড়া থেকে পড়েই তো আমার রতনের মুখে প্রথম রক্ত উঠেছিল।'

কিন্তু মামার মুখে রক্ত উঠেছিল বলে কি তাঁর ভাগ্নে ঘোড়ায় উঠবে না? ভাগ্নের রক্ত তো শুধু মুখে নয়, তার বুকের মধ্যে টগবগ টগবগ করছে। সে শোণিত শিরায় শিরায় স্রোতস্বতী। আমি শুধু কলেজের পড়ুয়া ছেলে নই। আমি লাঠি চালাতে পারি, বর্শা চালাতে জানি। বন্দুক চালানোও শিখেছি। আমার তখন ইচ্ছে শত্রুপুরী আক্রমণ করে বাহুবলে রাজকন্যাকে তুলে নিই, বসিয়ে দিই আমার ঘোড়ার ওপর। তারপর উধাও হয়ে যাই দেশ দেশান্তরে। দিন নেই রাত নেই, বাদল নেই বর্ষা নেই ঘোড়া ছুটছে ছুটছে ছুটছে। মানুষ নেই জন নেই, গাছ নেই পাখর নেই মরুভূমির ওপর দিয়ে আমি ছুটছি ছুটছি ছুটছি। সামনে পিছনে পুবে পশ্চিমে কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। আছি শুধু আমি, আমার অশ্বিনী, আর আমার বক্ষলগ্না পরম প্রিয়তমা চিরসোহাগিনী, অনঙ্গনা অলোক সামান্যা বিদ্যুৎ সৌদামিনী।

কেশ প্রসাধনে
রূপ হয় রমণীয়

ক্যান্থারাইডিন হেয়ার অয়েলে ক্যান্থারিস মেশানো থাকায় এই কেশ তৈল চুলের গোড়া সতেজ ও পরিপুষ্ট রাখে, কেশগুচ্ছকে ঘন, সুদীর্ঘ ও সমুজ্জ্বল করে তোলে এবং চুল ওঠা বন্ধ করে।

বেঙ্গল
কেমিক্যালের
ক্যান্থারাইডিন
হেয়ার অয়েল

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

এই ছিল কল্পনা। দিদিমার মুখে শোনা সেই গল্প, সেই রূপকথার রূপ ওই বয়সে এলেও আমার চোখ থেকে তখনো মুছে যায়নি। সেই রাজকন্যাকে আমি শুধু স্বপ্নে নয় বাস্তবেও দেখেছি। মাত্র কয়েকখানা বাড়ি পুবে মামারই জ্ঞাতি রুদ্রেশ্বর রায়ের মেজো মেয়ে মঞ্জরী। এমন মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিনি। আপনাকে বলছি জীবনে বিয়ের আগে বিয়ের পরে অনেক মেয়েকেই দেখেছি, বিয়ে করেও দেখেছি আমার স্ত্রী মোটামুটি সুন্দরীই ছিলেন কিন্তু মঞ্জরীর মত অমন কাউকে আর দেখিনি। জ্ঞাতি সম্পর্কে রুদ্রেশ্বরও তো আমার মামা। যাতায়াত ছিল। পারিবারিক যোগাযোগ ছিল। অল্পবয়েস থেকেই মঞ্জুকে দেখেছি কিন্তু এবার এসে দেখলাম সে একেবারে ষোড়শী ভুবনেশ্বরী। সে এত কাছে ছিল সে যেন অনেক দূরে চলে গেছে। হাসি দিয়ে কথা দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে আমাকে সে মুহুর্মুহু টানছে। আমি খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আর পারছিনে। এই মুহূর্তে যে অতিদূরবর্তিনী পরমুহূর্তে সে সুদূরবর্তিনী। বড় বাঁধানো রাস্তার সামনেই তাদের দোতলা পাকা বাড়ি। আমি সেই বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ খুব ভোরে উঠে ঘোড়া ছুটিয়ে যাই। আবার রোদ উঠতে না উঠতে ঘামে ভিজতে ভিজতে ফিরে আসি। একটু দূর থেকে মঞ্জু চেয়ে চেয়ে দেখে আর মিষ্টি করে হাসে। কখনো আবদার করে না 'আমাকে নিয়ে যাও। আমিও তোমার ঘোড়ায় উঠব।' কিন্তু ওই হাসির মানে কী, অমন করে তাকাবার মানে কী। ছাদে উঠে অনেকক্ষণ ধরে সেই দুরন্ত রক্তবর্ণ ঘোড়া আর তার সৌরবর্ণ সওয়ারের দিকে অমন অপলকে তাকিয়ে থাকবার মানে কী। আমি আমি যতক্ষণ না সেই সওয়ার সবুজবর্ণ দিগন্তের আড়ালে চলে যায় ততক্ষণ সেই দূরে আলতার রঙের মেয়ে তাদের সেই ছাদ থেকে নেমে আসে না। ঘোড়সওয়ার মাঠ পেরিয়ে বিলের ধারে আসে আর সেই দীর্ঘ বিলের চারদিকে ঘুরপাক খায়। আর ভাবে ঘোড়ার পিঠে ওই মর্মর মূর্তিটিকে তুলে আনতে পারলে কী সুন্দরই না মানাত। এই বিল তখন হত মানস সরোবর। একটি সোনার শতদল রাঙা আলো করে ফুটে থাকত।

রাত্রে আমি আর জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার আর এক মামাত ভাই বীরেশ্বর একঘরে থাকতাম, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে তাস খেলতাম, শেষ রাত অবধি গল্প করতাম। ওই মঞ্জরীর গল্প। মঞ্জরী শুধু রূপবতীই নয়, অনেক গুণবতী মেয়ে। স্কুল কলেজে না পড়লেও বাড়িতে মাষ্টার রেখে ওর বাবা ওকে ইংরেজী শিখিয়েছেন, সংস্কৃত শিখিয়েছেন। আর বাংলা তো ওর মাতৃভাষা। সে ভাষা, মঞ্জু কথা বলে শুধু সেই জন্যেই যেন তার অর্থগৌরব অনেক গুণ বেড়ে গেছে। অনেক ভালো ভালো ঘর থেকে সম্বন্ধ আসছে মঞ্জুর। বড় বড় জমিদাররা ওকে বউমা বলে ডাকবার জন্যে ব্যাকুল। অনেক বিলাত ফেরত আই-সি-এস ডাক্তার ইঞ্জিনিয়াররা ওদের বাড়িতে ঘটক পাঠিয়েছে। আমি সামান্য তালুকদার পুত্র। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে। আমার কোন আশাই নেই। কিন্তু মন কি আর সে কথা মানে?

বীরু আমার মনের কথা জানতে পেরে বলে, 'কেন বামুন হয়ে মিছিমিছি চাঁদে হাত দিতে চাইছিস। তুই ওকে ছুঁতেও পারবিনে। ওদের ভারি দেমাক। মরবে মাটিতে পা পড়ে না। আর রুদ্রেশ্বর দেখতে তালুকের মত ভিতরে ভিতরে বাঘ। ওদিকে হাত বাড়ালেই খবরদার। বাবা খেয়ে মরবি।'

আমি বলি, 'ছুঁতে পারব না এমন কি কথা আছে।' আগে কি ছুঁইনি? ছেলেবেলায় কত চুল ধরে টেনেছি গাল ধরে টেনেছি।'

বীরু বলে, 'আরে তখনকার ছোঁয়ায় আর এখনকার ছোঁয়ায় তফাৎ আছে। তখন ছিল মাটির দীপ, এখন বিদ্যুৎ। হাত দিবি আর সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে ছাই হয়ে যাবে।'

বললাম, 'দেখা যাক।'

বাজি রাখলাম বীরুর সঙ্গে। একশ টাকার বাজি।

কিন্তু ষষ্ঠী গেল, সপ্তমী গেল, অষ্টমী গেল। বাজিতে আমার হার সুনিশ্চিত। ঘোড়াই দাবড়াই আর যাই করি ওর ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারি নে। ওবাড়ি থেকে ওরা একাড়ি আসে! পুজো দেখে, প্রতিমা দেখে কখন যে চলে যায় টেরও পাইনে। চোখ খুলে চোখ বন্ধ করে আমি শুধু একটি প্রতিমা দেখি। দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবাইর মুখে আমি শুধু একখানি মুখ দেখতে পাই। কিন্তু সে মুখকে একেবারে মুখোমুখী পাইনে, সে মুখ আমার সম্মুখে আসে না। তাই বলে সে মুখ যে একেবারে বিমুখ একথা ভাবতে পারিনে। তার দুটি চোখের দুই আমি তো দেখেছি।

তারপর সেদিন নবমীর রাত্রে ও বাড়ির মেয়েরা এ বাড়িতে এলেন নিমন্ত্রণ খেতে। মধুর মা আসেননি, বাবা দুপুর বেলায় এসে চলে গেছেন। মধু এসেছে তার দুই পিসির সঙ্গে। পরিবেশন করবার যে সোক ছিল তিনদিন ধরে খেটে খেটে সে শুয়ে পড়েছে।

আমি বললাম, 'দিদিমা আমি ওদের পরিবেশন করব।'

দিদিমা বললেন, 'ওরা, তুই পারবি নাকি। ও সব মেয়েলি কাজ তুই পারিস? কদিন ধরে তুই তো কেবল ঘোড়ার পিঠে পিঠেই আছিস।'

বললাম, 'দেখই না পারি কি না।'

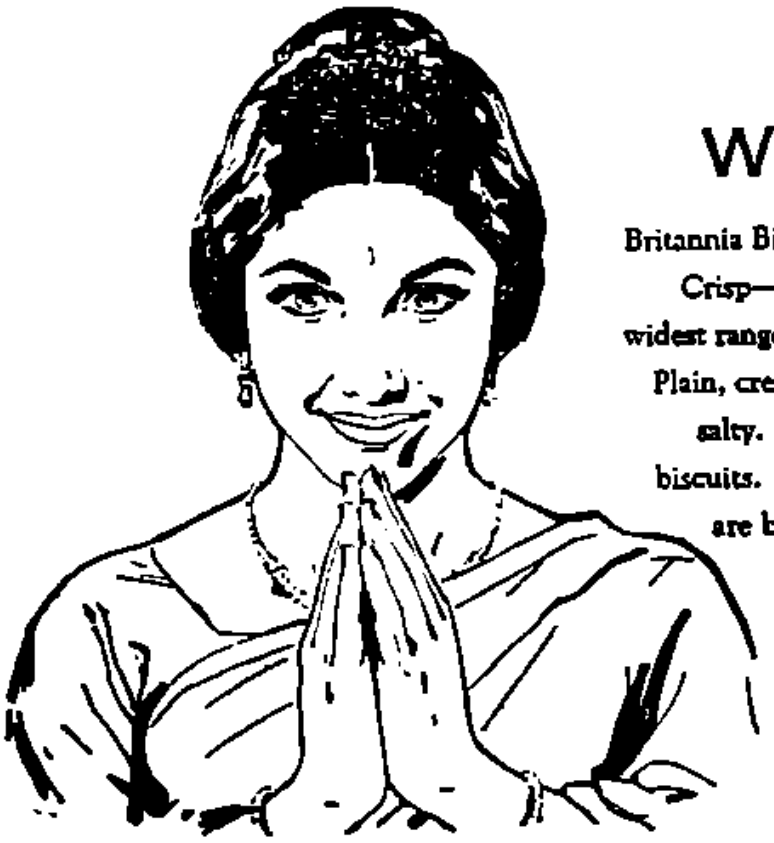

WELCOME!

Britannia Biscuits are always welcome.
Crisp—delicious—oven-fresh and in the widest range of varieties made in India.
Plain, cream filled, sweet, spicy or salty. All delicious and all high quality biscuits. That's why Britannia Biscuits are better biscuits—always welcome.

BRITANNIA
BISCUITS

মহুর দুই পিসি কিছুতেই খেলেন না। এক পিসি বিধবা। আর এক পিসি পেট রোগা। তারা প্রতিমা দেখতে চলে গেলেন। মহু আর প্রায় ওই বয়সী আর একটি মেয়ে বড় একখানা ঘরের মধ্যে। পাশাপাশি খেতে বসল। দিদিমা একটু দূরে বসে দেখাশোনা করতে লাগলেন। ছেলে বললেন 'আমার মাতির বড় শখ হয়েছে তোমাদের নিজের হাতে খাওয়াবে।'

উঠোন থেকে একজন লোক এগিয়ে এগিয়ে দিতে লাগল আর আমি ওদের পাতে সে সব তুলে দিতে লাগলাম। লুচি পোলাও মাংস মিষ্টি দই উপকরণের কিছুই অভাব নেই। কিন্তু মহু যেন কিছু খেতেই জানে না। কিন্তু থাক আর না থাক আমি সব ওর পাতে তুলে দিতে লাগলাম। পৃথিবীর সব খাদ্য যেন ওই একখানি ছোট পাতে ধরে দিতে পারলে আমার আশা মেটে।

মহু বলল, 'কী করছ তুমি শশীদা। এত যে দিচ্ছ খাবে কে?'

এতগুলি কথা এক সঙ্গে এবার আর মহু বলেনি।

বললাম, 'কেন তুমি খাবে।'

'আমি কি রাক্ষুসী?'

গলা নামিয়ে বললাম, 'তুমি অপ্সরী, তুমি উর্বশী। যা দিচ্ছি সবই দেবভোগ্য অমৃত, তুমি খাও। আমি দেখি।'

মহুর মুখ লাল হয়ে উঠল। তার পাশে যে বসেছিল সে তো আর বধিরা নয়! সে সবই শুনছিল। আর পাতের ওপর ঝুঁকে পড়ে খাওয়ার ছলে মুখ টিপে টিপে হাসছিল।

তারই এক ফাঁকে মহু বলল, 'শাড়ি পরে এলে না কেন?'

বললাম, 'ধুতি, টাইজার, হাফ প্যান্ট সব পরেই তো দেখলাম, শাড়িও পরতে পারতাম।'

মহু অস্ফুট স্বরে বলল, 'অসভ্য!'

এই সভ্য দুনিয়ার ওই কথাটি কারো কারো মুখে কী যে সুখের শোনায় আপনি নিশ্চয়ই জানেন। ওই একটি গালাগাল শুনে আমার দুটি কান মহুতে ভরে গেল।

খাওয়ার পরে আঁচাবার পালা।

মহু বলল, 'আঁচাব কোথায়?'

দিদিমা বললেন, 'কেন, দরদালানে বালতিতে জল তোলা আছে। শশী, ঘটিতে করে ওর হাতে ঢেলে দে।'

দুই সখী আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল। আমি জল ঢালতে গিয়ে বললাম, 'এ জল কিন্তু বাসি জল। টাটকা জলে মুখ ধোবে তো বলো কুয়ো থেকে তুলে দিচ্ছি। নতুন কাটা হয়েছে কুয়ো। এমন খাটিকের মত জল কিন্তু আর কোথাও পাবে না।'

মহু বলল, 'দরকার নেই আমাদের খাটিক জলে। আমরা এখানেই হাত মুখ ধুয়ে নিতে পারব। তুমি যাও কুয়োর কাছে।'

কাছে কথাটার মধ্যে কিসের যেন একটু আহ্বান ছিল। আমি চলে গেলাম।

ভিতরের বাড়ির এই উঠোন তখন অন্ধকার। লোকজন সব পুজো বাড়িতে। সেখানে বাজনা বাজছে, আরতি আরম্ভ হয়েছে।

উঠোন শুধু অন্ধকারও নয়, পিছলও। দুদিন খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। আকাশে এখনও মেঘ আমি কিন্তু তার আড়ালে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পাচ্ছিলাম।

কুয়োর ধারে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জল তোলার ঘড়ি বালতি সবই আছে। কিন্তু ছুলাম না। এঁটো হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক একটি মিনিটকে এক একটি যুগ বলে মনে হতে লাগল। ও কি আসবে, না কি আসবে না? আমি কি ভুল বুঝেছি? দু'পা চার পা করে বাগানের দিকে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ শুনতে পেলাম, 'বাব্বা, কী অন্ধকার!'

খুব মৃদু আওয়াজ। কোমল আর মিষ্টি! ওই সুর কি আর চিনতে ভুল হয়!

আমি আলো দেখতে পেলাম।

খুব আস্তে বললাম, 'এদিকে এদিকে।' দাঁড়িয়ে রইলাম না। ওকে এগিয়ে আনতে গেলাম। কিন্তু কয়েক পা এগোতে না এগোতেই পা পিছলে একটি নারীদেহ আমার একেবারে বুকের ওপর পড়ে গেল।

আমি এর জন্যে তৈরি ছিলাম না। কোন রকমে টাল সামলে নিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম। তারপর এতক্ষণ ধরে যাকে খাইয়েছি তার সেই এঁটো মুখ দুটি ঠোঁট দিয়ে সুন্দর করে মুছে দিলাম।

সে কোন আপত্তি করল না। শুধু তার শ্বাস প্রশ্বাস জোরে জোরে বইতে লাগল। শুধু কি তাই?

তারপর অবশ্য কুয়োর জলের দরকার হয়েছিল। কিন্তু সে জল বাদলা।

বীরুকে একথা বলায় সে বিশ্বাস করেনি, টাকাও দেয়নি। কিন্তু একশ টাকার ওপর আর আমার কোন লোভ ছিল না। আমি লক্ষ্মীরা পেয়েছি।

বিয়ে আমাদের হয়নি। হবে না তা জানতাম। নানা বাধা ছিল। আত্মীয়তার বাধা, আবার শত্রুতার বাধা। বাবার সঙ্গে কুঞ্জেশ্বর রায়ের বনিবনা ছিল না। জমিজমা নিয়ে দুজনার নথর দেওয়ানী ফৌজদারী সারা বছরই লেগে থাকত।

আমাদের চেয়ে অনেক বড় ঘরেই মঞ্জুর বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু সুখী হয়নি। সেকালের বড় ঘরে বড় বড় যে সব অভিশাপ থাকত মঞ্জুর কপালেও তাই ঘুটেছিল। একটি ছেলে রেখে অকালেই সে মারা গেছে।

আজ সেই ছেলেটি আমার কাছে এসেছিল। এখন আর ছেলে নয়। পূর্ণ যুবক। দিব্য কান্তি। বিলেত ঘুরে এসেছে। ভালো সরকারি চাকরি করে। মায়ের নামে টি. বি. হাসপাতালে একটি বেড খুলতে চায়। আমার মায়ের মত মঞ্জুও টি. বিতে মারা যায়। নিন এবার আপনি শুয়ে পড়ুন, ঘুমোন। আমার আজ আর ঘুম হবে না। আর কতটুকু রাতই বা আছে।"

———

মাউণ্ট এভারেষ্ট

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

(১)

আমি তখন সবে নতুন এই এলাকায় এসেছি। জায়গাও নতুন, লোকজনও নতুন। তাই খানিকটা পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছেন এখানকার স্থানীয় সমাজসেবী শ্রীযুক্ত ডিঙ্গেলাইয়া। ডিঙ্গেলাইয়া বাস্তবাগীশ লোক। সব সময়েই তাঁর ঠাসা কাজ। তবু আমাকে সঙ্গ দিচ্ছেন নতুন লোক বলেই।

দুপুরের খাওয়ার পর নদীর ধারে এসে দাঁড়াতেই শ্রীযুক্ত ডিঙ্গেলাইয়া এসে দাঁড়ালেন আমার পাশে। আমার মুখের পানে চেয়ে আপ্যায়িতের হাসি হেসে বললেন—মাউণ্ট এভারেষ্ট দেখবেন?—ওই দেখুন। ল্যান্ডস্কেপের অনেক দ্রষ্টব্যের মধ্যে ওটীও একটী। বলে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন নদীর ওপরে।

ভাবলাম ভদ্রলোক কি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন? তাই সেই রকম হাল্কা হাসি হেসে কথাটাকে উড়িয়ে দেবার ভান করেই বললাম—এই দুপুরের রোদে নদী আর সমুদ্রের সঙ্গমটা অদ্ভুত সুন্দর দেখায়—না?

আমরা যে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছি সেটা হল নেত্রাবতীর পাড়। দক্ষিণ কানাড়া জেলায় বয়ঃবাহিনী প্রধানধারা নেত্রাবতী। সুনীল, স্বচ্ছ তার জল। এত স্বচ্ছ যে অনেক গভীরে যখন কাঠবেরালী মাছেরা ঝাঁক বেঁধে যায় তখন প্রত্যেকটীকে চিনে নেওয়া যায় ওপর থেকে। দুপুরের রোদে বিরাট এক খণ্ড বোতল-রং কাঁচের মতো ঝক ঝক করছে নেত্রাবতী। এর এই অনন্ত শ্যামলা রূপটী আমাকে আকর্ষণ করেছে ভীষণ ভাবে। তাই প্রত্যেক দুপুরে খাওয়ার পর আমি এসে দাঁড়াই এই পাড়টাতে।

দু' ফার্লং দূরে ডানদিকে অগুন্তি টালিখোলা আর বাজারের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে গুরুপুর আলিঙ্গন করেছে নেত্রাবতীকে। গুরুপুরের জল ঈষৎ ঘোলাটে। তা ছাড়া সে নেত্রাবতীর মতো এতোটা শান্তও নয়, বেশ একটু চঞ্চল, একটু রুক্ষভাব। ডিঙ্গেলাইয়া বলেন—তা মেয়ে পুরুষে একটু তফাৎ তো থাকবেই মশাই। তারপর দুজনে এক হয়ে গিয়ে মিশেছে আরব সাগরে—পাঁচশ গজের মধ্যেই। এই পাড়ে দাঁড়িয়ে সবটাই এক নজরে দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্র যেখানে নেত্রাবতীকে পেয়ে কেনিল উল্লাসে অধীর হয়ে উঠেছে সে জায়গাটা চোখে পড়ে সরাসরি। সেই সময় বেশার চোখ মেলে খানিকটা চুপ করেছিলাম। ডিঙ্গেলাইয়া বললেন—আমি কিন্তু পরিহাস করছি না মশাই। সত্যি সত্যি মাউণ্ট এভারেষ্টই আপনাকে দেখাচ্ছে।

হাসিমুখে শুধু জিজ্ঞাসা করলাম—কি রকম?

ডিঙ্গেলাইয়া বললেন—ঐ সামনে দেখুন, নদীর ওপর।

নদীর ওপরটা দেখাচ্ছে যেন একটা ক্যানভাসে আঁকা ছবি। ঝকঝকে স্বচ্ছ নীল পটভূমি। তারই ওপর দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো জেলেডিঙি। এখানে, ওখানে, সেখানে। ডিঙিগুলোর ওপর

বসে আছে একটা করে মানুষ। তাদের প্রত্যেকেরই মাথায় নারকেল কি তালপাতার মাথাল। ডিঙিগুলো নড়ছে বলে মনে হয় না। নদীর বুক, ডিঙি নৌকো, তার ওপর মাথাল মাথায় মানুষ—এসব মিলিয়ে মনে হচ্ছে একটা স্থির চিত্রপট। লোকগুলো ডিঙির মধ্যে বসে আছে জলে বঁড়শি ফেলে। কখনই কারুর বঁড়শিতে মাছ টোপ গিলবে তখনই বোঝা যাবে যে লোকটা জীবন্ত। না হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপচাপ ডিঙির ওপর ভাসতেই থাকবে ওরা। ওদেরই মধ্যে একজনকে দেখিয়ে দিলেন ডিঙ্গেলাইয়া। লোকটা খুব কাছেই ছিল, তাই অল্পবিস্তর নজর পড়ল তার ওপর। দেখলাম তার মাথায় মাথাল নেই। সেই জায়গায় রয়েছে একটা ব্রাউন পেপারের গান্ধার টুপীর মতো চোঙা উঁচু টুপী। অথচ তাতে ফেল্টের চওড়া কানা।

বললাম—অদ্ভুত তো, এরকম টুপী তো কাউকে মাথায় পরতে দেখিনা এদেশে।

ডিঙ্গেলাইয়া বললেন—ঐ টুপীর ছুঁড়ো থেকেই তো আমরা মাউন্ট এভারেষ্টকে চিনতে পারি। আপনাকেও চিনিয়ে দিলাম। নদীর মাছ যদি খেতে চান তো ওকে বলে রাখবেন। আমিতো জানি আপনারা বাঙালীরা সমুদ্রের মাছ খুব বেশী পছন্দ করেন না।

বললাম—শুধু ওকেই বা বলতে গেলাম কেন? ওই তো কতলোক মাছ ধরছে, সবার কাছেই তো মাছ পাওয়া যাবে।

ডিঙ্গেলাইয়া বললেন—সব দিন না। যেদিন কারুর বঁড়শীতে মাছ উঠবে না, সেদিন এভারেষ্টের বঁড়শী মাছ মারবেই। বিখ্যাত বর্শেল মাউন্ট এভারেষ্ট। ওর বঁড়শী মাছ আনে।

ডিঙ্গেলাইয়া নিজেই হলেন জেলে সম্প্রদায়ের লোক। সবার বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ান সমাজ সেবার কাজে। কাজে কাজেই যে সমস্ত লোক মাছ মেরে খায়, তাদের নাড়ী নক্ষত্র ওর জানা।

বললাম—ও যদি এতো ভাল বর্শেল তবে সমুদ্রে যায় না কেন মাছ মারতে? নদীতে মাছ মেরে পেট ভরে কি?

ডিঙ্গেলাইয়া বললেন—নাঃ, পেট ওর ভরে না। তাছাড়া পেট তো ওর এক আধটা নয় প্রায় সোটা পাঁচেক। যদিও সেগুলো সবই পরের পেট, তবুও—

একটু থেমে কি একটা কথা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন ডিঙ্গেলাইয়া। তারপর থেমে থেমে বললেন—এক সময়ে যদিও ওর রোজগার যথেষ্টই ছিল এখন ও সত্যিই বড় গরীব। ওর ওই ডিঙ্গী নৌকোটার ইতিহাস বোধহয় জানেন না?

বললাম—কি করে জানব?

ডিঙ্গেলাইয়া বলতে লাগলেন—এখানকার এই সমস্ত ডিঙ্গী নৌকো তৈরী হয় এক একটা আস্ত গাছের গুঁড়ির ভিতরটা খোদাই করে। একটা ডিঙ্গী নৌকো তৈরী করবার জন্যে এভারেষ্ট গিয়েছিল মহাজনের কাছে টাকা চাইতে। সেতো ওকে দূর দূর করে খেদিয়ে দিলে। ওর না আছে চাল, না আছে চুলো। তাছাড়া বলতে গেলে তখন ও এদেশে সবে নতুনই এসেছে—যদিও আসলে ও এখানকারই ছেলে। আমি ওর বাপ-ঠাকুর্দাকে ভালভাবেই চিনতুম। কিন্তু বহুদিন বিদেশে থাকার জন্যে ও এখানে খুব বেশী পাত্তা পায়নি। তাই কোন নৌকোওয়ালাও ওকে নৌকোতে কাজ দিতে চাইত না। তাছাড়া ও জাতে জেলে হলেও ধর্ম পালটেছে। খৃষ্টান হয়েছে। তাতেই হয়েছে বিপদ। তাই আমাদের সম্প্রদায়ের কেউই ওকে কোন সাহায্য করবে না। আমিও প্রথমটায় ওকে খুব আমল

দিইনি। সেবার ঘোর বর্ষায় নেত্রাবতীর বন্যা চলে, আমাদের বাড়ীঘর সব ভেসে গেল। আমরা পাড়া ছেড়ে ওপরের দিকে উঠে গেলাম জান বাঁচাতে। আমি তখন এই অঞ্চলে রিলিফের কাজ করছিলাম। গৃহস্থদের গরু, ঘোড়া, ছেলে, বৌ, আসবাবপত্র সব ওপরে উঠিয়ে আনবার কাজে সাহায্য করছিলাম। রাস্তা পর্যন্ত তখন এক বুক জল হয়ে গিয়েছিল। নদীর তীরের ঝুঁড়েগুলো সব ভেঙে গিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে দেখেছিলাম এডারেষ্ট-এর আসল চেহারা। সেই এক বুক জলে সাঁতার কাটতে কাটতে প্রত্যেকটি ঝুঁড়ে থেকে জিনিষপত্র উদ্ধার করে এনেছিল এডারেষ্ট। সত্যি বলতে কি আমি অবাক হয়েছিলাম ওর কাজ দেখে। যারা ওকে খৃষ্টান বলে একদিন ঘেন্না করেছিল, তাদেরই ধনসম্পত্তি ও উদ্ধার করে এনেছিল ভাঙ্গণ বন্যার জলের থেকে। তার পরের দিন থেকে ওর পাত্তা পাইনি। বন্যার চল নামল আরও বেশী। সব এলাকাটা জুড়ে থৈ থৈ করতে লাগল জল। আমিও খুব বেশী খেয়াল করিনি। তিনদিন পরে জল কমলে গেলাম নেত্রাবতীর পাড়ে। দেখি ওই কোণের ঐ বুড়ো বটগাছটার নীচে আটকে আছে একটা মাঝারি রকমের গাছের গুঁড়ি। নৌকো নিয়ে কাছে গিয়ে দেখলুম সেই গুঁড়িটা একটা কাছি দিয়ে বটগাছের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে তার উপর চড়ে বসে আছে মাইক এডারেষ্ট। বললুম—একি, তুই সহরে যাস নি ?

ও চিঁচিঁ করে জবাব দিলে—আজ জল নামলে যাব ভাবছিলুম।

পরপর ক'দিন উপোষ দিয়ে ওর গলা বসে গিয়েছিল।

বললাম—এই গুঁড়ি পেলি কোথায় ?

ও কথা না বলে শুধু আঙুল বাড়িয়ে আকাশের দিকে দেখিয়ে দিলে। সেই গুঁড়ি পরে ও নিজের হাতে খোদাই করে ডিঙ্গী বানিয়ে ফেললে। মাইক সৎকর্ম-বিষয়ের। কাউকেই ওর গ্রাহ্য নেই। সেই থেকে ও ওই নদীতে মাছ মারে ওই ডিঙ্গী নৌকোয় চড়ে। এক কথায় বলা যায়—ও আমাদের সমস্ত জেলে সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মূর্তিমান চ্যালেঞ্জ। ওকে আমি সরাসরি সাহায্য কিছু করতে পারি না, তাহলে আমার জাতভাইরাই আমার শত্রু হবে। তবে ওর বুকের পাটার তারিফ করি আমি। ওর ওপর আমার পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

বললাম—আপনি নিজে একজন সমাজসেবী। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিটীর ওপর সহানুভূতি থাকা খুবই স্বাভাবিক—

ডিসেলাইয়া আমাকে বাধা দিলেন। বললেন—না, না, সে সহানুভূতি নয়—তারপর একটু থেমে কি একটু চিন্তা করে পরে বললেন—একে সহানুভূতি না বলে বরঞ্চ শ্রদ্ধা বলাই ভাল। হাঁা, মনে মনে আমি ওকে শ্রদ্ধাই করি।

বিস্ময়ের সুরে বললাম—সেকি! এতবড় লোক ঐ মাইক এডারেষ্ট!

ডিসেলাইয়া বললেন—না, না, বড়লোক ও মোটেই নয়। আমি শ্রদ্ধা করি—ওর বুকের পাটাকে। বুকের পাটা না থাকলে বাঁধা চাকরী, আরামের সহরে জীবন সব ছেড়ে এসে এখানে যুদ্ধ করে কেউ বেঁচে থাকতে পারে! তার ওপর আছে ধর্ম ত্যাগ করার জন্যে—আত্মীয় স্বজনের বিদ্রূপ ও বিরূপতা। না মশাই, আমার নিজের ওর মতো বুকের পাটা নেই তা আমি খোলা গলায় স্বীকার করি।

জিজ্ঞাসা করলাম—তা ও বাপ-ঠাকুর্দার ধর্ম ছাড়তে গেল কেন? কোন পাদ্রীর পাল্লায় পড়েছিল বুঝি। কথায় বোঁকায় পড়ে—

ডিসেলাইয়া গম্ভীর মুখে বললেন—কথার ধোঁকায় ভোলবার পাত্র ও নয়। বলে পায়ের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে মাটীতে আঁকিবুকি কাটতে কাটতে, সেদিকে নজর রেখেই বললেন—একটা খৃষ্টান মেয়েকে বিয়ে করেছে।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল। মুখ দিয়ে বার হয়ে এল—ওঃ তাই বলুন। সেই আদি ও অকৃত্রিম প্রেম ঘটিত ব্যাপার। যার পাল্লায় পড়ে বহুলোক জাত-কুল, ধর্ম বিসর্জন দিয়েছে।

ডিসেলাইয়া আমার মুখের দিকে দু' চোখ মেলে তাকালেন। দেখলাম তাঁর চোখ দুটো চশমার মধ্যে যেন ঈষৎ বেদনার্ত্ত হয়ে উঠল মুহূর্ত্তের মধ্যে। বললেন—না, সেদিক থেকে বিচার করলে আপনি ওকে ভুল বুঝবেন।

এমন সময় একটী লোক এল সাইকেল চেপে। সাইকেল থেকে নেমে ডিসেলাইয়াকে নমস্কার করে হাতে একখানা চিঠি দিল। ডিসেলাইয়া চিঠিখানা খুলে তাতে চোখ বুলিয়ে নিলেন—আইয়ে, আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে ভুলেই গিয়েছি আড়াইটের সময় এাপয়েন্ট করেছি মিউনিসিপ্যাল হেল্‌থ্‌ অফিসারের সঙ্গে। এই এলাকার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটীর নজর কম। এই বন্দর এলাকায়, নদী আর সমুদ্রের ধারে এতো বেশী ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। চারিদিকে এতো নোংরার ছড়াছড়ি। কী বীভৎস সব হাতীর মতো ফোলা ফোলা পা, দেখেছেন নিশ্চয়ই। খুব সাবধানে থাকবেন, রাতে মশারি ছাড়া শোবেন না। আর বাড়ীর চারদিকে রোজ না হোক সপ্তাহে দু'চার দিন ডি, ডি, টি, ছড়িয়ে দেবেন। মোরের মশা দেখতে ছোট, কিন্তু ভয়ানক চীজ মশাই। একবার কামড়ালে সারা জীবন বরবাদ হয়ে যায়। সুন্দর স্বাস্থ্য, চমৎকার ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য, রূপ, প্রতিপত্তি—ও সব কিছুই তুচ্ছ হয়ে যাবে ওই রোগের পাল্লায় পড়লে। না মশাই, খুব সাবধানে থাকবেন। আমি চলি এখন; দেখি মিউনিসিপ্যালিটীকে ধরে এদিকের এলাকার জল যাবার নালাগুলো ঠিক করে কাটাতে পারি কিনা।

বলতে বলতে ডিসেলাইয়া লোকটীর হাত থেকে সাইকেলটা নিয়ে নিজে তাতে চড়ে বসলেন। তারপর নিমেষের মধ্যে উধাও হয়ে গেলেন আমার সমুখ থেকে।

(২)

শীঘ্রই মাউন্ট এভারেষ্টকে জানবার সুযোগ এসে গেল। মহীশূর থেকে এক বাঙালী বন্ধু এসেছেন আমার কাছে। অতিথি সৎকারের জন্য ভাল কিছু মাছের প্রয়োজন দেখিনু। বিকাল বেলা নেত্রাবতীর ওপরকার জেটীর ওপর এসে দাঁড়িয়েছি। মাছধরা নৌকোগুলো একে একে ফিরে আসছে সমুদ্র থেকে। তাদের প্রত্যেকটিতে মাছ বোঝাই। তারা এসেই জেটীর কাঠের খাম্বা-গুলোতে সারি সারি বাঁধা পড়ছে। জেলেদের সবাই নৌকো বাঁধতে ব্যস্ত। পশ্চিমে সমুদ্র থেকে হাওয়া উঠেছে। সে হাওয়ার ঝাপটানি বাঁচিয়ে জেটীতে নৌকো বাঁধা সহজ নয়। হাওয়া লেগে নেত্রাবতীর সুনীল জল ঊর্মি-মুখর হয়ে উঠেছে। চঞ্চলা হয়ে উঠেছে সে। নৌকোগুলোকে

বুকের ওপর দুলিয়ে দুলিয়ে দুমদাম করে ধাক্কা দিচ্ছে একের সঙ্গে আরেকটাকে, কাঠের জেটীটার গায়ে। তাতে সারা জেটীটা থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

জেটীর ওপর অগুন্তি লোকের ভীড়। বেশীভাগই মেছুনী মেয়ে আর ভবঘুরে ছোকরাদের দল। ছোঁড়াগুলো নৌকো থেকে মাছ নামানর কাজে হাত লাগাবে। পাবে কিছু পয়সা, কিছু মাছ। এই ওদের নিত্যি রোজগার। মাথার ওপর এক ঝাঁক চিল চক্কর খেয়ে খেয়ে উড়ছে। কাকেরা ঝাঁক বেঁধে কোলাহল করছে। মাঝে মাঝে ছোঁ মারছে ফেলে দেওয়া মাছগুলোর ওপরে। সমুদ্র থেকে আজ যে নৌকোটি ফিরেছে তার অকেঠ কেবল চিংড়ি মাছে বোঝাই। কদিন থেকে এই উপকূলে চিংড়ি মাছের ঝাঁক উঠতে সুরু করেছে। বাস, আর কোন মাছের দেখাই নেই। চিংড়ি, চিংড়ি কেবল চিংড়ি। সহরের লোক আজ ক'দিন চিংড়ি খেয়ে খেয়ে জেরবার হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আমিও। আমার বন্ধুটি চিংড়ি মাছের আরবে ভক্ত নন। তাই আজও নৌকো ভর্তি কেবল চিংড়ির সাদা দেখে মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। এদিক ওদিক সন্ধানী নজর ফেলে দেখতে লাগলাম যাবার মতো ভাল মাছ পাওয়া যায় কিনা। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই হতাশ হতে লাগলাম। চিংড়ির সঙ্গে যে সব মাছ ওঠে তাদের বেশীর ভাগ কুচ্ছো জাঁসা জাতের—কাঁটায় ভুড়, অখাদ্য। আর ওঠে শঙ্কর মাছ, বাদুড় মাছ কি ছোট্ট ছোট্ট হাঙরের বাচ্চা। এখানকার লোকেরা এগুলো খুব তারিফ করে খায়। কিন্তু আমি এসব দেখে কেবল হতাশই হচ্ছিলাম।

এমন সময় আমার পাশে একটা মেছুনী মেয়ে জেটীটার দিছন দিকে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে কাকে যেন ডাক দিল। দু'হাতে তালি বাজাল। দেখলাম সেই নৌকোর ভীড়ের মধ্যে একটা ছোট্ট ডিঙি নৌকো আসতে আসতে ঢুকতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে দুপাশের নৌকোওয়ালারা হাঁ হাঁ করে তেড়ে মারতে উঠল—এই ভাগ হিঁয়াসে। দেখতে পাচ্ছিস না, এখানে নৌকো রাখবার-ই জায়গা হচ্ছে না। ঠেসাঠেসির চোটে কি অবস্থা হয়েছে। তুই এরই মধ্যে তোর ডিঙি ওঁজে দিচ্ছিস? তফাৎ যা এখান থেকে হতভাগা। বৈঠে লগি দিয়ে মাথা কাটিয়ে দেব।

ডিঙি বাইছিল যে লোকটা সে এতটুকুও ভয় পেল না এসব হুমকিতে। চীৎকার করে বললে—তোর সাতপুরুষ এই জায়গা ইজারা নিয়েছে রে নবাব পুত্তুর? লগি তুলে দেখ একবার কার মাথা কাটে।

বলতে বলতে সে বেশ কায়দা করে চাপ নৌকোর ফাঁকে ডিঙিটা ঢুকিয়ে দিয়ে—গোটা দুই গোত্তা মারল লগি দিয়ে জলের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে ডিঙি নৌকোটা আস্তে এসে জেটীর ধারে লাগল। ডিঙিওয়ালা ডিঙির নাকে বাঁধা দড়িটা জেটীর একটা খাম্বার বেঁধে ওপরে উঠে এলো। যে মেয়েটী তাকে হাততালি দিয়ে ডেকেছিল সে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল। লোকটা ওপরে আসতেই জিজ্ঞাসা করল—কি মাছ ধরলি আজ?

ডিঙিওয়ালা লোকটার গায়ে একটা লম্বা চিংকুট ময়লা নস্যি রংএর কোট। সেটা হাঁটু অবধি নেমে গেছে। তার গায়ে বিচিত্র রকম তালি পড়েছে নানান জায়গায়। অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে। নিম্নাঙ্গে যে তার কিছু আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় পরা আছে সামান্য একটা কৌপীন। কিন্তু কোটটা হাঁটু অবধি এসে তার লজ্জা রক্ষা করেছে। লম্বা চেহারা, চওড়া হাড়। মুখখানা এক সময়ে বোধ হয় একটু কর্সা ছিল, এখন রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে ঝামার মতো শক্ত দেখাচ্ছে।

দারিদ্র্যের রেখাগুলো সারাটা কপালে আর চোখের কোলে অঙ্কিত। লোকটার মুখখানা ঘিরে কয়েক সপ্তাহ না-কামানো দাড়ি গোঁফ। মাথার রুক্ষ কাঁকড়া কাঁকড়া একরাশ কাঁচা পাকা চুল। সে একটা দিশী চুরুটে টান মারতে মারতে জবাব দিল—সেই সকাল থেকে জাল মারতে মারতে উঠল কেবল একরাশ কাঁকড়া, আর একটা—

মেছুনী মেয়েটির আগ্রহ এবার ভেঙে পড়ল—আর একটা কি বল? আর একটা ইলিশ মাছ।

ইলিশ মাছ! কই কতোবড়ো দেখি।—মেছুনী মেয়েটার গলায় রাজ্যের আহ্লাদ ফেটে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটাও নেচে উঠল। বাঙালমাত্র ইলিশ মাছের ভক্ত। কিন্তু এ রাজ্যে ইলিশ মাছ এতদিন একটাও চোখে পড়েনি! ইলিশ যে আদবে পাওয়া যায় তাই শুনিনি আমি। তাই মেয়েটার সঙ্গে কৌতূহলী হয়ে আমিও ঝুঁকে ডিঙির ভিতরে নজর ফেললাম। দেখি ডিঙিটার খোলে রাখা আছে সেই অদ্ভুত টুপীটা যার কানাটা খুব চওড়া আর চূড়োটা গাধার টুপীর মত কোণাওয়ালা লম্বা। সেই টুপীটার পাশেই পড়ে আছে বেশ বড়সড় একটা ইলিশ মাছ। হ্যাঁ ইলিশ, ওজনে কম করে সের তিনেক তো হবেই।

টুপীটা দেখেই বুঝতে পেরেছি লোকটা মাউন্ট এভারেষ্ট। মেয়েটা এসে এভারেষ্টের ওপরের হাতটা জড়িয়ে ধরল।—আজ তুই একটা কাজ করেছিস মিতে। ওটা আমাকে তুই যে দামেই বেচ না কেন আমি ওর থেকে খুব কম করে তিনটে টাকা রোজগার করব। কত নিবি ওটার জন্যে?

মাউন্ট এভারেষ্ট তার বাহুর ওপর থেকে মেয়েটার হাতটা আস্তে ছাড়াতে ছাড়াতে বললে—ও মাছ আমি বেচব না।

মেয়েটা বললে—মস্করা রাখ। বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে বাজল। আমাকে এক্ষুণি বাজারে গিয়ে বসতে হবে, নৈলে সাড়ে চারটের খদ্দের পাব না। কত নিবি বল? পাঁচটাকা? তারপর এভারেষ্টের জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই বললে—আচ্ছা বাস তুই পরে ভেবে ঠিক করিস, মাছটা আর কাঁকড়াগুলো আমার ঝাঁকায় তুলে দে মিতে। হুলপ করে বলছি আমি তোকে ভাল দাম দোব।

এভারেষ্ট সেই রকম গম্ভীর মুখে চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে জবাব দিলে—রাধা দিদি, তুই কাঁকড়াগুলো নিয়ে যা। আমি সত্যি বলছি ও মাছ বেচব না।

রাধা নামে মেয়েটী বারকয়েক কাতর অনুনয় করল। কিন্তু এভারেষ্টএর এক কথা—ও মাছ আমি বেচব না।

শেষে রাধা চটে গেল। মুখ বিকৃত করে জেদি কেটে বললে—মাছ বেচবি না তো করবি কি? বৌকে খেলাবি?

এভারেষ্ট সেই রকম নিরাসক্ত কণ্ঠে জবাব দিলে—হ্যাঁ, তুই যা।

বলতে বলতে সে কাঁকড়ার রাশি ঢেলে দিলে রাধার ঝাঁকায়। রাধাও আর দেরী না করে হন হন করে চলে গেল ঝাঁকা মাথায়।

এবার আমি এগিয়ে এলাম। বললাম—তোমার নাম মাউন্ট এভারেষ্ট?

লোকটা ভুরু কুঁচকে আমাকে একবার আপা-পাশতলা দেখে নিয়ে অর্ধদগ্ধ চুরুটের অর্ধেকটা জেটীর পাটাতনের ওপর চেপে ধরে নিবিয়ে ফেলে বললে—হ্যাঁ, তা আপনাকে তো আমি চিনিনে।

আমি প্রশ্ন করেছিলাম হিন্দীতে। উত্তর এল খাঁটি ইংরাজীতে। তার ইংরাজী বলার ধরণ দেখে মনে মনে বিস্মিত হলাম। উচ্চারণ একেবারে নির্ভুলভাবে বিলিতী। আমি এবার ইংরাজীতেই জবাব দিলাম।—তা তুমি আমাকে কেমন করে চিনবে বল, আমি এখানে নতুন এসেছি। আমি তো এ মুলুকের লোক নই। আমি কলকাতার বাসিন্দা।

এভারেষ্টের কোঁচকান ভুরু এবার একটু শিথিল হল। ঠোঁটের কোণে কোথায় যেন অস্পষ্ট একটু হাসির রেখা দেখা দিল। এবার সে আমাকে অবাক করে দিয়ে ভাঙা বাংলায় শুধাল—মোসাই কি বাঙালী?

তারপর ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটের হাসিটুকুতে একটা বিদ্রূপের ভাব ফুটিয়ে বললে—ইলিশ মাছের গন্ধ পেলেই বাঙালীবাবু দৌড়বে। কিন্তু বাবু আমি এ মাছটা বেচব না।

শুনেছিলাম ও খুব গরীব লোক। তাই একবার বললাম—তুমি না হয় কিছু বেশী দামই নাও। জানতো এখানে ইলিশ আদবেই পাওয়া যায় না। আমার এক বাঙালী বন্ধু এসেছেন তিনি ইলিশ খুব পছন্দ করেন।

এভারেষ্ট বললে—দামের কথাই নেই। আমার বৌকে আমি ইলিশ মাছের গল্প করেছিলুম অনেক দিন আগেই। কলকাতায় থাকতে কতো ইলিশ খেয়েছি আমি। তাই শুনে তারও সখ হয়েছিল ইলিশ মাছ খাবার। সেই থেকে কতো চেষ্টা করেছি, ইলিশ মারতে পারিনি। আজকের এই ইলিশ বাবু আমার বৌ-এর জন্যে ঘরে নিয়ে যাব।

আমার একটু জিদ চেপে গিয়েছিল মাছটা নেবার জন্য। প্রবাসী বাঙালী বন্ধুটিকে ইলিশ মাছ খাওয়াবার লোভে কিছুতেই সামলাতে পারছিলাম না। তাই বললাম—আচ্ছা তোমাকে আমি দশটাকা দেব—মাছটা আমাকে দিয়ে দাও। আমার বাড়ীতে আজ অতিথি। তোমার বৌকে পরে খাইও।

মুহূর্তের মধ্যে দেখলাম এভারেষ্টের মুখটা এক চাপড়া পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেল। শক্ত হয়ে গেল তার গলার আওয়াজ। বললে—এভারেষ্ট একবার যা বলে তা থেকে তাকে নড়াতে পারে দুনিয়ায় এমন লোক নেই। আপনি বাবু আমাকে চেনেন না। আপনি লাখ টাকা দিলেও এসব আমি বেচব না। যান—আমাকে বিরক্ত করবেন না।

মাছটা সে নৌকোর খোল থেকে তুলে নিয়ে সটান বাড়ীর দিকে হাঁটা দিলে। একজন নৌকোওয়ালা আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বললে—ছোট লোকের আস্পর্দ্ধা দেখলেন স্যর একবার। আমরা সবাই এই লোকটার ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে গেছি স্যর। লোকে গরীব হলে নীচু হয়; পাঁচজন যা বলে তা শোনে। কিন্তু এই লোকটা একটা অদ্ভুত চরিত্রের লোক। দুবেলা ভাল করে খাওয়াই জোটে না, তবু অহংকারটা দেখলেন তো?

লোকটা যে অহংকারী তাতো স্বচক্ষেই দেখলাম। আমার মনে কিন্তু ধাক্কা দিল একটা কথা—এভারেষ্ট একবার যা বলে তা থেকে তাকে নড়াতে পারে দুনিয়ায় এমন লোক নেই। এমন কথা বর্তমান দুনিয়ায় ক'জন বুক ফুলিয়ে বলতে পারে? লোকটার ওপর আমার কৌতূহল বাড়ল। মনে মনে ঠিক করলাম ওকে জানতে হবে ভাল করে।

(৩)

ইতিমধ্যে গ্রীষ্ম কেটে দিয়ে বর্ষা এল। এ অঞ্চলের বর্ষা অতি সাংঘাতিক। বছরের মধ্যে চারটে মাস এখানকার সমস্ত কাজ অচল হয়ে যায় বর্ষার প্রচণ্ড প্রকোপে। আরব সাগর থেকে ঘন কালো রাশি রাশি মৌসুমী মেঘ উঠতে থাকে অনবরত। ভেসে যাবার উপায় নেই। ম্যাঙ্গালোরের আশপাশের পাহাড় সেই মেঘগুলোকে ঠেকিয়ে রেখে দেয়। পশ্চিম থেকে হুঙ্কার দিয়ে বাতাস ছুটতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র ফুলে ওঠে। তার নীল কালি ঘুচে গিয়ে ঘোলাটে হয়ে ওঠে আদিগন্ত বিস্তৃত রূপ। বিরাট বিরাট ঢেউয়ের দল প্রচণ্ড গর্জনে ভেঙে পড়তে থাকে পাড়ের ওপর।

দক্ষিণ কানাড়া জেলায় বর্ষা সুরু হয়ে যায় মে মাস থেকে। পাহাড়ে পাহাড়ে মেঘেরা ধারা-বর্ষণ সুরু করে দেয়। সেখানেও সমুদ্র গর্জনের মতো মেঘের দল গর্জন করতে থাকে। প্রাচীন আকাশ-চুম্বী দুনা, গরুগিরি, ডগ্‌গুল ধুপ, কাজীর প্রভৃতি বনস্পতির দল সেই ধারাস্নানে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। নৌন অরণ্যের মাঝখানে শুক্‌নো শুক্‌নো পাহাড়ে ঝর্ণাগুলো হঠাৎ প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠে একসঙ্গে অনেক উল্লাসে কোলাহল জুড়ে দেয়। নেত্রাবতী আর শুরপুরের জলে সেই পাহাড়ে মাটীর ঘোলাটে রঙ এসে কোল দেয় পাহাড়ী ছোট্ট ছোট্ট নদীগুলো। নেত্রাবতীর রূপ মেঘলা হয়ে ওঠে। তার অন্তঃস্রোত প্রখরতর হয়। বৈরাগিনীর মতো উন্মাদ প্রবাহে সে ছুটতে থাকে সমুদ্রের দিকে। দু'কূল ভাসিয়ে অনেক জনপদ তছনছ করে দেয় বন্যার বেগে।

বর্ষায় নেত্রাবতীর ওপর নৌকো ভাসিয়ে মাছ মারা অসাধ্য। এখানকার সব নৌকো যে মাস আসার সঙ্গে সঙ্গে ডাঙায় তোলা হয়ে যায়। জেলেরা সমুদ্রে যায় না। নদীতে বড় নৌকো মাঝে মাঝে মাছ মারতে গেলেও ডিঙি নৌকো নদীর জলে নামান অসম্ভব এ সময়ে।

দেখলাম ডিঙি ভাসান জেলেরা উঠে এসেছে নেত্রাবতীর বাঁধের উপর। সেখানে সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি সারি সারি লোক বসে থাকে জলে বড় বঁড়শী ফেলে। কিছু মাছ পেলেই সারা দিনের রোজগার হয়ে যায়। তবু তারা বসে থাকে নেশার টানে। মাছ মারার নেশা। এডারেষ্টকেও সেই বাঁধের ওপর বসে মাছ মারতে দেখি। পরণে সেই মার্কামারা কোট আর টুপী।

বাজারে মাছ দারুণ আক্রা। বর্ষায় টাটকা মাছ দুর্লভ বলে যা কিছু একটু পাওয়া যায় তার দামও তেমনি চড়া। এখন একমাস শুটকী মাছ খেয়ে কাটাবার সময়।

হঠাৎ এই সময়ে একদিন সকালে বেলা দশটা নাগাদ আমার ঘরে এডারেষ্টকে একটা বেশ বড়-সড় টাটকা ভাঙন মাছ নিয়ে ঢুকতে দেখে অবাক হলাম। সেদিন কিসের একটা ছুটীর দিন। এডারেষ্ট যদিও ঠিক তেমনি বুক চিতিয়ে ঘাড় সোজা করে এসে আমার সামনে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল, তবু দেখলাম তার গলার স্বর অনেক মোলায়েম। এডারেষ্ট বললে—মোশাই, সেদিন ইলিশ মাছটা আপনাকে দিতে পারিনি, সেই থেকে মনটা খুঁত খুঁত করছিল। আজ এই ভাঙনটা ধরা পড়তে ভাবলাম যাই, মোশাইকে দিয়ে আসি। আপনারা এ মাছও তো খুব পছন্দ করেন।

বললাম—নিশ্চয় নিশ্চয়। খুব ভাল করেছ মাছটা এনে। টাটকা মাছ যে কি জিনিষ তাতো ভুলতে বসেছি। তা কতো দাম দেব তোমায় ?

এডারেষ্ট বললে—এক পয়সাও নয়।

বললাম—তা কি হয়, দাম তোমাকে দিতেই হবে।

এডারেষ্ট বললে—আমি একবার ঠিক করেই ফেলেছি এটা আপনাকে খেতে দেব। সেদিন আপনাকে অপমান করে চটিয়ে দিয়েছিলাম; আজ এই মাছটা দিয়ে ঘুষ দেব। আমি যখন একবার ঠিক করেছি—কিছু দেব না তখন আমার পক্ষে কিছু নেওয়া অসম্ভব। আমার স্বভাব এটা। একবার একটা কিছু ঠিক করে ফেললে তার আর নড়চড় নেই মোশাই, রাগ করবেন না। আমার ওপর দয়া করে মাছটা নিন। নৈলে আমার শান্তি নেই।

মাছটা ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম—না, না—সেকি! রাগ করব কেন। এসো বসো।

বলে তাকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিলাম। বিনা দ্বিধায় এডারেষ্ট সেই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল। বাইরে বর্ষা নেমেছে দারুণ ভাবে। তাই বললাম—এই রকম ভিজে আবহাওয়ায় একটু চা খেয়ে গরম হও এডারেষ্ট। বলে, চাকরকে হুকুম দিলাম চা আনতে।

এডারেষ্ট খাঁটী বিলিতী কায়দায় নীচু হয়ে বললে—থ্যাংকু স্যর।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আচ্ছা তোমার এই এডারেষ্ট নামটা কি তোমার বাবা মার দেওয়া?

এডারেষ্ট-এর চোখ দুটো দেখলাম চকচক করে উঠল। মুখের কোঁচকান রেখাগুলো মুহূর্তের মধ্যে টান টান হয়ে গেল। তার বুকটা আরও খানিকটা চিতিয়ে গেল। মুখে তার একটা অতিশয় তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। বললে—তা যদি শুনতে চান মোশাই, তা হলে আপনি যে সিগারেট খাচ্ছেন তার গোটাকতক আমায় দিতে হবে।

বললাম—বিলক্ষণ, আমি জানতাম না যে তুমি গোল্ড ফ্লেক এতো পছন্দ কর। এটা তো নরম সিগারেট, এতে কি তোমার গা গরম হবে?

এডারেষ্ট বললে—এক সময়ে আমি শুধু কাইভ-ফিফটি-কাইভ আর গোল্ড ফ্লেকই খেতাম। আর শুধু খাওয়া নয়, এই সব দামী সিগারেট এক সময়ে আমি বিদেশী পোর্টে দশগুণ বেশী দামে বিক্রী করেছি। তাতে যে পয়সা পেয়েছি ফুর্তি করেছি। মার্চেন্ট নেভীতে কাজ করতাম, কাজেই বোম্বাই কলকাতা থেকে সুরু করে আফ্রিকা এশিয়া আর ইউরোপের কোন বন্দর দেখতে বাকি রাখিনি। কোন দেশে কি কি মদ পাওয়া যায়, তা যদি চান তো কনসাল্ট্ এডারেষ্ট। এই বলে নিজের বুকে গোটাকতক টোকা মারল সে।

আমি আমার কৌটা খুলে এক মুঠো সিগারেট এডারেষ্টকে দিলাম। ইতিমধ্যে চাকর চা এনে দিয়েছিল। সে চায়ের পেয়ালা চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে এক পায়ের ওপর আর এক পা চাড়িয়ে বসল। আমার মনে হল আমি সেই জীর্ণ শতছিন্ন লাঞ্ছিত নক্সা রংএর কোট পরা, প্রায় নগ্ন, দারিদ্র্য নিষ্পীড়িত চেহারার মধ্যে অতীতের সেই মার্চেন্ট নেভীর একজন নাবিককেই দেখলাম।

এডারেষ্ট তার গল্প সুরু করল। —প্রথমে সে সৌরচন্দ্রিকা করল তাঁতা বাংলায়। মোশাই, বাংলা আমি জানি বটে তবে ভাল নয়। কলকাতায় একবার এক মাসাড়ে বেশ ক'মাস ছিলাম। সেখানে বাংলা শিখি। তা সেও আজ কতো বছর হয়ে গেল। প্রায় ভুলেই গিয়েছি। তাই ইংরাজীতেই আপনার সঙ্গে গল্প করি এখন। আর ইংরাজী বলতে পারলে আমি খুব খুশী হই। ইংরাজী আমি আমার মাতৃভাষার চেয়েও ভাল করে জানি। হিন্দীও ভাল জানি, কিন্তু বলতে ইচ্ছা করে না।

বললাম—বেশ তো ইংরেজীতেই কথা বল তুমি। আর তোমার ইংরেজী তো খাঁটী—

এডারেষ্ট আমার মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললে—কুইন্‌স ইংলিশ স্যর। এই ইংরেজী শিখতে এক সময়ে আমার যথেষ্ট খরচ করতে হয়েছে। বিলেতে যতবার যাতায়াত করেছি প্রত্যেকবারে এর জন্যে আমি প্রচুর খরচ করেছি। এই মাদ্রাজেতে আমি ফিরেছি পাঁচ বছর হল। এই পাঁচ বছরের একটা দিনও আমি ভাল করে কথা বলিনি। কথা বলে আনন্দ পাইনি কারুর সঙ্গে। আজ স্যর আপনার সঙ্গে কথা করে সেই আনন্দ পাচ্ছি অনেকদিন পরে। অনেকদিন পরে কুইন্‌স ইংলিশ বলতে পারছি। জানেন স্যর, আগে আমি লোকের সঙ্গে গল্প করতে খুব ভালবাসতাম। কিন্তু এখানে আসবার পর থেকে গত পাঁচ বছর আমার জিভে যেন পক্ষাঘাত হয়েছে।

পরিষ্কার বিশুদ্ধ ইংরেজী উচ্চারণে মাউন্ট এডারেষ্ট কথা বলতে লাগল। প্রথমে আমার নিজেরই একটু একটু অস্বস্তি লাগছিল। এই বেশ-বাস আর হাল-চাল যে লোকের তার জিভ দিয়ে যে এমন ইংরেজী বার হচ্ছে সেইটেই আমার কাছে একটা বিশেষ অসঙ্গতির ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল। ক্রমশঃ সে ভাবটা চলে গেল।

এডারেষ্টকে বললাম—বেশ, আজ তোমার গল্প আমি শুনব, কিন্তু আমার একটা অনুরোধ রইল তোমার কাছে।

এডারেষ্ট জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকাল। বললাম—বাইরে দারুণ বৃষ্টি নেমেছে। এ বৃষ্টি চট করে থামবে না। আমি আমার চাকরকে ঝিঙ্গুড়ী আর টাটকা ভাজন মাছ ভাজা রাঁধবার কথা বলে দিচ্ছি। তুমি আজ আমার সঙ্গে খাবে। আজ ছুটীর দিন। তাছাড়া আমারও রোজ রোজ একলা খেতে ভাল লাগে না।

এডারেষ্ট কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন খানিকটা ভেবে নিল। ঘন ঘন সিগারেটে টান মারল বার কয়েক। তারপর বিনীত কণ্ঠে বললে—মাপ করুন স্যর; আমাকে বাড়ীতে যেতেই হবে। নৈলে আমার স্ত্রী হয়তো না খেয়ে বসে থাকবে।

বললাম—আমি আমার চাকরকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তোমার বাড়ীতে খবর দিয়ে আসবার জন্যে। তোমার বাড়ীর রাস্তাটা ওকে বলে দাও। ও এই সহরের লোক, বাড়ী খুঁজে বার করতে পারবে।

এডারেষ্ট উৎফুল্ল হয়ে বলল—সেই ভাল। আর কলকাতা ছাড়বার পরে অনেকদিন ঝিঙ্গুড়ী খাইনি। মোতিবালা ঝিঙ্গুড়ীর নাম শুনলেই পাগল হত। মেয়েটা এতো ভালবাসতো ঝিঙ্গুড়ী খেতে। একটু বাদলা বাধলেই আমাকে বলত—যা ইলিশ কিনে নিয়ে আয়। ইলিশ মাছ ভাজা আর ঝিঙ্গুড়ী। তা রাঁধতও চমৎকার, যেন অমৃত।

ঝিঙ্গুড়ী আর মাছ ভাজা রাঁধতে সময় লেগে না। চাকরকে তাই যেন কোট আর ছাতা দিয়ে পাঠালাম এডারেষ্টের বাড়ী খবর দিয়ে আসতে। এডারেষ্ট তাকে বাড়ীর রাস্তা বুঝিয়ে দিলে। সেও চলে গেল বৃষ্টির মধ্যে।

চাকর চলে যেতেই এডারেষ্ট নিশ্চিন্ত হয়ে আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বসল। মোটা দুই বড় বড় টান মেরে হস্ হস্ করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যেন আপন মনেই বললে—আর কথা কইব কার সঙ্গে বলুন? দুনিয়ায় মানুষ নেই।

আশ্চর্য হয়ে শুধালাম—সেকি? ভারতবর্ষে এতো বেশী মানুষ, যে তাদের খাদ্য জোগাতে সরকার হিমসিম খাচ্ছে। তার ওপর শুনতে পাচ্ছি বছর বছর লোকসংখ্যা এতো বেশী বাড়ছে যে সমস্যা প্রায় আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে বসেছে।

ডোরেই গম্ভীর মুখে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—যারা শুধু খাচ্ছে আর বংশবৃদ্ধি করছে সেই সব লোকদের সঙ্গে জানোয়ারদের তফাৎ কোথায় বলতে পারেন? জানোয়াররাও তো শুধু খায় আর বংশবৃদ্ধি করে।

এডারেষ্টের প্রশ্ন শুনে চমকে উঠলাম। তবু মুখে হাসি টেনে তর্ক করার মতো বললাম—তাই কি কখনও হয়? মানুষে আর জানোয়ারে কি কখনও এক হয়? মানুষ আজ সভ্য হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে। তার জন্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতো প্রসার, কতো উন্নতি—

এডারেষ্ট বাধা দিল।—আমি স্যর আহাম্মক লোক। আমি ওসব জ্ঞানও বুঝিনে বিজ্ঞানও বুঝিনে। বুঝি শুধু মোদ্দা কথাটা। সারা বোম্বাই সহরের শিক্ষিত আর ভদ্র সমাজ আমি এক সময়ে চুঁড়ে ফেলেছিলাম একটা লোক খুঁজে বার করতে যে সত্যি কথা বলার হিম্মৎ রাখে। যে একবার কথা দিলে কথার নড়চড় হয় না। আমি একটী লোকও পাইনি। সেই দুঃখেই আমি বোম্বাই ছেড়েছি, আফ্রিকার চাকরী ছেড়েছি। মৈসে বোম্বাইয়ে আমার জীবনের অনেকগুলো বছর কেটেছে। এখানে ওখানে জাহাজ নিয়ে গিয়েছি বটে কিন্তু ফিরে এসে ঠাঁই ছেড়েছি ঐ বোম্বাইয়ে। পরে দেখলাম সহর যতো বড়, সেখানে জানোয়ারের সংখ্যা ততো বেশী। বিরক্ত হয়ে ম্যাঙ্গালোরে ফিরে এসে মাছ মারছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে কি মানুষের সন্ধান পেয়েছ?

এডারেষ্ট বললে—একেবারে পুরোপুরি খাঁটী মানুষ বোধহয় সারা দুনিয়ায় দুর্লভ হয়ে পড়েছে। ম্যাঙ্গালোরের আবহাওয়া বিষাক্ত করে তুলছে বোম্বাই, মাদ্রাজ, কোচিনের বাতাস। সে বাতাসের হাত এড়াবে ম্যাঙ্গালোরের এখন সাধ্যি নেই। তবু বলব—ভিরেলাইয়া একজন যথার্থ খাঁটী মানুষ। মিথ্যে বলতে কোনদিন শুনিনি ওকে। হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বার হয়ে এল—তুমি যে মানুষের বিচার করতে বসেছ—তুমি নিজেই কি সব সময়ে সত্যি কথা বল? বর্তমান সমাজে বাস করে কি কেউ সব সময়ে সত্যি কথা বলতে পারে?

এডারেষ্টের বলিরেখা কুঞ্চিত মুখের ওপর একটী সুন্দর হাসি ফুটে উঠল। হাতের সিগারেটের শেষটুকু ছাইদানীতে রগড়ে ফেলে আস্তে আস্তে বললে—আগে আমি দুনিয়ার অধম মিথ্যেবাদী ছিলাম। কিন্তু এখন আমি যে শুধু সত্যি কথাই বলি তাই নয়; আমার মুখ দিয়ে কোন কথা একবার বার হলে জান গেলেও তার নড়চড় হ'তে দিই না। কিন্তু আপনি যে সমাজের কথা বলছেন—তা হল জানোয়ারের সমাজ। সত্যি কথা বলতে আমি যেদিন থেকে সুরু করেছি সেই দিন থেকে সেই সমাজ আমাকে বরদাস্ত করতে পারেনি। আমার ওপর অকথ্য অত্যাচার করেছে আপনাদের এই সভ্য সমাজ, যার জ্ঞান-বিজ্ঞানের চকচকানিতে আপনার মতো লোকেরা মুগ্ধ। তাই আমি বাধ্য হয়ে সেই সমাজ ছেড়ে এসেছি। যখন বোম্বাইয়ে ছিলাম তখন আমি মানুষ ছিলাম বাইরের বেশ-বাসে, ভিতরে আমি ছিলাম সবচেয়ে ওঁচা জানোয়ার। এখন আমার বেশ-বাস, চাল-চলন দেখছেন তো—জানোয়ারেরও অধম। এখন কিন্তু আমি ভিতরে ভিতরে মানুষ হবার চেষ্টা করছি। কিছুটা মানুষ হয়েছিও। কেলভিন সায়েবের ইচ্ছাকে অন্ততঃ কিছুটা যে রূপ দিতে পেরেছি তাতেই আমি খুশী আছি। তবে আমি খুশী থাকলে কি হবে, লোকে আমার ওপর আদবেই খুশী নয়। আমার নিজের লোকেরা আমাকে ভাবে অহংকারী, দেমাকী। তার জন্যে আমার ওপর অত্যাচারও

তো কিছু কম নয়। বোম্বাইয়ের কথা ছেড়ে দিই। এই ম্যাঙ্গালোরেও দুটো মাছ খেয়ে যায়, নিজের পথে নিজে চলবে, তাও কারুর সহ্য হয় না। তিনেসাইয়া ছিলেন বলে আমি বোধহয় আজও জানে বেঁচে আছি নৈলে আমার জ্ঞাতভাইয়া এতদিনে আমাকে আর আমার সংসারকে পুড়িয়ে খেয়ে ফেলত।

(৪)

এস. এস. নরকোক জাহাজের বুড়ো ক্যাপ্টেন জন ইয়ুর্ট কেলভিন ছিলেন খাঁটি ইংরেজ। একজন খাঁটি ইংরেজের বৈশিষ্ট্য যে সহজ সত্যবাদীতা তা ওঁর মধ্যে ছিল। নিজে জাহাজী লোক হয়েও আর সাতঘাটের জল খেয়ে ফিরলেও এই মহৎ গুণটি থেকে কোনদিন বিচ্যুত হননি তিনি। এর ওপর ওঁর খ্যাতি ছিল অত্যন্ত সদাশয় ও ধার্মিক বলে।

পাঁচ সাতখানা জাহাজে কাজ করার পর ম্যাঙ্গালোরের ঘরে-যাওয়া ছেলে দীনদয়াল গিয়ে চাকরী নিল এস. এস. নরকোকে। দীনদয়াল ছেলেবেলা থেকে জোচ্চুরী, বাটপাড়িতে পরিপক্ক। মিথ্যাকথা অনেকেই অনর্গল বলে থাকে। কিন্তু দীনদয়ালের মুখে কেউ যদি কোনদিন সত্যি কথা শুনে থাকে তবে সেই লোককে ভাগ্যবান বলে মনে করতে হত। ম্যাঙ্গালোর ছোট জায়গা। তাকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারেনি। সে পালিয়ে এসেছিল বোম্বাইয়ে। জাহাজের কাজে ঢুকেছিল খালাসী হয়ে। তারপর সে পরপর সাতখানা জাহাজে কাজ করেছে সাতটা বিভিন্ন নামে। প্রত্যেক জায়গা থেকেই তার চাকরী গেছে বিভিন্ন অপরাধে। সহকর্মীদের টাকা চুরি, টাকা ধার করে কোনদিন তা শোধ না করা, পোর্টে মেয়েছেলে নিয়ে মারামারি, আর মাতলামি তো ছিল তার নিত্যকারের অপরাধ।

সেবার এস. এস. নর্টগোমারী থেকে যখন চাকরী গেল তখন দীনদয়াল মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এবার ভালভাবে সুনাম নিয়ে কাজ করতে হবে। নৈলে বয়স বাড়ছে, মার্চেন্ট নেভীর কাজ একবার গেলে পাওয়া ক্রমশঃই দুষ্কর হয়ে পড়ছে। সেবার সে ছ'মাস বসে থাকার পর কাজ পেল এস. এস. নরকোকে। তাও বোম্বাইয়ে নয় কলকাতায়। ক্যাপ্টেন যখন অতীতের কাজের রেকর্ড দেখতে চাইলেন তখন দীনদয়াল অম্লান বদনে বাড়িয়ে দিল একগাদা সার্টিফিকেট আর সার্ভিস বুক. তাদের সবকটাই ছিল জাল করা। ক্যাপ্টেনের চোখে সে জাল ধরা পড়ল না। অন্যদিকে সে ক্যাপ্টেনকে মুগ্ধ করল চোস্ত ইংরেজী বাত বলে। কাজ পেয়ে গেল দীনদয়াল।

কিন্তু মনে মনে যা প্রতিজ্ঞা করা যায় সব সময়েই তো আর কাজে করা তা সম্ভব হয় না। বিশেষ করে দীনদয়ালের পক্ষে—যে তার ছোট বয়স থেকেই জাল-জোচ্চুরী, চুরি আর মিথ্যা কথা বলে লোক ঠকাবার কাজে পোক্ত হয়ে উঠেছে। এস. এস. নরকোকে কিছুদিন চুপচাপ কাজ করার পর সে নিজ মূর্তি ধারণ করল। সুদূরপ্রাচ্যে একটা যাত্রা শেষ করে কলকাতা ফেরবার মুখে জাহাজের নাবিকদের প্রায়ই জিনিষপত্র ও টাকাকড়ি চুরি যেতে লাগল। বিশেষ করে জাহাজ কোনও পোর্টে ভেড়বার ঠিক দুই একদিন আগে থেকেই এই চুরির হিড়িক পড়তে লাগল। ব্যাপারটা খালাসী মহল থেকে ক্রমশঃ চীফ অফিসারের কাছে, পরে সেখান থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে পৌঁছল নালিশ হয়ে। ক্যাপ্টেন চীফকে বললেন—ব্যাপার কি? আমার জাহাজে তো কোনদিন এ আপদ ছিল না।

চীফ বললেন—ক্যাপ্টেন, নতুন যে খালাসীটা কয়েক মাস হল ঢুকেছে তাকে আপনি তাড়াতাড়ি ডিস্চার্জ করলেন জাহাজ ছাড়বার মুখে। তার সার্টিফিকেটগুলো ঠিক ছিল কি? আমার তাকেই সন্দেহ হচ্ছে।

ক্যাপ্টেনের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। বললেন—তার সার্ভিস বুক থেকে প্রত্যেকটী সার্টিফিকেট আমি নিজে পড়ে তবে তাকে কাজে নিয়েছি। লোকটা বোম্বাইয়ে অনেক কাল কাজ করেছে বিভিন্ন জাহাজে। তাছাড়া ক'দিন দেখছি তো লোকটা অত্যন্ত কাজের।

চীফ জানতে চাইলেন—অতগুলো জাহাজে একের পর এক কাজ করেছে সে? জাহাজ পাল্টাবার কারণ কি? আমার সন্দেহ হয় তারা তাকে বরখাস্ত করেছে।

ক্যাপ্টেন বললেন—না। লোকটা নিজে থেকেই কাজ ছেড়ে দিয়েছে। আবার কাজ নিয়েছে। আমি কারণও জানতে চেয়েছিলাম। তা বলেছিল প্রেমঘটিত ব্যাপার। একটা মেয়েকে ও ভালবাসে, তার জন্যেই এই সব। আপাততঃ ও নাকি কলকাতায় সেই মেয়েকে বিয়ে করেছে। একটা বাড়ী ভাড়া করে তাকে সেখানে রেখেছে।

চীফ বললেন—আচ্ছা তাহলে একবার আমি নিজে খানাতল্লাসী করে দেখব। কলকাতার পোর্টে পৌঁছবার আগে আপনি একটা কাজ করবেন দয়া করে। জাহাজে বলা থাকবে আমরা পৌঁছব যথা সময়ে কিন্তু পোর্ট থেকে মাইল পঞ্চাশ দূরে আপনি জাহাজ রাখবেন কাউকে কোন কথা না বলে। তারপর যা করবার আমি করব।

চীফের এই কথা অনুযায়ী ক্যাপ্টেন কলকাতা পৌঁছবার পঞ্চাশ মাইল আগে গভীর রাতে হঠাৎ জাহাজ নোঙর করলেন। শোনা গেল ইঞ্জিনের কি একটা গণ্ডগোল হয়েছে। মেরামতি চলছে। তিনচার ঘণ্টার মধ্যে সে জাহাজের কলকাতা পৌঁছবার কথা সে সারা রাত নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে রইল কাকদ্বীপের কাছে। আর এদিকে চীফ তল্লাসী পরোয়ানা নিয়ে খালাসীদের কেবিন, ট্রাঙ্ক, বাক্স বিছানা সব খানাতল্লাসী করলেন তন্ন তন্ন করে। আর তাতেই হীরেন্দ্রলালের বাক্স থেকে বার হল কারুর দামী ঘড়ি, কারুর ট্রান্সিস্টার রেডিও, একগাদা নোট, কারুর চেন, কারুর পাথর বসান আংটি।

চীফ জাহাজী আইন অনুযায়ী হীরেন্দ্রলালকে অভিযুক্ত করে মালসমেত ক্যাপ্টেনের কাছে নিয়ে হাজির করলেন তাকে। ক্যাপ্টেনকে বললেন—ওর যা টাকা পয়সা পাওনা হয়েছে সব বাজেয়াপ্ত করে ওকে কলকাতায় পুলিশের হাতে দিয়ে দেওয়া হোক।

ক্যাপ্টেন হীরেন্দ্রলালকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এগুলো চুরি করেছ?

হীরেন্দ্রলালের মুখে একটু কুঞ্চনও দেখা গেল না। দৃঢ়স্বরে সে তখুনি অস্বীকার করল—না ক্যাপ্টেন, ঈশ্বর জানেন আমি এসব চুরি করিনি।

ক্যাপ্টেন জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে এসব তোমার বাক্সে এল কি করে?

হীরেন্দ্রলাল উত্তর দিল—কেউ শত্রুতা করে আমার বাক্সে এ সব লুকিয়ে রেখেছে।

চীফ কেবল দাঁত কিড়মিড় করে বলে উঠলেন—মিথ্যাবাদী শয়তান!

জাহাজ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা লেট-এ কলকাতা পৌঁছল।

হীরেন্দ্রলাল ভাবল আর আর জাহাজে তার যে দশা হয়েছে এবারও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

বরখাস্ত তো সে হবেই কাজ থেকে, পুলিশের হ্যাঙ্গামাও হতে পারে। কিন্তু এসবে সে রীতি-মতোই অভ্যস্ত। ভাবল কি আর করা যাবে। জেল থেকে ছাড়া পেলে আবার একটা জাহাজে কাজের সন্ধান করবে।

(৫)

দীনদয়াল মনে মনে যা ভেবেছিল এবার কিন্তু তা হল না। কলকাতায় পৌঁছবার পরেও সে তার বরখাস্ত পেল না বা তাকে পুলিশেও দেওয়া হল না। সে রাতে তার কেবল ডাক পড়ল ক্যাপ্টেনের ঘরে। সে বেশ একটু অবাক হয়ে ক্যাপ্টেনের ঘরে গিয়ে হাজির হল। এদিকে সারাটা জাহাজেই তার চোর বদনাম ছড়িয়ে পড়েছে। জাহাজের ছোট বড় কর্মচারী সবাই প্রতীক্ষা করে আছে তার কি শাস্তি হয় তা দেখবার জন্যে।

ক্যাপ্টেনের ঘরে ঢুকতেই ক্যাপ্টেন তাকে সস্নেহ আহ্বান জানালেন—এসো ভিন, বোসো। বলে কাছের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

দীনদয়াল রীতিমতো বিস্মিত হল। সে বসতে গিয়ে অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। ক্যাপ্টেন কেলভিন আবার তাকে অনুরোধ করলেন—বোসো, বোসো।

দীনদয়াল ধপাস করে চেয়ারে বসে ঘামতে লাগল। ক্যাপ্টেন তার সম্মুখে রাখা বোতল থেকে দামী হুইস্কি দু'টো গ্লাসে ঢাললেন। একটা হাত বাড়িয়ে তুলে ধরলেন দীনদয়ালের সামনে। স্নেহসিক্ত স্বরে অনুরোধ করলেন—ধর। দীনদয়ালের হাতটি বার বার কেঁপে যেতে লাগল। ক্যাপ্টেন আবার অনুরোধ করলেন—লজ্জা কি, ধর। আমরা জাহাজী লোক, পাপ একবার না একবার আমাদের সবাইকেই করতে হয়। কিন্তু সব পাপেরই ক্ষমা আছে কন্‌ফেশানে। নাও, গ্লাসটা নাও।

দীনদয়াল গ্লাসটা দুহাতে ধরে নিল। ক্যাপ্টেন তার গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাসটা ঠুকে বললেন—ভাই ধর, আমি জানি তুমি চুরি করেছ, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। কিন্তু আমি এও জানি দুনিয়ার ভয়ঙ্করতম পাপীর মধ্যেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বাস করেন। সেই ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করছি তিনি তোমার এই কু অভ্যাস ত্যাগে সাহায্য করুন। আমি উইস করছি তোমার মনে এমন শক্তি আসুক যাতে করে তুমি তোমার পাপকে, সামগ্রিক দোষ ত্রুটিকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করতে পার। আমি উইস করছি তুমি সত্যবাদী হও। একজন জাহাজী লোকের কাছে সত্যবাদী হওয়ার চেয়ে বড় গুণ আর নেই। পাপ মানুষেই করে, জানোয়ারে করে না। কিন্তু যারা মিথ্যে বলে তারা মানুষ নয় জানোয়ার! আমি তোমার সব অপরাধ ক্ষমা করলাম।

ক্যাপ্টেন কেলভিনের সেই মুহূর্তের আচরণে, তখনকার বলা কথাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা সম্মোহন করার শক্তি লুকিয়ে ছিল। পাকা পোক্ত ধাপ্পাবাজ দীনদয়াল ঘরময় ঘুরে যেতে লাগল এমন লোকের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে বলে। গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে সে টের পেল তার ঠোঁটের ওপর হার অজান্তে কয়েক ফোঁটা চোখের জল এসে পড়েছে। জিভের ওপর তাদের স্বাদটা নোনা নোনা ঠেকল।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বসে দু'গ্লাস হুইস্কি খেল সে রাতে দীনদয়াল। তারপর ফিরে এল নিজের কামরায়। মনের মধ্যে তার সৎ অসতের দ্বন্দ্ব তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে। ক্যাপ্টেনের কথাগুলো যেন অসহ্য লোভ দিয়ে কেউ তার মনের মধ্যে দাগা বুলিয়ে দিয়েছে। যতই সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সেগুলোকে তার মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করতে চায়, ততই তার মনের মধ্যে কথা-গুলো জোর করে ঠেলে বসে। শেষে সে খুব ভাল করে সাজ-পোষাক করে জাহাজ থেকে নেমে সহরে গেল। সহরে এসে দীনদয়াল তার পুরোন মনটাকে যেন ফিরে পেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, শালা চীনের পাল্লায় প'ড়ে তার যে ক্ষতিটা হল, সেটা আজ রোজগার করতেই হবে। কুচ পরোয়া নেই। রাত এখন সবে সন্ধ্যে। টাকাটা রোজগার করে নেওয়া যাবে সহর থেকেই। সে একটা ট্যাক্সি নিয়ে তাতে চড়ে বসল। ড্রাইভারকে কলকাতার একটা বনেদী বেশ্যাপল্লীর নাম করে সেখানে যেতে বলল। ড্রাইভার তাকে এনে ফেললে একটী বাড়ীর দরজার সামনে। সেই বাড়ীর একটা ঘরে একটী মেয়ের সঙ্গে সে এক লম্বা কাটাবার কড়ার করে নিল। তার মায়ের হাতে গুঁজে দিলে গোটা ত্রিশেক টাকা। এই টাকা ক'টাই তার সম্বল ছিল পকেটে। বললে, বাকি টাকা পরের দিন ব্যাঙ্ক থেকে উঠিয়ে এনে দেবে।

দীনদয়ালের চাল চলন, তার দামী স্যুট, সঙ্গে অনেকগুলো দুষ্প্রাপ্য হুইস্কীর বোতল দেখে মেয়েটীর মা আর তাকে সন্দেহই করল না। ভাবল বড় একজন জাহাজী ক্যাপ্টেন পাকড়েছে খদ্দের হিসেবে। বিলীতি মদের বোতল খোলা হল। দীনদয়াল নিজে যতো না খায় ততোধিক খাওয়ায় মেয়েটাকে। রাত এগারোটার মধ্যেই মেয়েটার বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল। সেই অবকাশে দীনদয়াল মেয়েটীর গলার সোনার হার, কোমরের সোনার বিছে তার অজ্ঞাতেই খুলে নিল। ট্রাঙ্ক হাতড়ে আরও কিছু মোটা সোনার হার গয়না সে হাতিয়ে নিল। তারপর দুপুর রাতে আস্তে আস্তে সবার অলক্ষ্যে সে সেই বাড়ী থেকে কেটে পড়ল। রাস্তায় নেমে সে লাট বাস ধরে চলে এল চৌরঙ্গী পাড়ায়। তার জানা শোনা এক জুয়েলার থাকে সুবেন ব্যানার্জি রোডে। রাতে তার দোকান খোলা থাকে ভিতরে যদিও বাইরের থেকে মনে হয় তালা বন্ধ। দীনদয়াল কয়েক বার তার সঙ্গে রাতের কারবার করেছে। সোনার গয়নাগুলো সে সেই জুয়েলারের কাছে বিক্রী করল। সমস্ত গয়নার দাম হয় সর্বসাকুল্যে হাজার আড়াই টাকা। সে ছয় হাজার টাকা নিয়ে জিনিষ-গুলো দিয়ে দিল।

দোকান থেকে বার হয়ে আসতেই তার মনে এল এক বিজাতীয় স্ফূর্তি। যে টাকাটা আজ সে খুইয়েছে সেটা হাজার খানেকের বেশী হবে না। তার বদলে এনেছে সে ছয় হাজার। এক পকেট টাকা তার। বার বার সে বুক পকেটে রাখা নোটের তাড়াগুলোতে হাত বুলিয়ে দেখতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে একটা নারী শরীরের জন্যে তার মনটা ছটফট করে উঠল। মোতিবালার কথা আবার মনে পড়ল। কিন্তু ভাবল—নাঃ আজ আর মোতিবালা নয়। মোতিবালা বড্ড নরম, বড্ড ঘরোয়া। আজ তার দরকার রক্তে আগুন ধরিয়ে দেবার মতো একটা মেয়েছেলের। তার পা দুটো তাকে টেনে নিয়ে চলল ধুকড়িয়া বাগানের দিকে। এইটাই হল কলকাতার "ইন্টার-ন্যাশনাল ব্রথেল"। যতো রাজ্যের নাবিকদের আড্ডা হয় এখানে। তবে নিম্নশ্রেণীর দেহ ব্যবসায়ী মেয়েরাই এখানে থাকে, যাদের সহজেই পাওয়া যায়। সেই রাস্তার মধ্যে ঢুকে পড়ল দীনদয়াল।

দুদিকে বস্তি। রাত প্রায় তখন একটা। কাজের বাইরের ভীড় খুব নেই। দরজায় দাঁড়ানো মেয়েদের সংখ্যাও অনেক কম। দু'দিকে নজর ফেলে ফেলে হতাশ হয়ে এগিয়ে চলল দীনদয়াল। যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাউকেই তার পছন্দ নয়। গলির শেষ মাথায় এসে সে পানের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কেনবার জন্যে একটু থামল। হঠাৎ সেই দোকানটার পাশের একটা দোতলা বাড়ী থেকে একটা মেয়ে বার হয়ে এল পান কিনতে। মেয়েটার বয়স কম কিন্তু সারা শরীর যৌবন রসে টলটল করছে। তাকে দেখেই দীনদয়ালের বুকের মধ্যে রক্ত তোলপাড় করে উঠল। তখুনি তার ঘরে ঢুকে পড়ল।

মেয়েটা চোখ মুখ মটকে বললে—সারা সন্ধ্যের খাটুনীর পর এখন যদি সারারাত ফুর্তি করতে হয় তো মদ চাই ক্যাপ্টেন সাহেব।

ভাল কথা। তাতে দীনদয়ালে পিছপাও নয়। তখুনি সে কয়েকখানা দশটাকার নোট ফেলে দিলে। একটা লোক কয়েক বোতল মদ দিয়ে গেল। দীনদয়াল পিপাসার্ত পশুর মতো গ্লাসে চুমুক মারতে লাগল। মেয়েটাও তার গ্লাস ভর্তি করে দিতে লাগল ক্রমাগত। নিজেও কয়েক গ্লাস মদ গলায় ঢালল। দীনদয়াল বাকি বোতলটার সমস্তটা তার গলায় ঢেলে দিলে। ঘোর মাতাল হয়ে উঠল। গায়ের জামা খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

(৬)

সকাল বেলা একটু ঘুম ভাঙতেই দীনদয়ালের আগে যে খেয়ালটা হল সেটা হল ডিউটীর। বেলা আটটায় জাহাজ যাবে বন্দরে তেল নিতে। তার ডিউটী আছে সেই সময়ে। হাতের ঘড়িটা ঠিকই বাঁধা আছে। তাতে দেখল বেলা সাড়ে সাতটা। চমক ভেঙে উঠে ঘরের মধ্যে ছড়ান জামা কাপড় চটপট পরে নিয়ে মেয়েটাকে ডাকল সে। মেয়েটা ঘরের এককোণে ঘুমোচ্ছে। দু'বার নাড়াচাড়া করে যখন তার ঘুম ভাঙান গেল না তখন দীনদয়াল আর অপেক্ষা না করে বাড়ী থেকে বার হয়ে পড়ল। আটটার মধ্যে তাকে জাহাজে পৌঁছতেই হবে। বেরিয়ে এসে সে একটা ট্যাক্সি ধরল। সোজা আস্তানায় ঘাটে এসে ট্যাক্সি থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে দিতে গিয়ে দেখল তার পকেটে একটাও পয়সা নেই।

হঠাৎ মনে পড়ল রাতের কথা। পকেটে রাখা দেড় হাজার টাকার কথা। মনটা হায় হায় করে উঠল। রাতে সে মাতাল হতে সেই মেয়েমানুষটা নির্ঘাৎ টাকাটা মেরে দিয়েছে। বুকড়িয়া বাগানের মেয়েরা নাকি পকেট মারতে রীতিমতো ওস্তাদ। তাই সে সকালে ঘুম থেকে তাকে ডেকে তুলতে পারেনি। সেটা তার নিশ্চয়ই আসল ঘুম নয়, ঘুমের ভান। হায় হায়, টাকাটা গেল। কম টাকা নয়, দেড় হাজার। অবশ্য ওটা পাপেরই ধন, কিন্তু গেল বৃথায়। কয়েক মিনিট অন্যমনস্ক হয়ে গেল দীনদয়াল।

ট্যাক্সিওয়ালা ভাড়ার তাগাদা লাগাল। বয়স্ত ক্রমে পিটার বলে একজন সহকর্মীও আসছিল সেই সময়ে। তার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে ট্যাক্সি ভাড়াটা মিটিয়ে দিয়ে সে জাহাজে গিয়ে উঠল।

তারপর সারা দিনের কাজের মধ্যে কেবল তার মনে খচখচ করে বাজতে লাগল ঐ একটা কথাই। চতুর দীনদয়ালের পকেট মারল একটা সাধারণ চোরা মেয়ে। তাও সামান্য টাকা নয়, দেড় হাজার টাকা। ঐ টাকায় কলকাতায় এসপ্লানেড বেশ জাঁকিয়ে ফুর্তি করা যেত।

জাহাজ তার পরের যাত্রায় যাবার আগে কলকাতার বন্দরে থাকবে দু'সপ্তা। এই সময়ে খালাসীরা কিছু কিছু ছুটী পায়। দীনদয়াল কোম্পানীর কাছ থেকে তার প্রাপ্য মাইনে ঠিক ঠিকই পেল। ক্যাপ্টেন কেলভিনকে মনে মনে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে সে এসে উঠল মোতিবালার বাড়ী।

মন কিন্তু তার খুবই খারাপ হয়ে রইল হারান দেড় হাজার টাকার জন্যে।

মোতিবালা তারি নরম মেয়ে। বাজারের মেয়ে বলে যেন তাকে মনেই হয় না। যেন ঠিক বিয়ে করা বৌয়ের মতো তার হালচাল। যতদিন দীনদয়াল তার সঙ্গে থাকে সে দ্বিতীয় পুরুষের কাছে যায় না। দীনদয়াল সমুদ্রে গেলেই সে সন্ধ্যেবেলায় দরজায় দাঁড়ায়। কলকাতা দীনদয়ালের অচানা জায়গা। তাছাড়া বাংলা সে ভাল জানে না। তাই মোতিবালার আশ্রয়ে থেকে সে অনেক জ্বালার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে।

তবু মোতিবালাকে তার ভাল লাগে না দু'চার দিন পরেই। সে ক্লান্ত হয়ে ওঠে। যতবার তার দেড় হাজার টাকার কথা মনে পড়তে লাগল, ততবারই ধুকড়িয়া বাগানের সেই কালো মেয়েটার বুনো স্বাস্থ্যটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মনে মনে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। টাকাতো গেছেই সেদিন মদ গিলে আসল ফুর্তিটাই মাটী হয়ে গেছে।

দিন সাতেক পরে সন্ধ্যাবেলা ওটী ওটী সে ধুকড়িয়া বাগানের সেই বাড়ীটাতে গিয়ে হাজির হল। দেখে দরজায় দাঁড়িয়ে সেই মেয়েটা বিড়ি খাচ্ছে। তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দীনদয়াল বললে—কিগো বিবিজান, চিনতে পার?

দীনদয়ালকে দেখেই মেয়েটার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কোন কথা না বলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ করে দীনদয়ালকে বিছানার ওপর বসিয়ে খিলখিল করে বললে—তুমি তো সে রাতের কাপ্তেন। তোমার জন্যে এই কদিন থেকে আমার খেয়ে ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই। রোজই ভাবছি আজ আসবে কাল আসবে তা কোথায় কি?

দীনদয়াল মুখ মটকে বললে—আমার ওপর তোমার এতো পীরিত?

মেয়েটা গম্ভীর মুখে বললে—যে পীরিত আমার ঘাড়ে ঝুলিয়ে রেখে গেছ সে রাতে তার জন্য আমি এ ক'দিন ছটফটিয়ে মরছি। বলেই সে তার মাথার বালিশটা টেনে নিয়ে একটা ব্লেড দিয়ে তার সেলাইটা খড়খড় করে কেটে দিলে। তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বার করে নিয়ে এল এক গোছা নোট। দীনদয়ালের হাতে সে সেগুলো গুঁজে দিয়ে বললে—নাও, গুনে নাও। এক হাজার চারশো আশী টাকা—

দীনদয়াল ইতিমধ্যে হতচকিত হয়ে গেছে! তার সমস্ত শক্তি যেন উবে গেছে, কথা পর্যন্ত বলতে পারছে না সে। পৃথিবীতে কি অসম্ভব সম্ভব হতে সুরু করেছে আজকাল। হঠাৎ ক্যাপ্টেন কেলভিনের গম্ভীর গলার স্বরটা যেন সে শুনতে পেল তার বুকের মধ্যে—আমি জানি দুনিয়ার জঘন্যতম পাপীর মধ্যেও সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বাস করেন।

একটা প্রচণ্ড আবেগের স্রোত তার বুকের কাছ থেকে ধরধরিয়ে উঠে সমস্ত অন্তর সবাকে ছড়িয়ে পড়ল। তার কড়া পড়ে যাওয়া কঠিন মন গলার ধানের পর পলিমাটির মতো ভিজে নরম হয়ে উঠল। তার চোখের পাতা ভিজে উঠল, গলার কাছটাও ভারী হয়ে উঠল। বার বার তার মনের দরজায় একটা প্রশ্ন ধাক্কা মারতে লাগল—আমি কি তাহলে এই মেয়েটার চেয়েও অধম?

মেয়েটা তার এই হতভম্ব ভাব দেখে তাকে একটা ঝাকুনি দিলে—কি গো কাপ্তেন সাহেব, কি হল বল না? টাকা কি কম পেলে নাকি? আমি কিন্তু হলপ করে বলছি তোমাকে। সে রাতে মাতাল হয়ে তুমি যখন পকেট থেকে টাকাগুলো মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলে দিলে, জামাটিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলে তখন আমি প্রত্যেকটি নোট গুণে তুলে নিয়েছিলাম। এখনও আমার অবস্থা তোমার মতো অত খারাপ হয়নি। তবু মাস খেয়েছিলুম তো বড় কম নয়। ভাবলুম যদি বেহুঁস হয়ে পড়ি। এ জায়গা তো ভাল নয়, এ বাড়ীতে যে কটা পুরুষ আছে সবকটা চোর আর গুণ্ডা। জানতে পারলে আমাকে খুন করে এ টাকা নিয়ে পালাত। তাই সে রাতে আমি বুকের কাছে নোটগুলোকে রেখে কাপড় জড়িয়ে শুয়ে পড়েছিলুম। ভেবেছিলুম সকাল হলেই তোমার জিনিষ তোমায় ফিরিয়ে দেব। তা কোথায় কি? সকালবেলা ঘুম থেকে উঠতে আমার প্রায় দশটা বাজল। দেখি কাপ্তেন সাহেব হাওয়া। আমায় সে রাতের পাওনা গণ্ডা দেওয়া নেই, টাকা পয়সায় খোঁজ নেই। সেই থেকে ভেবে মরছি লোকটা গেল কোথায়? ভগবান বাঁচিয়েছেন, তুমি আজ ফিরে এসেছ। না হলে এই টাকা নিয়ে আমি কি করতুম বল ত?

দীনদয়ালের কি হল, সে তার সমস্ত টাকাটা মেয়েটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—এর সমস্তটাই তোমার, নাও ধর।

মেয়েটা বললে—আজও কি এই সন্ধ্যে রাতে মাতাল হয়ে এসেছ? না না, অত টাকা আমার দরকার নেই। তুমি আমায় সে রাতের কুড়িটে টাকা দিয়ে যাও।

দীনদয়াল বললে—মাতাল আমি হইনি। তোমাকে আমি টাকাটা এমনি দিচ্ছি ধর।

মেয়েটা ফিসফিস করে বললে—ও টাকা নিয়ে এক্ষুণি বাড়ী যাও। এখানে হৈ চৈ কোরো না। এ জায়গা বড় খারাপ জায়গা। অতটাকা নিয়ে আমি রাখব কোথায়? না না, ও টাকা তুমি নিয়ে যাও। এখানে যখন আসবে তখন বিশ পঁচিশ টাকার বেশী সঙ্গে এনোনা এই বলে দিলুম। বলতে বলতে প্রায় জোর করে দীনদয়ালকে ঠেলে তার ঘর থেকে বার করে দিলে মেয়েটা।

(৭)

কার্জন পার্কের একটা কোণে অন্ধকারে ঘাসের ওপর পড়ে ছটফট করছিল দীনদয়াল। এই সে জীবনে প্রথম নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল। তার নিজের চেহারাটা তার চোখের ওপর ভাসতে লাগল—মনে হল তার চেয়ে অধম সে পৃথিবীতে আর কিছু দেখেনি। মনে হল তার সারা দেহে যেন কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে। তার নিজের ওপর নিজের ঘৃণা পাহাড় প্রমাণ হয়ে উঠেছে।

বোম্বেতে মানান জাহাজে কাজ করেছে সে। বহুদিনের পোড় খাওয়া নাবিক দীনদয়াল। আজ তার মনে হল তার নিজের নৌকোটারই হাল সে ধরতে পারেনি। সেটা কতকগুলো পাশবিক বৃত্তির ঘূর্ণিতে পড়ে প্রায় ডুবুডুবু। তার চাতুর্য, তার দুইবুদ্ধি ইংরিশ বলার দক্ষতা, তার অম্লানবদনে ধাপ্পা দেবার ক্ষমতা, আজ এই মুহূর্তে একটা অতি নিম্নশ্রেণীর বেজ্জার সামান্য সততার কাছে হুয়ো বলে মনে হতে লাগল। ক্যাপ্টেন কেলভিনের সে কথাগুলো তার মনে সে-রাতে সামান্য আঁচড় কেটেই ক্ষান্ত হয়েছিল, আজকের এই আচমকা আঘাতের রেখা ধরে তারা দীনদয়ালের মনে গভীর দাগের সৃষ্টি করতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সে ভিতরের অসহ্য জ্বালায় ছটফট করতে লাগল। দীনদয়ালের ছটফটানি তাকে বেশীক্ষণ কার্জন পার্কে থাকতে দিল না।

সে সটান চলে এল তার জাহাজে। জাহাজ তখন আউটরাম ঘাটের কাছে নোঙর করে দাঁড়িয়েছিল। সে প্রায় পাগলের মতো গ্যাংওয়ের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। আশপাশের থেকে সহকর্মীদের কেউ বোধহয় দীনদয়ালের নাম ধরে ডাক দিলে। সে গ্রাহ্যও করল না। সে ওপরের ডেকের সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে ওপরের দিকে উঠে যেতে লাগল। সবচেয়ে ওপরের ডেকে ক্যাপ্টেনের কেবিন। তার লক্ষ্য সেই দিকে।

ডিনারের পর ক্যাপ্টেন কেলভিন একটা ইজিচেয়ারে শুয়ে মাথার কাছে বাতি জ্বালিয়ে বই পড়ছিলেন। দীনদয়াল তাঁর কেবিনের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ক্যাপ্টেনের পায়ের কাছে। —ক্যাপ্টেন, আমাকে দয়া করে বাঁচান।

চমকে উঠে ক্যাপ্টেন কেলভিন দেখেন পায়ের কাছে পড়ে আছে দীনদয়াল। সন্দেহ হল। বোধ হয় হরদম মদ গিলে মাতাল হয়ে থাকবে। তবু তিনি তাকে দুহাত ধরে ওঠালেন। দীনদয়ালের গায়ে মদের গন্ধ পেলেন না তিনি। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাপ্টেন দেখলেন তার দুচোখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। সারাটা মুখের ভাব যেন ঝড়ে বিধ্বস্ত ভাঙা জাহাজের একটা দুঃস্থ নাবিকের মতো।

শান্ত স্নেহসিক্ত স্বরে তিনি শুধালেন—কি হয়েছে ডিন?

দীনদয়াল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—ক্যাপ্টেন আমার কনফেশান নিন।

ক্যাপ্টেন তার পাশের একটা চেয়ারে তাকে বসিয়ে বললেন—বল শুনি।

দীনদয়াল তার জীবনের জঘন্যতম অপরাধগুলোর কনফেশান দিতে লাগল ক্যাপ্টেনের কাছে। যতদূর মনে করতে পারল কিছু বাদ দিল না। শেষে সে তার নিদারুণ অভিজ্ঞতার কথা ক্যাপ্টেনের কাছে বলতে বলতে শুধাল—ক্যাপ্টেন, আমি কি তাহলে ঐ বেজ্জাটার চেয়েও অধম? আমি ঠিক করেছি এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। আপনি বলে দেন কি করলে এর প্রায়শ্চিত্ত হয়।

ক্যাপ্টেন অবিচলিত শান্তকণ্ঠে বললেন—যাই হয়, ঐ বেজ্জাটিকে অন্তত ধন্যবাদ দাও, ও তোমার ভিতরকার ঘুমন্ত ঈশ্বরকে জাগিয়েছে। কিন্তু অতীতে যা করেছ তার তো কোন সুরাহা এখন হবে না। তোমার বর্তমান পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে যে মেয়েটির গয়না চুরি করেছিলে সে যাতে তার কাছে গিয়ে অকপটে সব স্বীকার করে তার টাকাটি তাকে ফিরিয়ে দাও। গয়না বোধ হয় ফিরে পাবে না। জুয়েলার বোধহয় এতোদিনে সেগুলো গলিয়ে ইঁট বানিয়ে ফেলেছে।

দীনদয়াল শিউরে উঠল। কাতরস্বরে বললে—তাদের কাছে গিয়ে সব স্বীকার করলে তারা যে ধরে আমাকে পুলিশে দেবে। আমি কি তাহলে জেলে পচে মরব?

ক্যাপ্টেন সেইরকম শান্ত স্বরে বললেন—যদি তারা তোমাকে পুলিশে দেয়, তবে জানবে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত খুব তাড়াতাড়ি চুকে গেল। তুমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে কোরো। পারবে না তুমি এ অপরাধ স্বীকার করতে?

দীনদয়ালের মনে হঠাৎ কোথা থেকে শক্তির সঞ্চার হল। সে উঠে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের সামনে প্রতিজ্ঞা করল—ঈশ্বর শপথ, আমি পারব।

দেড় হাজারের বাকি টাকাটা সঙ্গে নিয়ে সেই রাতে সে যে মেয়েটীর গয়না চুরি করেছিল তার বাড়ি গিয়ে হাজির হল। মেয়েটীর মায়ের সঙ্গে দেখা করে সে তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করল। বললে—যা আমি চুরি করেছিলাম তার মোট দাম হয় আড়াই হাজার টাকা। সেই আড়াই হাজারের এই টাকাটা আমি এক্ষুণি দিয়ে দিচ্ছি।

বলে পকেট থেকে এক হাজার চারশো আশী টাকা বার করে দিলে। পরে বললে—বাকি টাকা আমি মাসে মাসে আমার মাইনে থেকে দফায় দফায় শোধ করব। তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর। আর যদি বিশ্বাস না করো তো আমাকে তোমরা পুলিশে দিতে পার। পুলিশে গিয়েও আমি আমার অপরাধ স্বীকার করতে রাজী। তবে জেল হলে আমার চাকরী যাবে। আমার রোজগার বন্ধ হয়ে গেলে আমি তোমাদের টাকা শোধ করবার সুযোগ পাব না। তোমরা দয়া করে আমাকে সে সুযোগ দাও।

মেয়েটীর মা কি মনে করে পুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে যায়নি। সে দীনদয়ালের কথাতেই রাজী হয়ে গিয়েছিল।

দীনদয়ালও সেই থেকে মাইনে পেলেই একটা থোক টাকা মাসের দু' তারিখে মেয়েটীর মার নামে মনি অর্ডারে পাঠাত।

এই ব্যাপারের পরেই ক্যাপ্টেন কেলভিন তাকে বুকে টেনে নিয়ে পিঠ চাপড়ে নাম দিয়েছিলেন —মাউন্ট এভারেষ্ট। তখন থেকেই দীনদয়ালের মাউন্ট এভারেষ্ট নামটা চালু। তখন থেকেই সে এক কথার মানুষ।

(৮)

গল্পের এই পর্যন্ত আমি এভারেষ্টের মুখে শুনছিলাম একেবারে তন্ময় হয়ে। এভারেষ্ট একের পর এক গোল্ড ফ্লেক সিগারেট শেষ করছিল আর গল্প বলে চলছিল। বাইরে শ্রাবণ আকাশের প্রচণ্ড ধারাবর্ষণও চলছিল অবিচ্ছিন্নভাবে। গল্পের মধ্যে আমরা এমন ডুবে গিয়েছিলাম যে কখন চাকরটা ফিরে এসেছে, কখন সে খিচুড়ী, মাছ ভাজা রান্না করেছে কিছুই টের পাইনি। খেয়াল হল যখন সে এসে জানাল—খানা তৈয়ারী।

আমরা গিয়ে খাবার টেবিলে বসলাম। গরম গরম খিচুড়ী আর ভাঙন মাছ ভাজা। দীনদয়াল দু' এক চামচ মুখে তুলে বললে—দীনদয়ালের শেষটা শুনবেন না স্যর?

বললাম—নিশ্চয়ই।

খেতে খেতেই সে গল্প করতে লাগল। ক্যাপ্টেন বলতেন—আসল মানুষ যে হবে তার মাথা হবে এভারেষ্টের চূড়োর মতো। সত্যি কথা বলা আর কথা দিয়ে কথা রাখা মানুষের মাথা চিরকাল সোজা আর উঁচু রাখে। তার প্রমাণ আমি নিজে পেয়েছি। সেই ঘটনার পর থেকে কোন অন্যায় যে করিনি তা নয় কিন্তু স্বীকার করতে পিছপাও হইনি এতটুকু। কোথা থেকে মনে শক্তি আসে। মনের ভিতরেই কে যেন বলে—কিসের ভয়ে মিথ্যে বলব? কথার খেলাপ করব কার চোখ রাঙানীতে? আমি ভয়, দুনিয়ার চোখ রাঙানীতে ভয় পাইনা। তা ছাড়া টাকা পয়সা, ঐশ্বর্য সম্পদ থাকলেই তো লোকের নানা ভয়, নানা ভাবনা। আমার ওসব বালাই নেই। লেংটার বাটপাড়ের ভয় থাকে না। কাজেই আমি লেংটা হয়ে সে আপদ চুকিয়েছি।

জিজ্ঞাসা করলাম—তা জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে এখানে এলে কেন?

এভারেষ্ট বললে—ক্যাপ্টেন কেলডিন একদিন রিটায়ার করে দেশে চলে গেলেন, আর আমারও চাকরী করা কঠিন হয়ে উঠল। পরে যে ক্যাপ্টেন এল সে একটা জানোয়ার। আমার চেয়েও ওঁচা জানোয়ার। আমার সত্যি কথা বলা তার চোখে বিষ হয়ে দাঁড়াল। প্রত্যেক ফেরে ষ্টিভেডোর-এর কাছ থেকে, ব্যবসাদারদের কাছ থেকে পয়সা খেত, জিনিষ উপহার নিত আর চালানী মালের মধ্যে তেজাল দিত। একবার বিদেশী কোম্পানী যারা মাল খরিদ করত তারা মালে শতকরা সত্তর ভাগ তেজাল বলে মাল ফেরৎ দিলে। যে ব্যবসাদার মাল বেচে সে অস্বীকার করলে। সবস্ত চার্জ এসে পড়ল জাহাজ কোম্পানীর ওপর। সেই সময়ে কোম্পানী থেকে একটা ইন্‌কোয়ারী হয় জাহাজে। আমাকে কোম্পানী সাক্ষী মানে আরও সব কর্মচারীদের সঙ্গে। আমি কোম্পানীর কাছে যা-যা ঘটে সব ব্যাপার একের পর এক বলে এসেছিলাম। অবশ্য জাহাজের মধ্যে আমিই ছিলাম একমাত্র লোক যার জবানবন্দী ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। অপর সকলে তার সপক্ষে সাক্ষী দিয়েছিল।

ক্যাপ্টেনের কিছুই হল না। কোম্পানী বিদেশী খরিদ্দারকে ইনসুরেন্সের মোটা টাকা গুণে দিল। ক্যাপ্টেন তিন দিনের মধ্যেই আমাকে এস. এস. নরফোক থেকে বরখাস্ত করলে চুরির দায়ে। কে একজন সহকর্মী ক্যাপ্টেনকে আগেই জানিয়েছিল আমি একজন ধার্মী চোর বলে।

আমি কলকাতা থেকে চলে এলাম বোম্বাই-এ। তারপর নানা কাজ করবার চেষ্টা করেছি। সরকারী অফিসে মিনিয়ালস্-এর পদ নিয়েছি, ছেড়ে দিয়েছি উপরওয়ালাদের মিথ্যে কথা বলার বহর দেখে। মার্চেন্ট অফিসে কাজ করেছি, খুচরো দোকানে কাজ করেছি, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে কুলীগিরি করেছি, খবরের কাগজের হকারি করেছি, সব কাজ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হয়েছে ঐ একই কারণে। যে সব লোকের সঙ্গে কারবার আর যাদের নিয়ে কারবার তাদের কারুর মধ্যে একজন সত্যি কথা বলার মতো লোক খুঁজে পাইনি। বড় লোক সুদখোরের বাড়ী শেষ পর্যন্ত রাঁধুনীর কাজ করেছি খানসামা হয়ে, কাজ করেছি চাকর হয়ে। সেখানে থেকেও পালাতে হয়েছে ঐ মিথ্যা কথা ও মিথ্যা আচরণের তাড়ায়।

একদিন চৌপাটীতে সমুদ্রের ধারে বসে ভাবছি কি করা যায়? যে দুনিয়ার আমি জন্মেছি তার আগাগোড়া ছবিগুলো মনের মধ্যে ভেসে উঠছে। নিজের অতীত জীবনের কথাও মাঝে মাঝে মনে উঠছে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল এমিলির কথা।

হঠাৎ খাওয়া বন্ধ করল এডারেষ্ট। মুখ তুলে বললে—এমিলির কথা মনে হতেই মনের ভিতর যেন একটা কাঁকড়াবিছে হুল ফুটিয়ে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কে এমিলি ?

এডারেষ্ট বললে—একটা কোঙ্কনী খৃষ্টান মেয়ে। এই ম্যাঙ্গালোরেরই মেয়ে। আমাদের পাশের বাড়ীতে থাকে। আমার বয়স তখন সতেরো-আঠারো। তার বয়স চৌদ্দ-পনেরো। যৌবন তখন তার সারা শরীরে চল নামিয়েছে। আমি ছেলেবেলা থেকেই বয়ে গিয়েছি। এমিলির ওপর আমার নজর পড়ল। মেয়েটা ছিল একেবারে সাদাসিধে ভাল মানুষ। দুনিয়ার ঘোরপ্যাঁচ কিছুই বুঝত না। তার ভাল মানুষীর সুযোগ নিলাম। তাকে বোঝালাম যে আমি তাকে ভালবাসি। তাকে কথা দিলাম খৃষ্টান হয়ে তাকে আমি বিয়ে করব। তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে একদিন আমি তার সর্বনাশ করলাম। ফল যা হবার তা হল। এমিলি অন্তঃসত্ত্বা হল। আর আমিও ম্যাঙ্গালোর সেই যে ছাড়লাম, ফিরেছি পঁচিশ বছর পরে।

চৌপাটীতে বসে বসে সেই সব কথা মনে হতে লাগল। এতদিন পরে হঠাৎ এমিলির মুখখানা মনের মধ্যে ভেসে উঠল। দারুণ দুশ্চিন্তা হতে লাগল—এতদিন এমিলির কি দশা হয়েছে তাই ভেবে।

এরপরে বোম্বাইয়ে আর তিষ্ঠোতে পারলাম না। ম্যাঙ্গালোরে এলাম চলে। তা এলাম প্রায় পঁচিশ বছর পরে। ম্যাঙ্গালোরে এসে এমিলিকে বার করলাম। দেখি তার অবস্থা কাহিল। আমার ফেলে যাওয়া পাপের সে প্রায়শ্চিত্ত করছে সারাজীবন ধিয়ে। সমাজ তাকে নেয়নি। সে পালিয়েছিল কোচিনে—বেশ্যাবৃত্তি করত। শেষে সে হঠাৎ রোগে পড়ল। সেই রোগ নিয়ে আর পাঁচ পাঁচটা জারজ সন্তান নিয়ে আবার এসে হাজির হল ম্যাঙ্গালোরে। আমার বরাত ভাল যে তাকে আর বেশী খুঁজতে হয়নি। ম্যাঙ্গালোরে এসেই আমি তার সন্ধান পেলাম।

এমিলির একটা ছেলে আর একটা মেয়ে হয়েছে। তারা এখানকার বড় লোকদের বাড়ী কাজ করে। তাই থেকেই এমিলির জীবন ধারণ আর বাকি তিনটে বাচ্চার ভরণ পোষণ চলছিল কায়ক্লেশে।

আমাকে দেখে সে প্রথমে চিনতেই পারেনি। তারপর আমি আমার পরিচয় দিতেই সে ক্ষেপে গেল। সে সময়ে হাতের কাছে যদি কোন অস্ত্র পেত তো বোধহয় আমাকে খুন করত। অনেক করে তাকে ঠাণ্ডা করি। সে কিছুটা ঠাণ্ডা হলে তাকে বললাম—দেখ অনেকদিন তোমাকে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছিলাম। নানা বাধায় তা আর হয়ে উঠেনি। এখন ভেবেছি আমি খৃষ্টান হয়ে তোমাকে বিয়ে করব।

এমিলি কান্নায় ভেঙে পড়ল। তা বেচারী আর কি করতে পারে বলুন ? তারপরেই আমি খৃষ্টান হলাম, এমিলিকে বিয়ে করলাম। এখন কাদারয়া ওকে চার্চে ঢুকতে দেয়। মরলে পরে একটু জমিও পাবে এমিলি। শেষ বয়সে যে ওকে শান্তি দিতে পারলাম এই মনে করে আমিও আনন্দে আছি। মাছ মারি। তাতে যা পাই টেনে টুনে চলে যায়।

কথা বলা শেষ করে এডারেষ্ট খাবারের দিকে মন দিল। সে যে মনের আনন্দে আছে তা স্পষ্ট প্রমাণ পেলাম তার খাওয়া দেখে। পরিতৃপ্ত হয়ে সে বিচুড়ী খেল। খেল অনেকখানি। হাঁড়ি শেষ করে খেয়ে ফেলল সে। চাকরকে আবার রান্না চাপাতে হল।

খাওয়া দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যর। এমন সুন্দর বিচুড়ী অনেকদিন খাইনি। আপনার চাকরটা একটা রত্ন।

তারপর সিগারেটটা শেষ করে বললে—এই শেষ। এই বাড়ী থেকে বার হয়েই আমি ভুলে যাব যে আমি নাবিক ছিলাম। সোজা ফ্রেঞ্চ যেতাম। বৃষ্টি ধরেছে আমি চলি। নৈলে, এমিলি আবার ভাববে। তারপর একটু থেমে বললে—আমি এখন খুবই গরীব। যে কুঁড়ে ঘরে থাকি তাতে ভদ্র-লোককে ডাকা যায় না। তবু যদি কখনও আসেন বড় আনন্দ হবে আমার।

মাউণ্ট এভারেষ্ট এবার উঠল। বুক চিতিয়ে মাথা উঁচু করে হন্ হন্ করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে গেল। আমি তার পিছন থেকে তার চেহারাটা দেখতে লাগলাম ঋজু, বলিষ্ঠ অথচ নিদারুণ দারিদ্র্য নিষ্পীড়িত মাউণ্ট এভারেষ্ট।

(৯)

মাছটা শুধু শুধু নিয়ে থেকে মনটা খচ খচ করছিল। ভাবছিলাম কিছু কিনে নিয়ে এভারেষ্ট এর ছেলেদের দিয়ে আসি। তাই পরের দিনই কিছু কেক, বিস্কুট, টফি, লজেন্স্ এইসব কিনে নিয়ে চাকরকে সঙ্গে করে গেলাম মাউণ্ট এভারেষ্টের বাড়ী।

না, বাড়ী তাকে কোন মতেই বলা চলে না। মেঘাবতী নদীর কিনারে একটা ঝুপড়ী। ঝুপড়ীটার উঠোন বর্ষার জলে কাদায় থৈ থৈ করছে। নারকেল পাতার ছাউনীর ফুটো দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ে ঝুপড়ীর ভিতরটাও ভাসছে। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি সেই বাড়ীর সামনে গিয়ে ডাক দিলাম—এভারেষ্ট।

এভারেষ্ট বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে বলল—একি মোশাই! আসুন মোশাই, আসুন।

বলেই অপ্রস্তুত হয়ে বললে—কোথায় বা বসবেন? আসুন এই চৌকীর ওপরেই বসুন।

দেখলাম সেই ভাসমান রাজত্বে নোয়ার নৌকোর মতো একটা চৌকী পাতা আছে। তার ওপর সোটাকতক শিশু চুপচাপ বসে। আর একপাশে ঝুপড়ীর দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে এক নারী শরীর। তার শরীরের দিকে নজর দিয়ে আমি শিউরে উঠলাম। শরীরটা ও মুখখানা দেখা যায় না। দেখা গেল শুধু দুটো পা। বীভৎস প্রকাণ্ড হাতির পায়ের মতো ঢিবি ঢিবি দুই মাংসের ভাল, দু'পায়ে দুই গোদ।

এভারেষ্ট পরিচয় করিয়ে দিল—এই হল এমিলি।—এমিলি সরে বস একটু, মোশাইকে বসতে দাও।

এভারেষ্টের কথায় সেই নারী দেহটা একটু নড়ে চড়ে উঠল। দেখলাম তার উর্ধ্বাঙ্গ পাটকাঠির মতো ক্ষীণ। যেন ওপরের দেহের সমস্ত মাংস নেমে এসেছে দুই পায়ে। মেয়েটি অতিকষ্টে তার ওপরের দেহটা বাড়িয়ে দিয়ে চিঁ চিঁ করে বললে—নমস্কার। বসুন।

(১০)

এভারেষ্টের বাড়ী থেকে ফিরে এলাম দশ মিনিটের মধ্যেই। বাড়ী ফিরে এসে কেবলই একটা কথা মনে পড়তে লাগল—ক্যাপ্টেন কেলভিন হীনদয়ালের নাম দিয়েছিলেন এভারেষ্ট। যথার্থ নামই দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মনে হল হীনদয়াল এভারেষ্টের চেয়েও বড়। তার চেয়ে অনেক উঁচু।

———

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

আনন্দ উৎসবে জন্মভূমির সেবার ডালি সাজিয়ে তুলুন

জাতীয় সঞ্চয় পরিকল্পনার লাভ [illegible]

- ১২-বছর মেয়াদী জাতীয় প্রতিরক্ষা সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪ ½ %
- ১০-বছর মেয়াদী প্রতিরক্ষা ডিপোজিট সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪ ½ %
- ১২-বছর মেয়াদী অ্যানুইটি সার্টিফিকেট : সুদের হার ৪·২৫% (চক্রবৃদ্ধি হারে)
- পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট : সুদের হার ৩% (মাত্র ২৲ টাকায় অ্যাকাউন্ট খোলা যায়)
- ক্রমবর্ধমান নির্দিষ্ট মেয়াদী ডিপোজিট পরিকল্পনা : সুদের হার ৩·৩% থেকে ৪·৩%

(এই সব লগ্নীর সুদ আয়করমুক্ত)

বিস্তারিত বিবরণের জন্য নিকটবর্তী পোস্ট অফিসে অনুসন্ধান করুন

আপনার প্রিয় সব কিছু
রক্ষার জন্য
আরও বেশী সঞ্চয় করুন

পরিচয়ের সহযোগে প্রচারিত

আপনার সঞ্চয় জাতির শক্তি

WB-7

হৃদয় আমার নাচেরে

দক্ষিণারঞ্জন বসু

এই উৎসবের আনন্দের মধ্যেও অমনভাবে তুমি কী এত ভাবছ এলিস!—পথ চলতে চলতে হঠাৎ সঙ্গিনীকে চিন্তাকুল দেখেই প্রশ্ন করলে অশান্ত ক্লোঁদ।

ভাবছিলাম, কোথায় তুমি আমাকে নিয়ে চলেছ এবং আমিই বা কোথায় চলেছি।

তার মানে? এই রথ সোড়ানোর উৎসব তা'হলে মোটেই মনে ধরেনি তোমার? অথচ আজকের এই পঁচিশে জানুয়ারি তারিখটির জন্যে সারা ফ্রান্সের তরুণ শিল্পী সমাজ কত আগ্রহ নিয়েই না অপেক্ষা করে থাকে!

ক্লোঁদের কথার আর কোনো জবাব দেয় না এলিস। মুখ বুজে দলের সঙ্গে হাঁটতে থাকে। কিন্তু আর যে হাঁটতে পারছে না সে। সে তো আর শিল্পী নয়, তবু ক্লোঁদ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে এই উৎসবে, নিজেও রং মেখে কিম্ভূতকিমাকার সেজেছে এবং তাকেও বিশ্রী রকমের একটা সং সাজিয়েছে।

এমন সুন্দর সুন্দর রথগুলিকে পুড়িয়ে ফেলবার পরেও আর আনন্দ করার কী থাকতে পারে, রাত জেগে রাস্তায় রাস্তায় এমনি হল্লা করারই বা কী মানে তা বুঝতে পারে না ইংরেজ দুহিতা এলিস। কাঠ ও কাগজের তৈরী অপূর্ব শিল্প-নিদর্শন এক একটি বিরাট বিরাট রথ। কোনো কোনোটা চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত উঁচু। এর চেয়ে ছোট ছোট বহু রথ তো আছেই। সন্ধ্যা রাতে এই সব রথ নিয়ে শিল্পী তরুণ-তরুণী ও আর্টের ছাত্রছাত্রীরা বিরাট মিছিল করে বেরোয় ব্যাণ্ডপার্টি সহ। আর্ট কলেজ স্টুডিও থেকে সে মিছিল এগিয়ে চলে ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পী সাহিত্যিকদের কবরখানা প্যাথেওর দিকে। শ্রীমতী এলিস সেই মিছিলের সঙ্গে সঙ্গেই ঐ কবরখানা অবধি এসেছে। তবে সে অবশ্য আর সবার মতো 'চলো, চলো, প্যাথেও চলো' বলে চিৎকার করেনি বা ধ্বনি তোলেনি। পূর্বাচার্যদের মতো বিখ্যাত হয়ে আজকের তরুণ শিল্পীরাও যাতে প্যাথেও কবরখানায় ভবিষ্যতে সমাধিস্থ হতে পারে তার জন্যেই তাদের এই স্লোগান, প্যাথেওতে তাদের এই বার্ষিক রথসোড়ানোর উৎসব। কিন্তু শ্রীমতী এলিস তো শিল্পী নয়, কাজেই সে আর ঐ স্লোগানে দিতে যাবে কেন? ক্লোঁদের তাগিদে সে এসেছে শুধু দেখতে, ও উৎসবটা আসলে কি তা' ভালো করে বুঝতে।

একটি একটি করে রথ সোড়ানোর সময় চতুর্দিকের বাজি সোড়ানোর হিড়িকের মধ্যে বেশ হিমসিম খেতে হয়েছে এলিসকে। তার আবার এক একটি জলন্ত রথকে ঘিরে হাত ধরাধরি করে আন্তরারা নৃত্যের সে কি ধুম! তার পরেও রাস্তায় রাস্তায় এমনি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে কী করে তাই মনে মনে চিন্তা করে এলিস। শুধু রং-এ নয় ক্লান্তির কালিমাতেও তার চোখ মুখ যে বিবর্ণ হয়ে গেছে তাও সে বেশ বুঝতে পারছে।

না, আর এক পা-ও সে এগোতে পারবে না। একটা বিরাট বাড়ির দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে শ্রীমতী এলিস।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা ধরা পড়ে অগাস্ত ক্লোঁদের কাছে। সেও এলিসের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তাকে এসে বলে, বুঝেছি তুমি আর হাঁটতে পারছ না। বলেই একটা ক্যাবকে থামিয়ে তাতে দু'জনে উঠে পড়ে, মধ্যরাত পার করে দিয়ে ওদের পেনসনে ফিরে যায়।

সেদিন বাকি সমস্তটা রাত এলিসের মনে সে কী তোলপাড়! এক বিন্দুও সে ঘুমুতে পারেনি। প্রায় একবছর ধরে সে প্যারিসে পড়াশোনা করছে। অনেক ছেলের সঙ্গে সে মিশেছে, কারো কারো সঙ্গে তার ভাবও হয়েছে, কিন্তু ক্লোঁদে তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে এলিস ভেবে ভেবে তার কোনো কূল কিনারাই করতে পারছে না।

সে নিজেই ভুল করেছে। প্রথম দিনের ওরকম ঘটনার পর ক্লোঁদকে আর কোনো রকম আমল দেওয়াই উচিত হয়নি তার। উঃ কী ভয়ঙ্কর ঘটনা! কী ভীষণ রকমের দুঃসাহস ক্লোঁদের! শুয়ে শুয়ে এমনি ভাবে আত্মচিন্তা করে চলেছে এলিস এবং রাত্রিদেবীও খুটি খুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে ভোরের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে যাবার তাল করছেন।

গত কয়েকদিনের ঘটনা এলিস নিজেকেই নিজে বলে চলে।

সাত দিনের ছুটিতে এলিস বাড়ি গিয়েছিল বাবার গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে। একজন অবসরপ্রাপ্ত বৃটিশ জেনারেল ওর বাবা উইলিয়াম ব্রিগস্। লণ্ডনের উপকণ্ঠে প্যাডিংটনে ওদের বাড়ি। বাবা অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। তাই আর ছুটি নিতে হয়নি এলিসকে, মাত্র তিন দিন আগে সে ফিরে এসেছে। একই ট্রেনে একই কামরায় লণ্ডন থেকে ফিরছে অগাস্ত ক্লোঁদও। নিজের কি একটা কাজে সে একদিনের জন্যে লণ্ডনে গিয়েছিল। একই কামরায় পাশাপাশি আসনে বসে এলিসের সঙ্গে গল্প করতে করতে সে এসে প্যারিসে পৌঁছেছে।

আগে থেকেই কথা, ক্লোঁদই এলিসকে তার পেনসনে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

সিতে ইউনিভার্সিতে অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় নগরী এলাকাতেই সেই 'পেনসন' হোটেল। এলিসের ইস্কুলের খুবই কাছে। আকাদমি ভ প্যারিসের অধীন তার সেই ইস্কুলের সঙ্গে এ 'পেনসন'-এর ঘনিষ্ট যোগাযোগ। তাই খুব নিঃসঙ্গ চিত্তেই এলিস এখানে থেকে কয়েকমাস ধরে পড়াশুনা করে চলেছে। ছোটবেলা থেকেই তার খুব সখ ইয়োরোপের মনোজগতের রাজধানী প্যারিসে সে তার পড়ার জীবন কাটাবে। বাবা-মা'র মত আদায় করে নিয়ে সে ইচ্ছেকে সে পূরণ করতে চলেছে। আসছে বারই বাকালিয়ার ডিগ্রী নিয়ে সে সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং তা' ভেবে তার কত আনন্দ।

কিন্তু কয়েকদিনের ঘটনাবলী এলিসের কল্পনারাজ্যে কেমন যেন একটা অভাবনীয় ওলট পালট এনে দিয়েছে। এমন দ্রুতগতিতে এসব ঘটতে পারে এ সে কখনো ভাবতে পারেনি। একের পর এক সে সব ঘটনাই সে শুয়ে শুয়ে আপন মনে আউড়ে চলেছে।

হ্যাঁ, সেদিন রেল স্টেশনে ক্লোঁদই একটা ক্যাব ভাড়া নিলে। আমাদের দু'জনের মালপত্রই আমরা তাতে তুলে নিলাম। কিন্তু গাড়িটা শহরকে পাশ কাটিয়ে অনেক দূরে একটা নিরালা এলাকায় চলে আসতেই আমার চমক ভাঙলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ তুমি কোথায় নিয়ে চলেছ আমাকে?

ক্লোঁদ একটু হেসে খুশিতে উজ্জ্বল তার মুখখানাকে এগিয়ে আনলে আমার মুখের দিকে। কিন্তু আমি আমার মুখ সরিয়ে নিতেই সে বুঝতে পারলে যে, সে যা চাইছে তা' হবার নয়।

বেশ কিছুটা ঘুরে শেষ পর্যন্ত আমাদের 'সেলুন'-এর সামনেই এসে দাঁড়িয়ে গেল গাড়িটা। আমি যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার সামান্য জিনিষ-পত্র নিয়ে নিজের ঘরে উঠে এলাম।

ট্রেন জার্নিতে ভারি ক্লান্ত। তারপরে আবার এতক্ষণ ধরে মোটর গাড়িতে ঘোরাঘুরি। একবার স্নান করে না নিলে শরীরটা ভালো লাগবে না। এই ভেবেই সোজাসুজি বাথরুমে চলে গেলাম।

তিনতলার পরপর চারটি বেডরুমের ঠিক উল্টোদিকে সবার জন্যে একটি মাত্র বাথরুম। আর ঠিক তার পাশেরই ঘরটা যত রকমের আবর্জনায় ভরতি।

সন্ধ্যেবেলায় ফেইরা আর কোটেলে বসে থাকে প্যারিসের মতো শহরে। আমি তাই মনের আনন্দে স্নান করে চলেছি বাথটাবে দাঁড়িয়ে সাওয়ারটা খুলে দিয়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য, সেখানে অকস্মাৎ এক পুরুষের আবির্ভাব! সে পুরুষ আর অন্য কেউ নয়, তারই সদ্য পরিচিত তরুণ বন্ধু স্বয়ং অশান্ত ক্লোঁদ! তাকে দেখেই আমার সমস্ত শরীরটা যেন শক্ত হয়ে গেল। তাকে আর কিছুই আমি বলতে পারলেম না, শুধু বললাম, তুমি ভারি অসভ্য, বেরিয়ে যাও এখান থেকে।

ক্লোঁদও কেমন যেন চমকে উঠলো আমার কথায়। একটু হেসে জবাব দিলে, ঠিক আছে মাই ডিয়ার, তুমি ইংরেজ মেয়ে প্যারিসে নতুন। আমায় ক্ষমা করো। আমি পরে তোমার সঙ্গে দেখা করবো। এখন তা' হলে যাই।

এই বলেই হাসতে হাসতে ক্লোঁদ বেরিয়ে গেল বাথরুম থেকে। অদ্ভুত সেই হাসির হাওয়ায় থরথর করতে থাকলো বাথরুমটা এবং আমিই বা কি করে অস্বীকার করবো যে ক্লোঁদের সে হাসি আমার খুবই ভালো লেগেছিল।

হ্যাঁ, সে চলে যাবার আগে আরো দু' একটি কথার বিনিময় হয়েছিল আমার তার সঙ্গে। খুব আস্তে করে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী করে তুমি এখানে ঢুকলে?

সে প্রশ্নে ক্লোঁদ হাসলে একটু।

তারপর উত্তরে বলে, ও, তুমি ঐ তালার কথা ভাবছো। আজ দু'দিন ওটা খারাপ হয়ে আছে। এ অবস্থার সঙ্গেই তোমায় মানিয়ে চলতে হবে। আমি তোমার পাশের ঘরেই রয়েছি।

ক্লোঁদ বেরিয়ে যাবার পর আমিও আর বেশিক্ষণ বাথরুমে থাকতে পারিনি। খুব তাড়াতাড়ি করে কোনো রকমে সারাটা গা মুছে নিয়ে ড্রেসিং রোবটা জড়িয়ে এক ছুটে চলে এসেছি নিজের ঘরে। আমার ভাববার তখন শুধুই ক্লোঁদ, আর কিছু নয় আর কেউ নয়—শুধু অশান্ত ক্লোঁদ। সে আমার পাশের ঘরেই নাকি রয়েছে, কোনো গুপ্ত জানালা দিয়ে সে আমায় দেখতে পাচ্ছে না তো আবার?

একথা ভাবছিলাম আর আমার খাটো পায়জামাটা পরছিলাম। সেরাল ভেদ করেই ক্লোঁদের কণ্ঠ তখন ভেসে এলো, বেশি দেরি করো না, আমি তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছি।

কিন্তু আমি যে এখন শুয়ে পড়বো ভাবছি। জবাব গেল আমার দিক থেকে।

পাগল নাকি, এত সকালে প্যারিসে কেউ ঘুমুতে যায়? লোকে শুনলে হাসবে যে! চলো, এক সঙ্গে কোনো একটা ভালো জায়গায় গিয়ে পানাহার সেরে আসি।

ক্লোঁদের এ কথার আর কোনো উত্তর দিইনি আমি। আমার ঘরের ঠিক মাঝখানে আমি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ ক্লোঁদ আবার আমায় ডাকলে।

শুনছো! তাড়াতাড়ি সাজগোজ করে বেরিয়ে এসো। আর নয়তো যেমনি আছে তেমনি অবস্থাতেই আমি তোমায় জোর করে ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসব।

আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম ক্লোঁদের কথা শুনে। সে যে ধরণের লোক তাতে জোর অবরদস্তি ঘরে ঢুকে আমায় এই সটপরা অবস্থাতেই টেনে বার করে নেবার চেষ্টা করলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। তাই ভয়ে ভয়ে তার কাছে দু'চার মিনিট সময় চাইলাম।

বেশ, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসা চাই কিন্তু।

সাজগোজের জন্যে পাঁচ মিনিট সময় যথেষ্ট করলেও তারই মধ্যে আরো দু'বার তাগিদ এলো ক্লোঁদের তরফ থেকে। তবে সহজ সরল ইংলিশ পোষাকে সেজে আমি যখন আমার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, দেখতে পেলাম আমারই দরজায় ক্লোঁদ আমার জন্যে অপেক্ষমান। দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে আমায় অভিনন্দন জানালে, নিচে আমায় ধরে ধরে নামালে তিনতলা থেকে এবং নামতে নামতেই বল্লে, তোমায় পেয়ে সত্যি সত্যি আমাদের দলের মর্যাদা বেড়ে গেল। তবে দেখবে, যেন আবার মুটিয়ে যেও না। বাস্তবিকই কি বলবো, ভারি সুন্দর লাগছে তোমায়!

মাত্র একদিন আগে ইংল্যাণ্ডে আমায় যদি এমনি ভাষায় কেউ কিছু বলতো আমি হয়তো তাকে অপমান করে দূরে সরিয়ে দিতাম। কিন্তু ক্লোঁদের এ কথায় মোটেই আমি বিরক্ত বা আহত বোধ করলাম না, আশ্চর্য! বরং হাসতে হাসতেই তাকে বল্লাম, সত্যি সত্যি দেখছি তুমি সাংঘাতিক লোক এবং আমার মা-বাবা ঠিক এমনি লোক সম্বন্ধেই আমায় বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলে দিয়েছেন।

এর উত্তরে আর কিছুই বলেনি অসাস্ত ক্লোঁদ, আমায় বাহুবন্ধনে বেঁধে নিয়ে দ্রুত পায়ে দুটপাত দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

তুমি বড্ড বেশি তুকার্ত বলে মনে হচ্ছে।—মৃদু প্রতিবাদের সুরেই আরেকটু ধীরে চলবার ইংগিত দিলাম ক্লোঁদকে।

সে কিন্তু উত্তরে বল্লে চলবার কথা। বল্লে, ক'দিনেরই বা আমাদের এই জীবন, কিন্তু তৃষ্ণা যে অন্তহীন! তাড়াতাড়ি না করলে চলবে কেন?

ক্লোঁদের ঐ কথা দু'টি আমার ভারি ভালো লেগেছিল। তবু আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমি হাই-হিলের জুতো পরে রয়েছি, দৌড়ে চলায় আমার অসুবিধে। কিন্তু আমার সে কথায় কোনো ভ্রুক্ষেপই করেনি ক্লোঁদ, বরং ঠাট্টা করে বলেছে, ও হাই-হিল নেহাৎই কাঁপা বলেই আমার ধারণা। চলো, আরেকটু এগিয়ে চলো, আঁশেনে তোমার জুতোর গলা অবধি কেমন তরতি করে দিই, দেখবে।

ছুটতে ছুটতে আমরা যখন সুন্দর ছোট্ট একটি কাঁফেতে গিয়ে বসলাম ক্লোঁদ কিন্তু আঁশেনের অর্ডার দিলে না, সে কিছু খাবার এবং দু' গ্লাস কমিয়াক আনতে বলে। তার ধারণা, আমি অন্য কোনো ড্রিঙ্ক চাইবো না, কমিয়াকেই খুশি হবো।

কাফের দেয়ালে আঁকা সুন্দর ছবিগুলোর দিকে চোখ বুলোচ্ছিলাম, রেডিওর মৃদু সঙ্গীতের সুর কেমন একটা মোহময়তার সৃষ্টি করে চলেছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি হঠাৎ কি যেন ভাবতে ভাবতে প্রশ্ন করে বসলাম ক্লোঁদকে, তুমি কি অমনি ভাবে বাথরুমে ঢুকে পড়েই মেয়েদের সঙ্গে পরিচয় করো?

প্রশ্ন শুনে ক্লোদ হেসেই অস্থির।

কী যে বলো, সে সৌভাগ্য কি আর সব সময় সম্ভব? তবে সন্ধ্যেবেলায় বাথরুম বন্ধ থাকে না এ শহরের কোনো বাড়িতে বা হোটেলে। আমি তাই ঢুকে পড়েছিলাম। এটা তোমার জেনে রাখা উচিত, প্যারিসে যে কোনো ঘটনাই ঘটতে পারে, সাবধান।

হাঁ, আমিই তাই ভাবছিলাম কালই বাথরুমের সিটকিনিটা ঠিক করে নেবো। —একথা বলতেই ক্লোদ আরেক ঝলক অমায়িক হাসি আমার উপহার দিলে। তারপর ছোট্ট জবাবে বলে, তা' সত্ত্বেও বাথরুমেই মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হতে পারে! তা' না হলে প্যারিস?

এরপর আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিলাম। তবে মনে মনে ক্লোদকে বাহবা না দিয়ে পারিনি। সত্যি সত্যি আমার খুবই ভালো লেগেছে ওকে। এমন ছেলেকে ভালো না বেসে পারা যায় না। আহা, প্যারিসিয়ান হয়েও কী সুন্দর ইংরেজী বলে ক্লোদ! তা' ছাড়া ওর স্পষ্টবাদিতাও আমায় ভারি অবাক করে দেয়। জানি আমার বাবা-মা পছন্দ করবেন না, তবু ক্লোদকে আমার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়।

চুপচাপ বসে একথাগুলোই ভাবছিলাম। কখন টেবিলে কনিয়াক এসেছে খেয়াল ছিল না। ঠিক যেন স্বপ্ন দেখছিলাম। স্বপ্ন ভাঙলো ক্লোদের ডাকে। সে তার হাতে গ্লাস তুলে নিয়েছে। আমাকেও ইঙ্গিত করলে গ্লাস তুলতে। গ্লাসে গ্লাসে ঠোকাঠুকি। আমার স্বাস্থ্য কামনা করে সে পান করলে কিছুটা কনিয়াক। আমাকেও এক চুমুক পান করতে হলো। কিছুটা তরল আগুন যেন আমার গলাটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিয়ে কোথায় গড়িয়ে চলে গেল। আমার চোখে জল দেখে বেশ একটু উদ্বিগ্নই হয়ে পড়েছিল ক্লোদ। কনিয়াকের স্বাদ আমার জানা ছিল না, একথা শুনে সে একেবারে অবাক। তবু তো আমি বলিনি যে, এমন কি খৃষ্টমাসের আনন্দ উৎসবেও হাইসিনের চেয়ে কড়া কোনো মদ আমার বাবা-মা আমাকে কখনো স্পর্শও করতে দেননি। এ জানলে ক্লোদ আরো আশ্চর্য হতো।

কিন্তু এও কি কম বিস্ময়ের কথা যে সেই মেয়েই আমি এ যাত্রার লণ্ডন ছাড়বার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ট্রেণে এক অপরিচিত তরুণের অনুরোধ রাখতে গিয়ে প্রথমে শ্যাম্পেন পান করেছি এবং সেই সে তরুণ যে অকস্মাৎ আমার বাথরুমে আবির্ভূত হয়ে আমায় কুণ্ঠিত করেছে তারই সঙ্গে বসে এক নিরালা কাফেতে কনিয়াকে মেতে উঠেছি?

মদ খেতে খেতেই ক্লোদ আমাকে খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। হঠাৎ একবার বলে ফেলে, সত্যি সত্যি তুমি সুন্দরী। একটু থেমে আবার বলে, বিলিতি মেয়েদের গায়ের রঙ এমনিতেই সুন্দর, কিন্তু তোমার বেলায় সেটা বড়ো কথা নয়, তোমার গড়নটাই চমৎকার বলে আর্টিস্টিক।

শুনে আমি তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিলাম। আমার সারা মুখ জুড়ে আমি যেন কেমন একটা জ্বালা অনুভব করছিলাম। কিন্তু এত প্রশংসার পর কিছু না বলে কী মনে করবে ক্লোদ? তাই তাকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে আমার কৃতজ্ঞতা জানালাম।

এরপরে কথার মোড় ঘুরিয়ে নিলে ক্লোদ নিজেই। তার গল্প বলার ধরণই আলাদা। কথার ভাণ্ডারও তার যেন অফুরন্ত। সে ঠিকই বলেছে, প্যারিসে আমি খুব বেশিদিন আসিনি এবং এ আশাও সে পোষণ করছে যে ইংরেজ মেয়ে হলেও আমি তেমন খুব একটা লজ্জাবতী হবো না।

বেশি সাহস হওয়াটা কোনো কাজের কথা নয়। তাতে জীবনের ওপর সময় সময় কঠিন আঘাত আসে, হতাশা এসে পীড়া দেয়। —এমনি সব কথা বলেই শামুকের খোল থেকে আমায় টেনে বার করার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছিল ক্লোঁদ এবং আমি যে তা' বুঝতে পারছিলাম না তা' নয়। বরং তার এ দক্ষতায় আমি মনে মনে আনন্দই উপভোগ করছিলাম।

দেখলাম, এক গ্লাস কনিয়াক নিয়ে একটি সন্ধ্যাকে পার করে দেওয়া যায় অনায়াসে। একটু একটু করে কনিয়াক পান করছিল ক্লোঁদ। আমি লক্ষ্য করছিলাম। আমার দিকে তাকিয়ে একবার ছোট্ট একটি প্রশ্ন করলে যে, তুমি কি খুব ধনী লোকের মেয়ে?

না, মোটেই নয়। বলতে পারো, মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে আমি। আমার বাবা একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। আমি জানি, আমায় প্যারিসে রেখে পড়াতে তাঁর বেশ কষ্টই হচ্ছে।

এ শুনে আমি খুবই আনন্দিত। বড়লোকের মেয়েদের আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে, তবে তেমন একটিকে পেলে হয়তো বিয়ে করে ফেলতে পারি শুধু এই আশায় যে সেই ধনীর মেয়ের প্রচুর অর্থে আমি প্রতি সন্ধ্যায় আমার মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে আমোদ-ফূর্তি করে বেড়াতে পারবো। —ক্লোঁদের এ কথায় আহত বোধ করলাম আমি, তবে তার কোনো প্রকাশ ঘটতে দিইনি আমার কথাবার্তায়। আমি শুধু তার কথার উত্তরে বল্লাম, তা' হলে দেখছি, তুমিও বড়ো লোকের ছেলে নও, যদিও বড়ো লোকের জামাই হবার সখ রয়েছে।

কিঞ্চিৎ দুঃখের সঙ্গেই যেন সে ঘাড় নাড়লে। জানালে, ঠিকই, সে বড়ো লোকের ছেলে হয়ে জন্মায়নি, তবে জন্মেছে সে নেপলসে প্রকৃতির দুলাল হয়ে। এর চেয়ে বড়ো কথা আর কী হতে পারে? সে একজন মস্ত বড়ো শিল্পী হবেই, বেশ জোরের সঙ্গেই ক্লোঁদ সে কথা বল্লে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা' হলে তুমি শিল্পের ছাত্র? ক্লোঁদ মাথা নেড়ে স্বীকার করলে। বল্লে, শহরতলীতে আমার বাড়ি। বাবা খুব বড়োলোক না হলেও প্যারিসে থেকে পড়াশুনা ও শিল্প-শিক্ষার জন্যে আমায় তিনি খুব কম টাকা দেননা। নিজের স্টুডিও ছাড়া শিল্পশিক্ষা ঠিক হয় না, সেজন্যেও তিনি আমায় যথেষ্ট টাকা দিয়েছেন। আমি আগে যে পেনসনে ছিলাম সেখানে স্থানাভাব ছিল। তাই মাত্র পাঁচ-ছয় দিন হলো তোমার ঐ 'এ্যাট হোম' পেনসনে এসেছি। ঘরটা বেশ বড়ো। এখানে বাড়িতে স্টুডিও করেছি এবং এখানেও বেশ ছবি-পত্র সাজিয়ে নিয়েছি। তোমার ঘরের জানালা দিয়ে মাথা গলিয়েই তুমি তা' দেখতে পাবে।

একটু থেমে কি যেন ভেবে নিয়ে আরেক চুমুক কনিয়াক টানলে ক্লোঁদ। আমাকেও একটু খেতে বলো। তারপরেই আবার সে বল্লে, জানো, এলিস, বাবা আমায় যত খরচই দিন না কেন আমার তাতে কুলোয় না। বাধ্য হয়েই আমাকে বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এবং পত্র-পত্রিকায়, কমার্শিয়াল আর্ট কাজ করতে হয়। এবার তোমার কথা বলো, শুনি।

কিন্তু আমার কথা কী আর বলবো, কীই বা বলার আছে? বাইরের জগতের সঙ্গে এতকাল আমি অপরিচিতই ছিলাম। বাবা-মা তাঁদের ভালোবাসা দিয়ে আমায় ঘিরে রেখেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টির বাইরে যাবার কোনো উপায়ই আমার ছিল না। এ বয়েস পর্যন্ত কীভাবে আমার জীবন কেটেছে, আমার দু'একটি কথা শুনেই ক্লোঁদ তা' আঁচ করে নিয়েছে। আমার জন্যে তাঁর মন সহানুভূতিতে

ভরে উঠেছে। সেই মুহূর্তে অন্ততঃ চেহারার পরিবর্তন দেখে আমার তাই মনে হয়েছে এবং তার কথা থেকেও আমি সে ধারণাই করেছি।

ক্লোঁদ স্পষ্ট করেই বলে, আগের জীবনের কথা একদম তুমি ভুলে যাও এলিস। আজ থেকে তোমার জীবনের নতুন অধ্যায় সুরু হলো। মনে রাখবে জীবনটা একলা মাটি নয় যে যেখানে যেমন করে ইচ্ছে ফেলে রাখবে। সমস্ত হতাশা ও নৈরাশ্যকে দূরে ঠেলে ফেলে হাসিতে হল্লায় এ জীবনকে পূর্ণ করে রাখতে হবে। এই বলেই ক্লোঁদ টেবিল থেকে কনিয়াকের গ্লাসটি আরেকবার উঁচু করে তুলে ধরে আমার শুভ কামনা জানালো। মুখ থেকে গ্লাসটি নামিয়ে রেখে উচ্ছল একটি ঘোষণা করলে সে, তোমার জীবন আনন্দময় হোক।

ক্লোঁদের সেই ঘোষণায় অভূতপূর্ব একটা উচ্ছ্বাস আমি অনুভব করেছিলাম, কিন্তু এমন একটা অবসাদ আমায় পেয়ে বসেছিল যে আমি আর কোনো কথাই বলতে পারছিলাম না। আমার সে অবস্থাটা ক্লোঁদেরও দৃষ্টি এড়ায়নি। সে তাই আর দেরি না করে আমায় নিয়ে পেনসনে ফিরে আসে।

আমি বেশ ভয়ে ভয়েই তার সঙ্গে ফিরছিলাম। কেবলই ভাবছিলাম, বিদায় নেবার সময় ক্লোঁদ যদি আমায় চুমু খেবার চেষ্টা করে তখন আমি কী করব। কিন্তু আশ্চর্য, সে তেমন কোনো চেষ্টাই করলে না। আমাকে আমার ঘরের দরজায় ছেড়ে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলে। তার নিজের ঘরে সে চলে গেল।

খুবই ক্লান্তিবোধ করছিলাম আমি ঠিকই। কিন্তু ভালোবাসার একটা যন্ত্রণাবোধও ছিল তার সঙ্গে। ভালোবাসাটা যে কি তাও ক্রমশঃ আমার কাছে যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। যন্ত্রণার মধ্যেও একটা অভাবনীয় আনন্দের অনুভূতি আমায় ঘুম পাড়িয়ে দিলে। পরদিন যখন জেগে উঠলাম বয়সে তখন আমি চল্লিশ ঘণ্টা বেড়ে গেছি, কিন্তু অভিজ্ঞতায় আরো অনেক বেশি।

এ কয়মাসেও ভালো করে আমার ফ্রেঞ্চ শেখা হয়নি। অথচ এ পেনসনে ব্রেকফাষ্ট বা লাঞ্চ-ডিনার টেবিলে বসে ফরাসী ভাষায় কথা বলাই রীতি। প্রথম প্রথম তাই প্রায় মুখ বুজেই আমায় খাওয়া-দাওয়া করতে হয়েছে। কিছু কিছু কথা যা ফাঁকে ফাঁকে শিখে নিয়েছি এবং ইস্কুলে যেটুকু ফ্রেঞ্চ শিখেছি তাতে কাজ চলে যায় বটে তবে ভাঙা ভাঙা ভাষায় কথা বলে কোনো আনন্দ পাওয়া যায় না। ক্লোঁদের সঙ্গে মন খুলে ইংরেজীতে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমার ভারি সুবিধে হয়েছে। সেদিন ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চে দু'বেলাই সে আমার পাশে থাকায় খাওয়ার সময়টা আমার বেশ আনন্দে কেটেছে।

বিকেলবেলা সেদিনও আমরা বেড়াতে বেরুলাম। রবিবার, বেড়াবারই দিন। তবে আগের দিনের মতো শুধু আমি আর ক্লোঁদ নই, সেদিন আমরা কয়েকজন মিলে এক সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। তার মধ্যে প্রায় সবাই ক্লোঁদের শিল্পী বন্ধু। একজন শুধু আমার বান্ধবী সুনা।

কয়মাস ধরে প্যারিসে থাকলেও দু'হাজার বছরের পুরনো এ শহরের খুব সামান্যই আমি জানবার সুযোগ পেয়েছি। তার একটা কারণ, আমি খুব বেশি সাবধান হয়ে এখানে চলাফেরা করে থাকি। আমি জানি ফরাসীরা ইংরেজদের ওপর ভারি চটা। ফরাসীদের বিশেষ করে প্যারিসিয়ানদের ধারণা, ক্লাশ এবং এদেশবাসীদের দুর্নাম রটনা ইংরেজদের একটা পেশা। তাই একমাত্র লেখাপড়ার ব্যাপার ছাড়া আর সব কিছু থেকেই এবং সবার কাছ থেকেই আমি নিজেকে দূরে দূরে রেখে

চলেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফরাসী তরুণ শিল্পী ক্লোঁদের পাল্লায় পড়ে আমাকে কোথায় কতদূর যেতে হবে কে জানে?

সেইন নদীর যা দিকটাতেই প্রাচীন প্যারিস। ফরাসী সংস্কৃতির যা কিছু সে আলোই। ডানদিকে ধনীদের আধুনিক এলাকা, ব্যবসায়ীদের বড়বাজার এবং বিলাসিতা ও দুর্নীতির মর্মকেন্দ্র। বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে ও অঞ্চলের কথা শুনেই আমার মনে ভয় ধরেছে। ওদিকটায় আমি তাই বড়ো একটা যাইনি। পুরনো প্যারিসেই ঘুরে বেড়াতে আমি অভ্যস্ত।

ক্লোঁদও বেড়াতে বেড়াতে অন্য আর সবার সঙ্গে আমায় নিয়ে এলো গ্রাদ শাঁ-জারমেঁ-দ্য-প্রে এলাকায় সেখানে কবি-সাহিত্যিকরা বীয়ার আর তামুখ ওড়াতে ব্যস্ত। আমার কাঁধে হাত দিয়ে চলতে চলতেই ক্লোঁদ আমায় দেখিয়েছে কবি-সাহিত্যিকদের সেই আড্ডা। আস্তে আস্তে সেখান থেকে আমরা চলে এলাম লঁপারনাস-এ। সেখানে আর রোতোঁদ-এ বসে শিল্পীরা সব ছবি আঁকছে দেখলাম। ফিরে আসবার আগে 'দে-মাগো'তে গিয়ে বসা গেল কিছুক্ষণের জন্যে। উদ্দেশ্য তৃষ্ণা মেটানো। এ ব্যাপারে ক্লোঁদের উদারতার অভাব নেই মোটেই। তবে শাঁ জারমেঁর পুরনো গীর্জাটার ওপর এক ফালি চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বারবার কী সুন্দর উঁকি ঝুঁকি মারছিল, আমার দৃষ্টি ছিল সেদিকেই বেশি। আমি কফি চেয়েছিলাম। কফির কাপ আসতে ক্লোঁদই আমায় সেদিকে সচেতন করে দিয়েছিল। কফি খাচ্ছিলাম, বন্ধু আমার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে, ঐ ভাখো তোমার সমুখ দিয়ে কে হেঁটে যাচ্ছেন—অর্জ ব্রাক যিনি কিউবিজ্‌ম প্রবর্তন করেছেন। অত বড়ো শিল্পীকে দেখতে পেয়ে আমি ধন্য হয়েছিলাম এবং ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম ক্লোঁদকে সেজন্যে।

আশপাশে অনেক আমেরিকানদের চোখে পড়লো। ওরা বেশ একটু নোংরা ধরণের। প্রাক্তন সৈনিক বোধ হয় অনেকেই। সে জায়গাটা খুব তাড়াতাড়ি ক্লোঁদ আমাদের পার করিয়ে নিয়ে এল এবং আমরা সেখান থেকে এসে পড়লাম একটা অত্যন্ত নীচু পাড়ায়। নামতে নামতে এমন একটা জায়গায় এসে আমরা থামলাম, মনে হলো আমরা যেন কোনো একটা ভন্টে এসে ঢুকে পড়েছি। আমার সহপাঠিনী মুনা প্যারিসের মেয়ে হয়েও একটু বোধ হয় ঘাবড়েই গিয়েছিল। কিন্তু ক্লোঁদ আমাদের অভয় দিলে। তবে তার সেই অভয়বাণীর পরেও মনটা খুব সুস্থির হতে পারছিল না পাশেই একটি দৃশ্য দেখে। একখণ্ড পাথরের ওপর একটি তরুণ বসে, আর তারই দুই হাঁটুর ওপর ঘোড়ায় চড়ার মতো করে বসে একটি তরুণী তাকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলুচ্ছে। ক্লোঁদ আমার হাতে হাত জড়িয়ে পথ চলছিল। কেমন একটা বিদ্যুৎ শিহরণ আমি অনুভব করছিলাম ঐ দৃশ্য দেখে। ক্লোঁদও বোধ হয় তা বুঝতে পেরেছিল।

কেবল কথা আর কথা। ব্যালে নিয়ে, আর্ট নিয়ে, গান নিয়ে আরো কতো কি। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম অনেক বিষয়েই ওরা সবাই আমার থেকে অনেক বেশি জানে। আমার জ্ঞানের অভাব দেখে ক্লোঁদ বোধহয় একটু বিস্মিতই হয়েছিল। হঠাৎ সে জিজ্ঞেস করলে, তুমি লুভর চিত্রশালা দেখেছ? আমার নির্বাক দেখে বলে, চলো আজ বরং অপেরায় যাই। তারপর কি মনে করে পরের রবিবারের জন্যে লুভর এবং অপেরার প্রোগ্রাম সে ঠিক করে রাখলে। তবে এ বিষয়ে বন্ধুদের সবাই একমত যে আমি একেবারে নভিস, সব বিষয়ে আমায় অভিজ্ঞ করে তুলতে হবে, আমাকে শিখিয়ে নিতে হবে। ক্লোঁদের এক বন্ধু এও বলেছে, নাইট ক্লাবেও এলিসকে নিয়ে যেতে হবে।

এমনি সব উত্তেজনাকর আলোচনার মধ্যেই আমাদের সেদিনকার সভার শেষ হয়েছে। আগের রাতের মতোই সে রাতেও আমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ক্লোদ আমায় শুভেচ্ছা জানিয়ে মিষ্টি হাসি হেসে বিদায় নিয়েছে।

তারপর সতকালের কথা। ক্লোদ আগের দিনই আমায় তার স্টুডিওতে নিমন্ত্রণ করে রেখেছিল। সে আমায় তার স্টুডিওতেই কাল নিয়ে গিয়েছিল। প্যারিস থেকে মাইল চল্লিশ দূরে এক শান্ত পল্লীতে তার স্টুডিও। সেখানেই তার বাড়ি। আমার সেনসনে সে ঘর ভাড়া নিয়েছে মাত্র এক সপ্তাহের জন্যে রথ পোড়ানোর উৎসব উপলক্ষে। দু'দিন বাদেই এখান থেকে সে বিদায় নেবে। তার আগেই তার পল্লীভবনের সঙ্গে আমায় পরিচিত করিয়ে নিলে ক্লোদ। কে জানে কি উদ্দেশ্য।

ক্লোদের স্টুডিওটি কিন্তু তেমন বড়ো নয়। চারদিকে ছবি ছড়ানো। কিছু দেয়ালে টাঙানো। আর কিছু এদিকে ওদিকে নিচেই পড়ে। ইজেলে যে ছবিখানা রয়েছে তা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এখন শুধু শিল্পীর শেষ তুলি স্পর্শের অপেক্ষা।

স্টুডিও ঘরে ঢুকে সেই ছবিটির দিকেই আমার নজর পড়েছে। এক নিরাবরণ রূপসী তরুণীর সেই ছবি। আমার সামনেই ক্লোদ ছবিখানিকে সম্পূর্ণ করতে বসে গেল। আমাকে স্টুডিওতে নিয়ে যাবার সময়েই সে বলেছিল, আমাকে একটু ধৈর্য ধরে বসতে হবে, কারণ চিত্রটিকে শেষ করে নিয়েই তাকে ফিরতে হবে। কাজ খুব বেশি বাকি ছিল না। কয়েকটি সূক্ষ্ম স্পর্শে ছবিখানি যেন আরো জীবন্ত হয়ে উঠলো। কিন্তু ছবি হলেও আঁকা সেই নগ্ন মেয়ে ক্লোদ তন্ময় হয়ে যে ভাবে তুলি বুলিয়ে চলছিল সেখানে বসে থেকে কেমন যেন একটা সঙ্কোচে আমি ছুয়ে পড়ছিলাম। এটি তার ছবি, একথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বার বার আমার জিভ আটকে আসছিল।

ক্লোদ কাজ করতে করতেই মাঝে মাঝে লক্ষ্য করছিল যে ছবিখানার দিকে আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছি। এক এক সময় আমি যে একটু আধটু লজ্জা পাচ্ছিলাম তাও সে বুঝতে পারছিল। তাছাড়া তাকে একটা প্রশ্ন করতে যেয়ে বার বার যে আটকে যাচ্ছিলাম সেটাও সে ধরতে পেরেছিল এবং তাই সে আমায় জিজ্ঞাসা করলে, এ মেয়েটি কে যার ছবি আমি এত নিখুঁত ভাবে আঁকছি, তাই জানতে চাইছ তো। আসলে এ আমাদের আকাদমিরই একটি মেয়ে—নিজেও একজন উঠতি শিল্পী এবং মডেলও। এখনও শুধু ছবি এঁকে তার চলে না, মডেলের সিটিং দিয়ে আরো কিছু তাকে রোজগার করতে হয়।

কিন্তু প্রকাশ্যে এরকম সিটিং···।—বলতে গিয়ে আমি আর শেষ করতে পারলাম না আমার মুখের কথাটা।

না, না পার্কের যে পরিবেশটি তুমি দেখছ ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ডে তা' সম্পূর্ণ কাল্পনিক। পার্কে নিশ্চয়ই এরকম সিটিং দেওয়া সম্ভব নয়। এ ছবির জন্য মডেল তিন দিন আসতে হয়েছে এই স্টুডিওতে। অন্য অনেক শিল্পীর স্টুডিওতেই সে যায় এমনি সিটিং দেবার জন্যে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে।

ক্লোদের এই কথাগুলি আমি শুনছিলাম এবং আমার বুকের মধ্যে কেমন যেন একটু কাঁপুনি আমি অনুভব করছিলাম। একি ভয়ে না ঈর্ষায় তা' আমি এখনো ঠিক করে বলতে পারবো না। মেয়েটি একা একা ক্লোদের সামনে তার স্টুডিওতে এমনি সিটিং দিত, আমিও ক্লোদের

স্টুডিওতে তার সামনে তেমনি একা—ওরকম সিটিং আমাকেও দিতে হবে নাকি? হ্যাঁ, সে রকম একটা আশঙ্কা আমার মনেও বার কয়েক উঁকি দিয়েছিল। তবে এ প্রশ্নও তার মনে জেগেছে, তা'হলে ক্লোদ কি এ কয়দিন ধরে তার সঙ্গে শুধু ভালবাসার অভিনয় করেই চলেছে, আসলে সে কি তবে তার ঐ মডেলকেই ভালোবাসে? তা' না হলে ঐ একই মডেলের নানা ভঙ্গিমার অনেকগুলি ছবি ক্লোদের স্টুডিওতে থাকবে কেন? এ চিন্তাই অনেকক্ষণ ধরে আমায় নীরব করে রেখেছিল। তবে আমার ভালোবাসায় ক্লোদ বন্দী হোক আর নাই হোক তার আঁকা বিচিত্র রকমের ছবি দেখে এ ধ্রুব বিশ্বাস আমার হয়েছিল যে, তার শিল্পী জীবনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

অনেক রাত হয়ে গেল আমাদের ক্লোদের পল্লী ভবন থেকে ফিরে আসতে। মেট্রো স্টেশন থেকে ওপরে উঠে আমাদের পেনসনের পাশের গীর্জাটার মাথার ঘড়িটায় তাকিয়ে দেখি ঘড়ির দু'টো হাত এক হয়ে মিলে আছে বারোটায় এসে।

মনে মনে ভাবি ভয়, মাদাম যদি দেখে ফেলেন! মাঝ রাত অবধি এক তরুণের সঙ্গে এমনি ভাবে ঘোরাফেরার কথা বাবার কাছে যদি লিখে দেন। বয়স্ত ভালো মাদাম দেখতে পাননি। ওঁর ওপরেই বাবা আমার দেখা শোনার ভার দিয়ে গেছেন। মাদাম আমার খোঁজ খবরও করেন সব সময়। এ পেনসনের তিনিই পরিচালিকা।

নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আমি তেতলায় উঠে এলাম। অশান্ত ক্লোদ আমার পিছে পিছে আরো ধীরে ধীরে এলো। ফেরবার পথে ট্রেণে ক্লোদের সঙ্গে তেমন কথা বার্তা না বলায় সে বোধহয় একটু মনমরা হয়ে পড়েছিল। আমার দরজার সামনে এসে আমি দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। ক্লোদ এসে আমার বাঁ হাতটাকে টেনে নিলে। খুব আদর করে হাতের পিঠে একটি মিষ্টি চুমু খেয়ে বল্লে, আজ রাতে ঘুমুতে ঘুমুতে তুমি অনেক সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখবে এই আমি চাই। এই বলেই সে দু'পা এগিয়ে গিয়ে তার নিজের ঘরে ঢুকে গেল।

আমিও ঘরে এসে হাত মুখটা ধুয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি রাতের পোষাক পরে শুয়ে পড়লাম। ঘুমও এলো তাড়াতাড়ি এবং স্বপ্নের একটা মোহজাল আমায় যেন ঘিরে ফেল্লে। তারি সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম। আনন্দের স্বপ্ন। কিন্তু আমার ঘরের দরজায় কার পায়ের শব্দ? মাদাম এত রাতে আমার খোঁজ করতে এলেন নাকি? আহা, এমন সুন্দর স্বপ্নটি আমার ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল! আমি মনে মনে আপশোষ করছিলাম। কিন্তু ভয়ে ভয়ে আস্তে করে দরজা খুলেই আমি অবাক। একি অশান্ত ক্লোদ নৈশ পোষাকে আমার সামনে! আমার মনে হচ্ছিল তখনো আমি স্বপ্নই দেখছিলাম। কি যেন বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনো কথাই ক্লোদ বলতে দিলেনা। চোখের নিমিষে ভেতরে এসে দোরটা বন্ধ করে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিলে। আমি তার ওপর রাগ করিনি, অভিমান করিনি কিংবা বিরক্ত হয়নি আমার কাছ থেকে একথা আদায় করে তবে সে আমায় নিষ্কৃতি দিলে। আমার শয্যা ছেড়ে সে যখন বেরিয়ে গেল তখন প্রায় রাত ভোর।

আজও ক্লোদ আবার আসবে নাকি? সে প্রশ্নই মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তা' ভাবতে ভাবতেই ঘুমে দু'চোখ আমার জড়িয়ে আসছিল এবং ঠিক তখনি মাঝ রাত পার করে দিয়ে আবার আগের রাতের পুনরাবৃত্তি করা হলো।

ক্লোদের পরিচিত পদশব্দে আমি জেগে উঠলাম। দোর খুলে দিতেই আগে। নিভিয়ে

দিয়ে সে এসে আমার শয্যাসঙ্গী হলো। আজ সে এসেছে একটা প্রতিশ্রুতি নিয়ে। বিদায় নেবার আগে ভোর হয় হয় এমনি সময়ে ফ্রেঁদ প্রকাশ করলে তার মনের কথা। সেটাই তার প্রতিশ্রুতি। যাবার আগে সে বলে, এলিস, তুমি আমার কাছে শুধু ছবি নও, মডেলও নও, তার চেয়ে অনেকে বেশি কিছু। জুন মাসে যেদিন তোমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে যাবে সেদিনের 'মনোম' উৎসবে আমিও থাকবো তোমার সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয় পাড়া 'কার্তিয়ে ল্যাতাঁ'র বুলভা সাঁ মিশেল ধরে আমিও তোমাদের সঙ্গে কালির বোতল ভাঙা ও কাগজ পোড়ানোর হৈ হল্লায় যোগ দেবো। পুলিশ এলে লম্বলের সাহায্যে উৎসবমত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের শান্ত করবে তা' ভাবতেও যেন লাগে। তার পরেই বাকালিয়রে ডিগ্রী পেয়ে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং তার পরেই একসঙ্গে আমাদের দু'জনের জীবন-যাত্রা শুরু হবে।

এই বলেই অগাস্ত ফ্রেঁদ চুপি চুপি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু আগেই যেন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। হৃদয়ে আমার সত্যি সত্যি যেন ময়ূরের আনন্দ-নাচ চলছে।

জার্মানীর এক সঙ্গীত বিদ্যালয়।

গানের মাষ্টার গান শেখাতে এসে একটা নূতন সুর বেহালায় বাজিয়ে শোনালেন। বল্লেন: এতে নদীর তরঙ্গকল্লোল শুনতে পেয়েছ তোমরা?

ছাত্রেরা বললে: আজ্ঞে হাঁ, ঠিক যেন কুলু কুলু ধ্বনি তুলে বয়ে চলেছে নদী।

শুধু একটি ছেলে বললে: কিন্তু নদীতে যখন তুফান আসে?

—সে সুর তোলা সহজ নয়। কেউ যে পারে, আমার তা' জানা নেই।

ছেলেটি বললে: আর নদী যখন সাগরে মেশে, তখনকার সুর?

—সে সুর জাগিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। কে আর পারবে বল?

—আমি পারি স্যার।

—তুমি? বেশ, শোনাও ত দেখি!

ছাত্রটি তখন বেহালা তুলে নিয়ে একসঙ্গে নদীর কুলুধ্বনি আর সাগরের তরঙ্গ-কল্লোল জাগিয়ে তুলেছে বেহালায়।

স্তম্ভিত হয়ে মাষ্টার হাত রাখলেন বিঠোফেনের মাথায়।

ক-থা-মা-লা

অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

একটি স্বপ্নের ফলশ্রুতি

বন্ধুর কথা শুনে হাসলেন লোকনাথবাবু। বললেন—স্বপ্নকে তুমি সত্যি বলে মনে কর নাকি হরিহর?

হরিহর জবাব দিলেন—সব স্বপ্নকে করি না। কিন্তু যে-স্বপ্নের কথা তোমায় বললাম, সেটা বিশ্বাস করি। আমার মন বলছে এই স্বপ্নটা ফলবে।

—আচ্ছা পাগল তুমি! লোকনাথ বললেন—রিটায়ার করে দেশের বাড়িতে এসে মনে হল তোমার সঙ্গে কয়েকদিন নিরিবিলি কাটাবো এখানে। তাই তোমায় কত সাধ্যসাধনা করে আনলাম। আর তুমি কিনা যত সব বাজে দুর্ভাবনা নিয়ে এলে!

নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক লোকনাথ মাত্র সরকারী চাকরি থেকে অবসর নিয়ে কিছুদিন হল তাঁর পল্লীভবনে এসে বাস করছেন। হরিহর তাঁর অনেকদিনের বন্ধু। তাই তাঁকে নেমন্তন্ন করে আনিয়েছেন। কিন্তু লোকনাথের কাছে পৌঁছেই উদ্বিগ্ন মুখে হরিহর যেকথা জানালেন তা শুনে লোকনাথ বললেন—একটা বাজে স্বপ্ন দেখে তুমি এমন উতলা হয়েছো! দূর দূর। ওকথা মন থেকে মুছে ফেল।

হরিহর বললেন—মুছে ফেলতে পারছি কই। আমার মনে হচ্ছে, তুমি শিগগিরই খুন হবে।

লোকনাথ হাসতে লাগলেন—আচ্ছা, সে যাহা হবে। তুমি প্রভুল্ল হও, আনন্দ কর! তোমায় কত অনুরোধ করে এখানে আনালাম, কোথায় তুমি দুদিন বিশ্রাম করবে, আনন্দ করবে তা নয়, যত সব বাজে ভাবনা! ভুলে যাও দুঃস্বপ্নের কথা।

বিমর্ষ মুখে হরিহর বললেন—ভুলতে পারছি না যে! আচ্ছা, দেখ, আমি তো তোমার এ বাড়ীতে আগে কখনো আসিনি, কিন্তু তোমার বাড়ীর কোথায় কি আছে, সব বলে দিতে পারি। স্বপ্নে আমি সেসব দেখেছি। আচ্ছা, বল তো বন্ধু, শোবার ঘরে খাটের পাশে তেপায়ার ওপর এক গেলাস জল, আর তার পাশে দুতিন খানা বই, এই নিয়ে কি তুমি ঘুমোও?

আশ্চর্য হয়ে লোকনাথ বললেন—হ্যাঁ। আমার অনেক দিনের অভ্যেস। শুয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ বই পড়ি। তারপর জল খেয়ে আলো নিবিয়ে ঘুমুই।

হরিহর বললেন—ঠিক মিলে যাচ্ছে। স্বপ্নে দেখেছি তোমার শোবার ঘর, কেমন করে তুমি ঘুমোও, সব স্পষ্ট দেখেছি।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে লোকনাথ প্রশ্ন করলেন—কেমন করে আমি খুন হব, তাও দেখেছো নাকি?

মাথা নেড়ে হরিহর জবাব দিলেন—দেখেছি। ঘুমন্ত অবস্থায় তোমার বুকে ছুরি মেরে খুন করা হবে। একটা লোক ··তাকে দেখতে···

বন্ধুর কথা থামিয়ে লোকনাথ হেসে বললেন—আচ্ছা, এখন থেকে এক চোখে তাকিয়ে

ঘুমুবো। ওসব যাকে কথা থাক, তোমাকে আমার বাগান দেখাই গে. কত শাকসব্জী, ফল-ফুলের গাছ করেছি দেখবে এসো।

দেউড়ি পেরিয়ে দুই বন্ধু বাগানে নামলেন। চারিদিকে ফল-ফুলের সমারোহ। বাতাসে মিষ্টি গন্ধ। অদূরে লোকনাথবাবুর বহুদিনের ভৃত্য শাকসব্জী তুলছিল। হরিহরকে দেখে মাথানীচু করে প্রণাম করল।

তার পানে এক নজর তাকিয়েই হরিহর যেন ভীষণ চমকে উঠলেন, ফিস ফিস করে বললেন—লোকনাথ, লোকনাথ, ঐ লোকটা. স্বপ্নে আমি ঐ লোকটাকে দেখেছি, তোমায় ছুরি মারছে, ওই লোকটাই তোমার মার্ডারার!

লোকনাথবাবু হা হা করে হেসে উঠলেন, বললেন—পরাশর আমার মার্ডারার! এবার সত্যিই হাসালে তুমি। বিশ বছর পরাশর আমার কাছে আছে। এসেছিল ছোট্ট বেলায়। আমার কাছেই মানুষ হয়েছে। ওর মতো প্রভুভক্ত বিশ্বাসী সৎ মানুষ দুনিয়ায় বিরল। ওকে আমি ছেলের মতো ভালবাসি। ও আমাকে বাপের মতো জ্ঞান করে।

কথা বলতে বলতে দু'জনে অন্যদিকে এগিয়ে গেলেন।

হরিহর বললেন—যাই বল তুমি। আমি স্বপ্নে দেখেছি, ওই লোকটা তোমায় খুন করেছে। ওই লোক। হবহু। ওকে তাড়াও তুমি। সরিয়ে দাও এ বাড়ী থেকে। দেরী করো না।

বলতে বলতে হরিহর রীতিমত ব্যাকুল এবং উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তাঁকে শান্ত করবার অভিপ্রায়ে লোকনাথ বললেন—আচ্ছা, আচ্ছা, ওকে তাড়াবো। ঠাণ্ডা হও তুমি! কী মুস্কিল!

রাত্রে দুই বন্ধু একত্রে আহার করে একই ঘরে দুটি পৃথক শয্যায় শুয়ে অনেকক্ষণ গল্প করে তারপর ঘুমিয়ে রাত কাটালেন।

পরদিন দুপুরে হরিহর বললেন—কই, লোকটাকে এখনো তাড়াও নি।

লোকনাথ বললেন—ব্যস্ত হচ্ছ কেন! তাড়াবো।

—দেরী করো না!

—না। আর দেরী করব না।

মুখে বললেও সত্যিই তো আর লোকনাথবাবুর মাথা খারাপ হয়নি যে বন্ধুর গাঁজাখুরি স্বপ্নের কথায় বিশ বছরের পুরানো আর বিশ্বাসী লোককে এক কথায় জবাব দেবেন!

দু'দিন পরে হরিহর বন্ধুর কাছে বিদায় নিলেন। চলে যাবার আগে অনেক আশঙ্কা আর ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন। বন্ধুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে হরিহর সত্যিই অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছিলেন।

কলকাতায় ফেরবার তিন চারদিন পরে হরিহর এক পত্র পেলেন। পত্র লিখেছেন বন্ধু লোকনাথ: তোমার প্রতি আমার ভালবাসা যে কত গভীর আর তুমিও যে আমার কত বড় সুহৃদ তা এই দু'দিনে যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম। তোমার মন যাতে শান্ত আর নিশ্চিন্ত হয় তার ব্যবস্থা করেছি। পরাশরকে বরখাস্ত করেছি। আশা করি এই খবর পেয়ে আমার সম্বন্ধে তোমার দুর্ভাবনা দূর হল।

চিঠি পড়ে হরিহর সত্যিই বড় আরাম অনুভব করলেন। বন্ধুর কাছ থেকে ফিরে এসে তিনি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। যাক, লোকটা গেছে। এবার নিশ্চিন্ত আর ভয় নেই। লোকনাথ

এবার নিরাপদে থাকবে। তিন চারদিন পরে হরিহর সেদিন মনে বিশেষ আনন্দ বোধ করলেন এবং রাত্রে বিনা চিন্তায় গভীর নিদ্রাসুখ উপভোগ করলেন।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে যথারীতি হরিহর সংবাদ-পত্র খুলে বসলেন। পড়তে পড়তে হঠাৎ তাঁর চমক লাগল, চক্ষু স্থির হল। এ কী অপ্রত্যাশিত ভীষণ দুঃসংবাদ! পত্রিকার নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন: "অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী লোকনাথ মিত্র তাঁর স্বগ্রামে নিজের ভিটায় গতকাল রাত্রে নিহত হয়েছেন। রাতের বেলায় সম্ভবত ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে ছুরি মেরে খুন করা হয়েছে। এই ব্যাপারে তাঁর ভৃত্য পরাশরকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। পরাশর নাকি তার অপরাধ স্বীকার করে বলেছে, যে বিশ বছর বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করবার পর তার মনিব যখন তাকে বিনা কারণে ও বিনা অপরাধে বরখাস্ত করলেন তখন তার মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে যায়, তার মাথায় গোলমাল হয় এবং এই অন্যায় অবিচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যেই সে রাত্রিবেলা মনিবের ঘরে ঢুকে তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় ছুরি মেরে হত্যা করে।"

উৎকট উপচিকীর্ষা

আশু ঘোষাল মশায়ের ধারণা পরের উপকার করবার জন্যেই তিনি ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাঁকে পেয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন চেনা-অচেনা সবাই ধন্য হয়ে গেছে।

পেশা তাঁর ওকালতি। কিন্তু দু'চারবার দু'একজন বিচারকের কাছে 'অবিচার' (ধমক?) পাবার পর তিনি আদালত-মুখো হতে পরাঙ্মুখ। তাছাড়া আদালতে যাবার সময়ই বা কোথায়? পরের উপকারের চেষ্টাতেই তো সময় কেটে যায়। তাঁর একমাত্র ব্রত, মানুষকে আনন্দ দেওয়া, তাদের আপদে-বিপদে সাহায্য করা। তারা না চাইলেও তিনি সাহায্য করবেনই। কোন আপত্তি শুনবেন না। বাজোড়বান্দা। আপনি হয়ত বাসা বদল করছেন কিম্বা হয়ত নতুন আসবাবপত্র বা টুকিটাকি কেনাকাটা করছেন, এমত অবস্থায় যদি আশুবাবুর সঙ্গে আপনার পরিচয় থাকে, ব্যস, তাহলে আর চিন্তা নেই। ঘোষাল মশায় আপনার সঙ্গে বাজারে ঘুরবেন, তারপর সারাদিন আপনার বাড়িতে কাটাবেন, নানা কাজ করবেন, প্রয়োজন না থাকলেও করবেন, সেই সব কাজ যদি অকাজের কোঠায় গিয়ে পৌঁছোয় তাহলেও ক্ষান্ত বা পিছপাও হবেন না তিনি। পরের কাজে তাঁর আলস্য নেই, ক্লান্তি বোধ নেই, অদম্য তাঁর অধ্যবসায়।

টালিগঞ্জের দিকে থাকেন। আমার সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়। সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাঘমারি ক্লাবে তাঁর সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত ভাব। আমায় দেখে বললেন—এই যে মুখুজ্যে এসেছো। কিন্তু ভাই আমার এখন বসে গল্প করবার সময় নেই। যেতে হবে অনেক দূর।

বুঝলাম, কারুর উপকার করার আগ্রহে আশুবাবু বেগবান। বললাম—বেশ রাত হল। তার ওপর বৃষ্টি নামল। এখন কি বেরুনো ঠিক হবে?

—উপায় নেই, যেতেই হবে। বললেন আশুবাবু—মজুমদারদের বাড়ি যাচ্ছি। জীবন মজুমদারকে চেনো। চেনো না? কেমন করেই বা চিনবে? নতুন এসেছে এ তল্লাটে। নিউ আলিপুরের বি ব্লক-এ বাসা নিয়েছে।

—সে তো অনেক দূর। বাস থেকে তো অনেকটা হাঁটতে হবে।

—তা হবে বৈকি?

—কমকমিয়ে বৃষ্টি নামল যে!

হাত নেড়ে সবেগে আশুবাবু বললেন উপায় নেই, বন্ধু, যেতেই হবে। তাদের বাড়ি এর আগে কখনো যাইনি বটে, কিন্তু খুঁজে নিতে কষ্ট হবে না। আর তাছাড়া কষ্ট হলেও খুঁজে নিতেই হবে। অন্ধকার রাত হলেও তাদের বাড়ি খুঁজে বার করা শক্ত নয় আমার কাছে। গলিটার সন্ধান পেলেই হল। ব্যস। সেই গলিতে ঢুকে প্রত্যেক বাড়ির কড়া নাড়তে থাকি। অমুক থাকে এ-বাড়িতে? থাকে না। আচ্ছা, আপনারা ঘুমোন, আমি অন্য বাড়ি দেখছি। কেউ কেউ, মনে কর, ওর নাম কি, রাগ করে, তেড়ে আসে, বেশ তেড়ে আসে, সময় সময়, মনে কর, ওর নাম কি, তা ওদের জন্যে আমি কিছু মনে করি না, পরের উপকারের জন্যে যখন নেমেছি তখন ওদের মন খারাপ করলে চলে না। আমি অন্য বাড়ির দিকে এগোই। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে অবশেষে ঠিক খুঁজে বার করি।

বললাম—কিন্তু বেশ রাত হয়ে গেল যে।

—হোক। তবু আমায় যেতেই হবে। বুঝতে পারছো না, ওদের কী অসহায় অবস্থা। মনে কর, ওর নাম কি, স্বামী আর স্ত্রী, দুটি প্রাণী। কত একলা। গল্প করবার কেউ নেই, আনন্দ দেবার কেউ নেই। মাত্র আজ জানলাম, ওরা এ তল্লাটে এসেছে। আগে জানলে তো কত আগেই…

কথা শেষ হল না। 'আচ্ছা, চললাম,' বলে আশুবাবু অন্তর্হিত হলেন।

পরের দিন বেলা হতে জিজ্ঞেস করলাম—কাল জীবনবাবুদের খুঁজে পেলেন?

ঘাড় হেলিয়ে আশুবাবু উত্তর দিলেন—পেলাম। ভাগ্যিস গিয়েছিলাম। হ্যাঁ, বাড়িটা খুঁজে বার করতে একটু বেগ পেতে হয়েছিল বৈকি! কুড়ি বাইশটা বাড়িতে পরপর ধাক্কা দিতে হয়েছিল। অন্ধকার নিশুতি রাত, তাই মনে কর, একটু জোরেই হাঁকডাক করতে হয়েছিল, সেজন্যে তারা সকলেই অল্পবিস্তর রাগ প্রকাশ করেছিল। যাই হোক, ধানাখন্দ পেরিয়ে প্রত্যেক বাড়ির কড়া নাড়তে নাড়তে এগিয়ে চললাম। প্রত্যেক বাড়িতেই একই প্রশ্ন, জীবন মজুমদার থাকেন এ বাড়িতে? থাকেন না? আচ্ছা, আপনারা ঘুমোন, আমি অন্য বাড়ি দেখছি। এইভাবে যেতে যেতে অবশেষে আসল বাড়ি খুঁজে পেলাম।

একটু দম নিয়ে আবার শুরু করলেন—অন্ধকার বাড়ি, নিরানন্দ পুরী। জানলা খুলে জীবন বললে, 'রাত দুপুরে চেঁচায় কে?' বললাম, 'জীবনবাবু, আমি, আমি আশু ঘোষাল। জীবন বললে, 'আমরা তো শুয়ে পড়েছি।' বললাম, 'তাতে কি হয়েছে, ওর নাম কি, আমি যে এসে পড়েছি।'

বলতে বলতে আশুবাবু উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন—বোঝো তাদের কী করুণ অবস্থা। বেচারাদের সঙ্গে গল্প করবার কেউ নেই, তাই সন্ধ্যে রাতেই শুয়ে পড়েছে। নাঃ সত্যিই মনে বড় কষ্ট হল। ওদের একটু চাঙা করা দরকার, ঘরের নিরানন্দ আবহাওয়াকে চকচকে করা দরকার।

আশুবাবু থামলেন। বললাম—তারপর?

তিনি বলতে লাগলেন—কয়েকবার ডাকাডাকির পর জীবন আর তার স্ত্রী নীচে নেমে দরজা খুলে দিলে, সাঁ করে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। মুখে না বললেও আমায় দেখে তাদের যে খুব আহ্লাদ হয়েছে তা বুঝতে বাকি রইল না। হবে না-ই বা কেন। অসময়ের দোসর যে! বললাম, 'তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। বোসো। চেয়ার নেই? তাতে কি। এই প্যাকিং বাক্সটার ওপরেই বসা যাক।' বসলাম চেপে। কথা শুরু হল। জীবনের স্ত্রী বললেন, 'আপনাকে চা করে দেব?' লাফিয়ে উঠলাম আমি।

'আপনি করবেন কেন? আমি নিজেই করে নেব। কোথায় রান্নাঘর?' তারা আপত্তি করতে লাগল। আমিও, মনে কর, নাছোড়বান্দা। ঢুকলাম রান্নাঘরে। জিনিষপত্র চারিদিকে থৈ থৈ, ওলচাল। পনেরো মিনিট কৌটো খুলে বার করলাম চা, চিনি, গুঁড়ো দুধ। দু'চারটে কৌটোর জিনিষ এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ল। তা পড়ুক। পরে গুছোবার ব্যবস্থা করা যাবে। জ্বাললাম জলতা। তৈরী করলাম চা। বললাম, 'এসো, তোমরাও খাও। তারা বললে, তাদের রাতের খাওয়া হয়ে গেছে, এখন আর চা খাবে না। বেশ, আমিই তিন কাপ চা খেয়ে ফেললাম। তারপর গল্প সুরু হল। প্রথমটায় তারা বিরসমুখে চুপচাপ বসেছিল। তাই আমায় একাই কথা চালিয়ে যেতে হচ্ছিল। কিন্তু মনে কর, ওর নাম কি, তাতে আমি নিরুপায় নই। নানা কথা, নানা প্রসঙ্গ। ক্রমে তারা চাঙ্গা হয়ে উঠল। জীবন তার হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাই তো রাত এগারোটা বেজে গেল যে!' বুঝলাম, আমার খোস গল্পে জীবন রীতিমতো খুশী বোধ করছে। তখন আমি মন খুলে অনর্গল আরও নানা আলোচনা করতে লাগলাম। থেকে থেকে জীবন বলতে লাগল, তাইতো, রাত সাড়ে এগারোটা। রাত বারোটা বেজে গেল যে। ইত্যাদি।

ক্ষণেকের জন্যে থেমে গিয়ে আশুবাবু কী যেন স্মরণ করে নিলেন। তারপর বললেন—অবিশ্যি আমি অবিবেচক নই। মনে কর, ওর নাম কি, বেশি রাত করে তাদের অসুবিধার সৃষ্টি করব, তেমন লোক আমি নই। উঠে পড়লাম, বললাম, আজ চলি, কাল সকালেই আবার আসব, তোমাদের ঘর গুছিয়ে দেব। তারা অবিশ্যি বারবার বললে যে আমার আর কষ্ট করে আসবার দরকার নেই। আমি বললাম, তাও কি কখনো হয়, আমায় আসতেই হবে।

পরদিন সন্ধ্যায় দেখা হতেই বললেন—বুঝেছো, বেচারা জীবন আর তার স্ত্রী, মনে কর, ওর নাম কি, আমার পেয়ে যেন বর্তে গেছে। আজ সারাদিন ছিলাম তাদের বাড়িতে। দেখলাম, জীবনের ছবির খুব শখ। নীচেকার বড় ঘরটায় অনেক ছবি টাঙানো হয়েছে। ওপে দেখলাম বত্রিশখানা। দেখেই বললাম, উহুঁ, সব ভুল, কোন্ ছবি কোনখানে টাঙাতে হয় তা তোমরা জানো না। নামাও সব ছবি। আস্তিন গুটিয়ে নিজেই লেগে গেলাম। নামাও, নামাও। তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে দু'চারখানার ফ্রেম ভেঙে গেল। কুছ পরোয়া নেই। ছবি টাঙানো তো সহজ কাজ নয়। চার ঘণ্টা পরিশ্রম করে আবার সব ছবি টাঙালাম। আহা, কী বাহার খুললো, যেন আর্ট এগজিবিশন।

তারপর দিন তিনেক পরে আবার দেখা। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন—শুনেছো ব্যাপার?

চমকে উঠে বললাম—কী হয়েছে?

—আর কি হয়েছে! আজ তিনদিন হল জীবনের অসুখ। এই মাত্র খবর পেলাম, রাস্তায় তার নেপালী চাকরটার মুখে। তিনদিন একটা সোফা চুরির মামলা নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তাই যেতে পারিনি, তারই মধ্যে এই কাণ্ড? চাকরটা অবিশ্যি বলছে, অসুখ সামান্য। কিন্তু আমার মন মানছে না। চললাম।

ঝড়বেগে চলে গেলেন। তারপর প্রত্যেক দিন তাঁর মুখে জীবন মজুমদারের অসুখের বৃত্তান্ত শুনতে লাগলাম—জাগিয়ে গিয়ে পড়েছিলাম। বলে কি না, সামান্য অসুখ। কোথায় সামান্য গিয়ে দেখলাম, বেহুঁস জ্বর, আমার দিকে শুধু লালচোখে চাইল। কথা বলতে পারলে না। দেখলাম, মাথা তুলতে পারছে না। তার ওপর ভুল বকছে। আমি ঘরে ঢুকতেই দেখলাম,

ঘাড় গুঁজে বিছানায় শুয়ে পড়ল। ডাক্তার আমায় পাশের ঘরে নিয়ে এলো। জানালে, রুগীর ঘরে যাওয়া নিষেধ। পাশের ঘরে বসে জীবনের স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে লাগলাম। বললাম, আমি এসে পড়েছি। আর ভয় নেই, দরকার হলে সারা রাত রুগীর সেবা করব। এমন সময় শুনলাম, জীবন প্রলাপ বকছে, রীতিমত ডিলিরিয়ম। কে যেন তাকে তাড়া করেছে, ভয় দেখাচ্ছে, এমনি ভাব। বলছে, 'বুড়ো সাধুটা কি চলে গেছে, উঃ কি যন্ত্রণা!' এই কথা শুনেই ছুটে গেলাম তার ঘরে। ডাক্তার বারণ করলে কি হবে? সান্ত্বনা দিতে হবে না? ভরসা দিতে হবে না? এ সময়ে রুগীর ঘরে না ঢুকলে চলবে কেন'? বললাম, ভাই জীবন, এখানে তো কেউ নেই, কেন তুমি ভয় পাচ্ছো। এ হচ্ছি, আমি, তোমার পরম বন্ধু, আশু। জীবন পাশ ফিরে শুয়ে কাৎরাতে লাগল। জীবনের স্ত্রী তখন অনেক অনুনয় করে আমায় বললেন, 'আশুবাবু, আপনি অনেকক্ষণ রইলেন। নিশ্চয়ই ক্লান্ত বোধ করছেন। এইবার বাড়ি যান।' বললাম, আমার জন্যে ভাববেন না। স্বামীকে দেখুন, এই বলে দুজনকে অনেক সান্ত্বনা আর ভরসা দিয়ে চলে এলাম।

তারপর তিনচার দিন আর আশুবাবুর দেখা নেই, ব্যাপার কি? জীবনবাবুর কি বাড়াবাড়ি অসুখ হল। সেদিন বাজার করে ফিরছি, হঠাৎ দেখা।

—এই যে, আজ মাছ কী রকম। ছোঁয়া যাচ্ছে? না, হাত বলসে যাচ্ছে?

বললাম—মাছের দিকেই যাইনি। তাই বলতে পারবো না, কিন্তু এদিককার খবর কি? জীবনবাবু কেমন আছেন?

আশুবাবু যেন কিছু বিমনা। বললেন—ভগবানের কৃপায় জীবন ভাল হয়ে গেছে। আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছি।

—যাচ্ছেন না ওঁদের বাড়ি?

—হাঁা, না, মানে, ওর নাম কি, এর মধ্যে আর যাই নি। মানে, গিয়েছিলাম, দু তিনদিন, কিন্তু ওদের বেয়ারা চাকরটা বড় রাক্, মানে, বুনো জাতের মানুষ তো! গেলেই বলে, বাবু বাড়ি নেই। যেন মারমুখো ভাব। যাক। নাই দেখা হোক। জীবন ভাল আছে, তাতেই আমি খুসী। এখন যাচ্ছি ও পাড়ায়, শুনলাম, ভবানীপুরের তাপস আর হীরণ সপরিবারে চারু অ্যাভিনুতে এসেছে। দেখে আসি তাদের। আমার কি ভাই বদ কেলধার দুরদৎ আছে। যার কাছে না যাব সে-ই দুঃখ করবে, অভিমান করবে। সকলেই যে আমার চায়।

এই বলে পরের উপকারের বাতিকে পাওয়া মানুষটি ঊর্ধ্বশ্বাসে নতুন শিকারের সন্ধানে ছুটলেন।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন

পূজোর লেখাটা আজই শেষ করতে হবে। সন্ধ্যা হয়েছে। বাইরে বেরুবার উপায় নেই। অকাল বর্ষণে পথঘাট দুর্গম। দিগদিগন্ত অন্ধকার।

ভৃত্য মধুকে দ্বিতীয় দফা চা করতে বলে কাগজ-পত্র নিয়ে গুছিয়ে বসলাম। সবে লেখা শুরু করেছি, ভৃত্য এসে বললে, আপনাকে একজন ডাকছেন।

এমন অসময়ে আবার কে এলো? ভিতরে আনতে বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে দরজার গোড়ায় মানুষের ছায়া দেখা গেল।

—কে? আসুন ভিতরে।

বিনোদ বিহারী দত্ত

জুয়েলার্স এণ্ড ডায়মণ্ড মার্চেন্টস্

১-এ, বেন্টিক ষ্ট্রীট (মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস্), কলিকাতা

ফোন ঃ ২২-২২৭০

ব্রাঞ্চ ঃ—৮৪, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

ফোন : ৪৭-১২৫৮

আগন্তুক ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল। তার পানে তাকিয়ে চমক লাগল। সুবল না? হ্যাঁ সুবলই তো।

—সুবল! তুমি হঠাৎ। এসো, এসো। বসো।

সুবলের সঙ্গে পুরীতে আলাপ। সাত বছর পুরীতে ছিলাম। সেই সময় ওর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। মানুষটি ভারী শান্ত আর ভদ্র। মুখের ওপর সব সময়েই বিষাদের ছাপ। আস্তে আস্তে কথা বলে। ছোট্ট একটি মনিহারি দোকান চালাতো। সেই দোকান থেকে জিনিষ কেনার সূত্রে ওর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। সুবল পুরীতে একা থাকতো। বিয়ে থা করেনি। বয়সে আমার চেয়ে কিছু ছোট। বড় দুঃখের জীবন ওর। মা অল্প বয়সে মারা যায়। বাপ দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। সেই থেকেই ওর দুঃখের সূত্রপাত। বাপ মারা যাবার পর ছোট বৈমাত্র ভাই বড় হয়ে তার মা বৌকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেল। সুবল প্রায় পথে দাঁড়ালো। ওর হাঁপানি ছিল বলে কোন কঠিন পরিশ্রমের কাজ সুবলের দ্বারা সহ্য হত না। সেই সময় ও পুরী যায় এবং সেইখানেই থেকে যায়। আমাকে ও বরাবর অত্যন্ত সস্নেহ করত এবং ভালবাসত।

চার পাঁচবছর পুরী থেকে চলে এসেছি। এর মধ্যে ওর সঙ্গে দেখা হয় নি। তাই আজ হঠাৎ ওকে দেখে খুব ভাল লাগল। বললাম—ভারী আনন্দ হল তোমায় দেখে। কিন্তু এসে কবে?

ক্লান্তস্বরে মৃদু হেসে বললে—আজই তো এলাম।

—আজ! তাইএর ওখানে উঠেছো?

—না, সোজা তোমার কাছেই এলাম।

এখন কোন্ ট্রেণে এলে? সুবলকে ভাল করে দেখে যেন অবাক লাগল। একী চেহারা হয়েছে ওর! রুক্ষ শুষ্ক শীর্ণ নির্জীব, যেন প্রাণহীন।

নীচু গলায় উত্তর দিলে—খড়্গপুর হয়ে এলাম। রমেন টি-টিকে জানতে তো? তার কাছে জিনিষের দাম বাবদ অনেক পাওনা হয়েছিল। বদলি হোয়ে খড়্গপুর চলে গেছে। তাই টাকাটা আদায়ের চেষ্টায় সেখানে গিয়েছিলাম।

কিন্তু তার দেখা পেলাম না। একটু থেমে বললে—তোমার দেখা পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে। তোমার কাছেই এলাম কেন জান? তুমি যেদিন পুরী ছেড়ে চলে আস সেদিন ষ্টেশনে আমায় বলেছিলে, 'আর হয়ত দেখা হবে না।' তাতে আমি বলেছিলাম, 'নিশ্চয় দেখা হবে। আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব।' মনে আছে?

মনে থাকার মত কথা নয়? তবুও বললাম—মনে আছে। তাই বুঝি তোমার কথা রাখতে এলে?

ম্লান হেসে সুবল বললে—হ্যাঁ। তাই তো এলাম।

সুবলকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। কিছুক্ষণ পরে বললাম—কয়েকদিন থাকবে তো?

ঘাড় নেড়ে বললে—না। শুধু আজ রাতটা। কালই আবার চলে যাব।

বললাম—তা হয় না। যখন এসেছো, দু'দিন থেকে যাও।

—কোথায় থাকবো?

—আমার এখানে থাকবে। তোমার কোন অসুবিধে হবে না। আমার স্ত্রী পুত্রকন্যা নিয়ে

বাপের বাড়ি গেছেন। দিন পনেরো পরে ফিরবেন। অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। আজ রাত্রে এখানেই থাকো। কিন্তু তোমার জিনিষপত্র কোথায়?

—সঙ্গে তো কিছু আনি নি।

—আচ্ছা, তাতে আটকাবে না। হাত মুখ ধোও। সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। দাঁড়াও, আগে তোমার খাবার জোগাড় করতে বলি।

ভৃত্যকে আহ্বান করলাম।

সুবল বললে—আমি কিছুই খাবো না ভাই। খেয়ে এসেছি। শরীরটা বড় ক্লান্ত। যদি একটু শোবার ব্যবস্থা করে দাও।

ভৃত্য এসে দাঁড়াল। সুবল বললে—এক গেলাস জল।

ভৃত্য জল এনে দিলে। এক চুমুকে সবে জলটুকু খেয়ে সুবল বললে—আর এক গ্লাস।

সুবলকে কেমন যেন অদ্ভুত লাগছে। যাই হোক ও যে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। ভৃত্যকে বললাম—ছোট ঘরে বাবুর বিছানা করে দে।

সামনা-সামনি দুটি ঘর। বড় ঘরে আমি শুলাম। সামনের ছোট ঘরে সুবল। বিছানা হবামাত্র ও গিয়ে শুয়ে পড়ল এবং দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। ওকে আজ বড় অদ্ভুত লাগছে। ওর ঘরের আলো নিবিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

রাত্রে দুবার দুবার ঘুম হল। বারবার সুবলের কথা মনে হতে লাগল। সুবল যেন কেমন হয়ে গেছে। কী রকম অদ্ভুত পরিবর্তন যেন ওর মধ্যে।

ভোরবেলা ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, সামনে সুবলের ঘরের দরজা ভেজানোই রয়েছে। ভৃত্য মধু উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। তাকে চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বলে মুখ ধুয়ে ফিরে এসে আস্তে আস্তে সুবলের ঘরের দরজায় ঠেলা দিলাম। দরজা খুলে গেল।

সুবল বিছানায় নেই। ভোর বেলা উঠেই কোথায় বেরিয়ে গেল?

মধুকে প্রশ্ন করলাম—বাবুটি কখন্ উঠে বেরুলো?

ভৃত্য বললে—তা তো জানি না। তিনি কি ঘরে নেই?

—না। তুই উঠে দেখিস নি?

ঘাড় নেড়ে ভৃত্য বললে—না। আমি উঠে সদর দরজার তালা খুললাম। ঝিল খুললাম।

বললাম—তাহলে তুই যখন এদিক ওদিক করছিলি তখন উঠে বেরিয়ে গেছে। যাই হোক, ওর জন্যে চা রুটি-টোস্ট তৈরী কর। এখনি এসে পড়বে বোধ হয়।

বেলা গড়িয়ে গেল। সুবল ফিরল না। আপিস বেরুবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় পিওন এসে হাঁকলো—টেলিগ্রাম।

সই করে টেলিগ্রাম নিয়ে খুলে পড়লাম। টেলিগ্রাম আসছে পুরী থেকে। নীচে অসিতের নাম। অসিত—সুবল এবং আমার, পুরীর আর-এক বন্ধু। জরুরী টেলিগ্রাম, পুরী থেকে ছাড়া হয়েছে আজই ভোর পাঁচটায়। টেলিগ্রামে লেখা: "গতকাল সন্ধ্যায় পুরী হাসপাতালে সুবল মারা গেছে। তার ভাইকে খবর দিও। চিঠি যাচ্ছে। অসিত।"

চল চল কাঁচা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ শারদীয়ার সাহিত্য উপঢৌকন ॥

বিমল মিত্রের নূতন সুবৃহৎ উপন্যাস

একক দশক শতক ১৪৲

'কড়ি দিয়ে কিনলাম'-এর পর লেখকের বৃহত্তম সৃষ্টি। কাপড়ে বাঁধাই শোভন সংস্করণ।

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের নূতন রসরচনা

ক্ষণদর্শন ৪॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের নবতম গ্রন্থ

গোপনপত্র ৪৲

অবধূতের বারাণসীর পটভূমে রোমাঞ্চকর কাহিনী

অবিমুক্ত ক্ষেত্রে ৪॥ হিংলাজের পরে ৫৲

নীহাররঞ্জন গুপ্তের নবতম উপন্যাস

ধূসর গোধূলি ৪॥ কিরীটী রায় ১০৲

শম্ভু মহারাজের দুর্গম নীলগিরি অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী

নীলদুর্গম ৬॥ বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা ৬॥

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস

কাঞ্চনময়ী ৬৲

দূরের মিছিল ৫৲

আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাস

উড়োপাখী ৫॥

স্বামী দিব্যানন্দের

পুণ্যতীর্থ ভারত ১০৲

প্রশান্ত চৌধুরীর উপন্যাস

নদী থেকে সাগরে ৮৲

সুমথনাথ ঘোষের উপন্যাস

বাঁকাস্রোত ৬॥

অনুরূপা দেবীর

মা ৭৲ পথহারা ৪॥

মৈনাকের উপন্যাস

বহ্নিবলয় ৮॥

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের

হিমালয়ের পথে পথে ৬॥

বিমল মিত্রের

শ্রেষ্ঠ গল্প ৫৲

সুখলতা রাও'র ছোটদের নূতন বই

নানান্ দেশের রূপকথা ৩৲

মিত্র ও ঘোষ ঃ ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

১

সকালবেলায় স্নান করছিল পাঞ্চালী। হাওয়ায় কান্নার সুর ভেসে এল। কানটা পেতে রেখেও পাতল না। আর জল ঢেলে কাজ নেই। তাড়াতাড়ি গা-মাথা মুছে বেরিয়ে এল দ্রুতপায়ে।

'হয়ে গেল বোধহয়।' মুখে আতঙ্কের ছায়া ফেলে বলে উঠলেন সুরমা।

হয়ে গেলেই হল? এমনি একটা ধপ ডিজিকোটাল পাঞ্চালী। প্রায় ছুট দিল নীচে। দেখে আসি। চোখ কেমন করে যেতে পারে।

সুরমা চাপা গলায় ধমকে উঠলেন: 'তোর এখুনি যাবার কী হয়েছে? আর এমনি পাগলের মত আলুথালু হয়ে—'

তার মানে মা বলতে চান, শোকের প্রথম তরঙ্গটা মিটে গেলেই তার যাওয়া উচিত। হয়তো বা মার সঙ্গেই যাওয়া উচিত। শোকের পোশাকে সজ্জিত হয়ে অর্থাৎ বেশবাসকে যথাসম্ভব নিরীহ করে, স্তিমিত রেখে। যেমন প্রতিবেশীরা যায়।

এই শাড়ি পরে কি যাওয়া যায় শোকের বাড়ি? শাড়ির রঙটা বড্ড চড়া, একটা শাদা জমির শাড়ি পর। হাতে অতগুলি সোনার চুড়ি ভালো দেখায় না। শুধু দুগাছ করে থাক। থাক, এখন আর পান খেয়ে ঠোঁট রাঙাতে হবে না। মুখের পানটা ফেলে দে। মুখটা তেলতেলে দেখাচ্ছে, শুকনো তোয়ালে দিয়ে ঘষে খরখরে করে নে। খরখরে মুখেই শোকের রেখাগুলি ভালো ফুটবে।

কিন্তু এমনি পাগলের মতো এলোমেলো হয়ে যাওয়াটা কি সুন্দর হবে না? না, এটাও সমীচীন পোশাক নয়। তুমি একটা প্রতিবেশিনী মেয়ে, কোনো আত্মীয় নও, তোমার এই বিহ্বলতা সাজে না। তা ছাড়া যাচ্ছ বড়লোকের বাড়িতে। খালি পা পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু যেতে হলে একটু ছিমছাম কিটফাট হয়েই যেতে হয়। অনেকে আবার শোক দেখতেই আসে। কেউ কেউ আবার শোকার্তদের।

যার কথায় একটু বা সম্বিৎ পেল পাঞ্চালী। গায়ের আঁচলটা ওরই মধ্যে একটু গোছগাছ করে নিল। তাড়াতাড়ি করে ছুটে যাচ্ছিল, অতর্কিত শাসনে পা দুটো একটু মন্থর হল। মন্থর হতেই শরীরে আরেক রকম শ্রী ফুটল। শোকের শ্রী নয়, আনন্দের শ্রী। শাবণের দিঘিতে আধফোটা শতদলের শ্রী।

কতটুকুই বা পথ! কিন্তু পা আর চলতে চায় না পাঞ্চালীর।

যদি গিয়ে দেখে সত্যিই সুস্মিত আর নেই? বুক আর উঠছে না পড়ছে না, ফুরিয়ে গিয়েছে নিশ্বাস! পা হাত পা ঠাণ্ডা, ঘাড়টা এলিয়ে পড়েছে বালিশে! যে চোখ অমন সুন্দর করে তাকিয়ে থাকত, বুজে গিয়েছে, নিবে গিয়েছে চিরদিনের জন্যে। আর সে চোখ হাসবে না, জ্বলবে না, বিরক্ত করবে না। আর জিজ্ঞাসা নেই উত্তর নেই, অকারণে এক ফোঁটা অশ্রুতে ভিজে ওঠবারও সম্ভাবনা নেই।

সুস্মিত নেই এ কখনো হতে পারে? একুশ-বাইশ বছরের ছেলে। মেডিক্যালে পড়ছে, কী

উদ্দাম স্বাস্থ্য, কেমন উঁচু গলায় হাসে, কথা কয়, উৎসাহে ছুটছে সারাক্ষণ, সে সহসা নিঃশেষ হয়ে যাবে? আর সবাই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখবে তার এই নিঃশেষ হয়ে যাওয়া? তার বাবা দুর্ধর্ষ ডাক্তার, কলকাতার যেন ডাক্তার নেই যাকে এনে না জড়ো করেছে ছেলের রোগশয্যার পাশটিতে, কত তার লোকজন টাকা পয়সা, সে অমনি-অমনি ছেড়ে দেবে ছেলেকে? এত সুখ-সুবিধে শক্তি সামর্থ্য হৈ-চৈ হুজ্জুতি কিছুই কাজে লাগবে না? সমস্ত পরাস্ত হবে? অসম্ভব। তাই যদি হবে লোকে তা হলে এত সুখ-সম্পদ চায় কেন, কেন এত প্রভাব-প্রতিপত্তির তপস্যা করে? তাহলে তো কিছু দিয়েই কিছু হবার নয়। এ কখনো হতে পারে? মানুষের তাহলে এত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বড়াই কেন? কেনই বা এত ভালোবাসার?

কাল রাতেও অনেকক্ষণ ছিল পাঞ্চালী। সন্ধ্যা থেকেই সুজিত অজ্ঞান। অক্সিজেন চলছে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় ইনজেকশান। কত ডাক্তারের আনাগোনা, কত পরামর্শ। অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি নেই। কেউ বললে, আরো বারো ঘণ্টা না কাটলে বোঝা যাবে না। কেউ বললে, রাতটুকু টেঁকে কিনা সন্দেহ।

সুজিতের মা পাঞ্চালীকে বলেছিলেন, 'একটু নাম শোনাও, মা।'

সুজিতের খাটের পায়ের দিকে মেঝের উপর দেয়াল ঘেঁষে চুপচাপ বসে ছিল পাঞ্চালী। চুপচাপ, কোনো কিছুই তার করবার নেই, নার্সিংএর সে জানেই বা কী। ডাক্তারের বাড়ির অসুখ, পালা করে পাকা নার্সরাই তদারক করছে, সুজিতের মা পর্যন্ত নিষ্ক্রিয়। প্রতীক্ষা করে বসে থাকা ছাড়া আর কারুরই কোনো লক্ষ্য নেই। কতক্ষণে রাত্রি ভোর হবে। দিন চোখ মেলবে।

একটু নাম শোনাও, মা। পাঞ্চালী যেন এতক্ষণে একটা কাজ পেল। প্রাণঢালা দেবার কাজ। কিছু একটা দেবার মত দিনিস। ভরে তোলবার মত সুখ।

'কাকে নাম শোনাবে?' সুজিতের বাবা ডাক্তার অভিজিত ঝমকে উঠলেন। 'দুদিন ধরে অজ্ঞান।'

'হয়তো নাম শুনতে-শুনতেই চোখ মেলবে।' সুজিতের মা মাধবী দুর্বলকণ্ঠে একটু ওকালতি করলেন।

'শুনবে কোনখান দিয়ে? ভাইব্রেশান রিসিভ করবে কে?' অভিজিতের গলায় পূর্ণ বিরক্তি।

পাঞ্চালী চুপ করে গেল।

'আমার ঠাকুরঘরে বসে একটু নাম করবে?' চোখে করুণ মিনতি পুরে মাধবী তাকাল।

'না, যা করবে মনে-মনে করো, চেঁচিয়ে রুগীর ঘরের শান্তি নষ্ট করে কাজ নেই।'

'ঠাকুরঘরে বসে নাম করলে এ ঘর থেকে শোনা যাবে না।' মাধবী শোকার্ত মুখে গাম্ভীর্য আনতে চাইল।

'কিন্তু কতক্ষণ পরেই লোক এসে জুটবে, সুরে সুর মিলিয়ে গাইতে সুরু করবে। শুণ শুণ থেকে ক্রমশ চিৎকার, লম্ফঝম্ফ। জুটবে খোল জুটবে করতাল—সে এক বিরাট কেলেঙ্কারি।' অস্থির পায়ে খানিকটা পাইচারি করল অভিজিত। সরে দাঁড়াল ছেলের খাট ঘেঁষে। বললে, 'ও যদি মরতেই চায় ওকে শান্তিতে মরতে দাও।'

মাধবী পাঞ্চালীর কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বললে, 'তবে মনে-মনেই নাম করো, মা। তোমার নামের জোরেই সুজিত ভালো হয়ে উঠবে।'

অসহায়ের মত অল্প একটু হাসল পাকালী। চোখ বুজে বসে রইল তন্ময়ের মত।

অনেকক্ষণই বসে ছিল অন্নিধারা।

কিছুই ফল হল না। রাতের শেষ ইনজেকশানও।

সমস্ত দীর্ঘমুখ কৌতূহলী জনতাকে অভিজিৎ তাড়িয়েছেন ঘর থেকে। বসিয়েছে বারান্দায়। রুগীর ঘরের শান্তিকে অব্যাহত রাখতে চেয়েছে। কিন্তু পাকালীকে মুখফুটে বলতে পারেনি, বাড়ি যাও। চুপচাপ বসে আছে তো থাকুক না বসে। মেয়েটার মুখের ভাবটা ভারি নির্মল। হয়তো বা নির্ভর।

সেই পাকালীকেও অসহিষ্ণু হয়ে বলতে হল: 'তুমি আর বসে আছ কী করতে? রাত অনেক হল। এবার বাড়ি যাও।'

তক্ষুনি বাড়ি ফিরেছিল পাকালী। সত্যি বসে থেকে আর কী করবে? তার কী শক্তি আছে অবধারিতকে প্রতিরোধ করে?

বাড়ি ফিরে এসে উচ্চকণ্ঠে অনেকক্ষণ নাম করল। দুই চোখ আকুল করল অশ্রুতে। নাম করতে-করতে নিজের দাহটারই কিঞ্চিৎ উপশম হয়—আর কিছুই হয় না। যারা টেনে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছে মুক্তিতকে তারা ছমে না, ধামে না, ফিরে যায় না। নিয়তির আবার লজ্জা কী!

আরো একটু এগুতে কান্নার আওয়াজটা স্পষ্টতর হল।

তবে বুঝি চলে গেছে!

কিন্তু মৃতের ঘরে ঢুকে পাকালী কি কাঁদতে পারবে? যদি কান্না না আসে! কান্না না আসে, বেশ তো, গান গাইবে। তাতে অভিজিৎ নিশ্চয়ই আপত্তি করবেন না। মৃত্যুর পরে গান গেয়ে শোকবন্দনা করাটা অনেক বেশি সম্ভ্রান্ত। যা বেশ পরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলা-মানা তাতেই ডাক্তারের অভিরুচি।

কাঁদতেই যদি হয় একলা বসে কাঁদবার ঢের ঢের সময় পাওয়া যাবে।

বাড়িতে পা দিয়ে নিচে একজনকে পেয়েই পাকালী জিগগেস করলে, 'কী অবস্থা?'

'বড় জোর আর আধ ঘণ্টা।'

যেন উল্লসিত হল পাকালী: 'তাহলে প্রাণ এখনো আছে?'

'রাতের ডাক্তার এইমাত্র চলে গেলেন। বলে গেলেন আর কিছু করবার নেই। রুগী এখন সমস্ত আশার বাইরে।'

কেন কে জানে পাকালীর ঠোঁটের কোণে একটি রহস্যময় হাসি ফুটে উঠল। বললে, 'যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।'

কিন্তু লোকজন আগের থেকেই কাঁদছে কেন? কে কাঁদছে? কারা কাঁদছে? মাধবীর গলা নয় তো। মাধবী কোথায়?

মাধবী পুজোর ঘরে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।

এই চরমক্ষণে তিনি ওখানে করছেন কী? কত আর রামায়ণ পুঁড়বেন? দেবতার যদি শোনবার মতি হত তা হলে তো সময় থাকতো, একটু আগে ভাগেই শুনতে পারতেন। এখন এঞ্জিনে সিটি দিয়েছে, গার্ড কখন নেড়ে দিয়েছে সবুজ নিশান, এখন কি আর চলতি গাড়িতে ওঠা যায়?

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। হায়, দেবতাদেরও দেরি হয়। হয়তো আবেদন-নিবেদন ঠিকই শুনেছেন কিন্তু তাদের ক্ষমতা নেই যে গাড়িটাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্বর্গরাজ্যে কেউই তারা ভি-আই-পি নয়, লাট-বেলাট তো নয়ই, মন্ত্রী-তন্ত্রীও নয়।

গাড়িটা চলল। সুজিতের নিশ্বাস ক্রমশই ছোট হয়ে আসতে লাগল। আর একবার—আর একবার। আরো—আরো একটা নিশ্বাস।

হঠাৎ বন্ধ পূজোর ঘরের দরজার উপর অভিজিৎ দুমাদ্দম কিল-লাথি মারতে লাগলেন। তীব্রস্বরে উঠলেন চিৎকার করে: 'চলে এস বেরিয়ে এস শিগগির। খোকা চলে যাচ্ছে। শেষ সময়টুকুতে ওর কাছে থাকো। যদি চোখ বোজবার আগেও একবার তাকায়। যদি তোমাকে খোঁজে। যদি—'

তবু কিছুতেই খুলল না দরজা।

ডাক্তার কোন দিকে দেখেন—স্ত্রীর দিকে, না, ছেলের দিকে? এ দরজা খোলেন, না, ও দরজা বন্ধ করেন? দিশেহারার মত হয়ে গিয়েছেন। কী বলবেন কী করবেন কিছুই যেন স্থির করতে পারছেন না। এমন সময় ওঁর শোবার ঘরে, পাশের ঘরে, ফোন বেজে উঠল। সব ফেলে-ছড়িয়ে ছুটলেন ফোনের দিকে।

অদ্ভুত শান্তস্বরে বলছেন: ও, হ্যাঁ, প্রবীরবাবু, চিনতে পেরেছি—কাল দেখে এসেছি, আর আজই ভুলে যাব?' একটু বা লঘু পরিহাসের টান দিলেন।

পরমুহূর্তেই গম্ভীর হল কণ্ঠস্বর: 'কী বলছেন? শুনতে পাচ্ছি না। ও! অবস্থা সিরিয়স হয়ে এসেছে? ভয় পাবেন না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি।'

তারপর একটু বুঝি মিনতির সুর: 'ঠিক এক্ষুনি যেতে পাচ্ছি না। গাড়ি তো আমারই আছে, না, গাড়ির জন্যে নয়, গাড়ি নিয়ে এলেই বা কী হবে! ঠিক এই মুহূর্তে যেতে পাচ্ছি না, কারণ আমার ছেলে বড় ছেলে—অসুস্থ—খুব বেশি রকম অসুস্থ, হ্যাঁ, অবস্থা এখন খুবই ক্রিটিক্যাল, কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে।'

আবার সেই লঘুতার সুর: 'যা, কাল দেখা হল, কাল আপনাদের এ কথা বলিনি কেন? এ কথা বলার কোনো দরকার ছিল না। এক রুগী দেখতে গিয়ে আরেক রুগীর কথা বলতে যাওয়া অবান্তর।'

তারপর একটু বা আশ্বাসের সুর: 'ভাববেন না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফ্রি হতে পারব—হ্যাঁ, আধ ঘণ্টাও হয়তো লাগবে না।'

তারপর ও-প্রান্ত হয়তো বলেছিল: 'থাক, আপনার এই দুঃসময়ে আপনি আসবেন না আমরা না-হয়—'

এবার অভিজিতের কণ্ঠে দৃঢ়তার সুর: 'থাকবে কী মশাই! একজন মরছে বলে আরেকজন বাঁচবে না? মানুষ একবার মার খেয়েছে বলে বারে বারেই মার খাবে? আর দুঃসময়? সুসময়ের জন্যে অপেক্ষা করে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। তবে আপনারা যদি অন্য ডাক্তার ডাকতে চান সে অন্য কথা।'

রিসিভার রেখে দিলেন অভিজিৎ।

এ কী, ঠাকুরঘরের দরজা এখনো খোলেননি মাধবী।

'এ কী, অসম্ভব কাণ্ড!'

অভিজিৎ ঢুকলেন রুগীর ঘরে। নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। বুকের কাছে প্রাণটুকু এখনো সামান্য ধুকধুক করছে।

বন্ধ দরজার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন অভিজিৎ। এ কী অলৌকিক ব্যবহার! ওসব মাটির পুতুলের কাছে কাঁদলে কোনো লাভ আছে? যা যুক্তি-বুদ্ধির মধ্যে আসে না, সব ছেড়ে ওঁড়ো করে দাও, ছুঁড়ে ফেলে দাও বাইরে। অনেক বলেছ অনেক কেঁদেছ, অনেক পুষেছ দুঃখ-কল্পনা দিয়ে, আর নয় এই মূর্খ প্রসন্ন। চলে এস, বেরিয়ে এস, ছেলেকে কোলে নিয়ে বোসো শেষবারের মত—'

একটা তাজা জীবন অকালে চলে যাবে এ যেন একটা মূর্খতর প্রসন্ন নয়। এ যেন স্বাভাবিক যুক্তি-তর্কের মধ্যে।

পাকাশীর বুকটা ফেটে যাচ্ছিল। এখানে তো তাকে কেউ কাঁদতে দেবে না প্রাণ ঢেলে। মনে হল, এ আর কী দেখব! বাড়ি ফিরে যাই। ঠাকুরঘরের মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সর্বস্ব দিয়ে কাঁদি! এতদিন শুধু কীর্তনই করেছি, কাঁদিনি। ঠাকুর হয়তো কান্না শোনবার জন্যেই কান পেতে আছেন। কীর্তনের চেয়েও ক্রন্দন বোধহয় তাঁর কাছে বেশি লোভনীয়।

ঠাকুর, সুজিতকে ভালো করে দাও। এতদিন স্পষ্টস্বরে সরাসরি প্রার্থনা করেনি পাকাশী। মনস্তাপের মধ্যে এ প্রার্থনা যে প্রচ্ছন্ন ছিল তা বোধহয় বোঝেননি ঠাকুর। আজ এখন উচ্চকণ্ঠে তীব্র আর্তনাদ করে স্পষ্ট প্রার্থনা করতে চায়, দাবি জানাতে চায়, সুজিতকে নিও না। না, পারবে না নিতে। ছেড়ে দেব না, কিছুতেই না।

কিন্তু এ বাড়িতে চেঁচিয়ে অমনধারা প্রার্থনা করা যাবে না, অলৌকিক শোনাবে।

পাকাশী ফের নিজের বাড়ির দিকে চলল।

কিন্তু এ এল কোত্থেকে? রাস্তার উপরে আশ্চর্য এক সাধু দাঁড়িয়ে। কোথায় যেন যাচ্ছিল, হঠাৎ থেমে পড়েছে।

পরণে কৌপীন, উপরে বহির্বাস। মুখভরা দাঁড়ি গোঁফ, মাথায় জটা। গলায় নানারকম মালা দুলছে, মধ্যখানে একটা কবচ। সারা গায়ে ছাই মাখা, কপালে লাল ঊর্ধ্বপুণ্ড্র। ডান হাতে দণ্ড, বাঁ হাতে কমণ্ডলু। দীর্ঘ শরীর, খালি পা।

পাকাশীকে দেখে সাধুও কম অবাক হল না। এ সুন্দর মেয়েটি কে? সদ্য স্নানের জলের ফোঁটা এখনো কপালে, কানের কাছেকার চুলে লেগে আছে। শিশিরধোয়া শিউলি ফুলের মত দেখাচ্ছে। পবিত্র একটি গন্ধ বেরুচ্ছে গা থেকে। এ আনন্দিনী মেয়ে এখানে কেন? কী চায়? কোথায় চলেছে ব্যাকুল হয়ে?

'কোথায় যাচ্ছ?' জিগগেস করল সাধু

'বাড়ি।'

'বাড়ি? এ বাড়ি কার?'

'এ বাড়ি ডাক্তার অভিজিৎ ব্যানার্জির।' সাধুর মুখে বাঙলা শুনে অনেক সাহস বেড়েছে পাকাশীর। 'আমার বাড়ি ঐ পাশেই।'

'পাশেই ? তবে এসেছিলেই যদি, ফিরে যাচ্ছ কেন এখুনি ?'

কী সুন্দর মিষ্টি করে কথা বলছে সাধু ! কোথায় তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবে, তা নয়, নম্র ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে জবাব দিতে হচ্ছে।

'ডাক্তারবাবুর বড় ছেলের মস্তবাপর অসুখ, তাই দেখতে এসেছিলাম।' যন্ত্র মুখে বললে পাকালী, 'নাড়ী ছেড়ে গেছে, খাস আর নেই—তাই ফিরে যাচ্ছি।'

সাধু মিষ্টি করে হাসল : 'বাড়ি ফিরে গিয়ে কী করবে ?'

'বাড়ি ফিরে গিয়ে খুব করে চেঁচিয়ে কাঁদব—'

'চেঁচিয়ে কাঁদবে—ডাক্তারবাবুর বড় ছেলে তোমার কে হয় ?'

'কেউ হয় না। পাশাপাশি বাড়ি থাকি, অনেক দিনের চেনা—'

'তা হলে দু বাড়ি তো প্রায় এক বাড়ি।' সাধুর চোখের দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে এল। 'তবে এ বাড়িতে কাঁদতে তোমার বাধা কী ?'

'এ বাড়িতে চেঁচিয়ে কাঁদা বারণ। এটা বৈজ্ঞানিকের বাড়ি। সমস্ত যুক্তি-তর্কের নিক্তিতে ওজন করা—'

'সত্যিই তো কেঁদে কী হবে ? চেঁচিয়ে কাঁদে ?'

'আমার ঠাকুরের কাছ থেকে জবাবদিহি নেব কেন আমার প্রার্থনা শুনলেন না ?'

'তোমার কে ঠাকুর ?'

'আমার ঠাকুরটা শিশু। দুর্বল, নিরীহ।' শোক ভুলে গিয়ে শান্তমুখে হাসল পাকালী : 'গোপাল ঠাকুর।'

'যে আঙুলে করে গিরি গোবর্ধন ধরেছিল ?'

'কে জানে ধরেছিল কিনা—'

'চলো না দেখে আসি গোপাল কী বলে।' সাধু অভিজিতের বাড়ির দিকে এগুলো।

কে জানে ঢুকতে দেবে কিনা। ইতস্তত করছিল পাকালী। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গিয়েছে ততক্ষণে। সে সব উপেক্ষা করে সাধু বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। যখন মৃত্যুর জন্যেই পথ খোলা তখন বুঝি কাউকেই আর বাধা দেওয়া যায় না। কোথায় সমস্ত গ্রন্থিরেখা শিথিল হয়ে পড়ে।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইলেন অভিজিৎ। বাধা দিতে পারলেন না। হয়তো বাধা দেবার মত আর শক্তি নেই। উৎসাহ নেই।

সাধু দিব্যি উঠে এল উপরে। জিগগেস করলে, 'রুগী কোন ঘরে ?'

পাকালী ঘর দেখিয়ে দিল।

কে না কে এক নোংরা সাধু, গায়ে এক রাজ্যের ছাই, পায়ে ধুলো, অনায়াসে ঢুকল সুজিতের ঘরে। রুগীকে দেখল তীক্ষ্ণ চোখে। অভিজিৎও ঘরে ঢুকেছে, তাকে লক্ষ্য করে সাধু জিগগেস করলে, 'আপনারা কি এখনো এর কিছু আশা রাখেন ?'

কেঁদে ফেললেন অভিজিৎ। এতক্ষণ ছিলেন পাষাণ হয়ে, এখন, কেন কে জানে, পারলেন না নিটুট থাকতে।

'জিগগেস করছি আপনাদের কি আর কোনো চিকিৎসা আছে?' সাধু ফণীর খাটের দিকে এগুলো। 'যদি না থাকে, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

দেখুন চেষ্টা করে। দেখুন। ভিড়ের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল।

আর দেখবে কী।' কে আরেকজন বললে, 'শেষ হয়ে গিয়েছে। নিশ্বাস পড়ছে না।'

এসব কথাবার্তা সাধু গ্রাহ্যের মধ্যেও আনল না। যার ছেলে তার দিকে তাকোল। বললে, 'কী, একবার শেষ চেষ্টা দেখব? আপনি না বললে হবে কী করে?'

আর শেষ চেষ্টা! ছেলের দিকে তাকিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন অভিমিৎ। পাকাশীও আঁচলে মুখ ঢাকল।

'ফণীর মা কোথায়?'

'ঠাকুরঘরে।' কে একজন বললে।

'সে কী? তাকে ডেকে আনো।'

'ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।' কে আরেকজন বললে।

সাধু এমনভাবে ঘরের চারদিকে তাকাল যেন সে ছাড়া সুস্মিতের আপন বলতে কেউ নেই। বাবা মা ভাই বোন আত্মীয় স্বজন, এমন কি, পাকাশীও তাকে আর দাবি করছে না আত্মীয় বলে। যেন সুস্মিত এই সাধুরই একলার সম্পত্তি। যেন সাধু সুস্মিতকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে।

সাধু কী আর করল? কমণ্ডলুতে জল ছিল, তাই খানিকটা নিয়ে সুস্মিতের গায়ে ছিটিয়ে দিল।

হয়তো মুখেও দিল দু-এক ফোঁটা।

তারপর সমবেত কাউকেও বিন্দুমাত্র প্রস্তুত হতে না দিয়ে বিরাট উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে উঠল। অট্টহাস্য না আর্তনাদ কেউ সহসা বুঝে উঠতে পারলনা। হঠাৎ কালবোশেখির আকাশে বাজ ফেটে পড়ল কিনা কে জানে। না কি প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গোটা বাড়িটাই ধসে পড়ল মাটিতে? সমস্ত শালীনতা সভ্যতার সমাধি হল?

ঘরে-বাইরে সকলে থ হয়ে গেল। কারু বা কাঁপন ধরল বুকের মধ্যে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

এমন বিকট আওয়াজ, সুস্থ লোকেরই হার্টফেল করে। যদি চেতনার কোনো গভীরতম স্তরে এখনো প্রাণের এক কণা বাকি থেকে থাকে তাহলে এই চিৎকারে তা নির্ঘাৎ মুছে গেল, ছিঁড়ে গেল শেষ তন্তু।

কিন্তু এ কী ভয়ঙ্কর!

কেন, কী হল? কেউ মূর্ছা গেল নাকি? পাকাশী? পাকাশী কোথায়?

যা, ঐ তো পাকাশী। জলজ্যান্ত বসে আছে টান হয়ে। আগে কাপড়ে মুখ ঢাকা ছিল, এখন মুখ খোলা। কান্নার করুণ রেখাকটা মুছে গিয়েছে। এ কি, পাকাশী হাসছে? কী দেখে হাসছে? চিৎকার শুনে মেয়েটা পাগল হয়ে গেল নাকি?

দেখ না কী দেখে হাসছে! দেখ না, শুধু ওর কেন, সকলেরই পাগল হয়ে যাবার অবস্থা কিনা।

আরে, সত্যিই তো এ কী অবিশ্বাস!

চোখের উপর দেখছ, তবু অবিশ্বাস্য বলছ,

সুজিতের বুক-পেট নিশ্বাসে দুলতে সুরু করেছে। গা-হাত-পা গরম লাগছে। মুখের নীলচে ভাবটা কমে যাচ্ছে।

আর?

ঠাকুরঘরের বন্ধ দরজা খুলে গিয়েছে হাট হয়ে। সাধ্য কী, ভয়ের হয়ে আর বসে থাকতে পারে মাধবী। কে যেন জোর করে দরজা খুলে দিল সশব্দে। বললে, যা, আর ডাকতে হবে না, কাঁদতে হবে না। তোর ছেলে ভালো হয়ে গিয়েছে। ওঠ, ছাখ গে তোর ছেলেকে। কোলে তুলে নে গে।

খোলা দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল মাধবী।

'বেঁচে উঠেছে। বেঁচে উঠেছে—।' বহু কণ্ঠ একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

অভিজিৎ নিজেই ছেলের হাত টেনে নিয়েছেন নিজের হাতে। নাড়ী দেখছেন। আশ্চর্য, পাওয়া যাচ্ছে নাড়ী। সুতো-সুতো নয়, বেশ মোটা, স্পষ্ট। অভিজিতের মুখে আনন্দের আভা ফুটল। নার্সকে বললে, 'ডাক্তার চ্যাটার্জিকে একটা ফোন করো—'

পুজোর কাপড় পরনে, কপালে সিঁথিতে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, মাধবী সুজিতের বিছানা ঘেঁসে দাঁড়াল। কপালে হাত রাখল।

দেখ দেখ মরা ছেলে চোখ মেলেছে। নড়ে-চড়ে উঠেছে।

'মা।' ডেকে উঠল, কথা কয়ে উঠল সুজিত।

'কিছু খাবে?'

'জল খাব।'

মাধবী পুজোর ঘর থেকে জল আনতে গেল।

হ্যাঁ, সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়েছে সুজিতের। এবার তবে আর ঘরের মধ্যে ভিড় কোরো না, সরে যাও, ফিরে যাও। যারা বড়লোকের বাড়ির শোক দেখতে এসেছিল তারা এবার হতাশ হলে। কিন্তু আবার ডাক পড়তে কতক্ষণ? যখন প্রাণের দেখা আরেকবার পাওয়া গিয়েছে আমরা, ডাক্তাররা, আবার লড়ব প্রাণপণে। তোমরা জায়গা ছাড়ো।

'ও কী?' অভিজিৎ বাধা দিল মাধবীকে।

'একটু চরণামৃত।' মাধবী বললে। 'ও জল খেতে চেয়েছে।'

'জল খেতে চেয়েছে, নার্স দেবে। গ্লুকোজ ওয়াটার দেবে।' অভিজিৎ প্রায় ধমক দিয়ে উঠলেন: 'এ সব নোংরা জল চলবে না। নতুন করে আবার ইনফেকশান হোক।'

কিন্তু সাধুর কমণ্ডলুর জল তো তখন চলেছিল। তখন বুঝি ডাক্তারিশাস্ত্রের বাইরে ছিল রুগী। সমস্ত আশা-ভরসার বাইরে। এখন কমণ্ডলুর জল প্রাণ এনে দিয়েছে, তাই, পাকালী ভাবল, বিজ্ঞান আবার মাতব্বরি করতে এসেছে।

কিন্তু, পাকালী বলে উঠল, সাধুবাবা, সাধুবাবা কোথায় গেলেন? কই তাঁকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

'নিচে নেমে গিয়েছেন।' ভিড়ের মধ্যে থেকে কারা বললে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাকো, খুব ভালো সময়ে এসেছিলেন।' অলক্ষ্যে অতিজিৎ চঞ্চল হলেন। বললেন, 'শুধু হাতে ফিরে যাওয়াটা ঠিক নয়। কটা টাকা অন্তত ধরে দেওয়া উচিত।' তারপরে হাত বাড়ালেন স্ত্রীর দিকে: 'তোমার ঐ নোংরা জলটা খোকার মাথায় ঠেকাতে পারো, মাথায় ঠেকালে কোনো ভয় নেই, কিন্তু মুখে নয় কিছুতেই।'

মুখে নিতে সুস্মিতের আপত্তি। পাঞ্চালী একবার দেখল তাকিয়ে, সন্দেহ কী, সুস্মিতের জ্ঞান হয়েছে।

'কিন্তু কে সাধুবাবা?' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাধবী।

'এই যে এখানে ছিলেন। সুস্মিতাকে ভালো করে দিলেন। কিন্তু ভারি অদ্ভুত তো, গেলেন কোথায়? নিচে নেমে গিয়েছেন বলছে—' বলতে-বলতে তরতর করে পাঞ্চালী নিচে নেমে এল। কই কই সে সন্ন্যাসী?

'এই যে এইমাত্র চলে গেলেন।' নিচের ভিড়ের মধ্য থেকে কে বললে।

'বেশি দূর যায় নি নিশ্চয়ই। রাস্তায় বেরুলে ধরা যাবে হয়তো।' বললে আরেকজন।

'কিন্তু এমন লম্বা-লম্বা পা ফেলে গেল, মনে হয় না কেউ ধরতে পারবে।'

তবু পাঞ্চালী তাড়াতাড়ি করে চলে এল রাস্তায়। এদিক ওদিক দুদিক তাকাল। বার বার তাকাল। রাস্তায় সেই প্রতিদিনকার চেহারা। দোকান রিকশা মোটর ফেরিওয়ালা। সাইকেলও যাচ্ছে দুচারটে। কিন্তু সবার সঙ্গে বেমানান সেই অদ্ভুত লোকটা কোথায়?

মুদি-দোকানের লোকটা বললে, ওধার দিয়ে গেলেন—

ওধার দিয়ে। বললে পানওয়ালা। মোড় ঘুরে, বাঁক নিয়ে, হন হন করে।

'আশ্চর্য কিন্তু। তুমি দেখেছ?' পথের পাশে বসে ছিল একটা লোক তাকে জিগগেস করল পাঞ্চালী। কই, না তো? তুমি? জিগগেস করলে একটা রিকশাওলাকে। সে শুধু হাসল। সাধু সন্ন্যাসী কি রিকশা চড়ে?

'তুমিও দেখনি?' পাথরের চোখে তাকাল চারদিকে। 'একটা জলজ্যান্ত মানুষ মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল?'

উধাও হবে কেন? পাড়ার ভূপেনবাবু তাকে তাঁর বাড়ি টেনে নিয়ে গিয়েছেন। ঐ একশো চৌত্রিশ নম্বরের বাড়িটা তো? যা, তা কী করে হয়, গেলেন এদিকে, একশো চৌত্রিশ নম্বরটা পড়ে কী করে? না, না, পতিত ঘোষের বাড়ি গেলেন বোধহয়। কে আরেকজন বললে। উনি তো পতিত ঘোষেরই ভাই। সে বাড়িতে উঠেছেন। সেখান থেকেই বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন এদিকে। আরে, কী আশ্চর্য, ঐ তো পতিত ঘোষ দাঁড়িয়ে। তবে নিশ্চয়ই দীনবন্ধু মাসের বাড়ি। সতেরো-বাই-থ্রি-এইচ।

পাঞ্চালী আবার ফিরে এসে দোতলায় উঠল। ভিড় তখন অনেক পাতলা হয়ে এসেছে, তাদের দেখবার মত আর বিশেষ কিছুই উপস্থিত নেই। না মৃত্যু না শোক না বা সন্ন্যাসী। কর্তা চোক গিলে জল খেয়েছে, কথা বলেছে, পাশ ফিরেছে নিজের থেকে।

কিন্তু পাঞ্চালীর দেখা এখনো ফুরোয়নি।

সঙ্গে-সঙ্গে মাধবী স্বামীকে বলছেন, 'তুমি বেরুচ্ছ? তবে একটু সাধুবাবার খোঁজ কোরো।'

'তার খোঁজ করব কোথায়?'

'তুমি গাড়ি করে বেরুচ্ছ তো? তবে একটু এখানে-ওখানে দেখো না। কোথায়, কতদূর আর যাবেন? ঠিক দেখা পেয়ে যাবে।'

'আমি যাচ্ছি এখন রুগীর বাড়ি।' অভিজিৎ ঘুরে দাঁড়ালেন।

'তবু—' চোখে মিনতি নিয়ে তাকাল মাধবী।

'রুগী বেশি, না, পথের একটা সন্ন্যেসী বেশি?' অভিজিৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: 'কখন থেকে ফোন এসে রয়েছে। কথা দিয়েছি যাব। আমাকে যেতেই হবে। একটা রুগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা ঢের বেশি মহৎ কাজ।'

ইতিমধ্যে মাধবী শুনে নিয়েছে কী অসম্ভব কাণ্ড ঘটে গিয়েছে বাড়িতে। তাই সে বলতে সাহস করে, 'কিন্তু যে তোমার ছেলেকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল তার কোনোই মূল্য নেই তোমার কাছে?'

'মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনল তোমার ঐ সাধু নাকি?' অভিজিৎ সগর্বে হেসে উঠলেন: 'ফিরিয়ে আনল ডাক্তারি চিকিৎসা। ওষুধ আর ইনজেকশান। একটু লেট একেই হয়েছে ওষুধের —দেরিতে কাজ হয়েছে। তার জন্যে তোমার ঐ ভিখিরি সাধু বাহাদুরি নিতে পারে না—'

'তোমাদের চিকিৎসার আর বড়াই করতে এস না। দেখা গেছে। এক ঘর লোক দেখেছে চোখ মেলে।'

'যদি সত্যি কেউ অহংকার করতে পারে তবে আজকের এই বিজ্ঞান।' অভিজিৎ সিঁড়ির দিকে এগুলেন।

'বিজ্ঞানের বাইরে তবে এটা কী ঘটল?'

'কিছু ঘটেনি। যা ঘটেছে বিজ্ঞানই ঘটিয়েছে। একটু দেরি করে ঘটিয়েছে এই যা।'

'তুমি এমনি অকৃতজ্ঞ?'

'কেন, কী করতে হবে?' সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে থামলেন অভিজিৎ। 'তাকে খুঁজে পেলে লাভই বা কী হবে শুনি? তার জন্যে ছেলে যদি ভালোর দিকে এসে থাকে তো ভালো কথা। আমরা খুশি হলাম, সকলে খুশি হল। তারপর তাকে দিয়ে আর কাজ কী। তবে যদি বলো তাকে একটা কি দেওয়া উচিত, অভিজিৎ বাঁকা মিশিয়ে হাসলেন, 'তা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। আমি তো বলেওছি, সাধু যদি তার আশ্রম-টাশ্রমের জন্যে কিছু টাকা চায়, আমি তা দেব, কার্পণ্য করব না। কতই তো অপচয় হচ্ছে, দান-খয়রাতও তো কম নয়—'

তুমি এসব কী বলছ?

বেঠিকটাই বা কী বলছি?' আরো দুধাপ নামলেন অভিজিৎ: 'সাধুর দেখা পেলে শেষ পর্যন্ত কিছু টাকারই তো শ্রাদ্ধ হবে। টাকা ছাড়া আবার সাধু কোথায়? হয় শাল-দোশালে। নয় হীরের আংটি নয় হোমের খরচ নয় তীর্থ দেখবার ট্রেনভাড়া। বুঝেছি, তোমার কিছু টাকা উড়োবার মতলব। তা তোমার সাধুই যদি উড়ে যান, তার আমি কী করব?'

'এ যেমন-তেমন সাধু নয়, এ তোমার ছেলের প্রাণদাতা।'

'মুহু। বেটা কমণ্ডলু থেকে জল দিলে মুখে। কমণ্ডলুর জল যখন তখন নিশ্চয়ই গঙ্গাজল। তার মানে, চলে যাচ্ছে রুগী, বাহাদুরি করে একটু গঙ্গাজল দিই। মানে, ইতি করে দিই। তারপর, অভিজিৎ মুখে-চোখে আতঙ্কের ছবি আঁকলেন: 'তারপর থেকে-থেকে এমন একটা অদ্ভুত চিৎকার করল যে সুস্থ লোকেরই হার্টফেল করার কথা। যারা এখানে ছিল তাদের কারু হার্ট-ব্যাটাক হয়েছে বলে যদি কল্ পাই আশ্চর্য হব না। বুদ্ধি খাটিয়েই পালিয়েছে লোকটা।'

'না, না, তবু তুমি খুঁজো—'

'গরু খুঁজে পাওয়া যায় কিন্তু সাধু খুঁজে পাওয়া যায় না।'

মাধবীও নামতে লাগল পিছে-পিছে। সম্ভব হলে সেই যেন বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়। সেই যেন খুঁজে দেখে।

অভিজিৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তীব্রস্বরে ধমক দিয়ে উঠলেন: 'এ কি, তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

মুহূর্তে সন্ত্রাসতা ও আভিজাত্য পায়ের বেড়ি হয়ে জড়িয়ে ধরল মাধবীকে।

'এ তোমার কিসের পাগলামি? লোকে লোকে পাগল হয় শুনেছি, কিন্তু তোমার ছেলে বেঁচে, ভালোর দিকে। তোমার কেন এ আত্মহারা ভাব? একটা বুনো সাধুর জন্যে? আর ঐ তো তার হাড়সর্বস্ব চেহারা—'

কী রকম করে যেন তাকাল মাধবী।

বোধহয় অভিজিৎ একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। বললেন, 'আগে রুগীকে তো দেখি পরে দেখা যাবে সাধুকে পাওয়া যায় কিনা।'

'একটু ব্যাকুল হয়ে খুঁজলে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

'ঐ যে এসেছিল সাধু, সেও কি ব্যাকুল হয়ে খোঁজবার ফলে? দৈবাৎ এসেছিল দৈবাৎ চলে গিয়েছে। যাও উপরে যাও। খোকা এখন একটু ঘুমিয়েছে, জেগে উঠে তোমায় আবার খোঁজ করতে পারে।' গাড়িতে গিয়ে উঠলেন অভিজিৎ, নিজের মনেই হাসলেন, বললেন, 'আমি যা খোঁজ করতে পারি—রুগী আর টাকা—তাই আমাকে খোঁজ করতে যাও।'

কিন্তু আরোগ্য? বুকের মধ্যে খচ করে উঠল।

সে রুগীর অদৃষ্ট। তার মানে এ নয় একটা সাধু-সন্ন্যাসী এসে জল-পড়া বা ধুলো-পড়া দিলেই মুমূর্ষু রুগী ভালো হয়ে উঠবে—।

'যাও, উপরে যাও।' মাধবী তবু গাড়ির কাছে চলে এসেছে দেখে অভিজিৎ ভীষণ বিরক্ত হলেন।

'যাচ্ছি।' মাধবী গাড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অশ্রুমাখা স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, 'তুমি একটু ভালো মনে খুঁজো, ঠিক দেখা পেয়ে যাবে। মানুষের একটু কৃতজ্ঞতাও তো থাকা উচিত। খোকা তো এখনো সম্পূর্ণ সেরে ওঠেনি, আবার না অবস্থা খারাপ হয়।'

'কী যে বলো তার ঠিক নেই। এই চলো,' স্টার্ট দিতেই অভিজিৎ মুখ বাড়িয়ে বললেন, 'আমি আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসছি। যেখানে যাচ্ছি সেটাও একটা সিরিয়স কেস।'

আধঘণ্টা! তা হলে কত খুঁজবে বোঝা গেছে।

মাধবী উপরে উঠে গেল। পর্দা সরিয়ে উঁকি মারতেই নার্স বললে, 'সব লক্ষণ ভালো, টেম্পারেচার নর্ম্যাল, ঘুমুচ্ছে আরামে। এখন আর এঘরে ঢোকবার কারণ নেই।'

তা হলে আধঘণ্টার মধ্যেই অতিজিতের বাড়ি ফেরবার দরকার কী! ধীরে সুস্থে এ-রাস্তা ও-রাস্তা খোঁজ করতে পারেন সাধুর। নানা মানুষের সঙ্গে পরামর্শও করতে পারেন কী করে নিরুদ্দেশের পাত্তা পাওয়া যায়। আচ্ছা, যে রুগীর বাড়ি গেছেন সেখানে ফোন করে দেওয়া যায় না? বলে দেওয়া যায় না শিগগির-শিগগির ফেরবার দরকার নেই—উনি একটু যেন--

পাঞ্চালী মধুর স্বরে বললে, 'খোঁজ করলেই কি ধরা যাবে যদি তিনি নিজের থেকে না ধরা দেন—'

মুগ্ধের মত পাঞ্চালীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মাধবী। বললে, 'তুমি ঠিক বলেছ, সবই তাঁর কৃপা। কিন্তু তুমি কিছু তো একটা করবে যাতে তাঁর কৃপা হবে তোমার উপর।'

পাঞ্চালী অপরূপ করে হাসল। বললে, 'তা কেন? কৃপা। কৃপা। কৃপার মধ্যে আবার যুক্তি কী। চাইলেও কৃপা না চাইলেও কৃপা।'

সামান্য একটা সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে কিন্তু কী সহজ বিশ্বাসে কথা কয়। বাড়ির অবস্থা ভালো নয়, ম্যাট্রিক পাশ করে বসে আছে। লেখাপড়া আর বিশেষ কী হয়েছে, তবু এমন সুন্দর করে কথা কয় যেন সমস্ত বিদ্যার সার কথা ওর জানা। কে যে ওকে এত সব শেখায়, মর্মে বসে বলে যেয় তা কে জানে। কৃপা যে সব যুক্তি তর্কের বাইরে এ ওকে কে বলে দিল?

পাঞ্চালীকে মাধবী ঠাকুরঘরে নিয়ে এল। বললে, 'কিন্তু আমি যে চেয়েছিলাম। আকুল হয়ে চেয়েছিলাম। নিদারুণ প্রতিজ্ঞার প্রার্থনা করেছিলাম।'

আমিও করেছিলাম। পাঞ্চালী একথা বললে না মুখ ফিরিয়ে। চেপে গেল। শুধু বললে, 'প্রার্থনা করতে খুব ভালো লাগে।'

'আমার স্বামীকে, ডাক্তারবাবুকে তো তুমি জানো, ঠাকুর দেবতার উপর নিদারুণ চটা। বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছু জানেন না, জানতে চাননা। আমি ঠাকুরকে বললাম, ঠাকুর, উনি বিজ্ঞান নিয়ে থাকুন, আমি অজ্ঞান মানুষ, আমাকে তুমি শুধু ভক্তি দাও, প্রার্থনা করবার শক্তি দাও। শুধু আমার প্রার্থনার শক্তিতে আমার সুজিত ভালো হয়ে উঠুক।'

পাঞ্চালী সেই অপার্থিব হাসিটুকু হাসল। বললে, 'প্রার্থনার শক্তিতে ভালো হয়ে উঠলে নির্ঘাৎ বলতেন, চিকিৎসার শক্তিতেই ভালো হয়ে উঠেছে। নইলে যে কাণ্ডটা ঘটল, চোখের উপর দেখেও যখন বলছেন, কিছু নয়, ওষুধেরই গুণ, তখন আর কী করা যাবে। কিন্তু মা বলেন, অবিশ্বাসে কিছু নেই, বিশ্বাসেই সমস্ত।'

'ও, হ্যাঁ, তোমার মা—তোমার সেই কৃষ্ণময়ী মা, তাই না?'

'হ্যাঁ।' অস্ফুটে হাসল পাঞ্চালী। বললে, 'যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অবিশ্বাস।'

'তাই আমি যত ঠাকুরঘরে পড়ে থাকি ততই উনি গর্জন-তর্জন করেন, ও দিয়ে কী হবে, কিছু হল এতদিন? কতগুলি পট আর পুতুলের কাছে মাথামুড় খুঁড়লেই যদি রোগ সারত তাহলে আর ভাবনা ছিল না। পৃথিবী শুদ্ধ লোক করত তাই সারাক্ষণ। কিন্তু একটা লোক এদিকে, সব কেঁচিয়ে বিদায় করে দেব। আমি খালি কেঁদেছি আর বলেছি, ঠাকুর, এ অপমান আর সইতে পারি না। যদি সত্যিই তুমি আছ, একটা চাক্ষুষ প্রমাণ দাও, মুহূর্তে সুজিতকে ভালো করে দাও। লোকে দেখুক, বিশ্বাস করুক।'

'কে আপনার ঠাকুর?'

'তাকিয়ে দেখ না কে নেই? শিব, কৃষ্ণ, রাম, কালী—সবাই এখানে বাসা বেঁধেছে। কাকে ছেড়ে কাকে ধরব, সকলের কাছে প্রার্থনা করেছি। বলেছি, আমার প্রার্থনায় ত্রুটির জন্যে তোমরা বিমুখ থাকবে এ আমি সহ্য করতে পারব না। আমার জোর নেই বলে তোমরাও জোর দেখাবে না এ কেমন কথা।' মাধবী তখনো কেঁদেছে, এখনো কাঁদছে: 'খালি কেঁদেছি, খালি ডেকেছি, ঠাকুর, দয়া করো, দেখা দাও—'

সরলতা মাখা প্রশান্ত মুখে পাকালী বললে, 'আপনার ডাকে মহাদেব চলে এলেন ওষুধ নিয়ে। মানুষের মূর্তি ধরে।'

'মানুষের মূর্তি ধরেই তো আসেন। কিন্তু কই আমি তাঁর দেখা পেলাম না কেন?' কান্নায় ভেঙে যেতে লাগল মাধবী: 'আমি পাপী, আমি বাসনায় বদ্ধ—'

'কী যে বলেন! আপনার ডাক আপনার ব্যাকুলতাই তো তাঁকে টেনে নিয়ে এল। শ্রদ্ধা ভক্তি না পেলে কি তিনি আসেন কখনো?' পাকালী হঠাৎ কৌতূহলী হল, জিগগেস করলে, 'আচ্ছা, যখন উনি প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠলেন তখন বন্ধ ঘরে বসে শুনতে পেয়েছিলেন?'

'পেয়েছিলাম।' মাধবী বললে, 'মনে হল আকাশে বুঝি হঠাৎ মেঘ করেছে, আর একটা বাজ বুঝি ফেটে পড়ল।'

'আওয়াজে আপনার ঘরের দরজা খুলে গেল তখুনি?'

'খুলে গেল। তার মানেই, ঠাকুর বললেন, কী ঘরের মধ্যে বন্ধ হয়ে আছিস, আমি ঘরে নেই, আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। বেরো, বেরিয়ে পড়, আমাকে দেখবি আয় বাইরে। আমার যেন্তে বুঝি কিছু দেরি হল।' দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে উঠল মাধবী: 'তিনি চলে গেলেন।'

'কিন্তু আপনার প্রার্থিত ফল তো দিয়ে গেলেন।' তৃপ্তিভরা স্বরে পাকালী বললে, 'মুক্তিদার সমূহ বিপদটা তো কাটল। বিজ্ঞানের বড়াই তো বজায় রইল না।'

'কিন্তু তোমার—তোমার কী পুণ্যফল পাকালী,' মাধবী পাকালীর হাত দুটো চেপে ধরল: 'তুমি তাঁকে দেখতে পেলে।'

'দেখতেই পেলাম,' মুখখানি করুণ করল পাকালী: 'কিন্তু চিনতে পেলাম না। একজন মর্ত সন্ন্যাসী বলে ভাবলাম। দিব্য চক্ষু তো আসল না।'

'না, তোমার টানেই উনি এসেছেন। তুমিও তো তোমার মুক্তিদার জন্যে প্রার্থনা করেছিলে—'

লাজুক মুখে হাসল পাকালী। বললে, 'কই, আমি প্রার্থনা করতে পারি না। তেমন করে পরাণপুটি আসে না মনের মধ্যে। চেষ্টা করি, আসেনা ষোল আনা। আমি শুধু নাম করি। আমার মা বলেন যা আমার মঙ্গল তা এই নামের মধ্য দিয়েই হবে।'

'কে, তোমার রাধা-মা?'

'হ্যাঁ, কেউ-কেউ বলে কৃষ্ণময়ী মা।'

'তোমার মায়ের কাছে আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?'

'বা, কেন নেব না? নিশ্চয়ই নিয়ে যাব।' পাকালী উদ্বেল হয়ে উঠল: 'মায়ের কাছে

সকলেরই দুয়ার খোলা। তাছাড়া আপনি কত বড় শক্তি। মহাদেবকে আপনি বিয়ে এসেছেন কৈলাস থেকে।'

'কিন্তু আর কি তিনি আসবেন?' যেন এ সমস্ত খবর পাকালীই ভালো জানে এমনি ভাবে, পরিপূর্ণ বিশ্বাসে, মাধবী তার মুখের উপর চোখ রাখল: 'আর কি তাঁর দেখা পাব?'

'নিশ্চয়ই পাবেন। সময় হলেই আবার আসবেন তিনি। ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে যাবেন কোথায়?' অগোচর জগতের সমস্ত গোপন খবর যেন তার নখদর্পণে এমনি সহজ সামর্থ্যে পাকালী বললে, 'ডাক্তারবাবুকে বৃথাই আপনি খুঁজতে বলছেন। শত খোঁজাখুঁজি করেও তিনি তাঁর সন্ধান পাবেন না। আর আপনি ঘরে বসেই তাঁকে পেয়ে যাবেন অনায়াসে।'

'ঘরে বসেই পেয়ে যাব?'

'হাঁ, বুকের মধ্যে ব্যাকুলতার আগুন জ্বেলে রাখলেই তিনি পথ চিনে ঠিক আবার চলে আসবেন। আমার মা বলেন, ঐ আগুনটাই তো হবে পথের প্রদীপ হয়ে। যে আসবে তার জন্যে পথে আলো জ্বেলে রাখতে হবে। নইলে কোথাকার পথ কদ্দূর গেছে সে চিনবে কী করে?'

কী সুন্দর বলে মেয়েটা! মুখখানা ভক্তিতে কেমন নম্র বিশ্বাসে কেমন নিটোল করে রাখে! ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে না। ইচ্ছে করে এ বাড়ির খাঁচার মধ্যে পুরে রাখি এই পাখিটাকে। নাম করতে ভালোবাসে, থেকে থেকে নাম শুনি।

মনের ইচ্ছেটা টের পেল নাকি? বন্দী করে রাখার ইচ্ছে? চট করে উঠে পড়ল পাকালী। বললে, 'আমি এবার যাই, নাসিনা। অনেকক্ষণ এসেছি। সুজিতদা তো ভালোই আছেন, ঘুমুচ্ছেন—'

যাই বলেছে, আর তাকে কে আটকায়। নিচে নামবার আগে সুজিতের ঘরের পর্দাটা একটু ফাঁক করল পাকালী। সুজিতদা না জানি এখন কী করছে!

নার্স এগিয়ে এসে বললে, 'ভালো আছে।'

২

একেবারে গাঁজা।

বাপের চেয়েও ছেলে এক কাটি সরেস।

ভালো হয়ে উঠেছে সুজিত। পথ্য পেয়েছে। গায়ে জোর এসেছে। পেয়েছে বিস্তারিত কথা বলার অনুমতি।

হাতে একটা সেলাই নিয়ে বসেছে পাকালী। মেঝের উপর বসেছে। দূরে একটা গদি আঁটা ইজিচেয়ারে সুজিত আধখানা শোয়া।

সন্ধে হতে এখনো কিছু দেরি।

পাকালীদের সংসারে যৌথগেরে কর্তা পাকালীর জেঠা বিভূতি। বাকারি মাইনের কেরানি। আগে-আগে ছোট ভাই পরেশ সঙ্গে ছিল, তার মাইনে এসে নিশত, সংসারের চেহারায় একটা শ্রী ছিল। হঠাৎ কী হল কে জানে, পঁয়ত্রিশ বছরের জোয়ান পরেশ দুদিনের জ্বরে খুড়িয়ে গেল। রেখে গেল স্ত্রী সুরমা আর দুটো নাবালক মেয়ে, পাকালী আর সকালী। পাকালী সাত আর সকালী

তিন। সুরমার বাপের বাড়ি প্রবল নয়, তাই ভাইয়ের সংসারে বিভূতিকেই থাকতে হল আঁকড়ে। দুটো কচি মেয়ে নিয়ে নিঃসহায় বিধবাকে কোথায় ভাসিয়ে দেবে? কিন্তু তিন-তিনটে প্রাণীর ভরণপোষণ করবার মত বিভূতির সঙ্গতি কই। তারও তো স্ত্রী আছে, মনে মুখে যাই হোক, নামে তো মমতা, আর দুটো ছেলে আছে, বরুণ-তরুণ, বারো আর আট। প্রাণান্ত কষ্ট হবে বটে আর মেয়ে দুটোও আপদ নয় শুধুই অপচয়ে—পরে নিলেও সেল ঘরে নিলেও সেল—তবু দুধের ভাত সুখের করেই খেতে হবে একসঙ্গে। মাথার উপরে যদি কেউ থাকেন তিনি দেখবেন। দেখবেন বিভূতি শেষ পর্যন্ত কাছিটা টেনে রেখেছে, ধরে রেখেছে—ছেড়ে দেয়নি।

তবে দু ভাইয়ে যে বাড়িটাতে আগে ছিল ভাড়া করে সে বাড়িটা ছাড়তে হয়েছে। ছেড়ে এ পাড়ায় কম ভাড়ায় এই একতলা বাড়ির আধখানায় উঠে এসেছে সবাইকে নিয়ে। পাশেই নামজাদা ডাক্তার অভিজিৎ মুখুজ্জের জাঁদরেল বাড়ি। তাতে ভড়কাবার কী আছে? দুটো বিপরীত নিয়েই তো সংসার—আলো আর অন্ধকার, জল আর আগুন, বড়লোক আর গরিব। আর, গরিব তো শুধু ধনে নয়, গরিব আবার মনেও। যেন মনের দারিদ্র্য না বিভূতিকে পেয়ে বসে। মনে যদি সে গরিব না হয় তা হলে তার বাড়ির মাথা যাই হোক তার নিজের মাথা অনেক বুকুটধারীর মাথার চেয়েও উঁচু থাকবে। তারপর যে বাড়িতে পাকালীর মত মেয়ে সে বাড়িকে গরিবের বাড়ি বলে কে? সে বাড়িতে অভাবের ধুলোও হীরের কুচি।

দশ বছর হল পরেশ মারা গেছে, বিভূতিরা এসেছে এ পাড়ায়। পাকালী তো তবু ম্যাট্রিকটা পাশ করেছে, বরুণ তাও পারল না। বার তিনেক ফেল করে পড়াশোনায় ইস্তফা দিয়ে একটা কারখানায় ছোটখাটো চাকরি নিয়েছে, তা দিয়ে তার সিনেমা-সিগারেট ফুর্তিফাতিরই খরচ মেটানো কঠিন, সংসারে দেবে কী। তরুণটাকেই কোনোরকমে কলেজে ঢুকিয়েছে আর পাকালী তো ছোট, তাকে রাখতেই হয় স্কুলে। যত প্রশ্ন পাকালীকে নিয়ে। তাকে আর কলেজে পড়ানোর মত ক্ষমতা নেই বিভূতির। তার বিয়ে দিয়ে দিতে পারলেই সবদিকে সচ্ছল। কিন্তু বিয়ে দিলে হলেও তো টাকার দরকার। পরেশের আফিস থেকে যা পাওয়া গিয়েছিল তা কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু টাকা ছাড়াও তো বিয়ে না হয় এমন নয়। হাঁ, কেউ যদি নিয়ে নেন দয়া করে। বলা যায় না, কারু যদি সুনজরে পড়ে যায়। পলকে প্রলয় ঘটে।

পাড়ার সব বাড়িতে ওর স্বচ্ছন্দ যাতায়াত। একটি গান শোনাও মা। একটু নাম করো। যে দেখে সেই খুশি হয়। যে শোনে সেই মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে।

ডাক্তারবাবু আর তাঁর স্ত্রী ওকে কী স্নেহ করেন! ওরও ও-বাড়ির উপর কী স্বভাবের টান!

'একজন সন্ন্যেসী তো এসেছিল, ও তো তুমি মানবে।' পাকালী তার সেলাইয়ের দিকে চোখ রেখে বললে।

'তোমরা সকলে যখন বলছ তখন মানতে কষ্ট নেই।' সুজিত বললে হাসিমুখে।

'কিন্তু আমরা সকলে যখন আরেকটা কথা বলব তখনই মানতে খুব কষ্ট হবে!' পাকালীর স্বরে বুঝি অভিমানের ছোঁয়া লাগল।

'হবেই তো। তখন তোমাদের সে কথাটা প্রত্যক্ষ প্রমাণের থেকে বলা হবে না, অনুমানের থেকে বলা হবে।' সুজিত যুক্তিতে স্বচ্ছ থাকবার চেষ্টা করল: 'মারে মুখে জল ছিটিয়ে একটা গাঁক-গাঁক চিৎকার করে সাধু মৃতদেহে প্রাণ নিয়ে এল, সেটাই গাঁজা—ব্রেক থ্রো।'

'বা, আমরা যে সকলে দেখলাম।'

'ভুল দেখলে। ধোঁয়া দেখলে। আসল বস্তুটা দেখনি।'

'আসল বস্তুটা কী?'

'ওষুধ। ইনজেকশান। বাবা যা বলছেন, তাই,—সেট এফেক্ট।'

'এফেক্টটা আর একটু সেট হলেই—' অসহিষ্ণু হয়েছিল পাকালী, মনে মনে জিভ কাটল।

'আর এক ধোঁয়া।'

মুখ নিচু করে এক মুহূর্ত চুপ থাকল পাকালী। পরে ধীরে বললে, 'সেট এফেক্টটা যে অনুমান নয় তা তুমি কী করে বলো? তুমি তো শরীরের মধ্যে ঢুকে ওষুধের কাজটা দেখতে পাচ্ছ না।'

'আমি পাচ্ছি না, কিন্তু বিজ্ঞান দেখেছে।'

'বিজ্ঞান এও তো দেখেছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওষুধের কোনো কাজই হয় না। তাই এবেলা হয়েছে, তুমি কী করে বলতে পারো?'

'এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো কারণ নেই বলে।'

ম্লান রেখায় হাসল পাকালী, বললে, 'এ যুক্তি নয়, এ গায়ের জোর।'

'নইলে তুমি বলতে চাও তোমার ঐ সাধুর ভেলকিটাই কারণ?'

'আমি আরো সুন্দর করে বলতে চাই।'

'কী?' সুজিতের মনে হল পাকালীর এরকম করে বলাটাই এক সুন্দরের উপহার।

'আমি বলতে চাই,' লাজুক-লাজুক মুখ করল পাকালী: 'ভগবানের কৃপা।'

ঐ একটা নাম যা শুনে, শোনামাত্রই জ্বলে উঠল সুজিত। বললে, 'যার চেহারা জানোনা ঠিকানা জানোনা, মিছিমিছি ঐ এক অজ্ঞাতকুলশীল ভদ্রলোককে আনো কেন? তার আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—'

'বা, নইলে ঠিক সময় বুঝে সাধু আসে কেন?' শৈশবসারল্যভরা চোখ তুলল পাকালী।

'দৈবাৎ সে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে, মজা দেখতে ঢুকে পড়েছে।'

'বাজে কথা। মজা দেখতে সাধুর সখ নেই।'

'মজা দেখতে নয়, খুঁড়ি, মজা দেখাতে।'

'তা হবে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, সে ঠিক ঐ সময় রাস্তায় আসে কেন?'

'বা, কী কথা!' সুজিত ঠাট্টা করে উঠল: 'ঐ ফিরিওয়ালাটা আসে কেন? রিকশাওলাটা আসে কেন? হাবু সাবু মেধো আসে কেন?'

'রাস্তার সাধারণ মানুষের মিছিলের মধ্যে একজন সাধু পড়ে না।' সেলাইয়ে চোখ নিচু করল পাকালী: 'সাধুর আসাটাই অসাধারণ।'

'মোটেই নয়। আজকাল হাটে ঘাটে মাঠে সর্বত্র সাধু। গাঁজার দোকানে বেশি করে—' বলেই সুজিত বুঝল কথাটায় পাকালী দুঃখ পেয়েছে। অমনি আবার মায়া হল সুজিতের। বললে, 'আচ্ছা মানলাম, সাধুর আসাটা অভাবনীয়। কিন্তু, প্রশ্ন হচ্ছে, এই অভাবনীয়টা ঘটল কী করে? দৈবাৎ ছাড়া তুমি আর কী বলবে?'

'না, দৈবাৎ নয়।' চোখ না তুলে গাঢ়স্বরে পাকালী বললে।

'সৈবাৎ নয়? কেউ তাকে খবর পাঠিয়ে ডাকিয়ে এনেছে?'

'হাঁ, তাই। মাসিমা—তোমার মা, ডাকিয়ে এনেছেন।' এখনো চোখ তুলল না পাকালী, বিশ্বাসদরল কণ্ঠে বললে, 'রাত-দিন ঠাকুরের কাছে তোমার ভালো হওয়ার জন্যে প্রার্থনা করছিলেন তো, ডাক্তারবাবুর বাধা নিষেধ বা বিজ্ঞাপেও ক্ষান্ত হননি। এত ভাবে, এত নিষ্ঠা কি ব্যর্থ হতে পারে? মহাদেব শেষ পর্যন্ত চলে এলেন কৈলাস থেকে।'

দুর্বল শরীরে প্রচণ্ড শব্দে হেসে ওঠাটা নিরাপদ নয়, তাই কষ্টে-সৃষ্টে হাসি দমন করল সুজিত। বললে, 'কৈলাস থেকে এই গরমে কেউ নেমে আসে কলকাতায়?'

'ডাকবার মতন লোক থাকলেই নেমে আসে।'

'নেমে যে এল—তার ষাঁড় কই?'

'এমন কী কোনো কথা আছে যে সব সময়েই ষাঁড়ে চড়তে হবে? যে ষাঁড়ে চড়ে সে কি আর পায়ে হাঁটে না?'

'বেশ, আসুক পায়ে হেঁটে। কিন্তু', সুজিত পিঠটা খাড়া করল চেয়ারে, 'কিন্তু ঐ তোমাদের মহাদেবের চেহারা?'

'তুমি তো চোখ বুজে ছিলে, অজ্ঞান হয়েছিলে, তুমি দেখলে কী করে?' জিজ্ঞাসায় চোখ ঘুরালো করল পাকালী।

'না, পরে শুনেছি।'

'সে কী, শোনা কথা? তুমি তো শোনা কথার দাম দাও না, বিশ্বাস করো না। তুমি তো সব স্বচক্ষে দেখতে চাও। তবে এই বেলা—'

একটু বুঝি অসহায় বোধ করল সুজিত। বললে, 'আচ্ছা, তুমিই বলো না, ওটা মহাদেবের চেহারা? মহাদেব কেমন কর্সা হবে, নাদুসনুদুস হবে, কিন্তু তোমার এ সাধু—'

কুবাক্য শুনতে প্রস্তুত নয় পাকালী। গম্ভীর মুখে বললে, ঈশ্বর যখন আসেন তখন মানুষের মূর্তি ধরেই আসেন। সে যেরকম মানুষই হোক না কেন—'

'হোপলেস।' সুজিত চেয়ারে আবার শুয়ে পড়ল।

'এখন তো হোপলেস বলবেই।' উঠে পড়ল পাকালী। 'এখন যে শরীরে বলবাহ্য ফিরে এসেছে। এখন তো আর নিজের অবস্থাটা হোপলেস নয়। আর তখন—'

'তখন কী?' পাকালীর সুন্দর উঠে-দাঁড়ানোর রেশ যেন এখনো মিলিয়ে যায়নি, তার দিকে তাকিয়ে রইল সুজিত।

'তখন সমুদ্রে পড়ে একটা খড়কুটো ধরতেও লজ্জা ছিল না কারুর—'

'একি, তুমি চলে যাচ্ছ?' আবার উঠে বসল সুজিত। 'রাগ হয়ে গেল বুঝি? এই তো বিপদ। যুক্তিকে আমোল দিতে চাও না।'

চলি চলি করেও যেতে পারল না পাকালী। জানলার কাছে সরে দাঁড়াল। বললে, 'অনুভূতির কাছে যুক্তি কী!'

কথাটা হঠাৎ একটা অন্যরকম আবহাওয়া তৈরি করে দিল। যেন অন্তরের কোন গভীরে গিয়ে বাজল কথাটা। অনুভূতির কাছে যুক্তি কী। সত্যি কী যুক্তি আছে যে পাকালীর দিকে দেহ-মন

ছুটে যেতে চায়। কী আছে ওর মধ্যে যা এমন করে টানে! দিবারাত্র টানে। ও কি সুন্দর? কে বলে? কোনখানটায় সুন্দর? ঐ তো গড়ন কাঠি কাঠি হাত-পা, ঐ তো নাক-মুখের ছিরি-ছাঁদ? যৌবনের ভোরবেলায় সব মেয়েরই চোখে কালো বিদ্যুৎ ঝিলিক মারে, তা ও তো চোখ বেশির ভাগ সময়ই ভ্যাবডেবে করে রাখে। তবে, কী, কিসের আকর্ষণ? স্বাস্থ্য? আঁচলের নিচে, সামনে পিছে কোনো উচ্ছলতাই তো স্পষ্ট হয়ে নেই। তবে, গায়ের রঙ? ও হরি! শুধু একটু মিটে মিটে আভা, বিয়ের বিজ্ঞাপনেও কর্সা বলতে বিবেকে বাধবে? চুল? কতদিন খোলা চুলেই চলে এসেছে এবাড়ি, সে এমন একটা কিছু পিঠ ছাপানো চেউ নয়, আর চুলে রূপ খোলে এ রুচি অচল হয়ে গিয়েছে। আর, ঐ তো লেখাপড়া। বাংলা-ইংরেজী পাচি-গেদি—ম্যাট্রিকটা কে না পাশ করে। তার আবার জলুস কী! কথাবার্তা মেয়েটা একটু ভালো বলে বটে, সে বোধহয় রাধা-মার আশ্রমে গিয়ে গিয়ে শেখা—হয়তো বা শুনে শুনে। তা এমনই বা সে কী দামী কথা! শুধু কথায়ই তো চিঁড়ে ভেজবার কথা নয়। তবে কি গান? মনে মনে হাসল সুজিত। পাঞ্চালীর গানের গলা খুব মিষ্টি তাতে সন্দেহ নেই আর গান গাইবার সময় তার মুখটা কী রকম যেন আলো হয়ে যায়—তাও সত্যি। কিন্তু সারাক্ষণই তো সেই আলো ওকে ছুঁয়ে নেই। আর, আলো যাই হোক, গানের কথাবার্তাগুলি কী কদাকার! যে গানের সঙ্গে খোল বাজে খঞ্জনী বাজে সে তো যাচ্ছেতাই ব্যাপার। যে গানে লোকে নাচতে-কুঁদতে চায়, শরীরে কম্প আনে, সে নিশ্চয়ই বিভীষিকা। কীর্তন দু চক্ষে দেখতে পারে না সুজিত। সেই দিক থেকে পাঞ্চালী বিবর্ণ। তবে কোথায়, কোথায় সেই রহস্যের ডাক? কোন অপার্থিব অতলে সেই আগুনের হাতছানি?

অনুভূতির কাছে যুক্তি কী! সত্যিই বুঝি কোনো যুক্তি নেই। কেন পাঞ্চালীকে দেখলেই তাকে সত্তার মধ্যে অনুস্যূত করে নিতে ইচ্ছে করে? ডাক্তারি মতে সব তার জানা, সব তার বুঝা তবু সমস্ত জানার পরেও কোথায় যেন আরো অজানার ইশারা! ধরা পড়েও আবার না ধরা। সত্যি, কোথায় যুক্তি, কেন পাঞ্চালীকে—একটা দুর্বল কৃশকায় মেয়েকে, ভয়ঙ্করের চেয়েও সুন্দর লাগে? কেন সর্বক্ষণ আকাঙ্ক্ষার সাপ ওকে ঘিরে নাচে ফণা তুলে? কেন?

সুজিতের আধুনিক মন যুক্তি ছাড়া শান্তি পায় না। মনে হয় ঐ আবরণটাই পাঞ্চালীকে অশেষ করে রেখেছে। ঐ আবরণটাই রহস্যের মূল। সমস্ত বিস্ময়ের কৌশল। ওটাকে টেনে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে পারলেই বুঝি নিমেষে পাঞ্চালী নিঃস্ব হয়ে যায়, খুইয়ে ফেলে তার অহঙ্কারের আড়ম্বর। তাহলেই বুঝি এ যন্ত্রণার—এ ভালো লাগার, ভালোবাসার যন্ত্রণার শেষ হয়।

কে জানে শেষ হয় কিনা। যদি তার পরেও পাঞ্চালী একটি হাসির, একটি লজ্জার আবরণ টেনে দেয়, একটি কটাক্ষ বা ভঙ্গি দিয়ে রহস্যের পাড় বোনে! কে জানে তখন আবার তাকে শতগুণ ভালো লাগে কিনা।

'তাই বলে এখুনি তুমি যেও না।' ব্যাকুল হয়ে উঠল সুজিত। 'এখুনি সব কথার শেষ হয়নি। কে জানে আরম্ভই হয়নি।'

'না, যাচ্ছিনা। বলো কী বলবে!'

'এইখানে বোসো।' ইজিচেয়ারের হাতলটা দেখিয়ে দিল সুজিত।

কোনোদিন তো এতটা কাছাকাছি হবার ইঙ্গিত করেনি। কী ব্যাপার? অনুস্থতার ঘোর

সম্পূর্ণ কাটেনি বোধহয়। পাকালী নড়ল না, যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। বললে, 'বসতে হবে না। শুনছি।'

'আচ্ছা তুমি তো বলছ, মার প্রার্থনার জোরেই তোমার সাধু এসেছিলেন।' একটু বা সকাতরে তাকাল সুস্মিত: 'সে প্রার্থনার সঙ্গে কি তোমার প্রার্থনাও মিশে ছিল না?'

'তা ছিল হয়তো। খুঁটে না হোক আঁচলে।'

'তবে তোমার প্রার্থনার জোরে সাধু আসেননি তা তুমি কী করে বলতে পারো?' আনন্দে সুস্মিতের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

'আমার প্রার্থনার জোরের চেয়ে তোমার মার প্রার্থনার জোর অনেক বেশি। এ কারু বলবার অপেক্ষা করে না। যিনি মা, তিনিই মা। তিনিই একমাত্র।'

'আর তুমি—তুমি কে?'

'আমি একজন প্রতিবেশী।'

'প্রতিবেশী হয়ে প্রার্থনা করবার কী দায়?'

'আমি যে ভালো প্রতিবেশী।' মিষ্টি করে হাসল পাকালী। 'আমি যে তোমার মঙ্গল চাই।'

'শুধু মঙ্গল?'

'হ্যাঁ, রাধা-মা বলেন, মঙ্গলেই সমস্ত।'

গলায় অভিমানের সুর আনল সুস্মিত। বললে, 'তোমাকে কে বলেছিল মঙ্গল চাইতে?'

'কে আবার বলবে! যা আসবার, নিজের থেকেই চলে আসে। নিজের থেকে যা আসে তাই ভালো, তাই সুন্দর।'

'হ্যাঁ, নিজের থেকে যা আসে।' কণ্ঠস্বর হঠাৎ রুদ্ধ করল সুস্মিত। 'কিন্তু—' কথাটা অন্য খাতে নিয়ে গেল: 'কিন্তু ওরা যে বলে তুমিই সাধুকে ডেকে এনেছ।'

'বলতে পারো আমি এগিয়ে এনেছি।'

'তুমি বুঝেছিলে ও একটা কিছু ম্যাজিক করবে? সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে?'

'কিছুই বুঝিনি। শুধু প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম একটা কিছু অঘটন ঘটুক, তুমি ভালো হয়ে ওঠো। একটা নবীন যুবক, কত তার বড় হবার স্বপ্ন, সে যেন সকালে না চলে যায়। সে যেন—'

'শুধু এইটুকু?'

সে যেন তার স্বপ্নকে সার্থক করবার জন্যে বেঁচে থাকে।'

'তাই বলো, বেঁচে থাকে।' ডান হাত মুঠ করল সুস্মিত। পরে মুঠ খুলে দিয়ে হালকা সুরে বললে, 'আর সাধু এসে ছুঁ দিল, আমি উঠে বসলাম!'

'মোটেই তা নয়। তুমি জানো, তুমি পরে শুনেছ—'

'আর, হ্যাঁ, আকাশ-কাটানো একটা চিৎকার করলেন সাধু। কেন চেঁচালেন বলতে পারো?' সুস্মিতের স্বরে স্পষ্ট পরিহাস।

'তা আমি কী জানি!'

'যমদূতদের তাড়িয়ে দিতে?' সুস্মিত হেসে উঠল: 'ভয় পাইয়ে দিতে?'

'তাই হবে। কিংবা,' পাঞ্চালী সরল বিশ্বাসে, 'যে প্রাণ নিয়ে ওরা পালাচ্ছিল তা ফিরিয়ে দিতে।'

'আর সেই শব্দে নাকি মার পুজোর ঘরের বন্ধ দরজা ফাঁক হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ, খুলে গেল দরজা।'

'তুমি বিশ্বাস করো ?'

'কেন বিশ্বাস করব না ? দেখলাম স্বচক্ষে।'

'তুমি জানো, পুজোর ঘরের খিল আলগা, হাওয়ার একটা ঝাপট লাগলেই খুলে যায়।'

'তোমার বাবা আরো বেশি বলেন—বলেন, 'পুজোর ঘরের খিলটা লাগানোই ছিলনা, আপনা থেকেই খুলে গিয়েছে। কিন্তু মাসিমা অন্য কথা বলেন। বলেন—'

'থাক। মা আর তুমি এক দলে। কিন্তু জিগগেস করি, পুজোর ঘরের দরজা খুলিয়ে তোমার সাধুর লাভ ?'

'হয়তো মাসিমাকে খবর দেওয়া, তুমি যাকে চাইছিলে সে এসেছে, তোমার প্রার্থনা মিটেছে। তোমার খোকা ভালো হয়েছে।'

'খোকা ?'

'মাসিমা তো তোমাকে খোকাই বলে।'

'তোমার মুখে কথাটা শুনতে কী রকম যেন অদ্ভুত লাগছিল।'

একটা মুহূর্তমাত্র। একটুখানি লজ্জার জ্যোৎস্না ফুটেছিল বুঝি পাঞ্চালীর মুখে, কিন্তু পরক্ষণেই গাম্ভীর্যের মেঘ এসে তা ঢেকে দিল।

'মা বুঝি আসতে একটু দেরি করলেন,' সুজিতই তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাল : 'আর এসেই দেখলেন সাধু হাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

'ঠিক তাই,' পাঞ্চালী আবার স্বর ধূসর করল : 'কখনো-কখনো দরজা খোলা থাকলেও আমাদের বেরিয়ে পড়তে দেরি হয়ে যায়। তারপর বসে অনুতাপ করি। এখন মাসিমা যেমন করছেন।'

'উঃ, আমার যদি তখন জ্ঞান থাকত !' একটা অসহ্য যন্ত্রণার মত করে সুজিত বললে।

'পরে জ্ঞান তো হল।'

'না, পরে নয়, যখন সাধু এসেছিল তখন।'

'তখন জ্ঞান থাকলে কী করতে ?' চোখের উপর চোখ রাখল পাঞ্চালী।

'চেঁচিয়ে উঠতাম। বলতাম, হট যাও, ভাগো, তোমার ওসব জল-পড়া ধুলো-পড়ায় আমি ভাল হতে চাইনা।'

'কেন, তাহলে বুঝি ঠিক সন্ন্যাস দেখায় না ?' ভ্রূ দুটি একটু বুঝি কুঞ্চিত হল পাঞ্চালীর।

'দেখায়ই না তো। ভদ্রলোকের মতই দেখায় না।' হাসতে চেয়েও সুজিত হাসতে পারল না। বললে, 'আমি আধুনিক যুগের মানুষ বৈজ্ঞানিক উপায়েই বাঁচতে-মরতে চাই।'

'তারই জন্যে বুঝি উলটোটা জেনেও বলে বেড়াতে চাইছ ওষুধেই ভালো হয়েছ।' পাঞ্চালীর ভ্রূরেখা ঘনতর হল। 'তা নইলে বুঝি স্বস্তি পাচ্ছ না।'

'ওষুধেই তো ভালো হয়েছি। নইলে কি তোমার ঐ হুঁকোটা নোংরা জলে, না, একটা অসাধু চিৎকারে?'

মুখে অপূর্ব শান্তি নিয়ে পাঞ্চালী বললে, 'যে ভাবেই হোক ভালো হওয়া নিয়ে কথা।'

এ যেন কত বড় ছার, অপমান, এমনি আর্তভাবে করুণ সুজিত। বললে, 'বাবা কেন যে সাধুকে ঘরে ঢুকতে দিলেন, নোংরা জল খাওয়াতে দিলেন, কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিনা। তক্ষুণি তো ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আশ্চর্য, ঘর-নর কাঁপার ঘরে লোকটা অমন একটা দুর্ধর্ষ চিৎকার করল আর বাবা তাকে কিছু বললেন না, পুলিশে দিলেন না—'

'তবেই বোঝ, মানুষ তার সমস্ত পরাক্রম সত্ত্বেও, কখনো-কখনো কী রকম অসহায়!' যেন জয়ের হাসি হাসছে পাঞ্চালী। 'যখন বিনাবাধায় পথের একটা সন্ন্যাসীও ঘরে ঢুকতে পারে, মুখে জল দিতে পারে, অবৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানা করে তুলতে পারে—'

সুজিত অনুভব করল পাঞ্চালী যেন কোন দূর জগতের বাসিন্দে। একটা পুরোনো পাহাড়ের অন্ধকার গুহায় বন্দী। যেন কোনোদিন সুজিত পৌঁছুতে পারবে না সে গুহায়, পাঞ্চালীকে উদ্ধার করে আনতে পারবে না। কখন উঠে বসেছিল, আবার শুয়ে পড়ল। বললে, 'আমার মরে যাওয়াই উচিত ছিল।'

এবার শব্দ করে হেসে উঠল পাঞ্চালী। শব্দ করে হেসে উঠলে বুঝি পাঞ্চালীকে আরো বেশি সুন্দর দেখায়।

পাঞ্চালী বললে, 'তোমার হাতেই তো বিশ্বের ভার নেই। তোমার কথায়ই তো সূর্য-চন্দ্র ওঠে না। মানুষ মরে না বাঁচে না।'

'তবে কার কথায় মরে-বাঁচে?' রীতিমত রাগ করে উঠল সুজিত: 'তবে তোমার ঐ সাধুর কথায়?'

'সাধু তো দূত, তার কথায় হবে কেন? সব চলছে-থামছে সব রাজার কথায়।'

'কে রাজা?' সুজিত আবার উঠে বসল: 'তোমার ভগবান?'

'তাছাড়া আবার কে?'

'এক যে ছিল রাজা সে খায় গাঁজা। বলি তাকে তুমি দেখেছ?'

'ওরে বাবা:, তাকে দেখব আমার সেই চোখ কোথায়?'

'তাহলে তুমি কী করে বলছ যে সেই সূর্য-চন্দ্র করেছে?'

'তাহলে তোমার মতে কে করেছে?'

'সমস্ত আপনা-আপনি হয়েছে।'

'আপনা-আপনিই বা হল কেন? কার ইচ্ছায়?'

'ইচ্ছা লাগবে কেন? শুধু-শুধুই হয়ে উঠেছে। নিজের থেকে, একেবারে অকারণে।'

'কোন জিনিসটা নিজের থেকে হয়ে ওঠে শুনি?'

'তার মানে এ হয় না ভগবান নামে একলা এক কারিগর সব তৈরি করেছেন।'

'কিছুই হয় না।'

'তবে এ নিয়ে মাথা ঘামাই কেন?'

'কে বলছে মাথা ঘামাতে? তবে সাধুর ডাকে দরজা খুলে দেলে মাথায় বোধহয় ভাবনা ঢোকে।'

'মোটেই নয়। অলৌকিক বলে কিছু নেই। সবই ইনমেকশানের সেট এফেক্ট।'

পাঞ্চালী গম্ভীর হল। বললে, 'সত্যিই অলৌকিক বলে কিছু নেই। লৌকিক জগতে কোথাও নিশ্চয়ই একটা ব্যাখ্যা আছে, সম্প্রতি সেটা জানতে পাচ্ছিনা বলেই অলৌকিক।'

'তুমি এত সব শিখলে কোত্থেকে?'

'জানি না।' মধুর করে হাসল পাঞ্চালী: 'হয়তো এটাও অলৌকিক।'

এটাও নয়—এটাই অলৌকিক। যৌবনের প্রথম প্রলেপে শরীর মসৃণ হয়ে উঠেছে, পুরুষের নবীন যৌবন তার প্রতি আকৃষ্ট হবে এটা তো বইয়েই লেখা আছে, এটা তো রক্তের কথা মাংসের কথা—কিন্তু যে মেয়েটার রূপ নেই অথচ অনুরূপ—এটা অলৌকিক ছাড়া কী। সে অলৌকিকত্ব কোথায়? চলায় বলায় হাসিতে চাউনিতে—কোথায়? কাছে, দূরে, অতলে, গভীরে—কোথায় এই রহস্যের উদ্ঘাটন?

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুজিত। জানলার দিকেই এগুলো দু পা।

তাড়াতাড়ি টেবলের দিকে সরে গেল পাঞ্চালী। বললে, 'তুমি সেই যে আমাকে একটা বই পড়তে দেবে বলেছিলে সেটা কোথায়?' বলেই টেবলের উপর রাখা একটা বই সে মেলে ধরল। 'ওরে বাবা, ও সব যে ভীষণ জ্ঞানের বই।'

'ডাক্তারি বই। শরীরতত্ত্ব।'

'থাক। এ দিয়ে আমার কী হবে?' তারপর পুরোনো কথার পালটা দিল: 'এ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই কেন?'

'তুমি না ঘামাতে পারো কিন্তু আমাকে ঘামাতে হচ্ছে। আমাকে পরীক্ষা পাশ করতে হবে।'

'করো, খুব ভালো করে করো। আমাকে যে উপন্যাসটা দেবে বলেছিলে সেই উপন্যাসটা দাও।' এদিক-ওদিক একটু ঘাঁটতেই বাঞ্ছিত বইটা বেরিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে বললে, 'যেমন তোমার ভগবান ছাড়া চলে তেমনি বহু লোকেরও শরীরতত্ত্ব ছাড়া দিব্যি চলে যায়। শরীর ভোগ করতে শরীরতত্ত্ব লাগে না।'

'তেমনি জীবন ভোগ করতে ভগবানকে লাগে না।' সুজিত জানলার শিক ধরল: 'যারা ভগবান মানেন। তারাও জীবন কম ভোগ করে না।'

'কিন্তু ভগবান মানলে জীবনটাকে হয়তো আর একটু বেশি ভোগ করতে পারত। যেমন যে শরীরতত্ত্ব জানে সে বোধহয় শরীরটাকে একটু বেশি ভোগ করতে পারে। যে সঙ্গীততত্ত্ব জানে সে বোধহয় গানকে। তাই নয়?'

'কিন্তু শরীরতত্ত্ব জানলে পৃথিবীর উপকার হয়? আর তোমার ভগবানকে নিলে?' সুজিত ঝাঁজিয়ে উঠল: 'ভগবানকে নিয়েই পৃথিবীর যত অশান্তি। যত মারামারি, রক্তারক্তি।'

'ভগবানকে নিয়ে নয়, গোরার গোবিন্দ মানুষদের নিয়ে।'

'ভগবানই মানুষদের গোরার গোবিন্দ করে।'

'মোটেও না। মানুষদের শাস্ত্র সংহত সুন্দর করে।'

'ছাই করে। করা উচিত, কিন্তু করে না।'

'তেমনি আমিও বলতে পারি তোমার শরীরতত্ত্ব মানুষকে সত্যিকার ভালোবাসা না করে শুধু করে।'

হো-হো করে হেসে উঠল সুজিত। বললে, 'কিন্তু শরীরতত্ত্ব যে মানুষের চিকিৎসা করে রোগ সারায়—'

'কত সারায় তা তো দেখলাম!'

'ওহো, ঠিকই তো, তোমার শরীরতত্ত্বে কী দরকার! তোমার তো একফোঁটা চরণামৃত খেলেই সুরাহা।' আবার বিদ্রূপের ধার ফোটাল সুজিত: 'ঐ কালের না প্রসাদ খেয়ে কলেরা হয়েছিল, তখন ডাক্তারি করেই কিন্তু তাদের ভালো করা হল—'

'তারা প্রসাদ খায়নি তারা বাসি খিচুড়ি খেয়েছে—'

'তার মানে?'

'তার মানে তাদের প্রসাদে বিশ্বাস ছিল না।' পাকাশী দরজার দিকে এগুলো: 'আজ তাহলে আসি।'

হাত বাড়িয়ে তার শাড়ির আঁচলটা ধরতে চাইল সুজিত, পারল না। ডেকে উঠল, 'দাঁড়াও, শোনো, একটা গান শুনিয়ে যাও।'

পাকাশী ফিরল। বললে, 'তুমি তো বিজ্ঞানের লোক, ফুটন্ত ডাক্তার, তুমি গান নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?'

'এ গান শোনা, মাথা ঘামানো নয়।'

'আমি যদি তোমাকে ভগবানের কথা শোনাই,' চোখের পালকে-পালকে হাসল পাকাশী: 'তুমি তখুনি বিরক্ত হবে, বলবে, ভগবান থাকুন-না-থাকুন, তাকে নিয়ে মাথা ঘামানো কেন?'

'গান—গান হচ্ছে সহজ আনন্দের জিনিস, আর, তোমার—কী জানি ঐ নামটা—'

'ভগবান আরো সহজ।'

সুজিত জানে এগুতে গেলেই আবার পালাবে পাকাশী। তাই যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই স্থির হয়ে রইল। বললে, 'হোক গে। তবু তোমার গানই ভালো।'

'মোটেও না। আমার গান বিশ্রী। তুমি মোটেই পছন্দ কর না।'

'কে বললে?'

'বা, আমি যে কীর্তন গাই। নয়তো ভজভজন, নয়তো শ্যামাসঙ্গীত। তোমার দু'কানের বিষ।'

'হোক গে। আমি তো গানের কথা বা সুর শুনিনা, আমি গান দেখি।'

'গান দেখ?' পাকাশী চোখ বড় করল: 'এ কী অলৌকিক কথা!'

'গান দেখি মানে গানের মধ্য দিয়ে তোমাকে দেখি।'

'তার মানে?'

'তার মানে যখন তুমি গান গাও তখন তোমাকে ভারি সুন্দর দেখায়। ভারি সুন্দর!'

'আর যখন গান গাই না?' স্থির গাঢ় চোখে তাকাল পাকাশী।'

'তখন আরো সুন্দর।'

অলক্ষ্যে আবার এগিয়ে পড়েছে সুজিত, আবার ত্রস্ত পায়ে দূরে সরেছে পাকাশী। ঘর ছেড়ে একেবারে বারান্দায় চলে এসেছে দুজনে।

সুজিত ডাকল : 'শোনো।'

অস্ফুট মুখেই এগিয়ে এল পাকাশী।

মৃদুস্বরে সুজিত বললে, 'তুমি আমার কেউ নও, তবু তুমি আমাকে 'তুমি' করে বলো কেন?'

'ওমা, সেকী? কতদিন ধরে বলছি। প্রথম যে দিন আলাপ হয়েছিল তুমিই তো বলেছিলে তুমি করে বলতে।'

'না, আর বলবে না।'

'তবে কী বলব? আপনি বলব?'

'হ্যাঁ, আপনি বলবে।'

'পারব না।'

'কেন পারবে না? তুমি কি আত্মীয়?'

'না।'

'তবে?'

'আমি তোমাকে আপনার বলে মনে করি। আমি তোমাকে—' বলতে-বলতে থামল পাকাশী। না, বলবে, বলতে বাধা কী, কথাটা তো ভালো, কথাটা তো সত্যি। তাই কথাটা সম্পূর্ণ করবার জন্যে বললে, 'আমি তোমাকে ভালোবাসি।'

সুজিত আর তবে কী চায়! তার ঘরে ফিরে গিয়ে বের ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়ুক।

আর, কথাটার মধ্যে এমন কিছু লজ্জার গৌরব নেই যে চপলা কিশোরীর মত পাকাশীকে ত্রস্ত পায়ে ছুটে পালাতে হবে। ধীরে মন্থরেই সে বারান্দা দিয়ে হেঁটে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

ঘরে পরে যাওয়া যাবে। সুজিত ভাবল। এখন ওর যাওয়াটুকু দেখি।

আহা, কী না জানি সেই পলাবলীর গানটা—মাঝে মাঝে পাকাশী যার দু-এক টুকরো গেয়ে ওঠে। আহা, কী না জানি কথাটা!

কথা দিয়ে কী হবে! মানুষটাকে দেখ।

৩

ডাক্তাররা বললে, দিন কতক যাওয়া বদল করে আসা ভালো। অভিজিৎই জায়গা ঠিক করে দিলেন, পুরী—। স্ত্রীকে বললেন, মন্দ কী, তুমিও যাও। না, না, হোটেল-টোটেল নয়, আলাদা বাড়ি-ভাড়া করিয়ে দিচ্ছি। লোকজন, বাসন-কোসন, সব নিয়ে যাবে এখান থেকে।

'দিন কয়েকের জন্যে তুমিও চলো না।' দুর্বল স্বরে মাধবী বললে।

'যদি পুরী থেকে কোনো রুগী কল দেয় তাহলেই যেতে পারি।' হাসলেন অভিজিৎ: 'সেবার যেমন শিলং ঘুরে এলুম। তাও থাকা নাকি? যাওয়া আর আসা।'

'দেখনা অন্তত দিন সাতেকের জন্যে—'

'আমার সময় থাকলেও রুগীদের সময় নেই। তারা ছাড়বে না, তাদেরও বা আমি বিপদের মুখে ফেলে রেখে পালাই কী করে?'

'তাই বলে তোমার শরীর ভেঙে যাবে—'

'শুধু ভাঙলে হবে না, শরীরকে পাত করে দেতে হবে, তবে ছুটি। ডাক্তারের কপালে তিনটে জিনিস নেই। বিশ্রাম নেই, রাত-বিরেতে ফোন। এদিকে আবার বিবেকদংশন আছে, কোনকে বিকল করে রেখে শুতে যেতে পারোনা। আর, দুই নম্বর, চেঞ্জ বা হাওয়া বদল নেই। যত ডাক্তার আছে কলকাতার বাইরেই পা ফেলেনি। আর, তিন নম্বর, সেইটেই মারাত্মক. ডাক্তারের মৃত্যুকালে ডাক্তার নেই।'

'তবু সব জেনে শুনে ছেলেকে তো সেই ডাক্তারই করছ।' অস্বস্তি নিয়ে মাধবী বললে।

'কিন্তু ডাক্তারিতে একটা মহৎ রোমাঞ্চ আছে। রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া। ধরো না এই খোকার বেলা—দু'তিনটে মাত্র নিশ্বাস বাকি—এখন সেই শেষ ইনজেকশানটা কল দিল, আস্তে-আস্তে মৃত্যুর ছায়া যা পড়ছিল তা মিলিয়ে গেল। ভাবো দেখি ডাক্তারের কত বড় জয়, কত বড় রোমাঞ্চ। সে আনন্দ কি কি দিয়ে কেনা যায়? না কি তা গেল ভবনে মেলে?'

এ কথাটা অভিজিৎ সুযোগ পেলে বলবেই। তিনি যে হেরে গেছেন, তাঁর বিজ্ঞান যে হেরে গেছে, এ লজ্জা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারছেন না। তাই বারে বারে প্রচণ্ড কণ্ঠে অস্বীকার করে লজ্জাকে চাপা দিচ্ছেন।

স্বামীর দুঃখটা কোথায় তা মাধবী জানে, তাই সে আর প্রতিবাদ করল না, কথাটাকে অন্য পথে নিয়ে গেল। বললে, 'আমার বাবা তো উকিল ছিলেন, তাঁর কাছে শুনেছি মামলায় জিতলেও এমনি আনন্দ—

'কার সঙ্গে কার তুলনা!' অভিজিৎ হাঁ করে হাসলেন, শব্দ করল না। 'মামলার প্রতিপক্ষ হচ্ছে মানুষ আর চিকিৎসার প্রতিপক্ষ হচ্ছে মৃত্যু—দুর্ধর্ষ যম। আর তোমার মামলার প্রাপ্তি কী? টাকা, না হয় সম্পত্তি। কিন্তু চিকিৎসায়? চিকিৎসায় প্রাপ্তি হচ্ছে প্রাণ। প্রাণের মত দামী আর কী আছে? যাক, দিন সাতেকের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

আড়ালে মাধবীকে টেনে নিয়ে গেল সুস্মিত। বললে, 'মাসিমাদের বলো না, ওঁরাও চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'তা বলে দেখতে পারি। কিন্তু ওদের যা অবস্থা—'

মা একটা অত্যন্ত বাজে ব্যাপারের দিকে ইঙ্গিত করছেন—মানে ওরা দুঃস্থ, ওরা কি খরচ কুলিয়ে উঠতে পারবে?

'তা যাই হোক,' সুস্মিত ছটফট করে উঠল: 'ওটা তুমি চালিয়ে নেবে। একটা গোটা বাড়ি ভাড়া নিলে কত বাড়তি লোকই দেখো জুটে যাবে শেষ পর্যন্ত। ওদের নিয়ে গেলে ক্ষতি কী।'

'দেখি যদি ওরা রাজি হয়।'

সুরমা এক বাক্যে রাজি হল। আসল উদ্দেশ্য যে পাঞ্চালীকে সঙ্গে নেওয়া এটা তার বুঝতে দেরি হলনা। এখুনি তো আর বিয়ে হতে পারে না তাই বাইরের সৌষ্ঠব রাখবার জন্যে সুরমার

যাওয়া দরকার। যা দিনকাল, এটুকু সৌজন্যও অনেকে মানেনা, বন্ধু-বন্ধুনীরা এমনিতেই ঘর পাকিয়ে যজ্ঞ-তত্ত্ব ছুটোছুটি করে। কিন্তু এসব পরিবারে তো ওসব হবার নয়, তাই দু পক্ষেরই মায়ের খবরদারির প্রয়োজন।

'তা তুমি কিছু ভেবোনা।' মাধবী ফিসফিসিয়ে বললে, 'খরচ আমিই চালিয়ে দেব।'

'তা না দিলে আমাদের সাধ্য কী।' সুরমা গা ঠেলে দিয়ে বললে, 'তোমরা পাকিকে কী ভালোবাসো তা কি আমি জানিনা?'

'বিভূতিবাবু রাজি হবেন তো?' মাধবীর চোখে বুঝি সন্দেহের কুয়াশা।

'তা তাঁর যখন কিছু খরচ হচ্ছে না, তাঁর অরাজী হবার কিছুই নেই। তা ছাড়া তোমাদের আশ্রয়ে যাচ্ছি এ তো তিনি ভাগ্যি বলে মানবেন।'

কথাটা বাড়ির মধ্যে চাউর হয়ে গেল।

নিভৃতে সুরমাকে ডাকল বিভূতি। বললে, 'পাকীর উপরে ডাক্তারবাবুর বড় ছেলেটার চোখ পড়েছে, তাই না?'

'ডাক্তারের ঐ তো একমাত্র ছেলে।' সুরমা বললে নম্র মুখে।

'ছেলের মাও বোধহয় সুনজরে দেখেছে মেয়েটাকে।'

'ভগবানের দয়ায় সকলেই পাকীকে ভালোবাসে।'

'সকলে ভালোবাসলে কী এগোলো?' বিভূতি বিরক্তির সঙ্গে একটু বুঝি ব্যঙ্গ মেশাল: 'বরং সুস্মিত আর তার মা যদি ভালোবাসে তাহলেই মেয়েটার একটা হিল্লে হয়।'

'ওকি আর তেমন ভাগ্য করে এসেছে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুরমা।

'তাই তো বলছি, দেখ যদি মেয়েটাকে পারো গছিয়ে দিতে?' বিভূতিও দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'যা দিনকাল, সম্বন্ধ করে বিয়ের আশা-টাশা কিছু দেখিনা। লেখাপড়া হলনা যে চাকরি-বাকরি করবে। চেহারাটা এখনো একটু ছিমছাম আছে, হলে হয়ে যেতে পারে।'

'সব ঠাকুরের কৃপা।' সুরমা ঘোঁয়াটে গলায় বললে।

বিভূতি খেপে গেল। 'কৃপা বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো চলবে না। চেষ্টা করতে তো হবে।'

তা তো হবেই। নীরবে সায় দিল সুরমা।

পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করল বিভূতি। হঠাৎ উত্তেজনা বেশি দেখিয়ে ফেলেছে, কেননা তার দ্বারা চেষ্টা যে অসাধ্য তা তো জানা কথা। তাই সে গলা নামিয়ে কথাটা সংশোধন করল। 'মানে যথাসাধ্য চেষ্টা। যতটুকু ক্ষমতার মধ্যে।' বলে একটু কটাক্ষ করতেও ছাড়ল না।

মানে, সুবিধে বুঝে আগুনের সামনে ঘিকে ভিড়িয়ে দাও।

'কই?' কাকে খুঁজছে নাম বলতে হয় না, এ বাড়িতে একজনই খোঁজবার আছে, বোধহয় শুধু এ বাড়িতে নয়, এ পৃথিবীতেই একজন—এমনি ব্যস্ততা নিয়ে ঢুকে পড়ল সুস্মিত: 'কই?'

সকালী কাছে ছিল, রান্নাঘরের দিকে ইশারা করল।

বারান্দার পাশ দিয়ে রান্নাঘর, এদিকে জুতো পায়ে আসা গেলেও ওদিকে যাওয়া চলবে না। কী কুসংস্কার, তবু না মেনে উপায় নেই। তা, এ বাড়ির লোকেরা তো টেবলে খায় না,

রান্না করেও জিনিস বাঁচিয়ে রাখে, স্বাস্থ্যের নিয়মই জুতো খুলে রাখা উচিত। মনে মনে একটা সমর্থন খুঁজে পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলে খালি পা হল সুস্মিত। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আবার হাঁকল: 'তোমাকে এত খুঁজছি, কোথায় তুমি?'

'এই তো এলাম।' ভিজে হাত আঁচলেই মুছল পাঞ্চালী। হাসিমুখে বললে, 'খুব কাছেই। কিন্তু কী ব্যাপার?'

'ব্যাপার আর কী।' উৎসাহটা মন্দীভূত করে ফেলল সুস্মিত: 'কতদিন আমাদের বাড়ী যাওনা।'

'শুধু এই? এই কথাই বলতে এসেছ?'

'কতদিন তোমাকে দেখিনা।'

'তাই তো নিজেই দেখা দিতে চলেছ।' পাঞ্চালী দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বললে, 'শুধু ভক্তই তো ভগবানের জন্যে ব্যাকুল নয়, ভগবানও ভক্তের জন্যে ব্যাকুল। ভক্তকে দেখতে চেয়ে নিজেই দেখা দিয়ে বসেন।'

সব কথাতেই ভগবান। প্রাণ অতিষ্ঠ করে ছাড়ল। কিছু তর্ক তুলতে গেলেই গুজ্জের মুখস্থ কথার বক্তৃতা দিতে বসবে। বিরক্ত মুখে সুস্মিত বললে, 'সেদিন যে উপন্যাসটা পড়তে নিয়েছিলে সেটা ফেরৎ চাই।'

চোখে কৌতুক স্থির পাঞ্চালী জিগগেস করলে, 'ওটা ফেরৎ নিতেই এসেছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, লাইব্রেরীর বই, ফেরৎ দিতে হবে।'

'কিন্তু ওটা যে আমার এক পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি।' অপরাধীর মত মুখ করল পাঞ্চালী।

'এতদিনেও পড়া হয়নি?' সুস্মিত প্রায় আকাশ থেকে পড়ল।

'একদম ভুলে গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে? লোকে ও-বই হাতে পেয়ে আহারনিদ্রা ভুলে যায়, আর তুমি বইকে বইই ভুলে গেলে? এমন একটা যুগান্তকারী বই—'

'দাঁড়াও, বইটা দিয়ে দিই। যখন এক পৃষ্ঠাও পড়া হয়নি, তখন ফেরৎ দিতে অসুবিধে হবে না।' সুস্মিত পাশ কেটে এই আশায় দরজার কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল পাঞ্চালী।

সুস্মিত পাশ দিল না। আরো একটু ঘন হয়ে এল পাঞ্চালীর কাছে। বললে, 'থামো। বইটা থাক। তার জন্যে আসা নয়। শোনো, তোমার জেঠু মত দিয়েছেন। আমরা পুরী যাচ্ছি।'

'শ্রীক্ষেত্র?' পাঞ্চালী সারা শরীরে আনন্দের ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

'সে আবার কী!' সুস্মিত ধাক্কা খেল।

'ঐ যে বললে—'

'না, পুরী তো বললাম—'

'তারই আরেক নাম, আসল নাম শ্রীক্ষেত্র। নীলাচল।'

'না, টাইমটেবলে নাম লেখা, পুরী।' সুস্মিত কাঠখোট্টার মত বললে, 'যেদিন রিজার্ভেশান পাব সেদিনই বেরিয়ে পড়ব।'

'কে কে যাচ্ছে?'

'না, মাসিমা, আমি আর ফুনি। বাড়ি-ভাড়া হয়ে গিয়েছে। ঠাকুর-চাকর আগেই চলে যাবে।'

'সত্যি?' আনন্দের রংমশাল হয়ে উঠল পাকালী: 'সত্যি বলছ? জগন্নাথ দর্শন করব? দেখব বিমলা দেবীকে?'

'কাকে?'

'বিমলা দেবীই তো শ্রীক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।'

'কেন, আর কিছু দর্শনীয় নেই?'

'আমি তো আগে কোনোদিন যাইনি, আশ্রমে গিয়ে-গিয়ে যা শুনেছি—'

'আর ঐ যে কী একটা বাড়ি আছে, যেখানে শুটি তৈরি হয়—' ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল সুজিত।

'ও, হ্যাঁ, শুটির বাড়ি। জগন্নাথের মাসির বাড়ি।' চোখ উজ্জ্বল করল পাকালী: 'ওটাও দেখতে হবে।'

'আর?'

'টোটা গোপীনাথ। চক্রতীর্থ। আর—আর, কী যেন সেই বকুল গাছটার নাম—যার নিচে বসে হরিদাস সাধন করত। হরিদাস কে জানো তো?'

'জানি।' মুখভাব নিষ্পাপ করল সুজিত: 'কালিদাসের ভাই।'

'নোটেও না। ঠাকুর হরিদাস। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, সিদ্ধবকুল। গল্পটা জানো তো?' প্রশ্নের দ্যুতিতে চোখ নাচাল পাকালী।

সুজিতের ইচ্ছে হল, বলে, জানি। তাহলে বিরক্তিটা বুঝি স্পষ্ট হয়, কিন্তু তাহলে আবার শুনতে শুনতে দেখা হয় না পাকালীকে: যখন অনেকক্ষণ ধরে একটানা কথা বলে তখন ওর মুখটা যেন কী রকম—একেবারে অন্যরকম সুন্দর হয়ে যায়। যেন উপর থেকে না কোথা থেকে কে জানে একটা আভা নামে। অনুভবের প্রলেপে সমস্ত মুখ-চোখ কেমন কোমল হয়ে ওঠে। তখন নিজে যে কিছু জানেনা মানেনা তাও সৌভাগ্য মনে হয়।

'কী করে জানব!' সোৎসাহে মুখ করল সুজিত: 'আমি কি তোমার মত আশ্রমে গিয়ে-গিয়ে পাঠ শুনি?'

'দু-একবার গেলেই তো পারো।'

'আমি যাব? ওর চেয়ে বোধহয় সূর্য পশ্চিম দিকে উঠবে এ ভাবা সহজ।'

'আর যাই হোক, গল্পগুলো তো শুনতে পারো। গল্পগুলো তো ভালো।' যেন প্রলুব্ধ করছে এমনি ভাবে তাকাল পাকালী। 'বেশ মনে করে রাখবার মত গল্প। অন্যকে বলবার মত।'

'শেষকালে গল্প শুনতে-শুনতে আমার নেশা হয়ে যাক।'

'তাই তো চিরকাল হয়েছে। মরা বলতে বলতে রাম হয়ে গেছে।'

'আর রামে কাজ নেই,' অস্থির হয়ে উঠল সুজিত: 'তোমার সেই বেলের গল্পটা আগে গাও।'

ঝাঁটকাঁট সুন্দর দাঁতে পরিচ্ছন্ন হেসে উঠল পাকালী। বললে, 'কী বুদ্ধি তোমার। বেল নয়, বকুল।'

'ডাক্তারি বুদ্ধি।' মুখ গম্ভীর করল সুস্মিত : 'সেন্ড বেল কোনো কোনো রুগীর পক্ষে উপকারী। কিন্তু সেন্ড বকুলে কোনো কাজ হয় শুনিনি।'

'সেন্ড নয়, সিন্ড।' আবার দাঁতের জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পাকালী হাসল। 'তুমি ভীষণ ভুল করো।'

ভুল না করলে তুমি হাসবে কেন? আমার ভুলের মধ্য দিয়ে তোমাকে নটলে দেখব কী করে নতুন করে?' এবার মনে মনে হাসল সুস্মিত। বললে, 'বেশ সিন্ড বকুল। হ্যাঁ, এখন যদি এক নিশ্বাসে সারো।'

'হ্যাঁ, ছোট্ট গল্প। কিন্তু ওরকম ছটফটে মুখ করলে চলবে না, মুখে বেশ শান্তি আনো, বিশ্বাস আনো।'

'যে শুনবে তারও অমনি দায় আছে নাকি?'

'তারই তো বেশি দায়। তারই তো মনোযোগী হবার কথা।'

'নাও, ধ্যানে বসছি। আর তুমি কী চাও?' সুস্মিত হঠাৎ মাটিতে বসল আসনপিঁড়ি হয়ে। চোখ বুজল।

অমনি আরেক পশলা হাসির বৃষ্টি ঝরে পড়ল পাকালীর শরীর বেয়ে। শুধু শ্রবণ হাসিটা, দেখব না? অমনি আবার চোখ মেলল সুস্মিত।

'অত বিজ্ঞ ভাবো নয়।' পাকালী বললে, 'অমনি ভাবে দুচারবার বলতে-বলতে না ভঙ্গিটা সহজ হয়ে যাব।

'রক্ষে করো।' লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সুস্মিত। বললে, 'মোটেই শ্রোতার দায়িত্ব নয়, বক্তার দায়িত্ব। বক্তারই এমনভাবে বলা দরকার যাতে শ্রোতার মধ্যে তন্ময়তা আসে। সে যদি বিরক্তেও থাকে তাকে যাতে দলে টেনে আনতে পারে। নাও বলে ফেল।'

'হরিদাস ঠাকুর রোদে-বৃষ্টিতে খোলা জায়গায় বসে সাধন-ভজন করতেন।' বলতে লাগল পাকালী : 'একদিন দাতন করতে করতে মহাপ্রভু ভক্তকে দেখতে আসেন, এসে দেখেন, রোদ্দুরে ভক্তের কী কষ্ট! দাতনখানি পুঁতে দিলেন—এই থেকে গাছ হবে আর সেই গাছ ভক্তকে ছায়া দেবে।'

'ওরে বাবা, সে তো লং-টার্ম ট্র্যাজেডির—তদ্দিনে হরিদাস তো পটল তুলবে।'

'আজ্ঞে না, মহাপ্রভুর ইচ্ছায় দেখতে-দেখতে দাতন থেকে প্রকাণ্ড গাছ হয়ে গেল।'

'মহাপ্রভুরই ইচ্ছায় যখন,' সুস্মিতের কথায় প্রচ্ছন্ন লঘুতার সুর : 'তখন দাতন পোঁতবার দরকার কী ছিল? একেবারে শূন্য থেকেই গাছ তৈরি করে দিলে হত!'

'মহাপ্রভুর ইচ্ছা তুমি-আমি বুঝব কী!' মুখভার করল পাকালী।

এই ভার-ভার রাগ-রাগ মুখখানিও অপরূপ। তাকে যেমন হাসিয়ে সুখ তেমনি রাগিয়ে। রাগের মেঘ সরিয়ে আবার যখন হাসির চাঁদ ওঠে তখন বুঝি আরো অপরূপ। অল্প-অল্প রাগ যেন বর্ষার দিনে হঠাৎ-ওঠা অল্প-অল্প রোদ।

'উনি বুঝি নিজের ডালে দাতন না করে বকুলের ডালে দাতন করতেন? নাকি নিজের ডাল পুঁতলেন, হয়ে দাঁড়াল বকুল গাছ?'

'দেখ অমনভাবে কথা বললে আমি কিন্তু ভীষণ চটে যাব।'

সে না জানি কত সুখের, তেবে পেলেনা সুজিত। কিন্তু এখন, এ মুহূর্তে, অল্পেতেই খুশি থাকা ভালো। তাই বললে, 'থাক, তোমাকে ভীষণাকার ধরতে হবে না। তুমি তোমার গল্পটা শেষ করো।'

আবার স্বাভাবিক স্নিগ্ধতায় হাসল পাকাশী। বললে, 'প্রকাণ্ড গুঁড়ি হল বকুল গাছের আর অনেক অনেক ডালপালা পাতা, ছায়াও চমৎকার। সেই গাছের নিচে ছায়ায় বসে সাধন ভজন করতে লাগলেন হরিদাস। এদিকে জগন্নাথের রথ বেরোবে, চাকা তৈরি করতে হবে, কাঠ দরকার—'

'কেন, কাঠ কেন?' সুজিত অবাক হবার ভাব করল: 'ফ্যাক্টরি থেকে রবারের টায়ার করে নিলেই হয়?'

'বাজে কথা বোলো না,' পাকাশী ধমক দিয়ে উঠল: 'রথের জন্যে কাঠের চাকা চাই। রাজার লোকেদের এই বকুল গাছের দিকে নজর পড়ল। প্রকাণ্ড গুঁড়ি, খুব ভালো চাকা হবে। ঠাকুর হরিদাস গাছটাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন, কিছুতেই কাটতে দেবেন না। রাজার লোকেরা বললে, এ রাজার আদেশ, এ আদেশ মানতেই হবে। তখন হরিদাস বললেন, বেশ, আমাকে এক রাত্রি সময় দাও, তোমরা কাল সকালে কেটো। আমি এক রাত্রি, শেষ রাত্রি গাছের সেবা করি, মহাপ্রভুকে আমার মনের দুঃখ জানাই। রাজার লোকেরা রাজি হল। পরদিন সকালে এসেই গাছ কাটবে স্থির করল। এদিকে—'

বাধা দিল সুজিত। বললে, 'তুমি তোমার গল্পটাকে ঐ গাছের মতই বড় করছ।'

'মোটেই না। গাছের মত মোটেই বড় করছি না।' চোখে শাসনের ভ্রুকুটি হানল পাকাশী: 'গাছের মতই সংক্ষিপ্ত করে বাকিটুকু শোনো।'

'একটা অলৌকিক কিছু ঘটল তো?'

'মোটেই না। বৈজ্ঞানিক ব্যাপারই ঘটল।' মর্মে বুঝি ছোট্ট একটি চিমটি কাটল পাকাশী: 'এদিকে সমস্ত রাত অনাহারে অনিদ্রায় থেকে ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর কাছে তাঁর মনের দুঃখ জানিয়ে কাঁদতে লাগলেন, তোমার নিজের হাতে পোতা বকুলগাছকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না। রাজার লোক এসে কাল সকালে গাছ কেটে নিয়ে যাবে। কাল সকালে উঠে সকলে দেখল, গাছের গুঁড়ি নেই, উড়ে গেছে।'

'তার মানে, ঝড়ে পড়ে গেছে গাছ?'

'আজ্ঞে না, ঝড় কোথায়? ঝড়-টড় হয়নি। ঝড়ে পড়তে হলে তো গোটা গাছটাই পড়ে যেত। গাছ বেঁচে আছে অথচ গাছের গুঁড়ি অদৃশ্য!'

'এ আরেক গাঁজা।' উড়িয়ে দিল সুজিত।

'বেশ তো, যখন যাবে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে নিজেই দেখে এস।'

'তোমার কথাটাই যে অবৈজ্ঞানিক।'

'আমি ঠিক বলতে পারছি না হয়তো। মানে গাছের একদিকের চোকলটা মাটির মধ্যে যেমন-কে-তেমন সেঁধিয়ে আছে, ভেতরের গুঁড়িটা নেই। মানে একটা বাকলের উপর সমস্ত গাছটা দাঁড়িয়ে আছে। কার সাধ্যি হরিদাসের মাথার ছায়া কেড়ে নেয়? গাছের গুঁড়ি দিয়ে রথের চাকা করে? গাছটা বৈজ্ঞানিকের বিস্ময়। দেখে এস।'

'যা কিছু আজগুবি সমস্ত দেখব।' প্রগণ্ড বুক মেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল সুজিত 'কিন্তু যা কিছু স্বাভাবিক, সবচেয়ে স্বাভাবিক, তা দেখবে না?

সে যে কী হতে পারে, কোন দিকে সুজিতের ইঙ্গিত, বুঝতে পারল না পাকালী।

'কী আশ্চর্য, পুরীতে সমুদ্র নেই? সমুদ্র দেখবে না?'

'বা, সমুদ্র দেখব বৈকি।' চেউয়ের মত উথলে উঠল পাকালী: 'যমুনা ভুল করে মহাপ্রভু সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলেন—'

'আমরাও সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে পড়ব।' সুজিত বলল চিকণস্বরে, 'কিন্তু সমুদ্রকে নদী ভেবে নয়, সমুদ্রকে সমুদ্র ভেবে।'

'শুনেছি মহাপ্রভু অনেকদূর ভেসে গিয়েছিলেন, কোনারক নামে একটা মন্দির আছে সেই দিকে চলে গিয়েছিলেন—কতগুলো জেলে তাঁকে উদ্ধার করেছিল—'

'আমাদের সঙ্গেও জেলে থাকবে।' সুজিত হাসল: 'মানে মুলিয়া থাকবে।'

'দরকার নেই।' মুখ ফিরাল পাকালী।

'তার মানে, সমুদ্রে স্নান করবে না?'

'বা, তাই বললাম বুঝি? প্রীক্ষেত্রে যাব আর সমুদ্রস্নান না করে ফিরে আসব?'

'অনেকে করেনা কিনা। বালতি করে সমুদ্রের জল তুলে এনে ঘরে করে স্নান করে।'

খিল খিল করে হাসতে লাগল পাকালী।

'জীবনকে ভোগ করা সম্পর্কে অনেকেরই ঐরকম দৃষ্টিভঙ্গি।' সুজিত বলল দৃঢ়স্বরে, 'সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে না পড়ে বাথরুমে বসে মগে করে মাথায় জল ঢালা।'

'আমার দিকে অমন তাকাচ্ছ কী কটকট করে?' আপত্তি করল পাকালী: 'মগে, ঐ একটুখানি জলে আমার তৃপ্তি নেই।'

'হাঁ, অবগাহন স্নান চাই।' বুকটা ভরে উঠল সুজিতের। একটু কাছে সরে এল, গোপনে যেমন কথা বলে তেমনি করে বললে, 'তোমার জন্যে একটা সুইমিং কস্টিউম কিনব।'

'বা, তার কী দরকার।' পাকালীর গালে লজ্জার ছায়া পড়ল।

'কস্টিউম পরা থাকলে শরীর বেশ আঁটসাঁট থাকে, ফিগারটাকে বেশ নীট দেখায়—'

'ওসব আমি পরতে পারব না।' রাগ নয় মিনতি করে বললে পাকালী।

'ও তো তোমার শাড়ির নিচে থাকবে, ও তো পরা থাকাই নিরাপদ—সমুদ্রের ঢেউ শাড়ি বা শালীনতা কিছুরই গ্রাহ্য করে না।'

আয়ত সরল চোখ তুলে পাকালী বললে, 'তাই বুঝি?'

'ভালোবাসার ঢেউও সমুদ্রেরই ঢেউ।' গাঢ় চোখে তাকাল সুজিত। 'কী বলো, তাই না?'

হঠাৎ চুপ করে গেল পাকালী। যেন মুছে গেল। রস-রঙ ঘুরে গেল সমস্ত।

দেখেও দেখলনা সুজিত। বললে, 'যাবার দিন তাহলে ঠিক করি। যদি তোমার আর কিছু কেনাকাটা করবার থাকে তো বোলো—বুঝলে?' সুজিত ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

'দাঁড়াও, আমে দার মত নি।' দরজার একটা পাল্লা টেনে নিজেকে আধখানা আড়াল করল পাকালী।

'যা, মাসিমা, তোমার মা তো সঙ্গেই যাচ্ছেন, তাঁর আবার মত কী।' সুজিত হেসে উঠল।

পাকাশীও হাসল। 'এই মা নয়, অন্য মা।'

'অন্য মা?' ধাক্কা খেল সুজিত: 'অন্য মা আবার কে?'

'আমার রাধা-মা। আমার রাধা-মার নাম শোননি?' পাকাশীর মুখটা আরো আলো হয়ে উঠল: 'আমার লক্ষ্মী মা।'

'তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন যখন শুনবেন পুরী যাচ্ছ।'

'হ্যাঁ, শ্রীক্ষেত্র।' ছোট্ট করে সংশোধন করল পাকাশী।

'হ্যাঁ, শ্রীক্ষেত্র।' খুশি হয়েই সুজিত পুনরাবৃত্তি করল। পাকাশী যাতে খুশি হয় সেটুকু করতে-বলতে আপত্তি কী!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সুজিত, পিছন থেকে ডাকল সুরমা। একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললে, 'একটা হার্মোনিয়াম নিয়ে যাবে না? পাকীর বেটা আছে সেটা তো একেবারে ভাঙা—'

'সত্যিই তো। ঠিক বলেছেন।' সুজিত উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 'একটা হার্মোনিয়াম চাই বই কি। মা কত পাকাশীর গান শুনতে ভালোবাসেন। মাকে বলে পাকাশীর নতুন একটা হার্মোনিয়াম কিনে দি। নিশ্চয়ই মা কিনে দেবেন পাকাশীকে।'

বুকে একটা আনন্দের ঢেউ নিয়ে চলে গেল সুজিত। আর সুরমা মুখের এমন ভাব করল যেন জয় তারই।

আশ্চর্য, গানের কথাটাই এতক্ষণ মনে হয়নি। সুজিত যেন প্রাণ হারিয়ে প্রাণ পেল। গান হারিয়ে গান পেল। শুধু কি পারে বসে সমুদ্রেরই গান শুনবে? পারে বসে পাকাশীর গান শুনবে না? আবার দেখবে না সেই অপার্থিব মুখটা? না, শুধু পদাবলী গাইবে কেন? আধুনিক গাইবে। মানুষের সুখ-দুঃখ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, কামনা-বাসনা নিয়ে যে গান সেই গান। সেই গান কি মন্দ? মাটি কি মন্দ?

এই গানই হয়তো কত আশ্চর্য সুষিমে তৈরি করে দেবে। এনে দেবে রঙিন অন্ধকার।

মমতা গিয়ে পড়ল বিভূতির দরবারে। রসনাকে মুখর করে তুলল। 'যদি, এ সব কী হচ্ছে? মেয়েটাকে হার্মোনিয়াম কিনে দেবে?'

'দিলেই বা।' গোড়াতেই এক কথায় বিভূতি নস্যাৎ করে দিতে চাইল। 'ডাক্তারবাবুর স্ত্রী পাকীর গান শুনতে খুব ভালোবাসেন, তিনি যদি ওকে একটা হার্মোনিয়াম কিনে দেন তো ভালোই।'

তিনি দিচ্ছেন? বুঝতে আর বাকি নেই কে দিচ্ছে। কিসের মাশুল? দেখলে না এতক্ষণ ছেলেটার সঙ্গে মেয়েটার কী হাসাহাসি চলাচলি হচ্ছিল? তারপর এখন চলবে আবার গানের হৈ-হল্লা? শুধু নদীর পারে নয়, একেবারে সমুদ্রের পুলিনে। সমুদ্র যখন, তখন উদ্দাম হাওয়ায় সব উড়িয়ে নিয়ে যাবে। গলাগলির থেকে একেবারে খোলাখুলি। তুমি চোখ বুজে থাকবে?'

'তুমিও থাকো না।' উদাসীনের মত বললে বিভূতি।

'কেন, আমি কেন থাকতে যাব?'

'তোমার চোখের মধ্যে কু।'

'আর তোমার মাথার মধ্যে গোবর। নইলে তুমি এই মোটা জিনিসটা বোঝনা?' বোঝাবার নির্মম চেষ্টায় মমতা দুহাত নেড়ে বললে, 'তারপর যখন একটা কেলেঙ্কারি হবে?'

'হবে।' বিভূতির তখনো নির্লিপ্ত ভাব।

'হবে?' মমতা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ার ভাব করল।

'হ্যাঁ, বিয়ে হবে।'

'ছাই হবে। ছেলেটা ডাক্তারি পাইনে আছে, মেয়েটা ডাক্তারি মতেই হবে।'

'আমরা তা হতে দেব কেন? আমরা আটকাব। আমরা সজাগ থাকব।' বিভূতি চোখের কোণে চালাকির ঝিলিক হানল: 'আমরা জালের মাছকে পালিয়ে যেতে দেব না।'

'এমন রীত-নীত দেখিনি কোনোখানে।' পরাস্তের মত সরে গেল মমতা।

তাকে উদ্দেশ করে বিভূতি বললে, 'এমনি স্বাভাবিক ভাবেই ছেলেটার মনে রঙ ধরাতে পারে মেয়েটা। এমনি স্বাভাবিক কারণেই ছেলেটা মেয়েটাকে বিয়ে করবার বাসনা করতে পারে। অতদূর না-ও যেতে হতে পারে। তবে আজকালকার বাজার, যদি চাও, কূটকৌশল করে কিস্তিমাত করে নিতে হবে!' তারপর বিরক্তি-ঝরানো গলায় বললে, 'বলি নিজে একটা সম্বন্ধ জোগাড় করে আনো না, রীত-নীত সব পালটে দিই।'

ওদিকে ডাক্তার অভিজিতেরও ইচ্ছে নয় সুজিত আর পাঞ্চালী একসঙ্গে পুরী যায়। ওদের এ সময়টায় পুরী যাবার কী হয়েছিল! স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে যাচ্ছে, এ সময় আবার মেয়ে কেন?

'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই।' মাধবী আপত্তি করে উঠল: গঙ্গাজলের মত পবিত্র একটা মেয়ে—

'মেয়েটা যে ভালো তা কে অস্বীকার করছে?' ডাক্তার মুখে চিন্তার রেখা ফেললেন: 'কিন্তু গঙ্গাজলও ঘুলিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে।'

'কক্ষনো না। আমি আছি, পাঞ্চালীর মা আছে।'

'আহা, সব কীর্তিমান শ্রীমান-শ্রীমতীদেরই মা থাকে।' অভিজিৎ টিটকিরি দিয়ে উঠলেন: 'সেটা কিছু একটা সিকিউরিটি নয়। আচ্ছা, আমি অতদূর কিছু একটা না ভাবলাম, কিন্তু ওরা যদি আলাদাই যাচ্ছে তবে তোমাদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে চাইছে কেন?'

'বা, ওরা থাকতে চাইবে কেন? আমিই তো ওদের থাকতে বলছি।'

তবে এর পরে আর কথা কী!

না, আছে কথা। ডাক্তার মুখের রেখাগুলোকে জটিল করে তুললেন: 'কত সময় তুমি আর পাঞ্চালীর মা বাড়ির বাইরে রইলে, সুজিত আর পাঞ্চালী একা থেকে গেল।' স্ত্রীর ক্রুর দৃষ্টির সামনে কিছুটা সংকুচিত হলেও বক্তব্যটা ছাড়লেন না অভিজিৎ: 'দিনে-রাতে এমনি অনেক সময়েই একা। অতদূর কিছু একটা আমি নাই ভাবলাম, যদিও ডাক্তার হিসেবে ভাববই বা না কেন? দুর্ঘটনা তো ঘটে, ঘটঘটে শুকনো মাটিতেও তো মানুষ পা পিছলে পড়ে যায়। আচ্ছা, ছেড়ে দিলাম—তোমার ছেলে খুব সৎ আর মেয়ে খুব নিষ্পাপ। শারীরিক দুর্ঘটনা না ঘটে না-ঘটুক, কিন্তু মানসিক? যদি মেয়েটা সুজিতের মনে রঙ ধরিয়ে দেয়? যদি সুজিত ঐ মেয়েটাকেই বিয়ে করবার বায়না ধরে?'

'বায়না ধরে তো ভালোই।' মাধবী মুখে তৃপ্তির আভা আনল, বললে, 'পাঞ্চালীকে ঘরের বউ করে আনব।'

'কাকে বউ করে আনবে?' অভিজিৎ কেটে পড়লেন: 'ঐ একটা বাজে মেয়েকে?'

'এই যে বলছিলে ভালো মেয়ে, নিষ্পাপ মেয়ে—'

'শত ভালো হোক, সুন্দর হোক, তবু এ বাড়িতে আমার একমাত্র ছেলের বউ হয়ে আসবার সে উপযুক্ত নয়।' এবার বিদ্রূপের বিষ ঢাললেন অভিজিৎ: 'এখানে আর গঙ্গাজলে হবে না, এখানে সাবস্ট্যানশিয়াল জিনিস চাই—দুধ মধু চাই। ও মেয়েটার আছে কী?'

'ভক্তি আছে। ও যদি এই বাড়ি আসে তা হলে ও এই অন্ধকূপটাকে মন্দির করে তুলবে।' মাধবীর চোখে-মুখে স্নেহ উথলে উঠল।

'কার বাড়ি কে মন্দির করে।' আর মন্দিরে যত বিগ্রহেরাই থাকতে পারে। কোনো ভদ্রলোক থাকতে পারে না। তাই বাড়িতে মন্দির করা পোষাবেনা। যাক্ গে, অভিজিৎ অন্যদিকে চোখ রাখলেন: 'কিন্তু মেয়েটার জাতটাও কি বাধা হবে না?'

'কোথায় হচ্ছে আর আজকাল?' মাধবী বললে, 'ছেলে আর মেয়ে বাপ-মাকে না জানিয়ে জাত-গোত্রকে কলা দেখিয়ে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করে আসছে, কে কী করতে পারছে? সুজিত যদি ভিন্ন জাতের মেয়েকে বিয়ে করতে চায়, তুমি সেটা ঠেকাতে পারো? ঘোর তো তবু ভালো, আমাদের লিস্টিতে এর চেয়েও তো নিচু জাত আছে—যদি তাদের কোনো মেয়েকে ও পছন্দ করে—'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন অভিজিৎ, প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সে কী? তুমি জাত মানো না?'

'ভক্তের আবার জাত কী!' নম্র কণ্ঠে বললে মাধবী।

অভিজিৎ বুঝলেন, কী ভাবে মহামারী আসতে চাইছে এ সংসারে। আসতে চাইছে ভক্তি হয়ে। আর এই ভক্তির উপর যদি সুজিতের অনুরাগ পড়ে তাহলেই সংসার ছারখার। ডাক্তারি রসাতলে। তখন গলায় স্টেথিস্কোপ না ঝুলিয়ে খোল কোলাতে হবে।

নিজেই ছেলের ঘরে। বললেন, 'পুরীতে যাবার কী দরকার! ওয়ালটেয়ারে যাও।'

'ওয়ালটেয়ার!' ধাক্কা খেল সুজিত।

'তোমার সমুদ্রে যাবার কথা। ওয়ালটেয়ারেও চমৎকার সমুদ্র।'

'না না, পুরী যাব।'

'পুরীতে স্পেশালিটি কী আছে?'

'পুরীতে তীর্থ আছে, মন্দির আছে—'

এই মরেছে! তীর্থ আছে! মন্দির আছে! এরই মধ্যে ছেলেটার ঘোর লাগল নাকি? অভিজিৎ কণ্ঠে ব্যঙ্গ আনলেন: 'তীর্থে-মন্দিরে তোমার কী ইনটারেস্ট! তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি বড় জোর সমুদ্রের হাওয়া বা সমুদ্র-স্নানের 'একিকেসি' নিয়ে কথা কইবে—ওসব অবান্তর ব্যাপার, মন্দির আর তীর্থ নিয়ে তুমি মাথা ঘামাবে কেন?'

'না, না, তা নয়, মন্দিরে একটা শিল্পের দিক আছে—'

'সে আলাদা কথা। কিন্তু তুমি আর্কিটেকচারের ছাত্র নও। ও সব গবেষণায় গিয়ে তোমার কাজ নেই। আমি বলি কী, ওয়ালটেয়ার পছন্দ না হয়, গোপালপুর-অন-সী যাও—'

'না, না, আমি পুরী যাব।' সুজিত জেদ ধরল।

রুষ্ট হলেও রাগ প্রকাশ করলেন না অভিজিৎ। বললেন, 'কিন্তু যে বাড়িটা ভাড়া নেব

ভেবেছিলাম সেটা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। যদি পুরীই তোমার একমাত্র 'চয়েস' হয়, তাহলে তুমি হোটেলে গিয়ে ওঠ। সেক্ষেত্রে তোমাকে একাই যেতে হয়। তোমার মা নিশ্চয়ই আর হোটেলে উঠতে রাজি হবেন না—'

'না, না, হোটেলে অনেকেই রাজি হবে না।' সুজিত উত্তেজিত হয়ে বললে, 'ও-বাড়ি না হয়, আরেক বাড়ি জোগাড় করে নেব। এখন এটা সিজন নয়, পাওয়া যাবে। আর তবে আমি মা-ই তো যাচ্ছি না, ও বাড়ির মাসিমা যাচ্ছেন পাকালী যাচ্ছে—'

'ওরা যাচ্ছে কেন?' অলক্ষ্যে একতন্ত্র বিস্ময় এসে গেল বুনটের মধ্যে: 'এদেরও কি অসুখ নাকি?'

'না, না, ওরা বোধহয় তীর্থ করতে যাচ্ছে। তার আমি কী জানি! মা ওদের নিয়ে যাচ্ছেন।' সুজিত অন্যভাবে বলতে চাইল। 'মা বলছেন, এরা অসুখের সময় এত করল ওদের কিছু প্রত্যুপকার করা মন্দ হবে না। আর তো বিশ্বাস, সাধুবাবাকে পাকালীই ডেকে এনেছিল—'

'ও! যে সাধুবাবা তোমাকে ভালো করল?' অভিজিতের মুখে-চোখে প্রকট ঘৃণা।

'না, না, সাধু-টাধু আমাকে ভালো করবে কী! আমি ওসব বিশ্বাস করি না। ওটা মা'র বিশ্বাস—' কী রকম যেন অসহায় বোধ করল সুজিত।

'বেশ তো তুমিও তাহলে পুরীতে তীর্থ করে এস।' ছেলে আর মা যেখানে একদিকে সেখানে অভিজিৎ প্রত্যক্ষে আর কী করে লড়বেন? শুধু বিদ্রূপের আকারে তাঁর অসন্তোষ জানিয়ে নিরস্ত্রের মত চলে গেলেন। স্ত্রীকে তবু রোখা যায় কিন্তু ছেলেকে ঠেকাবেন কী করে? যদি জোর করে হারিয়ে দিতে চাও নিজেই হেরে যাবে অলক্ষ্যে।

কিন্তু বিপদ এল অন্যদিক দিয়ে।

নতুন হার্মোনিয়াম কিনে সুজিত চাকর দিয়ে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে পাকালীকে। পরে নিজেই এসেছে কবে যাবার দিন ঠিক করা যায় তার পরামর্শ করতে। এরা আবার পাঞ্জি-পুঁথি দেখবে কিনা তার ঠিক কী। যদি তাই দেখে, মনে-মনে যতই গালাগাল দিক, নীরবে মেনে নিতে হবে সুজিতকে। দুর্লভের সান্নিধ্যের জন্যে অনেক অসম্ভবকেও সহ্য করে যেতে হয়।

বেদনায় চোখ নত করে পাকালী বললে, 'যাওয়া হবে না।'

'হবে না? কেন?'

'মা বারণ করলেন।'

'মা? কে মা?'

'তোমাকে তো বলেছি। আমার রাধা-মা।' দুঃখে দুটি চোখ বিহ্বল হয়ে উঠেছে পাকালীর: 'মাকে যাবার কথা বলতেই মা বললেন, না, তোমার স্ত্রীকেত্রে যাবার সময় এখনো পরিপক্ক হয়নি, তুমি যাবে না।'

'তোমার এই মা-টিও নেশা-টেশা করেন নাকি?' সুজিত প্রায় খেঁকিয়ে উঠল।

'করেন।' এক মুহূর্ত থামল পাকালী। পরে আস্তে বললে, 'হরিনামের নেশা করেন।'

'একই কথা, গাঁজা না খেয়ে আফিং খান। কিন্তু সময় এখনো কেন পাকেনি তা বললেন?'

'না, তা কিছু বলেননি। কিন্তু যেটুকু বলেছেন তাই যথেষ্ট।' পাকালীর কণ্ঠস্বরে একটু ধৃষ্টতা ফুটল : 'মার কথার অমান্য করতে পারব না।'

'খুব পারবে।' সুস্মিত ঝরিয়ার মত হয়ে উঠল। পারলে পাকালীর একটা হাত ধরে টেনে এক্ষুণি ওকে বাইরে নিয়ে যায়। একটা উদ্ভট আস্ফালন করে উঠতেও হয়। কিন্তু ধরবার জন্যে হাত বাড়াবে কী, যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল অনড় হয়ে। তীব্র কণ্ঠে বললে, 'ঐ মা তোমার কে? তোমার পাজিয়ান? ওঁর কী এক্তিয়ার আছে তোমাকে বারণ করবার? আর তোমারই বা কী দায় ওঁর কথা একেবারে বেদবাক্য বলে মানতে হবে?'

সুস্মিতের পক্ষে বিভূতি এসে দাঁড়াল। সত্যি মায়ের এই নিষেধের কোনো মানে হয় না। আর কোথাও নয়, পুরীধামে যেতে চাইছে, তাতে বাধা দেওয়া অশাস্ত্রীয়। শুনেছি যৌবনেই তীর্থ-টীর্থ সেরে রাখা উচিত, পরে বুড়ো বয়সে যখন শক্তি কমে আসবে তখন সুযোগ এলেও সুবিধে থাকবে না। এই তো পরিপক্ক সময়, শুভলগ্ন, এমন সংযোগ কটা আসে জীবনে।

পাকালীর যাওয়া হবে না মানে সুরমারও হবে না। তাই সুরমাও কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েছে। তার মুখ দিয়ে তাই বেরিয়ে এল : 'এ মায়ের বাড়াবাড়ি।'

'এ তো আর কোনো থিয়েটার-পার্টির সঙ্গে এখানে-ওখানে নাচতে-গাইতে যাচ্ছে না, এ যাচ্ছে তীর্থ করতে—' বিভূতি আবার যেই ধরল : 'এতে বাধা দেওয়া অন্যায়।'

'এ অত্যাচার।' সুস্মিত ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললে, 'একে কিছুতেই বরদাস্ত করা উচিত হবে না।'

'তুমি একবার যাও না আশ্রমে।' বিভূতি সুরমাকে লক্ষ্য করল : 'মাকে গিয়ে বলো না, যাবার সব তৈরি, তুমিও সঙ্গে যাচ্ছ—'

'মা সব জানেন।' সুরমা বললে, 'সব জেনে শুনেই না 'না' করে দিয়েছেন। যখন 'মা' করেছেন তখন 'না'-ই করেছেন।'

'কিন্তু সেই 'না'-কে শুনতে হবে কেন?' গলা আরো চড়া করল সুস্মিত : 'উনি কে? ওঁর কথায় কি ট্রেন-স্টীমার চলে? উনি কি লাটসাহেব না ডিক্টেটর?'

ভয়ে-ভয়ে অথচ স্পষ্ট করেই সুরমা বললে, 'মায়ের কাছে পাকালী নাম পেয়েছে। দীক্ষা নিয়েছে।'

'কী নিয়েছে?' মুখ বেঁকাল সুস্মিত।

'মন্ত্র নিয়েছে।'

'মন্ত্র?' চোখে যত পারে বিরূপতা নিয়ে সুস্মিত পাকালীর দিকে তাকাল। পাকালী দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরের দরজার কাছে। সুস্মিতের মনে হল, মন্ত্র যেন এক কদর্য রোগ, গোপনে রক্তে সংক্রামিত হয়ে পাকালীর সমস্ত দেহ কতচিহ্নে বীভৎস করে তুলেছে—চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে দুর্গন্ধ। তাকানো যায় না, কাছে যাওয়া যায় না, হাত বাড়িয়ে ছোঁবার ইচ্ছাতেও ঘৃণা করে।

'মন্ত্র দেওয়া মানেই তো শিষ্যের ভার নেওয়া।' বিভূতি বললে সুরমাকে উদ্দেশ করে, 'কিন্তু বলি মা ওর বিয়ের ভারটাও নেবেন তো? পাত্র ঠিক জোগাড় করে দেবেন তো মনের মত?'

'কাল পরিপক্ক হলেই দেবেন।' ঘরের ভিতর থেকে মমতা টিপ্পনী কাটল।

বিয়ের কথা হতেই পাকালী ঘরের মধ্যে অদৃশ্য হল। তা দেখে সুস্মিতের আরো রাগ হল,

কেন মায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অন্তত একটা নীরব কাকুতি চোখে মুখে পাকালী পাঠালনা তার দিকে? অত্যাচারের কাছে অনেককেই অসহায় অবস্থায় বশীভূত হতে হয়। কিন্তু তবু সে একটা প্রতিবাদ করে, উঁচুতে আওয়াজ তুলতে না পারলেও নীরব ভাবভঙ্গিতেও অসন্তোষ জানায়, বলবানের কাছে আশ্রয় খোঁজে। কিন্তু এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দূরের কথা, পাকালীর যেন কোনো অভিমানও নেই। আশাভঙ্গের জন্যে নেই একটুও কাতরতা। বঞ্চিতের চোখে যে সহানুভূতির প্রার্থনা থাকে তাও অনুপস্থিত। না 'না' করে দিয়েছেন সেইটেই যেন কত বড় তৃপ্তির কথা, যেন এতে কিছুই মনঃক্ষুণ্ণ হবার নেই।

নিদারুণ জ্বালায় পুড়তে লাগল সুজিত। মুখে হাত নেড়ে বললে, 'এ সব আশ্রম-টাশ্রম পুড়িয়ে দেওয়া উচিত। দাঁড়াও, আমি দেখছি—' বলেই দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল।

অসতোচেই পাকালী তার পিছু নিল। ডাকল: 'শোনো।'

মন্ত্রস্পর্শে পাকালীর সর্বাঙ্গ অশুচি হয়ে গিয়েছে, সুজিতের মনের মধ্যে তখনও সেই পরিহাসের ভাব, তবু ডাক শুনে না ফেরে পারল না। কী না জানি মধুঢালা ওর কণ্ঠস্বরে। আর যখন সুজিত পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল পাকালী কাছাকাছি এসে পড়েছে তখন কেন কে বলবে মনে হলনা ওর দেহ অশুচি, ওর রক্তে গুপ্ত ব্যাধির সঞ্চার। মনে হলনা কোনো দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অন্ধ সংস্কারের মন্ত্র নেওয়া সত্ত্বেও ঐ দেহ যেন এক অমৃতের ঝরনা।

হাসি মুখে পাকালী বললে, 'যাওয়া যখন হল না তখন হার্মোনিয়ামটা তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

আবার একটা ধাক্কা খেল সুজিত। রুক্ষ স্বরে বললে, 'যা আমি একবার দিই তা আর ফিরিয়ে নিই না। বলে এবার আরো জোরে পা ফেলে, ডাকুক না-ডাকুক, পিছনে না তাকিয়ে, চোখের বাইরে চলে গেল সুজিত।

ফিরে বাড়ির উঠোনে পা দিতেই মমতা ঝামটে উঠল: 'এত বেহায়াপনা কিসের? বলছে নিয়ে, যাবে না, তবু পায়ে পড়ে এত সাধাসাধি কেন? ও যাচ্ছে শরীর সারাতে, তাতে তোর সঙ্গে যাবার কী।

পাকালী তো খ।

বললে, 'সে কী! আমি বলছিলাম ওর দেওয়া হার্মোনিয়মটা ফেরত নিয়ে যেতে।'

'কেন, ফেরত দেবার কী হয়েছে!' বিভূতি এসে মাঝখানে পড়ল। 'যাওয়া না-যাওয়ার সঙ্গে হার্মোনিয়ামের সম্পর্ক কী।' তারপর মমতার দিকে তাকিয়ে শাসনের ভ্রুকুটি করল: 'কোনো কিছু জানো না শোনো না, যা মুখে আসে তাই বলে বসো।'

'সব জানি সব বুঝি।' মমতা বিজ্ঞের মত মুখ করল: 'কিন্তু হার্মোনিয়াম যে ওই দিয়েছে তাতো শুনিনি।'

বিভূতি ঘরে গেল, মমতাকে নিয়ে এল অন্তরালে। বললে, 'তারই জন্যেই তো হার্মোনিয়ামটা ফেরত দেওয়া চলবে না। ফেরত দিতে গেলেই তো ঝগড়া, ছাড়াছাড়ি। রেখে দিলেই তো আসা-যাওয়া চলবে, ভাব থাকবে, আশা থাকবে—'

'মেয়ে তখন জলসায় বসবেন! সাধে কি রাধা-মা বারণ করে দিয়েছেন।' মমতার কুটিল চোখ চকচক করে উঠল: 'মা আমার অন্তর্যামী।'

'তোমার তো কত বিশ্বাস! তোমার শুধু হিংসে!' বিভূতি না বলে থাকতে পারল না।

আর যায় কোথা! মমতা যত পারল বিষ ঢালতে লাগল। গায়ের চামড়া মোটা করে রইল বিভূতি, বিষ লাগতে দিল না। বেশ তো, বাপ-মরা মেয়েটাকে পাত্রস্থ করে দাও, ধর্মপথ ছুটে যাবে। লিখবে-পড়বেও না, বিয়েও হবে না, ধর্মপথেও যাবে না, মেয়েটা তবে করবে কী—

'হার্মোনিয়ামটা আশ্রমে দিয়ে দেব, মা।' পাকালী বললে সুরমাকে।

'না, আশ্রমকে দিতে হবে না।' সুরমা ধমকে উঠল।

'আমার মনে হয়—'

কথার মাঝ পথে আটকে দিল সুরমা। 'এ কি তোর কেনা যে তুই আশ্রমকে দান করবি?'

'সুজিতদা তো আমাকেই দিয়ে গেল।'

'তোর নিজের গান করার জন্যে দিয়ে গেল। অন্যকে দিয়ে দেবার জন্যে নয়।'

'তবে মাকে দিয়ে জিগগেস করে আসতে হয় ও হার্মোনিয়ামে আমার গান গাওয়া চলবে কিনা—'

'এ আবার জিগগেস করবি কী!' ধমকে উঠল সুরমা: 'তোর সবতাতেই বেশি বেশি। পুরী যাবি সে কথা ঠাট করে বলতে গেলি কেন?'

'সে কী?' অবাক মানল পাকালী: 'মাকে বলব না?'

'কেন, ঘুরে এসে বললেই হত! আগে বলে লাভ হল কী?' মনস্তাপটা কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না সুরমা: 'কেমন একটা সুবর্ণ সুযোগ ভেস্তে গেল। বোকা মেয়ে কোথাকার! এখন আবার হার্মোনিয়ামটা খোয়াবার মতলব। ও-ঘরে আবার আশ্রমে দিতে যাবার দরকার কী! যেই বলতে যাবি, অমনি মা মিষ্টি গলায় বলবেন, পাচু হার্মোনিয়ামটা নিয়ে এসে আমাকে গান শোনাও। তুই হার্মোনিয়াম নিয়ে গিয়ে গান শোনাবি, মা বলবেন, পাচু, বাজনাটা এখানে থাক, তুমি মাঝে মাঝে এসে ওটা বাজিয়ে গান শুনিয়ে যেও। ব্যস, আস্তে আস্তে হার্মোনিয়ামটা আশ্রমের সম্পত্তি হয়ে যাবে। সন্ন্যাসিনী হলে কী হবে, তোমার মা-টি একটি ঘুঘু।'

অধোমুখে বসে রইল পাকালী। মেঝেতে আঁক কাটতে লাগল। একটাও কথা কইল না।

অথচ সুরমার এ উপদেশ দেবার সাধ্য নেই, মায়ের আদেশ অগ্রাহ্য করো। নিজেই একদিন সখ করে মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলেন আশ্রমে। মেয়ে শুভলক্ষণ, সর্বশুভ লক্ষণ, ভক্তির উর্বর ক্ষেত্র—মায়ের মুখের ও সব অযাচিত সার্টিফিকেট পেয়ে সুরমারই আঁক বেড়েছিল, আশ্রমচারীদের কাছে এমন একটা নম্রতম ভাব করে থাকত যে সেই মায়ের নির্বাচনধন্য অগ্রগণ্য ভক্ত। সেই অহংয়ে রস ধরেছে। নম্রতাটাই ছিল একটা অহঙ্কারের মত। এখন সে অহঙ্কারের থাকল কী। মেয়ের সামান্য একটু স্বাধীনে বেড়াবার সাধ, তাতেও বাদ সাধলেন।

'সব কিছুতেই মায়ের মত নিতে হবে এমন কী কথা আছে?' সুরমা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'কী খাব কী পরব কোথায় বেড়াতে যাব সব বিষয়ে অনুমতি নিতে হবে? মন্ত্র নিয়েছি বলে ওঁর পায়ে লিখে দিতে হবে দাসখৎ? শিষ্যের কোনো ব্যাপারেই কোনো স্বাধীনতা থাকবে না?

পাকালী তবুও চুপ করে রইল। তার রাধা-মা তার গুরু-মা সম্বন্ধে কোনো তর্ক করতে সে প্রস্তুত নয়। সে জানে কী, বোঝেই বা কতটুকু! তার পড়াশোনাও তো নেই বললেই চলে।

রাধা-মার নিষ্ট নিষেধটুকু, নিদেশটুকু শুনতে ভালো লাগে, এই তার বুক-ভরানো তৃপ্তি। ঠা, সমুদ্রে যাওয়ার চেয়েও বড় সুখ। কোনো উপরালা যদি আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধা দেয়, লোকে তো কষ্ট পায়, লুকিয়ে বা কাঁদে—সেমন সুরমা কষ্ট পাচ্ছে, কাঁদছেও বা মনের গোপনে, কিন্তু পাকালীর এতটুকুও আসক্তি নেই, অশান্তি নেই। রাধা-মা যখন 'না' বলেছেন তখন ভালোর জন্যেই বলেছেন। তবে আর কথা কী। সুরমা যে রাধা-মাকে সমালোচনা করছে, মন্দ বলছে, সেইখানেই পাকালীর কষ্ট। যার কাছ থেকে সুরমা মন্ত্র নিয়েছে তারই নিন্দে করছে, তাকে ঘুণ্য বলছে এ কেমনতরো কথা! কই তাঁর আদেশ সরাসরি লঙ্ঘন করবার মত সাহস তো হয় না দেখি। রাধা-মা তো শুধু পাকালীকেই বারণ করেছেন, সুরমা যাক না।

'ভগবানে মতি হোক, দেহ-মন শুদ্ধ থাক, এ কে না ভালো বলবে?' সুরমার কথার রেশ চলেছে সেই গুঞ্জনের সুর: 'তাই বলে মানুষ সংসারধর্ম ভুলে যাবে? ভগবান কি সংসার ছাড়া। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—সবাই-ই তো বিয়ে-থা করে সংসার করেছে। কৃষ্ণ, রাম, কেউই তো ছেড়ে কথা কয় নি, শুধু মানুষের বেলায় এত কড়াকড়ি কেন?' মাটির জীব মানুষ, সে কি মাটিতে হাঁটবে না? সে কি কেবল আকাশে উড়বে? তার শরীরটা এমন কী মন্দ ব্যাপার? শরীরটা কি ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়? শরীর নাশ করে দিলে সৃষ্টি থাকবে কী করে?'

কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে যাচ্ছে, সুরমার দিকে তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করল পাকালী।

সাজগোজ নেই, রঙ-চঙ নেই, হাস-ভাষ নেই, তুই কেমন ধারা মেয়ে? মাথায় যে ভালো করে তেল মাখিস না, তুই কি জটা রাখবি? তুই সুন্দর হয়েছিস কি সন্ন্যাসিনী হবার জন্যে? মাসে না খাস না খেলি—বছরে কদিনই বা জোটে—কিন্তু তুই মাছ খাবিনে কেন? বিয়ে না হতেই তুই বিধবা সাজবি? কেন তুই ছুতি-কাতি করবি নে, কেন অমত করবিনে সিনেমায়? সেদিন যে সুজিত বন্ধে সবাইকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল সিনেমায় তুই রাজি হলিনে কেন? তোর রাধা-মা তো বারণ করে পাঠাননি, তবে তোর কেন এই বিতৃষ্ণা? শেষকালে তোর টিকিটে পাকালী গেল। বাইরের সমস্ত আনন্দ গেলো আর তোর ঘরে বসে 'মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোই' এই নাম গানই একমাত্র সুখ, এ এক ধরণের তামসিকতা। গিরিধারীও থাকুন, দোসরও আসুন। নামস্নানও হোক, সমুদ্রস্নানও যেন বাদ না পড়ে।

সমানে গজগজ করে চলেছে সুরমা, মাধবী ডেকে পাঠাল।

অভিজিৎ খুব খুশি যে পাকালীর যাওয়া হবে না, আর পাকালী না গেলে মা-বাসীও বসে পড়বে। কিন্তু কেন যাবে না, বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে কারণটা জিগগেস না করেও থাকা যায় না, আর কারণটা জানলেই তো হতভম্ব। মা বারণ করেছেন! কী সর্বনাশ! এখানেও সাধু-মা!

থাকগে, মরুকগে, মেয়েটা যে যাবে না, সমুদ্রে-অসমুদ্রে ঘনিষ্ঠ হবেনা সুজিতের সঙ্গে, এই ডাক্তারের আরাম।

'কিন্তু এই মা কে দিদি?' সুরমাকে নিভৃতে নিয়ে গিয়ে জিগগেস করল মাধবী।

'সে কী, রাধা-মার নাম শোননি? স্বয়ং আদ্যাশক্তি। সাংঘাতিক জাগ্রত। আসনে আসুন। দেখায় যেন একতাল মাখন। নরমের চেয়েও নরম।'

'কিন্তু কী ব্যাপার?'

চিরকুমারী। কালীবাড়িতে পড়ে থাকত। ঘুরত শ্মশানে-মশানে। বাড়ির লোক ধেঁধে রাখতে পারত না। হাতে ত্রিশূল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। পরণে রক্তাম্বর নয়, লাল কস্তা পাড়ের শাদা শাড়ি, কিন্তু কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা। নিজের মনে হাসত চেঁচাত কাঁদত গান গাইত। জ্বলজ্বল করছে দুটো চোখ কিন্তু উর্ধ্বদৃষ্টি। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। সবাই জানত, পাগলি, নিজের খুশিতে নিজেই মেতেছে। কেউ-কেউ বা বলত দিব্যোন্মাদের অবস্থা, স্বপ্নে আদেশ পেয়ে ভৈরবী সেজেছে।

কুকথা বলতেও ছাড়ত না মানুষে। প্রচ্ছন্ন ভৈরব আছে কোথাও, তন্ত্র-মন্ত্র করে। কিন্তু এমন জ্যোতির্ময়ী আকৃতি, কলুষস্পর্শের দোষচ্ছায়াও অনুমান করা যায় না। একদিন দু-দুটো লোককে চক্ষের পলকে খুন করে বসল ভৈরবী। অন্ধকার রাতে শ্মশানের দিকে চলেছে, তিনটে গুণ্ডা ভৈরবীকে আক্রমণ করল। আমার থেকে লুণ্ঠন করবার আছে কী? পিশাচ তিনটে ভয়ঙ্কর কণ্ঠে হেসে উঠল। আছে সবচেয়ে লোভনীয় সম্পদ। তোমার যৌবন।

একটা নিশ্বাসও বোধহয় পড়ল না, ভৈরবী হাতের ত্রিশূল ছুঁড়ে মারল একজনের বুকে। হাতের মুঠি শিথিল করল না, পরমুহূর্তেই সেই ত্রিশূল তুলে নিয়ে আরেকজনকে বিদ্ধ করল পাকস্থলীতে। রক্তে মাটি ভেসে গেল। খল খল করে হাসতে লাগল ভৈরবী। হাসতে-হাসতে চলে গেল শ্মশানের দিকে।

দু-দুটো লোক যে খুন হয়ে গেল সেটা যেন গ্রাহ্যের মধ্যেই নয়। কত লোক এমনি পড়ছে-মরছে তাতে সামনে চলা কে বন্ধ করে?

পুলিশ এসে ধরল ভৈরবীকে। তার সাধ্যি হাতকড়া পরায়! চলো যাচ্ছি। গায়ে হাত দিতে আসে যে পাষণ্ড, তাকে খুন করব না তো কী।

যে দুদিন পুলিশ-হাজতে ছিল নায়নি খায়নি শোয়নি ঘুমোয়নি, সারাক্ষণ আপন মনে কথা বলেছে আর হেসেছে। পুলিশ নিজেই জামিনদারের খোঁজে বেরুল। নগেন সামন্ত, কালীভক্ত ব্যবসায়ী, জোর করে ঘরে আনল, বেখুন, এর ভার নিল।

'কে কার ভার নেয়।' ভৈরবী ঠাণ্ডা গলায় বললো 'কথা দিচ্ছি, পালাব না শহর ছেড়ে। ওর বাড়িতেই থাকব। যখনই ডাকবে তখনই এসে হাজির হব। আমার কথাই ধ্রুব সত্য।'

ভয়ে ভয়ে ব্যবসায়ী ভৈরবীকে ঘরে আনল। কে বলে পাষাণী হৃদয়হীনা? এ যে দয়াও স্নেহের নিরন্ত নির্ঝর।

নগেন সামন্তের ব্যবসা ফুলে-ফলে ভরে উঠল। অঢেল হয়ে উঠল সংসার। যে সংসারে মায়ের কৃপা পড়েছে সেই সংসারই অজস্র হয়ে উঠেছে।

নগেনই মায়ের প্রথম ভাণ্ডারী।

কেসের কী হল?

আরে কেস! উকিল নেই মোক্তার নেই নিজেই নিজের কেস সওয়াল করল ভৈরবী। অসুরেরা অসম্মান করতে এসেছিল, আত্মরক্ষার জন্য হত্যা করেছি, এতে রাজার আইনে দোষ হয় নাকি?

হয় না। যে দেশে সতীত্বের মর্যাদা নেই সে রাজার রাজাই নয়। একবাক্যে জুরিরা নির্দোষ বললে। ভৈরবী খলখল করে হেসে উঠল।

সে কী ভিড়! কী আনন্দের বন্যা! বিশ্বজননী ধরা পড়ে গিয়েছেন।

খালাস হয়ে নগেন সাহার বাড়িতেই থাকলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ ভোল বদলে। মাথায় ঘোমটা টানেন। রুদ্রাক্ষ ছেড়ে তুলসী ধরলেন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটার বদলে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। ভৈরবী হয়ে দাঁড়ালেন সলজ্জা গৃহবধূ। আর অট্ট-অট্ট হাসেন না, মৃদু মৃদু হাসেন।

কিন্তু আবার ধরা পড়লেন।

মধ্যরাত্রে ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছেন হঠাৎ করুণস্বরে কেঁদে উঠলেন। কী হল, কী হল! কারা যেন ঘরে ঢুকে দুহাত ধরে মুচড়ে দিল, হাতের গয়না কেড়ে নিল, এই দেখ নখের আঁচড় পড়েছে হাতে। আলো এনে সবাই দেখল, সত্যিই মায়ের দুই মণিবন্ধে কালশিরের দাগ, নখের আঁচড়ের চিহ্ন, কিন্তু মার হাতে গয়না ছিল কবে? বা, ফুলের গয়না ছিল না? ফুলের গয়না চুরি করতে ঘরে ঢুকবে কে? কিন্তু হাতের কব্জিতে টানা হেঁচড়ার দাগ কেন? ভাবাবেশে স্বপ্ন দেখলে গায়ে কি রক্তাক্ত নখের রেখারও আবির্ভাব ঘটে?

কে জানে কী ঘটে।

পরদিন সকালে দেখা গেল স্থানীয় লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরে রাত্রে চোর ঢুকে লক্ষ্মীর দুহাত থেকে সোনার বালা ছিনিয়ে নিয়েছে। তাড়াতাড়িতে টানতে গিয়ে লক্ষ্মীর হাতে নখের আঁচড় লেগেছে, জায়গায় জায়গায়-উঠে গিয়েছে রঙের আস্তর।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী যেমন মন্দিরে তেমনি আবার নগেন সাহার ঘরে।

মা বললেন, আমাকে গঙ্গাতীরে একটা আশ্রম করে দাও। আমি কৃষ্ণনাম কীর্তন করি।

গ্রামের সীমান্তে নগেন সাহা বিশাল আশ্রম করে দিল। মা এখন রাধা হয়েছেন। ঐশ্বর্য ছেড়ে চলে এসেছেন মাধুর্যে। এখন শুধু তাঁর কৃষ্ণ তৃষ্ণা। আর ছটার নয়, এখন শুধু আর্তি। সর্বক্ষণ নামাচ্ছন্ন হয়ে আছেন। নাম শুধু নিজেই বলেন না, অন্যের কণ্ঠেও শুনতে চান।

এই অঞ্চলে এক ভক্ত বাড়িতে এসেছিলেন গেল বছর। সে বাড়ির পাশেই পাকালীর ইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বাসা। একজন গাইয়ে দরকার, মায়ের সভাতে মেয়েদের ভিড়, তাই একজন মেয়ে-গাইয়েই বাঞ্ছনীয়, প্রধান শিক্ষিকা কী খেয়ালে কে জানে পাকালীকে ডেকে নিয়ে গেল গান গাইতে।

আর পাকালীর গান শুনে মা একেবারে সমাধিতে ডুবে গেলেন।

সেই থেকেই পাকালীর উপর মায়ের অশেষ কৃপা। প্রায়ই আশ্রমের গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যান পাকালীকে, সুরমাকেও যেতে হয় সঙ্গে। এত কৃপা, নাম-মন্ত্র দিলেন পাকালীকে, সঙ্গে-সঙ্গে সুরমাকেও। পাকালীকে বেশি। দিলেন তাকে একটি গোপালের বিগ্রহ।

মায়ের যারা প্রিয় তাদের মধ্যে যারা প্রধান তাদেরই একজন হয়ে উঠল পাকালী। পাকালীও মা, রাধা-মা, কৃষ্ণময়ী মা বলতে তন্ময়। কিসে তাঁর প্রীতি হবে তারই জন্যে সে উৎসুক। নয়কে হয় করে দিতে পারেন মা এমনি তার বিশ্বাস। লোহাকে সোনা।

কই হয় কই? এই অভিযোগ সুরমার চিরন্তন।

বীজ পুঁতলেই কি গাছ হবে? ধৈর্য ধরতে হবে। ধৈর্যেরই তো আরেক নাম হয়। এসব রাধা-মার কথা। মুখস্ত শিখে এসে বলে পাকালী।

'আমাকে একদিন নিয়ে যাবেন ?' মাধবী বললে সকাতরে।

'কেন নিয়ে যাবনা ? আপনাকে দেখলে মা কত খুশি হবেন।'

'না, না, আমাকে দেখলে খুশি হবেন কেন ?'

'কী যে বলেন ! আপনার ভক্তিতে আপনার প্রার্থনায় কেমন শিব চলে এলেন আপনার বাড়িতে, আপনার মরণাপন্ন ছেলেকে ভালো করে তুললেন—'

'না, না, আমার প্রার্থনায় নয়।' মাধবীর দু চোখ ছলছল করে উঠল : 'আমার প্রার্থনায় যদি হবে তবে আমাকে দেখা না দিয়ে চলে যাবেন কেন ? কেন ওঁর পা দুখানি বুকে জড়িয়ে ধরতে দেবেন না ? তারপর থেকে কত ডাকছি, দিদি, আর তিনি দেখা দিচ্ছেন না। তিনি নিজে না কৃপা করলে কী সাধ্য শুধু ডেকে ওঁর সাড়া পাই ? আচ্ছা দিদি তোমার রাধা-মা কি আমাকে কৃপা করবেন ? চাইলে দীক্ষা দেবেন ?'

'কেন দেবেন না ? নিশ্চয়ই দেবেন। আপনি এতবড় এক ডাক্তারের স্ত্রী, বড়লোকের ঘরণী, আপনার খাতির সকলের চেয়ে বেশি হবে।' সুরমা পরোক্ষে একটু হাসল।

'বা, তা কেন ? আমি বড়লোক বলে খাতির চাই না।'

'আপনি না চাইলে কী হবে, মা করবেন। মাকে তো আশ্রম চালাতে হয়, তাই ওঁর বড়লোক ভক্ত দরকার। আর, আবার হাসল সুরমা : 'মা বলেন, বড়লোক বলে ভক্তি বিশ্বাসেও বড় হতে পারবে না এমন কী বাধা আছে ? অন্তত সে কৃপায় তো বড়। কৃপা বেশি করে পেয়েছে বলেই তো সে বড়লোক হতে পেরেছে। তাই যেখানে ভগবানের বেশি কৃপা সেই বড়লোককে বেশি খাতির করলে ভগবানকেই বেশি ভক্তি করা হয়। বড়লোকের পক্ষে মার কী সুন্দর যুক্তি—'

'না, না, বড়লোক নয়, আমি দীনহীন কাঙালের মত যাব—'

'মা ঠিক বুঝতে পারবেন—'

'আচ্ছা, দিদি, বলছিলেন না, মা একেবারে আচেল করে দেন। আমাকে দেবেন আচেল করে ?'

'আপনার কিছুই তো কম নেই।'

'না, না, আমি টাকা-পয়সার কথা বলছি না,' মাধবীর চোখে জল টলটল করছে : 'আমি ভক্তির কথা বলছি, আমার সংসারে ভক্তির বান এনে দিতে পারবেন ? দিদি, আমার বুকের ভিতরটা দাউ-দাউ করে জ্বলে, আমার স্বামী নাস্তিক, আমার ছেলে, একমাত্র ছেলে—সেও নাস্তিক, ভগবান তাদের কাছে উপন্যাসের বস্তু—আমার শান্তি নেই তৃপ্তি নেই—এ সংসার আমার কাছে মরুভূমির মত। মা কি এ সংসারে বিশ্বাসের মেঘ এনে দিতে পারেন ? তারপর ঝরাতে পারেন ভক্তির বৃষ্টি ?'

'মা ইচ্ছে করলে, কৃপা করলে, সব পারেন।' সুবিধে বুঝে সুরমা কখনো মাকে তুলতে পারেন বৈকুণ্ঠে, আবার কখনো বা নামাতে পারেন ব্যবসাদারের গদিতে। নিজের বা মেয়ের সম্পর্কে অহঙ্কার করতে গেলে মা একেবারে ভগবতী, আর মায়ের বিধানে স্বার্থের কিছু ব্যাঘাত ঘটলেই মা একজন পাকা পাটোয়ার।

'তাইতো আমার সাধ তোমার মেয়েকে এ সংসারে নিয়ে আসি।' বললে মাধবী, 'ওর সংস্পর্শে ঐ বাড়ির নাস্তিক্যের পাহাড় গুঁড়ো হয়ে যাবে নিশ্চয়।'

'তা আর বলতে ! পাকালী একেবারে রাধা-মার অন্তরঙ্গ জন।'

'কিন্তু তার তো দেরি আছে। সুস্মিতের ডাক্তার হয়ে বেরুতে আরো বছর দুই বাকি। ডাক্তার হয়ে বেরুবার আগে তো ওর বাবা ওকে বিয়ে দেবেন না—'

'তা তো বটেই। নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে ছেলেরা আজকাল বিয়ে করতে চায় না। আর পাকাদীরই বা বয়েস কতো? সাতেরো-আঠেরো। ইস্কুলে থাকলে তো ক্লাস পর্যন্ত।' সুধাভাব আবার গলার করল সুরমা: 'কিন্তু যাই বলো, এ বয়সে মেয়ের আবার কী ভক্তি! মাছ মাংস পর্যন্ত খায় না।'

'কবে নিয়ে যাবেন বলুন?' আকুল হয়ে উঠল মাধবী।

'যেদিন আপনার সুবিধে।' বললে সুরমা, 'মায়ের কাছে মেয়ে যাবে তার আবার দিন-ক্ষণ কী! কিন্তু যেদিনই যান,' সুরমা একটি সাঙ্কেতিক হাসি আনল ঠোঁটে: 'ডাক্তারবাবুর বড় গাড়িটা করে যাবেন। আর বেশ সেজেগুজে যাবেন, বেশ গয়না-টয়না পরে—'

'সে আবার কী কথা!'

'ভগবান যাকে যেটুকু ঐশ্বর্য দিয়েছেন তা একেবারে গোপন করে রাখাটাও ঠিক নয়। রাজা হয়ে নিরভিমান করে থাকাটাও এক রকমের অহঙ্কার।'

আরম্ভ হল মাধবী। বললে, 'না, যেমন সাধারণভাবে যাই তেমনি যাব। আর, গাড়ি নইলে অতদূরে পথ যাব কী করে?'

'সঙ্গে পাকাদীকে নেব তো?'

মেয়ের প্রতি বুঝি মার প্রচ্ছন্ন ঈর্ষা। তাই গলা নামিয়ে সুরমা বললে, 'না, না, ওকে কেন?' ও সঙ্গে থাকলে মা আর আমাদের দিকে তাকাবেন না, ভালো করে কথাও কইবেন না। সারাক্ষণ পাকাদীকে নিয়ে পড়ে থাকবেন। বলবেন, পাচু, নাম করো। আর আমাদের বলবেন, হাততালি দাও। নামের মধ্যে হাততালি দিতে-দিতে হাতের তালু লাল হয়ে যাবে।'

মাধবী হাসল, বললে, 'ঠিক বলেছ। তা হলে আবার মনের কথা কিছুই বলা হবে না।'

'আর পাকীকে যে আপনার ঘরের বউ করে নিতে চান সেই কথাটাও বলবেন।'

'বলব বৈকি।' মাধবী ভরাট গলায় বললে, 'বলব, আপনি ওদের আশীর্বাদ করুন।'

৪

ঘরের মধ্যে কার যেন ছায়া পড়ল। বিকেলের চা জলখাবার খেয়ে চুপচাপ বসে ছিল সুস্মিত, ভাবছে কোথায় যাবে, কোনো বন্ধুর বাড়িতে—বন্ধুর বাড়িতে তো নিশ্চয়ই, কোন বন্ধুর বাড়ীতে? যে বন্ধুর সঙ্গে ছাত্র-ইউনিয়নের জরুরি মিটিংগুলো পাকানো যায় শক্ত করে, সেখানে, না যে বন্ধুর সঙ্গে স্রেফ হালকা হাসির পানসি চড়ে চলে যাওয়া যায় সিনেমায়, সেই বাটে? এমনও তো হতে পারে কোনো বন্ধু নিজের থেকেই চলে আসতে পারে তার কাছে। তাহলে তার বাছাই-করার যন্ত্রণাটা আর পোয়াতে হয় না। যেই আসুক, রাজনীতি বা সংস্কৃতি, তার সঙ্গেই সে অনায়াসে জমে যেতে পারে।

কিন্তু এটা যেন অন্য রকম ছায়া। জুতোর শব্দ যখন নেই তখন বন্ধুরা কেউ নয়। তবে কি খালি-পায়ের কেউ? ছায়া তো মানুষ কই? না, সুস্মিত ভুল করেছে, ছায়া নয়, এক নিশ্বাস হাওয়া। এমন কী ফুল ফুটেছে যে হাওয়া তার গন্ধ বয়ে আনবে? হাওয়া মিলিয়ে গেলেও গন্ধটুকু মেলায় না কেন?

'কে?' কাউকে উদ্দেশ করে নয়, যেন নিজেকেই নিজে ডেকে উঠল সুস্মিত।

অমনি দরজার আড়াল থেকে পাকাশীর আবির্ভাব। স্বচ্ছ প্রসন্ন মুখ, একটি অমল স্নেহ কোথায় যেন লেগে আছে মুখখানিতে, পাকাশী ঘরে ঢুকেই মেঝের উপর চাপটি খেয়ে বসে পড়ল। জিগগেস করল, 'তুমি পুরী গেলেনা?'

সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুস্মিত পালটা জিগগেস করলে, 'তুমি যে আমার ঘরে ঢুকলে তোমার রাধা-মার অনুমতি নিয়ে এসেছ তো?'

'আহা, তোমার ঘরে কি আগে আমি আর ঢুকেছি!' স্নেহভরা মুখ তুলল পাকাশী: 'কেন তোমার অসুখের সময়?'

'ও, অসুখের সময়!' নিশ্বাস ফেলল সুস্মিত: 'তখন আমি শম্ভু ছিলাম, তাই হয়তো নির্বিঘ্নে ছিলাম।'

'কিন্তু তার আগে?' খিলখিলিয়ে উঠল পাকাশী: 'কতদিন কত বছর ধরেই তো—'

'তার আগে আমার বাসনাটা হয়তো এত উচ্চারিত হয়নি।' গাঢ় চোখে তাকাল সুস্মিত: 'এখন, এই অসুখের পরে যেমন হয়েছে—'

কথাটাকে এতটুকু স্বন হতে দিল না, দৃষ্টিটাকে দিলনা স্থির হতে, পাকাশী খোলা মনের হাসিতে সমস্ত দুরাশা উড়িয়ে দিয়ে বললে, 'তবেই বুঝতে পারো আমার রাধা-মা কেমন অন্তর্যামী! অন্যের মনের বাসনা টের পান।'

'টের পান না হাতি!' সুস্মিত রাধা-মাকে প্রাধান্য দিতে মোটেই প্রস্তুত নয়। ক্লিষ্ট মুখে বললে, 'ওটা একটা সনাতনী মনের অন্ধ সংস্কারের কথা। অনাত্মীয় যুবক-যুবতী একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে, সমুদ্রস্নান করবে এ তাঁর তপোবনী বুদ্ধির কাছে অসহ্য।'

'না, এর জন্যে নয়,' পাকাশী চোখ নামিয়ে শান্তমুখে বললে, 'আমার তো মনে হয় অন্য কারণ।'

'কী কারণ?'

'শ্রীক্ষেত্র ভ্রমণ তো জীবনের একটা বিরাট সম্ভোগ। কী বলো, তাই না?' ধীরে চোখ তুলল পাকাশী; 'জগন্নাথদর্শন, সমুদ্রস্নান—'

'সমুদ্রস্নান তো একশোবার।' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সুস্মিত: 'আর স্নানের আগে দর্শন। স্নানের পরে দর্শন। বিরাট সম্ভোগ—নিঃসন্দেহ।'

'মা বলতে চাইছেন,' চোখের দৃষ্টি আবার তুলে নিয়ে অন্তরে রাখল পাকাশী: 'জীবনের কোনো বিরাট সম্ভোগের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি দরকার, প্রতীক্ষা দরকার। শ্রীক্ষেত্র দর্শনের মত আমার এখনো কোনো প্রতীক্ষা-প্রস্তুতি হয়নি। তাই মা বারণ করে দিলেন।'

কথাটা সুস্মিতের মনে অপূর্ব ঝঙ্কার তুলল। জীবনের বিরাট সম্ভোগের ক্ষেত্রে প্রস্তুতি দরকার, প্রতীক্ষা দরকার।

'মা বললেন, তাড়াহুড়ো করে কিছু করতে গেলে ভোগ হয় বটে কিন্তু তৃপ্তি হয় না। অকালের আম মিষ্টি হলেও তেমনি সুস্বাদু হয় না। কী, ঠিক বলেননি মা?'

সুজিত চুপ করে রইল। হয়তো তাহলে ঠিকই বলেছেন।

'মা বলেন, যে জিনিস আমরা চাই, তীব্রভাবেই চাই, তার জন্যে প্রতীক্ষা করতে না শিখলে তার আমরা মূল্য দিতেও শিখিনা। যেমন ধরো ভগবান—'

মুহূর্তে জ্বলে উঠল সুজিত। বললে, 'তুমি আর যার নাম করো ঐ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম কোরো না।'

'করব না।' হাসল পাঞ্চালী: 'কিন্তু ভদ্রলোক মোটেই বৃদ্ধ নয়।'

'কোন বাল্মীকির আমল থেকে তার নাম চলে আসছে এতদিনেও সে বৃদ্ধ হয়নি?'

'না, সে চিরকিশোর।' পাঞ্চালী কি একটু আরেক রকম করে তাকাল: 'সব সময়েই তার নবীন বয়স। তার জরা নেই বার্ধক্য নেই—'

'তার গোঁফ নেই দাড়ি নেই সে চিরবাচ্চো,' শব্দ করে হেসে উঠল সুজিত; 'ঐ ভূতটাকে বাদ দাও।'

'বাদ দিচ্ছি। কিন্তু তুমি মিছে রাগ করছ, আমি ভগবানকে একটা প্রতীক বলে নিচ্ছি।'

'কিসের প্রতীক?'

'ধরো কোনো দুঃখী লোকের সবচেয়ে প্রিয় সবচেয়ে আনন্দের একজন আত্মীয় পুরুষ—রাধিকার যেমন শ্রীকৃষ্ণ—'

'রক্ষে করো।' তিক্তমুখে সুজিত বললে, 'কেন সে কী করেছে?'

'কিছু করেনি। মা কী বললেন তাই বলছিলাম। মা বললেন, আনা মাত্রই যদি ভগবান দেখা দিত তাহলে ভগবান খেলো হয়ে যেত। সেই আনন্দময় পুরুষ সহজে দেখা দেয় না, সুদীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করিয়ে রাখে বলেই সে এত মূল্যবান। প্রত্যেক পাওয়ার দাম তো দিতে হবে। বড় পাওয়ার বড় মূল্য।'

খাটে আধশোয়া অবস্থায় ছিল, উঠে বসল সুজিত। বললে, 'কথাটা অন্য অর্থে তো ঠিকই। কিছুকাল প্রতীক্ষা তো করতেই হবে।' সাদামাঠা হাসি হেসে বলল, 'পাশ করে বেরিয়ে আসতে তো আরো কিছু সময় লাগবে—'

'যদি ফেল-টেল না করো তা হলেও বেশ কিছু সময়—' পরিষ্কার গলায় পাঞ্চালীও হাসল।

'কিন্তু তারই বা কী দরকার?' অস্থির হয়ে উঠল সুজিত। ঐ তো নাগালের মধ্যে রয়েছে আনন্দের সমুদ্রটা, মুখের মধ্যে তুলে নিলেই তো চলে। কিন্তু ক্ষমতা নেই নামে খাট থেকে, তাড়াহুড়ো করতে গেলে সমুদ্র না পুকুর হয়ে যায়। অকালের ফল না স্বাদ হারায়। তাই ভয়ে-ভয়ে বললে, 'যদি প্রতীক্ষার পরে দেখি আনন্দ অন্যত্র চলে গিয়েছে।'

'আনন্দ যাবার নয়।' বললে পাঞ্চালী, 'আর যদি দেখ সে চলে গিয়েছে তবে দেখবে তার যাওয়াটাও আনন্দ।'

বসে ছিল, টান হয়ে শুয়ে পড়ল সুজিত।

পাঞ্চালী যেমন বসে ছিল তেমনি বসে রইল। যেন আরো কিছু তার কথা আছে। জিগ্গেস করলে, 'পুরী তা হলে যাচ্ছ না?'

'না। গোপালপুর যাচ্ছি।'

'কবে?'

'কাল।'

ব্যস, তারপর আর কথা কী? তবু পাকালী বসে আছে চাপটি খেয়ে। বললে, 'ওঠো, উঠে বোসো। তোমাকে একটা গান শোনাই।'

'হার্মোনিয়ামটা নিয়ে এসেছ বুঝি?' উঠে বসল সুজিত: 'কেরৎ দেবার মতলব।'

'না, মোটেই নয়। খালি হাতে এসেছি, খালি গলায় গাইব।'

'তুমি গাইতে সুরু করলেই তো লোক জমবে ঘরের মধ্যে। সুন্দর একটি নির্জনতা ছিল নষ্ট হয়ে যাবে।'

'না, আস্তে-আস্তে গাইব, গুনগুনিয়ে গাইব।'

'কিন্তু আলোটা তো জ্বালতে হবে।'

'নাই বা জ্বাললে।'

'অবশ্য এ বাড়িতেও তপোধনী মন আছে, অন্ধকার-হয়ে-আসা নির্জন ঘরে তোমাকে আমার সামনে বসে গান গাইতে দেখলে কোঁস করে উঠবে, তার কথা ভাবি না, তা ছাড়া বাবা বাড়ী নেই, রুগী দেখতে গেছেন। কিন্তু আলো না জ্বাললে তোমার সেই গানের আগুন-লাগা অপূর্ব মুখটা দেখব কী করে?'

কোনো কথা বলল না পাকালী, আপন মনে গুনগুন করতে লাগল।

'অন্ধকার থাকতে-থাকতে আমাকে আরেকটা কথা বলো।' খাট থেকে নেমে পড়েছে সুজিত।

'বলো।' এতটুকু নড়ল না পাকালী।

'তুমি সেই যে আনন্দের প্রতীক্ষের কথা বলছিলে, কী জানি তার নাম—'

'নাম শুনলে তো তুমি বিরক্ত হও।'

'হাঁ, দরকার নেই নামে। আমি জিগগেস করছি, প্রতীক্ষাই শুধু আনন্দকে চাইবে, আনন্দ প্রতীক্ষাকে, পিপাসাকে চাইবে না?'

'পিপাসা না থাকলে আনন্দ কী।' যেন পাকালী নয় ঘরের নতুন-আসা অন্ধকার বলছে, 'যত বড় পিপাসা তত বড় আনন্দ।'

'তবে আনন্দ পিপাসার কাছে এসে, এতদূর এসে, ঘরের মেঝেতেই থেমে পড়ল কেন?' খাটের বাজুটা শক্ত করে ধরল সুজিত: 'কেন খাটের উপর উঠে এল না?'

উত্তর দিল না পাকালী। সে গান ধরল:

'চল চল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।'

নাই বা উত্তর দিক। ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে তো এসেছে। মেঝে পর্যন্ত তো এসেছে। বাকিটুকু তার কাজ, তার পৌরুষ। সেই পিপাসিত বাহু বাড়িয়ে দুই হাতে আনন্দকে তুলে নেবে খাটে। সে নিষ্ক্রিয় ঈশ্বরবাদিত্বে বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর কিছুই করে দেবে না। সব নিজেকেই করতে হবে।

কিন্তু এমন গলা ওকে কে দিল? ক্ষীণ স্বরে গাইছে, মনে হচ্ছে যেন বুকের উপর মুখ রেখে

গাইছে ; না, না, অন্তরের। ভিতরে বসে গাইছে সুস্মিতের কানে, মর্মে, কেবা দিল এই নতুনের অনুভূতি? সকলেই কি এমনি গানে শোনে এমনি হৃদয়ে আলোড়িত হয়? আর, গানের আলোতে ভেসে যাওয়া দেখেছ ঐ মুখটা? চোখ কোথায়? চোখ কি বুজে আছে? বুজে নেই তো কোনদিকে তাকিয়ে আছে, কী দেখছে? কাকে দেখছে? অমন বিহ্বল হয়ে?

আর সকলে গান শোনে, সুস্মিতের কাছে গানটা দেখার জিনিস হয়ে দাঁড়ায় কেন? কেন ইচ্ছে করে মুখটা ছুঁই? আগুন হয়ে যাই?

কিন্তু ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি—এ কার? যে গাইছে তার নয়? তার যদি হয়, তবে এ গান সে গাইছে কেন? তবে এ গান তো সুস্মিত গাইবে। হায়, ঈশ্বর তার কণ্ঠে গান দিল না কেন? এত পিপাসা দিল, ভালোবাসা দিল কিন্তু গান দিল না কেন? ঈশ্বর যে নেই এই তো তার একটা সহজ প্রমাণ।

'কিন্তু এ অঙ্গের লাবণি কার?' জিগগেস করল সুস্মিত।

পাঞ্চালী থামল না, অল্প হেসে পরের ছত্র গাইল :

'ঈষত হাসির তরঙ্গ-হিলোলে
মদন মুরছা পায়।'

সন্দেহ কী, এ গান পাঞ্চালীকে নিয়ে, আর এর আসল গায়ক সুস্মিত।

ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করল সুস্মিত : 'এ কার হাসি? কার তরঙ্গ-হিল্লোল?'

গান থামাল পাঞ্চালী। সেই মৃদু হাসিটি লেগে রইল ঠোঁটে। বললে, 'শ্রীকৃষ্ণের।'

'শ্রীকৃষ্ণের? কিন্তু গাইছে কে?'

'শ্রীমতী।' বলেই পরের পদে চলে গেল পাঞ্চালী :

'কিবা সে নাগর কি দেখে দেখিনু
ধৈরয রহল দূরে।
নিরবধি মোর চিত্ত বেয়াকুল
কেনে বা সদাই ঝুরে॥'

পদটা শুনেই অস্থির হয়ে সুস্মিত বললে, 'কথাটা কিবা সে নাগর নয়, কিবা সে নাগরী হবে। তুমি ভুল গাইছ। শ্রীমতীর চিত্ত আবার ব্যাকুল হল কবে? সে আবার কবে কাঁদল? যত ব্যাকুলতা তো শ্রীকৃষ্ণের।'

পাঞ্চালী থামল না, কথা কইল না, হাসল না একটুও। তন্ময় হয়ে গাইতে লাগল :

'কপালে চন্দন-ফোঁটার ছটা
লাগিল হিয়ার মাঝে।
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাজল
না কহি লোকের লাজে।'

তোমার আবার মর্মব্যাধি! তোমার আবার লোকলজ্জা!

গুনগুন করে গাইবে বলেছিল, এখন উদ্বেল আবেগে গলা ছেড়ে দিল পাঞ্চালী।

গান শুনতে-শুনতে সুস্মিতও বুঝি অন্তচেতনায় চলে গিয়েছিল, তাকিয়ে দেখল যা এসে

দাঁড়িয়েছেন, বাড়ির আর-আরেরাও এসে জড়ো হয়েছে—আরে, এ কী, স্বয়ং অভিজিৎ উপস্থিত!

মেয়েটা ভালো, গানও গায় প্রাণকাড়া, কিন্তু আসর বাড়ির মধ্যে কেন? দারুণ বিরক্ত হলেন ডাক্তার। মাধবীকে ইশারায় ঘরের বাইরে নিয়ে এসে বললেন, 'গান শুনতে চাও, আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে আসর বসাও গে।'

'মন্দ কী, বাড়িই না হয় আশ্রম হল!' মাধবী লঘু সুরেই বললে।

'তাহলে আর ডাক্তারি করে খেতে হবে না।' অভিজিৎ নির্মম মুখে বললে, 'রুগীরা বলাবলি করবে, ডাক্তারবাবুর আর ডাক্তারিতে মন নেই, তিনি হরিনামের পেটেন্ট ধরেছেন।'

'সেটাই তো সেরা ওষুধ। রুগীরা তাহলে আরো বেশি করে আসবে।'

'রাখো। যত সব বস্তাপচা কথা।' সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন অভিজিৎ: 'ওকে এখানে ডেকে আনল কে?'

'নিজের থেকেই এসেছে।' অভিজিতের রুক্ষতায় একটু বা আহত হল মাধবী: 'সে কি, আসবে না?'

'কী করতে আসবে? এ বাড়িতে কী কাজ? আর যদি আসেও, গান গাইবার দরকার কী! আশ্রমের গান আশ্রমে গিয়ে গাক।'

পাকালীর কণ্ঠে তখন শেষ দুছত্র শোনা যাচ্ছে:

'না জানি কি জানি হয় পরিণামে
দাস গোবিন্দ কয়।'

গান শুনে পাড়াপড়শীরাও বুঝি আসছে কেউ কেউ।

তারা লক্ষ্যে থাকলেও কাউকে লক্ষ্য না করে অভিজিৎ নামতে-নামতে বললেন, 'বাকি গান আশ্রমে হবে।'

হঠাৎ দুরন্ত এক ঝাপটা হাওয়ার মত ছুটে নেমে গেল পাকালী। তখনো চেনাশোনা লোক আসছে, জিগগেস করছে অভিজিৎকে, 'গান কোথায়?' আর অভিজিৎ বলছে, 'আশ্রমে।'

সুজিতের দুজন কলেজের বন্ধু এসে উপস্থিত। সিঁড়ির নিচে অভিজিতের সঙ্গে দেখা। থাবড়ে গিয়ে একজন জিগগেস করলে, 'সুজিত কোথায়!'

কী রকম যেন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন অভিজিৎ, বললেন, 'আশ্রমে।'

হ্যাঁ, চলো, আশ্রমে চলো সুরমাকে ধরল মাধবী। চলো, মাকে, রাধা-মাকে, কৃষ্ণমন্ত্রী কৃষ্ণভাবিনীকে দেখে আসি।

ডাক্তারবাবু তাঁর বড় গাড়িই বার করিয়ে দিলেন। বললেন, 'ধর্ম-কর্ম বাইরে করো আপত্তি নেই. ঘরের মধ্যে টেনে এনো না। সিনেমা-থিয়েটারের নানারকম হাউস আছে না, এ আরেক হাউস, আশ্রম-হাউস। কেউ যদি আশ্রম-হাউসের শো-তে বেশি আনন্দ পায়, সেখানে সে যাবে তাতে কথা কী।'

'সে হাউসে গেলে প্রেস্টিজ বাড়ে।' লঘুভাবেই বললে মাধবী।

'যার যেমন প্রেস্টিজ সম্বন্ধে ধারণা।' টিপ্পনী কাটলেন ডাক্তার: 'কেউ কেউ যেমন বিলিতি

হাউসে ইংরিজি সিনেমা দেখে মনে করে প্রেস্টিজ বাড়ল। অথচ বেশির ভাগ কথাই যে কিছু বুঝল না।'

'যেতে-যেতে শুনতে-শুনতে বুঝবে।' সুরমাকে আগে উঠতে দিয়ে মাধবী পরে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

সদর পারে সুন্দর আশ্রম। পাকা দোতলা বাড়ি, আশে-পাশে কিছু-কিছু একতলা ঘর, আর ফুলের বাগান। গাছগাছালিও আছে মন্দ নয়। সমস্ত জায়গাটা শান্তি দিয়ে স্নেহ দিয়ে ছায়া দিয়ে ঘেরা। শুদ্ধতায়ও এমন একটা সুর বাজছে সে যেন আরেক কান শোনে, এমন একটি সুবাস উঠছে সে যেন আরেক নাক টেনে পায়।

আশ্রমের দরজায় প্রকাণ্ড একটা গাড়ি এসে দাঁড়াতেই আশ্রমবাসীরা সচকিত হয়ে উঠল। ড্রাইভারই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিল কলকাতার সেরা ডাক্তার মুখার্জি সাহেবের স্ত্রী।

সমস্ত আশ্রম চঞ্চল হয়ে উঠল। যার কতখানি শক্তি, একটা ইহাভিমুখী বিষয়ী ডাক্তারের সংসারকে টেনে এনেছেন।

এ আর বেশি কথা কী। কত রাজা-মহারাজাই তো এসেছেন। কথাটা বড়লোক নয়, কথাটা বৈজ্ঞানিক। যারা দেখার বাইরে কোনো অদেখাকে মানতে চায় না। অহরহ দেখছে, বিজ্ঞানের ঘড়িতে বেড় পাচ্ছে না, বাড়তি ঘড়ি দুড়ালেও দু আঙুল কম পড়ছে তবু যাদের নত হয়না অহঙ্কার। না, না, আজকাল অনেক ডাক্তারই ঘায়েল হয়েছে—ছোল বছরে ষোল ধরেছে। না ধরে যাবে কোথায়? রুগীর আর আশা নেই, দুঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ, ডাক্তার চলে যাবার দুঘণ্টার মধ্যেই রুগী সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে বিছানায়। বিপদ কেটে গিয়েছে, শান্তিতে ঘুমুক এখন, ডাক্তার চলে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই—ডাক্তার বুঝি তখন বড় রাস্তায়ও পড়েনি—রুগী চেঁসে গিয়েছে। কেউ কেউ আবার প্র্যাকটিসে সুবিধে করবার জন্যে ধরে। নাড়ী টেপবার আগে জল করে নেয়। তা করুক। ভক্তির ঢেকও ভালো।

কিন্তু ডাক্তারবাবু কই? ডাক্তারবাবু আসেননি?

আস্তে-আস্তে আসবেন। কান যখন এসেছেন তখন মাথাও আসবেন।

সুরমার সঙ্গে এসেছে তাই অর্থ-প্রার্থী সাধারণ ভক্তের ভিড় সরিয়ে মাধবী একেবারে মার অন্তরঙ্গ মহলে এসে উপস্থিত হল।

ছোট নীল পাড়ের শাদা একখানা গরদ পরে আছেন মা, গায়ে জামা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দু কাঁধের উপর খুব ছড়ে রয়েছে, কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা—আসনে বসে আছেন মেঝের উপর।

দশদিক আলো করে বসেছেন। দেখে স্তম্ভিত হল সুরমা। এত যেন সে আশা করতে পারেনি। তার কল্পনা যতই উজ্জ্বল হোক না, এ আরো বেশি উজ্জ্বল। ভ্রূক্ষেপী তেজস্বিনী মূর্তি, কিন্তু করুণায় মমতায় দ্রবীভূতা। কঠোরের কাঠামোর উপর কোমলতার প্রতিমা। কী রঙ কী রূপ, যেন ঝলমল ঝলমল করছেন। বয়সের হিসেবে অনেক প্রৌঢ় কিন্তু দেখলে মনে হয় চিরন্তনী ষোড়শী। মুখের হাসিটি চিরভাস্বর।

সুরমাকে দেখেই মা বলে উঠলেন: 'আমার পাচু কই?'

মায়ের পায়ের কাছে বসল সুরমা। সুরমার পাশ ঘেঁষে মাধবী।

'পাচু আসেনি।' মায়ের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল সুরমা।

না হাসলেন : 'পুরীধামে যেতে পারনি বলে বুঝি মন খারাপ করে আছে ?'

'না, আপনি বারণ করেছেন, তাতে তার কোনো অসন্তোষ নেই। আপনার নিষেধও তার তৃপ্তি।' সুরমা বললে গদগদ হয়ে।

'আহা, ওকে নিয়ে এলেই পারতে। একটু গান শুনতুম। কী করছে ও বাড়িতে ?'

'রান্নাবান্না করছে। সংসারের কাজকর্ম করতে হবে তো ?'

'আহা, কাজকর্ম করবে না ? নিরন্তর করবে। রাঁধবে বাড়বে দেবে খোবে খাওয়াবে।'

'তারপর বয়স হল, নিজের সংসার খুঁজে নেবে।'

মা হাসলেন মধুর করে। যেন জানেন কোথায় সেই নিজের সংসার। তাকালেন মাধবীর দিকে। ইঙ্গিতে জিগগেস করলেন, 'ইনি কে ?'

সুরমা পরিচয় দিল। পাকাপাকী যে ওদেরও প্রিয়পাত্রী এটুকুও না বলে ছাড়ল না।

এতক্ষণ শুধু দেখছিল মাধবী, এবার প্রণাম করল। পা ছুঁয়ে মামুলি প্রণাম নয়, দুটি পা একত্র করে তাতে মাথা রেখে প্রায় চালা প্রণাম। মা মাথায় দুই হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। যখন মুখ তুলল, মাধবী কান্নায় ভেসে যাচ্ছে।

কে এমন পাপিষ্ঠ আছে যে ঐ দুখানি পায়ের উপর না মাথা নোয়াবে! কে এমন পাষাণ আছে যে না বিগলিত হবে।

যদি এই মূর্তি দেখাতে পারত ডাক্তারকে! চিন্তা ও চেতনার কী অবস্থায় থাকলে মানুষের এত কান্তি হয় এত দীপ্তি হয়, কেন মন ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, এমনটি আর দেখিনি!

'কিছু বলবে ?' মা মনস্তাপিক্ত কণ্ঠে জিগ্‌গেস করলেন।

অন্তরের ব্যথা বুঝতে পেরেছেন মা। মাধবী আরো আকুল হয়ে উঠল।

'লোকজন সরিয়ে দেব ? গোপন কিছু বলবে ?'

'না, গোপন আর কী।' মাধবী তবু স্বর নিচু না করে পারল না : 'সংসার বড় প্রতিকূল। সবাই ঈশ্বরবিমুখ।

রাধা-মা স্মিতসুন্দর হাসলেন। বললেন, 'আমি সব জানি। তোমার স্বামী-পুত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ও নিয়ে তারা মাথা ঘামাতে অনিচ্ছুক। তা ওরা অবিশ্বাসী থাক না—'

'অবিশ্বাসী থাকবে ?' যেন ঘা খেয়ে চমকে উঠল মাধবী।

'মন্দ কী। সবাই যদি ভক্ত-বিশ্বাসী হবে তা হলে ভগবানের লীলা হবে কী করে ? তা হলে আর সংসারে মজা কই ? সব সময়েই যদি আলো হয়ে থাকে তবে সেখানে সুখ কই ? অন্ধকার আছে বলেই তো আলোর সুখ। জটিলা-কুটিলা আছে বলেই তো কৃষ্ণলীলা।'

কী মধুর স্বর! চিন্তা কত পবিত্র হলে মানুষের স্বর এত মধুর হয়! হৃদয় কত গভীর মঙ্গলের আকর হলে নিরঞ্জন এমন অমৃত ওঠে!

মা আরো কিছু বলুন, দৃষ্টিতে অতৃপ্তি নিয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে আছে মাধবী। স্বামী-পুত্র যা তাই তাকে মেনে নিতে হবে কিন্তু ওরাও যদি ভক্ত হত, ঈশ্বরের অভিমুখী হত তা হলে কি সংসার আরো আনন্দময় হত না ?'

'দরকার কী ওদের ভক্ত হয়ে বিশ্বাসী হয়ে ?' উদার-শান্ত মুখে বললেন রাধা-মা, 'ওরা চলুক

না আপন গৌরবে। ঈশ্বরকে না মেনেও তো ভালো থাকা যায়। আর ঈশ্বরকে মেনে সংসারে কত ছল-অনাচার কত ভণ্ডামিই তো চলেছে। চলেছে তো চলুক। যিনি রোখবার তিনি ঠিক রুখবেন। বলো, সংসারে পাপীই যদি না থাকে তবে ভগবান যে পতিত পাবন তার প্রমাণ হবে কী করে?'

'তা হলে—'

'হ্যাঁ, থাক ওরা যেমন আছে। ওরা বিমুখ বলেই তো তোমার ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তুমি সংগ্রাম করতে পারবে। সংগ্রাম ছাড়া জীবনের তাৎপর্য কী। তোমার স্বামীও তো বলতে পারে, দিব্যি সহধর্মিনীর মত, স্বামী যেমনটি চায়, তেমনি ভোগে-বিলাসে জীবন কাটানোই তোমার তো উচিত ছিল, কেন তোমার এই ঈশ্বরে দুর্মতি হতে গেল? পাঁচটা বড়লোক মেয়ে যেমন চিন্তা না করে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটায় তেমনিভাবেই তুমি কাটাবে না কেন—বাধা কী? কিন্তু ঈশ্বরের অন্য রকম ইচ্ছে—স্বামীকে বিমুখ রেখে স্ত্রীকে ডাক দিলেন—'

'তা হলে কি আমি ঈশ্বর ছেড়ে স্বামীর অবিশ্বাসে ফিরে যাব? ওর কথা শুনে ভুলে যেব ঠাকুরঘর?'

'সাধ্য কী তুমি ফিরে যাও?' রাধা-মা সেই দিব্য হাসি হাসলেন: 'বলো, ঠাকুরের ঘর কি ভুলে যেওয়া যায়? সমস্ত দুনিয়া জুড়ে তাঁর ঘর পাতা।'

'কিন্তু মা, স্বামীর অবাধ্য হচ্ছি—'

'তা ঈশ্বরের জন্যে স্বামীর অবাধ্য হওয়া যায়। রাধা কী করেছিল? গোপিনীরা? আর আমাদের মীরাবাঈ? আহা, সেই ভজনটা কেউ গাও না। আমার পাঁচু থাকলে ঠিক গাইত—মেয়ে তো গিরিধর গোপাল, দুসরা ন কোই—'

অপরাধীর মত মুখ করল মাধবী। বললে, 'কিন্তু ভগবান না মানলে, বিরুদ্ধতা করলে স্বামী-পুত্রের অমঙ্গল হবে না?'

'অমঙ্গল কেন হবে?' ভগবান কি ছোটলোক যে তাঁকে কেউ না মানলে, হটিয়ে উঠিয়ে দিলে তিনি প্রতিশোধ নেবেন? তাঁকে না মানলে তাঁর কী এসে গেল? তাঁর মত উদার তাঁর মত মহাত্মা দুটি নেই। ভগবানকে না মানলেও ভগবান তাকে সুখে রাখবেন। তাঁকে মানবার যে সুখ, শুধু সেটুকুই যেন না—'

'সেই তো আসল সুখ।'

'যে যেমন বুঝেছে মা যে যেমন বুঝেছে।'

'মা—' এবার আরো যেন কী গূঢ় কথা বলবে মাধুরী।

'বলো।'

মাধবী আরো একটু এগিয়ে এল। ম্লান আর্ত মুখে বললে, 'আপনার কাছে আমি মন্ত্র পাই মা?'

চোখ বুজে খানিকক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন মা। পরে চোখ মেলে গম্ভীর স্বরে বললেন, 'মা, আমি তোমার গুরু নই। তোমার যিনি গুরু তিনি আসছেন। তিনিই তোমাকে মন্ত্র দেবেন।'

মুষড়ে পড়ল মাধবী। 'আসছেন? কবে আসছেন?'

'ধৈর্য ধরো। কাল পরিপক্ক হলেই আসবেন।'

'কই এলেন? না, আসবেন না। আপনিই আমাকে মন্ত্র দিন।'

মা দৃঢ় অথচ শান্ত স্বরে বললেন, 'আসবেন, ঠিক আসবেন। একবার যখন এসেছিলেন, আবার আসবেন—না এসে যাবেন কোথায়?'

'এসেছিলেন?' মাধবী বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল।

মা হাসতে লাগলেন। যেন তিনি সব জানেন। কিন্তু কী করে জানলেন? নিশ্চয়ই পাকালীর কাছে বা সুরমার কাছে শুনেছে। সেই তিনিই তার প্রকৃত গুরু? সন্দেহ কী, তিনিই ভবাব্ধিকর্ণধার, তিনিই ভ্রমতম ভাস্কর। যে মৃত পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দেয় সেই জীবনদাতা মৃত্যুঞ্জয়েশ্বরই তো গুরু। কিন্তু তিনি আসছেন—এ কথা মা জানলেন কী করে? এ কি কথার কথা? কথার কথা বলবার মত কি এই মুখ? স্থির করে নিলেই তো হয়ং মার সুবিধে, মানে, আশ্রমের সুবিধে। কিন্তু না, আমি তোমার গুরু নই, তোমার গুরু আসছেন—আসছেন—

'যতদিন না আসেন আমি কী করব?' আবার কেঁদে উঠল মাধবী।

'যা করছিলে তাই করো; তোমার ঠাকুরঘরের নিরালায় বসে ডাকো। ডাকলে না এসে পারবেন কী থাকতে?'

মন্ত্র দিলেন না মা। বড় সাড়ি করে ফিরে গেল মাধবী। কিন্তু শিখিয়ে দিলেন ধৈর্য ধরার মন্ত্র। আসনে অচল হয়ে বসে থাকার মন্ত্র। ব্যাকুল হয়ে অনন্ত মনে ডাকবার কৌশল। তেমন করে ডাকলে কেউ না এসে পারে? পর্বতই চলে আসে আর এ তো মানুষ।

'কী, দেখলে কী?' বাড়ি ফিরলে জিগগেস করলেন অভিজিৎ।

'দেখলাম সৎচিন্তার আশ্রমে থাকলে একটা মানুষ কতদূর সুন্দর হতে পারে।'

'সুন্দর তো চোখ যে রকম রিয়্যাক্ট করে। বলতে পারো চোখের এলার্জি।' অভিজিৎ হাসলেন: 'তোমার কাছে যা সুন্দর তা হয়তো আমার কাছে ইরিটেটিক। তাই সুন্দরের কথা বলা বৃথা। কিন্তু জিগগেস করি, কিছু পেলে?'

'কিছু না। আমাকে মন্ত্র দিলেন না।' বঞ্চিতের মত মুখ করল মাধবী।

'সে কী, এত বড় সাড়ি দেখেও না?' একটু বা অপমানের মত লাগল নিজেকে। কণ্ঠে শ্রদ্ধার লেশমাত্র না রেখে অভিজিৎ বললেন, 'শুনেছি তো বাঁধা ধরা কি দিতে পারলেই দীক্ষার রেজিস্টারে নাম উঠে যায়। তুমি তো কি দিতে অপারগ ছিলে না—'

'না, সে জন্যে নয়।'

'যে জন্যেই হোক ও সব হামবাগিজম থেকে দূরে থাকাই ভালো। তোমার কিসের দুঃখ যে তুমি ধর্ম করতে যাবে?'

'যা, দুঃখ না থাকলে বুঝি ধর্ম করা যায় না?'

'যায়, কিন্তু কোনো মানে হয় না। দিনেও আলো জ্বালানো যায়, কিন্তু কোনো মানে হয় না। বড়লোকের বাড়িতে যেমন ড্রয়িং রুম ডাইনিং রুম থাকে তেমনি কাশীবাসের খাতিরে একটা ওয়ারশিপিং রুম বা ঠাকুরঘর থাকুক, চলে যায়। ড্রয়িং রুমে যেমন বুদ্ধমূর্তি রাখবার রেওয়াজ তেমনি তোমার ওয়ারশিপিং রুমে কটা না হয় কেষ্ট বিষ্টু রাখলে, তাতে বেমানান হবে না। মূর্তি যদি ভালো ডিজাইনের হয়, লোকে উঁকিঝুঁকি মারলেও আপত্তি নেই। ব্যস এই পর্যন্ত। মন্ত্র-তন্ত্র যে পাওনি

ভালোই হয়েছে, নিজের মনে আরাম করে থাকতে পারবে। কোন কথাবার্তার মধ্যে যেতে হল না—

'আমাকে মন্ত্র দিলেন না, কারণ উনি আমার গুরু নন। আমার গুরু আসছেন—'

'আসছেন? কোত্থেকে আসছেন? তিব্বত থেকে না কামস্কাটকা থেকে—'

'তা বলেন নি।'

'কবে আসছেন?'

'তাও না।'

'কোথায় আসছেন?'

অভিজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে মাধবীর কেমন ভয় করে উঠল। বললে, 'তাও জানা নেই।'

'সবই অস্পষ্ট।' হেসে উঠলেন অভিজিৎ: 'তা হলে তাকে চিনবে কী করে?'

'আগে একবার তিনি—' এসেছিলেন, এ কথাটা বলতে সাহস পেল না মাধবী, কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে কথাটা ঘুরিয়ে দিল: 'আগে একবার তিনি স্বপ্নে দেখা দেবেন—'

'তবে বেশ মাকে তেল দিয়ে ঘুমোও। গভীর ঘুম হলে স্বপ্নের হাত থেকে বাঁচবে। গুরুকে আর আসতে হবে না। যত সব—'

'আকুল হয়ে ডাকলেই তিনি আসবেন।'

একটা শাঁসালো রসী আসে না, গুরু আসবে।' টিটকিরি দিয়ে উঠলেন অভিজিৎ: 'যা আসবে আসবে। না আসবে তো না আসবে। হাতের কাছে যা কর্তব্য তাই করো, আর কেন বা কিসে, প্রশ্ন কোরো না। যা জানো না বোঝো না, অদৃষ্ট বলে, 'লাক্' বলে ছেড়ে দাও, মানে খুঁজতে গিয়ে অমূল্য সময় নষ্ট কোরো না। যেহেতু এর কোনো মানে নেই।'

কিন্তু গোপালপুর থেকে সুজিত যে প্রকাণ্ড একটা চিঠি লিখেছে পাকালীকে—অনেক কথা, অনেক কবিত্ব দিয়ে ভরা—তার কি কোনোই মানে নেই? একবার—একবার মাত্র ভাসা-ভাসা করে পড়েছে তাড়াতাড়ি—এমন সময় শেষ ডাকে চিঠি এলে মানুষ কী করতে পারে—আর আশ্রম থেকে তখুনি কিনা গাড়ি এসে উপস্থিত। মা তো শুধু ড্রাইভার দিয়ে গাড়ি পাঠাবেন না, সঙ্গে আশ্রমের দুই ব্রহ্মচারিণী রমা-দি আর শোভা-দিকেও পাঠিয়েছেন। এক দিন একা-একা গেলে কী জোরের হত! কত দিনের পুরোনো এই ড্রাইভার।

রমাদি মোটা মানুষ, নড়তে-চড়তে দেরি হয়, কিন্তু শোভাদি পাতলা একহারা, একটানে ছুটে এসেছে বাড়ির মধ্যে।

চিঠিটা একটু ভালো করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে পড়ে তার পর্যন্ত সময় নেই।

'কী করছ?' ব্রহ্মচারিণী শোভা প্রচণ্ড শাসনের সুরে বললে, 'আমি ভাবছিলাম তৈরি হয়ে আছ বুঝি।'

'আমি তো তৈরি।' হাতের লম্বা চিঠিটা ভাঁজ করে খামে পুরতে-পুরতে পাকালী বললে।

'কী ওটা?'

'একটা চিঠি।' তাড়াতাড়ি করলে কি মিটোল হয়ে ঢোকে! পাকালীর অবাধ্য আঙুল আরো এলোমেলো করে ফেলল।

'প্রকাণ্ড চিঠি তো ?' ব্রহ্মচারিণী হলে কী হয় কৌতূহল টনটনে।

'হ্যাঁ, সুজিতদার কাণ্ড।' ছেলেমানুষের মত অসতর্কে নামটা বলে ফেলল পাকালী। তারপরে সাবধানের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে বললে, 'গোপালপুরে গেছে, চারপৃষ্ঠা ভরে শুধু সমুদ্র বর্ণনা। ডাক্তারি পড়লে কী হবে, যেমন ভাষা তেমনি কবিত্ব!'

চিঠিটা কোথায় রাখে, বুকের মধ্যে না বইয়ের মধ্যে পাকালী চিন্তায় পড়ল।

শোভা হাত বাড়াল। বললে, 'চিঠিটা আশ্রমে নিয়ে চলো না। আমরা সবাই সমুদ্র বর্ণনাটা পড়ব।'

'না, না, আশ্রমে নিয়ে যাব কী!' পাকালী পাংশু হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি টেবলের উপর সকালীর পাদা-করা বইয়ের মধ্যে চিঠিটা পাচার করে দিল।

'এই বুঝি সেই লোকটা যার সঙ্গে পুরী যেতে তোমাকে মা বারণ করেছিলেন—'

'লোকটা কী!' হাসতে চাইল পাকালী: 'সুজিতদা! আমাদের পাশের বাড়ির ডাক্তারবাবুর ছেলে।'

'ওই তো তোমাকে পুরী নিয়ে যেতে চেয়েছিল—' খটাক্কেও কম যায় না ব্রহ্মচারিণী।

পাকালী চুপ করে রইল।

'আমার মনে হয় চিঠিটা মাকে দেখানো উচিত।' মুখচোখ সন্দেহে কালো করল শোভা: 'তাঁর জানা দরকার কী ধরণের চিঠি লিখেছে! এ চিঠির উত্তর দেওয়া তোমার ঠিক হবে কিনা—'

'না, না, সাধারণ একটা সমুদ্র বর্ণনার চিঠি—' বইয়ের পিরামিডের দিকে তাকাল পাকালী। ঠিক কোন বইটার মধ্যে লুকিয়েছে মনে করতে পারলনা। বললে, 'এ মাকে কী দেখাব!'

'খাটে মাসিমা শুয়ে আছেন না?' 'ঘরের প্রান্তে বিছানায় মুড়িসুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা সুরমাকে লক্ষ্য করল শোভা। প্রথম ভেবেছিল এটা বুঝি দুপুরের ঘুমেরই জের, এখন একটা কাতর শব্দ শুনে বলে উঠল: 'কী হয়েছে?'

'কদিন ধরে জ্বর।' চিন্তিত মুখে পাকালী বললে, 'মাথার যন্ত্রণা।'

ব্রহ্মচারিণী সুরমার কাছে এগুলো। সুরমা জিগগেস করলে, 'সকালে খবর পাঠিয়ে বিকেলে ওকে নিয়ে যাচ্ছেন মা, ব্যাপার কী?'

'কে একজন মহাপুরুষ আসবেন আশ্রমে তাঁকে গান শোনাতে হবে।'

'কে আসবেন? যিনি ডাক্তারবাবুর ছেলেকে ভাগো করে দিয়েছিলেন, তিনি?'

'তাঁকে তো চিনিনা। কত সাধু-মহাজনই তো আসছেন অহরহ—'

'তিনি এলে আমিই তো চিনব।' খেতচন্দন ছোট্ট পাথরের বাটিতে যবা আছে তারই মধ্যে আঙুল ডুবিয়ে কপালে ছাপ তুলল পাকালী।

'ওকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যেও মা। দেখছ তো আমার জ্বর। সকালীর সার্দি সাইড, এখনো ফেরেনি।' অতিকষ্টে পাশ ফিরল সুরমা।

দরজার কাছে এসে আরেকবার ফিরল পাকালী। সুরমাকে বললে, 'সকালী এলে বোলো গোপালের আরতিটা যেন করে রাখে।'

বলে তাকালো গোপালের দিকে। কুলুঙ্গিতে বসে আছে। ছোট্ট হাতটি মেলে চাইছে ক্ষীর-ননী।

তাকালো বইয়ের মলাটের দিকে। কোন বইয়ের কোন পৃষ্ঠায় ঢাকে রেখে দিয়েছে চিঠিটা ঠাহর করতে পারছে না। সেখানেও যেন কে হাত বাড়িয়ে কী চাইছে সুধার্ত হয়ে! সুধা না বিষ, তা কে বলবে?

তার একটা ব্যক্তিগত চিঠি সেটা গুরু-মাকে দেখাতে হবে কেন? গুরু-মা যদি পত্রের উত্তর দিতে বারণ করে দেন? কী দরকার? তার একটা চিঠি পাবার, চিঠি লেখবারও স্বাধীনতা থাকবে না? সে মন্ত্র নিয়েছে বলে তার সম্পর্কে সমস্ত সিদ্ধান্ত গুরু-মাই নেবেন, তার নিজের বক্তব্য শেষ হয়ে যাবে? তা কী করে হয়? এমন একটা সুন্দর চিঠির!

হ্যাঁ, সমুদ্র বর্ণনা ছাড়া কী! একটু বেশি কেনিল, বেশি উত্তাল করে লিখেছে, কিন্তু মানুষের ভালোবাসা তো সমুদ্রই। মানুষ চেয়েও যে পায় না এ কান্নাও তো সমুদ্রেরই মত! সুজিতদার একটু বাড়াবাড়ি করাই অভ্যেস। এমন পর্যন্ত লিখেছে, বাবা যে তোমাকে অপমান করলেন, বাড়ি থেকে আসর গুটিয়ে চলে যেতে বললেন, আমি এর প্রতিশোধ নিতে প্রস্তুত আছি। পরীক্ষা পাশ করে বেরুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বোলো না, আমি তোমাকে এখুনি নিয়ে আসতে পারি, নিয়ে যেতে পারি পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। আমার মা আমার পক্ষে, তোমাদের বাড়ি আমাদের অনুকূল। কেউ যদি পক্ষে নাও থাকত, সবাই যদি বিরুদ্ধেও যেত, আমি ভয় পেতাম না, সেছপা হতাম না। তুমি যাকে ঈশ্বর বলো সেই অবাস্তবকে খোঁজার চেয়ে এ শরীরে ভালোবাসার বাস্তব আনন্দকে খোঁজা ঢের বেশি রোমাঞ্চকর!

এমনি সব উলঙ্গ কথা! আর কাউকে নয় তার গোপন হৃদয়ের প্রতিবেশিনী পাকালীকে লিখেছে। সে-সব সে গুরু-মার কাছে প্রকাশ করতে যাবে কেন? মা উত্তর দেবার সে নিজে দেবে। তাতে গুরু-মার কী বলবার আছে?

'কী অত ভাবছ?' পাড়িতে জিগগেস করল শোভা।

'ভাবছি যে সাধুবাবা ডাক্তারবাবুর মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন তিনিই এলেন কিনা আশ্রমে।' অমল মুখে বললে পাকালী।

না, এ অন্য সাধু। অন্যরকম সাজপোশাক। ভদ্র ও মোলায়েম।

পাকালী গান ধরল:

বঁধু, তোমায় করবে করবিনী আমি
রূপসী তোমার রূপে।
যেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে॥

প্রাণ ঢেলে গাইল পাকালী, যেমন গায়। নবাগত সাধু ধ্যানাবিষ্ট হয়ে শুনলেন। 'আনের আছয়ে অনেক জনা, আমারি কেবল তুমি—'এ গাইবার সময়ে কাঁদতে লাগলেন নীরবে। আশ্রমের গাছপালা পর্যন্ত তন্ময় হয়ে শুনল। কিন্তু গানের শেষে রাধা-মা জিগগেস করলেন, 'মা পাচু, তোমার মন কি আজ চঞ্চল?'

অপরাধীর মত মুখ করে পাকালী বললে, 'না, হ্যাঁ, মার খুব জ্বর চলেছে।'

'তা হলে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাও।'

বাড়ি ফিরে সব সেরা-খাওয়া করে পাকালী মায়ের পাশটিতে শুতে এসেছে, আসলে দেখতে এসেছে মা ঘুমিয়েছেন কিনা। ঘুমিয়ে পড়লে নিশ্চিন্ত হয়ে চিঠিটা বইয়ের ফিজিবিজি থেকে বার করতে পারে। তাকিয়ে-তাকিয়ে পড়তে পারে আরো ক'বার। হয়তো বা ভাবতে পারে, কী সুরে কত গভীরে উত্তর পাঠাবে। সুরমা পাশ ফিরে তাকালেন পাকালীর দিকে, গাঢ় স্বরে বললেন, 'সুজিতের চিঠির জবাবটা কালকেই দিয়ে দিস, দেরি করিসনে।'

পাকালী বিছানার উপর বসে পড়ল। এদিকে ঘুমের ঘোরে মাথা তুলতে পারেন না, অথচ খুঁজে পেতে চিঠিটা পড়েছেন। উপদেশ দিচ্ছেন, কী ভাবে লিখতে হবে জবাব।

'বেশ সুন্দর করে মিষ্টি করে চিঠি লিখবি।' ঘুমের আবেশ মিশিয়ে বলতে লাগল সুরমা, 'লিখবি তুমি আগে ডাক্তার হয়ে বেরোও, পরে আর সব। আমার কী বা বয়স, আমি ঠিক অপেক্ষা করতে পারব। আর বাপের সঙ্গে ঝগড়া কাটির কথা ও সব কী লিখেছে—লিখবি, ডাক্তারবাবু তো আমাকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলেন নি, উনি ও সব কেন্তন পছন্দ করেন না তাই বলেছেন—মিছিমিছি ওঁকে আমরা চটাতে যাব কেন? বুঝলি যেমনটি লিখলে খুশি হয় তেমনি করে লিখবি—'

আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল পাকালী। আর চিঠির খোঁজ করে না! পড়ে-শুনে মা আবার কোন বইয়ের ফাঁকে রেখেছেন কে জানে। কাল সকালে দেখা যাবে।

পরদিন সকালে চিঠির জবাব দিতে বসল পাকালী। সাদামাঠা পাঠ দিল। শ্রীচরণেষু। লিখল: সমুদ্রের হাওয়ায় স্বাস্থ্য ভালো করো। প্রচুর বিশ্রাম নাও। এখানে মার জ্বর। তাই ব্যস্ত আছি। আশ্রমে মাঝে মাঝে যাই। তবে গানে বিশেষ উন্নতি হচ্ছে না। একজন মাস্টার রাখলে ভালো হয়। গুরু-মা বলেছেন জোগাড় করে দেবেন। দেখি কী হয়। গানে খুব আনন্দ। জপ-ধ্যানে আরো বেশি আনন্দ।

একটা খবর আছে। যে সাধু তোমার অসুখ সারিয়েছিলেন তিনি শিগগিরই দেখা দেবেন। কবে দেখা দেবেন জানা যায়নি। বর্তমানে কোথায় আছেন ঠিক জানা না গেলেও কাছাকাছি আছেন এমনি অনুমান। একটু খোঁজাখুঁজি করলেই বোধহয় বার করা যায়। কিন্তু কে খোঁজে?

আমার জন্যে ভেবো না। আমি ভালো আছি। আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিও। ইতি—

পাকালী।

এ চিঠিরও একটা জবাব এল। পিওনের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েই নীল খামটা বুকের মধ্যে পুরল পাকালী। যেন দেয়ালের টিকটিকিটাও না দেখতে পায়। রান্নাঘরের নিভৃতিতে উনুনের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। বুকের থেকে চিঠিটা বার করে কোলের উপর রেখে পড়ল নিবিষ্ট হয়ে। তারপর পড়া হয়ে গেলে উনুনের মধ্যে ফেলে দিল। কাউকে দেখাবার বা কারু থেকে উত্তর জেনে নেবার দায় রইল না।

আর চিঠি নেই।

'কিরে, সুজিত আর চিঠি লিখল না?' সুরমা বিরক্ত মুখে বললে।

'কই, দেখি না তো।' নির্লিপ্তের মত মুখ করল পাকালী।

কদিন পরে বাড়ির দরজায় ডাক শোনা গেল: পাকালী। পাকালী কোথায়? যেন কেউ পাকালীকে দেখে নেবে, স্বরে এমনি ঘৃণা ভঙ্গি। শিক্ষা দেবে, শাসন করবে—এমনি ঔদ্ধত্য।

সকাল বেলা, বাড়িতে সবাই আছে, সকলে চমকে উঠল।

ওমা! এ যে সুজিত। কই, চেহারা তো বিশেষ ফেরেনি। কালো হয়ে গেছ দেখছি।

মমতা মুখ লম্বা করে বললে, 'যাকে খুঁজছে তারই তো দেখা নেই। পাকী কোথায়?'

সুরমা বললে, 'ওর ঘরে বসে জপ করছে।'

জপ করছে! সে আবার কোন দেশী? সশব্দে দ্রুত পায়ে সুজিত এগুলো ঘরের দিকে। দেখল ঘরের দরজা ভেজানো। কেউ বারণ করল না, সুজিত এক লাথি দরজা ঠেলে খুলে দিল। খুলে দিতেই দরজার মাথার আলগা শেকলটা বেজে উঠল আর এক ঝলক রোদ ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

এমনটি যেন কোনোদিন দেখেনি সুজিত। কল্পনাও করেনি।

মেঝের উপর পাতা একখানা কম্বলের আসনের উপর চোখ বুজে টান হয়ে বসেছে পাকালী। হাত দুখানি গুটিয়ে এনে বুকের উপর একত্র করে রেখেছে। নিজের আঁচলের অংশ দিয়ে ঢেকেছে হাত দুখানি। ডান হাতের আঙুল বুঝি নড়ছে, বাঁ হাতটি স্থির।

এ এক নতুন রকমের সৌন্দর্য। হাওয়া নেই এমন একটা জায়গায় যদি প্রদীপ জ্বলে তেমনি তারই একটা শুভ্র শিখা। কাঁপছে না একবিন্দু। এই যে সুজিত দাঁড়িয়েছে তার সামনে তাতে পর্যন্ত না। দরজা খোলার শব্দ হল, শেকল বাজবার শব্দ, খানিকটা রোদ যে ছিটকে পড়েছে গায়ে-মুখে, ভ্রূক্ষেপ পর্যন্ত নেই।

সুজিতের মনে হল দুহাত বাড়িয়ে যদি এখন পাকালীকে তুড়িয়ে নেয় বুকের মধ্যে তবে কেমন হয়? তা হলে ও কি চোখ মেলে, চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, না, কি এমনি ধ্যানলীন হয়ে বাহুবন্ধনেও মৌন হয়ে থাকে?

যদি জয় করবার কিছু থাকে তবে এই উপেক্ষাকে, এই ঔদাসীন্যকে। এই অচঞ্চল জ্যোতি—এর মত আর সুন্দর কী। যদি লাভ করবার কিছু থাকে তবে এই গাঢ়তাকে মহত্তাকে। মেরুদণ্ডটা কী রকম কঠিন করে রেখেছে! যদি নম্র করবার ভয় করবার কিছু থাকে তবে এই কাঠিন্যকে। সুজিতের মনে হল পাকালীর এই রূপই বেশি লোভনীয়। কপালে ওটা শ্বেতচন্দনের ফোঁটা না? ওটা মুছে ফেলে ওখানে লাল বসাতে হবে, সিন্দুরের লাল। যদি কিছু রক্তিম করবার থাকে তাহলে এই বৈরাগ্যকে। যা বিশুষ্ক তাকে আবিল করেই বলবানের সুখ।

আস্তে-আস্তে শব্দ না করে দরজাটা টেনে দিল সুজিত। রোদের ঝলকটুকু পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

'একী, চোখ খুলল না?'—মমতা সকলক করে উঠল।

'না, জপ করছে।' সুজিতের কণ্ঠে যেন সেই পুরোনো ঝাঁজটুকু ফুটল না।

'চং করছে।'

'তুমি একটু বোসো।' সুরমা বললে, 'এখুনি ও উঠবে আসন থেকে।'

'না, ও শান্তিতে করুক যা করছে।' সুজিত সদরের দিকে যেতে-যেতে বললেন, 'আমি আবার না হয় আসব।'

'পায়ে ঠেলা দিয়ে ওকে তুলে যাও না এখুনি—' মমতা সুরমাকে লক্ষ্য করল: 'ছেলেটা ট্রেন থেকে নেমেই ছুটে দেখা করতে এল, তার প্রতি একটুও ওর ভদ্রতা নেই?'

'না, না, থাক—' সুস্মিতই বাধা দিল সুরমাকে।

'তার মানে আসন থেকে উঠবে না ও কিছুতেই ? কেউ পারবে না তুলতে ?'

যদি কেউ পারে, আমিই পারব। মনে মনে বললে সুস্মিত। আমিই যেব ওর আসন নড়িয়ে। আমি পারব। আমার ভালোবাসা পারবে।

সুস্মিত চলে গেলে বড়বৌকে লক্ষ্য করে বিভূতি বললে, 'তুমি কখন যে কোনদিকে কথা বলো বুঝে উঠতে পারি না। কখনো ছেলেটা এ বাড়িতে আসে বলে তোমার রাগ, কখনো ছেলেটাকে কেন আসন ছেড়ে উঠে যাতির করা হল না তার জন্যে আপত্তি। তুমি সত্যি কী চাও বলো না ?'

'আমি আবার কী চাইব ! আমি শুধু ন্যায্য কথা বলতে চাই !'

৫

ছাত্র ইউনিয়নের ইলেকশানের প্রস্তুতি-পর্ব চলেছে, জরুরি মিটিং। সবাই ভেবেছিল সুস্মিত তার বক্তব্যটা আরো ফলাও করে উপস্থাপিত করবে। এত ভালো বলতে পারে, মালা ধরিয়ে দেবে বক্তৃতায়। কিন্তু, না, অত্যন্ত সংক্ষেপে সারল। তাও কাঠ-কাঠ কথায়। আর কী বলব। তা তো ঠিকই, তবু বলার জন্যে বলাটাই তো আসল বলা। বলায় ফুল-ফল আর কতটুকু থাকে, আসলই হচ্ছে পাতাবাহার।

হ্যাঁ, সবই তো বলেছে। শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে কী হবে যদি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকে ? টাকা না থাকলে সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক স্বাধীনতা সম্ভোগ করবে কী করে ? কটা লোক প্রয়োজনের চেয়ে-চের বেশি টাকা করবে আর অধিকাংশ লোক জীবনধারণের সামান্যতম প্রয়োজনটুকুও পাবে না এ অনৈক্য অসহ্য। ঐ অনৈক্য দূর করার সংগ্রামে আজকের তারুণ্যকেই অগ্রণী হতে হবে। হ্যাঁ, ওটাই জীবনসম্পর্কে সুস্থ বৈজ্ঞানিক ভঙ্গি। এ সব পয়েন্টও 'টাচ্' করেছে। যখন আমি জন্মেছি, আমাকে বাঁচবার সম্পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। আর এই বাঁচা মানে একটা কীট হয়ে বাঁচা নয়, হাওয়া খেয়ে বাঁচা নয়, মানুষের মত মানুষ হয়ে বাঁচা। এটাই বিজ্ঞানভিত্তিক জীবন দর্শন। এ দর্শনে যাদের অভ্যাস ও অস্বীকার তাদেরই, মানে ছাত্রদেরই ভোট পাওয়া উচিত।

হাততালি ঠিকই পড়ল, কিন্তু শ্রোতাদের তৃপ্তি হলনা। প্রতিপক্ষকে গালাগাল না দিলে কি বক্তৃতায় উত্তেজনা হয় ? আর উত্তেজনা ছাড়া শ্রোতার তৃপ্তি কোথায় ?

'খুব তাড়াতাড়ি সারলেন।' যখন বেরিয়ে যাচ্ছে সভা থেকে কেউ-কেউ বললে।

'বিট র‍্যাবাউট দি বুশ করে লাভ কী !' সুস্মিত মৃদু হাসল : 'সব সময়ে টু দি পয়েন্ট হওয়াই ভালো।'

শুধু সভা থেকে নয়, কলেজ থেকেই বেরিয়ে যাচ্ছে সুস্মিত।

'এখুনি চলে যাচ্ছিস ? - সে কী, শোন দাঁড়া—'

'কাজ আছে। বিশেষ জরুরি।' কী যেন লুকোতে চাইছে সুস্মিত।

'কী কাজ ?' আর সকলকে নিরস্ত করতে পারলেও বাসুদেব আর নির্মলকে পারা গেল না। ওরা একেবারে রাস্তায় এসে পাকড়াও করলে।

'আছে কাজ।

এমন কী কাজ যা সহচর বন্ধুদের বলা যায় না? কোনো শিকার? কোনো মেয়ে-টেয়ে? কিংবা কোনো আলু-ভাতে প্রেম? ট্যাশ। টাকার তাগাদা, টিউশানি? বাজে কথা। বাড়ি ভাড়া? কেন, আমি কি বাউণ্ডুলে? তবে বোনের পাত্র? আমার বোন কোথায়?

তবে কোন চুলোয়?

'নারকেলডাঙায়।'

'সেখানে কী?' আরো আঁকড়ে ধরল বন্ধুরা। বন্ধুদের থেকে লুকোবি স্বর্গে-মর্তে এমন কী থাকতে পারে?

এ একেবারে অবৈজ্ঞানিক। কিন্তু আগেই বলে রাখি এ আমার প্রয়োজনে নয়। আমার মার প্রয়োজনে। আমি মাকে ভালোবাসি, আমি শুধু মায়ের আদেশ পালন করছি।

যেন কী এক লজ্জাকর ব্যাপার—পাপ স্বীকার করছে—এমনি মুখ করে বললে, 'এক সন্ন্যাসী খোঁজ করছি।' বলেই তাড়াতাড়ি যোগ করল: 'আমার কেউ নয়, মায়ের চেনা।'

হো হো হো করে হেসে উঠল বন্ধুরা। সে কী রে? তাকে দিয়ে কী হবে?

কিছুই হবে না। তা কি আর সুজিত জানেনা? তবে নিতান্তই মার খেয়াল। আর মাকে একান্ত ভালোবাসেই বলেই মার খাতিরে এই বুনো হাঁস খুঁজে বেড়াচ্ছে।

'তুই বুজরুকটাকে চিনবি কি করে?'

'আমি তো চিনবই না। আমি শুধু গিয়ে দেখব দেওয়া-ঠিকানার সন্ন্যাসী আছে কিনা। যদি নেই তো চুকে গেল। আর যদি থাকে তবে মাকে খবর দেব। মা এসে সনাক্ত করবেন—'

'তোদের বাড়ি এমন সনাতনী তা তো জানতাম না।' বাসুদেবের সুরে যেন একটু ধিক্কারের টান।

'সনাতনী আবার কী। বাধা তো সমস্ত বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে। একমাত্র মা যা একটু সেকালদেঘে।—

'আর তুই?'

'দেখতেই পাচ্ছিস। মূর্তিমান কালাপাহাড়।' বললে বটে কিন্তু ভঙ্গিটা সুজিৎ পাষাণবৎ করতে পারল না।

'বলা যায় না মায়েরই তো ছেলে—'

'কে নয়?' একটু যেন বা—'

'নারকেলডাঙায় পাওয়া গেল না, তারপর খবর এল ঘুঘু ঘুঘুডাঙায় আছে, তখন আবার যদি ঘুঘু ধরতে?' বিদ্রূপের প্রশ্ন খোলাখুলি নির্মম।

'তা মা বললে—'

'এই রে মা বললে! মা বললে তুই রিয়াকেশানারি কাজ করবি?'

'তা যার যা ভক্তিবিশ্বাস। মা যদি তাতে শান্তি পান—'

'তুই তাকে প্রশ্রয় দিবি? যা বাজে ঝুরো অযৌক্তিক তাকে সমর্থন করবি?'

'কোনটা বাজে কোনটা কাজের তা কে বলবে?' পাশ কাটাতে চাইল সুজিৎ। 'কার মধ্যে

কী আছে কে জানে। আমাদের মনে হচ্ছে ভুয়ো, হয়তো বা তা দিয়ে আর কারু উপকার। হয়তো বা কারু রোগের উপশম, শোকের সান্ত্বনা—' চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল সুজিত : 'পরে বলব কী হল—'

কী আবার হবে! মায়কেলডাঙায় না পেয়ে পায়রাডাঙায় গেল। না আবার কোত্থেকে খবর পেলেন সাঁতরাগাছিতে এসেছেন। নয়তো ডায়মণ্ডহারবারে। দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গেল, সাধুর সন্ধান নেই কোথাও। বাপি আসছেনই, এসে আর পৌঁছুচ্ছেন না।

সুজিত মাকে বললে, 'কলকাতার মধ্যে কোথাও খবর পাও বোলো। চুঁ মেরে আসব। কলকাতার বাইরে কোথাও যেতে বোলো না। শেষ পরীক্ষা কাছিয়ে এল।'

'না, না, আমি তোকে কোথাও যেতে বলিনা।' মাধবী স্নেহ ঢেলে বললে, 'তুইই তো নিজের উৎসাহে যাস—'

'হ্যাঁ, মা, কোথায় যে কী আছে কেউ বলতে পারে না।' কীরকম যেন ঘুসর বিষাদের সুর এসেছে সুজিতের কথায় : 'যা জলের মত সোজা তা ঘটে না আর যা অসম্ভবেরও বাইরে তাই সহজ হয়ে ওঠে।'

'কারণ নিশ্চয়ই কোথাও আছে।' মাধবী সান্ত্বনা মাখানো মুখে বললেন, 'হয়তো অনেক দূরে আছেন। মানুষ দেখতে পাচ্ছে না। তাই আড়াল হচ্ছে।'

আড়াল ছাড়া আর কী। নইলে কী হিসেবে সে আকর্ষণীয় নয় পাঞ্চালীর কাছে! সামাজিক বিচারে তার যোগ্যতার সার্টিফিকেট তো প্রথম শ্রেণীর। গাড়ি-বাড়ি চিত্ত-বিভব স্বাচ্ছন্দ্য-প্রাচুর্য কুমারী মেয়েকে মুগ্ধ করবে না এ কে কবে শুনেছে? সুজিতকে সুদৃশ্য ও সুদর্শন বলেই তো সকলে জানে। তাছাড়া তার প্রতি পাঞ্চালীর শ্রদ্ধা বা সৌজন্যও তো কম নয়। তবু কেন, কেন এই বিমুখতা? বাবা অবশ্য বিরুদ্ধে কিন্তু একমাত্র পুত্রের ইচ্ছার কাছে কোন বাপ না শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়েছে? আর এখানে তো বিশেষ সুবিধে, মা তাঁর স্নেহনীড়ে টুকে নেবার জন্যে হাত বাড়িয়ে আছেন। তার যা সব পুতুলখেলা। সব তো মায়ের ঠাকুরঘরেই হতে পারবে, মায়েরই প্রশ্রয় ছায়ায়। তবে কেন তার এই বিতৃষ্ণা? কেন সুজিতের প্রতি তার আকাঙ্ক্ষা আগুন হয়ে ওঠে না? কিসে সুজিত কম পড়ছে? কেন তার মাঝে সেই সুন্দরকে দেখছেনা যার পায়ে সর্বস্ব ডালি দেওয়া যায়, সর্বশেষ বস্ত্রতন্তুটি পর্যন্ত? কেন সে সুজিতকে সর্বৈশ্বর্যবান বলে দেখছে না, অনির্বচনীয় বলে? কিসে সে ম্লান? কোথায় তার অভাব?

এক-একবার মনে হয়, ভারি তো মেয়ে, ঐ তো বড় জোর একটা জুঁই ফুলের লতা, তার জন্যে কেন এত বাসনা? ইচ্ছে করলে আরো কত রূপসী কত বিদুষী মেয়ে ঘরদোর আলো করে বসতে পারে। কলেজের দুটো হবু-ডাক্তারনী কত দিন ধরে ছোঁক-ছোঁক করছে। ডাক্তার ছাড়া ডাক্তারনীকে কে দেখবে? তাদের একজনকে নিলে তার প্রতিপত্তি কত না বেড়ে যায়। বাবাকে যদি বাজারে নামতে দেয় আরো কত শাঁসালো জাঁকালো পাকড়াও করতে পারেন। তবু সব প্রলোভন ফেলে কেন সে এই এক চিলতে একটা মেয়েকে অশেষ মূল্য দিয়ে বসেছে? ইচ্ছে করে, চেষ্টা করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তুলে নেয় মন, কিন্তু পারে না কেন? কী এমন আছে মেয়েটার মধ্যে যা সে জানে না? কী আছে দেখবার যা বইয়ের পৃষ্ঠায় লেখা নেই? তবু সব জানবার পরেও কেন আবার থেকে যায় অজানা, কী না-জানি আছে, যা বইয়ে লেখা নেই, যা সম্পূর্ণ হিসেবের মধ্যে

থেকেও হিংসেরও বাইরে? কেন পারে না মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে? কেন বারে বারে ঘুরে-ঘুরে মন ঐ চোখ দুটির উপরে এসেই বসতে চায়? কেন ঐ চোখ অহর্নিশ মর্মকে কীটের মত কাটছে।

বাজে কথা। আসলে ওর ভঙ্গিতে যে ঔদাস্য জাগিয়ে রেখেছে তাকে বিধ্বস্ত করবার সঙ্কল্পেই সুজিতের এই অভিযান। ওর যেন খুব বেশি সুখ, সৌরভে-গৌরবে ভরে আছে। কোথাও ওর অভাব নেই অভিযোগ নেই—স্পৃহা-ইচ্ছা নেই, এই অহঙ্কার যেন গায়ে জ্বালা ধরায়। ও কোনো একটা দুঃখ পাক এ ভাবতেই যেন আনন্দ। ও দুঃখ পেলেই তো অন্যের দুঃখকে অনুভব করতে পারবে। অলক্ষ্যে একটু বা ঘনিষ্ঠ হতে পারবে সুজিতের।

এ বাড়িতে ও আর আসে না, তাই বলে অভিমানে সুজিত ও-বাড়ি যাবে না এ কথা সুজিত ভাবতেও পারে না। এ বাড়িতে ওর না-আসার তবু একটা কারণ আছে—অভিজিৎ সেটা পছন্দ করেন না—কিন্তু ও-বাড়িতে সুজিতের না-যাওয়ার কোনোই কারণ নেই, বরং সে আসুক ও-বাড়ির সকলেই তা চায়, পাঞ্চালীও চায়। পাঞ্চালী আর-আরদের মত সিনেমা-থিয়েটারে যাবে না, যাবে না বেড়াতে, মাঠে-ঘাটে, রেস্টুরাণ্টে, বাড়ির মধ্যে, বেশির ভাগ সময় রান্নাঘরেই বন্দী হয়ে থাকবে, তখন যেটুকু দেখবার, বলবার বা কাছাকাছি হবার তা ঐ চার দেয়ালের আবরণে। সুজিত এলে বাড়ির লোকেরা অবশ্যি ঘর যথাসাধ্য ফাঁকা করে দেয়, এবং পাঞ্চালীর সমর্থন আছে তেমন যদি কিছু অমিতাচারও করে তাতে তারা আপত্তি জানাবে এমন ভাবও দেখায় না। তবু জাগা মানুষের বাড়ি, পা ছমছম করে। কেন কে জানে, অজাগা মানুষের মাঠ হলেও বুঝি পা ছমছম করত।

সন্ধেসন্ধি পাঞ্চালীদের বাড়িতে ঢুকে পড়ল সুজিত। ঠিক রান্না ঘরে আছে পাঞ্চালী। ঠিক অগোছালোর মধ্যে সেই পারিপাট্য। সেই হাসির টুকরো ঠোঁট। চোখে সেই শাশ্বত জ্যোৎস্না।

'যখন বাড়ি থাকবে না তখন আশ্রমে, আর যখন বাড়ি থাকবে তখন রান্নাঘরে।' সুজিত বাইরে দাঁড়িয়ে বললে।

'নয়তো জগৎ আসনে।'

'হাসছ কী। একটু সময়ও তোমার ফাঁকা নেই যে গল্প করি।'

'ঢের-ঢের সময় আছে।' তুমি ও-ঘরটাতে গিয়ে বোসো না, আমি রান্না করতে-করতে কত গল্প করবো দেখো। তুমি তো আজকাল কত কম আস।'

একটুখানি বারান্দা পেরোলেই শোবার ঘর, স্যাণ্ডেল বাইরে রেখে ভিতরে ঢুকল সুজিত। সকালী পড়ছিল, কিছু বলতে হল না, উঠে চলে গেল। তক্তপোশে বিছানা পাতা ছিল, খানিকটা তুলে দিয়ে বসবার জায়গা করল সুজিতের। সুজিত জিগগেস করল, 'এটা কার বিছানা?'

'এ তক্তপোশে মা আর সকালী শোয়।'

'আর তুমি?'

'আহা, জানো না বুঝি?'

মনে হল যেন কোন রাজার পালঙ্কে শোয়। কোন রাজেশ্বরের বুকের উপর।

'বা, আমি কী করে জানব?' সুজিত তাকিয়ে রইল অবাক হয়ে।

'আমি মেঝেতে শুই।'

'মেঝেতে!' আঁতকে উঠল সুজিত।

'হ্যাঁ, খুব শান্তিতে ঘুমুই।' সেই অতল তৃপ্তির শান্তিটি অন্ধশক্তির আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল : 'ঘুমিয়ে পড়লে পরে এটা মেঝে না তক্তপোশ তা আর খেয়াল থাকে না।'

'কেন তোমার এত ভুল করবার মানে কী?'

'বা, ভুল কোথায়? তুমি তো জানো, সুখ তো বস্তুতে নয়, সুখ মনে। আমার মন যদি বলে আরাম, তবে ঘরের মেঝে আমার করবে কী? দাঁড়াও, একবার দেখে আসি হাঁড়িটা।' ত্বরিত পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল পাকালী, আবার হাত মুছতে-মুছতে বেরিয়ে এল। বললে, 'আমার খবর ঢের হয়েছে, এখন তোমার খবর বলো। সাধুবাবার দেখা পেলে?'

'না।' বিনম্র কণ্ঠে সুস্মিত বললে, 'আরো অনেক কিছুরই দেখা পেলাম না।'

'কী পেলে না?' এতটুকু ভয় নেই, পাকালী দস্তুরমত এগিয়ে এল : 'কিসের দেখা?'

'তোমার একটি মহৎ ইচ্ছার দেখা আজও পেলাম না।'

'কী ইচ্ছা?'

কী করে বোঝাবে কী ইচ্ছা, কিসের ইচ্ছা? সুস্মিত ছটফট করে উঠল, বললে, 'আচ্ছা পাকালী, বারে-বারে একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে হয়, শুধু বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্যে, তুমি তো আমাকে ভালোবাসো, অপার স্নেহ করো—তা আমি বুঝি '

'স্নেহের মত অপরূপ আর কী আছে?'

'এই স্নেহের সঙ্গে সৃষ্টির ইচ্ছাটুক মেশাও না কেন?'

'সৃষ্টির ইচ্ছা—' কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল পাকালী।

'প্রত্যেক সৃষ্টির পিছনেই তো একটা কামনা থাকে। সেই কামেচ্ছাটুকু তোমার স্নেহে এসে মেশাও না কেন? তা হলেই তো প্রেমের জন্ম হয়।'

ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে রইল পাকালী। বললে, 'আমার সে ইচ্ছা আসে না।'

'কেন আসে না? তাকে কি অস্বাভাবিক মনে হয়?'

'তা কেন? রক্তের মধ্যে মিশে আছে, খুবই স্বাভাবিক।'

'তবে কি অপবিত্র মনে হয়?'

'যা স্বভাবের জিনিস তাকে অপবিত্র বলি কী করে?'

'তবে আমিই কি অনুপযুক্ত?' হতাশ মুখে তাকাল সুস্মিত।

'তুমি নিজেই জানো, তুমি কামনীয়তম।'

'তবে?'

'তবে সে ইচ্ছা আসতে চাইলেও আসতে দিই না।' 'স্বচ্ছ মুখে বললে পাকালী, 'বাইরে হাড় করিয়ে রাখি।'

'কেন?'

'আমার আরেক রোমাঞ্চময় জীবনযাপনের ইচ্ছা।'

'সে আবার কী?'

'সে এক দুঃসাহসিক অভিযান। অতীন্দ্রিয় জীবন—'

'এটা আবার কোত্থেকে শিখলে?' ঠাট্টা করে উঠল সুস্মিত।

'এই চারদিক দেখে-শুনে।' দিব্যি তরল মুখ পাকালীর।

'তুমি আবার দেখলে-শুনলে কী? তোমার অভিজ্ঞতা কতটুকু?'

'কাণাকড়িও নয়। সাংসারিক অভিজ্ঞতার কথা বলছ তো? দাঁড়াও—' রান্নাঘর থেকে পাকালী আরেক দফা ঘুরে এল। আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে বললে, 'সাংসারিক অভিজ্ঞতা চুকে পড়লে তো অতীন্দ্রিয়তার পথে বাধা পড়লো।'

'আগে ইন্দ্রিয় হোক পরে অতীন্দ্রিয় হবে।'

'রাধা-মা বলেন, যৌবনের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গেই মানুষের ঈশ্বর-পথে চলে আসা উচিত।'

'লেখাপড়া ফেলে কাজকর্ম ফেলে সকলেই আসবে?' প্রায় লাফিয়ে উঠল সুজিত।

'সকলেই কি এক কাজ করে? এক পথে চলে? সকলেই কি ডাক্তারি করে না আমার মত রান্না করে?' সুন্দর হাসছে পাকালী: 'তেমনি সকলেই আর ঈশ্বর-পথে চলবে না। তবে যারা চলবে—'

'তা তোমার কি যৌবনের উন্মেষ হয়েছে?'

'যদি মনে করো হয়নি তাহলে তো চুকেই গেল—তাহলে ঐ ইচ্ছা-টিচ্ছার কথা ওঠে কেন? যদি মনে করো যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে চলে এসেছি—'

'ও বাবাঃ, অভিমানটুকু আছে। কিন্তু,' সুজিত বললে, 'কিন্তু, অতীন্দ্রিয় বলতে তুমি কী বোঝ?'

'কিছুই বুঝিনা। বুঝলে পরে তো হয়েই গিয়েছিল।' আবার ললিত লহরে হাসি পাকালীর।

'কী হয়ে গিয়েছিল? কাঠ না পাষাণ?'

'সে অবস্থায় পৌঁছুলে কাঠ না পাষাণ কি কিছু আলাদা থাকত?'

'সেই অবস্থায় পৌঁছুবার জন্যেই বুঝি মেঝেতে শোও, নিরামিষ খাও আর আমি আসলে অমনি টান হয়ে বসে মুখ লম্বা করে জপ করো।'

'মুখ লম্বা করিনা গোল করি আয়নায় একবার দেখতে হবে তো?'

'চোখ বুজে থাকলে কী করে দেখবে?'

চোখ বুজে থাকি তাও দেখে গেছ বুঝি?

'হ্যাঁ, চোখ বুজেই তো আছ। আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো,' ছুঁই-ছুঁই ইচ্ছা হল সুজিতের: 'আয়নায় তুমি কখনো তোমার মুখ দেখ?'

'আমার আয়নাই নেই।' হাসির লহর বেগে বাসে সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিল পাকালী।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সুজিত। বললে, 'তোমার এই বনের মোষ তাড়িয়ে, মানে এই অতীন্দ্রিয়ে লাভ কী?'

'তা যদি বলো তোমার এই দেহসর্বস্ব জীবনেই বা লাভ কী? আসল কথা কী জানো?' আবার রান্নাঘরে কী টুকিটাকি সারতে গেল পাকালী, এবার বুঝি বেশ খানিকটা দেরি করে এল।

'কী আসল কথা?'

'ও! সেটা তোলনি বুঝি? আসল কথা, আমার হাতে বিয়ের কোনো রেখা নেই।'

'কই দেখি কেমন নেই?' সুজিত শক্ত হাত বাড়াল।

'তুমি হাত দেখতে জানো নাকি ?' কয়েক পা সরে গেল পাঞ্চালী।

'যে বলেছে রেখা নেই তার চেয়ে ভালো দেখতে পারি।'

'তার মানে রেখা আছে', এই তো ? সে তো তুমি অন্ধকারেই বলতে পারো। হাত দেখার আর তবে কী দরকার ?'

অথচ জোর করে হাত ধরে কাছে টেনে আনার শক্তি পেলনা সুস্মিত। তুচ্ছ হাত ধরবার জন্যে অনুমতি চাইতে গেল।

'তার মানে, তুমি বিয়ে করবে না জীবনে ?'

'সবাই বিয়ে করবে এমন কী মানে আছে ?' চোখ নিচু করল পাঞ্চালী : 'কত মেয়ের বিয়ে তো হয়ও না। আমারও না হল !'

'তোমার বেলায় হওয়া তো তৈরি। হলেই হয়। তোমার বেলায় হওয়া নয়, তোমার বেলায় করা। তুমি করবে না। করলেও আমাকে না।'

'তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে !' ঘরের অন্ধকার দিকটায় একটু সরে গেল পাঞ্চালী।

'বুঝেছি।' উঠে পড়ল সুস্মিত : 'তোমার গুরু-মা বিয়ে করতে বারণ করে দিয়েছেন। যেমন পুরী যাওয়া বারণ করেছিলেন। আর তুমি তাই মানছ অক্ষের মত।'

'ঠিক, অতটা নয়। তবে গুরু-মা বলছেন, ব্রহ্মচর্যই একমাত্র তপস্যা। একমাত্র স্থায়ী আনন্দ। তুমি তো আমাকে ভালোবাসো' আলোর দিকে মুখ করল পাঞ্চালী : 'তবে আমাকে একটু সাহায্য করো না।'

'আমি যে তোমাকে ভালোবাসি সেটা তোমার শরীরটাকে বাদ দিয়ে নয়। তোমাকে তোমার অস্থিমাংস মেদমজ্জা রক্তমেদ সমস্ত নিয়ে ভালোবাসি। আমার ওসব নিষ্কামে সহানুভূতি নেই।'

'তবে বেশ, প্রতীক্ষা করো, দেখি আমার মধ্যে সেই অন্ধ ইচ্ছাটা জাগে কিনা, পারো কিনা জাগাতে—'

অন্ধকারের দিকে তবু একগুলো না সুস্মিত। থমথমে মুখে বাড়ির দিকেই ফিরে চলল।

পাঞ্চালী ঢুকল রান্নাঘরে।

আর বাড়ি ফিরে এসে দেখে, এ কী অভাবনীয়, মার ঠাকুরঘরে এক সাধুবাবা বসে।

'ইনিই সেই ?' ইশারায় জিগগেস করল সুস্মিত।

'হাঁ, আমিই সেই। কেউ বলে, দুর্গানন্দ কেউ বলে দুর্গত্যানন্দ। কী, বলছিলাম না,' মাধবীর দিকে তাকাল সাধু, 'তোমার ছেলে এসে পড়বে। ঠিক এসে পড়েছে। এত আমাকে খোঁজাখুঁজি করেছে তার সঙ্গে দেখা না হয়ে কি পারে ?'

মাধবী ইশারা করছিল বটে, তার উত্তরে নয়, নিজের প্রেরণাতেই সুস্মিত সাধুকে প্রণাম করল।

সাধু বললে, 'এমনিতেই আমি কখনো, কিন্তু কেউ ডাকলে, জিজ্ঞাসা করলে, এখানে-ওখানে খোঁজাখুঁজি করলে আসতে মধুর লাগে।' সুস্মিতকে আপাদমস্তক দেখল একবার সন্দেহে, বললে, 'তোমার ছেলে খুব বড় হবে, মা।'

এমনিতেই তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে মাধবী, তার ছেলে বড় হবে মহাপুরুষের মুখের কথায় কোন্ মা না খুশি হয়। বললে, 'আপনি যে ওকে ভালো করেছেন ও তা মানতে চায় না—'

'ও যে মানতে চায় না, ও ঠিকই করে।' শিশুর মত হাসতে লাগল সাধু: 'ভালো করবার যিনি মালিক সেই ভবরোগবৈদ্য শিবশম্ভু ভালো করেছেন।'

উঠে পড়ল সাধু। সময় হল এবার যাই।

'এ নিয়ে ঘরে-বাইরে কোথাও কোনো হৈ-চৈ কোরো না। হরি সাক্ষাৎ গোপনীয় জিনিস কোথাও প্রকাশ করতে হয়না। তোমার সময় হয়েছে তুমি পেলে, তাতে অন্যের কী। জানাজানিতে আত্মপ্রচার আসে। ওটা মারাত্মক বাধা।'

'না, না, নিজের মাঝে গোপনীয় রাখব।' মাধবী বললে গাঢ়স্বরে।

দুর্গানন্দ আবার সব মনে করিয়ে দিল। দিন-ক্ষণ, উপকরণ। উপাচার সামান্য পুজাও যৎকিঞ্চিৎ।

'আবার আসবেন?'

'আসব বৈকি। তুমিও যাবে।'

'আমাকে যেতে বলবেন না।' লঘুস্বরে বললে সুস্মিত, 'শুধু আপনাকে খুঁজতে গিয়ে কলেজের রাজনীতি ছাড়তে হয়েছে, এখন যদি সত্যসত্যি আপনার আশ্রয়ে গিয়ে উঠি, তাহলে আমার সব যাবে।'

'সব যাবে না সব থাকবে।' হাসতে লাগল দুর্গানন্দ: 'কত নীতি আসবে কত নীতি যাবে, তুমি তোমার নীতি ছাড়বে না।'

মাধবী আর সুস্মিত দুজনেই প্রণাম করল সাধুকে। সাধু গুটি-গুটি বেরিয়ে হাওয়ার মত বেগে শাঁ শাঁ করে ছুটে মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

কী করে কী হল মা? ব্যাকুল হয়ে জানতে চাইল সুস্মিত।

বিকেলে বেরিয়েছিল মাধবী, সন্ধেসন্ধি বাড়ি ফিরে দেখল গেট পেরিয়ে দরজার কাছে একটা সাধুমতন লোক তালপোল পাকিয়ে বসে আছে। মাধবী ভাবল বুঝি ভিক্ষুক হবে। ধমক দিয়ে উঠতেই চকচকে চোখে হেসে উঠল সাধু, উঠে দাঁড়াল। আর চিনতে দেরি হল না মাধবীর। সেই তুমি? আমার আরাধনার সারনাথ?

সাধুর হাত ধরে প্রায় টেনে উপরে ঠাকুরঘরে নিয়ে এল মাধবী। পায়ের উপর মাথা লুটিয়ে দিয়ে উন্মাদের মত কাঁদতে লাগল।

দুর্গানন্দ বললে, 'তোমার সময় হয়েছে, তোমাকে দীক্ষা দিতে এসেছি মা।'

মাধবীর রাধা-নয়ে কথা মনে পড়ল। তোমার গুরু আসছেন। ভক্তি ঐকান্তিকী হলেই আবির্ভূত হবেন তিনি।

গুরুকরণ ছাড়া কিছু হবার নয়। দীক্ষায় দেহ শুদ্ধ করে না নিলে মন্ত্রবীজ ফল ধরবে কী করে? গুরু ছাড়া কে অন্ধকার দূর করবে, আনবে সেই পরম চেতনা? কে ভাগবত দীপ জ্বালবে? কে দেবে ব্রহ্মজ্ঞান? কে ভগবানকে দর্শন করিয়ে দেবে?

মাধবীর পুজার ঘরে এত ঘট-পট-মূর্তি কেন? তাই সব জবড়জং এলোমেলো হয়ে পড়ছে। মন একাগ্র হয়ে লক্ষ্যে নিবদ্ধ হতে পারছে না। অত বাহুল্যের মধ্যে সে কেন থাকবে? সে একেই লগ্ন একেই মগ্ন হয়ে থাকবে। আর সেই এক কে? সে একই গুরু। আর যখন সে একবার গুরু তখন সে ভগবান। গুরুই তারকব্রহ্ম। মন্ত্রগুরু শ্রীমদ্‌গুরু।

'মা, বাবা তখন কোথায় ?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিগগেস করল সুস্মিত।

'তিনি তো চারটের সময় বেরিয়েছেন—'

'তাঁকে সাধুর কথা বলবে ?'

'তুই কী বলিস ?'

'আমি বলি, বলে কাজ নেই। দীক্ষা হয়ে যাক তারপরে বোলো।'

'সেই ভালো কথা।' আশ্বস্ত হল মাধবী।

'নইলে যেমন খাপ্পা লোক, দীক্ষায় বাধা দিয়ে বসবেন।' সুস্মিত আরো সন্নিহিত হল: 'দীক্ষার সময় কখন ঠিক হয়েছে ?'

'বেলা দশটায়।'

'যাক, বাবা তখন বাড়ি থাকবেন না। রুগী দেখতে বাইরে থাকবেন। নইলে সাধুর যা হাড়-গোড়বার করা চেহারা, আর যা সব গলায় মালা আর মাথায় জটা—বাবার পিত্তি জ্বলে যাবে—

'একজন তবু ঝকঝকে চকচকে চেহারার স্বামীজি হলে ওঁর প্রেস্টিজ থাকত।'

'আরো ভালো করেছ না, নাসিমাদের যে খবর দাওনি।' যেন একটা প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে এমনি আনন্দের থেকে সুস্মিত বললে।

'তবে তুই বলছিস পাকাশীকেও বলব না ?' মাধবী একটু যেন ফাঁপরে পড়লেন।

'না। ওদের রাধা-না আছে, আমাদের বাবা দুর্গানন্দ থাক। দেখি কে জেতে!'

আমাদের বাবা দুর্গানন্দ থাক। ছেলের কথায় উছলে পড়ল মাধবী। তবে বুঝি গুরুকৃপায় ওর মধ্যে বিশ্বাসের অঙ্কুর জাগল।

'তুই ঠিক বলেছিস। যার যা তার তা।'

গুরুবাক্যে বিশ্বাসই বিশ্বাস। গুরুর কাছে প্রাপ্ত মন্ত্রই সিদ্ধমন্ত্র। গুরুর আশ্রয়ই সব চেয়ে নিরাপদ। গুরুই জীবনের একচ্ছত্র সম্রাট।

দিনে-ক্ষণে ঠিক চলে এসেছে দুর্গানন্দ। অভিজিৎ রুগী দেখতে বেরিয়েছেন। কৌতূহলী হয়ে লাভ কী, নিজের ঘরে পড়ায় ডুবে আছে সুস্মিত। দীক্ষা হয়ে যাবার পর মা নিজেই ডেকে নেবেন। যদি সাধু দয়া করে তাকে একটু সময় দেয় তবে সাধুকে সে তার কটা দুঃখের কথা নিবেদন করে। সাধু তো কঠিন ব্যারাম সারাতে ওস্তাদ। যৌবনে পৌঁছেও স্বাভাবিক কামেচ্ছার অভাবও তো ব্যাধি। সাধু সেই ব্যাধি সারিয়ে দিতে পারে না ? এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে পারে না এই অস্পৃহা।

পূজার ঘরে ঢুকে দুর্গানন্দ বললে, 'দরজা বন্ধ করো।'

দরজা বন্ধ করল মাধবী। সাধুর গলায় মালা দোলাল।

'এই সব ঘট-পটের জঞ্জাল সরিয়ে ফেল। এ সবের পরিবর্তে কী মূর্তি বসবে আমি দীক্ষান্তে তোমাকে দিয়ে যাব।'

সমস্ত মূর্তি-বিগ্রহ একটা বাক্সে গিয়ে উঠল। সমস্ত সাজ-পাট আসন-কোসন। ওরা তো সমস্ত অতন্ত্র, অচৈতন্য। তোমার দীক্ষার পরে ওদের আনতে চাও তো এনো, কিন্তু ওরা অবান্তর। এখন ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।

দীক্ষা হয়ে গেল।

দুর্গানন্দ আজ কাঁধে একটা ঝুলি নিয়ে এসেছে। এই ঝুলির মধ্য থেকে বার করল বাঁধানো একটা ফটো।

'কী, চিনতে পারো?' দুর্গানন্দ হাসতে লাগল।

'এই তো আমার গুরু, আমার ভবপারের কর্ণধার! ফোটোকে কপালে এনে ঠেকাল মাধবী। কপোর রিক্ত চৌকিতে ভক্তিভরে বসাল পটকে। ফুল দিল।

দুর্গানন্দ বললে, 'আর কিছু নয়, শ্রদ্ধাবীর্যেই জপের অমোঘশক্তি। আর জানবে গুরুই তোমার সহায়, শরণ সুহৃৎ, সর্বদা তোমার সম্মুখে সমাসীন।'

আমি এবার তবে যাই। দাঁড়ান, আপনার পায়ের ধুলোনি ছাপ রাখি।

আর দক্ষিণা?

বাইরে থেকে বন্ধ দরজায় ঘা মারছেন অভিজিৎ। খোলো, খোলো। পূজার ঘরের দরজা তো কোনোদিন বন্ধ হতে দেখিনি। এ আবার কী নতুন ঢং!

সে একবার বন্ধ করেছিল মনে আছে। এক বন্ধ সন্ন্যাসীর হিংস্র চিৎকারে দরজা খুলে দিয়েছিল। অভিজিতের ইচ্ছে হল অমনি একবার গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে ওঠে। তাহলেই বুঝি খুলে যায় দরজা।

ডাক্তার শুধু রুগী দেখতেই বেরোয় না, উকিল সাক্ষাতে বেরোয়। বিষয় যখন বিষ হয় তখন সে বিষের ডাক্তার আবার উকিল। তেমনি একটা বৈষয়িক চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অভিজিৎ উকিল-বাড়ি গিয়েছিল। উকিলের টাকা ডাক্তার অনেক পেয়েছে, ডাক্তারের টাকা এখন উকিলে খাচ্ছে। কই টাকা দিন। উকিলের কি ডাক্তারের চেয়েও বেশি। অভিজিতের টাকায় কিছু কম পড়েছে। তাই বাড়ি এসেছে মাধবীর খোঁজে। টাকার চাবি মাধবীর আঁচলে।

আগে-আগে কখনো-সখনো পুজোর মধ্যেও মাধবীকে নড়িয়ে দেওয়া গিয়েছে। পুজো করতে-করতেই জরুরি কথা সেরে নিয়েছে। দরকার হলে আঁচলের থেকে খুলে দিয়েছে চাবি। নয় নয় করে সেরেছে। কতদিন মাঝপথেই উঠে পড়েছে আসন ছেড়ে। বলেছে, যেটুকু হল, সেইটুকুই লাভ। আমার তো দীক্ষা-নেওয়া বৈধী পুজো নয়, নিজের মনগড়া এলেবেলা পুজো। আমি কোনো বাঁধাবাঁধির মধ্যে নেই। আমার ইচ্ছা পুজো।

কিন্তু আজ একেবারে দরজায় খিল চাপানো কেন? কই কার কোনো অসুখ তো নেই বাড়িতে? নিজের অসুখ?

'খোলো। খোলো। টাকার দরকার। উকিলের ঘাঁই চারটে ডাক্তারের সমান।' ঘন-ঘন কড়া নাড়ছেন অভিজিৎ।

এ কী, শুনতে পাচ্ছে না নাকি? এত কী তন্ময়তা!

শালীনতা বুঝি আর থাকল না। অভিজিৎ আরো—

দরজা খুলে দিল মাধবী।

কিন্তু কার প্রতি অভিজিৎ ক্রুদ্ধ হবেন? ঘরের মধ্যে ওটা কে? বিসদৃশ, প্রায়-উলঙ্গ জটাজুটের জঙ্গল কে ওটা ভূতপ্রেত?

প্রসন্ন মুখে মাধবী বললে, 'ইনি সেই খোকার অসুখের সময় এসেছিলেন—'

'এখন আবার এসেছেন কেন?' কোথাকার রাগ কোথায় এনে ফেললেন অভিজিৎ: 'এখন আবার কার অসুখ?'

'ওঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিলাম।'

'কিন্তু ওর সঙ্গে যোগাযোগ করলে কী করে? একেবারে দরজা বন্ধ করার মত যোগাযোগ?' শুধু রাগ নয়, মনের কোণ থেকে আরো কিছু কদর্য পাক তুললেন অভিজিৎ।

আনন্দভরা মুখে দুর্গানন্দ বেরিয়ে এল। উদাত্ত কণ্ঠে বলতে বলতে: গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।'

'আপনি কার হুকুমে এ বাড়ি ঢুকেছেন?'

'সেদিন যার হুকুমে ঢুকেছিলাম—'

'কিন্তু ভদ্রমহিলার সঙ্গে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করলেন কোন নিয়মে?'

চেঁচিয়ে উঠল মাধবী: 'আমাকে দীক্ষা দিলেন যে।'

'ঘর বন্ধ করে এ কী রকম দীক্ষা?' হঠাৎ সুজিতের উদ্দেশে হাঁক পাড়লেন অভিজিৎ: 'খোকা! খোকা!'

সুজিত ছুটে এল।

'এ লোকটা কখন এসেছে জানিস? এমন অসভ্য, পুজোর ঘরে দরজায় খিল দিয়ে বসেছে।'

সুজিত কী করবে কী বলবে কিছু স্থির করতে পারল না।

দুর্গানন্দ এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে, মুখে সেই গুরুস্তোত্রের ছত্র: 'গুরুর্ব্রহ্মা, গুরুর্বিষ্ণু, গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ—'

'দাঁড়ান, দক্ষিণা দেওয়া হয়নি—' মাধবী কেঁদে উঠল।

'দক্ষিণা? টাকা? একবার উকিলকে টাকা আরেকবার সন্ন্যাসীকে!' অভিজিৎ গর্জে উঠলেন: 'অসম্ভব।'

দুর্গানন্দ নেমে যেতে লাগল।

'চরণের ছাপ! চরণের ছাপ!' মাধবী আকুল হয়ে উঠল।

'ঐ চরণের ছাপ নিয়ে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখবে? তুমি না এককালে শান্তিনিকেতনে পড়েছিলে? তোমার এই রুচি?'

আনন্দে স্তোত্র বলতে-বলতে নেমে গেল দুর্গানন্দ: 'ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং। মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা।'

মাধবীও অনুসরণ করতে চাইল। সুজিত মাকে ধরে ফেলল।

অভিজিৎ বললেন, 'কতদিন বলেছি এ সব জঞ্জাল বাড়িতে এনো না, বাইরে যা খুশি করোগে। একটা ডাক্তারের বাড়িতে এসব ভূতের নৃত্য অসহ্য।'

বলতে-বলতে জুতো পায়েই পুজোর ঘরে ঢুকলেন। এবং ঢুকেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। ঘর একেবারে ফাঁকা। সমস্ত দেবদেবী লোপাট হয়ে গিয়েছে। আর উনি ওখানে কে বসে আছেন? আরে এ যে সেই অমূলেটার ছবি! কী স্পর্ধা! কী অন্যায়! কী অপমান!

ইচ্ছে হল জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন ফটোটাকে। মাধবী ছুটে এসে ফটোটা বুকের মধ্যে তুলে নিল।

অভিজিৎ বললেন, 'দুশোটা টাকা বের করে দাও।'

আঁচল থেকে চাবিটা মেঝের উপর ছুঁড়ে দিল মাধবী।

অভিজিৎ কুড়িয়ে নিয়ে নিজেই আলমারি খুলে টাকা বের করল। চাবিটা মাধবীর হাতে ফেরত দিতে এলে মাধবী নিল না। হাত গুটিয়ে রইল।

পরদিন বেলা প্রায় এগারোটা, অভিজিৎ কল্‌এ, সুজিত কলেজে, মাধবী পুজোর ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। গুরুর ফটো রাখল সেই চৌকির উপর, দেয়াল ঘেঁষে। নতুন বস্ত্রে জলতুলসী সারল। তারপর নিজের গায়ে কেরাসিন ঢালল। প্রণামের ভঙ্গিতে নুয়ে পড়ল সেই ফটোর সামনে। নিজেই দেয়াশলাই জ্বেলে ধরিয়ে দিল আগুন।

দেখতে-দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ফায়ারম্যান এল, পুলিশ এল। সুজিত এল। অভিজিৎও এসে পৌঁছুলেন।

দরজা ভেঙে ফেলা হয়েছে। কিছুই করবার নেই।

কিন্তু একটা জিনিস দেখবার আছে। আগুনে দগ্ধ হয়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে মাধবী কিন্তু তার প্রণামের ভঙ্গি থেকে সে এক চুল বিচ্যুত হয়নি। যেমন উপুড় হয়েছিল তেমনি উপুড় হয়ে আছে। আরো লক্ষ্য করবার, আগুন ঘরের আর সব জিনিস পুড়িয়েছে, চার দিকের দেয়াল লেহন করেছে, কিন্তু চৌকির উপর গুরুর ফটোকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনি। গুরু অক্ষত অবস্থায় অগাধ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছেন।

অভিজিৎ পাগলের মত হয়ে গিয়েছেন। যাকে পাচ্ছেন তাকেই ধরছেন, তাকেই বলছেন, 'কেউ তোমরা সাধুবাবাকে নিয়ে আসতে পারো? তিনি একবার আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন, তিনি ইচ্ছে করলে আমার স্ত্রীকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন।'

কোথায় দুর্গানন্দ? দিনের পরে দিন যায়, সুজিত এখানে খোঁজে ওখানে খোঁজে। ইছাপুর যায় ক্যানিং যায় বাগনান থেকে ঘুরে আসে।

পাকালীই থেকে-থেকে এসে দেখে-শুনে দিয়ে যায়।

অভিজিৎ এখন নরম হয়েছেন, পাকালীকে বলছেন, 'তোমার মাসিমার খুব ইচ্ছে ছিল তুমি এ সংসারে লক্ষ্মী হয়ে বসো।'

পাকালী বললে, শ্রীগুরুর ইচ্ছা ছাড়া কিছু হবার নয়।'

কিন্তু কোথায় সেই জ্ঞানদাতা?

'সব তছনছ হয়ে গেল।' অভিজিৎ নিস্তেজ কণ্ঠে বললেন, 'সুজিত শেষ পরীক্ষাটা দিলে না, আমিও আর প্র্যাকটিসে মন পাচ্ছি না, তোমার মাসিমাও চলে গেল। তোমার আর এ সংসারে আকর্ষণ হবে কেন?'

পাকালী বললে, 'শ্রীগুরুর ইচ্ছে হলে সব হবে।'

কিন্তু কোথায় সেই সর্বজীব শিব?

সুজিতের কাছে এসে দাঁড়াল পাকালী। বললে, 'একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'একবার আমার রাধা-মার কাছে যাবে?'

'তোমার গুরু-মার কাছে।'

'হ্যাঁ।'

'কেন বলো তো?'

'তাঁর কাছে নাসিমা একবার গিয়েছিলেন।' আর্দ্র চোখে বললে পাকালী: 'রাধা-মাই বলে দিয়েছিলেন, যিনি নাসিমাকে মন্ত্র দেবেন তিনি আসছেন। দেখলে, ঠিক এসেছিলেন। তুমি গেলে তোমাকে আবার বলে দিতে পারেন, আসছেন কিনা। এলে কবে আসবেন। যাবে?

'যাব। তুমি?'

'তুমি একা যাও।' পাকালী বললে, 'আমি আমার মনে যাব।'

'তাই ভালো। একা যাব। কবে যাব?'

'যেদিন খুশি।'

একদিন সকালে সুস্মিত চলল আশ্রমের দিকে। পাকালী বললে, 'দাঁড়াও, তোমার কপালে শ্বেত চন্দনের তিলক এঁকে দিই।'

বাধা দিলনা সুস্মিত। পাকালী আঙুলে করে সুস্মিতের কপালে ফোঁটা এঁকে দিল।

আর সুস্মিত যখন রাস্তায় নামল, দরজায় দাঁড়িয়ে রইল পাকালী। যতদূর চোখ যায় চোখ তুলে নিল না। আর মনের মধ্যে গুঞ্জরন করে ফিরতে লাগল সেই গানের কলিটা:

'চল চল ঝাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায়।'

সৈন্যাধ্যক্ষ ধরে এনেছেন জনকুড়ি তরুণকে। তাদের মধ্যে কে জোসেফ ম্যাটসিনি সেটা জানতে চাইলেন তিনি।

সব নিরুত্তর। তাইতে রেগে তিনি হুকুম দিলেন: মার সবাইকে একসঙ্গে।

অমনি একদল সৈন্য বন্দুক উঁচিয়ে এল তাদের সামনে।

ঠিক সেই সময়ে একজন তরুণ কোথা থেকে সেখানে ছুটে এলেন, বল্লেন: জোসেফ ম্যাটসিনিকে খুঁজছেন? আমিই সেই।

—তবে তুমিই মর।

তরুণ বুক চিতিয়ে বন্দুকের সামনে দাঁড়ালেন।

—বড্ড সাহস দেখছি যে তোমার যুবক! তারপর কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বললে যাক, তোমাকে আর মারা চলবে না দেখছি।

এবার হেসে উঠলেন সৈন্যাধ্যক্ষ।

মেয়েরা এমনই হয়

সুলেখা দাশগুপ্ত

কলেজ জীবনে অনেক রঙিন ছবি এঁকেছিল কৃষ্ণা আর সঞ্জীব। এমন সব রঙিন ছবি আঁকবার মতো রংএর উপকরণ ওদের হাতের কাছে কিছুই ছিল না। তবু ওরা এঁকেছিল। সবার চোখে বসে। লেকের ঘাসে বসে। পার্কে বেড়াতে বেড়াতে। ইউনিভারসিটিতে ক্লাশ করবার ফাঁকে চোখে চোখে তাকিয়ে অসংখ্য ছবি এঁকেছিল কৃষ্ণা আর সঞ্জীব। কলেজ জীবনের সে সব ছবির কড়া রংএর পোঁচ বাস্তব জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক ফেকাসে হয়ে গিয়েছিল। আজ আর ওরা ঘাস রংএর টুসিটার গাড়ী ছুটিয়ে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড ধরে কাশ্মীরের ফুল্লু উপত্যকায় গিয়ে আঙুর খেতে শুয়ে আঙুর ফল খাওয়ার স্বপ্ন দেখছিল না। কিন্তু দুজনে দুরাত্মা বসে—সঞ্জীব কলকাতায় আর কৃষ্ণা ডিগবয় কাজ করতে করতে—চার দেয়ালের একখানা ছোট্ট ঘরের ভেতর এক শয্যায় যে স্বপ্ন এতদিন দেখছিল সেই স্বপ্নের ঘর ওদের যখন আজ সত্য করার সময় এলো সঞ্জীব যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল। যা-তা কাজ করতে করতে আজ পাঁচ বছর বাদে ব্যাঙ্কের ভালো কাজ পেয়ে গেছে সঞ্জীব। উপরিতে মাইনে ভালো। ভবিষ্যতের উন্নতি আরো ভালো। কৃষ্ণাকে লিখল, এক্ষুনি ডিগবয়ের কাজ ছেড়ে চলে এসো। এখানে কাজ মিলবে। না মেলে সঞ্জীব রায় পরোয়া করে না। স্ত্রীকে খাওয়াতে এবং পরাতে—দুটোই পারবে। মা বাবা বিয়ের দিন দেখেছেন। ব্যাপার যা দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে, আমার সবুর সইলেও বাবা মা'র সবুর সইবে না।

যদিও সঞ্জীবের এই চিঠির জন্য নয়। এ জন্য হলে হয়ত কৃষ্ণার আসতে আরো কিছুদিন দেরী হতো। কলেজের কাজ একমাসের নোটিশ না দিয়ে ছাড়া যায় না। সামনে ৺পূজার ছুটি। কী ভাবে নোটিশ দিলে বছের মাইনেটা ৺পূজার আগে যাবে না, সেটাই ভাবছিল কৃষ্ণা এমনি সময় মা'র কাছ থেকে জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে সে দিনই চলে আসতে হলো ওকে ছুটি নিয়ে। সঞ্জীব যখন কৃষ্ণাকে আশা করছিল তার আগেই এসে গেল কৃষ্ণা। সঞ্জীব আরো খুশী। যদিও সে ওদের পারিবারিক অশান্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুখের ভাব বিমর্ষ করেই রাখল কিন্তু ভেতরে ভেতরে সত্যি খুশী হলো। নইলে কৃষ্ণা কলেজী-সৌজন্য বজায় রাখতে আরো একমাস পার করে দিত। প্রথম মাসের বেতনের নতুন নোটের তোড়াটা বুক পকেটে গুঁজে সোজা চলে এলো সে কৃষ্ণার কাছে। বসবার ঘরে ঢুকে পেয়ে গেল কৃষ্ণাকেও। বেতের চেয়ারটা কৃষ্ণার দিকে কিছুটা টেনে এনে হুতকরে বসে পকেট থেকে নোটের তোড়াটা বের করে ফেলে দিল কৃষ্ণার কোলের উপর। বলল, প্রথম মাইনে আমার।

মলিন হাসল কৃষ্ণা। বলল, আমার কাছে কেন! তোমার হাতে নিয়ে দিও।

তা দেবো। সব আগে ভবিষ্যৎ গৃহিণীর কল্যাণ হাত ছুঁইয়ে নিয়ে যেতে এলাম।

টাকার তোড়াটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কৃষ্ণা বলল, বুঝলাম চাকরীটা গেল।

কেন?

আমার মতো অলুক্ষুণে আছে নাকি ? দেখছ না পাঁচ বছর ধরে তোমাকে কত ভোগাচ্ছি—আরো কত ভোগাব কে জানে।

এসব কথা আমার এতো বাজে লাগে। বড্ড মেয়েলী মনে হয়।

আমি মেয়ে।

মেয়ে—কিন্তু তাই বলে মেয়েলী হবে কেন। তারপর চকিত দৃষ্টিতে বাইরেটা একটু দেখে নিতে নিতে বলল, তোমার মা কোথায় ?

আছেন কোথাও ধারে কাছে।

তা ধারে কাছে থাকলেই বা কী—হাল্কা বেতের চেয়ারটা টেনে একেবারে কৃষ্ণার কোলের কাছে নিয়ে এলো সঞ্জীব। যেন সাবধানতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আবেগ ভরে কৃষ্ণার দুই হাত টেনে আনল কোলের ওপর। বলল, আর আমি দেরী করতে রাজী নই কৃষ্ণা—

আজই ? মুখের বিরক্তির উপর একটা সকৌতুক হাসির টান দিল কৃষ্ণা।

কিন্তু সঞ্জীব হাসল না। বলল, আমার তাই ইচ্ছে করছে। আজ কেন—এই মুহূর্তে তোমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে আমার ঘরে অধিষ্ঠিত করতে ইচ্ছে করছে। কৃষ্ণার হাত তুলে ঠোঁটে ছোয়াল সঞ্জীব। বলল, তোমার করছে না কৃষ্ণা ?

করছে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস আস্তে আস্তে বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলল কৃষ্ণা।

কিন্তু সঞ্জীবের উদ্‌গ্রীব কান তা ঠিক ধরে নিল। কৃষ্ণার এই শুভ্র মিষ্ট মুখ পীড়িত করতে লাগল তাকে। মনে মনে বলল, দাঁড়াও পালাচ্ছি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে। তারপর তোমার সুখের ভার আমার। এই মুখ কত হাসতে পারে আমি দেখব। একটি নারীকে একটি পুরুষ কত দিতে পারে আমি তা দেখব। কৃষ্ণার হাতের ওপর হাত বুলাতে বুলাতে সঞ্জীব বলল, মাকে বলি দিনটা ঠিক করে ফেলতে ?

মুখ নিচু করে কিছুটা সময় চুপ করে রইল কৃষ্ণা ; তারপর বলল, সঞ্জীব তুমি আর কিছু সময় দাও আমাকে।

কৃষ্ণার জবাব সঞ্জীবকে চমকে দিল। এই জবাবের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। সে নিশ্চয় ছিল কৃষ্ণা বলবে, বল। কৃষ্ণার হাত ছেড়ে দিল সঞ্জীব। আশ্চর্য কণ্ঠে বলল, কেন, সময় চাচ্ছ কেন ?

তুমি তো দেখছ আমাদের বাড়ীর অবস্থা। তুমি তো জান আমি মার জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে এসেছি……

নইলেও তোমাকে আমার জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে চলে আসতে হতো…

কে, তোমার প্রথম মাইনের টাকায় হাত ছোয়াবার জন্য ?

আমার সিরিয়াস কথাকে তুমি ঠেলে ঠেলে কেবলি, ঠাট্টার কৌতুকে কেন নিয়ে ফেলছ আমি বুঝতে পারছিনে। আমাদের বিয়ের কথাটা কী ঠাট্টার কথা ?

এবার কৃষ্ণা আবেগে ভেঙে পড়ল। বলল, সঞ্জীব এ দিনটার জন্য আমি পাঁচ বছর ধরে দিন গুণছিলাম। তুমি জাননা, তোমার বাবার কাজের কথা শুনে আমি আনন্দে একা ঘরে নেচে উঠেছিলাম। কিন্তু কোথা দিয়ে কী সব ঘটে গেল দেখলে তো। আমার জীবনটা ক ঠেলে দিয়ে গেল কের পেছনে—অন্ধকারে। সামনে আমি অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পাচ্ছিনে সঞ্জীব

কৃষ্ণার কথাগুলো দুর্বোধ্য ঠেকতে লাগল সঞ্জীবের। বিস্মিত কণ্ঠে বলল, তোমার মেজদা একটি মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করেছেন, তোমার ছোট বোন তার পানের ওয়ালের সঙ্গেই পালিয়ে গেছে—ঘটনা দুটো নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে মর্মান্তিক দুঃখের। তোমার মেজদার ব্যাপারটা সংস্কারের ব্যাপার ও নিয়ে করবার কিছু নেই। তোমার ছোট বোনের খবর যতটুকু পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে, সেও বিয়ে করেছে—তা যাই হোক—এ সব ঘটনার জন্য তোমার জীবনটা অন্ধকারে ডুবে যাবে কেন আমি বুঝতে পারছিনে। তোমার বিয়েতে বাধা কোথায় হচ্ছে তাও বুঝতে পারছিনে।

বিছানায় কিছুক্ষণ চুপকরে রইল কৃষ্ণা। তারপর কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলল, আমাকে মা'র কথা ভাবতে হচ্ছে সঞ্জীব। তোমার বাবা রয়েছেন, মা রয়েছেন। ছোট ভাই বোন রয়েছে। মাকে তো আমি তোমার ওখানে নিয়ে যেতে পারব না।

কেন তোমার মাকে তোমার বড়দা নিয়ে যাচ্ছেন না।

না। তিনি বলছেন, পেয়ারশ টাকার কেরানী আমি। ষাট টাকা বাড়ী ভাড়া দেবার সাধ্য নেই আমার। মেসে থাকি—মেসের টাকা দিয়ে বাকী টাকা মাকে পাঠাই। বাস্। আসলে মাকে নিয়ে কোন সমস্যাই তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। বড়দা বলছেন, তোর দিদা কোয়ার্টার। মাকে নিয়ে চলে যা। সত্যি বলতে, এ ছাড়া উপায়ও তো দেখছিনে কোন। বড়দার পক্ষে সত্যি সম্ভব নয় বাড়ী ভাড়া দিয়ে মাকে রাখা। আমি বিয়ে করলে মা তোমার যাবেন। একটা নিঃশ্বাস টানল কৃষ্ণা।

হঠাৎ জবাব না পেয়েই যেন বিজ্রপে বলসে উঠল সঞ্জীব। বলল, না, এ সমস্যাটা আমার মাথায় আসেনি। এ তোমার তৈরী করা সমস্যা।

আমার তৈরী করা সমস্যা!

স্রেফ্ তৈরী করা। বলছিলে তোমার ভাগ্যটা ভালো নয়। দেখলে তো কেমন ভালো ভাগ্য তোমার। আমাকে তাড়াবার যখন কোন উপায় খুঁজে পাচ্ছিলে না তখন কেমন উপায় করে দিল তোমার ভাগ্য।

বিহ্বল কৃষ্ণা তাকিয়ে রইল সঞ্জীবের মুখের দিকে।

সঞ্জীব বলে চলল—আমি অনুমান করছিলাম। আমার মনে কেমন ভয় জাগছিল—তোমার চিঠিতে সুব্রত গুপ্তের কথা যে ভাবে আসতে শুরু করেছিল—

—কী বলছ সঞ্জীব।

ঠিকই বলছি। হিংসায় যন্ত্রণায় যেন ছটফট করে উঠল সঞ্জীব। বলল, জাঁতকে উঠোনা কৃষ্ণা। সত্যকে স্পষ্ট করছি আমি। আমি শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলাম—কেবল আশঙ্কা করছিলাম, কী যেন ঘটে কপালে।…তিনি অধ্যাপক। তুমি অধ্যাপিকা। তোমার কোয়ার্টার রয়েছে। তিনি থাকেন হোষ্টেলে। অধ্যাপকের স্বাস্থ্যটা নাকি তেমন ভালো নয়। একা থাকেন। দেখবার যত্ন করবার কেউ নেই। হোষ্টেলের অখাদ্য জীর্ণ করতে পারেন না। তুমি এনে মাঝে মাঝে রান্না করে খাইয়েছ। অধ্যাপকের খাওয়ার দুঃখ ঘুচবে। নিঃসঙ্গতার দুঃখ ঘুচবে। তোমার মার সমস্যা মিটে যাবে। তোমরা দুজন অধ্যাপনা আর পাঠ নিয়ে থাকবে, মা সংসার আগলাবেন—সুন্দর সম্পূর্ণ ছবি—ছবিটা আমি দেখতে পাচ্ছি, আর তুমি পাচ্ছনা একি হয়।

ক্লান্ত ভাবে শরীর ছেড়ে দিল কৃষ্ণা চেয়ারের পেছনে। অবসন্ন কণ্ঠে বলল, আমি জানতাম তুমি ব্যাপারটা অন্য চোখে দেখবে। কারণ তোমার চিঠিতে সুব্রতবাবুর সম্বন্ধে অযৌক্তিক ভাবে উক্তি দিচ্ছিল। কিন্তু তোমার ও সব ছবি আমি দেখতে পাচ্ছিনে সঞ্জীব। আমার সংসারের ছবি তোমাকে নিয়ে—বিশ্বাস করো। আমি শুধু তোমার কাছে সময় চাচ্ছি সঞ্জীব।

এর ভেতর কখন যেন সিগারেট ধরিয়েছিল সঞ্জীব। সেটা দু একটান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, চমৎকার! এ সময় চাওয়ার মানেটা কী হয়? তোমার বাবার বয়সে পাঁচটাকা করে পঞ্চাশটাকা মাইনে বাড়তে কেটে যাবে দশবছর। মাকে নেবার শক্তি তার শিগ্‌গির হবে না। আমার বাবা মাও, শিগ্‌গির মরবেন বলে মনে হয় না—

সঞ্জীবের নিষ্ঠুরতায় চোখ ঢাকল কৃষ্ণা হাত দিয়ে।

সঞ্জীব উঠে পড়ল। সবিদ্রূপে বলল, তোমার অনির্দিষ্ট কাল সময়ের দরকার মনে হচ্ছে। তাই দিলাম। মেয়েদের কিছু আগে চিনতে পারলে ছেলেরা অনেক দুঃখের হাত থেকে বাঁচত—ব্যাঙ্কের কেরানীর মূল্য যে তাদের কাছে কতটুকু আগে বোঝা উচিত ছিল আমার।

বাড়ীটা নিঃশব্দ, অন্ধকার। কত রাত কে জানে। বড়দা রাতের ট্রেনে তাঁর কাজের জায়গায় চলে গেছেন। বাড়ীটায় ভেতর ওরা দুজন লোক। মা আর মেয়ে। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। কৃষ্ণার চোখে ঘুম এলো না। কৃষ্ণার হাত মুঠোর ভেতর শক্ত করে ধরে ঘুমিয়ে আছেন মা, যেন আঁকড়ে ধরেছেন ওকে। মার শক্ত করে ধরা হাতের মুঠোর ভেতর নির্জিবের মতো হাতটা ফেলে রেখে কৃষ্ণা মলিন হাসল মনে মনে। মনে পড়ল, আজ মা যে ভাবে ওর হাত ধরে ঘুমিয়ে আছেন, একদিন ও ঠিক তেমনি ভাবে মার হাত ধরে ঘুমোত। নইলে কিছুতেই তার ঘুম আসত না। মাকে বহুকাজ ফেলে, উনোনের চাপানো হাঁড়ি নামিয়ে রেখে এলেও ওর জন্য এসে একবার বিছানায় শুতেই হতো। কৃষ্ণ মার হাত ছোট্ট মুঠোয় ধরে ঘুমিয়ে পড়ত। আজ ওর মা ওর হাত ধরে ঘুমিয়ে আছেন ঠিক তেমনি ভাবে! মা যেমন ঘুমন্ত শিশুর হাতের মুঠো সন্তর্পণে আলগা করে, ঠিক তেমনি সন্তর্পণে মার হাত ছাড়িয়ে কৃষ্ণা বিছানা ছেড়ে উঠে এলো। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছোট্ট রেলিং-ঘেরা বারান্দাটুকুতে দাঁড়াল। এমনি ঘুম না হওয়া রাত কৃষ্ণার জীবনে আরো এসেছে। এমনি বিছানা ছেড়ে উঠে এসে একা বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তার চেহারা, স্বাদ একেবারে ছিল আলাদা। সেই রাত আমার সঙ্গে থাকত সঞ্জীব। আজ সে একা। ...একটা ইজিচেয়ার... না এ বাড়ীতে তা নেই। এতদিন মনে হয়নি। আজ মনে হলো একটা ইজি-চেয়ার না হলে মানুষ বাঁচে কী করে!

নতুন পৃথিবী

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

দার্জিলিঙে আমি একটি মেয়ের নাম রেখেছিলুম মন্দাক্রান্তা। আশ্বিনের এক উজ্জ্বল বিকালে স্যানাটোরিয়াম থেকে সে বেড়াতে বাহির হচ্ছিল। একটি যুবকের পাশে হাসি মুখে দুলে দুলে চলেছিল মেয়েটি, এক নজর দেখেই আমি তার নাম রেখেছিলুম মন্দাক্রান্তা। সেই ছন্দোময় চলা, টানা টানা দীর্ঘ ছন্দ। চলায় কোন চঞ্চলতা নেই দেখে কালিদাসের কবিতা আমার মনে পড়েছিল :

শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্ যুবতি বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।

আমার চিকিৎসকের জীবনে তার চেয়ে বড় আঘাত আর কে দিয়েছিল জানিনে। যে বিরুওয়ালাকে আমি অপারেসনের টেবিলে হত্যা করেছিলুম, সে আমাকে একটি কথাও বলেনি। আঘাত পেয়ে আমি নিজেই পালিয়ে গিয়েছিলুম। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, এক কাজ থেকে আর এক কাজে। নির্মম অভিজ্ঞতায় জীবন আমার ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, রক্ত ঝরেছে হৃদয় থেকে। কিন্তু তার মধ্যেও আনন্দ পেয়েছি। অভিনব এক দেহাতীত আনন্দ। কালিদাসের কবিতার মতো ছন্দোময়।

জীবনের ছন্দকে পঞ্চানন পয়ার বলত। একদিন বলেছিল : সুর বেঁধেছি পয়ার ছন্দে, এবারে মহাভারত গড়ে তুললেই হল।

আমি হেসে বলেছিলুম : পয়ার ছন্দে, না মন্দাক্রান্তায়?

পঞ্চানন মেনে নিয়ে বলেছিল : ঠিক বলেছিস। মন্দাক্রান্তাই আমাদের জীবনের ছন্দ। হেসে দুলে বিয়ে তালে চলে। ঘরা নেই, শেষ হবারও আশ্বাস নেই।

জীবনের মাঝারে পৌঁছে আজ আমি সেদিনের পরিহাস সত্য বলে মেনে নিয়েছি। আজ আমি জীবনের ছন্দকেই মন্দাক্রান্তা বলি। কবিতার মতো মানুষের জীবনও যেন দুলে দুলে দুলকি চালে চলে। কখনও রূপের ভারে অলস-গমন। কখনও জীবনবোধে বেদনার্ত। জীবনের ছন্দেও কোন চঞ্চলতা নেই, শুধু দুলে দুলে চলা, আর একটা পরিণতির জন্য করুণ প্রতীক্ষা।

একটা মানুষকে হত্যা করে যেদিন আমি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছিলুম, সেদিন আমি নিজেকেই শুধু খুনী ভাবতুম। তারপর এই বিরাট পৃথিবীটার সঙ্গে পরিচয় হল। দেখলুম যে মানুষ শুধু মানুষ খুন করে না, করে সমাজ ও রাষ্ট্রও। পঞ্চাননকে কে খুন করেছিল?

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। গোল দিঘীর একটা বেঞ্চিতে বসে আমি চিনে বাদাম চিবোচ্ছিলুম, আর নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছিলুম। এরপরে কী করব!

ঠিক এই সময়ে তার গলা শুনলুম : কে, জ্যোতির্ময় না ?

মুখ তুলে তাকাবার আগেই সে আমার পাশে এসে বেঁধে বসল।

কতদিন পরে দেখা, কত আকস্মিকভাবে। কত আশ্চর্য হলুম, কত খুশী হলুম। কিন্তু বলা কিছুই হল না। পঞ্চানন নিজের কথা দিয়েই গল্প শুরু করল : এবারে বেশ শক্ত তার চড়িয়েছি রে, সহজে আর ছিঁড়বে না।

ভূমিকার সৌজন্য প্রকাশের সার্থকতা সে কোনোদিন মানতনা, আজও মাননা। সরাসরি নিজের কথায় নেমে পড়ল। দেখলুম, তার পুরনো অভ্যাস আজও যায়নি। শুধু চেহারাটাই বদলেছে, বদলায়নি তার মন। বললুম : তাই নাকি !

পঞ্চানন হেসে বলল : বড়বাজারে আজকাল খাতা লিখি। মাইনে বাড়ে না, কমেও না। প্রমোশনের আশা নেই, ডিমোশনের ভয়ও নেই। আর চাকরি যাওয়া ? বলে আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললুম : বুঝেছি।

বুঝিস নি। এর চেয়ে কম পয়সায় একটা মজুরও জুটবে না।

কিন্তু তোর মতো লেখাপড়া জানা ভদ্রলোক অনেক জুটবে।

পঞ্চানন আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল : ঠিক বুঝেছিস।

হেসে বললুম : তবে তো বেশ সুখেই আছিস বলতে হবে।

পঞ্চানন ম্লান মুখে বলল : সুখের কথাই তো বলছি।—

চাহ গয়ি তো চিন্তা গয়ি
মনুয়া বেপরোয়া।
যাহো কছু না চাহিয়ে
সোহি শাহন শাহ।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম : এ আবার কী ?

কেন, কবীর পড়িস নি ?

না।

চাইবার কিছু নেই তো চিন্তাও নেই, মানুষ তখন বেপরোয়া। যে কিছুই চায় না, সেই হল বাদশাহ শাহন শাহ।

সুন্দর কথা।

পঞ্চানন বলল : সুন্দর জীবনের কথা।

বললুম : বিয়ে নিশ্চয়ই করেছিস !

পঞ্চাননের মুখে আমি কান্নার মতো করুণ হাসি দেখলুম। বলল : তবে আর সুন্দর জীবন কেন বলছি। এমন নিশ্চিন্ত হয়েও কি বীণা ফেলে রেখে দেব। বীণকার না আসলে কে বাজাবে বীণা।

একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলে বলল : তোর কাছে মিথ্যা বলব না, বীণা একদিন বেজেছিল, জীবনের দুই তীরে একটি সুর বেজেছিল। সত্যিই মেয়েটার নাম রেখেছি সুর, সুরমা, সুরবালা নয়, শুধু সুর। বেশ আর্টিস্টিক নয় ?

এ সেই পুরনো পরিচিত পঞ্চানন। শৈশবে গ্রামের স্কুলে যখন এক সঙ্গে পড়তাম, তখনও তার কথাবার্তা এই রকম ছিল। অন্য ছেলেরা যখন হাসত, আমি তখন তার দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতুম। ছেলেরা আমাকে ওর ভক্ত বলত। কিন্তু কেন আমি ওর ভক্ত হয়েছিলুম, সে কথা কেউই জানত না। আমি দেখতে পেয়েছিলুম, ও তারাভরা রাত্রির নীল আকাশ পড়তে শিখেছে। আবিষ্কার করেছে ফুল ফোটানোর গোপন রহস্য, আর কালো মেঘে বিরহী যক্ষের বাণী ও শুনতে পায়। ওর বাবার অভাব ছিল না, আর পড়াশুনোয় তিনি ওকে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তাই পড়ার বই-এর পাতা ও যত ওল্টাল, তার চেয়ে বেশি পড়ল প্রকৃতির পাতা। আমরা জানতুম, পঞ্চানন কবি হয়েছে; বুড়োরা বললেন, ও ছেলে মানুষ হল না। পঞ্চাননকে দেখলুম আজও সে কবির মতো কথা বলছে। বললুম: তোর কথাবার্তার ধরন একটুও বদলায় নি।

চেহারাটাই বুঝি খুব বদলে গেছে?

তা বলেছে বৈ কি!

বললুম না যে সে রূপ আর নেই, লাবণ্যও না। স্কুলের ছেলেরা যে তাকে মেয়ে বলে ক্ষেপাত সে কথা কেউ আজ বিশ্বাস করবে না। স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, নীল শিরা বেরিয়েছে হাতে। রুক্ষ চুল, বেশবাস মলিন অবিন্যস্ত। গালে খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়িও দেখতে পাচ্ছি। অথচ বয়স আর কতো হবে! ত্রিশ পৌঁছতে এখনও দুতিন বছর দেরি আছে।

পঞ্চানন প্রতিবাদ করল না। বলল: মিথ্যে নয়। শরীরের ওপর দিয়ে ঝড় তো কম গেল না।

গত দশ বারো বছরের খবর আমি জানিনে। ম্যাট্রিক পাশ করে আমি কলকাতায় চলে এসেছিলুম, আর পঞ্চানন পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। তাদের যা অবস্থা ছিল, তাতে তার চাকরি করবার দরকার ছিল না। কিন্তু গ্রাম ছেড়ে কেন চলে এল, সে কথা জানতে আমি চাইলুম না।

পঞ্চানন নিজেই বলল: একদিন আসিস আমার কাছে, তোকে সব ঘটনা খুলে বলব।

বললুম: আসব বৈকি।

পঞ্চানন উঠে দাঁড়াতেই প্রশ্ন করলুম: ঠিকানা দিলি না?

বেশি দূর নয়। বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীট ধরে সোজা এগিয়ে বাঁ দিকে গলি ধরবি। কতগুলো খোলার ঘর, দেওয়ালে ঘুঁটে দিয়ে রেখেছে ঘোটারা। আর একটু এগিয়ে খানিকটা খোলা জায়গা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অনেক খানি আকাশ দেখা যায়। তারপর একখানা দোতলা বাড়ি। বৃষ্টির জলে তার নম্বর ধুয়ে গেছে। দরজাটা সামনে নয়, এক পাশে। সরু পথ ধরে ভিতরে চলে যাবি। কোনোদিকে চাইবি না। মেয়েরা কেউ ঝাঁট দিচ্ছে, কেউ কাঁচের গেলাস ধুচ্ছে। কেউ আবার চুলে সাবান দিচ্ছে দেখবি।

বললুম: বুঝেছি।

বুঝিস নি কিছু। একবার না গেলে কিছুই বুঝবি না।

হেসে বললুম: যাব।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পঞ্চানন আবার ফিরে এল। বলল: তুই কী করিস তাতো বললি না?

সংক্ষেপে বললুম: কিছুই করিনে।

পঞ্চানন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বললুম : ছোট বইতেও রাজী আছি, কিন্তু লোকে হয় পাবে, ভাবে, ভদ্রলোকের ছেলে, হয় তো মাথা খেকে ফেলে দেবে।

পঞ্চাননের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল যে এ কথা তার বিশ্বাস হল না। বললুম : তিনকড়িদাকে মনে আছে? মুকিয়া ষ্টীটের তিনকড়িদা। তাঁর বৈঠকখানার জায়গা না পেলে গাছতলায় দাঁড়াতে হত।

পঞ্চানন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল : কার কাছে যেন শুনেছিলুম, তুই ডাক্তারী পড়ছিস!

ডাক্তারী!

চোখের সামনে সেই মর্মান্তিক দৃশ্য ভেসে উঠল। কী বীভৎস সেই মুখখানা! বাঁ দিকের কান ঝুলো দিয়ে প্রায় কাটা, মুখের ও দেহের কত তাজা ঘসঘস করছে। মাথায় আইস ব্যাগ, আর নাকের কাছে অক্সিজেনের সরঞ্জাম। পেরিফেরাল কেটলিংএর চেক করতে পায়ের দিকটা উঁচু করে দিয়েছিলুম। মুকোস ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দিয়েছিলুম মাথার ইডিমা প্রিভেন্ট করতে। তারপর—

তারপর আর ভাবতে পারিনে। অপারেশন টেবিলে তোমার দুর্বুদ্ধি কেন হল, তা মনে নেই। লোকটি মরে গেল। ঘেরে ফেললুম তাকে। আড়ালে আমায় সিনিয়র বললেন, লোকটাকে তুমি খুন করলে।

খুন করলুম! কিন্তু খুনের শাস্তি যে বড় নির্মম।

জীবনের শুরুতেই সব গুলট পালট হয়ে গেল। সামনের আকাশ অন্ধকার দেখলুম। মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তাতেও তখন অন্ধকার ঘনিয়ে উঠেছে।

এখন গলায় আমার স্টেথস্কোপ নেই, পকেটেও নেই। এতদিন শখ করে যা গলায় ঝুলিয়ে রাখতুম, তা ফেলে এলুম সিহনের বড় বাড়ির ভিতরে। ভুলে নয়, স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে। মনে মনে সংকল্প নিয়ে বেরলুম, ও জিনিষ আর হাতে তুলব না।

মানুষের চোখের আড়ালে কয়েকটা দিন কেটেছিল। একান্তে নির্জন ঘরে। রাতে দুঃস্বপ্ন দেখতুম, আর অন্ধকারে ছায়া দেখে ভয় পেতুম। দিনের আলোতেও চমকে উঠতুম অকারণে। আমি কি পাগল হয়ে যাব?

তিনকড়িদাও একদিন আমার পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। বললেন : তোর কি শরীর ভাল নেই? না তো।

এই আপত্তি জানিয়েছে বুঝতে পারলুম যে ভুল হল। পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন হবে।

ঠিক তাই হল। তিনকড়িদা বললেন : কদিন কাজে যাচ্ছিস না শুনলুম!

দূর সম্পর্কের দাদা। কিন্তু তাঁরই দয়ায় ডাক্তার হবার সুযোগ পেয়েছিলুম। স্বেচ্ছায় তাঁর গৃহে আশ্রয় না নিলে কলকাতায় লেখাপড়া আমার সম্ভব হত না। তাঁর কাছে তাই মিথ্যা বলতে পারলুম না। বললুম : কলেজের কাজ আমি ছেড়ে দিয়েছি।

ছেড়ে দিয়েছিস?

আমি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলুম : আর একটা কাজ শিগগিরই জুটিয়ে নেব।

এ কথার উত্তর তিনি দেননি। আমার কথায় বোধ হয় কোন ভরসাও পাননি।

পরে আমিও আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। কলকাতা শহরে রোজগার অনেকে করে, কিন্তু সবাই করে না। আমার মতো বেকারে এই শহর ভরে আছে।

পঞ্চানন আমার মুখের দিকে চেয়েছিল। বললুম : ডাক্তারী করি না।

কেন করি না, সে কথা আমাকে সে জিজ্ঞাসা করল না। বলল : এখন তোর সময় আছে?

বললুম : অঢেল।

পঞ্চানন আবার এসে আমার পাশে বসল।

খট করে একটা শব্দ পেলুম। দেখলুম, তার পকেটে একটা ওষুধের শিশি। বেকিতে ঠেকে শব্দ হল। বোধহয় ওষুধ কিনতে বেরিয়েছিল। কী অসুখ তার অসুখ, এসব কথা জানতে চাইলুম না। যদি সুযোগ পাই, পরে জিজ্ঞাসা করব।

পঞ্চানন অনেকক্ষণ নীরব রইল। তারপর প্রশ্ন করল : আমাদের পৃথিবী কোথায় বলতে পারিস? খানিকটা লেখাপড়া শিখে কিছু কুসংস্কার ত্যাগ করেছি। গ্রাম আমাদের ভাল না। বিত্তহীন আমরা, তাই শহরে আমাদের জায়গা নেই। আমাদের জন্যে নতুন পৃথিবী কি কেউ গড়বে?

কান্নার মতো করুণ শোনায় তার কণ্ঠস্বর। আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

উপরে কালো আকাশ। কয়েকটা তারা স্থির হয়ে আছে, আর বাকিগুলো মিটমিট করছে। সামনে কালো জল। তার চেউএর উপর রুপালি আলো ঝিকমিক করছে। ওধারের শরবতের দোকান থেকে গান শুনতে পাচ্ছি। আর এধারে জলে লাফালাফি করবার মাছটা শ্রোতার মতো স্তব্ধ হয়ে আছে। কোলাহল যখন নিজের চারিপাশে হয়, তখন তাকে কোলাহল বলে মনে হয় না। এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে জনতার কোলাহল শুনতে পাচ্ছি। সবাই ছুটছে। আমিই নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলুম আমার পা দুটোও এমনি করে ছুটবার জন্য নিশপিশ করছে।

আর পঞ্চানন। সে যেন স্থির হয়ে আছে! তার পা দুখানা কি ভেঙে গেছে, না তার চলবার বেগ গেছে ফুরিয়ে।

পঞ্চানন আস্তে আস্তে বলল : জেল খাটতে না হলে আমি গ্রাম ছাড়তুম না।

জেল।

আমি চমকে উঠেছিলুম।

পঞ্চানন আশ্বাস দিয়ে বলল : তোর ভয় নেই, দেশের কাজ করে আমি জেলে যাইনি তাতে .তা আনন্দ আছে। সে আনন্দের আস্বাদ আমি পাইনি।

আমি আরও আশ্চর্য হলুম। চুরি ডাকাতি খুনোখুনির জন্য পঞ্চানন যে জেলে যাবে না। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। দেশের কাজ করেও সে জেলে যায়নি। তবে সে কোন্ অপরাধে শাস্তি পেল!

পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা জ্যোতি, সংস্কার কি জীবনের চেয়েও বড়?

কেন বলতো!

আমি তাই জানতে চাইছি। একটা অন্যায় চিরদিন চলে আসছে বলেই তা মেনে নিতে হবে! আমাদের সংহিতা লিখেছিলেন—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পুত্র মনু, সেই সংহিতা আমাদের গলা টিপে সুস্থ জীবনটা নষ্ট করলেও আমরা প্রতিবাদ করতে পারব না। অন্যায়কে অন্যায় বলা কি পাপ।

পঞ্চাননের উচ্ছ্বাস দেখে আমি বললুম : বৃহৎ পরিবারে সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে স্বার্থ ত্যাগ করতেই হয়।

পঞ্চানন নিজেকে সংযমে নিয়েছিল, বলল : সমাজটা কারখানা আর মানুষ যন্ত্র হলে তোমার কথা মেনে নেওয়া চলে। ম্যালেরিয়া হয়েছে, কুইনিন দাও ; কিন্তু কেন ম্যালেরিয়া হল তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না।

বললুম : সমাজের ওপর এমন রাগ কেন ?

পঞ্চানন বলল : সে কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়।

সংক্ষেপেই বল।

পঞ্চাননের কাছে সংক্ষেপে সেই গল্প শুনলুম। কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে পঞ্চানন নিজের সমাজে বিয়ে করেনি। একটা ছোট জাতের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে এনেছিল। বাপ যে জমিজমা ও পয়সা রেখে গিয়েছিলেন, তাতে তার জীবনযুদ্ধে নামবার দরকার ছিল না। সময় কাটাবার জন্যে হোমিওপ্যাথির ওষুধ বিতরণ করত। এমনি এক জায়গায় চিকিৎসা করতে গিয়ে ছেলেটা মরে গেল। বউটাকে কেউ দেখবার নেই, কোন আত্মীয় স্বজন তাকে দেখবার জন্যে এগিয়ে এল না।

পঞ্চানন বলল : তোকে মিথ্যে করে বলছি ভাই, মেয়েটার রূপ দেখে আমি ঘরে আনিনি। এনেছিলুম না এনে উপায় ছিল না বলে। কিন্তু গ্রামের কেউ তা বুঝল না।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, বলল : বুঝবে, ইংরেজ আইন পাশ করলেই বুঝবে। সতীদাহ বন্ধ হয়েছে, আর মানুষে মানুষে প্রভেদ কোনদিন ঘুচবে না।

কিন্তু তার জন্যে খেদ করে কেন ?

সে সঙ্কীর্ণতার কথা থাক। শুনলে তোর মনটাও বিষিয়ে যাবে।

পঞ্চাননের নিঃশব্দ রোদন আমি শুনতে পাচ্ছিলুম। তাই কোন উত্তর দিতে পারলুম না।

সরবতের দোকানে একটার পর একটা গান হচ্ছে। কলকাতা শহরে কলের গানে অরুচি তখনও হয়নি।

এক সময় আমি বললুম : রাত যে অনেক হল, বাড়ি ফিরবি না ?

পঞ্চানন নিস্পৃহ ভাবে বলল : না।

সেকি !

রাতদিন অমন ঘ্যানর ঘ্যানর ভাল লাগে না। বাড়ি তো নয়, যেন হাসপাতাল।

আমি চমকে উঠলুম। এ কোন্ পঞ্চানন কথা বলছে ! আমাদের সেই দরদী কবি পঞ্চানন, না বড় বাজারের খাতা লেখা কেরানী !

নিজেকে সামলে নিয়ে বললুম : চল এবারে।

পঞ্চানন উঠল না, বলল : তোর কিধে পেয়েছে বুঝি ?

ক্ষুধার কথায় আমার চিনেবাদামের কথা মনে পড়ল। এ মাসে মাইনে পাইনি, পয়সা নেই পকেটে। যতদিন আর একটা কাজ না জুটছে, ততদিন কোনমতে চালাতে হবে। তিনকড়িদার বাড়িতে শুধু চা পাই সকালে। খাই বাইরে। আত্মীয়ের অধিকারে বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছি। তাই যথেষ্ট। তার বেশি কোনদিন দাবী করিনি। পঞ্চাননের কথার উত্তরে বললুম : আজ রাতে কিছু খাব না।

কেন ?

সত্য কথা আমি বলতে পারলুম না। মুখে আটকে গেল। ক্ষিধে পেলেও এখন আমার খাবার উপায় নেই। দুবেলা খাবার সৌখিনতা কিছুদিন আমাকে বাদ দিতে হবে। বললুম : দুপুরের খাবার এখনও হজম হয়নি।

পঞ্চানন কী বুঝল সেই জানে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল : চল।

চলতে চলতে আমি বললুম : তোকে আবার ওষুধ নিয়ে ফিরতে হবে !

ওষুধ ! ওষুধ কী হবে।

তোর পকেটে ওটা ওষুধের শিশি নয় !

সহসা পঞ্চানন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, হাত দিয়ে ওষুধের শিশিটা অনুভব করে বলে উঠল ! হ্যাঁ, না, ওষুধের আজ দরকার হবে না।

আরও কিছু শোনবার জন্য পঞ্চাননের মুখের দিকে আমি তাকালুম।

পঞ্চানন কতকটা সহজ হবার চেষ্টা করে বলল : ওষুধ নিতেই আমি বেরিয়েছিলুম। পরে ভাবলুম, আজ থাক। বেশি ওষুধ খাওয়ানো ভাল নয়।

আমার মনে হল, পঞ্চাননও আমার মতো সত্য কথা গোপন করে গেল। কিন্তু কেন করল ! আমরা কি সত্য কথা বলতে ভয় পাই। না মিথ্যা দিয়ে আমরা মর্যাদা বাঁচাতে পাই ! দরিদ্রের এমন মর্যাদাবোধ কেন !

তবু আমাকে না বোঝার ভাণ করতে হল। বললুম : আয় না, এ দিকটায় একটু ঘুরে যাই।

পঞ্চাননকে আমি একটা ওষুধের দোকানে টেনে আনলুম। একটা টাকা বার করে বললুম : প্রেস্‌ক্রিপসনটা আছে ?

পঞ্চানন আমার মুখের দিকে তাকাল বোকার মতো।

বললুম : বার কর।

কোন কথা না বলে একখানা জীর্ণ কাগজ সে বার করে দিল। ওষুধের শিশিটাও দিল।

ওষুধ পাবার পর রাস্তায় নেমে আমি বললুম : কাল বিকেলে তোর বাড়ি যাব।

পঞ্চানন কোন উত্তর দিল না। দ্রুত পায়ে পালিয়ে গেল। মনে হল, আত্মরক্ষার জন্যেই সে এমন ভাবে পালাল।

পরদিন আমি পঞ্চাননের কাছে যেতে পারিনি, তার পরের দিনও না। নিজেরই একটা কাজের জন্য কয়েক জায়গায় ছুটোছুটি করতে হয়েছিল। তার পরদিন বিকালে বাড়ি ফিরে একখানা চিঠি পেলুম। চিঠিখানা পড়ে বিস্ময়ের আমার সীমা রইল না।

পঞ্চানন যে অফিসে কাজ করত, সেই অফিসের চিঠি। তারা জানিয়েছে যে পঞ্চানন চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, আর তার জায়গায় আমাকে নেবার জন্য অনুরোধ করেছে। বেতনের পরিমাণ দেখে চক্ষু স্থির হল। এত কম টাকায় একটা পরিবার কেন একটা মানুষেরও চলা কঠিন। পঞ্চাননের যে চলছিল না তা আমি অনুমান করেছি, কিন্তু এতদিন কী করে চলেছে তা ভেবে পেলুম না।

গায়ের জামাটা আমি খুলে ফেলেছিলুম। আবার সেটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। পথের উপর তখন ছায়া দীর্ঘ হয়েছে। আকাশের রোদ উঠেছে বাড়ির চিলে কোঠায়।

পঞ্চাননের বাড়ি খুঁজে বার করতে আমার একটুও কষ্ট হয়নি। নিখুঁৎ ভাবে সে পথের নির্দেশ দিয়েছিল। সেই নির্দেশমতো আমি তার বাড়ির সামনে পৌঁছে গেলুম।

দরজাটা সামনে বন্ধ। লম্বা পথ ধরে ভিতরে এগিয়ে গেলুম। সত্যিই অনেক মেয়ে দেখতে পেলুম। কেউ ঝাঁট দিচ্ছে, কেউ কাচের গেলাস ধুচ্ছে ঘসে ঘসে। দু একজন সেজে গুজে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

পঞ্চাননের কথা এদের কাউকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারলুম না। এদের সঙ্গে কথা কইতেই আমার লজ্জা হল। খানিকক্ষণ ডাকাডাকি করতে একটি মেয়েই এগিয়ে এল, বলল: পঞ্চানন বাবুকে চাই?

সংক্ষেপে বললুম: হ্যাঁ।

কী দরকার আপনার?

সে আমার বন্ধু।

ও।

আর একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলল: তা এতদিন আপনারা কোথায় ছিলেন?

এই কটূক্তির উত্তর দেবার প্রবৃত্তি আমার হল না। বললুম: সে আমাকে বলেছিল বলেই এসেছি।

প্রথম মেয়েটি কিন্তু ভদ্র। বলল: একটু বেরিয়েছে এসেছেন।

আমি কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না। ঠিক এই সময় বাড়িওয়ালা বেরিয়ে এলেন।

ভদ্রলোক আমার নাম ধাম পেশা জিজ্ঞাসা করলেন।

বললুম: নাম একটা আছে, কিন্তু ধাম আর পেশা নেই।

কী দরকার?

পঞ্চাননের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

পাওনাদার?

আজ্ঞে না।

আসুন।

বলে ভদ্রলোক একটা দরজার তালা খুলে দিলেন।

অন্ধকার ঘর। সামনেই কী একটা নড়ে চড়ে উঠল বলে থমকে দাঁড়ালুম। তারপর দেখলুম, একটা কালো বেরাল পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাড়িওয়ালা এগিয়ে গিয়ে একটা ছোট জানালা খুলে দিলেন। আবছা আলো এল সেই জানালা দিয়ে। ঘরের জিনিষপত্র মোটামুটি দেখতে পাওয়া গেল।

একটি ঘরেই মোটা সংসার। মেঝের উপরে মোয়া বিছানা। এক কোণে একটি খোলা টিনের বাক্স। কিছু জামাকাপড়ের মধ্যে একটা কড়ির ঝাঁপি উল্টে আছে। তার পাশে কতগুলো কৌটো আর টিন। সবগুলোই খোলা, সবগুলোই খালি।

ঘরের আর এক কোণে একটা তোলা উনুনের পাশে একটা পেট মোটা লণ্ঠন কাৎ হয়ে পড়ে আছে। ময়লা চিমনি, প্রচুর ধোঁয়া দিয়ে বাতিটা এক সময় নিবে গেছে।

একটা বড়ি থেকে শাড়ি ঝুলছে একখানা। লাল পাড় ছেঁড়া শাড়ি, তার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। সেই আঁচলের তলায় একটা মোরো ফ্রক।

ছোট একটা বালিশ একখানা ছেঁড়া কাঁথা দিয়ে আধখানা ঢাকা ছিল। তারই তলায় কিছু কাগজপত্র দেখা যাচ্ছিল। টেনে নিয়ে দেখলুম, একখানা প্রথম ভাগ, আর একটি শ্লেট। কালো শ্লেটের উপর সাদা লেখা পড়তে আমার অসুবিধা হল না। হিজিবিজি আঁচড় থেকে মানুষ সৃষ্টির বাসনা পর্যন্ত দেখতে পেলুম। এই সৃষ্টির বাসনা আসে শৈশবেই। সৃষ্টিকর্তাও এমনি কোন খেয়ালে সৃষ্টি শুরু করেছিলেন।

আমি বোবার অভিভূতের মতো দাঁড়িয়েছিলুম। বাড়িওয়ালা বললেন: আপনার দরকার থাকে ও দুটো আপনি নিতে পারেন।

দরকার! না-না দরকার কিসের!

বলে বই আর শ্লেট রেখে দিলুম।

এবার ঘরের আর একটি কোণে সেই ওষুধের শিশিটি দেখতে পেলুম। এক দাগ ওষুধও খরচ হয়নি। জিজ্ঞাসা করলুম: এরা কি বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে?

বাড়িওয়ালা বললেন: মেয়েটি মারা যাবার পর বাড়ির বউকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সেই মুখরা মেয়েটি দরজায় দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। বলল: গঙ্গায় তার লাস খুঁজে না পেলে এইরকম কোন গলি খুঁজিতে খুঁজে দেখবেন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম!

সেই মেয়েটিই বলল: আপনার বন্ধু তাঁর বউকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম, তখন বাড়িওয়ালা বললেন: পুলিশে খবর দিয়েছি, কিন্তু কারও কোন খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি।

আমার আর কিছু জানবার ছিল না। শুধু একটা নমস্কার করে বললুম: আসি।

ফেরার পথে পঞ্চাননের একটি কথা আমার মনে পড়ল। ছেলেবেলায় সে আমাকে এই জগতের মানুষ বলত। সমাজকে কেন্দ্র করে আমরা নিয়মানুগ নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তন করি। তার অন্য আছে। উল্কার মতো কক্ষচ্যুত হয়ে জলে উঠবার চেষ্টা করে নিঃশেষ হয়ে যায়।

আজ দেখলুম, কথাটা ঠিকই বলেছিল। সে কি তার নিজের পৃথিবী খুঁজতে গেছে!

কে জানে!

খাটাউ

ভায়েল

খাটাউ প্রিন্টের প্রত্যেক মিটারে খাটাউ মিলের গারের সুন্দর কারুকার্য দেখে নিন।

দি খাটাউ মাকাঞ্জী স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ

খুচরা দোকান : ১৮ এল, পার্ক ষ্ট্রীট, প্রবেশ পথ মিডলটন রো, কলিকাতা-১৬ • ফোন : ২৩-৫২৮৩
১৬৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৪-১৯৯৯

বাংলা প্রবন্ধের বিবর্তন

অরবিন্দ পোদ্দার

কিছুদিন আগেও এই অভিযোগ অহরহ শোনা যেত যে, সৃজনশীল সাহিত্যের তুলনায় বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য অনগ্রসর। কিন্তু এই মন্তব্যের পশ্চাতে যে একদেশদর্শিতা ক্রিয়াশীল সেটুকু বাদ দিলে একথা নিঃসংশয়ে ঘোষণা করা চলে যে, আধুনিক কালের বাংলা প্রবন্ধ একটি সুনির্দিষ্ট ঈপ্সিত মানে উত্তীর্ণ হয়েছে, এবং সে মানটি সুস্থির, সুউন্নত। জনপ্রিয়তা দ্বারা অবশ্যই এর মান নির্ণীত হবে না, নির্ণীত হবে বক্তব্যের মননশীলতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার সংহত অভিব্যক্তিদ্বারা। ষাট-সত্তর বৎসর পূর্বে বাংলা প্রবন্ধের যে রূপ ছিল, আজকের রূপ তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, জাত আলাদা। তারই কিঞ্চিৎ পরিচয় এই প্রবন্ধে আমরা গ্রহণ করব।

ইতিহাসের যে কোন বিন্দুতে সাংস্কৃতিক হাওয়া-বদলের পশ্চাতে যেমন কালের আন্তর পরম সংগোপনে ক্রিয়াশীল, তেমনি ব্যক্তিক ভাবনা-চিন্তা অনুসন্ধিৎসা এবং প্রেরণের ব্যাপ্তিও কালের মর্মবাণীটি আবিষ্কার করা কঠিন নয়। এই একটি সূত্রের মধ্যেই একটি বিশেষ ঐতিহাসিক কালের সঙ্গে আরেকটির, এক যুগের মানুষের সঙ্গে আরেক যুগের মানুষের, পার্থক্য ব্যবধান ও স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের সাহিত্য ও মানসভঙ্গির সঙ্গে তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজ নিয়মেই আধুনিক কালের, বর্তমানে ক্রিয়াশীল সাহিত্য ও মানসভঙ্গির প্রভেদ। সে প্রভেদ ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও। সে প্রভেদ শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের প্রভেদ নয়, সে প্রভেদ মননশীলতায়, আদর্শের অনুধ্যানে, চিন্তার স্বরূপে এবং সর্বোপরি বাচনভঙ্গিতে। বিগত শতাধিক বৎসরের বাংলা সাহিত্যের বিবর্তনের যদি সামান্যতম রূপরেখার পরিচয় গ্রহণ করা যায়, তবে তার গতিশীলতায়, ঐতিহ্য বিস্মরণে এবং নতুনতর মূল্যের সৃষ্টি প্রয়াসে, বিষয়নিষ্ঠতায় এবং বাচনভঙ্গির সুদমতায় বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।

গল্প উপন্যাস কবিতা এই তিন শ্রেণীর রচনা আমাদের বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়; যে সব বিশিষ্ট গদ্য রচনার মুখ্য আবেদন যুক্তি আশ্রয়ী চিন্তা ও বুদ্ধির নিকট—অর্থাৎ যেসব রচনাকে আমরা প্রবন্ধ বলে চিহ্নিত করি, তার উপস্থিত সিদ্ধি ও ভবিষ্য সম্ভাবনার ইঙ্গিত করা আমাদের উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর সাহিত্য পূর্বে আমাদের চিন্তা-মননের জগতে কতটা স্থান জুড়ে ছিল এবং আমাদের সুস্থ জীবনবোধ গঠন করায় কি প্রভাব বিস্তার করেছিল, এবং বর্তমান কালেই তার স্থান কোথায়, তার একটি আপেক্ষিক বিচার অবশ্যই করা চলে।

কিন্তু আরম্ভের আগে যে আরম্ভ, তার কথা সর্বাগ্রে। জীবনের যারা একটি গভীর জটিল অর্থভারে আত্যন্তিক পরিচয় গ্রহণে অনুৎসাহী, তাঁদের নিকট মননশীল অথবা প্রবন্ধ সাহিত্যের স্থান অত্যন্ত গৌণ—এখনকার কালে যেমন, আমার সুদৃঢ় অভিমত, অতীতেও তাই ছিল; শুধু নিকট অতীতে নয়, বোধ করি সর্বকালেই তাই ছিল, আর, তা যে একান্ত অসঙ্গত তা-ই বা বলি কি করে? সাহিত্যপাঠে রসিক-পাঠক হৃদয়ের সাযুজ্য লাভে আনন্দিত হতে চায়, এবং সে সাযুজ্যের পূর্ণতায়

চিত্ত তার রসিয়ে উঠে ; বিভিন্ন কল্পিত সত্তায় আপনার আংশিক প্রতিচ্ছবি লাভ করে কিঞ্চিৎ আত্মজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয় তার মানস। এই আনন্দের সম্ভাবনা সৃজনশীল সাহিত্য অর্থাৎ গল্প—উপন্যাস—নাটক কবিতারই অত্যধিক। কারণ, রস এদের উপজীব্য, আর আবেদন মানুষের অনুভবের জগতে। কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্য বা যে-কোনরূপ মননশীল রচনার প্রত্যক্ষ আবেদন প্রজ্ঞার নিকট, যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্যতা এবং গভীরতর সত্যতার তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। মননশীলতায় যে আনন্দ সে আনন্দ ক্ষেত্রে অবশ্যই সত্য, কিন্তু হৃদয়ের স্পর্শে হৃদয়ের রসিয়ে ওঠার অবকাশ বিন্দুমাত্রও এখানে নেই। আর, এও সম্ভবত অনস্বীকার্য, প্রাবন্ধিকের বিশ্লেষণে ও যুক্তি বিস্তারে, সিদ্ধান্তের অপরিহার্যতায় প্রায়শ একটা প্রচ্ছন্ন 'পণ্ডিতী'র ছাঁট থাকে ; যেন, অন্ধ নির্বোধ পাঠককে যথোচিত ভাবে কবিত করে তিনি আপন সিদ্ধান্তের সত্যজ্ঞানে তাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করছেন। কিন্তু কোন মানুষই উপদেশামৃতের পাচন গ্রহণে উৎসাহী নয়, অবশ্য যদি তার সঙ্গটি রসসম্ভোগের অন্ন আধারের সন্ধান পেয়ে থাকে ; কারণ, যদিচ পাচন মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে সবিশেষ উপকারী, তথাপি জিহ্বা নামক বস্তুটির নিকট তা একান্তই বিস্বাদ।

সম্ভবত সর্বকালেই প্রবন্ধ সাহিত্যের অ-জনপ্রিয়তার এও একটি অন্যতম কারণ। অবশ্য কালভেদে মানুষের রুচি ও মানসভঙ্গির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রবন্ধ সাহিত্যের জনপ্রিয়তার তারতম্য হওয়া স্বাভাবিক। বর্তমান কালের কথাই প্রসঙ্গত উত্থাপন করা যাক। বাংলা সাহিত্যের সদ্যতিকালের সৃষ্টিপ্রাচুর্য আমাদের প্রত্যাশাকে উপপ্লাবিত করে দিগন্তপ্রসারী হয়ে উঠেছে ; বিষয়বস্তুর ও দূরবগাহী ভাবের বৈচিত্র্যে যেমন, তার বিশ্লেষণ ও রূপায়ণেও তেমনি এর সাফল্য বিস্ময়কর। পত্র পত্রিকার সংখ্যা যেমন বিপুল, রূপসৃষ্টির কর্মে নিয়োজিত শিল্পীর সংখ্যাও তেমনি সংখ্যাতীত, আর তেমনি অজস্র ঐ সৃষ্টিতরঙ্গে অবগাহনেচ্ছু পাঠকের সংখ্যা। কিন্তু অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রবন্ধ সাহিত্যের সমাদর অল্প ; আর যেটুকু আছে তারও পশ্চাৎ প্রেরণা নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশের ঐকান্তিকতা। অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রের একাধিক সংখ্যা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, মুদ্রিত পৃষ্ঠা-সংখ্যার অর্ধেক বা তার বেশী স্থান প্রবন্ধের জন্য সংরক্ষিত, এবং তার বৈচিত্র্যই বা কত। তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজকে দেশ সমাজ জীবন সম্পর্কে সচেতন করার জন্য সম্পাদকের কি আগ্রহ, মননশীল রচনার উপর কি অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ ! দেশকে বোঝার কত আকাঙ্ক্ষা।

এর হেতু সম্পর্কে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। শিক্ষা দীক্ষা বিচার বুদ্ধি চিন্তা মননে আমরা অনেক বেশী প্রাগ্রসর, জীবন ও জাগতিক সমস্যাদি সম্পর্কেও আমাদের অনুরাগ বেশি এবং বহুমুখী, বিশ্বে সমাজও পূর্বের তুলনায় বড়, তথাপি প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রতি আমাদের কালের মানুষের অনীহার সামাজিক হেতু কি ? এবং বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের শিক্ষিত বাঙালীর তত্ত্বাশ্রয়ী রচনার প্রতি অকুণ্ঠোৎসাহেরই বা হেতু কি ?

সামাজিক ক্রমের লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে, তখনও, বাংলার নতুন সমাজ সংস্কৃতি বিকাশের সমস্ত সম্ভাবনা নিঃশেষিত করেনি ; তার অঙ্কে তখনও সৃষ্টির প্লাবন। সেই নির্মীয়মাণ সৃষ্টির তরঙ্গে স্নাত হয়ে তখনকার দিনের শিক্ষিতের পক্ষে সহজ কৌতূহলে উদ্দীপ্ত না হয়ে উপায় ছিল না। তাঁদের চিৎপ্রকর্ষ, সামাজিক প্রশ্নগুলো সম্পর্কে গভীর অনুরাগ এবং বুদ্ধিবৈদগ্ধ্য আজও পর্যন্ত আমাদের বিস্মিত করে ; আমাদের নিকট তাঁদের যে সম্ভ্রমনা

সে সম্ভাবনা আমাদের কালের পত্রিকাদের আমরা কখনও দিই কিনা সন্দেহ। কিন্তু, চিৎপ্রকর্ষ ছাড়াও আমার নিকট তাঁদের যে বৈশিষ্ট্যটি উজ্জ্বলতর ও গভীরতর বলে মনে হয় তা হলো তাঁদের মনোরাজ্যে দেশ এবং দেশের সমাজ নিয়ত অস্তিত্বশীল। কিভাবে অগ্রসর হলে দেশ উন্নত হবে, কোন্ ভাবনায় সমৃদ্ধ হলে দেশের মানুষ শ্রেয়সের সন্ধান লাভ করবে, কোন্ বিশেষ ধারায় পরিশীলিত হলে জীবনের বোধ সামগ্রিক কল্যাণের সন্ধান পাবে, এই একান্ত ভাবনায় তাঁদের চিত্তপট ভাস্বর ছিল। এক কথায়, তাঁদের সমস্ত ভাবনাকে তাঁরা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে চেয়েছেন সবভাবে জেগে ওঠার আত্যন্তিক ভাবনায়।

কিন্তু এই মানস পরিবেশটি বর্তমানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সেটা ছিল সৃষ্টির যুগ, এটা অবক্ষয়ের; সেটা নির্মাণের এটা আত্মক্ষয়ের; সেটা ছিল সমবায়বিধে সংঘবদ্ধ সমাজের কাল, এটা নৈরাজ্যের, সমাজহীনতার। ফলে, তখনকার সমষ্টি মানসে যে সামগ্রিক কল্যাণবোধ জাগ্রত ছিল, আজকের অধিকাংশ চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকের মনে তার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। তাঁর আপন মানস-প্রকরণের ফসল নিয়ে বৃহত্তর জীবন লাভবান হলো কিনা, বা তার মননশীলতা জীবনকে কোন্ নতুন অভাবরণে সজ্জিত করতে পারে, সে-চিন্তায় তিনি উদ্বিগ্ন নন। তাই, জীবন সম্পর্কে তাঁর আপন পরিচয় যেমন স্বল্প, তেমনি সংসারধর্মে তাঁর নিজস্ব পরিচয়ও যৎকিঞ্চিৎ। এ উক্তি সেই সব প্রবন্ধকারদের সম্পর্কে অধিকতর প্রযোজ্য যাঁরা বিশেষজ্ঞরূপে নিজেদের পঠনপাঠনের এক সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ জগতে অধিষ্ঠিত। বাংলা দেশে দর্শন—মনস্তত্ত্ব—বিবিধ বিজ্ঞান—নাট্যকলা—ইতিহাস—নৃতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ক পত্র-পত্রিকা প্রচলিত; তাদের লেখকগোষ্ঠী সাধারণতঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ। কিন্তু, জীবনের প্রতি যে গভীর ভালবাসা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে এনে দিয়েছে এক অপরূপ গাম্ভীর্য ও হৃদয়াবেগ, অথবা যে কল্যাণবোধ রমেশচন্দ্র দত্তকে ভারতের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের চিত্র উদ্ঘাটিত করার উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই উত্তপ্ত আবেগ আজকের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে নেই, যেমন নেই দেশের প্রতি উদ্বিগ্ন ভালবাসা। ফলে, বহু ক্ষেত্রেই, তাঁদের নিষ্প্রাণ তথ্যসন্নিবেশ অথবা তাত্ত্বিক আলোচনা সাধারণ পাঠক সমাজে বিশেষ উৎসাহের সঞ্চার করে না; আর, জীবনের সঙ্গে তাঁদের মানসজীবনের একটা অনিবার্য ব্যবধান থেকেই যায়। বর্তমানকালের প্রবন্ধকারদের সম্পর্কে অনাগ্রহের এও নিশ্চয়ই একটি কারণ।

কিন্তু তৎসত্ত্বেও, বর্তমান কালের প্রবন্ধ সাহিত্য যে মননশীলতায়, বোধের গভীরতর দীপ্তিতে, বাকসংযমে ও ব্যাপকতর অধ্যয়নের ফলশ্রুতিতে অনেক বেশি সমৃদ্ধ তা বলাই বাহুল্য। বিগত পঞ্চাশৎ বা আশি বছরের সময়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করা যাক, তাতে প্রবন্ধ সাহিত্যের বিবর্তনের স্বরূপটি সহজে অনুমান করা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা: 'আমরা উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই। পাঠকের সহিত আনুপূর্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া দিয়াছি। গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক পৃথক করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এরূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না। এক একখানি প্রস্তর পৃথক করিয়া দেখিলে তাজমহলের গৌরব বুঝিতে পারা যায় না। একটি একটি বৃক্ষ পৃথক করিয়া দেখিলে উদ্যানের শোভা অনুভূত করা যায় না। একটি একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্ণনা করিয়া মনুষ্যমূর্তির অনির্বচনীয় শোভা বর্ণনা করা যায় না। কোটি কোটি জলের আলোচনায় সাগরমাহাত্ম্য অনুভূত করা যায় না। সেইরূপ কাব্যগ্রন্থের।' ইত্যাদি।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা : 'মূলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আদিরসের মহাকবি। তাঁহার সকল উপন্যাসেই আদিরসের নানা অবস্থাগত বিশ্লেষণ আছে। তিনি বাঙ্গালার ইংরাজি-নবীশ বা উন্নত নায়ক-নায়িকাই ভাল করিয়া আঁকিয়াছেন, মাতা পিতা ভ্রাতা বন্ধু সখা অন্য কোন ভাবের কথাই ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই। বিলাতের যে আদিরসের Romanticism বায়রণ হইতে ব্রাউনিং পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। শেষের তিনখানা উপন্যাসে সমাজ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিতে যাইয়াও তিনি আদিরসের হাত এড়াইতে পারেন নাই।' ইত্যাদি।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের কাব্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ : 'কাব্যশাস্ত্রের প্রকৃতি কল্পনা। কল্পনা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-বিহারিণী। তাই কবিতাশক্তিও সৌন্দর্যশালিনী। অসীম গগনের শীতল স্বাধীন বায়ু সর্বদা সমভাবে না পাইলে কল্পনা জীবিত থাকে না; কবিতাও থাকে না। সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ স্থানে কল্পনার মৃত্যু, কবিতারও মৃত্যু। অনন্তের মহামেরুদণ্ডে কল্পনার জন্ম, অসীমতা, উষা ও আকাশ তাহার কর্মভূমি এবং ক্রীড়াস্থল কবিতার আদ্য, মধ্য ও অন্ত তিনই অসীমতার সহিত মিশ্রিত। মায়ের স্বাধীনতায় মেয়ের পুষ্টি, মায়ের হাতে মেয়ের হাত।'

আর আমাদের সমসাময়িককালে বিষ্ণু দে-র মাইকেল সম্পর্কে আলোচনা : 'মাইকেল অষ্টাদশরকম উনিশ শতকী নবাসবাবিত্ত বাঙালী যিনি ইওরোপের তুলনা টানতে গিয়ে স্থান-কাল-পাত্র বিষয়ে বিভ্রান্ত, যিনি পশ্চিম ইওরোপের রেনেসাঁস আর আমাদের মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ প্রায় সমার্থক ভেবে বসেছিলেন। তাই তাঁর জীবন করুণ অপরিচ্ছন্নতায় অকালে শেষ হয়, কিন্তু কীর্তির দিক থেকে তিনি নব্যভারতীয় কবিদের মধ্যে অসংহত অথচ বিরাট পুরুষ, রূপক হিসাবে মহান্। বড় কথা

৺পূজায় বাংলার রেশম

পশ্চিমবঙ্গ

রেশম শিল্পী সমবায় মহাসংঘ লিঃ

বিক্রয় কেন্দ্র :

(১) ১২/১, হেয়ার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১
(২) স্টুটার শিল্প বিপণি
১১এ, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১
(৩) ১৪৯/১এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯
(৪) ৯০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭
(৫) ১৫৬, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
(৬) নাচান রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৪

২রা থেকে ২৫শে অক্টোবর
এবং
৩রা থেকে ৮ই নভেম্বর
রেশম বস্ত্রে রিবেট ২০%
খাদি বস্ত্রে রিবেট ২৫%

হচ্ছে ঐ কবিত্ব, মাইকেলের মানসে কবিতা শুরু করেছিল। এবং এ কবিতা প্রাণ পেয়েছিল ইংরেজি-কবিত সেই মহাজননীতে, যুগযুগান্তব্যাপী জাতীয় জীবনে তাঁরও সবের ও, সমগ্র দেশের মানুষের স্মৃতিমন্থনে.....' ইত্যাদি।

এই উদ্ধৃতি, কয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্যকে শুধু রসের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে—এমন কি অত্যন্ত স্থূল ক্ষেত্রে—স্থাপন করে বিচার করেছেন; আর তাঁদের আলোচনায় মূল্যায়নের বিন্দুমাত্র স্বাক্ষরও নেই। কিন্তু আধুনিক কালের বিষ্ণু দে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের প্রেক্ষিতে ইতিহাসের বিকশমান সত্তার প্রগতি স্বাগত রেখে মধুসূদনের কবি-মানস বিশ্লেষণ করছেন, এবং সেভাবে তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ণে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ফলে, তাঁর আলোচনা যেমন তাৎপর্যগভীর, বিষয়নিষ্ঠ, তেমনি ইতিহাস চেতনায় দীপ্ত। ইতিহাসবোধের অভাব পূর্বসূরীদের রচনাকে যে গভীরতা দান করতে পারেনি, তার অনায়াসস্বীকৃতি বিষ্ণুবাবুর আলোচনাকে সহজে সেই গভীরতায় সমৃদ্ধ তো করেছেই, উপরন্তু দিয়েছে এক দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি যার পরিচয়ে হৃদয় আনন্দিত ও প্রসন্ন হয়। তাছাড়া, বিষ্ণুবাবুর গদ্যরীতিও পূর্বসূরীদের বাচনভঙ্গি অপেক্ষা অধিকতর সুসংবদ্ধ, সুসংযত, পরিমিত ও গভীরতাসন্ধানী। ওঁদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণ মননশীলতার অভাব এবং তরলতার অভিযোগও উত্থাপিত হতে পারে, কিন্তু ওঁর ক্ষেত্রে কোনক্রমেই নয়। আধুনিক সাহিত্যের প্রাগ্রসরতা যদি কোন ক্ষেত্রে পরিস্ফুট তবে তা এইখানে, এই মননশীলতায় ও তার সুনিত অভিব্যক্তিতে।

বস্তুত, আধুনিক যুগের সার্থক প্রবন্ধকারদের রচনার যে সব বৈশিষ্ট্য সহজেই লক্ষণীয়, যা বিষ্ণু দে-র রচনার বৈশিষ্ট্য বলে এইমাত্র উল্লেখিত হয়েছে। প্রথাগত ইতিহাসের বোধ, সমাজচেতনা ও ব্যাপক অধ্যয়ন-অনুশীলনের স্বীকৃতিতে এইসব রচনা সহজেই বিদগ্ধ সমাজে চিত্তহারীরূপে আবির্ভূত হয়। এ ছাড়াও প্রবন্ধ সাহিত্যের আরও দু'একটি গুণ মনোযোগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন—বস্তুনিষ্ঠতা; এ যুগের মননশীল সাহিত্য ব্যক্তিক অভিরুচি, প্রবণতা অথবা পছন্দ-অপছন্দের পেয়ালীপনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বিষয়গত সত্যতা ও যুক্তির পারম্পর্যের উপর এর সৌধ নির্মিত। তারপর, সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ রসবাদী যে আলোচনা আমরা পূর্বসূরীদের মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তা আজ বিলুপ্তপ্রায়। এখানেও রসবস্তুর হেতু অথবা স্রষ্টা যে মন, যে মনকে ইতিহাস উদ্ভাস্ত নব নব ভাবে গড়ে তুলছে, তাকে তার সমগ্রতায় আবিষ্কার ও আলোচনায় বিধৃত করার চেষ্টা প্রবল। এ ছাড়াও সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে, যেসব লক্ষণগুলোকে আমরা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা অথবা গ্রামীণতা-দোষদুষ্ট অথবা মানসিক অন্ধতা প্রসূত বলে অভিহিত করে থাকি, এ কালের প্রবন্ধ তার সীমাও অতিক্রম করে চলেছে।

কিন্তু, তারপরেও কথা থেকে যায়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, দেশের প্রতি যে প্রগাঢ় ভালবাসা এবং সামগ্রিক কল্যাণের যে বোধ রচনায় হৃদয়ের উত্তাপ ঢেলে দেয় এবং অন্য হৃদয়কে সহজেই আকর্ষণ করে, অধিকাংশে রূপস্রষ্টা ও প্রাবন্ধিকের মধ্যে তা লক্ষ্যকরভাবে অনুপস্থিত। বেশির ভাগ অধ্যাপক-প্রাবন্ধিকের কথাই পুনরায় উল্লেখ করা যায়। তাঁরা নির্দিষ্ট পঠনপাঠনের একটি স্বকীয় সীমায় মুখ্যত আবদ্ধ থাকেন বলে বিস্তৃততর পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অধীত বিদ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা বা ঐ গণ্ডীর বিশুদ্ধ টেক্‌নিক্যাল দিকের বিষয়গত তত্ত্ববিচার ও তর্কমীমাংসায় তাঁদের অধ্যবসায় ব্যয়িত। কিন্তু, ঐ টেক্‌নিক্যাল

আলোচনা বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত হতে পারে, প্রবন্ধকার সে-চিন্তায় উদ্বিগ্ন মন বলে সাধারণ পাঠকের নিকট সে আলোচনা প্রায় অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, এবং সেজন্যই প্রবন্ধবিষয়ে পাঠকের উৎসাহের অভাব। জীবনের সহিত সম্পর্কের অভাবে আমার ধারণা, মননের ঐশ্বর্যে আমরা পূর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হলেও যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত ও মূল্যায়নের মানদণ্ড এখনও পর্যন্ত অনায়ত্ত।

পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তাতে একটি মূল্যবান সত্য স্বীকৃত—অরণ্যের সৌন্দর্যোপভোগে তার সমগ্র চিত্রটি দৃষ্টিপথে প্রসারিত রাখা প্রয়োজন। এই মন্তব্যের অনুসরণে বলা যায়, একটি স্ব-মহিমায় স্থিত পুষ্পের সৌন্দর্য উপভোগের সময়ও পুষ্পটিকে তার অরণ্য সম্পর্কের সমগ্রতায় উপলব্ধি করা আশু প্রয়োজন। রসিকের হৃদয়-সংবেদনা সেই সমগ্রের উপলব্ধিতে প্রধান হাতিয়ার। যে কোন বস্তু অথবা বিষয়কে তার জীবনসম্পর্কের সমগ্রতায় উপলব্ধি করাই প্রকৃত পরিপ্রেক্ষিত এবং মূল্যায়নের মানদণ্ড; এবং তা আয়ত্ত করতেও হয় ইতিহাসচেতনা, সমাজচেতনা ও মানবিক অভিজ্ঞতার সঞ্চিত ভাণ্ডারের সহিত পরিচয়ের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য, সতীর অধ্যয়ন অধ্যবসায় এবং অনুশীলন-পরিশীলনের বিনিময়েই তা লভ্য। একথা সৃজনশীল সাহিত্যকর্মীর পক্ষে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য মননশীল প্রবন্ধকারদের সম্পর্কে। আসল কথা, আমাদের অর্থাৎ প্রবন্ধকারদের আরও প্রস্তুত হতে হবে; বিশ্বের বিদ্বৎসমাজে এবং সাধারণ পাঠকের দরবারে আপন উপস্থিতিকে অনিবার্য করে তোলার জন্যই তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে জ্ঞানানুশীলন ও জীবনজিজ্ঞাসার উজ্জ্বলতর আলোকে। এই নিত্য রূপান্তরশীল মানববিশ্বে চিন্তার দিগন্ত এমনভাবে বিস্তৃত হয়ে চলেছে যে, ঐ প্রসারের চিহ্ন যদি না আমাদের চৈতন্যে বর্তমান থাকে তো আমাদের ইতিমধ্যে অর্জিত সাধনা ও কৃতিত্ব আমাদের সম্মুখ দিকে প্রসারিত করতে পারবে না।

দেশ কাল ও বাস্তব পরিবেশ অনুযায়ী আমাদের পূর্বপুরুষবৃন্দ সাহিত্যের ও বোধের মান উন্নয়নের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টিত ছিলেন। 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদকরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণী মনন সর্ববিষয়ে এমন নিরলসভাবে ক্রিয়াশীল ছিল যে এমন আত্মসচেতন মন আজও দুর্লভ। বঙ্গদেশের কৃষক, সাম্য এবং কমলাকান্তের দপ্তরাংশের কোন কোন নিবন্ধে এমন বিশ্লেষণী প্রতিভার স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন যে, সিদ্ধান্তের বিভ্রান্তি সত্ত্বেও বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা আজও আমাদের বিমোহিত করে। ঐতিহাসিক তথ্যাদির সন্ধানে ও সত্যতা বিচারে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা আজকের ক'জন প্রাবন্ধিক সে নিষ্ঠার অধিকারী? অথবা, যে প্রজ্ঞাধর্মী মনন প্রমথ চৌধুরীর সমস্ত উক্তিকে একটা অপূর্ব প্রাখর্যে উজ্জ্বল করে রেখেছে, সে প্রাখর্য ক'জন আয়ত্ত করতে পেরেছেন? অর্থাৎ, কালের রূপান্তরশীল সত্তা যদি আমাদের চিত্তে নতুনতর ভাবনা, প্রেক্ষিত ও আদর্শের সন্ধান এনে দিয়ে থাকে তো সেই আদর্শকে জীবন ও উপলব্ধির জগতে সার্থক করে তোলার জন্য যে সদা-সচেতন মানস ও বাস্তিক অনুরাগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন তার অভাব যেন আমাদের চিত্তকে পঙ্গু না করে। আমাদের চিত্তকে প্রসারিত করতে হবে বুদ্ধির জগতে এবং জীবনের বিচিত্র প্রাঙ্গণে।

মুখোমুখি

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

দু'দিনেই কিন্তু ফুরিয়ে গেলো সব! আত্মহত্যার একটি নিষ্ফল ভাগ্য বিপর্যয়। একটি ঘর আর একটি সংসার।

অমন ফুটফুটে বৌ আর রুচি একটা মেয়ে। সংসারেও কোনো অভাব অনাটন নেই। বড়লোক বাপের একটিমাত্র ছেলে সুশান্ত। ঝকঝকে সৌখিন বাড়ি, সাজানো-গোছানো পরিপাটি ঘর।

বড়লোকের ঘরে বড়লোকের ঘর থেকেই মেয়ে এসেছে। তারি মিষ্টি চেহারা, আর মিষ্টি মন। শ্বশুর বাড়ির সকলেরই মন জয় করে ফেলেছে বিয়ের পর কয়েকদিনের মধ্যেই। শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়-পরিজন থেকে আরম্ভ করে বাড়ির চাকর-বাকর পর্যন্ত বৌরাণী বলতে অজ্ঞান।

কাজ-কর্ম কিছুই করবার দরকার নেই—স্বচ্ছল পরিবারে লোকজনের অভাব কী? তবুও বৌরাণী মল্লিকা কোনদিক না দেখে?

রান্নাঘরে শাশুড়ির আর যাওয়ার দরকার কী? পাচক ঠাকুরকে সেই নির্দেশ দেয়—কী রান্না হবে! আনাজ-তরকারি কোটা—তাও নিজে হাতে করে।

সবাই হাঁ-হাঁ করে আসে—'আমরা থাকতে তুমি কেন বৌরাণী?'

'তা আমার আর কাজ কী? সারাদিন কী শুধু শুধু বিনাকাজে চুপ করে বসে থাকা যায়?'

না, তা যায় না। তাই শ্বশুরের খাওয়ার সময় সামনে বসে পরিবেশন করা, শাশুড়ির পুজোর ঘরে নৈবেদ্য সাজানো থেকে আরম্ভ করে নিজের নিজস্ব ঘরে টুকিটাকি কাজ। সেলাই বোঁড়াই, ঘর-দোর সাজানো-গোছানো, আর স্বামীর পছন্দ মতন সৌখিন রান্না-বান্না বৌরাণী মল্লিকারই কাজ। মুখে তার মিষ্টি হাসি—চোখ ভরা আষাঢ়।

মল্লিকা নিজেই উদ্যোগী হয়ে পাঠিয়েছিলেন। সুশান্তকে বিলাতে বিজনেস্ অরগানিজেশন পড়বার জন্যে।

শ্বশুরের অতো বড়ো ব্যবসাকে সুষ্ঠুভাবে চালাতে আরো বৈজ্ঞানিক জ্ঞান কেন সঞ্চয় করে ফিরুক না সুশান্ত।

মল্লিকার এ প্রস্তাবে বাড়ির কর্তা খুশিই হয়েছিলেন। এখানে সুশান্ত লেখাপড়ায় তেমন এগিয়ে যেতে পারেনি। বিদেশের একটা ছাপে মর্যাদা তবু কিছু বাড়ে।

সুশান্তের কিন্তু চোখ ছলছল করছিলো, 'তোমায় ছেড়ে থাকবো কেমন করে?'

মল্লিকা বললে, 'তুমি বড়ো হয়ে এলেই তো আমার পতি-সৌভাগ্য! কীসের অভাব তোমার? ঘুরে থাকলেও তুমি আমারই থাকবে, আর আমি তোমারই থাকবো। আর যে আসছে সেও জানবে, বাবা তার বিলেত-ফিরৎ কৃতবিদ্য।

মল্লিকার তখন সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

তবু সুশান্তের মনটায় কেমন আশঙ্কা,—'আমি থাকবো বিদেশ বিভূঁইয়ে আর তোমার এই অবস্থা!'

মল্লিকা বললে, 'আজকাল কী আর সত্যিকার বিদেশ-বিভূঁই। প্লেনে কতোক্ষণের পথ?'

সুশান্ত মনে নিলে, 'তা অবিশ্যি ঠিক।'

'মাত্র ওরেক বছরের কোর্স। আর এই ওরেক বছরে আমিও পড়াশুনায় কলেজের দরজায় এসে পৌঁছাবো।

'তুমি পড়াশুনা করবে?'

'হ্যাঁ। বাবাকে বলেছি। তিনি রাজি। তুমি না থাকলে আমার আর কাজটি কী?'

'বাচ্চাটা?'

'তার জন্যে বাড়িতে লোকজন কী কম?'

'বেশ।' খুশিই হয়েছিলো সুশান্ত।

এবার ৺পূজায় সিমেন্সের SIEMENS INDIA অনবদ্য ৪টি প্রীতি উপহার

স্পেশাল সুপার ৬৯২ ডব্লিউ ও

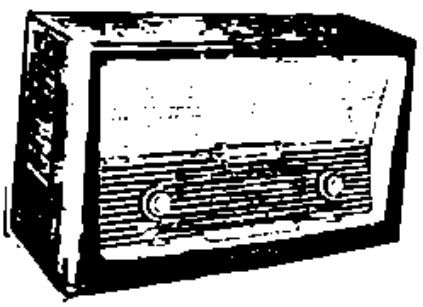

এ সি ও এ সি/ডি সি। ৬ ভালব, ৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৮+৩ পুশ বাটন, ৩ লাউড স্পীকার।

মূল্য ৫৭১৲ ও স্থানীয় কর।

গ্র্যাণ্ড সুপার ৭৯০ ডব্লিউ (এ সি)

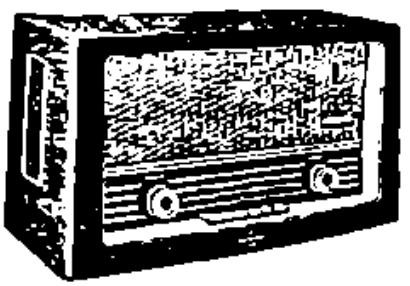

৬ ভালব, ৪ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৮+৫ পুশ বাটন, ৫ লাউড স্পীকার।

মূল্য ৯৯৩৩ ও স্থানীয় কর।

.... সুপার অার এ-১০১। এসি ও এসি/ডিসি। ট্রানজিস্টর মডেল—২৭০৲ ও স্থানীয় কর।
স্ট্যাণ্ডার্ড সুপার—৬৯১ ডব্লিউ ও। এসি ও এসি/ডিসি—৪১৫৲ ও স্থানীয় কর।

আপনার নিকটবর্তী অনুমোদিত ডিলারের নিকট অনুসন্ধান করুন।
পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও আন্দামানের
পরিবেশক:
নান এণ্ড কোং ৯এ, ডালহৌসি স্কোয়ার, কলিকাতা
৩২বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

পাঁচবছর। পাঁচবছরে কৃতকার্য হয়ে ফিরতে পারলো না সুশান্ত।

ফিরেছে অবিশ্যি। পাঁচবছর বিলেতে থেকে, বিলিতি মার্কা জামার অভাব হয়ে।

বাবা দুঃখ করলেন, 'শুধু শুধু কতোকগুলো টাকার অপব্যয়।

মা বললেন, 'তা'তে আর কী? তোমার তো অভাব কিছুই নেই—বুঝে-সুঝে চলতে পারলে ওর অভাব কী?

'বুঝে-সুঝে চলার স্বভাবটিই তো খুইয়ে এসেছে।'

মায়ের কণ্ঠে আর্তি, 'কাটা ঘায়ে এর ওপর তুমি আর নুনের ছিটে দিওনা। বেচারি একেই তো মরমে মরে আছে। দেখছো না, ওর মুখ চোখের অবস্থা! আর এইজন্যেই তো আমি বলেছিলাম কাজ নেই বিলেত পাঠিয়ে। আমাদের একটি মাত্র ছেলে।'

মল্লিকাও আঘাত পেয়েছিলো। নিজে পড়াশুনায় অনেকখানি এগিয়ে গেছে সে। স্কুল ফাইনাল পড়তে পড়তে এ-বাড়ির বধূ হয়ে এসেছিলো। পাঁচবছরের মধ্যে একটি ফুটফুটে সন্তানের জননী হয়েও সে স্কুল ফাইনাল থেকে আই-এ পাশ করে থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে উঠেছে। দর্শন শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি-এ পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

স্বামীর অসার্থকতা নয়, আর একটি পরাজয়, পরাভব তার মনকে দুমড়ে মুচড়ে দিলে। নিজের প্রতিই তার ঘৃণা, তার নারীত্বের প্রতি অবিশ্বাস! স্বামী তার জৈব লালসায় পরিতৃপ্ত হয় নি—তাকে স্ত্রীরূপে পেয়ে।

কথাটি জানাজানি হয়ে গেলো। চারিদিকে ছিছিকার।

সহানুভূতির মধ্যেও এতো যে পীড়ন থাকে, মল্লিকা তা এই প্রথম জানলো।

আর তাথেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে কোলের মেয়েটিকে নিয়ে সে কদিনের জন্যে বাপের বাড়িতে চলে গেলো।

শ্বশুর ব্যবসায়ী; কিন্তু মন বোঝেন তিনি। তিনি এতে সায় দিলেন। টাকা দিয়েও যদি মেটানো যায় পরোক্ষে সেই চেষ্টাই করছিলেন তিনি। লণ্ডনে এক হোটেল পরিচারিকার সঙ্গে ব্যাভিচারে যুক্ত হয়ে সুশান্ত যে অঘটন ঘটিয়েছে—তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দুঃসাধ্য। সে মেয়েটিরো সন্তান-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কিন্তু আর এক কাণ্ড করে বসলো সুশান্ত।

শোওয়ার ঘর অর্গলবদ্ধ। চাকর এসে সকাল বেলা ডেকে ডেকে সাড়া শব্দ পায় না। সবাই জড়ো হলো ঘরের দরজায়। দরজা-জানলা সবগুলিই ভিতর দিক থেকে বন্ধ।

অগত্যা দরজা ভাঙতে হলো। আর ভাঙা দরজার ঘরে ঢুকে যে বীভৎস দৃশ্য দেখা গেলো—তাতে সবাই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো।

কড়িকাঠে ঝোলানো দড়িতে সুশান্তের মৃতদেহ। চোখদুটি ঠিকরে বার হয়ে এসেছে—একহাত জিভ বেরিয়ে পড়েছে। সুশান্ত আত্মহত্যা করেছে।

সবাই কাঁদলো। আত্মীয় স্বজন, পরিবার বর্গ। পাড়া প্রতিবেশি পর্যন্ত হায় হায় করে উঠলো।

কাঁদলো না শুধু দু'জন। মল্লিকা আর মল্লিকার শ্বশুর।

বাপের বাড়িই ফিরে যাবে মল্লিকা।

শুধু মল্লিকা কেন, শাশুড়ি আত্মীয়-পরিজন এমন কী চাকর-বাকররা পর্যন্ত একথাই বলবে 'এ-বাড়িতে কী আর থাকা যায়!'

মল্লিকার শ্বশুর বাড়ি বেচতে চেয়েছিলেন।

মল্লিকাই বাধা দিলে সেবার, 'এমন বাড়িটা বেচে দেবেন বাবা?'

'সবাই যখন গেলো, তখন আর শুধু ইঁট কাঠ লোহার মায়া কেন মা?'

শ্বশুরের কথায় মল্লিকা বললে, 'না, তা নয় বাবা।'

'তবে?'

'কিছু যদি তবু থাকে!

'তুমি থাকতে পারবে?'

'কেন পারবো না বাবা। আমাদের তো কোনো অন্যায় নেই। যার অন্যায় সেই তো তার প্রায়শ্চিত্ত করে গেলো।'

শ্বশুর দেখলেন পুত্রবধূর চোখের দিকে। বললেন, 'তবে তাই হোক মা। এই বাড়িতে থেকেই আবার তুমি পড়াশুনা করো।'

পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য

ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মনোজ্ঞ মুখবন্ধ

ও

ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্তের তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সম্বলিত

জাতীয় স্বদেশপ্রেম ও সংগ্রাম-চেতনার মহত্তম প্রকাশ

মাতৃবন্দনা

ব্রিটিশ-শাসনের অত্যাচার ও শাস্তিকে উপেক্ষা করে দেশপ্রেমের গান ও কবিতা রচনা করে যাঁরা জাতিকে মন্ত্রমুগ্ধ দীক্ষিত করেছেন, তাঁদের সেই সব দুষ্প্রাপ্য বিস্মৃতপ্রায় বিখ্যাত রচনার সংকলন। রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১) থেকে আরম্ভ করে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১৩০ জন কবির ১৯১টি কবিতার বিরাট সমাবেশ। বাংলায় এ ধরণের প্রচেষ্টা এই প্রথম। শারদ উৎসবকে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ ও সার্থক করবে।

প্রবীণ শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত। দাম : ৫'৫০

মাতৃবন্দনার পরিপূরক

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য

চীনা-আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রমুখ

পঁচিশজন কবির অগ্নিগর্ভ কবিতার সংকলন। ২'০০।

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ, ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রৌঢ় অধ্যাপক মল্লিকাকে পড়ান। দর্শন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইংরেজি সাহিত্যেও প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর।

দেড়শো টাকা মাইনে দিয়ে বেশ যত্ন করেই পড়ান মল্লিকাকে। মল্লিকা সসম্মানে ফিলজফিতে সেকেণ্ডক্লাস অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করলো।

শ্বশুরের একাগ্র ইচ্ছা মল্লিকা পড়াশুনায় এগিয়ে যাক্। আরো পড়ুক শুনুক!

শাশুড়ি বাধা দিয়েছিলেন, 'আর কেন? অনেক তো হলো!'

'কী আর হলো? বি-এ পাশ করেছে। এম-এ পড়ুক মল্লিকা!'

'কেন? বৌ কী আবার মাষ্টারি করবে? না, চাকরি করবে?'

'কিছু করারই দরকার হয়তো হবে না। তবুও কী নিয়ে থাকবে ও?'

'কেন? ঘর-সংসার, আত্মীয়-পরিজন?'

'সে তো আর ওর কিছু নয়।'

'তবে কার?'

'সে তো আমাদের। যাকে নিয়ে ওর বন্ধন সেই নেই যখন!'

শাশুড়ির কথায় পুরোনো শোক উথলে উঠলো আবার সুশান্তর মায়ের।

'সেইজন্যেই তো প্রথমে আপত্তি করেছিলাম আমি। কী হবে সুশান্তর বিয়ে ও দিয়ে। আমার কথা কী শুনলে? শ্বশুর-বৌ-এ মেতে উঠলে দু'জনে!'

'এর সঙ্গে মল্লিকার পড়ার কী সম্পর্ক?'

'সম্পর্ক হচ্ছে তার বাইরের জীবন। পরপুরুষ মাষ্টারদের কাছে পড়া।' স্পষ্ট করেই কথাগুলি বললেন শাশুড়ি।

কিন্তু মল্লিকা তবুও পড়তে লাগলো। দিন দিন পড়াশুনায় মেতে উঠছে। প্রৌঢ় অধ্যাপক দেখেছেন ছাত্রীর মেধা। মাস গেলে দেড়শো টাকার অঙ্কটাই সব কিছু নয়। অনেকক্ষণ ধরে পড়ান তিনি।

শাশুড়ির ঠাকুরঘর, শ্বশুরের খাওয়ার পরিবেশনা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, সংসারটাকে নিজের হাতে সুনিপুণ ভাবে সাজানো-গুছানো—এমন কী নিজের নারী-জীবনের সবচেয়ে বেশি অবলম্বন ছ'বছরের মেয়েটির প্রতিও কোন দৃষ্টি নেই মল্লিকার। শুধু পড়া আর পড়া।

শাশুড়ি বলেন, 'বৌমার এ-হচ্ছে আত্মহত্যা।'

শ্বশুর বলেন, 'না, এ-আত্ম-উন্নয়ন। সংসারের দিকে তাকিয়ে সংসার-সর্বস্ব মন করে যে আত্মহত্যা করেছিলো সেই মৃত্যু থেকে এইবার জীবনের পথে ফিরে আসছে মল্লিকা।'

মল্লিকা এম-এ পরীক্ষায় দর্শন শাস্ত্রে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় জোড়া তার নাম।

এতোদিন পড়াশুনায় মেতে সব কিছু ভুলেছিলো মল্লিকা। এখন সে করবে কী? তার সার্থকতায় সংসারের সকলেরই আনন্দ। শ্বশুর তো আত্মহারা—পুত্রবধূর গৌরবে সম্ভ্রান্ত তাঁর পরিবার। এতোদিন ছিলো বিত্তশীল; এইবার মননশীল। মননশীল-সমাজে তাঁর পরিবার আজ আত্ম-প্রতিষ্ঠিত। মল্লিকা শুধু তাঁর পুত্রবধূ নয়—তাঁর আত্মার একটি ইচ্ছা। একটি প্রবল বাসনা। নিজে লেখাপড়া শেখবার অবকাশ এবং সুযোগ পাননি। একটি মাত্র ছেলেও সে ইচ্ছা পরিপূরণ করতে পারে নি। মল্লিকা তাই করেছে।

আর প্রৌঢ় অধ্যাপক—দেড়শো টাকার মাস মাইনের বিনিময়ে যিনি তাঁর সমস্ত উদ্যমকে নিয়োজিত করে এসেছেন মল্লিকার শিক্ষকতায়, তাঁকে কী দিয়ে পুরস্কৃত করা যায় ?

মল্লিকার হাত দিয়েই একখানা হাজার টাকার চেক পাঠিয়ে দিলেন মল্লিকার শ্বশুর।

প্রৌঢ় অধ্যাপক, অধ্যাপনা যাঁর জীবিকা-বৃত্তি—হাজার টাকার পুরস্কার তাঁর কাছে অভিপ্রেতকর নয়।

কিন্তু এ কী হলো ?

'পড়ার বিনিময়ে তোমাকে পড়াইনি মল্লিকা। জীবনে যা কোনদিন করি—তাতে আমার দিন ভালোভাবেই কেটে যায়।'

অধ্যাপকের কথায় মল্লিকার বিস্ময় জাগে।

'তবে ?'

'নাই বা শুনলে সে-কথা !'

'আপনি তো জানেন আমার জীবন। কিছুই তো লুকোইনি আপনার কাছে। বন্ধুর মতোন আপনি আমাকে সহানুভূতি জানিয়েছেন। জীবনকে ভুলে থাকার রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।'—মল্লিকার কণ্ঠে আর্দ্রতার স্বর।

আর সেই স্বরের সঙ্গে প্রৌঢ় দর্শনের অধ্যাপকেরও কী নিবিড় সংযোগ। আশ্চর্য ! এতোদিন এতো কাছে থেকেও মল্লিকা তা জানতে পারেনি ?

'আমিও জীবনকে ভুলে থাকার জন্যেই তোমাকে পড়াতাম। তোমাকে পড়াতে পেয়ে আমি সবকিছু ভুলে গিয়েছিলাম। ছ'বছর আগে মনের বছরের বিবাহিতা স্ত্রী আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে। সংসারে আমার কোনো অবলম্বনই নেই আর।'

'কোথায় ? কোথায় গেছেন তিনি ?' মল্লিকার কণ্ঠে বিস্ময়ের প্রশ্ন !

প্রৌঢ় অধ্যাপক জবাব দিলেন, 'আর একজনের সঙ্গে।'

'কেন ?'

'আমি তাকে সন্তান দিতে পারিনি। তার ব্যবহারিক-জীবনের দাবি, সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারিনি কিছুই।'

ঘরের নিওনের আলোয় চোখগুলো হঠাৎ যেন অন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত ঘর অন্ধকারে ঠাসা। সেই অন্ধকার থেকে আবার যখন আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালো মল্লিকা তখন দেখলো প্রৌঢ় অধ্যাপক আর সেখানে নেই।

সেখানে দাঁড়িয়ে কড়িকাঠে ঝোলানো ঘড়িতে সুশান্তর মৃতদেহ—বীভৎস, ভয়ঙ্কর।

লঘু-ত্রিপদী

আশাপূর্ণা দেবী

রাত বেশ বেশী হয়ে উঠেছে। রাস্তায় যানবাহন বিরল হয়ে না এলেও, হালকা হয়ে এসেছে। নিমন্ত্রিতেরা অনেকেই বিদায় নিয়েছেন, অনেকে নিচ্ছেন। একে একে দুইয়ে দুইয়ে গাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে প্রতাপ রায়ের গেটের বাইরে থেকে। যে গাড়ীগুলি এতক্ষণ মসৃণ গম্ভীর চেহারা নিয়ে লম্বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছিল এ রাস্তা থেকে ও রাস্তার মোড় পর্যন্ত।

প্রতাপ রায় যারা গেছেন অনেক দিন, তবু পাড়ার লোকে এখনো প্রতাপ রায়ের বাড়ীই বলে। হয়তো বর্তমান মালিক সেই পুরনো নামটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেনি বলেই ওদের পুরনো অভ্যাসটা থেকে গেছে।

বর্তমান মালিক অবশ্য এখন দু'জন। প্রদীপ রায়, আর তার অবিবাহিত ছোট ভাই সন্দীপ রায়। প্রতাপ রায়ের দুই ছেলে।

প্রদীপের বয়েস চল্লিশ পার হয় হয়, বয়সের কাছটা খুঁজলে এক আধটা রুপোলি রেখা চোখে পড়ে। মাথার মাঝখানে টাকের আভাস, তবু সবল স্বাস্থ্যবান দীর্ঘোন্নত দেহটি যেন রাজকীয় মহিমায় অনেকের মধ্যে মাথা উঁচিয়ে থাকে। প্রদীপের চেহারা বাবা বসানো। ষাট বছরে মারা গিয়েছিলেন প্রতাপ রায়, এমনি লোভা সতেজ।

সন্দীপ অন্যরকম।

সন্দীপ তার মায়ের মত ছোট খাটো গড়নের। মুখের লাবণ্যে আর চিবুকের সৌকুমার্যেও বারে বারে তার মায়ের মুখ মনে পড়িয়ে দেয়।

আকৃতিটা মায়ের ধরণের। কিন্তু প্রকৃতিটা?

সে কী মায়ের মত মৃদু মধুরভাষিণী? না বাপের মত দৃঢ় অনমনীয়? প্রতাপ রায় দৃপ্ত ছিলেন কোমল, কিন্তু ভিতরের মানুষটি একেবারে ইস্পাত। সন্দীপ কি তেমনি? তুলনা করে দেখবার উপায়ও নেই। আর এখন, বাপ প্রতাপ রায় আর মা কল্পনা রায় দু'জনেই এখন ছবি হয়ে দেওয়ালে ঝুলছেন। দুই ছেলে আর দুই মেয়ে এই চারটি সন্তানের সব ছোট সন্দীপের প্রকৃতি গঠিত হবার আগেই তাঁরা মেয়াদে উঠেছেন।

তবু গঠিত হয়ে ওঠার পর দেখা গেল সন্দীপের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত দুই প্রকৃতির লীলা। সেই দুই বিপরীত যেন মেঘ ও রৌদ্রের মত ক্ষণে ক্ষণে তার নিজস্ব ব্যক্তিসত্তার উপর ছায়া ফেলে ফেলে চলে। যে সত্তাকে সন্দীপ জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে একান্ত নিষ্ঠায় লালন করে আসছে।

কে জানে সেই ছোটবেলা থেকে কে সন্দীপকে মাথায় দিব্যি দিয়েছে সকলের থেকে স্বতন্ত্র হতে, এ বাড়ির মত না হতে।

কে বলেছে জানা নেই, তবে সেই অদৃশ্য শক্তির নির্দেশ যে মেনে আসছে আবাল্য।

অতএব সন্দীপ এই সুখ শান্তিময় রায় বাড়ীতে অশান্তির দুঃখের আগুন, এই নিরুপদ্রব বাড়ীতে নীরব উৎপাত।

প্রতাপ রায়ের বাড়ীর একটা আভিজাত্যের ঐতিহ্য ছিল। বড়ছেলে, প্রদীপ রায় সেটি সযত্নে এবং সমহিমায় রক্ষা করে আসছে। রায়েদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীদের মধ্যে এখন আর কাউকেই ন বছরের ছেলের পৈতে দিতে দেখা যায় না, কেউবা যে কোনো বয়সে দেয়, কেউবা বা একেবারে ছেলের বিয়ের সময় একই নান্দীমুখে চালিয়ে দেয়। কিন্তু প্রদীপ কুলপ্রথার ধারা বজায় রেখেছে। ন বছরের ছেলের পৈতে দিয়েছে সে।

আজকের উৎসব সেই উপলক্ষেই।

ছেলে উজ্জ্বল দীপ 'দত্তী ঘর' থেকে বেরিয়েছে কাল, আজ ভোজ। আয়োজন যেমন প্রচুর হয়েছিল আতিথেয়তাও তেমনি মনোমুগ্ধকর। আড়ালে সকলেই বলাবলি করছিল, 'ঠিক বাপের গুণটি পেয়েছে।' এও বলছিল, 'এ বাজারে এত করতে ক'জন পারে? টাকা থাকলেও পারে না। শুধু ধন থাকলেই হয় না মন থাকা চাই।'

এ ধরণের কথাবার্তা অবশ্য আত্মীয়রা এবং বয়স্ক বয়স্করাই বলছেন, যাঁরা প্রতাপ রায়ের আমলে আসা যাওয়া খাওয়া মাখা করেছেন।

যাঁরা নতুন, যাঁরা প্রদীপের বন্ধুজন, অফিসের 'বস্', তাঁরা বিস্মিত হয়েছেন। ঘটার জন্যে নয়, সৌজন্যের জন্যে। শুধু যে নিমন্ত্রিতদেরই আদর আপ্যায়ন করেছে প্রদীপ তা নয়। বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এসে, প্রত্যেকটি গাড়ীতে খোঁজ নিয়েছে ড্রাইভারকে খাবার দেওয়া হয়েছে কি না।

মাধুরী বলেছিল, 'নীচের তলায় টেবিল পেতে ওদের সবাইকে একেবারে বসিয়ে খাইয়ে দিলে তো হতো।' প্রদীপ তা'তে রাজী হয়নি। বলেছে, 'তা কেন খাবে ওরা? ওরাও ভদ্রলোকের ছেলে, ওদের কি আত্মসম্মান বোধ নেই? নেমন্তন্নর চিঠি তো দিইনি আমি ওদের!···মিষ্টি, খাবার, এসব যে কারুর বাড়ীতে বেড়াতে এলে খাওয়া যায়!'

তাই বিখ্যাত একটি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান থেকে 'বাক্স' করিয়ে এনেছে প্রদীপ এদের জন্যে। চার পাঁচ রকম মিষ্টি, তার সঙ্গে বাড়ীর তৈরি চপ্, ক্রাই। জনে জনে গিয়ে প্রশ্ন করছে, মিষ্টি একটু মুখে দিয়েছেন তো? আমার ছেলের জন্যে শুভেচ্ছা রাখবেন সকলে—' ইত্যাদি।

বাবা প্রতাপ রায় নিজের বাড়ীর, আত্ম কুটুম্বদের বাড়ীর, এবং পড়শীর বাড়ীর, যত চাকর বাকরদের ডেকে নিমন্ত্রিতদের মত সযত্নে সামনে দাঁড়িয়ে খাওয়াতেন, 'আপনি' না বলুন 'বাবা' বলতেন।

প্রতাপ রায়ের বাবা প্রতাপ রায় খাওয়াতেন তাঁর যত প্রজা পাঠকদের—বলতেন 'খা বাবা, ভাল করে পেট পুরে খা। তোদের মুখেই নারায়ণ খান।'

পুরুষানুক্রমের ঐতিহ্য এদের এই গরীব বড়লোক নির্বিশেষে যত্ন করা সৌজন্য দেখানো। কিন্তু এ যুগে এটা দুর্লভ বলে অনেকেই বিস্মিত হচ্ছে প্রদীপের নিরহঙ্কারিতায়। এতে প্রশংসাও করছে তাই।

কিন্তু এদিকে যতই নিখুঁত কাজ করে তোলার আনন্দ লাভ হোক। মনের ভিতরটা অবিরতই খুঁত খুঁত করছিল প্রদীপের। বিশেষ করে শেষের দিকে।

বাড়ীতে এতবড় একটা কাজ সকাল থেকে সন্দীপের দেখা নেই। সেই কোন সকালে না কি

দিদি বৌদি অনুরোধ উপরোধ করে বাড়ীতে তৈরি মিষ্টি কিছু চাখিয়ে ছিল তাকে। আর তখনই সে না কি খাওয়ার অযাব দিয়েছিল। বলেছিল, 'ব্যস, এ বেলার মত নিশ্চিন্দি। আর কিছু খেতে হবে না। অতএব শ্রীমান সন্দীপ রায় আজকের মত নিরুদ্দেশ হতে পারে না।'

কিন্তু সেই কথাটা যে সত্যি একটা কথার মত কথা বলে গণ্য করতে হবে, তা' কে ভাববে? এত চক্ষুলজ্জাহীন হবে বাড়ীর ছেলেটা?

এই যে আয়োজনটি হ'ল তার জন্যে তো আঙুলটি নাড়েনি। সব প্রদীপ, আর প্রদীপের অফিসের কটি অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র। ছোড়দি একবার বলেছিল, 'আচ্ছা তোর কি চক্ষুলজ্জার বালাই মাত্র নেই? বাড়ীর একটা কাজ করবিনা তুই? কেন দাদাকে একটু সাহায্য করতে পারিস না?'

সন্দীপ হেসে উঠেছিল, 'আমার ওপর কে ভরসা রাখছে বাবা?'

'ভরসা রাখবে কিসের ভরসায়? তুমি কোনো কাজে এগোও? কেন, বলতে পারিসনি, দাদা, বল তোমার কোন কাজ টাজ যদি—'

'থাক্ ছোড়দি! সমুদ্র বন্ধনে কাঠবিড়ালীর ভূমিকা গ্রহণের বাসনা আমার নেই।'

'তা' বীর হনুমানের ভূমিকা নিতেই বা বাধা কি ছিল? বড় হয়েছিস এখন দাদার ডান হাত হবার কথা তো তোরই।'

'সর্বনাশ! অলজ্যান্ত দু' দুটো হাত যার দু কাঁধের নীচে ঝুলছে, তার ডান হাত! তার মানে সেই নিরীহ ভদ্রলোকটিকে 'ভিন গেয়ে গরুর' মত একটি কৌতুক দৃশ্য করে তোলা। বৃদ্ধ নয়, স্থবির নয়, অশক্ত নয়, যাকে বলে একটি 'ম্যান'! তার কনুইয়ের কোণা থেকে কিম্বা পিঠের পাটাতনের খাঁজ থেকে বাড়তি একটা ডান হাত হয়ে বেরোবার দরকারটা কি বল? 'এতবড় একটা আয়োজন' নিশ্চয়ই তিনি বাড়তি কোনো ডান হাতের আশায় ফাঁদেন নি?'

'ছোড়দি রেগে বলেছিল, 'তা' বাড়ীকে তুই বাড়ী ভাববি না?'

'এই দেখ! বাড়ীকে বাড়ী ভাবিনা তো কি মাঠ ভাবি? বাড়ী ভাবি বলেই তো যখনই ইচ্ছে বেরোই, যখন ইচ্ছে ফিরি, অথচ হাতের কাছে খাবারটি প্রস্তুত রয়েছে দেখে বিধায় কুণ্ঠিত হইনা, অবলীলায় হাত বাড়িয়ে মুখে তুলি।'

'খাওয়ার কথা বলিস না। যা খাস তা তো জানতে বাকী নেই। শ্বশুর বাড়ীতেই না হয় থাকি তা বলে জানি না কি? বৌদি কত দুঃখু করে, তুই কোনো ভাল জিনিস খাস না বলে। তুই নাকি বলিস ভাল খাবার উপায় নেই, যাবতীয় সুখান্তে তোর এ্যালার্জি—'

'বানিয়ে বলি ভেবেছিস? মোটেই না। সত্যিই ওই সব 'সু' জিনিসটাতেই আমার এ্যালার্জি। তাই আর তোদের মনের মত 'সু' হতে পারলাম না।'

'তাতো দেখছিই। 'সু' তো হসনি, হয়েছিস একখানা চটি। চ্যাটাং চ্যাটাং করেই আছিস। ভাবতাম আমার ননদের সঙ্গে তোর বিয়ের চেষ্টা করবো, কিন্তু—'

'উঃ ভাবনাটা যে কাজে পরিণত করনি, এর জন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ!

'কেন আমার ননদ কি এত সস্তা?' রাগ করে বলেছিল ছোড়দি, প্রণতি চৌধুরী, দেখতে খারাপ? মুখ্যু?'

'সম্পূর্ণ উল্টো। আমি বলতে চাইছি সেই দিব্যি সুন্দরী মহামূল্যবান বস্তুটির জন্যে, এই তিন নয়া পয়সা দিয়ে যে বাজারে এগোওনি, এর জন্যেই ধন্যবাদ।'

'তা' বলে নিজেকেও কিছু এমন অধম ভাবার দরকার নেই। বাবার বিজনেসের অর্ধেকের মালিক তো তুই? এতবড় বাড়ীটারও—'

'এইবার হঠাৎ বড় বেশী সিরিয়াস হয়ে যাচ্ছিস ছোড়দি, বরদাস্ত হবে না। আমার আবার ওতেও এ্যালার্জি।'

এরপর ছোড়দি উঠে গিয়েছিল রাগ করে। এসব কথা হয়েছিল, ক'দিন আগে যখন এসেছিল প্রস্তুতি, দাদার ছেলের শুভ উপনয়নের প্রস্তুতি পর্বের মিটিঙে।

তা সে যাক।

আজ সন্দীপের এ কী ব্যবহার!

অভ্যাগতরা বিদায় নেবার সময় প্রায় সকলেই মৃদু আক্ষেপ জানাচ্ছেন, 'তাইকে দেখলাম না।' নিকট আত্মীয়া মহিলারা জায়গায় জায়গায় দল বেঁধে সমালোচনার পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। কেউ এপক্ষে, কেউ ওপক্ষে।

যাঁরা প্রদীপের সৌজন্যকে 'চাল' বিনয়কে 'উদাসিকতা', এবং আয়োজনের প্রাচুর্যকে 'বড় মানুষী' বলে গণ্য করেছেন তাঁরা বলছেন, 'ও এই রকমই করে বলে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে হবে? ভাবনা করতে হবে না! খায়নি নাকি সারাদিন। আশ্চর্য! সত্যি একটু তো দুশ্চিন্তা দেখছি না! এই দিনকাল, এই রাস্তা কলকাতার! এ্যাকসিডেন্ট তো হলেই হল। মা বাপ থাকলে এভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারতেন তাঁরা?'

অবশ্য সংখ্যায় এঁরাই নগণ্য।

বেশীর ভাগ লোকেই সন্দীপের নিন্দাবাদ করছে। এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন, এবং মায়া-মমতাহীন ছেলেই যে আজকাল ঘরে ঘরে, একথাও বলছে সবাই। বাড়ীকে এরা 'আপন' ভাবতে পারে না কেন এ রহস্যেরও কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা হচ্ছে।

এঁদের মধ্যে রথীও আছেন, পদাতিকও আছে। ডেক্রন টেরেলিনও আছে, আদি কাঁচি ধুতিও আছে। সোল্ডারকাট্ও আছে, চারদিনারও আছে।

আবার ওদিকে, মানে অন্দরে বলছি না, অন্দর অন্তঃপুর ইত্যাদির বিভাগ তো এখন আর নেই। সম্ভ্রান্ত ঘরে তো আরোই নেই। প্রশ্নই নেই। তবে আভিজাত্যটা বিধাতার সৃষ্টি, তাই সাজে সজ্জায় চলনে বলনে তফাৎটাও আছে।

ওদিকে তাই যেমন ঘাটো চুল, বড় নখ, ঠোঁটে রং, পিঠে-ছাটেরা আছে, তেমনি সোনা চুড়ি, মোটা হার, শান্তিপুরী জরিপাড়েরাও আছেন।

সামাজিক কাজে সমাজের সর্বস্তর থেকেই কিছু কিছু লোক আহরণ করে এনে একত্রে জড় করতে হয়। এ ওকে দেখে ঠোঁট ওল্টায়, ও একে দেখে হাসে। তবে যদ্যপি এই দু' পক্ষেরই আলোচনার কান পাতুন, আলোচনার বিষয়বস্তু এক।

সেই আদি ও অকৃত্রিম।

সেই অনন্তকালের ঐতিহ্যবাহী।

সেই আত্ম গরিমা ও পরচর্চা।

প্রেম যেমন যুগে যুগে, এও তেমনি যুগে যুগে। মানব মঙ্গল গ্রহেই পৌঁছুক আর চাঁদেই হাত ঠেকাক, এটা থাকবে। দু'জন একত্র হলেই চলতে থাকবে।

থাকবে।

অতএব আছে।

এখানেও এতক্ষণ ছিল। চায় চলছিল তার। ক্রমশঃ হালকা হয়ে এল, থেমে গেল। একে একে দুইয়ে দুইয়ে অনেকগুলি গাড়ী ছেড়ে গেল. বাকীগুলিও যাচ্ছে। যেগুলো আছে, মানে মহিলাদের 'শেষ গল্প' ফুরোবার অপেক্ষায় বাবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের চালকরা এবং মালিকরা ঘন ঘন হাত উল্টে ঘড়ির কাঁটার গতি নিরীক্ষণ করছে।

শেষের দলের একজন, শেষ আক্ষেপ জানালেন 'ভাইয়ের সঙ্গে আর দেখা হল না।'

ইনি প্রদীপের এক দূর সম্পর্কের ভায়রাভাই, এবং আপাততঃ একটি বিয়ে দেওয়া যার কন্যার পিতা। সস্ত্রীক সভায় এসেছেন, এবং ইচ্ছে ছিল এই সুসজ্জিতা কন্যাটিকে একবার সন্দীপের দৃষ্টিপথে ফেলেন। প্রত্যেক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার মত তাঁরও ধারণা ছিল একবার পাত্রের দৃষ্টিপথে পড়ানো নিয়ে কথা। যেমন ধারণা থাকে প্রত্যেকটি নতুন লেখকের মনে। একবার পাঠকের নজরে পড়তে না দেরী।

টালবাহানা করে আর কতক্ষণ থাকা যায়? অতএব বিদায় নিলেন তাঁরা। এবং পরপর সকলেই। বিবাহিতা বোনেদের যদি বহিরাগতের দলে ফেলা যায় তো ওই দুটি বহিরাগত পরিবার এখনো রইল। সন্দীপের বড়দি বড় জামাইবাবু, তস্য পুত্র কন্যা, ছোড়দি এবং তস্য তস্য।

প্রদীপের থেকে অবশ্য বোনেরা ছোট। প্রদীপে আর সন্দীপে তাই বয়সের এত তফাৎ। কম বয়সে মা বাপ-হারা ছোট ভাইকে প্রদীপ মা বাপ বড় ভাই তিনজনের স্নেহ ঢেলে মানুষ করতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্দীপের সেই নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই টের পেল প্রদীপ হাতের চেয়ে আধটা তার বড়। ওকে হাতের মধ্যে ধরা যাবে না। যাবেনা স্নেহের বন্ধনে বেঁধে রাখা।

স্নেহ ভালবাসা মমতা প্রীতি এই সেন্টিমেন্টের ব্যাপারগুলো তার কাছে হাস্যকর ছেলেমানুষি।

আর সেই অতটুকু বেলা থেকে ছোট একটা ছেলে যেন বাড়ির সমস্যা। মাধুরী মেয়ে খারাপ নয়, তবু ওতো সত্যি মায়ের পেটের বোন নয়? পরের মেয়ে বৌদি। কত আর প্রতিহত হয়ে ফিরে আসবে, আবার এগিয়ে এগিয়ে যাবে? সন্দীপের থেকে অবশ্য বড়ও নয় যে, ওর সব কিছু ছেলেমানুষী বলে উড়িয়ে দেবে। সন্দীপ যত বড় হয়েছে, মাধুরী ততই ঘুরে সরে গেছে, কঠিন হয়ে গেছে।

প্রদীপও তাই।

তবু ফল্গুনদীর মত বালির নীচে প্রবাহিত হচ্ছে যে গভীর স্নেহ, মাঝে মাঝে সেটা আত্মপ্রকাশ করে বসে বৈ কি।

কিন্তু আর যেন হচ্ছে না।

ভিতর থেকেও শুকিয়ে উঠছে যেন।

এ কী ?

এ কেন !

বড় ভগ্নিপতি সুরজিৎ এসে বলল, দাদা, আমাদের তো আর থাকা হচ্ছে না, বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়ছে, ও দুটোর আবার ভোরবেলা স্কুল—'

প্রদীপ ক্লান্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা এসো ভাই।'

সুরজিৎ বলল, 'বুঝতে পারছি না—'ছোট'র হলটা কি। বাড়ী ফিরেই ফোন্ করব একটা। কি জানি কি—'

'ভাববার কিছু নেই। আসবে একটু পরে।' বলল প্রদীপ। বাড়ীর ভীড় কমলেই যেন এখন শান্তি পায় সে।

মুখের উজ্জ্বলাটা তার কমে গেছে অনেকক্ষণ। দৈহিক ক্লান্তিতে নয়, মানসিক ক্লান্তিতে।

বাবার কথাটা মনে পড়ছে আজকে বড্ড বেশী বেশী। তার নিজের পৈতের দিনটাই মনে পড়ছে।

সে দিনও লোকজন খেয়েছিল প্রচুর।

এই 'দক্ষীঘর' থেকে বেরোনোর পরদিনই। মনে আছে লোকজন সবাই চলে গেলে, চাকর বিদের পর্যন্ত ভাল করে খাইয়ে' রাতদুপুরে বাবা হাঁক দিলেন, 'কইরে কে আছিস, এইবার আমার খাবার আন। সমস্ত রকম আছে তো আমার জন্যে ? সিই মিলিয়ে খাব।'

সেই বলার মধ্যে কী আহ্লাদের সুর।

পিসিমা কাকীমা ছুটোছুটি করে ঘরে ঘরে সব সাজিয়ে দিলেন। বাবা সেই রাত্তিরে কী পরিতোষ করেই খেলেন তারিয়ে তারিয়ে। ছেলেবেলায় প্রদীপ রোগা রোগা ছিল, তাই বাবা ডাকতেন 'পিছিলমামা'। খাওয়ার পর বললেন, 'কই দেখি পিছিলমামার ভিক্ষের ঝুলিতে কী ভিক্ষে পড়ল।'

এইটুকুর অপেক্ষাতেই অত রাত পর্যন্ত জেগেছিল প্রদীপ। বাবা দেখুন তার কত ঐশ্বর্য হল।

বাবা প্রদীপের প্রাণের দেবতা ছিলেন। সেই বাবাকে সন্দীপ ভাল করে গেল না, সন্দীপের এই লোকসানটাই ছোট থেকে প্রদীপকে এত স্নেহশীল করে তুলেছিল। বাবার মতন হবো—এই ছিল তার বাসনা।

কিন্তু বাবার মত হবো বললেই কি হওয়া যায় ? সে দিনকাল কোথা ?

তা' সেই সেদিন বাবার সামনে ভিক্ষের ঝুলি উপুড় করা হলো। এখনকার আমলের মত তাত পৈতের এত রকম উপহার দেওয়ার রেওয়াজ হয়নি তখনও। টাকাই পেয়েছিল অনেকগুলো মনে আছে প্রদীপের। কাগজের টুকরো নয়, রূপোর টাকা।

সেটাকা ভিক্ষালব্ধ চালের মধ্যে মিশিয়ে গিয়েছিল, পিসিমা চালের মধ্যে হাত চেলে চেলে বার করেছিলেন বারেবারে, মনে আছে প্রদীপের। জিনিস পেয়েছিল দু'চারটি। প্রদীপের মাসী একটি পেন্সিলকাম পেন্ দিয়েছিলেন লাল টুকটুকে, মামু দিয়েছিলেন একটি হাত ঘড়ি। ন বছরের ছেলে ঘড়ি নিয়ে কী করবে বলে হেসেছিল সবাই। ন বছরের ছেলে জোড়া তিনচার সোনার বোতাম নিয়ে কি করবে, অথবা এক মুঠো আংটি নিয়ে, সে কথা কিন্তু কেউ ভাবেনি। ওগুলো দেওয়ার রেওয়াজ ছিল পেয়েছিল অনেক।

বাবা দেখে টেখে কী খুসি !

যেন সত্যিই কী ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছে ছেলে। তারপর বাবা প্রদীপের মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন, এতদিন তুমি শুধু ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলে, আজ থেকে নিজে ব্রাহ্মণ হলে বুঝেছ তো ? ব্রাহ্মণ মানে শুধু গলায় একটি সুতোর গোছা ঝোলানো নয়, ব্রাহ্মণ মানে অনেক কিছু। সেগুলি বুঝতে হবে শিখতে হবে। আমি আশীর্বাদ করছি তা' তুমি হবে।'

বাবার আশীর্বাদ, পাথরে বীজ রোপণের মত হয়েছে কি না জানেনা প্রদীপ, কিন্তু সে তার ছেলেকে এমন আশীর্বাদ করার কথা ভাবেও নি। যদি আশীর্বাদ করে, হয়তো বলবে, সুখী হও স্বাস্থ্যবান হও। লেখাপড়ায় ভাল হও' আর কি ?

পৈতে দেওয়াটাই তো বলতে গেলে ঘটা না প্রথা পালনের জন্যে। তার চাইতে অনেক বেশী বাড়ীতে একটা উৎসব বাঁধবার সুযোগ নেবার জন্যে। 'কাজ' একটা হোক বাড়ীতে, এই উৎসাহ নিয়ে কাজে নামা।

তা ছাড়া আর একটু বড় হলে হয়তো বলে বসবে, 'আমি পৈতে নেবনা।' যেমন বলে বসেছিল সন্দীপ।

বাবার সহসা মৃত্যুতে ওরটা আর সময়ে হয়ে ওঠেনি, ষোলো বছরে হবার কথা হয়েছিল, সন্দীপ রাজী হয়নি। অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, 'ন্যাড়া হতে হবে না, দণ্ডীঘরে থাকতে হবে না' এইসব প্রতিশ্রুতি দিয়ে, 'লক্ষ ভাসান' করে একগাছা পৈতে গলায় তুলে দেওয়া হয়েছিল, সেই অবান্তর সুতোর গোছাটা না কি একবার ধোবার বাড়ী চলে গিয়েছিল, আর ফেরেনি।

উজ্জ্বল সম্পর্কে সেই সব ভয় হবার আগেই কাজ সারা হল। সবই কত সুন্দর হল। কিন্তু বাড়ীরই একটা ছেলে বিদ্যে জ্ঞেরের অহঙ্কার নিয়ে এমন একটা অসভ্যতা করল যে সমস্ত সৌন্দর্যই শ্রীহীন হয়ে গেল।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে অভ্যাগতদের আপ্যায়ন সুরুর সময় প্রদীপ আনন্দে আর সাফল্যে যেন আলোর মত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সন্ধ্যা বিদায় নেবার পর থেকেই সে মুখ বিশ্রস্ত হয়ে এসেছে। লোকে ভেবেছে ক্লান্তি।

কিন্তু না।

শারীরিক শক্তি প্রচুর প্রদীপের।

এত সামান্য পরিশ্রমের ক্লান্তি চেহারায় ধরা পড়বে না।

আরো পরে লোকে বলাবলি করতে লাগল, 'দুশ্চিন্তার ছাপ। চাপা মানুষ কাজের বাড়ীতে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে না, কিন্তু—'

কিন্তু সত্য বলতে, দুশ্চিন্তা প্রদীপের ছিল না।

দুশ্চিন্তা করার অভ্যাস অনেকদিন হ'ল ঘুচিয়ে দিয়েছে সন্দীপ। সেই যখন বারো তেরো বছরের ছেলে, প্রথম একদিন যেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরল না, ফিরল রাত নটায়, দুশ্চিন্তা করেছে প্রদীপ সেদিন। অতটুকু সময়ের মধ্যেই পাগলের মত ছুটোছুটি করে সম্ভাব্য অসম্ভাব্য সকল স্থানে

খুঁজে বেড়িয়েছে গাড়ী নিয়ে। তারপর বাড়ী ফিরে যখন দেখেছে অটুট ছেলে দিব্যি সপ্রতিভ মুখে বাড়ী ঢুকল, তখন জীবনে যা না করেছিল, তাই করেছে। কান ধরে টেনে এনে কৈফিয়ৎ চেয়েছে।

কৈফিয়ৎ দেয়নি সন্দীপ।

চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেছিল।

মামা-বৌদি, দুই দিদি, বাড়ীর পুরনো ঝি সবাই জিগ্যেস করে হার মেনেছিল বেয়াটা হল কেন, সন্দীপ পাথরের পুতুলের ভূমিকা নিয়ে স্থির অচঞ্চল।

হার মেনে প্রদীপ বলেছিল, 'বেশ আজ যা হয়েছে হয়েছে, আর কোনদিন যেন এমন না হয়।'

প্রতিবাদ করেনি সন্দীপ, শুধু পরদিন রাত সাড়ে নটা বাজিয়েছিল।

বয়েসটা তখন নিতান্ত নাবালক, তাই সেদিনও বকাবকি প্রশ্ন চলেছিল। সন্দেহ নেই যে ছেলেটা কারো প্রয়োজনায় এমন বিস্মৃত হচ্ছে, সেই 'কে বা কাহারা' কোথা থেকে ওকে কবলিত করল আবিষ্কার করা দরকার।

কিন্তু আবিষ্কার করা যায়নি।

সন্দীপ পরদিন আরো দেরী করেছে, পরদিন আরো। অথচ বকুনি খেয়ে রাগ করেনি, দিব্যি সহজভাবে খেতে বসেছে।

এই অসহনীয় দুঃসাহসের নমুনা দেখে শুরু হতে হতে ক্রমশঃ নীরব হয়ে গেছে বাড়ীর লোক। সন্দীপ সম্পর্কে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন ও যে বাড়ীতে আছে, আর বাড়ীতে খাচ্ছে দয়া করে, এতেই যেন কৃতার্থ সবাই।

যেন ঘরের পাখীটা ছাদের কার্নিশে এসে বসে ছোলা খাচ্ছে, নাড়া দিলেই উড়ে যাবে। অতএব নাড়াচাড়া করে কাজ নেই বাপু।

কিন্তু আজও এতটাই যে বুনোমি করবে সন্দীপ, লোকলজ্জা মানবে না এটা যেন সহ্য করা যাচ্ছে না। এতগুলো লোক, কী ভেবে গেল কে জানে। হয়তো ভাবল সন্দীপ এখন আর এখানে থাকে না। হয়তো ভাবল বড় ভাই তাদের কাছে নিশ্চয় এমন ব্যবহার পায় যে—

তা'ছাড়া—সব ছাপিয়ে এটাও বড় মর্মান্তিক লাগছে আজকের দিনে। উজ্জ্বল দীপের জীবনের এই উৎসবের দিনে একটু দেখতেও ইচ্ছে করল না তার ছোটকার?

সেই উৎসবের ভোজে একটু খেয়ে উপকার করতে পারল না? অন্যান্য অন্যুক্ত অবস্থায় কোথায় কোথায় ঘুরতে লাগল, শুধু অস্বাভাবিক হবার নেশায়।

স্বাভাবিক হওয়াটা যেন নিকৃষ্ট জীবেদেরই মানায়, এমনি একটা ভাব সন্দীপের। বাড়ীতে পাঁচজন আসবে, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করবে, এমন নিকৃষ্ট আর সস্তা কাজ সন্দীপের দ্বারা সম্ভব নয়।

অতএব এই চমৎকার বুদ্ধি পথটি বেছে নিয়েছে প্রদীপের ছোট ভাই। এ ভাইয়ের জন্যে দুশ্চিন্তা করতে বসবে, এমন নির্বোধ নয় প্রদীপ। ও শুধু সন্দীপের পরিণাম ভাবছে।

এমন করে সকলের স্নেহ-মমতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে, যে সুখের জীবন বেছে নিয়েছে সে, কী পরিণাম সেই জীবনের?

প্রদীপের নিজের বড় শালী আজ থাকবেন, তাই তাড়া নেই ; তিনি কাছে এসে বলেন, 'প্রদীপ, ভাই খেতে তো বলতে পারব না, তাই না এলে ! তা' ততক্ষণ না হয় দেখ ছেলে কি কি পেল ?'

প্রদীপ বলল, 'থাক ! দেখলেই হবে।'

'বাবাঃ যা জিনিস পেয়েছে। লোভে বিষেতে এত পায় না ! এইবেলা আলমারীতে তোলার আগে—'

'তাড়া কি ! আলমারীর চাবিতো ফেলে দেওয়া হচ্ছে না ?

শালী বিরক্ত হয়ে সরে গিয়ে বলেন, 'যত্তি ঘটে। ওই ভাইয়ের জন্যে এত ইয়ে। খাবার কথা তো বলতেই পারলাম না—'

না খায়নি প্রদীপ।

সব সেরে এসে দরাজ গলায় বলতে পারেনি 'কই আমার সব খাবার কোথায় ? লিট মিলিয়ে খাব !'

সন্দীপ দুপুরে পর্য্যন্ত ভাত খায়নি, এ খবরটা যে এসে দিয়েছিল প্রদীপের কানে। অথচ আবার বাড়ীতে কড়া হুকুম দেওয়া আছে সন্দীপের জন্যে কেউ না খেয়ে অপেক্ষা করছে, একথা যেন সন্দীপের কানে না ওঠে। তাই সন্দীপ এলে যে দুই-ভাই একসঙ্গে খেতে বসবে সে উপায়ও নেই। ও এসেছে, খেয়েছে, শুনে খেতে বসতে হবে প্রদীপকে।

একগ্লাস শরবৎ চেয়ে খেয়ে ঘরে গিয়ে বসল প্রদীপ। আর ভাবতে লাগল, সবাই বলছে বিয়ে হলে স্বভাব ফিরবে। কিন্তু বিয়ে দেব কার ? আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখীর ?

আহা, প্রদীপ যদি সন্দীপের চিন্তা থাকলে—ঝকঝকে—বলে উড়িয়ে দিতে পারতো। ঝেড়ে ফেলতে পারতো।

যেমন করে সন্দীপ ঝেড়ে ফেলতে চাইছে সামাজিক জীবনের সমস্ত মূল্যবোধগুলিকে। স্নেহ মমতা প্রীতি ব্যাকুলতাকে।

হাতের ঘড়িটা খোলা পড়ে রয়েছে এখন টেবিলে, যেন ঘড়িটার বাজার অপেক্ষায় ছিল প্রদীপ, সেটা বাজতে সুরু করল, অনেকক্ষণ ধরে বাজনা শেষ হল।

শেষ হল সিনেমার শেষ 'শো'।

জনস্রোতের মত জনস্রোত বেরিয়ে আসছে হল থেকে নেমে আসছে রাস্তায়। পথের ধারে যাদের 'ছাতা' বাঁধা ছিল তারা সন্ধান করে বেরিয়ে যাচ্ছে, যাদের নেই, তাদের এই নাইট শোর সিনেমা দেখার দুর্গতির শেষ নেই।···তবু দেখতে আসার আগে সে চিন্তা কে করে ? দেখতে হবে সেটাই প্রধান চিন্তা। এখন বিরল যানবাহন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পড়ছে ওই পদাতিকেরা, একটি আলোর মুকুটধারিণী 'বেবি'র পিছনে এক কুড়ি লোক ছুটছে, এবং বেবি যখন নিতান্ত নিষ্ঠুরার মত সেই আকুল আহ্বানে কর্ণপাত মাত্র না করে নাকের সামনে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে যাচ্ছে, তখন কাঁধো কাঁধো হয়ে উঠছে বেচারারা।

এরা তিনজন কিন্তু বেবির পিছনে ছুটছেনা।

এরা হাসতে হাসতে পথ ভাঙছে। মনে হচ্ছে রাত যে দুপুর হয়ে উঠেছে সে খেয়াল নেই এদের। যেন সারারাত রাস্তায় বেড়াতে পারে। দুটি পাতা একটি কুঁড়ি, দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

হাসতে হাসতে চলেছে ওরা পথকে সচকিত করে। ছবির ওপাশ্তপটাই তাদের আলোচ্য। বলা বাহুল্য সব কিছুই এরা বস্তাৎ করছে, করবেই। এ বয়সের ছেলেমেয়েদের এটা ধর্ম। বেশী করে মেয়েরা হলের মধ্যে চোখে রুমাল চেপে ফোঁস ফোঁস করে, আর বাইরে এসে ছেলে বন্ধুদের সামনে নাক কুঁচকে বলে, 'কী সেন্টিমেন্টাল।'

তারপর হাসাহাসি করে।

আর এই যে তিনটি কুঁড়ি, এদের অভিমতগুলি অদ্ভুত অপূর্ব! নিজেদেরকে এরা বলে 'ত্রিশক্তি'। এই ত্রিশক্তির কাজ হচ্ছে পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মের শাসন অনুশাসন, আচার-আচরণগুলি অস্বীকার করে চলা।

প্রবলভাবে আন্দোলন করে নয়, বাদ প্রতিবাদ করে নয়, নিঃশব্দ অবাধ্যতায়।

এরা কবে কিভাবে একত্র হ'ল সে আর এদের মনে নেই, কিন্তু এখন নিত্য একত্রিত হবেই, এরা নিশ্চিত।

বড়লোকের ছেলে সন্দীপ, মেরুদণ্ড ঘরের ছেলে অতীশ, আর নেহাৎ গরীবের ঘরের মেয়ে সুরভি।

অভাবগ্রস্ত বাপের চার মেয়ের শেষ মেয়ে, ছোট থেকে বোধ করি কিছু না পেয়ে পেয়েই সংসারের প্রতি নিস্পৃহ মমতাশূন্য, আর উদ্ধত দুর্বিনীত। একটু বড় হতে, দিদিদের বিয়ে হয়ে গেছে, আর বিবাহিতা দিদিরা সাধ্যমত বিলাসিতার উপকরণ জুগিয়েছে ছোটবোনটিকে আদর করে করে। অবশ্য তাদের সাধ্যই বা কতটুকু? তবে অভ্যাস খারাপ করে দেওয়ার কাজে লেগেছে সেই সামান্য সাধ্যটুকুই।

নিজেকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না সুরভি। দেখতে শেখেনি। তাই ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর যখন হিন্দুস্থান লিভারে একটা চাকরী জোগাড় করে ফেলল, তখন প্রথম মাসের মাইনে থেকে নিজের শাড়ী ব্লাউস চটি ব্যাগ কিনে ফেলল একরাশ, অবশিষ্ট আর রাখল না কিছু টাকায়।

মা বাপ মনের খেয়ায় ভেবেছিল, ওর টাকা ছোঁবে না কোনদিন, কিন্তু অভাবের সংসারে সে প্রতিজ্ঞা রাখা বড় কঠিন। লজ্জার মাথায় ক্ষুদ্রদ মেরেও নিতে হয়। ঘরে পাঁচন সেলার মুখ করে হাত পাততে হয়।

তবে মাইনেটা নেহাৎ কম নয়। তাই সুরভির নিজের সখ আর প্রয়োজন মিটিয়েও থাকে কিছু। সুরভির চেহারাটা চাকরীতে কাজে লেগেছে।

এই সুরভির সঙ্গে ওদের যোগাযোগ হয়ে গেল, কি জানি কি মহালগ্নে—

ক্যানভাসার মেয়ে বলে ওরা 'অছেদ্দা' করল না, কারণ খামখেয়ালের আর এক নীতিতে ওরা মহৎ। মানুষের মূল্য ওদের কাছে মানুষ হিসেবেই, তার পদমর্য্যাদা দিয়ে নয়।

ওদের মনে আছে কি নেই, তবে পরিচয়ের সূত্রটা ছিল এই, 'বাসে' উঠে অতীশ দেখে পকেটে পার্স নেই। তার পকেট হাতড়ানো দেখে, বাসের অন্য আরোহী কয়েকজন বিদ্রূপ করে ওঠে, এবং

কণ্ডাকটার বলে ওঠে, 'থাক দা'রা আর বুক চাপড়ে কী হবে? বুক সেরেক্ সুস্থ। বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। আস্তির পাঞ্জাবীটা তো উড়িয়েছেন মক্ষ না।'

অতীশ আরক্ত মুখে নেমে যেতে উদ্যত হচ্ছিল, হঠাৎ সন্দীপ ও বেঞ্চ থেকে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এই, তুই আচ্ছা ছেলে তো! নেমে যাচ্ছিস মানে? আমি এখানে রয়েছি দেখতে পাচ্ছিস না?'

চোখে চোখে ইসারা হল, সন্দীপ এসে গরলাটা মিটিয়ে দিল।

সুরভি ছিল সেই ধারে।

ইসারাটা দেখল।

কেমন একটা কৌতুক বোধ করল। দুটো ছেলেকেই উঠতে দেখেছে সে। চোখাচোখি ও হতে দেখেছে। পরিচিতের ভঙ্গী দেখেনি সে চোখে, সহসা এটা কী হল? একেবারে 'তুই'!

ওরা দুজনে একই স্টপেজে নামল, সুরভিও নেমে পড়ল, একটা স্টপেজ আগেই। কাছে এগিয়ে এল এদের।

আগে সন্দীপের কাছেই।

সোজাসুজি প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা আপনারা দু'জনে কি সত্যিই পরিচিত?'

সন্দীপ হেসে বলল, 'আপনার কি মনে হয়?'

'মনে হচ্ছে অচেনা—'

'অচেনাকে কেউ 'তুই' বলে? বলে সন্দীপ অবলীলায় অতীশের কাঁধে একটা হাত রেখে কৌতুকের আলো চোখে মেলে প্রশ্ন করল, 'কিরে আমি তোর অচেনা?'

অতীশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলল, 'পাগল! জন্ম জন্মান্তরের চেনা।'

সুরভি ও হাসল। বলল, বুঝলাম। বুঝলাম ওঁর আর বার শোধ দেওয়া চলবে না। কিন্তু ভারী লোভ হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছে আপনাদের এই জন্মান্তরের চেনার আর এক অংশীদার হই।'

'বার শোধ দিতে হবে না বলে নাকি?' বলে হেসে উঠল অতীশ! হেসে উঠল এরাও।

ব্যস! হয়ে গেল।

অদ্ভুত ধরণের এক 'ভাব' গড়ে উঠল তিনজনের মধ্যে। 'এক মেয়ে দুই ছেলে'র কাহিনীর রীতি অনুসারে এই 'ভাব'কে ওরা নষ্ট করে ফেলবে না, পচিয়ে ফেলবে না, এ যেন একটা অদৃশ্য দলিলে স্বাক্ষরিত হয়ে গেল।

সুরভিকে ঘিরে ওদের আগ্রহ দানা বাঁধে, সুরভির অনুপস্থিতিতে ওদের কাঁকা কাঁকা লাগে, দু'জনের উপস্থিতিতে দু'জনেই সুরভিকে নিবেদন করে সে কথা। বলে, 'উঃ কাল তোমার বিরহে সন্ধোটাই মাটি—' কিন্তু কেউ কারুর আড়ালে প্রেম নিবেদন করে বসে না।

আর সুরভি?

সে বোধ করি দু'জনের ওপরই সমান আকর্ষণ অনুভব করে।

তাই যখন যাকে দেখে ওর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। স্বচ্ছন্দে বলে, 'বাবাঃ! এতক্ষণে আসা হ'ল। সেই থেকে অপেক্ষা করে করে—'

এই ভাবেই চলছে হপ্তা তিনেক।

মনে হচ্ছিল ওরা বুঝি সারারাতই পথ হাঁটবে, তা' অবশ্য হ'ল না শেষ পর্যন্ত। একটা সঙ্কীর্ণ গলির মুখে এসে দাঁড়াল ওরা।

'থাক আর এই বিচ্ছিরির মধ্যে আসতে হবে না তোমাদের—' বলে সুরভি একটু বিচ্ছির হল। তারপর সহাস্যে বলল, তা'হলে ওই কথাই রইল ?'

ওরা হেসে উঠে বলল, 'হ্যাঁ ওই কথাই রইল।'

অতঃপর অতীশ আর সন্দীপও ছাড়াছাড়ি হ'ল।

অতীশ বলল, 'আজ বিচ্ছা বাড়ী গিয়ে বকুনি খাবি ?

'আমার ব্যাপারে বকুনির কথা ওঠে না।'

'তবু আজ স্পেশাল।'

'দূর! কত স্পেশাল পার করলাম। তোরে যেন আনন্দ অনুভব করছি যে, বাড়ীতে অভ্যাগতদের ভীড় এতক্ষণে আর নেই।'

'থাকলেই বা কী ক্ষতি ছিল ?'

'ওরে বাবা! জানিসই তো সেই সব অমকালো চকমকে, চিকণ চকচকেদের দেখলেই আমার হার্ট প্যালপিটেশান হয়।'

'তা' তো জানি। কিন্তু তোর দাদা-বৌদি—'

'আহা তাঁরা এখনো আমার সম্পর্কে কোনো আশা পোষণ করেন, এই কি ধারণা তোর ?'

'তা' নয় বটে। সে ধারণা নেই। আচ্ছা!'

অতীশ আর একটু ঘুরে যাবে, হেঁটেই ফিরে যাবে। সন্দীপ বাসে উঠবে।

কলকাতায় অতীশের জন্যে ভাববার কেউ নেই। সে একেবারে মুক্ত বিহঙ্গ। দূর সম্পর্কের জ্যাঠতুতো বোনের বাড়ীতে পেয়িং-গেষ্ট হয়ে থাকে। তাদেরই একেবারে বাইরের দিকে হাত তিনেক চওড়া আর হাত চারেক লম্বা একখানা ঘর তার আস্তানা। ঘরটা বাড়ীর থেকে প্রায় সম্পর্কচ্যুত। ঘরটায় সবসময়ই তালা ঝোলে, তালার ডুপ্লিকেট চাবিটা অতীশের কাছেই থাকে। অতীশ যখনই ফিরুক তালা খুলে ঢোকে। ঘরের এককোণে কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল আছে, তার ওপর অতীশের ভাত ঢাকা থাকে, অতীশ খেয়ে এঁটো থালাটায় আবার ঢাকাটা চাপা দিয়ে রেখে দেয়। অতীশের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে সকালে বাড়ীর ঝি এসে ঢাকা আর থালা তুলে নিয়ে যায়।

টেবিলটা সাফ করার কথা ওঠেনা কোনদিন। অতীশও ওঠায় না। খেয়ালই হয় না।

গ্রামের বাড়ীতে মা বাবা ঠাকুমা কাকা অনেক কিছুই আছেন, এবং তাঁদের সেখানে যাহোক আয় সংস্থানেরও ব্যবস্থা আছে, অতীশ কিছু কিছু টাকা পাঠায়। কালে ভদ্রে যায়।

বেশী পাঠাবে এমন উপার্জন করে না। নিত্যি যাবে এমন আকর্ষণও অনুভব করে না। অতীশের নীচে অনেকগুলি ভাইবোন, মায়ের সঙ্গে অতীশের দেখাই হয় না বেশী।

আর বাবাকে সে গ্রহণ করে না মোটেই।

অতএব নিরঙ্কুশ।

সন্দীপ তো স্বভাবেই তাই। এই নিরঙ্কুশতা থেকে তাদের যেন একটি পরিচয়না গড়ে উঠেছে।

'তা' হলে ওই কথাই থাকলো—'

এটা হচ্ছে সেই পরিকল্পনার শপথ বাণী।

আর এটা ওদের দৈনিক উচ্চারণের শপথ।

কৌতুকছলে বলতে বলতে দুরাদোষের মত হয়ে গেছে। ছাড়াছাড়ির সময় মুখ দিয়ে বেরোবেই।

পরিকল্পনাটা এই—

দুই বন্ধুর একজনও বিয়ে করবে না, অথবা দু'জনেই করবে একই মেয়েকে। অর্থাৎ সুরভিকে।

শাস্ত্রীয় আচার বা লোকাচার সম্মত বিয়ে নয়। বিয়ের যে চলতি মানে আছে তাও নয়। তিনজনে মিলে একটা সংসার পাতবে, এই হচ্ছে কথা।

সে সংসারের চেহারা? পরিষ্কার দৃষ্টি আছে। সুরভি হবে কর্ত্রী, এরা দুটো লোক। ওদের উপার্জ্জনের টাকা এনে সুরভির হাতে তুলে দেবে, সুরভি, যেমন ভাবে খুশি সংসার চালাবে। দুজনের কাউকেই কোনো হিসেব দেবে না, কারো সঙ্গে পরামর্শ করবে না।

এবং—

হ্যাঁ সেইটা স্থির করতে কিছুদিন ভাবতে হয়েছিল এদের, ওই বেপরোয়া সঙ্গীছাড়াদেরও।

এবং যদি কোনোদিন কারো প্রয়োজন হয় সুরভি তার সাময়িক পত্নীত্ব গ্রহণ করবে। আপত্তি করতে পারে না।

সুরভি মুচকি হেসে বলেছিল, 'আর দু'জনেরই যদি একসঙ্গে অথবা বরাবরের জন্যে প্রয়োজন হয়?'

তখন পঞ্চভ্রাতা পাণ্ডবদের স্মরণ করবো। বর প্রার্থনা করবো সেই পরলোকগত ভদ্রলোকদের কাছে।'

'লোকে কি বলবে?'

'লোক? লোকের কথা ভাবছ এখনও তুমি? নাঃ তোমাকে ত্রিশক্তি সংঘ থেকে বাতিল করা হোক।'

'এ প্রস্তাবে রাজী হবে এমন মেয়ে পাবে আর?'

'পৃথিবীতে কী না পাওয়া যায়? টোটাদের মেয়ের শরণাপন্ন হবো।'

'উঃ কী সাংঘাতিক। কিন্তু—'

'কিন্তু' বলে কোনো কথা আমাদের অভিধানে থাকবে না, এটা ভুলে যাচ্ছ—সুরভি।'

'না ভাবছি—'

'কী ভাবছ বুঝেছি। সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকো। ইহলোকে পরলোকে মানে পরলোক বলে যদি কিছু থাকে, সেখানে সবত্রই আমাদের অক্ষয় স্বর্গ, 'নরক' বলে কোনো বস্তু নেই। অতএব পুনার নরকও নেই। কাজেই তা' থেকে উদ্ধার হ'বারও প্রশ্ন নেই। নিশ্চিন্ত থেকো।'

তা' সুরভির বোধকরি এই দুস্পাচ্য পরিকল্পনা হজম করতে কিছু সময় লেগেছিল। তাই বারে বারে যখন তখন প্রশ্ন তুলেছিল।

বলেছে—'তা বেশ, এ পর্যন্ত বুঝলাম, কিন্তু এই সংসারের উদ্দেশ্যটা কী হবে?'

'এই সর্বনাশ! ও সন্দীপ, এ আবার উদ্দেশ্য চায়। নাঃ মেয়েদের দিয়ে মহৎ কিছু হওয়ার আশা দুরাশা। ভুলে যাও নিরুদ্দেশ জীবনই আমাদের উদ্দেশ্য। এই মহৎ পরিকল্পনাটি নিয়েই তো—'

'আচ্ছা যখন আমরা বুড়ো হবো?'

'বুড়ো? আরে ছ্যাঃ! এটা একটা প্রশ্ন? বুড়ো তো হবোই না। তেল ফুরোবার আগেই দোরা নিভিয়ে দেব আলো।'

দু' চারদিন যায়।

'আচ্ছা ওই কথাই রইল' বলে, বিদায় নেয়, ত্রিমূর্তি। কিন্তু আবার পরদিন হয়তো প্রশ্ন তোলে সুরভি, 'আচ্ছা—এই যে চাকরী বাকরী, এও তো মস্ত পরাধীনতা। যার নাম দাসত্ব। এটাই যখন করতে হচ্ছে—'

'আরে ওইটেই তো খুড়োর কল! টাকা কিছু চাইই জীবন ধারণের জন্যে।'

'তা' তিনজনে মিলে যদি কোন একটা ব্যবসা করা যায়?'

'সেটা তাত্ত্বিক দাসত্ব। এ দাসত্ব ঘণ্টা কয়েকের, সে চব্বিশ ঘণ্টার। এ শুধু টাইম মাফিক একটু হাত পা মাথা খাটানো। সে যাবজ্জীবৎ হাত পা মাথা মন, অস্থি মজ্জা স্নায়ু শিরা সব কিছুকে চাবুক মেরে মেরে খাটিয়ে চলা। চাকরী করা হবে, তবে খুব বড় একটা কিছু নয় মানে তার চেষ্টাই নয়। মাত্র খেতে পরতে থাকতে যতটুকু প্রয়োজন—'

সুরভি বলেছিল, 'থাকার জায়গা তো সন্দীপ জোগাবে। ওদের অত বড় বাড়ী—'

সন্দীপ চমকে উঠেছিল।

'সর্বনাশ! ওই আশায় আছ না কি তুমি? আমাদের সেই পরম পবিত্র লক্ষ্মীমন্ত বনেদী বাড়ীতে এই সব লক্ষ্মীছাড়া কাণ্ড! মৈব মৈব চ—'

'বাঃ তুমি তোমার পোরশানটায় পাঁচীল তুলে নিয়ে—'

'মহে মহিয়সী মহিলা ক্ষান্ত দাও। এ প্রসঙ্গে যবনিকা নিক্ষেপ করো। আমাদের যেমন সেই একটি তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাট খোঁজার প্রস্তাব আছে, সেই প্রস্তাবই বলবৎ থাকবে।'

সেদিনের মত থাকলো।

আবার একদিন জিজ্ঞেস করলো সুরভি, 'তোমার টাকা পয়সা বাড়ী, কিছু নেবে না তা' বলে তুমি?'

'আমার? আমার কোথায় হে শ্রীমতী? 'আমার' কেন? আমি কি রায় বাড়ীর পুণ্য ঐতিহ্যের বাহক বাহক? যে রায় বাড়ীর বিষয় আশয়ে আমার দাবি?'

'আহা উত্তরাধিকার না কী যেন বলে একটা—'

'আরে ছি ছি। নাঃ অতীশ ঠিকই বলে, মেয়েদের দ্বারা কোনো মহৎ বিপ্লব সাধিত হয় না। উত্তরের ধার ধারিনা আমরা, আমাদের আইনে কেবলমাত্র পূর্ব। পূর্বগামী হবার জন্যেই এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছি আমরা। তোমার মাথায় আমাদের পরিকল্পনা কিছুতেই ঢুকছে না কেন বল তো?'

সুরভি লজ্জা পেয়ে চুপ করেছে।

কিছুদিন সাবধানে কথা বলেছে।

তবু আবার কোনো সময় খিলিক্ মেরে উঠেছে সন্দেহ।

'আচ্ছা আমাদের জীবন যাত্রা পদ্ধতিটা কী হবে?'

'ঠিক এখন যেমন আছে।'

'আমার যদি ঘর সাজাতে ইচ্ছে হয়—'

'পয়সায় তুলোসে সাজাবে। আমরা তো কৃচ্ছ সাধনার কাঁটা পথ ধরতে যাচ্ছি না? পয়সার চাহিদা বেশী হয়ে দাঁড়ালে স্বাচ্ছন্দ্য স্বেচ্ছাচার এগুলো বিদায় নেবে, তাই 'অল্পে সন্তোষ' নীতি।'

'আমি যদি সেই অল্প টাকাতেই ঘর সাজাতে পারি। গহনা গড়াতে পারি, আপত্তি নেই তা'হলে?'

'মোটেই না। আমাদের চাহিদা মাত্র নিশ্চিন্তে দুটো খেতে পরতে পাওয়া।'

ক্রমশঃ প্রশ্ন থেমেছে সুরভির।

ক্রমশঃ সেও অভ্যস্ত হয়ে গেছে 'তাহলে ওই কথাই থাকলো'।

তবে কবে সেই ত্রিশক্তি সম্মিলন প্রস্তাব কার্যকরী হবে, সেটা এখনো পর্যন্ত বোঝা যাচ্ছে না। তেমন তোড়জোড় করছেনা কেউ।

প্রেরণাও নেই তত।

তিনজনে তিন বাড়ীতে থাকলেও, এবং তিন পকেট তিন জায়গায় হলেও, জীবনযাত্রা পদ্ধতিটা তো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুযায়ীই যচ্ছে?

জীবিকা নির্বাহের সামান্যতম দায়িটুকু মিটিয়েই তো মুক্ত জীব!

ইচ্ছে হল সিনেমা গেল, ইচ্ছে হল গঙ্গার ধারে বেড়িয়ে এল, ইচ্ছে হল, রেস্তোঁরায় ঢুকল, ইচ্ছে হল যে কোনো একটা জায়গা বেছে নিয়ে শুধু গল্প চালানো। ব্যস!...এই তো কাম্য জীবন তাদের।

আগে সুরভির চিন্তার জগতে অবশ্য কোনদিন এ জীবনের ছায়া মাত্র ছিল না। কিন্তু সম্পূর্ণ অজানা এই চটকদার কথাগুলি তার মনে ক্রমশঃ মোহ বিস্তার করেছে। আর দু দুটো পুরুষের প্রিয়া হতে পারার অদ্ভুত আকর্ষণ, মদের নেশার মত তীব্র হয়ে পেয়ে বসেছে তাকে।

কী ঘরের সংসার তাদের!

কী যা আদরের মেয়ে সে!

সুরভির কাছে ওই সবীণ আকাশের চাঁদ, অতীশ উঁচু গাছের ফল।

দেখতে একটু ভাল ঘটে সে, তিন দিদি মাধবী করবী আর পূরবীর চেয়ে অনেকখানিই ভাল কিন্তু কেবল মাত্র সেই ভালটুকুর জোরে এই পৃথিবীর কতটুকু 'ভাল' আহরণ করা যেত?

বড়জোর জামাইবাবুদের থেকে আর একটু অবস্থাপন্ন ঘর জুটতো সেই রূপটুকুর ঘোরে। কিন্তু তার মা দিদিদের চেয়ে কতটুকু তফাৎ সেই জীবনে?

এই সংসার ধার, এই অনন্ত আকাশ, এই মাঠ ঘাট পথ প্রান্তর। এই যথেচ্ছচারিতা আর ওই বেপরোয়া উল্লাসের বাদ কোথায় সেখানে? এত নতুন কথা কোথায়?

এমন নতুন আলো?

আলোর নেশা, বড় অস্ত্রের নেশা। পতঙ্গে আর মানুষে তফাৎ নেই। বিধাতা মানুষকে সাবধান করে দেবার জন্যে পতঙ্গদের পাঠালেন, মানুষ সাবধান তো হলই না। উল্টে বেশী করে শিখে নিল পতঙ্গদের আচার আচরণ জীবন নীতি।

সেই আলোর নেশায় মত্ত সুরতি মা বাপের শাসন অগ্রাহ্য করে। তিরস্কার গায়ে মাখে না। ভ্রুকুটিকে উপেক্ষা করে।...

যে নীতিতে ত্রিশক্তি শক্তিমান।

এদিকে মা বাপের শাঁখের করাত।

ছেলে নয় যে 'আমার বাড়ী থেকে দূর হও' বলে জব করবেন। মেয়েকে দূর করে দেওয়া মানেই তো তার উজ্জ্বলের পথ আরো বেশী করে পরিষ্কার করে দেওয়া। ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া।

অথচ ক্রমশঃই সহ্য করা কঠিন হয়ে উঠছে।

অবিরত দুটো ছোকরার সঙ্গে ঘোরার অন্তে বদনামের শেষ নেই। যারা দেখে তারাই ধরে নেয় ছেলে দুটো বদ আর মেয়েটা খারাপ। নইলে এমন কেন?

একটি মেয়ে একটি ছেলে, এ দৃশ্য অবশ্য দেখতে দেখতে চোখে ধাঁচা পড়ে গেছে। কিন্তু তার তো তবু যুক্তি আছে।

এটা কী?

এটা খারাপ ছাড়া আর কী!

খুবই খারাপ সন্দেহ নেই।

অতএব পরিচিত জনের চোখে পড়লেই তারা জগমোহন আর অপর্ণার কানে খবরটি পরিবেশন করে যায়।

আর এই প্রৌঢ় দম্পতি নিরুপায় আক্রোশে জ্বলতে থাকেন।

আজও জ্বলছিলেন।

রাত একটা বাজে, মেয়ের দেখা নেই। সুন্দরী তরুণী মেয়ে।

এর উপর পাড়া দিয়ে চুকবে সেই মেয়ে। কড়া নাড়বে পাড়া জানিয়ে। আর পড়শীরা দেখবে জগমোহন দরজা খুলে ঘরে তুলে নিলেন সেই মেয়েকে।

ভগবান!

এ দুর্গতির শেষ কবে হবে।

কবে তাঁরা দু'জনে একত্রে বিষ খাবার সাহস আর বেঁচে মরবার উপযুক্ত বিষ সংগ্রহ করতে পারবেন?

পারছেন না।

অন্ততঃ এখনো পারেন নি।

তাই এই রাত দুপুরে অনুপস্থিত মেয়েরই মৃত্যু কামনা করছেন দু'জনে। আর পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করছেন।

মেয়েকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলার জন্যে দু'জনে দু'জনকে দায়ী করছেন।

'টাকা! মেয়ের টাকায় সংসারের সুসার করবেন!' জগমোহন ক্রুদ্ধ গলায় বলেন, 'লোভ উথলে উঠল, বারণ করতে পারলেন না মেয়েকে। ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারলেন না মেয়ের টাকা! এখন? এখন কেঁচো যে কালনাগিনী হয়ে উঠল!'

অপর্ণাও চুপ থাকেন না।

তেমনি গলাতেই বলেন, 'কেঁচোকে কেঁচো রাখবো কিসের জোরে? বলি জোরের কিছু রেখেছিলে? পরনাকে জবাব দিয়ে বসে আছি। ঘোরা ছাড়িয়ে কার সেন্ধ করছি। বাড়ীওলা নালিশ করবার ওয়ার্নিং দিয়ে গেল। আর তুমি স্বচ্ছন্দে বললে, 'পারো কোথায়? চুরি করতে যেয়োনা?' মনে নেই সে কথা?···বয়েস থাকতে যতো বুড়ো হয়ে বসে আছ। আর ঘোলচাল কাটছ। আমাকে যে কী করে চালাতে হয়!···পেটের মেয়ের কাছে মাথা হেঁট করেছি, দোষ করেছি। তা না করলে পথে বেরিয়ে ভিক্ষে করতে হতো!'

জগমোহন তিক্তকণ্ঠে বলেন, 'তবু বাঁচার সাধ!'

'আমার নয় তোমার! রাতদিন বলিনা বিষ এনে দাও, খেয়ে জ্বালা জুড়োই। তা নয়, বিষ হারানো চোঁড়া, একদিন বিড়ির বাণ্ডিল ফুরিয়ে থাকলে চোখে অন্ধকার দেখেন। আবার বড় বড় কথা!'

সারা জীবনের যত তিক্ততা এইভাবে উদ্গার করে এরা আর এদের মত-রা—সারা জীবনের সঙ্গীর ওপর।

'আজ এলে ওই মেয়েকে তুমি যদি বাড়ী থেকে তাড়িয়ে না দাও—'

চুপ করলেন জগমোহন।

ঝড় নড়ল বাইরে।

অপর্ণা উঠে দাঁড়ালেন।

জগমোহন যাতে দেখতে পান এমন ভাবে চৌকীর তলা থেকে ঘর ঝাঁটানো ঝাঁটা গাছটা বার করলেন। এগিয়ে গেলেন, ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলেন, আর জগমোহন তাড়াতাড়ি নড়তে গিয়ে বাতের ব্যথায় কোঁক করে উঠে—চাপা ক্রুদ্ধ গলায় বললেন, 'যা করবার কাল ভোরে। রাত-দুপুরে আর—'

ঝাঁটাটা অবশ্য জগমোহনের জন্যেই বার করা হয়েছিল। তাঁর ওপর না হোক, তাঁর দৃষ্টান্তের ওপর বসানোর জন্যে, সেটা হাত থেকে নামিয়ে রেখেই গেলেন অপর্ণা।

কিন্তু রুদ্রাণী মূর্তিতেই গেলেন।

তা' তাতে খুব একটা বিচলিত হবার কি আছে সুরভির? এ মূর্তিই কি নতুন? এতো নিত্যকার।

আজকের মত রোজই তো অপর্ণা ঠিক তীব্র স্বরে মেয়েকে প্রথম সম্ভাষণ করেন, 'কোন চুলোয় ছিলে এতক্ষণ ;'

আজও করলেন।

সুরভি রেগে উঠল না।

রেগে ওঠা তাদের নীতি নয়।

আগে উঠতো।

যখন নীতিটা ভাল রপ্ত হয়নি। যখন গুরুজনের শাসন বাক্যকে অমৃতং বাল ভাষিতং বলে ভাবতে শেখেনি। রেগে উঠে কড়া কড়া জবাব বলতো মাকে।

নীতি রপ্তা হয়ে গেছে।

এখন বলল না।

বরং হেসে উঠে বলল, 'ওমা! কী ভুলো হয়ে গেছ তুমি? বলে গেলাম না সিনেমা যাচ্ছি—'

'সাইট শোয়ে একা সিনেমা দেখতে কোন ভদ্রলোকের মেয়ে যায় জিজ্ঞেস কর ওকে।'

ঘর থেকে গর্জে উঠলেন জগমোহন।

অপর্ণার মনে হ'ল এই বুঝি মেয়ে একটা চড়া উত্তর দিয়ে অপমান ঘটায় বাপের, তাই

তাড়াতাড়ি বললেন, 'তুমি আবার ঘুম থেকে জেগে তেড়ে উঠছ কেন? মেয়েকে যা শাসন করবার আমি করছি।'

'শাসন! শাসন যা করছো—'

বাপের কথা শেষ করতে না দিয়ে মেয়ে বাপকে পরম শান্তি দিতে মধুর গলায় বলে উঠল, 'একা আবার কই যেখান বাবা? আমার সেই দুই বন্ধুর সঙ্গে তো—ওরা ভীষণ খিদে পেয়েছে। দাঁড়াতে পারছি না!'

'জল! আমাকে এক গেলাস জল দিয়ে যাও—'

তীব্র গলায় ডাক দিলেন অনমোহন।

অপর্ণাও তেমনি গলায় ঝঙ্কার দিলেন, 'হুঁহ্! রাজকন্যার অন্নের আয়োজনটা আগে হোক।'

সুরভি ভাবল নীতি রক্ষা কত শক্ত বোঝাতে হবে কাল, ওই হাতাতে মুখ্যু দুটোকে! 'যে যা বলে বলুক রাগব না, এর চাইতে কঠিন সাধনা আর আছে নাকি?'

তবু আজ ব্রত রক্ষা করল।

খেল অম্লান বদনে।

সুরভি যখন খেয়ে শুতে যাচ্ছে, অপর্ণা গম্ভীরভাবে বলেন, 'কাল তুমি আমাদের জন্যে একটা জিনিস এনে দিতে পারবে?'

সুরভি একটু অবাক হয়ে তাকাল।

কোন কিছু দরকার হলে, এভাবে সোজাসুজি চান না অপর্ণা। বাতাসকে শুনিয়ে শুনিয়ে আক্ষেপ করেন জিনিসটার অভাবে কী কষ্ট পাচ্ছেন।

তাই অবাক হল সুরভি।

বলল, 'কী?'

অপর্ণা বললেন, 'একটু বিষ! দুটো মানুষের উপযুক্ত!'

সুরভি এক মিনিট মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল 'আচ্ছা!' তারপর শুতে গেল।

শুয়ে প্রতিজ্ঞা করল, কাল ওদের বলবে তিন দিনের মধ্যে যদি সেই আমাদের তিন ঘরের ফ্ল্যাটটা জোগাড় করতে না পারো, আমাকে বিষ জোগাড় করে দিতে হবে একটু। যতটা বিষে একটা মানুষ বেশ সহজে—

ওরা যদি বলে, 'আমাদের নীতি?'

যদি বলে, 'কথায় গায়ে ফোস্কা পড়বে না এই না আমাদের ধর্ম?'

স্রেফ বলে দেব, 'আমাদের বাড়ীতে বাস করে যাও দু' একদিন।'…

মেয়ে আর ছেলে এক কিনা?

সমাজের বিরুদ্ধে একজন তুমি যতই বিদ্রোহ কর, নিয়মটা কি বদলাবে?

বদলায় না।

তবে মেয়েদের থেকে পুরুষের গায়ের চামড়া পুরু।

বিনা সাধনাতেই ওরা 'কথা' নামক বস্তুটাকে যা খেকে ছেড়ে ফেলতে পারে, পদ্মপত্র থেকে জলবিন্দুর মত।

সাধনাতে তো আরোই।

তাই সন্দীপ বড় বুলি এর সব কিছুকে ছেড়ে ফেলে দিয়া হাত ধরে বলল, 'তা' হয়েছে তো তোমাদের সব বলা? এবার আশা করি খেতে দেবে?...আমার কিছু আছে তো? না কি তোমাদের মানসীর অতিথিরা সব সেঁটে গেছেন?'

হাঁ আজ হয়ে গেল বেশ কিছু বড় বুলি বলাগাত।

এতক্ষণ যে তাতে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ছোড়দিদি প্রমতি, সে তীব্র স্বরে বলে উঠল, 'খাম আর বাড়াবাড়ি করিস না। খাবার জন্যে তো মরে যাচ্ছেন একেবারে।'

'যাচ্ছি না মানে? পেটের মধ্যে বক রাক্ষস হাঁউ মাউ করছে। আর সেই তখন থেকে ভাবছি তোমাদের রান্নার মেয়েটা একবার দেখে নিতে হবে, দিই মিলিয়ে যাব।'

ঘরের মধ্যে থেকে চমকে উঠল প্রদীপ।

মনে হল বাবা কথা বলে উঠলেন।

উঠে বসল।

চোখটা জ্বালা করে উঠল।

তারপর ভাবল, এর ওপর রাগ করে না খেয়ে শুয়ে পড়েছি— আমি!

উঠে এল।

সহজ ভাবে বলল, 'তা' আমাকেও কিছু দে প্রমতি, এখন তো মাথাটা ছেড়েছে মনে হচ্ছে—'

সন্দীপও চমকে উঠল।

আর জীবনে এই প্রথম বোধকরি অপ্রতিভ হল, 'দাদা খাওনি না কি?'

প্রমতি ঝঙ্কার দিয়ে বলে, 'খাবেন। বলতে লজ্জা করছে না?'

প্রদীপ শান্ত হাসি মুখে বলে, 'সারে পড়ে ঝগড়া করছিস কেন বল দিকি? একটু টায়ার্ড লাগছিল তখন, মাথাটাও ধরেছিল— এখন ভালই লাগছে।'

বহুদিন পরে দুই ভাই একত্রে খেতে বসল। আর সন্দীপের খচ করে মনে হল এটা এত ভাল লাগছে কেন! এমন ভাল লাগবার তো কথা নয়।

এই পারিবারিক সুখকে ভাল লাগা মানেই তো বশ হওয়া, বন্দী হওয়া।

তবু ভাল লাগতে লাগল।

মহোৎসাহে রান্নার প্রশংসা করল, কিন্তু বাড়তি হল কি না নিশ্চয় করে আরো উৎসাহ দেখিয়ে বলল, 'ভালই হল। কাল চায়ের সঙ্গে খাওয়া যাবে।'

ঘর থেকে মঞ্জুরী ভাবল, বরঞ্চই।

প্রদীপের মনে হল, আজকের উৎসব সার্থক।

প্রণতির মনে হল ভাগ্যিস আজ থেকে গেলাম আমি! বড়দি বেচারীরও খুব ইচ্ছে ছিল, বড় জামাইবাবুর ইয়েতেই—বাবা: বুড়ো বয়সে এমন করেন! একটা দিন ছেড়ে থাকা যায়না যেন।

যাক প্রণতি যখন রয়েছে, কথার সুখটা করে নিক।

তাই আবার বলল, 'সত্যি তুই আজ যা করলি সখী—'

'তোমরাও কিছু এমন ভাল করনি—'

'আমরা? আমরা আবার কী করলাম!'

উঃ উচ্ছলটার ওপর কী মুখরোচকটা করলে ভেবে দেখ!...সেই যেবলায় বেচারা নিরুপায় হয়ে তার যেখানে যত্তা চাকা মাথাটা তোদের নিয়মের জুতোর নীচে পেতে বসল, সেই কোটে পড়লাম। উঃ! আমি তো ঠিক করেছি যতদিন না তার মুণ্ডিত মস্তকে কেশ গজায়, ততদিন চোখ বুজে ওর সঙ্গে কথা বলব।'

'খোলো কথা!'

প্রণতি বলে, 'মানুষের ওপর একতিল মায়া নেই তোর, চারটি চুলের ওপর মায়া!'

'মায়া বস্তুটাই যে মায়াময়।'

প্রবীণ পরিতৃপ্তি করে খেতে খেতে ভাবল, বেগবতী নদীর মোড় ঘুরে যায়, মানুষের মনের ঘোর ঘোরাই কি অসম্ভব?...এমন হতে পারে না—সখীপ হঠাৎ আজ থেকে বয়সে গেল, সহজ হয়ে গেল!

সখীপ শুতে এসে, ছোড়দি আবার এসে জাঁকিয়ে বসল, বলল, 'আজ তোর নামে কি কি নিন্দাবাদ হয়েছে জানিস?'

'জানি।'

'জানলি কি করে?'

'অনুমানে।'

'কত খারাপ নামে বলতো?'

'আমার তো খুব আমোদ লাগে। লোকে আমায় নিয়ে করছে, ভাবতে বেজায় খুসি লাগে।'

'তোর একটা কনে ফুটছিল—'

'ফুটছিল বুঝি?' লাফিয়ে ওঠে সখীপ, ইস্ আগে জানাতে হয়! তাহলে বাড়ী থেকে মড়ি? এ হে হে!'

'বাস ফাজিল কোই! দাদা ঠিক করেছে, এবার তোর বিয়ে দেবেই দেবে।'

ব্যস! তা হলে তো হয়েই গেল। তোরা—বিয়ে বাড়ীতে পরবার জন্যে নাইলন শাড়ীর অর্ডার দিগে যা। তারপর আবার ম্যারাপ বাঁধ, তিয়েন বসা, আলোয় ভরপুর করা যেখানে যত তেলাকাথা আছে তাদের ডেকে ডেকে এনে তেল চাল। এক রাত্তিরে একটা সরীষ গেরস্থর বিশবছরের সংসার পোষণের টাকা দু হিয়ে উড়িয়ে দে।'

'ওসব তো পুরনো কথা। ও সব কথা এখন আমার কেউ মানে নাকি? দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না, অতএব আমি আমার অবস্থা অনুযায়ী খরচ করব না, এ সব পচা সেন্টিমেন্ট আর নেই এখন, বুঝলি? যার যেমন ক্ষমতা, সে তা' দেখাবেই।'

'তা' বটে। দেখবার জন্যেই তো ক্ষমতা। ওড়বার মত, পোড়াবার মত, মাড়াবার মত প্রচুর টাকা থাকলে লোকে ওড়াবে না, পোড়াবে না, মাড়াবে না? নিশ্চয় তা' করবে। তা' ছাড়া তোরা যদি পাতে কেলা মণ্ডা মেঠাই দিয়ে ভাইবীনগুলো ভরিয়ে না রাখিস, যা-তাতে হতভাগারা দুটো ভালমন্দর স্বাদ পাবে কোথা থেকে?'

'তোর তো চিরদিনই এই সব বড় বড় কথা! আমরা তো বাবা সার বুঝি, যে যা ভাগ্য নিয়ে এসেছে, তার তাই হবে।···আমরা ঘটা না করলেই কি ওদের দুঃখু ঘুচবে?'

'অকাট্য যুক্তি। তারপর রাত তো দুটো বাজল, আপনার এখন অভিধানের হেতু কি?'

'বলছি, দাদা তোকে বিয়ের কথা বলবে, চোটপাট উত্তর দিবি না।'

'বেশ দেব না!'

'দাদা যেখানে মেয়ে দেখতে যেতে বলবে, যাবি।'

'বেশ যাবো।'

'দাদা নিশ্চয় ভাল মেয়েই দেখাবে তোকে।'

'খুব সম্ভব!'

প্রণতি সন্দিগ্ধ গলায় বলে, 'সবেতে তো সই দিচ্ছিস দেখছি, বিয়ের কথাতেও দিবি তো? না তখন আমার দ্বারা হবে না বলবি?'

'ঠিক ওই ভাষাটা ব্যবহার না করতে পারি।'

'কিন্তু বিয়েটা?'

'ওই একটা দলিলে সইটা বাদ থাক। দেখ তোদের সব কথায় বিনা বাক্যে 'রাজী' দিচ্ছি—'

'সন্দীপ! তোকে নিয়ে কী হবে রে?'

'দেখ ছোড়দি, তোর সবই ভাল, শুধু আমার কথা নিয়ে যদি একটু কম ভাবতিস! কিন্তু এখন যা। কনে দেখতে এক্ষুনি যেতে হচ্ছে না তো? ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে।'

ঘুমে চোখ ভেঙে আসছিল, তবু ঘুমোল না সন্দীপ।

ভেবে দেখল, আর দেরী করা ঠিক নয়। এবার খাঁচা কাটবার সময় হয়েছে। এরা ষড়যন্ত্রে নেমেছে।···ভাবল আজ আমার দাদার কাছে বসে খেতে ভাল লাগছিল, এই মোহকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়।···এটা বিপদের সঙ্কেত।

ঘুম আজ অতীশেরও আসেনি।

খালি পেটের যন্ত্রণায় ঘুম এল না। আজ ঘর খুলে ঢুকতেই দেখল একটা বেড়াল বেরিয়ে গেল।

তারপর দেখল খাবারের ঢাকা মাটিতে গড়াগড়ি। বোধকরি বেড়ালটা চৌকীর তলায় টলায় ছিল চাবি লাগানোর সময়।

খালি পেটে চকচক করে এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে ভাবল, সন্দীপটা বেশ বাড়ী গিয়ে ভোজ খেল। তারপর ভাবল, ও যদি স্বাভাবিক হতো, ভাইপোর পৈতের ঘটায় ভোজে বন্ধুবান্ধবকে নেমন্তন্ন করতো।

ঘুম না আসা বিরক্তিকর মনে ভাবল, একটু আধটু স্বাভাবিক হলেই বা ক্ষতি কি ?

আর ভাবল, ওই ফ্ল্যাটটা খোঁজা এবার বিশেষ দরকার হয়েছে। এভাবে আর পারা যাচ্ছে না।

চেষ্টার মত চেষ্টা হলে, সাপের চোখ বাঘের নখ মেলে, বাসাই কি আর মিলবে না ? মিলল। খাস কলকাতায় নয়। শহরতলীতে।

তা হোক বড় মনোরম। বড় সুন্দর।

সুরভি দেখে এসে হাততালি দিল। সঙ্গীপ বলল, 'অপূর্ব।'

খুঁজে বার করেছে অতীশ, তাই গৌরবটা তার, সে বিনয় করে বলল, 'বল নেই টিউবওয়েল, এই যা অসুবিধে—'

'দূর ও আবার একটা অসুবিধে ?'

তা' সত্যি ওসব একটা অসুবিধে নয়।

অসুবিধে বুঝলেন জ্যেঠতুতো দিদি। ভাত-হাঁড়ির একমুঠো ভাত, রুটির গোছার খান চারেক রুটি, আর অপ্রয়োজনীয় একফালি কুটুরি, এর বিনিময়ে নগদ আশিটা করে টাকা আসছিল হাতে, সেটা গেল।

রাগ করে কথা কইলেন না তিনি।

স্বামিপতি, যিনি জীবনে ডেকে কথা বলেন না, তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন।

বললেন, 'শালাবাবুর এখানে অসুবিধেটা কী হচ্ছিল ? জানতে পারলে তো—'

অতীশ বলল, 'না না অসুবিধে আর কি ? খুব তো ভালই ছিলাম। কিন্তু কতকাল আর আপনাদের ঘাড়ে—'

অসুবিধের চোখে অন্ধকার দেখলেন অপর্ণা।

ক্ষুব্ধ ধিক্কারে বললেন, 'একা মেয়েমানুষ, তুই বাসা করে থাকবি ?'

'একা নয়, তিনজন বন্ধুতে মিলে—'

তোমার বন্ধু যে কি ধরের জানতে তো বাকী নেই। তার মানে বাড়ী থেকে আউট হয়ে গেলি—'

'তা' যা মানে আবিষ্কার করো—'

'আর এই আমরা দুটো বুড়োবুড়ি কীভাবে থাকবো ভাবছি না ?'

'বড়দি মেজদি সেজদিরা কি ভাবছে ?'

'তাদের কথা বাদ দে, তাদের ঘর সংসার হয়েছে—'

'ঘর আমারও হচ্ছে।'

'তা যদি হতো, তবু তো লোকের কাছে মুখ থাকতো। লোকের কাছে এইভাবে মুখ পোড়াবি আমাদের ?'

'মুখ তো অনেক দিন ধরেই পোড়াচ্ছি মা তোমাদের !'

'তা বটে !' অপর্ণা অনন্ত নিশ্বাস ফেলে বলেন, 'পোড়ামুখ আর কতই পুড়বে ! কিন্তু পোড়া পেট বলেও যে একটা জিনিস আছে—'

সুরভি অন্য দিকে তাকিয়ে বলল, 'একশো টাকা করে দিয়ে যাব মাসের গোড়ায়। তাছাড়া তোমার লক্ষ্মীমন্ত মেয়েরা তো রইল—'

'তারা কত দেখে সে তো চোখেই দেখছ।'

'তবু তারাই তো তোমার ভাল মেয়ে মা! এই হতভাগা মেয়ের দৃষ্টান্তস্থল। তাদের কাছে তো কোনদিন বিষ চাইতে যাবে না তুমি।'

জগমোহন ঘর থেকে চীৎকার করে বলেন, 'পায়ে লাথি মেরে জন্মের শোধ খোঁড়া করে রেখে দাও হারামজাদীকে! স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হোক!'

কেউ সে কথার উত্তর দিল না।

সুরভি চলে গেল, খালি হাতে।

ত্রিশক্তির ওই আইন, খালি হাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

সুরভি ভাবল পুরুষরা বড় হৃদয়হীন।

কত ছোট ছোট সখের জিনিসের সঞ্চয় থাকে মানুষের, সেগুলি ফেলে যাওয়া কি সহজ?

তবু এই গলি থেকে বেরোতে পাচ্ছে এই আনন্দে সে লোকদান কাটিয়ে উঠল।

অতীশের বাড়ী নেই, ফেলে আসার প্রশ্ন নেই, বিছানাটা সুটকেসটাতো রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসতে পারে না?

সুরভি আর অতীশ কাছাকাছি পাড়ার, তাই এক সঙ্গে এল।

সুরভি বলল, 'আপনি তো বেশ সব কিছু নিয়ে যাচ্ছেন—'

'নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য। খুললে হাসি পাবে আপনার।'

সুরভি ভাবে আমারও এমন কিছু রাজ-ঐশ্বর্য্য ছিল না, তবু নিজে রোজগার করে পর্য্যন্ত শাড়ী জামা অনেকগুলো করে ফেলেছিলাম—

নবজীবনের যাত্রা পথে সেই তুচ্ছ বস্তুগুলোই বারে বারে চোখের সামনে ছায়া ফেলতে লাগল, তীব্র আকর্ষণে পিছনে টানতে লাগল।

নতুন ফ্ল্যাট তার নতুনত্ব নিয়ে মুখর হয়ে রইল। আরো যতই শাড়ী কিনুক সুরভি, কিনুক যত ব্লাউস চটি ব্যাগ মালা চুড়ি দুল, যেগুলো পরিত্যাগ করে এল সেগুলোর শোক কি কোনদিন ঘুচবে?

সেই শোকে মন পিছনে আছড়াতে লাগল।

নাকি বাতগ্রস্ত জগমোহন, আর কটুভাষিণী অপর্ণা ওই তুচ্ছ বস্তুগুলোর ছদ্মবেশে সুরভিকে এমন করে ব্যাকুল উন্মনা করে তুলে মেয়ের দুর্ব্যবহারের শোধ নিতে বসলেন?

ওরা এসে উঠল।

সন্দীপ এসে পৌঁছয়নি এখনো।

হঠাৎ সুরভির মনে হল অতীশ আর সে যেন এক জাতের, সন্দীপ অন্য জাত। অতীশের সঙ্গে যেন থাপ খাওয়াবার প্রশ্নই নেই। কিন্তু সন্দীপের জন্যে অনেক চিন্তা।

আসল কথা—

সন্দীপ যে বড়লোকের ছেলে, একথা সন্দীপ ভুললেও এরা ভুলতে পারছে না।

পথে পথে ঘোরার বন্ধুত্ব এক জিনিস, আর এক সঙ্গে থাকা অন্য জিনিস। তাছাড়া—

ঈশ্বর জানেন কী করল সে।

ভাল কি মন্দ!

ওই সব উদ্ভট মতবাদ কি সত্যি কার্যকরী? জীবনে কল্যাণকর? মাত্র উদ্দেশ্যহীনতার উদ্দেশ্য নিয়ে দুটো ছেলে একটা মেয়েকে নিয়ে অথবা একটা মেয়ে দুটো ছেলেকে নিয়ে ঘর বাঁধল, এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কেউ কখনো শুনেছে? এমন কথা শুধু এদেশে কেন, অতি উগ্র আধুনিক দেশেও বোধ করি যে শুনবে সেই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

তা এত কথা না শুনেও স্তব্ধ হয়ে গেল মাধুরী!

অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে বলল, 'এখানে থাকবে না? অন্যত্র বাসা নিয়েছ?'

'হয়ে তো গেল তাই।'

'কিন্তু কেন বলতে পারো?'

কঠিন হল মাধুরী।

সন্দীপ কঠিন হবে না, ওটা তাদের নীতি বিরুদ্ধ, তাই সহজ গলায় বলল, 'কারণ কিছুই নেই। এমনি।'

এমনি!

'এমনি শুধু শুধু বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে?'

'আহা ওভাবে নিচ্ছেন কেন? ধরে নিন না বাইরে বদলী হয়ে যাচ্ছি।'

'ধরে নেওয়া কথার কোনও মানে হয় না। তুমি এভাবে চলে গেলে, লোকে কি বলবে জানো?'

'জানি। বলবে ছোঁড়াটা লক্ষ্মী ছাড়া, বাউণ্ডুলে—'

'না তা' বলবে না!' মাধুরী কঠিন হয়ে বলে, 'বলবে বড় ভাই ভাজ একলা সমস্ত ভোগ করবে বলে ছোট ভাইটাকে দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দিয়েছে। তোমার খামখেয়ালের জন্যে আমরা কেন নিন্দনীয় হতে যাব, সেটা বল?'

'বাঃ এত সব ভাবছেন কেন? আমি খামখেয়ালী, সে তো চিরকাল সবাই জানে।'

'কেন খামখেয়ালী সেটা তো জানে না। এইবার একটা কারণ আবিষ্কার করতে পেরে বাঁচবে।'

'লোকের কথা ছেড়ে দিন।'

'না! লোকের কথা ছেড়ে দিতে আমরা পারি না—' মাধুরী আরো কঠিন গলায় বলে, 'লোক নিয়েই আমাদের সমাজ। বেশ, তোমার যদি আমাদের সঙ্গে থাকাটা অসহ্য হয়ে উঠে থাকে, অন্য ব্যবস্থা কর। তোমার অংশ পৃথক করে নাও।'

সন্দীপ শুধু হেসে বলে, 'তাতে আপনাদের ওই 'লোক' নামক প্রভুরা খুব প্রশংসা করবেন?'

'করবে না। নিন্দেই করবে—' মাধুরী নির্লিপ্ত নিষ্ঠুর গলায় বলে, 'কিন্তু সে নিন্দেটা তোমাকে করবে, আমাদের নয়।'

'আরে বাবা বাড়ীর একটা ছেলে তো অনেক সময় বিবাগীও হয়ে যায় ? ঘটে চলে যায়, তাতে—'

'তারা ত্যাগের ছাপ মেরে যায়, নিজের কথা ওঠে না।'

'বেশ। ওই কী যেন তোমাদের ত্যাগ টাগ ওটাই বরং পাকা খাতায় তুলে দিয়ে যাচ্ছি। আমি প্রতাপ রায়ের অধম অনুপযুক্ত সন্তান, অতএব তাঁর বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদিতে আমার অধিকার নেই এই বোধে ওই অংশ তস্য পৌত্র শ্রীমান উজ্জ্বলদীপকে—'

'কখনই না—' মাধুরী তীব্র গলায় বলে ওঠে, 'আমার ছেলেকে আমি তা নিতে দেব না।'

সন্দীপ একটু স্তব্ধ হয়ে যায়।

ভাবে ভেবেছিলাম 'দেব না' কথাটা খুব সহজ, দেখছি সহজ নয়। আস্তে বলে, 'নিতে দেবেন না কেন ? ধরে নিন না উপহার। ওর পৈতের অনেকে অনেক কিছু দিয়েছে, আমি তো কিছু দিইনি, মনে করুন সেইটাই—'

কথাটা সত্যি।

উপহার দেওয়াটা গতানুগতিক লৌকিকতার মত দেখাবে মনে করেই কিছু দেয়নি সন্দীপ।··· অস্বাভাবিক সন্দীপ। এখন হিসেব সহজ করতে—

কিন্তু সহজ করে নেওয়া অত সহজ নয়, সন্দীপের কথা শেষ হয়না. ওঘর থেকে উঠে আসে প্রদীপ।

পর্দা তোলানো দরজার ওপিঠে যে সে বসেছিল, জানত না সন্দীপ।

প্রদীপ উঠে আসে, তার দীর্ঘোন্নত চেহারা নিয়ে দাঁড়ায়, গম্ভীর গলায় বলে, 'না তা মনে করা যায় না সন্দীপ। উপহারটা উপহারই' ধারশোধ নয়। আর যদি দান করতে চাও তো মনে করিয়ে দিচ্ছি রায় বংশের ছেলে দান নেয়না।'

সন্দীপ মাথাটা নীচু করে বলে, 'বেশ যেমন আছে তেমনিই থাক।'

'তা হলে তুমি যাচ্ছই ?'

নির্দিপ্ত গম্ভীর প্রশ্ন !

উত্তর দিতে সময় লাগে সন্দীপের। কে জানতো যাওয়াটা এমন কঠিন চেহারা নিয়ে দাঁড়াবে ! নিজেকে সে চিরদিনই বন্ধনমুক্ত ভেবেছে, ভেবেছে পাকা ফলের মত বোঁটাটা খসেই আছে, টুপ করে পড়লেই হ'ল।

কিন্তু কোথায় পাকা ?

এখন উপায় ?

একটা বন্ধুকে টেনে এনেছি তার মাথা গোঁজার আস্তানা থেকে, একটা মেয়েকে বার করে এনেছি তার সমাজের ঘর থেকে এখন আমার পিছিয়ে পড়লে চলবে কেন ?'

পরিকল্পনাটা যতক্ষণ পরীর কল্পনার মত অলীক ছিল, ততক্ষণ সহজেই এর সপক্ষে যত পারা যায় বড় বড় কথা বলা চলছিল, কিন্তু এখন যেন সব যুক্তি ফাঁপসা হয়ে যাচ্ছে। তাই উত্তর দিতে দেরী হল। প্রদীপের সামনে নিজেকে নিতান্ত অর্বাচীন মনে হল. আস্তে বলল, দু'জন বন্ধুর সঙ্গে ফ্ল্যাটটা নেওয়া হয়ে গেছে, তারা আমার ভরসায়—'

'তোমার ভরসায় ?'

প্রদীপ যেন অস্ফুটে একটু হাসল। তারপর বলল, 'বেশ তো তোমার ভরসাই যদি তারা করে থাকে, ফ্ল্যাট ভাড়াটা তুমি দিয়ে দিও?'

'ধাঃ তা তারা নেবে কেন?' সন্দীপ এবার মাথা তুলে বলে, 'সেটা তো সাহায্যের মত লাগবে। গরীব বলে কি আত্মসম্মান নেই তাদের?'

'তা' বটে।' প্রদীপ গম্ভীর হাসে বলে, 'আর সে সম্মান তো রাখতেই হবে।'

মাধুরী এতক্ষণ চুপ করেছিল, এবার বলে ওঠে, 'বন্ধুর সম্মানের কথাটা তোমার এত সহজে মনে পড়ল ঠাকুরপো, আর বড় ভাইয়ের সম্মান—'

'আঃ মাধুরী, থামো। মা গিয়ে যখন উপায় নেই ওর, ওকে যেতে দাও। তোমার আমার নিন্দে হবে, এটা একটা কিছু বড় কথা নয়। ঠিকানাটা রেখে যেও সন্দীপ।'

সন্দীপ কণ্ঠে আত্ম-সংবরণ করে বলে, 'আমি কি আর মুখ দেখাবনা বলেছি? আসবো তো মাঝে মাঝে—'

'ওঃ আসবে মাঝে মাঝে? তা' হলে আর কি! কোন একদিন বেড়াতে এলে, নিলেই হবে ঠিকানা।'

পর্দাটা ঠেলে আবার ও ঘরে চলে যায় প্রদীপ।

আর সন্দীপের মনে হয় প্রদীপ যেন একটা লোহার প্রাচীর গেঁথে দিয়ে গেল তার সামনে।

এ প্রাচীর কি আর ভাঙবে না?

ভেবেছিল বৌদিকে বলে কেটে পড়বে।

ভেবেছিল বেড়াতে টেড়াতে এসে সহজ করে নেবে আবার। কত ছেলেই তো এমন আলাদা থাকে!

তার বন্ধুদেরই দু' চারজন মা বাপ আছে, তবু আলাদা থাকে। কই খুব একটা পাপিষ্ঠ বা অপরাধী বলে মনে হয় না তো তাদের।

অথচ সন্দীপের নিজেকে—

এ কিছু না।

এ সাময়িক মোহ।

অর্জুনেরও নাকি হয়েছিল এমন। সময়ে সব সয়ে যাবে।

আরো বহুবিধ যুক্তি খাড়া করে নিজেকে প্রস্তুত করে নিল সন্দীপ।

এত কাণ্ড করে পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া। কারণ এ হচ্ছে জীবনের নতুন ছাঁদের একটা এক্সপেরিমেন্ট! হয়তো ওদের এই পরীক্ষার ফল থেকে লাভবান হবে পরবর্তীকালের সমাজ!

সন্দীপ যখন গেল, ওরা তখন ঘর সংসার প্রায় গুছিয়ে ফেলেছে। গিয়ে দেখল, অতীশের মুখে এক অনির্বচনীয় দীপ্তি, সুরভির মুখে একটি মধুর সার্থকতা।

আশ্চর্য!

অতীশের না হয় ঘর-বাড়ী কিছু ছিল না। সুরভির তো ছিল, সুরাভ তো ছেড়ে এসেছে সে সব।

তবে?

নিজেকে যতই কঠিন ভাবুক সন্দীপ আসলে তাহলে ভিতরে ভিতরে সেন্টিমেন্টাল। আর কিছু নয়, রায় বাড়ীর আবহাওয়ার ফল। এ থেকে উত্তীর্ণ হতে হবে।

মন খারাপ!

মন কেমন!

এর চাইতে হাস্যকর লজ্জার বস্তু আর কি আছে?

অতএব দুর্দান্ত উৎসাহে হৈ হৈ করা যাক।

'কিরে তোরা তো বেশ গুছিয়ে এনেছিস দেখছি, 'বলল হৈ হৈ করে,' মনে হচ্ছে চা প্রস্তুত, এবং চায়ের সঙ্গে গরম ফ্রাই কিম্বা—'

'আহা।'

সুরভি বলসে ওঠে, 'ছেলের বায়না কত, ভাত পায়না পায়েস চায়। চা তো কিনে এনে খেয়েছি আমরা।'

'চমৎকার! খাওয়া-দাওয়া কিনিস! আমার পাওনার খাতায় এক কাপের ঘাটতি লেখা হয় যেন।'

'হবে!'

'তারপর? রান্না বান্না?'

'সে ও আজ হোটেলে—'

'যাচ্ছলে—' সন্দীপ বলে, 'কোথায় ভাবতে ভাবতে আসছি দেরী করে বাড়ি গিয়েই বেড়ি পাবো! আর কিনা হোটেল দেখিয়ে দিলে?'

অতীশ হেসে উঠে বলে, 'সত্যি বলতে ভাই, দেখিয়ে আমিই দিয়েছি। মানে শ্রীমতী সুরভির রান্না মুখে তোলা যাবে কিনা যাবে—'

'দেখ! ও রকম অপমান করলে, কোনদিন রান্না করব না। নিজেরা যা ইচ্ছে কোরো!'

'আহা-হা চটছো কেন? তুমিই এখন আমাদের অকূলের কাণ্ডারী, অনাথের হরি।'

এমনি হাস্য পরিহাসের বাতাসে কেটে যায় খানিকটা মেঘ। চেষ্টাকৃতটা সহজ হয়ে আসে। যে চারখানা বেতের চেয়ার কিনেছিল, তারই তিনটের তিনজনে বসে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গল্প করল, তারপর জামা-জুতো পরে চলল হোটেলে।

'তা' এটাই বা মন্দ কি?' সন্দীপ বলে, এই ব্যবস্থাই চালু রাখলে তো হয়। রান্না বান্না বাজার দোকান চাল ডাল, এই সব ঝিরক্তিকর ঝামেলাগুলো থাকে না।'

'আহারে—' সুরভি বলসে ওঠে, 'আমি বলে কত কি ম্যান করেছি। দেখো কী ভাবে ম্যানেজ করি—'

'রান্না ঘর আর ভাঁড়ার ঘরেই নিমজ্জিত থাকবে মনে হচ্ছে!'

'বলবো না। সবই করবো।'

মনে মনে বলে, তা' বলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে নয়। পরিণাটি করে সব গুছিয়েও টাকা জমিয়ে ফেলব আমি। ঠিক ফেলব। টানাটানির সংসার দেখে দেখে হাড় শক্ত আমার।

মনের কথা বাইরে ফোটে না তাই।

'তারপর? শোওয়ার ব্যবস্থা?'

অতীশ অসঙ্কোচে বলে, 'আমার রাজশয্যাটুকুতো ফেলে আসবার জায়গার অভাবেই এসে গেছে—'

সন্দীপ বলে, 'ঠিক আছে অত কুণ্ঠিত হবার কিছু নেই। আজ আমাদের ওই নবক্রীত নেওয়ারের খাটই যথেষ্ট। কাল দেখা যাবে।'

শুয়ে পড়ে।

তিনজনে তিন ঘরে।

কিন্তু ঘুম আসে না কারুরই।

অতীশ ভাবে, জলের কুঁজো সামনে নিয়ে হেঁটায় ছ'তি কাটিয়ে বসে থাকা কি সত্যই সম্ভব? এমন অবাস্তব কল্পনা তারা করেছিল কি করে?

তারপর ভাবল, গলিতে বাকি আছে, হেঁটা পেলে জল খেতে বাধা নেই। কিন্তু প্রথম জলটা চালবে কে?

আর কোনও একটা অনুষ্ঠান বাতীতই—হিঃ তাই কি সম্ভব?

ঘুম আসছিল না সুব্রতিরও।

ও ভাবছিল, ভাবা গিয়েছিল খুব হালকা হয়ে থাকা যাবে। বিদেশে বেড়াতে গিয়ে যেমন ভাবে চালিয়ে নেয় মানুষ, তেমনি ভাবে চালিয়ে নেওয়া হবে, কিন্তু একবেলাতেই তো বুঝছি তা' হয় না। হাজার জিনিস লাগে সংসারে।

সুব্রতিদের পুরনো সংসারে দৈনিক জিনিসের অভাব আছে, স্থায়ী জিনিসের অভাব নেই। তাই অসুবিধে করে কাজ করার অভ্যাস ওর নেই।

তাই কি কি অবশ্য প্রয়োজনীয়, কালই না কিনলে নয়, তার তালিকা করে মনে মনে। অবশেষে আর মনের হিসেবে কুলোয় না, তখন উঠে পড়ে আলো জ্বালায়, এই বেলা মনে থাকতে থাকতে লিখে ফেলবে বলে।

আলো জ্বালিয়েই ভুলটা ধরা পড়ল।

লিখবে কিসে?

কেবলমাত্র কলমটা এনেছে হ্যাণ্ডব্যাগে ভরে, কিন্তু কাগজ?

দেয়ালে লিখে রাখবে নাকি?

কলমটার থাকবে কিছু তা'হলে?

কিছু না আনার প্রস্তাবে কেন রাজী হয়েছিল ভেবে নিজের ওপর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেল।

নিষ্ফল রাগে কিছুক্ষণ শুম্ হয়ে থেকে ভাবল, মাসকাবারে টাকা দিতে গিয়ে সব নিয়ে আসব।

কিন্তু এখন?

এখন একটুকরো কাগজ না পেয়ে যে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে।

সুরভিকে যদি কেউ অসহিষ্ণু ভাবে তো, ভুল ভাববে। বড় অভাব মেনে নেওয়া যায় তুচ্ছ জিনিসের অভাবই মানুষকে ক্ষিপ্ত করে তোলে।

নতুন বাড়ীতে যদি ওদের খাট চেয়ার না থাকতো, মাটিতে শুতো, বসতো, ভাবতো এ আর অসুবিধে কি? এতো হবেই। কিন্তু ভীষণ দরকারের সময় একটুকরো কাগজ থাকবে না? এ কী!

নিজের বন্ধ দরজার ছিট্‌কিনিতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে অনেকক্ষণ, তারপর মনের জোর করে, ঝট্‌ করে খুলে ফেলে বেরিয়ে পড়ল।

দোষ কি! কী আর হবে?

অতীশ বুদ্ধিমান।

অতীশ তার জিনিসপত্র এনেছে।

দরজা খুলেই থতমত খেল অতীশ। ভেবেছিল সন্দীপ। ভেবেছিল 'টুকটুক' করে টোকা দেওয়ার জন্যে প্রচণ্ড এক বকুনি দেবে। বলবে, 'ধাক্কা দিতে পারিসনি? দুমদাম লাথি? এত খুব অভদ্রতা আমার সইবে না।'

কিন্তু—ধাক্কা খেল নিজেই।

দরজা খুলে ধরে।

অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার?'

উত্তর দিতে গলা কাঁপার তো কথা ছিল না, এতো ওদের নীতি নয়। তবু গলা কাঁপল সুরভির। সামান্য একটু কাগজ চাইতে গলা কাঁপল।

অতীশ আরো অবাক হল।

'এত রাত্রে কাগজ কি করবে?'

'আছে দরকার।'

কাগজ দিল। আর দেবার সময় অল্প হেসে বলল, 'ভাবলাম, হয়তো একা ভয় করছে, তাই আশ্রয় নিতে এসেছ এঘরে—'

'যোৎ অসভ্য' বলে পালিয়ে এল সুরভি।

এ ভঙ্গীটা সম্পূর্ণ নতুন।

এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না অতীশ।

ঝঙ্কারটা বাজতে লাগল কানে।

ঘুম সন্দীপের চোখেও ছিল না।

তবু এসব টেরও পেলনা ও।

ওর কানে সারা রাত্তির ধরে একটা গম্ভীর আওয়াজ যেন একটানা ধাক্কা দিয়ে চলেছে..... 'ওকে যেতে দাও···ওকে যেতে দাও···।'

এ আওয়াজ কি সন্দীপের দরোর ?

এরকম গলা নাকি তার ?

সকালের আলোয় আর এক চেহারা।…

এই আলো ঝলমলে প্রকৃতির মাঝখানে, শহরতলীর খোলা মেলার মধ্যে একেবারে নতুন তৈরি বাসার বারান্দায় বসে চা খেতে খেতে ওদের মনে হল সত্যই কোনো বাইরে বেড়াতে এসেছে।

আজ ছুটির দিন, তাড়া নেই, অন্ততঃ সন্দীপের মনে হচ্ছে নেই, তাই জমিয়ে গল্প করতে বসে। কিন্তু …অপর দু'জনের মধ্যে যেন চাঞ্চল্য।

'কী হল ? তোমরা যেন মন দিচ্ছ না—'

'না তা ঠিক নয়' অতীশ বলে 'একটু বেরোলে হতো—'

'কেন ? খবরের কাগজ কিনতে ? না সিগারেট ফুরিয়েছে ?'

'নাঃ ওসব কিছু না। মানে কেনাকাটা তো করতে হবে কিছু—'

'কেনাকাটা ?' সন্দীপ চক্ষু বিস্ফারিত করে বলে, 'আবার কেনা কাটা কী ? এই তো চেয়ার টেবল, চায়ের সরঞ্জাম সব হয়েছে, যেটা প্রধান। এরপর হোটেলে গিয়ে—'

'হাঁ যোজ যোজ হোটেলে ?' সুরভি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। 'পাগল তো নয় মানুষ !'

'ওদেশে কত লোক চিরকাল হোটেলে খায়—'

'থাক, এটা ওদেশ নয়। রান্নার সরঞ্জাম কিনতে বেরোব এখন—'

'আর তোমাদের বিছানাও তো চাই।' বলল অতীশ।

'বিছানা ? আমার চাই না।' সন্দীপ বলে, 'শুধু নেওয়ারে চমৎকার শুয়েছিলাম কাল।'

'আমি চমৎকার শুইনি !' সুরভি বলে, 'সারারাত ঘুম হয়নি আমার।'

'নতুন জায়গায় অমন হয়।'

'আরামের বিছানা আর মানসিক শান্তি থাকলে হয় না।'

'কোনটার অভাব হচ্ছিল ?'

'দুটোরই।'

'দুটোরই ?'

'হাঁ ! না তো কি ! এই আস্তানাটি আগু করে তুলতে না পারা পর্যন্ত শান্তি আছে না কি আমার ?…কাল রাতদুপুরে লিষ্ট করলাম।'

'লিষ্ট ! লিষ্টের মত গুরুতর কিছু নাকি ?'

'দেখ !' বলে কাগজটা ফেলে দিল সুরভি ওর সামনে।

কিন্তু সন্দীপ কি সবটা পড়তে পেরেছে ? শেষ পর্যন্ত ধৈর্য্য রেখে ?

কাগজখানা হাত থেকে পড়ে যায় ওর।

কাতর আর্ত্তনাদ করে ওঠে।

'এই সব চাই তোমার ? এইগুলো কিনে আনবে ? এই শিল, নোড়া, বঁটি, উনুন, হাঁড়ি, কড়া, সাঁড়াশী, খুন্তি, ওরে বাবা এযে গন্ধমাদন ! বাড়ীতে ধরবে ?'

'ঘরে কিনা দেখো ?'

'এইভাবে সংসার করতে চাও তুমি ?'

'ওর আবার ভাবাভাবি কি ? এগুলো অবশ্য প্রয়োজনীয়—'

'অবশ্য প্রয়োজনীয় ! এই ছাতনি দুধের হতো সস্পান, পেরেক দড়ি—'

'সব, সব চাই।'

'অতীশ ! এ বলে কি ?'

'শুনছি তো ?'

'আমি ওর মধ্যে নেই। টাকা লাগবে, এই নাও—'

একগোছা নোট পকেট থেকে বার করে দেয় সন্দীপ।

অতীশ টাকায় হাত দেয় না।

অতীশ অপ্রস্তুত মুখে বলে, 'আমিও তো থাকতে চাইছিলাম না কিছুর মধ্যে, কিন্তু এত জিনিস, সুরভি একা—'

সুরভি খপ্ করে টাকাগুলো তুলে নিয়ে ব্যাগে পুরতে পুরতে বলে, 'আহেলা যেন ছিল ? বলে বলে তবে না ? চল চল···অত আবদারে কাজ নেই—'

'সুরভি তুমি শর্ত ভঙ্গ করছ'—সন্দীপ বলে, 'আমাদের জড়াবার কথা ছিল না।'

সুরভি খিলিক মেরে বলে, 'তাই একেবারে জজ সাহেবের কাছে শর্ত ! দেখো না—প্রতি পদে শর্ত ভাঙবো। রাতদিন যদি তোমার শর্তের বন্ধনেই বন্দী থাকবো, মুক্তিটা কোথা ? চল, চল অতীশ ! ওই ক্যাপাটির পরামর্শে চললে আর খেতে শুতে হবে না।'

বেরিয়ে যায় ওরা দু'জনে।

আর পরমুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে যায় সন্দীপ।

বাবা কি কাল রাত্রে খেয়েছিলেন ?

উজ্জ্বল কি শুনেছে তার ছোটকার কীর্তি ? সে কি ছোটকার এই ভয়ঙ্কর বিশ্বাসঘাতকতায় স্তব্ধ হয়ে গেছে ? না কাঁদছে ?

'মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবো'র তো কথা ছিল। আজকের দিনটাই কি সেই 'মাঝে মাঝে'র প্রথম পাঠ হতে পারে না ?

গেট পার হতে লজ্জা করবে ?

সন্দীপদের অভিধানে কি লজ্জা শব্দটা আছে ?

ট্যাক্সীর পিছনে সামনে, পিঠে 'সিটে', পায়ের নীচে কোলের কাছে জিনিস বোঝাই করে ঘর্মাক্ত সুরভি হৃষ্টচিত্তে গুছিয়ে বসে বলে, 'যাই বল, সন্দীপের মতবাদে বড় বেশী অবাস্তব। এর কোনটা না হলে চলতো বল তো ?'

অতীশের মতে অবশ্য অনেকগুলোই না হলে চলতো। কিন্তু সে কথা প্রকাশ করে না সে। বলে 'তা তো ঠিক !'

'তবু তো' একটা বৈ বাসতি হল না!'

অতীশ ঝাঁংকানিটা কষ্টে সামলে বলে, 'আরো চাই?'

'চাইতে? নিশ্চয়! বাথরুমে একটা—রান্নাঘরে একটা এতো চাই-ই। তা ছাড়া—টিউবওয়েল থেকে জল তুলতে—

'অতীশ!'

সন্দীপ প্রায় চুকরে ওঠে, 'এ পাড়ায় ডাক্তার নেই?'

'ডাক্তার!'

অতীশ চমকে হতভম্ব হয়ে তাকায়।

'হ্যাঁ হ্যাঁ। ডাক্তার! যেখান থেকে পার ধরে আন একটা। মনে হচ্ছে এক্ষুনি হার্টফেল করবো—'

মাটিতে বসে পড়েছে সন্দীপ বুক ধরে।

অতীশ কাতর ডাক দেয়, 'সুরভি, শীগগির এসো একবার। সন্দীপের শরীর খারাপ লাগছে। হঠাৎ কখন থেকে এরকম হচ্ছে সন্দীপ?'

সাধা সেই রুমাল দিয়ে বাতাস করতে আসে।

সুরভি বারান্দায় নামানো সেই গন্ধমাদন পর্বত একটি একটি করে গুণে গুণে লিষ্ট মিলিয়ে দেখছিল, সেইভাবেই বলে, 'কেন বোকামী করছ? ওর হার্টফেলের কারণ আমি বুঝেছি।···সরিয়ে নিচ্ছি বাবা, চোখ থেকে এক্ষুনি সরিয়ে নিচ্ছি সব।'

'জিনিসের জন্যে নাকি?' অতীশ বলে।

'তবে?···সন্দীপ, ভয় খেয়ো না। দেখবে সব কিছু এমন ছড়িয়ে সাজিয়ে রেখব—'

পুলকিত আনন্দে হেসে চেয়ারে এসে বসে সুরভি।

সমস্ত বড় বড় কথা ভেসে হারিয়ে যাচ্ছে··ভিতরের তৃষিত ক্ষুধার্ত সংসারী মেয়েমন যেন পায়ের নীচে মাটি পেয়ে ষোল আনা বিকশিত হয়ে উঠতে চাইছে।···

ওই মনকে রুখতে পারবে এরা?

আর ওকে ছেড়াতে পারবে 'লক্ষ্মীছাড়া ক্লাবে'? ত্রিশক্তি ইউনিয়নে? নিজ শক্তিতে দুর্বার হয়ে উঠবে ও।

ও হেঁসে বেঁকে বলবে, 'বাজে গল্পে সময় নষ্ট করো না। খেয়ে নিয়ে আমায় ছুটি দাও।···ও নিজে কাজে যেরোবার সময় ছুটো অবোধ পুরুষকে শত শিক্ষা দিয়ে অবহিত করে বলে যাবে, 'খবরদার যেন ভুল না হয়···ও সংসার করতে করতে স্বচ্ছন্দে বলবে, 'বাজার যা আওন, আরো কিছু টাকা চাই।'

হ্যাঁ ওর মুখে সেই সংকল্পের আভাস। ওর চোখে সেই নাগপাশের ইসারা।

সেই নাগপাশ ধরা পড়ে প্রতি মুহূর্তে।

এই কি উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া জীবনের ছন্দ? এই কি ছন্নছাড়া লক্ষ্যহীন সংসারের ভেলা? ছন্দের বাটিতে চায়ের খানি পর্যন্ত নির্মূল!

এই জন্যে প্রতাপ রায়ের ছেলে প্রদীপ রায়ের গম্ভীর গলা বেজেছিল 'ওকে যেতে দাও!'

ক্যাপা বাউলের একতারার সুর থামল না।

একটা তার ছেঁড়া ঘরের বেহুরো আওয়াজ বারে বারে বাজ হাসি হেসে ওঠে।

সেই অদ্ভুত গল্প, সেই খোলা আকাশ, সেই গঙ্গার ধার, সেই রাত-দুপুরের সিনেমা, সবই স্তিমিত হয়ে গেছে।

সুরভির সময় নেই।

একটা চাকর রাখা হয়েছে, তবু সুরভি সময় পায় না।...

রাতে বেরোলে 'চোরে সব নিয়ে পালাবে,' এই আশঙ্কায় সুরভি ঘরে সেলেও নড়তে চায় না।

আর—

সন্দীপ দেখে অতীশও তা'তে সায় দেয়। সয়বে না হোক নীরবে। সন্দীপ অনুভব করে অতীশ আর সুরভি সমগোত্র। সন্দীপের সঙ্গে ওদের গোত্রের মিল নেই। ওরা ওদের মধ্যবিত্ত মনকে পিছনে ফেলে আসতে পারেনি।

এক জায়গায় আড্ডা গেড়ে, ত্রিশক্তির সহজ আড্ডা ভাঙল। ভাঙন ধরল ভিতরে।

সন্ধ্যা হলেই ওরা দুজন সওদা করতে বেরোয়, সন্দীপ অন্ধকারে বসে থাকে।

সন্দীপের বইগুলো যদি থাকতো? সবগুলোও না হোক কিছু।

রাত্রে থানকতক বই আশেপাশে নিয়ে শুয়োনো সন্দীপের চিরদিনের অভ্যাস। সেই অভ্যস্ত বস্তুর অভাবে ঘুম আসতে চায় না, উঠে পায়চারি করে বেড়াতে হয়।

কিন্তু নিশ্চুপ নিশ্চিন্তের ঘুম কি কারুরই আসে এ বাড়ীতে? সব কিছু পেয়ে, এবার পাওয়ার সম্পূর্ণতা আনবার জন্যে ছটফট করতে থাকে সুরভি।

অর্জ্জরিত কামনায় অভিশাপ দেয় ছলনাকারী পুরুষ দুটোকে।...

ধিক্কার দেয় নিজেকে।

কী করে নারীত্বের অবমাননাকারী এই সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাবে সে রাজী হয়েছিল ভেবে অবাক হয়।...ইচ্ছে হয় একদিন ধাক্কা মেরে ওদের ঘরজা ভেঙে ফেলে প্রশ্ন করে, 'কই? তোমাদের সেই প্রয়োজনের কী হল? সেই প্রয়োজন? আমার পোষ্টটা তা'হলে রাঁধুনীর চাকরানীর!

বস্তুর পোষ্টটা যে সে নিজেই মুছে ফেলেছে। তা আর মনে পড়ে না। ও তবু ভাবে কেউ যদি এ বাড়ীতে আসে? যদি প্রশ্ন করে, 'তোমাদের সম্পর্ক কী? ওরা তোমার কে হয়?'

কী উত্তর দেবে সুরভি?

'আমরা ভাইবোন?'

ওরা হেসে উঠবে না? বলবেনা 'ভাইবোন যদি তো তোমাদের তিনজনের পদবী আলাদা কেন?'

একজন স্বামী, একজন স্বামীর বন্ধু?

ওঃ! তা' কে কোনটি?

ছি ছি! কী লজ্জা, কী লজ্জা।

সুরভি কি সমাজকে জানে না?

সুরভি এই দুটো বিস্মৃত বুদ্ধি ছেলের সঙ্গে মিশে একী ক্ষতি করলো নিজের?

পরিচয়হীন জীবনের মূল্য কী?

সুরভি যদি সংসারে খরচ বাঁচিয়ে ঘর সাজায় কে দেখতে আসবে সেই ঘর? যদি গহনা গড়ায়, কোথায় যাবে সে গহনা পরে বেড়াতে? বড়দি, মেজদি, সেজদির বাড়ীতেই যদি যেতে না পেল?

নিজের বাড়ী, নিজের সংসার এ না হলে আবার জীবন।

এই সুইছাড়া ঘরে কোনদিন কাউকে ডাকতে পারবে সুরভি?

পারবে না।

এরা সুরভির সব সম্ভাবনা নষ্ট করেছে, অথচ তার বদলে সুরভি কিছু পাচ্ছে না। নিজের রোজগারের টাকায় শুধু খেতে পরতে পাওয়া, সে তো তার বাবার কাছে পাচ্ছিল। তা' ছাড়া নতুন আর কি হচ্ছে?

এরা ধূর্ত, বোকা সুরভিকে ঠকিয়েছে।

এরা ব্যাধ, সুরভি এদের ফাঁদে ধরা দিয়েছে।

মাঝরাতে আশীর সামনে দাঁড়ায়।

নিজেকে বাঘিনীর মত মনে হয়। ভাবে ওরা কেন অমন নিশ্চিন্তে ঘুমোবে?

কিন্তু সত্যি কি নিশ্চিন্তে ঘুমোয়? নাঃ! সন্দীপ নয়, অতীশও নয়।

সেও মানুষ। জীবনের বহু বাসনায় বঞ্চিত দীন মানুষ। কথার ফেনায় ফানুসের মত আকাশে ঠেলে উঠে নিজেকে ভেবেছিল, আকাশচারী বুঝি।

ভেবেছিল···দেখিয়ে দেবে সুরভিকে, দেখিয়ে দেবে সন্দীপকে, কত সংযত সভ্য সে।

কিন্তু এখন ভিতরে শুধু একটা ক্রুদ্ধ আক্রোশ গর্জন করতে থাকে। মনে হয় কে যেন ওকে ঠকিয়েছে, ঠকাচ্ছে!

কে সে।

সন্দীপ?

হ্যাঁ সন্দীপ।

সন্দীপ যদি তার মহত্ত্বের ধর্ম এঁটে বসে না থাকতো, সন্দীপ যদি আকাশ থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াতো, তাহলে বলা যেত, 'এভাবে পারা যায় না ভাই, একটা যাহোক কিছু ব্যবস্থা করা হোক?'

কিন্তু সন্দীপ আকাশে ঘুরে বেড়াবে।

সন্দীপ মাটিতে নামবে না।

সন্দীপ উড়তে বলে ওদের রাশ ধরে থাকবে। কেন আমি ওকে ভয় করবো? কেন লজ্জা করবো?···আমাদের অভিধানে তো লজ্জা নেই?

ভাবল অতীশ।

দরজা খুলে বেরোল।

সন্দীপের জানলায় গিয়ে দাঁড়াল।

দেখল সন্দীপ অন্ধকারে চুপ করে চৌকিতে বসে আছে।

মনে হল ওর সঙ্গে অতীশের যোজন-ব্যবধান। ওর কাছে এত ছোট কথা উত্থাপন করা যায় না।

মাসকাবারে টাকা দিতে এল সুরভি।

প্রথমটায় মা-বাপ কেউই কথা কইলেন না। তারপর জগমোহন মেয়েকে শুনিয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেন, 'পাপের অন্ন যখন গলা দিয়ে নামাতেই হবে, তখন ওই চাঁদির জুতো মাথায় নিতেই হবে! কিন্তু বলে দাও ওকে, টাকাটা যেন মনি অর্ডার করে পাঠায়।'

মনি অর্ডার করেই পাঠাবে, এই কথাই ভেবেছিলেন অপর্ণা। মুখ দেখাতে আসবে ভাবেন নি। জগমোহন শুদ্ধতা ভাঙতে তিনি মুখ খুললেন। বললেন, 'বিষ যখন দেখাতে পারছ না, তখন আর ফুলোপারা চক্ষুর দেখিও না।···চুপ করো!'

সুরভির তবু রাগ হল না।

সুরভি দেখল, মা আধখানা রোগা হয়ে গেছেন। দেখল বাবার বিছানাটা ময়লা চিরকুট, ঘরটা নোংরা বিশ্রী!

মার আর সামর্থ্য নেই।

সন্ধ্যার বেলায় আর খাটুনিতে মা মরতে বসেছেন!···মাকে কি বলব একটা ঝি রাখো আরো কিছু টাকা দেব!

বলতে পারল না।

শুধু আস্তে বলল, 'এ আমার মাইনের টাকা মা।'

তারপর অনেকক্ষণ চৌকিতে বসে থেকে উঠে চলে এল।

নিজের সেই শাড়ীজামার কথা মনেও পড়ল না।

অপর্ণাও সেই যে রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন, আর দেখা করলেন না।

ফিরে আসবার সময় বারবার চোখ মুছতে মুছতে ভাবল সুরভি, আমার যদি নিজের সংসার হতো, দু'জনের সংসার, স্বাভাবিক সংসার, আমি জোর করে মা বাবাকে নিজের সংসারে নিয়ে আসতে পারতাম। বলতাম 'কে দেখবে তোমাদের শুনি? মেয়ের বাড়ী বলে ইয়ে করলে চলবে কেন?'

কিন্তু তিনজনের সংসারে এসব চিন্তার বিলাসিতা সাজে না।

সবোরই বা বলি কেন ?

বলা উচিত যেন !

সন্দীপ অনুভব করছে, ওরা দু'জন নয়নোত্র ক্রমশঃই যেন কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছে, সন্দীপ বলছাড়া হয়ে যাচ্ছে !

জোর করে হৈ চৈ করবার চেষ্টা করে, বেশীক্ষণ এগোয় না।

হঠাৎ কেমন ঠাণ্ডা মেরে যায়।

অতীশ চুপ করে থাকে, ফিকে হাসি হাসে।

সুরতি কাজে চলে যায়।

সন্দীপকে অগত্যাই বই কাগজ একটা কিছু চোখের সামনে তুলে ধরতে হয়।

হঠাৎ একদিন সেই চোখের সামনের কাগজখানা হাত থেকে খসে পড়ল।

সকালের পড়া কাগজ না ?

চোখে পড়ে নি এতবড় খবরটা ?

একবার দু'বার তিনবার পড়ল, তারপর উঠে দাঁড়াল।

'মাঝে মাঝে আসবার' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল না সন্দীপ ? সে প্রতিশ্রুতি কি রেখেছে সে ?

না রাখেনি।

পারে নি।

যারে যারে বাড়ীর কাছাকাছি গিয়ে ফিরে এসেছে। রায় বাড়ীর গেট পার হচ্ছে সন্দীপ যায়, একথা ভেবে শরীরের রক্ত কেমন হিম হিম হয়ে গেছে। আর সেই হিম রক্তকে কি করে চাঙা করে তুলবে সন্দীপ ?

কাগজখানা কুড়িয়ে নেয় অতীশ, চমকে চোখ তুলে বলে, 'তোর দাদা না !'

সন্দীপ উত্তর দিল না, চটিটা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অতীশ সুরতিকে ডেকে বলল, 'দেখেছ কাণ্ড ! সন্দীপের দাদার মোটর এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে।'

'সে কী ?'

'এই যে দেখ না 'সুপ্রসিদ্ধ রায় কোম্পানীর মালিক প্রদীপ রায় মোটর দুর্ঘটনায় পতিত—'

সুরতি বলল, 'জি, টি, রোড হচ্ছে যেন সেই মহাভারতের বকরাক্ষস, প্রতিদিন নরমাংসের নৈবেদ্য চাই !'

'বকরাক্ষসের চাহিদা ছিল মাত্র দৈনিক একটা।'

'তা' সত্যি। সন্দীপ চলে গেল বুঝি ?'

'গেল তো ! বেচারা ! দেখনা সকালে সবাই দেখেছি কাগজটা—'

প্রদীপ ওর বিছানার ধারে মাথা গোঁজা মাথাটার ওপর আস্ত ডানহাতটা রেখে ক্লান্ত শান্ত গলায় বলে, 'কাগজওলাদের কথা বাদ দে ! ওরা তিলকে তাল করে। বাঁ হাতটা একটু জখম হয়েছে—'

এমন সুন্দর কেশগুচ্ছের অধিকারী হলে

আপনিও শুনবেন

"বাঃ সত্যই সুদর্শন"

রুক্ষ অবাধ্য চুলকে সংযত সুন্দর ও মসৃণ করে এবং কেশমূলে সতেজ সজীব রেখে চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে কেয়ো-কার্পিন অদ্বিতীয়।

কেশ পরিচর্যায় এই তেল ব্যবহারে চুল দিনে দিনে ঘন, চিক্কণ ও সুন্দর হয়।

কেয়ো-কার্পিন

মহাফলপ্রদ কেশ তৈল

ম মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা · দিল্লী · বোম্বাই · মাদ্রাজ · পাটনা · গৌহাটী · কটক

মাধুরী নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলে, 'খবর দেব, তারও উপায় নেই, ঠিকানা জানিনা—'

'মাধুরী! তুমি আমার ছলিকসটা আনতে পারতে—'

মাধুরী চোখে আগুন মেলে অনন্ত গলায় বলে চলে যায়, 'ছলিকস তুমি আধঘণ্টা আগে খেয়েছ।'

প্রদীপ বলে, 'ওঠ! উঠে বোস! খুব ভাগ্য জোরের ওপর দিয়ে গেছে। নইলে চোখের সামনে যখন সেই দৈত্যের মত লরিটা ছুটে এসেছে। তখন তো ভাবলাম, বাস হয়ে গেল ভবলীলা সাঙ্গ! ভাবলাও হল, তোর ঠিকানা জানিনা, কার হাতে ইঞ্জলকে আর তোর বৌদিকে দিয়ে যাবো! তক্ষুনি হাসি পেল, ভাবলাম, দিয়ে যাবে কে কাকে? আমি তো শ্রেফ ছাড়ু হচ্ছি! এক সেকেণ্ডের অর্ধাংশেই এত কথা ভাবা হয়ে গেল বুঝলি?—কী রে? কি হল? এই দেয়েছে! আরে আরে ঠিক হয়ে নে। এক্ষুনি তোর বৌদি এসে পড়বে। মান মর্যাদা থাকবে না!'

তা মান মর্যাদা জ্ঞান বোধকরি লোপই পেয়েছে সন্দীপের। তা' নইলে অনেকক্ষণ পরে মাধুরী যখন আবার গম্ভীর বদনে ঘরে ঢোকে দুধের গ্লাস হাতে করে, তখন অমন হেসে বলতে পারে, 'ঠাকুরের রান্না-টান্না বোধ হয় ফিনিস্? এখন আপনার ভাগ্যটাই কমবে দেখছি—'

দিন দুই পরে ঠিকানা খুঁজে অতীশই এল। চাকর ডেকে দিল সন্দীপকে।

অতীশ সকল প্রশ্ন ভুলে চারিদিক তাকিয়ে বলে উঠল, 'এইটা তোদের বাড়ী!'

'রাখেরের!'

'জানি। এইখান থেকে গিয়ে তুই 'ওই কুঁড়ের' তারপর সহসা ওর আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখে ভয়ে ভয়ে বলে, 'আছেন?'

'আরে! ইস! ভাল আছেন, অনেকটা ভাল আছেন। মানে কাগজওলাদের ব্যাপার তো বেশী করে না বললে—আমি একটু আটকে গেলাম। দাদাকে ওই রকম দেখে—ইয়ে এখন আমার না থাকাটা—সে যাক।' 'তোদের কী খবর বল?'

'আমাদের?'

অতীশ নিতান্ত অপ্রস্তুত ভাবে মাথা চুলকে বলে, 'আমাদের—মানে—সে তাই হয়ে গেছে একটা ঘটনা—'

'কী হল?' সন্দীপ বলে, 'কনে বৌয়ের ভূমিকা নিচ্ছিস কেন?'

'আর কেন! তুই ডুব মারলি, একা বাড়ীতে—মানে কী আর বলব বুঝতেই তো পারছিস, হয়ে গেল একটা কাণ্ড!

'হয়ে গেল! বলিস কি?'

'আর বলি কি। তা' সেই অবধি যায়নি মায়নি, জেঁকে হাট বাধাচ্ছে, মুস্কিল একখানা।... এখন মরতে মরতে এসেছি তোর কাছে বেজোড়ীর ব্যাপারে পরামর্শ করতে—'

'বেজোড়ী? মানে বিয়ে?' হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে সন্দীপ। সজোরে বন্ধুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, 'কাট্ ক্লাশ। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এতদূর অগ্রগতি?'

অতীশ আর একবার মাথা চুলকে বলে, 'কী আর বলা! তবে বুঝলাম—ও তোমার ভাই প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে লাভ নেই। তাতে প্রকৃতির প্রতিশোধ বাসনা আরো বেড়ে ওঠে। কিন্তু এদিকের একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি দরকার, অমঙ্গল ত্যাগ করে খোট্ট হয়ে বসে আছে—'

'আরা সে তো একুনি বললে একুনি হবে না? মোটিশ দিতে হবে তো? ততদিনে মেহত্যাগ করে বিদেশী হয়ে বসলে, বিয়েটা হবে কার?···থাক আমি গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে—'

'এই না না—'

অতীশ—হাঁ হাঁ করে ওঠে, 'অমন কাজও করিসনা। তোকে কি করে মুখ দেখাবে এই চিন্তাতেই আরো—তুই এখন চট করে যাসনি। তবে বিয়েতে উইট্‌নেস হতে হবে তোকেই।'

'তা' হলে আমারও একটা শর্ত আছে—' সন্দীপ গম্ভীর ভাবে বলে।

'কী?'

অতীশ শঙ্কিত।

বৌয়ের ভাগ চাইবে না তো হতভাগা?

যা পরিকল্পনা ছিল আগে।

বিশ্বাস নেই ওকে।

সন্দীপ ওর শঙ্কিত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসে, 'মৎ ঘাবড়াও বালক! আমার শর্ত, বিয়ের ভোজটা আমাদের বাড়ী থেকে হবে!'

'তোদের বাড়ী থেকে? এখান থেকে? বলিস কি?'

'অবাক হবার কি আছে? বন্ধুর বাড়ী থেকে বন্ধুর বিয়ে হতে পারে না? তোমার এই প্রেম বিবাহে নিশ্চয়ই তোমার বাধা না—'

'সে তো প্রশ্নই নেই!'

'তবে? চল্ আমার মামার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—'

'আহা হা কেন আবার!'

'চলনা বাবা!'

টেনে নিয়ে যায়।

বলে 'মামা, এই আমার বন্ধু অতীশ। এর সঙ্গেই আমি এতদিন—তা দেখ এ আমাকে মোটিশ দিতে এসেছে। বলছে বিয়ে করবে, আর ঘরে তুলোবে না—'

'তাই নাকি?'

প্রদীপ একটু কৌতুকের হাসি হেসে বলে, 'তাহলে তোমার অবস্থা পুনর্মূষিক?'

'অবশ্যই!'

খানিকটা হাসির আলো ছড়িয়ে পড়ে ঘরের বাতাসে।

———

দেবমিতা

নীলিমা দাশগুপ্ত

"গয়নের দশ টুটিতে, তুমি যখন একখানি পত্র দেবারও প্রয়োজন মনে করলে না আমাকে, তখন ভাবলাম, শ্রীযুক্তা দেবমিতা দেবী বোধো এই. এ. এস. কি বিলেত ফেরৎ এনজিনীয়ারের সঙ্গে ইতিমধ্যে শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে মধুচন্দ্রিমা যাপন করছেন। শুভ বিবাহের গোলাপী-লিপি পাঠাতে অবশ্য ওঁর আপত্তি ছিলো না; কিন্তু মুখ ফুটে হয়তো তিনি কিছু বলতে পারেননি··· দেবীর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তো আর অতীন মিত্রকে চেনেন না···"

উত্তরে কিছু বললো না দেবমিতা। বড় নির্বিকার হাসলো।

অতীন ভেবেছিলো দেবমিতা কিছু বলবে। হয়তো বলবে, এটা ওর স্বেচ্ছা-নির্বাসন, অতীনের জীবনের উন্নতির পথে বিরাট আকর্ষণ হয়ে ওর কর্মপন্থাকে অমনস্ক করতে চায়নি।

অনেক কিছুই ভেবেছিলো অতীন। কিন্তু দেবমিতা একটুকরো ম্লান হেসে উঠে দাঁড়ালো। বললো, "দাঁড়াও, একটা বই আনতে হবে লাইব্রেরী থেকে। এখুনি আসছি—" একটা ভারী দীর্ঘশ্বাস চেপে, আর একবার হাসির চেষ্টা করে পা বাড়ালো দেবমিতা।

অতীন ইনিভার্সিটির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রইলো স্থাণুর মতো। বই নিয়ে আসতে অবশ্য খুব দেরী হয়নি দেবমিতার।

বাঁধানো সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে নেমে অদূরে দাঁড়ানো অতীনকে হাতছানি দিলো। জোরে হেসে উঠলো অতীনের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু, হাসিটাকে বেশীক্ষণ ধরে রাখতে পারলো না।

"অতীন—" একমুহূর্ত থেমে হাতঘড়ির ওপর চোখ রাখলো দেবমিতা, কিম্বা সময় দেখার ভান করে আরো একটু ভেবে নিলো হয়তো বা, "···চল, আমার বাড়ি থেকে আসবে—"

দেবমিতার আহ্বানের সুরটা কেমন যেন ঠাণ্ডা মনে হলো অতীনের। মুখের দিকে তাকালো, "কতদূরে?"

কপালের ওপর ঝুলে পড়া চুল হাত দিয়ে পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে দেবমিতা বললো, "বেশী দূরে নয়, হেঁটেই যাই চল গল্প করতে করতে—"

গেট থেকে বেরিয়ে এলো ওরা। একটা সিগারেট ধরিয়ে অতীন বললো, "জানো মিতা, ক্লাশের ছেলেরা বলে, অতীন আর মিতা মানে—"

"তাতে কী হয়েছে—" দেবমিতা কথা কাটলো, ওটা তো স্বাভাবিক। অতীন মানে একটি যুবক ছিলো আর দেবমিতা নামীয়া একটি তরুণী ছিলো। তথের মধ্যে যুবকটি কবি, দোষের মধ্যে তরুণীটি সুন্দরী। একই কলেজে পড়তো যখন, তখন অবিশ্রান্ত মেলামেশায় কিছুটা স্বাভাবিক উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিলো উভয়ের মনে। তারপর কবি যখন তাঁর প্রথম বই বার করলেন 'দেবমিতা' নামে,

তখন সহপাঠীসুলভ মানবিক বিষয়েই যদি কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হয়ে উঠে তাদের কফি-হাউস আড্ডায় কিছু মুখরোচক সংবাদ পরিবেশন করেন, তাতে তাদের দোষ দেয়া যায় না কিন্তু—"

"কিন্তু এতে কিছু নেই মিতা···আর তুমি প্রথমেই একটা ভুল করছো। অতীন নামে একটি কবি ছিলো, আর দেবমিতা নামীয়া কোনো তরুণী নয়, দেবমিতা নামে কবিতা। পৃথিবীতে তারা জন্মেছিলো একটি কবি আর একটি কবিতা হয়ে। কবি গড়তো কবিতাকে আর কবিতা গড়তো কবিকে। তারপর—"

"কবি—"দেবমিতা দৃঢ়স্বরে বললো, "তোমার কবিতা এবার থামাও। এখন যে অঞ্চলে এসেছো, সেখানকার বাসিন্দারা আলু, পটল আর তিদিব বাজার ঘর আলোচনাকেই কাব্যচর্চার পক্ষে যথেষ্ট মনে করে থাকেন, কবিতা এখানে ঢোকবার পথ পায় না—"

অতীন সচেতন হয়ে ব্রেক কষলো।

বালি ঝিরঝিরে ইঁট হাঁ করা বাড়ির রংচটা একটা টিনের দরজার মধ্যে কুঁজো হয়ে মাথা গলালো অতীন মিতাকে অনুসরণ করে। আবর্জনার স্তূপ আর তরকারীর খোসার মধ্যে দিয়ে দেবমিতা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় এগিয়ে গেলো আর আধো-অন্ধকারে তার সঙ্গে যেন ধাক্কা খেলো অতীন।

"কি মশাই, দেখতে পাননা—" ও পাশের মুদোতর মাংসপিণ্ডগুলো নড়ে চড়ে উঠলো সংঘর্ষে। কস্ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে জলন্ত দেশলাই কাঠিটা ছুড়িয়ে দেখলো সে অতীনকে।

"কে বাবা তুমি, দেখেছি বলে তো মনে হয়না, সরে পড়ো চাঁদ—"

"মানে ! ··" তীব্র বিরক্তি ছিটেগুলির মতো বেরিয়ে এলো অতীনের মুখ থেকে।

দেবমিতা দূর থেকে ডাকলো, "ও অতীন, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছো, চলে এসো—" তারপর এগিয়ে এসে হাতের কেরোসিনের কুপিটা তুলে কলরব করে উঠলো, "এই ভাখো, আলোটা আনতে গিয়েছি, এরই মধ্যে তোমরা ঝগড়া শুরু করেছো তো ?"

অতীনের মনে হলো, মিতা যেন দুটো পোষা বেড়ালকে সস্নেহে তিরস্কার করছে। আর ঐ নুড়িপরা একগাল দাড়ি—কিম্ভূতকিমাকার জীবটির সঙ্গে ওকে সমপর্যায়ে ফেলায়ও যেন ইঙ্গিত রইলো মিতার এই অদ্ভুত আচরণে। অতীনের চোখের দৃষ্টি এড়ালোনা বোধ হয় মিতার, "উনি হচ্ছেন পরাণদা, আমাদের···আমাদের গার্ডেন···আমাদের মস্ত—" চোঁক গিলে থেমে গেলো মিতা। তারপর খপ্ করে বিমূঢ় অতীনের হাতটা ধরে আকর্ষণ করলো, "চল, মা'র সঙ্গে কথা বলবে চল—"

যেতে যেতে অতীন ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো। কুপির আলোতেই দেখলো, মিতার পরাণদা চোয়ালের হাড় দৃঢ় করে, চোখের দৃষ্টি প্রখর করে চেয়ে আছে ওর দিকে। বিড়ালের মতোই জ্বল জ্বল করছে পরাণদার চোখের মণিদুটো আর কিরকম যেন উদগ্র-উদ্ধত-হিংস্র।

একফালি বারান্দা নিয়ে পর পর দুটো ছোটো খুপরি। শেষের খুপরিতে ঢুকে মিতা ডাকলো, "মা, এই যে আমার বন্ধু অতীন মিত্র এসেছেন—"

"এসো, বাবা এসো—" ব্যস্ততায় এগিয়ে এসে একটি পাটি পেতে দিলেন মা। আর অতীন যেন শরীরের ভার সামলাতে অসমর্থ হয়ে বসে পড়লো ধপ্ করে।

মা সস্নেহে বললেন মেয়েকে, "তোর মতো ডাক্তি মেয়ের এমন শান্ত ছেলের সঙ্গে ভাব হলো কিরে ? এ যে কথাই বলে না—"

পরাণবাবুর পর্যবেক্ষণের ফলে বিভ্রান্ত অতীন অপত্যা নড়ে চড়ে কিছুটা সহজ হতে চেষ্টা করলো। দেবমিতার মুখের ওপর চকিতে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে, এ অবস্থায় যে ধরণের কথাবার্তা ও বলে থাকে, যার পর শ্রোতারা কখনো মৃদু ঠোঁট বেঁকায় অথবা সকাশে রোমাঞ্চিত হয় ছেলেটির রসিকতায় মুগ্ধ হয়ে, সে সব কথাই বললো অতীন, "না, না, মাসিমা! ওটা আমার মুখোস। পরিচিত এলাকায় এসে মুহূর্তের মধ্যে খসে পড়ে ওটা আর তারপর অনতিবিলম্বে প্রকাশিত হয়ে পড়ে আমার আদি এবং অকৃত্রিম স্বরূপ··, যেমন এক্ষুনি হবে—আপনাকে আলাতন করতে আরম্ভ করবো,···ঘরোয়ার ঐ সুন্দর ক্যালেণ্ডারটি কোথা থেকে পেয়েছেন জিগ্যেস করবো, ঐ সুন্দর গোলগাল ছেলেটির ফটোর সামনে গিয়ে দাঁড়াবো, মিতাকে একগ্লাস জল আনতে বলবো—"

"হয়েছে হয়েছে—" চমৎকার একটি ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়ালো মিতা।

জল খেয়ে রুমালে ঠোঁট মুছলো অতীন।

মাসিমা বললেন, "তোমাকে যে কিছু খেতে দেবো তার উপায় নেই, দুটো নারকেল সন্দেশ ছিলো তাও পরাণ—"

"না, না—"বিপন্ন অতীন হৈ হৈ করে উঠলো, "কি আশ্চর্য, আমি তো খেয়েই এসেছি, আর তাছাড়া—" ছোট্ট ছেলেটির ফটোর দিকে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে, কথা না শেষ করে উঠে দাঁড়ালো অতীন, "এটি কার?"

"আমার ছোটো ভাই সৌমেনের, ছোটোবেলাতেই আমাদের ছেড়ে গেছে—"

"ও—" দেবমিতার কথার শেষে, অকারণেই মাথা নিচু করলো অতীন, মুখে কিছুটা বিষাদের ভাব আনবার চেষ্টা ক'রে আস্তে আস্তে পাটিতে এসে বসলো আবার।

"তোরা গল্প কর মিতা, আমাকে আবার হরি সংকীর্তন শোনার নেমন্তন্ন করে গেছে—" বলে দেয়াল ভেদ ক'রে কোথাকুথি তাকাবার চেষ্টা করলেন উনি, মেয়েকে যেন কিছু ইশারা করলেন চোখ দিয়ে, তারপর বললেন, "তোমার সঙ্গে আর একদিন গল্প করবো বাবা · তোমার কথা খুব শুনি মিতার কাছে···আর 'দেবমিতা' বইটা খুবই ভাল লেগেছে আমার···হাজার হোক মেয়ের নামের বইতো। আর কোনো বই বার করেছো নাকি?···করোনি?···ও, আচ্ছা,···আজ যাই কেমন?···মিতা, রাত হলে দুই খেয়ে নিস বুঝলি···আমার জন্য—"

"আচ্ছা, আচ্ছা ··" অসহিষ্ণু গলা দেবমিতার, "তুমি যাও তো—"

মৃদু হেসে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। দরজা থেকে ওনার চাদরের ঘোমটানান অংশটুকু মিলিয়ে যেতে না যেতেই ওঁর গলা শোনা গেলো, "কি পরাণ, আজ কারখানায় যাবে না?"

পরাণ ধোঁত ধোঁতে গলায় কি যেন বললো বোঝা গেলো না।

ইতিমধ্যে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছে দেবমিতা।

"কি ভাবছো?" মিতার কণ্ঠস্বর হোঁচট খেলো।

"না, কিছু না—" উদ্গত একটা অনুভূতি সামলাবার চেষ্টা করছে অতীন।

"এই ছবিগুলোও যদি ভাল পাওয়া যায় বাজারে—" জানলার তাকে-রাখা লণ্ঠনটার সলতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ইচ্ছে করে হরবাগ হতে লাগলো মিতা।

কিছু না—বললে কী হবে, অতীন সত্যিই ভাবছিলো। অনেক ভাবনার ভেতরে ভেতরে সে

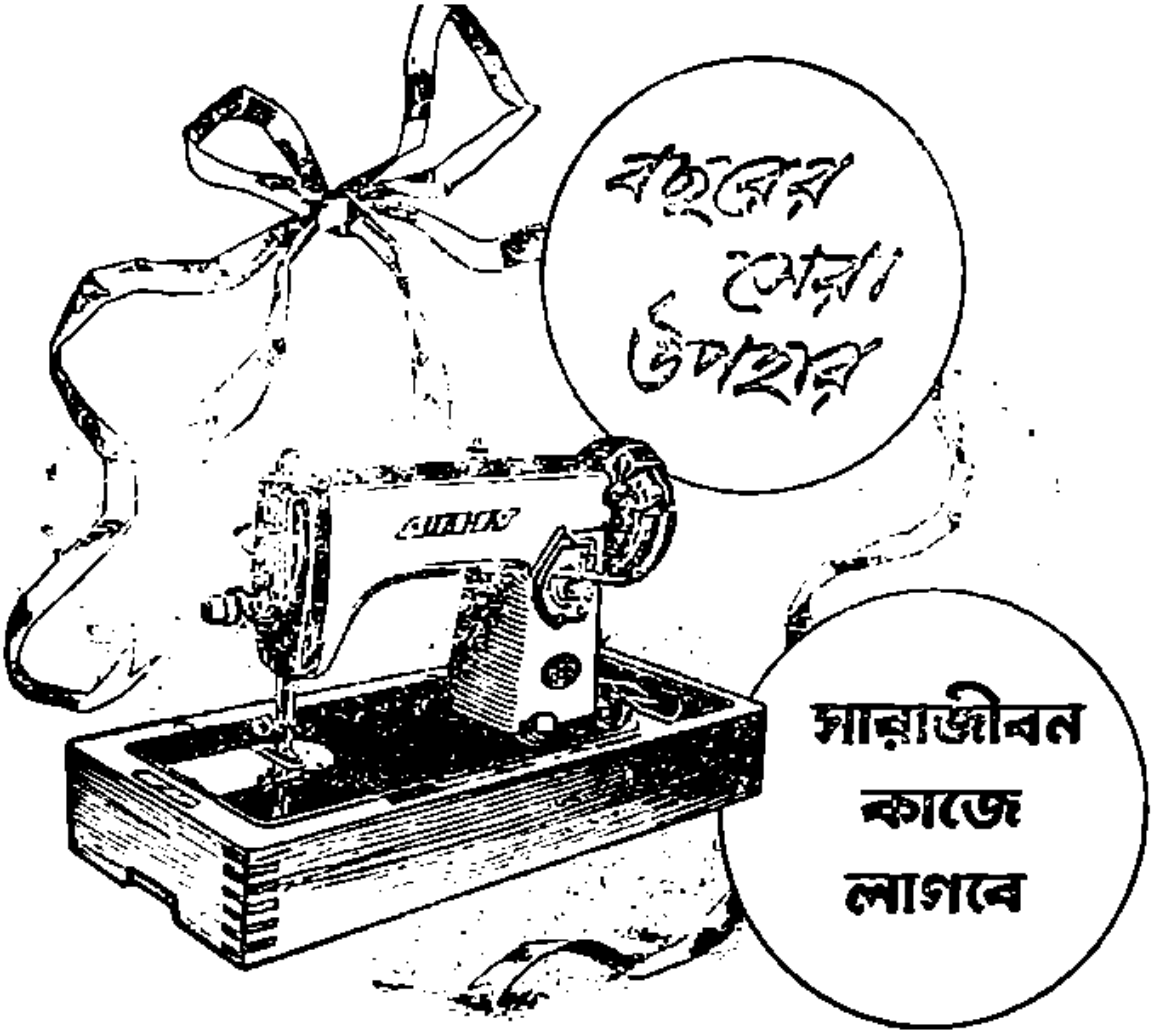

উৎসব উপহার হিসেবে সেলাই কল আজকাল এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে কেন? আপনার পরিবার খুশী হবে সেইজন্য কি? আপনার প্রিয়জনেরা আপনার নির্বাচনায় তারিফ ক'রবে, এই সুন্দর মনমত উপহারটি তাদের জীবনযাত্রার অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়াবে, তাই? হ্যাঁ। কিন্তু শুধু তাই নয়—এই সেলাই কল প্রাচুর্য্যের স্বচ্ছলতার প্রতীক। আপনার পরিবারের জন্য আদর্শ উপহার। এ বছর 'উষা'-র নতুন 'স্ট্রীমলাইন্ড' মডেল দিয়ে আপনার পরিবারকে চমক লাগিয়ে দিন। সুন্দর, আধুনিক গড়ন আর নিখুঁত কাজের জন্য ভারতের বাইরে চল্লিশটিরও বেশী দেশে সমাদৃত —এদেশে এই প্রথম বাজারে ছাড়া হচ্ছে।

উষা

সেলাই কল

ঊষা ইণ্ডিয়া লিঃ কলকাতা ৫৩

JEAM/57

অস্থির। আলোহীন বাতাসহীন এই খুপ্‌রির সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে যতই দেবমিতার দিকে তাকাচ্ছিলো, ততই আশ্চর্য বিস্ময়ে ভাবছিলো···। ভাবছিলো, কোথায় যেন একটা মস্ত ফাঁক রয়ে গেছে···একটা অনিবার্য ফাঁকি। সমুদ্র মাঠে অদৃশ্য বিবরের মতো ওত পেতে আছে ফাঁকটা···।

আশ্চর্য! এই দেবমিতাই নির্জন কফিহাউসে আবৃত্তি করতো, শেলি, কীটস, রবীন্দ্রনাথ··· অতীনের খাতা টেনে নিয়ে লিখতো,—ঠিক কতদূর গেলে চিনবো তোমাকে—, লিখতো, জীবনানন্দের মেদুর পংক্তি··· নীলাচিঠিতে সম্বোধন করতো,—সিন্ধু অতীন···এই দেবমিতাই ওর চোখের ভেতর গভীর চোখ রেখে বলেছিলো, তুমি আমাকে দামী করেছো,···আর···আর দুর্বোধ্য হেয়ালির মতো ঐ বন্ধ পরাণঘাটিই বা কে?···যে প্রায় চোখ রাঙিয়ে ধমক দিতে সাহস করে অতীনকে, অথচ তার সঙ্গে মিতার আচরণ অন্তরঙ্গ জনের মতো···

"বাব্বা, লণ্ঠনটা এতক্ষণে ঠিক হলো একটু—"

মিতার কথায় চমক ভাঙলো অতীনের।

"কী কবি, মুখে আবার মুখোস এঁটে ফেলেছো নাকি?"

অতীন বললো, "মিতা, শোনো!···সামনে এসো। তোমার ঐ পরিহাসচপল কণ্ঠকে কিছুক্ষণের জন্ত নির্বাসিত কর·· দু' একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি···সত্যুত্তর না দাও, ঈষত্যুত্তর দাও—"

জিজ্ঞাসু চোখ দুটো আয়ত হয়ে উঠলো দেবমিতার, গভীর হয়ে উঠলো। শান্তকণ্ঠে বললো, "বল—"

"প্রথমে সেই চিরন্তন অথচ চিরনবীন প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবো— গল্পে উপন্যাসে যে ব্যাপারটা নায়ক জিজ্ঞাসা ক'রে নায়িকাকে, অথবা নায়িকা নায়ককে, অর্থাৎ—" বলতে গিয়ে একটু থামলো অতীন, লণ্ঠনের বিবর্ণ আলোয় সেই অপরূপ পাখি-আঁকা ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকালো, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "···জিজ্ঞাসা করবো তুমি আমাকে ভালবাসো কিনা··তুমি আমাকে—"

"তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন—" অতীনকে অবাক করে দিয়ে দেবমিতা কথাটা বললো।

"দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ পরাণঘা—"

"বল—" একটা চাপা যন্ত্রণায় চোখ দুটোকে বিস্ফারিত করে অতীনের চোখে তাকালো দেবমিতা, অতীন আর কিছু বলতে পারলো না, চেয়ে রইলো শুধু।

"শোনো—" মর্মচ্ছেঁড়া একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতায় দেবমিতার কণ্ঠস্বর কাঁপছে, "একটি বাস্তু-হারা পরিবারের কাহিনী শোনাই তোমাকে—"যেন বহুদূর থেকে গল্প শোনাচ্ছে কেউ। যে দেবমিতাকে অতীন চেনে, যাকে 'সোনাল ফুল', 'ভোরবেলার পাখি' বলে সম্বোধন করতো···এ যেন সে নয়।

"·· ঢাকার একটি গ্রামে, 'মস্ত'গ্রামে তারা থাকতো। একটি ছোট্ট পরিবার। ডাক্তার, তাঁর স্ত্রী ও তাঁদের দুটি ছেলেমেয়ে। সর্বনাশা গোলমালের সময়ে, প্রায় সব হিন্দুরাই 'মস্ত'গ্রাম ছেড়ে চলে এলো। কিন্তু ডাক্তার এলেন না। হিন্দু বলে তাঁর কোনো আলাদা পরিচয় নেই। তিনি ডাক্তার। তিনি চলে গেলে 'মস্ত'গ্রামের কী হবে। বিচক্ষণ আর কোনো ডাক্তারই নেই যে—! গ্রামের মুসলমানরাও একবাক্যে বললো, তারা তাদের বুক দিয়ে, বলতে গিয়ে ডাক্তার পরিবারকে রক্ষে করবে। তাই করেছিলো তারা। এরজন্ত অন্যান্য গ্রাম থেকে প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করেও অত্যাচারের সমস্ত ঢেউ তারা আটকেছিলো। ডাক্তারের জীবিতকাল পর্যন্ত একটি আঁচড়ও পরিবারের গায়ে লাগতে

দেয়নি। আজ থেকে ঠিক দশ বছর আগে, ডাক্তার মারা গেলেন।···বর্ষার বুক-ডোবা জল মাড়িয়ে রোগী দেখতে গিয়েছিলেন, সেই সময় সাপে কেটেছিলো তাঁকে।···

তখন মেয়েটির বয়েস বারো আর ছেলেটির পাঁচ। ভাই-বোনের রূপের কিছু খ্যাতি ছিলো। গ্রামের মাতব্বরের ছেলে জনাব আলি, জানোয়ারের চরিত্র তার, অন্য গ্রামের ক'টি দুর্ধর্ষ গুণ্ডার সাহায্যে মেয়েটিকে গোপনে সরিয়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। বর্ষার পুত্রের চক্রান্ত টের পেয়ে, মাতব্বর সেই মুহূর্তে ডাক্তার পরিবারকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়। কপর্দকশূন্য অবস্থায় কলকাতায় এসে পৌঁছোলো তারা।

এর পরের বর্ণনা দেবার প্রয়োজন নেই। অন্য সব বাস্তুহারাদের মতোই। ভাগ্যের হাতে চাবুক খেয়ে জর্জরিত হলো তারা। সব বোধ ভোঁতা হয়ে গেলো। মেয়েটি মান ইজ্জতের দায় ভুলে ভিক্ষে বৃত্তি নিলো···কিন্তু তবু পারলো না···পারলো না তার ছোট ভাইটিকে বাঁচাতে। বস্তিবাড়ির একটি ঘরে মা তখন শয্যাশায়ী। অচেতন অবস্থা।

সেই সময় পরাণদাসের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে যায়। সে একজন মোটরের মিস্ত্রী। তাকে ভদ্রলোক বলা যায় কিনা জানিনা, তবে আচরণ ভদ্র। অসংযম, অসঙ্গত আচরণ সে কোনোদিনও করেনি।···মেয়েটির হাতে সে ভিক্ষে না দিয়ে, নিজে তার সঙ্গে বাড়িতে এলো। তারপর নিরাপদ আশ্রয় মিলো তাদের।

৩

৭৯এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬
(উদ্বোধনা সিনেমার বিপরীত দিকে)

মেয়েটি বললে একদিন,—"পরাণদা, ম্যাট্রিকটা পাশ করার বড় ইচ্ছে ছিলো আমার।"

"বেশ তো।" পরদিনই মেয়েটি স্কুলে ভর্তি হয়ে গেলো। কেনা হয়ে গেলো খাতা বই পত্তর, স্কুলের প্রয়োজনীয় সব কিছু।

এইভাবে আই. এ. তারপর বি. এ., শুধু ইচ্ছেটুকু প্রকাশ করেই মেয়েটি কলেজের পড়াও শেষ করলো। শুরু হলো ইউনিভার্সিটির পড়া।···

দিনরাত্রি অমানুষিক পরিশ্রম ক'রে মেয়েটির সব ইচ্ছে তামিল করে যাচ্ছে মোটর-মিস্ত্রী পরাণদাস। তার নিজের কোনো ইচ্ছে নেই, বেপরোয়া কোনো দাবী নেই।···সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে, সে সারাজীবন শুধু মেয়েটির ইচ্ছের দাস হয়ে থাকতে চায়।··· ডাক্তারের স্ত্রী সবদিক দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এ অঞ্চলে শক্তিমান পরাণদাসকে এক ডাকে সবাই চেনে। মেয়েটির সৌন্দর্যের জন্য ভয় পেতে হয়না তাঁকে। পরাণদাসের সাকরেদদের নজর সর্বদা ছড়িয়ে আছে। ডাক্তারের স্ত্রী পুরোপুরি নির্ভর, নিঃশঙ্ক। মেয়েটিও। বাড়ি ফিরতে রাত্রি বেশী হলে, কিম্বা নির্জন গলিতে একা ঘোরাফেরা করলে ভাবনা করার কিছু নেই তার··· দেবমিতা থামলো। মনে হলো ও থামলো না, যেন নির্মম-নিষ্ঠুর অদৃশ্য কোনো হাত জোর করে কণ্ঠনালি চেপে ধরলো ওর।

কিছু বলতে চাইলো অতীন, পারলো না। যেন কথা বলার সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে। শুধু দৃষ্টিটাকে তুলে দেবমিতার মুখের ওপর রাখলো। মুহূর্তের জন্য, একটি মেয়ের অন্তরের অকপট রূপটা চোখে পড়লো। যার মনের পাখেয় নিঃশেষিত···যে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষ মরুভূমির মধ্যে···যার বর্তমান নেই···ভবিষ্যৎও নিশ্চিহ্ন···।

দেবমিতা চোখ তুলতেই অতীনের চোখের ওপর এসে পড়লো। চোখ নামিয়ে চোখের জল সামলালো মিতা। তিন চার মুহূর্ত। সমস্ত বিহ্বলতা বুকের ভেতর চেপে দেবমিতা আবার চোখ তুললো "চল, তোমাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি—" তেমনি হরদা খুলে দেবমিতা বারান্দায় এলো। উঠতে দেরী হলো অতীনের। দুঃস্বপ্নের ঘোরটা যেন কাটেনি এখনো···যেন পথ বলতে চোখের সামনে কিছু নেই। তারপর পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালো বারান্দায়।

"একী পরাণদা, তোমার অসুখ করেছে নাকি?" আকণ্ঠ উৎকণ্ঠা দেবমিতার কণ্ঠস্বরে।

অতীন তার টান ধরা স্নায়ুগুলোকে বশে রাখবার চেষ্টা করছে।···

প্রথম যৌবনে একটা বেড়হাত চৌকির ওপর দুটো পা তুলে, পিছিল বেঢপ ভঙ্গিতে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসেছিলো পরাণদাস। মিতার কণ্ঠস্বর কানে যেতেই, কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়ালো সে। মুহূর্তে মানুষটার চেহারা থেকে সব নিষ্ক্রিয়তা সরে গেল যেন।

"তোর পরাণদাকে হাঁচি দিতে দেখেছিস কখনো যে অসুখ করবে—"

হো হো করে ঘর কাটিয়ে হেসে উঠলো পরাণ।

"গল্প শেষ হলো?"

"তা তো হলো, কিন্তু তুমি কেমন পরাণদা, আমার বন্ধু এই প্রথম এলো আমার বাড়িতে··· সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি যখন, তখন আমার বসিয়ে বন্ধু নিশ্চয়ই···তুমি মিষ্টি টিষ্টি কিছু এনে দিলে না—"

"বলবি তো—" এক হেঁচকায় বড়ির আসনা থেকে মলিন পাতছিন্ন সাটটা টেনে নিয়ে গায়ে গলিয়ে দিলো পরাণ।

"কি মিষ্টি আনবো বল—"

অপাঙ্গে অতীনকে একঝলক দেখলো দেবমিতা, "ভাল দেখে মিষ্টি নিয়ে এসো, রসোমাধুরী, ভালশাঁস সন্দেশ…"

"আর ঐ সঙ্গে গোটা কয়েক হিঙের কচুরিও নিয়ে আসি কি বল—তুই ভালবাসিস—"

"তা এনো—"

এই মুহূর্তে নিজের অস্তিত্ব ভুলে যাবার তাড়নায় ব্যস্ত অতীন, দরজা হয়ে জোরে ডাক দিয়ে ফেরালো পরাণকে।—খাবার তো নেই আজ, প্রচুর খাওয়া হয়ে গেছে—।

মিতার ইশারা চোখে পড়লো। অর্থাৎ যেতে দাও। কিন্তু না। আর এক মুহূর্ত অতীন এখানে দাঁড়াতে পারছে না…অতীনের বুকের ভেতরটা একটু শান্ত হোক, একটু ঠাণ্ডা হোক, একটু নির্লিপ্ত হোক, তারপর…তারপর সে একদিন এসে পরাণদার আনা মিষ্টি খেয়ে যাবে।

"একটু দাঁড়াও অতীন…তোমার বইটা নিয়ে যাও—"মিতার গলায় অপরিচিত কণ্ঠস্বর। দরজার বাইরের পা-টাকে টেনে অতীন ঘুরে দাঁড়ালো। ওর কোন বইটার কথা মিতা বললো সেটা নিয়ে ভাবলো একটু।

বই আনতে দেবমিতার দেরী হলো বেশ।

অতীন বই হাতে নিয়ে বিস্মিত হলো। লাইব্রেরী থেকে এইমাত্র আনা বইখানা। মুহূর্ত দুই চুপচাপ দেবমিতাকে দেখলো অতীন…তারপর বই নিয়ে বেরিয়ে এলো মন্থর পায়ে।…

সমস্তটা পথ যেন হাতড়ে হাতড়ে এলো অতীন। যেন অনুভূতি মরে যাওয়া একটা দেহপিণ্ডকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এলো একটা নিষ্প্রাণ অস্তিত্বের মতো।…

—পৃথিবীর কোথাও যেন আলো নেই। নৈরাশ্যের অন্ধকার পাথরের মতো জমাট বেঁধে গেছে সর্বত্র।

—অতীন মিত্রের জীবন থেকে সব আকর্ষণ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তো যাক্…কিন্তু মিতার …দেবমিতার কী হবে?…

ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে অতীন বইখানা পড়ার টেবিলে ছুঁড়ে দিলো। কয়েক ছত্র লেখা নিয়ে এক টুকরো কাগজ পড়ে গেলো মাটিতে।

—তাইতো! বইখানা খুলে দেখার কথা কেন মনে হয়নি।…

এ লেখা অতীনের খুব বেশী চেনা। হেঁট হয়ে কাগজটা তুলে নিলো।

: কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আমার সারাটা জীবন বাঁধা…তার একটু নীচে—

মানুষ বৃদ্ধ হয়, তার একমাত্র কারণ বোধহয় সে মানুষ,

ইট-কাঠ-পাথরের নয়…রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ।

আমাকে ক্ষমা করো।

—দেবমিতা।

———

Child Child Missing Size

চোরে চোরে

প্রবাদ সব দেশেই আছে। অথচ কবে থেকে এল, ও কোথেকে এল, এ কথা অনেকেই জানেন না। মানুষের জীবনে প্রবাদের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। এক একটি ছোটখাটো কথার মধ্যে হাসি ঠাট্টা ও তামাসার সুরে যে প্রবাদ তার গভীরে অনেক সত্য লুকিয়ে থাকে।

"চোরে চোরে মাসতুতো ভাই—" এই প্রবাদটি সম্পর্কে হাল্কা রসের একটি গল্প আমরা শুনেছিলাম রসরাজ অমৃতলাল বসুর মুখ থেকে—সেই গল্পই বলছি শুনুন। সিঁদেল চোরের একটি দল বেরিয়েছে রাতের শিকারে। গাঁয়ের মধ্যে বেশ সঙ্গতিসম্পন্ন একটি গৃহস্থের বাড়ীর পাঁচিল টপকে ঢুকল তারা সেই বাড়ীর ভেতরে। সবাই তখন ঘুমে বিভোর—চোরের দল এদিক ওদিক বেশ করে দেখে ঢুকল ঘরের ভিতরে। ফিসফাস করে আওয়াজ চলল কিছুক্ষণ ধরে; তারপর সব চুপ! সোনার কৌটো, রূপোর ও পেতলের বাসন ঝকঝক করছে দেখে আনন্দে তারা আটখান। কিন্তু এত জিনিস নেবে কেমন করে? ভেবে তারা আকুল! আরে ঐ দেখ একটা খাটিয়া! একজন চোরের মাথায় বুদ্ধি খেলল—মড়া সাজিয়ে খাটিয়ায় বেঁধে নিয়ে চল। শেষে তাই হল। বাঃ, বেশ বুদ্ধি খেলেছিস তো—বলে উঠল দলের নেতা।

সেই খাটিয়াতে স্থান পেল সোনার কৌটো রূপোর ডিবা—টুকিটাকি আরও কত জিনিস-পত্তর! সব ভালো করে ঢাকা দিয়ে নিয়ে মড়ার মত করে বেঁধে কাঁধে নিয়ে চোরের দল বের হল গ্রামের পথে।

থমথম করে রাত—একটু একটু ফিকে ফিকে জ্যোৎস্না। চারদিক নীরব।

বলহরি হরিবোল—বলহরি হরিবোল! যারা শুনছে, তারাই ভাবছে—মড়া নিয়েই যাচ্ছে কারা! আহা কার সর্বনাশ হোল গো—বলে উঠল বাড়ীর মেয়েরা। বলহরি হরিবোল——আর মাঝে মাঝে বাপ মরেছে বাপ—বলতে বলতে চোরের দল দ্রুত গাঁয়ের পথে এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তারা শুনতে পেল—গাড়ুর নলটা ঢাক—গাড়ুর নলটা ঢাক। কেরে বাবা—এ কথা আবার বলছে কে? অবাক হয়ে তাকায় তারা এদিক ওদিক, কিছুই তারা ঠাওর করতে পারে না। আবার সেই শব্দ—গাড়ুর নলটা ঢাক। তারা দেখলে সত্যিই তো গাড়ুর নলটা বেরিয়ে আছে—ভালো করে ঢাকা হয়নি; কিন্তু চোরের উপর বাটপাড়ি করছে কে? সিঁদেল চোরেরা দেখল দূরে তালগাছের মাথায় বসে আর একজন। চাউনির বিনিময় হতেই পরিচয় হতে এক মুহূর্ত দেরী হল না। অমনি চোরের দল বলে উঠল—ভাগ নেবে তো এস—ভাগ নেবে তো এস। দূর থেকে উত্তর এল—একটুখানি রোস। তরতর করে তালগাছ থেকে নেমে এল আর একজন চোর। নেমে এসেই তাদের পাশে দাঁড়িয়েই ব্যস্ত হয়ে বললে—কবে মরেছে বেলো—কবে মরেছে বেলো। এবার তারা সবাই সোরগোল করে এগিয়ে চলল।

রাতে শিকারে বেরুল চারজন চোর

পাচিল টপকে ঢুকলো তারা গৃহস্থের উঠানে

এ তো বড় কম জিনিস নয়, কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে ?

.....ঐতো খাটিয়া, বেঁধে নাও মড়ার মত করে সাজিয়ে।

চলে তারা মড়া নিয়ে, মুখে বলে বাপ্ মরেছে বাপ্।
বাপ্ মরেছে বাপ্॥
তালগাছের মাথা থেকে কে বলে উঠলো, গাড়ুর নলটা চাই।
অবাক হয়ে তাকায় তারা চার ধারে
বলে, ভাগ নেবে তো এসো।

তর্‌তর্‌ করে তালগাছ থেকে নেমে এলো আর একজন চোর,

ও বললে—কবে মরেছে মেসো।

কবে মরেছে মেসো॥

এবারে সবাই মিলে চন্দ্রা তারা মড়া নিয়ে রাজপথ ধরে তাদের গন্তব্য স্থানে।

কেউ কম নয়

আশীষ গুপ্ত

দু' বছরের স্বামীর বিরুদ্ধে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা। অত্যন্ত ঘাতীয় অত্যাচার, অমানুষিক অত্যাচার।

জজ উকিল বন্ধুদের আলাপচারিতে, "বন্ধুর আমার মাত্র বিয়েই তাঁর সব দুঃখের কাহিনী আদালতের কাছে বিবেচনা করবার জন্য স্থির করেছেন। আমার সাহায্যের বিশেষ দরকার হবে না।"

দু' উকিল হাসিমুখে বললেন, "হাঁ বন্ধুর, যা বলবার নিজেই বলবে। স্বামীর অত্যাচার আর আমি সহ্য করতে পারছিনে ধর্মাবতার।"

জজসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, "কি রকমের অত্যাচার শুনি।"

"সাংঘাতিক রকম কী যে ঔৎপীড়ন তা আর কি বলব বন্ধুর। বিয়ের পর দিন এ-ভাবে চলেছে। তবু কাতুকুতি দিয়েছি এই প্রতিবিধানের আশে—কিন্তু কোন ফলই হয়নি। স্বামীর অত্যাচারের মেয়াদ দিন দিনই বেড়ে চলেছে। তাছাড়া আশঙ্কা হচ্ছে যাতে একদিন বন্ধুর, মানের জেরহতার "ঃ" পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যেতে পারে না, এরজন্য ব্যবস্থা করেছি আমি।"

"কিন্তু ব্যাপারটা একটু খুলেই বলুন" বললেন হাকিম।

"বলে ভীষণ দুর্বল বন্ধুর। স্বামীর নিয়ে থেকে গন্ধ আসে। আতরাশনের তাকতুকু, বলি ওরে ফেলে। স্বামীর দুর্ব্যবহার তিক্ত হোতেই চলে। অনেক করে বলি, অনেক হয়েছে, এবার ক্ষমা করে আমায় রাখ। কিন্তু ব্যাপারটার গভীর মর্মান্তিকতা—অনেক বিষয়ে বলবার পাত্র নয় সে।"

বিচিত্র হাকিম প্রশ্ন করলেন, "বন্ধুর! কিসের বন্ধু?"

"সে কথা বলতেও লজ্জা হয় ধর্মাবতার। তোমার অন্তরোধের রে—"

কথা শেষ করে হেসে ফেলেন বাদিনী।

"কিন্তু আপনি যে কি বলতে চাইছেন আমি কিছুই বুঝতে পারছিনে। খুলে করে একটু সহজ ভাবে কথা বলুন।"

"বলব বৈকি বন্ধুর। আপনি সবকথা শুনে তার বিচার করবেন। আদালত খুলেও খোলা যায় না,—সেটা একটা লজ্জার বিষয়ও বটে, আর যাতে আমার পরাজয় ও তাহার জয়লাভ ঘটে।"

হাকিমের মুখ গম্ভীর, স্নেহ প্রকুটিত, মস্তক ঘূর্ণায়মান। আদালতঘর স্তব্ধ।

বাদিনী বলে চলেন, "কী যে ঘৃণিত বলতে লজ্জায় ধর্মাবতার। একটা নয়, দু'-দু'টা ব্যাপার একসঙ্গে—"

"ব্যাপার! সেকি!"

"হাঁ বন্ধুর। দু'-দু'টা। আর কি আর এমনি আদালতে! একেবারে যখন তখন অবস্থায় পৌঁছেছি তখনই এসেছি এখানে।"

"ছ'-ছ'টা ছাগল! কোথায়?" হাকিমের চোখ কপালে উঠল।

"খাটের তলায় ধর্মাবতার।"

"খাটের তলায় ছাগল! এল কোথা থেকে? কে রেখেছে তাদের ওখানে?"

"হায় আমার কপাল! কে আর রাখবে! আমার স্বামীই রেখেছেন। ছাগল পোষেন তিনি। শোবার ঘরে খাটের নিচে ছাগল পালছেন তিনি!—সমস্ত ঘর নোংরা করে তারা। কী যে ভয়ানক দুর্গন্ধ! রাত্রিতে তিষ্ঠোনই দায়, তা ঘুম তো দূরের কথা।"

পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন হাকিম। অবসন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, "রাত্রিতে জানালা খুলে দেন না কেন?"

বাদিনী কুণ্ঠা ও দ্বিধায় সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন। ব্রীড়াবনতা নারীর ভঙ্গীতে মাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "সেকথা বলতে আমার বড় লজ্জা করছে হুজুর,—স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার!"

ধমক দিলেন বাদিনীর উকিল, "তাহলে আর এখানে এসেছেন কেন?—ওসব লজ্জা-টজ্জা এখন রাখুন। এটা আদালত। সব কথা খুলে বলুন হুজুরের কাছে।"

ঢোঁক গিলে বাদিনী বললেন, "জানালা খুলে রাখলে আমার পায়রা উড়ে যাবে ধর্মাবতার। তাই জানালা খুলিনে।

"পায়রা! পায়রা পোষেন আপনি?"

"হাঁ। শোবার ঘরের কার্নিসের ঘুলঘুলিতে থাকে তারা। মুখি, পরপর, লোটন, লক্কা আরও কতরকম! সব পোষা পায়রা, পালাবে না তারা সহজে জানি। কিন্তু যদি দৈবাৎ উড়ে যায় আমি ঘুমোলে পরে, সেই ভয়ে জানালা খুলতে পারিনে। আর তাছাড়া যদি পালায় তাহলে স্বামীর কাছে আমার মস্ত বড় হারও ঘটে।"

"তাহলে আপনি পোষেন পায়রা, আর আপনার স্বামী পোষেন ছাগল?" হাকিমের মুখ বজ্রপাতের পূর্বেকার আকাশের মত গুমগম্ভীর।

'হাঁ—"

"পায়রা পুষেছিলেন আপনি আগে, তারপরে আপনার স্বামী পুষেছেন ছাগল?"

"হাঁ—"

"মামলা ডিস্‌মিস্।" হাকিম বললেন। পেস্কারকে বললেন, "পরের কেস্ ডাকুন।" রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছলেন তিনি।

———

বাংলার দেউল ও দেবতা

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

বাংলাদেশের গ্রামজীবনের সঙ্গে গ্রামীন দেবদেউলের সংযোগ এক সময় অত্যন্ত নিবিড় ভাবেই অনুভূত হত। বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এখনও অনেক গ্রামে প্রতি পাড়ায় এমনকি অনেক পরিবারেরও নিজস্ব দেউল দেখতে পাওয়া যায়। বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনে এইসব দেউল ও দেউলে প্রতিষ্ঠিত দেবতার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এই দিক থেকে বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেউল ও দেবতার বিবর্তনের কথা যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আমাদের বাংলায় সচরাচর যে সব দেউল চোখে পড়ে সেগুলি ছোট আকারের ছাঁচা ধরণে সমান করে তৈরী করা ইটে গড়া। বাংলাদেশের চালাঘরের মতই এর নিচের দিকের আকৃতি; আয়তক্ষেত্রের মত ভিত্তি নক্সা, চেউখেলান খিলেনের ধরণের, চালু গড়ান ছাত। এই ছাতের মাঝখানে রথের চূড়ার মত উঁচু চূড়া। এই মন্দিরের আকৃতি কোথাও ছোট, কোথাও মাঝারি, আবার কোথাও, যেমন দিনাজপুরের কান্তনগরে বা মুর্শিদাবাদের বড়নগরে বেশ বিস্তৃত। মন্দিরের সামনে থাকবে মণ্ডপ আর মূল মন্দির আর মণ্ডপকে ঘিরে প্রাচীরে ঘেরা দালান চত্বর। সংসার তীরে তীরে অশথ বট আম কাঁঠালের সদারোহের মধ্যে বাদশ শিবের মন্দিরশোভিত ঘাট বাংলার একান্ত বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাংলায় এই ধরণের মন্দির নির্মাণের প্রবর্তন হয়। এই সময়ের আগেকার তৈরী দেউল এ রকম বড় একটা দেখা যায় না। বর্ধমান জেলায় দামোদরের তীরে ধরাকরের বেগুনিয়াতে কয়েকটা পাথরের মন্দির আছে। এর মধ্যে অন্তত একটি মন্দির মুসলমান আমলের আগেকার। বর্ধমান জেলায় পাণ্ডবেশ্বরের মন্দির ও বাঁকুড়ার কাছে বহুলারার মন্দিরও পাথরের তৈরী আর মুসলমান আমলের আগেকার। পাথরের তৈরী এই সব মন্দিরের গড়নের সঙ্গে পার্শ্ববর্তী রাজ্য উড়িষ্যার মন্দির শিল্পের অনেক সাদৃশ্য আছে। উড়িষ্যার মন্দিরে যেমন অনুচ্চ পিঠ বা ভিত্তি আর চৌকো গর্ভগৃহের উপরে ক্রমযুক্ত আমলক শোভিত উঁচু বিমান দেখা যায়, বহুলারা আর বেগুনিয়া জাতের মন্দিরগুলিও অনেকটাই একরকম। বর্ধমানের পশ্চিমাঞ্চল, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অঞ্চল এক সময়ে ঘোর জঙ্গলে আবৃত ছিল, আর তারই ফলে দুরবিগম্য এই সব অঞ্চলে প্রাচীন আমলের কিছু কিছু প্রাচীন মন্দির মুসলমানদের ধ্বংসোদ্যতা থেকে রক্ষা পেয়েছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে ভটার দেউল বলে ইটের তৈরী একটি প্রাচীন মন্দির আছে; এই মন্দিরটিও মুসলমানদের আসবার আগেকার। কিন্তু এই অত্যন্ত অল্পসংখ্যক প্রাচীন দেউল ছাড়া আর কোন প্রাক-মুসলিম দেউলের অস্তিত্ব বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যায় না। এ থেকেই স্পষ্টই অনুমান হয় যে ষোড়শ শতাব্দীর আগে মুসলমানেরা স্থানীয় ধর্মের প্রতি বিশেষ ভাবেই বিদ্বেষপরায়ণ ছিল এবং তাদের এই ধর্মদ্বেষিকতার ফলে প্রাক-মুসলিম আমলের ধর্মস্থানগুলি ধ্বংস হয়েছিল। বিজেতা মুসলিম শক্তির হাত থেকে বাঙালীরা নিজেদের মঠ মন্দির দেউল ও ধর্মস্থান-গুলি রক্ষা করতে পারে নাই। মালদহ জেলার মৌড় ও পাণ্ডুয়ায়, হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় এবং

ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

আনন্দবাজার পত্রিকা শুধুই সর্বাধিক প্রচারিত নয়, সর্বাধিক জনপ্রিয়ও। তার কারণ অনেক। নির্ভীক ও বলিষ্ঠ সম্পাদকীয়, সুসম্পাদিত সংবাদ পরিবেশন আর বহুবিধ বিশেষ প্রবন্ধমালা।

যে-কোনো দিনের কাগজ বৈচিত্র্যে,
সুমুদ্রণে ও স্বকীয়তায় আপনাকে
মুগ্ধ করবে।

সংবাদপত্র জগতে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্য এনেছে আনন্দবাজার পত্রিকা

দেশের সেরা

দেশ

সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা

গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, কার্টুন, রসরচনা, বিচিত্র বার্তা, রঙ্গজগৎ, সঙ্গীত, পুস্তক সমালোচনা, ক্রীড়াজগৎ প্রভৃতি বহুবিধ রচনায় ভরপুর।

খ্যাতনামা লেখকরাই দেশ
পত্রিকায় লেখেন।

যেখানে প্রতিদিন দৈনিক কাগজ পৌঁছায় না,
দূর গ্রামে যাঁরা বাস করেন,
তাঁদের জন্যে আছে—

অর্ধ-সাপ্তাহিক

আনন্দবাজার পত্রিকা

প্রতি সোম ও শুক্রবার

প্রতি সংখ্যায় থাকে নিয়মিত সংবাদ,
সম্পাদকীয় এবং রবিবাসরীয় বিভাগের
বিশিষ্ট রচনা।

ইংরেজী খবরের কাগজ যাঁরা পড়েন তাঁদের জন্যে আছে

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড

এমন ভাল কাগজ আর দ্বিতীয় একখানি নেই

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাইভেট লিমিটেড
৬, সুতারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ত্রিবেণীতে মুসলিম ধর্মস্থানে পরিণত অনেক অট্টালিকা থেকে প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের অংশ খোদাই করা পাথর ইত্যাদি পাওয়া গেছে। লক্ষ্মণসেনের আমলে ত্রিবেণী অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল; এখানে মুরারীর মন্দির নামে পরিচিত বিষ্ণুমন্দিরের বর্ণনা ধোয়ীকবির পবনদূত নামক কাব্যে পাওয়া যায়। কাশ্মীরের খ্যাতনামা ইতিহাসকার কবি কল্হন মিশ্রের রাজতরঙ্গিনীতে বাংলারাজ্যের গৌড়ে অবস্থিত গগনচুম্বী বিমান শোভিত বিপুল কারিগরের মন্দিরের বর্ণনা আছে। এই মন্দির সর্বদা জনসমাগমে পরিপূর্ণ থাকত; সন্ধ্যার পরে প্রচুর আঁকজমকের সঙ্গে দেবতার পূজা ও আরতি হত এবং সেই উপলক্ষ্যে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানও হত। এই বর্ণনা পাঠে মনে হয় সে যুগে দেবদেউলগুলি ধর্মসাধনার স্থান অপেক্ষাও সমাজ জীবনের কেন্দ্রস্বরূপেই বেশী সমাদর ও জনপ্রিয়তা ভোগ করত; সমাজ জীবনে এবং মানুষের হৃদয় মন ও চরিত্রের উপর এই সব মন্দির ও দেউলগুলির প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রত্যক্ষ ও প্রবল। এখনও দক্ষিণ ভারতে ছোট বড় অসংখ্য দেবদেউলে প্রচলিত সমাজ জীবনের প্রবহমানতা অত্যন্ত প্রাণবন্ত রয়েছে লক্ষ্য করা যায়। বড় বড় খ্যাতনামা মন্দিরগুলি আজ তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হলেও স্থানীয় এবং আঞ্চলিক দেবদেউলগুলি এখনও সামাজিক মিলন কেন্দ্র, অবসর ও বিশ্রামের এবং দেবসান্নিধ্যে পবিত্র জীবন সাধনের অবলম্বন বলে গণ্য হয়ে থাকে। মুসলমান আক্রমণের ফলে কিছুদিনের জন্য বাংলায় এই চিরদিনের প্রবহমানতা প্রতিহত হয়েছিল। কিছুদিন আগে রাজসাহী জেলায় পাহাড়পুরে প্রাচীন আমলের একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই বিহারটি বাংলার বিখ্যাত সম্রাট ধর্মপাল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়; এর নাম ছিল সোমপুর বিহার। এই বিহারের ক্ষেত্রে একটি বিচিত্র নক্সার দেউলের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়েছে। ক্রুশচিহ্নের মত আলম্ব ভিত্তিনক্সার উপর ধাপে ধাপে উঠে যাওয়া এই বিচিত্র দেউলটির সঙ্গে যবদ্বীপের প্রখ্যাত বোরোবুদুরের স্তূপমন্দিরের খুব সাদৃশ্য দেখা যায়। এই দেউলটি ইটের তৈরী ছিল। মনে হয় বাংলায় পাথরের অভাব থাকায় দেউল নির্মাণে খুব প্রাচীনকাল থেকেই ইটের ব্যবহার চলত আর জলবায়ুর প্রভাবে এবং সহজেই গাছপালা জন্মে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকায় বাংলায় প্রাচীন ইটের তৈরী দেউলগুলি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নাই। তবে খুব প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় যে স্থাপত্যভাবের যথেষ্ট প্রসার ছিল তার কিছু প্রমাণের অভাব নাই। খুব অল্পদিন আগে বারাসতের কাছে দেবালয় বা বেড়াচাঁপা নামে পরিচিত গ্রামে গুপ্ত আমলের কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। পাহাড়পুরের বিখ্যাত পাল যুগের মন্দিরের উচ্চতম সমতল অংশে চৌকো ধরণের একটা কুয়োর মত গভীর গর্ত দেখা যায়। বেড়াচাঁপার মন্দিরের মাঝখানেও ঐ ধরণের গর্ত আছে। কিন্তু এই গর্তের গড়ন একটু ভিন্ন ধরণের। এর উপরের অংশ বেশ ছড়ান বড় চৌকো ধরণের; নীচের অংশ অনেক ছোট আয়তনিকের প্রাচীর ভিতর দিকে গড়ান (inclined)। মন্দিরের মাঝখানে এই ধরণের অদ্ভুত নক্সার গভীর গর্ত আর কোথাও এ পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া যায় নি। এই মন্দিরেও চারদিকের ভিনদিক একটু করে বাড়ান এবং প্রবেশ পথের দিক বেশ বাড়ান এবং উহাদিকে পরপর কয়েকটি ধাপ দেখা যায়। পাহাড়পুর মন্দিরের আগে তৈরী হয়ে থাকলেও পাহাড়পুরের মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের সাদৃশ্য দেখে অনুমান হয় বাংলাদেশে যা পূর্বভারতে এক বিশেষ ধরণের ইটের মন্দিরের প্রচলন ছিল যেমনটি অন্য কোথাও দেখা যায় নি। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমণে প্রাচীন মন্দির ধ্বংস ও নূতন মন্দির নির্মাণে কিছুকাল বন্ধ থাকলেও পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকেই আবার বাংলায় মন্দির

নির্মাণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। ইতিমধ্যে মুসলমান শাসন প্রাচীন ধ্বংসপ্রবণতা এবং অত্যাচারমুক্ত থেকে অনেকটা মুক্ত হয়ে বাংলার মাটির সঙ্গে একটা আপনের সম্বন্ধ সৃষ্টির সূচনা করছিল। এই নমনীয়তা প্রথমে আত্মপ্রকাশ করে মুসলমান শাসকদের স্থানীয় ভাষার উপর আনুকূল্যের পথে। রামায়ণ ও মহাভারত রচনার উৎসাহ দিয়ে মুসলমান শাসকদের মধ্যে কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি মুসলমান শাসনের এই আপনপ্রবণতার সূচনা করেন। পরে ধর্মের নানা বিশিষ্ট অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে স্থানীয় অধিবাসীরা মুসলমান শাসনের ঔদ্ধত্য এবং হিংস্রতাকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করে। এই ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনের পরিচয় নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে দেবদেউলগুলি। ধর্মীয় এবং সামাজিক দুর্বলতার কারণে অন্তর্হিত হয় আত্মজিজ্ঞাসা। ধর্মমঙ্গল এবং গোরক্ষবিজয়াদি ধর্মমূলক আখ্যানে সামাজিক দুর্বলতাকে তুচ্ছ করে আধ্যাত্মিকতার পথে অংস্রোপলব্ধির প্রচেষ্টা দেখা যায়। মুসলমান শাসনকে প্রতিহত করে জল জঙ্গল ইত্যাদি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার সাহায্য নিয়ে সমাজ আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। মন্দির প্রাচীরে রামের রাক্ষস বধ ও শ্রীকৃষ্ণের অসুর দমনের কাহিনীগুলিকে অবলম্বন করে নূতন পোড়ামাটির শিল্পের পত্তন হয়। বাংলাদেশে আবার দেউলগুলি সমাজসত্তার কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

এইভাবে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে যেমন বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় বাংলার অতি জনপ্রিয় দেবতার ক্ষেত্রেও তেমনি বিবর্তন লক্ষ্য না করে পারা যায় না। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মকে অবলম্বন করে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের পথে ধর্ম সাধনার যে পরিচয় পাওয়া

যায় সেই যুগের ভাগবতী ধর্ম বাংলায় কখনও খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বলে মনে হয় না। জৈন আচারঙ্গ সূত্রে জানা যায় যে মহাবীর লোঢ়ে উপনীত হলে স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে মোটেই প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করে নাই। ভগবান বুদ্ধ তাঁর ধর্মপরিক্রমণ ব্যাপদেশে কখনও বাংলায় পদার্পণ করেন নাই। বাংলা বুদ্ধদেবের আমল পর্যন্তও সম্ভবত উত্তর ভারতীয় অর্থ ধর্মের আওতার বাইরে ছিল এবং উত্তর ভারতীয় সভ্যতার চোখে হীন বলেই প্রতীয়মান ছিল। এই সময় বাংলার অবস্থা কেমন ছিল—বাংলায় কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল বলা সহজ নয়। পূর্ববঙ্গের বগুড়ার মহাস্থান গড়ে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এখানকার একটি ক্ষুদ্রশিলা ফলকে প্রাচীন মৌর্য আমলের অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপি পাওয়া যায় যা থেকে অনেকে অনুমান করেন যে পুণ্ড্রবর্ধন অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য বাংলা থেকে এ পর্যন্ত অশোকের রাজত্বের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় প্রথম শতকের যে অসংখ্য পোড়ামাটির মূর্তি ও ফলক বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে বিচিত্র অলঙ্কার ও বেশভূষায় মণ্ডিত অনেক নারী মূর্তি আছে। এ ছাড়া হাতী, ভেড়া, ষাঁড় ইত্যাদি জন্তু বা ঐ সব জন্তুতে টানা রথের উপর আরূঢ় মানুষের মূর্তিগুলিকে অনেকে ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য ইত্যাদি বৈদিক দেবতার মূর্তি বলে মনে করেন। এই অনুমান কতদূর সত্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রবর্তনের আগে বাংলা অঞ্চলে বৈদিক ধর্ম প্রচলিত ছিল কিনা কিংবা বাংলার নিজস্ব কোন ধর্ম প্রচলিত ছিল এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এখনও সম্ভব নয়। তবে রথারূঢ় কোন কোন মূর্তির সঙ্গে ভারতের অন্যান্য অংশে পাওয়া অনুরূপ মূর্তির খুব নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। বিশেষ করে চারঘোড়ার রথে চড়া একটি মূর্তির সঙ্গে পশ্চিম ভারতের ভাজায় আবিষ্কৃত খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর একটি মূর্তির অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করে চমৎকৃত হতে হয় এবং এ থেকে এই অনুমান সত্য বলে মনে হয় যে এই দুটি একই দেবতার মূর্তি। ভাজার ঐ মূর্তিটিকে আমি বৈদিক মিত্রদেবতার মূর্তি বলে মনে করি। ঋগ্বেদে মিত্র খুব জনপ্রিয় দেবতা নন, যদিও আদিত্যদের নামের তালিকায় মিত্রদেবতার নামের উল্লেখ আছে। এই অনুমানে হাতীতে চড়া মূর্তিকে বেদের ইন্দ্র বলে অনুমান করা হয়। অন্যান্য মূর্তিগুলিকে যদি বৈদিক দেবতাদের মূর্তি বলে ধরা যায় তবে বাংলায় ঐ সময়ে অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী ও তার আগে বৈদিক দেবদেবীদের পূজার প্রচলন ছিল বলে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে। এর পরবর্তী যুগে যে সব দেবতার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে তার মধ্যে বিষ্ণুই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। উত্তরবাংলার হাকড়াইল থেকে খ্রীষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতকের একটি বিষ্ণু মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বাংলায় আবিষ্কৃত পাথরের তৈরী দেবমূর্তির মধ্যে এইটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। এর পরেই উল্লেখ করা যেতে পারে সুন্দরবন থেকে পাওয়া ষষ্ঠ শতাব্দীর একটি অপূর্বমাধুর্যমণ্ডিত সপ্তাশ্ববাহিত রথারূঢ় সূর্য মূর্তির। সূর্যের এবং মিত্রের পূজা বিষ্ণুপূজার মতই বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বাংলায় আবিষ্কৃত চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তির সঙ্গে উত্তর ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া প্রাচীন আমলের বাসুদেব মূর্তির বেশ কিছু সৌসাদৃশ্য দেখা যায়; আর সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলায় যে বিষ্ণু ভগবানের পূজা প্রচলিত ছিল এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নাই। মহাভারতে আছে যে, বাংলায় বাসুদেব নামে এক রাজা ছিলেন এবং তিনি নিজেকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করতেন—মথুরার বাসুদেবকে তিনি বিষ্ণুর অবতার বলে গণ্য করতেন না। অবশ্য যাদবকুলজাত বাসুদেবের হাতে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। পাহাড়পুরের মন্দিরের গায়ে বাসুদেব কৃষ্ণের লীলা বিষয়ক কতগুলি শিলাচিত্র দেখা

যায়; ঐ সঙ্গে শিবের বিবাহ ইত্যাদির চিত্রও আছে। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ মন্দিরের গায়ে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাশ্রয়ী এইসব দৃশ্যচিত্রের সমাবেশ কিছুটা বিস্ময়জনক। মনে হয় এইসব শিলাচিত্র সন্নিকটবর্তী ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ীদের মন্দির থেকে সংগ্রহ করে সোমপুর বিহার নির্মাণকারীরা তাদের মন্দির প্রাচীরে লাগিয়ে দিয়েছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তৈরী ঐ মূর্তিগুলিতে বাংলার বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের প্রভূত সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ সময়েই বাংলায় বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের প্রবর্তন হয়েছিল। বীরভূম, বাঁকুড়া এবং সুন্দরবন অঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্করদেরও অনেক মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। পূর্ববাঙলা থেকে বঙ্গরাজ্যের আ-দের ধাতুময়ী একটি সর্বাঙ্গ মূর্তি পাওয়া গিয়েছিল—পরে এই মূর্তিটির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। নির্মাণ-কৌশলে এবং দেহলালিত্যে এই মূর্তিটি খুবই সুন্দর ছিল। এই মূর্তি থেকে বাংলায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে বাংলায় যেসব বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলিতেও তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রভাব ছিল প্রবল। বাংলার খ্যাতনামা পাল সম্রাটরা ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাশ্রয়ী। ফলে বাংলায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের নানা দেবতার পূজার প্রচলন হয়েছিল। বাংলার শিল্পীর তৈরি অবলোকিতেশ্বর, তারা, মঞ্জুশ্রী ইত্যাদির মূর্তি খুবই সুন্দর এবং শালিত্যপূর্ণ বলে গণ্য হয়ে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মাশ্রিত এই সব দেবদেবী বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল নানা জায়গা থেকে এই সব মূর্তির আবিষ্কারে তার প্রমাণ হয়।

পাল রাজাদের বহু আগে বাংলায় গুপ্ত রাজবংশের অধিকার বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সম্রাটরা ধর্মে ছিলেন বৈষ্ণব। গুপ্ত রাজবংশের অবলুপ্তির পর বাংলায় জয়নাগ এবং শশাঙ্ক নামে দুজন পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করেন। নাম থেকেই বোঝা যায় যে জয়নাগ ছিলেন নাগ বংশের সন্তান। নাগ জাতি ভারতের সর্বত্রই প্রতিষ্ঠিত ছিল; খুব সম্ভব এরা ধর্মীয় বিশ্বাসে ছিলেন শৈব। জয়নাগের সঙ্গে শশাঙ্কের কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা জানা যায় না; তবে তাদের প্রচারিত মুদ্রা অনেকটা এক রকম ছিল। হর্ষচরিতে শশাঙ্ককে গৌড়ভুজঙ্গ বলে অভিহিত করা হয়েছে। কেন শশাঙ্ককে বাণভট্ট ভুজঙ্গ বলে অভিহিত করেছেন তার অনেক অর্থ করা হয়েছে। আমার মনে হয় শশাঙ্ক জয়নাগের আত্মীয় এবং নাগবংশ সম্ভূত ছিলেন, এই কারণেই বাণভট্ট শশাঙ্ককে গৌড়ভুজঙ্গ আখ্যা দিয়েছিলেন। শশাঙ্কও ধর্ম বিশ্বাসে ছিলেন শৈব। পাল যুগের আগে থেকেই বাংলা দেশে বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। পাল রাজারা বৌদ্ধ হলেও সে যুগে ধর্মের গোঁড়ামী ছিল না। তাঁদের আমলে দেশের সর্বত্র বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের বহু মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। এই সব দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে অবশ্য বিষ্ণু মূর্তির সংখ্যা অন্যান্য মূর্তি অপেক্ষা অনেক বেশী। বাংলাদেশে প্রাচীনকালে দেবতাদের মধ্যে বাসুদেব বিষ্ণুর জনপ্রিয়তাই ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী। বাংলার বিষ্ণু মূর্তি গঠন সৌকর্যে এবং ভাবরসে বিশেষ সমৃদ্ধ। এই সব দেবতা ও দেউল নিয়ে বাংলার লোকজীবন দীর্ঘকাল এক অপূর্ব রসধারায় পুষ্ট হয়ে প্রবাহিত হয়েছিল।

———

মামুণ্ডির জঙ্গলে

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অর্জুন সেন বক্তা, ভন্টু তার যোগানদার, আর আমি চলার শ্রোতা। আরও একজন আছেন আমাদের আচার্যি মশাই। মেয়ের বিয়েতে এক খোক সাহায্য প্রার্থনায় এসে বাঘের টাঁদে পড়েছেন। অর্থাৎ বাঘ-শিকারের কাহিনী শ্রবণের আগ্রহ তাঁর এতই বেশী যে মেয়ের বিয়ের ব্যাপারটা আপাতত ধামাচাপা পড়লো।

শীতের সন্ধ্যা। এক রাউণ্ড চা হয়ে গিয়েছে। দু'জনের অর্ডার জারি করেই অর্জুন সেন বর্মা চুরুট ধরিয়ে নিলে। তারপর মুখভর্তি একরাশ ধোঁয়া উদ্গীরণ করেই সুরু করে—

গতবছর আজ্ঞা নাম্বেকাল হয়েছিলাম এক শিকারে গিয়ে। আমার ভন্টু আবার এখন একটা বেহদ্দ গোঁয়ার, কোথায় আমাকে আগে থাকতেই সাবধান করবে, তা নয় বিপদের ঝুঁকি যেখানে বেশী, ওর ঝোঁকটাও যেন সেই দিকেই চেপে বসে।

ভন্টুও জুৎসই উত্তর দিয়ে বলল—মেজর সাহেবকে কোনো কাজে বাধা দেওয়ার তালিম আমার নেই।

অর্জুন সেন ঠোঁট বেঁকিয়ে প্রশ্ন করে, তবে তোমার কাজটা কী?

ভন্টু বুক ঠুকে উত্তর দিলে, বিপদে জান দেওয়া—

আচার্যি মশাই-এর ধৈর্য থাকে না—তিনি গায়ের কম্বলখানা ভাল করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, এবার বাঘের কথাই হোক।

অর্জুন সেন সোজা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই মুচকি হাসে—এই যে আপনার সামনেই বাঘ এনে দিচ্ছি একটা নয়, একজোড়া—

আচার্যি মশাই যেন আঁৎকে ওঠেন—সঙ্গেই আছে না কি?

—আছে বৈ কী? ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

বাধা দিয়ে বলি, আসল ঘটনা কি হয়েছিল, তাই বলে যাও। শিকারের মাল মশলা কী আছে, তাই দেখা যাক।

—সব শিকারেই যে মাল মশলা থাকবে, এমন কোনও কথা নেই। আমি তো আর উদ্যোগ আয়োজন করে শিকারে যাইনি—হাতী, ঘোড়া, লোক-লস্কর তেমন নেই, তাঁবুও ফেলিনি। বেহাৎ রাইফেলটা হাতেই থাকে, ছুটিছাটা পেলেই এদিক ওদিক জঙ্গল জানোয়ারের পক্ষস্থান করাটাই স্বভাব। তা'ছাড়া উদ্ধে দেবার জন্যে আমার ভন্টু মহারাজতো আছেনই।

আচার্যি মশাই একটি খাঁটি প্রবাদবচন তাঁর ঝুলি থেকে বের করে ছাড়লেন—একে যা মনসা, তায় ধোঁয়ার গন্ধ।

ভন্টুর চোখ দুটি উটাের মত জ্বলে ওঠে। অর্জুন সেন ইসারায় থামিয়ে দিতেই তিনি চুপ।

এবার আমিও অসহিষ্ণু হয়ে উঠি। বন্ধুবরকে তাগাদা দিই—কৈ হে, তোমার শিকারের থলেটা একবার খোলো—

অর্জুন সেন চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ঊর্ধে ছড়িয়ে দিলে—বেশ তবে আরম্ভ করা যাক—একটানা বলব, কেউ বাগড়া দিওনা।

আচার্যি মশাই-এর অর্ধ নিমীলিত চোখ দুটি বিস্ফারিত—একটি অস্ফুট ধ্বনি—তা বেশ বেশ।

অর্জুন সেন বলে যায়—জানোই ত, বছরে দুমাস ছুটি। একলা মানুষ, কোনো নেশা ভাঙ করিনা বা বকফেলো নই।

আচার্যি মশাই-এর সঙ্কুচিত চোখ দুটি খুলে গেল—বকফেলো আবার কী?

—বকে বলে যারা বকবাজি করে—আর বকম বে-বকম কথায় ভুরুড়ি ছোটায়। আমার সময়টা পাহাড়ে পাহাড়ে বনে জঙ্গলে কেটে যায়।

সেবার ছুটি পাওনা হতেই ঠিক করি—সোজা পাড়ি জমাব—কোনো পাহাড়ের কোলে। না, না, হিমালয় নয়, তোমাদের ওই দার্জিলিঙ, শিলং, মুসৌরী, রাঁচিকেত কি ফরিবার নয়—তাহাতাহি অরণ্যিয়া পাহাড়ে। মনে মনে একটা ছক কেটে নিয়েছিলাম—কিন্তু যার সাথে ভন্টু। সেবার ভুয়ার্সে গিয়ে ভালুকের সঙ্গে বৈরথ যুদ্ধে যে বিক্রমটা দেখিয়েছিল, তাইই সরমে সে তখনও নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে। আমাকে অহেতুক উপদেশ দেয়—সাহেব, চলুন না, এবারও ভুয়ার্সের দিকেই যাওয়া যাক। ওদিকে যেমন জঙ্গল—তেমনি তার জন্তু জানোয়ার।

একবার ভাবলাম যাই, তারপরেই মনটা বিগড়ে ওঠে—আজকাল ওপথে অনেক ঘোর প্যাচ · তাই প্রস্তাবটা সরাসরি ডিস্‌মিস করে দিলাম।

এদিকে আমার এক ঘাটাঠী বন্ধু শাজাহানপুরের কাছে মাধুণ্ডিতে থাকেন—তিনিও বারে বারেই ডাকছেন—ওদিকে না কি প্রচুর শিকার। ফতোয়া জারি করে দিই: রাখো তোমার ভুয়ার্স—চলো মাধুণ্ডি ওখানেই জানোয়ারের মুণ্ডপাত।

কোন কাজটি কখন করতে হয় ভন্টুর নখদর্পণে—কোনো কথাটি না বলে টাইম-টেবলখানা এগিয়ে দেয়।

আমার বাবাবর জীবনের উপযুক্ত সঙ্গী ভন্টু—অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা সব তৈরী হয়ে নিলাম। তারপর যথা সময়ে ট্রেণে ওঠা এবং পথে দুজায়গায় গাড়ী বদল করে সীতারামপুর হয়ে শাজাহানপুরে পৌঁছলাম। সেখান থেকে জীপ গাড়িতে প্রায় ত্রিশ মাইল যাবার পর আমাদের গন্তব্যস্থল।

আগেই তার করেছিলাম। সস্ত্রীক যশোবন্ত রাও-এর সাদর অভ্যর্থনার কথা কখনও ভুলতে পারব না। তাঁর বিরাট বাংলোর একপাশে একটা গোটা ফ্ল্যাট তিনি আমার জন্ত নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন। কাজেই কোন অসুবিধা নেই। স্নান করে বেশ তৃপ্তি পেলাম।

চায়ের টেবিলে বসে বারে বারেই মিসেসরাও খিল খিল করে হেসে উঠছিলেন। খুব চকল প্রকৃতির মহিলা আর বেশ সহজ সরল ভাবভঙ্গী। তাঁর এবম্বিধ হাসির কারণ কি যশোবন্ত রাওকে

জিজ্ঞেস করতেই তিনি পাশির সঙ্গে ইসারায় কী যেন বললেন। উত্তরে মেমসাহেব তাঁর কানে কানে কী কথা বলতেই মিঃ রাও উচ্চহাস্যে ফেটে পড়েন আর কি! কোনো রকমে হাসি নিয়ে রহস্য করে বললেন,—আমার স্ত্রী আপনার এক জোড়া বিরাট গোঁপ দেখে মুগ্ধ—হাসিটা তারই জন্যে।

আচার্যিমশাই বড়ো চটে বসলেন। রাগের কথা ফেলেও উঠতে পারেন না, আবার কন্যাদায়ের তাগাদাও আছে—আরো যে কয়েকবাড়ী আমায় সন্ধ্যের মধ্যে যেতে হবে। কিন্তু আচার্যিমশাই উঠতে পারলেন না।

অল্পক্ষণ পরে তৎক্ষণে আবার সন্ধ্যের সেই ঘরে: মিসেস রাওয়ের আতিথেয়তা যে শুধু চায়ের টেবিলে হাসির খোরাক যুগিয়েছিল, তাই নয়, তার পরদিন সকালে মেমসাহেবের কাণ্ড কারখানা দেখে আমি আরও চমকে উঠলাম। কোন্ ভোরে উঠেই তিনি রাও সাহেবকে ডেকে তুলেছেন, শুধু তাই নয়, তাঁর হুঁকে ডাকে বেয়ারা বাবুর্চি, মশালচি থেকে জমাদার দামু পর্যন্ত নাচতে সুরু করেছে।

আমার শোবার ঘরের বারান্দায় ভন্টুরও খটমট বুটের আওয়াজ। তার এই ব্যস্ত সমস্ত ভাব দেখে জিজ্ঞেস করি, কী রে এত তাড়া কিসের? বাঘের ডাক শুনতে পেলি না কী?

ভন্টু একটা সেলাম ঠুকেই উত্তর দেয়, মেমসাহেব—

তাকিয়ে দেখি, মিসেস রাও আমার এদিকেই আসছেন। সুপ্রভাত জানাতেই তিনি বলেন, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিন মেজর, আমরা সবাই প্রস্তুত।

অবাক কাণ্ড! কোথায় শিকার—কে কে যাবে, তার কিছুই ঠিক নেই—আর ঘুম থেকে উঠেই বলে কি না—চলো।

যশোবন্ত রাও-এর কথা জিজ্ঞেস করতেই মিসেস ফিক করে হেসেই বললেন, তিনি পোষাক পরছেন—ঠেকাটে সেরেই আমরা রওনা হব। তিনটে ঘোড়া আর দুটো হাতী সাজিয়ে হয়েছে। আপনিও তৈরী হয়ে টেবিলে আসুন।

ঠিক হল আমি এবং মিঃ ও মিসেস রাও তিনটে ঘোড়ায় যাব। একটা হাতীর পিঠে ভন্টু আর জমাদার দামু আমাদের পেছনে আসবে—আর একটা হাতীতে আমাদের খাবার নিয়ে বেয়ারা আর খিদ্‌মদ্‌গার থাকবে।

আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়ি। আমার কাঁধের ওপর দিয়ে পিঠ বরাবর আড়াআড়ি ভাবে বাইনোকুলার বাঁধা। পেছনে দুটো হাতী হেলে দুলে আসতে থাকে। মিসেস্ রাও আমার আর যশোবন্তের মধ্যে অনর্গল কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলেন—উজ্জ্বল প্রাণশক্তিতে ভরপুর। স্বামী বেচারা কোন কিছু বলার সুযোগ পান না।

বাংলোর কিছুটা দূরে—প্রায় মাইলখানেক পরেই একটা ছোট্ট নদী—জল নেই বললেই হয়—শুধু বালির চড়া আর মাঝে মাঝেই কষাড় ঝোপ। এখানে এসেই হতাশ হলাম। কোথাই বা তেমন জঙ্গল, আর কোথায়ই আমাদের বাঞ্ছিত শুশ্রূষিধি। যশোবন্তকে সে কথা বলতেই, মিসেস রাও চটপট উত্তর দেন, ও কথা বলবেন না মেজর সেন—এদিককার জানোয়ারগুলো ভারী চালাক আর হুঁশিয়ার। কখন যে এসে হাজির হবে, টের পাবেন না।

মাঝে মাঝেই বালুর ঢিবি—তার ওপর ছোটছোট ঝোপ। আশে পাশে অবশ্য কিছু চাষের জমি আছে—আর সে সময় ভুট্টা আর তামাকের চাষও দেখা গেল। এখানে ওখানে ঘুঘুর আর হরিণের পায়ের ছাপ—পাখীও অনেক জাতের—কিন্তু এদিকে নজর দেবার ইচ্ছে আমাদের কারো

অমৃত

সম্পাদক
সুধাংশুকান্তি ঘোষ

সবে মাত্র দু'বৎসরে পড়েছে,
এই অল্প সময়ের মধ্যে তার
জনপ্রিয়তা ও চাহিদা
সকলকে বিস্মিত করেছে।

*

অতি আপনার পত্রিকা হিসাবে
বাঙ্গালীর প্রতিদিনের সুখ দুঃখের
কাহিনী ও মর্ম্মকথা
গল্পে, উপন্যাসে ও প্রবন্ধে
সপ্তাহের পর সপ্তাহ পরিবেশন করে
অমৃত কৃতার্থ হচ্ছে!

যদি গ্রাহক না হয়ে থাকেন
আজই গ্রাহক হোন

দাম প্রতি সংখ্যা ৪০ নয়া পয়সা

অমৃত পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ ॥ ১১ডি, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, কলকাতা-৩

ছিল না। আরো কিছুটা এগিয়ে যেতেই সামনে একটা বালির স্তূপ, আশে পাশে এলোমেলো ঝোপ ঝাড় ক্রমেই ঘন হয়ে দূরে আকাশের কোলে মিশে গিয়েছে—সেটাই শিকারের জঙ্গল।

আমরা ক্রমে সেই জঙ্গলের মুখে এসে পড়ি। পাশ দিয়েই নদীটা একে বেঁকে বয়ে চলেছে—তার ওপারেই ঘন জঙ্গল—ভেতরে সূর্যালোক প্রবেশ করে না।

এখানে এসেই মাটা কেমন ছমছম করে ওঠে। বাতাসে এমন একটা গন্ধ, এমন একটা থমথমে ভাব, আমাকে অত্যন্ত মন জানিয়ে দিল—কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোন বড় শিকার আছে। সে শিকার বাঘ না হয়ে যায় না। কাছেই এমন চাষের জমী, গরু বাছুর ও প্রচুর হরিণ চরে বেড়ায়, তার ওপর পাশেই ছোট্ট নদী, তারপরই বিস্তৃত জঙ্গল—আর চাই কী?

যশোবন্ত রাও আমার দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভঙ্গী করে, যার অর্থ, কি বন্ধু, তোমার পছন্দ মাফিক জায়গা পেলে তো?

—জায়গা তো পেয়েছি কিন্তু শিকারের তোড়জোড় কৈ? খেদা না করলে কি বাঘ আপনা থেকে বেরিয়ে আসবে? তিন তিনটে প্রান্তি ঘোড়ায় চেপে এসেছি—তাও দিন দুপুরে—বাঘের শিক্যালরী সম্বন্ধে আমার এমন কোনও গল্প জানা নেই যে সে নিজে থেকে আমাদের চ্যালেঞ্জ করবে।

অতএব কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা যাক—যতক্ষণ না হাতী দুটো এসে পড়ে। ইতিমধ্যে চাষীদেরও ডাকা যাক—যদি তারা আমাদের শিকারে যোগ দেয়।

ঘোড়া থেকে আমরা তিনজনেই নেমে পড়ি। পাশেই একটা বড় গাছ—তার ডালপালায় অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া পড়েছে। আমরা সেখানে দাঁড়িয়ে কী করা যায়, তাই আলোচনা করি। কয়েকজন চাষীও মজা দেখার জন্যেই বুঝি এসে আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। সিগারেট বের করে ধরাতে যাব, এমন সময় চাষীর এক ছেলে জঙ্গলের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে সেদিকে ঢিল ছুঁড়ে মারে। নিছক খেলা আর কি! আমি লক্ষ্য করিনি, নচেৎ আগেই তাকে থামিয়ে দিতাম।

সামান্য ব্যাপার থেকে কী গুরুতর পরিস্থিতিরই না উদ্ভব হয়। তিন চারটে ঢিল ছুঁড়তে না ছুঁড়তেই জঙ্গলের ভেতর থেকে এমন একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার শোনা গেল যে আমরা সবাই চমকে উঠলাম। সমস্ত শরীরে উত্তেজনার আগুন জ্বলে ওঠে। চাষীদের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের মুখ চোখ ভয়ে বিবর্ণ—ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে, কথা বেরোয় না।

ঘটনাটি এমনি আকস্মিক আর অভাবিত যে প্রথমটা আমিও যেন কি রকম হতভম্ব হয়ে গেলাম। তাড়াতাড়ি আমরা তিনজনেই সেই মোটা গাছের আড়ালে গা-ঢাকা দিই। এক লহমায় একটা বাঘ জঙ্গল থেকে ঝাঁপিয়ে বের হয়ে এলো—বাচ্চা না হলেও বাড়ী বাঘ নয়—গায়ের ডোরাকাটা দাগগুলো খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। পলকে দু' তিনটি লাফ দিয়েই বাঘটা এসে সেই হতভাগ্য চাষী ছেলেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই সে মাটির ওপর লম্বা হয়ে পড়ে গেল।

আমার পেছনে মিসেস রাও ক্রমাগত চীৎকার করছেন, গুলী করুন, মেজর, গুলী করুন আর দেরী কেন? যশোবন্ত রাও ঠিক করতে পারেন না গুলী তিনি করবেন কিনা—কী জানি যদি ছেলেটি আহত হয়। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে আমরাও বাকি থাকব না।

কি আশ্চর্য! বাঘ ছেলেটির দিকে মনোযোগ না দিয়ে বিড়াল যেমন ইঁদুরকে খানেক করে তার ওপর দাঁড়িয়ে খেলা করে, তেমনিভাবে চারদিকে চাইতে লাগলো। লেজটা এধার ওধার সজোরে দুলতে

থাকে—আর সঙ্গে সঙ্গে একটা চাপা গোঁ-গোঁ আওয়াজ। সে যেন তার রাজ্যে উৎপাত সৃষ্টিকারীর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতে চায়। গাছের আড়ালে থাকায় সে আমাদের হয়তো দেখতে পায়নি।

আকস্মিক এই অবস্থায় মুহূর্তের জন্য হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। তারপরই আমার বন্দুক কাজ করে গেল। গুলী অব্যর্থ—লাগলো তার বুকে। একখণ্ড পাথরের মত বাঘটা চলে মাটির ওপর পড়ে গেল।

নিগেস রাও ও ঘশোবন্তের উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় আমি নিজেই লজ্জা পেলাম। গ্রামবাসী চাষীরাও এসে ভীড় করে। আমি ছুটে গেলাম সেই বাঘের দিকে—কিন্তু খুব সন্তর্পণে। বন্দুকের আর এক নলে গুলী ভরাই আছে। জানি এই জানোয়ার বড় চালাক—সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত না হয়ে এগিয়ে যেতে নেই। একটা মাটির চাপড়া তুলে তার গায়ে ছুঁড়ে দিতেও বাঘটা পড়েই থাকল। কাছে গিয়ে দেখি সেই চাষী ছেলেটি অজ্ঞান। তাকে টেনে বের করে নিতেই জ্ঞান ফিরে এল। গায়ে খুব বেশী চোট লাগেনি, শুধু বাঘের থাবড় খেয়ে তার বাঁ পাঁজরের দুখানি হাড় ভেঙে গিয়েছে—আর সেই বাঘের রক্তে মাথা থেকে পা পর্যন্ত মাখামাখি।

এমন সময় দেখি, দুটো হাতী শুঁড় তুলে আমাদের দিকেই ছুটে আসে। দুরবীনে বন্দুকের আওয়াজ পেয়েই তাদের মাহুত দুজনের চালের কিছিৎ পরিবর্তন হয়েছে। কাছাকাছি আসতেই শ্রীমান্ ভন্টু হাতীর ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আমাদের কাছে ছুটে এসেই সভক্তি প্রণাম। মেজাজ মাফিক কখনও সেলাম ঠোকে কখনও সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে।

তারপর যা করণীয় অর্থাৎ হাতীকে বসিয়ে তার ওপর বাঘটাকে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে নেওয়া হল।

বুড়ো গোছের এক চাষী বাড়ি চুমড়িয়ে প্রাদেশিক ভাষায় ছড়া কাটলে—যার অর্থ: যারে যারে যুদু তুমি খেয়ে যাও ধান—এবার কী হ'ল বাছাধন?

এই না বলেই বীরপুরুষ বাঘের ওপর দু এক ঘা লাঠি চালাতেই ভন্টু বজ্রনির্ঘোষে কণ্ঠে বললে,—খবরদার মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা? এক থাবড়ায় তোর বদন বিগড়ে দেব।

চাষী বেচারীও তখনি চোঁচা দৌড়।

নিগেস্ রাও প্রস্তাব করেন—ঘাংসোয় ফিরেই সাক হবে—এখন যাওয়া যাক। এমন সময় জঙ্গলের মধ্যে বিতীয় গর্জন। সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থার আমূল পরিবর্তন। চাষীরা ভয়ে এদিক ওদিক ছুটে পালায়। ঘশোবন্তের এক তাড়া—আর কাজ নেই আজ ফিরে চল। পরে আবার আসা যাবে।

কিন্তু সম্মুখে আর একটা চ্যালেঞ্জ—তাকে পেছনে ফেলে যাই কী করে? বন্ধুবরকে বুঝিয়ে বলি—তোমরা ফিরে যাও—আমি আর একটা চান্স না নিয়ে যাবনা।

—আমাকেও আর এক জায়গায় চান্স নিতে হবে কল্যাণের ঘর যায়—আজ তো কিছুই হলনা—কাল আবার আসব—

বেরসিক আচার্যিমশাই গাত্র উৎপাটন করলেন।

যার পথে বসভঙ্গ হওয়ায় অর্জুন সেন বলে উঠলেন, দেখ পণ্ডিত, এই সব হত্যাকাণ্ড তোমার কর্মবিবরে প্রবেশ করেছে—ঘরণী গিয়ে পুজোর আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে 'বাস্তুত্যস্তর শুচি' এই সব কথা বলবে তো? তোমাদের তো একটু মুখের কথায় সব শুচি হয়ে যায়—যাও, যাও আর দেরী ক'র না।

আচার্যিমশাই চলে গেলেন। মাহুতের জঙ্গল থেকে আবার চায়ের আসরে ফিরে আসা গেল।

বিজন ভট্টাচার্য

দেবীগর্জন

বিজন ভট্টাচার্য

চরিত্র পরিচয়

সর্দার—বাউরী মোড়ল চাষী
গিরি—স্ত্রী
মংলা—ছেলে
রত্না—মংলার বউ
প্রভঞ্জন—ধনী চাষী জোতদার
ত্রিভুবন—সমাজসেবী সর্দার
ধনাই—চাষী
ভানু—চাষী
মনা—কামিন
লেদুয়া—রত্নার বাবা
গুনাই—চাষী
লকারিয়া—সাঁওতাল চাষী
খগেশ্বর—চাষী
লক্ষ্মণ—চাষী
পুরোহিত—গাবতলার সেবায়িত
দশরথ—অতিবৃদ্ধ মোড়ল চাষী

আরলা গোমস্তা, সহকার, লাঠিয়াল, পুরনারী, বহুরূপী ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

—১ম দৃশ্য—

বীরভূম অঞ্চলের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামাঞ্চল। উষাকাল। পূর্বদিগন্তের আরক্তিম দিক্‌চক্রবাল রেখা ধরে শ্রমিক ছেলে মেয়েরা লাইনবন্দী কাজে চলেছে গান গাইতে গাইতে।

(গান)

হাতে মনের বাতি মাথাত্ বেতের ঝুঁড়ি
চলিলাম ধারা স পাতালপুরী।
চোখেতে ঘুম ঘুম পায়েলা ঝুমরুম্
সুখরী শুকরী ধাঁইছে পাতাল নিঝুম॥

এই পটভূমিকায় পরিদৃশ্যমান বাউরী পল্লীর এক বৃদ্ধ মোড়ল চাষীর দীনহীন খোলার ছাউনী, নিকানো পরিচ্ছন্ন মাটির ঘরের দাওয়ায় ব'সে চুটি বিড়ি খাচ্ছে বুড়ো বুড়ী। বিড়ি খাচ্ছে, আর কাসছে থেকে থেকে।

সর্দার : আবার খোলান ছেঁতে হবেক।

গিরি : কেনে, হয় নাই মাড়াই ?

সর্দার : মাড়াই ঠো তো হইছে, অখন ভাগঠো তো বাঁটতে হবেক।...

ক্রমশঃ আলো ফুটে ওঠে। পাঁইতি ঝুড়ি কোদাল কাঁধে ফেলে জোয়ান-রা তখন কাজে বেরিয়ে পড়ে। মোড়লের অঙ্গন দিয়ে চলে যায় তারা। সর্দারের ছেলে মংলা-ও খোপড়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে যোগ দেয় তাদের সঙ্গে। সবাই কাজে চ'লেছে।

(জোয়ানদের প্রতি)...তুমরা সকল কামে যাইছ, খোলান ছেঁতে হবেক নাই ?

মংলা : সর্দার, হয় তো কালে ছেঁতে, ফুরাণ কাম !

গিরি : ফুরাণ কাম ত' ই কামঠো কোন্ করে ?

[গিরির প্রশ্নে এ ওর মুখের দিকে তাকায় আর

বলে, বুল কেনে?—কহেক না।—কামঠো তো করিবার-ই হয়]

মংলা : কেনে সর্দার, তুমি গেলে হবেক নাই?

সর্দার : হবেক নাই কেনে?—তবে ই দেখ জোতদারঠো বড় হামাল আছে, কামিনগুলানও ভাল নাই,—খুন্টিমত ভাগ বাঁটবে, নজর রাখা একটা মুস্কিল হয় কি না আমার!

মংলা : হয় তো বটে।

সর্দার : তবে?…

গিরি : (সর্দার-কে) সর্দারী দিছে সর্দার বহিস্, জানঠো গেলেও দেখবি ঠ্যাং-ঠো টাইনা ধরেছে অরা ভুর, বুলবে, সর্দার ই কামঠো করে যাও,—সব জোয়ান হইছে!

মংলা : জোয়ান হইছে—টুকতে দেঁগেছে, কামঠো করতে হবেক নাই?

গিরি : বুলিস না! আমি ত দেখি জোয়ান-গুলান সব বুড়া হইছে আর বুড়াটো হইছে জোয়ান!

সর্দার : তো থাইছ যাও, কামে যাও।

গিরি : (ধমক দেয়) ই কামঠো কোন করে?

মংলা : আচ্ছা তো যাও কেনে, আমরা ঘুরে থাইছি।

(বুড়ো বুড়ি চুপ করে বসে চুটি বিড়ি খায়)

সর্দার : ই দেখ কর্জা ধানের সুদ, কে কত নিছে কতেক হারে, ই কোন বুলবে? জোতদার ঠো তো বুলবে দুই কাঠার বদল পাঁচ কাঠা দিতে হবেক। —তখন বুঝ করি যদি একটা আওয়াজ না উঠাও তো ধান গেলে জান্ বাঁচবে কিসে?

গিরি : ইরা আবার মাগ পুষবে, ছেলে পালবে! —বেড়কুড়িটাক্ বয়স হছে, কথা বুলে যেন্ নৈ-বাছুরটো ডাক পাড়ছে! (ছেলেকে) হবেক নাই কামে যেতে, আগে ভাগঠো কর, যা সব খোলান যা।

(জোয়ানদের প্রস্থান)

সর্দার : হাতীঠো নাই কিন্তু ই দেখ খরচাঠো ধরেছে।

গিরি : হাতী নাই জোতদার আছে অটাই হাতী।

সর্দার : হুঁ! জমিদারী উঠাই দিল সরকার তো প্রভঞ্জন বুলল, আমার তুংগেও বাগ আছে গ,—তামাম রাজ্যটাক খণ্ড খণ্ড করি তখন সে বেনামীতে দখল নিল। আর ধরবে কিসে? কাক্ ধরবে? এখন ধরণতে আছিয়ার প্রজা আর কয় ঘর! সকলই তো ভুঁইচাষী—সানকি চাটার বেটা হাঁড়িচাটা। যে গোয়াল আধার সে গোয়াল—যা প্রভঞ্জন সর্দারের খামার যা!…এখন ভাগান ভাগান কাটান, ইটা সিটা বাবরদারি…

গিরি : ইখান-ই ত যাবেক কতেক কাঠা। তারপর খোলান চাছানি…

সর্দার : হুঁ সে ধর কেনে এক কাঠা, খামাক খরচা দুই কাঠা…

গিরি : হুঁ, জোতদারঠোর ভূতপেত্নীগুলাক্-ও তো খাওয়াইতে হবেক,—আচ্ছা এই হিসাবঠো কোন বুলছে?

সর্দার : প্রভঞ্জন বুলছে, আবার কোন বুলবে। —বুধের বচনটা-ই তো আইন হইছে; নূতন কথাঠো শুনাইল যেন বটে!

গিরি : হুঁ তো পুরান কথাঠো নূতন করলে কি হয়? দিব নাই খামাক খরচা, গোলামুছানি।

সর্দার : আঁই দেখ, গোলামুছানিঠো আবার দুই কাঠা।

গিরি : হুঁ, বসা ছিল দাঁড়াইল উঠে তাঠা কাঠা, দাঁড়াইছিল বদল বটে কাঠা কাঠা, বুলতে কথা হাসলো চোখে কাঠা কাঠা, ই হিসাবটোয় কোন কাম হয় বটে?

সর্দার : কোন বুলে!!

গিরি : কোন বুলে। ছা-ও কাল থিকা ই কথাঠো কত শুনছি—কোন বুলে, কোন করে, কোন বাঁচায়, ই মানুষটার দেখা নাই!

সর্দার : (গিরি-র মুখ ছুঁয়ে সর্দারের দুটি ঘুরে নিবদ্ধ হয়) ই মানুষটার দেখা নাই।

(ক্ষণকালের স্তব্ধতা)

গিরি : তো যাও কেনে খোলান !

সর্দার : অঁ, হঁ। (বিড়ি টানে) ছেলেটাকে সাদি দিব মন করলম ··

গিরি : অাঁই দেখ, লেদুয়া বুড়া আসবে বুলছিল আজ।

সর্দার : হঁ, আসবে তো, আজই আসবে। কিন্তুক ধানে পায়সার হালঠো যা হইয়েছে বটে তাতে সাদি দিবার মনঠো নাই। মেজাজঠো···, ভাবছিলাম তো একটা তুয়ার-ই মারবো বটে যেদিন লেদুয়া আসবে। তা আর হবেক নাই।—একটা খাসি কম হয় তো দশ-ও টাকা। মুরাদ নাই আজ ছুঁড়ে দেই।

গিরি : মুরাদ নাই মেজাজঠো আছে, হঁ।

সর্দার : কি মুরাদ নাই বুলিস তুই ?

গিরি : অঁ, হঁ, সর্দার হোস তো !

সর্দার : (ধমক দেয়) টুকিস না বুল্লম, হঁ।

গিরি : অাঁই দেখ !···সর্দারি তো তারি কানা-কড়ির বারবরদারি, তার খাসি মারছে ! এখন দেখ কর্জা ধানের সুদ বাদ দিয়া খোরাকীঠো মিলে ত' খুব হয়। লেদুয়া আসবে, পচাই আছে পচাই দিব।

সর্দার : পচাইঠো, বেয়াই লাগে বটে !

গিরি : (ঠাট্টাচ্ছলে) তো মদ দিব, বিদাতী !

সর্দার : পায়সাই তো···

গিরি : সাদি দিব ছেলেটাক্ তা পায়সা খরচা হবেক নাই ? অাঁই দেখ, মজাঠো কেমন হয় বটে ? টুকচা বউ ঘুর ঘুর করবেক, ধান ভানবেক, তোক্ হাঁড়িয়া দিবে ··

(গান ধরে) করি চিরি পাটিপারি
বৈছাসে ঘুলঘরি ঘুলঘরেরী
তখন তেল খরচি···

সর্দার : অাঁই দেখ···, বুই খোলান ধাইছি। লেদুয়া বুড়া আসলে তাক্ খতন করি বলাস কেনে, অাঁই দেখ··· ! [সর্দারের প্রস্থান]

[গিরি-র গান শুনে আশপাশের আর মেয়েরা এসে গানের সুরে সুর-মেলায়।] [ধীর পদ্ধ]

প্রথম অঙ্ক

– ২য় দৃশ্য –

স্থান : প্রভঞ্জন সর্দারের খোলান। সকালবেলা। প্রথম দৃশ্যান্তের বিয়ের গানের সুর মিলমিশ খেয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যের আবহসঙ্গীত রচনা করে।

মঞ্চের পশ্চাদ্ভাগে, বাঁদিকে, বৃহদাকার একটা ধামের সারাই। ডানদিকে স্তূপাকার ধানসমেত খড়—মই—মাচান ; মেয়ে কামিন-রা এখানে ধান ঝাড়ছে, ধান উড়োচ্ছে গান গাইতে গাইতে।

মঞ্চের মাঝামাঝি, দুধারি বাঁশের তেকাঠার ওপর দাঁড় করানো দড়িদড়াসমেত বৃহদাকার দুই কাঠের পাল্লা। লোহার বাঠখারা আর পাথর ইতস্ততঃ ছড়ানো। ডাক অনুযায়ী পাল্লায় বোরাভরতি করে ধান উঠছে, নামছে। 'কিউ' ভেঙে চাষীলোক এসে টিপছাপ দিয়ে হিসাব মত পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে যাচ্ছে।

মঞ্চের সামনের দিকে—ডান ধার ঘেঁসে টেবিল চেয়ারে ছোটখাটো একটি দপ্তর সাজানো। সরকার আর আমলা গোমস্তারা এখানে জাবদা খাতা রেখে হিসাব মত নাম ডাক দিচ্ছে প্রাপ্য ধানের পরিমাণ তারস্বরে জানান দিয়ে।

কর্মচঞ্চল আবহাওয়ার মাঝখানে আমীর ওমরাহের মেজাজ নিয়ে স্মিতমুখে বিচরণ করছে প্রভঞ্জন সর্দার ; কখনও বা দুটো ধান তুলে নিয়ে দেখছে, কখনও বা কাব্যময় চোখে মেয়েদের ধান ওড়ানো দেখছে, কখনও বা বিগলিত করুণা হচ্ছে দুঃস্থ চাষার সামান্য প্রাপ্য-সঞ্চয় দেখে।

কাঠের পাল্লায় মাপজোপ ছাড়াও আড়াই সেরী বেতের পাল্লায় ধান ওজন করে বোরা ভরতি চলে। ওজনদারের মুখে তার হিসেব ধানের সুরে স্বতঃস্ফূর্ত হয়—রামটু রাম, রামে রাম, দু'টু দুই, তিনটু তিন, চারটু চা, চার চা, পাঁ-চ পা, ছ'টু ছয়···

[বোরা ভরতি ধান কাঠের পাল্লায় নামিয়ে ওঠে]

আমলা : সনাতন বাউরী—দুই মন পঁচিশ সের···

[ছিপছাপ দিয়ে সমাতন ধাউরী কাঁটায় ওজন দেখে ধানের। আমলার গলার হাঁক শোনা যায়।]

…ধনাই ধাউরী, ধনাই ধাউরী হাজির…, এক মণ দশ সের।

(টিপ ছাপ দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় ধনাই ধাউরী। গোটা ব্যাপারটা তার কাছে ঘোরতর প্রতারণা বলে মনে হয়)

ধনা : ওঁাই দেখ, দুইটা মুনিষ আনছিলম রে!—পাঁচ বিঘার হিসাবঠো ছিল মাথাত,—ভাবছিলাম বিঘা প্রতি ধর যদি পাঁচ মন-টাক্ ধানও হয় তো পঁচিশ মনটাক্ ধান উঠবে জমী থিকা। জোতদারটা নিবে অর্দ্ধেক, থাকবে বারো সাড়ে বারো মন। তা সাড়ে বারো মনটাক্ তো আর পাবো না,—কর্জ্জা ধানের সুদ আছে, নতুন লাঙলঠো বাবদ টাকা ধার নিয়েছিলম,—তার বাবদও বেশ কয়টা মন কাটান যাবে,—ছাঁটকাট দিয়া অতিকম পাঁচমনটাক ধান ঘরে তাবছিলম। ওঁাই দেখ, ধানের চেয়ে বস্তা ভারী হইছে, চারটা বোরা ঘুরতি নিয়া যাঁছি, একটা বোরায় অর্দ্ধেকটাই খালি।—ওঁাই দেখ…(কপাল চাপড়ায়) দুইটা মুনিষ আনছিলম রে, পাঁচমনটাক ধান ঘরে নিব ভাবছিলাম রে…

সর্দ্দার : ভাবছিলাম রে…! কি হারে নিল সুদটা কর্জ্জা ধানের?

ধনা : হিসাবঠো শুনে আর কি হবে বুল? —যে হারে কাটান দিলে আমার কলজেটায় ভাঁটি মলে, দাগ ছেলে নিয়ে উপাস দিয়া মরি, সেই হারেই নিল।

সর্দ্দার : তা উয়ার সুখঠো আর চড়াস না তুই কামার হারে, চুপ যা!

ধনা : মুখটো চাপলে বুকঠো ফাটে, ই আমি কি করি? ইস্ রে, পাঁচ মনটাক ধান ঘরে নিব ভাবছিলম রে, দুইটা মুনিষ আনছিলম রে…

ভানু : কামাঠো দেখে মনে হয় সর্দ্দারটা যেন মাদি হ ইয়ে গেইছে।

সর্দ্দার : ওঁাই দেখ, বীর বনছিস বটেক!… খোঁকাটা অর হিসাবের নাগালে নাই, তাই ব্যথাটা বুকে ছিড়ছে, কানছে।…

(ডাক হয় : ভানু সাঁওতাল, ভানু সাঁওতাল হাজির। ডাক শুনে কিউ ভেঙে ছুটে যায় ভানু সাঁওতাল।)

…কিন্তুক মংলাটা।—বচন দিল, তো যাও আমরা ঘুরে যাঁইছি, দুষাটা!

আমলা : ভানু সাঁওতাল, দুই মন বাইশ সের।

ভানু : আমার হিসাবটো ঠিক নাই।

আমলা : ঠিকই আছে। খাতাপত্তর দেখি হিসাব ছুড়ে বলছে সরকার, আর যাতে কে যাত বচন দিল—হিসাবটো আমার ঠিক নাই, মস্ত হিসাবদার! দে টিপছাপ।…কর্জ্জা ধানের সুদ জোতদার কি ধরণিকা দিবে? সইটা পড়বে খাতায় তো ধানঠো উঠবে কাঁটায়,—কি, দিবা কি দিবা না টিপছাপ? ওঁাই দেখ, …সরাইয়েও বোরা,…সকারিয়া সাঁওতাল হাজির সকারিয়া সাঁওতাল।

(সকারিয়া 'কিউ' ভেঙে এগিয়ে আসে। লোক-জনের মধ্যে গোলমাল সুরু হয়)

ভানু : ধেড়া হারে সুদ কাটলে পাওনাগণ্ডা কি থাকে বুল!

সরকার : ওঁাই দেখ, গোল করবি তো ইবার চড়াইতম মার! [হস্তদন্ত মংলা প্রভৃতির প্রবেশ]

মংলা : (সর্দ্দার-কে) পড়ে নাই—ডাক?

সর্দ্দার : ধেড়া হারে সুদ নিছে!

ভানু : (সরকার-কে) ও দাও, দিব টিপছাপ!

সরকার : 'দিব টিপছাপ!'—ধানঠো কর্জ্জা নিবার সময় টিপ্‌টা দিছিল কোন?—এখন তার সুদটা কাটান দিতে বুকি মনঠো চাহে না?

ভানু : সর্দ্দানঠো কাটলে মনটায় সায় আসে কিসে বুল?

সরকার : দুই মন বাইশ সের।

(ধান কাঁটায় ওঠে)

ভানু : হায়রে, ঐ টুকচা ধান নিয়ে আমি কি করবো বুল ! আমি দিব নাই উ ধান, আমি দিব নাই উ ধান···

সরকার : 'দিব নাই' তো নামাই দাও ধান।

ওজনদার : কি, দিবে, না নামাই দিব পাথর ?

ভানু : পাথরতো আমার মাথাত্ মার, বাপ !

সর্দ্দার : ভাগান ভামান কাটান, তার উপুর বে-আইনী চড়া সুদ···

মংলা : (গর্জে ওঠে) বে-আইনী সুদ দিব নাই, —নামাই দাও পাথর, বন্ধ করি দাও মাপ জোপ !

(চমকে ওঠে সকলে। চমকায় না শুধু প্রভঞ্জন)

প্রভঞ্জন : কথাঠো কার ?

মংলা : আমার।

প্রভঞ্জন : আমার, কার ? কে তুমি ?

মংলা : আধিয়ার।

প্রভঞ্জন : আধিয়ার !—চোট্ দিছে যেন জমীদার !

মংলা : হুঁ !

প্রভঞ্জন : কি নাম ?

মংলা : মংলা বাউরী।

প্রভঞ্জন। (সরকার-কে) খাতা দেখ।

সর্দ্দার : খাতায় উয়ার নাম পাই বটেক, কিন্তুক উ আমার ছেল্যা।

সরকার : (খাতা দেখে) মংলা বাউরী, মংলা বাউরী, নাম নাই মংলা বাউরী, নাই নাম খাতায়।

সর্দ্দার : খাতাত্ নাম নাই কিন্তুক উ আমার ছেল্যা।

প্রভঞ্জন : নাম নাই গোরগোল করছে ; (হাঁক দেয়) রংকু, ভীমা, সাটোর !

মংলা : খাতাত নাম নাই তো কি হইছে, আমার বাপ তো আধিয়ার প্রজা।

প্রভঞ্জন : হুঁ, তাতে তোর চিনবার কি কারণ আছে ?

মংলা : কেনে, ঘুইরোঁড় আসছি নাকি ?

প্রভঞ্জন : ই কথাটা ঘুই বুঝাক শুধা কেনে !—

মংলা : হেই বুলছি, সামাল !

রংকু : (লাঠি মারে) হেই সামাল ··

[মংলা এগিয়ে যেতেই রংকু, ভীমা ও সাটোরের লাঠি এসেমাপায় পড়ে মংলার। ধ্বস্তাধ্বস্তি সুরু হয় তুমুল]

সর্দ্দার : মংলা কহি চুপ যা · মংলা থাঁই যেখ ·· (প্রভঞ্জন-কে) সর্দ্দার।

প্রভঞ্জন : (হাঁক ছাড়ে) সাটোর ! · (সভয়ে থামে সকলে) আধিয়ার প্রজা না তো কথা বুলে কেনে ?

(লাঠিয়ালদের প্রস্থান)

সর্দ্দার : বুলে কেনে, বুলে—ধড়টার উপুর মুণ্ডিটা আছে তাই বুলে বটে, লাশ হ'লে বুলতো না কথা !

প্রভঞ্জন : তোমার ছেল্যা যে ই রকম করবে সর্দ্দার···!

সর্দ্দার : চাষ কি বুলি গোলায় গেইছে আমার ছেল্যা ?

প্রভঞ্জন : ছেল্যাটা তোমার গোল্লায়-ই গেছে কহি সর্দ্দার।

সর্দ্দার : যাক, কথার কথা বাড়বে, আধিয়ার প্রজা আমি আছি, আমার ঠাঁই কথা বুলেন।

প্রভঞ্জন : কথা বুলেন—পুরান কথাটো নূতন করি বুলবার তো কিছু নাই :—যা কথা সে ত' লিখাই আছে খতে, সই আছে তাত তুমাদের সকলের। আজ্ঞা কর্জ্জাট নিবার সময় মনে ছিল না তুমাদের যে ইটা শোধ করতে হবে ? না কি ভাবছিলা ফাঁকি দিবা তুমরা ?

মংলা : হুঁ, ফাঁকিটা দিলম আমরা আর টাকি-টা মারলা তুমরা,—ই একটা বজার হিসাব !

প্রভঞ্জন : দেখ না কথা কহে চ্যাটাং চ্যাটাং !

মংলা : 'কথা বুলে চ্যাটাং চ্যাটাং'—মজার চ্যাং

সর্দ্দার : মংলাটার কথা ধরিবার না।

প্রভঞ্জন : ধরি তো নাই। সম্বন্ধটা আম তুমার সাথ। উয়ার কথায় কি এসে যায় ? ত ইটা ঠিক না সর্দ্দার। জান, উটাকে আমি পুলিশে দিবার পারতম। আধিয়ার না, কিছু না, খোল আসি তুমি সোর মচাও কোন সাহসে হে।

দেখি, মাথাটা গরম করি এই যে অনাহক কতকগুলান কথা শুনাইল আমাক—বুঝিবারই পারে না যে উয়ার মাথাঠো আমি ভাইঙা দিবার পারতম। তা সেই ত নাই। বিচার করি আমাক কাম করিবার হয়,—পঞ্চাশ গণ্ডা আধিয়ার প্রজা, লাজারটা তার খতিয়ান, শতকে চককথা একটা হয় কি না হয় নিরানব্বইটাই তার ফালতু কথা, তাই আমার মাথাটো ঠাণ্ডা রাখিবার-ই লাগে।…(শ্রমিক কর্মীদের প্রতি)…আরে আপাই যাও, সারি কেল কাম, বেলা গড়াইল দেখ।

(প্রভঞ্জনের প্রস্থান ও বেগে ত্রিভুবনের প্রবেশ)

ত্রিভুবন: আঁই দেখ, আমি ভাবলম বুঝি বা আগুনই লেগেছে খোলানে।—যে ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি…(মংলাকে দেখে) হা রে বাপুই—কোন দুষমনটায় করছে? আসাই আয়, আসেক ইদিক, মেড়াটা! আ হা হা হা হা…! জল আন, ত্যানা আন, কালি কাপড়…ছি ছি ছি ছি! (সর্দার-কে) আর এ-ও বড় আশ্চর্য্য কথা কহি সর্দার, ছেল্যাটার মাথা কেঁটেছে, রক্ত পড়ছে, তুমি পিতা, কোথায় তুমি বেঁধে দিবে মাথাটা, তা না দেখি ধাতাসের গলায় দড়ি দিয়া মনমড়া শত্তুরটার সাথ মোকাবিলা করছ তুমি,…জল আন, ত্যানা আন…

সর্দার: না দেখেন সর্দার, বাপের সাথ ছেল্যা এসেছে, না হোক আধিয়ার প্রজা—দুইটা না হয় কথাই বুলেছে পিতার পক্ষ নিয়া, তাত করি তুমি ছেল্যার মাথাটা ভাঙি দিবেন?

ত্রিভুবন: ভাঙুক দেখি কেনে,—জল আন, ত্যানা আন…। আঁই দেখ, পিরানটা ভিজা গেইছে রক্তে! (সরকার-কে) লাঠিবাজির যুগ নাই গ, লাঠিবাজির যুগ বিগত। পরমাণুটা এখন বড় প্রবল, পরমাণুর যুগ চলেছে ইটা, তোমার দলিলকে বুলে দিও।…আঁই দেখ, একফালি ত্যানা আনবে, নাঃ, চাষরটাই কেঁড়ে দিব…অমানুষ, বেবাক অমানুষ! আর কেনে।

(মংলা সহ ত্রিভুবনের প্রস্থান ও প্রভঞ্জনের প্রবেশ)

সর্দার: (প্রভঞ্জন-কে) আমার হিসাবটা করেন দেখি সর্দার। কর্জ্জাঠোতো আমারও আছে। কি মিলছে কি জানি এখন!…নাই পয়সা, নাই কড়ি, ইদিক তো মন করছি ছেল্যাটাক সাদি দিব,—মাথাঠো খারাপ হয় কি না, বুলেন?

প্রভঞ্জন: ই কথাঠো বুঝিবার পারি তোমার সর্দার।…বেশ তো, সুদ কাটান দিলে যাহাঠো কম হয় তো দিবেন না এখন সুদ, টাকা নাই, পয়সা নাই, তো ধার নেন টাকা পয়সা আইনবন্দী খৎ দিয়া, সই লাগবে আপনার তাতে। আপনাদের দরকারে আমি দিব নাই, ই কথাঠো তো আমি কোনদিনও বুলি নাই, বুলেন কেনে?

সর্দার: না ই কথাঠো তো ঠিক-ই বুলেছেন।

প্রভঞ্জন: তো আপনে কাল আইসেন, খরত আইসেন। তবে দেখেন, ই কথাঠো প্রকাশ করিবার নয়। কর্জ্জাঠো আর দিব নাই মন করেছি। লাভ নাই, বদনামের ভাগীদার।…এই যে দেখছেন ধান, আপনারা তো মন করছেন—কতটাকা করবে প্রভঞ্জন ই ধান থিকা। হঁ, পারতম যদি সে সুবিধা পাইতম, তামাম ধান গুদামজাত করি খুশীমত দরি আক্রার বাজারে ছাড়বার পারতম ধান হাইতের অন্ধকারে। কিন্তুক এখন বাঁধা দরে ছাড়তে হবে ধান সূর্য সাক্ষী করি, একটা পয়সার সুবিধা নাই। তা যার ভাবনা তার ভাবনা, আপনাক সে কথা ভাবিবার না, কাক কি বুলি কথা!…তা যাক্, আপনার বয়স হছে, একটা ছোকরার বুদ্ধ আর আপনার বুদ্ধ সমান না। আশা করি আপনি আমাক ভুল বুঝিবেন না…

সর্দার: না না ইটা কি…

প্রভঞ্জন: আচ্ছা তো কাইল আইসেন, খরত আইসেন, বুঝ করি একটা ব্যবস্থা…

(সর্দারের প্রস্থান)

(যথারীতি কাজ চলেছে। গাড়ী উঠছে, নামছে। এবার-কার ওজন-টা একটু বড়। বেশী ধান। বাট-কারা কমতি পড়েছে। কামিন-রা বুঝে উঠতে পারছে না কি দিয়ে কি করবে।)

…মজাটাই করতা করি দে।…

(মনাকে পাথর চাপান দেওয়া হয়)

(হাসি)…এইবার ঠিক হইয়েছে বাটকারাটো।…

মন : আঁই দেখ, বাঁটকারা বানাইল দেখ, ই দেখ —বাঁটকারা বানাইল আমাক… …

প্রভঞ্জন : চাপি ধরেক, খাসিটা।…সরেশ বাঁটকারা, আমার খানঠো ই বাঁটকারায় মাপিবার হয়। চাপা পাথর…

(মনার বুকে পাথর চাপানো হয়)

…সরেশ বাঁটকারা।

মনা : (চীৎকার করে) আঁই দেখ ; বাঁটকারা বানাইল দেখ, বাঁটকারা বানাইল দেখ…

[প্রভঞ্জন, সরকার প্রভৃতি তুমুল মজা পেয়ে হাসে আর বুকে পাথর চেপে ধরে তারস্বরে চেঁচায় মনা]

—পর্দা—

প্রথম অঙ্ক

—তৃতীয় দৃশ্য—

মঞ্চের তিন চতুর্থাংশ ঢাকা। তুষার থেকে পর্দা গুটিয়ে এনে মাঝখানে এই এক চতুর্থাংশ অভিনয় পরিসর সাধারণ করা যেতে পারে। মঞ্চের গভীরে পাঁচ ছ'টি সোপান সমন্বিত সিঁড়ি। সামনে পিছনে অস্পষ্ট আলোক সম্পাত। প্রভঞ্জনের ভিতর বাড়ীর বৈভবের চাকচিক্য এই আলোতেই ঈষৎ পরিদৃশ্যমান। সুবৃহৎ ভূঙার আর বড় বড় পিতলের আলার সমারোহ। কবরের প্রশান্তি ঘিরিয়ে আছে গোটা দৃশ্য-টায়।

হঠাৎ বাঁ দিক থেকে ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় প্রভঞ্জনের-ই এক অনুচর। অভিবাদন জানিয়ে কুর্ণিশ করতে করতে পেছিয়ে যায় লোকটা।

অনুচর : আইসেন বটে, আইসেন বটে, আইসেন বটে, আইসেন বটে।

(সর্দারের প্রবেশ)

(কুর্ণিশ করে চলে যায় অনুচর)

[অনুচরের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে সিঁড়ির মুখে বিস্মিতের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে সর্দার চুপ করে। ক্ষণকাল অতিবাহিত হয়।]

সর্দার যেন কানে শুনতে পায় সুস্পষ্ট—প্রভঞ্জন তাকে বলছে—আপনে কাল আইসেন, ধরত আইসেন ; আপনে কাল আইসেন, ধরত আইসেন…। শঙ্কাহত মন সর্দারের।

সর্দার : (স্বগতঃ) টাকাটো তো লাগেই ! ছেল্যাটাক সাদি দিব মন করছি…কিন্তুক খৎ-টা তো বদল দিবে হবেক ! ই-আমি কি করি এখন !

গভীর শঙ্কায় ভেঙে পড়ে সর্দার। কানে শোনে প্রভঞ্জন তাকে বলছে—আপনি কাল আইসেন, ধরত আইসেন…। বসে পড়ে সর্দার।

(সময় যায়। প্রভঞ্জনের প্রবেশ)

প্রভঞ্জন : আইসেন বটে। বইসেন বটে। ই দেখেন নূতন খৎ। সুন্দর খৎ। এই খৎ-এ টিপছাপ দিবার হয়। আইসেন কেনে, আইসেন কেনে।

সর্দার : মংলার সাথ ধুক করি আসি নাই।

প্রভঞ্জন : মংলাটার কথা ধরিবার নয়। ওরার কোন মাথা নাই। বয়সকালে সাদি না করাইলে ওরার মাথাটাও ঠিক হবার নয়। আইসেন কেনে। টিপছাপ দেন কেনে ?

সর্দার : বিষম পাকটাতেই পড়লম বটে।… উপায়ের বুদ্ধিটা কত ভাবছি, কিছুই মাথাত্ আসে না। আমি বুঝিবার পারি না সর্দার ! অথচ টাকাটো তো লাগেই। কি করিবাব পারি ? খৎ-টা আপনে একবার পড়ি দিবেন ভাল করি। হায় ভগবান, মানটা রাখিবার গেলে জানটা বাঁচিবার নয়—এ তুমার কোন বিচার !

প্রভঞ্জন : মুস্কিলটার যিনি ফেলেন আসানটাও তাঁক করিবার হয়, সর্দার। আপনে ভাবনা চিন্তা ছাড়ি দেন।

সর্দার : ভাবনাটা ছাড়িবার কহেন কিন্তুক অন্য গতি আমার কি আছে বুলেন ? ধরিবার তো কিছুই নাই। টুকচা কয়কানি মাটি, তা-ও দেখেন…

প্রভঞ্জন : যে কামঠো করিবার আসছেন সেই কামঠো করেন দেখি এখন। আমার দেখেন সময় নাই। আইসেন কেনে?

(অনুচর এসে টাকা রেখে যায় থালা করে)

…আইসেন বটে! আইসেন বটে!

(সর্দার টিপছাপ দেবে বসে এগিয়ে আসে। প্রভঞ্জন তার বুড়ো আঙুল ধরে কাছে টানি)

…আইসেন বটে…আইসেন বটে।

সর্দার : হেউনিয়া।

প্রভঞ্জন : আইসেন কেনে? আইসেন বটে।

সর্দার : ও হোঃ হোঃ হোঃ।

প্রভঞ্জন : এ হেঃ হেঃ হেঃ।

সর্দার : হেউনিয়া…!!

(ঢোলের শব্দ দ্রুততালে বাজে)

—পর্দা—

দ্বিতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

সর্দারের অঙ্গন। বিবাহোৎসব চলেছে। ঢোলের তালে নাচগান হচ্ছে। বর্ষীয়ান মেয়েরা নবাগতা বধূকে আচারসম্মতভাবে বরের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে স্ত্রী-আচারে ব্যস্ত। কনের বাপ সেছরা বুড়ো ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবীরা মিষ্টি মওয়ার হাঁড়ি নিয়ে একপাশে বসেছে আসর জাঁকিয়ে।

নবাগতা বধূ, রত্না—উপস্থিত গুরুজনদের পা ধুইয়ে দিয়ে মাথার চুলে পা মুছে দিচ্ছে। আশীর্বাদের পাট শেষ হলে বরণ ও প্রদক্ষিণ চলে বরবধূর।

উৎসব ও আনন্দের মাঝখানে সর্দার ঘরে ফেরে চোরের মত। বুড়োকে দেখে গিরি গদগদ হয়। চাদর ধরে টানে। অন্য এয়োস্ত্রীরা মিঠাই-মওার দাবী জানায়।

সর্দার : ঐই দেখ, বাক্সা মারছে, ই দেখ কি করছে, ই দেখ…

গিরি : মেহিনা কোথা? স্বজন আর বান্ধবে আজিনা আমার ভরা ভরতি আর ইদিকে আমার ঘরের মানুষ…

সর্দার : মিঠাই দে, মওা দে, গুরাপান তামাক দে…(তাকে) মনোরের সেল কুথা গ? নবীন বাউড়ীর বউ আসে নাই? বলি অ জটাধর, তিনহাড়ি মহুয়া রেখেছি, কুটুমের মুখ যেন বেজার না হয়, নজর রেখো। আমি এই আসলম।

(বরণ ও স্ত্রী-আচার অন্তে বর বউ ঘরে যাবে কিন্তু সেখানেও আর এক বাধার সৃষ্টি। নবীনারা হাত ধরাধরি করে বন্ধনী রচনা করে আছে, উপযুক্ত দক্ষিণা ব্যতিরেকে, তারা ঘরে উঠতে দেবে না বরবধূকে।)

নবীনা : টাকা পয়সায় হবেক নাই গ, সোনারূপা চাই, তবে ছাড়বো।

গিরি : ও বুড়া। বুড়া গ। তামাশা দেখ।

সর্দার : অাঁই দেখ, সোনারূপা পাব কুথায়?

নবীনা : হবেক নাই, ছাড়বো নাই বন্ধনী।

সর্দার : (কাঁচা টাকা দেয়) তো নাও দিছি খেসারত, ছাড় বন্ধনী।

কলহাস্যমুখর পরিবেশ। ঘরে উঠে যায় বরবধূ। জোকার পুকার দিয়ে গান গাইতে গাইতে পিছনে যায় এয়োরা।

—পর্দা—

দ্বিতীয় অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

সর্দারের আঙিনা। সকাল বেলা।

লাঙল আর মই কাঁধে বেরিয়ে আসে মংলা। এখন মাঠে যাবার সময়। চুপিসাড়ে পেছনে এসে দাঁড়ায় রত্না।

মংলা : আমাক কিছু বুলছিস নাকি বটে?

রত্না : কুথা যাচ্ছিস?

মংলা : কবিরাজ কোন করে বটে ? মাঠে যেতে হবেক নাই ?

রত্না : ভাঁটফুল মিলছে না মাঠে, সাদা সাদা, থোকা থোকা, সেই যে কালা ভোমরা ওড়ে…

মংলা : কালা ভোমরাঠো তো আমি আছি বটে, কিন্তুক শ্বেত পদ্মটা তোক্ কোন বুলছে ?

রত্না : তুই আমার কথাটো শুনিস না…

মংলা : আঁই দেখ, কহেক কেনে ?

রত্না : —তো সেই ভাঁটফুল, টুকচা লালের ছিটা থাকে, আনিস, মাথাত পরতম।

মংলা : পলাশ ফুলঠে-ই তো আনবার পারি, কহেক না ?

রত্না : পলাশফুল পাবি না এখন।

মংলা : নাই পলাশ তো লাল শালুক আনবো পদ্মবন থিকা।

রত্না : লাল শালুক ! পদ্মবনে সাঁপ থাকে যে মংলা !

মংলা : রাখিস বটে ! বিষবরঠো আমাক কি করবে ? মন্ত্র জানি না ! এমন মন্তরঠো ছাড়বো না, সাঁপ বুলবে পলাই কুথা, হুঁ। …আনব লাল শালুক তুই ঘরকে যা।

রত্না : মাঠে নিবি না ?

মংলা : নতুন বউঠো হোস, কাল আসছিস আজই মাঠ ? দুইটা দিন সবুর কর।

রত্না : হরবানটা হলে তোক্ তামুকটা দিবে কোন ?

মংলা : হুঁ, সে তো কথাই বটে। তামুকটা দিবার-ই তো মানুষ নাই। কিন্তুক বুড়া বুড়ী,—আর মানবেই বা বুলবে কি ? না:, তুই ঘর যা, পিছু টানিস না, কামঠো হবেক নাই।…(নিজেই নিজের চোখ বন্ধ করে) তোক্ আমি দেখিবার-ই পাই না !

রত্না : চোখটা ঢাকলি, কানঠো ঢাপলি, কিন্তুক মনটাকে মানাবি কি দিয়া রে কালা ভোমরা, এ কালা ভোমরা !…　　(মংলার প্রস্থান)

…(স্বগতঃ) এ কালা ভোমরা !…আর একটা মেয়ে, যদি তোর মনটায় আমাক আবডাল করে, তো জানবি মাছ কোটা গাঁথি দিয়া তার নাকটা আমি কেঁটে দিব।

(গিরির প্রবেশ)

গিরি : আঁই দেখ ! যা ঘর যা, বনটাক যাইছি জ্বালানী আনবো, পাতা আনবো,—বুঢ়াক্ দেখিস।

(গিরি-র প্রস্থান ও সর্দ্দারের প্রবেশ)

[রত্না সংসারের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়। এমন সময় অতর্কিতে ঢোল বেজে ওঠে—নীলামের ঢোল]

সর্দ্দার : বাজারে দেউনিয়া, জোরে বাজা, মরণটার কাড়া নাকাড়া জোরে বাজা…　　(প্রস্থান)

(বেগে মংলার প্রবেশ)

মংলা : হারে বাপুই, কি বরঠো লিখে দিছিস… ঢোল বুলছে ভিটামাটি জমীজিরাৎ সব,—হারে বাপুই।

(বেগে প্রস্থান)

(চুপ করে দাঁড়িয়ে কচি কলাপাতার মত থর থর করে কাঁপতে থাকে রত্না)

(গিরির প্রবেশ)

গিরি : (রত্নাকে লক্ষ্য করে) পা-ও ঠোঁও দিছে, ঢোলটোও বেঁজেছে। দুখ কলা দিয়া কাল সাঁপ এনে পুষেছি ঘরে।…　　(গিরির প্রস্থান)

(গিরির কথা শুনে কাঠ হয়ে যায় রত্না। চোখ বুজে আসে। কাঁপতে থাকে ভয়ে)

রত্না : 'পাও-ঠোঁও দিছে ঢোলটোও বেঁজেছে।'

[বুক ভেঙে কান্না আসে তার]

পাইতম একটা বিষবর, আলা জুড়াইতম এখনই।

(মংলার প্রবেশ)

মংলা : কার ঠাই কথা কহিস ? বুলি কথা কহিস কার ঠাই ? না:, ই বাড়ীর মানুষগুলানই যেন কেমন কেমন ! কথা কহে আপন আপন,—কি কহে, কার ঠাই কহে, বুঝিবার উপায় নাই।

রত্না : চাহে যেন কেউ বুঝিবার।

মংলা : আঁই দেখ, বুলিস কেনে ?

রত্না : 'পাও-ঠোও দিছে চে'লটাও বেঁজেছে'—প্যাটে নাই ভাত, মাথাত নাই তেল, পরণে ছেঁড়া কাপড়, বউ-বিটির শরম রাখিবার যারে না আবার কথা বুলে চ্যাটাং চ্যাটাং। মরম হছে! পাও-ঠোও দিছি তুর তিঁটায় জানবি সাত পুরুষের করমফল ছিল তুর···(কেঁদে ফেলে)।

মংলা : আঁই দেখ! আমি তোক্ কিছু বুলেছি যে তুই আমার উপুর চোপা করছিস?

রত্না : তুই বুলিস নাই বুড়ী বুলছে, বুড়া বুলছে, হঁ। এই পাও-ঠোও একদিন দেখবি তুই আমি রেলগাড়ীর নীচে কাটা দিব, বুলম।

মংলা : রেলগাড়ীটাক্ যেন আমি চিনি না। পাও-ঠো কাটা দিবি, আমি না হয় গলাটাই দিতম!··· আমি শালা বুঝে যাব। খাতাত নাম লিখে সদর যাব, বুঝে যাব। শালা ই তিটামাটি আর আপ্তজনের কারণ মায়া করি করি জানটাই খেতে বসেছে। কহেক ইয়ার খুনটা আমার! জমীনঠো জমিদারের, তিঁটামাটি প্রত্তজনের, আপনজন সে-ও তুধার না—কেন কি নিজের দাবী তার উপুর তোমার খাটবেক নাই—আমি বুঝে যাব।

রত্না : না, তুই বুঝে যাবি না।

মংলা : আর নয় তো চলি যাব পাতালঘর,—কয়লাখাদ।

রত্না : মংলা।

মংলা : অভাগ্যের দেশ, রেলগাড়ীতে মেয়ে অনেক কেঁটেছে রত্না। কিন্তুক আমি যেইয়ে দেখছি—রেলপাতের উপুর তার একটা দাগ নাই! (পর্দা)

দ্বিতীয় অঙ্ক

—এক দৃশ্য—

[সর্দারের ঘর। জমিজোত থুইয়ে সর্দার পরিবারবর্গসমেত তার আদি জাত-ব্যবসা—ঝুঁড়ি ঝাঁপি চুলো কাঠা বোনার কাজে হাত দিয়েছে নিরুপায় হয়ে। এতেই যা জীবিকার সংস্থান হয় এখন। ছেলে মংলা নিরুদ্দেশ। হয় তো বা কয়লাখনি-ই চলে গেছে, কে বলবে?

রত্না এই সব ঝুঁড়ি ঝাঁপি বোনার কাজে এখনও হাত রপ্ত করে উঠতে পারে নি। বুড়ো আর গিরি-ই এ কাজে কারিংকর্মা। সকাল না হতেই কাজে লেগে গেছে সবাই।

কাঁচা বাঁশের লম্বা লম্বা কালি স্তূপাকার পড়ে আছে একধারে। তৈরী কিছু ঝুঁড়ি ঝাঁপিও ডাঁই করা আছে। হাত চলেছে যন্ত্রের মতো।)

সর্দার : (রত্নাকে) আঁই দেখ! ডান হাতে সলাটা থাকবেক্ টানা, বাঁ হাতত্ টুপিটাক ধরে যাবা, হঁ হঁ—তারপর ছুঁচপানা আলঠো খাড়া চটার ঘুর ধরে চক্কর দিয়ে দিঁচ মারবি সটান, ব্যস সেই তো।

রত্না : (হাত চালিয়ে দেখায়) ই গেল!···

সর্দার : হঁ।

রত্না : ···এই উঠল···

সর্দার : হঁ।

রত্না : এই ঘুর···

সর্দার : হঁ।—আঁই দেখ টুপিটাক যাবা কেনে?

রত্না : যাবাইলম।

সর্দার : —ব্যস তো মার দিঁচ।···

(রত্না টান মারে)

···সিধা হিসাব। হাত চালা কেনে? ঝাঁপির ডৌল যদি হাতে না উঠল তো সে মেয়ের কেমন আঙুল? যেমন তেমন বুনলে খরিদ্দার পাইকারে নিবে কোন ঝাঁপি?···হঁ, ঘুরা কেনে, হঁ, হঁ—ঝাঁপিটা ঘুরবে সলাটা চলবে হিলা সাপের মত, এঁকে বেঁকে।

গিরি : চ্যাটাই-ঠো বুনবার মুরাদ নাই, ওয়াক দিছে ঝাঁপি বুনবার। আবার বুলছে ডৌল লাগে নাই। মোটা কামঠো শিখলে তো সিহিন কামে হাত আসবে?

সর্দার : হাত আসবে কাম উঠবে, দুই গণ্ডা টাকা বায়না দিয়েছি, ই কথাঠো তো পাইকার 'তবেক

নাই'! বুধবার হাটবার, গলাটায় আমার গামছা দিবে জনার্দ্দন।

গিরি: (রত্নার প্রতি কটাক্ষ করে) তা কারো গলায় রুদ্রাক্ষ মালা কারো গলায় পাইকারের গামছা —যার যেমন করমগুণ, তুমরি কাক?

সর্দ্দার: তুমি মোর কপালটাক, আর কাক কি বুলি।

(ত্রিভুবনের নেপথ্য কণ্ঠ)

ত্রিভুবন: সর্দ্দার আছ নাকি হে বুড়া সর্দ্দার!

গিরি: (সর্দ্দারকে সমস্বে দেয়) ত্রিভুবন সর্দ্দার আসছে, বুঝ করি কথা বুলবার হয়। মানুষটাক আর বিশ্বাস করিবার নয়।

সর্দ্দার: হঁ হঁ, আমার হুঁস আছে। (উঠে যায়) আইলেন কেনে! ভিতর আইলেন!

(ত্রিভুবনের প্রবেশ)

গিরি: (হেসে) ত্রিভুবন বাবা যেন এখন আমাক চিনবার-ই পারে না।

ত্রিভুবন: কি রকম! ছেল্যার বিয়াতে নিমন্ত্রণ খাইলম!

গিরি: নিমন্ত্রণ তো তারি পান তামুক। (বউকে) বস্তাটো দিস কেনে? মানুষ যখন আসনে বসবার দিবার হয় না সো ছেমরি! (ত্রিভুবনকে) একটা বুদ্ধি নাই।

ত্রিভুবন: না বেশ বউ, খাসা বউ; সুন্দর বউ। (রত্না এসে বস্তা পেতে দেয়) আমাক দেখে লজ্জার কিছু নাই গ, আমি তুমার পিতার সামিল। বাঃ, সুন্দর বউ, খাসা বউ!

গিরি: দেখতেই, কামের নাই।

(সর্দ্দার তামাক সেজে আনে)

ত্রিভুবন: ঐ তো কত কাম করছে, আবার কি কাম করবে?—নতুন বউ! তা বাংলায় দেখিবার পাই না।

সর্দ্দার: সর্দ্দার সে দুঃখের কথা আর বুলিবার নয়।

ত্রিভুবন: কি রকম?

সর্দ্দার: ছেল্যাটাক সাদি করাইলম, সংসার করলম, তা দেখেন পোড়া পেটের কারণ ছেল্যাটা আমার মনের দুঃখে দেশান্তরী হইয়েছে।

ত্রিভুবন : এই কথা! তা সে তো কত বাঁইছে ভীনদেশে। রোজগারপাতি করবার দরেক নাই?

সর্দার : ইদিক আপনারা সকজনা থাকতে প্রভঞ্জন আমাক দেখেন ভিখারী করি ছেড়েছে। তিনটা পেট···

গিরি : চুপ দাও কেনে? পড়শী আসলে দুইটা গালগল্প করবে, রসের কথা বুলবে, তা না বুড়ার মত দুঃখের কথা।

সর্দার : ওঁ, হঁ। ইটা তুমি ঠিক-ই বুলেছ। ভর-পেটার কাছে খালি-পেটার কথা—শুনছে যে তার-ও ভাল লাগে না আর বুলছে যে তার-ও ইচ্ছং থাকে না। মাফ করবেন সর্দার!

ত্রিভুবন : আগে জানলে আমি আসতমই না।

সর্দার : ঁাই দেখ!

ত্রিভুবন : না না, গাঁওকোয়াত্তে সম্বন্ধটা আমার তুমার সঙ্গে—ই কথাঠো যদি বুল তো আমার কোন কথা নাই, কিন্তুক প্রকৃত বান্ধব যদি মনে কর আমাক তুমি, যদি বিশ্বাস কর যে না—এই ত্রিভুবন আমার আপন জন, তো আমি কহি তুমি আমাক দুঃখের কথাঠোই বুলবে।

সর্দার : না সে তো বুলবই।

ত্রিভুবন : না, কই বুলছ?—প্রভঞ্জন যে ফন্দী করি তুমার জোতজমী সব নিলাম করি নিয়েছে, আমাক বুলেছ তুমি? কি খৎ, কেমন খৎ, কি সর্তে টিপছাপ দিলা—আমাক তুমি শুধাইছ কোনদিন? পরামর্শ করি তুমরা একটা কাম কর না! কি একটা মনগড়া বিশ্বাস তুমাদের—ত্রিভুবন আর সে ত্রিভুবন নাই; ত্রিভুবন এখন প্রভঞ্জন সর্দারের সাথ সড় করছে, তার বন্ধুটা হইয়েছে! ই দেখি একটা বদ্ধ ধারণা তুমাদের। আরে! সুতা সিলাই থিকা চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত—তুমাদের হাজারঠো ঝামেলা আর যথেক্কা নিয়া কারসাজীটা করতে হয় আমাক রোজ কার সাথ? প্রভঞ্জনের সাথ বন্ধুতা আমি নিজ স্বার্থে করি বুলবার চাহ? সে আমার প্রাণের কোন সখাটা? আমাক সে ইমারত বনাই দিয়েছে? অঠারী দশজনের শতেক দায়-ভার দিয়া প্রভঞ্জনের সাথ আমার দৈনিক মুকাবালা—তাই যোগাযোগ আমার একটা রাখিবারই হয় প্রভঞ্জনের সাথ।···না সর্দার, মনে বড় দুঃখু পাইলম আমি।

সর্দার : ঁাই দেখ।

ত্রিভুবন : না, বড় পর পর ভাব তুমরা আমাক। ···একটু জল খাইতম।

গিরি : (বউকে) জল দিস কেনে?···

···গোসা করবেন নাই।

ত্রিভুবন। না, গোসা কেন করবো! কুশল নিতে আসলম, দুইটা গাল মন্দ খাইলম, যার যা পাওনা!

গিরি : ঁাই দেখ!—বুঝলম! তা সে রাগমান করছেন ভাল করেছেন, এখন আসানটো একটা করেন কেনে দেখি।—আমরা তো নাচার হছি। (বউকে উদ্দেশ করে) জল দিস কেনে? (ত্রিভুবনকে) বুলম না, দেখতেই, কাদের নাই বউ!

ত্রিভুবন : তা তুমরা বসাই বসাই খাওয়াইবে। উয়ার কি দোষ! গন্তর আছে খাটি খাক। বউঝিটি আজকাল সকল করছে। (সর্দারকে) পাঠাও কেনে খোলান? ধান উড়াবে, চাল ঝড়বে,—দেড়টাকা থিকা দুই টাকা রোজ উঠল হয় তো মন্দ কি?

(বধূ জল এনে দেয়)

গিরি : তা সে মন করলে তো করিবারই পারে।

ত্রিভুবন : (বধূকে) মনঠো কত্তার ঠিকই আছে, এখন আজ্ঞাটা তুমাদের হলে হয়।

সর্দার : আজ্ঞাটা দেওয়াই আছে। ও বুঝবে।

ত্রিভুবন : তা পাঠান কেনে? কামঠো উয়ার খোলানে বাঁধা থাকবে—কথা মিলম।···বড় ভাল বউ হইয়েছে, টুকটা বউ, সুন্দর বউ!···(উঠে পড়ে) মাংসোটাক দেখিবার পাই না;—না, বুঝে তো শহর গেইছে।

সর্দার। কয়দা থাকে কাম নিয়েছে।

ত্রিভুবন : হাঁ হাঁ, ভুলে গেছিলাম কথাটা।...তো আসি,—টুকচা বউ, সুন্দর বউ, খাসা বউ ..

(সর্দার, গিরি ও রত্না ত্রিভুবনকে এগিয়ে দেয় অগ্রসর হয়ে) —পর্দা—

দ্বিতীয় অঙ্ক

—চতুর্থ দৃশ্য—

(প্রভঞ্জন সর্দারের খোলান। ঘটনা সংস্থান পূর্ব্বকার খোলানের দৃশ্যের মত। তবে লোকজন কম। চাষীদের ভিড় নেই। কাঠের পাল্লা গোটানো। বেলা পড়ে এসেছে। মেয়ে কামিনরা ধান ঝাড়ছে, ধান ওড়াচ্ছে গান গাইতে গাইতে। একজন সরকার হাজিরা-র খাতা দেখে রোজা মিটিয়ে বিদায় দিচ্ছে ছেলে কামিনদের।

সূর্য্য ছেলে পড়ে পশ্চিমে। মেয়েদের কাজেও ভাটা পড়ে। তারাও নেমে আসে মাচা থেকে নীচে। শুধু রত্নাকে দেখা যায় ধান ওড়াচ্ছে কুলো করে।

একটু পরেই মেয়ে কামিন-রা লাইন করে এসে দাঁড়ায়। সরকার খাতার নামের পাশে টিকলি মেরে তাদের রোজ মিটিয়ে দেয়। তারা চলে যায় মাইনে বুঝে নিয়ে। এতক্ষনে মাচাং থেকে নেমে আসে রত্না।

সরকার : (রত্নাকে) আঁই দেখ, কামঠো উঠলো নাই ঘর যেতে মন করছে। যা কাম উঠা।

রত্না : সাঁঝ লাগছে, ঘরকে যাব, আমাক আজ ছুটি দে।

সরকার : মালিক আছি নাকি বটে? বুঝ নিতে হবেক নাই আমাক? কাম উঠাবি না, তারপর সরকার আপি যখন আমার সর্দানঠো টেপে ধরবে তখন ঠেকাবি তুই? কাম উঠাবি না তো পারদাও পাবি না পুরা, ই—আধা রোজের পারদা মিলবেক।

রত্না : আধা রোজের পারদা আমি নিব নাই।

সরকার : আঁই দেখ!

রত্না : (রেগে) পুরা কাম দিব, পুরা পারদা নিব।

সরকার : আঁই দেখ, খিলিক্ মারছে যেন বিদ্যুৎটো, বাপ্‌রে!

(রাগমান করে রত্না কাজে হাত দেয়। অন্য-সবাই চলে যায়। কুলো করে ধান ওড়াতে থাকে রত্না) (সরকারের প্রস্থান ও প্রভঞ্জনের প্রবেশ)

(পড়ন্ত আলোয় রত্নাকে সুন্দর দেখায়। প্রভঞ্জন রত্নার দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে)

প্রভঞ্জন : ই রকম আপনার মত করি পরের কামঠো যে বুক দিয়ে উঠায়, আমি তাক মাথাত করি রাখতম। দেখি দেখি নজরঠো ছুঁড়াই গেল আমার, খাল্লি আসলো মনে।...আর কাম উঠাইতে হবেক নাইগ মেয়ে তুমার পাওনা পুরা হইছে। সাঁঝ নামবে, আঁধার ঘনাবে, এখন মেয়ে তুমি তোমার ঘরত যাও।...সোনা মেয়ে, সুন্দর মেয়ে...(রত্না এগিয়ে আসে, প্রভঞ্জন তাকে টাকা দেয়) এমন মেয়ে যার খোলান তার সোনায় লক্ষী বাঁধা।.. আমার নাম প্রভঞ্জন সর্দার।...সোনা মেয়ে, টুকচা মেয়ে, সুন্দর মেয়ে ..। আঁই দেখ, টানাটানিক কামল নাই অথচ তোমরা বুলবে পলাই কুথা। খাসা মেয়ে...সুন্দর মেয়ে; তুমার নাম কি গো?

রত্না : রত্না।

প্রভঞ্জন : সুন্দর নাম, খাসা নাম। যে মেয়ের এমন নাম, তাক আমি কি দিব? কি রতন আছে আমার? আমি তোমাক মেয়ে রতন দিব।.. সন্ধ্যা ঘটে, আঁধার ঘনাইছে, রাস্তাঘাটে চোর বাউড়, ভূত প্রেত—কীট পতঙ্গ কি ভুজঙ্গের ভয় লাগে তো বুল মেয়ে আমি তোমার সহচর হইবার পারি। (রত্না ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানায়) একা-ই যাবে! —বেশ কথা। ই মেয়ের ভয় ডর নাই।...

(চুপিসাড়ে ত্রিভুবনের প্রবেশ)

...খাসা মেয়ে, সুন্দর মেয়ে, টুকচা মেয়ে...

আহা, যাইছে যেন শ্রীমতী, অভিসারে।

(রত্নার প্রস্থান)

(হাঁক দেয়)···বঙ্কু, ভীমা, সাটোর।

(ত্রিভুবন আড়ালে লুকিয়ে পড়ে)

(তাকিয়ে আছে বিমূঢ় দৃষ্টিতে প্রভঞ্জন, বঙ্কু ভীমা-রা এসে হাজির হয়। প্রভঞ্জন ইঙ্গিতে তাদের বন্ধুকে অনুসরণের ইঙ্গিত করে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবন বেরিয়ে আসে)

ত্রিভুবন : কে ?

প্রভঞ্জন : কে !—অ, ত্রিভুবন।

ত্রিভুবন : কে বটে ?

প্রভঞ্জন : কামিন।

ত্রিভুবন : কামিন !

প্রভঞ্জন : কামিন। বুল কেনে ?

ত্রিভুবন : নাঃ, তোমাকে আমার কিছু বুলবার নাই।

প্রভঞ্জন : আঁই দেখ, বুল কেনে ? যেটা খুসী সেটাই বুল।···কি ? আমি বুলব তোমার কথাঠো ?

ত্রিভুবন : আমার কথাটো !

প্রভঞ্জন : হঁ, যে কথাঠো আমাক তুমি বুলবে মন করছিলা ?

ত্রিভুবন : কি মন করছিলম ?

প্রভঞ্জন : গত, নয়গত। ঠিক কি না ?

ত্রিভুবন : আত্মদর্শনটো তোমার ভালই হইছে বটে।

প্রভঞ্জন : হঁ।···(পায়চারি করে। হঠাৎ বলে নিজের উরুতে দুহাত চাপড়ে বলে) তারপর ত্রিভুবন দাদা !

ত্রিভুবন : বেশীক্ষণ বসবো না। আবার যেতে হবে কাজ সহর, অনেক কাম হাতে জমা আছে।

প্রভঞ্জন : আরে বস কেনে দুইদণ্ড, কথা আছে।

ত্রিভুবন : আর কথা। কথা আর শুনবার চাহি না !—

প্রভঞ্জন : আঁই দেখ।

ত্রিভুবন : নাঃ, কথা আমি অনেক শুনেছি মানবের। কিন্তুক আমার কথাঠো কেউ শুনবার চাছে না। রাজনীতিঠো আর করবো নাই ভাবছি। বড় জটিল ব্যাপার।

প্রভঞ্জন : তুমি ভাল বুঝবে। ও আমার মাথাত আসে না।

ত্রিভুবন : হঁ, তুমার কি ! তুমি তো ভালই আছ। খাইছ, দাইছ, ভ্যাৎ-তুৎ বসন বাজাইছ···

প্রভঞ্জন : হঁ, রাজনাঠো শুনেছ বটে কিন্তুক প্রমঠো দেখ নাই ! কত ঘানে, কত চাল—ই খানা হিসাব করি করি খাটা পড়ি গেল নখত্তে···

ত্রিভুবন : তবু দেখ দিনরাত্রে নিদ্রাটি সাধাই আছে। আর আমি শুতেই সময় পাই না।—সমিতি আর কমিটি—মাতৃমঙ্গল, বংশনিরোধ বিধা স্থগিত-করণ তক···

(এই সময় পরিচারিকা এসে এক থালা খাবার দেয়)

আঁই দেখ, বস্তুটা কি মুরগী বটে !

প্রভঞ্জন : হঁ, বিলাতী মোরগ।

ত্রিভুবন : তাই দেখি জানোয়ারঠোর মতন ; খানা চিজ্ বটে !

প্রভঞ্জন : ছুরি ধর কেনে ?

ত্রিভুবন : না, হাত দিয়া ছিঁড়ে খাইতম।

প্রভঞ্জন : অভ্যাসদোষটা যায় নাই বটে !

ত্রিভুবন : না, সে দিক থেকে জাতীয়তাঠো রেখছি,—আচার বিচারে ত্রুটী পাবে না।

(দুজনে মুরগীর ঠ্যাং ছিঁড়ে খায়)

প্রভঞ্জন : সেই দেখি···(ভৃত্যকে) জল দিস কেনে, ঠাণ্ডা জল। খাইতে কোন অবহিতকর কর্ম নাই, আসাকরি। খাইদাই এখন একটু মৌজ করা যাক। একটু বিশ্রাম।

ত্রিভুবন : মৌজ না হয় করলম কিন্তুক বিশ্রামঠো আর হবেক নাই। বুঝল না, কাল সহর যেতে হবে। হাকিমটাক একটু ভেঁটে দিতে হবে। পর পর দুইটা মামলা ভিন্‌ভিন্ করি মহকুমায় গরীবের যা বাপ হইছে বলেছে। বুঝে কি না, মন্ত্রীর কাজ করবে মন্ত্রী, আমার কাজ আমি করব। কথার একটা নামায় নাই।

বুঝিবারই পারে না, খোদ দপ্তর খিকা একটা অর্ডার জারী করি ওরাকে আমি রাতারাতি স্থানান্তরী করিবার পারি। আরে বাবা, যন্ত্র দেখে যদাচার,—যা কর চুপ করি কর, সাঁচাই বাঁচাই কর। হাকিমশাহীটা ইখানে চলবেক নাই।

প্রভঞ্জন: তুমার লীলা বুঝিবার-ই পারি না। এই দেখি, ছোটলোকগুলানের সাথ সমাসনে বসি সমিতি করছ। আবার শুনলম হাকিমের হাকিমী ছুটাইতে চাদর কাঁধে চলেছ সদর। তোমার অসাধ্য কর্ম নাই।

ত্রিভুবন: দেশের দশের মঙ্গলটাই যখন বরম করেছি তখন কোন কর্ম-ই আর সাধ্যাতীত হওয়া উচিত হয় না, জানিবে।···দেখি, শত খানেক টাকা ছাড় কেনে?

প্রভঞ্জন: একশত?

ত্রিভুবন: তো আমার খরচাটা কোন দিবে?

প্রভঞ্জন: কিন্তুক একটা কথা ত্রিভুবন ভাই, ই ছোটলোকগুলানের সাথ তুমি বেশী মিলমিশ দিও নাই। মিথ্যাবাদী কতকগুলান জুয়াচোর, খালি নিজ নিজ স্বার্থ,—আমি চাহি না তুমি উয়াদের সঙ্গ কর।

ত্রিভুবন: তা সে তুমি মহাশয় ব্যক্তি, তুমি সঙ্গ না করিবার পার; কিন্তুক আমাক সঙ্গ কিছুটা করিবার-ই হয়। সামনে নির্বাচন, আমার জোরঠো বাধবে কুথায়? সঙ্গ আমাক করিবারই হয়; হঁ, তবে ই-কথাঠো বুলতে পার কি যে সঙ্গ তুমি করিবার পার কিন্তুক সঙ্গী তুমি কখনই নও,—ই কথাঠো বুঝিবার পারি।

প্রভঞ্জন: ই কথাঠোই বুলছিলাম।

ত্রিভুবন: না, তুমি বুলছিলে অন্য কথা। আমার কথা যদি তুমার কথা হইত তো আচরণঠো তোমার আমার সামিল হইত বটে। তোমার সে হঁস নাই।

প্রভঞ্জন: ঐাই দেখ, বেহোসঠো কি হইলম বুল কেনে?

ত্রিভুবন: না দেখ, পর পর দুই-বছর অজন্মা গেইছে, তার উপুর এই চড়া বাজার। মানবের আথায় এমনিতেই ঠিক নাই। দেখে কুষিঠো ভাল হয় নাই, তবু তুমার পাওনা তুমি পুরা নিয়েছ।

প্রভঞ্জন: নিব নাই কেনে? দানছত্র খুলে বসেছি নাকি?

ত্রিভুবন: না তা সে যা বুঝেছ তাই করেছ, আমি তাত কোন কথা বুলি না। পাওনা যেখানে পুরা হয় নাই তোমার, সেখানে চোলসহরৎ করি কেতী জমির ভিঁটা মাটি পর্যন্ত তুমি দখল নিয়েছ।

প্রভঞ্জন: হঁ, নিয়েছি। অন্যায়ঠো করেছি বুলবার চাহ?

ত্রিভুবন: আরে রাখ, কথাঠো বুলবার দাও।

প্রভঞ্জন: প্যাটনিঠ সাঁটা কতকগুলান অপগণ্ড পশু, স্বার্থ ছাড়া কথা নাই মুখে, তুমি বুলবার চাহ আমাক তাদিগের সাথ সলা করি চলতে হবে? আমার ভাগ্য আমি নিজে গড়েছি। বুদ্ধি বিদ্যা হোক, কৌশল করি হোক, দান করি কি লুঠ করি হোক, আমি-ই আমার বিধাতা পুরুষ। কতকগুলান পরগাছা···

ত্রিভুবন: এ সব তো রাগের কথা বুলছ তুমি। তুমি বুলছ তারা পরগাছা আর তারা বুলছে—তুমি-ই পরগাছা,—বেআইনী দখলদার।

প্রভঞ্জন: কোন কুত্তায় বুলছে?

ত্রিভুবন: কেন কি বাঘসিংহের মতন তুমাকেও দেখিবার নয়। দেখতে তোমাক তাদের-ই মত, বিলকুল মনুষ্য বটে।

প্রভঞ্জন: হঁ!

ত্রিভুবন: যাউক, আমি বুলছিলম অন্য কথা। তা সে তুমি তো আমাক সে কথা বুলবার-ই দিলা না।

প্রভঞ্জন: কি?

ত্রিভুবন: না সে পরে বুলব, এখন তোমার মেজাজ ঠিক নাই।

প্রভঞ্জন: ঠিকই আছে। বুল কেনে?

ত্রিভুবন: বুলছিলাম, বুদ্ধির কথাঠো। আগেও বুলেছি, এখনও বুলছি—পঞ্চায়েতি শাসন তোমাক এখনই চালু করবার হয়। কেন কি অভাব আর

অভিযোগের বহরটে যেই পরিমাণে বেড়ে যাইছে, তাহে করি দায়িত্বটা তুমার নিজের উপুর রাখাটা আর উচিত হয় না।

প্রভঞ্জন : সুবিচারটো করবে কোন? সরষের ভিতর ভূত।

ত্রিভুবন : সেই দায়টো তুমার না। থাকুক কেনে ভূত!

প্রভঞ্জন : কায়দা করি যদি গোটাকতক ব্রহ্মদৈত্য ঢুকাবার পারি তো আরও ভাল, না কি বুল বটে!

ত্রিভুবন : সে তুমি বুঝবে ভাল। এই কথা, আর একটা কথা রইছে বউ বিটি মেয়ের কথা। সমস্ত রাত্তি কামকাজ করিবার হয়। এও-ও কহি ধর্মের সামিল। এই সেদিন হিরণাক্ষ বাউরীর মেয়েটাক নিয়া কি গণ্ডগোলটাই না বেধে উঠেছিল। অনেক কৈফত করি চাপা দিলম ব্যাপারটো। আবার ই দেখ সর্দারের বেটার বউ বস্ত্রাক নিয়া…

প্রভঞ্জন : থাঁই দেখ! সিটা ইটা পৃথক কথা। ইখানে আমি অনাসক্ত।

ত্রিভুবন : তুমি! অনাসক্ত! পাঁ-ও দিয়া সাঁপটো খেদাইছ তুমি আর মুখে বুলছ অনাসক্ত। তবে হল করি রাখ, ইবার যদি সাঁপে কাটে তো এই অধম খন্তিটাক দিয়া কিন্তুক কোন কাম হইত না।

প্রভঞ্জন : (ঠাট্টা করে) কেন কি বৈদ্যরাজ-ই ইখানে জর জর বিসে, না কি বুল?

ত্রিভুবন : না না, ঠাট্টার বিষয় না ইটা, কহি।… একটা কথা কহি কি প্রভঞ্জন, পুরান হিসাবটোর এখন কিন্তুক আর চলবেক্ নাই। সূর্যসাক্ষী করি দুনিয়াটো এখন যে রকম ঘুরে চলেছে মেলগাড়ীর চাকাটোর মতন, তাত করি—এই তো সেদিন কে যেন বুলছিল কথাটো শুনছিলম কানে, মঙ্গল গ্রহটায় নাকি জমী ইজারা মিলবে, ভাবিবার পার?

প্রভঞ্জন : কথাটো একটা শুনেছিলাম বটে। তা নিব ইজারা, কথা বুল কেনে?

গ্রন্থশ্রীর বই

॥ কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস ॥

অংশুমান মিত্র

ইতিহাসের নায়িকা ২·৫০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

চোখের বাহিরে ২·৫০

প্রভাত দেব সরকার

মধুর এমন ৩·০০

চিত্তরঞ্জন মাইতি

ডঃ জনসনের ডায়েরী ৩·০০

সুবোধ ঘোষ

মুক্তিপ্রিয়া (২য় মুদ্রণ) ২·৫০

বারীন্দ্রনাথ দাস

অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা ৪·০০

প্রভাত দেব সরকার

মধুর এমন ৩·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী

৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের

অবিস্মরণীয় উপন্যাস

যদি জানতেম ৪·০০

কন্যা মৃণ্ময়ী (২য় মুদ্রণ) ৩·০০

স্বনির্বাচিত গল্পগ্রন্থ

সাত দিন ২·৫০

গ্রন্থশ্রী প্রাইভেট লিমিটেড

১৭০/১৩, প্রিন্স আনোয়ার সা রোড, কলিকাতা-৩৩

অনিলকুমার ভট্টাচার্যের

দু'খানি মনোরম উপন্যাস

উপনদী ২·০০

মেঘ পাহাড়ের গান ২·০০

সুপাঠ্য কবিতার বই

সাগর আকাশ ২·০০

ডি. এম. লাইব্রেরী

কলিকাতা-৬

ত্রিভুবন : যাউক, মর্ত্তধাম ছেড়ে এখন স্বর্গটা ইজারা নিবে তুমি, গল্পকথার কাজ নাই। আমি বুল্লম একটা ভাবিবার বিষয়, চিন্তার কথা।

প্রভঞ্জন। অত চিন্তা করিবার পারি না। টাকা চাহ বুঝিবার পারি।

ত্রিভুবন : দেখি ছাড় দেখি!

প্রভঞ্জন : কি?

ত্রিভুবন : খাঁই দেখ!

প্রভঞ্জন : হঁ হঁ, ভুলেই গেইছিলম।

(ট্যাঁক থেকে গাঁটরি বার করে টাকা দেয়) এই যে! তা কি যেতেই হবে।

ত্রিভুবন : যেতেই হয়। তোমার-ই কাজ সর্দ্দার!

প্রভঞ্জন : জানি, জানি। আর দিতম?

ত্রিভুবন : না থাক। আচ্ছা, দেও কেনে!

(হেসে টাকা দেয় প্রভঞ্জন ত্রিভুবনকে)

(ত্রিভুবনের প্রস্থান)

প্রভঞ্জন : (পায়চারি করতে করতে দাঁড়িয়ে পড়ে) আমি রাজা, আমার-ই নীতি। ই টাই রাজনীতি। ত্রিভুবন আমাক রাজনীতি সমঝাইছে।

—পর্দা—

তৃতীয় অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

রাত্রি। সর্দ্দারের বাড়ী। কেরোসিনের একটা ডিবরি জ্বলছে আঙ্গিনায়। কম্প্রমান আলোক শিখায় ঘর বাড়ী গাছ গাছালি—সব কিছু কাঁপছে জলরং-এ আঁকা ছবির মত। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। অস্পষ্ট আলোয় আবছা দেখা যায় গিরি দাঁড়িয়ে আছে একা নিশ্চল পাথরের মত। চোখের দৃষ্টিটা নিরুদ্দিষ্ট বস্তুকে খুঁজতে উধাও বনে সামাটা বেরিয়ে আছে নিরাশ বাতনার মত।

ক্ষণকাল অতিবাহিত হয়। সরে নড়ে দাঁড়ায় গিরি।

গিরি : (স্বগতঃ) যেই দিক দিকা পাও দিছে ঘরে, লেগেই আছে অশান্তি। অভাগীর বিটি আলাই দিল ঘর-সংসার। জমী জিরাৎ নীলামে চড়াইছে, ছেলেটাক দেশান্তরী করছে, এখন বুড়াবুড়ীর কলজেটানা খোপাইতে লেগেছে;—খা কেনে খা, চিবাই চিবাই খা, আবাগীর বিটি, মুখ্যার বিটি।.....

(ক্ষণকাল চুপচাপ)

.. গতরখাকী, গতরখাকীর ঘরের কাজে মন নাই। ত্রিভুবন সর্দ্দার আসি যেই সেখানের কামের কথা বুলেছে কি অমনি মেচে উঠেছে গতরখাকী, গতভাতারীর বিটি, টাকা দেখেছে, টাকা চিনেছে! যা কেনে যেথা খুসী, মর গিয়া যড়ি নিয়া, ইঁদের ভাবছিস তুর জন্তে?

(ক্ষণকাল চুপচাপ)

আর ঐ বুড়াটা-ই হইয়েছে আমার শত্তুর. রাতকানা-নজর চলে না, খালখন্দে কি তুজঙ্গের ঘাড়ে পাও যেয় তার ঠিক নাই, উ গেইছে হাঁগা করতে। বুল্লম, আমি যাই, আমি দেখি—না, বউ বিটি ঘর দিকা পাও বাড়াবে না রাতে। বউঠোই তার জবাব দিয়েছে মনের মত।

(সর্দ্দারের হন্ত দন্ত প্রবেশ)

আমার মন খুব তুষ্ট হইয়েছে।...

সর্দ্দার : কার সাথ কথা কহিস?

গিরি : কি খবর?

সর্দ্দার : আমি ভাবলম...।—নাঃ, যায় নাই বাপের ঘর।

গিরি : যায় নাই?

সর্দ্দার : খোলান দিকা বার হইছে তখনম বেলাবেলি, টাকা পায়সা সব বুঝ করি নিয়েছে, সরকার-কে বুলেছে মুই ঘর যাছি...

গিরি : তারপর?

সর্দ্দার : তারপর আর কি! কত খুঁজলম পাইলম নাই। এখন, কি করি...বুঝিবার-ই পারি না।

গিরি : কি জানি কি আছে উয়ার মনে।

সর্দ্দার : আমার হিসাবে আসে না।

গিরি : বাকি সড় করি সেবটায় সরই গেল চলি কাঁকি দিয়া।

সর্দার : সত্য করি! কার সাথ? কাকে কাঁকি?

গিরি : বুঝলম একটা কথা। মন করলে সহচর-এর উয়ার অভাব কি?

সর্দার। দুঃখটা তোমার নিজের কারণ তাই ই কথাঠো শুনলম তুমার মুখে।

গিরি : হঁ, বচন আমি ভালই দিবার পারি…

সর্দার : (ধমক দেয়) চুপ, একটা কথা না, চুপ।…আর তার যদি মেয়েটার কোন বিপদ হয়, সাপে কাটে কি বাঘে নেয়…

গিরি : বাঘ?

সর্দার : হঁ, বাঘ। আমি নিজের কানে তার হাঁকাড় শুনেছি।

গিরি : (অবাক বিস্ময়) হাঁকাড় শুনেছ!

সর্দার : কেনে, তুমি শোন নাই?—হাঁকাড় দিছে আর কুয়াত করি ফিরছে চক্কর দিয়া দিয়া, আজ আমার ঘর, কাল তার ঘর—সকল সংসারে চুনা বাড়াইছে—কলজ্যার ভিতর নদি ঢুবাই রক্তমাখা থাবাঠো চাটতে লেগেছে…

(পাশেই ছিল রাম দা। রাম দা-খানা নিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ায় গিরি পাথর প্রতিমার মত। সর্দার অন্ধকারের দিকে নিশ্চল তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ)

…পাপ! মহাপাপ! এ মহাপাপের কি কোন খণ্ডন নাই?

গিরি : এইবার বিলম্বুর্ত্তি ধরতে হবে। বাঘটাক আমি স্পষ্ট দেখলম অন্ধকারে।…

(সর্দার তাকায় গিরির দিকে। দেবীপূজার ঢাক বাজে) —পর্দা—

তৃতীয় অঙ্ক

—দ্বিতীয় দৃশ্য—

দেবীস্থান। স্থানটার একাংশে। এই দৃশ্যে শুধু মাত্র একটি বটবৃক্ষের প্রপ্রশস্ত গুঁড়ির কিয়দংশ পরিদৃশ্যমান। এই বটকাণ্ড মূলের সামনে দাঁড়িয়ে ওরাই বাউরী তার নালিশ জানাচ্ছে উপস্থিত পাঁচজনের কাছে। ওরাই বাউরীর মুখখানাই দেখা যাচ্ছে। শুনছে যারা তারা সবাই পেছন ফিরে বসে আছে, বক্তার মুখের দিকে তাকিয়ে। বসীরেখাঙ্কিত শুধু আর একটি জানবুদ্ধের মুখ, ওরাই-এর বক্তব্য বিষয়ে সায় দিয়ে দিয়ে যিনি মাথা হেলাচ্ছেন মাঝে মাঝে, তাঁকেও সামনা সামনি সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সাদা-কালোর ছোপ দেওয়া জলরং ছবির মত এ দৃশ্যটাও কাঁপছে দূরবীক্ষ্য কোন কম্প্রমান বহির্শিখার—এহেন আলোকসম্পাতে।

লেছুয়াসর্দার : কাঁদতে লেগেছে, হঁ—কান্না দেখে কি করবো, কান্নায় আমাদের তিতিকার এঁসেছে? ঘটনা যা বুল না কেন?

ওরাই : (কান্না থামিয়ে) আমার নাম সর্দার ওরাই বাউরী। প্রভুজনের মোকামে কাজ করতম—আপখোরাকী পাঁচ টাকা বেতন। তিন বছর বাদ একদিন সর্দারকে বুলম, সর্দার—ঘরে আমার মা বউ বিটি নিয়া তিনটা মুখ, বছরের মধ্যে ছয় আট মাস ভুখা মরে, তা ই কাম আমি আর করবো নাই। আমাক তুমি ছেঁড়ে দেও, আমি পাটকলে কি কয়লা খাদে কাম নিব। তা সে আজ বুলবো কাল বুলবো করি করি ছয়মাস অন্তে সর্দার আমাক একদিন ডেঁকে বুল—ওরাই! তুই এক কাম কর। বিশ্বাসী লোক তুই আমার তোক তো আমি ছাড়তে পারবো নাই—বউ বিটিক তুই নিয়া আয় আমার কাছে। মোহানে কাম করবি তুই আর তোর বউ সব বাছুর-গুলাক দেখভাল করবে, ছাগল চরাবে, হাঁসমুরগী উঠাবে—ভালই থাকবি ইখানে। ভাবলম, ভালই কথা—দুঃখের দিনের আসান পাইলম এতদিনে। তা ভগবানের মার মানুষে কি করবে, আমার কপালের দোষই কহি—মেয়েঠো আমার মারা গেল ওলাউঠোয়। বিষম দুঃখু পাইলম মনে—মনঠো আমার ভেইঙে গেল। বউঠোর কান্নাই বা কত সহ্য করি! তখন আমি সর্দারকে বুলম, আমাক তুমি ছুটি করি দাও সর্দার, আমরা ঘর যাব। ভাল কথা, যাবি তো যাবি

ঘর—সর্দার বুল, বউঠো'র চক্ষের জলটা শুকাইবার দে, ওরাক আমি নিজের ঘরে চাকরাণের কাম দিব, সোনামে আর কাম করতে হবেক নাই উয়াক। ই লেল তুমার মত দেবীপূজার সময়। তা সেই যে চাকরাণের কাম নিল বউ, সে আজও নিল কালও নিল,—গত একটা বছর তার সাথে আমার কোন সাক্ষাৎকার নাই। মোকামের চৌহদ্দির ভিতর আমাকে ঢুকতে দিত নাই, রাস্তাঘাটে নজরে পড়লে সর্দারের লোক আমাক ইঁটপাটকেল ছুঁড়ে মারতো আর বুলত শুণাই-এর মাথা খারাপ হইয়ে গেইছে—উ বেটা বড় উন্মাদ বটে।..... শুণাইলাম একদিন শুয়ারটার মত ঢুকছিলাম একদিন সর্দারের অন্দর মহল পাইখানার ভিতর দিয়া। আমাক দেখে তো থ, কাঁপতে লাগলো বউ; যেন ভূত দেখেছে। বুল্লম, শুণাই নইগ, শুণাই-এর ভূতটাই হই বটে। তবে তুমার ভয় নাই। এসেছি, আবার এখনই চলে যাব। সনব্বোতা করতে আসি' নাই আমি। তবে যাওয়ার আগে আমি তুমার মুখ থিকা মাত্র একটা শুনিবার চাহি—তুমিও কি বুলবার চাহ শুণাই বাউরী পাগল হয়ে গেইছে। এই কথাটো বুল তুমি আমাক। সে কথার উত্তর দিল না বউ। তবে সর্দার নাকি তাক শুধাইছে বউ বুল—যতন করি এক বজ্জরটাক যে খাওয়াইলম তোমাক ধলাই বসাই, তার খেসারতটা শুণাই কি আমাক শোধ করি দিবে তোমাক ছাড়বার আগে? কানেই শুনলম কথাটো, আমি আর উত্তর মুখ দেখি নাই। শুয়ারটার মত যেমন ঢুকেছিলাম, তেমনি পলাই আসলম নরককুণ্ডটার ভিতর দিয়া। পঞ্চজনার সভায়, আমি আর বেশী কথা বুলবার চাহি না।...আমি আর বেশী বুলতে পারতম না সর্দার।

সর্দার: বুঝলম, তোমাক আর বেশী বুলতে হবেক নাই। (উঠে দাঁড়ায়) আমি চাই কি—শুণাই বাউরীক পঞ্চায়েৎ সভায় পঞ্চজনার একজনার সামিল করি নেয়া হোক। নরককুণ্ডের এমন একটা সাচ্চা শুয়ার ইখানে একটাও নাই। চল কেনে?

—পর্দা—

তৃতীয় অঙ্ক

—তৃতীয় দৃশ্য—

পঞ্চায়েৎ বৈঠক। চার পাঁচজন চাষী জরুরী আলোচনায় ব্যস্ত। নিশাকাল। ঘটনা সংস্থান পল্লীর যে কোন চাষীর আঙ্গিনা। দেবী পূজার ঢাক নেপথ্যে শোনা যায় অনিবার্য ভাবে।

ধনাই: আমি কহি ধর্মগোলার কথা। ধর্মগোলার যে ধান মজুত আছে, সেই ধান সকলের। আজ যখন দিনঠো খারাপ এসেছে, প্যাটচিটা দিয়া মরতে লেগেছে মানুষ, তখন ঐ গোলার ধান বাঁটি করি দেওয়া হোক ঘর ঘর। ঐ ধানে প্রভুজনের কোন এক্তিয়ার নাই।

সকারিয়া: একতিয়ার নাই বুলছ কিন্তু ঐ গোদারটাই হিয়েছে আবার ঐ ধর্মগোলার ধর্মাবতার। একদিন তুমরাই আগ বাড়াইয়া দিয়া গোলাটা গোদারের খোলানে বসাইছিলা। ইদিকে অভাবের ধারে স্বভাবঠো নষ্ট হিয়েছে মানষের, তাই তাই ঠাঁই ঠাঁই, ইটা হিয়েছে একটা গল্পকথা। আপৎকালে একটা মারা উঠাইলেও দুইখানা গাঁয়ের মানুষ জড়ো হইবার চাহে না। সুযোগ বুঝে গোদারটার দাপট গেইছে বেড়ে, কর্মীধানের সুদটাক যে হারে কাটলো ছাগল ছেঁড়ার গলাটাও বোধ করি একটা কসাই তার চেয়ে রিয়াত করি কাটে। অভাবী মানষের নাই রোষ, নাই কৌস, দাহন আর পীড়নে কহি কি কতকটা যেহাঁস, তাই ধর্মগোলার আজ বয়স নাশ হিয়েছে। লক্ষীর কাঁসিঠো তুলা দিয়া টেনে নিছে শয়তান—ইটার একটা ফয়সালা দরকার।

খগেশ্বর: পঞ্চজনার কাছে আমার একটা কথা আছে। কথা হইয়েছে এই যে, মনে তো আমার ভড়াস লে গেছে। খৎ-এ যে রকম লিখা আছে তাতে হই আমি উঠবন্দী প্রজা। যা কেনে হই—বুল কি অমনি বাচার হইলাম আমি। কিছুদিন যর আমার উপুর সর্দারের নজরঠো ভাল নাই। তিন বেলা হাঁক ডাক

করাইছে, ইটা সেটা সমঝাইছে,—ছেলে মরিবকে ডেকে দিয়ে নাকি সর্দার বুলেছে ক্ষেত্তিজমী এবার নাকি সর্দার সব খাস করি লিবে। —চাই কি তেমনার খালের এপার থেকে ভুঁইচাষীর জমিন সর্দার নাকি খাস করি লিবে।

ভানু: ই একটা গল্পকথা। খাস করি নিবার পারে এক সরকার; মধ্যসত্বভোগী প্রভঞ্জন সর্দারের প্রজাসত্বে হাত দিবার কোন একতিয়ার নাই।

খগেশ্বর: একতিয়ার নাই, লিবে একতিয়ার। উ তো বুলছে তুমি নামমাত্র প্রজা, জমীতে তুমার কোন সত্ব-ই নাই। আর পয়সা আছে আইনজারী করবে কোর্ট ধিকা, কানুনটাক তার বদল দিতে কতক্ষণ!

লক্ষ্মণ: তা সে জবাব করতে হবে। খাস মহলে যেতে হবে সব চালচিড়া বেঁধে নিয়ে। সুবোধবাবুক ভোট এমনেই দিলম নাকি? সরকারী দপ্তরটায় হৈ চৈ উঠাই দিব না?

সকারিয়া: গ্রাম পঞ্চায়েৎ সভার বিষয়টা তুলতে হবে - ঘটনাটা গুরুতর বটে। পঞ্চায়েৎ সভায় কথাটা না উঠালে দপ্তরটায় তুমার ধেঁচুটা হবে। সুবোধবাবু খৎ পাঠাবে, আজ্ঞি দিবে—কথায় কথা ডুবে যাবে, ও আমরা অনেক দেখেছি।

খগেশ্বর: কি করিবার চাহ তবে?

সকারিয়া: পঞ্চায়েৎ সভাকে সমঝাইতে হবে। সরাসরি সুবোধবাবুকে বুল্লে তো সুবোধবাবু বুলবে, আজ্ঞি পাঠাও, সই দাও কেনে তাতে তুমাদের সকলের। ই হইছে যেন সেই গল্পকথা—সাত বেটা যার দরবারে, নাই কেহ তার সংসারে।

খগেশ্বর: ইটাক রদ করতে পারে, যদি মন করে এক ত্রিভুবন সর্দার।

ধনাই: অ-টা দালাল বটে, যোদ্ধারটার অনুচর।

খগেশ্বর: ইটা যদি বুল তো আমি বুলব ঐ রকম সকল আছে। তুলসীর পাতাঠো তুমি কুথায় পাবে?

সকারিয়া : ইটা মিথ্যা কথা। মংলার বাপ, বুড়া হইছে, তবু সে একটা সর্দার। আর সেলেও যার দিকে নাই বুড়া। তুমি খগেশ্বর দাদা, আমাদের নেতা আছ বটে। দশরথ বাইতীর বয়স হচে, চোখে দেখে না, কানে শুনে না—তবু তার একটা কথা শুকুর বচন। দিগম্বর সাওতাল-টাক, মাস্তে করে না, এমন মানুষ ভল্লাটে নাই। আছে তো। সব সর্দার দালাল হইয়ে গেইছে—ই একটা তুমি কেমন কথা বুল্লে খগেশ্বরদাদা?

ধনাই : আসল কথা বুল খগেশ্বরদাদা, তুমার ভয় লে গেছে।

খগেশ্বর : না, ডরাই নাই।

লক্ষ্মণ : তুমি ডরাইছ।

খগেশ্বর : না, ডরাই নাই।

সকারিয়া : বাঘের চোখে চোখ পড়েছে আমার, কহ আমার কি কর্ত্তব্য? ডরালে বাঁচবো?

খগেশ্বর : না।

সকারিয়া : তো কি করবো?

খগেশ্বর : টাঙিটাক তুলবো।

সকারিয়া : তো উঠাও কেনে টাঙিটাক্।

(চিত্রার্পিতের ভঙ্গীতে টাঙিটা তুলেই যেন সকারিয়া তাকিয়ে থাকে খগেশ্বরের চোখে চোখ রেখে। আর সকলেও দাঁড়িয়ে উঠেছে যুগপৎ)

—অন্ধকার।

তৃতীয় অঙ্ক

—চতুর্থ দৃশ্য—

কাঠের টুকরো গুঁড়ি সমাকীর্ণ বৃহৎ বটকাণ্ডমূলের পটভূমিতে পঞ্চায়েৎ সভা। প্রবীণ নেতারা বসেছেন ধানতলার উচ্চ ভূমিখণ্ডে। আর নীচে সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে সাধারণ লোকেরা বসেছে কাঠের গুঁড়িগুলোর ওপর ও মাটিতে। সরব আলোচনার মাঝখানেই পর্দা সরে যায়।

ধনাই : ই দেখ ত্রিভুবন।

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : এলো না।

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : অথচ দেখ কত বুলন!

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : আসলো না তো সেদ্দারঠো ভাবল কি যে ওয়ার কোন উল্টা কথা আছে।

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : ভাবল কি না?

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : ফলটা কি হলো?

সমস্বর : অঁ?

ধনাই : ছত্রভঙ্গ।

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : প্রভঞ্জন ভাবল, সায়টা ত্রিভুবনের আমার দিকেই।

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : ভাবল কি না?

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : এই যেই ভাবল…

সমস্বর : হুঁ।

ধনাই : —একটা ইউনিয়নের কম সে কম আট দশঠো গ্রামের হাজারো মানুষের মনের কথাঠো, কহি কি শুকতর একটা প্যাটের কথা—বিটি ছেলে বুড়া বুড়ি ছোক্রা ছুক্রীর একটা কথা, যে কি খেয়ে বাঁচবে মানুষ ই কথাটা, ই কথাটা চাপা গেল।

সমস্বর : হুঁ, হুঁ, হুঁ, হুঁ…

ধনাই : —চাপা গেল সেই সাইকার মহাজনের মোটর লরীর নীচে ত্রিভুবনের ইউনিয়নের-ই প্যাটপীঠ-সাঁটা হাজারো মানুষের জান, কহি কি সেই ধান, যখন দেখি সুতার হাটে বিকায় চড়া দামে, ষোল টাকায় ধান পচিশ, তিরিশ। ধানের দাম তিরিশ আর ইদিকে ঘরে পায় না একটা দানা।…

জনৈক চাষী : কিন্তুক ত্রিভুবন বুলেছে ই কথা…

ধনাই : ...তো ইটাক সর্দ্দারি বুলে না। সর্দ্দারি বুলি না তাক যে যখন খুসী তখন তুমি মজ্জিমত ধমকে বুলবে, হেই—ইটা কর, হেই—উটা কর, হেই—ইদিক যাও, হেই—উদিক যাও ;—সর্দ্দারি, বুলি না যখন দেখি তুমি পকজনার দুঃখের দিনে নিশানা দিবার পার না, উল্টা নিজের বেয়াকুবির দোষে হুসটাক পরমাল করি নিজে ডুব আর মানষগুলাক ডুবাও, এক সময় ভীতু, এক সময় সুবিধাবাদী, এক সময় বেইমানীটাও যে কর না ই কথাঠো-ও মানি না আমি।—আরে মানুষগুলান তো বোকাছোকা, একটা বুদ্ধির ঠিকানা নাই, কাত্ তো কাত্, চিৎ তো চিৎ, যা বুলছ তুমি তারা তাই শুনছে। কিন্তুক তুমার সর্দ্দারিটা যে মানলো তারা, তুমি যে গলাকাড়া দিয়া একদিন তাদিগে বুলেছিলে যে আমি তুমের সর্দ্দার হই, আমার কথাই একটা অাঁজার কথা, তাতে কি কয়বাঠো উঠাইল মানুষ!

অনেক চাষী : ত্রিভুবনের কথাঠো যখন উঠলো তখন আমি কহি কি...

বুঝলম, সর্দ্দারটা-ও একটা মানুষ, ভুলচুক তার-ও হইতে পারে, সব সময় বুদ্ধিটার ঠিক সর্দ্দারের-ও থাকিবার না—মানলম ; কিন্তুক শুঁধাইতে তো পারতে তুমি একবার যে ই কথাঠো আমি তুমাদের বুঝতে পারি নাই,—একটা পকায়েৎ সভা ডাকা লাগে। একটা ইউনিয়নের দশখান গেরামের মানুষ তো প্যাটচিটা দিয়ে মরতে চাহে না, বেবাক মানষে তো বাউরা হইয়ে যায় নাই, তো বুঝ করি বুদ্ধির নিশানাঠো ঠিক করতে তো দেখি তুমার মন নাই, কলিজা নাই তুমার, রোখ নাই তুমার। —তবু তুমি ত্রিভুবন, তুমি সর্দ্দার, পকজনার একজনা। —আমি তো মরতে চাই না, না, তুমি মরতে চাও না প্যাটচিটা দিয়ে, আরে আজ যে বাচ্চাটা পয়দা হইয়েছে, মুঠ্ করি সে-ও তো চিল্লাইছে, চিল্লাইছে আর বুলছে—আমাক জান-এ বাঁচাও, আমি বাঁচবো, আমাক মারতে তুমার কোন একতিয়ার নাই।—সরুরে ঢোল পিটায়, ঢোল পিটায় আর বুলে ঐ কথাঠোই, তুমার কোন একতিয়ার নাই, প্যাটচিটা দিয়ে মর তুমি। কিন্তুক নাকাড়া-ঠো তো (পেটে চাপড় মারে) ইখানেও বাজে, আর সেই নাকাড়া-ঠোর ডাক ঐ ঢোলের চেয়ে জোরে বাজে—বোলটা-ও মিথ্যা কহে না,—কহে কি, তুমি খাও, ওয়াক খাওয়াও, সকল খাও—একটা পুণ্যের কথা, ধর্ম্মের কথা, ভাল কথা, সুন্দর কথা। তবে কথাঠো হইয়েছে ইখানে যে এই ধর্ম্মের নাকাড়া-ঠো অরা বুলছে আপন আপন বাজবে,—আর আমি কহি কোনদিন না, কোনদিন বাজবে না যদি আমরা না বাজাই। কাড়া-নাকাড়ায় কাঠি দিবার সময় আমার মনে হয় এইটাই হয়।

[বক্তব্যের উপরোক্ত অংশটি শেষ হবার কিছু পূর্ব্বেই পাত্রমিত্রসহ ত্রিভুবন সর্দ্দারের প্রবেশ ও আসন গ্রহণ। সমালোচনা শেষ হতেই সহাস্য মুখে লাফিয়ে ওঠে ত্রিভুবন।]

(সভায় সাড়া পড়ে যায়)

ত্রিভুবন : ইখানে আমার একটা কথা আছে। কথাঠো আমি আপনাদিগে বুলতে চাই।

প্রবীণ : বুল কেনে?

খগেশ্বর : হঁ বুলেন! আমরা তো শুনতেই এসেছি। কহেন কেনে?

প্রবীণ : হঁ চুপ করি থাকিলে তো বাধে লিবে। একটা খাবার প্যাটচিটা কঁয়াইছে, দুই খাবার টেনে লিবে অখন, কহ যেথি শুনি বুঝ করি।

ধনা : কথাঠো কোন বুলছেন? মহাশয়ের নাম?

ত্রিভুবন : আমি কহি, কেনে? আমার নাম ত্রিভুবন।

ধনা : হঁ, ত্রিভুবনঠো-ই দেখাইলা বটে। বুল কেনে?

ত্রিভুবন : কথাঠো যিনি বুলছেন তার নাম?

ধনা : নামে কি কাম আছে সর্দ্দার, নিবাস চ্যামনার খাল,—আপনার পাশাপাশি।

ত্রিভুবন : বুঝলম, তাই এত রেশারেশি।

প্রবীণ : (জনসাধারণকে) আহা সোন করো না হে তুমরা, সর্দারের কথাটো শুনতে দাও।—চামনার খালের ওপারে-ও দুনিয়া আছে, সেখানেও মানুষ আছে, তারা ত্রিভুবনের যুক্তিটা শুনতে চাহে, হঁ!—ধর্মাধর্ম তুললে চলবে কেনে?

ত্রিভুবন : 'ধর্মাধর্ম তুললে চলবে কেনে'—এতক্ষণে একটা কথা শুনলম বাপের মত সর্দারের মুখ দিকা। ধর্মাধর্ম তুললে চলবেক নাই। ধর্মটা-ক জানতে হবে, অধর্ম-টাকও চিনতে হবে—তবেই তুমি কাজকর্মে বিচার বুদ্ধিটাক্ সামিল করতে পারবে। কথাটোই তো আমি বুলতে পারলম নাই আপনাদের ঠাঁই। অথচ দেখেন কৈফিয়ৎটা আর দিকাই তলব করা হয়েছে,—ইটা আমি কহি ঠিক না। ইটা কোন ধর্ম না।

সমস্বর : বুল কেনে? শুনব আমরা। কহেন দেখি!

ত্রিভুবন : তা সেই ধর্মাধর্মের কথা,—আমি ভুলি নাই। ভুলি নাই, স্বার্থের কারণ।—কেন কি উটা ভুলে আমার জোরটা বাঁধবে কুথায়? কিন্তুক কথাটো ঠিক যে, আমাক ভুলাইতে চাহে। ভুলাইতে চাহে শতেক ঠেলা মারা কথার ধাক্কা মারি মারি সেই সুবুদ্ধিটাক, শয়তানটোর সাথ লড়াই করি করি যাক্ আমি অন্তর অন্তর জানান দিয়ে রেঁখেছি সকলের মঙ্গলের কারণ—যে মানুষের ভাল হোক, কল্যাণ হোক, চামনার খালের নিশানা ছাড়ি তামাম দুনিয়ার অভাবী মানুষের ভাল হোক। কেন কি ত্রিভুবনের ভুবনটা চিরকালই চামনার খালের ওপার দিয়া দিয়া। কূট স্বার্থবুদ্ধি আর আপনকার ভালর অন্তে নিজের গুটিকয়েক স্বজন আর বান্ধব-কে লিয়ে ত্রিভুবন চামনার খালের কাশীবহে ডুবে মরে নাই। তাই আজ দেশের মধ্যে তার পরবাসীর অবস্থা, আপনজন তাক্ চিনতে পারে না।.....

.. তা সে যাউক, কথাটো উঠেছে যে বিষয় নিয়ে সেই বিষয়গত জবাবটো আমাক দিতে হবে। বিষয়টো হইয়েছে—সর্দার ও সর্দারী। গুরুতর বিষয়, কহি কি একটা জরুরী বিষয়। যিনি এই কথাটো উঠাইছেন সভায়, প্রথমতঃ আমি তাক আমার পক্ষ দিকা সাধুবাদ জানাই। কেন কি তিনি গোপন করেন নাই কথা। সংশয় যেটা, সেটা ব্যক্ত করেছেন খোলাখুলি। আমি তাক্ বাহাদুরী দিব।..... দুঃখের দিনে বাঁচবার নিশানা ত্রিভুবন সর্দার দিয়েছে কিনা, সেটা মানষে বুলবে। হঁ, একটা কথা উঠেছে বটে যে একটা গাছের সব পাতাগুলান যখন ঝরতে হইয়েছে, শুকাই গেইছে, তখন সেই গাছের একটা পাতায় এত সবুজের জৌলুষ আসে কোনখান দিকা? কথাটো অবশ্য আমাক ইখানে খাটো করতে কহা হইছে। পঞ্চজনার সভায় আমার পক্ষ দিকা ই কথাটোর জবাব দিতে হবে।... পরথম কথা এই যে চামনার খালের সব পাতাগুলানই যে ঝরতে হইয়েছে, ই কথাটো আমি মানি না। কেন কি এই সভাটাই তার প্রমাণ দিয়েছে। অভাবী অকল দিকা যারা আজ এখানে এঁসেছেন, তেনাদের তেল-চুকচুকা মুখে অভাবের কথাটো নাই।..... (ত্রিভুবনকে সমর্থন করে সভায় হট্টগোল).....দ্বিতীয়তঃ—একটা কথা ইখানে খেয়াল করবেন ভাইসব, যে গাছ অর্থে ইখানে বলা হইয়েছে সমাজদেহটাক্ আর পাতাগুলান অর্থে জনসাধারণ.—সর্দার কিন্তুক তাঁদেরই একজন।

জনৈক চাষী : হঁ হঁ, বুঝা যাইছে।

ত্রিভুবন : তো সেই পাতার কথা, ঝরা পাতা আর সবজা পাতার কথা। আমি কহি কি, সর্দার-কে সবজা থাকিবারই হয়। কি কারণ কহি।—সবজা থাকিবার হয় একটা নিশানার মতন, তামাম হলদা পাতাগুলাক আবার সবজা করিবার দায়ভার নিয়া, যে আবার ঝুরা সবজা হ, আবার ঝুরা ঝাড়া দিয়া উঠেক নতায় পাতায় সবুজের সমারোহ নিয়া শক্ত গাছের বাকল ফুঁড়ে। সুতরাং যুক্তিটা ভুল। ভুল ই কারণ যে কথাটো নিয়ে পুষ্ট হইয়েছে। সুবুদ্ধিটাক নাশ করি সমাজ দেহরূপী বৃক্ষটার-ই মরণ ডেঁকেছে।...

(ত্রিভুবন সর্দারের যুক্তির সমর্থনে হট্টগোল)

তৃতীয়ত : নিম্ন নিম্ন ভুলচুকটার কথা বাদ দিয়ে কিছু লোকের মন ইয়েছে সন্ধ্যেবের ভুল ধরা, সন্ধ্যারির সমালোচনা করা। আমি বলব ইটাও ভুল। আরে বাবা সন্ধ্যেরঠো তো আর রাজটিকা মাথায় নিয়া সংসারে আসে নাই যে, শতেক বিচ্যুতি হইলেও তার সন্ধ্যারিটাক মানিবার লাগে। সন্ধ্যেবের সন্ধ্যারি তুমরাই দিঁয়েছিলে, তুমরাই একদিন তাক মেনে নিয়েছিলে। হয় কি না ?

(যুক্তির সমর্থনে হট্টগোল)

সমস্বর : হঁ, হঁ, ইটা তো সত্য বুলেছে…

ত্রিভুবন : রাখেন—তা আজ যদি বুক সন্ধ্যেরঠো হেজে গেইছে, মজ্যা গেইছে তো সেই সন্ধ্যেরটাক ঘচাপচা ছাতার মত টান মেরে ফেলে দিয়ে একটা নতুন সন্ধ্যার খাড়া করতে তো বাধা নাই তুমাদের। তবু কর না কেনে ? কেন কর না ?

সমস্বর : ইটা তো ঠিক কথাই ; লেজা কথাঠো বুলেছে ;…

ত্রিভুবন : শেষটা করিবার দেন। হঁ, যে কথা বুলন—তবু কর না কেনে ? কর না, কারণ ইটা মিথ্যা কথা, মনগড়া কথা। একটা মিথ্যার পক্ষে লড়াই করতে যে শক্তি লাগে, সেই শক্তিটাক তোমেরা সত্যকে মিলাই তুমি সামিল করতে পার না। কোনদিন কেউ পারে নাই। শাস্ত্রে দেবতার সাথ অসুরের লড়াইটাই তার মস্ত প্রমাণ। মিথ্যা মিথ্যাই, সত্য চিরকালই সত্য। মেঘচাপা সূর্যটাক দেখাই তুমি মিনটাক রাত করতে পার না। সুতরাং কথাটার পিছাটা যদি বা মিলে তো আগা-টা নাই ;—একটা রাত-কে রাত, ধেৎ !…

(ত্রিভুবনের পক্ষে তুমুল সমর্থন)

…পঞ্চজনের সভায় কৈফিয়ৎ-ঠো দিলম, এখন আপনারা সব বুঝ করি দেখেন। আমি একটা বুলব আর অমনি মেনে নিবেন আপনারা, এমন কথা আমি বুলি না।…কাজের কথাঠো শেষটায় এই কহি কি, ইয়ার মধ্যে আমি প্রভঞ্জন সর্দারের সাথ আপনাদের লাহীলাওয়ার কথাঠো নিয়ে কথা একটা বুলছিলাম। হইছে এই চং-এ যে, আজ তামাম মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ তুমি কি আমি, কি আর কেউ, ই কথাঠো অবান্তর। অবান্তর এই কারণ যে সেই কথাঠো ফয়সালা করতে যে সময়ঠো লাগে, এমনই অবস্থা যে সেই সময় আমাদের নাই। ঘর ঘর দুঃখু, ঘর ঘর অনশন অর্দ্ধাশন, প্যাটটিটা দিয়ে মরতে লেগেছে মানুষে—ইয়ার প্রতিবিধান তোমাক একটা করতে হয়। কর

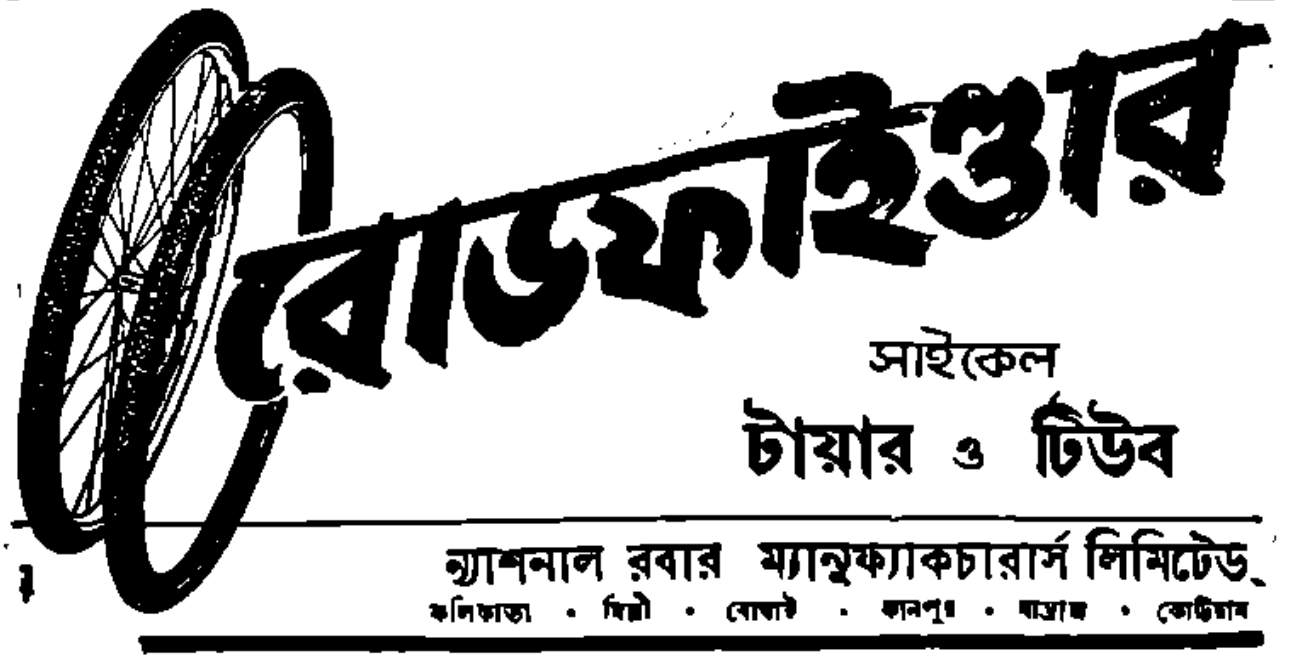

কি টিঁকে গেলে আর নয় তো মরণে। তুমি আমাদের জমীদার, প্রভু, বন্ধুজন, তোমার অনেক আছে, ভগবান তোমাকে অঢেল দিয়েছেন, আজ তোমাকে আমাদের বাঁচাতে হবে। আজকার দিনের এই কথাটাই একটা বড় কথা, কহি কি একমাত্র কথা। এই দায়িত্ব যদি প্রভুজন তুমি পালন করতে না পারো তো ধর্মের কাছে, দেবতার কাছে, মানুষের কাছে, তুমি চিরটা কালের জন্যে দোষী হবে। মরেছে যারা, তারা তোমাকে অভিসম্পাত দিবে, আর মরতে লেগেছে যারা তারাও তোমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আসমান জমিন—দুই-ও তরফে বিচার তোমার একদিন হতেই হবে।…

সমবয় : শুন নিছে ; মিথ্যা বলছে ; চুপ করেন কেনে। চাপি ধরেক।

…কথাটো শুনে প্রভুজন তো পরথমটা ক্ষেপি গেল আমার উপুর। বলে, ত্রিভুবন—আমি তোমাকে লাস বানাইব। আমি বলনু, প্রভুজন, আমাকে তুমি লাস বানাইতে পার, কিন্তুক তামাম মানুষগুলাকে তো তুমি লাস বানাইতে পার না। বুঝ করি কথাটো বলতে হবে, কাঁকা কথায় কি কাম আছে? কথাটো শুনি পর প্রভুজন তো পরথমটা মাথাটা হাতে নিয়া একটুক বসি থাকলো। পরে বলে। আপনি সাত দিন পর আসেন ; সাতটা দিন চিন্তা করি আমি আপনার কথার উত্তর দিব। আজ কিছু বুলব না। আমি তো জানলম, ঘুঁরেছে ওবুঃ! বলনু, বেশ কথা, সাত দিন অন্তেই আসবো। কিষ্টপক্ষের শেষ বুলে আসলম কথা, ঘুরতি গেইলম পরের শুক্লপক্ষে, আরও সাত-দিন সময় নিয়া, পনেরো দিন পর।—নূতন অভিজ্ঞতা, দেখলম আর শুনলম যা স্বপনেও ভাবি নাই। দেখি সর্দারের চোখের কোলটা ভিজা ভিজা, প্রভুজন কাঁদছে।…

সমবয় : (বক্রোক্তি) আহা মরি যাই গ, দুষ্টীরের চক্ষে জল, বিড়াল তপস্বী বটে।

…মনে কয়, প্রভুজনের মত মানুষটো কাঁদছে। বলে, ত্রিভুবনবাবা, আমি ভুল করেছি, আমাকে তুমি ক্ষমা কর। তুমাদের উপুর আমি ঠিক বিচারটো করি নাই। আমি তখন বয়সম চেপে—বিচারটো যখন কর নাই তখন আজ তার খেসারত দাও প্রভুজন! মনুষগুলাকে বাঁচাও। একেবারে চাপি ধরলম কাঁকড়া-ঠোর মতন। দাঁড়াইল উটি। হাতটো বাড়িছিল বন্ধুটার মত। আওরাড়ি কাঁধটো ধরে বন্ধুটার মতই বলে, আমি ই পাপের পেরাচিত্ত করবো ত্রিভুবনবাবা। আমাকে তুমরা ক্ষমা কর। মনে মনে বলনু, ক্ষমা চাইছে ক্ষমা না হয় করলম কিন্তুক বিশ্বাসটো তোমার উপুর মানুষের বর্তায় কেমনে, কর্মগুণ তোমার কিছু নাই প্রভুজন। বলনু কথাটো সাহস করি। একটুকণ চুপ করি বসি বসি থাকল সর্দার। তারপর উটি চলি গেল। আবার ঘুরতি আসল। ছটকটানি যে একটা ধরে গেইছে অন্তরে ইটা বুঝলম। বসি আছি বসি আছি—হঠাৎ হুঁকাড় দিয়া উঠল, লুটে দিব। যা কিছু আছে সব আমি লুটে দিব মানুষের ঠাঁই, যাতে করি এই অপযশ আমার চিরতরে মুছি যায় ধরাধাম থিকা। কি করিবার পারি তুমি আমাকে বুল ত্রিভুবন দাদা। আমি তখন বলনু, কাম যাও। ভাত চাহি না, কাম চাহি। আমাদিগে তুমি বেকমদা খাওয়াইবা কেনে, আর আমি-ই বা তুমার ভাত মিনি মাগনা খাব কেনে? হাত আছে, আমরা সতর খাটি খাব। তামাম অভাবী মানুষের কাম চাহি আমি। তুমি সড়ক বনাইছ, দিল করছ, ব্যবসা ফাঁদছ, কারখানা চালু করছ—তুমি আমাদিগে কাম দাও।…

সমবয় : (হট্টগোল) একটা কামের কথা হইছে বটে ; মিনিমাগনা দিব কেনে, ভিক্ষুক আছি নাকি?

…তখনই আমলা গোমস্তাক ডাকি কি যেন সব বলাবলি করল,—সে জোর সলা ;—তর্কাতর্কি, ঝগড়া ঝগড়ি, নালিশ কৈফত—যাই হোক একটু পর ঘুরতি আসি বলে, আমি সিদ্ধান্ত নিলম ত্রিভুবনবাবা। তামাম অভাবী মানুষের কাম দিব আমি।—চাহি কি, তোমার কারখানার মুনাফার উপুর কিছু অংশের দাবিদাওয়া-ও

আমি ভামিনওলাক দিয়া দিব, কথা দিলম।…আমি বুল্লম, কথাটোর তো এখন আর চিড়া ভিজবে না প্রভঞ্জন, অগ্রে তুমি সকলকে ডেঁকে এনে সদাসরি কামে বহাল দাও। কামে বহাল দাও আর অগ্রিম কিছু টাকা দাও হাতে হাতে। ঁাকা কথার দিন নাই গ; আমরা দুঃখের উত্তল চাহি। যে প্রস্তাব সেই পাখ—বুল্ল, পাঠান কেনে সকলকে কাছারী বাড়ী —আমি তাই দিব—আজই দিব—হাতে নাতে দিব।

সকারিয়া : বড়যন্ত্রটা খুবই পাকা। ধরিবার কল নাই।

ধনাই : ই পাল্লাটো আর ও দড় হে। প্রভঞ্জন আমাক একা করতা করতে চেয়েছিল, আর ই সর্দারটো দেখি তামাম মানুষগুলাক করতা করিবার চাহে, ঁাই দেখ !!

সমস্বর : (স্বপক্ষে) চুপ যা কেনে, মেড়াটা। কথার একটা মাথা নাই,…যাচাই করি নিব নাই ?

ত্রিভুবন : (ধনাকে লক্ষ্য করে) ধনাই দাও ধরপাইসটাক।…দাও ওয়াক দুইটা থাপ্পড়, বুঝু ঁাহিকা !… যাও, তোমরা সব কাছারী বাড়ী যাও। প্রভঞ্জন সর্দার তোমাদিগে স্মরণ করেছেন গ। যাও সব, কাম পাবে—টাকা পাবে—মিঠাই-মণ্ডা খাওয়া হবে !—কাছারী বাড়ী যান কেনে ? (ঢোল পড়ে) কাছারী বাড়ী !!

(ত্রিভুবনের প্রস্থান)

(কাছারী বাড়ীর উদ্দেশে জনতা হর্ষধ্বনি করে। মিছিলের আগে চাকঢোল কাঁসি বাজিয়ে চলে বহুরূপীর দল। খানতলায় এবার দেবীপূজার আর কোন বাধা নেই।)

(গান)

সমস্বর : চল কেনে কৈলাসে……

সকারিয়া : আগের কালে আমাদের দেবতা ব্রাহ্মণের বেশ ধরে এসে মর্ত্তভূমে মানুষকে ছলনা করতেন। শাস্ত্রে পুরানে আপনারা তেনাদের কথাটো শুনেছেন—আজগের দিনে সেই মানুষ চলেছে বহুরূপীর বেশ ধরে দেবতাটাক ছলনা করতে, কেন কি প্রভঞ্জনের স্বর্গের সীমানাটো দিনকে দিন যে রকম বেড়ে যাইছে তাতে করি মর্ত্তধামে মানুষের বসবাসের আর কোন উপায় থাকবেক নাই—

ঐকতান : চল কেনে কৈলাসে…

(গীতবাদ্য সহকারে বহুরূপীদলকে অগ্রবর্তী করে এগিয়ে চলে হর্ষোৎফুল্ল জনতা)

—ভিমারের সাহায্যে আলো ফুটিয়ে পর্দা—

চতুর্থ অঙ্ক

—প্রথম দৃশ্য—

[প্রভঞ্জনের খামার বাড়ী। পিছন দিকে একটা উঁচু বেদীতে দাঁড়িয়ে প্রভঞ্জন ও ত্রিভুবন কথা বলছে।]

প্রভঞ্জন : তুমি পার না ?

ত্রিভুবন : না।

প্রভঞ্জন : পার না !!

ত্রিভুবন : না।

প্রভঞ্জন : না !!

ত্রিভুবন : না।—পারতম, কিন্তুক এখন আর সম্ভব না। কেন কি আপোষরফার সবগুলান-পথ, সে ইচ্ছায়-ই হোক আর অনিচ্ছায়-ই হোক,—অনিচ্ছায় হোক-ই বা আমি কি করে যখন আমি জানি যে তুমি জেনে শুনে আমার প্রতিটা কথার প্রতিবাদী হইয়েছে, আমি যদি বুলেছি না—তেন সেটাই তুমি আস্ত ঘাড়াই আসি করেছ ই, আর যখন বুলেছি ই, কর ইটা তখনই সেটা তুমি নাকচ করে দিয়েছ,—সলা করি, যুক্তি করি, একটা কাজ তুমি আমাক করিবার দাও নাই, তুমি,—আজ বুলছ…

প্রভঞ্জন : ইটা ভুল কথা।

ত্রিভুবন : না, ইটাই কথা। বয়ঃ তম গুণে তুমি এমনই মোহান্ধ বটে যে নিজের মঙ্গলামঙ্গল পর্যন্ত বুঝতে পার নাই।

(নেপথ্যে ঢাক ঢোল সহ বহুরূপীর নৃত্যের সমারোহ)

প্রভঞ্জন : তার হিসাব তুমি এখন করতে এসেছ আমার সাথ ?

ত্রিভুবন : না, আমাকে তুমি কেন হিসাব দেখাবে। আমি চলে যাইছি, এখনই। হিসাব যারা চাহে তারা আসছে। তুমি তাদিগের সাথ মুকাবালা কর গিয়া।

(প্রস্থানোদ্যত)

প্রভঞ্জন : (ধমকে) ত্রিভুবন ! (ভয়ে) ত্রিভুবন ! আমাকে তুমি ভয় দেখাইছ ত্রিভুবন।

ত্রিভুবন : ভয়কে তুমি তড়াশ লাগাও প্রভঞ্জন, তোমাকে আমি কি ভয় দেখাইতে পারি ? আমি বুলছিলাম একটা কথা, তোমারই মঙ্গলামঙ্গলের কারণ। কিন্তুক যে মরতে চায় তাকে আমি বাঁচাই কি মতে। আমি কি করি ? দুই হাতে বুকটাক ফেঁড়ে রাম নাম দেখাইতম, এমন প্রকৃতি আমার নাই। নচেৎ দেখতা চায় অন্তরের একটি বচন—তুমার নামটাই লিখা আছে সেইখানে। তুমি আমাকে বুঝনা না প্রভঞ্জন !

প্রভঞ্জন : কি করিবার চাহ তবে ?

ত্রিভুবন : পঞ্চায়েৎ সভাটাক তোমাকে পরবশতঃ স্বীকার মানতে হবে। পর পর দুই সন অজন্মা, আর এই আক্রার বাজারে মানষের হাতে নাই পায়সা—মানুষ জন সব ক্ষেপি গেইছে। আমি কহি দেবামতে যখন হাও তুমি তাদিগে জমীতে। তারা বুলছে, পঞ্চায়েতি খামার বানাবে, খামাক তারা পঞ্চায়েতি খামার। বেনামীতে যে সব জমীর মালিকানা রেখেছ তুমি, বাঁটি হাও সেই জমী প্রজাসত্বমতে তাদিগের ভিতর। বিশ্বাসে আশ্বাস আসবে ; নিশ্বাস নিবার সময় পাবে তুমি। তারপর…

(নেপথ্যে ঢাক ঢোল সহ বহুরূপীর নাচের শব্দ আস্তে আস্তে লয়)

প্রভঞ্জন : তারপর !!

(প্রভঞ্জনের মুখের ওপর আলোটা কাঁপতে কাঁপতে মিলিয়ে যেতেই অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় গোটা মঞ্চ। বহুরূপীর নাচ ও বাদ্য চলে ক্ষণকালের জন্য। আর অকস্মাৎ সব কিছু থেমে যায়। আলোক সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে গোটা পঞ্চায়েৎ সভা পরিদৃশ্যমান হয়। বহুরূপীর নাচ ও ঢাক ঢোলের বাজনা মিশ্রিত হতে হতে থেমে যায় নেপথ্যে।

মঞ্চ সংস্থাপন মোটামুটি এইরূপ। মঞ্চের বাঁ দিকে একটা উচ্চবেদীতে—প্রভঞ্জন, ত্রিভুবন, পুরোহিত ইত্যাদি। তার সামনে প্রবীণ পঞ্চায়েৎ নেতৃবৃন্দ। এ ওকে ধাক্কাধাক্কি করে আশপাশ, সামনে—চেপে বসেছে জন-সাধারণ। যখন যে অংশ মঞ্চে মুখর, তখন সেই অংশের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আলোকসম্পাতের আপেক্ষিক কলা কৌশল।

বহুরূপীর নাচগান নিস্তব্ধ হলেও বহুরূপী এই দৃশ্যের নেপথ্যে বিধাতা। তাই ধানতলায় দেবী পূজার অনারব্ধ অকাল বোধন, মঞ্চের পটভূমিতে সংস্থাপিত দেবীর আলুলায়িত কেশদাম ঘিরে ঘূর্ণচক্রাভাস)

পঞ্চায়েৎ সভা

ঋষির প্রবীণ রঘুনাথ বাউরী : ই সমাজ আর পঞ্চায়েতের কালাকাল সমান সমান। ছা-ও কাল ধিকা দেখেছি কি গ্রামের ভিতর কোথাও কোন ঝগড়া কি মারামারি হইয়েছে, কি কোন ঘরে বউ ঝিটি কলঙ্কিনী হইতেছে, কি কোন সামাজিক ব্যবহৃত পূজা অনুষ্ঠানে ব্যাঘাটো হইয়েছে—অমনি তখন পঞ্চায়েতের ডাক পড়তো। পাঁচগ্রামের ষোড়ল মাতব্বর একজোট হইয়ে তার একটা বিধি ব্যবস্থার নিশানা দিতেন।—সজ্জন জমীদার কি রাজালোক যিনি থাকতেন, তিনি সেই সভায় থেকে পঞ্চায়েৎ সভার মোড়লী করতেন কেন কি তিনি ছিলেন সকল ষোড়ল মাতব্বরের আদ্যাভাজন, শুরুস্থানীয়—সকলে বিচার করি তেনার কথার সায় দিতেন ;—ধরম ছাড়া করম ছিল না তেনার,—ওঁকে ভক্তি করতো সকলে দেবতার মতন। —আজ ঘটনা চক্রে অবস্থাটো এমনি হইয়েছে যে ওঁকে এখন আর মানবে বিশ্বাস করে না, কেন কি তিনি অনাচারী হইয়েছেন। —ধরম করম এখন আর

ওঁর মাথাত নাই,—হক্ক ইইয়েছেন হক্ক ;—তাই তেনার বিচারের কারণ পঞ্চায়েৎ সভার আজ এই বৈঠক ডাকা ইইয়েছে। ই একটা নূতন সভা। নূতন সভা কহি ই কারণে যে এই সভায় ধর্ম্মাধিকরণের বিচার করিবার হয়। পঞ্চায়েতি মতে দশজনই এই সভার ধর্ম্মাবতার। ধর্ম্মাধিকরণ যদ্যপি অন্যচারী হন, অধার্ম্মিক হন, তো দশজনই আজ ওঁর বিচার করবে। ই একটা দায়িত্বের কথা, হুঁস করি বিচারঠো করিবার হয়। তাই কথা উঠলে আপনারা সোরগোল উঠাইবেন না, মেজাজ চড়াইবেন না,—প্রভঞ্জন সর্দ্দারের বাদী, কি প্রতিবাদী—তেনারা ইখানে উপস্থিত আছেন, তেনারা শান্তিমতে তেনাদের সকল কথা বলবেন, শুনবেন—তারপর দশজন মোড়ল মাতব্বর পরামর্শ করি বিচার করি তেনাদের রায় দিবেন। —কি বুঝলম, আর কি কথা।

সমবয় : না, ঠিকই বুলেছেন। আর কোন কথা নাই।

দশরথ বাউরী : তো ইবার কথা শুনতম এক এক করি। বিষয় নির্ব্বাচনঠো কি করেছ হে দিগম্বর ?

প্রবীণ দিগম্বর সাঁওতাল : পরথম বিষয় ই কথা কহি কি…

(দিগম্বর সাঁওতাল-কে বাধা দিয়ে এক জোয়ান বাউরী চাষী কথা বলে)।

তরুণ বাউরী পুত্র : টাঙ্গিটাক্ সাথেই আনছিলম—এখন রায়-টা হলে হয়—দেখতম শয়তানটাক্।

(তরুণ যুবা সকলের সাড়া কাড়ে কিন্তু ক্ষুব্ধ হয় দশরথ বাউরী)।

দশরথ বাউরী : (হট্টগোল থামিয়ে) রাখেন দেখি,—কথাঠো কার। কে বুলছে বলীর কথাঠো ?

অনেক যুবা : ঘুঘুয়া বুলছে।

দশরথ : ঘুঘুয়া। ইদিক আয়।… (এগিয়ে যায় তরুণ বাউরী)…টাঙ্গিটাক্ দে।…(টাঙ্গিটা বৃদ্ধের হাতে দেয়)…মাথাঠো দিলা ?……(ঘুঘুয়া ইতস্তঃ করে) দিলা মাথাঠো কহি।…

(ঘুঘুয়া মাথা পেতে দিলে দশরথ টাঙ্গি তোলে কোপ দেবে ব'লে ; তারপর কি মনে করে ছুঁড়ে ফেলে দেয় টাঙ্গি—পাথরে লেগে ধাতব শব্দ সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়)।

…দশজন ধর্ম্মাবতার, আমি ঘুঘুয়াক্ ই সভা ছেড়ে চলে যেতে কহি।……দূর যা !

(মাথা নীচু করে বেরিয়ে যায় ঘুঘুয়া)

…ত্রিভুবন !

ত্রিভুবন : কহেন সর্দ্দার কি কথা।

দশরথ : কথা নাই কাম আছে। প্রভঞ্জন সর্দ্দারের সাথ বুঝ করতে এসেছি আমরা। সর্দ্দারকে ডাক।

ত্রিভুবন : ইটাই আমি চেয়েছিলম। কেন কি হাত পেতে ভিক্ষা চেয়েছেন যারা একদিন, ভিক্ষা চেয়েছেন অথচ যুক্তি চলে গেছেন ভিক্ষুকের মত—তাঁরা একদিন আমি জানতম ঠিক যুক্তি আনবেন কঠিন দাবীদার ইইয়ে। সুতরাং প্রভঞ্জনকে আজ জবাবদিহি হতেই হবে।

সকারিয়া : আমরা প্রভঞ্জনের কথা শুনিবার চাহি।

ত্রিভুবন : নিশ্চয় শুনিবেন। সব-ও বার শুনিবেন। আপনাদের জোরে আমার বুকে আজ দশ হাতির বল। আমি এখনই প্রভঞ্জনকে আপনাদের সামনে এনে হাজির করবো। তবে একটা কথা—আর কথা না। কথা প্রভঞ্জন অনেক বুলেছে। পঞ্চায়নার সভায় আজ তাক কবুল করতে হবে দশজনের অধিকার। প্রভঞ্জন ! (ভীমাকে) ডাক প্রভঞ্জনকে !

ভীমা : আইজ্ঞা সর্দ্দার…

ত্রিভুবন : তোমাকে যা বুলম ডাকো প্রভঞ্জনকে।

(নেপথ্যে ঢাক ঢোল সমেত বহুরূপীর ঐক্যতান—চল কেনে কৈলাসে…)

(প্রভঞ্জনের প্রবেশ)

প্রভঞ্জন : (জোড়করে) কহেন কেনে, কহেন কেনে…

ত্রিভুবন : প্রভঞ্জন, এনারা সব এসেছেন, এনাদের পক্ষ থিকা আমি তোমাক কয়টা কথা বুলতে চাই।

প্রতজন : বুঝেন কেমে !

ত্রিভুবন : দেখ, তুমি আমাদের সর্দ্দার। একদিন আমরাই তোমাকে সর্দ্দারি দিয়েছিলম। এখনও আমরা তোমার সর্দ্দারি-টাক্ মানলে রাজী আছি, যদিচ তুমি এই সভায় সকলকার বারটো বজাল কর ; স্বার্থগন্ধী কুবুদ্ধিটাকে পরিহার করি দশের মঙ্গল কবুল কর। আমরা তোমার মুখ থিকা এই প্রশ্নের সাফ জবাব শুনতে চাই।

প্রতজন : সাফ জবাবটাই দিতম। কহেন কি কবুল করতে হবে।

ত্রিভুবন : (দশরথকে) কথা উঠান কেনে সর্দ্দার !

দশরথ : চাঁদনার খালের এপার ওপার দিয়া তুমি কি পতিত যতেক জমী আছে তুমার তাঁবে, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা মতে সেই সব জমীতে পঞ্চায়েৎ খামার চালু করিবার হয় ; আর সেই জমী থিকা যে ফসল উঠবে, সেই ফসলের ভাগ বাঁটোয়ারা পঞ্চায়েতি সর্ত্তমতে কবুল করিবার হয়—ইটা পরথম কথা।

প্রতজন : স্বীকার মানলম।

দশরথ : তুমিরন আর কর্জ্জার টাকা সরকার দিঁয়েছে, সরকার দিবে, পঞ্চায়েৎ সচা তার বাঁটোয়ারা করবে,—তার পর দারিদ্ব উপসর্গ সব পঞ্চায়েতের, তাত তুমার কোন এক্তিয়ার নাই।

প্রতজন : মানলম।

দশরথ : এতাবৎ খতবন্দী হিসাবে টিপছাপ দিয়ে যে সব ভূঁইচাষী প্রজাকে উঠবন্দী করান হঁয়েছে, উচ্ছেদ করা হঁয়েছে জমী থিকা তাদিগের সকলকে আবার জমীতে বসল দিতে হবে প্রজাসত্ব মতে। এখন থিকা তারা সরাসরি কাছারীতে খাজনা দিবে, মধ্যসত্বভোগী থাকবেক নাই।

প্রতজন : থাকবেক নাই।

(দশরথ বাউরীর প্রস্তাব সমর্থনে হট্টগোল)

দশরথ : কি বুলম, আর কি কথা ! দিগর কিছু বুল কেনে ?

মংলা : কথা আছে, আরও কথা আছে।

পঞ্চজনার সভায় ই সব কথা যা বলা হয়েছে ই সব তো গেল ভবিষ্যতের কথা। কি নীতি মতে এখন বিকা কামকাজ করা হবে না হবে, সেই নীতির কথা। এই চিঙ্কা ভিজবে, তবে খাবে মানুষে। কিন্তুক এখন তো আমরা নাচার হয়েছি। ত্রিভুবন সর্দার আমাদিগে কাছারী ঘড়ী ডেঁকেছেন। কেন ডেকেছেন, কি কারণে ডেঁকেছেন, তিনি-ই ভাল বুঝবেন। সে কথা আমি ইখানে আর তুলব নাই। তবে পঞ্চজনার পক্ষ থিকা আমার ইখানে একটা কথা আছে। কথাটো এই যে তামাম অভাগী মানুষ আজ যখন প্যাটচিটা দিয়ে মরতে বসেছে, তখন তাদের খোরাকী বাবদ ধর্মগোলার ধান এখনই বাঁট করি দেয়া হোক।

(প্রস্তাবের সমর্থনে ভীষণ হট্টগোল)

প্রভঞ্জন : ইটা অসম্ভব কথা। ধর্মগোলার ধান পূজার ধান, মহোৎসবের সময় দেবীর ভোগরাগের পর নরনারায়ণের সেবায় লাগে। সেবায়িতের আজ্ঞা ভিন্ন ধর্মগোলার হাত দিবার কারো কোন একতিয়ার নাই।

মংলা : পঞ্চায়েতের একতিয়ার আছে।

প্রভঞ্জন : না।

দিগম্বর : আমি কহি দুই বছর কাল যখন মহোৎসব বন্ধ আছে তখন সেবায়িতঠাকুর যাঁজ্ঞা করেন তো ধর্মঠাকুরের পূজাঅন্তে ধর্মগোলার মজুত ধান নরনারায়ণের সেবায় লাগতে পারে।—আছেন তো বুলেন কেনে সেবায়িতঠাকুর!

ত্রিভুবন : সনাতনঠাকুর বুল কেনে?

পুরোহিত : হঁ, ইটা একটা কথা বটে। গত বছরও ধর্মঠাকুরের থানে পূজা হয় নাই। তাতে করি মনে ভাবি গোসা করেছেন দেবতা। রুষ্ট হয়েছেন দেবী। ঘর ঘর যে সব অনশন অর্দ্ধাশনের কথা শুনতে পাই, মন করি ই সব ভোগান্তিক সেই পাতকেরই সুনিশ্চিত কারণ, তবে ইখানে আমার কথাটো এই যে সেই পূজাপার্ব্বণের-ও কালাকাল আছে, দিনক্ষণ মুহূর্ত্ত আছে। ধর্মঠাকুরের উপুর পঞ্চায়েতের বিধান চালু করি কি তুমরা পঞ্জিকার বিধান উল্টাপাল্টা করিবার চাহ? ধর্ম্মাধর্ম্ম তুলসে তো চলবেক্ নাই।

প্রভঞ্জন : রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হইতে দিব নাই।

মংলা : কে রাজা, কার রাজ্য?

দশরথ : সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে দেবী···

প্রভঞ্জন : দেবতার অভিসম্পাত তামাম মানবের মাথার উপুর টেনে নাথাতে চাহ তুমরা,—ইটা কেমন কথা?

দশরথ : অভিসম্পাত না, আমি কহি আশীর্ব্বাদ। দেবতার পূজা কালে অকালে সকল সময় হইতে পারে। অকাল বোধনটার কথা তুল্যা যাইছ তুমরা।

প্রভঞ্জন : সে করেছিলেন এক রামচন্দ্র।

মংলা : তা সে আমরাও করবো অকাল বোধন। একশত আটঠো নীলোৎপল লাগে তো তাই দিব। আজই পূজা, আজই সেবা। ধর্মগোলা খুলি দাও।

সমস্বর : খুলি দাও ধর্মগোলা।

প্রভঞ্জন : না, ধর্মগোলা খুলি দিব নাই।

সকারিয়া : ধর্মগোলা খুলি দাও।

প্রভঞ্জন : না।

মংলা : খুলি দাও কহি ধর্মগোলা।

প্রভঞ্জন : দিব নাই।

মংলা : প্রভঞ্জন !!

প্রভঞ্জন : ত্রিভুবন !!

সমস্বর : ধর্মগোলা·····

(ধর্মগোলার দিকে ধাবিত হয় জনতা। যুগপৎ ঢাক ঢোল কবতালসহ বহুকণ্ঠীর গান—চল কেনে কৈলাসে সহ নৃত্য সুরু হয় নেপথ্যে)।

পরমুহূর্ত্তেই স্তব্ধ হয়ে যায় জনতা। নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে তারা চেয়ে দেখে মংলাকে; সিঁড়ি বয়ে সে ধর্মগোলার ভেতর থেকে হেয়ার দেহ দু'হাতে বয়ে নীচে নেমে আসছে।

পাথর জনতা। সতীর দেহভার নিয়ে এগিয়ে আসে মংলা সামনের দিকে। একটি আলোক রশ্মি কাঁপতে কাঁপতে নিভে যায় সতীর চোখে মুখে।

যুগপৎ ঘুরে যায় দেবীমূর্ত্তি—পটভূমিতে যিনি এতক্ষণ আলুলায়িত কেশভার এলিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

সামনে দেহনে এখন আর কিছুই পরিদৃশ্যমান নয়। জনতা নেই, প্রবীণ নেতৃগণ নেই, প্রভঞ্জন নেই, ত্রিভুবন নেই, মংলা নেই, সতী নেই -কেউ নেই; আছে শুধু দেবীমূর্ত্তি। এগিয়ে আসে কালীমূর্ত্তি। [যবনিকা]

—যবনিকা—

ব্যবধান

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

এ পথ দিয়ে আরতি সচরাচর হাঁটে না। হাঁটবার দরকারই হয় না। আজ কিন্তু নিরুপায় হয়েই এই গলিতে ঢুকতে হল, এই পরাশর পতিতুণ্ডি লেনে।

বিরাট মিছিল চলেছে রাজপথ দিয়ে। ট্রাম, বাস সব বন্ধ। মিছিলের যা আয়তন, তাতে ঘণ্টা খানেকের মধ্যে ট্রাম বাস চালু হবে, এমন ভরসা কম। আরতি বাসে ছিল। ছুটির দিন। স্কুল নেই, ছাত্রী পড়ানোও নয়। একটু এদিক ওদিক বেড়াতে বেরিয়েছিল। হালকা মার্কেটিং। উলের কাঁটা, রুমাল, একটা কেস ক্রীম, এই সব টুকিটাকি কেনা।

কিন্তু অদৃষ্ট। বসে বসে বিরক্ত হয়ে আরতি নেমে পড়ল। দু'একজন লোক এই বাই লেন দিয়ে যাতায়াত করছে। তাদের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে আরতি জানল এই গলি দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ওধারের বড় রাস্তা থেকে বাস ধরতে পারলে মিছিলটা এড়ানো যেতে পারে।

কলকাতায় শুধু আরতির নয়, তার তিনপুরুষের বাস, কিন্তু তবু প্রতিদিন অক্টোপাশের মতন আটদিকে বাহু বাড়িয়ে শহর বেড়ে চলেছে। সপ্তাহে সপ্তাহে তার নব নব রূপ। কাজেই সব গলি, সব উপগলি চেনা সম্ভব নয়।

চলতে চলতেই আরতি থেমে গেল। পিছন থেকে নাম ধরে কে একজন যেন ডাকছে। নিশ্চয় পরিচিত কেউ।

আরে আরতি না?

আরতি ঘুরে দাঁড়াল, দাঁড়িয়েই অবাক।

একটা বাড়ীর দাওয়ায় হৃষ্টপুষ্ট একটি ভদ্রলোক। মাথার দুপাশে দ্বিতীয়ার চাঁদের মতন টাকের ইশারা। দুগালেও দাড়ির খোঁচা। পরনে সবুজ ছিট এক সেট্ আর আধময়লা ধুতি লুঙ্গির ধরনে। একহাতে একটি খবরের কাগজ আর এক হাতে একটি শিশুর হাত। দাওয়ার ওপর ছড়ানো মুড়িগুলো শিশুটি নির্বিবাদে, নিরুদ্বেগে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

একবার আরতি ভাবল সম্ভবত তার নামেরই কোন মেয়ে ওই বাড়ীতে আছে, ভদ্রলোক তাকেই ডাকছে কিন্তু চোখাচোখি হ'তেই ভদ্রলোক আরতিকেই হাতছানি দিয়ে ডাকল।

আরতি কিশোরী নয়। যৌবনও প্রায় অস্তাচলে, অবশ্য যদি বুড়িতেই বুড়ী হওয়ার প্রবাদ-বাক্য মানতে হয়। কাজেই দিনদুপুরে পুরুষমানুষ ডাকলে মূর্ছা যাবে এমন আশঙ্কা ছিল না।

তাই সে আস্তে আস্তে এগিয়ে লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

আমায় ডাকছেন?

লোকটি ভ্রূ কুঁচকে আরতির আপাদমস্তক আর একবার দেখল। তারপর সহাস্যে বলল, কি চিনতে পারছ না আমাকে?

এতক্ষণ আরতি চিনতে পারেনি, লোকটি হাসতে, এইবার পারল। সেদো দিয়ে বাঁধানো একটা দাঁত আর চোখ কুঁচকে হাসার ভঙ্গীটা খুব পুরোনো, খুব চেনা। একটু স্মৃতিমন্থন করতেই মনে পড়ে গেল।

কিন্তু তাও কি সম্ভব। সেই লিকলিকে বেতের মতন চেহারার আজ এ কি রূপান্তর। ঝলমলে শরীর, কোমরের দুপাশে অতিরিক্ত মেদের সঞ্চার, একমাথা কুঞ্চিত কেশরাশির কয়েকমুঠো নির্মম অবশিষ্ট। এত সম্পদ সময় এত দ্রুত হরণ করে নিল।

একটু বিষাদজড়িত কণ্ঠে আরতি বলল, সুদর্শন, সুদর্শন রায়।

ভদ্রলোক সলজ্জে হেসে উঠল, আর সুদর্শন। দেখছ তো চেহারার অবস্থা। আগে যাকে টেনিস র‍্যাকেট হাতে মানাত, আজ তার হাতে গদা ছাড়া আর কিছু মানায় না। অনেকদিন হয়ে গেল। অ-নে-ক দিন।

শেষ দিকের কথাগুলো টেনে টেনে বলল, ব্যবধানটা বোঝাবার জন্য।

সুদর্শনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আরতির নতুন করে মনে পড়ল সত্যি অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেছে এর মধ্যে। সুদর্শন বদলেছে আর আরতি বুঝি বদলায় নি। সেই কলেজ জীবনের মতন লঘুপক্ষ তন্বী আছে! সামান্য আনমনা চঞ্চল, সুখে আত্মহারা। সংসারে থেকেও তাদের সংসারের কায়া মাখে নি।

এদিকে কোথায়?

সুদর্শনের ভারি গলার আওয়াজে আরতির চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল। হেসে বলল, ওদিকে কিসের একটা মিছিল চলেছে, সব বন্ধ। তাই বাস থেকে নেমে ভাবলাম short cut করি।

সুদর্শন সর্বশরীর কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তারপর বোঝো, short cut is often a wrong cut. একেবারে আমার মুখোমুখি এসে পড়লে।

কথাটা সুদর্শন কি ভেবে বলেছিল কে জানে, আরতি কিন্তু গম্ভীর, নীরক্ত হয়ে গেল।

প্রথম আলাপে সুদর্শন ঠিক এই কথাই বলেছিল। অবিকল এই কথাগুলো।

একটা ক্লাশ শেষ করে আরতি আর একটা ক্লাশে যাচ্ছিল। একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে করিডর দিয়ে না গিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে কোণাকুণি পথ ধরেছিল। কি একটা কারণে বেশ একটু অন্যমনস্কও ছিল। চলতে চলতে ইঁট ঠোক্কর খেয়ে একেবারে সুদর্শনের গায়ের ওপর।

অবশ্য ওরকম আছাড় সুদর্শনের খাবার কথা নয়। সুদর্শনের কেন, কারুরই কথা নয়, কিন্তু সুদর্শন ছিল। রোদের আড়ালে বসে টেনিস সম্বন্ধে একটা বই পড়ছিল, আচমকা গায়ের ওপর আরতি গিয়ে পড়তে চেঁচিয়ে উঠল, by jove, করছেন কি আপনি?

লজ্জিত, বিব্রত আরতি বলেছিল, short cut করছিলাম।

সুদর্শন আরতির অবস্থা দেখে হেসে ফেলে বলেছিল, জানেন না short cut is often a wrong cut.

সেই আলাপ থেকে শুরু, তারপর পথে, ঘাটে, সভা সমিতিতে, কলেজের করিডরে দুজনে এক সঙ্গে। আশপাশের সতীর্থদের বাক্যোক্তি, হাসি, টিটকারি সব তাদের নিস্পৃহতার কঠিন বর্মে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেছে।

টেনিস টুর্নামেন্টে শুধু যাওয়া নয়, ছাত্রদের সঙ্গে আরতি সমানে চেঁচিয়েছে সুদর্শনকে উৎসাহ দিয়ে। তার জন্যি কিংবা হাত আশ-এর তাগিদে করতালি দুই করেছে। সুদর্শনের পাওয়া কাপ নিজে বাড়ীতে নিয়ে গেছে।

ছুটির দিনও দুজনে দেখা করেছে।

কোনদিন দক্ষিণেশ্বর, কোনদিন বোটানিকস্, কোনদিন ট্রেনে চড়ে ছোটখাটো কোন স্টেশনে। কাজের কোন কথা নয়, মনের এমন অবস্থায় অকাজের কথাই বেশী হয়। অর্থহীন কথায় পাগল।

এই রকম বেড়াতে বেড়াতেই একদিন সুবর্শন বলল।

গঙ্গার চালু পারের ওপর বসে দুজনে পালতোলা নৌকা গুণছিল, হঠাৎ সুবর্শন আরতির একটা হাত চেপে ধরেছিল, এই, একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।

আমি তো কাছেই রয়েছি। কানে কম শুনি, এমন বদনামও আমার নেই, তার জন্য অমন-ভাবে দুটি মুঠিতে কব্জি ধরেছ কেন?

সুবর্শন হেসেছে। বলেছে, বলতে চেয়েছি, ওরে মোর মুঠি ছাড়াবি কি করে? না চাললেও নয়, একটা খুব কাজের কথা রয়েছে।

কি বল।

কলেজের জীবন চিরকালের নয়। এর পর আমাদের দুজনকে পৃথিবীতে প্রবেশ করতে হবে। দুজনে দুটো সংসারের বাধ, দুজন মানুষকে কেন্দ্র করে আমাদের ভবিষ্যত জীবন গড়ে উঠবে। হয়তো আর কোনদিন দেখাই হবে না।

খুব স্বাভাবিক। অনেক দূরের ভবিষ্য-ভাবের দিকে চেয়ে আরতি বলেছিল।

না, তা হতে দেব না। আরতির হাতের কব্জিতে আরো চাপ দিয়ে সুবর্শন চেঁচিয়ে উঠেছিল।

উঃ, ছাড়, ছাড়, আমার কব্জিটা তোমার টেনিস র‍্যাকেটের হ্যাণ্ডেল নয়।

অপ্রস্তুত সুবর্শন হাতটা ছেড়ে দিয়ে বলল, লাগল?

সে কথার উত্তর না দিয়ে আরতি জিজ্ঞাসা করল, কি বলছিলে বল?

বলছিলাম তোমাকে আমার চাই। তোমাকে আমি আর কারও সংসারে যেতে দেব না। তুমি আমার।

আকাশে দু একটা নক্ষত্র। আলো-আঁধারে এদিকটা যেন রহস্যাচ্ছন্ন। কিছু আলো, কিছু অন্ধকারে সুবর্শনকে ভাল করে দেখা যায় নি, শুধু তার দৃঢ় সবল কণ্ঠস্বর বাতাসকে আলোড়িত করে তুলেছিল।

রতি। খুব মৃদু কোমল কণ্ঠে সুবর্শন বলেছিল।

এবার আরতি আপত্তি করেছিল, না, না, ওভাবে অত নীচু গলায় তুমি কথা বলবে না। তোমার চাইবারও সুরও ভিন্ন হবে। তুমি এদেশের হাজার হাজার মেরুদণ্ডহীন লাজুক ছেলের মতন মিনমিনে ভাষায় প্রেম করবে না সুবর্শন, তুমি বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী কর, নেটের কাছে উঁচু বল পেলে হার্ড আপে তার উত্তর দাও, একশ মিটারের দৌড়ের রেকর্ড এখনও তোমার, তুমি যা বলবে উঁচু গলায় বল। বীরের মতন।

ঠিক আছে, সুবর্শন সোজা হয়ে বসল, ভারি, অকম্পিত কণ্ঠে বলল, তোমাকে আমার চাই, বল তুমি আমার প্রতীক্ষা করবে।

করব। আরতি সমান দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল।

এসব অনেক দিনের কথা। এ সময়, এ বয়স আরতি পায়ে পায়ে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে।

এসে যখন পড়েছ, সুদর্শন শরীর কাঁপিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তখন ছাড়ছি না। উঠে এস ওপরে। আজ ছুটির দিন কিছুক্ষণ বসে বসে গল্প করা যাবে।

বোধহয় সুদর্শনের চীৎকারে ভিতর থেকে একটি মহিলা আলুথালু বেশে বেরিয়ে এসেই চমকে দাঁড়াল। একটা হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি ঘোমটা টেনে নিয়ে সুদর্শনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

সেই ফাঁকে আরতি আড়চোখে মহিলার আপাদমস্তক দেখল। খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করার ভঙ্গীতে। একেবারে সাধারণ। একবার দেখলেই কৌতূহল মিটে যায়। দ্বিতীয়বার দেখবার কোন মোহ, কোন আকর্ষণ থাকে না।

শ্যামাঙ্গী রং, শরীরের কোন বাঁধুনী নেই, চ্যাপ্টা মুখ। ছোট চোখ। নাকও সুগঠিত নয়। ঠোঁট দুটোও বেশ পুরু, অবশ্য তাম্বূলরাগরঞ্জিত।

এই লীলা। লীলা মজুমদার। যার জন্য সুদর্শন পিছু হটে হটে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। নানা স্তোকবাক্যে আরতিকে ভোলাবার চেষ্টা করে। একদা প্রতিশ্রুতির বাঁধন শিথিল করে দিয়েছিল। ব্যারিষ্টার বাপের একমাত্র সন্তান। সৌহার্দ্যে খেলতে গিয়ে সুদর্শন গোল একটা দিতে পারে নি, কিন্তু হৃদয় দিয়ে এসেছিল।

বলিহারি রুচি সুদর্শনের, বলিহারি পছন্দ। কিংবা এমনও হতে পারে রূপবান সুদর্শন রায় যেমন কালের ব্যবধানে রূপের ঐশ্বর্য হারিয়ে নিঃস্ব, লীলাও হয়তো সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে তার সৌন্দর্য খুইয়েছে।

এস তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এই হচ্ছে আরতি বসু। আমাদের কলেজে পড়ত। খুব ভাল মেয়ে ছিল। আমার সঙ্গে ভাবও ছিল বেজায়। বিয়ে হবো হবো করে আর হয়নি। আর ইনি হচ্ছেন আমার অভিভাবিকা পারুল দেবী। মহাবিক্রমে সংসার করছেন। আমাকে একেবারে মুঠোর মধ্যে রেখেছেন। এই যে তোমার সঙ্গে আমি এমন অন্তরঙ্গভাবে কথা বলছি, এরজন্য পরে আমাকে অনেক হেনস্তা সহ্য করতে হবে।

আরতি আর পারুল দুজনেই লজ্জিত হ'ল। আরতি শুধু লজ্জিত নয়, কিছু পরিমাণে ক্ষুব্ধও। সে স্কুলের শিক্ষিকা, ঠিক এই ধরণের কথাবার্তায় সে অভ্যস্ত নয়। সুদর্শনের কি শালীনতার কোন বালাই নেই।

ওরই মধ্যে পারুল একটু সামলে নিল। দাওয়া থেকে ছেলেটিকে কোলে তুলে নিয়ে স্বামীর দিকে ফিরে বলল, বলি, তোমার আক্কেলটা কিরকম। ওঁকে পথের ওপর দাঁড় করিয়েই রাখবে নাকি? আসুন ভাই, বাড়ীর মধ্যে আসুন।

সুদর্শন টিপ্পনী কাটল, আমাদের আলাপটা তো চিরদিনই পথে পথে। কলেজের কম্পাউণ্ডে, দক্ষিণেশ্বরে, গঙ্গার ধারে, মনে আছে আরতি?

সেদিনের রংয়ের সামান্য রেশও নেই, সে মনও নিশ্চিহ্ন, তবু সুদর্শনের ভারি গলায় নিজের নামটা শুনে আরতি রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বয়সের পলিমাটি ঠেলে হারানো দিনের জোয়ারের কুলকুল ধ্বনি শোনা গেল।

ছোট ঘর। মামুলী। বোঝা গেল সুদর্শন একেবারে মধ্যবিত্ত জীবনে নেমে এসেছে। লেখাপড়ায় ভাল সে কোনদিনই ছিল না, তবে তার আশা ছিল চেহারা আর খেলার জোরে ভাল চাকরি একটা সংগ্রহ করে নিতে পারবে, কিন্তু বোঝা গেল তা সে পারে নি।

ছেলেকে নিয়ে ভিতরে যেতে যেতে পারুল বলল, আপনারা ততক্ষণ গল্প করুন ভাই, আমি ছেলেটাকে একটু খাইয়ে নিয়ে আসি। এখন না খেলে পরে ওকে খাওয়ানোই মুস্কিল হবে।

এতক্ষণ তবু একটা ঘবনিকা ছিল, কিছুটা আড়াল, পারুল পরে যেতে আরতির নিজেকে যেন বড় অসহায় মনে হ'ল। একটা নড়বড়ে চেয়ারে সে বসেছে। সামনে সুদর্শন গোটানো বিছানাটার ওপর। হাতের পত্রের কাগজ ছাড়ে নি।

মরীয়া হয়ে কথাটা আরতি বলে ফেলল, পারুল দেবীকে তো এ অবস্থায় আশা করি নি।

হাঁটু দুটো দোলাতে দোলাতে সুদর্শন বলল, কেন?

ভেবেছিলাম এখানে লীলা এসেছে। এ ঘরে।

সুদর্শন হাসি থামাল না। বলল, তা যদি বল, এ ঘরে আরতি দেবীর দাবী তো সবচেয়ে বেশী।

আরতি তাড়াতাড়ি মুখটা ঘুরিয়ে নিল। চোখ মুখের চেহারা সুদর্শন না দেখতে পায়।

যুতসই একটা উত্তর আরতির ঠোঁটের ডগায় এসেছিল, সে নিজেকে সামলে নিল। না, এতদিন পরে এভাবে কথা কাটাকাটির খেলা খেলতে মন চায় না। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ভালবাসার কঙ্কালটা বের করে কি লাভ।

সুদর্শন নিজে থেকেই বলল, মাস তিনেক গৌহাটিতে ছিলাম, ভেবেছিলাম লীলার বাবা একটা ভদ্রগোছের চাকরি করে দেবেন। কিন্তু কিছুই না। তাঁর মেয়ের দরবারেও দেখলাম সভাসদের সংখ্যা অনেক। যতদিন আমি মন ঘুগিয়ে আসছিলাম, আমার আদর ছিল, কিন্তু তখন একটি পয়সা উপার্জন নেই, নিজের জিনিসপত্র বেচে কতদিন আর অনুরাগের রিহার্সাল দেব। ফলে একদিন বিচ্যুত হলাম। কলকাতায় ফিরে এসে শুনি, তুমি মফঃস্বলের কোন কলেজে চলে গেছ।

আরতি আশ্চর্য হ'ল। এভাবে নিজের কুৎসার কাহিনী কেউ নির্দ্বিধায় অনর্গলভাবে বলে যেতে পারে তা সে ধারণাও করতে পারেনি। মনে মনে নিজের ভাগ্যকে হাজার বার ধন্যবাদ দিল। এমন মানুষের ঘরণী হয়ে এলে হয়তো নেমে নেমে এরই উপযুক্ত হ'তে হ'ত এতদিনে। চলনে, বলনে, আচারে, আচরণে।

পর্দা সরিয়ে পারুল ঘরে ঢুকল। এক হাতে চা, আর এক হাতে খাবারের প্লেট।

একি আপনি ছাতা কোলে করে অমন জড়সড় হয়ে বসে আছেন কেন? টেবিলের ওপর কাপ ডিস রাখতে রাখতে পারুল প্রশ্ন করল।

আরতি বিব্রত বোধ করল, অসময়ে আবার এসব করতে গেলেন কেন আপনি? একি চা জলখাবারের সময়?

পারুল কিছু বলবার আগে সুদর্শন কথা বলল, জলখাবারের কথা জানি না, চায়ের আবার সময় অসময় আছে নাকি? অন্তত আগে তো ছিল না। মনে আছে, ক্লাশ পালিয়ে কতবার চায়ের দোকানে ঢুকেছি, রোজ কতকাপ চা খেয়েছি?

আরতি মুখ তুলেই লজ্জা পেল। পারুল একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রয়েছে। নিষ্পলক দৃষ্টি দিয়ে দেখছে তার স্বামীর একরা প্রথমিনীকে।

লজ্জা, সঙ্কোচ, জড়তা সব কিছু পার হ'য়ে মনের গোপনে সামান্য আনন্দের আভাস। দেখুক পারুল, ভাল করে দেখুক। এখনও আরতির শরীরের বাঁধন যথেষ্ট দৃঢ়। অথবা নেভার জমেনি দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। ঋজু, দীর্ঘ চেহারা। পারুলের চেয়ে, পারুলের স্বামীর চেয়ে স্বাস্থ্যবতী।

কিন্তু এ পরিবেশ আর আরতির ভাল লাগছে না। এখনও খুঁজলে সুইকেশের একেবারে তলায় হয়তো সুদর্শন রায়ের একটা ফটো পাওয়া যেতে পারে। এই সুদর্শন রায় নয়। ধুলো, ময়লা, চটুল অতি সাধারণ এক কেরানীর প্রতিকৃতি সযত্নে রক্ষা করবার কোন কারণ নেই আরতির। সে সুদর্শন রায় তার প্রথম প্রেম। প্রথম আর অন্তিম।

সিঁদুরটা ভাঙতে গিয়েই আরতি থেমে গেল।

সুদর্শন আবার প্রশ্নের খোঁচা তুলেছে, কিন্তু এখনও বিয়ে করনি কেন বল তো? মেয়েরা বড় সেন্টিমেন্টাল হয়। আমি তো কেমন সংসার গুছিয়ে বসেছি।

হাত দিয়ে সুদর্শন নিজের সংসারের পরিধি দেখাল। যেন নিটোল, পরিপাটি সংসার।

সিঁদুরটা সরিয়ে রেখে আরতি চায়ে চুমুক দিল। সব যেন বিস্বাদ লাগছে। এই একটা মানুষ সমস্ত পরিবেশটা তিক্ত করে তুলেছে।

একটু থেমে আরতি বলল, বিয়ে করার সময় কোথায়? তুমি তো জানো কলেজে ভাল ছাত্রী ছিলাম, একটার পর একটা পরীক্ষা পাশ করে গেছি। শেষ পরীক্ষাটা পাকা করে থামবার অবসর পেলাম না। এক স্কুল থেকে প্রধানা শিক্ষিকার চাকরি হাতের মুঠোয় এসে গেল।

বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোভিয়েত মতামত জানিতে হইলে পড়ুন:

১। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নিকট "খোলা চিঠি"

২। ২১শে সেপ্টেম্বরের সোভিয়েত সরকারের বিবৃতি

"সোভিয়েত দেশ"-এর বার্ষিক গ্রাহক সংগ্রহ অভিযান এই বৎসর ১লা নভেম্বর '৬৩ হইতে আরম্ভ হইবে।

এবারের বিশেষ কনসেসন:	ভারতীয় ভাষায়	ইংরেজি ভাষায়
বাৎসরিক	৪ টাকা	৫ টাকা
ষিবার্ষিক	৩ "	৩।৫০ "
ত্রিবার্ষিক	৮ "	১০ "

গ্রাহক-সংগ্রহ এজেন্সির জন্য আবেদন করুন

যোগাযোগের ঠিকানা:

সোভিয়েত দেশ কার্যালয়

১১১, উড স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬

তুমি এখন মাষ্টারণী? শেষ মেশাতে গিয়েও সুবর্শন পারল না। আরতির হীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। মর্মস্থলে বিঁধেছে। একটার পর একটা পরীক্ষা পাশ করার কথাটা কি ইচ্ছা করেই আরতি বলল, সে একটার পর একটা পরীক্ষায় ফেল করেছে বলে।

চায়ের কাপ শেষ করে আরতি বলল, কেন মাষ্টারণীর চাকরি বুঝি কেরাণীগিরির চেয়ে কোন অংশে খারাপ?

সুদর্শন হাসবার চেষ্টা করল, হাসি ফুটল না। তবু হাসি-হাসি মুখের ভাব করে বলল, ভাগ্যিস আমার গৃহিণীর বাবা ছিলেন, তাই এই চাকরিটা জুটল। ভেবেছিলাম খেলা দেখিয়ে অফিসপাড়া মাত করব কিন্তু একটা খেলায় পায়ে এমন চোট লেগে গেল যে খেলার দফা রফা। সারাজীবন খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে।

আশ্চর্য, এমন একটা ব্যাপারেও একটু সমবেদনা জাগল না আরতির মনে। প্রথমেই যদি সুদর্শন এ কথাটা বলত তা হ'লে হয়তো দয়া হ'ত আরতির, সে দুঃখ প্রকাশ করত, কিন্তু কথার বিষে আরতির অন্তরাত্মা জ্বালিয়ে দিয়ে এটুকু বাহ্যিকতা অর্থহীন।

আজ উঠি ভাই। আরতি দাঁড়িয়ে উঠে সুবর্শনের দিকে নয়, পারুলের দিকে চেয়ে বলল।

আপনার সঙ্গে তো কথাই হ'ল না ভাল করে। কেবল আপনারা দুজনে পুরোনো দিনের কথাই বললেন। কবে কি করেছিলেন সেই সব কথা।

আরতির বিস্ময়ের যেন আর শেষ নেই। এই কালামাটির ভাল হাজার ঘর্ষণেও যা থেকে একটু ঘুলিঙ্গ বের হয় না, এর সামাজিক পরিচয় সুবর্শন রায়ের ঘরণী। অন্য যে কোন মেয়ে হ'লে জ্বলে উঠত। এভাবে স্বামীকে আবোল তাবোল কথাই বলতে দিত না। চোখের দৃষ্টিতে বিদ্বেষের বহ্নি ছুটিয়ে তুলত। সহ্য করতে পারত না আরতিকে।

কথাটা মনে পড়তেই আরতির হাসি পেল। যোগ্যের সংগেই যোগ্যের মিলন হয়েছে। স্থূলবুদ্ধি, বাকসর্বস্ব স্বামী আর নির্বোধ সন্তবত অশিক্ষিতা স্ত্রী।

আবার কবে আসবেন বলুন? পারুল আরতির গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

খুব অল্পক্ষণের জন্য হ'লেও আরতি দেখতে পেল। একেবারে পাশাপাশি আরতি আর পারুল। দুজনের দেহে মনে আকাশপাতাল ব্যবধান। ক্ষোভের বহ্নি জ্বলে উঠেছে সুবর্শনের দুটি চোখে। কি ছেড়ে কি আঁকড়ে ধরেছে তারই ছায়া।

একটা কথা বলব, রাখবেন? আচমকা আরতি পারুলকে প্রশ্ন করল।

কি কথা বলুন? রাখবার হ'লে রাখব না কেন। অপ্রস্তুত গলায় পারুল বলল।

আপনার ফটো দেবেন একটা? আপনাদের দুজনের নয়। আরতি একটা হাত দিয়ে সুবর্শনের দিকে দেখাল।

বিস্মিত, স্তম্ভিত পারুল স্বামীর দিকে মুখ ফেরাল, রহস্য সমাধানের আশায়।

সুদর্শন বলল, আরতি চাইছে একটা ফটো দিয়ে দাও না। অ্যালবামে তোমার তো অনেক ফটো আছে।

পারুল ফটো আনতে ভিতরে চলে যেতে সুবর্শন হেসে বলল, আমার একটা ছবি নিলে না আরতি?

আরতি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে অল্প দৃঢ় কণ্ঠে বলল, তোমার ছবি তো বুকের মধ্যে এঁকে নিয়ে যাচ্ছি।

পারুল একটা খাম হাতে ফিরে এল। খামটা আরতি অ্যাটাচি ব্যাগের মধ্যে রেখে উঠে দাঁড়াল। হাত তুলে দুজনকে নমস্কার করে পথে পা দিল।

এবার সুদর্শনই বলল, আর একদিন এস কিন্তু আরতি। বাড়ী তো চিনে গেলে।

চলতে চলতে আরতি ফিরে দাঁড়াল। দৃঢ়কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয় আসব। বাড়ীও চিনে গেলাম, মানুষদেরও। খুব শীঘ্রই আসব।

বাড়ীতে পা দিয়েই আরতি নিজের অ্যালবামটা খুলল। এই কিছুদিন আগেও সে নিজের একটা ফটো তুলিয়েছিল। ফটো তোলানো তার একটা বাতিক।

মন ঠিক করে ফেলল। এক সঙ্গে দুজনের ছবি বাঁধিয়ে আনবে। নিজের আর পারুলের। তারপর সেই বাঁধানো ফটো একদিন গিয়ে উপহার দেবে সুদর্শন রায়কে। কয়েক মুহূর্তের জন্য পাশাপাশি যে দুজনকে দেখে সুদর্শন রায়ের চোখ জলে জলে উঠেছিল, সেই ছবি, সেই বাধাবন্ধ আরতি চিরন্তন করে রাখবে। চলতে ফিরতে এই অকৃতজ্ঞ মানুষটার চোখে পড়বে। নিছক অবহেলায় কি সে হারিয়েছে।

নিজের ফটোটা বের করে আরতি টেবিলের ওপর রাখল। অনেকক্ষণ ধরে দেখল তারিফ করার ভঙ্গীতে। বয়স হ'য়েছে, কিন্তু দেহে বয়সের ভার নামে নি। কোথাও একটু কুঞ্চন নয়, কালের ক্ষীণ পদরেখাও না। সারা মুখে শিক্ষার দীপ্তি। কোথাও একটু কাঠিন্য নেই। বসবার ভঙ্গীতেও আভিজাত্যের নিশানা।

খাম খুলে পারুলের ফটোটা বের করতে গিয়েই আরতি হেসে ফেলল। আরতির পাশে কি চমৎকার মানাবে পারুলকে!

হাসতে হাসতে ফটোটা বের করে নিজের ফটোর পাশে রেখেই আরতি চমকে উঠল। কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল দুটি ভ্রূ। দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁট। দুটি চোখ জ্বালা করে উঠল। দুটো হাত দিয়ে কপাল টিপে চুপচাপ বসে রইল।

নিজেরই ফটো দিয়েছে পারুল তাতে আর ভুল নেই। একটা কৌচের ওপর সে বসে আছে। পরণে চওড়া পাড় শাড়ী, কপালে টিপ, এক মুখ হাসি। উজ্জ্বল দুটি চোখ। কোলে সন্তান। মাতৃত্বের স্পর্শে মহীয়ান এক ছবি। এর পাশে আরতির ফটোটা ম্লান, বিবর্ণ দেখাল।

এক ফ্রেমে এ দুটো ছবি বাঁধানো যায় না।

আচমকা চোখে আঁচল চাপা দিয়ে পরাজয়ের গ্লানিতে উত্তরযৌবনা শিক্ষিকা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বিশ্বের ব্যালে নৃত্য

সচিত্র সংযোজন

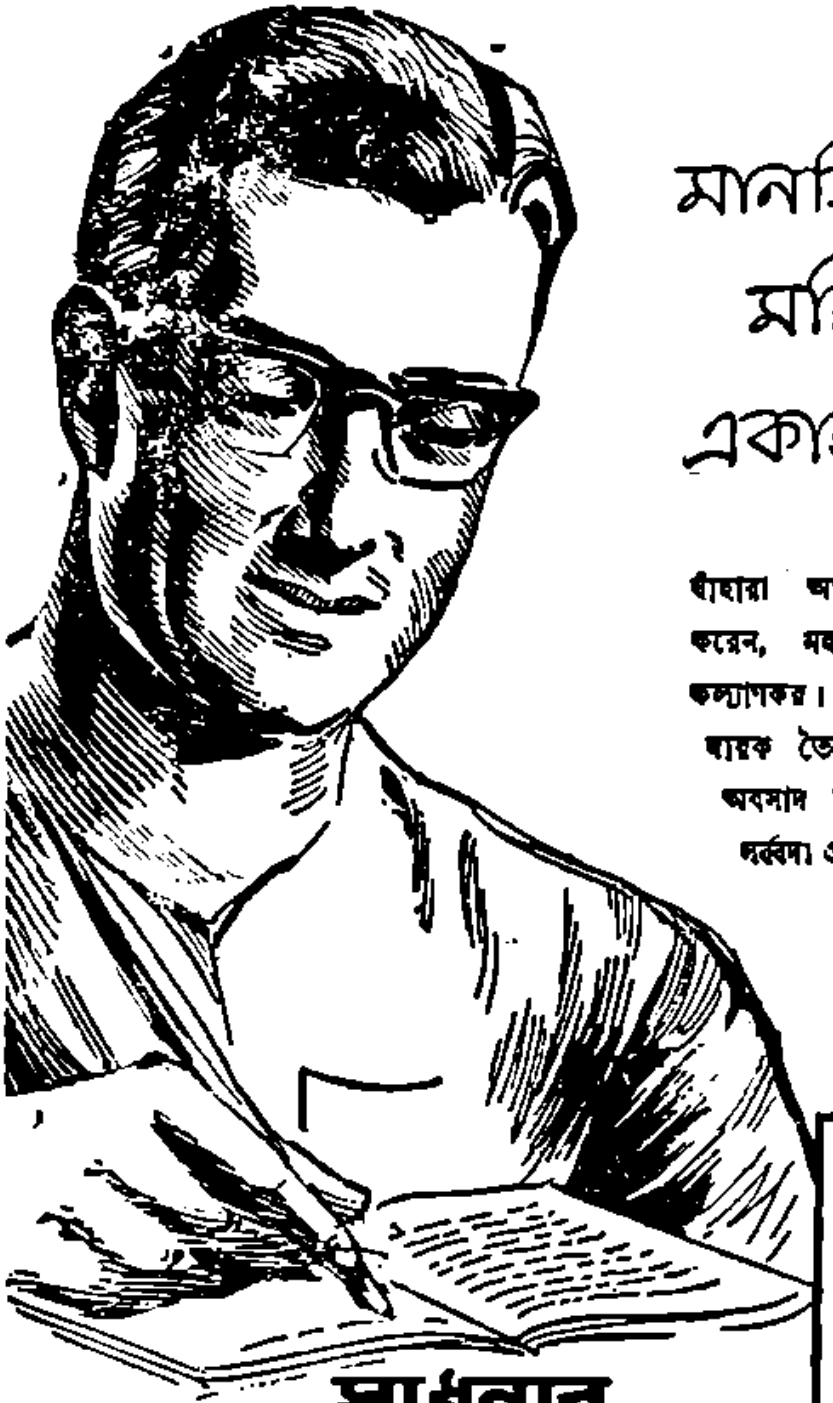

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে।

সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি. বি. এস. (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ.
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এম, সী, এস, (গভঃ) এফ, সি, এস (আমেরিকা)

ব্যালে বা নৃত্য-নাট্য

শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য

শিল্পের উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ নিয়ে, বিশেষ করে আদিম শিল্পের স্বরূপ নিয়ে যে সব নৃবিজ্ঞানীরা আলোচনা করেছেন, তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তাঁরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে আদিম পর্যায়ের সামষ্টিক জীবন থেকে যে ভাষা-শিল্প জন্ম গ্রহণ করেছিল তা' ছিল একাধারে নৃত্য-গীত-ভাষারূপ এক সংশ্লিষ্ট সৃষ্টি; অর্থাৎ আদিম পর্যায়ে এমন কোন ভাষা-শিল্প ছিল না যা' সুরে গান করা না' হ'ত এবং নাচের সাহায্যে অভিব্যক্ত না হত। এই নৃত্য-সুর-ভাষার সংশ্লেষ স্বরূপ আদিম ত্রিপুটি কালক্রমে বিশ্লিষ্ট হ'য়ে কবিতা, সংগীত এবং নৃত্য এই তিন স্বতন্ত্র শিল্পে পরিণত হয়েছিল। নৃত্য-সুর বিবর্জিত ছন্দোবদ্ধ ভাষা-শিল্পের নাম হ'ল কবিতা নৃত্য-বর্জিত সুর সংযুক্ত কথার নাম হ'ল গান—(নৃত্য ও ভাষা বর্জিত বিশুদ্ধ সুর-শিল্পের নাম হ'ল বিশুদ্ধ সংগীত) এবং সুর সংযোগে নৃত্যের নাম হল নৃত্য-শিল্প (এবং ভাষা সুরবর্জিত শুধু তাল লয়-সংবলিত নৃত্যের নাম হ'ল বিশুদ্ধ নৃত্য।) সংগীতের ও নৃত্যের মিশ্র ও বিশুদ্ধ রূপ সম্বন্ধে দু'একটি কথা ব্যাখ্যা হিসাবে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরং নৃত্য-নাট্যের স্বরূপ বুঝবার পক্ষে সহায়কই হবে এবং সেখানে দুই ব্যালে-বিশারদ মিশ্র ও বিশুদ্ধ রূপ কি হবে এই প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্ব করেছেন সেই দ্বন্দ্বের কারণটি উপলব্ধি করা সহজ হবে। নৃত্য-সুর-ভাষারূপ মূল শিল্প রূপটিই মধ্যে বিশ্লেষণ কেন্দ্রাতিগ শক্তি যখন কাজ করতে আরম্ভ করেছিল তখন মূল প্রকৃতিতে তিনটি প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। এক প্রবণতার গতি ছিল ভাষার মেরুর দিকে আর এক প্রবণতা ছিল সুরের মেরুর দিকে এবং আর এক প্রবণতা ছিল নৃত্যের মেরুর দিকে। প্রথমতঃ নৃত্য ও সুরকে বর্জন করে ভাষা নিরপেক্ষ স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে চেষ্টা করেছে এবং তার এই প্রবণতা নৃত্য ও সুর ঘেঁষা-ছন্দোবদ্ধ পদ্য থেকে ছন্দোহীন গদ্যের অভিমুখে প্রসারিত হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ সুর নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা ক'রেছিল, ভাষাকে আশ্রয় করে থাকলেও সে নৃত্যকে বর্জন করেছিল। কিন্তু ভাষা সাপেক্ষতা তার স্বাতন্ত্র্য বোধকে ক্ষুণ্ণ করেছিল এবং করেছিল ব'লেই—ভাষা বাদ দিয়ে নিছক সুর বা ধ্বনির জগতে আপন সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। এই চেষ্টা থেকেই বিশুদ্ধ সংগীতের জন্ম হ'য়েছিল। তৃতীয়তঃ নৃত্য নিজের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হয়েছিল—ভাষা ও সুরকে সহযোগী রেখে—কথা ও সংগীতকে পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করে আপন মহিমাকে প্রধানভাবে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছিল। কথার মধ্যে ভাবের যে বিশেষ পরিচয় অভিব্যক্তি হয়েছিল, সুরের মধ্যে ভাবের যে বিশেষ আবেগ রূপটি ব্যক্ত হয়েছিল, নৃত্য দেহের ছন্দোলয়ের লীলার মাধ্যমে সেই ভাবেরও বিশেষ পরিচয়টুকু ভাবের আবেগ মূর্তিটিকে পরিস্ফুট করার চেষ্টায় নিজের প্রতিষ্ঠা ভূমি খুঁজে পেয়েছিল—দেহের ছন্দে ভাবের বাণী-মূর্তি, ও আবেগ-মূর্তিটিকে যুগপৎ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। নৃত্যের স্বাতন্ত্র্য লাভের সাধনা—ভাষার ও সুরের সহযোগিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার সাধনা—ভাষা ও সুরকে দেহের ছন্দে আত্মসাৎ করার

সাধনা। দেহকেই যদি ভাষায় পরিণত করা না যায়, দেহের অভিব্যক্তিতেই যদি সুরের মূর্ছনা ফুটিয়ে তোলা না যায়, তবে নৃত্যের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? ভাবের পরিচয় দিতে যদি ভাষাকেই সঙ্গে সঙ্গে থাকতে হয় আবেগের গতি-প্রকৃতি ব্যক্ত করতে যদি সুরেরই আশ্রয় নিতে হয়, তবে নৃত্যের পরমুখাপেক্ষিতা ঘুচবে কি করে? সেইজন্যই নৃত্যের স্বাভাবিক ঝোঁক রয়েছে—ভাষার ও সুরের সহযোগিতা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিরপেক্ষ সত্তাটি প্রকাশ করার দিকে। কণ্ঠসংগীতের সহযোগিতা এবং যন্ত্রসংগীতের সহযোগিতা না নিয়েই, শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গতি- ভঙ্গিমার সংকেতে ও ছন্দোলয়ে ভাবকে সমগ্রভাবে ব্যক্ত করা যায় কি না—এরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিশুদ্ধ নৃত্যের কাম্য। তাই বিশুদ্ধ নৃত্যের একমাত্র সহযোগী—লয়রক্ষক বাদ্য ছাড়া আর কেউ হতে পারে না; সুতরাং বেশথা-গীতেরও যন্ত্র সংগীতের সহযোগিতায় যে নৃত্য হয়, সে নৃত্য বিশুদ্ধ নৃত্য-শিল্প নয়। সে নৃত্য ভাষা, সুরের ও নৃত্যের সমবায়ে রচিত মিশ্রশিল্প। সাধারণতঃ আমরা যে নৃত্য দেখি তা' এই মিশ্রশিল্পই, কারণ কণ্ঠসংগীত বা যন্ত্র সংগীতের সহযোগিতা প্রায় সব নৃত্যেই থাকে।

এও একটা প্রশ্ন বটে যে সহযোগিতায় বিশুদ্ধতা নষ্ট হ'লেও, অভিব্যক্তির পরিপোষণ হয় না কি? দেহকে সুপরিস্ফুট ভাষায় ও সুরে পরিণত করার পথে যে বাধা আছে, সেই বাধা অপসারিত করে না কি? বস্তুতঃ কণ্ঠসংগীতের ও যন্ত্র সংগীতের সহযোগিতা ভাব-প্রকাশের স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা থেকে নৃত্যকে অনেক পরিমাণে মুক্তি দান করে। প্রত্যেক শিল্পের বিশেষ মাধ্যম (মিডিয়াম) থাকে এ যেমন সত্য, তেমনি এও সত্য যে কোন মাধ্যমেরই প্রকাশ-শক্তি অবাধ বা অসীমাবদ্ধ নয়। নৃত্যের মাধ্যম দেহ—দেহের ছন্দোলয়। এই মাধ্যমটিও সীমাবদ্ধ। ভাষা যত সুষ্ঠুভাবে ভাবকে প্রকাশ করতে পারে, সুর যত তানবিস্তারে আবেগের গতিবেগকে সংকেতিত করতে পারে দেহ তত সুষ্ঠু ভাবে পারে না এবং পারে না বলেই ভাষার ও সুরের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে নৃত্যের স্বাধীন সত্তা সম্ভব নয় বা নেই। এ কথা বার বার বলা হয়েছে—নৃত্য সেখানেই স্বাধীন বা স্বতন্ত্র যেখানে সে স্বতন্ত্র একটি মাধ্যমে—দেহের গতি ভঙ্গিমায়—ভাবাবেগকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছে। অন্য কোন মাধ্যমের সাহায্য না নিয়েই, নিরপেক্ষভাবে আপন সত্তাটি ব্যক্ত করেছে।

এ কথাও বলা বাহুল্য নৃত্যের শিল্পোৎকর্ষ বিচারে—সহযোগী কণ্ঠসংগীত বা যন্ত্র সংগীতের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারের কোন স্থান নেই, বা থাকলেও গৌণ আসন বিচার্য সেখানে - যে মাধ্যমে শিল্পটির প্রকাশ সেই মাধ্যমের প্রয়োগে শিল্পী কতখানি কি কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন তাই। একটি সমগ্র নৃত্যানুষ্ঠানের উৎকর্ষ-অপকর্ষ বিচারে সহযোগী শিল্প প্রয়োগের দোষ-গুণ বিচার অপেক্ষিত বটে কিন্তু নিছক নৃত্যের বিচারে নৃত্যের বিশেষ মাধ্যমটির প্রয়োগ কৌশলই একমাত্র বিচার্য, কারণ নৃত্য একটি স্বতন্ত্র শিল্প—কবিতা-গান-সুর-নিরপেক্ষ স্বাধীন একটি শিল্প।

কিন্তু এই অবিমিশ্র স্বাধীন সত্তায় নৃত্যকে খুব কমই দেখা যায়। আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নৃত্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—ভাষার বা সুরের সহযোগিতাকে সে বর্জন করেনি, ভাষা ও সুরের সাহায্যে সে নিজেকে পুষ্ট করেছে। নিজের দৈন্যের পরিপূরণ করেছে। এমনকি মনুষ্যের প্রাণীর মধ্যে নৃত্যের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে,—ডারুইন তাঁর "অরিজিন অফ স্পিসিজ" গ্রন্থের 'এস্থেটিক ফিলিং' পরিচ্ছেদে 'বাওয়ার বার্ডদের' এবং গোরিলাদের নৃত্যের যে উল্লেখ করেছেন তাতেও দেখা যায়—গোরিলারা চাঁদের আলোয় যে নৃত্য করে বা 'বাওয়ার বার্ডরা'

যৌন-সঙ্গমের আগে লতা ও গুল্মের পটভূমি তৈরি করে যে নাচ নাচে তা'তেও দেহের গতি ভঙ্গিমার সঙ্গে অস্ফুট ধ্বনির সহযোগ থাকে—বিশেষতঃ গোরিলা-নৃত্যে বাদ্যের সহযোগও থাকে। ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে প্রাণিদেহের মধ্যে যে আন্দোলন সৃষ্টি করে, সেই আন্দোলনই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নানা ছন্দে, নানা লয়ে এবং নানা ভঙ্গিমায় সঞ্চালিত করে তথা নৃত্যের রূপ পরিগ্রহ করে। বিশেষ বিশেষ ভাবাবেগের বিশেষ বিশেষ গতিছন্দ আছে। বিশেষ বিশেষ ভাব প্রাণীর চোখে মুখে বিশেষ বিশেষ বিকার সৃষ্টি করে। এই দৈহিক গতিছন্দ ও ভাবাভিব্যক্তির সামবায়িক সুষম অভিব্যক্তিরই নাম নৃত্য। মনোজীবক সামাজিক প্রাণী মানুষের প্রকাশ ক্ষমতার ক্রমগত পরিবর্তন ঘটায়, মানুষের স্তরে ভাবের ও অভিজ্ঞতার প্রকাশে অভূতপূর্ব বৈচিত্র্য দেখা দিয়েছিল। হৃদয়ের আবেগ এবং বাইরের জগতের ঘটনাকে অভিজ্ঞতাকে নানা মাধ্যমে সে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছিল। আদিম মানুষের শিকার-নৃত্যের বা যুদ্ধ নৃত্যে বা দেবতার কাছে প্রার্থনা বা আত্মনিবেদন করার অনুষ্ঠানে আদিম নৃত্যের আদিম রূপের নিদর্শন দেখতে পাই। তারপর কৃষিযুগের নানা উৎসবে মানুষ তার নানা ভাবকে গতিছন্দে ও ভাববিকারে ব্যক্ত করেছিল। তাণ্ডব নৃত্যে ব্যক্ত করেছিল বীর রৌদ্র-ভয়ানক রসের উদ্দীপনাকে এবং লাস্য-নৃত্যে ব্যক্ত করেছিল প্রেমের বিচিত্র আবেগগুলিকে। গীতি-কবিতা বা খণ্ড খণ্ড কবিতার মতো বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা ভাবকে ভিত্তি করে খণ্ড খণ্ড নৃত্য গ'ড়ে উঠেছিল। যদিও একদিকে মন্দিরে মন্দিরে দেবদাসীরা দেবতাদের আরতি করতে নৃত্যের নৈবেদ্য নিবেদন করছিল অর্থাৎ নৃত্য দেবারাধনায় নিবেদিত হচ্ছিল, তবু আর একদিকে—দেবসভার অপ্সরাদের মতো রাজাদের সভাতেও নর্তক-নর্তকীরা শোভাবৃদ্ধি ও আমোদ দান করতে নিযুক্ত হ'তে লাগল—শিল্পপণ্যে পরিণত হ'ল।

সে যাই হোক নৃত্যের মাধ্যমে একটি সমগ্র কাহিনীকে উপস্থাপিত করার প্রচেষ্টা তখনও দেখা দেয় নাই, তখনও নৃত্য-শিল্পে খণ্ড-কবিতার যুগ চলছিল, নৃত্য-নাট্যের উদ্ভব ঘটেনি। একথা ঠিক বটে যে নৃত্য স্বভাবতই দৃশ্যধর্মী—তথা নাট্যধর্মী, কিন্তু তাই বলে একথা ঠিক নয় যে সব নৃত্যই নৃত্য-নাট্য। নৃত্য-নাট্য শব্দটি একটু বিশেষ অর্থে প্রযুক্ত এবং সেই বিশেষ অর্থে নৃত্য-নাট্য হ'চ্ছে—নৃত্যের মাধ্যমে দৈহিক গতি-ভঙ্গিমা ও ভাববিক্রিয়ার উপাদানে সংগঠিত একটি নাটক—নৃত্য, মূকাভিনয় এবং যন্ত্র সংগীতের মাধ্যমে একটি কাহিনী বা বৃত্তকে উপস্থাপিত করা—["The art of narrating through dancing, pantomime and music." (Dictionary of World Literature). "a dramatic spectacle in which the action is presented in dancing and in mime to the accompaniment of music. (The Oxford Companion to the Theatre)] সাধারণ অভিনয়ে—আঙ্গিক বাচিক আহার্য ও সাত্ত্বিক এই চার প্রকারে—অবস্থার অনুকরণ করা হয়। নৃত্য-নাট্যের অভিনয়ে, উক্ত অবস্থানুকার-উপায়ের মধ্যে, বাচিক ছাড়া আর সবগুলিই থাকে এবং বিশেষ ক'রে থাকে নৃত্য এবং নৃত্যের সহচারী যন্ত্র-সংগীত। সাধারণ অভিনয় থেকে মূকাভিনয়ের এবং মূকাভিনয় থেকে নৃত্য-নাট্যের পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করলে নৃত্য-নাট্যের স্বরূপটি ধরা সহজ হবে বলে, সেই পার্থক্যের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি।

সাধারণ অভিনয়ে—আঙ্গিক-বাচিক-আহার্য-সাত্ত্বিক—এই চার প্রকারের অবস্থার অনুকরণ করা হয়—একথা আগেই বলেছি। মূকাভিনয় অবস্থানুকার করে তিন উপায়ে—আঙ্গিক-আহার্য ও সাত্ত্বিক এবং পুরাচিক অভিনয়ের ঘাটতি পূরণ করে আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় দিয়ে। মোটকথা মূকাভিনয়ে

সমস্ত কার্যকে (action) আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকাশ করতে হয় এবং তা'হয় বলেই সেই সব কার্যই কায়া যেগুলি সহজেই আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয় নিষ্পাদ্য। সুতরাং একটি সাধারণ নাটককে মূকাভিনয় করে তুলতে হলে, নাটকখানিকে এমনভাবে সম্পাদন করতে হবে যাতে আঙ্গিক ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা সব কথা ও কাজ ব্যক্ত করা চলে। অরূপকে নৃত্যনাট্যও মূকাভিনয়ের মতো—আঙ্গিক, আহার্য ও সাত্ত্বিক অভিনয়ের দ্বারা সম্পাদ্য, কিন্তু নৃত্য-নাট্যের আঙ্গিক অভিনয়ের সঙ্গে মূকাভিনয়ের আঙ্গিক অভিনয়ের বিলক্ষণ পার্থক্য রয়েছে। মূকাভিনয়ে আঙ্গিক-অভিনয়ের আতিশয্য থাকে—প্রতিটি কথা ও কাজকে আঙ্গিক সংকেতে ব্যক্ত করার চেষ্টা থাকে বটে, কিন্তু নৃত্য-নাট্যের আঙ্গিক অভিনয়ে যে নৃত্য-চপলতা বা নৃত্যভঙ্গিমা থাকে তা থাকে না। নৃত্য-নাট্যাভিনয়ে আঙ্গিক অভিনয় নৃত্যের মুদ্রা, ছন্দ ও লয়ে সম্পাদিত হয়। এই কারণে সেই সব নাটকই নৃত্য-নাট্যাভিনয়ের উপযোগী যে নাটকে পরিস্থিতিগুলি, চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলি ও তীব্র ভাবাবেগে স্পন্দিত যেখানে আবেগ শীর্ষোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত এবং যেখানে স্বল্প মূকাভিনয় এবং সমধিক নৃত্যাভিনয়ের সুযোগ থাকে। সেজন্যে নাটককে নৃত্য-নাট্যে পরিণত করতে গেলে এই বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেই রূপায়িত করতে হবে। এই নৃত্য-নাট্যই ইয়োরোপ-আমেরিকায় "ব্যালে" নামে পরিচিত। নৃত্য-মূকাভিনয় ও সংগীতের সহযোগে কোন একটি ঘটনা বা কাহিনীকে রূপ দেওয়ার সার্থক চেষ্টা যদিও সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে দেখেই হয়েছিল তবুও একথাও স্মরণীয় যে রোমান মূকাভিনয়ের মধ্যে এবং ইতালীয় অপেরার মধ্যে নৃত্য-নাট্যের অনুরূপ রূপটি পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদের ধারণা—ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে ইতালী থেকে 'ক্যাথেরিন ডি মেডিচি' ফ্রান্সে নৃত্য-নাট্যের চারা গাছটি নিয়ে

Telegram : WOOLTOP Telephones : 23-6776 (3 Lines)

Puja Greetings to all

BHARAT WOOLLEN MILLS LTD.

WORSTED SPINNERS AND MANUFACTURERS.

11, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-1

Proprietors of J. J. R. INDUSTRIES, Dulhipur-Moghalsarai

এসেছিলেন। সকলেই জানি—নাটকের বাগানের সঙ্গে নাচের প্রথা অতি পুরাতন প্রথা—সবদেশেই সে প্রথা বেশী-কম প্রচলিত ছিল, কিন্তু, যে কথা আগেই বলেছি, শুধু নৃত্যের মাধ্যমে নাটক অভিনয় প্রচলিত প্রথা ছিল না। ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন—সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী রাজা চতুর্দশ লুই—এঁরই নৃত্য-প্রীতি ও পটুতা নৃত্য-নাটকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। রাজসভার আনন্দানুষ্ঠানের মধ্যে ব্যালে ছিল খুবই প্রিয়। রাজা লুই নিজে—'ব্যালে ডি. লা. নুইত' (১৬৫৩) —পালায় 'লে রোই সোলেইল্'-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'তেন। মোলিয়ের ও লালি প্রমুখ শিল্পীরাও ঐ সমস্ত রাজসভার নৃত্য-নাট্যের শ্রীবৃদ্ধিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কালক্রমে এই নৃত্য-নাট্য রাজসভার গণ্ডী ছাড়িয়ে পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের আসরে নেমে এসেছিল এবং অপেরার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিল। বিচিত্র জাঁকজমকপূর্ণ পোষাক-পরিচ্ছদ, মুখোস, উঁচু গোড়ালি জুতো এবং ভারি ভারি 'স্কার্ট' প্রথম দিকে নৃত্যের গতিতে এবং ভাবাভিব্যক্তিতে বাধা সৃষ্টি করেছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, নৃত্যশিল্পী ক্যামার্গো এবং মেরিসালে প্রাচীন প্রথা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন প্রথা প্রবর্তন করেছিলেন। ক্যামার্গো ছোট স্কার্ট প'রে এবং এন্ত্রেশাট্ (entrechat) প্রবর্তিত করে এবং মেরিসালে অতি সাধারণ মসলিন পোষাক প'রে—লম্বা ও ভারি পোষাকের বাধা থেকে নৃত্য-নাট্যকে মুক্ত করেছিলেন—নৃত্য-নাট্যকে অধিকতর গতিশীল ও ভাবব্যঞ্জক করে তুলেছিলেন। অবশ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধেই ব্যালের সংস্কার সম্পূর্ণ হ'য়েছিল এবং ব্যালের মূলসূত্র রচিত হ'য়েছিল। গ্লুক (Gluck) যেমন তাঁর 'এলসেসটি' নাটকের ভূমিকায় অপেরার মূলসূত্র নির্দেশ করেছিলেন তেমনি Jean Georges Noverre—'লেটর্স সুর্ লা ড্যানসে এং লে ব্যালে'—নামক পুস্তিকায় (১৭৬০ খৃঃ প্রকাশিত) ব্যালের মূলসূত্র নির্দেশ করবার প্রথম চেষ্টা করেছিলেন।

জাঁ জর্জ নোভেরি নৃত্যের গতি-ভঙ্গিমাকে এবং সাজসজ্জাকে সরল করতে এবং ভাবাভিব্যক্তির ও মূকাভিনয়ের উপরে বেশী জোর দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই নির্দেশের ফলে নৃত্য নাট্য নৃত্যের কোটি থেকে সরে নাট্যের কোটির দিকে বেশী ঝুঁকে পড়েছিল এবং ঐ কারণে অনেকেই নোভেরিকে সমালোচনা করেছিলেন। নৃত্য-নাট্যে নাটকের ক্রিয়া (action)—দীর্ঘ দীর্ঘ লিখিত ব্যাখ্যা—যোজনা করায় ভিয়েনার গ্যাস্পেরার এনজিওলিনি নোভেরিকে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে প্রত্যেক শিল্প স্বয়ংসম্পূর্ণ হবে এবং নিজেই নিজের ব্যাখ্যা হবে; লিখিত ব্যাখ্যা দিয়ে বা 'প্রোগ্রাম' দিয়ে যদি তাৎপর্য বুঝাতে হয় তা'হলে বুঝতে হবে শিল্পটির নিজের জোর কিছু নেই, সে পরমুখাপেক্ষী।

নোভেরি নাট্য উপাদানের উপর জোর দিলেও মনে রাখা দরকার তারই অধিনায়কতায় প্রাচীন (ক্লাসিকাল) ব্যালের কয়েকটি প্রথা উদ্ভাবিত হ'য়েছিল। এই প্রথাগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে—"pirouette"—আনে হেইনেল্ (Anne Heinel) এই প্রথাটির সদ্ব্যবহার করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে—'round de jambes'। পিয়ের গেব্রিয়েল গারডেল (১৭৫৮—১৮৪০), এবং গাইতান ভেসট্রিস (Gaetan Vestris) (১৭২৯—১৮০৮) এই প্রথাটির সুষ্ঠু প্রয়োগ করেছিলেন। ফরাসী বিপ্লবের পরে—সবকিছুর পরিবর্তনের সঙ্গে নৃত্যশিল্পীদেরও মধ্যে মুক্তির আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন যুগের বিষয়বস্তু, পোষাক-পরিচ্ছদ, সঙ্গীতছন্দ, সব কিছুর বন্ধন থেকেই তাঁরা মুক্তি চেয়েছিলেন। তবে প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করতে গেরেই, ফরাসী অপেরাতে নর্তক-নর্তকীর জন্য "maillot"

মানুষ এক প্রকার রেশমী পোষাক উদ্ভাবিত করেছিল। এই পরিচ্ছদটি গায়ারের রেশম দিয়ে তৈরী—সমস্ত দেহটি আবৃত করার উদ্দেশ্যেই তৈরি। এই পরিচ্ছদটি পরে নৃত্য করলে সমস্ত অঙ্গলীলাই দর্শকরা দেখতে পান ব'লে পোষাকটি ব্যালে-নৃত্যে স্থায়ী পরিচ্ছদের মর্যাদা পেয়েছে। বলা বাহুল্য, পোষাকটি উদ্ভাবনে নৃত্য-কলার দ্রুত উন্নতি ঘটেছিল।

প্যারিস ব্যালে-নৃত্যের প্রধান কেন্দ্র হ'লেও, বড় বড় নৃত্য-শিল্পীর অনেকেই আসিতে ইতালীয় ছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কেন্দ্রটি প্যারিস থেকে ইতালীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ব্যালে-নৃত্যে ইতালীয় ক্যাপ্রিস সুর এবং অভিনয়ের প্রাধান্য ঘটেছিল।

মিলনে সহরে লা স্কেলার অর্থে শিল্পী সালভাটোর ভিগানো (১৭৬৯-১৮২১) অঙ্কনকুশলতা দৃশ্যপট ও সংগীত সহকারে কতকগুলি ব্যালে-নাট্য উপস্থাপিত ক'রে প্রচুর খ্যাতিলাভ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর রোমান্টিক ব্যালে-নাট্যে সুদৃশ্য বিচিত্র দৃশ্যসজ্জার উপাদানটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সংগীত ও নাটকের দিকটিও, বিশেষভাবে রচিত, সংগীত ও গ্রন্থের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিল। এই সব ব্যালে-নাট্যের মধ্যে সব চেয়ে নাম করা হ'চ্ছে—জী কোরালি'র (১৭৭৯—১৮৫৪)—Giselle। এই নাট্যের নাটকাংশ রচনা করেছিলেন—থিওফিলে গোতিয়ে এবং সংগীতাংশ রচনা ক'রেছিলেন—এডোলফি এডাম। কালক্রমে ব্যালে প্রথার বন্ধনে গতি হারিয়ে ফেলেছিল এবং কেন্দ্রটি ইতালী থেকে রাশিয়ায় সরে গিয়েছিল। মহান পিটারের (Peter the Great) পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহ দেওয়ার পর থেকে, রাশিয়ার রাজসভায় এবং ধনীশ্রেণীর নাগরিকদের

প্রকাশিত হল

উপনিষদের দর্শন

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল পরিবেশন। উৎকৃষ্ট সংস্করণ। [৭·০০]

আমাদের অন্যান্য বই

ড: শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই :

ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য [১৫·০০]

সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী-সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের সর্বশেষ আকর-গ্রন্থ :

বৈষ্ণব পদাবলী [২৫·০০]

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের সরল আলোচনা :

রবীন্দ্র দর্শন [২·৫০]

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত ও সাহিত্যকীর্তি আলোচিত :

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস মোট ১৪ খানি একত্রে [১২·০০]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস মোট ৬ খানি একত্রে [৯·০০]

ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ও বহু রঙীণ চিত্র-সংযোজিত আধুনিক সংস্করণ :

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত [৯·০০]

বাঙলা সাহিত্য-চর্চায় নিত্যসঙ্গী

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান [৮·৫০]

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ [১২·০০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

অমিদারিতে ব্যালের প্রতিষ্ঠা বাড়তে থাকে। নৃত্য-পরিচালকরা বিদেশী হ'লেও, নর্তক-নর্তকীদের রাশিয়া থেকেই তাঁরা সংগ্রহ করতেন; ফলে রাশিয়ার ব্যালেতে লোক-নৃত্যের বলিষ্ঠতা নিয়ে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল এবং অনতিবিলম্বেই রাশিয়ার নৃত্য-নাট্য আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এই সুখ্যাতির মূলে ছিল Ichaikovsky, Serge Diaghilev Massine, Fokine প্রমুখ নৃত্য-নাট্যপরিচালকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। রাশিয়ার বিখ্যাত প্রতিভাময়ী নর্তকী আনা পাভলোভা (১৮৮২-১৯৩১) নৃত্য-জগতে অবিস্মরণীয় নাম, যেমন এক অবিস্মরণীয় নাম আমেরিকার বিখ্যাত নর্তকী ইসাডোরা ডানকান (১৮৭৮-১৯২৭)।

নৃত্য-নাট্যের ইতিহাস বিবৃত করার উদ্দেশ্যে এই প্রবন্ধ লিখিত নয় বলে, আর আমি নৃত্য-নাট্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বর্ণনা করব না। এই প্রবন্ধে আমি নৃত্য-নাট্যের বিলক্ষণ বৈশিষ্ট্যটি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছি—মূকাভিনয় ও অপেরা থেকে নৃত্য-নাট্যের পার্থক্য কোথায়, তা নির্দেশ করতে চেষ্টা করেছি। ঐ একই কারণে দেশকালের প্রভাবে নৃত্য-নাট্যের বিষয়বস্তুতে, পোষাক-পরিচ্ছদে, নৃত্য-ভঙ্গিমায়, নৃত্য-উপাদান ও মূকাভিনয়-উপাদানের সংযোগ-মাত্রায় যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করিনি। সুতরাং এ প্রবন্ধে নৃত্য-নাট্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রত্যাশা করলে অবশ্যই হতাশ হ'তে হবে। তবে নৃত্য-নাট্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের একটি রেখাচিত্র যে এখানে পাওয়া যাবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই রেখা-চিত্রে সব দেশের সব যুগের কথা পাওয়া যাবে না এ কথা যেমন সত্য, তেমনি এ কথাও সত্য—নৃত্য-নাট্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্রের উল্লেখ এতে বাদ পড়েনি। ইংলণ্ডে, আমেরিকায়, ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে নৃত্য-নাট্যের অভিনয় হ'য়েছে এবং এখনও হচ্ছে এ কথা ঠিক বটে কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলে চলবে না—ফ্রান্স, ইতালী এবং রাশিয়া যে-ভাবে 'কেন্দ্র' হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে, অন্যান্য দেশ সে মর্যাদা পায়নি।

আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ নৃত্য-নাট্য রচনা ও অভিনয় ক'রে নৃত্য-নাট্য প্রবর্তন করে গেছেন; তাঁর চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা নৃত্যনাট্যে সার্থক সৃষ্টি এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, শ্রীমতী উদয়শঙ্কর, অমলা, সিমকি প্রভৃতির নৃত্য-প্রতিভাও প্রশংসনীয় ও স্মরণীয়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও এ কথা মিথ্যা নয় যে আমাদের দেশে নৃত্য-নাট্য সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পের মর্যাদা লাভ করেনি—নৃত্য-নাট্য অভিনয়ের জন্য কোন স্বতন্ত্র প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয়নি—নৃত্য-নাট্যের রস আস্বাদন করবার জন্য উপযুক্ত দর্শকরুচি গড়ে উঠেনি। যেদিন তা' সম্ভব হবে সেদিন থেকেই ভারতীয় নৃত্য-নাট্যের উন্নতির সূত্রপাত হবে।

সোভিয়েট ব্যালে

গোপাল ভৌমিক

সোভিয়েট রাশিয়ার ব্যালে নৃত্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান মস্কোর বলশয় থিয়েটার এবং বর্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ার শ্রেষ্ঠা ব্যালে নর্তকী—ইংরেজিতে যাকে বলে প্রাইমা ব্যালেরিনা—হলেন মায়া প্লিসেট্স্কায়া। বলশয় থিয়েটারের ব্যালে নৃত্যের দল নিয়ে মায়া প্লিসেট্স্কায়া ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশে নৃত্যকলা প্রদর্শন করে বেড়িয়েছেন এবং সর্বত্রই বিশ্বের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা নর্তকীর সম্মান পেয়েছেন। এই দলের সর্বশেষ বিজয়াভিযান হয়েছিল কিছুকাল পূর্বে আমেরিকা ও ক্যানাডায়। তাঁরা তিন মাসের অধিককাল স্থায়ী এই ভ্রমণকালে বলশয়ের ব্যালে নাচ দেখিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৃত্যরসিকদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। ব্যালে নাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উৎকর্ষ বড় কম নয়। ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই ব্যালে নাচের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন এবং প্রত্যেক দেশেরই ব্যালে নাচের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তবু শ্রেষ্ঠা সোভিয়েট ব্যালে নর্তকী মায়া প্লিসেট্স্কায়ার সুপ্রসিদ্ধ 'সোয়ান লেক' নৃত্য দেখে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট কেনেডি এমন মুগ্ধ হয়েছিলেন যে নিউইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনের মত বিখ্যাত পত্রিকা বলশয়ের ব্যালে নাচকে বিনা যুদ্ধে হোয়াইট হাউস দখলের গোপন অস্ত্ররূপে বর্ণনা করেছিলেন। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে নৃত্যকলার মাধ্যমে এ ধরণের সম্প্রীতি সঞ্চারের নজির ইদানীংকালে বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে বড় একটা পাওয়া যায় না।

ব্যালে নৃত্যের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার এ ধরণের উৎকর্ষ ও সাফল্য কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনা বা আকস্মিক ব্যাপার নয়। বিপ্লবপূর্ব যুগে জারের আমল থেকেই ইউরোপে ব্যালে নৃত্যে রাশিয়ার একটা বিশেষ স্থান ছিল। বিপ্লবোত্তর যুগে সোভিয়েট রাশিয়া তার এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে শুধু বজায় রাখারই চেষ্টা করে নি, নানাভাবে এই প্রাচীন নৃত্যকলাকে নতুন ঐশ্বর্যে মণ্ডিত করে তোলার প্রয়াস পেয়েছে। বিশ্বের ব্যালে নৃত্যের ক্ষেত্রে বলশয় থিয়েটারের বর্তমান শ্রেষ্ঠত্ব সোভিয়েট রাশিয়ার অনুসৃত নীতির সাফল্যই সপ্রমাণ করে। বিগত তিন চার দশকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠা ব্যালে নর্তকীর সম্মান যাঁরা পেয়েছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিসম্পন্না তিনজন নর্তকীই হলেন জাতিতে রুশ—আনা প্যাভ্লোভা, উলানোভা এবং মায়া প্লিসেট্স্কায়া। এটা নিছক আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়—এই নৃত্যশিল্পে রাশিয়ার পূর্বাপর শ্রেষ্ঠত্বেরই নিদর্শন।

ব্যালে পাশ্চাত্য জগতের ক্লাসী নৃত্যকলা। আভিধানিক সংজ্ঞার দিক থেকে ব্যালে হল পেশাদার নৃত্যশিল্পীদের সম্মিলিত নাচ। কিন্তু আধুনিক ব্যালেতে যেমন সম্মিলিত নাচ তেমনই একক নৃত্যেরও অবকাশ যথেষ্ট। আর ব্যালের সব চেয়ে বড় যে বৈশিষ্ট্য সেটা হল সঙ্গীত ও নৃত্যের অপূর্ব সংশ্লেষ—চিত্রধর্মিতা ও সুরের অপরূপ সংমিশ্রণ। সঙ্গীত বলতে অবশ্য এখানে কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে যন্ত্রসঙ্গীতকেই বড় করে বোঝায় এবং সেও আবার সম্মিলিত যন্ত্রসঙ্গীত। তাই ব্যালে নৃত্যে নৃত্যকারিণী ও নৃত্যকারীদের চেয়ে সুরস্রষ্টার স্থান নীচে নয়। আমাদের দেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ঘরাণার মত এই সুরস্রষ্টারা স্বীকৃত মর্যাদার অধিকারী এবং বিভিন্ন দেশে তাঁদের সুরারোপ অবলম্বন

করেই গড়ে ওঠে প্রপদী ব্যালে নৃত্য। রূপের সঙ্গে তাল রেখে ব্যালেতে আধুনিকতা আমদানি না হয় এমন নয়—তবে প্রাচীন স্বীকৃত পদ্ধতির তীব্র ব্যতিক্রম বড় একটা দেখা যায় না। বাস্, নোভার্ত, সায়াকোভস্কি, মাস্থনোভ্, মেত্তেলসন, ব্যাভেল, প্রকোফিভ্ ও স্ট্রাভিন্স্কি—এই জাতীয় আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সুরস্রষ্টা। এই সুরস্রষ্টাদের মধ্যে কয় সুরস্রষ্টাদের সংখ্যা যে নগণ্য নয় আশা করি নামগুলি থেকেই তা সহজে বোঝা যায়।

শ্রেণীভেদে ব্যালে নাচের মাধ্যমে নৃত্যকারী বা নৃত্যকারিণী সুরের চিত্ররূপ যেমন দেন, তেমনই কোন কোন ব্যালে-নৃত্যে অভিনয় কলার অবকাশও যথেষ্ট আছে। এই শেষোক্ত ধরনের ব্যালে গড়ে ওঠে বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত নাটকীয় সঙ্গীতকে কেন্দ্র করে। সোভিয়েট ব্যালেতে এই দুই ধরণের নৃত্যেরই সন্ধান পাওয়া যায়। সার্থক ব্যালে নাচিয়ে হতে হলে নিছক সুগঠিত দেহের অধিকারিণী হলেই শুধু চলে না—সেই সঙ্গে চাই নৃত্যশিল্পে সুদীর্ঘ সাধনা যার ফলে দেহকে ইচ্ছামত বাঁকানো চোরানো চলে—এমন কি সঙ্গীতের সঙ্গে সমতা বজায় রেখে মঞ্চের উপর চিত্রায়িত ভঙ্গিতে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও যায়। সার্থক ব্যালে নাচিয়ের সে দক্ষতা দেখে মনে হবে যেন চোখের উপর কোন নিশ্চল ছবি দেখছি। আমাদের দেশে যেমন ভরতনাট্যম্, কথাকলি প্রভৃতি নাচ শিখতে গেলে গুরুর কাছে দীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, প্রকৃত ব্যালে নাচিয়েদেরও তেমনই শিক্ষা-গুরুর অধীনে দীর্ঘদিন সাধনা করতে হয়।

সোভিয়েট ব্যালে এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের ব্যালে মূলত একই শ্রেণীর নাচ হলেও গুণগত উৎকর্ষ ও ব্যক্তিনৈপুণ্য ছাড়াও সোভিয়েট ব্যালের কিছু কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্যও আছে। এই মূল বৈশিষ্ট্য হল সোভিয়েট ব্যালেতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পরীতি অনুসরণ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের উপর অধিকতর মনোযোগ আরোপ। পাশ্চাত্যের ব্যালে শিল্পীরা যেখানে বিশুদ্ধ রসচর্চার আদর্শে উদ্বুদ্ধ, সেখানে সোভিয়েট শিল্পীরা কিছু পরিমাণে উদ্দেশ্যপরায়ণ। শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ, তেমনই এক্ষেত্রেও সোভিয়েট ব্যালে শিল্পীরা মানুষের সুখ দুঃখ, আশা নিরাশাকে ব্যালের মাধ্যমে রূপায়িত করে তুলতে সচেষ্ট। এই আদর্শগত ব্যবধানের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে সোভিয়েট ব্যালে নৃত্যের চরিত্রগত কিছু কিছু বিভিন্নতাও চোখে পড়ে। যেমন ধরুন, পাশ্চাত্যের ব্যালে নৃত্য সাধারণভাবে যে পরিমাণে সূক্ষ্ম কারুকার্যে সমন্বিত, সোভিয়েট ব্যালে সাধারণত তা নয়। উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রবণতা থাকার ফলে সোভিয়েট ব্যালেতে দৈহিক বলপ্রয়োগ, ক্রীড়াকৌশল, লম্ফ-ঝম্পাদির উপর কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি জোর দেওয়া হয়। অবশ্য সোভিয়েট ব্যালের যেটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সেই সায়াকোভস্কির 'সোয়ান লেক' সম্বন্ধে আমার এ উক্তি খাটে না। 'সোয়ান লেক' আধুনিক ব্যালে-নৃত্যে মানবিক আশাবাদ ও সৌন্দর্যতত্ত্বের এক অপূর্ব সৃষ্টি। এই নৃত্যটিতে প্রধান নায়িকার ভূমিকায় যে অপূর্ব কলাকৌশল প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় তা সহজলভ্য নয়। তাই সোভিয়েট রাশিয়ার সকল ব্যালের মধ্যে এটিকেই কষ্টি পাথরের মর্যাদা দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না শ্রেষ্ঠা ব্যালে-নর্তকী বা প্রাইমা ব্যালেরিনার মর্যাদা যিনি চান তাঁকে এই 'সোয়ান লেকে'র প্রধান ভূমিকায় নৃত্যাভিনয় করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিতে হয় সর্বাগ্রে। এক সময় 'সোয়ান লেকে'র মূল ভূমিকায় দক্ষতার প্রমাণ দিয়ে উন্নীতা হয়েছিলেন যেই প্রাইমা ব্যালেরিনা, আজ আবার তাঁরই স্থলবর্তিনী হয়ে যারা রিপেটিশন্ করছেন প্রাইমা ব্যালেরিনা।

অনেক কালি-ই আসবে
যাবেও অনেক কালি।
কালির সেরা **সুলেখা**
থাকবে চিরকাল-ই॥

I.S. 1221

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

SW

একটি শিল্পকলার এক বছরের ইতিহাস

(আমেরিকান ব্যালে-নৃত্য)

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

নড়তি, নড়তি, নড়তি—মানুষের মনের ও দেহের উজ্জীবনের সরস মন্ত্র আছে নৃত্যের তালে তালে, একথা আজ সারা বিশ্ব স্বীকার করে নিয়েছে। নৃত্যকলা জাতীয় সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট অভিব্যক্তি এবং সেই অপূর্ব সম্পদ যে নানা আঙ্গিকে ও ব্যঞ্জনার শৈলীতে পরিস্ফুট হয়ে রসিক চিত্তকে উন্মোচিত, উন্মথিত ও উন্মীলিত করতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলা-চেতনার ইতিহাস। তার উক্ত ও নিরুক্ত অধ্যায়গুলি নৃত্যের মধ্য দিয়েই সূক্ষ্ম কুশলী সৃজনশীল রূপ নিচ্ছে, রসমূর্তি গড়ছে, ১৯৬২ সালের কাহিনী অন্ততঃ সেই সাক্ষ্যই দেয়।

পেশাদারী ব্যালে-নৃত্যের দলগুলির প্রাণচঞ্চল উদ্ভব ও তাদের পরিবর্ধমান পরিধির কথা আমরা জানি কিন্তু এই বিস্তীর্ণ মহাদেশের নানা স্থানে যে সব নৌজীবন সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে তারা কি শুধু সখের দালালী করছে, না নৃত্যগীত পাগল তরুণ তরুণীর এক ধরণের খেয়াল মেটাচ্ছে, না এ তাদের যুক্ত মনের সমষ্টিগত সৃষ্টির আর একটি অভিনব বিকাশ? এ প্রশ্ন অসঙ্গত নয় কিন্তু ১৯৬২ সালে তাদের সংখ্যা যে দুশোর গণ্ডী পেরিয়েছে, এইটেই প্রমাণ করে যে তাদের লোকপ্রিয়তা বাড়ছে এবং ব্যষ্টির জীবন পেরিয়ে ঐ ধরণের কারুশিল্পচর্চা সমষ্টি জীবনকেও পাকাপাকিভাবে প্রভাবান্বিত করছে।

আজকের দিনে জনমনে টেলিভিশন্ এমন এক স্থান অধিকার করেছে যে এর অবদান আর অবহেলার বস্তু নয়। টেলিভিশনের মাধ্যমে ঘরে বসে আজ মার্কিন জনসাধারণ, তার বধূ, তার কন্যা, তার মাতা, তার পুত্র, তার স্বামী, তার মুটে মজুর চাষী বড়লোক কর্মী রাজনীতিজ্ঞ শিক্ষক সবাই সারাদিন ধরে নিত্য নূতনভাবে ক্ষণে ক্ষণে পরিচিত হচ্ছেন জীবনের নব নব ছন্দের সঙ্গে। লোকনৃত্য, স্কোয়ার নৃত্য, বলরুম নৃত্য, ট্যাপ নৃত্য প্রভৃতি কত ধরণের কত নাচের কথা আমরা যে পড়ি তা বলতে পারা যায় না। ১৯৬২ সালে একমাত্র স্কোয়ার নৃত্যেই সক্রিয়ভাবে সমর্পিতপ্রাণ অনুরাগী-দলের সংখ্যা ছিল লক্ষাধিকের বেশী—আর লোকনৃত্যের সাদর বাগ্র সমর্থকের সংখ্যাও কম ছিল না।

মার্কিন দেশে 'নৃত্যপত্রিকা' নামে একটি বহুল প্রচারিত কাগজ আছে। তাদের বিচারে ১৯৬১ সালে তিনজন বিশিষ্ট শিল্পী সম্মানিত হন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'মেলিসা হেডেন' (Melissa Hayden) যাকে বলা যেতে পারে তিনি একজন উচুদরের কলাকুশলী ব্যালেরিনা। আর ছিলেন অ্যানা সকোলভ্ (Anna Sokolov) যাঁর ছিল একটা খাঁটি প্রাণ ও সৃজনশীল দুঃসাহসিক প্রগলভতা। গোয়েন ভার্ডন (Gwen Verdon) ছিলেন এই ত্রয়ীর আর একজন—যাঁর বিদ্বেষহীন সহানুভূতি-প্রবণ মন, আর প্রয়োগবিদ্যার নিপুণতা তাঁকে গীতিবহুল হাস্যরসপ্রধান নৃত্যনাট্যে পারঙ্গম করে তুলেছিল।

শেক্সপিয়রের—মিড্ সামার নাইটস ড্রিম বা মধ্য গ্রীষ্মের রাত্রির স্বপ্ন—শতাব্দীর পর শতাব্দী, দেশে দেশে রসিকচিত্তকে মুগ্ধ করেছে। নিউইয়র্কে সিটি ব্যালে ইংরেজী ভাষায় তৈরী করলেন সেটিকে স্তবকবদ্ধ অভিনয় করে। সঙ্গে ছিল মেন্ডেলসনের জগদ্বিখ্যাত অমর সুর ধারালো নাচের সঙ্গে মেলিসা হেডেন, এডওয়ার্ড ভিলেল্লা আর অন্যান্যদের অভিনয় নৈপুণ্য ও দৃষ্টা।

থাকবেন তাঁরা আমাদের পরস্তরাল। সত্যি কথা বলতে কি বলতেন,—সেক্সপিয়র, বাপু হে, সে তো সেদিনকার ছেলে—বাইবেলের মোজার গল্প পড়েছো। প্রলয়ঙ্করীর তাণ্ডবনৃত্যে যখন সব ভেসে গেলো তুষার বন্যার স্রোতে। আইরিশ স্ট্যাভিনস্কি তারই কাহিনী রসিয়ে করিয়ে বানিয়ে টেলিভিশনের অভিনয়ের জন্য লিখলেন, "নোয়া ও বন্যা"। নিউইয়র্কের সিটি ব্যালেট তার প্রথম রূপদান করলেন—ধন্য ধন্য রব উঠলো অনেক ভবনে ও ভুবনে।

আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যালে-নৃত্য যে কতটা ধারক ও বাহক হিসেবে গণ-চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তারই পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি যে কেনেডী সম্পত্তীও হাউসোয়ে দুটি এই ধরনের নৃত্যাংগের প্রযোজনা করলেন। জেরোম রবিন্স মঞ্চস্থ করলেন—"ব্যালে—ইউ. এস্. এ."র একটি সংস্করণ। আর একটি পালা হলো—"অক্টোবর-ফুল অফ. এ. ফল"—একটি কিশোরের বিকাশ। মনে পড়ছে বিখ্যাত ফরাসী কবি মালার্মের তত্ত্বোদ্ভাবিক বিখ্যাত কবিতা। গ্রীক পুরাণে বর্ণিত এই অর্ধনর-অর্ধপশু দেবতা অপরাহ্ণে নিস্তব্ধ আরণ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন অপ্সরাদের নৃত্যসম্ভোগ। রাষ্ট্রপতির অনুরোধে আমেরিকার নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতীক হিসাবে "বিলি দি কিড্"ও নৃত্যরসে সিক্তিত হয়ে অভিনীত হয়।

সুগন্ধি

বাসমতী চাউলের

পোলাও

উৎসবে অপরিহার্য্য

পশুপতি দাস

এণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

৩৭এ ও ৪৩-১ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-১৩

ফোন : ২৪-৪৩৯১/৮২ গ্রাম : "রাইসফিনস"

এ ছাড়া এ বছর বিদেশ থেকে কত নৃত্যশিল্পের দল এলো—সোভিয়েট ইউনিয়নের বলশই, সিংহলের জাতীয় নৃত্যবিদরা, স্পেনের হোসে গ্রেকো ও তাঁর দল, ভারতের বিশ্ববিখ্যাত উদয়শংকর ও তাঁর সম্প্রদায়—ভ্যান, মেক্সিকো, উক্রেন, বালি, কানাডা প্রভৃতি দেশ থেকে নর্তক ও নর্তকীর দল ভিড় জমালো রসিকজনের আবাহনে। লেনিনগ্রাদের "কিরোভ ব্যালে"র সেরা শিল্পী কলদক্, ফুরিয়েভ, শিকাগোয় এসে রাশপেজ্ অপেরার পাড়ি জমালেন এবং যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে যাবেন স্থির করলেন।

যেমন আসা তেমনি যাওয়া। মার্কিন নৃত্যশিল্পীরাও অন্য দেশের কলা তীর্থে তীর্থে আসর জমালেন 'মধুরেণ'। সাগর পেরিয়ে ঝুকুন ছাঁকিয়ে চললো শিল্পীর দল—নিউইয়র্ক সিটি ব্যালে, মরক্কো ব্যালানচাইনের নেতৃত্বে এলেন ইউরোপে—জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন কোন দেশই বাদ গেলো না। ঐ দলের জনজমাটি অর অরকার। মস্কোর সব টিকিট বিক্রী হয়েছিল বহুদিন আগেই।

জাতীয় সরকারের সাংস্কৃতিক বিভাগের সহযোগিতায় অক্টোবর মাসে আর এক দল মার্থা গ্রেহামের নেতৃত্বে আট সপ্তাহের জন্য চললো মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে। সহরের পর সহর মুগ্ধ হলো তাদের কলানৈপুণ্যে—টেল-আভিভ, আংকারা, এথেন্স, বেলগ্রেড, আগ্রাব, ওয়ারশ, মিউনিক্, কলোন্, স্টকহলম্, অসলো, হেলসিংকি, হেগ্।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা জেনে রাখা ভালো যে আমেরিকা থেকে ইউরোপে যাবার আগে মার্থা, ব্রডওয়েতে দুটি নৃত্যনাটিকার উদ্যোগ করেন—একটি গ্রীক ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত "ফিয়েস্তা" আর একটি "এ লুক্ এট্ লাইটনিং" বা বিদ্যুৎশিখার দিকে একবার চোখ মেলুন। সমালোচকদের মতে "ফিয়েস্তা" হয়েছিল "Brilliant এবং দ্বিতীয়টি হয়েছিল "a revealation of the human spirit at the moment of inspiration" মানবাত্মার অনুপ্রেরণার একটি অনির্বাণ দীপশিখা।

কুমারী গ্রাহাম এবং জোসে লিমনের আধুনিক নৃত্যশিল্পের দলগুলি কনেকটিকাটের উৎসবে যোগ দিয়ে আমেরিকায় এই কলা কি রকম উন্নতি করেছে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেন। এই বৎসরে নিউইয়র্কেও যে উৎসব হয়, তাতে যোগদান করেন এগারোটি অপেশাদারী দল। এতেই প্রমাণ হয় যে আমেরিকার শিল্পমন আস্তে আস্তে এরা অধিকার করে নিচ্ছেন। নিউইয়র্ক টাইমসের মন্তব্য স্মরণি—a sizable appetite for dance has developed in the United states since the end of World war II—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই মার্কিন মুলুকে নৃত্যগীতের আদর বেড়ে যাচ্ছে।

এই ললিতকলা শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও বেড়ে চলেছে। দেশের নানা স্থানে কলাকেন্দ্র স্থাপিত হচ্ছে—মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলিতে ব্যালে নৃত্যের শিক্ষণ ব্যবস্থা আছে। মেট্রোপলিটন অপেরা কোম্পানী একটা ভ্রাম্যমান দল গঠন করেছেন এইজন্য। অনেক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েও এই ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। ওহিওতে ব্যালেশিক্ষার 'workshop' বা কারখানাই স্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে—মেইন্, টেক্সাস্, উইনস্কনসিন্, ইলিনয়স, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়েষ্ট ভার্জিনিয়া, নিউ হ্যাম্পশায়ার প্রভৃতি রাজ্যে এদের উৎসব বৈঠক বসে। ব্রিজওয়াটারে "নিউ-ইংল্যাণ্ড ফোক্ ফেষ্টিভ্যাল" বা লোক উৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দর্শক মাত্রকেই সানন্দে আমন্ত্রণ জানানো হতো সমবেত লোকনৃত্যে যোগ দেবার—এক একটা জন-সমষ্টির বেষ্টনীতে।

দেখা যাচ্ছে, সারা বিশ্বের দুনিয়ার বিনি নটরাজ তাঁর পরিবেশের আর বিরাম নেই—বিপুলা পৃথ্বী আর রসিকচিত্ত নিয়েই তাঁর কারবার—দেশ-কাল-পাত্র ছাড়িয়ে তাঁর অনন্তলীলা—পৃথিবীর যত জ্ঞানীগুণী তাঁর চেলা।

আমাদের দেশের বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের পরিভাষার রূপক উজ্জ্বলনীলমণির কথায় বলা যেতে পারে এইসব নৃত্যবিলাসের লাবণ্যরসময়। লাবণ্যবলতে তাঁরা বুঝতেন মুক্তাফলাদির অন্তর থেকে যে ছটা বেরোয় তার প্রতিভাস।

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমকয় হাতি
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল—চলই
তাঁহা তাঁহা থল—কমল—দল খলই
.....
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুসুম পরকাশ। (গোবিন্দদাস)

SEASON'S GREETINGS.....
from the manufacturers of

CROWN BRAND

Aluminium Utensils & Articles
Brighten your home during these festival days with our Anodized Aluminium Articles and modern and han some Aluminium Utensils.
Crown Brand products are reliable & cheap
Select from a wide range of colourful articles displayed at our Showroom at 23, Brabourne Road.

Jeewanlal (1929) Ltd.
Crown Aluminium House
23, Brabourne Road, Calcutta-1
ADEN - BOMBAY - DELHI - MADRAS - RAJAHMUNDRY

ভয়েস অব আমেরিকার
বাংলা অনুষ্ঠান শুনুন—

প্রত্যহঃ
সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৭-৩০ মিঃ
১৯·৪৬, ২৫·৪৮ ও ৪২·১৯ মিটারে

ইংলণ্ডের ব্যালে-নৃত্য

উমা দেবী

আটলান্টিক মহাসাগর ও উত্তর সাগরে ঘেরা যে দ্বীপপুঞ্জটি একদা সমস্ত জগতের বিস্ময় ছিল শক্তিতে ও প্রভুত্বে আজ তার জ্যোতির্বলয় ক্রমশ ম্লান হয়ে আসছে। তবু ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ বলতে যে দেশটি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার স্মৃতি শুধু মুন্ময়ী নয়—সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের দিক দিয়ে চিন্ময়ীও স্বচ্ছন্দেই বলা চলে। উত্তরের অনুর্বর পার্বত্যভূমি ও দক্ষিণে উর্বর সমতলভূমি আর সারাবছর বৃষ্টিঝরা শীত, না ঠাণ্ডা না গরম জলবায়ু তার ওপর পার্শ্বে বহমান উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত দেশটিকে যেমন চরমে নিয়ে যায়নি তেমনি নিয়ে যায়নি দেশের মনকেও কোনো চরমে। অবশ্য সাহিত্যে সে পরমকে লাভ করেছে কিন্তু নৃত্যরসে বোধহয় সে পরমের স্পর্শ পায়নি।

আমরা প্রসঙ্গত ব্যালে-নৃত্যের কথাই উল্লেখ করছি। শব্দটির গ্রীকরূপের অর্থ "পা-ছোঁড়া" অর্থাৎ নৃত্য। গ্রাইডেন ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে শব্দটিকে প্রথম ইংরেজি ভাষায় ব্যবহার করেছেন আর ১৭০২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্যালে-নৃত্য হয় "The Travern Bilkers" নামে ডুরি লেনে।

অর্কেস্ট্রা বাদ্যের সঙ্গে অভিনয়াত্মক এই নৃত্যের উৎস যে ছিল রোমের নীরব অভিনয়কলা সে কথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে। এ নৃত্যের আদিরূপ ছিল নৃত্য-গীত ও বাদন সহযোগে অভিনয়। ফরাসী দেশে অপেরার ইতিহাসের সঙ্গে এ নৃত্যের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যদিও ইংলণ্ডে এর আবির্ভাব অপেরার অনেক পরে। বলতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে এর কোনো অস্তিত্বই ছিল না। আদি যুগে এর বিষয়বস্তু ছিল প্রাচীন কাহিনী কিন্তু পরবর্তী কালে এর বিস্তার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিষয়বস্তু হয়ে উঠল কাব্যিক বা নৈতিক এমন কি অদ্ভুত রসাত্মকও কোনো কোনো ক্ষেত্রে।

বিচিত্র ছিল এর প্রয়োগক্ষেত্র। মিলানের ডিউকের বিবাহ বাসরে এর প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল নিছক আমোদের উপাদান হিসেবে কিন্তু তৃতীয় হেনরির রাজ্য নিয়ে নাচা ঘানোকে সুদৃষ্টিতে রাণী ক্যাথরিন দেখতে পেলেন না বলে আয়োজন হল লাবণ্যময়ী লাস্যময়ী তরুণীদের হাব-ভাব-ইঙ্গিতে ভরা ব্যালে-নৃত্যের—রাজনৈতিক অস্ত্ররূপে প্রযুক্ত হল এই নিছক আমোদের উপাদান। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ লুই এই নৃত্যে এমন অনুরাগী ছিলেন যে প্রকাশ্য ভাবেই তাঁরা এসবে যোগদান করতেন। তিনিই রমণীকে অন্তর্ভুক্ত করে নৃত্যের রমণীয়তাকে বাড়িয়ে তোলেন। অবশ্য যতদিন পর্যন্ত তাঁর মেহটি ছিমছাম ছিল ততদিনই তিনি নেচেছিলেন কিন্তু বেজায় মোটা হয়ে যাবার পর তিনি নৃত্য ত্যাগ করতেই রাজসভা থেকে নৃত্যও অন্তর্হিত হল। কিন্তু এ সবই অনেক কাল আগের কথা।

বিংশ শতাব্দীতে ব্যালের নূতন রূপ দান করলেন ইসাডোরা ডানকান। প্রাচীন ব্যালে-নৃত্যে ভাব প্রকাশের প্রধান অঙ্গ ছিল পা আর পায়ের আঙুলের কাজ। আধুনিক পদ্ধতিতে সমস্ত দেহই ভাবপ্রকাশের সার্থক বাহন হয়ে উঠল। প্রাচীন ব্যালে-নৃত্যে মেরুদণ্ডের কঠিন শুচুতা ছিল সর্বাধিক কাম্য কিন্তু আধুনিক ব্যালে-নৃত্যে গভীর ভাবপ্রকাশের শক্তি অর্জিত হওয়ায় গণচিত্তে ভাবোদ্রেক করার কলাকৌশল অধিকতর ক্রিয়াকারী হয়ে উঠল। প্রাচীন যুগের গ্রীকধর্মক ভরা

নৃত্যপদ্ধতির চেয়ে এই নৃত্যপদ্ধতি যে অনেক বেশি গণসংস্কৃতির নিয়ামক ও অববোধক হয়ে উঠল—তাতে সন্দেহমাত্র নেই।

ইংলণ্ড হলো এই নূতন রীতির অনুশীলক। Kate Vaughan এই রীতির নর্তকী হিসাবে প্রচুর নাম কিনলেন। এই রীতির যথেষ্ট উন্নতিও তাঁর হাতে হয়েছিল। স্কট-ডাফিং-কে ইনিই জনপ্রিয় করে তোলেন। যাঁটি ব্যালে-নৃত্য থেকে এর বৈশিষ্ট্য হলো যে এতে পায়ের বুড়ো আঙুলের কারকাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসাব রাখতে হয় না। এই মহিলার দুই শিষ্যা Sylvia Grey এবং Letty Lind এই রীতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।

অবশ্য প্রাচীন ধারার ক্লাসিকাল পদ্ধতির ব্যালে-নৃত্য Adeline Genee লণ্ডনে নতুন করে উপস্থাপিত করলেন।

এর পরের যুগের ইতিহাস ব্যালে-নৃত্যের পক্ষে তেমন গরিমা বহন করে না। আধুনিক কালের বিহ্বল আমোদের অন্বরূপে এই নৃত্য জনমনশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে আনছে। জনসাধারণের বী-শক্তিকে আগ্রত করে তুলতে পারল না বলে এই নৃত্য ক্রমশই অনর্থকো দৃশ্যের অবতারণার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। লক্ষ লক্ষ টাকা এখন ব্যয় হচ্ছে বর্ণসন্নিপাতের বৈচিত্র্যময় অবস্থানের চাতুরি দেখাতে। দ্রুত বসন পরিহিতা তরুণীদের পটভূমির সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলবার জন্য মঞ্চে অবতীর্ণ করানো হচ্ছে। এমন কি অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যে একটি ব্যালে-নৃত্যদলের অধিকাংশই নৃত্যশিল্প সম্বন্ধে অজ্ঞ। তারা শুধু দেখতে সুন্দর আর পোষাক তাদের সুন্দর।

ব্যালে-নৃত্যে রুশদেশের সমকক্ষ কোনো দেশ নয়। ইংলণ্ডের প্রাচীনতম ব্যালে-নৃত্য-দল Bolshoi Ballet Royal Opera House-এ নৃত্য পরিকল্পনায় রাশিয়ার সমকক্ষ হবার আশা পোষণ করছেন। সম্প্রতি "The Travellers", "Conflicts", "A Place in the Desert" ইত্যাদি ব্যালে নৃত্যে তাঁরা আধুনিক জীবন থেকে উপাদান সংগ্রহ করে মহৎ শিল্পবোধে পরিণত করবার চেষ্টা করছেন। "Rambert Dancers" নামে নৃত্য দলটি বারটি নৃত্যশিল্পী নিয়ে স্বদেশে ও বিদেশে যথেষ্ট সৌরবও অর্জন করেছেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা দর্শকমাত্রেরই মনে আসবে—শিল্পকলার প্রতি আনুষ্ঠানিক ও নৈষ্ঠিক মনোবৃত্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মানব মনের নিগূঢ় ধর্মীয় উৎসবাভিলাষ, সৌজন্য ও দুঃসাহসিকতার প্রতি সমমনোবোধ যদি একটি ভাবঘন পরিবেশের সৃষ্টি না করে তা হলে কি নৃত্য তার চরম প্রকর্ষে গিয়ে পৌঁছতে পারে?

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে Claude Francois Menestrier লিখিত Des Ballets anciens et modernes গ্রন্থে ইতালিয়ান ও ফরাসী ব্যালে-নৃত্যের আলোচনা আছে কিন্তু ইংলণ্ডের নামগন্ধও নেই। সুতরাং ইংলণ্ডে আধুনিকতার হাওয়ায় উড়ে আসা এই ব্যালে-নৃত্য সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সংশয় কি আরো বেশি প্রযোজ্য নয়, এমন সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু মানবচিত্ত নিত্য-নূতনাভিলাষী এবং গভীরের প্রয়াসী বলে এবং ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক মান উচ্চাশ্রয়ী বলে নিরাশ হবার স্থায়ী কারণ নেই বলেই আমরা বিশ্বাস রাখছি।

অষ্ট্রেলিয়ার ব্যালে-নৃত্য

হিরণ্ময়ী বসু

যদিও অষ্ট্রেলিয়া আবিষ্কৃত হয়েছিল পশ্চিম মহাদেশগুলির অনেক পরে, সংস্কৃতি আর শিক্ষার দীপ জ্বেলে উঠতে যদিও অনেক দেরী হয়েছিল ; তবু এর ক্ষয়ে যাওয়া পর্বত চূড়ায় আজও প্রমাণিত হচ্ছে যে প্রকৃতির অফুরন্ত দানে সমৃদ্ধ এই প্রাচীন অষ্ট্রেলিয়া।

বৈজ্ঞানিকদের মতে কোন এক সময় এশিয়ার সঙ্গে সঙ্গে একখণ্ড ভূমি দ্বারা অষ্ট্রেলিয়া যুক্ত ছিল, কিন্তু সেই সংযোগ সেতু সমুদ্র গর্ভে লীন হয়ে গেছে প্রাগৈতিহাসিক জীবজন্তু আর গাছগাছালির সঙ্গে। নিঃসঙ্গ এই দ্বীপটি মহাদেশ হলেও পৃথিবীর আলোকপ্রাপ্ত দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করতে পারেনি। সেই কারণেই বোধহয় ফুলের সমারোহে প্রাচীন জীবজন্তু আর দুষ্প্রাপ্য গাছে পৃথিবীর যাদুঘরে পরিণত হয়েছে।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে অষ্ট্রেলিয়া আজও ভ্রমণ বিলাসীদের কাছে খুবই আকর্ষণীয়। উত্তর পূর্বে গ্রেট বেরিয়ার কোরাল পর্বতগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দক্ষিণ পূর্বে তল নেমেছে নিম্ন ভূমির। গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ আমন্ত্রণ জানায় দক্ষিণ পূর্ব মৌসুমি বায়ুকে, যার ফলে মধ্যভাগে হয় প্রচুর বৃষ্টিপাত। পর্বতগুলির যত দূরে যাওয়া যায় বৃষ্টিপাত তত কম হয়। সেই অনুকূল আবহাওয়ায় জন্মায় প্রচুর ঘাস। এই ঘাসের দৌলতেই পশু পালনে নাম আছে অষ্ট্রেলিয়ার। পশম আর মাংস রপ্তানিতে অষ্ট্রেলিয়া এখন পৃথিবীর একটি সেরা দেশ। অষ্ট্রেলিয়ার সম্পদ এখন শুধু গৃহপালিত পশু নয় সেই সঙ্গে দ্রাক্ষা, নল, নানাজাতীয় ধাতব পদার্থ।

অষ্ট্রেলিয়ায় আজও বাস করে বহু আদিবাসী, তাদের বলা হয় 'ব্ল্যাক ফেলো'। সেই সঙ্গে আজও আছে আদি জীবজন্তু যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

অষ্ট্রেলিয়ার জাতীয় পাখি এমু, যাকে বলা হয় অষ্ট্রেলিয়ান অস্ট্রিচ। এ ছাড়াও আছে 'যাওয়ার বার্ড' কোকাটুস আর সুন্দর সুন্দর গাইয়ে পাখি। সেই গানের সুর আর রোদা অষ্ট্রেলিয়ার শিল্পকলায়।

আজকের অষ্ট্রেলিয়া আর অন্ধকারে আচ্ছন্ন নয়। আজ সঙ্গীতে শিল্পে, শিক্ষায় নৃত্যগীতে অষ্ট্রেলিয়া সুনাম অর্জন করেছে। অফুরন্ত প্রকৃতির দানে পুষ্ট অষ্ট্রেলিয়ানরা নিজেদের বিকশিত করেছে অপূর্ব ব্যালে-নৃত্যে। এই নৃত্যকলা অষ্ট্রেলিয়ার যদিও প্রাচীন ঐতিহ্য নয়—এটি তাদের নৃত্যকলার নব সংযোজন।

ব্যালে-নৃত্য শিখে আজ তারা অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশ থেকেই প্রেরণা এবং রসদ সংগ্রহ করছে। তাদের ক্লাসী নৃত্যে লোক নৃত্যে যেমন সুনাম আছে তেমনি ব্যালে-নৃত্যের ভেতরেও তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে ছন্দে সুরে যন্ত্রসঙ্গীতের মূর্ছনায় নৃত্যের তালে তালে পরিমূর্ত করে তুলছে। কোন একটি

সুসংবদ্ধ কাহিনীকে কিম্বা কোন একটি ঘটনাকে তারা ঐতিহাসিক সামাজিক বা লোককথার রূপ দান করে ব্যালে-নৃত্যের মাধ্যমে।

প্রেক্ষাগৃহে আলোক-সম্পাতে, বাদ্যযন্ত্রের অপূর্ব ধ্বনি, নৃত্যরতা অষ্ট্রেলিয়ানদের অনবদ্য বেশভূষা কিছুক্ষণের জন্য দর্শকের মনকে তার পার্থিব জগত থেকে অন্য এক পরিবেশে নিয়ে যায়; কিন্তু তার ভেতরেও অষ্ট্রেলিয়ানদের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বোধের চেতনা স্ফুরিত হয়।

বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ানদের সামাজিক জীবনের বাস্তব রূপ যেমন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, তেমনি তাদের নৃত্যশিল্পেও এই বাস্তব রূপ পরিস্ফুটনের প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে। শিল্পকে তারা আজ ব্যবহারিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে art for life's sake-এ রূপান্তরিত করতে প্রয়াসী। তাই অষ্ট্রেলিয়ার নৃত্যে আজ কাহিনীর সঙ্গে বলিষ্ঠতার প্রভাব। রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত। দল বেঁধে ব্যালে নৃত্যশিল্পীর দল আজ শুধু প্রাকৃতিক প্রভাবেই নিজেদের সৌন্দর্যবুদ্ধিকে লোক-শিল্পে আবদ্ধ রাখেনি—তারা জীবনের রাজপথেও পা বাড়িয়েছে।

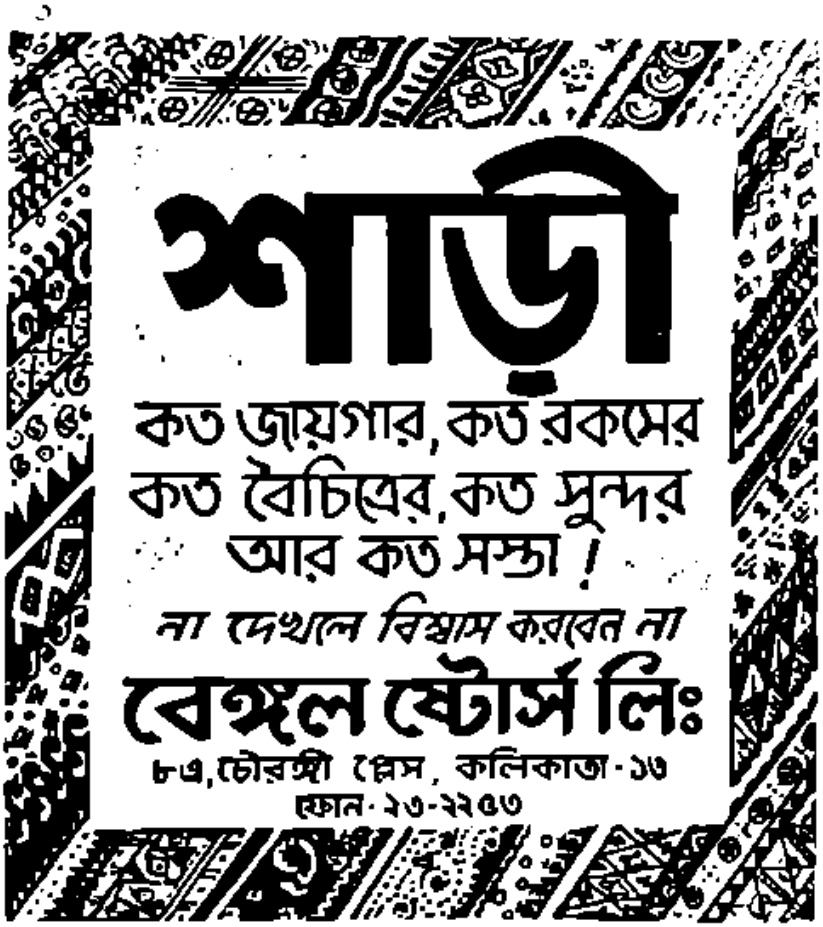

॥ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিভাগীয় বিপণী ॥

ফরাসীদেশে ব্যালে-নৃত্য

রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

'এই প্যারী নগরী ইউরোপীয় সভ্যতার গোমুখ।'

স্বামী বিবেকানন্দ একদা বলেছিলেন, "এ বিরাট রাজধানী মর্ত্যের অমরাবতী সদানন্দনগরী। এ ভোগ, এ বিলাস, এ আনন্দ না লণ্ডনে, না বার্লিনে না আর কোথায়। লণ্ডন, নিউইয়র্কে ধন আছে। বার্লিনে বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট; কিন্তু নেই সে ফরাসী মাটি, আর সর্বাপেক্ষা নেই সে ফরাসী মানুষ। ধন থাক, বিদ্যাবুদ্ধি থাক, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও থাকে—মানুষ কোথায়? এ অদ্ভুত ফরাসী চরিত্র প্রাচীন গ্রীক মনে জন্মেছে যেন—সদা আনন্দ, সদা উৎসাহ। অতি ছাবলা, আবার অতি গম্ভীর, সকল কাজে উত্তেজনা, আবার বাধা পেলেই নিরুৎসাহ। কিন্তু সে নৈরাশ্য বেশিক্ষণ থাকে না। আবার জেগে ওঠে।"

এই হল ফরাসী জাতির চরিত্র।

'ইট্ ইজ্ এণ্ড বি মেরী'—এই জীবন-দর্শন যেমন আছে তেমনি সংস্কৃতির প্রতি প্রীতিও সমান তালে বর্তমান রেখেছে এঁরা জীবনের সর্বস্তরে এবং সেই তালে জীবন ছন্দিত ও স্পন্দিতও হয়েছে যুগে যুগে, কালে কালে। দেশবিদেশের মানুষের কাছে ফরাসী জাতি এবং ফরাসী দেশ সম্বন্ধে বেশ একটা আকর্ষণ আছে অনুভব করা যায়।

সব মানুষই কর্ম জীবনের মধ্যপথে একটি মুহূর্তের বিশ্রাম চায় হাল্কা দেহ মন নিয়ে। আজকের দেশবিদেশের মানুষ ফরাসী দেশে আসেন এমনি সদানন্দে থাকতে। সেই আনন্দময় মন যে দেশের তাদের সাংস্কৃতিক জীবনচর্যাও নানাবিধ ছন্দে লীলায়িত।

কী সংগীতে—নৃত্যে, আহারে বিহারে—সব কিছুর মধ্যে নিজেদের খুশি মেজাজের আমেজ রেখে গেছে। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে যখন অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃন্দনৃত্য বা ব্যালের প্রচলন খুব বৃদ্ধি পায় তখন ফরাসী দেশেও তার চরম উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। ব্যালের প্রথম যুগের প্রদর্শনের মধ্যে দেখা যেত দেশ-প্রচলিত কাহিনীকে বেছে নিয়ে তাকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত হতে। এগুলি সাধারণ লোকের খুবই মনোহরণ করতে পেরেছিল। ফরাসী ব্যালে-নৃত্য দেখতে দেখতে মানুষের মনে সেই নাটকের ভাব-কাহিনী গভীর রেখাপাত করতো। পানাহারে উন্মত্ততা যেমন ফরাসী দেশে প্রচলিত ছিল তেমনি পবিত্র প্রেমের অনুরাগেও তাদের আগ্রহ দেখা যেত এইসব নৃত্যনাটক বা ব্যালেতে।

ফরাসী দেশের অবস্থান ও পারিপার্শ্বিকতা জাতীয় জীবনে এঁদের উচ্ছল প্রাণপ্রবাহ বিশেষ ভাবে দায়ী। দেশের জলবায়ু আবহাওয়া প্রাকৃতিক বৃত্তাবলী; সব কিছুই এক ফরাসী মেজাজ তৈরি করেছে। তাঁদের ব্যালে-নৃত্যও তেমনি বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ। ইউরোপ ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যালে প্রচলিত, ফরাসী দেশের ব্যালের মধ্যে বিশেষ ভাবের আঙ্গিক প্রবর্তন করা হয়।

ব্যালে সংগীত নৃত্য-বাদ্য-রীতি তিনটিরই সমন্বয়ে গঠিত নৃত্যনাট্যগুলি বা ব্যালে-নৃত্য। এমনি একটি পরিবেশ রচনা হয় নৃত্য ভঙ্গিমায়, সাজ পোষাকে এবং সিম্ফনী মিউজিকের প্রভাবে।

ব্যালের মধ্যে যে প্রধান বস্তুটা তাকে ছাপিয়ে অনেক সময় ফরাসী গীতিকবির গানগুলিই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ফরাসী সমাজের খুবই অনুকূল এই ব্যালে-নৃত্য প্রদর্শন।

ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে দেশের মধ্যে যে রেনেসাঁসের সূত্র হল তাতে ব্যালেরও অনেক প্রচলন বৃদ্ধি পেল। নতুন নতুন টেক্‌নিকে প্রদর্শন চলতে লাগলো। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষাও আরম্ভ হল—প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও এই পরীক্ষা নিরীক্ষাই চলেছে তবে ফরাসী দেশের সংস্কৃতির অনুকূল ব্যালে আজ আরো প্রচলিত আছিক ও ভাবে আমাদের চোখে ধরা দিলে ভালো হত।

ইউরোপীয় সভ্যতার গোড়ুী ফরাসী দেশ; তার ব্যালেও সেই সম্মান রাখছে বহু বছর থেকেই।

With the best compliments of :

THE EAST BENGAL RIVER STEAM SERVICE LTD.

Managing Agents :

Raja Sreenath Roy & Bros. Private Ltd.

87, SOVABAZAR STREET, CALCUTTA-5.

Telegrams : "INDOSTEAM" Calcutta.

Telephones : 66 {1138 1019 (3 Lines)

জার্মানীর ব্যালে-নৃত্য

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়

ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠভূমি জার্মানী। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জার্মান জাতির অতুলনীয় অবদান তাকে মহিমান্বিত করেছে, বিশ্বজনের কাছে শ্রদ্ধান্বিত করেছে। গ্যেটে, শীলার, বাখ্, হ্যান্ড, আইনস্টাইন, বেটোফেন প্রমুখ জার্মান মনীষীবৃন্দের নাম বিশ্বের সর্বদেশে বিশ্বজন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন।

জার্মান মনীষীর এই গৌরবোজ্জ্বল স্বাক্ষর ব্যালে-নৃত্যের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত। ব্যালে-নৃত্যের প্রসঙ্গে বলতে গেলে সাধারণত রাশিয়া ও ব্রিটেনের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়ে থাকে। কিন্তু জার্মান ব্যালের গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, ব্যালে-নৃত্যের ক্ষেত্রে জার্মানীর অবদান উপেক্ষণীয় তো নয়ই, বরং তা বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে।

নৃত্য বলতে ইউরোপে ব্যালের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখিত হয়ে থাকে। ব্যালে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য নৃত্যকলা এবং ব্যালের বিকাশে ইউরোপের সকল জাতির কিছু না কিছু ভূমিকা আছে।

ব্যালে-নৃত্যের আঙ্গিকগত সৌষ্ঠব ঊনবিংশ শতাব্দীতে সবিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে এবং ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে ব্যালের ছন্দময় উপস্থাপন দর্শকদের মুগ্ধ করে। কিন্তু তখনও জাতীয় লোক-নৃত্যের প্রভাব ছিল অপ্রতিহত। এরপর আসে এক আকস্মিক পরিবর্তন।

১৯০৪ সালে ইসাডোরা ডানকান্ নামে জনৈকা মার্কিন মহিলা সর্বপ্রথম জার্মানীর বার্লিন শহরে একটি নৃত্য শিক্ষায়তন স্থাপন করেন।

তিনি এখানে ব্যালের প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তন করে নিজস্ব রীতিতে ব্যালে প্রবর্তন করেন। তাঁর এই নৃত্যপদ্ধতি মিশেল ফকিনকে প্রভাবান্বিত করে এবং তিনি শ্রীমতী ডানকানের রীতি অনুসরণে রাশিয়ান ব্যালের পরিবর্তন সাধন করেন। তারপর রাশিয়ার ডিয়াগিলেভ-এর প্রবর্তিত ধারার প্রভাবে সমগ্র ইউরোপে ব্যালে-নৃত্য নতুন ধারায় অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

১৯১০ সালে মেরী ভিগম্যান্ জার্মানীর ব্যালে-নৃত্যকলায় এক যুগান্তকর পরিবর্তন সাধন করেন এবং ১৯১৩ সালে রুডলফ্ ফন লাবান-এর সহযোগিতায় তিনি জার্মানীতে এক সুদূরপ্রসারী নববারা প্রচলন করেন।

লাবান শুধু একজন অভিজ্ঞ নৃত্য-শিক্ষক ছিলেন না, নৃত্যতত্ত্বের তিনি একজন বিশেষজ্ঞও। তিনি তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে নিজস্ব চিন্তাধারার বাস্তব রূপদান করেন। তাঁর নৃত্যধারা শুধু জার্মানীতে সীমিত থাকে নি, প্রাচীন ব্যালে-নৃত্যের কৃষ্টিভূমি ইটালী, হাঙ্গেরী ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে প্রভাব বিস্তার করে।

এইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে জার্মানীতে ব্যালে-নৃত্যের যে সূত্রপাত হয় তা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকে।

শ্রীআয়ুর্বেদমের
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক
ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

মানে ও গন্ধে অতুলনীয়
একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড়
ষ্টেশনারী দোকানে
পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

১৯৪৫ সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত জার্মানীতে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়, ব্যালে-নৃত্যের ক্ষেত্রে যে 'নতুনের অভিযান' শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত থাকবে কিনা। ১৯২০ সাল থেকে প্রাচীন ও নতুন ধারার মধ্যে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল এখন তার অবসানের সম্ভাবনা দেখা দিল। ব্যালে-রচয়িতারা দেখলেন, জার্মানীতে ব্যালের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে তাঁদের নৃত্যপদক্ষেপে নতুনের পথেই অগ্রসর হতে হবে, প্রাচীনের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না।

জার্মান ব্যালে-স্রষ্টাদের নতুন নৃত্যধারা শুধু জার্মানীতেই দর্শকদের প্রশংসা লাভ করেনি, বিদেশেও বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছে এবং 'নতুন জার্মান নৃত্য' রূপে অভিহিত হয়েছে।

প্রাচীন ব্যালে-নৃত্যপদ্ধতিতে আইনকানুনের নিগড় পদে পদে। নতুন জার্মান নৃত্যধারা আইনকানুন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নবধারায় নর্তকের নিজস্ব রীতি প্রদর্শনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। যাঁরা এর নিয়মের সে এখানে দাস নয়, নিজস্ব রীতির সে স্রষ্টা। এইভাবে বর্তমানে ব্যালে-নৃত্য-রচয়িতারাই হচ্ছেন নৃত্যের প্রাণস্রষ্টা। তাঁদের পরিকল্পনাকেই নৃত্যে রূপায়িত করেন নর্তক-নর্তকীরা। কিন্তু আধুনিক নৃত্যকলার প্রকাশ হলো নর্তক-নর্তকীদের নিজস্ব সৃজনশীলতায়, তাঁদের দূরদর্শিতায় ও নৃত্যভঙ্গিমায়। নৃত্যে তাঁরা যা প্রদর্শন করেন তা হলো সম্পূর্ণ তাঁদের নিজের।

জার্মান ব্যালের এই নবধারার স্রোত ক্ষীয়মান তো হয়নি, বরং তা ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করছে। ব্যক্তিগত নৃত্যস্রষ্টার এই প্রাধান্য ব্যালে নাটকে এক নবজীবন সঞ্চার করেছে।

উৎসবের দিনে

বিউলাক্স

জীবনে নিয়ে আসে আনন্দ। প্রতিদিনের অভাব অভিযোগ সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে প্রতিটি মানুষ নিজেকে এবং পরিবারের সকলকে সাধ্যমত সাজাতে সচেতন হন। আজকের দিনে রূপের শ্রীবৃদ্ধি করতে বিউলাক্স বিউটি ক্রীমের জুড়ি নেই।

প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকের (ডি, ফিল ও ডি, এস, সি) সুদীর্ঘ গবেষণার ফল পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিউলাক্স বিউটি ক্রীম নিয়মিত ব্যবহারে দেহবর্ণ অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোরম হয়

বিউলাক্স বিউটি ক্রীমের উৎকর্ষতা বজায় রাখার জন্য মৃদু গন্ধযুক্ত করা হ'য়েছে

অংকর ইণ্ডাষ্ট্রীজ, কলিকাতা

যুদ্ধোত্তর যুগের এই নবধারার মূল কথা হলো নর্তক-নর্তকীকে নিজস্বভাবে স্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে, অথবা পরিচালকের অপেরা-রচয়িতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সহযোগিতা করতে হবে।

যুদ্ধোত্তর যুগে শুধু যে ব্যালে-নৃত্যের পদ্ধতিতে বা উপস্থাপনে পরিবর্তন ঘটেছে তা নয়, মূল ব্যালে রচনার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছে। এবং তার ফলে প্রতীকী ব্যালেরও আবির্ভাব ঘটেছে।

যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে ব্যালে-নৃত্যের পদ্ধতি, উপস্থাপন, তার সঙ্গীত ও বিষয়বস্তু নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে তা যেমন বিচিত্র তেমনি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। নতুন জার্মান নৃত্যধারা রঙ্গমঞ্চের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং রঙ্গমঞ্চও আজ নতুনের পথে অভিযাত্রী। সৃষ্টি-অভিলাষী মানুষ চিরদিন নতুনের পূজারী—তারই অভিব্যক্তি আজ জার্মান ব্যালে ও রঙ্গমঞ্চে প্রকাশমান।

মানুষের জীবনের ছন্দ নৃত্যেই প্রকাশিত। নর্তক নৃত্যের মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেন। নৃত্যের মধ্যেই মানুষ দেখতে পায় তার জীবনের গতি, তার আশা ও আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। মেরী উইগম্যান, হারাল্ড, কুরুৎজবার্গ, ওনী গর্গী, রুডলফ্ লাবান্ প্রমুখ জার্মান ব্যালের নবধারার প্রবর্তকেরা তাই আজ এই পথে অগ্রবর্তী এবং জার্মানীতে ব্যালে-নৃত্য আজ এত ব্যাপক ও জনপ্রিয়।

'রূপা'র বই

উপন্যাস

চক্ষে আমার তৃষ্ণা—বাণী রায়	৬·০০
এক যে ছিল রাজা—দীপক চৌধুরী	৫·০০
বাতাসী বিবি—অজিতকৃষ্ণ বসু [অ. কৃ. ব.]	৪·০০
অস্তগামী সূর্য—ওসামু দাজাই	৪·৫০
অনুবাদ : কল্পনা রায়	
শেষ গ্রীষ্ম—বরিস পাস্টেরনাক	৩·০০
অনুবাদ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	
মোনা লিসা—আলেকজাণ্ডার লাবেনেট-কলেনিয়া	২·৫০
অনুবাদ : বাণী রায়	
অপমানিত ও লাঞ্ছিত—ডস্টয়েভস্কি	৮·০০
অনুবাদ : সমরেশ বাসনবিশ	
সম্পাদনা : গোপাল হালদার	

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২

গল্প-ভারতী

কার্ত্তিক—১৩৭০

সম্পাদক :

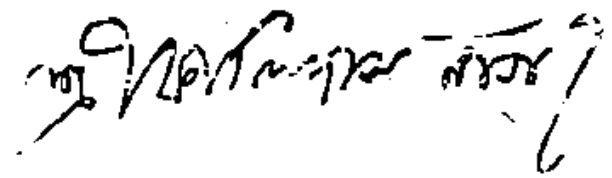

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২১৯বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

কাশি
বন্ধ
করুন !

বি.আই.
কফ সিরাপ

দমকা ও
পুরোনো কাশিতে
এবং শ্বাসনালীর
প্রদাহে বিশেষ উপযোগী।

বেঙ্গল
ইমিউনিটির
তৈরী

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—	২৮৯
মাতা দক্ষিণকালিকা—শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী	২৯১
উদাত্ত আহ্বান—	২৯২
অমৃত কথা ও কাহিনী—	২৯৩
গ্রহান্তরে যাত্রার পূর্বাভাস—তরুণ চট্টোপাধ্যায়	২৯৪
চিঠি শুধু চিঠি নয়—	২৯৯
চলতি দুনিয়া—	৩০০
চমক—	৩০৪
দোটানা—ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়	৩০৫
চোর—দিলীপকুমার দাশগুপ্ত	৩১৬
দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি—বররুচি	৩১৯
চাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার (ব্যঙ্গচিত্র)	৩২৩
চিত্র বিচিত্র—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ	৩৩২

কেশ ও মস্তিষ্কের পরম হিতকারী

মনোরম গন্ধযুক্ত "ভৃঙ্গল" আয়ুর্ব্বেদীয় মতে প্রস্তুত মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল। ইহা ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে এবং মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে।

ভৃঙ্গল

সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ কেশ তৈল

নতুন সুদৃশ্য ছোট শিশি প্রচলিত হইয়াছে। বড় শিশিও শীঘ্রই পাওয়া যাইবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা-২৯

BHRIN-I/62-63

এই সংখ্যায়

সর্পিল (উপন্যাস)—সমৃদ্ধ ৩৩৫

বিশ্ব-সাহিত্য

সাহিত্য ও সাহিত্যিক—গ্রীক কবি **জর্জ** সেফারিস—গৌরীশঙ্কর দে ৩৮০

দেশ-বিদেশ— ৩৮২

রাষ্ট্রসংঘ (সচিত্র সংযোজন)

Preamble to the Charter of the United Nations ৩৮৯

রাষ্ট্রসংঘ ও ভারতবর্ষ— ৩৯০

রাষ্ট্রসংঘ ও আপনি— ৩৯২

রাষ্ট্রসংঘের সারা বছরের কাজ— ৩৯৭

খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাষ্ট্রসংঘ— ৩৯৯

বুভুক্ষা থেকে মুক্তির সংগ্রামে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা— ৪০১

অনাহার ও তার প্রতিকারে রাষ্ট্রসংঘ— ৪০৩

• দেশ-দেশান্তর থেকে ভ্রমণকারীর দল রাষ্ট্রসংঘ দেখতে যায়। প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত ছবিতে রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল এসেম্বলি ভবনের সম্মুখ ভাগ ও ৩৯ তলা সেক্রেটারিয়েটের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে।

ভীমনাগের স্টীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

ফিলিপ্‌স

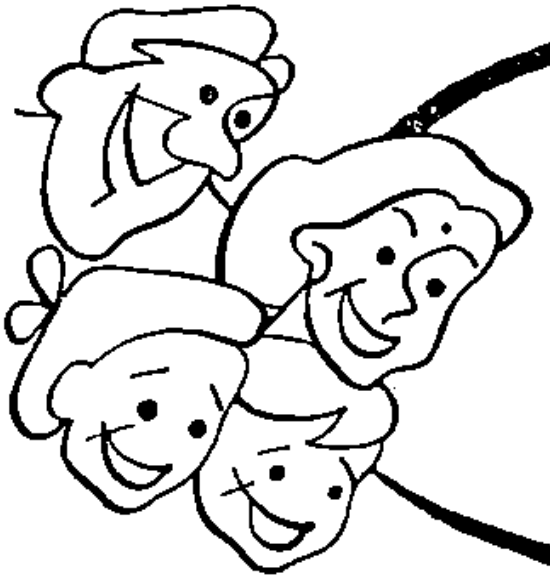

মিল্ক অফ্‌
ম্যাগনেসিয়া

পরিবারের সকলের পক্ষেই আদর্শ

বিরেচক-অম্লনাশক

এই নিশ্চিত উপায়ে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হচ্ছে!

কেবলমাত্র **একটিই** খাঁটি ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ্‌ ম্যাগনেসিয়া আছে—সারা পৃথিবীর কোটি কোটি লোক যে অম্ল-নিরোধক কোষ্ঠ পরিষ্কারক ওষুধটি জানেন ও ব্যবহার করেন। কোষ্ঠকাঠিন্য ও তার উপসর্গ থেকে নির্দোষ ও সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্যে মিল্ক অফ্‌ ম্যাগনেসিয়ার চেয়ে ভাল ওষুধ আর নেই।

প্রস্তুতকারক রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী: দে'জ মেডিকেল স্টোর্স (ম্যানুঃ) প্রাঃ লিঃ

PS/HOM—L-1/61/B

বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ

এবারে যে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রত্যেক ভিয়েতনামী ভাইবোনের পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি আমাদের ও আমাদের পরিবারের পক্ষে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ, চীনের আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের প্রস্তুতির ওপরে আজ সমস্ত কিছুই নির্ভর করছে। আমাদের দেশ শান্তিতে থাকতে চায়, আমাদের দেশের জনগণ শান্তি ভালোবাসেন। কিন্তু তাই বলে আমরা আক্রমণকারীর হাতে মার খেতে পারি না।

চীনা আক্রমণের ভয়

সত্য কথা হল এই যে আমাদের সীমান্তে প্রকৃত যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে। চীনাদলিদের আক্রমণের আশঙ্কা এখন রয়েছে। চীন এখন পর্যন্ত লক্ষাধিক, অর্থাৎ ১৫০০০ বর্গ মাইল ভূমি অধিকার করে আছে এবং আমাদের সীমান্তে তাদের রণসজ্জা তৈরিয়ে রেখেছে। কাজেই যে কোন নতুন আক্রমণের জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে। আমাদের মাতৃভূমি থেকে শেষ আক্রমণকারীকে পর্যন্ত বিতাড়িত না করে আমরা ক্ষান্ত হবো না। আমরা এই প্রতিজ্ঞার অটল থাকবো।

অতুলপূর্ব্ব সাড়া

প্রথম মন্ত্রী শ্রীকোহেরলাল নেহেরু যখন ভারত প্রতিরক্ষা তহবিলে গয়না তোলার আহ্বান জানান তখন সমস্ত দেশজুড়ে লোক তাতে বিপুলভাবে সাড়া দেয়।

আমরা চীনের হাতে মার খেয়েছি……কখন ……কখনও তা ঠিক করে বলা যে কোন সময় আমরা তাদের চিনিয়ে করতে আমরা প্রস্তুত ছিলাম।

দৃঢ় সঙ্কল্প

আসুন, আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করি যে, আমাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হওয়ার যে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তা দূর না হওয়া পর্যন্ত আমরা বসে থাকবো। আমেরিকার যদি আমাদের সমর্থনেই সৈন্য পাঠাতে আরম্ভ হয়ে আমরা যদি তাহলে আজ কি করা দরকার করে নাচে কি? আমরা আমরা তাকিয়ে করি। আমাদের এই বিপদের সময় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাতে দুর্বল হতে পারে তা করবে।

দান করার পক্ষে তিনটি প্রধান কারণ

১। আমাদের নিজের ও পরিবার এবং আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ রক্ষা করার জন্য দান করুন।

২। আমাদের মাতৃভূমির আক্রান্ত অংশটুকু রক্ষা করার জন্য দান করুন।

৩। ভারতে এবং সমস্ত বিশ্বে শান্তি রক্ষা করার জন্য দান করুন।

এই প্রশ্নগুলি ভেবে দেখুন

কর্তব্য সম্পাদনে তৃপ্তিই হবে আমরা কি নিজেদের কর্তব্য বিসর্জন দেবো? আমাদের জন্য এগিয়ে এসে কিন্তু আমরা তাদের সাহায্য করবো? আমরা যা ভালোবাসি, আমরা যে সব জিনিষকে ভালবাসি তা রক্ষা করি, আমাদেরকে দেওয়ার ক্ষমতার অসীম থাকা সত্ত্বেও, আজ আমরা কি কার্পণ্য হয়ে থাকবো? আমরা কি নিজের স্বার্থকে দেশের ঊর্ধ্বে স্থান দেবো? চাইনে, সমস্যার চাইতে লোককে, স্বাধীনতার চাইতে পরিবার মূল্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা দেবো?

এগুলি ভেবে দেখুন

জাতীয় প্রস্তুতিতে অংশ গ্রহণ করুন

Paid Freedom

এমন সুন্দর কেশগুচ্ছের অধিকারী হতে
আপনিও শুনবেন

"বাঃ সত্যই সুদর্শন"

ঠুক প্রবাহ্য চুলকে সহজে সুন্দর ও মসৃণ করে এবং কেশমূল সতেজ সজীব রেখে চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে কেয়ো-কার্পিন অদ্বিতীয়।
কেশ পরিচর্যায় এই তেল ব্যবহারে চুল দিনে দিনে ঘন, চিক্কণ ও সুন্দর হয়।

কেয়ো-কার্পিন

মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল

দেব ফার্মাকেল কর্পোরেশন প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা দিল্লী · বোম্বাই মাদ্রাজ · পাটনা · লোহার্ডী · ঢাকা

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct public service.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court,
Ex-Law Member, Govt of India

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ
সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই ভেজালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক—যুগান্তর

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

শ্রীসীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখরোচক।

শ্রীশান্তা দেবী

উঃ
কি সাংঘাতিক
কাশি!

এইতো
টাসানল
খান

যন্ত্রণাদায়ক কাশি থেকে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী উপশম পাবার জন্য টাসানল কফ সিরাপ খান। টাসানল আপনার ফুসফুস ও গলার প্রদাহ কমিয়ে চট করে আপনাকে আরাম দেবে। এর কার্যকরী উপাদানগুলো আপনার শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে সাহায্য করবে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার কাশি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে।

আঃ কি অপূর্ব
আরামদায়ক এই

টাসানল
কফ সিরাপ

প্রস্তুতকারক : মার্টিন এণ্ড হ্যারিস প্রাইভেট লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস : মার্কেণ্টাইল বিল্ডিংস, লালবাজার, কলিকাতা-১

T.P.20 B

পল্লী-ভারতী
কার্ত্তিক ১৩৭০

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ সংখ্যা

১৯১২ সাল থেকে—১৯১৪ সালের মধ্যে B. A. (Honours) ও M. A. পরীক্ষা শেষ করে যখন Scottish Church কলেজে অধ্যাপনা সুরু করি সে প্রায় ৫০ বছর আগেকার কথা। তখন বিশ্ব-সমস্যা জটিল হয়ে উঠেছে, Boer war ও Balkan wars শেষ হয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্ব (১৯১৪—১৮) সুরু, অথচ বিশ্ব-রাষ্ট্র স্থাপনার চেষ্টা সুরু হয়নি! ১৯১৬ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জাপান—আমেরিকা ভ্রমণ করে Nationalism বক্তৃতামালা প্রকাশ করে জাতীয়-রাষ্ট্রগুলির হিংসাত্মক প্রক্রিয়া ও মতবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। কবি Romain Rolland (1866-1914) প্রভৃতি মনীষীর অভিনন্দন পেয়েছেন ও ১৯২০ সালে আমাকে সঙ্গে নিয়ে পারিসে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সে সব কথা "রবীন্দ্র-যুগ" প্রবন্ধে লিখছি। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহু মূল্যবান চিঠিপত্র মারফৎ Rolland ছেপে "Tagore and Rolland", এবং "Inde" নামে দুখানি ফরাসী গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

১৯১৯ এর শরৎ কালে পারিস্ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে প্রথম যে ফরাসী পুস্তিকা তিনি তার নাম "Versailles-এর সন্ধি"—যার ফলেই বিজিত জার্মানীর অভ্যুদয় ও Hitlerismএর তথা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৮—১৯৪৫) অধিকাণ্ড। দীর্ঘ তিন বছর ধরে সারা ইউরোপ ঘুরে স্বচক্ষে দেখেছি এবং League of Nations (1919—1939) এর ওঠা-পড়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে শান্তিপূর্ণ চীন-জাপান দেখেছি—সেখানেই বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠল। জাপান শিষ্য ভুলে গুরু চীনকেই আক্রমণ করল (Manchurian War)। এবং Italy আক্রমণ করল Ethiopiaকে, অথচ League of Nations নিষ্ক্রিয়—ভেঙ্গে পড়ল। তার ধ্বংসস্তূপ থেকে ১৯৪৫ সালে জন্ম নিল United Nations। আরম্ভ San Francisco-তে, ও স্থায়ী ভবন New York সহরে দেখেছি। ইতিহাসের মোড় ফিরে গেল।

ইউরোপ থেকে আমেরিকায়—President Wilson থেকে President Kennedy পর্যন্ত (1920—1963) চলল হিংসা ও অহিংসার দ্বৈত-যুদ্ধ! কোথায় এর শেষ! মধ্যে শান্তির কবি রবীন্দ্রনাথ চোখ বুজলেন (১৯৪১) ও মহাত্মা গান্ধি নিহত হলেন (১৯৪৮)। দুর্দিন যেন ঘনিয়ে এল। তখন এক মাত্র আশার প্রতীক (U. N.) সম্মিলিত বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ। তার জয়ধ্বনি করি কারণ নানা কল্যাণ প্রচেষ্টার মধ্যে দুটি বিশেষভাবে স্মরণীয়:—

(১) I. L. O অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রম-শ্রমিক প্রতিষ্ঠান, যেটি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে

একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে গেছে Geneva দপ্তরে তাদের কাজ দেখে মুগ্ধ হয়েছি! শ্রমিক—অর্থাৎ শূদ্র-রাষ্ট্র—স্বামী বিবেকানন্দের কথা মত—জয়ী হয়ে উঠছে সর্ব্বত্র, বিশেষভাবে রুশ দেশে, নিজে দেখে এসেছি। এখন শুধু ইউরোপই মালিক নয়, তাদের ভাগীদার Soviet রুশরাষ্ট্র যার প্রভাবে ইংরেজ, ফরাসী, ডাচ, পর্ত্তুগীজ সব জমিদারীই ভেঙে পড়ছে ও সাধারণ মানুষ চাষী কৃষক ও মজদুর দল বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়ে আসছে।

অর্থনৈতিক বিভাগে এই যে বিপ্লব তার পাশেই দেখি সাংস্কৃতিক বিভাগ U. N. E. S. C. O.। শিল্প শিক্ষা ও বিজ্ঞান প্রচার সারা মানবের মধ্যে করা চলছে। শুধু শাদাদের জন্য নয় কালো ভাই-বোনদের মধ্যেও কাজ চলছে। অজ্ঞাত Africa মহাদেশেও চলছে। যেখানে শুধু ক্রীতদাস (Slaves) ব্যবসায়ীরা পণ্য অথবা Christian মিশনারীরাই চেলা সংগ্রহ করতেন, আজ সেখানে Algeria উত্তর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্য্যন্ত বিরাট মহাদেশের নরনারীরা সজাগ ও সক্রিয় হয়ে উঠছে। Paris গিয়ে তাদের কাজও দেখে এসেছি। Africaর শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ে নূতন ও আশাপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গত ১০ বছরে তার হিসাব ভারতবাসী রাখেনা। অথচ মহাত্মা গান্ধি তাঁর জীবনের ২২ বছর (১৮৯৩—১৯১৪) দিয়ে গেছেন Africaর কালা-আদমী (নিগ্রো ও এশিয়াবাসীদের জন্য। আমার "Tolstoy & Gandhi পুস্তকে তার আভাষ দিয়েছি। "Indian Opinion" Durban থেকে বহুকাল প্রকাশিত হয়। অথচ ভারতে "Gokhale Institute" Poona ছাড়া কোথাও ফাইল দেখতে পাইনি। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিৎ সমগ্র files আনিয়ে সংগ্রহ শালায় রাখা।

Passive Resistance সুরু হয় দক্ষিণ আফ্রিকায় ও পরে মহাত্মা গান্ধি ১৯১৪-১৫ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, চম্পারণ সত্যাগ্রহ করে জয়ী হন ও তাঁকে ১৯১৭ সালে Wellington Square কংগ্রেসে আমরা দেখি। রবীন্দ্রনাথ স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত ও তাঁর—"জন-গণ-মন অধিনায়ক" গানটি গাওয়া হয়। সেই বৎসর ১৯১৭ সালে October বিপ্লবে Leningrad সহরে Tsarism-কে পরাস্ত করে রুশ জাতি লোকতন্ত্র (Soviet) স্থাপনা করেন। তার ফলে বিরাট চীন দেশের ৮০ কোটী মানুষ রুশের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পন্থী হয়। পরে নিরীহ তাহাতকে আক্রমণ করে। কিন্তু রুশ ও U.N. ভারতের পক্ষেই লড়ে আসছেন। তবু ভারতে তার ভাল রকম প্রচার হচ্ছে না তাই আশা করছি গল্প-ভারতী ও অন্য পত্রিকাদির মারফতে U. N. তার কীর্ত্তি-কাহিনী প্রকাশ করবেন।

বিশ্বস্বাস্থ্য ও খাদ্য-সংগ্রহ ব্যাপারেও রাষ্ট্রসংঘ অগ্রণী। সে খবর পেয়েছি বাঙলার সুসন্তান কৃতীছাত্র শ্রীবিনয়রঞ্জন সেনের (যিনি F. A. O. Rome এর অধিকর্ত্তা) কাছ থেকে। তাঁর সহকর্ম্মীরূপে কাজ করছেন ভূতপূর্ব্ব I. C. S. সুশীলচন্দ্র দে এবং শ্রীমণীন্দ্রনাথ মৌলিক; ইনি জাপান ও ইংলণ্ডে ভারত দপ্তরে কাজ করে এখন Romeএ বসেছেন শ্রীবিনয় সেনের সহকারীরূপে। এঁদের দীর্ঘ সার্থক জীবন কামনা করি। বিবেকানন্দের শতবার্ষিকীর মধ্যে অন্ত্যজ ও অস্পৃশ্যদের অনাহার নিবারণ ব্রতে F. A. O. কাজ করছেন সেটি স্মরণীয় এবং চাদের সমস্যায় ভুক্তভোগী আমরা জানি যে আফ্রিকা ইত্যাদী তথা আমেরিকাতেও বহু খাদ্য উৎপাদন হয়। F. A. O এ বিষয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন—দরিদের খাদ্যাভাব অচিরে দূর হোক এই প্রার্থনা জানাই।

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

মাতা দক্ষিণকালিকা

শ্রীগৌরী নাথ শাস্ত্রী

১

বৈদিক সাহিত্যে কালী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আথর্বণিকগণের দুই মন্ত্রমধ্যে (মুণ্ড-কোপনিষৎ-১।২।৪) কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচি—এই সপ্ত লেলিহানা অগ্নিজিহ্বার নাম দৃষ্ট হয়। ইহার অতিরিক্ত কালিকাদেবী মূর্তির কোন স্পষ্ট উল্লেখ বর্তমান উপলভ্যমান বৈদিক সাহিত্যের কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

বাঙলার শক্তিসাধকগণ সাধারণতঃ মার যেরূপ ধ্যানে নিমগ্ন হন, সে তো মা'র বামা মূর্তি নহে—সে যে দক্ষিণামূর্তি। অভক্তের পক্ষে তিনি করালবদনা ঘোরা, কিন্তু ভক্তগণের নিকটে তিনি যে বরদমুণ্ডী মোক্ষাসন-সরোজস্থা, সুখ প্রসন্নবদনা। এই দক্ষিণ কালিকা—মুক্তকেশী চতুর্ভুজা, দিগম্বরা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা; ইঁহার বামদিকের নিম্ন ও ঊর্ধ্ব হস্তে ক্রমান্বয়ে সদ্যছিন্ন মুণ্ড ও খড়্গ শোভমান; দক্ষিণের ঊর্ধ্ব ও অধোহস্তে ক্রমান্বয়ে অভয় ও বরমুদ্রা; মহামেঘের ন্যায় শ্যাম ইঁহার বর্ণ; ইনি ত্রিনয়নী; ইঁহার কণ্ঠদেশে বিলম্বমান নরশিরোমালা হইতে গলিত রুধিরধারায় সর্বাঙ্গ চর্চিত। দুইটি শব (বা শব) ইঁহার কর্ণাভরণ; ইঁহার ভ্রূকুটীকরাল মুখবিবর অভক্তের পক্ষে বড় ভয়ঙ্কর। ইঁহার সরোজবৎ যুগল পীনোন্নত—যেন ভক্তগণকে পীযূষ স্তন্যপান করাইতে সদাই উন্মুখ, শবগণের ছিন্ন করসমূহে ইঁহার কাঞ্চী রচিত; মুখে অট্টহাস্য; উভয় ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে রক্তধারা বিগলিত হইয়া ইঁহার মুখমণ্ডলকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে; ইঁহার রব অতি ভীষণ ও অতি রৌদ্রমূর্তি ইঁহার; শ্মশানালয়ে (অর্থাৎ) পরব্রহ্মে ইনি অধিষ্ঠাতা; বালার্কমণ্ডলের ন্যায় ঘূর্ণায়মান তিনটি নয়ন; ইঁহার দন্ত পঙ্‌ক্তি বিকাশিত; মুক্ত কেশরাশি দক্ষিণাঙ্গ ব্যাপিয়া লম্বমান; শবরূপ মহাদেবের হৃদয়োপরি ইনি মহাকালসহ বিপরীত রতিযুক্তা (বিপরীত রতি সর্বজনের প্রতিকূল বলিয়া এই বাক্যটির অর্থ এইরূপ করিতে হইবে যে, তিনি মহাকাল শক্তিরূপে জগৎ সংহারে ব্যাপৃতা; আর এই মহাশক্তির অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ চৈতন্য সদাশিব নিষ্ক্রিয় শবরূপে উঁহার পাদদেশে পতিত) চতুর্দিকে শিবাগণ ভয়ানক অশিবধ্বনি করিতেছে; কিন্তু সংহাররূপা হওয়া সত্ত্বেও ভক্তগণের রক্ষাবিধানজন্য আনন্দে ইনি সতত প্রসন্নবদনা; ভক্তকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ প্রদানে ইনি সর্বদাই তৎপর।

বিভিন্ন কালের বিভিন্ন যুগে এই দক্ষিণা কালিকা দেবী বিভিন্নরূপে শত শত বার আবির্ভূত হইয়া মুনি-সুর-নর প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্তের নানা কার্যসিদ্ধি করিয়াছেন। স্থূল দৃষ্টিতে এই প্রকার সাময়িক আবির্ভাবই তাঁহার উৎপত্তি বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি উৎপত্তি ও বিনাশরহিতা চিন্ময়ী নিত্যা আদ্যা প্রকৃতি। ইঁহার এই সকল আবির্ভাবের কথা ভক্তিপূর্বক শুনিলে সংসারভয় বিদূরিত হয়। তাই আজিকার এই পুণ্যদিনে সংসার-সংহাররূপিণী শ্রীশ্রীদক্ষিণা কালিকা দেবীর চরণে লুণ্ঠিত হইয়া বলিতে চাই—

"শরণাগত দীনার্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি! নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

উদাত্ত আহ্বান

আজকের দিনের
সবচেয়ে বড় কথা
ও
সবচেয়ে বড় কাজ
মানুষ হওয়া
ও
মানুষ করা।

সংহতি, সংহতি, সংহতি,
দুর্নীতি, দুর্নীতি, দুর্নীতি
বলে চিৎকার করে মরে গেলেও
সংহতি আসবেও না, দুর্নীতি যাবেও না।

যার শক্তিতে আসবে ও যাবে
তা হচ্ছে মনুষ্যত্ব।

মা জগদম্বে, আমাদের মানুষ কর।

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথা—

একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই দেখনা, প্রথম একটু আধটু ভাব যতক্ষণ ততক্ষণ 'আপনি মশাই' ইত্যাদি লোকে বলে থাকে, বেই বাড়ল অমনি 'তুমি—তুমি—তুমি' আর তখন 'আপনি—টাপনি' গুলো বলা আসে না; বেই আরও বাড়ল আর তখন 'তুমি—টুমিতে' মানে না; তখন 'তুই—মুই'; তাঁকে আপনার হতে আপনার করে নিতে হবে তবেতো হবে। যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েছে, সে তাঁর উপর জোর করে বলে, 'তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দেখা দিবি কিনা বল্?'

সব লোক বাবুর বাগান দেখে অবাক—কেমন গাছ, কেমন ফুল, কেমন ঝিল, কেমন বৈঠকখানা, কেমন তার ছবি এইসব দেখেই অবাক। কিন্তু কই বাগানের যে বাবু তাঁকে খোঁজে ক'জন? বাবুকে খোঁজে দুই-একজনা। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয় যেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। সত্যি বলছি দর্শন হয়। একথা কারেই বা বলছি, কে বা বিশ্বাস করে!

• • • •

শ্রীশ্রীযীশুখৃষ্টের কথা—

স্বর্গরাজ্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করা যায়, যিনি আপন ক্ষেত্রে ভাল বীজ বপন করলেন। কিন্তু লোকে নিদ্রা গেলে পর তাঁর শত্রু এসে ঐ গমের মধ্যে শ্যামা ঘাসের বীজ বপন করে চলে গেল। পরে যখন বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ফল ধরল, তখন শ্যামা ঘাসও প্রকাশ হয়ে পড়ল। তাতে সেই গৃহকর্তার দাসেরা এসে তাঁকে বললে, মশাই, আপনি কি নিজের ক্ষেত্রে ভাল বীজ বুনেন নাই? তবে শ্যামাঘাস কোথা হতে হল? তিনি তাঁদিকে বললেন, কোন শত্রু একাজ করেছে। দাসেরা তাঁকে বললে, তবে আপনি কি এমন ইচ্ছা করেন যে, আমরা গিয়ে তা সংগ্রহ করি? তিনি বললেন, না, কি জানি, শ্যামাঘাস সংগ্রহ করবার সময়ে তোমরা তার সঙ্গে গমও উপড়িয়ে ফেলবে। শস্য ছেদনের সময় পর্যন্ত উভয়কে একত্রে বাড়তে দাও। পরে ছেদনের সময় আমি ছেদকদিকে বলব, তোমরা প্রথমে শ্যামাঘাস সংগ্রহ করে পোড়াবার জন্য বোঝা বোঝা বেঁধে রাখ, কিন্তু গম আমার গোলায় সংগ্রহ কর।

• • • •

শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের কথা—

ষোড়শ বৎসরের পর দেখা হল। আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, মহারাজের আর কোন গ্রন্থাদি রচনা হয়েছে কি? রাজা রাজশেখর মহা দুঃখিত হয়ে বললেন, যতিবর, দুঃখের কথা আর কি বলব? কিছুদিন পূর্বে রাজ প্রাসাদে অগ্নি সংযোগ হয়, তাতে আমার এই গ্রন্থ তিনখানি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে। আমি মনের দুঃখে আর কোন গ্রন্থই রচনা করি নাই। আচার্য ঈষৎ হাসতে হাসতে বললেন, মহারাজ এজন্য এত দুঃখ করছেন কেন? আপনি যদি ইচ্ছা করেন তো আমি বলছি, আপনি লিখে নিন। উহা আমার অবিকল মনে আছে। আচার্য বলতে লাগলেন, রাজা লিখতে লাগলেন। এইভাবে কয়েকদিন উপর্যুপরি পরিশ্রমের পর 'বাল রামায়ণ', 'বাল ভারত' প্রভৃতি তিনখানি গ্রন্থ লিখিত হল।

গ্রহান্তরে যাত্রার পূর্বাভাস

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

স্পুৎনিক, রকেট ও লুনিকের খবর আজকাল আমাদের খানিকটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে বলতে পারেন। মহাশূন্যে তাদের আসা যাওয়ার মধ্যে আর তেমন নতুনত্ব নেই। এখন একবার চাঁদে যেতে পারলে ব্যাপারটা আবার সরগরম হয়ে ওঠে। প্রথমে চাঁদ, তারপর মঙ্গল, তারপর শুকতারা। সেখানেই শেষ নয়, আরো গ্রহ উপগ্রহ আছে, আছে আমাদের সৌরমণ্ডল ছাড়িয়ে আরো বহু সৌরমণ্ডল।

চাঁদে বা মঙ্গলে যাওয়ার কথা কল্পনা করা সোজা ; কিন্তু বাস্তবে কাজটা মোটেই সহজ নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলে "পঞ্চম মহাসাগর" সেই মহাকাশ পাথারের কূলে উপকূলে আমরা সবাই বাস করি। এমন একজনও নেই যে সেই মহাকাশের সৈকতে বাস করেনা। মানুষ আজ সেই অকূল পাথারে কূলের সন্ধানে বার হয়েছে। সেই সাগর যাত্রার সবে সুরু।

মহাশূন্যের জাহাজের কাণ্ডারীর পক্ষে বাধাপথ দৈর্ঘ্য—প্রস্থ—বেধ এই ত্রিক্ষেত্র দিয়ে গিয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠে বা সমুদ্রে যাতায়াতের সঙ্গে তার সোজাসুজি সংঘর্ষ। এই হল প্রথম সমস্যা।

এক মুটোর কয়েকটি জটিল সমস্যা ছাড়া সৌরমণ্ডলের অন্য সমস্ত গ্রহ এক নির্দিষ্ট সমতল কক্ষপথে সূর্য প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর কক্ষপথের সমতল ক্ষেত্র এবং মঙ্গলের কক্ষপথের সমতলক্ষেত্রের মাঝখানে ১·৯° ব্যবধান। সেই ব্যবধানের কথা খেয়াল না রেখে কোন রকেট যদি মঙ্গলের দিকে চালানো যায় তাহলে সেটা লক্ষ্যের ৮০ লক্ষ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবে। মাত্র ৮০ লক্ষ কিলোমিটার!

মহাকাশের যাত্রীকে মনে রাখতে হবে যে আকাশ সাগরের বিভিন্ন বিন্দুতে মহাকর্ষের পরিমাণ বিভিন্ন এবং সময়ের গতির সঙ্গে সঙ্গে একই বিন্দুতে মহাকর্ষের তারতম্য ঘটে। মহাকর্ষের হিসাবে সামান্যতম ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে জাহাজটি বহু বহু কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যাবে।

পার্থিব জগতে জাহাজ, রেলগাড়ী এমন কি উড়োজাহাজে করে যেখানেই যাওয়া যাক সন্তব্যস্থল সব সময় একজায়গাতেই থাকে। কলকাতা থেকে দিল্লী যে যাবে সে এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে দিল্লী যেখানে আছে সেখানেই থাকবে। কিন্তু চাঁদে পৌঁছানো অত সোজা নয়। রকেট-জাহাজ ছাড়বার সময় চাঁদ যেখানে ছিল, পরে চাঁদ তো সেখানে থাকবে না। সে তো এক-নাগাড়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। সেই ভ্রাম্যমান লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে বহু হিসেবপত্র করে তবে জাহাজের দিক ঠিক করতে হবে। স্বয়ংক্রিয় পরিগণন যন্ত্র ছাড়া সে হিসেব করা যাবেনা। শেষ পর্যন্ত এমনও হতে পারে যে লক্ষ্যের ঠিক উল্টো দিকে রওনা হলে তবে লক্ষ্যে গিয়ে হাজির হওয়া যাবে।

এ ছাড়া আরো কত শত সমস্যা আছে মহাকাশযাত্রীর সামনে ; কিন্তু তবু একথা বলা অন্যায় হবে না যে অতীতে কলম্বাসের মত ধীরা পৃথিবীর অজানা অকূলের সন্ধানে বার হয়েছিলেন তাঁদের তুলনায় আজকের মহাকাশযাত্রীদের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি। তাঁরা কলম্বাস বা মেগেলনের মত, নাবধ্যাঙ্ক বেরিং-এর মত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে যাত্রা করবেন না। বিজ্ঞান আজ তাঁদের প্রত্যেকটি

যাই হোক চাঁদে যেতে হলে কতটা আলানী চাই সেটা হিসেব করাটা হল প্রথম কথা। আলানীর পরিমাণ দূরত্বের ওপর নির্ভর করেনা, নির্ভর করে মহাকর্ষের ওপর। পৃথিবী থেকে চাঁদ রকেটে ২।১ দিনের পথ। কিন্তু রকেটের ইনজিন সেই সময়ের থেকে মাত্র মিনিট দশেক চলবে। ওঠবার পর মিনিট কয়েক, এবং নামবার মুখে মিনিট কয়েক। বাকিসময় সে প্রধানত মহাকর্ষের টানে এবং নিজস্ব সঞ্চিত বেগে বেয়ে চলবে। তাই মিনিট দশেক ইঞ্জিন চালাবার মত আলানী হলেই চাঁদে যাওয়া যাবে। চাঁদে আবহমণ্ডল নেই বলে চাঁদে নামবার সময় রকেটের মুখ উল্টো দিকে ঘুরিয়ে ইনজিনের বেগ ক্রমে ক্রমে কমিয়ে আনতে হবে। পৃথিবীর প্রথম রকেট চাঁদে গিয়ে আঘাত করেছে। এর পরে সম্ভবত একটি স্বয়ংচালিত বেতার কেন্দ্র পাঠানো হবে—যা থেকে চাঁদ সম্পর্কে নানারকম সংকেত পৃথিবীতে "রীলে" করা হবে। তৃতীয় ধাপে একটি মানুষবিহীন চন্দ্রপ্রদক্ষিণকারী জাহাজ। তারপরে একজন পর্যবেক্ষক সহ ঐরকম একটি রকেট-জাহাজ চাঁদের চারদিকে ঘুরবে। মানুষবিহীন চন্দ্রপ্রদক্ষিণকারী রকেট থেকে চাঁদের অন্য পিঠের ছবি তোলা হয়েছে। একটি তিন ধাপের রকেটের প্রথম দুধাপে আলানী সঞ্চয় করে রাখা যেতে পারে। যাত্রাপথে শেষ ধাপটিকে আলানী জোগান দিয়ে প্রথম দুটি ধাপ আপনা থেকে খসে পড়ে পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে যাবে। তখন শেষ ধাপটি ছুটে চলবে চাঁদে। চাঁদের আকাশে শেষ ধাপের আলানীর ট্যাঙ্কটি আলাদা হয়ে গিয়ে চাঁদের চারদিকে ঘুরবে এবং শেষ ধাপটি যাত্রী নিয়ে চাঁদে গিয়ে নামবে উল্টো দিকে মুখ করে।

মঙ্গল ও শুক্রের রাস্তা

চাঁদ আজ মানুষের নাগালের মধ্যে। চন্দ্রবিজয়ের পর মানুষ কোন্ সুদূর রাজ্য জয় করার দিকে পা বাড়াবে? নিশ্চয়ই মঙ্গল ও শুক্র হবে তার পরবর্তী গন্তব্যস্থল; কারণ এই দুটি গ্রহই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে। কিন্তু মঙ্গল ও শুক্রের দিকে যাবার পথে আরো কতকগুলি ক্ষুদ্রতর জগৎ আছে যেগুলি মহাকাশযাত্রীকে সাহায্য করতে পারে মহাজগৎ সমুদ্রে প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে। সেগুলিকে বলা হয় "অ্যাস্টেরয়েড" বা পুঞ্জগ্রহ। এ পর্যন্ত প্রায় ৬ হাজার পুঞ্জগ্রহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির কক্ষপথ কোথাও অন্য গ্রহের কক্ষপথের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, কোথাও বা পাশ দিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি আছে ইরস নামে একটি পুঞ্জগ্রহ যার ব্যাস ২৪ কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে যার ন্যূনতম দূরত্ব ২০ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটারের মত। সেটি ১৯৩১ সালে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছে এসেছিল, আবার আসবে ১৯৭৫ সালে। পৃথিবী থেকে মঙ্গল যাবার পথে ইরস আমাদের সরাইখানা হতে পারে। এইরকম পুঞ্জগ্রহ আরো আছে।

সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে বেশি। সুতরাং মঙ্গলের কক্ষপথের দৈর্ঘ্যও বেশি। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে আসতে মঙ্গলের ৬৮৭ দিন (পৃথিবীর দিনের মাপে) লাগে অর্থাৎ মঙ্গলের ১টি দিনের মেয়াদ ৫৮ ঘণ্টার মত। প্রতি ১৫ বছর অন্তর মঙ্গল একবার করে পৃথিবীর কাছাকাছি আসে (৫ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার) ১৯৫৬ সালে মঙ্গল আমাদের কাছে এসেছিল, আবার আসবে ১৯৭১ সালে। সেই সময় কোন রকেট যদি সেকেণ্ডে ১২ কিলোমিটার বেগে ছোড়া হয় তাহলে ১৫০ দিন পরে সেটি মঙ্গলে পৌঁছতে পারে।

কিন্তু মঙ্গলের যাত্রীও প্রথমে মঙ্গলে যাবে না। সে আগে যাবে মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবস এবং ডিমস-এ। ফোবস থেকে মঙ্গলের গোলকটি যাত্রী পরীক্ষা করে দেখবে। সেটি আয়তনে যেখানে চাঁদের

৯ শুণ। মঙ্গল থেকে চাঁদের দূরত্ব মোট ৯৩০ কিলোমিটার অর্থাৎ চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্বের ৪১ ভাগের এক ভাগ। সেখান থেকে যাত্রী মঙ্গলে যেতে পারে।

শুক্রের পথের সঙ্গে মঙ্গলের পথের তফাৎটা এইখানে যে শুক্রের পথ গিয়েছে পৃথিবীর পথের বাইরের দিক দিয়ে নয়, ভিতরের দিক দিয়ে কারণ শুক্র পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের আরো কাছে। শুক্রগামী রকেটকে সূর্যের দিকে ছুঁড়তে হবে এমনভাবে সময় হিসেব করে যে রকেটটি যখন শুক্রের কক্ষপথে পৌঁছবে, শুক্র ঠিক সেই সময় ঘুরতে ঘুরতে সেইখানে গিয়ে পৌঁছয়। রকেটের যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য হবে ৪০ কোটি কিলোমিটার। সেই পথ পার হতে লাগবে ১৭৬ দিনের মত। শুক্রের কোন উপগ্রহ আছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে শুক্রে যাওয়া আরো কঠিন হবে।

সৌরমণ্ডলের গ্রহউপগ্রহ বিজয়ের অভিযানের পূর্বশর্তগুলি হোল :

(১) পৃথিবীর মহাকর্ষ জয় করে মহাকাশে উড়ে যাবার মত প্রাথমিক বেগ।

(২) সেই বেগ সৃষ্টি করার উপযুক্ত জ্বালানী।

(৩) পৃথিবী থেকে রওনা হবার সময় রকেটের গতি পৃথিবীর আহ্নিক গতির বিপরীত দিকে না হওয়া (রকেট ও পৃথিবীর গতি বিমুখী হলে পৃথিবীর মহাকর্ষ জয় করার জন্যে আরো অনেক বেশি বেগের দরকার হবে)।

(৪) পৃথিবীর মহাকর্ষের সীমানা পার হলে রকেটের কতটা বেগ চাই সেটা হিসেব করে সেইমত ব্যবস্থা করা কারণ কিছুটা নিজস্ব বেগ না থাকলে শুধু গন্তব্য গ্রহ বা উপগ্রহের আকর্ষণে রকেটের গতি হয়ে যাবে অত্যন্ত মন্থর।

(৫) গ্রহে নামবার সময় এবং গ্রহ থেকে আবার পৃথিবীর দিকে রওনা হবার সময় সেই গ্রহের মহাকর্ষ জয় করা।

মহাজগৎ বিজয়ের পথে প্রথম ধাপ হচ্ছে চাঁদ। মঙ্গল ও শুক্র হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপের লক্ষ্য। তৃতীয় ধাপে হচ্ছে সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ। তারপর আসবে বৃহস্পতি, শনি, নেপচুন, প্লুটো ইত্যাদি। সূর্য থেকে দূরতম গ্রহগুলি। শুক্র বাদে অন্য প্রত্যেকটি গ্রহের উপগ্রহ আছে। বৃহস্পতির আছে এক ডজন উপগ্রহ, শনির আছে ৯টি, ইউরেনাসের ৫টি, মঙ্গলের এবং নেপচুনের ২টি করে। চাঁদ বাদ দিলে এ পর্যন্ত আমরা সৌরমণ্ডলে ৩০টি উপগ্রহের খোঁজ পেয়েছি।

অন্য সৌরমণ্ডলের সন্ধানে

সৌরমণ্ডলের উপগ্রহ বিজয়ের পর মানুষ হয়ত একদিন অন্যান্য নক্ষত্র-জগতে যাবার কথা চিন্তা করবে। সূর্যের নিকটতম জ্যোতি "প্রক্সিমা", "সেন্টরাস" নক্ষত্রপুঞ্জে "আলফা সেন্টারী" নক্ষত্রের নিকটে একটি রক্তিম তারকা। প্রক্সিমার আলোকরশ্মি পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ৪'২৭ আলোক বৎসর লাগে অর্থাৎ পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব ৪-এর পিঠে ১৩টি শূন্য কিলোমিটার। মানুষ যেদিন সেই সব নক্ষত্রের রাজ্যে হানা দিতে পারবে সেদিন সে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যেখানে তার চোখের সামনে সে দেখতে পাবে কিভাবে গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় হয় অর্থাৎ সূর্যের শৈশব কাল তার সামনে আত্মপ্রকাশ করবে। শুধু তাই নয়। মানুষ তখন এমন সব দুনিয়ার খোঁজ পাবে যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে চিন্তাশক্তিসম্পন্ন প্রাণীর।

অন্য গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব

বিজ্ঞানের বিচারে আমাদের নীহারিকাপুঞ্জে (সূর্য যে পরিবারের সদস্য) অন্তত ১০ হাজার কোটি নক্ষত্র আছে এবং প্রতি হাজার নক্ষত্রের মধ্যে অন্তত একটির নিজস্ব গ্রহ আছে। তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের নীহারিকাপুঞ্জে অন্তত ১০ কোটি "সৌরমণ্ডল" আছে। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা পুলকোভো মানমন্দির থেকে বুহবীণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে "সিগ্নাস" নামে যে নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তার ৬১ নম্বর নক্ষত্রটির একটি গ্রহ আছে। প্রক্সিমা নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও তাই দেখা গিয়েছে। স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক ব্রুনো প্রায় ৩৬০ বছর আগে যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বহু সৌরমণ্ডল আছে তখন ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীলরা তাঁকে পুড়িয়ে মেরেছিল। আজ ব্রুনোর সেই ভবিষ্যদ্বাণী বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত।

মহাজগতে ১০ কোটি সৌরমণ্ডল আছে কিন্তু জীবনের অস্তিত্ব আছে কতগুলিতে ?

ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ তাঁর "ডায়ালেক্টিক্স্ অফ নেচার" বইখানিতে বলেছেন :—"জীবন হচ্ছে প্রোটিনঘটিত বস্তুর এক বিশিষ্ট রূপ।" কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি কতকগুলি মূল পদার্থ নির্দিষ্ট উত্তাপ ও আর্দ্রতার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশে জড়কে জৈবরূপ দান করে। যেকোন গ্রহে বা উপগ্রহে প্রোটিনের এইরকম যোগাযোগ হলেই প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হয়। কিন্তু মানুষের মত চিন্তাশক্তিসম্পন্ন জীব অন্য জগতে আছে কি ? এর উত্তরেও এঙ্গেলস্-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বলব যে, "চিন্তাশক্তি আহরণ করার দিকে বিবর্তনের পথে অগ্রসর হওয়া বস্তুর সহজাত প্রকৃতি। তবে সেই চিন্তাশীল প্রাণীর রূপ যে সব জায়গায় বা সব সময়ে একই রকম বা পৃথিবীর মানুষের মতই হতে হবে এমন কথা নেই।

ম্যাকবেথ লেখার পরে সেক্সপীয়ার ভাবলেন : "এ বইখানা চলবে না। রেখেই বা লাভ কি ! একে পুড়িয়ে ফেলাই ভালো।"

বন্ধু বেকনকে মনের কথা বলে বইখানা পড়িয়ে শোনাতেই তিনি বললেন : "দাও ও বইখানা। আমিই পুড়িয়ে দোব।"

কিছুদিন পরে সেক্সপীয়ার জিজ্ঞাসা করলেন : "বইখানা পুড়িয়েছ ?"

বেকন বল্লেন : "হাঁ, পুড়িয়েছি, তবে তোমারটা রেখে আর সব নাটকগুলোকেই।"

এই বলে বেকন হাসতে লাগলেন।

চিঠি শুধু চিঠি নয়!

শ্রীযুক্ত প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত

আলমোড়া

৩০শে মে, ১৮৯৭

সুহৃদ্বরেষু,

শুনিতেছি, অপরিহার্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি জানবান্, দুঃখ কি করিতে পারে? তথাপি ব্যবহারিকে বন্ধুজন কর্তব্যবোধে একথার উল্লেখ। অপিচ, ঐ সকল লক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাঁধন সরিয়া যায় ও সত্য সুখের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্ধেক বন্ধন খুলিয়া যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ়—লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষা অধিক। তাও যেন একটু নরম হইয়া পড়ে, মন যেন অন্ততঃ মুহূর্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা নিতান্ত অপেক্ষা অন্তর্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ডাকে, এই ত মায়া! যদিও বহু দিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্বক এক গীতার অনুবাদ ইংরেজীতে আমায় প্রেরণ করেন। তাহার ললাটে এক ছত্র ভবৎ-হস্তলিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, উত্তর-পত্রে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে আপনার প্রতি আমার অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরেজী গীতার ললাটে, ঐ একছত্র মাত্র আপনার হস্তলিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই তখন পড়িবার অবকাশ কি হইবে?

দ্বিতীয়তঃ, শুনিলাম গৌরবর্ণবিশিষ্ট হিন্দুধর্ম প্রচারকেরই আপনি বন্ধু। দেশী নাচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ আমি ম্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা-তা খাই, যার-তার সঙ্গে খাই—প্রকাশ্যে সেখানে ও এখানে। তাছাড়া মস্তেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত—এক নির্গুণ ব্রহ্মবেশ বুঝিতে পারি, আর তাহারই ব্যক্তি বিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐ সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় ত বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎই কর্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার ঈশ্বর জীবনে দেখিয়াছি এবং তাহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি পুরাণাদি সামান্য বুদ্ধি মানুষের রচনা,—ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দেষ বুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ; রামানুজ শঙ্করাদি সংকীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র। সে প্রীতি নাই, পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতই—আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব!! তা কি হয়, মহাশয়! কখনও হয়েছে, না হবে? 'আমি'র লেশমাত্র থাকিতে কি কিছু হবে?

এসব সত্ত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি—

বিবেকানন্দ

চলতি দুনিয়া

বুড়োদের সঙ্গে আজকালকার প্রগতিশীল তরুণের দল এক হোটেলে আর থাকতে চায় না। তারা দাবী করছে, তাদের জন্ত এখন আলাদা হোটেল বা বোর্ডিং হোক, যেখানে বুড়োর দল ঢুকতে পারবে না। যে সব তরুণ-তরুণী লণ্ডন সহরে আসতে চায় (Young people planning a visit to London) তারা Youth Hotel না হলে রীতিমত আন্দোলন জাগিয়ে তোলবার ভয় দেখাচ্ছে। একটা ছোটখাট Youth Hotel-এ অন্ততঃ তরুণ-তরুণীদের জন্তে ১৪০টি শয্যা থাকা চাই, (140 beds for boys and girls) আর তা'ছাড়া কোন ঘরেই দরজার চাবী বা খিল থাকবে না,—যখন-তখন যে-কেউ যে-কোন ঘরে ঢুকতে পারবে। আজকালকার এই প্রগতি-যুগে দরজার চাবী আর দরকার কি ? (Who wants the key of the door these days ?) —উওম্যান

• • • •

প্রকাশ্যস্থানে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে চুম্বনের আদানপ্রদান দোষাবহ কিনা এই নিয়ে সমাজ-হিতৈষীদের বিলক্ষণ মাথাব্যথা আরম্ভ হয়েছে। কঠোরস্বরে সমাজনেতারা প্রশ্ন করছেন—Should you kiss in public ? এর উত্তর কিন্তু তরুণ-তরুণীরাই দিয়েছে, এতে দোষের কি আছে ? এটা হচ্ছে একটা প্রেমনিবেদনের অঙ্গ (display of affection), পৃথিবীর অনেক জায়গায় এটা অপরাধ বলে গণ্য হলেও (in some parts of the world it is an offence) সেটাকে মেনে নিতে যাবে কেন আধুনিক ছেলেমেয়েরা ? এঁরাকে romantic pastime (মধুময় লীলাখেলা) বলে ধরে নিতে দোষ কি ? এসব মনভোলানো প্রাণমাতানো তর্ক শুনে প্রবীণ সমাজহিতৈষীর দল এখন রীতিমত ঘাবড়ে গেছেন।

—উওম্যানস্ মিরর্

• • • •

আজকালকার খানাপিনার টেবিলে তরুণীদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়, সেগুলিতে পাওয়া যায় শুধু গোপন প্রেমের ষড়যন্ত্র (intrigues), ঈর্ষা (jealousies), প্রতিবেশীদের কুকার্য (misdeeds) আর উত্তেজনাপূর্ণ প্রেমনিবেদন (exciting flirtations)—এতে সমাজ কোন্ পথে চলেছে তা' বেশ বোঝা যায়। জাতির ভবিষ্যৎ ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠছেন প্রবীণেরা। কিন্তু কালের প্রবাহ রোধ করবে কে ? মেয়েদের কথাবার্তায় যদি পারিবারিক কল্যাণসূচক কিছু না থাকে তবে মানুষের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হতে হয় বৈ কি। —উওম্যানস্ মিরর্

• • • •

রোগীদের জন্ত প্রত্যেক ডাক্তারখানায় অপেক্ষা করবার একটা ঘর থাকে। সেখানে অনেক সাময়িকপত্র, চিত্রের অ্যালবাম ও ছোট ছোট নভেলও থাকে। এবার কিন্তু সেসব জায়গায় একটু পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। রোগিণীদের জন্তে বোনবার পশম ও কাঠি দেওয়া হয়ে থাকে (Wool and needles to knit squares) আর সেই বোনা জিনিষগুলি পরে আর্তসেবায় লাগে। এতে অবশ্য দু'কাজই হয়। প্রতীক্ষাঘরের মধ্যে সময় কাটানো চলে আর পরহিতে শ্রমদান করাও হয়। ব্যাপারটা

এরই মধ্যে বেশ লোকপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য এটা যে করতেই হবে তা নয়, কিন্তু সকলের চোখের সামনে 'করব না' বলাও ত চলে না। —উওম্যানস্ মিরর্

• • • •

আজকাল বিবাহিত ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রেম করবার জন্য আগ্রহশীল হয়েছে তরুণীরা। এতে সামাজিক জীবনে কতখানি বিপর্যয় ঘটতে পারে সেকথা কি তারা একবারও ভেবে দেখেছে? চলতি কথায় এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'husband stealers' অর্থাৎ অপর মেয়ের স্বামীকে প্রলোভনে ভুলিয়ে তাকে চুরি করা। এতে একটা দুর্নীতিমূলক অন্তরঙ্গতার উল্লাস থাকে। শুধু তাই নয়, এইসব মেয়েরা পার্কে বা নিভৃত স্থানে বসে মনমাতানো সরস কথার ফাঁদে প্রলুব্ধ করে স্বামী বেচারাদের। প্রথম মধুর আলাপ আরম্ভ হয় "In their talk of sex experience with boys" বাস্, এতে সেই সব লঘুপ্রকৃতি স্বামীর দল রীতিমত প্রলুব্ধ (badly tempted) হয়। এই সব মেয়ের দল (gang) বেছে বেছে সবরকম সন্ধান নিয়ে তবে অপর মেয়েদের স্বামীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেশে (associate with married men). পাশ্চাত্য সমাজে এই সব নিয়ে এখন যে পথে চলেছে সেটা অনেকেরই বিভীষিকার কারণ হয়ে উঠেছে। —উওম্যান্

• • • •

স্বপ্নের মধ্যে কোন্ গভীর রহস্য নিহিত আছে, এ বিষয় নিয়ে আজকাল অনেকরকম বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে। মনের চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যায়, মনের স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু অনুভব করা যায় তার অন্তরালে কি রহস্য আছে, এ সম্বন্ধে নানা গবেষণা সুরু হয়ে গেছে। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে "dreams have a profound significance." মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় অনেক কিছু অজ্ঞাত জিনিষের সন্ধান পাওয়া যায়, অনেক অচিন্তনীয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা যায়, ভবিষ্যতের খবর জানা যায়, কিন্তু কেন এমন হয়? শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক Dr. Nathaniel Kleitman বলেছেন "Not only the brain but active nerve and muscle tissue evidence such activity." (সক্রিয়ভাবে সাড়া দেয়।) এ কি করে সম্ভব হয় তার নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় বহির্জগৎ থেকে নানাস্থানের radio wave মেরুদণ্ড বেয়ে মস্তিষ্কে ও স্নায়ুমণ্ডলীতে পড়ে। (large rapid waves which occur at the rate of ten per second), তা'তে যে ধ্বনি ও দৃশ্য উৎপন্ন হয় তাতে "brain's electrical activity" এভাবে বেড়ে যায় যে আমরা চোখ বুজেও সেসব উপলব্ধি করি (after the eye movements ceased) কিন্তু স্বপ্ন সত্যেরই প্রতিধ্বনি (dreams are not meaningless)। আজকাল স্বপ্ন তত্ত্ব নিয়ে জগৎব্যাপী আলোচনা চলছে। —স্যান

• • • •

ব্যালে নৃত্যে যেমন রাশিয়া অগ্রগামী, থিয়েটার শিল্পকলায় তেমনি জার্মানীর তুলনা নেই। একদিন জার্মানীর থিয়েটারের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের প্রচার ঘটেছিল (All great epochs in the history of German theatre have been receptive to world literature)। ইবসেন, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ, বার্নার্ড শ', গোগল, গোর্কি, টলস্টয়, শেখভ, ইউজিন্ ও' নীল, থর্নটন প্রভৃতির সাহিত্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত রূপ জার্মাণ থিয়েটারই সর্বপ্রথমে উদ্ঘাটিত করে। গেটে, লেসলীয়ার প্রভৃতির কথা না বললেও চলে। সবচেয়ে বড় কথা জার্মাণ থিয়েটারের কোন গোঁড়ামি ছিল না। যে কোন দেশের

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেই জার্মাণী আদর করে ডেকে নিয়েছে। এখন যুদ্ধোত্তর জার্মাণী আর নাটকলার দিকে আগের মত মন দিতে পারছে না। অথচ এখনও সে স্বপ্ন দেখছে বিশ্বসাহিত্যকে মঞ্চস্থ করবার (the dream of a world theatre with foreign authors on German stages). বিশ্বের সকল সাহিত্যিকই এখন Germanyর দিকে চেয়ে আছেন আকুল আগ্রহে। —স্কাল।

• • • •

আজকাল পাশ্চাত্ত্য বিদ্যালয়সমূহে (ভারতেরও কতিপয় বিশিষ্ট বিদ্যালয়ে) টেলিভিশনের সাহায্যে শিক্ষাদান চলছে। The students watch their lessons on the television screen. এতে সুবিধা এই যে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজেই শিক্ষণীয় বিষয়টি ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে। বিশেষতঃ যেখানে উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, সেখানে T. V. teaching বিশেষ কার্যকরী হয়েছে (Specially where there is a shortage of highly qualified and trained teachers)। ঠিক এই কারণে T. V. teaching সারা পৃথিবীতে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠছে (television is quite widespread and is gaining popularity all over the world). ভারতেও এর প্রচার হতে আরম্ভ হয়েছে; আর আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষার এই বৈজ্ঞানিক বাহনটি যথেষ্ট সমাদর লাভ করবে।

—কেমিনা।

• • • •

ধর্মঘটের হিড়িক আজকাল দেখা যায় সব ক্ষেত্রে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও মাঝে মাঝে ধর্মঘট করে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে একথাও সকলে জানেন কিন্তু তাদের অভিভাবকেরা এবার ধর্মঘট করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছেন। ব্যাপারটা ঘটেছে ইংলণ্ডে এসেক্স প্রদেশে। (The parents have decided to keep their children away from schools) কারণ, অভিভাবকেরা মনে করেন ছেলেমেয়েরা স্কুলে অনেকস্থলে গোপনে কুশিক্ষা পায় তাদের চেয়ে বয়সে বড় সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের কাছ থেকে। এতে চরিত্রের উন্নতি হওয়া দূরে থাক, আরও অবনতি ঘটে। অকালে ডেঁপো হয়ে ছেলেমেয়েরা সহজেই কুপথ ধরতে শেখে। তাদের পরস্পরের মধ্যে কি সব বিশ্রী অন্তরঙ্গতা চলে, শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের পক্ষে তা' জানা সম্ভব নয়। আপাতমধুর কুকাজের প্রলোভনে তারা সহজেই ধরা দেয়। ব্যাপারটা ক্রমশঃ এমন গুরুতর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ চারিত্রিক অবনতি লক্ষ্য করে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও অভিভাবকদের এই ধর্মঘট সমর্থন করছেন (entirely sympathise with the parents). —ডেলিমিরর

• • • •

রাত্রে ঘুমাবার আগে অনেকেরই বই পড়ার অভ্যাস আছে। কিন্তু কি রকমের বই পড়লে ঘুমের ব্যাঘাত হয় না, অথচ সুনিদ্রাও হয়, এই নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদ্ মহলে নানা আলোচনা চলছে। অনেকের মতে ঘুমাবার আগে পড়বার বই (bed-time book) শিকারের কাহিনী হলেই ভাল হয়। শিকারী কুকুরের দল (hounds) ছুটোছুটি করছে শিকার ধরবার জন্যে, শিকার কিন্তু ধরা পড়ছে না, এ রকম হলেই স্নায়ুঘটিত উত্তেজনা আসে আর তাতেই কিছুক্ষণ পরে অবসাদের সঙ্গে চোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়। আবার অনেকের মতে মরা খরগোস জানালায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে (rabbits hanging in a game-dealer's window) এই ঘটনার বিষয় পড়তে পড়তে ঘুমে চোখের পাতাও

ঝুলে আসে। অনেকের আবার উড়ন্ত পাখীর বর্ণনা পড়তে ভাল লাগে (birds spring into flight)। দেখা যাচ্ছে শিকার কাহিনীগুলিই নিদ্রাজনক ঔষধরূপেই ব্যবহার করাই মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের অভিমত।

—সান্‌ডে মিরর্

• • • •

মহাকাশ পরিক্রমণের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এমন সব অদ্ভুত আবিষ্কারের খবর আমাদের কর্ণগোচর হয়েছে, যাতে রীতিমত বিস্মিত হতে হয়। চিন্তাকালীন মানুষের মস্তিষ্কে যে সব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গ ওঠে সেগুলিকে টেলিভিশনে দেখানো ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করা এখন সহজসাধ্য হয়ে পড়েছে। মস্তিষ্কের এই তরঙ্গ (brain waves) অনেক সময় ইঙ্গিতের (signal) কাজ করে ও পরিচালনার কাজে সহায়তা করে। ইংলণ্ডে অবস্থিত কোন লোকের চিন্তাসূত্র আমেরিকার লোকে টেলিভিশনে দেখতে পাবে। অবশ্য এ প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু বাধাবিপত্তি আসতে পারে; কিন্তু তাতে আসল পর্যবেক্ষণের কোন অসুবিধা ঘটবে না (despite several interruptions this have convinced us that brain information can be successfully communicated)। বৈজ্ঞানিক গবেষণা যে কতদূর সার্থক হয়ে উঠতে পারে, এই ব্যাপারটিই তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

—ওভারসীজ্ ডেলি মিরর

• • • •

Eve-teasing কথাটার একটা ব্যাপক অর্থ আছে। এ দেশে বাঘের শিস্ দেওয়ার মত শব্দ (wolf-whistle)। কখন ঐ শব্দ অবশ্যভাবে তীব্র হয়ে ওঠে আর কখনও বা মাঝে মাঝে থেমে থেমে হয়। তা নির্ভর করে যে শিস দেয় তার উদ্দেশ্য। সে কি চায় তরুণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না শুধু আমোদ করতে। অন্য দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ কাজটা নির্দয়ভাবে ভালমানুষ মেয়েদের অতর্কিত পীড়াদায়ক হয়, কারণ সবাই ত আর অবয়বস্থ মেয়েমানুষ নয় যে সঙ্গে সঙ্গে তার উচিত উত্তর দেবে। সব চেয়ে আপত্তিকর কথা হচ্ছে এই, যারা রাস্তায় রাস্তায় এই রকম শিস্ দিয়ে বেড়ায়, প্রায়ই দেখা যায় তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের ছেলে, যাদের ভালমন্দ-বিচারবুদ্ধি বেশি থাকাই উচিত। সহরের রাস্তায় নির্বিবাদে ও শান্তিতে চলে ফিরে বেড়াবার যে আইনসঙ্গত অধিকার তাতে বাধা দেওয়ার জন্য যে শাস্তি তার চেয়েও কঠোরতর শাস্তিই এর প্রতিরোধ করবার উপায়। কঠোর সামাজিক বিধিব্যবস্থাই এই অবাঞ্ছিত কাজ বন্ধ করবার একমাত্র পথ। —দি স্টেটস্‌ম্যান

চমক

আল্‌পস পর্বতশ্রেণীর ভিতর দিয়ে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার রেলপথ তৈরী হচ্ছিল। খুব বড় একটা টানেল গড়ে তুলতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারের দল কিন্তু ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়লেন। টানেল করবার সমস্ত সরঞ্জাম প্রস্তুত হয়েই আছে, কিন্তু বাধা দিচ্ছে একটা প্রকাণ্ড বরফের স্তূপ। সে স্তূপের আয়তন অন্তত: আধ মাইল হবে। সেই বিরাট বরফের স্তূপটি না সরালে টানেল তৈরীর আর কোনই আশা নেই।

ডিনামাইট দিয়ে সে স্তূপকে সরানো চলতে পারে কিন্তু তাতে যে বিস্ফোরণ ঘটবে তার ফলে রেলপথ তৈরীর সমস্ত সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর অনেক প্রাণহানিরও সম্ভাবনা আছে। ইঞ্জিনিয়ারের দল বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

আর এদিকে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় তাঁদের কর্মশক্তি ক্রমশ: যেন ক্ষীণ হয়ে পড়তে লাগল। সামনে শীতকাল, তার আগেই টানেল তৈরীর কাজে হাত না দিতে পারলে, সারা বছর আর কোনই সম্ভাবনা নেই। চিন্তাকুল হয়ে তাঁরা সেই হিমশীতল উপত্যকায় তাঁবুতে বসে ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্বন্ধে নানা আলোচনা করতে লাগলেন।

—এ বিষয়ে কেউ কি নেই আমাদের সাহায্য করবার?—প্রধান ইঞ্জিনিয়ার জিজ্ঞাসা করলেন সকলকে।

সকলেই নীরব। শুধু একজন তরুণ শ্রমিক একটু নড়ে চড়ে বসল।

—তুমি কি কিছু বলতে চাও?

—আজ্ঞে হাঁ। আপনি যদি একশ'জন শ্রমিক আমার সঙ্গে দেন, তা'হলে আমি এই বিরাট বরফের স্তূপকে সরিয়ে দিতে পারি।

—সে কি!—আশ্চর্য হয়ে গেলেন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু তরুণ শ্রমিকের দৃঢ়তা দেখে তিনি শেষে স্বীকার করলেন তাকে সাহায্য করতে।

—কিন্তু কি উপায়ে তুমি একাজ করবে?

—শব্দের দ্বারা।

—আশ্চর্য ত!—সকলে অবাক হয়ে তরুণের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

একশ' জন শ্রমিককে নিয়ে তরুণ গেল সেই তুষার স্তূপের কাছাকাছি। তার ইঙ্গিত মত সকলেই একসঙ্গে একই সুরে তীব্র চিৎকার করতে সুরু করল। সেই শব্দের প্রতিধ্বনি পর্বতের চূড়ায় চূড়ায় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

হঠাৎ দেখা গেল তুষার স্তূপ নড়ে উঠে বিপুল শব্দে ধ্বসে পড়তে আরম্ভ করল একদিকে। আস্তে আস্তে পথ হোল পরিষ্কার।

প্রধান ইঞ্জিনিয়ার এগিয়ে এসে তরুণকে জড়িয়ে ধরে বললেন: শব্দের যে এত শক্তি আছে। তা' আগে জানতাম না। তুমি শুধু আমাদের চমক লাগাওনি, সারা দুনিয়াকেও চমকিত করলে।

দোটানা

ডঃ হরেন্দ্রনাথ রায়

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সুলেখা। ছোট্ট টেলিগ্রাম, পাঠিয়েছে তারই অগ্নীপতি কল্যাণ মুখার্জি। লিখেছে, সুরেখা সহসা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকস্মাৎ প্রাণ করেছে। মাতৃহারা মিণ্টুকে দেখবার কেউ নেই। তাই কেঁদে কেঁদে তার অবস্থা শোচনীয়। পার ত একবার এস।

সুলেখা নিজেকে সামলাতে পারে না। টেলিগ্রামখানা সজোরে মুখের উপর চেপে ধরে সে ফুঁপিয়ে উঠে। তারপরই সেইখানে সে লুটিয়ে পড়ে চুকরে কেঁদে ওঠে, দিদি, দিদি গো!

সুরেখা নেই। প্রিয়তমা দিদি তাদের ছেড়ে চলে গেছে অমরধামে। সুলেখা ভাবতে পারে না এ কথা। এই ত কয়েকদিন আগেও দিদির চিঠি পেয়েছে সে—শরীরটা খুব ভাল যাচ্ছে না বটে, তবে এমন কিছু নয়। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে সব। কিন্তু এই ভাবেই কি ঠিক হয়ে গেল সব! সামান্য থেকে এতখানি অসামান্য!

পিঠোপিঠি দুটি বোন। মানুষ হয়েছে তেমনি ভাবেই। একজন যেন অপরের প্রতিপূরক। সুরেখা ছাড়া সুলেখা অচল আর সুলেখা ছাড়া সুরেখাকে কেউ কল্পনা করতে পারে না, এমন কি তারা নিজেরাও নয়। সুরেখার যখন বিয়ে হয়, সুলেখা তখন কেঁদেছিল। বিচ্ছেদ-বেদনা-ব্যথায় লুকিয়ে অনেক কান্নাই কেঁদেছিল। এই ত সেদিনের কথা চোখ বুজলেই চোখের উপর ভেসে উঠে। এরই মধ্যে শেষ হয়ে গেল সব।

দিদির সংসারটি ভারী ভাল লাগত সুলেখার। একটি নিটোল পরিবেশ, শান্তির পারাবার। এ সংসারে অনেকদিন বাস করে গেছে সে; মুখুজ্যে মশাই লোক ভাল। একেবারে ছেলেমানুষ। উপার্জন করে এনে দিদির হাতে তুলে দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাঁর। তারপর যা কিছু করণীয় দিদির। তিনি শুধু ছায়ার মত ঘুরে বেড়ান দিদির পিছনে পিছনে।

এদের মধ্যে খুনসুটিটাও ভারী মধুর। বাক্‌পটুতায় সমান দুজনাই। মুখুজ্যে মশাই যদি বলেন, তোমার পিছনে ঘুরে ঘুরেই আমার এই দশা।

দিদি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, ওটি মহারাজের গ্রহের ফের। মহারাজ যদি অন্দরের মধ্যে পায়চারণাটা একটু কম করেন, তাহলে তাঁরও দশান্ত হয়, বাঁদীরও কিছুটা দুরদৃষ্ট মেলে।

আবার দিদি যদি রাগ করে বলে, তুমি কি পুরুষ! কোন যোগ্যতাই তোমার নেই।

মুখুজ্যে মশাই অমনি জিভ কেটে বলেন, পুরুষ নয় মহাপুরুষ, মহারাণী। তোমাদের মত পতিতপ্রাণাদের উদ্ধারের জন্যই মাঝে মাঝে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হ'তে হয় আমাদের। পতিতপাবন আমরা, এটা কি কম যোগ্যতা? কথাগুলি এখনও কানে বাজে সুলেখার।

কিন্তু নিজের ভাগ্যে এমন শান্তির নীড় জোটেনি সুলেখার। যত্নময় স্বামী, পৃথিবীটাকে স্বাস্থিক চোখেই দেখে। স্ত্রীর চাইতে যন্ত্রের কদরটাই তার কাছে বেশী। তাই স্ত্রীকেও যন্ত্রের মত ব্যবহার

করতে চায়। এখানে বিবাহের নিয়মকানুনের চলন বিশেষ কিছু নেই। সারাদিন যন্ত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত স্বামী বীরেশ্বর যখন বাড়ী ফেরে, তখন নিজেও সে যেন এক যন্ত্রে পরিণত হয়ে যায়। তখন তার কাছে আর কিছু আশা করা যায় না। এই নিষ্করুণতার মাঝে সুলেখা তার আলো-ভরা-চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে আর একটি সংসারের দিকে, যেখানে স্বামী যন্ত্র নয়, যেখানে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর সম্পর্ক নিবিড়, যেখানে হৃদয়ের উত্তাপের স্পর্শ পেয়ে অন্তরের সুপ্তবৃত্তিগুলি যেন অকূলে কূল পেয়ে।

সুলেখা আর সময় নষ্ট করে না। মুমূর্ষু বাবা তাকে ডেকেছেন। তার এত বড় বিপদের দিনে সে যদি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারে ত দাঁড়াবে কে? এ বিষয়ে স্বামীর সাহায্য সে আশা করে না। তার মন্তব্য যে কি হবে তাও তার অজানা নয়। সব শুনে হয়ত বলবে, আমরা এই বিরাট যন্ত্র-পৃথিবীর এক একটি প্রত্যঙ্গ বিশেষ। সকলেই নিজের নিজের কাজ করে চলেছি। যখন যার দম ফুরোবে, সে ঝরে পড়বে। অতএব দুঃখ করে লাভ কি?

অন্তঃসারশূন্য কথা; আন্তরিকতা কিছু নাই। শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে সুলেখার। তাই সে স্বামীর সহানুভূতিটুকু নিতে চায়। কিন্তু বীরেশ্বরের কারখানা থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের অপেক্ষায় থাকতে গেলে সেদিনের মত কলকাতাগামী ট্রেন ফেল করতে হবে সুলেখাকে, তাই সে টেলিফোনেই যোগাযোগ করে ফ্যাক্টরীতে।

কলকাতা থেকে কয়েক শ মাইল দূরে গভর্ণমেণ্টের এই ফ্যাক্টরীটি। এখানকার মেকানিক্যাল ওয়ার্কশপের ফোরম্যান বীরেশ্বর। কাজে নিষ্ঠা আছে। তাই নাম ডাকও কিছুটা আছে। টেবিলের উপর ড্রয়িংয়ের একখানা কাগজ মেলে ধরে টেলিফোনে কথা বলছিল সুলেখার সঙ্গে। বলছিল, তোমার সংবাদটা, খুবই দুঃসংবাদ, সন্দেহ নেই। আমাদের যাওয়া উচিত। কিন্তু সব ফেলে ছড়িয়ে যাই কি করে বল ত? পাওয়ার প্লাণ্টে 'ব্রেক ডাউন' হয়েছে। প্ল্যাণ্ট যতক্ষণ না চালু হচ্ছে ততক্ষণ আমার ছুটসৎ নেই। তুমি ত সব জান। সুলেখার কণ্ঠে স্নেহ। বলে, জানি। আর জানি বলেই তোমাকে জানাতে চাই না কিছু। কিন্তু এ জীবনে তোমার 'ব্রেক ডাউনের' শেষ নেই বলে কি আমারও শেষ হ'তে নেই? তোমার যদি যাবার উপায় না থাকে, আমায় যেতে হ'বে। আত্মীয়স্বজনের এত বড় দুর্দিনে যদি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে না পারি, তাহলে সমাজে মুখ দেখাব কি করে?

সুলেখার সব কথাগুলো বীরেশ্বরের কানে গেল কিনা সন্দেহ। সে তখন ড্রয়িংয়ের মধ্যে অনেকখানি ডুবে গেছে। ড্রয়িংটা পড়তে পড়তে কোনমতে বলল, সেই ভাল; তুমি বরং যাও। আমি না হয় দুদিন পরেই যাব। কিন্তু ভাবছি যাবে কার সঙ্গে?

—সে ভাবনা তোমার নয়, আমার। ব্রেক ডাউন তোমার হয়েছে, আমার হয়নি। সুতরাং আমি যেতে পারব ঠিক।

—বাঁচালে তুমি। শুধু করুণেশ বাবুকে আমার কথাটা একটু বুঝিয়ে বল, তিনি বুঝতে পারবেন ঠিক।

—তা পারবেন। সেটুকু মনস্তত্ত্ব ওঁর আছে।

পরের দিনই সকালে এসে যায় সুলেখা।

করুণেশ বসেছিলেন মিণ্টুকে কোলে নিয়ে। অসহায় করুণ মূর্ত্তি। এ মূর্ত্তিকে চেনা যায় না।

সুলেখা ঘরে ঢুকেই থমকে পড়ে। বাধায়, করুণায় তার পায়া অন্তর ভরে যায়। সে নির্বাক মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

করুণেশ চোখ তুলে তাকায়। তারপর বলে, এসে সুলেখা। তোমাকেই বোধ হয় মনে মনে খুঁজছিলাম আমি।

সুলেখা মৌন মুখে এগিয়ে আসে। মিন্টুকে লক্ষ্য করে মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করে, ঘুমুচ্ছে বুঝি?

—এই কিছুক্ষণ আগে চোখ বুজিয়েছে। তিনদিন তিনরাত ঘুমোয়নি। একবার করে চোখ বুজছে আবার চমকে কেঁদে উঠছে। দিদিমাকে আনিয়েছি বটে কিন্তু তাঁর কাছে কিছুতেই যেতে চাইছে না। সেইখানেই মুস্কিল হয়েছে।

সুলেখা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে বলে, এমনিভাবে কতক্ষণ ওকে কোলে নিয়ে বসে থাকবেন আপনি। দিন, ওকে শুইয়ে দি।

সুলেখা মিন্টুকে কোলে তুলে নেয়। ঘুমন্ত শিশু ঘুম ভেঙে চমকে উঠে কাঁদতে যায়। কিন্তু সুলেখার আহ্বানে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে সহসা দুহাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে তারই কাঁধে মাথা রেখে আবার চোখ বোজে। শিশু মনে এতক্ষণে কিছুটা নির্ভর হয়।

করুণেশ প্রশ্ন করেন, বীরেশ্বরকে দেখছি না যে। তাকে রেখে এলে কোথায়?

—কারখানায়। 'ব্রেক ডাউন' হয়েছে। সুতরাং আসবার ফুরসৎ নেই।

করুণেশ একটু ম্লান হাসেন। বলেন, মেশিনের 'ব্রেক ডাউন' হ'লে তার উপায় আছে। কিন্তু মানুষের 'ব্রেক ডাউন' হ'লে তার কোন উপায় নেই।

—আছে। সুলেখা জোর দিয়ে বলে, মেশিন প্রস্তুত করে মানুষ। তার ব্রেক ডাউন হলে ভগবানই তাকে সারিয়ে তুলবেন। আপনি বড় বেশী উতলা হয়ে পড়েছেন মুখুজ্যে মশাই। পুরুষ মানুষের অত বেশী উতলা হওয়া শোভা পায় না।

করুণেশ অপ্রতিভ মুখে বলেন, না, না, উতলা হব কেন? তবে মিন্টুটা কচি ছেলে, তাকে নিয়েই যত দুর্ভাবনা আমার।

—না, মিন্টু আজ থেকে আমার। তার যা কিছু ভাবনা সব আমার। অনর্থক তার ভাবনা ভেবে শরীর খারাপ করতে পারবেন না আপনি। বলতে বলতে সুলেখা ঘুমন্ত মিন্টুর মুখখানা পরম স্নেহভরে নিজের উপর চেপে ধরে।

—মুখুজ্যে মশাই। বলতে বলতে মিন্টুকে কোলে নিয়ে সুলেখা ঘরে ঢোকে। অসময়ে করুণেশ শুয়েছিলেন আপন খাটটিতে আর ক্লান্ত চোখে তাকিয়েছিলেন সামনে ঝোলান স্ত্রীর ফটোখানির দিকে। ফটোখানি ছিল পাশের ঘরে টাঙান। সেখান থেকে ফটোখানি তুলে এনে এ ঘরে একেবারে চোখের সামনে টাঙিয়ে রেখেছেন করুণেশ।

সুলেখা তাকিয়ে দেখে একবার করুণেশের মুখের দিকে আর একবার দেওয়ালে টাঙান দিদির ছবিখানির দিকে। সে বোঝে সব। কতবড় আঘাত এ লোকটি অন্তরের মধ্যে ধারণ করে আছেন, এ জানতে বাকী থাকে না তার। কিন্তু এ আঘাত থেকে একে রক্ষা করতে না পারলে যে আর একটা বড় রকমের দুর্ঘটনার সম্ভাবনা অধিক এ কথা ভেবে শিউরে উঠে সুলেখা। সে মনস্থির করে ফেলে।

একে বাঁচাতেই হ'বে। সেজন্য প্রয়োজন এর মানসিক পরিবেশের পরিবর্ত্তন—সঙ্গ দিয়ে, রঙ্গ দিয়ে সেই পুরাতন আবেষ্টনীর সৃষ্টি করা যার মধ্যে একদিন সুরেখা ধরে রেখেছিল কঙ্কণেশকে। হয়ত এরজন্য কিছুটা স্বার্থ ত্যাগ করতে হবে সুলেখাকে, কিন্তু সেজন্য পিছুলে চলবে না। রক্ষা করতেই হবে কঙ্কণেশকে।

সুলেখা এগিয়ে আসে। বলে, এমন অসময়ে শুয়ে কেন মুখুজ্যে মশাই। কঙ্কণেশের মুখে সেই ক্লান্তির হাসি ফুটে উঠে। বলেন ভারী ক্লান্তিবোধ করছি সুলেখা।

—ও আলস্যের ক্লান্তি। পুরুষ মানুষ, সারাদিন ঘরে বসে থাকলে অমন ক্লান্তি আসে। একটু ঘুরে এলেই সব ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।

—কিন্তু ভাল লাগে না। এ বেশ আছি। আর ঘুরেই বা আসব কোথা থেকে?

সুলেখা জানে, সাবেক দিনে কোথা থেকে ঘুরে আসতে ভাল লাগত কঙ্কণেশের। ছুটির দিনে কখনও বা দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গার পারটিতে, কখনও বা মন্দিরের সুবিস্তীর্ণ চাতালের পাশটিতে সুরেখাকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে আসতেন তিনি। এইটাই ছিল তাঁর প্রিয় বিহার, তাঁর একমাত্র বিলাস। সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেয় সুলেখা। বলে, কলকাতায় এসেছি অনেকদিন পর। দক্ষিণেশ্বরে যাবার বাসনা হয়েছে। যাবেন সেখানে? 'না' বলে বসবেন না যেন।

—বললে কি হবে?

—ঠাকুর অসন্তুষ্ট হবেন।

—বেশ, ঠাকুর যাতে অসন্তুষ্ট হ'ন, এমন কাজ করা উচিত হ'বে না। তোমায় নিয়ে যাব।

—চলুন। রান্নার ব্যবস্থা পিসিমাই করবেন এবেলা।

একটা খেলা ছিল সুরেখার বড় প্রিয়। ছক কাটা ঘরে অনেকটা দাবা বোর্ডের মত খেলা। ছুটির দিনে অথবা কঙ্কণেশ কলেজ থেকে ফিরে এসে জলযোগের পরই সুরেখা স্বামীকে ধরে নিয়ে বসত খেলতে। পাকা খেলোয়ার সুরেখা, স্বামীকে হারিয়ে দিত বারবার। কঙ্কণেশ আপত্তি করতেন না একটুও। বরঞ্চ খুশি মনেই খেলে যেতেন স্ত্রীর সঙ্গে।

সেই খেলাটাই এতদিন পড়েছিল ঘরের এক কোণে। সুলেখা তাকে উদ্ধার করে আনল কোণ থেকে। বলল, আসুন মুখুজ্যে মশাই, আপনাকে হারাতে পারি কিনা চেষ্টা করে দেখি একবার।

কঙ্কণেশ প্রথম প্রথম রাজি হ'ল না। বলেন, ও মেয়েলী খেলা। আমার ভাল লাগে না।

সুলেখা হেসে বলে, যাতে ভাল লাগে সেই ব্যবস্থা আমি করব। বসুন শীগগির।

অগত্যা বসতে হয় কঙ্কণেশকে। খেলা জমে উঠে। রোখ চেপে যায়। হারলে রোখ আরও বাড়ে। সাবেক দিনের মতই কঙ্কণেশ খেলতে চেষ্টা করে। কিন্তু সুলেখাকে এঁটে উঠতে না পেরে বলে, তোমরা দুজনেই সমান। আমি হেরে গেলাম।

—এত শীগগির। সুলেখা হেসে উঠে। কঙ্কণেশও হাসেন।

হাসিতে গল্পেতে বাড়ীখানা একটু একটু করে সরসময় হ'য়ে উঠে। কালো মেঘের পর্দাখানা প্রথমে একটু দুলে উঠে। তারপর ধীরে ধীরে অপসারিত হ'তে থাকে। কঙ্কণেশ যা পছন্দ করত, সুরেখা যেভাবে তার পরিচর্য্যা করত, সুলেখা সেই দিকে তার দৃষ্টি সজাগ রাখল। বিন্টুর কান্না শুধু যে

বন্ধ হয়েছিল তা নয়, তাঁর মুখে হাসিও ফুটে উঠেছিল। এইটাই ছিল করুণেশের কাছে পরম তৃপ্তির কারণ। এর জন্য তিনি সুলেখার কাছে প্রকৃতই কৃতজ্ঞ।

সুলেখা করুণেশকে তাগাদা দেয়, ব্যাংকে গেলে, বাড়ীতে বসে বসে শরীর নষ্ট করবেন না মুখুজ্যে মশাই, এবার কলেজে বেরুতে সুরু করুন।

করুণেশ কেমন যেন অসহায় বোধ করেন। অসহায় কণ্ঠে বলেন, বেরুব? তুমি বলছ বেরুতে? কিন্তু পারব? যদি ভুল করে ফেলি? পড়াতে না পারি?

—অবাক কাণ্ড! সুলেখা গালে হাত দেয়, এতকাল পড়ালেন কি ক'রে? না, ভুল হবে না। আমি বলছি কোন ভুল হ'বে না আপনার।

—যদি মিণ্টু কাঁদে?

সুলেখা হেসে ফেলে বলে, আপনি একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছেন মুখুজ্যে মশাই। মিণ্টু কি আপনার নেওটা আছে আর যে সে কাঁদবে। মিণ্টুর ভার আমার। আমি যখন যাব, তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তার ভাবনা ভেবে ভেবে শরীর নষ্ট করতে পারবেন না আপনি। কাল থেকে কলেজ বেরুতে হবে আপনাকে।

এ আদেশ মানতে হয় করুণেশকে।

সুলেখার যাবার দিন যতই এগিয়ে আসে এই শোকাহত আদুর লোকটির কথা ভেবে ততই সে মনে মনে ছটফট করতে থাকে। একালে সংসারে ওকে দেখবার কেউ নেই, বোঝবারও কেউ নেই। কলেজে সারাদিনের পরিশ্রমের পর যখন ক্লান্ত দেহে, ক্লান্ত মনে ঘরে ফিরে আসবে, তখন এক কাপ চা এগিয়ে দেবার মত কেউ থাকবে না। একথা ভাবে সুলেখা, তাই কি একটা অব্যক্ত আবেগে মনটা তার টনটনিয়ে উঠে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চট করে চোখ দুটো একবার মুছে নিয়ে সে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ ক'রবার চেষ্টা করে।

সেদিন বিকালের দিকে করুণেশের পড়বার ঘরখানি ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে তুলছিল সুলেখা। হঠাৎ সে চমকে উঠল করুণেশের ডাক শুনে, একটা সুখবর শুনেছ সু। আমাদের ফিজিক্সের প্রফেসর ডক্টর হালদার খবরটা আমাকে—। বলতে বলতে সহসা তিনি থেমে যান। তারপর অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ করে সুলেখার কাছে সরে এসে বলে, আমায় ক্ষমা কর সুলেখা। আমি ভুল করেছিলাম।

ভুলটা যে কি সে কথা বুঝতে সুলেখার বাকী থাকে না। অকস্মাৎ লজ্জার একটা অরুণিমা তার সারা চোখ মুখকে আক্রমণ করে সর্বাঙ্গে আলোড়ন বইয়ে দেয়। সে করুণেশের দিকে তাকাতে পারে না। করুণেশ বলতে থাকেন, সুলেখার ব্যাপারের সাথে ছিল আমি ডক্টরেট হই। তারই আগ্রহাতিশয্যে আমি একটা গবেষণা পাঠিয়েছিলাম। হালদার খবর দিল আমার গবেষণা প্রশংসিত হয়েছে। শুনে খুশিই হলাম। তোমাকে খবরটা শোনাব বলে তাড়াতাড়ি বাড়ী এলাম। তুমি বই গোছাচ্ছিলে। ঠিক এমনি ভাবে তোমার দিদিও আমার বইগুলি গুছিয়ে রাখত। হয়ত একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। তাই ভুলটা হয়ে গেল।

সুলেখা কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করে বলে, ভুল সকলেই করে। এমন কিছু মারাত্মক ভুল করেননি আপনি।

—না, তা করিনি। তবে পেছন থেকে এ ভুল সবাই করবে। তারপর একটু হেসে বলেন,

তোমার মধ্যে তোমার দিদিকে আবিষ্কার করা আদৌ কষ্টকর নয়। আমি সেই কথাই ভাবি। এ কদিন ধরে তোমার যত দেখছি ততই মনে হচ্ছে সে বোধহয় তোমার মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে। তা না হলে মিণ্টুই বা অতো সহজে ভুলে যাবে কেন?

সুলেখার মুখের আরক্তিমতা ঘোচে না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, শিশুরা অবুঝ। তারা স্নেহের কাঙাল। আসল নকল কিছু বোঝে না। একটু স্নেহ পেলেই তারা সব ভুলে যায়।

—তারা না বুঝতে পারে আসল নকলের প্রভেদটা কোথায়। কিন্তু আমি ত বুঝি। বুঝি বলেই ত বলতে পারলাম। তোমার দিদি তার সবটাই তোমার মধ্যে রেখে গেছে।

যাবার দিন আরও এগিয়ে আসে। বীরেশ্বরেরও চিঠি এসেছে সেই ইঙ্গিত বহন করে। করুণেশ বলেন, আর ত তোমায় ধরে রাখতে পারি না সুলেখা। তোমারও ত সেখানে বাড়ী ঘর সংসার সবই রয়েছে। এর পর আর আমার অনুরোধ করা সাজে না।

সুলেখা চা পরিবেশন করছিল। চামচে দিয়ে চাটিকে বারকতক নেড়ে কাপটিকে করুণেশের দিকে এগিয়ে দিল। কোন উত্তর দিল না। করুণেশ আবার বলেন, মানুষের দুঃখের অন্ত নেই। আমারই বা থাকবে কেন? তাই দুদিন রোদ উঠতে না উঠতেই আবার তা মিলিয়ে গেল।

সুলেখা শান্তভাবে বলে, না, মিলবে না। আপনি খেয়ে নিন। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

করুণেশ চায়ে চুমুক দেন। তারপর আবার বলেন, চাঁদ ডুবে গেলেই জ্যোৎস্না মিলিয়ে যায়। তখনও কেউ যদি জ্যোৎস্নার অন্বেষণ ক'রে তাকে পেতে চায়, তার মস্তিষ্কের প্রশংসা আমি করি না। এ কদিনে তোমার কাছ থেকে অনেক সেবাই পেলাম ভাই। তোমার দিদির বিচ্ছেদ ব্যথাকে তুমি সব দিক দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলে। সেই পুরাতন পরিবেশ—যে পরিবেশ তোমার দিদি রচনা করেছিলেন—তারই মধ্যে তোমার সব সামর্থ্য দিয়ে আমায় টেনে নিয়ে গিয়েছিলে। বাবার সেই প্রাথমিক প্রচণ্ডতা যা আমাকে দিশেহারা করে দিয়েছিল, তাকে রোধ করেছিলে। আমি সামলে উঠেছিলাম। কিন্তু এরপর সব মিলিয়ে যাবে, শূন্যতায় পরিণত হবে।

সুলেখা শোনে। অসত্য এর মধ্যে কিছু নাই। করুণেশ অত্যুক্তিও কিছু করেন নাই। সত্যই ত সে তাকে তার পুরাতন পরিবেশে আকর্ষণ করে নিয়ে গেছে; সুরেখার ভূমিকায় অভিনয় করে। মানবতার দিক দিয়ে সে হয়ত অন্যায় কিছু করে নাই। আতুরকে সে শান্তি দিয়েছে, ব্যথিত চিত্তকে সে তৃপ্তি দিতে চেয়েছে, সন্তাপিতকে সে স্নিগ্ধতা দান করেছে। আত্মীয়ের যা কর্তব্য সবই সে করেছে। তবুও এর মধ্যে যে নূতন সমস্যা দেখা দিতে পারে এ কথা সে ভাবেনি। এই সমস্যাই তাকে বিচলিত করে তুলল। তবুও সে কোনমতে মাথা নেড়ে বলল, কিছুই মিলিয়ে যাবে না। আপনি যদি শক্ত হন, শূন্যতাতেও কিছু পরিণত হবে না। আত্মীয়ের শোকসন্তপ্ত দিনে আর একজন আত্মীয়ের যা কর্তব্য আমি সেইটুকুমাত্র করবার চেষ্টা করেছি। এর বেশী আর কিছু না।

—সে চেষ্টায় তুমি ফলবতী হয়েছ সুলেখা। আর হয়েছ বলেই আমার দুঃখটাকে আবার নতুন করে অনুভব করতে হবে।

সুলেখা চট করে কোন উত্তর দিতে পারে না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমি কি কিছু অন্যায় করেছি মুখুজ্যে মশাই?

—অন্যায়? কেন সুলেখা?

—আপনার দুঃখটাকে আবার জাগিয়ে তুলবার বলে?

দুঃখ যদি অসুস্থ হয়, সে যদি জেগে ওঠে, তার জন্যে দায়ী তুমি নও। তাকে যে এতদিন ঘুমিয়ে রেখেছিলে তার জন্য আমিই তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

এ কথার কোন উত্তর দেয় না সুলেখা। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

দুটি সংসারের দুটি চিত্র পাশাপাশি সুলেখার চোখে ফুটে উঠে। একটি সার্থক রচনা। সেখানে সংসারের সব মাধুর্যই বর্তমান। প্রেম, ভালবাসা, সুখ, দুঃখ নিত্য প্রয়োজনীয় যা কিছু, মানুষ যা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, শান্তির নীড় রচনা করতে পারে সে সবই বিদ্যমান। আর একটিতে আছে শুধু মেসিন আর ব্রেক ডাউন। নিত্য নৈমিত্তিকের ঘটনা। সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি কখনও এর বিরাম নেই। এ যেন নিশ্ছিদ্র। সেখানে সংসারের নিত্য প্রয়োজনীয় সেটুকু ছাড়া আর কোন কিছুর অনুপ্রবেশের সাধ্য নাই। তাই সুখের কোন নীড়ই রচনা করা সম্ভবপর নয়। একটা দুঃখের মত মনকে আকর্ষণ করে আর একটা বিকর্ষণ করে। একটা দীর্ঘশ্বাস সুলেখার বুক চিরে বেরিয়ে আসে।

বীরেশ্বরের চিঠি এসেছে!

দু'একদিনের মধ্যে সে এসে সুলেখাকে নিয়ে যাবে। এ জানা কথা। তবুও সুলেখার মন চায় না সেই ক্যাক্টরীর আবহাওয়ার মধ্যে ফিরে যেতে। সেই একঘেয়ে মেসিন আর তাদের কলকব্জা আর তাদের ব্রেক ডাউন শুনতে শুনতে মনটা ঘি ঘি ক'রে উঠে। যে নরকে আশ্রয় করে নারী ঘর বাঁধে, সেই নর যদি সংসার-নিস্পৃহ হয়, মেসিন আর ব্রেক ডাউন-এর সমস্যা নিয়ে অহোরাত্র বিব্রত থাকে, তাহলে নারী ঘর বাঁধে কি নিয়ে। সারাটা দিন এমন কি রাতের বেশ কিছুটা সময় থাকে কাটাতে হয় নিঃসঙ্গ অবস্থায়, সংসারকে ঘিরে কতখানি রস মাধুর্য সে নারী সৃষ্টি করতে পারে! এ সুলেখার অপারগতা নয়, এ ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। পরের সংসারে সে যদি কিছুটা মাধুর্য সৃষ্টি করে থাকতে পারে, নিজের সংসারেও পারত নিশ্চয়ই, যদি সে সংসারের পুরুষ কিছুটাও প্রিয়তোষ হ'ত। সুলেখার মনটা বিদ্রোহ করে উঠে। সে ঠোঁট কামড়ে ধরে।

কল্পেশকে বলে রেখেছিল সুলতা, স্বস্থানে ফিরে যাবার আগে আর একবার সে দক্ষিণেশ্বর ঘুরে যাবে। সে দিনের সেই সাদ্ধ্যভ্রমণ তারী ভাল লেগেছিল তার। সন্ধ্যার কোলে সুদীর্ঘ প্রাচীরের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকার সার্থকতা তাকে যেন পেয়ে বসেছিল। সে কথা ভুলতে পারেনি সে। কল্পেশ কলেজ থেকে ফিরে এলে আজকেও সেই যাবের মত যাবে তারা। সুলেখা পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়েছিল। ঝিলিমা এসে খবর দিল, কল্পেশ কলেজ থেকে ফিরেছে কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়ে ফিরেছে সে। সুলেখা চমকে উঠে বলে, কই জানি না ত। দেখে আসি।

সুলেখা এসে কল্পেশের ঘরে ঢোকে। ডাকে, সুপ্রভো মশাই। কল্পেশও পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। সুলেখার ডাকে পাশ ফিরলেন।

সুলেখা আর একটু সরে এসে প্রশ্ন করে, জ্বর কখন এল?

কল্পেশ উত্তর দেন, সকাল থেকে। তবে ক দিন ধরেই শরীরটা তেমন ভাল ছিল না।

সুলেখা বলে, ভুল ছিল না, এ কথা বলেননি কেন ?

—তোমায় আর বিব্রত করতে চাইনি। বললেই ত ব্যস্ত হয়ে পড়বে তুমি। তাই বলিনি। সকালে ঘুম থেকে উঠে কয়েকটা মাথা ধরার বড়ি খেয়ে ফেলেছিলাম। ভেবেছিলাম, কমে যাবে। কিন্তু এখন দেখছি খালি পেটে বড়িগুলো খেয়ে ভাল করিনি। তারই প্রতিক্রিয়া এখন সুরু হয়েছে।

—ভাল কোনটাই করেন নি। বড়ি খেয়েও নয়, স্নান করে ভাত খেয়েও নয়, আর আমাকে গোপন করেও নয়। আশ্চর্য মানুষ আপনি। একটুও জানতে দিলেন না আমায়। ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে এত কাণ্ড তখনও হতে পারত না। চোখ দুটো বেশ লাল হয়ে উঠেছে। হয়ত জ্বরটা বেশী এসেছে। দেখি জ্বরটা কতখানি এল। বলতে বলতে সে করুণেশের আতপ্ত কপালের উপর ডান হাতখানি চেপে ধরেই চমকে উঠে, ইস্, জ্বরে গাটা পুড়ে যাচ্ছে যে ? মাথার যন্ত্রণা আছে ?

করুণেশ করুণ চোখে তাকান, বলেন, জ্বরটা মনে হচ্ছে গৌণ, মুখ্য ঐ মাথার যন্ত্রণাটা। তারই জন্যে অতগুলো বড়ি খেলাম। কিন্তু কিছুই হ'ল না।

—আমি জানতে পারলে একটাও খেতে দিতাম না। আর এ দুর্ভোগ আপনাকে ভুগতে হত না। কিন্তু জানব কি করে ? জানতে দিলে ত জানব ? দেখুন ত অসুখ করে বসলেন এই অসময়ে ?

করুণেশ বলেন, জানি, ঈশ্বরের আদেশ। তবে তোমার যাবার কোন অসুবিধে হবে না সুলেখা। আমার অসুখ তোমার অন্তরায় হবে না।

সুলেখা বড় বড় চোখ করে করুণেশের দিকে তাকায়। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলে, আমিও থাকতে চাই না। কে-ই বা থাকব ? যেখানে জোর নেই, সবটাই লুকোচুরি, সেখানে থাকতেই বা চাইব কোন্ অধিকারে ?

করুণেশ অপ্রস্তুতে পড়েন। অপ্রতিভ মুখে চুপ করে যান।

করুণেশের মাথার যন্ত্রণা সুরু হয়েছিল বটে কিন্তু তার যেন আর শেষ হতে নেই। প্রথমে মালিশ, তারপর ওডিকলম, তারপর জলপটি। কিছুতেই যন্ত্রণার উপশম নেই। রাত্রিতে যন্ত্রণার তীব্রতা বাড়ে। সুলেখা অসহায় বোধ করে। অসহায় মুখে বলে, আস্তে করে বললুম, তখন ত ডাক্তার ডাকতে দিলেন না। এখন কি করি বলুন ত ? আমি জলপটিটা পালটে দিয়ে যাই। পিসিমা এ ঘরে আজ রাত্রে শুন। কাল সকালেই ডাক্তারকে ডেকে পাঠাব।

পাশের ঘরে সুলেখা কান খাড়া করে থাকে। মাঝরাতে একটা কাতরোক্তি কানে যেতেই সে ধড়মড়িয়ে উঠে পাশের ঘরে এসে উপস্থিত হয়। পিসিমা বৃদ্ধ মানুষ, সারাদিনের খাটাখাটুনির পর অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আর খাটের উপর করুণেশ যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মাঝে মাঝে দু' একটা ভুলও বকছেন। সুলেখা অতি সন্তর্পণে করুণেশের কপালের উপর ডান হাতখানি রাখে। বোঝে শুধু জ্বরই বাড়েনি মাথার দপদপানিটাও বেড়েছে। ঠাণ্ডা হাতের পরশে করুণেশ একবার চোখ মেলে তাকান। সুলেখা প্রশ্ন করে, যন্ত্রণাটা কি খুব বেড়েছে মুখুজ্যে মশাই ?

করুণেশের চোখের দৃষ্টি ঠিক যেন স্বাভাবিক নয়। একটা ঘোরে সে দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি মাথা নাড়তে থাকেন। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বলতে থাকেন, যখন এসেছ, তুমি যেও না, তুমি যেও না। সুলেখা কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে। একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখে।

প্রস্তুত ঘর। সাড়া শব্দ কোথাও নাই। শুধু নীল আলোর কোমলতা ঘরটিকে ঘেরিয়া করে রয়েছে। করুণেশের মাথার জলপটিটা শুকিয়ে গিয়ে একপাশে পড়েছিল। সুলেখা সেটিকে ভিজিয়ে নিয়ে সযতনে করুণেশের কপালে লাগিয়ে দেয়। অকস্মাৎ করুণেশ যেন চকল হয়ে উঠেন। একটু ঝুঁকে পড়ে সুলেখার একখানি হাত দু'হাতে চেপে ধরে বলেন, সু এসেছ যখন, যেও না। আমায় ছেড়ে আর কোথাও যেও না। বল, কথা দাও। বল তুমি যাবে না।

সুলেখা বিব্রত বোধ করে। কিন্তু কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বার হয় না।

করুণেশ তেমনিভাবেই বলে চলে, বল কথা দাও, তুমি যাবে না।

সুলেখা রোগীকে উত্তাক্ত করতে চায় না। মৃদু কণ্ঠে বলে, বেশ, কথা দিলাম, যতদিন না আপনি ভাল হ'ন আমি যাব না।

রোগী কি বুঝলেন বোঝা গেল না। কিন্তু পরম নিশ্চিন্ত মনে সুলেখার হাতখানি ধরে স্থির হয়ে রইলেন।

বীরেশ্বর আসে।

করুণেশের জ্বর তখনও যায়নি। তবে অন্যান্য উপসর্গ অনেকাংশে কমেছে। কিন্তু ডাক্তারের মতে সাবধানতার শেষ এখনও হয়নি। জ্বরটা বাঁকা পথে যাতে না এগুতে পারে সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন।

নিয়মিত ভাবে জ্বর দেখা, রোগীকে ওষুধ দেওয়া, পথ্য দেওয়া, তদারক করা—সবেরই ভার সুলেখার উপর। সকালে থার্মোমিটার দিয়ে জ্বর দেখছিল সে। জ্বরের তাপ তখনও একশো দুই। সুলেখার যেন বিশ্বাস হতে চায় না। তাই সে হাত দিয়ে কপালের তাপটি অনুভব করে। করুণেশ বলেন, তুমি অনেক সেবাই আমার করলে ভাই। এখানে এসে পর্যন্ত দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারনি। কিন্তু আর না। বীরেশ্বর এসে গেছে। আর তোমায় ধরে রাখব না। এবার তোমার মুক্তি।

সুলেখা বলে, বেশ আর কিছু?

করুণেশ ঘাড় নাড়েন, না।

সুলেখা বলে, কিন্তু আমাকে মুক্তি দেবার জন্যে আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন বলুন ত? এ ক দিনে এতই কি বোঝা হয়ে পড়েছি?

—না ভাই, পরের দ্রব্যে লোভ করতে নাই। তুমি, পরের দ্রব্য, তোমার ওপর লোভ করতে যাই কেন?

—বেশ, করবেন না। আমি সেজন্যে মাথার দিব্যি দিইনি। আর যদি বোঝা মনে করেন—

—না, না বোঝা মনে করব কেন? তবে আর একজনের কথাও ত ভাবতে হবে। তাকে খামোকাই কষ্ট দি কেন?

—ও চিন্তা অনর্থক মুখুজ্যে মশাই। আমার জন্যে কেউ কষ্ট পাবে না। যদি কেউ পায়, সে নিজের দোষেই পাবে।

—বল কি! পৃথিবীতে এমন লোকও আছে নাকি তোমার জন্য যার কষ্ট হবে না?

সুলেখা মুখ টিপে বলে, আছে। এমন লোকও আছে। আমার সামনেই আছে।

—ওটি তোমার অপভাষণ সুলেখা। তুমি মনে মনে জান এক কথা, আর মুখে বলছ অন্য কথা।

—আমার বয়ে গেছে অন্য কথা বলতে। সুলেখা আরক্ত মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

বীরেশ্বরের সঙ্গে কথা হচ্ছিল সুলেখার। বীরেশ্বর বলছিল, ছুটি দেবে না কিছুতেই। বলে, অনেকগুলো নতুন মেসিন এসেছে, সেগুলো ঠিক করে বসাতে হবে। এখন ছুটি হবে কি করে? অনেক বলে কয়ে তবে দু'দিনের ছুটির কড়ারে আসতে পেরেছি।

সুলেখা ব্যঙ্গভরে বলে, বল কি! দু-দিনের ছুটি! তোমায় ছাড়তে পারল তারা? এ দু'দিন মেসিন চলবে কি করে? ব্রেক ডাউন হবে না?

—না। এ দুদিন শুধু নতুন মেসিনগুলির প্যাকিং খোলা হবে, সেই রকম ব্যবস্থা করে এসেছি। তবুও আজ রাত্রেই ফিরতে পারলে ভাল হয়।

—তা না হলে সব রসাতলে যাবে?

—তা নয়। শুধু শুধু কামাই করে লাভ কি? তবে আজ রাত্রে একান্তই যাওয়া যদি না হয়, কাল সকালের একসপ্রেস আমায় ধরতেই হবে।

সুলেখা শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলে, তাই কর। কেউ তোমায় বাধা দেবে না বা আটকে রাখবে না।

বীরেশ্বর বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, তার মানে? তুমি যাবে না?

সুলেখা উদাস ভাবে বলে, আমার যাওয়া আর হবে কি করে? দেখতেই ত পাচ্ছ এখানকার অবস্থাটা। মুখুজ্যে মশাইয়ের জ্বর আজও ছাড়ল না। এখানে তাকে দেখবার লোক কেউ নেই। অথচ ওষুধ আছে, পথ্য আছে, সেবা শুশ্রূষা সবই আছে। পিসিমা বুড়ো মানুষ, তাঁর দ্বারা এ সব কিছুই হবে না। ডাক্তার বারবার সতর্ক ক'রে গেছেন—এসব ব্যাপারে একটুও এদিক ওদিক যেন না হয়। তাই ভাবছি, একজন ত চলে গেল চোখের আড়াল দিয়ে, আর একজনও কি চলে যাবে চোখের সামনে দিয়ে, আর তাই আমি চেয়ে চেয়ে দেখব নিশ্চেষ্ট চোখে?

বীরেশ্বর অপ্রতিভে পড়ে। বলে, তবে থাক। এ সময়ে তোমার গিয়ে কাজ নেই। মুখুজ্যে মশাইয়ের অবস্থা ত স্বচক্ষে দেখতেই পাচ্ছি। তাঁর কাছে একজন লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। তিনি একটু সুস্থ হ'লেই বরং তুমি যেও। আমি না হয় যা হ'ক করে এ কদিন চালিয়ে নেব।

সুলেখা উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা অভিমান তার জেগে ওঠে। দুটি সংসার। একটিতে সে আজ যতখানি অপরিহার্য। অপরটিতে তার কিছুমাত্র না। স্বামী একটিবারও মুখ ফুটে স্বীকার করল না যে সুলেখা না হ'লে সে অচল। সেখানকার সংসার অচল। সুলেখার ইচ্ছে হ'ল একবার চেঁচিয়ে বীরেশ্বরের মুখের উপর বলে উঠে, শুধু এ কদিন কেন, চিরদিন তুমি যা হ'ক করে চালিয়ে নাও, আমি তোমায় বিরক্ত করতে সেখানে যাব না। কিন্তু কোন কথাই সে বলল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। তবে বীরেশ্বরকেও ধরে রাখা গেল না। করুণেশের অনুরোধে রাতটুকু যদি বা কাটল, পরের দিনের সকাল আর কাটল না। কারখানার সদ্য প্যাকিং মুক্ত মেসিনগুলো এমন প্রবল বেগে তাকে আকর্ষণ করল, যে সে সকল অনুরোধ উপরোধকে ছিন্ন করে বেরিয়ে পড়ল। যাত্রার যত কিছু আয়োজন সব করে দিল সুলেখা দ্বিতীয়বার বাক্যনিষ্পত্তি না করে।

কিন্তু বীরেশ্বর চলে যাবার পরই সুলেখার সারা অন্তরে জ্বালা ধরে গেল। মন বিদ্রোহ করে উঠল। তখন দুচোখে ফুটে উঠল তার দুটি সংসারের চিহ্ন। একটি স্নিগ্ধ অনাবিল মনোরম। সংসারের

রূপে, রসে, গন্ধে সেটি পরিপূর্ণ। আর একটি কক্ষ, সর্বধাতুর্ঘ রক্ষিত। সেখানে আছে শুধু মেসিন আর ব্রেক ডাউন। সকাল থেকে সন্ধ্যা, আর সন্ধ্যা থেকে রাত্রি সেই একই চিত্র। দুটি সংসার একেবারে বিপরীত ধর্মী। একটি খরস্রোতা নদী, সেখানে তরীতে পাল তুলে দিয়ে উজানে না ভাসিয়ে দেওয়া যায়। আর একটি বদ্ধ পুকুর। না আছে বেগ। সেখানে তরী অচল। একটি দুহাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করে, আর একটি? সেখানে আকর্ষণীয় কোন বস্তুই খুঁজে পায় না সুলেখা। অথচ এই তার সংসার। ইচ্ছা থাক বা না থাক, সেখানে ফিরে গিয়ে বদ্ধ পুকুরেই তাকে তরী ভাসাতে হবে। সুলেখা আর পারে না। দাঁতে দাঁত চেপে দু হাতে বুক চেপে ধরতে চায়। ঠিক সেই মুহূর্তে দিদিমা এসে খবর দেন, ওঘরে করুণেশ তোমায় ডাকছে মা। দুহাত দিয়ে মাথাটা সে টিপে ধরেছে। বোধহয় যন্ত্রণাটা বেড়েছে আবার।

সুলেখা শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে করুণেশের ঘরে এসে উপস্থিত হয়। তখন তার চোখ থেকে একটা সংসারের চিত্র প্রায় বাপসা হয়ে এসেছে। সেখানে ফুটে উঠেছে আর একটা সংসারের চিত্র।

হলিউড ষ্টুডিওর কাজ শেষ করে বাড়ী ফিরছিলেন পরিচালক ভিকি কলিন্স। পরদিন একটা বইয়ের স্যুটিং আছে,—কিন্তু উপযুক্ত নায়িকা তিনি ঠিক করতে পারছিলেন না!

পথের পাশে একটা ক্লাব। অত রাত্রেও সেখানে নাচ চলছিল।

ভিকি সেখানে গিয়ে বসতেই একটা ট্রে ভর্তি বিয়ারের গ্লাস নিয়ে এক তরুণী তাঁর কাছে এলেন।

ভিকির ছবিতে এই রকমই একটা দৃশ্য আছে বটে!

এইবার ভিকি হঠাৎ তরুণীকে মারলেন এক ধাক্কা, ট্রে শুদ্ধ বিয়ারের গ্লাসগুলি মাটিতে পড়ে গেল।

তরুণীও সঙ্গে সঙ্গে ভিকিকে মারলেন এক চড়। "স্কাউণ্ড্রেল!"

ভিকির মুখে তখন হাসি। তিনি চীৎকার করে উঠলেন, তিনি পেয়েছেন তাঁর নায়িকাকে।

সেই রাত্রিতেই তিনি সেই তরুণী মারলিন্ ডিয়েট্রিকের সঙ্গে মোটা টাকার চুক্তি করে ফেললেন।

চোর

দিলীপকুমার দাশগুপ্ত

আধশোয়া হ'য়ে ঝিমুচ্ছিলুম। হাত পা ছড়িয়ে শোবার জায়গাও ছিল। কিন্তু পুরাণো মডেলের তৃতীয় শ্রেণীর ফাঁক ফাঁক বেঞ্চিগুলোর ওপরে শুতে বাধা লাগছিল।

গাড়ীতে কয়েকজন যাত্রী রয়েছে। বেলডাঙা থেকে বস্তা বস্তা বাঁধাকপি নিয়ে চলেছে। বাঙ্ক, বেঞ্চির তলা, দরজার গোড়া, কোথাও ফাঁক নেই। বাঁধাকপির বস্তায় কামরাখানা ভর্তি। এক একজনে চার-পাঁচ বস্তা কপি তুলেছে। বিক্রী করবে।

চৈত্রের প্রায়ন্তেই সুইছাড়া গরম পড়েছে। লোমকূপের ফাঁক দিয়ে সুস্পষ্টভাবে স্বেদ-বহির্গমন অনুভব করতে পারছি। গাড়ীতে ওঠা থেকেই একটু ঘুমের আশা করেছিলুম। কিন্তু গরম আর বাঁধাকপির বুনো গন্ধ আমাকে ঘুমুতে দেয়নি। দেহ হেলিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে ঝিমুচ্ছি।

ঘুবুলিয়া আসতেই উঠতে হ'ল। এখানে অনেক যাত্রী ওঠে। ঠাসাঠাসি করে বসতে হয়। তাই কেউ অনুরোধ করবার আগেই উঠে বসলুম। বসলুম একটা কোণে, জানালার কাছে।

কিন্তু এ কামরাতে ভিড় পড়েনি। কপির বস্তা নামাতে যে সময়টুকুর প্রয়োজন, সেটুকু অপেক্ষা করতে চায়নি এখানকার যাত্রীরা। তারা ধাওয়া করেছে অন্য দরজার দিকে।

যারা উঠল, তারা নিতান্তই শান্ত এবং ভব্য-সভ্য। ওদিকের বেঞ্চির দিকে কেউ গেল না। কেননা বিকেলের রোদ ও পাশে জানালার কাছের বেঞ্চিকে তাতাচ্ছে। আরো বেলা পড়লে সামনের বেঞ্চির ওপরেও রোদের ঝলক পড়বে। তাই এ ধারের বেঞ্চি দুখানাই আগে ভর্তি হ'ল।

আমার ঠিক সামনের কোণে বসেছে একটি মেয়ে। মুখোমুখি। তার সেডিজ ছাতাটিকে পেছনে শুইয়ে রেখেছে।

থার্ড ক্লাসের এই বেঞ্চিগুলোতে বসে ভব্যতা রক্ষা করা যায় না। কর্তৃপক্ষ বড় কৃপণ। চারের বদলে তিনখানা করে বেঞ্চি বসালে প্রবণে খানিকটা আয়েস লাভ করা যেত। বর্তমান অবস্থায় সব সময়ে থাকতে হয় সন্ত্রস্ত হয়ে।

আমাকেও হুঁসিয়ার হ'তে হ'ল। বসতে হ'ল কোণাকুণি। স্পর্শ বাঁচিয়ে। একটু অসাবধান হ'লেই ভব্যতার হানি ঘটবে।

চকিতে মেয়েটিকে দেখে নিলুম একবার। শ্যামবর্ণা। মুখখানা গোল এবং ভরাট। শরীরটা একটু ভারি।

সবুজ পাড়ের সাদা তাঁতের সাড়ি পরণে। গায়ে কনুই পর্যন্ত হাতাওয়ালা চিত্র-বিচিত্র ছিটের একটা ব্লাউজ।

মুখে ক্লান্তির ছাপ। কিছুটা হয়তো রোদের। বাকীটা পরিশ্রমের। মেয়েটিকে রূপবতী বলা চলে না। যেটুকু আছে, সেটুকু ওর বয়েসের।

গাড়ী ছাড়ল।

মেয়েটি বলল, তাস বের করুন।

তখন বুঝলুম, এরা একদল যোজকায় যাত্রী। কথাবার্তায় বুঝলুম, ধুবুলিয়াতে এরা হাত বেঁচান। হয়তো কোন স্পনসর্ড কিম্বা বেসিক স্কুলের মাষ্টার।

আমার পাশের লোকটি কাগজে জরানো তাসের মোড়ক বের করল। সামনা-সামনি দুটো বেঞ্চির সঙ্গে সংযোগ সাধন করা হ'ল দুটো ছাতা দিয়ে। তার ওপরে খবরের কাগজ বিছিয়ে তাস বাঁটা হ'ল। নয়লা পুরাণো তাস। প্রায় প্রতিটিরই একটা-দুটো করে কোণ কাটা।

আমি ব্যক্তিগতভাবে গাড়ীর মধ্যে তাস খেলা পছন্দ করিনা। ভালো লাগে না সহযাত্রীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে সমস্ত পথ বক্ বক্ করা। গাড়ীতে চুপচাপ বসে থাকতেই বেশি ভাল লাগে।

ওদের খেলা আরম্ভ হ'ল। ওরা চারজন। আমার ডানদিকের দুজন মেয়েটি, আর তার পাশের লোকটি।

আমি ধরনা থেকে শিয়ালদা যাতায়াত করি প্রত্যহ। গাড়ীতে বহু দলকে তাস খেলতে দেখেছি! প্রত্যেকেই পুরুষ। কোন মেয়েকে গাড়ীর ভেতরে তাস খেলতে এই প্রথম দেখলুম।

খেলছে ভিংস্তোয়ার। অর্থাৎ টুয়েন্টি-নাইন।

গাড়ী চলছে চিমে-তেতালায়। বেগ হয়তো কুড়ি। কিম্বা নিতান্ত বেশি হ'লে পঁচিশ। অথচ রাণাঘাট পেরিয়ে এ গাড়ী সব স্টেশন ধরবে না। তখন গতি হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ।

অতি সন্তর্পণে উঁকি মেরে বাঙ্কের ওপরে আমার হাত ব্যাগটাকে দেখে নিলুম। ওটা ঠিক আছে।

ওরা খেলছে। মেয়েটি মাঝে মাঝে তার বাঁ দিকের ভদ্রলোকের দিকে তাকাচ্ছে। আর প্রতিবার খেলায় শেষে তাকে লক্ষ্য করে একটু হেসে বলছে, চোর!

ভদ্রলোক উঁকি-ঝুঁকি মেরে ওর তাস দেখছে।

এতক্ষণ ওদের খেলার দিকে মন দেইনি। প্রতিবারই খেলায় শেষে পাশের খেলোয়াড়টিকে চোর বলাতে স্বভাবতই আকৃষ্ট হলাম খেলার ওপরে। বার-দুয়েক দেখেও ধরতে পারলুম না ভদ্রলোক কিভাবে অসৎ উপায় অবলম্বন করছে। কারুর হাতের দিকে তাকে তাকাতেও দেখলুম না। খেলাটাকে পরিষ্কার ও নির্ভেজাল বলেই বোধ হ'ল। যখনই ডাকছে, জিতে বেরিয়ে যাচ্ছে। প্রতিপক্ষ কিন্তু ডেকে খেলা নিয়ে প্রায়ই হারছে।

আর মেয়েটি মৃদু হেসে ওর দিকে তাকিয়ে বলছে, চোর।

ভদ্রলোক হাসছে। বয়েস হয়তো বছর আটাশ হবে। ধুতি-সার্ট পরিষ্কার। কালো হলেও চেহারাটা উজ্জ্বল। হাসলে ওপরের পাটির মোটা তিনেক ঝক্‌ঝকে দাঁত বেরিয়ে পড়ে। এ সময় লোকটাকে বেশ দেখায়।

কয়েকবার খেলা দেখে বুঝলুম, তাসের ভাঁজে ওর চেনা। প্রতিপক্ষের কাছে কোন্ তাস গেছে তা বুঝতে পারে। মনে হ'ল বত্রিশখানা তাসের গতিবিধি ওর নখ-দর্পণে।

ওইখানেই ভদ্রলোকের বাহাদুরী। তাই প্রতিপক্ষ পারছে না। মেয়েটি হারছে বলেই তার ধারণা হয়েছে চুরি করে খেলছে। বলছে, চোর।

ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি ভালো লাগল।

খেলা কিন্তু থেমে গেল। ঘুঘুদিহা থেকে এ পর্যন্ত কতটুকুই বা রাস্তা। কৃষ্ণনগর আসতেই দেখলুম তিনজন খেলোয়াড়ই উঠে পড়ল। ওরা নামবে।

মেয়েটি গুছিয়ে বসল।

'চোর' ভদ্রলোক নেমে গিয়েও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড। সহকর্মী দুজন চোখের আড়াল হ'তেই সে ইসারাতে মেয়েটিকে ডাকল।

আমারই পাশ দিয়ে মেয়েটি গলা বাড়ালো।

ভদ্রলোকের চোখে-মুখে এবার লুকোচুরির ভাব ফুটে উঠেছে। চকিতে পরিবেশটা দেখে নিয়ে মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদু কণ্ঠে বলল, কাল আসছি না। রেজিষ্ট্রারের অফিসে যাবো। ভেবো না, বুঝলে।

মেয়েটির মাথা দোলানি স্পষ্টই দেখলুম। কিন্তু বাইরে গলা বাড়িয়েছে বলে চোখ-মুখের ভাবটা বুঝতে পারলুম না।

মেয়েটি বলল ফিস্‌ফিসিয়ে, তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করবে। লুকোচুরি আর ভাল লাগে না।

আমার কান কিন্তু এদের গোপন কথা শুনতে পেল।

আমি অনেক বুঝলুম, অনেকখানি অনুভব করলুম।

ভদ্রলোক সত্যি সত্যি একজন চোর। ভাল-চোর নয়। মন-চোর।

চুরি করেছে মেয়েটির মন।

পার্কের কোণের বেঞ্চিটায় বসে তাঁর কবিতার খাতা পড়ছিলেন হুইটম্যান। কিন্তু বইটার নাম কি দেবেন, সেটা ভেবেই পাচ্ছিলেন না।

ঠিক সেই সময়ে এল তাঁর সামনে দুটি ভাইবোন। বোনের বয়স দশ, ভাইয়ের বয়স সাত।

ভাই ঘাসের পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার দিদির গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। দিদি রেগে গিয়ে বলল ; ছিঃ নটন, তুমি এসব নোংরা জিনিষ নিয়ে খেলা করছ ?

—নোংরা জিনিষ আবার কি !—এগুলোত Leaves of grass।

শুনেই হুইটম্যান চমকে উঠলেন, তারপর তাঁর খাতার উপর নামকরণ করলেন—Leaves of grass।

দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি

রচনা : কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাট্যরূপ : বরুরুচি

[রসসাহিত্যিক হিসাবে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাংলা সাহিত্যে চিরকালের জন্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। দুঃখের বিষয় অধুনা তিনি বিস্মৃতপ্রায়। একথা তাঁর রচনা রসসৃষ্টিতে এবং প্রায় বাংলার চিত্র অঙ্কনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর লেখা একটি নির্মল কৌতুক-চিত্রকে নাটকাকারে সাজিয়ে দেওয়া হল।—গঃ ভাঃ সঃ।]

কলকাতার কাছাকাছি এক পল্লীগ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী চৌধুরী মশায়ের বৈঠকখানা। চৌধুরী মশায় সঙ্গতিপন্ন জমিদার। বাড়ি, বাগান, পুকুর, শিবমন্দির, সটকার মাথায় অনির্বাণ বাড়বানল —সবই তাঁর ছিল। আর ছিল, তাস পাশা অহিফেন আর সান্ধ্য মজলিশ—এই চতুর্বেদ-চর্চা।

তখনকার ন্যাশনাল থিয়েটারে "দুর্গেশনন্দিনীর" প্রথম অভিনয় রজনী ঘোষিত হয়েছে। গ্রামের দেওয়ালে অবধি সোনার জলের পোস্টার পড়েছে, তাতে লেখা—

"কে না জানে বঙ্গে রঙ্গে বঙ্কিম লেখনী,
কে না জানে বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী।"

কাছারি যাতায়াতের সময় সেই পোস্টার চৌধুরী মশায় গাড়ির মধ্যে থেকে দেখেছেন, সবটা বুঝে উঠতে পারেননি।

সন্ধ্যাকাল। আফিম চড়িয়ে খুব হয়ে চৌধুরী মশায় বৈঠকখানায় আসীন। ঘরজামাই গোড়ার ভৃত্য নন্দা। পারিষদবর্গের আসার সময় হয়েছে।

এমন সময় চৌধুরী মশায়ের পেয়ারের নাতি আধুনিক সাহিত্যের অনুরাগী নব্য-ছোকরা ইন্দুর প্রবেশ।

চৌধুরী। কে রে। ইন্দু নাকি?

ইন্দু। হ্যাঁ দাদামশায়, আমি। আপনি এই ভরসন্ধ্যেবেলায় ঘুমুচ্ছেন নাকি?

চৌধুরী। ঘুমুচ্ছি। আলবৎ না। তোর হাতে ওটা কি?

ইন্দু। ও একখানা বই।

চৌধুরী। হ্যাঁ, ভাল কথা। দুর্গেশ নন্দী লোকটা কে রে? লোকানটা কোথায়? বরানগরে বুঝি? বেজায় বেড়ে উঠেছে দেখছি। মেয়ের বিয়েতে সোনার জলের হেঁয়ালি ছেড়েছে দেখলুম। তেল বেচে, না? তা না হলে এতো তেল!

ইন্দু। হেঁয়ালি কোথায় দেখলেন?

চৌধুরী। ওই যে দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছে।

ইন্দু (সহাস্যে)। তা ওর মধ্যে 'নন্দী' কোথায় দেখলেন! লেখা আছে, দুর্গেশনন্দিনী।

চৌধুরী। (চুলতে চুলতে) ওই হল। বাংলা বুঝি নারে শালা। নায়ক দুগো নন্দীর মেয়ে। এই তো?

ইন্দু। না, দাদামশায়, ও একখানা উৎকৃষ্ট উপন্যাসের নাম। বঙ্কিমবাবুর লেখা। অমন বই পড়েননি। তার একটু যদি দেখেন, নাওয়া খাওয়া ঘুমে যাবে, সবটা না দেখে ছাড়তে পারবেন না, অবাক হয়ে যাবেন।

চৌধুরী। যাম্ যাম্। নন্দীর মেয়ে দেখে ওর দাদামশায়ের মাথা ঘুরে যাবে, ছানোর মত অবাক হয়ে দেখবে? ইস্টুপিড কোথাকার। হ্যাঁ, সে বটে 'দোলেবকালী'! আলবৎ! কেতাব বটে!

ইন্দু। কি বলছেন দাদামশায়। অমন সুন্দর বই বাংলায় আর বেরোয় নি। অমন একটি 'আইডিয়া' দুনিয়া চুঁড়ে বার করতে পারবেন না।

চৌধুরী। এটা কি মাস রা?

ইন্দু। কেন! আশ্বিন।

চৌধুরী। এ দুটো মাস আর বাড়িক বৃদ্ধি করে মাথা খারাপ করিস নি। ক'টা দিন কোন রকমে কাটিয়ে দে ভাই। অন্নাশের তেরোটা দিন বাদ দিয়ে তোর মুখ বন্ধ করছি, রোস্।

ইন্দু। আপনি তো শুনবেন না। কি ঘটনাবিন্যাস, সে না শুনলে—

চৌধুরী। বটে। লেখকের বাড়ি কোথায়? যাত্রার দল আছে বুঝি?

ইন্দু। না, না, মস্ত বিদ্বান, ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। বাড়ি কাঁটালপাড়া।

চৌধুরী। বলিস কি। ডেপুটি। ও বুঝেছি। আইন আকবরির তর্জমা করেছে। যাঃ! আর আঠামি করতে হবে না। আগে আখ্, শোন্, দেখ্। ওই আমডাঙা, নারকোলডাঙা, ডুমুরদহ, বেলঘরে, বেলগেছে, কলাগেছে, কাঁঠালপাড়া—ওসব আয়গায় লোক কলহরি ঠাকুরের কলোয়ার—তারা আবার বই লিখবে! লিখলে, আমরা কি বাড়া বানিয়ে বসবে। আর কি ভারতচন্দ্র আছে,—এক কেতাবে খেতাব বেরিয়ে গেল—'মেদিনী হইল মাটি'—খবর রাখিস?

ইন্দু। আপনাকে বোঝানো অসম্ভব।

চৌধুরী। আলবৎ নয়। আচ্ছা নিয়ে আয় তোর বই। আমি শুনবো।

ইন্দু। বইখানা তো সঙ্গেই রয়েছে—

চৌধুরী। অ্যাঁ, বলিস কি! একেবারে সেপ্টে গেছিস!

(বাইরে কাশির শব্দ পাওয়া গেল। চৌধুরী মশায়ের তিনজন পার্ষদ, বিশ্বম্ভর, হরদেব এবং কালীবর প্রবেশ করলেন)

চৌধুরী। এসো, এসো। বস। (সকলের উপবেশন) বুঝলে হে বিশ্বম্ভর, ইন্দু আমাদের একখানা বই শোনাবে বলে বায়না ধরেছে—

ইন্দু। মোটেই বায়না ধরিনি। আপনিই তো শুনতে চাইলেন।

চৌধুরী। হ্যাঁ। চাইলুমই তো। শোনা তোর কেতাব। তিনজন সমঝদারও আছে। বোঝা যাবে কেমন বই। শুনছো, হরদেব, কাঁঠালপাড়ায় কে এক ডিপুটি টকনাথবাবু নাকি লিখেছেন।

ইন্দু। আজ্ঞে বঙ্কিমবাবু!

চৌধুরী। ওই হল। বঙ্কিম আর টক ওই একই কথা। আসল অক্ষর তো বাদ দিইনি—ওর করে তো বজায় রেখেছি। কি বল কালীবর?

কালীবর। আজ্ঞে, তা তো বটে কথাই।

চৌধুরী। নে সুরু কর্।

(ইন্দু বই খুলে পড়তে আরম্ভ করল। চৌধুরী মশায় ঢুলতে লাগলেন)

ইন্দু। দাদামশায়, শুনছেন?

চৌধুরী। হুঁ। তারপর?

ইন্দু। (পড়তে লাগল)। "এমন সময় মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহ—"

চৌধুরী (ঢুলুনি থামিয়ে)। বাদ্ ঠারো। পাগলি ছাড়। মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহ? কখনো হতেই পারে না। এই সব বই লেখা, ছ্যাঃ—

ইন্দু। কেন? কি হল?

চৌধুরী। আরে মানসিংহ লোকটাই বা কে, কার ছেলে, কাদের খাযোয়ান, এ পরিচয় কে দেবে? তিনি তো আর গঙ্গাগোবিন্দ সিং নন যে দশ-পুরুষ লোক!—আমি কেটে দাও। লেখো—ওসসিংহের পুত্র মানসিংহ, তস্ত পুত্র কচু সিংহ, তেনার পুত্র বেঁচু সিংহ—তবে না একটা ধারাবাহিক বংশাবলী পাওয়া যাবে! ও পাড়ার মেনকা ঠান্দি মেয়েমানুষ হলে কি হবে, তাঁরও এসব জ্ঞান আছে। নিজে মেনকা, মেয়ের নাম রেখেছেন দুর্গা, নাতনির নাম লক্ষ্মী। খুঁট ধরলেই পটাপট তিন পুরুষ গ্রাগসে বেরিয়ে আসে। বই কি লিখলেই হল। কি বল হে হরদেব।

হরদেব। কি আর বলব। আর কি দেবীবর আছেন। তিনি থাকলে এসব যথেচ্ছাচার ঘটতে পেতো না।

কালীবর। ছেড়ে দাও, ওসব কথা আর বাড়িও না। আমাদের ওপাড়ার মহাদেব খুড়োর ছেলের নামকরণ হয়েছে—'মেঘনাদ'। সতী সাধ্বী বিন্দু খুড়ীর কপালটা একবার ভাখো। কার্তিক নয়, গণেশ নয়—মেঘনাদ। মেঘনাদ হয় কি করে? সমাজ কি আর আছে। বিন্দু খুড়ী লজ্জায় গঙ্গাস্নান ছেড়ে দিয়েছেন। থাক। ও পাপকথা ছেড়ে দাও।

চৌধুরী (জড়িত স্বরে)। ছেড়ে দাও কি রকম। আমরা জিতা থাকতে জাতটা চোখের সামনে বর্ণসংকর মেয়ে যাবে নাকি? কালই মহাদেবকে ডাক দাও। বুঝলে। হুঁ! ইন্দু, তারপর?

ইন্দু। "বিমলা আর তিলোত্তমা তখন শৈলেশ্বর মন্দির মধ্যে। বাহিরে ভীষণ ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত—"

চৌধুরী (চমকে উঠে)। দুর্গা, দুর্গা! নন্দা, ওরে নন্দা। ঢুলছিস বুঝি! দেখছিস না হারামজাদা, মাথার ওপর কি প্রলয় কাণ্ড! গরুগুলো বাইরে নেই তো? শিগগীর তুলে ফ্যাল্। উঠ্‌লি?

ইন্দু। "রমণীদ্বয় ভয়ে জড়সড়—"

চৌধুরী (সজোরে)। কোন ভয় নেই মা—এ ভদ্রলোকের বাড়ি। নন্দা, মিত্তিরকে বল্, ওঁদের বাড়ির মধ্যে নিয়ে যান। শুনি?

ইন্দু (পড়তে লাগল)। "এমন সময় জগৎ সিংহ মন্দির দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিলেন—মন্দির মধ্যে কে আছ, দ্বার খোলো—"

চৌধুরী (রেগে উঠলেন)। খেলে কলাপোড়া। মেয়েদের বলে দরজা খুলতে। বেটার বাবার মন্দির! নন্দা, আবি গলা ধাক্কা দে কে বিকালো। গিয়েছিস?

ইন্দু। "বার উন্মুক্ত হইয়া ধমকা হাওয়া ঢুকিয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল—"

চৌধুরী। অ্যাঁ। ও বেটাও ঢুকলো নাকি! কি দেখছো হে হরদেব। একটা বিহিত কর।

ইন্দু। শুনুন না, তারপর কি হল? অরংসিংহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ চমকালো, অমনি তিলোত্তমার সঙ্গে তাঁর চারি চক্ষে মিলন।

চৌধুরী (রাগে কাঁপতে কাঁপতে)। এই মাথা খেলে। শিবের মন্দিরে যেলুকোমো। পাহারাদা বোলাও। আচ্ছা, হরদেব, মেয়েগুলোই বা কি রকম! এই দুর্যোগের রাতে আমারই শিবমন্দিরে—অ্যাঁ। নন্দা, ছাতাটা দে তো। উঃ, কি বিদ্যুৎ! চোখ সামলাও হরদেব, চোখে পড়তে পারে। (বোজা চোখ সজোরে বুজলেন)

ইন্দু (হাসতে হাসতে)। আপনি ব্যস্ত হবেন না মামামশায়। আপনি বসুন, আমি দেখে আসছি।

চৌধুরী। অ্যাঁ। তুই কি দেখবি? তোর যাওয়া হবে না। ওরা কাঠের পুতুল নয়। দেখলিনি পাজি। বিদ্যুতে শুভদৃষ্টি! কি হে হরদেব! কিছু বলছ না যে!

হরদেব। কি বলব বলুন। তাস খেললে আর এসব বিভ্রাট ঘটত না।

চৌধুরী। সে তো বুঝলুম। এখন উপায়? মন্দিরের তো দরজা—বুঝলে। শিবেরও মাথা খেলে। এখন শুদ্ধির উপায় কর।

বিশ্বম্ভর। আজ্ঞে, তান্ত্রিক পুরুতকে ডাকতে পাঠান। কাল প্রাতেই পঞ্চগব্য চড়াতে হবে। আর সেই সঙ্গে যাগযজ্ঞটি—সে তো জানেনই।

চৌধুরী। দিন যায় তো ক্ষণ যায় না। হারাণজাদা নন্দাকে বলি, শেওড়া আরতি হয়ে গেলে মন্দিরে তালা মেরে দিবি। ওরায়, হরসিজ শুনবে না। ঘুস করে দেব। হাঁা, কি নাম বললে, তিলের মাথা, আর কি যেন? কি বিদকুটে নাম রে বাবা। না অ্যাস্ত, না লক্ষ্মী, না বিধু। ওরা কখনো ভাল মেয়েমানুষ নয়। খবরদার ইন্দু, ওদিকে যেতে পাবিনি। কের বিদ্যুৎ চমকাতে পারে। তোর এত ছটফটানি কেন রে হারামজাদা, বোস্ এইখানে।

(এই বলে ইন্দুর হাত ধরে সটকার নল ধরে সজোরে টান মারলেন। গড়গড়া উল্টে পড়ল)

ইন্দু (চিৎকার করে)। করেন কি, করেন কি মামা মশায়। গড়গড়া উলটে গেল যে! ইস, আঃ একটু হলেই যে লঙ্কাকাণ্ড হত।

চৌধুরী (সন্ত্রাস হয়ে) অ্যাঁ। কি হল!

ইন্দু। আর কি হবে। চরম দুর্গতি হল!

চৌধুরী। দুর্গতি? কার?

ইন্দু। দুর্গেশনন্দিনীর।

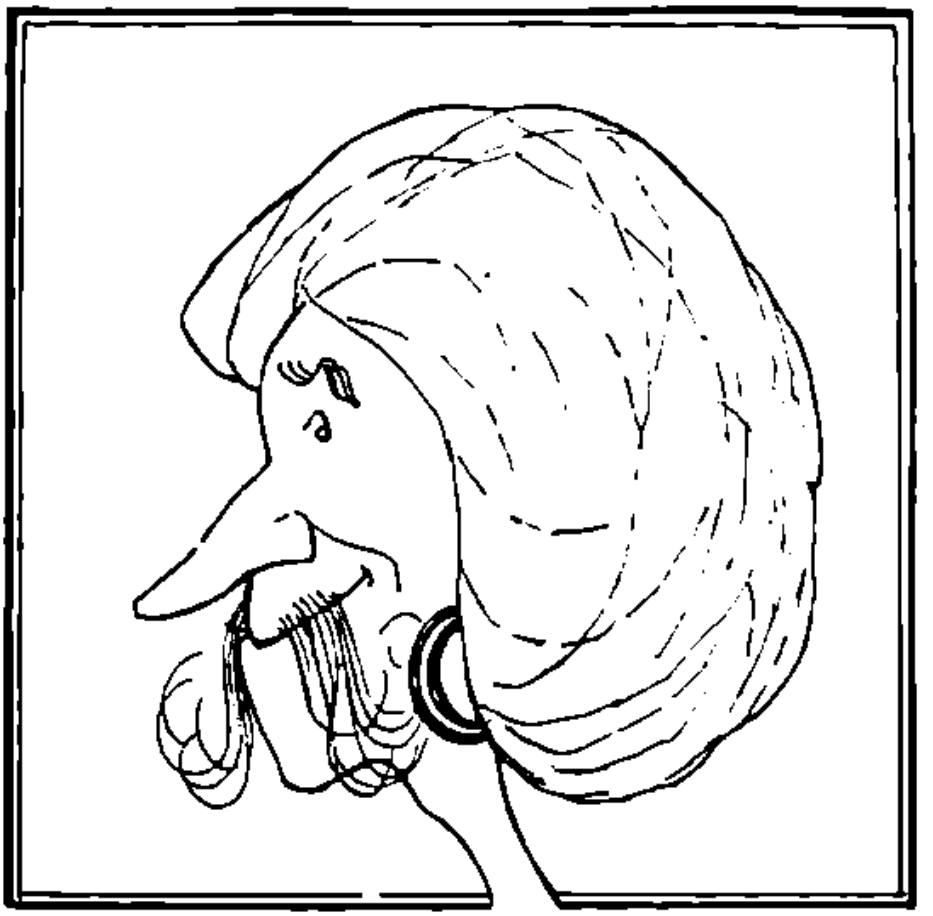

ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার

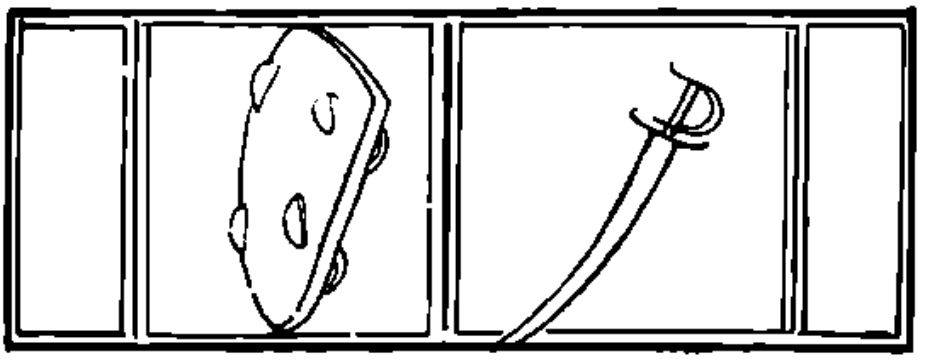

গল্পাংশ

এক ছিল রাজা। বড় লোভীন। তাঁর যত বড় নেশা ছিল কুস্তি। দেশ বিদেশ থেকে আনা বহু কুস্তিগির তিনি রাখতেন তাঁর আখড়ায়। নিধিরাম নামে ছিল তাঁর এক রক্ষক। দেখলে তাকে মনে হত তালপাতার সেপাই, টিং টিং করছে চেহারা। এদিকে মাথার মত বড় পাগড়ী আর লম্বা লম্বা গোঁফ। রাস্তাঘাটে বেরুলে তাকে দেখে সবাই হাসত। ছেলেরা পেত ভয়। এমন একটা মানুষ কোত্থেকে যে রাজা যোগাড় করলেন, জু থেকে কিনা, কেউ বলতে পারে না। রাজার ছিল অনেক সখ। যত বড় বড় কার্পেট ও বিরাট সব সতরঞ্চ দেশ বিদেশ থেকে আসত, বোখারা বা ইটালী থেকে কিনা কেউ জানে না। এই সব কার্পেট ও সতরঞ্চ জাপটে ধরে মাথার উপর ঘুরিয়ে মারত নিধি পাটার উপর আছাড়, দেখে লোকের তাক লেগে যেত। এমন সুন্দর ও পরিষ্কার সে কাচ্ত, যে সেরকম আর কেউ পারে বলে রাজা বিশ্বাস করতেন না। একবার শীতের মরশুমে সেই দেশে এল এক বিরাট্ বপু পালোয়ান। সে রাজ্যের কুস্তিগিরদের আহ্বান করল মল্লযুদ্ধে। রাজা তার কথায় খুশি হয়ে ঢোল দিয়ে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর বিরাট্ আখড়ায় হবে এক কুস্তির লড়াই। নির্দিষ্ট দিনে সুরু হোল কুস্তির লড়াই। চারদিকে সাড়া পড়ে গেল। দূর-দূরান্তর থেকে কাতারে কাতারে আসতে লাগল লোক। রাজা, উজীর, ফকির, আমীর সবাই এল। কেউবা পায়ে হেঁটে কেউবা ঘোড়ায় বা হাতীর পিঠে চেপে। হৈ হৈ পড়ে গেল রাজ্যে। রাজা সব কাজ বন্ধ করে এই নিয়েই মেতে রইলেন। ঘুষোঘুষির সঙ্গে চলতে লাগল কুস্তির লড়াই। কিন্তু এ কি হোল! রাজ্যের বড় বড় কুস্তিগির হেরে যেতে লাগল একের পর এক। রাজা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। মন তাঁর হোল ভারী খারাপ। নিধিরাম প্রতিদিনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই দেখত। সেও হল খুব বিমর্ষ। অবস্থা দেখে রাজা ঘোষণা করলেন যে এই পালোয়ানকে হারাতে পারবে তাকে তিনি দেবেন বহুমূল্য পুরস্কার। নিধি সব শুনল ও ভাবল সে যদি একবার সুযোগ পেত। একদিন বলেই ফেললো তার মনের কথা, শুনে সকলে হো-হো করে হাসল। ঠাট্টা তামাসাও করলে অনেকে, বলল তুমি কি পাগল? নিধি কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। মন ছিলো তার লোহার মত শক্ত। সোজা চলে গেল সে রাজার কাছে। রাজার কর্মচারীরা তার কথা শুনে বললে নিশ্চয় নিধির মাথা খারাপ হয়েছে। নিধি কিন্তু নাছোড়বান্দা, অগত্যা রাজা রাজী হলেন।

সুরু হল নিধির পালা। নিধির টিং টিংএ চেহারা দেখে পালোয়ান মনে মনে হাসল, ভাবল এ ব্যাটাকেও এক আছাড়ায় করব শেষ। নিধি কিন্তু ধরা ছোঁয়া দেয় না। ছিট্‌কে ছিট্‌কে সরে যায়। তার লক্ষ্য শুধু পালোয়ানের দুটো পা। সে কেবলই ভাবছে—যদি একবার ব্যাটার পা দুটো জাপটে ধরতে পারি তবে ঘুরিয়ে মারব এক সতরঞ্চ আছাড়। দেখি ব্যাটা কত বড় পালোয়ান্! ঠিক তাই হোল, যেমন পালোয়ান একবার তাকিয়েছে অন্যদিকে, খপ্ করে নিধি ধরল তার পা দুটো জাপটে, আর এক প্যাঁচ মেরে মাথার উপর ঘুরিয়ে মারল এক সতরঞ্চ আছাড়। ক্যাঁ ক্যাঁ শব্দ করে পালোয়ান ত চিৎপটাং। রাজা প্রথমটা হতভম্ব হলেন তার পরেই তাঁর আহ্লাদ দেখে কে? আহ্লাদে তিনি হলেন আটখান। রাজা নিধিকে বল্লেন—নিধি তুমিই আমার মুখ রেখেছ। এই বলে তার গলায় মুক্তার মালা পরিয়ে দিলেন।

যে সময়ের কথা বলা হলো, সে সময় লড়াইয়ে হোত চাল তলোয়ার নিয়ে, চালতলোয়ার না থাকলে কেউ সর্দ্দার হতে পারত না। নিধির না ছিল চাল, না ছিল তলোয়ার। কিন্তু চাল তলোয়ার না থেকেও সেদিন যে কেরামতি দেখিয়ে নিধি সকলকে চমক লাগালো তাতে সেদিন থেকে সে হোল সর্দ্দার।

এ গল্প আমরা শুনেছিলাম আশুতোষ কলেজের বাংলার অধ্যাপক স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র দে উচ্চটসাগরের কাছে।

রাজার রসুই নিবিরাম,
তাপপাতার দেপাই,
দিনের পর দিন
ছোঁস্ ছোঁস্ করে কাচত
রাজার মত বড় সব সতরঞ্চ।
দেখে তাক্ লেগে যেত
সকলের।

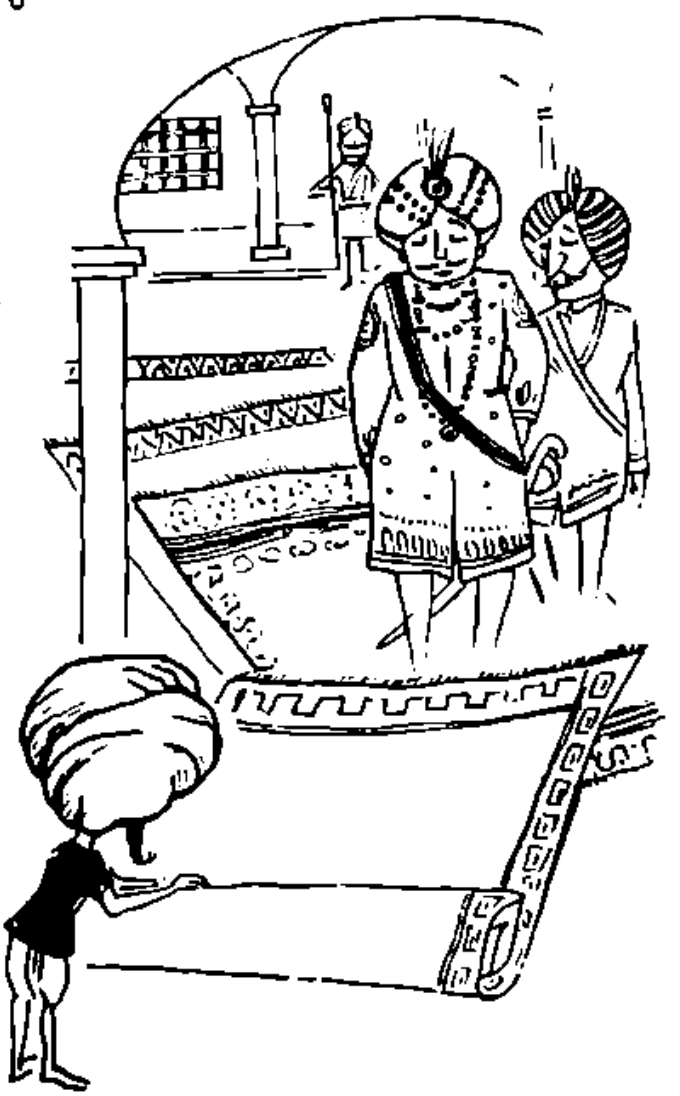

কি চমৎকার,
কেমন পরিষ্কার কাচ্‌ত সে।
রাজা দেখে হতো মহাখুশী।

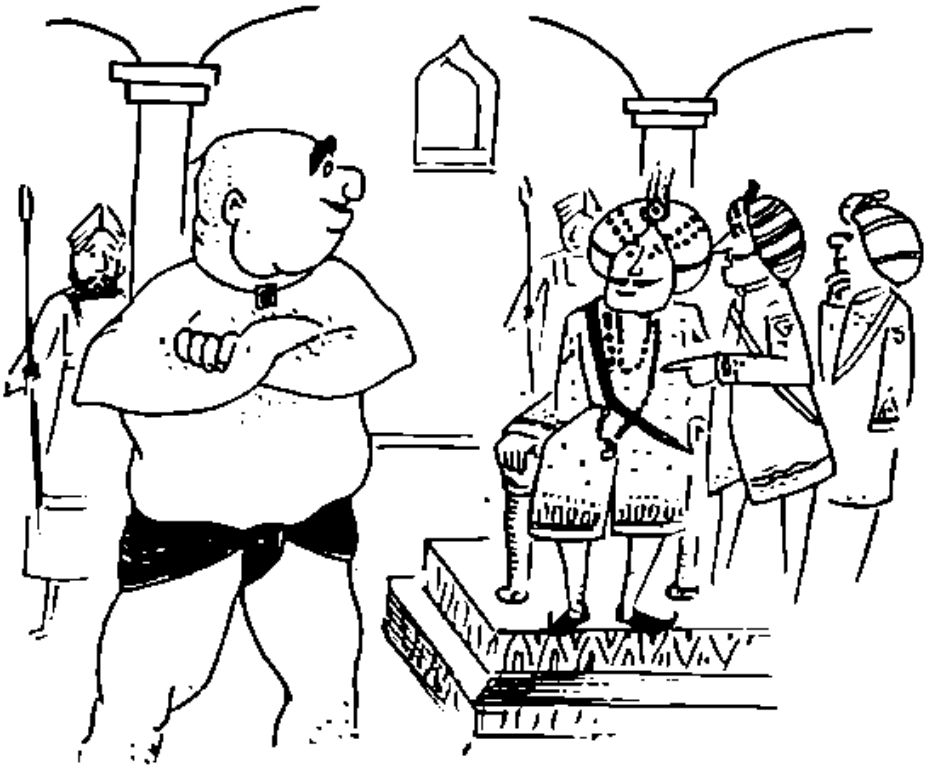

একদিন রাজার সামনে
এসে দাঁড়াল এক
পালোয়ান।
যেমন তার বিরাট বপু,
তেমনি শক্তি।

রাজা চোল দিয়ে
জানিয়ে দিলেন—
তাঁরই আখড়ায়
কুস্তিগীরদের হবে
এক লড়াই।

রাজ্যের যত বড় বড়
কুম্ভিগীর ঘেরে যেতে লাগল
একের পর এক।
নিধিরাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
দেখলে আর ভাবলে .....

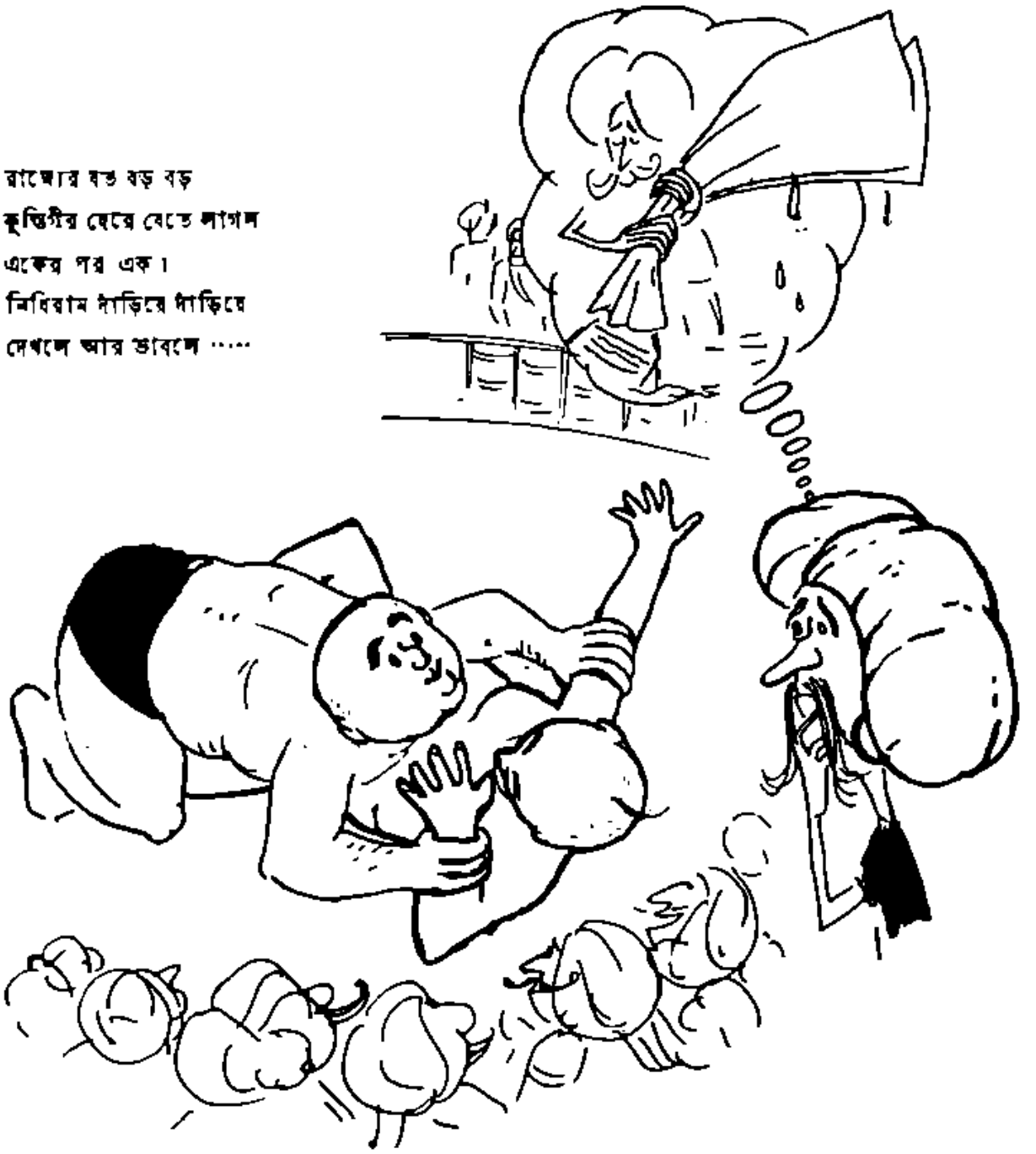

কে এই পালোয়ান তাই দেখতে বহুদূর থেকে
এলো হাজার হাজার লোক।

রাজা প্রচার করে দিলেন যে এই পালোয়ানকে
হারাবে, পাবে সে বহুমূল্য পুরস্কার ।
নিধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলে আর ভাবলে
সে যদি একবার সুযোগ পেত !

নিধি একদিন বলেই
ফেলল তার মনের
কথা। শুনে সকলেই
হো হো করে হেসে
উঠলো, ঠাট্টাও করল
অনেকে।

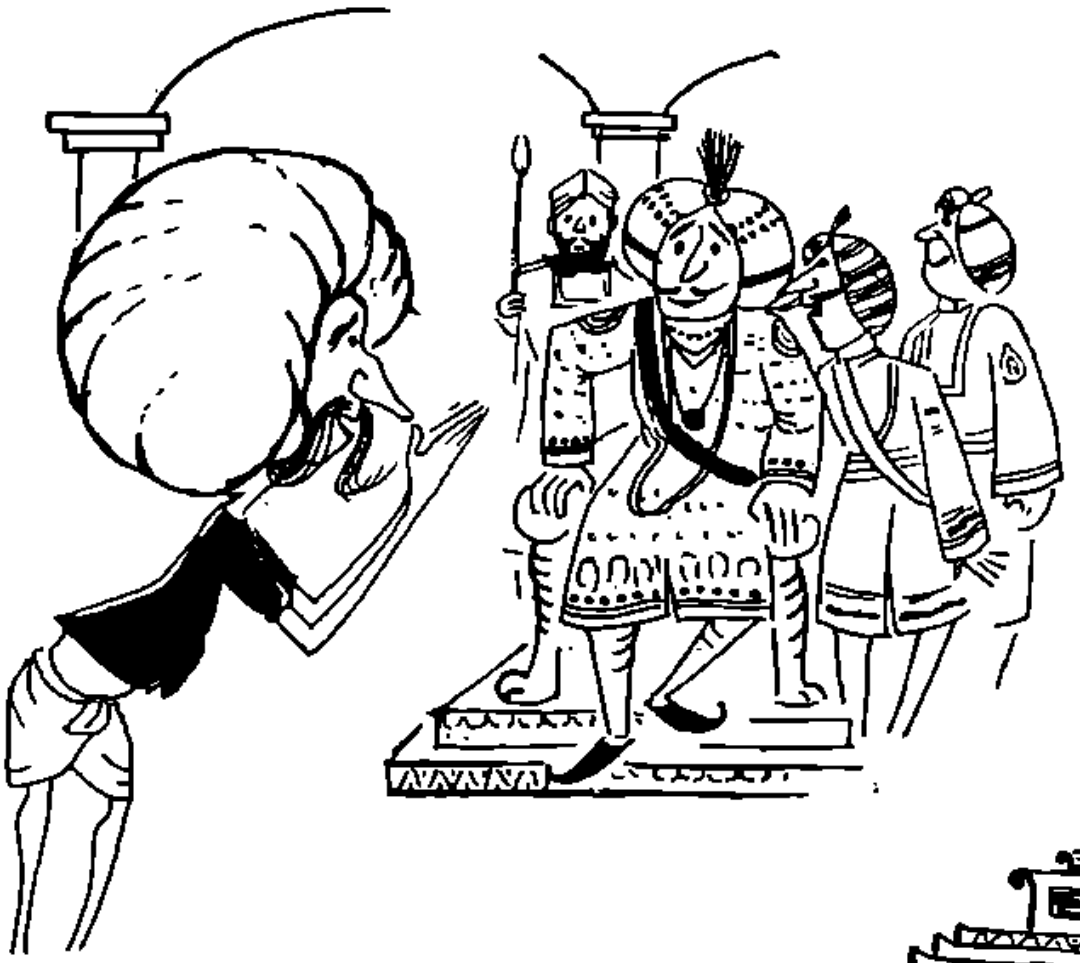

লোহার মত শক্ত নিধির মন, ঘাবড়াবার পাত্র সে নয়।
সোজা সে চলে গেল রাজার কাছে।
নাছোড়বান্দা হয়ে আনল হুকুম।

এই কথা যেমন রটে গেল রাজ্যে, অমনি তামাশা দেখতে কাতারে কাতারে লোক ছুটল রাজার আখড়ার দিকে।

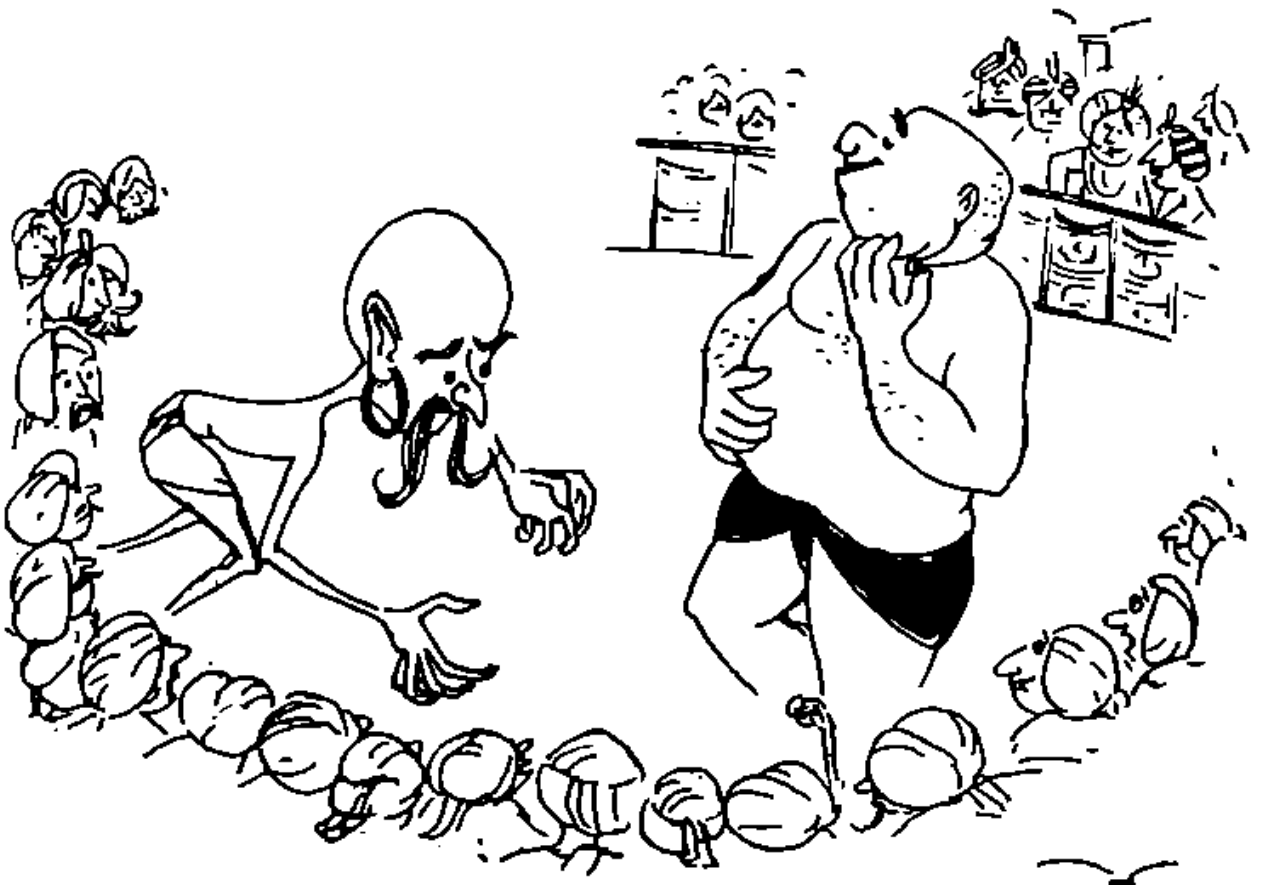

টিং টিং করছে নিধির চেহারা
দেখে পালোয়ান মনে মনে হাসলো
আর ভাবলো — এক থাবড়ায়
শেষ করব একে!
নিধি কিন্তু এক নম্বরে চেয়ে আছে
পালোয়ানের দুটো পায়ের দিকে
আর ভাবছে যদি খ্যাঁচ করে ব্যাটার
পা দুটো আপ্‌টে ধরতে পারি
মারব এক সতরঞ্চ আছাড়!
দেখি ব্যাটা কত বড় পালোয়ান!

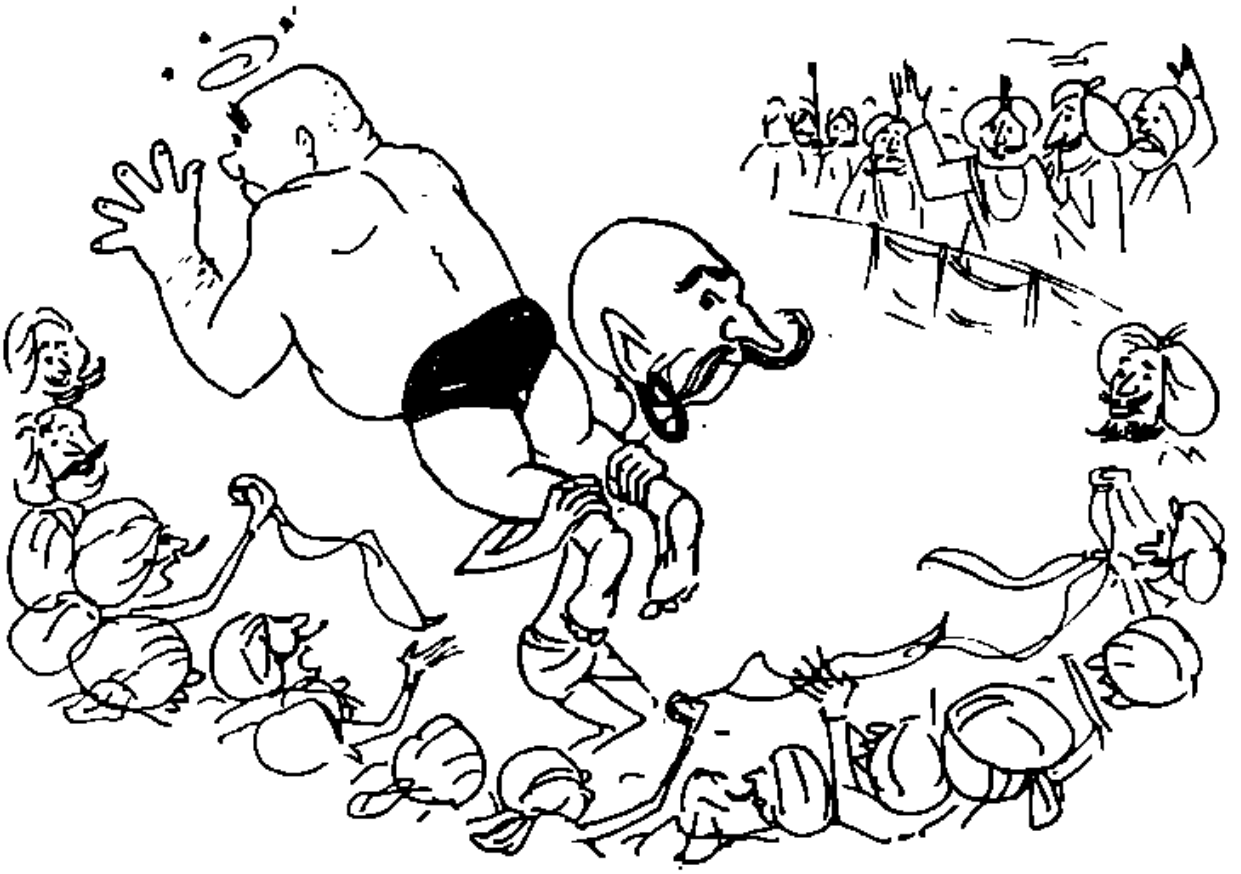

হলো ঠিক তাই!
পালোয়ান একেবারে
কুপোকাৎ। হৈ হৈ পড়ে
গেল চারধারে।
সকলের তাক্ লেগে গেল
নিধির কেরামতি দেখে।
রাজা আহ্লাদে আটখান।
বল্লেন, নিধি, তুমিই আমার
মুখ রেখেছ! রাজ্যের মান
রেখেছ তুমিই
এই বলে তার গলায়
নিজের মুক্তার হার
পরিয়ে দিলেন।

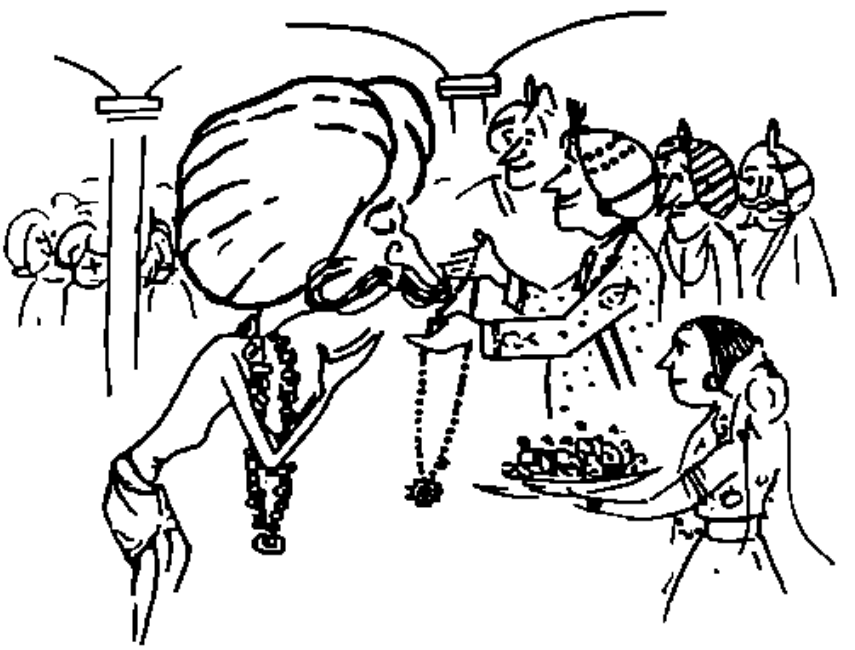

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় তরফদার

প্যারিসের এক জনবিরল পথের একটি বাড়ির নিভৃত ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। হ্যালো? নিউ ইয়র্কের আই পি আপিস থেকে বলছি। হ্যাঁ, খবর এসেছে। কাল প্যারিস ছেড়ে গেছে। বেইরুট হয়ে বোম্বাই বা কলকাতা!

প্যারিস জানালো, ঠিক আছে। ব্যবস্থা করছি।

তারপর ঘণ্টা খানেক ধরে ফোন চলল। বেইরুট, বোম্বাই, কলকাতা। ফোন শেষ হবার পর, বেইরুট থেকে একটি জেট উড়ল। প্রথমে বোম্বাই। তারপর কলকাতা।

কলকাতায় শীতের অপরাহ্ণ। মোটা কোটের ওপর অলেষ্টার, মাথায় কান-ঢাকা টুপি, সাধারণ চেহারার এক পশ্চিমী ভদ্রলোক নেতাজী সুভাষ রোড ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে চলেছেন। গন্তব্যস্থল বোধহয় কোন সদাগরি আপিস। কিন্তু গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে তিনি পারলেন না। হঠাৎ তিন চারজন লোক দুপাশ থেকে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে একটা কালো মোটর এসে দাঁড়াল তাদের পাশে। চোখের পলকে ভদ্রলোককে টানতে টানতে মোটরে তুলে তারা মোটর হাঁকিয়ে চলে গেল। আশ্চর্য! পুলিসের এক সার্জেন্ট পাশে দাঁড়িয়ে। সে তো বাধা দিলেই না। বরং মনে হল যেন এই কাজে সে মানুষ-ধরা লোকগুলোকে সাহায্যই করল।

লর্ড সিংহ রোড। আই বি আপিসের এক গোপন কক্ষ। সেই অলেষ্টার-পরা বিদেশী। পাশে সেই তিনচারজন মানুষ-ধরা। চেয়ারে আসীন দিল্লী থেকে আগত এক স্পেশাল পুলিশ অফিসার।

অলেষ্টার পরা লোকটির জামা প্যান্টালুনের ৭২টি ছোট বড় পকেট তল্লাস করে অনেক কিছু কাগজ-পত্র এবং টুকিটাকি জিনিষ পাওয়া গেছে। সে রাত্রে লোকটি সেই আপিসেই রইল। পরের দিন সকাল হবার আগেই বেইরুট থেকে আসা জেট-এ চেপে চলে গেল নিউইয়র্কে।

আমাদের দেশের কোন কাগজে ঘটনাটির কোন উল্লেখ দেখা গেল না। আমেরিকার পত্রিকায় সংক্ষিপ্ত খবর বেরুলো:

"কুখ্যাত আন্তর্জাতিক জুয়াচোর-জালিয়াৎ-ঠক বারণ ক্যাসি, ওরফে সীহক মাইার, ওরফে ডীন পল অবশেষে ধরা-পড়েছে। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের অসামান্য কর্মকুশলতার ফলে প্রাচ্য ভূ-খণ্ডের এক মহানগরীর রাস্তায় রোমাঞ্চকর নাটকের অভিনয়। ইত্যাদি। কোথায় কেমন করে কীভাবে তাকে ধরা হল তার বিশদ খবর যে কেন্দ্রায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। তাই অনেকেই জানতে পারলেন না যে একটি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই এই সব কাজ সম্পাদিত হয়েছে। এর নাম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল পুলিস অর্গানিস। সংক্ষেপে – ইনটারপোল। ৪২টি দেশের পুলিস বিভাগের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। প্রধান কর্ম-কেন্দ্র – প্যারিস।

যে-সব চতুর আন্তর্জাতিক কুখ্যাতি সম্পন্ন জালিয়াৎ, খুনে বা ঠক এক দেশ থেকে আর এক দেশে পালিয়ে বেড়ায়, প্রেপ্তার তাদের বিরুদ্ধেই ইনটারপোলের অভিযান। প্রায় প্রত্যেক দেশেই এর

গুপ্তশাখা আছে, সেই সব শাখা থেকে প্রতিনিয়ত গুপ্তচরদের খবর আসে, ঘটনাস্থল ইয়ার্ড থেকে আসে, আসে ইস্তাম্বুল, সিডনি এবং মধ্যে ও দূর প্রাচ্য থেকে। বার্তাবহ চলে এদেশ থেকে ওদেশে। ৬০০০০ দুষ্কৃতকারীর রেকর্ড—এর দপ্তরে আছে।

ইউরোপের একাধিক দেশের কয়েকজন কোটিপতিকে ঠকিয়ে দশ পনেরো লক্ষ টাকা কামিয়ে অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ঠক আটো ব্রক দিব্যি অনায়াসে সুইডেন থেকে স্পেনে চলে গেল। সেখানে তার নতুন নাম, নতুন পাসপোর্ট। কার সাধ্য তার স্বরূপ জানতে পারে। রাজধানীর সর্বশ্রেষ্ঠ রেস্তোরাঁয় বসে আটো ব্রক অতঃপর কোন্ দেশে পাড়ি জমাবে তাই ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ দু'তিনজন লোক যেন মাটি ফুঁড়ে গজিয়ে উঠে তাকে ধরলে। আধঘণ্টার মধ্যেই এরোপ্লেন যোগে আটো ব্রক চালান হয়ে গেল মাদ্রিদ থেকে একেবারে সোজা স্টকহলমের শ্রীঘরে।

ইনটারপোলের কর্মপদ্ধতির সুনিপুণ ব্যবস্থায় অপরাধীরা জানতে পারে না যে পৃথিবীর এক প্রান্তের পুলিস অপর প্রান্তের পুলিসের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে চলেছে তাদেরই ধরবার জন্যে।

এই তো কিছুদিন আগেকার কথা। লণ্ডন ইন্টারপোল প্যারিস ইন্টারপোলকে জানালো যে এক ভদ্রবেশধারী ডাকাত তার দুজন সঙ্গীসহ ২০০০০ পাউণ্ড দামের হীরা-জহরৎ চুরী করে ফেরার হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সমস্ত শাখায় খবর চলে গেল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই স্টকহলম শাখা থেকে সাংকেতিক বার্তা এলো যে বিবরণ অনুযায়ী তিন ব্যক্তি একটি ট্রলার জাহাজে চেপে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে রওনা হয়েছে।

ডাকাতটি আর তার দুজন সঙ্গী যদি জানতে পারতো যে তারা যখন মনের আনন্দে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিচ্ছে তখন প্যারিস, লণ্ডন, মেলবোর্ন ও সেই জাহাজের কাপ্তেনের মধ্যে ঘনঘন তারের বার্তার বিনিময় চলছে তাদেরই সম্বন্ধে, তাহলে তারা অমন করে জাহাজে স্ফূর্তি করতে পারতো না। জাহাজ গিয়ে বন্দরে ভিড়ল আর সঙ্গে সঙ্গে এক ডজন পুলিস জাহাজে উঠে বসল তাদের গ্রেপ্তার করল।

১৯২৩ সালে ভিয়েনার পুলিস-প্রধান ডক্টর জোহান শোবারের উদ্যোগে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। ১৯৩৬ পর্যন্ত ৩৪টি দেশের সহযোগিতা লাভ করে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গেই এই প্রতিষ্ঠান কাজ চালায়, তারপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হিড়িকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। যুদ্ধ শেষে ইউরোপে যখন অপরাধের বন্যা বইতে লাগল তখন বেলজিয়ান রাজকর্মচারী ইনসপেক্টর-জেনারেল স্যাউবয়েক্সের চেষ্টায় চারটি দেশের চারজন মাথাওলা পুলিস-প্রধান তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়ে আবার এই প্রতিষ্ঠানটিকে চালু করলেন।

বিভিন্ন দেশে কাজ করবার জন্যে ইন্টারপোলের নিজস্ব কোন প্রতিনিধি নেই। ইন্টারপোল বিশ্বাস করে ভিন্ন ভিন্ন দেশের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনীর কাছ থেকেই ভাল কাজ পাওয়া যাবে। তাদের উপর নির্ভর করলে তারা খুশী ও সন্তুষ্ট বোধ করবে ফলে পূর্ণ সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। ইন্টারপোলের স্থায়ী কর্মচারী মাত্র ২৯ জন অপরাধতত্ত্ববিশারদ। প্যারিসে প্রধান কর্মকেন্দ্রের সেক্রেটারী মাদাম সিগো। রাজনীতির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবেন না', এই হল এঁদের প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশের পুলিস প্রধানদের নিয়ে একটি কর্মপরিষদ আছে। কিছুদিন আগে স্টকহলমে এঁদের বার্ষিক সম্মেলন হয়ে গেছে। সেই সম্মেলনের বিবরণীতে জানা যায়, সকল দেশেরই সক্রিয় সহায়তা এঁরা পেয়েছেন এবং এমন কয়েকটি বিস্ময়কর সাফল্যের নজির দিয়েছেন যাতে প্রমাণ হয়েছে যে এমনি একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

• • •

কয়েকদিন আগেকার কথা। নবদ্বীপ লাইনে ঘর্ষিকু গ্রাম বলাগড়। কাছেই পুরন্দরসিংহ ভর আশুতোষের বাস্তভিটা। সেখানকার দুর্ধর্ষ ডাকাত শিবরাম আজ বার্ধক্যের ভারে লোলচর্ম, হাঁপানির পীড়নে অকর্মণ্য। সেদিন সন্ধ্যায় তার কাছে এলো তার বালাবন্ধু ও সাথী হারাণ। জানালো, সংবাদ সত্যি এবং আজই রাত বারোটায়। খবর শুনে শিবরাম অস্থির হল, উত্তেজনায় আরও বেশি হাঁপাতে লাগল। তার ছেলে, একমাত্র সন্তান পরশুরাম, বাপকে ত্যাগ করে গেছে বহুদিন। তা যাক, তাতে শিবরামের তত দুঃখ নেই, দুঃখ এই যে সে একটা পোচ্চা. পাষণ্ডে পরিণত হয়েছে। ছিনতাই, গাঁয়ের গরীব পানওয়ালার দোকান লুঠ, অসহায় পথচারীর ওপর অত্যাচার, মেয়েদের ওপর জুলুম—এইসব ঘৃণ্য ছোট কাজে লিপ্ত আছে সে। গ্রামে এসে বাস করছে এক অনাথ উদ্বাস্ত পরিবার —মা আর তার যুবতী মেয়ে। সেই মেয়েকে আজ জোর করে লুঠ করবে পরশুরাম রাত বারোটায়।

কিছুক্ষণ পরে চলে গেল হারাণ। জানিয়ে গেল, চৌকিদারকে সে বলেছিল, কিন্তু চৌকিদার নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে রাজি নয়। অস্থির হয়ে উঠে বসল ডাকাত শিবরাম। তার চোখ দুটো জ্বলতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের কোণ থেকে লাঠিটা নিল। বহুদিনের সঙ্গীকে হাতে নিয়ে সে যেন কিছুটা বল পেল। বাড়ি থেকে বেরুলো। রাত বাড়ছে। এগিয়ে চলল শিবরাম। তার পা টলছে। বুকটা যেন হাপরের মত ওঠানামা করছে। চারিদিক নিশুতি। পথের ধারে কবি-মনসার ঝোপের পিছনে মোলপাতার ঘরে থাকে মা আর মেয়ে। সেই ঘরের কাছে ঝোপের আড়ালে গিয়ে বসল শিবরাম।

কিছুক্ষণের মধ্যে দূরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। চঞ্চল হয়ে উঠল। আবছা দেখা গেল পরশুরামকে। পিছনে আরও চারপাঁচজন।

উঠে দাঁড়াল শিবরাম। তারস্বর আকাশ-ফাটা বজ্রকণ্ঠে হেঁকে উঠল—কে রে ওখানে!

চমকে উঠল পরশুরাম। এ কার গলা! কিন্তু সে আজ পিছপা হবে না। এগিয়ে এলো।

খবরদার! খবরদার! ভীষণ গর্জন ডাকাত শিবরামের—বেজাতকের হল! ডাকাতি করতে চাস, মালগাড়ি লুঠগে যা যদি সাহস থাকে, চলে যা চুঁচড়োর সুদর খাজাঞ্চিখানায়, সেখানে অনেক টাকা! তা নয়, গরীব মেয়েমানুষকে চুরি করতে এসেছিস! আমার জান্ থাকতে পারবি না। আয়, সাহস থাকে এগিয়ে আয়। আমি ডাকাত শিবরাম।

শিবরামের সেই ডাকাতে-চিৎকারে জেগে উঠল পড়শিরা। ছুটে বেরিয়ে এলো অনেক লোক। দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত চেপে পরশুরাম বললে—শালা! পাশ থেকে সঙ্গী বললে —এযে তোর বাবারে! মাথা নেড়ে পরশুরাম বললে—তাই তো দেখতে পাচ্ছি! চ সরে পড়ি!

সমানে গর্জন করে চলেছে শিবরাম। প্রতিবেশিরা তার সেই ভয়ঙ্কর অগ্নিমূর্তি দেখে অবাক হল। এ সেই ডাকাত শিবরাম যে ট্রেন লুঠ করেছে, কাছারি লুঠ করেছে, কিন্তু কখনো কোন মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেয়নি, এ সেই শিবরাম যার কাছ থেকে গ্রামের দুঃস্থ লোক অসময়ে সাহায্য পেয়েছে, এ সেই শিবরাম যে কখনো নিজের গ্রামবাসিদের কোন ক্ষতি করেনি।

চেঁচাতে চেঁচাতে অবসন্ন হল শিবরাম। হঠাৎ তার বুকটা বন্দুকের মত বেঁকে গেল। হাত থেকে লাঠিটা খসে পড়ল। ভয়ানক কাশতে লাগল শিবরাম। তারপর নিস্পন্দ হল তার শরীর। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তার প্রাণহীন দেহ।

তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় সারা গ্রামের লোক যোগ দিলে। আশেপাশের গ্রাম থেকেও অনেকে এলো। কেবল এলো না তার ছেলে পরশুরাম। তারপর থেকে পরশুরামকে আর সে অঞ্চলের কোথাও দেখা যায়নি।

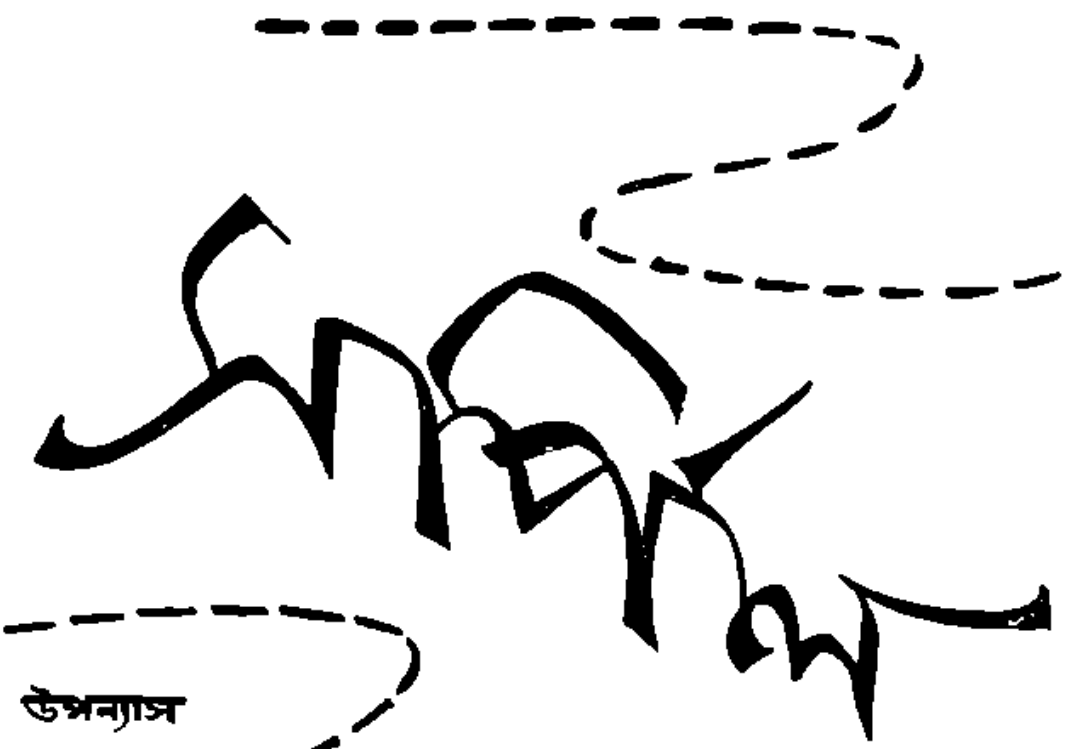

উপন্যাস

সমুদ্ধ

ডানলাপিলো

তোশক বালিশ কুশন

যে কোন

উৎসবের

দিনে

শোভন

উপহার

সপিল

সমুদ্ধ

আমাকে যাঁহারা চেনেন তাঁহারা জানেন, আমার লাটু সদা পরিব্রাজক রাশি। ক্রমাগত এক জায়গাতে থাকিয়া সুখ বোধ করি না, এক স্থানে বা এক প্রকারে দীর্ঘদিন চাকুরি করিয়া স্বস্তি পাই না, আমার প্রকৃতি ও আমার ভাগ্য উভয়েই আমাকে ক্রমাগত এক স্থান হইতে অন্য স্থানে এক কর্ম হইতে অন্য কর্মে বদলি করিয়া লইয়া বেড়ায়। বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, চাকরিও করিলাম প্রায় পঁচিশ বছর, তবু আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড বলিতে কিছু নাই। এই ক'বছরে আমি এতবার চাকরি ও জায়গা বদলাইয়াছি, এবং বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই বাকি ক'বছরে আরও এতবার বদলাইব, বহুলী-জীবী সরকারী কর্মচারীর সাধ্য নাই তাহার সঙ্গে পাল্লা দেয়। তা হউক, আমার দুঃখ নাই সেজন্য ; কারণ ক্রমাগত যাযাবর জীবনের ফলে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড জমে নাই বটে, কিন্তু দেশে দেশে ঘুরিয়া এত বহুসংখ্যক ও এত বহুপ্রকার মানুষের সংস্রবে আসিয়াছি, এত ব্যাপক সাহচর্য ও এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছি যে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের দুঃখ তাহার কাছে নিতান্ত তুচ্ছ।

এই নিরন্তর ভ্রমণ চক্রের গতিপথে একবার উত্তরবঙ্গের একটি ক্ষুদ্র শহরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম।

বহুদিন পূর্বের কথা। তবুও জায়গাটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। এখনও যদি যাই, বিনা দ্বিধায় তাহার প্রতিটি পথ প্রতিটি পরিচিত বাড়িকে আবার চিনিয়া লইতে পারিব। সাধারণত এটা আমার নিয়ম নয়, পিছনে ফেলিয়া আসিলেই সে জায়গা ও সে জনতাকে আমি ভুলিয়া যাই। এই জায়গাটিকে স্পষ্ট মনে আছে। সম্ভবত তাহার কারণ, জায়গাটি আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল

হিমালয়ের উপরে নয়, পার্বত্য অঞ্চল হইতে বেশ কিছু দূরেই। তবুও পার্বত্য প্রকৃতির কিছু পরিচয় সেখানে মিশিত। দেবদারু কুটজ চাঁপার গাছের অধিক্যের বৃহৎ আকার, শীত ও উত্তর-বায়ুর প্রাবল্য, শহরের প্রান্তবর্তী ক্ষুদ্র স্বল্পতোয়া নদীটির একটানা দক্ষিণ-বাহী স্রোত এবং বর্ষায় তাহার অকস্মাৎ কূলপ্লাবী জলপ্রবাহ, ক্রমাগত মনে করাইয়া দিত, পাহাড় আছে, দূরের মধ্যে না হোক অন্তত দৃষ্টির অন্তরালেই আছে। আমি দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের ছেলে, নিতান্তই সমতল ভূমি ও সমজল নদীর মানুষ। এদেশের এই নূতন রূপ আমার ভাল লাগিয়াছিল।

আরও ভাল লাগিয়াছিল সেখানকার মানুষের প্রকৃতিটি। শহর অতি ক্ষুদ্র, মানুষের সংখ্যা মুষ্টিমেয়, এবং হয়ত সেইজন্যই প্রত্যেকে প্রত্যেকের অত্যন্ত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। দোকানী প্রত্যেক খরিদ্দারকে নাম ধরিয়া ডাকে, কলেজের ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা পরস্পরকে প্রায়শই উল্লেখ করে বাড়ির নাম বা ডাক-নাম ধরিয়া। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে আমরা অধ্যাপকরাও তাহাদের সরকারী নাম মনে রাখিতে পারি না। সে নাম খাতাপত্রে থাকে, আমরা ক্লাসে তাহাদের ডাকনাম ধরিয়াই ডাকি, প্রথম দিনের 'তুমি' অচিরাৎ ও অলক্ষিতে 'তুই'-তে পরিণত হয়। তাহারাও দুই-চার দিন 'স্যর' বলে, তারপর হঠাৎ কখন 'মাস্টারমশাই' বলিতে আরম্ভ করে, আড়ালে আমাদের নাম করিতে হইলে নিঃসঙ্কোচে দাদা-বৌদি, মাসীমা-মেসোমশাই বলিয়া যায়।

আমি আধাল্যা প্রবাসী, নিজের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একত্র বাস আমার ভাগ্যে অল্প ঘটিয়াছে বলিয়াই বিদেশে আত্মীয়তা সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়—এই

অনায়াস আত্মীয়তা আমাকে সহজেই আকৃষ্ট করিল, আত্মসাৎ করিয়া লইল। দুদিন না যাইতে দেখিলাম আমিও অজ্ঞাতসারে কখন দাদা ভাই কাকা মাসীমা বলিতে শুরু করিয়াছি। সম্ভবত সেইজন্যই এই স্থানটিকে ও তাহার মানুষগুলাকে আমার এতদিন পরেও স্পষ্ট মনে পড়ে। তাদের চাকা অনেক দূর ঘুরিয়াছে, আর কখনও যাইব না সেখানে নিশ্চিত জানি, গেলেও তাহাদের অনেকেরই দেখা পাইব না ইহাও ধ্রুব সত্য। কিন্তু দেখা হইলে আমি তাহাদের চিনিব তাহারা আমাকে চিনিবে, ইহা আমার নিঃসংশয় বিশ্বাস।

মানব-প্রকৃতির মাধুর্য সেখানে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু, অবিমিশ্র সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে বিধাতা-পুরুষের ধর্মজ্ঞানে বাধে; যে হাতে অসীম মাধুর্য ঢালিয়া তিনি মানুষের অন্তরকে ও সম্পর্ককে পরিপূর্ণ করিয়াছেন, সেই হাতেই তাহার মধ্যে একবিন্দু বিষ মিশাইয়া দিতে তাঁহার যত্নের অবধি নাই। অতখানি প্রীতি-সৌহার্দ্য যেখানে, তাহার মধ্যেও পাপের ছবি দেখিয়াছি। সেই কাহিনীই বলিতে বসিলাম।

আয়রাটোতে পৌঁছিয়া, প্রথম কয়েকদিন কলেজের হস্টেলে আশ্রয় লইলাম, তারপর নিজস্ব একটি ঘর লইয়া বাসা বাঁধিলাম। বাসা অর্থ একাকী বাসাই; গৃহস্থালীর অস্ত্র অংশীদার তখনও জীবনে আবির্ভূতা হন নাই। একটা বড় বাড়ি, একটানা লম্বা চলিয়া গিয়াছে। এক একটি ঘর তাহার পিছনের রান্নাঘর বাথরুম ইত্যাদি সমেত এক একটি ক্ষুদ্র ফ্ল্যাট হিসাবে ভাড়া দেওয়া হইত। শহর হিসাবে ভাড়া কিছু বেশী। কেহবা দীর্ঘকাল থাকিতেন, কেহবা দুই চারিদিনের জন্যও আসিতেন। সমস্ত ব্যাপারটা একটা আবাসিক হোটেলের মত। কিন্তু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। কেহবা নিজে রান্না করিয়া লইতেন, কেহবা অদূরবর্তী ঠিকা হোটেলে গিয়া খাইতেন, বা হোটেল হইতে খাদ্য আনাইয়া লইতেন। বেশীর ভাগই এই দলের। আমি স্পিরিটকী, স্টোভ ও সসপ্যান্ লইয়া ইহারই দোতলায় একটি ফ্ল্যাটে অধিষ্ঠিত হইলাম। বাড়ি বড়, ফ্ল্যাট অনেক, তাহার বহু ফ্ল্যাটই প্রায়শ খালি পড়িয়া থাকিত। আর যাহাই হউক, হৈ-হল্লা মোটেই ছিল না। আমার তখন স্বল্পা কিছু ভাঙা ছিল, নিরিবিলি থাকাটা আমার বেশ পছন্দই হইয়া গেল।

সেখানে যাইবার পর মাস তিনেক কাটিয়া গেল। জুলাই মাসে গিয়াছি, সেপ্টেম্বরে পূজার ছুটি হইল। ছুটি সারা করিয়া ফিরিলাম একেবারে অক্টোবরের শেষে। ফিরিবার দিন আট-দশ পরে, একদিন সকালবেলায় চিৎ হইয়া শুইয়া শুইয়া কবিতা পড়ার চেষ্টা করিতেছি, এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার নাম করিয়া আমাকেই প্রশ্ন করিল, এখানে থাকেন? তারপর প্রশ্ন অসমাপ্ত রাখিয়াই কহিল, বাঃ। বলিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিল।

সুন্দর স্বাস্থ্যবান্ যুবক, পরিচ্ছন্ন সাহেবী স্যুট পরা। আমি উঠিয়া বসিতে বসিতে তাকাইয়া দেখিলাম, চিনিতে পারিলাম না। সে কহিল, চিনতে পারলেন না স্যর? আমি বিভু। মানে ভূপতি।

এবার চিনিলাম। কহিলাম, আরে বোসো বোসো।

কলেজ-জীবনে সহপাঠী ছিলেন একজন, তাঁহার নাম বিভূতি। একসঙ্গে পড়িতাম, কিন্তু বয়সে তিনি বড় ছিলেন। অন্তত তিনচার বছরের বড়। মাঝখানে নাকি পড়া বন্ধ করিয়াছিলেন। আমাকে স্নেহ করিতেন, আমিও তাঁহার বাড়িতে মাঝে মাঝে যাইতাম। বড় পরিবার। বাপ, মা, কয়েকটি ছোট ভাই বোন। পরিবারটি দরিদ্র, তাহা সহজেই বোঝা যাইত; বিভূতি যে পড়া বন্ধ করিয়াছিলেন তাহাও সম্ভবত সেই কারণেই। প্রথম যেদিন গেলাম, সকলে যেন কিরকম একটা সমারোহ বাধাইয়া তুলিলেন আমাকে লইয়া; আধা-অন্তরালে উচ্চারিত উক্তিও বহুবার কানে আসিল: কী-রিয়াট ভাল ছাত্র। কত বড় বড়-

লোকের ছেলে। কথা দুইটাই ভুল। এতও রকম ভাল ছাত্র আমি কোনদিন নই; আর ছেলে ত ছিলাম রীতিমত গরীব ঘরের। প্রতিবাদ করিলাম, ইঁহারা সেটাকে আমার অলৌকিক বিনয় বলিয়া ধরিয়া লইলেন। এবং শেষ পর্যন্ত অনেকদিনের পরিচয়ের পরেও আমার প্রতি একটা অহেতুক সমীহের ভাব ইঁহাদের মধ্যে দেখিতে পাইতাম। অস্বস্তি লাগিত, অথচ যাইতেও হইত—কারণ বিভূতি ও আমি দুই জনেরই বইয়ের অভাব ছিল, অনেক বই পরস্পর পালটাইয়া পড়িতে হইত। আমার সম্বন্ধে সমীহের মূলে ছিল সম্ভবত একটা বৃহৎ ভুল—দৈবক্রমে কলিকাতায় আমি যে-বাড়িটিতে থাকিতাম পড়াশুনার জন্য, সেটি মোটামুটি স্বচ্ছল, অতএব ইঁহাদের মতে ধনশালী পরিবার বলিয়া পরিচিত ছিল। আমি সেই পরিবারের, অতএব ধনীপুত্র, এইরূপ একটা ধারণা ইঁহাদের বদ্ধমূল ছিল। আমার প্রতিবাদ নিষ্ফল হইত; আমি যে ওঁহাদের আশ্রিত বিত্তহীন আত্মীয়মাত্র এবং বিত্তহীন বলিয়াই আশ্রিত হইতে পারি, একথাটা ওঁহারা কিছুতেই বিশ্বাস করিতেন না, অন্তত স্বীকার করিতেন না।

যুল হইল, অন্তরঙ্গ হইয়াও আমি কিছুটা অহেতুক ভয় ও ভক্তির পাত্র হইয়া রহিলাম। বিভূতির দ্বিতীয় ভ্রাতা বয়সে বোধহয় আমার সামান্য বড়ই ছিলেন, তবু তিনি আমাকে চিরদিন জোর করিয়া দাদা ডাকিয়া গেলেন, কিছুটা আমার ধনগৌরবে কিছুটা আমি ওঁহার দাদার সহপাঠী সেই গর্বগৌরবে। আর, ছোটদের ত কথাই নাই। এই ভূপতি, এ তখন স্কুলে পড়ে, বয়সে আমার চেয়ে বড় জোর তিন কি চার বছরের ছোট—এ কিন্তু এমন করিয়া চলিত যেন ওঁহার ও আমার বয়সে অন্তত বছর দশেকের ব্যবধান।

আমার গত্যন্তর ছিল না, ইঁহাদের সকলকেই তুমি বলিতে হইত। ভূপতিকে আমি ডাকিতাম 'ভূপতি' বলিয়া। অন্যে ডাকিলে চটিত, আমি ডাকিলে পরম কৃতার্থ হইত।

মানুষ মনে পড়িল, নামও মনে পড়িল। কহিলাম, বোসো বোসো, ধূর্জটিবাবু। কি খবর, এখানে?

সে কহিল, মাস্টার ডেকেছেন যি? বাবাঃ। এখানে, মানে এইখানেই ত আছি।

তারপর প্রায় একনিঃশ্বাসে তাহাদের বিগত দশ বৎসরের ইতিহাস শুনাইয়া দিল। বাবা নাই, মা আছেন বড়দার অর্থাৎ বিভূতির কাছে। বিভূতি বিবাহ করেন নাই। হেডমাস্টারি করিতেছেন। নিজের যথাসাধ্য দিয়া ভাই বোনদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। এক বোন্ বিবাহিতা, এক বোন্ স্কুল-টীচার। মেজদা উকিল হইয়াছেন। আলাদা। ভাল আয় করেন। সংসারের সঙ্গে বিশেষ যোগ রাখেন না। বড়দার সঙ্গেও না। অনুভব। বৌদির জন্য। অন্য ভাইদের, দুইজন মোটামুটি সুপ্রতিষ্ঠ। ছোট দুইটি পড়ে—বড়দাই পড়ান। ভূপতি নিজে এম্-বি পাস করিয়া সংকারী চাকুরিতে ঢুকিয়াছে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জেন।

এই পনর বছর তিনেক হইয়া আসিল। এবার বদলী আসন্ন, হয়ত আর মাস কয়েক কি বছরখানেক জোর। এখনও বিবাহ করে নাই, ভাল লাগে না বারেবারে ছুটাইতে। শেষে যদি বড়দার কাছ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়? এই বেশ আছে, যা আয় করে নিজের খরচটা রাখিয়া সমস্তই বড়দাকে পাঠাইয়া দেয়।

উপসংহারে বলিল, আমি এখানে আসিয়াছি সে প্রথমে জানে নাই, নহিলে কবেই আসিয়া দেখা করিত। হাসপাতালে কাজের চাপ, বাহিরের খবর কানে প্রায় আসে না। আর, সত্যই ত—আমিই বা কি করিয়া জানিব সে এখানে আছে। মাসখানেক পূর্বে হঠাৎ এক ছাত্রের মুখে আমার নাম শুনিয়াছে। বর্ণনা শুনিয়া বুঝিয়াছে এ ঠিক আমি না হইয়া যায় না। কিন্তু তখন কলেজে ছুটি, আমি বাড়ি চলিয়া গিয়াছি। মধ্যে দুইদিন আসিয়া ঘুরিয়া গিয়াছে, অবশেষে আজ ধরিয়া ফেলিয়াছে।

কহিলাম, বেশ করেছ। বোসো চেপে, আমার আজ অনেক দেরিতে ক্লাস।

সে কহিল, কিন্তু আমার হাসপাতাল, তার ছুটি নেই। সকালে না এলে পাব না, তাই এসে খুঁজে বার করে গেলাম। এবার ছুটব।

চলিয়া গেল।

আমার কবিতা পড়া সেদিন সেইখানেই থামিয়া গেল, অতীত দিনের একটি মুহূর্ত হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইয়া বর্ত্তমানের পূরা ছবিটাকেই একটা প্রচণ্ড নাড়া দিয়া গেল। ভূপতি—ছিল বোগো। আমার কাছে মুখচোরা, কিন্তু বাড়িতে দুর্দ্ধিবাজ। চেহারাটা শুধু সংসারে নাই, একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে, এখন সে চমৎকার সুন্দর সুঠাম পুরুষ। মনটি অবিকল সেই রকমই আছে, একেবারে খোলা, কোন ঘোর-প্যাঁচ নাই। পরিবর্ত্তনের মধ্যে, বদলাইয়াছে তাহার চালচলন। মুখচোরা লাজুক ছিল, স্পষ্ট ও সহজ হইয়াছে, নিঃসঙ্কোচ হইয়াছে। কিছুটা হইবার ত কথাই—দরিদ্র ছিল, দারিদ্র্যের কুণ্ঠায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত। দারিদ্র্যমোচনের সঙ্গে সঙ্গে সে কুণ্ঠা চলিয়া গিয়াছে, সহজ একটা আত্ম-প্রত্যয় আসিয়াছে। তাহাতে তাহার যা চাকুরি, প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন মানুষের সঙ্গে একান্তভাবে মিশিতে হয়, বিপদের ঝুঁকি সাহলাইতে হয়। এই শিক্ষাও তাহাকে স্বপ্রতিষ্ঠ করিয়াছে। দরিদ্র, কিন্তু মেধাবী এবং বুদ্ধিমান্ ছিল ভাইবোন সব কয়টাই। উপরের চাপা সরিয়া গিয়াছে, এখন গাছ বাড়িয়া উঠিবেই। তাহার চেয়েও বেশী কাজ করিয়াছে সম্ভবত এই শহরের পরিবেশ। যেখানে সকলে সকলের সহজ আত্মীয়, সেখানে মন সহজ হইবেই, বিদেশী মানুষও অতি অনায়াসে এই জীবনস্রোতে নিজেকে মিশাইয়া দিবে।

আমার এই শেষ অনুমান সত্য, তাহা টের পাইতে সময় লাগিল না। আমি তাহার বনিষ্ঠ আত্মীয়, এ কথা তাহার মুখেই অচিরাৎ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। হঠাৎ দেখিলাম তাহার পরিচয়ে আমিও অতি অকস্মাৎ শহরের আপনজন হইয়া গিয়াছি। ডাক্তার এই শহরে সকলেরই আপনজন, সকলেরই পরম বন্ধু। আমি তাহার আত্মীয় ও গুরুজন, ইহার চেয়ে বড় পরিচয় আমার আর কিছু থাকিতে পারিত না।

ডিসেম্বর মাস আমাদের ব্যবসার মরশুম। বড়দিনে বাড়ি যাওয়া। জানুয়ারির মাঝামাঝি পৌঁছিয়া অবসর মিলিল। পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা ক্লাস সারা করিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। অন্যরা নিশ্চিন্ত মনে ক্রিকেট টেনিস ব্যাডমিন্টন লইয়া মাতিয়াছে। ইহার পর সম্মুখে স্পোর্টস, তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা।

কলেজ আছে, ক্লাসের চাপ নাই, পরীক্ষার্থী ছাত্র লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাস ধাবন নাই—এইটাই আমাদের পক্ষে অবসরের কাল, পড়াশোনা করারও, আড্ডা দিবারও। ভূপতি সময় পাইলেই আসিয়া জুটে। আমিও তাহার বাসায় যাই। বাসা অর্থ তাহারও একাকী, হাসপাতালের সংলগ্ন কোয়ার্টার। শহরের এক প্রান্তে হাসপাতাল, অন্য প্রান্তে কলেজ, তবুও দুয়ের মধ্যে ব্যবধান মাইল দেড়েকের বেশী নয়।

ইহার পূর্বের বছর দুই আমার টীকা নেওয়া হয় নাই। জানুয়ারির শেষ দিকে একদিন কথাটা মনে পড়িল। ভূপতিকে কহিলাম, তোমাদের টীকাওয়ালা কখন আসবে?

সে কহিল, টীকা কি হবে? তামাক খান না ত!

—আঃ। টীকা, মানে ভ্যাকসিনেশন।

এই কথা! সে পরম নিশ্চিন্ত সুরে কহিল, সে নেই।

—নেই মানে?

—মানে। নেই। দরকার হয় না।

—কেন?

—কারণ রোগ হয় না। আমি ত তিন বছর আছি। একটাও বসন্ত বা কলেরা কেস হতে দেখিনি।

—সে কি কথা। তাহলে মানুষ মরে কি করে এখানে?

—মরে, বহুৎ বুড়ো হয়ে মরে। অর হয়। টেরাই অঞ্চল, অতএব হিল-ডাইরিয়া হবার আশা থাকে বর্ষাকালে। তারপর, নেহাৎ ইচ্ছে করলে খুন-টুন হয়েও মরে কেউ কেউ। বসন্ত কলেরা হয় না।

—অনার্থ দেশ, বল।

—রীতিমত। পাহাড়ী জাত ত। দেখেননি কি বিষম নাকবোঁচা সব। মঙ্গোলয়েড্।

—কিন্তু, সত্যি এখানে এপিডেমিক হয় না?

—সত্যি হয় না। এরা লোক ভাল। সবাই সবাইকে ভালবাসে। পিঠে করলে ডেকে খাওয়ায়। রোগের ছোঁয়াচ কেউ কাউকে দেয় না। কারণও আছে। শহরটা অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন দেখতে দেখেছেনই, মিউনিসিপ্যালিটিও সতর্ক—ময়লা নোংরা জমতেই দেয় না। ছোট শহর, ছোট মিউনিসিপ্যালিটি, চুরি-চামারি নেই। তাই কাজের নামে ফাঁকিও নেই। আরও একটা কারণ হচ্ছে, এরা বাইরে যানে কলকাতায় প্রায় যায় না। ঘরের ভাত খায়, বাবার দরকার হয় না। রোগের সাম্রাই-হেড্কোয়ার্টার হচ্ছে কলকাতা শহর, সেখানে না গেল ত পরম আনা ফাঁড়া এড়িয়ে গেল। যারা যায় কালেভদ্রে, সেখানে পা দিয়েই টীকা নিতে বলে দিই। এখানে আর ঝামেলা টেনে আনতে হয় না।

কথাগুলা বড় অদ্ভুত লাগিল। সংক্রামক ব্যাধি নাই অথচ বাংলা দেশ, এ অবিশ্বাস্য। কহিলাম, এমন দেশও আছে? আয়গা কিনে ঘর করে বসে যাই, কি বল?

ভূপতি উৎসাহিত হইয়া কহিল,—থাকবেন, সত্যি? ত বলুন, জায়গা আমি যোগাড় করে দেব। তারপর কহিল, তাতে আমার লাভ কি। আমি ত বদলি হয়ে চলে যাব। এবং পরক্ষণেই আবার লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, হোক না, তাতেই বা কি। বেড়াতে ত আসা যাবে মাঝে মাঝে আপনি যদি থাকেন। ইতিমধ্যে বৌদিও একটা এসে যাবে কোনক্রমে।

কহিলাম, হ্যাঁ, এই আসে, সোকুলে বাড়ছে। কিন্তু, রোগ নেই, ব্যাধি নেই, এখানে তাহলে কর কি বসে বসে?

—রোগ নেই বলিনি ত। বলেছি এপিডেমিক নেই। নইলে, জ্বর আছে, ডাইরিয়া আছে, ঠাণ্ডার দেশ—ব্রঙ্কাইটিস নিউমোনিয়া হামেশা হচ্ছে। তারপর ধরুন, গাছ থেকে পড়ে ঠ্যাং ভাঙল, বা সেটাপিটি করে মাথা কাটল—এইসব নেড়ে বেড়েই দিন কাটিয়ে দিতে হয় আর কি।

বলিতে বলিতে ভূপতি সহসা অন্যমনস্ক হইল, কথার মধ্যখানে থামিয়া গেল। আমি কহিলাম, কি হল?

ভূপতির কথার সুর পরিবর্তিত হইল। ধীরে ধীরে কহিল, একটা কথা মনে হল।

—কি?

—এপিডেমিক নেই বললাম ত? আছে। মানে দেখা দিয়েছে। সাপে কাটা।

—তার মানে?

—মানে তাই। এপিডেমিক মানে হল, কোন একটা ব্যাধি হঠাৎ দেখা দেওয়া এবং পর পর অনেক জনের হওয়া। সাপে-কাটার কেস এখানে হঠাৎ দেখা দিয়েছে, পর পর কয়েকটা হ'য়ে গেছে। বসন্তের টীকা নিতে হবে না, কিন্তু চলাফেরায় সতর্ক থাকবেন, বিশেষ করে রাত-বিরেতে। মশারি খুব ভাল করে গুঁজে নিয়ে শোবেন।

—তা শোব। কিন্তু, শীতকালে ত সাপ থাকে না। কাজেই সত্ত ভয় নেই। আর, সাপে-কাটার কেস হঠাৎ দেখা দিয়েছে মানে? সাপ সর্বত্রই থাকে, মানুষও কামড়ায়—কম আর বেশী।

—দুটোই ভুল হল। শীতকাল, অতএব ভয় নেই—বর্ষা নামবার আগে কামড়াচ্ছে না, ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়া চলবে না। মাত্র দিন পনর আগেও কামড়েছে একজনকে, এবং সে মারা গেছে। দ্বিতীয়ত, সাপ সর্বত্র থাকে হয়ত, কিন্তু এখানে ছিল না। অন্তত মানুষ কামড়াত না। আমার হাসপাতালে গত দশ

বছরের রেকর্ডে সাপে কাটার কোন কেস নেই। এবার কেস হয়েছে, এবং মাত্র মাস ছ'সাতেকের মধ্যে পাঁচ ছটাকে কামড়েছে, সব কটাই মারা গেছে।

—হাসপাতালে রেকর্ড নেই, হতে পারে এখানে আসেনি। গেঁয়ো লোক সাপে কাটলে হাসপাতালে আসে না। ওঝা ডেকে ঝাড়ফুঁক করে।

—তাও নেই, আমি খোঁজ নিয়েছি। কোন লোকের মুখে শুনতে পাইনি অমুক পাড়ার অমুককে কেউটেয় কেটেছিল।

—বল। এবার কেউটেয় কেটেছে। হাসপাতালেও এনেছে তারপর। কিন্তু, তবু তারা মারা গেল? একেবারে সব ক'টাই?

—হ্যাঁ। আনা অবধি তর সয়নি, তার আগেই মরে গেছে।

—সব কটা?

—সব কটা। যদ্দুর জেনেছি, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হয়েছে। চেঁচামেচি লোক-ডাকাডাকি করেনি কেউ। যেখানে কেটেছে সেইখানেই চলেছে সব। হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে শুধু মৃতদেহগুলো।

—সে তখন এনে লাভ? যদি কিছু করা যায়?

—না। করবার কিছুই ছিল না। এনেছে, কারণ আনা নিয়ম। অ্যাকসিডেন্ট কেস বলে।

—সাপে কাটা কি অ্যাকসিডেন্ট?

—খানিকটা ত বটেই।

—এনে কি হয়? পোস্টমর্টেম কর?

—সন্দেহ হবার কারণ থাকলে করতেই হয়।

—করেছ

—প্রথম দিকে দুটো একটাকে করেছি।

—কি পেলে?

—পাব আর কি। সাপে কাটা, সেটা নিঃসন্দেহ—কামড়ের দাগ স্পষ্ট, বিষের অ্যাকশনও সমান স্পষ্ট। শেষের দিকে আর কাটিনি। বাইরের লক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখেই ছেড়ে দিয়েছি। মরে ত গেছেই বাপ-মায়ের ছেলে, আর তাকে চেরা-ফাঁড়া করে কি হবে—শুধু শুধু মনঃকষ্ট দেওয়া।

—তা বটে। তা, পরপর কেস হয়েছে বললে, প্রিকশনের ব্যবস্থা কিছু হয়নি?

—নিশ্চয়। মিউনিসিপ্যালিটি এ বিষয়ে খুব সতর্ক। এমনিতেই দেখেছেন এখানে আবর্জনা জোপজাড় অতি অল্প; তবুও মিউনিসিপ্যালিটি উঠে পড়ে লেগে গেছে—বিশেষ করে বর্ষার অকাল বা শরৎের ধারে তবুও যা জোপজাড় ঘাসবন ছিল সব সাফ করে ফেলেছে। লোকের বাড়ি বাড়ি ঘুরে, দোকান-পাটে গিয়ে গিয়ে কড়া নোটিস দিয়েছে বাস্তু-পাটিয়া মালপত্রের কোন অন্ধকার অবড়ং স্থান না থাকে। প্রতি ঘরে ঘরে বোতল বোতল কার্বলিক এসিড দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তবু ত কেস হয়ে যাচ্ছে। বারবার।

—দেখ, সাপ ক্ষুদ্র প্রাণী, অতি সামান্য একটা আড়াল বা গর্ত ফাঁক পেলেই থেকে যেতে পারে। শুধু ঘাস কেটে বা কার্বলিক ছিটিয়ে তাকে তিটে-ছাড়া করা বা শহর-ছাড়া করার চেষ্টা বৃথা। আর সাপও পৃথিবীতে একটা-মাত্র নয়।

—তা নয়। কিন্তু, যে জায়গাতে দশ বছরে একটাও সাপে কাটার কথা শোনা গেল না, সেখানে হঠাৎ ছমাসের মধ্যে ছ'সাতটা মানুষ মারা গেলে শঙ্কিত হবার কারণ ঘটবেই।

তা ঘটবে, সতর্ক থাকতে বারণও করছে না কেউ। কিন্তু আমি বলছি, সাপে-কাটা বস্তুটা এপিডেমিক নয়। দৈব দুর্ঘটনা মাত্র। সতর্ক থেকেও কল হবে কিনা বলা কঠিন। কাজেই, কাটে ত কি আর করব, ভেবে সুস্থ চিত্তে বসে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—কল হচ্ছে না, সতর্ক থেকেও মানুষ মরছে, সে ত দেখতেই পাচ্ছি।

—তবেই বোঝ। এমনও ত হতে পারে, অত বেশী করে জোপজাড় কেটে তছনছ করে তাদের ভিটে-ছাড়া করা হচ্ছে বলেই সাপরা ক্ষেপে গেছে, আক্রোশ করে মানুষ কামড়াচ্ছে?

—কি জানি, সাপেদের মধ্যেও ইউনিয়ন তৈরি হয়ে গেছে হয়ত। কিন্তু সে যাই হোক, সতর্ক থাকবেন।

সেদিন রাশিকৃত এনে ফেলেছি আমি হাসপাতালে, সোটাকতক শিশি কালই পাঠিয়ে দেব। এতদিন খেয়াল হয়নি, সেইটেই অন্যায় হয়েছে।

—অন্যায় কিছু হয়নি, তাহলে দিলেও পড়েই থাকত, অযত্নেতে নষ্ট হ'ত। তিন মাসের ওপরে আছি, এর মধ্যে একবারও সাপে কাটেনি আমাকে।

ইহার কয়েকদিন পরে, বিকালবেলা কলেজ হইতে ফিরিতেছি, পথে ভূপতির সঙ্গে দেখা। তাহারই সমবয়সী আর একটি ছেলের সঙ্গে পাশাপাশি সাইকেলে আসিতেছিল। দূর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল, এই যে দাদা। কাছে আসিয়া নামিয়া পড়িল, তাহার সঙ্গীও নামিল।

কহিলাম, কোথা থেকে?

সে কহিল, দেশভ্রমণে বেরিয়েছি। ইনি হচ্ছেন আমার দাদা, তোমাকে এঁর কথা বলেছি।

ছেলেটি হাসিয়া নমস্কার করিল, প্রচুর বলেছে।

ভূপতি কহিল, আর এটি হচ্ছে, পুণ্যব্রত ঘোষ। আমার বন্ধু, স্কুলে একসঙ্গে পড়তাম, কাল এসেছে এখানে। ফিরিওলা আরশী, মানে ইন্‌সিওরেন্স এজেন্ট। খুবভালসেল্‌স্‌ম্যান। আমার সঙ্গে পার্টনারশিপেব্যবসা। ও কেস্ আনে আমি মেডিক্যাল এগ্‌জামিন করি।

ছেলেটি কহিল, আঃ থাম্ না। দাদা, আপনার কথা আমি খুব শুনেছি ওর মুখে। কি রকম বকবক করে জানেন ত।

আমি কহিলাম, হাঁ, আমি না হয়ে প্রফেসর ওরই হওয়া উচিত ছিল। রুগীদের দশা যে কি হয়!

ভূপতি কহিল, নেভার। রুগীর ঘরে গিয়ে আমার সে একেবারে ভিন্নমূর্তি, কথাই কইনে। অন্য জায়গায়, that is different, আড্ডা is আড্ডা।

আমি কহিলাম, আমি কিন্তু আপনার কথা শুনিনি, কিছু বলেনি ও।

ছেলেটি কহিল, ও নিজের কথা এত বলে যে পরের কথা বলতে সময় পায় না।

আমি কহিলাম, কেন, আমার কথা ত বলেছে আপনাকে।

পুণ্যব্রত ভূপতির কণ্ঠস্বর অনুকরণ করিয়া কহিল, আপনার কথা, that is different. for দাদা is দাদা।

ছেলেটিকে বড় ভাল লাগিতেছিল। হাল্‌কা ছিপ্, ছিপে মাঝারি গড়ন, লঘু ও ক্ষিপ্রগতি তাহা দেখিলেই বোঝা যায়, যাহাকে একথায় আমরা athletic form বলি। রং ময়লা কিন্তু মুখচোখ অনিন্দ্য সুন্দর। সকলের উপরে, মুখে চোখে বুদ্ধি ও অমায়িকতার একটি শান্ত শ্রী। হাসিলে আশ্চর্য সুন্দর দেখায়। পুরুষের মুখে এমন মিষ্ট হাসি প্রায় দেখা যায় না। কথাটা চকিতে মনে হইল; তারপর মনে হইল, সে ইন্‌সিওরেন্স-দালাল, লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা তাহার ব্যবসায়ের অঙ্গ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার মন মাথা নাড়িল, কহিল, উঁহুঁ, ইহার মুখের হাসি সে ব্যবসায়ীর হাসি নয়, ইহা অকৃত্রিম ও স্বচ্ছ, সহজ ও নিষ্পাপ মনের প্রতিবিম্ব।

এ এমন ছেলে যাহাকে বাবু আপনি বলিয়া দূরে রাখা যায় না, তাই বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা করে।

কহিলাম, কোন্ কোম্পানীর এজেন্ট আপনি?

সে একটা নামজাদা বিলাতী কোম্পানীর নাম করিল। কহিল, কিন্তু আমাকে আপনি করে বলছেন কেন। আমি আপনার চেয়ে অনেক ছোট, ভূপতির চেয়েও ছোট।

ভূপতি কহিল, শুনবি না, ওটা হচ্ছে প্রফেসরিয়াল কার্টসী।

আমি কহিলাম, সম্পূর্ণ ভুল করলে। প্রফেসরদের বরং আপনি বলার অভ্যাস কর—ছাত্র নিয়ে কারবার, তুমি বলাটাই সহজে এসে যায়।

—তার ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মুহূর্তেই পাওয়া যাচ্ছে।

—নাঃ পারা গেল না। বেশ, তুমিই সই। নামটা কি বললে, মহামহোপাধ্যায়?

—না। পাপব্রত হওয়া উচিত ছিল নামটা, বাপ-

মার স্নেহাতিশয্যে পুণ্যব্রত হয়ে গেছি। তা হোক, শাস্ত্রে বলেছে প্রপার মেন্‌স্ আর সন্-কন্সোর্টটিভ।

কহিলাম, রবীন্দ্রনাথ যদিও অন্যরকম বলেছেন। তা পথে দাঁড়িয়ে আর কেন, বাড়ি অবধি চল।

—আজ নয়। অনেক কাজ।

—তারি কাজ, এইটুকুন ত আইসা। বাড়িটা কোন্ পাড়ায়?

—বাড়ি, কোথা পাব, কেবল অব্ ভূপতি চাক্তার।

ভূপতি কহিল, এখানে থাকে না ত, মাঝে মাঝে আসে। এলে আমার কাছেই ওঠে।

—ও। বাসটা কোথায়?

পুণ্যব্রত কহিল, বাস কোথাও নয়। মাসের অর্ধেক দিন ট্রেনে ইনারে বাস। বাকিটা হোটেল-হোটেল বা যখন জোটে।

—হ'ল, টুরিংএর চাকরি। তবু ত খুঁটি একটা কোথাও আছে?

—নেই। একটি সংক্ষিপ্ত শব্দে সমস্ত কথাটার সমাপ্তি টানিয়া দিল পুণ্যব্রত। কথাটা সহজে ও স্মিতমুখে উচ্চারিত। কিন্তু হঠাৎ মনে হইল তাহার ভিতর একটা অনুচ্চারিত দুঃখ আছে, যাহার গভীরতা হঠাৎ মাপিতে যাওয়া সমত হইবে না। কথা ঘুরাইয়া কহিলাম, ক'দিন আছ?

—আজকের দিনটাই। এখন চলি যাদা, একটা এনগেজমেণ্ট আছে খানিক পরে। সন্ধ্যেবেলা ফ্রী থাকেন?

ভূপতি কহিল, নিশ্চয়ই থাকেন। সন্ধ্যেবেলা আসব আমরা।

তাহারা চলিয়া গেল। আমি বাড়ি ফিরিলাম। ঠিক সন্ধ্যার মুখে দুইজনে আসিয়া উপস্থিত হইল। এটা সেটা গল্পগুজবে সময় অলক্ষ্যে কাটিয়া যাইতে লাগিল। ছেলেটি হাসিতে জানে, হাসাইতেও জানে, কথা বলিয়া আরাম পাইবার মত সঙ্গী। কেন যে এখানে আসিলে ভূপতি তাহাকে নিজের অতিথি করিয়া রাখে, তাহা বোঝা আদৌ কঠিন নয়।

কহিলাম, কিন্তু দেখা যখন হলই, পালাচ্ছ কেন। থেকে যাও না ক'টা দিন।

সে কহিল, হবে না। কর্মচক্র, বড় কঠিন তার পাক। শাস্ত্রে বলেছে, অনাস্ত-চক্র।

কহিলাম, তুমি খুব শাস্ত্র মান, না?

—কে বললে?

—দুবার দেখা হয়েছে। তার মধ্যে দুবারেই শাস্ত্র বচন কোট্ করেছ।

—মানিনে। মুখস্থ রাখি। ছুং পেলে ঝেড়ে দিই।

ভূপতি কহিল, ওকে মিছে বলছেন দাদা। দেখেছি ত, কাজ ওর একমাত্র চেতনা। কাজ শেষ হয়েছে, অতএব আর থাকবে না। আজ রাতটা নেহাৎ থেকে যাচ্ছে, তার কারণ ও এখান থেকে সোজা কলকাতায় যাবে। সন্ধ্যের ট্রেন ধরা হল না। ভোরের আগে আর ট্রেন নেই।

পুণ্যব্রত কহিল, মান-মান শোনাচ্ছে যে। বেশী বলিস না, বৌ এসে ঝগড়া করবে।

—আসতে দাওক, ততক্ষণ ত বলে নিই।

আমি কহিলাম, কিন্তু ইনসিওরেন্স সেল্‌সম্যানের কাজ হচ্ছে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা, সে কাজ ত ছট্‌ছট্ করে হয় না। কাল এলে, এরই মধ্যে সারা হয়ে গেল—এ কীরকম কাজ?

ভূপতি কহিল, ওঃ হো, সেটা বলা হয়নি। একটা অভিমানী মেয়ের ছিল, তাই পৌঁছে দিয়ে গেল। কাজেই কাজ শেষ।

—অভিমানী মানে?

—মানে, ক্লেম্ পেমেণ্ট্। হঠাৎ উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, তাও ত বটে। ব্যাপারটা বলা হয়নি আপনাকে, কিন্তু বলবার মত। সাপে কাটার কথা বলেছিলাম না আপনাকে? এ তাই।

—কি?

—যাদব মজুমদারকে চেনেন? রায় সাহেব, ধনী ব্যক্তি? কলেজ কমিটিরও মেম্বর আছেন সম্ভবত।

—চিনিবে, নাম শুনেছি বোধ হয়। কি তাঁর?

—তাঁর ছেলে। সাপে কেটে মারা গেছে। মাস কয়েক হল।

—তুমিনি। কত বয়স?

—আপনারেরই বয়সী হবে। তার ইনসিওর ছিল ওদের কোম্পানিতে। মোটা ইনসিওরেন্স। বোধ হয় হাজার দশেক টাকার পলিসি।

পুণ্যব্রত কহিল, শনরো।

—তাই। তার ওপরে ডবল-বেনিফিট্ অ্যাকসিডেণ্ট কভার—মানে অ্যাক্সিডেণ্টে মারা গেলে তিনগুণ টাকা পাবে। ওই করিয়েছিল পলিসি। সেই টাকা পেমেণ্ট হল। তারই চেক পৌঁছে দিতে এসেছিল ও।

—নিজে?

পুণ্যব্রত কহিল, তা দিতে হয় অনেক সময়ে, টাকার অঙ্ক যেখানে বড়।

ভূপতি কহিল, তাছাড়া, টাকা গছানোর ব্যাপার ছিল। বিলিতি কোম্পানী, তারা টাকা না দিয়ে ছাড়বে না, বুড়োও নিতে রাজি নয়। খানিকটা জোর করেই গছাতে হল। আমিও সেইজন্যেই সঙ্গে গিয়েছিলাম।

আমি কহিলাম, রাজি হবেন না সে ত জোজা কথা। ছেলে মারা গেল, তার ইনসিওরেন্স-মানি বুড়ো বাপ হাত পেতে নেবে—এ ভাবতেই কিরকম লাগে!

পুণ্যব্রত কহিল, কিন্তু এ ব্যবসার যে ঐটেই রীতি। বেঁচে থাকল, ভাল; মরে গেল ত আরও ভাল, অর্থলাভ হল। আসলে এতে লাভ ত অকালে মরে গেলে তবেই। মৃত্যুলোভ বেচার ব্যবসা আমাদের।

তাহার কথায় একটা অদ্ভুত সুর—দুঃখ, বা গ্লানি, বা দুইয়েরই সংমিশ্রণ।

কহিলাম, খুব কান্নাকাটি করলেন?

ভূপতি কহিল, না, শুধু কাঠ হয়ে বসে রইলেন। চেকটা যখন নিলেন হাত বাড়িয়ে, তখনও সে কাঠের পুতুলের মত হাত। শক্তিমান্ লোক, অনেক কাজ করেছেন জীবনে, কান্নাকাটি করবার মত দুর্বল ত নন।

—তারাই বেশী পোড়ে ভেতরে ভেতরে। ছেলে মারা গেল, কোথায় সাপে কেটেছিল?

—এইখানেই।

—তুমি দেখেছিলে?

—দেখেছিলাম, মৃতদেহ। বলবার না সেদিন? যে-ক'টা কেস আমি, সবই শেষ হয়েছে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। হাসপাতাল অবধি কেউই জ্যান্ত এসে পৌঁছয়নি।

পুণ্যব্রত হঠাৎ কহিল, থাক এ আলোচনা। আমার ভাল লাগছে না।

লাগিবার কথাও নয়, বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইনসিওরেন্স মানুষের ভবিষ্যতের সন্ধান, আকস্মিক বিপদ ভাবিয়া তাহার বিরুদ্ধে অগ্রিম আত্মরক্ষা। পলিসি যাহারা বেচে তাহারা বীমাকারীর ও সমাজের উপকারই করে। তবু, অকালে ও আকস্মিক আঘাতে মৃত পুত্রের জীবনের মূল্য শোকদীর্ণ পিতার হাতে যাহার পৌঁছাইয়া দিতে হয়, তাহার মনে কিছু আঘাত লাগিবেই—যদি না লাগে তবে সে অমানুষ।

পুণ্যব্রতর ইহা ব্যবসায় ও জীবিকা, কর্তব্য। তবু সেই সঙ্গে তাহার সহজাত করুণা ও আত্মগ্লানি মিশিয়া আছে, টের পাইয়া তাহার উপরে আমার স্নেহ ও মমতা বাড়িয়া উঠিল।

সেই মমতার টানেই বোধহয়, বৃদ্ধ পিতার ছবিটা মন হইতে মুছিতে চাহিতেছিল না। কহিলাম, বুড়োর এই বড় ছেলে?

ভূপতি কহিল, বড় নয়, ছোট, কিন্তু একমাত্র। এর দাদা—ওঃ হো, তাও ত বটে!

—কি?

কিন্তু ভূপতি আর কথা বলিবার পূর্বেই পুণ্যব্রত কিছু উচ্চস্বরে কহিল, থাম। বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, দাদা এবারে আমরা চলি।

এই আলোচনাটা তাহার অত্যন্ত তিক্ত লাগিতেছে, অথচ তখন চেষ্টা করিয়া কথা ঘুরাইয়া অন্য কোন

আলোচনা আরম্ভ করাও একান্ত অক্ষম একটা কৃত্রিম প্রয়াসে পর্যবসিত হইবে। ভাবিয়া আমি আর কথা বাড়াইলাম না। কহিলাম, তোমার কি আরও কাজ আছে কোন?

—তা, আছেও একটু।

—তাহলে আর কি বলব। কাল কি খুব ভোরেই চলে যাবে?

—হ্যাঁ। ভোর হবার আগেই ট্রেন আমার।

—আচ্ছা। আবার কবে আসছ?

—তার ত ঠিক নেই কিছু। যখন যেমন দরকার পড়ে। এটা যেমন হঠাৎ আসতে হল। তাছাড়া রেগুলার ট্রিপও থাকে।

—ঠিক আছে। যখনই আসবে, আমার সঙ্গে দেখা না করে পালাবে না। মনে থাকবে?

—থাকবে। বলিয়া সে হঠাৎ নীচু হইল, পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। বৃদ্ধজনোচিত ভাবভঙ্গী আমার অভ্যস্ত নয়। কিন্তু যেন নিজেরও অজ্ঞাতসারেই আমার একটি হাত তাহার মাথার পিঠে বুলাইয়া দিলাম। মনে হইল, ঠিক এইরকম সুন্দর একটি ছোট ভাই যদি আমার নিজের থাকিত!

পরবর্তী দুই-তিন মাসের মধ্যে পুণ্যব্রত আরও বার-দুই সেখানে গেল। উঠিল ভূপতিরই বাড়িতে, কিন্তু প্রতিবারেই বেশ কিছুকাল আমার ঘরে কাটাইল। প্রথম পরিচয়ের দূর পরিচয়ের কৃত্রিমতার বেড়া সে ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল, তবু যদি তাহার কোথাও কোন অন্তরাল বাকি ছিল, এই দুইবারে তাহার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত উৎপাটিত নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বারে তাহাকে বলিয়াছিলাম, ভূপতি ত দিনরাত রোগী নিয়ে থাকে, তুমি এস না আমার এখানেই থাকবে?

সে বলিল, ভূপতিটা কাঁদবে।

কথাটা সত্য, বুঝিয়া আমিও আর পীড়াপীড়ি করিলাম না।

ভূপতি ঠিক পাইলেই আসে, মাঝে মাঝে আমিও তাহার বাড়িতে যাই। ইহারই মধ্যে হঠাৎ একদিন কথায় কথায় সেই রায়সাহেবের নাম উঠিল। ভূপতি কহিল, একটা প্রশ্ন আপনি করেছিলেন, উত্তর দেওয়া হয়নি। পরেও মাঝে মাঝে মনে পড়েছে, আবার ভুলে গেছি।

—কথাটা কি?

—আপনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, রায় সাহেবের ঐটি বড় ছেলে কিনা। আমি বলেছিলাম, ছোট ছেলে, বা একমাত্র ছেলেও বলতে পারেন।

—মনে আছে। তার কি?

—'কিউরিয়াস ইন্টারেস্টিং। রায়সাহেবের আরও এক ছেলে ছিল, বড়। সে ছেলেও মারা গেছে, এবং সেও সাপের কামড়ে।

—সে কি!

—হ্যাঁ। বছর তিনেক আগে। আমি তখন মাত্র এসেছি।

—এইখানে?

—না। আসামে ওঁদের ব্যবসা আছে, সেইখানে। সেখানেই ছিলেন কিছুদিন থেকে, কার্ব দেখছিলেন।

—আশ্চর্য।

—হ্যাঁ, আশ্চর্য। accident একবার ঘটে বলেই তার নাম অ্যাকসিডেন্ট। দুইসিডেন্ট তিনসিডেন্ট কখনো হয় না। এ তাই হয়েছে।

—তারপর?

—তারপর আর কি। আমি তখন সদ্য এসেছি। আলাপ পরিচয়ও বিশেষ হয়নি কারু সঙ্গে। শুনলাম খবর এসেছে, সবাই যথারীতি কান্নাকাটি করেছে, আবার যথারীতি খেয়েও গেছে। রায়সাহেব রাশভারী লোক, হৈ-চৈ করে কান্নাকাটি করা তাঁর ধাত নয়; দুদিন শুধু খেয়ে থেকেছেন, আবার সামলে নিয়েছেন।

—বড় ছেলের ইনসিওরেন্স ছিল?

—জানিনে। বোধহয় ছিল না। রায়সাহেব সম্ভবত বিশ্বাসই রাখতেন না ওসবের ওপরে।

—তবে এর বেলায় করা হল কেন? অন্য তাদের ব্যাপার দেখে?

—খুব সম্ভব। ওটা যা হবার হয়ে গেল, সবাই মোটামুটি সামলেও নিয়েছেন, এমন সময়ে পুণ্যব্রতর আবির্ভাব। আমি এখানে আছি জানত না, সেও বোধহয় তার আগে আর আসেনি। পার্কে বেড়াতে হঠাৎ দেখা। একসময়ে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল দুজনে, সোজা টেনে আমার বাড়ীতে এনে তুলল্যাম। হোটেলে উঠেছিল।

—সেটা কদিন আগে?

—বছর দুয়েক, বা কিছু বেশী। মানে, পূজোর ছুটির পরে এটা মনে আছে, ঠিক তারিখটা মনে নেই। কেস খুঁজতে এসেছে। রায় সাহেবের ছেলের সমস্যাটা বোধহয় আমার মুখেই প্রথম শুনল। বা হয়ত অন্যের কাছেও জেনে থাকবে তার আগে। চলে গেল তাঁর কাছে। এক ছেলের বিপদ হয়ে গেছে, মন তখন দুর্বল। রায়সাহেব রাজি হয়ে গেলেন। তার আগে নাকি কোন ইনসিওরেন্স এজেন্টকে বাড়িতে ঢুকতেই দিতেন না। বলতেন ওরা অমঙ্গলের সূচনা বয়ে আনে।

—তাই ত আনল।

—হ্যাঁ। ব্যাপারটা অবশ্য কাকতালীয়। তবু ভাবতে অদ্ভুত লাগে। পুণ্যব্রতও মস্ত শক্ খেয়েছে। সেইজন্যেই সেবারে কাজটা শেষ করার পর আর থাকতে চায়নি এখানে। রায়সাহেবও সহজে নিতে চাননি সে টাকা। সেইজন্যেই ও নিজে চলে এসেছিল, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল তাঁকে বুঝিয়ে রাজি করতে।

—আচ্ছা, এই রায়সাহেব, ইনি কে?

—জানেন না? ইনি এ অঞ্চলের খ্যাতনামা ব্যক্তি। বিরাট সম্পত্তি—একা মহারাজাকে বাদ দিলে এঁর মত ধনী এ জেলায় বোধহয় আর কেউ নেই। বহুরকম সম্পত্তি, বহুরকম ব্যবসা আর কারবার। পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাকে বাড়িয়েছেন, একসময়ে নাকি ব্যাঙও করেছিলেন একটা। এখন জমিজমা আছে, কলিয়ারি আর টীমার্ডেনে প্রচুর শেয়ার আছে, বাস সার্ভিস আছে, প্রেস আছে, কাঠের কারবার আছে, তারই একটা বড় অফিস আসানসোলে, সেখানে বড় ছেলে থাকতেন। নগদ লগ্নী কারবারও বহু; মর্টগেজটও প্রচুর এঁর ওপরে, সেটা রায়সাহেবের খেতাবে প্রমাণ। রায়বাহাদুর হয়ে যাবেন এমন ভরসাও ছিল। সব ঠাণ্ডা করে দিয়েছে সাপে কামড়ে।

—আর ছেলে নেই?

—ছেলে নেই। মেয়ে আছে একটি, বিবাহিত। এখন বলতে গেলে সেই উত্তরাধিকারী। কিন্তু জামাইয়ের ওপরে ইনি প্রসন্ন নন। মেয়েকে বঞ্চিত করে অন্যকে উইল করে সব দিয়ে যাবেন, এমন অন্য নিকট-আত্মীয়ও বিশেষ কেউ নেই মনে হয়।

—ছেলেদের বিয়ে হয়নি? নাতি টাতি?

—না। বড় ছেলের শুনেছি বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের তারিখের দিন দশ পনর আগে এই কাণ্ড। ছোটছেলের বিয়ের তাই কথাই কেউ হঠাৎ তুলছিল না।

—বেশ। সর্বতোভাবে সুসংবাদ। ভদ্রলোকের ভাগ্য বলতে হবে। কিন্তু তুমি এত জানলে কি করে?

—সবাই জানে, টাউনের লোকের মুখেই শোনা যায়। সর্বজন-পরিচিত ব্যক্তি, এবং ঘটনাগুলোও গোপন রাখবার মত নয়। আর আমি ত রীতিমত অন্তরঙ্গ হয়ে গেছি বলতে গেলে। বড় ছেলে মারা যাবার পরে সামান্য একটা প্রেসার-স্ট্রোকের মত হয়েছিল একবার, তখন আমার প্রথম ডাক পড়ে। তারপর থেকে সে বাড়িতে আমিই একচ্ছত্র চিকিৎসক হয়ে আছি। পয়সা আছে, অতএব কারণে অকারণে ডাক্তারের গতিবিধিও লেগেই থাকে।

ইহার কয়েকদিন পরে রায়সাহেবকে দেখিলাম। কলেজে একটা সভা হইতেছিল, তিনি সভাপতিত্ব করিতে আসিলেন। বয়স সত্তরের কাছে, কিন্তু অত্যন্ত শক্ত-সমর্থ দেহ। পাকা ব্যবসাদার লোক,

আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ়সংকল্প প্রতিটি কথায় চালচলনে পরিস্ফুট। দেখিলেই বুঝা যায় এ লোকের কর্মশক্তি ও জিদ দুইটিই অসাধারণ, যাহা স্থির করিয়াছেন তাহা হইতে ইঁহাকে বিচলিত করা দুঃসাধ্য।

গ্রীষ্মের ছুটিতে কলিকাতায় আসিলাম। ডাক্তার বোস কলিকাতায় ছিলেন। তাঁহার কাছে অনেক গল্পই করিতাম। এই সর্পাঘাতের গল্পও বলিলাম। বোধহয় একদিনে সমস্তটা নয়, কথাপ্রসঙ্গে দুইতিন বারে। বলিয়া প্রশ্ন করিলাম, সত্যি কি এমন হয়? হঠাৎ একটা জায়গাতে এভাবে সাপের উপদ্রব দেখা দিতে পারে?

ডাক্তার কহিলেন, না হবার কি আছে। যে নদীতে সাধারণত কুমির নেই, হঠাৎ দেখা যায় সেখানে এক কুমির এসে হাজির হয়েছে, মানুষ গরু টেনে নিয়ে ঘনঘন বাধিয়েছে। হয় না?

—কেন হবে না। আমাদের নিজেদের টাউনেই ত হত। টাউনের নিচে নদী। সারা বছর কোন উপদ্রব নেই, কিন্তু প্রায় প্রতি বছরই গ্রীষ্মকালের মুখে কুমির আসত। কুমির একটা, বড় জোর দুটো, কিন্তু পরিত্রাহি কাণ্ড বাধিয়ে দিত—তাকে মেরে তবে শান্তি।

—তবে? বাঘও তাই। বাঘ থাকে বনে। লোকালয় থেকে বহু দূরে। কিন্তু হঠাৎ হয়ত একটা ছিটকে চলে আসে লোকালয়ের কাছে। মহামারী বাধিয়ে দেয়। হয়ত সে মানুষ-খেকোই।

—হ্যাঁ।

—তা, এ না হয় কুমির বাঘ নয়, সাপ। সে অঞ্চলে নেই, এমন সাপ হঠাৎ চলে এসেছে সেখানে।

—কিন্তু এল কোত্থেকে?

—কোত্থেকে তা আমি কি করে বলব। জঙ্গল কাটলে বনে আগুন লাগলে তার জানোয়াররা আতঙ্কে লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে চলে যায়। বন্যার সময় পাহাড়-অঞ্চল থেকে অনেক জানোয়ার জলের তোড়ে ভেসে বহুদূর চলে যায়, যেখানে ডাঙা পায় সেখানে আস্তানা গাড়ে। বাঘ ভালুক যায় সেভাবে। সাপ যায় আরও সহজে, কারণ সাপের কাছে জল ঠিক করেন-এলিমেন্ট নয়। তোমাদের ও জায়গাটা টেরাই-অঞ্চল। পাহাড়ী বা আধা-পাহাড়ী নদী কি ঝোরাও নিশ্চয় আছে কাছাকাছি। হিমালয়ের নিচের রিজিয়নে সাপের অভাব নেই—তারা সংখ্যায় প্রচুর, ভ্যারাইটিও অনেক। হয়ত তাই কিছু চলে এসেছে কোন রকমে।

—এল। কিন্তু এমন বেপরোয়া মানুষ কামড়াচ্ছে কেন?

ডাক্তার কহিলেন, go ask the snake! কেন কামড়াচ্ছে সেটা সেই বলতে পারে। তাড়া খেয়ে, বিপদে পড়ে এসেছে, হয়ত সেই জন্যেই তারা সদা-সন্ত্রস্ত, তাদের মন চঞ্চল। মনে ভয় ভয়। নতুন জায়গাতে মনে ভরসা পায় না। তাই আত্মরক্ষার জন্যে বেশী সতর্ক। ভয়ের সামান্য কারণ ঘটেছে দেখলে বা মনে করলেই কামড়ে বসছে মানুষকে। সবাই তাই করে। একবার পথ নেই দেখলে মরীয়া হয়ে ওঠে।

—বুঝলাম। কিন্তু, যেখান থেকেই এসে থাক আর যে কারণেই ক্ষেপে উঠে থাক, কামড়াবামাত্র মরে যাচ্ছে মানুষ, হাসপাতালে এনে পৌঁছবার সময় পাচ্ছে না, এ কী সাপ?

ডাক্তার কহিলেন, আমিও সেটা ভাবছিলাম। হতে পারে না তা নয়। সাপ যদি খুব বড় সাইজের হয়, তার ব্যাগে বিষও বেশী পরিমাণ থাকবে; অত্যন্ত তীব্র বিষ এবং পরিমাণেও বেশী। সেক্ষেত্রে অল্প সময়ের মধ্যে মারা যাওয়া অসম্ভব নয়। তাছাড়া, শুধু বিষ বলে নয়। সাপ নামের একটা মহিমা আছে। সাপে কেটেছে জানলেই মানুষের মন বাঁচতে যায়—মোটে বিষ ঢোকেনি বা আদৌ সাপের কামড়ই নয় অথচ সে বীর মানুষ মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে, এমনও হয়ে থাকে।

—তাই হচ্ছে? দেশশুদ্ধ প্রত্যেকটি মানুষই অমন ভয়-কাতুরে? আর এমন তীব্র বিষ, বড় আকার, সে সাপেরই বা নাম কি?

—হয়ত শঙ্খচূড়। আর হতে পারত অষ্ট্রেলিয়ার সাপ বুশ-মাস্টার। কিন্তু সে সাপ এদেশে আসবে কি করে। শঙ্খচূড় হওয়া আশ্চর্য নয়। পাহাড়ী বনে বাস, হিমালয়ের টেরাই অঞ্চলেও থাকে, তারই একটা কোনরকমে ছিটকে এসে পড়েছে হয়ত।

—মোটে একটা?

—আমার ত তাই মনে হচ্ছে শুনে। পাঁচ সাতটা সাপ যদি হত, কামড়ের ফলও পাঁচ সাত রকম হতে পারত। তা হচ্ছে না। কামড়াবার কায়দাটাও বোধহয় সবক্ষেত্রে একরকম।

বলিতে বলিতে ডাক্তার হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন।

আমি কহিলাম, কি ভাবছেন?

ডাক্তার কহিলেন, একটা কথা মনে হল হঠাৎ। সে থাক গে। বলিয়া একেবারেই অন্য প্রসঙ্গে চলিয়া গেলেন।

দুই তিনদিন পরে হঠাৎ ডাক্তার কহিলেন, তোমার যে ডাক্তার বন্ধুর কলকাতায় বাড়ি বলেছিলে না?

—ছিল একসময়ে। এখনও আছে হয়ত।

—আসে-টাসে?

—তা আসে নিশ্চয়ই।

—বললে আমার সঙ্গে দেখা করবে?

—তা কেন করবে না।

—তবে দাও একটা চিঠি লিখে।

—কি লিখব?

—ঠিক ডেকে পাঠিও না, তবে আপাতত করে-তক এখানে আসবার সম্ভাবনা আছে জিজ্ঞেস কর, এলে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই এটা জানিয়ে দাও। যদি তার আপত্তি না থাকে তবে দেখা করবে। তার কেস্-ডাইরি নিশ্চয় রাখে, সেটা সঙ্গে নিয়ে আসবে।

আমি সেইদিনই ভূপতিকে চিঠি দিলাম। অন্য কিছু লিখিলাম না। শুধু লিখিলাম, তোমার কি আজকালের মধ্যে কলকাতায় আসবার সম্ভাবনা আছে? থাকলে ভালো, এখানে একটি ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।

চিঠির উত্তর আসিল না; দিন চার-পাঁচেক পরে ভূপতি স্বয়ং আসিয়া আমার বাড়িতে হাজির হইল।

কহিল, কি ব্যাপার, ডেকেছেন কেন?

কহিলাম, ডেকেছি বলেই কি ছুটে এলে?

—না, আসতে চচ্ছিল এমনিই। তারিখটা নিশ্চিত ছিল না বলে চিঠিতে লিখিনি। কিন্তু, কি ব্যাপার, কে চেয়েছে আমাকে দেখতে? বদ মতলব যদি কিছু করে থাকেন তবে এক্ষুণি হয়ে যাবে বলে দিচ্ছি।

—ও, তাই ভেবে বুঝি পড়ি-মরি করে ছুটে এলে? হতাশ হও, সে লোকের মেয়ে নেই। বউই জোটেনি জীবনে।

—আহা, দাদা, পায়ের ধুলো দিন। বসুন এবার তাহলে, নির্ভয়ে শুনি। কি ব্যাপার?

কহিলাম, ব্যাপার যারাত্মক কিছু নয়। একটি ভদ্রলোক আছেন, প্রবীণ ডাক্তার। অনেক বিষয়ে পড়াশোনা। আমার খুব চেনা। তাঁকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম তোমার কথা। মানে তোমাদের ওখানে সেই সাপের কামড়ের এপিডেমিকের কথা। শুনে বললেন সম্ভব হ'লে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। বোধহয় এই কেসগুলো নিয়ে তাঁর কৌতূহল জেগেছে। কি জাতের সাপ সেটা আন্দাজ করতে চান।

—বেশ ত। যদি পারেন, আমারও কিছু কৌতূহল মিটবে। কবে যাব তাঁর ওখানে?

—যেদিন যখন তোমার সুবিধে। কদিন থাকবে?

—কাজ এসেছি। থাকব দিন দুই।

—বেশ, আজ সন্ধ্যেবেলা আসবে এখানে। একসঙ্গে যাব। তোমার কেস-ডাইরি আছে?

—নিশ্চয়। সেটা রাখা এ চাকরিরই অঙ্গ। যে-কোন সময়ে কোন পুরোনো কেস নিয়ে কোর্টে সাক্ষী

দিতে হতে পারে। কাজেই ওটা ঠিক না থাকলে ডাক্তারের মরণ।

—কোথায় আছে? সেখানে ত?

—না। ওটা দামী জিনিস। অন্যের হাতে পড়লে কারসাজি করে রাখতে পারে—কিছু জানব না, হঠাৎ একদিন জব হয়ে যাব। মামলা-মোকদ্দমার জন্যে মানুষ সব কিনিস করতে পারে। এটা আমার গুরুর শিক্ষা। কেস-ডায়েরি আমি নিজের সঙ্গেই রাখি সব সময়ে। পুরোনোগুলো ব্যাঙ্ক ভল্টে রেখে দিই।

—ঠিক আছে। এই কেসের সব ডায়েরি নিয়ে এসো। আমি তাঁকে জানিয়ে রাখব।

বিকালে তুপতি আসিল। তাহার হাতে একটি ছোট চামড়ার ব্যাগ।

আমি প্রস্তুত হইয়া ছিলাম। তাহাকে লইয়া ডাক্তারের বাড়িতে চলিয়া গেলাম।

ডাক্তার নিঃশব্দে বসিয়া তাহার বিবরণ শুনিলেন। প্রথম দিন আমাকে সে যেমন বলিয়াছিল, তবে আরও বিশদ বিবরণ ও টেক্‌নিক্যাল্ তাহার এবং পরপর ঘটনার তারিখসহ।

মোটামুটি শুনিয়া লইয়া ডাক্তার কহিলেন, এবার প্রশ্ন করছি। উত্তর দাও। শেষ কেস হয়েছে কবে?

—মাস চারেক আগে।

—প্রথম কেস্?

—তা, প্রায় বছর খানেক।

—তার মানে, আন্দাজ ছ'আট মাসের মধ্যে জন পাঁচেক মানুষ মরেছে।

—বেশীও হতে পারে, সেগুলো হাসপাতালে আসেনি।

—সেগুলো এসেছে তারই কথা বল। পুরো পি এম্ করেছিলে?

—প্রথম দিকে মোটা ছুইকে করেছি।

—কি পেলে?

—কামড়ের দাগ। মৃত্যুর প্রমাণ।

—হাইসর?

—হাঁ।

—কি সাপের বিষ। প্রমাণ পেয়েছ? বা পরীক্ষা করেছ?

—কি সাপের বিষ?

—হাঁ। সব সাপের বিষের একরকম action নয় ত? বিষের action দেখেই সাপের জাত বোঝা যাবে।

তুপতির মুখের চেহারা বিপন্ন দেখাইল।

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন। কহিলেন, ও এটা পড়াশুনি।

—না। আমিও ত কোনদিন পাইনি এ আলোচনা!

—তার মানে খুঁজে দেখা দরকার হয় নি। তাতে আশ্চর্য বা অন্যায় কিছু নেই, কারণ হাসপাতালের ডাক্তার সেই কেস্‌গুলো নিয়েই ভাবতে বাধ্য হয় যেগুলো তার হামেশা আসছে।

—তা হবে, কিন্তু তা হলেও আমার জেনে নেওয়া উচিত ছিল। কোথায় আছে?

ডাক্তার কহিলেন, আচ্ছা, বই বলে দেব। মোটা-মুটি ব্যাপারটা হচ্ছে এই রকম: এক এক জাতের সাপের বিষে এক একরকম ফল হয় দেহের ওপরে। যেমন ধর, কোব্‌রা ভেনমের আক্রমণ হয় ব্রেন্ আর নার্ভ-সেন্টারের ওপর তার ফলে দেহ অবসন্ন হয়ে পড়ে, যাকে বলে চলে পড়া। রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, নাক মুখ দিয়ে লাল ভাঙে, মুখ চোখে নীল আভা পড়ে। ব্ল্যাক্‌ক্রেটের বিষ রক্তকে ছানা কাটিয়ে দেয়। মানে, রক্তের জলীয় অংশটা আলাদা হয়ে যায়। তাই এতে মৃত্যুও হয় অত্যন্ত অল্পসময়ে। রাসেলস্ ভাইপার মানে চক্র-বোড়ার বিষ আক্রমণ করে কিডনী এবং কতগুলো গ্ল্যাণ্ডকে। তার ফলে সমস্ত দেহটা জর্জরিত হয়ে পচে ওঠে। স্টুলে ইউরিনে নাক কান দিয়ে এমনকি লোমকূপ দিয়েও রক্তপাত হতে থাকে। সর্ব শরীরে দারুণ যন্ত্রণা হয়—অল্পে তবে বহুক্ষণ বা বহুদিন ধরে পচিয়ে মারে তাই চক্রবোড়ার বিষকে বলে পচা বিষ।

রোগীর লক্ষণ বা পোস্টমর্টেম থেকে, কি সাপে কামড়েছে সেটা বুঝে নেওয়া যায়।

ভূপতি কহিল, জানিনে।

—তবু! লক্ষণ যা যা দেখেছ, লিখে রেখেছ নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ। ডায়েরি সব নিয়েও এসেছি। এই নিন।

ব্যাগ খুলিয়া ভূপতি কয়েকটি খাতা বাহির করিল। বইয়ের আকারের খাতা, ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন অক্ষরে লেখা। খাতাগুলি পরপর নম্বর এবং তারিখ দেওয়া। ডাক্তারের হাতে দিয়া কহিল, রেকর্ডাইট কেসগুলোতে স্লিপ দেওয়া আছে।

ডাক্তার খাতাগুলি লইলেন, স্লিপ ধরিয়া পরপর পৃষ্ঠা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় কুড়ি মিনিট কাল তিনি একটানা পড়িয়া গেলেন। তারপর মুখ তুলিয়া কহিলেন, ভাল ডায়েরি। কিন্তু, কামড়ের জায়গা লিখেছ, মাপ লেখনি কেন?

—মাপ মানে?

—দুটো দাঁতের মাঝখানে কতটা ফাঁক?

—তা লিখিনি। কিন্তু সে মাপ দিয়ে কি হবে?

—মাপগুলো থাকলে, মিলিয়ে দেখা যেত। সাপের আকার অনুসারে তার মাথা এবং চোয়ালের মাপ ছোট বড় হবে। কামড়ের মাপ এক হলে বোঝা যেত যে যারা কামড়েছে তারা মোটামুটি একই আকারের সাপ। বা হয়ত সবগুলো একটাই সাপের কামড়। মাপ আলাদা হলে বুঝতে হবে সাপও আলাদা, মানে অনেকগুলো।

ভূপতি কহিল, তা বটে। কিন্তু, দেখুন, ডায়েরিতে আমি লিখে রেখেছি সেই পয়েন্টগুলো, যা পরে দরকার হতে পারে। মানে কোন রিপোর্ট দেখবার জন্যে বা কোর্টে সাক্ষী দেবার জন্যে। মাপের কথা সেখানে ওঠেনা। যা লিখিনি এমন অনেক ডিটেইল আমার মনেও আছে মোটামুটি।

—আছে? বেশ ত, যা বলি, দেখ মনে আছে কিনা। কিন্তু, খুব শিওর মনে থাকলে তবেই বলবে, ভেবে বা আন্দাজ করে বলবার চেষ্টা কোরো না।

—ঠিক আছে, বলুন।

—মাপ সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আছে তোমার?

—প্রথম কেসটা মেপেছিলাম, লেখা আছে দেখুন। পরেরগুলো মাপিনি। তবে যতটা মনে আছে, মাপ প্রায় সবই এক রকম।

—তার মানে একই সাইজের সাপ বা একই সাপ।

বলিতে বলিতে ডাক্তার খাতা খুলিলেন, প্রথম কেসের পৃষ্ঠা বাহির করিলেন: হ্যাঁ, লেখা আছে। 2·5 CM। তার মানে তার মুখ এবং মাথা অন্তত দেড় ইঞ্চি চওড়া। প্রকাণ্ড সাপ বলতে হবে।

ডাক্তার হাত বাড়াইয়া কাগজের প্যাড্ ও কলম টানিয়া লইলেন। ডায়েরির পাতা উল্টাইয়া কতগুলা অঙ্ক কাগজে টুকিয়া লইলেন। সেগুলি পরপর সাজাইয়া কি হিসাব করিলেন। তারপর কহিলেন, এবার শোন।

কামড়ের মাপ বললে একরকম। তার মানে সাপও এক রকম বা একই। তার সাইজ প্রকাণ্ড। দেহের লক্ষণ লিখেছ, মুখে নীল আভা। নাক ভেঙে পড়েছে। চুল টান্‌লে উঠে যাচ্ছে। তার মানে এ কোব্‌রা গ্রুপের সাপ। কোব্‌রা যদি হয়, তবে অতি প্রকাণ্ড সাইজের কোব্‌রা। কামড়ের জায়গা লিখেছ অনেক রকম। প্রথম কেসে কামড় পড়েছে ডান পায়ের ডিমে। মানে পেছন থেকে কামড়েছে, মাটি থেকে পৌনে এক হাত-খানিক মাথা তুলে। দ্বিতীয় কেসে কামড় পড়েছে ঘাড়ে।

আমি কহিলাম, ঘাড় অবধি উঁচু হয়ে কামড় বসিয়েছে, এ কত বড় সাপ?

ডাক্তার কহিলেন, সাপ বড় সে ত বোঝাই যাচ্ছে। কোব্‌রা না হয়ে যদি শঙ্খচূড় হয়। তারা রাগলে সেজে ভর দিয়ে অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠে ছোবল্ মারে। সে কামড় ঘাড়ে পড়া অসম্ভব নয়। লোক যদি বেঁটের দিকে হয়।

ভূপতি কহিল, হ্যাঁ, বেঁটে লোক।

ডাক্তার কহিলেন, তা ছাড়াও হতে পারে—বয়

লোকটা বসে ছিল সেই অবস্থায় কামড়েছে, বা হয়ত সাপটাই কোন উঁচু জায়গাতে ছিল, গাছের গায়ে বা মেহগনির কোটরে, সেখান থেকে ছোবল দিয়েছে।

বলিতে বলিতে ডাক্তার আবার খাতা উল্টাইয়া বিবরণগুলা দেখিতেছিলেন। কহিলেন, আচ্ছা। ছোবলের জায়গা ছাড়া, অন্য কোনরকম চিহ্ন ছিল এর কোনটার দেহে? এই ত—প্রথম কেসে দেখছি আছে, মাথার পেছন দিকে একটা উঁচু ফোলা—এটা কি?

—একটা জায়গা সুপুরি রকম ফুলে উঠেছিল, ঠুকে যাওয়ার মত।

—তা কেন হবে?

—হতে পারে, হয়ত ছোবল খেয়ে লাফিয়ে উঠেছে, পা হড়কে চিৎ হয়ে পড়ে গেছে, মাথাটা ঠুকে গেছে, রাস্তায় ইটে বা কোন কাঠকাটে।

—ঠুকে গেলে তার অন্য চিহ্ন থাকত না? যেমন, ইটে যদি ঠুকে যায়, সুরকির গুঁড়ো লেগে থাকতে পারে। রাস্তা কি সেখানে পাকা?

—অতটা অবশ্য জিজ্ঞেস করিনি, খেয়াল হয়নি। তা ইটে ঠুকে গেলেও সুরকি লেগে থাকত না—হাসপাতালে আনবার আগেই লোকেরা যার মাথায় বা এসেছে করে সেরেছিল, প্রচুর জলও ঢেলেছিল মাথায়। হাসপাতালে এনেছে যখন তখন সবটা জলে সপ্‌সপ্‌ করছে।

আমি কহিলাম, কামড়েছিল, রাস্তায়?

ভূপতি কহিল, তাই ত বলেছিল মনে পড়ছে।

ডাক্তার কহিলেন, লেখা কিছু নেই। কোন জায়গাতে বসে কামড়াল; প্রশ্ন করেছিলে সব কেসেতে?

ভূপতি কহিল, লিখিনি, কিন্তু প্রশ্নও করতে হয়নি, যারা এনেছে তারাই কলকল করে বলেছে শুনে গেছি। তাও ত—আশ্চর্য, এটা ভাবিনি।

—কি?

—যতদূর মনে পড়ছে, সব কটাই কামড়েছে বাইরে, মানে out-door case—পথে বা মাঠে-ঘাটে।

—সেটা অস্বাভাবিক নয়, ঘুমো সাপ ঘরে আসবে না।

—আর, সব কেসই হয়েছে রাত্রে। অন্তত সন্ধ্যার পরে।

—সেটাও স্বাভাবিক। ঘুমো সাপ দিনের বেলায় বাইরে বেরোয় না। আচ্ছা, এই তিন নম্বর কেস্‌টা দেখছি, কামড় পড়েছে পেছনে, গ্লুটিয়াস্ ম্যাক্সিমাসে।

—হ্যাঁ, প্রায় সোজাসুজি পশ্চাতে।

—কি রকম angle-এ ঢুকেছিল দাঁত?

—দেখিনি। কেন?

—Angle থেকে, বা মাংস কিভাবে ছিঁড়েছে, তার থেকে, বোঝা যেত, কামড়াবার সময় লোকটা কি পোজিশনে ছিল, দাঁড়িয়ে বা বসে। সাপের হাইট্, আন্দাজ করা যেত তার থেকে।

—ওটা বলতে পারব না।

ডাক্তার কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর কহিলেন, হাইট্-পয়েন্টস্ মনে আছে? লেখা নেই কিছু।

—হাইট্-পয়েন্টের কি?

—রক্ত ছিল, ঘায়ের মুখে?

—না।

—মোটে না?

—না। থাকবার ত কথা নয়। বিষ ঢুকলে সে বিষ দিয়ে রক্ত আসে না। রক্তপাত হয় নিবিষ কামড়ে।

—হ্যাঁ, তাও বটে।

ডাক্তার আবার নিঃশব্দে বসিয়া খাতার পাতা উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। তারপর নিঃশ্বাস ফেলিয়া নড়িয়া চড়িয়া সিধা হইয়া বসিলেন। খাতাগুলি বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, নাও এগুলো। তুমি কবে ফিরে যাবে?

—কেন।

—তোমার ওখানে আমার দেখবার। Next case হলে, তক্ষুনি আমাকে খবর দেবে। আমি যাব, লাস দেখব। লাস মর্গে রেখে আমাকে টেলিগ্রাম করবে।

—আমাকে বলতে হবে না?

—ও ত ঠিক তক্ষুনি নাও থাকতে পারে ওখানে। আমার ঠিকানা নিয়ে যাও। বেশী কিছু লিখবে না—'আসুন' লিখলেই আমি বুঝে নেব। আর, এই ডায়েরিগুলো কোথায় ছিল, ব্যাগে?

—পুরোনোগুলো, ব্যাগে।

—এগুলো যদি দরকার হয়, তখন আমাকে আবার দিতে পারবে? নিয়ে চলে যাবে?

—এখানেই রেখে যাব? আপনি যা দরকার ধীরে-সুস্থে পড়ে নেবেন?

ডাক্তার চোখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইলেন। কহিলেন, এত আগ্রহ কেন?

ভূপতি কহিল, আগ্রহ, কারণ এই সাপে ক'টার ব্যাপারটা আমারও বড় বিশ্রী লাগছে। পরপর এতগুলো কেস্ হয়ে গেল, একটাও বাঁচল না। এটা হাসপাতালের পক্ষে গৌরবের কথা নয়।

—আহা। তুমিই ত বললে, হাসপাতালে এসেই পৌঁছেছে মরে যাবার পর। তবে আর তোমার দোষ হল কোথায়।

—কি জানি। তবু স্বস্তি পাচ্ছি না। খালি ভেবেছি, হয়তো বাঁচানো যেত তাদের, আমিই পারিনি। লোকে বলে শুনেছি, সাপে কাটা রোগী, যখন দেখে মনে হয় মরে গেছে তখনও তার মধ্যে প্রাণ থাকে, ওঝার গুণী হলে তখনও বাঁচিয়ে তুলতে পারে। তাই নাকি আগের কালে সাপে কাটা রুগীকে পোড়ানো হত না, ভেলায় করে নদীতে ভাসিয়ে দিত। যদি কোথাও তেমন গুণীর চোখে পড়ে যায়, যদি সে বাঁচিয়ে দিতে পারে।

ডাক্তার কহিলেন, ওঝা, ঝাড়ফুঁক, এসবে বিশ্বাস কর?

ভূপতি কহিল, 'করি' বলতে পারিনে, মন থেকে ঝেড়ে ফেলতেও পারছিনে কথাটা। বাঁচাতে পারিনি, কে জানে আমিই না-মরা মানুষকে মরা বলে ছেড়ে দিলাম কি না। একথাটা কেবলই মনে হয়েছে, অথচ করবারও কিছু পাইনি। সেই জন্যেই যাদা যখন বললেন আপনি ডেকেছেন আমাকে, ছুটে চলে এসেছি। তা নইলে, বুঝতেই পারেন, আপনি আমার অচেনা লোক, আমার কেস্-ডায়েরি এমন সহজে আপনার হাতে দিয়ে দেবার আমার কথা নয়। কারণ আসলে এগুলো সরকারি দলিল।

—হাঁ।

—এসে, আপনার কথা থেকে এটা বুঝেছি, যে কারণেই হোক আপনারও বিশেষ আগ্রহ জেগেছে এই ব্যাপারটা নিয়ে, এবং সাপ সম্বন্ধে সাপের বিষ সম্বন্ধে আপনি প্রচুর জানেন, অন্তত আমার চেয়ে অনেক অনেক বেশী জানেন। আগে জানলে আমি নিজেই ছুটে আসতাম আপনার কাছে। বইগুলো আপনি রেখে দিন। কাজ হয়ে গেলে যাদাকে দিয়ে দেবেন। আমি ওঁর কাছ থেকে নিয়ে নেব। আর, আবার যদি কেস্ হয়, জানাব আমি তক্ষুনি আপনাকে। এমনিও যদি চান, আপনার যখন খুশি চলে আসবেন ওখানে; আমি যদি হঠাৎ বদলি হয়ে যাই, আমার পরের লোককেও বলে রেখে যাব আমি।

—কেন?

—নিশ্চয়ই। আমি নিজে থাকলাম কিনা সেটা ত কথা নয়। আমরা জানিনে কোন্ রকমের সাপ, কি তার আকার বা প্রকৃতি। আপনি যদি সেটা বলে দিতে পারেন, তবু হয়ত সেখানকার লোকদের সতর্ক করে দেওয়া যাবে, হয়ত এখনও যারা মরতে পারত তাদের কেউ কেউ না মরে বেঁচে যাবে।

ভূপতির মুখচোখ উদ্দীপ্ত, গলা প্রায় কাঁপিতে লাগিল উত্তেজনায়।

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন, কহিলেন, ঠিক আছে। যদি পারি, যতটা পারি, সাহায্য করব তোমাকে। খাতাগুলো থাক তাহলে।

ভূপতি হেঁট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। কহিল, তাহলে আজ আমি চলে যাই?

—হাঁ, এসো।

—যদি আরও কিছু প্রশ্ন থাকে করবার, জানাবেন। বা ডেকে পাঠাবেন। আমি চ'লে আসব।

—আচ্ছা।

পরদিন গিয়া দেখিলাম ডাক্তার একা বসিয়া আছেন, ভূপতির ডায়েরী বইখানা তাঁহার হাতের কাছে এলোমেলো অবস্থায় পড়িয়া। কহিলাম, আবার পড়লেন?

ডাক্তার কহিলেন, এই, দেখছিলাম একটু নেড়ে-চেড়ে।

—আর কিছু বুঝতে পারলেন?

—আর কি বুঝব। ভূপতির দোষ নেই, সে ছেলেমানুষ। সব জিনিস লক্ষ্য করেনি। আরও কিছু পয়েন্ট পেলে তবে একটা ফির লাইন ধরে ভাবা যেত। দেখি, next caseটা আসুক।

—আসবে বলছেন?

—আসা, না এলে ত ভালই, আমারও দৌড়-ঝাঁপ করতে হল না।

—কেন?

—কি জ্বালা। সাপ যদি মরে গেল বা দেশত্যাগী হল বা বৈষ্ণব হয়ে গেল, তবে আর তার আতকুল নামঠিকানা খুঁজতে যাবার কি দরকারটা হচ্ছে?

—বা। তাকে মারতে হবে না?

—কেন হবে। সে যদি মানুষ না মারে, মানুষেই বা তাকে খুঁচিয়ে মারতে যাবার গরজটা কি। মানুষ ঐ দোষেই তো মরে—অকারণে খুঁচিয়ে জানোয়ারকে উত্যক্ত করে। তার ফলে যখন তারাও ক্ষেপে যায়, মানুষকে কামড়ায়—তখন মানুষই উল্টে তাকে বলে ক্রুর, বলে ভাকর। দোড়ার দোষটা যেন তার নিজেরই, সে কথা মনে রাখে না।

—দোষ মানুষের?

—নয় কেন। ইংরেজীতে কথা আছে, Live and let live। আসলে ওটা, উল্টে বলা উচিত—Let live, and live। অন্যকে বাঁচতে দাও। তবে তোমারও বাঁচার বাধা হবে না।

—ভূপতি কিন্তু কাল অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্য করেছেন?

—করেছি।

—পথেও সারাক্ষণ ঐ কথাই বকবক করতে করতে গেছে। ভাবুন, সত্যি মনে হচ্ছে উনি পারবেন এই সাপের জাত আর তার বিষের গুণ বদলে দিতে। আর আমার হাসপাতালে মানুষ বাঁচতে এসে ফিরে যাবে না।

—একটু sentimental।

—Sentimental, কারণ sincere।

ডাক্তার চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে তাকাইলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, হ্যাঁ, অত্যন্ত বেশী sincere। এই sincere লোকেরা আছে বলেই পৃথিবীটা বেঁচে আছে। অথচ এরাই অত্যন্ত বেশী আঘাত পায় জীবনে।

—আঘাত পাবে কেন?

—না। ওর কথা বলে নয়। এমনি বললাম কথাটা।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। আমার ছুটি ফুরাইতে তখনও দিন দশবারো বাকি। হঠাৎ একদিন রাত্রি-বেলায় ডাক্তার টেলিফোনে করিলেন। কহিলেন, চল, ডাক এসেছে।

—মানে?

—মানে ভূপতি টেলিগ্রাম করেছে। তার মানে আমার কেস রয়েছে।

—কখন যাবেন?

—ট্রেন কখন? যত শিগগীর হয়।

—ঘণ্টা দুই পরে আছে একটা।

—পারবে?

—আমার কি। আপনি পারলেই হল।

—আমি রেডি। তুমি বেরিয়ে পড়। স্টেশনে দেখা হবে।

ট্রেন হইতে নামিলাম খুব ভোরে, তখনও আলো

কোটে নাই। আমার বাড়িটি স্টেশনের কাছে। অতএব প্রথমে সেখানেই গেলাম। হাত মুখ ধুইয়া, আলো ফুটিলে দুইজনে ভূপতির বাড়িতে চলিলাম। ডাক্তারকে দেখিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। কহিল, এখনই যাবেন?

ডাক্তার কহিলেন, সবুর, আলো হোক। তাড়াহুড়োর কি আছে।

ভূপতি অস্থির। ডাক্তারও অবশ্য খুব বেশী সময় কাটাইলেন না। কহিলেন, চল। কোথায় মর্গ?

—কাছেই।

হাসপাতাল এলাকারই এক পাশে ছোট ঘর। সুরক্ষিত ও সুসজ্জিত। টেবিলে দেহটি শোয়ানো। চাদর ঢাকা। আমরা তিনজনে প্রবেশ করিলাম। ডাক্তার ঘর দেখাইয়া দিলেন। ভূপতি কহিল, চোর?

ডাক্তার কহিলেন, না।

দেহটিকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন ডাক্তার। ভদ্রব্যক্তি, বয়স পঞ্চাশের কাছে। ডাক্তার নাক, কান, চোখের পাতা, মাথার চুল টানিয়া টানিয়া দেখিলেন। হাত পা টানিয়া দেখিলেন। রাইগর মর্টিস অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছে।

ভূপতি কহিল, কাল সন্ধ্যার অল্প পরে কেটেছে —সাড়ে সাতটা বা কিছু বেশী। হাসপাতালে এসে পৌঁছেছে তখনও আটটা বাজেনি।

—প্রাণ ছিল?

—না। প্রাণ নেই। সেটা নিশ্চিত জেনেই আমি আপনাকে ওয়ার্ন করেছি, নটায় কিছু আগে।

—বাইট কোথায়?

—ভূপতি দেহটাকে ধরিয়া উপুড় করিয়া দিল। কহিল, এই যে, ডান দিকের উরুতে। মাঝামাঝি জায়গাতে, কামড় পড়িয়াছে। দুইটি দাঁত ফোটার ছিদ্র সুস্পষ্ট। ছিদ্রের গায়ে চামড়ায় রক্তের দাগ দেখিলাম না।

ডাক্তার পকেট হইতে একটি ছোট পাতলা রবারের ব্যাগ বাহির করিলেন, টেবিলে রাখিয়া খুলিলেন। একটি ছোট গেজ, একটি ডিসাইডারের তুলিয়া লইলেন। ছিদ্র দুইটির উপরে ডিসাইডারের কাঁটা বসাইয়া, সেটি গেজের উপরে ধরিলেন, কহিলেন, 2:5 C. M.

আমি কথা না কহিয়া দেখিতেছিলাম, বলিয়া ফেলিলাম, তার মানে, সেই একই সাপ?

ডাক্তার কথা কহিলেন না, গেজ ও কাঁটা রাখিয়া একটি ছোট সোজা ছুরি তুলিয়া লইলেন—ডাক্তারি ভাষায় তাহার নাম স্কালপেল। দংশন-স্থানের চারি পাশে তুলা দিয়া স্পিরিট লাগাইলেন। বাম হাতে আয়গাটি চাপিয়া ধরিয়া, দংশনের ছিদ্র বরাবর আয়গাটা গভীর করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। রক্ত বাহির হইল না। পোড়াকাঠের মত বিবর্ণ রঙের জলীয় রসের একটি ক্ষীণ ধারা দেখা দিল। ডাক্তার তুলা দিয়া রসটা ছুপিয়া তুলিলেন, ছুরি রাখিয়া প্রোব ও লেন্স হাতে লইলেন। প্রোব বসাইয়া ও লেন্সে চক্ষু দিয়া ক্ষত স্থানটিকে খুব মন দিয়া দেখিলেন, কোন মন্তব্য করিলেন না। তুলা দিয়া ক্ষত স্থানের রস ছুপিয়া লইয়াছিলেন, সেটা একটা কাচের পাত্রে রাখিলেন, তুলা দিয়া নাকের ভেতর দিয়ে মুখের ভিতর হইতে, জলীয় রস লইলেন। দেহের বমনী হইতে ও কপাটিতে, অক্ষিগোলকের পাশে ছুঁচ বিঁধাইয়া মস্তিষ্ক হইতে জলীয় রস টানিয়া বাহির করিলেন, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা টেষ্ট টিউবে রাখিয়া নাম লিখিয়া দিলেন। তারপর সমস্ত সংগ্রহ ও যন্ত্রপাতি গুছাইয়া লইয়া কহিলেন, হয়েছে, চল। ভূপতি কহিল, শেষ? এটা ফেরত দিতে পারি?

—হ্যাঁ।

বলিয়া ডাক্তার বাহির হইয়া আসিলেন।

আমরাও বাহিরে আসিলাম।

ডোম বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, ভূপতি তাহাকে কহিল, বামুনটা একটু চেরা হয়েছে, সেটা সেলাই করে রাখ। ওদের খবর দাও, এসে নিয়ে যাক।

ডোম সেলাম করিয়া কহিল, জী।

ঘরে আসিয়া হাত ধুইয়া আমরা বসিলাম। ডাক্তারের বন্ধুগুলিকে চাকর ধুইতে লইয়া গেল।

ভূপতি কহিল, কি দেখলেন?

ডাক্তার কহিলেন, দেখলাম কিছু কিছু। এবার ভেবে দেখতে হবে। হিসেব মেলাতে হবে।

—হিসেব কিসের?

—অনেক কিছুর। আগে বার করি ভেবে, তারপর বলব।

—কি সাপ মনে হল?

—বিষের ক্রিয়া থেকে মনে হয় কোব্রা গ্রুপ।

—মানে গোখ্‌রো?

—কোব্রার ভ্যারাইটি বহু—গোখরো কেউটে থুবরাজ পাতরাজ বহুরাজ শঙ্খচূড়—। ইনি কোন্ বংশীয় সেটা ক্রমশ খুঁজে বার করতে হবে।

—ইনি—তার মানে একটিই সাপ?

—লক্ষণ ত সেই রকমই, ঘায়ের আকার এবং আক্রমণের পদ্ধতি দেখে যা মনে হয়। হয়ত চোট্-খাওয়া সাপ, মাথায় আগুন জ্বলেই রয়েছে তাই ফাঁক পেলেই দিচ্ছে এক একজনকে সাবড়ে।

—এমন?

—হ্যাঁ। সাপের আক্রোশ বিখ্যাত বস্তু। ধূর্ত্ততাও ম্যান্‌ইটার বাঘের চেয়ে খুব কম নয়।

তারপর কহিলেন, এবার একটু অন্য খবর বল। এই মৃত ব্যক্তিটি কে?

—ভদ্রলোক, আমি ঠিক চিনতাম না, এখানে কো-অপারেটিভ্ সোসাইটি আছে অনেক দিনের, তার ক্লার্ক। ক্লার্কও অনেক কালের। কাল মিটিং ছিল। সন্ধ্যের পরে বাড়ি ফিরছিলেন।

টাউনের একটু বাইরের দিকে বাড়ি। একটা কাঁচা রাস্তা আছে আমবাগানের মধ্য দিয়ে, সেটা দিয়ে গেলে সর্টকাট হয়। তাড়াতাড়ির জন্যে সেই পথে যাচ্ছিলেন, সেখানেই কামড়েছে শুনলাম।

—সঙ্গে লোকজন আর কেউ ছিল না? অন্ধকার রাত, সাপের ভয়, আলো ছিল না?

—খুব ভাল আলোও। কাল যারা নিয়ে এল তাদের কলরব থেকে যেটুকু শুনেছি মনে পড়ছে, হাতে টর্চ ছিল, লোকও ছিল সঙ্গে জন দুই। তারা কিছু আগে আগে। ইনি পিছিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। আর্ত্তনাদ কানে যেতে চেঁচিয়ে উঠেছেন, তারা ফিরে এসে ধরতে ধরতে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। ব্যস্, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অটৈতন্য, গাড়ি ডেকে হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই শেষ।

আমি কহিলাম, কিন্তু যারা যখন গেলেনই, দেহ রেখে গেল কেন তারা? শহরের লোক, আত্মীয়স্বজন আছে, তারা নিয়ে যেতে চাইল না?

ভূপতি কহিল, রেখে গেল, ডি-এম আর এস্-ডি-ও-র হুকুমে।

—হুকুম মানে?

—আমি তাঁদের বলেছিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, কি বলেছিলে?

—বলেছিলাম আপনার কথা। আপনি আসেন শোনেন, ইন্টারেষ্ট নিচ্ছেন, হয়ত আইডেন্টিফাই করতে পারবেন এটা কি-জাতীয় সাপ হতে পারে, এবং তারই জন্যে next case এলে খবর দিতে বলেছেন—এই আর কি। শুনে এস-ডি-ও হুকুম দিয়ে দিলেন, next case এলে লাস রেখে দিতে হবে পোষ্টমর্টেমের জন্যে।

—আমার নাম করে হুকুম?

—না। সেটার দরকার ছিল না। সে রকম হুকুম অফিসিয়ালি দেওয়াও যায় না সহজে, কারণ আপনি গভর্ণমেণ্ট ষ্টাফের লোক নন। পোষ্টমর্টেম যা করবার, সেটা in theory করছি আমি নিজে।

—তবু বাঁচিয়েছ। তাহলে, আমাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করতে আসবেন না এঁরা কেউ?

—আসবার কথা ত নয়। অন্তত এক্ষুনি নয়। পরে যদি দরকার হয়, তখন হয়ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইতে পারেন এঁদের কেউ মানে D. M. বা S. D. O. বা C. S.। যদি চান, আপনার কি কোন আপত্তি হবে?

—আপত্তির আর কি, তবে পারমিসিটি যত কম হয় ততই স্বস্তি। তুমি অবশ্য এঁদের বলে অন্যায় করনি কিছু। না বললে আমাকে লাস দেখাবার সময় দায়িত্ব তোমার একার নিতে হত, সেটা উচিত হত না। বেশ, দরকার যদি হয়, না হয় করব এদের সঙ্গে দেখা।

তারপর কহিলেন, কাজ ত শেষ হল আপাতত। আমি তাহলে এবার ফিরে যাই, কি বল?

ভূপতি কহিল, আজই ফিরে যাবেন?

—ক্ষতি কি! ট্রেন কখন?

—একটা আছে বিকেলের দিকে। আর আছে কাল ভোরে।

—তাই ভাল, বিকেলে আর নয়, কালই যাওয়া যাবে। আজ না হয় থেকে টাউনটাই বেড়িয়ে দেখে যাই, এসেই যেমন যখন। এখন তাহলে উঠি, কি বল?

—উঠবেন কেন? এইখানেই খেয়ে যান না দিনটা।

—তবে এখানে বসে কি করব। তুমি ত এখন ডিউটিতে যাবে। আমি বরং ওর ওখানেই যাই, ওকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াব।

—তা বটে।

—তাহলে এবার চলুন।

—আবার দেখা হবে না?

—কি দরকার। দেখা হবেই, সময় মত আমিই জানাব। আজ আর তুমি ডিউটি ফেলে আমার সঙ্গে ঘুরবে না। আর শোন, তোমার যে বইগুলো আমার কাছে আছে, আমি ফিরে গিয়ে আর একবার পড়ে দেখব সেগুলো। তার পরে ফেরত দেব। অসুবিধে হবে?

—কিছু না। থাক না পড়ে। নেহাৎ যদি দরকার হয়, চেয়ে নেব।

আমরা উঠিলাম। বাহিরে আসিতে আসিতে ভূপতি কহিল, আপনাকে এতক্ষণ বলা হয়নি দাদা। পুণাতেও এসেছিল। ছিল দিন চারেক। কালই সন্ধ্যেবেলা চলে গেল।

—আঁ! আটকালে না কেন?

—তখন ওর কি করে। ঠিক সন্ধ্যের আগে সে বেরিয়ে গেল—বাসে করে আসের স্টেশনে কোন এক মক্কেলের বাড়িতে যাবে। সেখান থেকেই ট্রেন ধরবে। কেস এল রাত আটটায়। তখন তাকে পায় কোথায়?

—থাকলে বেশ হত। ওর সঙ্গেও দেখাটা হয়ে যেত।

—উনি জানেন তার কথা?

—জানেন। মানে আমি যা সামান্য বলেছি। যাক হল না ত কি আর হবে। আবার কবে আসবে কিছু বলে গেছে?

—তার আর সময় অসময় কি, ছুট করে চলে এলেই হল।

পথে বাহির হইয়া ডাক্তার কহিলেন, তার কথা বলছিল, কে চলে গেল?

—ও, ওর সেই ইনসিওরেন্স বন্ধু। তার কথা ত বলেছিলাম আপনাকে।

—ও, হাঁ।

বাড়িতে পৌঁছিয়া ডাক্তার কহিলেন, এবার চান করব ভাব। তারপর বেড়াতে বেরোব। তোমার ক্লাস কখন?

—ক্লাস নেই। বেরোবেন; কোন্ দিকে?

—সব দিকে। টাউন দেখতে। এলাম ত যেখেই যাই। কোন্ বাগান-টার কথা বলল, তুমি বুঝেছ? যেখানে কামড়েছে লোকটাকে?

—সে জেনে নেওয়া যাবে। সেখানে যাবেন?

—যেখে আসি না একবার, কিরকম জায়গাটা, তোমাদের সেই রায়সাহেবের বাড়িটা কোন্‌দিকে?

—সে টাউনের ভেতরে নয়, বাইরে। টাউন থেকে মাইল খানেক। যাবেন?

—বাড়িতে যাব না, জায়গাটা যেখে আসতে পারি। জানাশোনা আছে তোমার সঙ্গে।

—না। বাড়িটা চিনি, মনে একদিন দূর থেকে দেখে এসেছি। আর কোথাও যেতে চান?

—আরে না না, যেতে চাইলে কোথাও, তবু ঘুরে ঘুরে আসুন। দুটো জায়গা দেখবার ইচ্ছে, সে ত বলসামই।

—বেশ। আপনি চান করে খেয়ে নিন আমি এক ফাঁকে জেনে নিই সে বাগানের পথটা কোন্ দিকে।

—কার কাছে জেনে নেবে?

—Any body। আজ টাউনের যাকে জিজ্ঞাসা করব সেই বলে দেবে।

—বেশ। রায়সাহেবের ছেলেকে কেটেছিল কোথায়?

—শুনেছি টাউনের বাইরে, বাড়ি ফেরার পথে রাস্তায়।

—একা যাচ্ছিল?

—হ্যাঁ, সাইকেলে। সাইকেলের ওপরেই সাপ কামড়ে দিয়েছে, ডান পায়ে। কামড় খেয়ে সাইকেল সুদ্ধ আছাড় খেয়ে পড়েছে। ঘণ্টাখানিক পরে অন্য লোকের চোখে পড়েছে—তখনমারা গেছে। সাইকেলটা খানিক দূরে ছিটকে পড়ে আছে।

ডাক্তার হঠাৎ থামিয়া কি ভাবিলেন; তারপর বলিলেন, তোমার বন্ধু ও ডি-এম, এস্-ডি ও সবাইকে বলে গেছে আমি কেস দেখতে আসুন। আমি ক্রাইম্ নিয়ে চিন্তা করি। এটাও বলেছে ত? একটু জেনে নিতে পারবে?

আমি কহিলাম, সেটা ত বলতে পারবার কথা নয়, কারণ ওটা আমি তাকে বলিনি। তবু বলেছি আপনি রোগ আর বিষের Specialist।

ডাক্তার কহিলেন, হবু বন্ধে।

খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম করিয়া দুইজনে বাহির হইলাম। আমি গাড়ি ডাকিতে চাহিয়াছিলাম, ডাক্তার ডাকিতে দিলেন না। হাঁটিয়া বেড়ানোই তাঁহার ইচ্ছা।

ছোট শহর, বড় পাকা রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে আধপাকা বা কাঁচা রাস্তা, কখনও মাঠের কখনও দুইধারে বাগানের মধ্য দিয়া গিয়াছে। শহরের জনসংখ্যা বেশী নয়। বড় রাস্তাগুলাই বা একটু বাড়িঘর আর দোকানপাটে ভরা, অন্যত্র বাড়িঘর যত তাহার চেয়ে বেশী ফাঁকা জায়গা আর গাছপালা।

বাগানটা কোন্‌দিকে মোটামুটি জানিয়া লইয়াছিলাম। বাগান অর্থ, পথের দুইধারে মাঠ ছুড়িয়া বড় বড় আমগাছ, বেশ প্রাচীন কালের বলিয়া মনে হয়। এই অঞ্চলের আম বিখ্যাত, যদিও বাগিচার বিশেষ চলন হয় না বলিয়া দূরের লোকে বড় জানে না।

বাগানের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে আমরা ঠাহর করিতেছি ঠিক কোন্ জায়গায় হইতে পারে। একটা গাছের নীচে কয়েকটা ছোট ছেলে, কি লইয়া তুমুল তর্ক করিতেছে। ডাক্তার কহিলেন, ওদের জিজ্ঞেস করা যাক।

আমি তাহাদের দিকে চাহিয়া হাত নাড়িলাম, তাহারা কলরব থামাইল, গুটি দুই ছেলে সামনে আগাইয়া আসিল। আমি কহিলাম, এইখানে একটা লোককে কাল সাপে কেটেছে না?

একটা ছেলে অন্যদের চেয়ে বয়সে বা মাপে ছোট, আধময়লা এক হাফপ্যাণ্ট আর মাছধরা জালের মত এক গেঞ্জি পরা, মহাউৎসাহে হাত বাড়াইয়া কহিল—হ্যাঁ, ঐত, ঐ—ঐ গাছটার তলায়।

আমি কহিলাম, একটু দেখিয়ে দাও ত ভাল করে।

বলার প্রয়োজন ছিল না, কারণ তাহার আগেই সে ছুট দিয়াছে। একটা বড় গাছের কাছাকাছি গিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, চেঁচাইয়া কহিল, আসুন, এই ত এইখানটা।

অন্য ছেলেগুলা যথাস্থানে দাঁড়াইয়া রহিল, বোধ হয় তাহাদের মুলতুবি আলোচনাটা আবার আরম্ভ করিল।

আমরা আগাইয়া গেলাম। একটা খুব বড় আমগাছ, তাহার কাছাকাছি জায়গাটা। একটা পুরা দিনও কাটে নাই এতবড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, পথের ধুলায় মাঠের ঘাসে তাহার কোন স্মৃতি বা চিহ্ন মাত্র দেখিলাম না, সে পথ আর পথের ধুলা নির্বিকার নিশ্চিন্ত হইয়াই পড়িয়া আছে।

ডাক্তার জায়গাটাতে গিয়া দাঁড়াইলেন, চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন, তারপর রাস্তা ছাড়িয়া বাগানের মধ্যে গিয়া ঢুকিলেন, সেই বড় আমগাছটির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাটিতে কি খুঁজিলেন, গাছের উপরে ডালপালার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আবার সেটা ছাড়িয়া তাহার পাশের গাছটার কাছে গেলেন। হাতের লাঠি দিয়া ঘাসের মধ্যে খোঁচাও দিলেন দুই একটা। আমি সঙ্গে আছি। সেই ছেলেটি আমাদের হঠাৎ ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। সেও সঙ্গে সঙ্গে আছে।

কহিলাম, কি খুঁজছেন?

ডাক্তার কহিলেন, দেখছি, এর কোন গাছের তলায় সাপের গর্ত আছে কিনা।

আমি কহিলাম, গর্ত যদি থাকে, তাকে এইভাবে খুঁজছেন? যদি বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ কামড়ে দেয়?

ডাক্তার নির্বিকার মুখে কহিলেন, দেয়, মরে যাব, তোমরা টেলেটুনে হাসপাতালে নিয়ে যাবে লোকটাকে।

আমি ব্যাকুল হইয়া কহিলাম, না না, এর কোন মানে হয় না। আপনি চলে আসুন।

ডাক্তার হাসিয়া কহিলেন, যাবড়িও না হে, সাপের কামড়ে মরা আমার ভাগ্যে নেই। রোজ কতখানি করে আফিম খাই আমি, জান?

ছেলেটা খুব ভক্তিভরে শুনিতেছিল, কহিল, আফিং খান?

—হ্যাঁ। আস্ত আধোলার করে।

—কি হয় আফিং খেলে?

সাপে কাটলে মরে না। উল্টে সাপটাই নিজে মরে যায়।

—সুর!

—হ্যাঁ রে! শুধু না, যদি বেরিয়ে কামড়ায় আমাকে, এক্ষুনি দেখবি বড় কড়িয়ে সেই সাপটি মরে গেছে।

—সত্যি!

—হ্যাঁ হ্যাঁ। যে তুই গর্ত বার করে খুঁজে, আমি তোকে ম্যাজিক দেখিয়ে দিচ্ছি। কোথায় গর্ত। জানিস?

—তা আমি কি করে জানব। সাপ কি থাকি এইখানে থাকে, আরও কত কত জায়গাতে থাকে।

—কোথায় কোথায় থাকে?

—সব জায়গাতে। সব জায়গাতেই ত লোক কামড়াচ্ছে।

—তুই জানিস যে যেখা গুলো?

—জানি। দেখবেন?

—কিরি দেখিয়ে?

—যাবেন? চলুন। অনেক দূর কিন্তু।

—হাক। চল। গাড়ি ডাকব? তুই হেঁটে যেতে পারবি?

—আমি? আপনারাই পারবেন না হাঁটতে!

—আহা! দেখেছিস, আমার কত লম্বা লম্বা ঠ্যাং, কত বড় লম্বা প্যান্ট? তোরই ত বেঁটে বেঁটে পা, এইটুকু একটা হাফপ্যান্ট।

—ইঃ।

ছেলেটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল, চীৎকার করিয়া সঙ্গীদের ডাকিয়া কহিল, তোরা যা, আমি যাচ্ছি। তারপর ফিরিয়া কহিল, চলুন।

খুব টগ্‌-বোট যে আনন্দে ও গর্বে বৃহৎ জাহাজকে টানিয়া লইয়া বন্দরের ঘাট পার করিয়া দেয়, সেই আনন্দে ও গর্বে স্ফীত হইয়া সেই বালক আমাদের আগে আগে পথ দেখাইয়া চলিল।

তাহার সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আয়গাগুলা দেখিলাম, যেখানে যেখানে সাপে মানুষ কামড়াইয়াছে, হাং-সাহেবের পুত্র যেখানে মারা যান, সেখানেও গেলাম। সেখানে বনের ধারে গাছ নাই, দুইধারে নীচু জমি, মাঝখানে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, জনবসতিহীন। তাহারই মাঝখানে ছেলেটি দাঁড়িয়া পড়িয়া ছিল।

ভ্রমণ শেষ করিতে দিনও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ডাক্তার কহিলেন, এবার বাড়ি। চলরে ছেলে।

ছেলেটা কহিল, বাড়ি যাবেন? তবে আর কি, আমিও এবারে চলে যাই।

ডাক্তার কহিলেন, কেন? চল আমাদের সঙ্গে।

ছেলেটা গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। কহিল, না।

ডাক্তার হাসিলেন। কহিলেন, ভয় নেই তোর, যাব যাবে না। কিছু নিতে বলব না তোকে। তবেই ত হ'ল?

সে ছেলে তবুও আসিবে না। ডাক্তার বস্তুত নিজের ইচ্ছাশক্তির জোরেই তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিলেন। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সকলেই ক্লান্ত, হাত মুখ ধুইয়া ঠাণ্ডা হইলাম, ডাক্তারের তাড়া খাইয়া ছেলেটাও শেষ পর্যন্ত বাথরুমে ঢুকিল, কোন মতে হাতে মুখে জল ছোঁয়াইয়া আসিল।

ডাক্তার নিজের হাতে খাবার তৈরি করিলেন। একটি ডিশে বিস্কুট বাদাম মিছরি ইত্যাদি সাজাইয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন। ছেলেটা কিছুক্ষণ কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর কহিল, খাবার দিলেন কেন? বললেন না কিছু খেতে বলবেন না?

ডাক্তার চক্ষু পাকাইয়া কহিলেন, খাবার দেব না বলেছি? নিতে বলেছি? তবে?

ছেলেটা হাসিয়া ফেলিল। কহিল, খাবার দিলে বুঝি নিতে বলা হয় না?

—আমি ত বলিনি। তুইই ভেবে নিচ্ছিস বলেছি। তার মানে, তোর খিদে পেয়েছে। তা, খেতে পারিস ইচ্ছে করলে। খেলে আমি বারণ করব না।

—আমার খিদে পায়নি।

—দেখি তোর হাতটা।

ডাক্তার তাহার নাড়ি ধরিলেন। কহিলেন, আমি একটা কত বড় ডাক্তার, তা জানিস তুই? বত্রিশ টাকা চৌষট্টি টাকা ভিজিট আমার। ভিজিট কাকে বলে, জানিস?

—জানি। মার যখন অসুখ করেছিল, ডাক্তার আসেনি। বলেছিল টাকা না দিলে আসবে না। ডাক্তারকে টাকা দিতে হয়। তাকে ভিজিট বলে।

—কি অসুখ করেছিল, মার?

—তা জানিনে। তখন আমি ছোট। সেই অসুখে ত মা মরে গেল।

ডাক্তার খুব মৃদুস্বরে কহিলেন, আমারও মা নেই। আমরা দুজনে বন্ধু। একসঙ্গে বেড়ালে বন্ধু হয়, জানিস? বন্ধু বন্ধুকে খেতে দিলে না খেয়ে ফিরিয়ে দিতে নেই। তাতে বন্ধু দুঃখ পায়। খাবিনে?

—খাব।

ছেলেটা খাইতে শুরু করিল। তারপর হাত গুটাইল। কি ভাবিল, আমার দিকে একবার চাহিল, তারপর ডাক্তারকে কহিল, কটা বিস্কুট আর বাদাম আমি পকেটে করে নিয়ে যাব? আপনি কিছু বলবেন, নিলে?

—বলব না। কিন্তু নিবি কেন?

—আমার ছোট বোন্ আছে একটা, তাকে দেব।

—বেশ ত। এগুলো তুই খা। তার জন্যে আমি আলাদা করে দিয়ে দেব।

একটা বিস্কুটের টিন ভরিয়া সকল রকম খাবার ডাক্তার তাহার হাতে দিলেন। কহিলেন, নাও বাবা, বাবুনের ছেলের ছাদা বেঁধে দিলাম। এবার দয়া করে খেয়ে ফেল। আমার খিদে পেয়েছে।

—কি করে বুঝলেন আমি বাবুনের ছেলে? নাম ত বলিনি।

—নাড়ি দেখে। বললাম না আমি খুব বড় ডাক্তার?

ছেলেটা নিঃশব্দে খাইতে লাগিল। ক্ষুধা তাহার পাইয়াছে, এবং এ সকল খাদ্য তাহার অপরিচিত বিলাস, তাহা স্পষ্টই বুঝিতেছিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, এই বন্ধু, তোর বাড়িতে কে আছে রে?

—বাবা, ছোট বোন, আমি আর পিসী।

—মা মরে গেল, বাবা আবার বিয়ে করেনি?

—না। পিসী বলেছিল বিয়ে করতে। বাবা বলেছে, শেষে যদি এসে ওদের ঠ্যাঙায়?

—এই কথা বলেছে? হবেই। তোর ত বাবা, রাম বোকা। যাক। শোন, তোর সঙ্গে বন্ধু হল। এই বাড়িটা দেখে রাখ। এটা চিনবি? আবার আসতে পারবি?

—এ বাড়ি ত আমি চিনিই।

—কি করে চিনলি?

—বা, এখানে মাঠ ছিল, আমরা খেলতাম।

—বেশ। আমি আবার আসব এখানে, অনেকদিন থাকব। তখন আবার আসতে হবে তোকে। আমাকে নিয়ে নিয়ে সব দেখিয়ে বেড়াতে হবে। পারবি?

—যদি স্কুল খোলা থাকে?

—তাহলে নয়। স্কুল যেদিন থাকবে না। ঠিক?

—হ্যাঁ। কবে আসবেন?

—সে আমি এলে তখন বলব।

—বা, কি করে বলবেন?

—অত কি আর বোকারে। তোর নাম বাবার নাম এক্ষুনি লিখে নেব না? বল, বানান লিখে নিই।

আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমি এদের বাড়িটা চিনে রেখো একসময়ে।

ছেলেটার খাওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে; আঙুল চাটিতে চাটিতে কি ভাবিয়া লইল, তারপর কহিল,

—আপনি সত্যি বড় ডাক্তার?

—হ্যাঁ, কেন, কার অসুখ করেছে? তো বল। চিকিৎসা করে দেব।

—না অসুখ নেই।

—হয় যদি পরে, বলবি।

—বলব। কিন্তু তাই যদি হয়, আগে কেন এলেন না? তাহলে মা মরত না।

ডাক্তার হঠাৎ গম্ভীর হইলেন। কহিলেন, জানতাম না ত! কিন্তু অসুখ যদি নেই, তবে কেন বললি আমি সত্যি ডাক্তার কিনা?

—বলব?

—বল্।

—আমি ভেবেছিলাম আপনি পুলিশ।

—কেন?

—ডাক্তার হলে ত অসুখ দেখে। কোথায় কি হয়েছে তা দেখে পুলিশরা।

ডাক্তার থতমত খাইয়া গেলেন, তারপর হঠাৎ চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, এইবার আমার মৃত্যু। ধরা পড়ে গেছি।

—সত্যি পুলিশ?

—নারে। বেশ ত, পুলিশই যদি হই, তোর কাছে যদি সাহায্য চাই, দিবি?

—দেব। কি খুঁজছেন আপনি?

—সে বলব, সময় হোক। মনে থাকে যেন, আমি আসব আবার। আর শোন, আজ যে তোকে নিয়ে দেখে দেখে বেড়ালাম, কাউকে বলবি না।

—বলব না। বাবাকে?

—বাবাকে বলবি, তবে এক্ষুনি না। পরে, যখন আমিই বলে দেব। ঠিক?

—ঠিক।

—তোর বন্ধুরা যে আজ দেখে ফেলল আমাদের? তারা যখন জিজ্ঞেস করবে?

—সে আমি একটা বলে দেব।

—আচ্ছা।

ছেলেটির নাম ঠিকানা আমি লিখিয়া রাখিলাম। সে চলিয়া গেল।

ডাক্তার কহিলেন, আমার কাজ শেষ। তোদের ট্রেনে কেটে পড়ছি। তুমি থাকবে? না আমার সঙ্গেই ফিরবে?

—ফিরব। এখনও পনর দিন ছুটি—বসে থেকে কি করব। কেন, কিছু কাজ করবার আছে, এখানে? বলেন ত থেকে যাই।

ডাক্তার একটু ভাবিলেন। কহিলেন, কাজ, বিশেষ কিছু না। ঠিক আছে, ফিরেই চল, থাকে কাজ, পরে ফিরে এলেই হবে।

—আপনি কি সত্যি আবার আসবেন এখানে?

—আসতে হবে বলেই যেন মনে হচ্ছে। দেখি ভেবে, আগে ত কলকাতায় যাই। দরকার যদি হয়, আসব—হয়ত থেকেও যাব কিছুদিন।

—তার মানে? এর মধ্যে কি শুধু সাপের উৎপাত নয়, আরও কোন ব্যাপার আছে?

—বলেছি? সুন্দর জায়গা, আমার বেড়াবার সাধ হতে পারে না? শোন, যা কাজ বলছিলাম। এখন পর্য্যন্ত সাপে কেটে যতজন মরেছে এখানে, তাদের মরার তারিখগুলো ওর ডায়েরিতে আছে। লোকগুলোর পুরো পরিচয় লেখা নেই। তুমি এইগুলো খুঁজে জেনে নেবে। প্রত্যেকের নাম, পরিচয়, ঠিকানা, কে কি কম্‌ত, কার কি বয়স, ইত্যাদি ডিটেইল, যতটা পার। পারবে?

—তা পারব। এক্ষুনি চাই? ত বলুন আমি কালই থেকে যাই।

—না, অতটা জরুরি নয়, দু'চারদিন দেরিতে হলেও চলবে। অবশ্য কাল থেকেও যেতে পার ইচ্ছে করলে, কাজ সেরে ফেললেই কাজ সারা হয়। কিন্তু, কার কাছ থেকে জান্‌বে?

—দেখি। ছেলেদের কাছ থেকেই জানা যাবে বোধ হয়।

—তা যাবে, জানাজানিও হয়ে যাবে কথাটা।

—ভূপতিকে?

—সে অতটা জানবে না। তাছাড়া, ওসব প্রশ্ন করলে তার সন্দেহ হবে।

—তবে?

—তবে, আমার বন্ধু, ঐ ছেলে।

—অতটুকুন ছেলে, ও কি পারবে!

—ওই পারবে। ছোটদের চোখ কান অসম্ভব তীক্ষ্ণ, অথচ ওদের কেউ সন্দেহ করে না। ওকেই ডেকে বলবে খোঁজ খবর ওগুলো যোগাড় করতে।

—বেশ, তাই বল্‌ব।

ভোরের গাড়িতে ডাক্তার চলিয়া গেলেন। আমি সে দিনটা থাকিয়া গেলাম। ভূপতির বাড়িতে খাইয়া গড়াইয়া গোটা দুই দিন কাটিয়ে দিলাম। তাহারই মধ্যে এক ফাঁকে ছেলেটাকে আবিষ্কার করিয়া তাহাকে কাজের ভার বুঝাইয়া দিলাম। সে দুইদিন পার না হইতে একটি খাতার ছেঁড়া পাতায় ট্যারাব্যাঁকা অক্ষরে লেখা গোটা পাঁচ ছয় নাম ও তাহাদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে যথাসম্ভব বিবরণ আনিয়া আমাকে পৌঁছাইয়া দিল।

আমি কহিলাম এত শিগগীর হয়ে গেল? ভুল লিখিসনি ত?

—না। আপনি মিলিয়ে দেখবেন।

—কিন্তু, তুই এত খবর কোথা থেকে যোগাড় করলি?

—সে, করে নিলাম।

বুঝিলাম, ডিটেকটিভের যোগ্য সাকরেদ বটে।

কাগজটা লইয়া আমি কলিকাতায় ফিরিলাম। ডাক্তার কাগজটা লইয়া রাখিয়া দিলেন, কোন মন্তব্য করিলেন না।

আরও দিন দশেক পরে কলেজ খুলিল। আমি কর্ম্মস্থলে ফিরিলাম। আমার সঙ্গে ডাক্তারও গেলেন, আমার ঘরের পাশের ঘরটা তাঁহার জন্য ঠিক করিয়া লইলাম। এক চাকরকে লইয়া গিয়াছিলেন, ঘরেই রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থা খাড়া হইয়া গেল।

আমি কলেজে যাই বাড়িতে থাকি, কাজকর্ম করিয়া বেড়াই। ডাক্তার কখনো বা বসিয়া বসিয়া বই পড়েন কখনও বা শহরে ঘুরিয়া বেড়ান। তাহার সে বন্ধুকে তিনি আসিয়াই খুঁজিয়া লইয়াছেন, অনেক সময়ে সে তাঁহার সঙ্গী বা গাইড হয়। তাহার নাম বিরজন। ছেলেটা শুধু সপ্রতিভ হয়, অত্যন্ত প্রখর বুদ্ধি—দরিদ্রের ছেলে, জীবনে লেখাপড়া বা অন্য অনেক প্রগতির দরজাই তাহার রুদ্ধ, কিন্তু সুযোগ পাইলে সে অদ্ভুত বড় হইতে পারিত তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

ডাক্তার তাহাকে লইয়া চলে যান বেড়াতে, দুই বন্ধুতে কি গল্প কি তত্ত্বের আলোচনা হয় তাহা তাঁহারাই জানেন। শহরের লোকজনের সঙ্গেও ডাক্তার অনায়াসে আলাপ করিয়া লইয়াছেন—তাঁহার প্রকৃতি ও শহরের সাধারণ প্রবৃত্তি দুইটি তাহার অনুকূল; তাহার উপর আমার ডাক্তার আমার আত্মীয় ও ভূপতির বন্ধুব্যক্তি। ডাক্তার কোথায় যান কি করেন আমি জিজ্ঞাসা করি না; তাঁহার ইচ্ছা হইলে কিছু বলেন, অনেক সময়েই

বলেন না। একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলাম সাপের হদিশ কিছু পেলেন? ডাক্তার কহিলেন বিষ analyse করে আভটা পেয়েছি। গর্তের সন্ধানটা এখনও পাই নি।

—পাবেন?

—আশা ত করি।

—কিন্তু এভাবে খুঁজে কি সত্যি সাপ পাওয়া যাবে?

—ডাক্তার কহিলেন, চেষ্টা করতে দোষ কি। ফল আশা না করলেই হল, পণ্ডশ্রমের দুঃখ মনে লাগবে না।

একদিন বলিলেন, রায়সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল।

কহিলাম, কোথায়?

—আমিই গিয়েছিলাম। মহৎ ব্যক্তি।

—সে কি। শহরের লোক যে বলে রায় কৃপণ, অর্থলোভী।

—প্রেফ হিংসা। আমি অপরিচিত লোক, আমাকে ত নিদারুণ খাতির করলেন। প্রচণ্ড কর্মশক্তি ভদ্রলোকের। অদ্ভুত determination। পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছেন, কলকাতা বোম্বাই হলে কাণ্ড করে ফেলতে পারতেন।

—তা এই বা কম করেছেন কি। এই পাড়াগাঁয়ে লক্ষপতি হলে যে ঐশ্বর্য আর মান, কলকাতায় বোম্বাইতে কোটিপতি হলেও ততটা হবে না, ততজনে চিনবে না।

—তা বটে। তোমার সঙ্গে আলাপ নেই মনে হল।

—নেই। দূর থেকে দেখেছি।

—চেহারাটা লক্ষ্য করেছ? বড়ো, রাউণ্ড, জাদ্‌। অত্যন্ত জোয়ালো জ-লাইন। প্রচণ্ড জিদ আর কর্মশক্তির পরিচয়।

—হ্যাঁ, লোকে তাই বলে। আমারও দেখে তাই মনে হয়েছিল। যা করবেন স্থির করেছেন তা থেকে নাকি কিছুতেই বিচলিত হন না।

—For right, or for wrong। কি বল?

ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়া আবার সহজ হইয়া গেল।

আমার মন ছাৎ করিয়া উঠিল। ডাক্তার কি হঠাৎ কোন রহস্যের আভাস দিলেন?

কিন্তু আমি কোন পাল্টা প্রশ্ন করিবার পূর্বেই ডাক্তার কথার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন, সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন।

আমার মনে কিন্তু কথাটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাক খাইতে লাগিল। রায়সাহেবের নামডাক আছে, দুর্নামও আছে। থাকে, বড়লোক মাত্রেরই স্তাবক ও বিমুখ দুইই অনেক। কিন্তু, ডাক্তার হঠাৎ গায়ে পড়িয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছেন, নিশ্চয়ই অমন কৌতূহলে নয়। কি উদ্দেশ্য? কোন্ সংবাদ বা সিদ্ধান্তের আশায়? আসিয়াছেন একটা বন্য জন্তুর উপদ্রবের তথ্য সন্ধানে। তাহার সঙ্গে রায় সাহেবের কি সম্পর্ক? তাঁহার পুত্র মরিয়াছে। কিন্তু ডাক্তারের কথায় লক্ষ্য সেটা নয়। রায়সাহেব দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি—for right or wrong—অর্থাৎ ন্যায় হউক অন্যায় হউক যেটা করিতে চাহেন করিয়া তবে ছাড়েন। এই মন্তব্য কেন করিলেন ডাক্তার? কোন্ অন্যায় পাইলেন রায়সাহেবের? রায়সাহেব সাপ পুষিয়া রাখিয়াছেন, সেই সাপ মানুষ কামড়াইতেছে? এ নিশ্চয়ই নয়। হয় শুনিয়াছি—পোষা সাপ দিয়া মানুষ বধ করার কৌশল প্রচলিত আছে, হয়ত এখানেও আছে। কিন্তু সেভাবে ব্যবহার করা হয় ক্ষুদ্র আকৃতির তীক্ষ্ণ বিষ সাপ—ব্ল্যাকস্নেক, যাহাকে লম্বা বাঁশের চোঙার মধ্যে লইয়া বেড়ানো যায়। এ সাপ তাহা নয়। শঙ্খচূড় যদি সত্যই হয়। তাহাকে পোষ মানানো মানুষের অসাধ্য। আর, সত্যই যদি এটা শত্রু নিপাতের ব্যাপার হয়—অসম্ভব নয়। শুধু সাপের উপদ্রব মনে করিলে ডাক্তার এতখানি উৎসাহিত হইতেন কিনা সন্দেহ। যদি হয়ই—সাপ দিয়া কেহ শত্রু নিপাত করিতেছে,—রায়সাহেবের সঙ্গে তাঁহার কি সম্পর্ক? হইতে পারে তিনি জিদী লোক। কিন্তু যাহারা মরিতেছে তাহাদের উপরে তাঁহার এতবড় আক্রোশ হইবে কেন? একজন শুনিলাম,

কোঅপারেটিভের কেরাণী। তাহার কাজ দশ বিশ একশত টাকার হিসাব রাখা। রায়সাহেবের গায়ে এতবড় আঘাতের যোগ্য কাজ সে নিশ্চয়ই করে নাই—রায়সাহেবের বিরোধী হইবার সাহস তাহার হইবে, ইহাই অবিশ্বাস্য। তাহার চেয়েও বড় কথা, অন্য একজন রহিয়াছে যে রায়সাহেবের নিজের ছেলে, একমাত্র বংশধর। তাহাকে বধ করিবার ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছেন? অদ্ভুত কল্পনা। অথচ যদি মনে করি ডাক্তার এই ব্যাপারের সঙ্গে তাহাকে কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট মনে করিতেছেন, তবে কল্পনা এই পর্যন্ত না গড়াইয়া পারে না। আর, যদি সমস্তটাই আমার ভুল হয়। এরকম কোন রহস্যের ব্যাপার যদি নাই থাকে, তবে কেন ডাক্তার মিছামিছি এখানে বসিয়া কাল কাটাইতেছেন, কেন সাধিয়া রায়সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিতে গিয়াছেন? কি বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে?

ভাবি, কূল পাই না। স্বস্তিও পাই না। ডাক্তার নিজে হইতে না বলিলে প্রশ্ন করা বৃথা। তবুও একবার চেষ্টা করিলাম, অন্য কথার প্রসঙ্গে হঠাৎ বলিলাম, রায়সাহেবকে কি আপনি সন্দেহ করছেন কোনরকম?

ডাক্তার বিস্মিত হইলেন। কহিলেন, সন্দেহ করছি? কিসের সন্দেহ?

আমি আমতা আমতা করিয়া কহিলাম, না, মানে এই—

—তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। হবেই, ক্রমাগত কুসঙ্গ করার ফল। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ধারণা হয়েছে আমি যাই করি তাই পুলিশের মত ক্রিমিনাল ডাক দিয়ে।

—বোধ হয় তাই। কিন্তু, এর মধ্যে যদি কিছু গোলমাল নাই থাকে, তবে আপনি—

—কেন এখানে এসে বসে আছি? বেশ, না থাকলাম। সাপে মানুষ খাচ্ছে বলেছিলে, দেখতে এসেছিলাম কি সাপ বুঝতে পারি কিনা। তোমারই বন্ধুর গরজে। এসে, জায়গাটা দেখে ভাল লাগল। বুড়ো হচ্ছি, একটু-আধটু তপোবনে যাবার ইচ্ছে জাগে মাঝে মাঝে। ভাল লাগল, ভাবলাম, থেকে আসি জায়গাটাকে দিনকতক। সইল না, তোমাদের পাপ মন, কু-অভিপ্রায়ের হদিশ খুঁজছ। বেশ, কালই কেটে পড়ছি না হয়।

—তাই বলেছি?

—আর কিরকম করে বলে? রায়সাহেব, বিজ্ঞ ব্যক্তি। সকলের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, স্বয়ং সরকার বাহাদুরের জানিত ব্যক্তি। তাঁরও সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ হয়েছে, এ বলা মানে আমাকে ঘেরে তাড়াতে চাওয়া নয়?

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

ডাক্তার কহিলেন, আরও কাউকে বলেছ নাকি। আমার সম্বন্ধে তোমার এই বদ্-ধারণার কথা?

—আর কাকে বলব।

—বোলো না। বললে দুজনকেই মার খেয়ে পালাতে হবে এখান থেকে।

প্রায় একমাস কাল সেখানে থাকিয়া, ডাক্তার কলিকাতায় ফিরিয়া গেলেন। তখন ঘোর বর্ষা নামিয়াছে, সে বৃষ্টিতে ঘরের বাহির হওয়া দুঃসাধ্য। আমি কহিলাম, কিন্তু এই বর্ষাতেই ত সাপের উপদ্রব বাড়ে।

ডাক্তার কহিলেন, তার কিছু ঠিক নেই। যে সাপ শীতেও ঘুমে না, সে বর্ষাকেই বা বিশেষ মান্য দেবে কেন। আর, কামড়ায় যদি, খবর দিও, আবার এসে দেখব তার খোঁজ পাই কিনা। বেকার বসে থেকে আর কি হবে।

ডাক্তার যেদিন চলিয়া যাইবেন, ঠিক তাহার আগের দিন পুণ্যব্রত হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল। ডাক্তারের সঙ্গে তাহার পরিচয় করাইয়া দিলাম। সে কহিল, ভূপতির মুখে আপনার নাম শুনেছি। আপনি কি সত্যি অ্যানালাইজ করতে পেরেছেন, সাপটা কি জাতের?

ডাক্তার কহিলেন, কোথায় গ্রুপ বুঝতে পারছি। কিন্তু তার ত ভ্যারাইটি অনেক। মৃতদেহ থেকে ত আর খাঁটি বিষটা পাওয়া যায় না, পেয়েছি তার ক্রিয়েটেড্ রিয়াম। আরও কেস কেস পেলে সহজ হত।

তারপর কহিলেন, তোমারও ত রাগ আছে সে সাপের ওপরে। তোমার একটা ভাল কেস্ নষ্ট করে দিয়েছে।

—হ্যাঁ। অবশ্য এসব রিস্কের জন্যে কোম্পানী প্রস্তুতই থাকে। তবুও, পুরো আধলাখ টাকা বেরিয়ে গেল কোম্পানীর, গেলও আমারই হাত দিয়ে। এটা গায়ে বাজে।

ডাক্তার কহিলেন, বাজবেই। to any conscientious worker। তুমি তাদের কি, organiser, না salesman?

—Salesman, organiser হতে বলেছিল, আমি রাজি হইনি। আমার এই ভাল লাগে, বেশ ঘুরে ঘুরে বেড়াই।

—ঘর ছেড়ে ক্রমাগত বেড়িয়ে বেড়াতে ভাল লাগে?

—ঘর আমার নেইই কিছু।

অত্যন্ত সহজে বলিল কথাটা।

তারপর কহিল, যাই, আবার আসব।

ডাক্তার কহিলেন, আবার কবে আসছ, আমি ত চলে যাচ্ছি কাল।

—কালই?

—হ্যাঁ। তাতে কি—কলকাতায় যাও ত? যেয়ো আমার ওখানে।

পুণ্যব্রত কহিল, যাব।

চলিয়া গেল। ডাক্তার কহিলেন, চমৎকার ছেলেটি।

আমি কহিলাম, হ্যাঁ, সত্যি চমৎকার।

ডাক্তার কহিলেন, ঘর নেই বলছে কেন? সত্যি নেই কেউ? না রাগ করে বেরিয়ে এসেছে?

কহিলাম, কিছু জানিনে। কিন্তু কথাটা আগেও বলেছে আমাকে।

ডাক্তার কহিলেন, যা নেই মনে হল।

—মনে হল মানে?

মনে হল। ছেলেবেলা থেকে যা থাকে না যাদের, তাদের মনে একটা চাপা দুঃখবোধ থেকে যায়। বাইরের হাসিখুশিতে ঢাকা পড়ে না। এরও তাই আছে মনে হল।

—নিরঞ্জনের যেমন?

—হ্যাঁ। তবে, নিরঞ্জনের সংসার নেই। এর হয়ত তাই আছে।

—কি জানি।

—ভূপতি জানে?

—জানতে পারে। জিজ্ঞেস করব তাকে?

—কিছু দরকার নেই।

—জানা যেত।

—জেনেই বা কি হত?

পরদিন ডাক্তার কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

আরও মাসখানেক কাটিয়া গেল। বর্ষা পূর্ণ উদ্যমে নামিয়াছে। শহরের প্রান্তবর্তী নদীটি তীর ছাপাইয়া শহরে প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে; শহরের মধ্যেও যেগুলা নীচু অঞ্চল তাহার পথে মাঠে জল দাঁড়াইয়া যাইতেছে। সারাদিন বৃষ্টি। নেহাৎ যেটুকু প্রয়োজন তাহার বেশী প্রায় বাহিরে যাই না—যাওয়াই যায় না। এই একমাসে ডাক্তারও আর কোন চিঠিপত্র দেন নাই। যাইবার সময় ভূপতির ডায়েরিগুলা রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেগুলা ভূপতিকে ফিরাইয়া দিয়াছি। সর্প সমস্যার কোন সমাধান খুঁজিয়া পাইলেন কিনা কিছুই জানিনা। ভূপতিকে কিছু বলিয়াছেন কিনা সে সম্বন্ধে, তাহাও আমার অজ্ঞাত। সম্ভবত বলেন নাই, কারণ বলিলে ভূপতি আমাকে বলিত। ক্লাশ ছাড়া কথার কিছু নাই, একা ঘরে নিঃসঙ্গ ও বেকার দিন কাটিতেছে।

এমনই এক দিনে অকস্মাৎ ভূপতি আসিয়া হাজির হইল। কয়েকদিন তাহার সঙ্গে দেখা হয় নাই—বা বৃষ্টি, কাহারও সঙ্গেই কাহারও দেখা হইয়াছে কিনা সন্দেহ লাগে।

সে আসিল, চিঠিটা সশব্দে পড়িতেছে।

কহিলাম, চমৎকার। ডাক্তারেরা অন্যকে চিকিৎসা করিতে বারণ করে। ডাক্তারদের নিজেদের অসুখ করা নিশ্চয়ই নিষেধ?

সে কহিল, কদিন বেরুইনি। আজ বেরুতেই হল। বিশেষ দরকারে।

—দরকারটা কি?

—বাড়ি যাচ্ছি।

—কবে?

—কাল ভোরে। কিছুদিন থাকতে হবে মনে হচ্ছে।

—হঠাৎ? ব্যাপার কি?

—সেরকম কিছু নয়। বড়দা লিখেছেন। তাঁর শরীর হঠাৎ খারাপ করেছে। কাজেই দিন সাতেকের একটা ছুটি চেয়ে নিয়ে ছুটলাম। বড়দা নিজের কথা কখনও বলেন না। যখন লিখেছেন তখন বিশেষ অসুস্থ হয়েছেন বলেই ভেবে নিচ্ছি।

—সাতদিন থাকবে?

—বিশেষ কিছু নয় যদি দেখি হয়ত আগেই চলে আসব। সীরিয়াস কিছু বুঝলে ছুটি বাড়িয়ে নেব। বা হয়ত তাঁকেই সুদ্ধ নিয়ে চলে আসব।

—তা বেশ। গিয়ে চিঠি দিও কি অসুখ, কেমন আছেন। আমার সঙ্গে ত বহুকাল দেখা নেই।

—নিশ্চয় দেব চিঠি। আর একটি কাজ চাপিয়ে যাব আপনার ঘাড়ে। আমার এই ক'দিনে চিঠিপত্র যা আসবে, পোস্ট অফিসকে বলে যাচ্ছি সব আপনার এখানে দিতে। যদি আসে, আপনি সেগুলো আমাকে রিডাইরেক্ট করে দেবেন। জরুরি চিঠি থাকতে পারে। ঠিকানাটা মনে আছে আপনার?

—আছে।

—মিটে গেল। তাহলে চলি দাদা।

পরদিন রাত্রি তাহার টেলিগ্রাম পাইলাম, বড়দা বিশেষ অসুস্থ, ছুটি বাড়াইলাম।

এবং ঠিক তাহার পরদিন পুণ্যব্রত আসিয়া উপস্থিত হইল।

সে অকস্মাৎ আসে অকস্মাৎ চলিয়া যায়, নিজেও বোধহয় ভাল করিয়া জানে না দুইদিন পরে কোথায় থাকিবে বা যাইবে। স্টেশন হইতে ভূপতির বাড়িতে গেল, দেখিল সে নাই। আমার কাছে চলিয়া আসিল। আমি কহিলাম, এবার ভূপতি ফিরবে না এখানেই থেকে যাও। ক'দিন থাকবে?

—ঠিক নেই। তবে এবারে একটু বেশীদিন থাকা দরকার হতে পারে। ধরুন দিন সাতেক, বা আরও বেশী। অসুবিধে হবে?

—কিছুমাত্র না। বরং সুবিধেই হবে, বাইরে বৃষ্টি। আড্ডা দিয়ে বাঁচব।

আমার পাশের ঘরটিতে ডাক্তার থাকিয়া গিয়াছেন, পরিষ্কার করাই ছিল ঘরটা। সেই ঘরে তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলাম। দোতলার অন্য বাসিন্দা তখন অনুপস্থিত, পুরা দোতলাটাই আমাদের।

খোটা-পাঁচেক দিন অতি আনন্দে কাটিল। সকাল-বেলা সে বাহিরে যায় আমি ক্লাসের পড়া তৈরি করি, রান্না করি। দুপুরে সে ঘরে বসিয়া পড়ায় বা বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়, আমি কলেজে যাই, বিকাল হইতে রাত্রি দশটা পর্যন্ত আড্ডা চলে। আড্ডা জমাইবার জন্য বহু লোকের প্রয়োজন যাঁহারা বলেন তাঁহারা ভুল বলেন—সত্যকার নিবিড় আড্ডা দুইজনেই জমিতে পারে। যেখানে বক্তা আর শ্রোতার মধ্যে তৃতীয় কোন অমনোযোগী বা অধান্তর তৃতীয়ের ব্যবধান নাই। পুণ্যব্রত সু-আলাপী জানিতাম, সে সু-গায়ক এবং অতি অনায়াসে অনাড়ম্বরে অতি চমৎকার গায়, সেটা আবিষ্কার করিলাম। চার পাঁচটা দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল টেরই পাইলাম না—একটা কথা ভাবিয়া শুধু ক্ষণে ক্ষণে মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—এই ত গেল, আর কটা দিন বা সে থাকিবে!

ভূপতির নামের চিঠিপত্র রোজই একগাদা করিয়া দিয়ে যায় পোষ্টম্যান। কতগুলা থাকে ঔষধের বিজ্ঞাপন বা পরিচায়ক পত্র। ডাক্তারের তাহা অনিবার্য প্রাপ্য। কতক বা থাকে ব্যক্তিগত বা অফিশিয়াল। বিজ্ঞাপন-

গুলা একপাশে জমাইয়া রাখি। চিঠিগুলা ঠিকানা কাটিয়া ডাকে দিই।

বোধ হয় চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে, ডাক বাহিতে বাহিতে পুণ্যব্রতর নামের দুইটি চিঠি বাহির হইল। পুণ্যব্রত, কেয়ার অব ভূপতি। কহিলাম, এই নাও।

সে হাত বাড়াইয়া চিঠি দুইটি লইল। একটি অফিশিয়াল নাম, সম্ভবত তাহার কাজ সংক্রান্ত। অন্যটি ব্যক্তিগত চিঠি। প্রথমটিকে এক পাশে রাখিয়া দিয়া সে দ্বিতীয়টি হাতে লইল, উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কহিল, এ আবার কে রে বাবা।

তারপর নাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। ছোট একটি চিঠি, তাঁজ করা। আমি অবশ্য চিঠিটা দেখার চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু হঠাৎ লক্ষ্য হইল চিঠিটা পড়িয়া সে ভ্রূ ঈষৎ কুঞ্চিত করিল, একবার জানালা দিয়ে দূরের দিকে তাকাইয়া, যেন কিছু স্মরণ করিবার চেষ্টা করিল। আবার দৃষ্টি ফিরাইয়া চিঠিটা পড়িল, খামে পুরিয়া সেটা পকেটে রাখিল, অন্য চিঠিটা খুলিয়া পড়িল, তারপর হঠাৎ কহিল, হুম্। আচ্ছা যারা আর কপালে লইল না, যাক। ছুটতে হবে।

কহিলাম, হুকুম বুঝি?

—হাঁ। কর্তারা স্মরণ করেছেন।

—কোথায়?

—মসজিদ অবধি।

তাহার কোম্পানীর ভারতীয় হেড্ অফিস বোম্বাইতে, জানিতাম। কহিলাম, কবে যাবে?

দাঁড়ান, এখানকার কাজগুলো সেরে নিই আগে। লিখেছে অবশ্য ইমিডিয়েটলি—তার আর কি হবে। একটা চিঠি ছেড়ে দিচ্ছি যেরি হবে বলে।

—চটে যাবে না ত?

—যাক না বটে। আমি তাদের best salesman যাব অন্য কোম্পানীতে চলে।

ইহার পর চার-পাঁচটা দিন তাহার প্রায় দেখাই পাইলাম না। ভূপতির সাইকেলটা সে লইয়া আসিয়াছিল। সমস্তদিন বাহিরে বাহিরে কাটায়? রাত্রে যখন বাড়ি ফেরে তখন বিষম ক্লান্ত, কথাবার্তা না বলিয়া শুইয়া পড়িতে চায়, আমিও তাহাকে তাড়া দিই শুইয়া পড়িতে। একবার প্রশ্ন করিলাম, এত ঘুরছ কোথায়?

সে কহিল, বম্বেতে গেলে হয়ত ওরা আটকে রেখে কিছুদিনের মত, বা অন্য কোন কীল্ডে পাঠিয়ে দিতে চাইবে। তাই এখানে যেসব প্রস্পেক্ট বা আধা সারা প্রোপোজাল আছে সেগুলো তো সম্পূর্ণ করে রেখে যাচ্ছি।

—কিন্তু, অন্য কীল্ডে যদি পাঠায়, মাঝে মাঝে এখানে না এসে কি থাকতে পারবে তুমি? এমনি ত মাসে দুমাসে একবার আসতে।

—পারতেই হবে।

—এখানটা ভাল কীল্ড ছিল?

—খুব, সেইজন্যেই আসি। সস্তায় চাবী আর টি-গার্ডেনের সেয়ার-ওয়ালার দেশ। খুব ভাল বিক্রী হয়।

—যেবে এবার ঘাস মাড়োয়ারে পাঠিয়ে। তারা বছরে একশ টাকারও পালসি কিনবে না।

—বেশ ত, দেখিই না গিয়ে কেনে কি না কেনে। মৃত্যুঞ্জয় নেই এমন মানুষ কোথায়?

আরও দুইতিন দিন। সেদিনটা শুক্রবার মনে আছে। শহর হইতে মাইল কুড়ি দূরে একটা খুব সুন্দর মন্দির আছে, জায়গাটা মনোরম, দূর হইতেও লোকে দেখিতে আসে। আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, ভাল শনিবার বিকালের দিকে তাহাকে লইয়া সেখানে চলিয়া যাইব, রবিবারটা কাটাইয়া আসিব। আমার এক সহকর্মীর বাড়ি সেখানে তিনি শনিবারে বাড়ি যান—কোন অসুবিধা হইবে না। সত্যিই যদি বোম্বেতে গিয়া আটকাইয়া পড়ে। আর হয়ত আসিবে না। আর হয়ত দেখাই হইবে না জীবনে।

সেদিন খুব ভোরে উঠিয়া পুণ্যব্রত বাহির হইয়া গিয়াছে। বেলা নয়টায় ডাক আসে। ডাক্তারের

একটি চিঠি আসিল, শনিবার ভোরে পৌঁছিতেছি। পুণ্যব্রত বাড়িতে ফিরিল বেলা প্রায় একটায়। আমার দু'টায় ক্লাস, আমি তখন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি। কহিলাম, এত দেরি করলে? যাও, তোমার খাবার ঢাকা আছে।

পুণ্যব্রত কহিল, আমি খেয়ে এসেছি এক জায়গাতে। কাল ভোরের ট্রেনে দুর্গা বলুর।

—সে কি!

—হ্যাঁ। কাজ সারা হয়ে গেল, আর দেরি করে কি হবে। কাল কলকাতায় যাব। রবিবার দিনটা থেকে, রবিবার রাত্রের ট্রেনে বম্বে ছুটব।

—বাঃ। আমি প্ল্যান্ করে রেখেছি কাল বিকেলে দুজনে সেই মন্দিরে যাব। তোমার সঙ্গেও ত তাই কথা ছিল।

—তা ত ছিল। কিন্তু—

—আরও আছে। ডাক্তার বোস লিখেছেন, তিনিও এসে পড়ছেন কাল ভোরে। এই দেখ তার চিঠি। যাও না আর কটা দিন থেকে। খুব কি অসুবিধে হবে?

—কিন্তু আমি যে তাদের জানিয়ে দিয়েছি, যাচ্ছি বলে।

—তা না হয় আবার লিখবে দেরি হবে বলে। মানুষের অসুখও ত করে।

—পুণ্যব্রত অন্যমনে কহিল, তা করে। কিন্তু একবার বলে আবার 'না'-বলতে আমার খারাপ লাগে।

আমি আর কিছু বলিলাম না। পুণ্যব্রত বাথরুমে চলিয়া গেল। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে স্নান সারিয়া, মাথা মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া আসিল। কহিল, আপনি এখন বেরুচ্ছেন, সোজা বাড়ি ফিরবেন ত?

—না, দেরি হবে। স্কুলে একটা কি মীটিং আছে। বার বার করে বলেছে যেতে। কলেজ থেকে বেরিয়ে সেখানে যাব। ফিরতে বর সোটা আটেক। তুমি? তুমি কি আবার বেরুবে? কাজ শেষ হয়নি?

—কাজ নেই, তবু বেরুব একবার বিকেলের দিকে। তুলসির সাইকেলটা নিয়ে আসতে হবে।

—তার জন্যে নাই বা গেলে, কি দরকার। ওটা না হয় আমি কাল পৌঁছে দেব।

—থাক না, আমিই দিয়ে আসি। অমনি টাউনটাকে দেখে আসব আরেকবার।

সহজ কথা। কিন্তু এই শহরের উপরে কী প্রচণ্ড মমতা তাহার, দীর্ঘ বক্তৃতায় সে কথা ইহার চেয়ে বেশী ব্যক্ত হইত না। কহিলাম, যাও তাই। ফিরতে দেরি হবে?

—না, আমারও ঐ আটটা-নটা জোর।

—তুলসি কবে আসবে, কিছু শুনলে?

—না। এসে তাকে বলবেন।

কলেজের পরে মীটিংএ গেলাম। সেখান হইতে বাহির হইলাম, তখন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। স্কুলটি শহরের প্রায় বাহিরে ও আমার বাড়ি হইতে বেশ কিছু দূর। পুণ্যব্রত চলিয়া যাইবে, আমারও শীঘ্র বাড়ি ফেরার তাড়া। মীটিং বহুজনের নয়। জোর জন চল্লিশেক লোকের। বেশির ভাগই বড় রাস্তা ধরিলেন। একটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত পথ আছে আমার বাড়ির দিকে যাইবার—তাহার পাশে বসতি প্রায় নাই। ঝোপঝাড়ও কিছু আছে, আমি সেই পথটি ধরিলাম। স্কুলের গেটে হেডমাস্টার মহাশয় একটু আটকাইলেন, ফলে আমি যখন সে পথে পা দিয়েছি তখন আমার পিছনে প্রায় লোক নাই। পথও নির্জন। কিছুটা সেইজন্য, তাহা ছাড়া স্বভাববশেই আমি দ্রুত হাঁটি—বাড়ি ফেরার তাড়াও আছে—আমি অত্যন্ত দ্রুত পদে হাঁটিয়া চলিলাম।

সুরকির পথ। আমার সেকালে ক্রেপসোলের জুতা পরা অভ্যাস ছিল, ফলে দ্রুত চলিলেও আমার পায়ের কোন শব্দ উঠিতেছিল না।

সে রাস্তাটি আধ মাইল লম্বা, তারপর গিয়া আবার বড় রাস্তায় উঠিয়াছে। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গাতে একটা বড় ঝোপ। ঠিক সেইখানে রাস্তাটাও একটু বাঁকিয়া গিয়াছে।

আকাশে মেঘ, সামান্য চাঁদের আলো কিন্তু সে আলোতে প্রায় কিছুই দেখা যায় না। এমনিই আমার তাড়াতাড়ি। নির্জন পথে নামিয়া বোধহয় সেই সাপের ভয়ও মনে পড়িয়াছিল, আগে মনে হয় নাই। আমি যথাসাধ্য বেগে চলিয়াছি। ঝোপটার পাশ ঘুরিয়া রাস্তার অন্যদিক বরাবর আসিল। হঠাৎ দেখিলাম আমার প্রায় হাত পঞ্চাশেক সামনে, রাস্তার উপরে কিছু একটা কাণ্ড চলিতেছে। স্পষ্ট কিছু দেখিতে পাইনা, আবছায়া আলো আঁধারে মনে হইল যেন একটা খুব মোটা মানুষ, পথের উপরে দাঁড়াইয়া মাতালের মত এপাশে ওপাশে টলিতেছে।

আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম। একটু ভয়ও লাগিল। ভূত কি জানি না, কিন্তু কি ওটা?

পরক্ষণেই ডানদিকে একটা ঝোপের আড়াল হইতে একটা অত্যন্ত জোরালো টর্চের আলো আসিয়া সেই ছায়ামূর্তির উপরে পড়িল। স্পষ্ট দেখিলাম দুইজন মানুষ ধস্তাধস্তি করিতেছে। অতদূর হইতে মুখ দেখা যায় না—দুইজনই সাধারণ জামাকাপড় পরা। একজন পিছন হইতে বাম হাতে অন্যজনের কোমর বা পেট জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার ডান হাতটা আস্ত্রা। সে হাতটা দিয়া সে অন্য দিক দিয়া জড়াইয়া ধরিতে চাইতেছে। আক্রান্ত ব্যক্তি তাহার আলিঙ্গন ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে।

আমি। এই এই—চোর চোর বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলাম। মারামারি করিয়া খাই। গলার জোরটা আছে। চতুর্দিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে আমার গলা বোধহয় আরও বেশী জোরালো শুনাইল। চীৎকার করিতে করিতেই আমি দৌড়িয়া সেইদিকে অগ্রসর হইলাম, কিন্তু কয়েক পা না যাইতেই টর্চের আলোটা ঘুরিয়া আসিয়া আমার মুখে পড়িল। আমার চোখ ধাঁধাইয়া দিল। আমি অন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। আলোটা আমার চোখে একবার পড়িয়াই নিভিয়া গেল। আর জ্বলিল না।

ঘুরে অন্ধকারে শুধু একটা পদশব্দ পাইলাম, কেহ ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছে, একটু পরেই সে পদশব্দ মিলাইয়া গেল। একটা ক্ষীণ আর্তনাদ কানে আসিল। রাস্তার উপরে পড়িয়া কেহ কাৎরাইতেছে। নিশ্চয় সেই আক্রান্ত ব্যক্তি।

আমি চক্ষু ডলিয়া লইলাম। সেইদিকে অগ্রসর হইলাম। পিছন হইতে জনদুই লোক ছুটিয়া আসিতেছে টের পাইলাম—সম্ভবত আমার চীৎকারই টানিয়া আনিয়াছে তাহাদের। একজনের হাতে টর্চ।

তাহারা এবং আমি একই সঙ্গে অকুস্থলে পৌঁছিলাম। লোকটি তখনও মুখ গুঁজিয়া মাটিতে পড়িয়া আছে। তাহাকে ধরিয়া তুলিলাম। আঘাত কিছু নয়, আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন ভদ্রলোক। অপরিচিত নন, যদিও আলাপ ছিল না। ঐ স্কুলেরই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হেডমাস্টার। বয়স ষাটের কাছে। তিনিও মিটিংএ ছিলেন, আমার কিছু পূর্বেই ঐ পথ ধরিয়া বাড়ি ফিরিতেছিলেন।

কোলাহলে আরও দু'একজন করিয়া লোক জড়ো হইল। ভদ্রলোকও মানুষ দেখিয়া ক্রমশ আশ্বস্ত ও সুস্থ হইলেন। নানাজনের নানা প্রশ্নের উত্তরে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝিলাম, পথের মধ্যে পিছন হইতে হঠাৎ কেহ তাঁহাকে ধরে। অকস্মাৎ আক্রমণে তিনি ভয়ে অভিভূত হইয়া যান, সেই অবস্থাতেই নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন।

গুণ্ডার আক্রমণ, সন্দেহ নাই। লোকেরা তাঁহাকে সুস্থ করিতে লাগিল, বাড়িতে পৌঁছিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। আমার আর কিছু করার ছিল না। আমি সেখান হইতে সরিয়া পড়িলাম।

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিলাম, পূর্ণাবতী তাহার আগেই ফিরিয়াছে। কহিলাম, কখন ফিরলে?

সে কহিল, এক্ষুনি।

—যাওয়ার পরে আমি কহিলাম, কাল যাওয়া হবে?

—হ্যাঁ, দাদা। লিখে দিয়েছি। সেটা খেপাপ করব না।

—বেশ। আর না জেগে তাহলে শুয়ে পড়। আবার ভোরে উঠতে হবে। শুনো, স্টেশন যাবার জন্যে ত একটা লোক বলে রাখতে হয়। তুমি একটু বোস, আমি হোটেলের চাকরটাকে বলে আসি।

—দরকার নেই। আমি এক রিকশওলাকে বলেছি, সে আসবে ঠিক সময়ে।

—বেশ, তুমি দেরি না করে শুয়ে পড়। আমি ঠিক টাইমলি ডেকে দেব তোমাকে, নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে যাও।

—তাই যাব। বলিয়া সে সহসা মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। মনে হইল কিছু বলিবে। আবার থামিয়া গেল।

কহিলাম, কিছু বলছিলে?

—না।

ভোর পাঁচটায় ট্রেন। আমি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়া শুইলাম। ঠিক পৌনে চারটায় জাগিয়া উঠিলাম। পুণ্যব্রতর দরজায় গিয়া ডাকিলাম। সে জাগিল না। ভাবিলাম আহা বেচারী, ঘুমাক না আরও একটু—এই কয়দিন বড় খাটিয়াছে। আর, কতক্ষণই বা লাগিবে তাহার প্রস্তুত হইতে—সে উঠিয়া যতক্ষণে হাতমুখ ধুইবে খাবার খাইয়া লইবে, আমি ততক্ষণে তাহার বাক্সটা গুছাইয়া এবং বিছানাটা বাঁধিয়া দিব তাহার খাবারও আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

আমি বাথরুমে চলিয়া গেলাম। চারটার সময়ে আবার তাহাকে ডাকিলাম। সাড়া পাইলাম না। আরও জোরে ডাকিলাম, দরজার কড়া নাড়িয়া শব্দ করিলাম। তবু জাগিল না। হঠাৎ আমার কিরকম খারাপ লাগিল। মন কাঁদিয়া উঠিল। দরজায় কান পাতিলাম। নিঃশ্বাসের শব্দ কানে আসিল না। আমার নিজের নিঃশ্বাসেরই শব্দ প্রখর হইয়া আমার কানে বাজিতে লাগিল। শ্বাস বন্ধ করিয়া আবার কান পাতিলাম। তবু শব্দ নাই। আবার ডাকিলাম, উত্তর নাই। আমার ভয় ধরিল। কি হইল তাহার? সে কি ঘরে নাই?

ও ঘরে গিয়া টর্চ লইয়া আসিলাম। একপাশে জানালা, ভিতর হইতে বন্ধ। তাহার খড়খড়িতে চক্ষু লাগাইলাম। খাটের উপরে মশারি ফেলা। তাহার মধ্যে শয়ান দেহ চোখে পড়িল।

আমার সর্বাঙ্গ তখন কাঁপিতেছে। আমি দেহের সমস্ত শক্তি দিয়া দরজায় ধাক্কা দিলাম। একবার, দুইবার, তিনবার। খিল ভাঙিয়া গেল। দরজা খুলিয়া গেল। খাটের কাছে ছুটিয়া গেলাম। মশারি তুলিয়া তাহার গায়ে ঠেলা দিলাম। সমস্ত দেহটা একসঙ্গে নড়িয়া উঠিল। সে দেহ প্রাণহীন, কঠিন।

ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইলাম। সমস্ত দেহ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, মন অসাড় অবশ হইয়া গিয়াছে। পুণ্যব্রত মরিয়া গিয়াছে? কি হইল তাহার? একথা ত স্বপ্নেও ভাবি নাই। অথচ, ডাকিয়া যখন উত্তর পাইলাম না, নিজে হইতে কেন মন অমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল? ইহারই কি নাম প্রিসেন্টিমেন্ট। ইহাই কি সিক্সথ্ সেন্স?

তখনও কথাটা সত্য বলিয়া মনে হইতেছে না। কি করিব, ভাবিতে পারিতেছি না। কতক্ষণ সেইভাবে দাঁড়াইয়া ছিলাম তাহাও জানিনা।

পিছন হইতে অকস্মাৎ কাহার একটি হাত আমার কাঁধে পড়িল, আমি আঁৎকাইয়া, বোধহয় চেঁচাইয়াই উঠিলাম। ডাক্তার বোসের গলা কানে আসিল, কি হল? এভাবে দাঁড়িয়ে আছ?

তিনি কখন আসিয়াছেন, পিছনে দাঁড়াইয়াছেন কিছু টের পাই নাই। ডাক্তার বোস আবার কহিলেন, কি হয়েছে?

আমি প্রায় স্বরহীন ভাষায় কহিলাম, পুণ্যব্রত মরে গেছে।

ডাক্তারও চমকাইয়া গেলেন। কহিলেন, সে কি? কখন?

—জানিনে। ঐ ঘরে।

ডাক্তার একবার হতভম্ব মুখ ফিরাইয়া খোলা

দরজাটার দিকে তাকাইলেন। অন্ধকার ঘরের মধ্যে দৃষ্টি পাঠাইবার চেষ্টা করিলেন। তারপর দৃঢ় হাতে আমার কাঁধে চাপিয়া ধরিয়া এদিকের ঘরে লইয়া আসিলেন। খাটের উপরে আমাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, বোসো।

আমি অবশের মত বসিয়া পড়িলাম। ডাক্তার নিজেও একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। অত্যন্ত বিচলিত স্বরে কহিলেন, ছি ছি ছি ছি ছি ছি।

তারপর যেন গভীর অবসাদে চেয়ারের কাঁধে মাথা হেলাইয়া দিলেন। প্রায় অশ্রুত স্বরে কহিলেন, ইঃ এত দুর্বল, এত দুর্বল।

কিন্তু এক বা দুই মিনিট মাত্র। তারপরই তিনি সহসা সচেতন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, টর্চটা দাও।

টর্চটা আমার হাত হইতে খসিয়া বিছানার উপরে পড়িয়াছিল, সেটা তুলিয়া লইয়া তিনি পাশের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

আমারও তখন ঘোর কাটিয়া আসিয়াছে। কহিলাম, আলো জ্বেলে দেব?

ডাক্তার যাইতে যাইতে কহিলেন, দরকার নেই।

কয়েক মিনিট পরে আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, এঘরে এসো।

আমি উঠিয়া গেলাম। ডাক্তার টর্চের আলো পুণ্যব্রতর দেহের উপরে ফেলিলেন। খালি গা, চিৎ হইয়া, সোজা হইয়া শুইয়া আছি—ঘুমের মধ্যেই প্রাণ চলিয়া গিয়াছে, মৃত্যুযন্ত্রণা বা মৃত্যুকালীন আক্ষেপের কোন চিহ্ন দেহে বা মুখশ্রীতে নাই, বিছানাও কিছুমাত্র স্থানভ্রষ্ট হয় নাই।

কহিলাম, টেরই পায়নি?

ডাক্তার কহিলেন, সময় পায়নি। এই দেখ।

ডাক্তার তাহার পেটের উপরে আলো ফেলিলেন। পেটের মাঝামাঝি, একটু বাঁদিকে, পাশাপাশি দুইটি ছিদ্র।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম—সাপ!

ডাক্তার ধীরকণ্ঠে কহিলেন, হ্যাঁ। সেই সাপ!

আমি বিবশের মত কহিলাম, কিন্তু এ যে ঘরের মধ্যে!

ডাক্তার কহিলেন, এঘর থেকে ঘরে এসেছে। চল।

আমার হাত ধরিয়া ডাক্তার আমাকে এঘরে লইয়া আসিলেন। বিছানায় বসাইয়া দিলেন। আমি কহিলাম, একবার ডাকলও না। আমার যে পাশে পাশে সেক্সিন্ আছে। বলিতে গিয়া আমি হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। ডাক্তার আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিলেন, মিছে। সেক্সিনে কিছু হত না।

—হত না?

—না।

রাস্তার উপরে হঠাৎ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। রিক্‌শওয়ালা আসিয়াছে।

ডাক্তার কহিলেন, কে এল?

আমি আবার কাঁদিয়া উঠিলাম। কহিলাম, রিক্‌শ। ওকে নিয়ে যাবে বলে। আজ যাবে কথা ছিল।

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, নীচে চল।

নীচের বারান্দায় আসিয়া ডাক্তার দাঁড়াইলেন। কহিলেন। আমি এই রিক্‌শয় ফিরে যাচ্ছি।

আমি বিহ্বলের মত কহিলাম, যাবেন?

—হ্যাঁ। বিনু আসবে আজ। সাতটার সময়ে এখানে আসবে। তার সঙ্গে আমি দেখা করতে পারব না।

কোনদিন যাহা দেখি নাই কল্পনা করি নাই—দেখিলাম ডাক্তারের গলা কাঁপিতেছে। স্বর অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। কহিলেন, আমি যাই, তাকে বোলো না আমি এসেছিলাম।

আমি অসহায়ের মত কহিলাম, আমি কি করব?

—কি আর করবে। কাউকে ডেকে বিনুকে খবর দাও।

ডাক্তার রিক্‌শয় উঠিলেন। আমি মূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলাম। তারপর উপরে উঠিয়া আমিও বিছানায় লুটিয়া পড়িলাম। পাশের ঘরের দরজা খোলাই ছিল।

তারপর একসময়ে নিশ্চয়ই উঠিয়াছিলাম, লোক ডাকিয়াছিলাম ভূপতিকে খবর পাঠাইয়াছিলাম, কিন্তু ঠিক কি কি যে করিয়াছিলাম, কি কি হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট বিবরণ আমার মনে নাই।

অনেক মাস পরে।

ডাক্তার একটি বস্তু আমার হাতে দিলেন। একটি ছোট পিচকারি, কিন্তু অদ্ভুত গড়নের। ভারী শক্ত কোন ধাতুতে গড়া। ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি. দৈর্ঘ্যও সবসুদ্ধ এক ইঞ্চির মত। পিস্টনের মাথাটা চ্যাপ্টা, কর্ণেটের চাবির মত। সিলিণ্ডারের উপরে, পিস্টনের মাথাটি বসানো আছে একটি জোরালো স্প্রিংয়ের উপর। ফলে পিস্টনহেডটি টানাই থাকে। হাতের চাপ পড়িলে বসিয়া যায়, জল ছুঁড়িয়া দেয়। চাপ তুলিয়া লইলেই পিস্টন আবার নিজে হইতে উঁচু হইয়া উঠে, জল বা বায়ু টানিয়া লয়।

মাথার দিকটা আরও আশ্চর্য। সেটা গোল নয়। হঠাৎ চাপ্টা হইয়া ক্রমশ পাৎলা হইয়া গিয়াছে। ঠিক টুথপেষ্টের টিউবের নীচের দিকটার মত। সেই চাপ্টা জায়গার দুই পাশে দুইটি আংটা বসানো, তাহার মধ্যে আঙুল গলিয়া যায়। তলায় যেখানে দুই পাশের দেওয়াল একত্র মিলিয়া সারা হইয়াছে, তাহার শেষে পাশাপাশি দুইটি ছুঁচ বসানো—শক্ত, মোটা বেঁটে, সিকি ইঞ্চি বা কিছু বেশী লম্বা। ছুঁচের ডগা কলম কাটা, অত্যন্ত ধারালো। হাতে পরাইয়া দেখিলাম। আংটা দুইটির মধ্য দিয়া তর্জ্জনী ও অনামিকা ঢুকাইয়া দিলে সিলিণ্ডারের চ্যাপ্টা তলাটি দুই আঙুলের মাঝখানে চাপিয়া যায়, আঙুলের ঠিক নীচে ছুঁচ দুটি বাহির হইয়া থাকে, এবং পিস্টনের মাথাটি হাতে তেলোর মধ্যে আসিয়া যায়। হাত মুঠা করিলে সমস্ত বস্তুটি মুঠার মধ্যে লুকাইয়া যায়; ঘুষির মত ভঙ্গিতে আঘাত করিলে ছুঁচ দুইটি একই সঙ্গে দেহে বিঁধিয়া যাইবে এবং তখন হাতের তেলোর ঈষৎ চাপ দিলেই পিচকারির মধ্যের বস্তু ছুঁচের মধ্য দিয়া দেহে প্রবিষ্ট হইবে।

নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলাম। কহিলাম, কি এটা?

ডাক্তার হাত বাড়াইয়া আমার হাত হইতে পিচকারিটা ফিরাইয়া লইলেন। কহিলেন, চিনলে?

—হ্যাঁ। কিন্তু এরকম সিরিঞ্জ ত কখনও দেখিনি। কোথায় পেলেন?

—কুড়িয়ে। দেখনি, কারণ বাজারে নেই। এ একজনের আবিষ্কার।

—কিন্তু জিনিসটা কি?

—সাপ।

—সাপ? চমকাইয়া উঠিলাম। সেই পর পর সর্পাঘাত। সে তাহা হইলে সর্পাঘাত নয়, নরহত্যা?

কহিলাম, এ কার বানানো? কার অস্ত্র?

ডাক্তার কহিলেন, বলব। ধৈর্য ধরে শুনতে হবে। লম্বা গল্প।

ধর কোন একটি জায়গা। ছোট একটি মফঃস্বল শহর। সেখানে স্কুল আছে। কাছারি আছে। ব্যাঙ্ক আছে।

একটি লোক, অল্প বেতনের বাড়ি। সেখানে স্কুলে মাষ্টারি করতে এলেন। মাষ্টার ভাল, কিন্তু মাষ্টার জীবনের যে দোষ ছিল একালে। চরম নীতিবাগীশ। মাষ্টারি নিয়ে গিয়েছেন, জায়গাটা ভাল লেগেছে। জমি, বাজার সবই সস্তা। দেশেও আত্মীয় স্বজন বলতে বিশেষ কেউ নেই, অতএব দেশের দিকে পেছুটান নেই। জমি কিনে বাড়ি করে বসে গেলেন। এইখানেই নতুন করে জীবনের পত্তন করবেন। বিয়ে বোধহয় আগেই করেছিলেন। দুটি সন্তান ছিল সেখানে। বড়টি ছেলে, ছোটটি মেয়ে। বছর তিনেকের তফাৎ তাদের বয়সে।

আছেন। স্কুলের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। নিয়মিত মাইনে পান না এমন অবস্থা। সংসার চলে না। ওদিকে, হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাবেন, আবার নতুন করে সব পত্তন করবেন, তাও ইচ্ছে করে না। তাত না থাক, নাম ছিল—অঙ্কের এক্সপার্ট বলে। স্কুলের সমস্ত অ্যাকাউন্ট আর হিসাবপত্রও তিনিই রাখতেন।

স্কুলের অবস্থা যখন যায় যায়। সেট আর চলে না, এমন সময়ে তাঁকে ডাকতে এলেন ব্যাঙ্কের কর্তারা। সেই সবেরই ব্যাঙ্ক। তার আকার ছোট কিন্তু ব্যবসা অনেক। বললেন, আমাদের অ্যাকাউন্ট্যান্ট হবেন আসুন। আমরা তিনগুণ মাইনে দেব। কিছুদিন না না বলে এড়াতে চাইলেন —শিক্ষা বিভাগের মোহ আর বিদ্যাদানের নেশা তখনও মাথায় ঘুরছে। শেষ অবধি আর পারলেন না —অনাহার অর্ধাহারে আদর্শ শুকিয়ে মরে যাচ্ছে, স্ত্রী চাপ দিচ্ছেন, বন্ধুবান্ধবরাও বলছেন, এমন সুযোগ হেলায় হারিয়ো না। স্কুল ছাড়লেন। ব্যাঙ্কের চাকরি নিলেন। অবস্থা ফিরল। খেতে পেয়ে শরীর ফিরল, ছেলেটিকে কলকাতায় বড় স্কুলে পড়তে পাঠালেন। সে দুধোড় ছাত্র, তাকে নিয়ে অনন্ত আশা।

সব যখন বেশ চলছে, এল ঝড়। যে ব্যাঙ্ক তৈরি করেছিলেন সেই জায়গারই মাতব্বর ব্যক্তিরা। প্রথম দিকে ব্যাঙ্কে খেটেখুটে সুনাম বানিয়ে নিয়েছে। অনেক টাকা আমানত, অনেক টাকার কারবার— সেই সুযোগ। কর্তারা স্থির করলেন, এইবার ব্যাঙ্ককে ফেল করাতে হবে। তাহলেই পরের গচ্ছিত বহু টাকা বেমালুম মেরে দেওয়া যায়—আইনে ফাঁকের অভাব নেই।

কিন্তু ব্যাঙ্ক ফেল করাতে হলে তার হিসাবপত্রে গোলমাল করা দরকার। অ্যাকাউন্ট্যান্টের ওপর আদেশ হল, খাতাপত্রে মিথ্যে হিসেব খাড়া কর।

মাষ্টারি করা মূর্খ আদর্শবাদী মন খাড়া দিয়ে উঠল। বললেন, সে পারব না।

ফলে তাঁর ওপরে প্রচণ্ড চাপ এসে পড়ল। প্রথমে কথা শোনাবার জন্যে, তারপরে তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে। পড়ে গেলেন ধ'রে বন্ধনে। নগদ পয়সা-কড়ি খুব ছিল না। যা ছিল দু'চার পয়সা সবই সেই ব্যাঙ্কে। সেটা তুলে নেবার পথে অনেক বাধা। চাকরি ছাড়তে চাইলেন, তাও মঞ্জুর হল না— ছেড়ে গেলে ত আর হাতে থাকবে না। এখন যদি সব ফাঁস করে দেয়!

কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক, তার আইনে নাকি এমন প্যাঁচ আছে যে ইচ্ছে করলেই ফোকা যায় না বেরিয়েও যাওয়া যায় না; আর মফঃস্বলের গ্রামা-পলিটিক্স, সে ভয়াবহ বস্তু। যাঁরা তাঁকে নিয়েছেন তাঁরা স্থানীয় মহাকর্তাব্যক্তি। তিনি একে ক্ষুদ্র তাতে বিদেশী—তাঁর জোরও নেই সহায়ও নেই। আদালতী বন্ধু যাঁরা ছিলেন বেগতিক দেখে সরে দাঁড়ালেন। তাঁর বন্ধু সাজতে গিয়ে বাঘকুমিরদের ক্যাপাবে কে! শেষাশেষি তাঁরও জিদ চেপে গেল। দেশ ছেড়ে এসেছি এই বিদেশে একটু শান্তি একটু স্বস্তির আশায়—আমি কারো কোন ক্ষতি করিনি, করতে চাইনি—তবে কেন আমার ওপরে এই অন্যায় নির্যাতন? ঠিক আছে, আমিও যাব দেখে, দেখি ধর্ম আছেন কিনা, দেখি কে কি করতে পারে আমার।

সেই জিদ কাল হল। জিদের মাথায় একথা ভাবলেন না, এদেরই দেশ এদেরই শক্তি, এদের বিরুদ্ধে তিনি লড়ে পারবেন না। চতুর্দিক থেকে যতরকম সম্ভব চাপ আর আঘাত, অনিষ্ট আর শত্রুতা তাঁর ওপরে এসে পড়তে লাগল। তাঁকে কোন দোকানী ধারে মাল দেয় না, তাঁর বাড়িতে অসুখ করলে কোন ডাক্তার তাঁর বাড়িতে আসে না। তবু তিনি মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলেন—ধর্মের ওপরে ঈশ্বরের ন্যায় বিচারের ওপরে অটল বিশ্বাস তাঁর, সে বিচার তিনি পাবেনই—আজ হোক কাল হোক? ধর্ম নাই ঈশ্বর যে বহুদিন মরে ভূত হয়েছেন সে খবর তিনি জানতেন না।

ডাক্তারের মুখে ঈশ্বর সম্বন্ধে অন্য কথাই পূর্বে শুনিয়াছি। কিন্তু এখন তিনি নিজেই যেন আবেগে পূর্ণ, কথা কহিয়া তাঁহাকে বাধা দিলাম না। ডাক্তার বলিতে লাগিলেন—

ধর্ম রক্ষা করলেন না তাঁকে। মেয়েটার অসুখ হল, ডাক্তার পেলেন না, চিকিৎসা হল না, সে মরে গেল। ছেলেকে আর টাকা পাঠাতে পারেন না— তার পড়াশোনা বন্ধ হবার উপক্রম। মামা ছিলেন কলকাতায়। তাঁর বাড়িতে থেকেই পড়ত। মামা

গরীব। তবু তিনিই ছেলেটার ভার নিলেন। তাঁর পয়সা নেই—বড় স্কুল ছেড়ে গরীবের ছেলের যোগ্য স্কুলে দিতে হল তাকে।

ছেলেকে লিখে দিলেন, এ শত্রুপুরী, এখানে এসো না। এসে হঠাৎ বিপন্ন হবে। হয়ত কেউ বিষটিষ খাইয়ে মেরে ফেলবে বা পাগল করে দেবে, এমন আশঙ্কা তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। হয়ত সে আশঙ্কা খুব মিথ্যেও নয়।

ভদ্রলোক ঈশ্বরপরায়ণ, জিদী। তাঁর সমান মনের জোর তাঁর স্ত্রীর ছিল না, যদিও স্বামীর মুখ চেয়ে তিনিও জোর করে মাথা উঁচু করেই চলেছিলেন। স্বামীকে কখনও বলেননি মাথা নীচু কর। কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত লড়তে পারলেন না—ভেঙে পড়লেন। চিন্তায় উৎকণ্ঠায় অবসাদে তাঁর শরীর ভাঙল মন ভাঙল। মুরিসি দেখা দিল। ভাই ডেকে পাঠালেন, গেলেন না। চিকিৎসাও হল না কিছু। মারা গেলেন। ছেলের সঙ্গে দেখাও হল না।

ভদ্রলোক অন্ধ জিদের বাড়ায় তখন প্রায় উন্মাদ। তখনও জায়গা ছেড়ে গেলেন না। শেষ অবধি সত্যিই উন্মাদ হয়ে গেলেন। একা একা ঘুরে বেড়াতেন, বিড় বিড় করে বকতেন। সে বকুনির ভাষা ছিল একটিমাত্র নালিশ—সর্পাঘাত হবে, সর্পাঘাত হবে।

ধর্ম আর ন্যায়বিচারের ওপরে ভক্তিটা বোধ হয় চিড় খেয়েছিল। বেশীদিন বাঁচলেনও না—উন্মাদ অবস্থায়ই একদিন মরে পড়ে রইলেন ঘরের মধ্যে।

ছেলের সঙ্গে দেখা আর হল না। সঙ্কল্প চেষ্টা করেছিলেন একে টেনে নিয়ে যেতে, পারেন নি। ছেলে এখানে আসবে না। কড়া নিষেধ ছিল। সে ছেলে তারপর কোথায় গেল। কি হল তার, তাও কেউ জানল না। কিরকম লাগল গল্পটা?

—চমৎকার। তারপর বলুন।

তারপর, অনেকদিন কেটে গেল। প্রায় দশ বারো বছর। তারপর হঠাৎ একদিন কে জানে কোন বন্যার জলে ভেসে সেই শহরে এক পাহাড়ী সাপ এসে উপস্থিত হল। কামড়ে কামড়ে মানুষ মারতে লাগল। কিন্তু বেশ ভেবেচিন্তে, বেছে বেছে।

আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। নিঃশব্দ স্বরে বলিয়া ফেলিলাম পুণ্যব্রত!

চুপ্। ডাক্তার হাত তুলিয়া আমাকে থামাইয়া দিলেন। কহিলেন, তার মামা তাকে বেশীদূর পড়াতে পারেন নি। অনেক পাশ করিয়ে জজ হাকিম বানিয়ে দিতে পারেন নি। কিন্তু মানুষ করে দিয়েছিলেন—মরা বাপের প্রতি মরা মায়ের প্রতি মরা বোনের প্রতি তার শেষ কর্তব্য কি সেটা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। সভ্য সমাজের আইন উৎপীড়িতকেই ধৈর্য ধরতে শেখায়। শক্তিমানের সাত খুন মাপ। কিন্তু বিধাতার আইন বোধ হয় বেশী সত্য হয়ে দেখা দেয় অসভ্যদের আইনে, যেখানে অন্যায়ের অবাবে বদলা লওয়াই কর্তব্য বলে বিবেচিত। সাপ এল সে শহরে।

সিরিঞ্জটি তখনও ডাক্তারের হাতে। আমার দৃষ্টি তাহার উপরে পড়িল। কহিলাম, ওটা আপনি পেলেন কোথায়?

পুণ্যব্রতর ঘরে। চুরি করে সরিয়ে এনেছিলাম সেদিন যাতে কারু চোখে না পড়ে।

—কেন?

—কি হত? মিথ্যে তার গোপন কথাটা জানাজানি হয়ে যেত। তাকে খুনী বলে মুখ বাঁকাত সবাই। এ ভাল হল, লোকে জানল সাপের কামড়েরই আরেকটি victim.

—কিন্তু, আপনি কি এই গল্প আগে থেকে জানতেন?

—না। পরে জেনে নিতে হল।

তবে কি করে তাকে সন্দেহ করলেন?

—একে একে বলতে যাও।

ভূপতি সাপে কাটা কেস্ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সে ডাক্তার, তার পক্ষে সেটা স্বাভাবিক।

তুমি আমাকে যেদিন বললে, আমার তখন কিছু মনে

হয় নি। ভেবে দেখতে গিয়ে পরে খটকা লাগল। ডুপতির ডায়েরি পড়ে খটকা আরও গভীর হল? সাপে কামড়াচ্ছে—সাপ একটা বা কয়েকটা এসেছে। মানুষ কামড়াচ্ছে, এতে আশ্চর্য কিছু নেই। রাতের বেলাই কামড়াচ্ছে, রাস্তায় এবং নিরিবিলি রাস্তায় কামড়াচ্ছে, সেটাও হতে পারে—নিজেকে বাঁচিয়ে সবাই চলতে চায়। কিন্তু ঘরের ভেতরে যেমন আসছে না, খোলা মাঠের মধ্যেও ত কামড়াচ্ছে না কাউকে। তবে কি বুঝতে হবে, মানুষেরা যেমন রাস্তা দিয়েই হাঁটে, সে সাপও রাস্তা দিয়ে ছাড়া চলে না?

ডায়েরি পড়ে আরও খটকা বাড়ল। কাউকে কামড়াচ্ছে ঘাড়ে, কাউকে কোমরে কাউকে উরুতে কাউকে পায়ের ডিমে। সাপের কামড় বিঁধবে। সে কতটা খাড়া হয়ে ছোবল দিলে তার মাপ ধরে। এ সাপ তবে কোন্ মাপের? বিষের দাগ সর্বত্র এক, মানে সাপের মুখের আকার একই। তবে তার ফণার হাইট কেন রকম রকম হচ্ছে?

ক্রমে ধারণা স্পষ্ট হতে লাগল। কামড়ের হাইট এক নয়। কিন্তু বিঁধ এক। আরও একটা বিষয় সবাইকেই কামড়াচ্ছে পেছন থেকে, এবং দেহের ডান দিকে। সাপ পেছন থেকে এল, সেটা বোঝা যায়। কিন্তু ডান দিকে কেন? তবে কি সে সাপের বাঁ চোখ কানা? তাও ভেবেছি। ভেবে ভেবে ক্রমে উত্তর মিলল। যদি এমন হয় এ সত্যি সাপ নয়, কোন মানুষ সাপের বিষ ফুঁড়ে দিচ্ছে এদের। তবে হিসেব মিলে যায়।

পেছন থেকে এসে জড়িয়ে ধরছে, বাঁহাতে জড়িয়ে ধরে ডানহাতে ছুঁচ বেঁধাচ্ছে, তাই সবারই ঝোঁক ডানদিকে পড়ছে।

কিন্তু তাই যদি হয়, সাধারণ সিরিঞ্জ দিয়ে একাজ হবে না। সিরিঞ্জে একটা ছুঁচ, ছুবার ফোটাতে হবে—ধস্তাধস্তি করে ছুবার করে বেঁধানো এবং তাও ঠিক মেপে সমান ঘুরে, এ অসম্ভব। সাধারণ সিরিঞ্জ এক হাতে বেঁধানোও যায় না, অন্য হাতে চামড়া টেনে ধরে নিতে হয়। হতে পারে, যদি এই রকমের স্পেশাল সিরিঞ্জ কেউ বানিয়ে নেয়।

এই অনুমান সত্য কিনা, বোঝা যাবে রোগী দেখলে। তাই দেখতে হল। বিঁধের সোজা ছুরি চালিয়ে দেখলাম। প্রমাণ মিলে গেল।

—কি প্রমাণ?

—সাপের দাঁত যেটুকু বেঁধে। বিষ গড়িয়ে পড়ে ঠিক তারই ওপায়। এ দেখলাম, অনেকদূর মাংসে চিরে বিষ ঢুকে গেছে। যা হতে পারে শুধু সিরিঞ্জেই—মাংস চিরে বহুদূর গভীরে ঢুকে যাচ্ছে বিষ। বিষ তীব্র, পরিমাণে বেশী, এবং ঢুকছে গভীর হয়ে। তাই ফলও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেছে, কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু। লোক ডাকতেও পারেনি।

সত্যি সাপের কামড় নয়, তার আরও একটা প্রমাণ স্পষ্ট পেলাম। সাপের ব্যাগে বিষ থাকে, সাধারণত দেখা যায় এক এক দিনে এক একটা ব্যাগে। মানে, একটা দাঁতে বিষ ঢালে একটা দাঁত অমনি বিঁধে। বিষ ঢুকল যে দাঁতে তার ছ্যাদায় রক্ত আসে না। অন্যটায় রক্ত আসে। একটা ছ্যাদায় রক্ত গড়াচ্ছে অন্যটায় গড়াচ্ছে না। এই হল সাধারণত প্রমাণ যে কামড় সাপেরই। এর দুই ছ্যাদারই বিষ।

অবশ্য সাপ খুব রেগে থাকলে এমন হতে পারেনা তা নয়, কিন্তু প্রতি বারে হবে কেন।

তখন নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলাম, সাপ নয়। মানুষই খুঁজতে হবে আমার। কিন্তু ঠিক এই ব্যাপার বুঝলে বোধহয় খুঁজতাম না।

—খুঁজতেন না?

—কি জানি। যাক সে কথা।

মানুষ খুঁজব, কিন্তু কোন্ দিকে তাকিয়ে খুঁজব তার হদিশ পাই কোথায়। ভাবতে হল। যদি নরহত্যাই হয়, তবে এ নিছক গুণ্ডামি নয়। গুণ্ডামির জন্যে কেউ এত বুদ্ধি খাটায় না। যে করছে, সে প্ল্যান করেই করছে। অথচ মরেছে যারা, তারা বিচিত্র শ্রেণীর ও অবস্থার মানুষ। প্ল্যান যদি থাকে, তবে এই মানুষ

গুলোর মধ্যে কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। যার যারা এরা একত্র বাঁধা। অতএব এদের পরিচয় জেনে নিতে হল।

পরিচয়গুলো এনে দিলে নিরঞ্জন। খুব চুখোড় ছেলেটা। হয়ত তার বাপের কাছ থেকে এনে দিয়েছিল। বাপকে আমি বলে এসেছি, নিরঞ্জনকে পড়াবার খরচ সব আমার কাছে পাবে—হয় যদি মানুষ ছেলেটা, ত হোক।

পরিচয় জেনে নিয়ে, তারপর গিয়ে তোমার অতিথি হলাম। সেখানে ঘুরে ঘুরে এদের সকলের অতীত ইতিহাস জেনে নেওয়া গেল। মাস্টার মশায়ের গল্পটাও পেয়ে গেলাম। তারপর দুই আর দুই যোগ করে নিলাম। অঙ্ক মিলে গেল।

ব্যাঙ্কটা ছিল রায়সাহেবের। তখনও অবশ্য তিনি রায়সাহেব হননি। তাঁরই টাকা, অন্যরা তাঁর হাতের পুতুল। দাতের বড় ভাগটাও তিনিই মেরেছেন, তাই দিয়েই তাঁর পরের ঐশ্বর্য। অন্য যারা, তারা সেই সময়ে তাঁর চ্যালা ছিল। কেউ ছিল ব্যাঙ্কের কেরাণী, কেউ বা ছিল টাউট, কেউ কেউ বা সেজেছিল মাস্টার মশায়ের বন্ধু সুহৃদ্। মানে নিজে কিছুটা আড়ালে থেকে এদেরই দ্বারা তিনি মাস্টার মশায়ের সর্বনাশটি ঘটিয়েছিলেন। মাস্টারমশাই সবই জানতে পেরেছিলেন শেষ পর্যন্ত। সহধর্মীকেও হয়ত জানিয়ে গিয়েছিলেন। পুণ্যব্রত—সার্থক নাম রেখেছিলেন ছেলের ভদ্রলোক—হয় এদের নাম মায়ার কাছেই জেনেছিল, আর না হয় নিজেই এসে এসে ক্রমে ক্রমে জেনে নিয়েছিল। একথা ঠিক, যুদ্ধে নেমেছে সে অনেক আটঘাট বেঁধে, সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে।

তারপর ধীরে সুস্থে সে পিতৃতর্পণ শেষ করেছে। তার বাপ-মাকে হত্যা করল যারা তাদের একটি একটি করে বধ করেছে। সবচেয়ে মোক্ষম মার দিয়েছে রায়সাহেবকে। যিনি নাটের গুরু তাকে নির্বাংশ করে, সেই ছেলেরই ইনসিওরেন্সের দরুণ আধলাখ টাকা হাতে এনে গুঁজে দেওয়া এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কিছু হতে পারত না রায়সাহেবের।

—কিন্তু রায়সাহেব ত টস্‌কানি তাতে, বেশ ডাঁটসেই চলছেন।

—চলবেন, কারণ যে মার খেয়েছেন সেটা প্রকাশ করে বলা তাঁর ধাতে বা সাহসে কুলোবে না। বলতে পারছেন না বলেই শুমে শুমে পুড়ে মরছেন, সেইটেই আমি সেদিন গিয়ে টের পেয়ে এসেছি। খাঁটি গ্রীক-অলঙ্কারের ট্রাজেডি—পাপের অবাবে নিয়তির হাতের মার, তার জন্যে আর্তনাদ করারও সুযোগ নেই।

বাপ পাগল হয়ে বলে বেড়াতেন সর্পাঘাত হবে এদের। ছেলে সেইটেকেই সত্যি বানিয়ে দিয়ে গেছে।

আমি কহিলাম, কিন্তু, রায়সাহেবের বড় ছেলে, সেও কি ওরই হাতে মরেছে?

ডাক্তার কহিলেন আমার তা ধারণা নয়। তারটা বোধহয় সত্যিই সাপের কামড়। তার সে গল্প পুণ্যব্রত জানত, এবং তাই থেকেই ছোট ছেলের ইনসিওর করিয়ে তারপর তার সর্পাঘাত ঘটাবার প্ল্যান তার মাথায় এসেছে। অন্যদের কথাটা এসেছে তার সূত্র ধরে।

—তাকে আপনি সন্দেহ করলেন কি করে?

—প্রথমটা করিনি। তোমার মুখে তার নাম শুনেছিলাম শুধু—তখন এসব কিছু মনে হয়নি। তারপর তার বাবার গল্প শুনলাম। সে ভূপতির স্কুলফ্রেণ্ড ছিল শুনলাম। ভূপতি কোন্ স্কুলে পড়ত সেটা জেনে নেওয়া শক্ত নয়—সেই স্কুলের রেকর্ড থেকে ওর পরিচয় পেয়ে গেলাম। বাকিটা কয়েল ভূপতির ডায়েরি।

ডাক্তারের ডায়েরি, তার সব কাজকর্মেরই হিসেব আছে তাতে। কবে কোন্ ক্লায়েন্টের মেডিক্যাল এগ্‌জামিন করেছে, কি রিপোর্ট দিয়েছে, তাও সব লেখা আছে। মিলিয়ে দেখা গেল। যে যে তারিখে সর্পাঘাতের কেস হয়েছে। তার সব তারিখেই পুণ্যব্রত সেখানে হাজির আছে, বা হয়ত ঠিক তার আগেই সেখান থেকে চলে এসেছে। তার মানে, বলে বেরিয়েছে চলে গেলাম। আসলে ঠিক তখুনি চলে

যায়নি। একটি হত্যা করে দিয়ে তারপর সরে পড়েছে। লোকে জানে সে আগের দিনেই চলে গেছে শহর ছেড়ে। ইনসিওরেন্স সেলস্‌ম্যান যখন খুশি যেখানে খুশি যাতায়াত করে, তার আসিবাই বড় সহজ। কে জানে, হয়ত সেইজন্যেই ইনসিওরেন্স সেলস্‌ম্যান হয়েছিল সে।

রায়সাহেবের বড় ছেলেকে সে মারেনি। তার প্রথম হাতে খড়িও ঐ জায়গাতেই। তৃপতি বলেছে, ডায়েরিতেও আছে। প্রথম কেসের আসের মাথায় মুপুরি ফুলেছিল। তৃপতির ধারণা, পড়ে গিয়ে মাথা ঠুকেছে। তা নয়। প্রথম বার, মনে ভয় ভয়। তাই আগে পেছন থেকে লাঠি বা ইট মেরেছে মাথায়, পড়ে যাবার পর বিষ ফুঁড়েছে। সেবার তাই ফুঁড়েছেও পায়ে—সাপের কামড় পায়ে পড়াই স্বাভাবিক। পরের সব বারে জাপ্টে ধরে দিয়েছে। কাজেই কামড় পড়েছে ওপর দিকে। ডান দিকে, মানে ঐ অবস্থায় ডানহাতের নাগালে যেসব জায়গা থাকে।

আমি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এত বড় একটা জিনিস। মনের মধ্যে পরিপাক করিয়া লইতে মস্তিষ্ক ও মনের জোর দুইটাই লাগে। পরে কহিলাম, তৃপতি জানে এসব? তাকে বলেছেন?

—সর্বনাশ। শুনলে সে হার্টফেল করবে গলায় দড়ি দেবে। খবরদার, ঘুণাক্ষরেও এর কোন আভাস দেবে না তাকে। অসম্ভব ভালবাসত।

—ভালবাসার মতই ত ছেলে। কিন্তু, ও ত বলেছিল বম্বে থেকে ডাক এসেছে, বম্বে চলে যাবে। গেলে হয়ত আর এই অকালেই আসত না অনেকদিন।

মরতে গেল কেন? আত্মগ্লানিতে? না, কাজ শেষ হয়ে গেল বলে?

ডাক্তার কহিলেন, কোনটাই নয়। মরল, ভয়ে।

—ভয়? কিসের ভয় তার?

—লজ্জার। ভেবেছিল ধরা পড়ে গেছে।

—বুঝলাম না।

—বলছি বুঝিয়ে।

ডাক্তার বহুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, কি জানি হয়ত আমিই মেরে ফেললাম তাকে! আমার আরও বুঝে চলা উচিত ছিল।

—আপনি? তার মানে?

ডাক্তার স্থির স্বরে কহিলেন, বলছি ত। ওর সব ব্যাপার জেনে গেলাম, কার কার ওপরে ওর রোখ, তাও জেনে নিলাম। তাদের মধ্যে অনেককেই শেষ করে এনেছে ও। আমি ভাবলাম, আর কেন পাপ করে বেড়ায়, অনেক ত হল। আমি ওকে একটা চিঠি লিখে দিলাম তৃপতির কেয়ারে। অবশ্য নিজের নাম না দিয়ে। তাতে লিখলাম, তোমার সব ব্যাপার জানা হয়ে গেছে। তুমি এবার সরে পড়, আর ওখানে যেয়ো না।

—একটা নীল ভারী খামে করে চিঠি? ওর যাবার দিন আটেক আগে?

—হ্যাঁ।

—বুঝেছি। সেই চিঠিটাই পেয়েছিল, আমিই দিয়েছিলাম ওর হাতে। তাই পেয়েই বম্বে বম্বে চলে যায়।

—যাবার ব্যাপারটা নিশ্চয় নিজে থেকেই স্থির হচ্ছিল, যা হয়ত ও নিজেই ঠিক করে এনেছিল। আমার চিঠিটা তার সংকল্পটাকে expedite করেছে।

—আপনি কি জানতেন, ও ঐ সময়ে ওখানে যাবে?

—না। যখন হোক যাবেই, এবং তৃপতির ঠিকানায় চিঠি গেলে পাবে এটা জানতাম। আর যতদিনেই যাক, আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে—যাবার আগে ত আর নতুন case করতে পারছে না।

চিঠি গেল। বম্বের ডাকও গেল। পেয়ে স্থির করল। যাবেই ত চলে, যাবার আগে আর এক সাপিষ্টকে সাবাড় করে দিয়ে যাই। সরজাম নিশ্চয় তার সঙ্গেই থাকত, কে জানে কখন কাজে লেগে যায়। সুযোগও স্থির হল, সেই সন্ধ্যায় মিটিং থেকে ফেরবার পথে ঐ ব্যক্তিকে খায়েল করবে। ওর বাবার বন্ধু সেজে যারা চলত তার সব মনের কথা আর পরামর্শ জেনে নিয়ে এসে এদিকে খবর দিত। ঐ ব্যক্তি ছিল তার মধ্যে প্রধান।

প্ল্যান স্থির হল। তোমাকে বললে পরদিন চলে যাবে। মানে সেই সন্ধ্যায় একে সাবাড় দিয়ে কেটে পড়বে। কিন্তু ঠিক সেইসময়ে আমিও লিখে দিয়েছি সব।

ভাগ্যের খেলা। যাবার কথা আমার একেবারে হঠাৎ মনে হয়েছিল। চিঠি দিয়েছি, সেই চিঠি দেখেছে বোধহয়?

—আমিই দেখিয়েছিলাম।

—হবে। হাতের লেখা দেখে চিনেছে বেনামা চিঠির হাতের লেখাও আমারই। আমি সব জানি। আমি যাচ্ছি, যদি সব বলে দিই তুলসিকে, তোমাকে? এই ভেবে তার মন চঞ্চল হয়েছে, নার্ভাস্ হয়েছে। বোধ হয় সেইজন্যেই, সেদিন তার শিকারকে আক্রমণ করেছে, কিন্তু ঠিকমত কায়দা করতে পারেনি—মন অস্থির ছিল।

আমি লিখেছিলাম শনিবার ভোরে পৌঁছব। তারপর হঠাৎ কি খেয়াল হল, শুক্রবার সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলাম। মন টানছিল। একেই বোধহয় haunch বা টনিক বলা বলে। সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছিলাম। কেউ জানে না। নিরঞ্জনের কাছে জানা গেল ও পরদিন চলে যাচ্ছে—তার সঙ্গে ওর দেখা হয়েছিল, তাকে বলেছিল, মনে হল, শেষ মুহূর্তে আবার একটা কাণ্ড না করে যায়—যথেষ্ট ত হয়েছে। আরও পাপ থেকে ওকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম, তাই প্রাণে মেরে দিলাম। হবেই। নিজের ভাগ্যে অমন ছেলে হল না। পরের ভাগ্যে হল—সহ্য হবে কেন।

ডাক্তার গলা সাফ করিয়া লইলেন। কহিলেন, বেশ্যালয়, ও মিটিংএর পথে যাচ্ছে। ওর শত্রুদের নাম আমি জানতাম, কজন তার বাকি আছে তাও জানি। এইরকম একটা কাণ্ড করতে পারে, আন্দাজ করে নিলাম। ও স্কুলের বাহিরে অপেক্ষা করে রইল। আমিও দূর থেকে নজর রাখলাম ওর ওপরে। তারপর ও যখন মাষ্টারকে ধরেছে কিন্তু কায়দা করতে পারছে না। হঠাৎ কি মনে হল, টর্চের আলো ফেললাম ওদের ওপরে। তাতে যদি ছেড়ে দিয়ে সরে যায়।

কিন্তু তাতে ত মাস্টারও ওকে চিনে ফেলত।

—না। আমি ঠিক তার মুখের ওপরেই ফেলেছিলাম আলো। তার চোখ ধেঁধে যাবে। ওকে দেখতেই পাবে না, ও সেই ফাঁকে সরে পড়বে। এই ছিল আমার ইচ্ছে।

হল না। হঠাৎ তুমি এসে পড়লে, চীৎকার করে লোক ডাকলে। তখন আর আমার উপায় নেই। টর্চ ফেলে তোমাকে অন্ধ করে দিলাম। ওদেরও অন্ধকারে ফেলে দিলাম। সেই ফাঁকে যাক পালিয়ে। গেলও।

কিন্তু তোমার চীৎকার শুনে গলা চিনেছিল। টর্চ ফেলতে তোমার মুখও দেখতে পেল। ওর ভয় হল তুমিও ওকে দেখে ফেলেছ চিনে ফেলেছ। আমি জেনে গেছি এটা জেনেছে, আবার তুমিও জেনে গেলে—এবার সবাই জেনে যাবে। আসল কথা জানবে না কেউ, কারণ ও কাউকে বলবে না—সেদিকে বিষম অভিমানী। অথচ সবাই ওকে দেখে গেল একটা খুনী বলে। সে লজ্জা নিয়ে ও বাঁচতে রাজি নয়। বম্বে বা বিলেতে গিয়েও নয়।

মন এমনিতেই চঞ্চল হয়ে গিয়েছিল। এবার সেই চাঞ্চল্য পুরো হল। আগে থেকেই নিশ্চয় তলায় তলায় মন ভেঙে এসেছিল—যুক্তি দিয়ে নিজেকে যতই বোঝাক মানুষ, পাপের একটা গ্লানি মনে লেগে থাকেই। ক্রমাগত বেড়ে চলে। হয়ত তারই তাড়নায় বম্বেতে চলে যাবার ব্যবস্থা করেছিল। সেদিনকার আতঙ্কটা হল সেই অবসাদের ওপরে বাড়তি বোঝা—The last straw to break his back। সামলাতে পারল না। অভিযোগটা মুখোমুখি শুনবার আগে আত্মহত্যা করল। তবু চেষ্টা করেছিল সেটাকেও সর্পাঘাত বলে চালাতে, পারেনি।

বিষ ঢুকিয়ে সিরিঞ্জটাকে শিয়রের জানলার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিল। বাইরে পড়ে যেত গলার মধ্যে। কেউ খুঁজে পেত না। হল না, জানলার গিকে ঠেকেই আটকে গেল বোধ হয়। আমি তাই গিয়েই সেটা খুঁজে নিয়ে পকেটে পুরেছি, ওর সে লজ্জাটা বাঁচিয়েছি। আর কিছু করবার ছিল না?

—কিন্তু। এত বিষ ও পেত কোথায়?

—হয়ত বানিয়ে নিয়েছে। কোবরা ভেনমের ফর্মুলা শক্ত নয়। সিন্থেটিক বানিয়ে নিয়েছে।

আমি অনেকক্ষণ কথা বলিলাম না, শেষে কহিলাম, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পারছি না। ঐ আয়নাটার ওপরে ওর অতবড় রাগ, ওদের সমস্ত পরিবারটার জীবন ধ্বংস হয়ে গেল। ঐখানে গিয়ে। অথচ দেখলাম ও জায়গা ছেড়ে যেতে ওর কী বিষম দুঃখ। কিছুতেই যেন পারছে না মায়া কাটাতে। কেন?

ডাক্তার কহিলেন, ভুলে যাচ্ছ। ঐটেই ওর জন্মভূমি। দেশ ছেড়ে এসে ঐখানেই সুখের আশায় ঘর বেঁধেছিল ওরা। বাপ মায়ের ছবি যেটুকু ওর মনে ছিল, ছিল ঐ জায়গারই ফ্রেমে বাঁধাই হয়ে।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

গ্রীক কবি জর্জ সেফেরিস

গৌরীশঙ্কর দে

নিথর গাঢ় নীল সমুদ্র। তার তীর পর্যন্ত ধাপে ধাপে নেমে গেছে রৌদ্রপায়ী আঙুর আর জলপাইবীথি। পাহাড়ের গায়ে বড়ো বড়ো কর্পিমনদা জাতের গাছ। মাঝে মাঝে নীল আকাশ ছুঁয়ে উঠেছে এক একটা সরল আর ঋজু সাইপ্রাস। গোটা দেশটাই পাহাড় আর ছোটো ছোটো উপত্যকায় ভরা। এই হলো গ্রীস। শুধু সুন্দর নয়, প্রাচীন।

আধুনিক কালে রাষ্ট্র হিসেবে তেমন কৌলিন্য নেই গ্রীসদেশের। সাম্প্রতিক কালের শিল্প সাহিত্য গ্রীসের কাছে কতোটা ঋণী পরিষ্কার ভাবে আমরা জানিনা। গ্রীস বলতেই আমাদের চোখে যে দেশের ছবি ভেসে ওঠে তার অবস্থান সুদূর কালে। ইতিহাসের সূত্রে আমরা জানি য়োরোপীয় সভ্যতার প্রথম উন্মেষ ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে এই ছোটো দেশটির ভূমিতে। এক অর্থে গোটা য়োরোপীয় সভ্যতাই গ্রীক ঐতিহ্যে লালিত। শিল্প, সাহিত্য, রাষ্ট্রতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ইত্যাদি নানা বিষয়ে যে সোনার ফসল একদিন গ্রীসে ফলে উঠেছিলো তার আভায় পৃথিবীর ইতিহাস আজো সমুজ্জ্বল। সেই গ্রীসের একজন কবি সেফেরিস এবার নোবেল পুরস্কার পেলেন। এর আগে আর কোনো গ্রীক কবি এই সম্মান লাভ করেননি।

জর্জ সেফেরিসের জন্ম ১৯০০ সালে। গ্রীক এশিয়া মাইনর-এর অন্তর্গত স্মির্নায়। কবির ছেলেবেলা কেটেছে চাষী আর নাবিকদের মাঝখানে। আঠারো বছর বয়সে তিনি আইন শিখতে গিয়েছিলেন প্যারিসে। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় ভ্যালেরি প্রমুখ আধুনিক ফরাসী কবিদের সঙ্গে, তাঁকে প্রভাবিত করে ফরাসী কবিদের প্রতীকী আন্দোলন। ১৯২৩ সালে তিনি কাজ নিলেন কূটনৈতিক দপ্তরে। ১৯৩১ সালে বেরোলো তাঁর প্রথম কবিতার বই। বিবাহিত জীবনের সূত্রপাত এর দশ বছর পরে, মানে চল্লিশ বছর পেরিয়ে যাবার পর। স্ত্রীর নাম জানোও। ১৯৫৭ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত সেফেরিস ছিলেন লণ্ডনে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত হিসেবে। বর্তমানে তিনি বাস করছেন অ্যাথেন্সের কাছে একটা ছোটো বাড়িতে। পরিবারে অবশ্য তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই।

প্রত্যেক কবিই নাকি তার পূর্ববর্তী বা সমকালীন কবিদের দ্বারা কম বেশি প্রভাবিত। সমালোচকদের মতে আধুনিক কবিদের মধ্যে সেফেরিসের উত্তমর্ণ টি, এস, এলিয়ট আর ডব্লু, বি, ইয়েটস। কিন্তু এঁদের প্রভাব তিনি শুধে নিয়েছেন নিজের মধ্যে। সেফেরিসের ভূতপূর্ববর্তী মনোলোক অংশত প্রাচীন গ্রীসের অন্তর্ভূত। তাই গ্রীক পুরাণ, বিশেষত: ইলিয়ড আর অডিসির ছায়া প্রায়ই এসে পড়ে তাঁর রচনায়। অবশ্যই আধুনিক বক্তব্যের প্রয়োজনে। প্রায় বিশ হাজার পংক্তির দুই বিপুল মহাকাব্য ইলিয়ড আর অডিসি কণ্ঠস্থ করা প্রাচীন গ্রীকদের কাছে শিক্ষার

অন্ধ বলে বিবেচিত হতো। আধুনিক গ্রীক কবিও স্বাভাবিক ভাবে আত্মসাৎ ক'রে নিয়েছেন সমগ্র গ্রীক পুরাকাহিনীকে।

সেফেরিসের বয়স যখন মাত্র বাইশ তখন তাঁর জন্মভূমি তুর্কীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নিজেদের বাড়ি ঘর ছেড়ে বহু গ্রীককে চলে যেতে হলো নির্বাসনে। এই ঘটনা সেফেরিসকে শুধু যে বিচলিত করেছিলো তা নয়, তাঁকে একাত্মও ক'রে তুলেছিলো মহাকাব্যের অডিসিয়ুসের সঙ্গে। তিনিও তো স্বদেশ ছেড়ে বহুদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন সমুদ্রের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। তবু আধুনিক এই কবির কাছে প্রাচীন গ্রীস ছিলো এক স্বপ্নের উজ্জয়িনী যেখানে ফিরে যাওয়া আর কোনো দিনই সম্ভব নয়। কবির ব্যক্তিগত যন্ত্রণা ব্যাপ্ত হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে উদ্বাস্তু মানবতার বৃহৎ বেদনায়। তাঁর কবিতা মাঝে মাঝে ভরে গেছে চাপা বিষণ্ণতায়। আর যে সমুদ্র সেখানে থেকে থেকে গর্জে ওঠে তার জল গভীর এবং অপরিচিত। এই সমুদ্র তাঁকে ক'রে তুলেছে শ্লান্ত ভিক্ত।

য়োরোপে একটা চলতি কথা আছে: "গ্রীসে যা-ই ঘটুক সেই ঘটনার বৈশিষ্ট্য এই যে তা অপ্রত্যাশিত।" সেফেরিসের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিও যেন তেমনি এক ঘটনা। আমরা তো এই খবরের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলুম না। হাল আমলের গ্রীক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেই চলে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষেই সেফেরিসের নামের সঙ্গে আমাদের অনেকের পরিচয় হলো। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর যেমন অন্তত সাময়িক ভাবে হলেও পৃথিবীর নজর ভারতের ওপর এসে পড়েছিলো:, পৃথিবীর লোক, বিশেষ ক'রে য়োরোপবাসী উপলব্ধি করেছিলো যে ভারতীয় সাহিত্য কালিদাস পর্যন্ত এসেই থেমে যায়নি তেমনি গ্রীক কবি সেফেরিস নোবেল পুরস্কার পাওয়ায় জানা গেলো গ্রীসের সাহিত্য-সাধনার ধারা প্রাচীন কালের সীমান্ত লঙ্ঘন ক'রে আধুনিক কাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এখন থেকে আমাদের নতুন চোখে গ্রীসের দিকে তাকাতে হবে।

আবার একদিন টলষ্টয় পরিবারে হাস্যতা কলহ দেখা দিল।

টলষ্টয় গৃহিণী রাগ করে চেঁচিয়ে উঠলেন—"তোমার মত আলসে, তোমার মত অপদার্থ, তোমার মত গণ্ডমূর্খ, আমি কোথাও দেখিনি। তুমি দূর হও, তোমার চাষের জমিতে। সেইখানে থাক। এখানে আর এস না।

টলষ্টয় হেসে বললেন: "কিন্তু আমি যে তোমার মত কর্মঠ, তোমার মত বুদ্ধিমতী, তোমার মত সুরসিকা কোথাও দেখিনি! তুমি থাক, চিরদিন থাক, আমার ঘর আলো করে।"

টলষ্টয় গৃহিণী ও অবাক্।

দেশ-বিদেশ

বিমান প্রতিরক্ষা মহড়ায় মার্কিন জেট-বিমান

সম্প্রতি ভারতে যে যুক্ত বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে—তার উদ্দেশ্য সর্বজনবিদিত—সম্ভাব্য চীনা আক্রমণের প্রতিরোধ করা এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে শিক্ষাদান করা। রেডারের সাহায্যে ভারতে অনধিকার প্রবেশকারী বিমানের উপস্থিতির সন্ধান করে কিভাবে তাকে বাধা দেওয়া যায়—সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হবে।

ভারতীয় বিমান বাহিনীর নেতৃত্বে এই বিমান মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এতে মার্কিন বিমান-বহরের ১৮খানি সুপারসেবার জেট বিমান ভারতীয়, ব্রিটিশ ও অষ্ট্রেলিয়ার বিমানবহরের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করছে।

বিমান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য স্বানান্তরযোগ্য আধুনিক রেডার ব্যবহারের সঙ্গে ভারতীয় বিমান বাহিনীর কর্মীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াও এর অন্যতম উদ্দেশ্য। যুক্তরাষ্ট্র সরকার এইসব রেডার ইতিমধ্যেই ভারতে সরবরাহ করেছেন।

উপরে ও নীচে ওঠা নামা করে ও শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে সোজাসুজি উড়ে চলবার যুক্তরাষ্ট্রের এই এফ—১০০ বিমানগুলিই পৃথিবীর মধ্যে প্রথম টেকনিক্যাল ফাইটার হিসাবে পরিচিত।

ব্রিটিশ সাংবাদিকগণের আসন্ন ভারত সফর

এ মাসের শেষে একদল ব্রিটিশ সাংবাদিক ভারত সফরে বের হবেন, তাঁরা ব্রিটেনে ক্ষুধা-হতে-মুক্তি অভিযানে সংগৃহীত অর্থ ভারতে কি ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ-আয়োজন সম্পর্কে ব্যবহৃত হচ্ছে তা লক্ষ্য করবেন। এই পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছেন ক্ষুধা-হতে-মুক্তি অভিযান সংক্রান্ত ব্রিটিশ কমিটি। কমিটির তিনজন কর্মচারী এই দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

এ পর্যন্ত মোট প্রায় ৫,০০০,০০০ পাউণ্ড এই অভিযানে ব্রিটেনে সংগৃহীত হয়েছে। কমিটি মনে করেন যাঁরা এই অর্থ দান করেছেন তাঁরা স্বভাবতই এই দান কি ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে। সেই জন্যই ব্রিটেনের বিশিষ্ট কয়েকটি সংবাদপত্রকে তাঁরা প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

দলটি ২৬শে নভেম্বর ভারতে গিয়ে পৌঁছবে, তার পূর্বে সাংবাদিকগণ পূর্ব আফ্রিকায় তিন দিন অতিবাহিত করে আসবেন এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা দেখে আসবেন। কটসম্যান পত্রিকার প্রতিনিধি গুজরাটের অন্তর্গত আনন্দের লাইভস্টক ফীড-মিক্সিং পরিকল্পনা পরিদর্শন করিবেন। ২৭শে নভেম্বর সাংবাদিকগণ দিল্লি গিয়ে পৌঁছবেন, এবং পরদিন ভারত সরকারের প্রতিনিধিগণের সহিত এবং ব্রিটিশ হাই কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করবেন।

২৯শে নভেম্বর তাঁরা হায়দ্রাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের দুগ্ধ উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম লক্ষ্য করবেন এবং পর দিন তাঁরা বিজয়ওয়াড়ার দুগ্ধ পরিকল্পনা পরিদর্শন করবেন, ১লা ডিসেম্বর ভুবনেশ্বরের নিকটে পুষ্টি পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজকর্ম পরিদর্শনের পর তাঁরা বিমানযোগে কলকাতায় যাবেন এবং সেখানে পর দিন হরিণঘাটা দুগ্ধ পরিকল্পনা এবং দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা পরিদর্শন করবেন। পরবর্তী দুই দিন তাঁরা সোরখপুর ও বস্তির পুষ্টি পরিকল্পনা পরিদর্শনে অতিবাহিত করবেন। ইহার পর আগ্রার তাজমহল দেখে সাংবাদিকগণ ৪ঠা ডিসেম্বর দিল্লি প্রত্যাবর্তন করবেন। পর দিন তাঁরা লণ্ডনে রওনা হয়ে যাবেন।

দলের সদস্যগণ হলেন : মিঃ জন আকাস্, ডেইলি হেরাল্ড ; মিঃ ইয়ান হোয়ার্ড, ডেলি মেল ; মিস শীলা ডানকান, ডেইলি মিরর ; মিঃ লেটলিন চ্যাপ্টার, ডেইলি টেলিগ্রাফ ; মিঃ রব পেরট, অবজার্ভার ; পিটার কেন, ওয়েস্টার্ন মেইল ; মিঃ ডেভিড রক্সান, নিউজ অব দি ওয়ার্ল্ড ; মিঃ মাইকেল মোরিহাম, সান্ডে টাইমস ; মিঃ আর্থার হপক্রাফট, গার্ডিয়ান ; মিঃ জন ক্লার্ক, স্কটসম্যান ; মিস উইনিফ্রেড নোলস্, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন ; এবং মিঃ বার্নেট সেইডম্যান, ফোটোগ্রাফার। বার্মিংহাম পোস্ট হইতেও একজন প্রতিনিধি ভারতে যেতে পারেন।

ক্ষুধা-হতে-মুক্তি অভিযান সংশ্লিষ্ট যে সমস্ত কর্মচারী দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন তাঁরা হলেন : মিঃ নোয়েল প্যাটার্সন, প্রোজেকটস অফিসার ; মিস্ এরিকা স্পিনি, পাবলিসিটি অফিসার ; এবং মিস সারা ডেনকিনস, প্রেস অফিসার।

নেদারল্যান্ড্সের স্কেটিং

সম্প্রতি নেদারল্যান্ড্সের সমস্ত ঘটনার মধ্যে সবচাইতে অদ্ভুত ঘটেছে নেদারল্যাণ্ডের উত্তর প্রান্তের প্রদেশ—দীর্ঘস্থিত ল্যান্ড্সের বরফ জমা হয় ও খালগুলি দিয়ে ২০০ কিলোমিটারেরও বেশী দীর্ঘ পথ ঘুড়ে যে স্কেটিং দৌড় হয়, তাই হল অদ্ভুততম ঘটনা। এ' প্রদেশের ১১টি সহরকে যুক্ত করে যে সব খাল রয়েছে, তীব্রতম শীতে সেগুলি যখন জমে যায়, হাজার হাজার দর্শক ও প্রতিযোগীদের ভার বহন করার মতো যথেষ্ট পুরু হয়ে বরফ পড়ে একমাত্র তখনই এই ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হতে পারে।

এই বছরে এতো তীব্র শীত পড়ে যে এই ক্রীড়ার পক্ষে প্রয়োজনীয় সবগুলি অনুকূল অবস্থা পাওয়া যায়। সুতরাং একদিন অত্যন্ত ঠাণ্ডা এক প্রভাতে সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় ১০ হাজারেরও বেশী প্রতিযোগী তাঁদের জুতোর নীচে এক জোড়া স্কেট বেঁধে দৌড় তথা ভ্রমণ প্রতিযোগিতা সুরু করলেন। আবহাওয়ার অবস্থা এমন ছিল যে ওলন্দাজ আবহাওয়ার মান অনুযায়ীও তা ছিল ভয়ঙ্কর। কারণ সমস্ত দিনের মধ্যে উত্তাপ, হিমাঙ্কের ১৮টি ডিগ্রীর নীচে ছিল এবং বরফাচ্ছাদিত সমতল ভূমির ওপর দিয়ে বিপুল বেগে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল।

এই দৌড়ের বিজয়ী, বরফ, হাড় জমানো শীতের মধ্যে দিয়ে ১১ ঘণ্টারও কম সময়ে বিকেল সাড়ে চারটার সময় এই অতীব কষ্টকর ২০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে লক্ষ্যস্থলে পৌছান।

নেদারল্যান্ড্সের রাণী জুলিয়ানা নিজের থেকেই সৈন্যবাহিনীকে একটি হেলিকপ্টার পাঠাতে বলেন এবং তাঁকে উত্তর প্রদেশের এই মেরু সদৃশ সমতল ভূমিতে নিয়ে যেতে বলেন। বিজয়ীকে ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দন জানানোর জন্য তিনি ঠিক সময় মতো সেখানে গিয়ে পৌছান। তাঁর স্বামী নেদারল্যান্ড্সের প্রিন্স, একটি হেলিকপ্টারে করে প্রোতিযোগিগণের মাথার ওপর দিয়ে ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছিলেন বলে তিনি সেখানে আগে থেকেই পৌছে গিয়েছিলেন।

এই প্রতিযোগিতায় ৩৩ বছর বয়সের একজন ক্রীড়া শিক্ষক বিজয়ী হন। এই ভ্রমণে ১০ হাজার প্রতিযোগীর মধ্যে মাত্র ৫৯ জন লোক, শেষ প্রান্তে উপস্থিত হতে সক্ষম হন। এঁদের মধ্যে অনেকের দৃষ্টিশক্তি বরফের জন্য অন্ধপ্রায় হয়ে গিয়েছিল, চোখের পাতা, হাতপা জমে গিয়েছিল। তবুও এই বছরের বিপুল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে তাঁরা যে শেষ প্রান্তে পর্যন্ত পৌছুতে পেরেছেন তাতেই তাঁরা খুশী।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ

সচিত্র সংযোজন

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেন সার্ট, ড্রয়ার এবং ব্রীফ্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই দেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; ব্লুজিং স্টোর্স—লেক মার্কেট; গোপাল স্টোর্স, শোভনালয় এবং যাদবগঞ্জ বিসিলেনি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১০৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, নির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইন্দ্রাণী স্টোর্স—২১/১, নির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; জয়দেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (ঠনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাণ্ডারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল ভাবরমল; বীতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ দয়ারাম কেত্রী; জয়কৃষ্ণ অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮৩

Preamble to the Charter of the United Nations

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS

determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and

to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and

to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and

to promote social progress and better standards of life in larger freedom,

and for these ends to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours,
and
to unite our strength to maintain international peace and security, and

to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and

to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,

have resolved to combine our efforts
to accomplish these aims.

Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organisation to be known as the United Nations.

রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও ভারতবর্ষ

বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে দু'দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে, লক্ষ লক্ষ সৈনিক রণভূমিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে, লক্ষ লক্ষ অভাগা চিরতরে অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু হয়ে ফিরেছে, কোটি কোটি নিরীহ নিষ্পাপ নরনারী নিহত হয়েছে অমানুষিক নিষ্ঠুরতায়, আর মানুষের কত যে অমূল্য ঐশ্বর্য, কত যে সযত্নলালিত সম্পদ ধ্বংস হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

মানুষের মনে তাই একটি প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠেছে: সারা জগৎ জুড়ে এই যে যুদ্ধ, হিংসা, হত্যার উন্মত্ততা, মিথ্যার রাজত্ব, ধ্বংসের প্রচণ্ড লীলা—মানুষ কি পারবে একে প্রতিরোধ করতে? মানুষের মধ্যে এখনো সুপ্ত আছে কি সেই শক্তি? কোথাও কি রয়েছে অনির্বাণ অধ্যাত্ম-বহ্নি?

ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে সেই সাধনাই করে চলেছে। ভারতের মুনি ঋষি তপস্যা করেছেন বিশ্ব-কল্যাণের জন্যে। যখনই দেখা দিয়েছে ধর্মের গ্লানি, হয়েছে অধর্মের উদ্ভব, তখনই যুগে যুগে সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্টের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন ধর্মভূতের অধীশ্বর—রাবণের দর্পচূর্ণ হয়েছে, কুরুকুলের পরাজয় ঘটেছে—আর মহাদুর্যোগের দিনে মানব-চেতনায় এসেছে বিরাট পরিবর্তন। যুগে যুগে এসেছেন যুগাবতার, মানবাত্মার নতুন অভিব্যক্তি হয়েছে।

এই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছেন বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, শঙ্করাচার্য, শ্রীরামকৃষ্ণ। তমসাবৃত পৃথিবীতে তাঁরা এনে দিয়েছেন শান্তি, সৌন্দর্য, আনন্দময় আত্মার আলোক, বিচ্ছেদের পরিবর্তে ঐক্য, সামঞ্জস্য, হিংসার পরিবর্তে প্রেম, মৈত্রী, ধ্বংসের পরিবর্তে স্থিতি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ প্রচার করেছেন ভারতের শাশ্বত আদর্শ: ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানব-জাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তি নির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। ... পৃথিবীর সভ্য সমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

বিশ্বকল্যাণের জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করে প্রবল প্রাণশক্তি নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন: আমার ধর্ম হল সত্য আর সমগ্র বিশ্বই আমার স্বদেশ। শান্তির পথ দেখাতে তিনি ঘোষণা করেছেন: ঘৃণা নয়, প্রেমই পারে শান্তি এবং সুমহান পবিত্রতার পথ নির্দেশ করতে। তাঁর অমর-বাণী আজ পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর হৃদয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে: প্রেম কখনো ব্যর্থ হয় না। আজ কিংবা আগামীকাল অথবা কোন না কোনদিন সত্যের জয় হবেই হবে, প্রেম বিশ্ব-বিজয়ী হবেই।

এই ভারতবর্ষ থেকেই শ্রীঅরবিন্দ সারা বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন—কি আমাদের ধর্ম, কি আমাদের সনাতন আদর্শ। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম আর্যশিক্ষার মূল কথা। জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্যচরিত্রের লক্ষণ। মানবজাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা আর্য জাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তার ধর্মের চরিতার্থতা।

সত্য ও অহিংসার পূজারী মহাত্মা গান্ধী রাষ্ট্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রমাণ করলেন যে সত্য ও অহিংসের শক্তি অমোঘ। তিনি চেয়েছিলেন সারা পৃথিবীতে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হোক। তিনি বলেছেন: আমি, 'রাম' অর্থে বুঝি 'সত্য', সত্যেরই নাম হল রাম, রামরাজ্যের সমাজনীতি হল:—সবাই উদার সবাই পর-উপকারী।

• • • •

এখানে সকল মানুষ উদার ও পরোপকারী। সকল মানুষ পরস্পরের প্রতি প্রীতির ভাব রেখে চলে থাকে।

আজকের ভারতবর্ষ বিশ্বরাজনীতিতে শান্তিবাদের উপাসক, আর এই শান্তিবাদ তার প্রতিটি ধূলিকণায় মিশে আছে। আজ যারা বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত তাদের অনেকের চেয়ে দেশ ও রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষ প্রাচীন। এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত আজকের ভারতবর্ষের পররাষ্ট্রনীতি হল শান্তি ও মৈত্রী।

আর সেই জন্যই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রক্তস্নানের শেষে যখন মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হল, যখন রাষ্ট্রসংঘের সনদে ঘোষিত হল :

WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS determined to save succeeding generations from the scourge of war……to unite our strength to maintain international peace and security.

তখন তার মধ্যে ভারতবর্ষ তার মহা আদর্শ রূপায়ণের একটা পথ খুঁজে পেয়েছিল।

তাই স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র দু' বৎসর পরেই শ্রীনেহরু ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বলেছিলেন : আমরা সকল রাষ্ট্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন……বিশ্বে আমাদের একমাত্র লক্ষ্য শান্তির প্রতিষ্ঠা। বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ঐক্যবদ্ধ।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ একমাত্র আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যার মধ্য দিয়ে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা যায়। পৃথিবীর বহু বিভিন্ন দেশকে একমাত্র রাষ্ট্রসঙ্ঘই নিয়ে যেতে পারে অমিল থেকে মিলের দিকে, এইখানেই বিশ্বের সর্বদেশ মিলতে পারে, প্রতিষ্ঠিত করতে পারে পারস্পরিক সম্প্রীতি, প্রশস্ত কল্যাণমূলক করে তুলতে পারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পথ।

শান্তি আন্দোলন তথা পৃথিবীর শান্তিপূর্ণ পরিমণ্ডল সৃষ্টির মহৎ ভূমিকা গ্রহণ করেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘে শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারে, রোগ দূরীকরণে, ক্ষুধা নিবারণে এবং বৈষয়িক সমৃদ্ধি সাধনে বহুমুখী প্রচেষ্টা চলেছে তার বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে যা পৃথিবীর কোটি কোটি নরনারীর প্রাণে এনেছে নবজীবনের আশা ও আনন্দ। শান্তির শক্তির কাছে পরাজিত হয়েছে অস্ত্রের শক্তি।

তথাপি একটা সংশয় থেকেই যায়। এখনো রাষ্ট্রসঙ্ঘ পৌঁছতে পারেনি দীনতম দরিদ্রতম দূরতম মানুষের দুয়ারে তার নবজীবনের বাণী নিয়ে, এখনো তার মধ্যে রয়ে গেছে প্রচার, সংগঠন এবং কর্মধারার প্রত্যাশিত বিস্তারের অভাব। তাকে হতে হবে বিশ্বজোড়া বৃহত্তম ও সর্বশক্তিশালী। তার আদর্শ, তার লক্ষ্য, তার সাধনা প্রচার করতে হবে বিশ্বের প্রতিটি নরনারীর কাছে। আর সেই সঙ্গে শান্তিকামী নবজীবনপিপাসু মানুষকেও এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পতাকাতলে, আসতে হবে শিক্ষালাভের জন্যে, স্বাস্থ্য লাভের জন্যে, শিল্পে কৃষিতে উন্নতি সাধনের জন্যে, মৈত্রী সাধনের জন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের জন্যে। সত্যিকার শান্তিপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য প্রতিটি সাধারণ মানুষ এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের কল্যাণ-আদর্শ—এই দুয়ের মিলনে প্রতিষ্ঠিত হবে এক নূতন শান্তিপূর্ণ, সুন্দর, আনন্দময় বিশ্ব—সেইদিনই স্বপ্ন হবে সত্য, বিশ্ব হবে এক পরিবার।

নির্মলেন্দু মায়া

রাষ্ট্রসংঘ ও আপনি

লক্ষ লক্ষ জীবনের আহুতি নিয়ে কোটী কোটী মুদ্রার ক্ষতিতে ইংরাজি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত চলল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। যখন যুদ্ধ শেষ হোল তখন পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জাতিই হয়েছে ক্লান্ত, শক্তিহীন ও দেউলিয়া।

তারপর যখন ইংরাজি ১৯৪৫ সালে যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে শান্তি স্থাপিত হোল তখন সব দেশের স্বাধীন ব্যক্তিরা ভবিষ্যতে এই রকম মহাযুদ্ধ যাতে আর না ঘটে তার স্বীকৃতি দিতে বদ্ধপরিকর হলেন।

যুদ্ধের শেষে লক্ষ লক্ষ গৃহহারা সর্বহারা উদ্বাস্তু দলকে দেখে আগ্রহ হোল করুণ, উদ্দীপ্ত হোল সেবাব্রত। সারা বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল যাতে এমন সর্বধ্বংসী যুদ্ধ ভবিষ্যতে আর কখনও না হয়, পৃথিবীর শান্তির আবহাওয়া বজায় থাকে আর অনুন্নত দেশগুলি সব দিক দিয়ে উন্নতির সুবিধা ও সাহায্য পায়।

এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ইং ১৯৪৫ সালে ৫১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে সমবেত হলেন। তাঁদের পরস্পরের আলোচনার ফলে প্রতিষ্ঠিত হোল রাষ্ট্রসংঘ। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যসংখ্যা এক শতেরও অনেক বেশি। পৃথিবীতে শুধু শান্তি রক্ষাই এর উদ্দেশ্য নয় সারা পৃথিবীতে সাহায্যপ্রার্থী দেশগুলিকে সবদিক দিয়ে সাহায্য করে বিশ্ববাসীকে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, স্বাস্থ্য দান করে এক সুখী বিশ্বপরিবার গঠন করাই এদের মুখ্য উদ্দেশ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যে লিগ্ অব নেশনস্ এর পত্তন হয়েছিল তার ভুলভ্রান্তি ত্রুটীবিচ্যুতির যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় রাষ্ট্রসংঘের প্রতিষ্ঠাতারা সে বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক ও সচেতন হলেন।

রাষ্ট্রসংঘই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির বার্তা বহন করে আনেন এবং বিশ্বজুড়ে জনগণের যে দুর্দশা ও দুঃখ চলেছে তাঁর নিবারণ করবার সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করেন। সারা দুনিয়ার দুঃখ অশান্তি অভাব চিরতরে কিভাবে দূর করা যায় সে বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ সর্বদাই বিশেষ সচেষ্ট।

রাজনীতির গণ্ডির বাইরেই রাষ্ট্রসংঘের সব চেয়ে বেশি সাফল্য হয়েছে। কোটী কোটী লোকের উপকারের জন্য স্বাস্থ্যরক্ষার বিবিধ প্রকার ব্যবস্থা, উন্নতধারার কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন ও সর্ব স্তরের লোকের সুশিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা করেছে এই রাষ্ট্রসংঘ।

রাষ্ট্রসংঘে উচ্চ পর্যায়ের কার্যপরিচালক সংস্থাগুলির গঠনপ্রণালী দেওয়া গেল :—

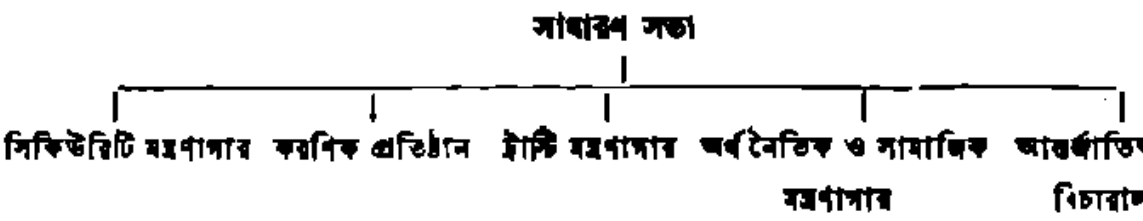

নিউ ইয়র্ক শহরের ইষ্ট্ নদীর তীরে যে অট্টালিকা শ্রেণী দাঁড়িয়ে আছে সেগুলিই রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয়। এইগুলির জন্য জমিদান করেছেন মানবপ্রেমিক জন, ডি, রকফেলার (ছোট)।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভাকে বলা হয় পৃথিবীর পৌরসভা। এখানে সভ্যেরা আলোচনা করেন অনেক রকম সমস্যা। ছোট বড় যে কোন রাষ্ট্রের প্রত্যেক সভ্যই সমভাবে নিজ নিজ দাবী জানাতে পারেন। যে কোন ভাষায় বক্তৃতা হলেও সভ্যেরা ইয়ারফোনের সাহায্যে তার অনুবাদ শুনতে পান।

রাষ্ট্রসংঘের সিকিউরিটি মন্ত্রণাগারের ক্ষমতা অন্যান্য সংস্থার চেয়ে অনেক বেশি। এর কাজ হোল পৃথিবীর সর্বত্র শান্তিরক্ষা। এই কাজে পূর্ণ সফলতা লাভ করতে না পারলেও অনেক রক্তপাত বন্ধ হয়েছে এই হস্তক্ষেপের ফলে।

সব রাষ্ট্রের সভ্য নিয়ে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্রসংঘ। কোন অবস্থাতেই একটিমাত্র রাষ্ট্রের ভিতর থেকে বেশি সংখ্যক সভ্য লওয়া হয় নি। কেবল সিকিউরিটি মন্ত্রণাগারেই একজন মাত্র সভ্য ভিটো দিয়ে সভার নির্দ্ধারণকে নাকচ করতে পারেন। যেমন রাশিয়া প্রায়ই করে থাকেন।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক মন্ত্রণাগারে, সর্বক্ষেত্রে মানব-সমাজের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রসংঘের কর্ম সংস্থাগুলির একত্রবিধানে সাহায্য করা হয়েছে। মানবসমাজের দাবী, বাস্তুহারা সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

ট্রাস্টি মন্ত্রণাগার হোল রাষ্ট্র সংঘের সর্বপ্রধান কর্মক্ষেত্র। স্বায়ত্ত শাসনের অনুপযুক্ত ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করা এই মন্ত্রণাগারের কাজ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে সব রাষ্ট্র একনায়ক-কর্তৃক পরিচালিত হোত সেগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা এই মন্ত্রণাগারের কর্মের অন্তর্ভুক্ত। কারিক প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র বিশাল। প্রধান সেক্রেটারী রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি। শান্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব তাঁরই সবচেয়ে বেশি।

আন্তর্জাতিক উচ্চ বিচারালয় রাষ্ট্রসংঘের বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারের সর্বপ্রধান প্রতিষ্ঠান। এর বিচারই চরম, আর তার কোন আপীল নেই।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক মন্ত্রণাগারের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। নানা বিভাগের ভিতর দিয়েই এর মিলনাত্মক কর্মক্ষেত্র প্রসারিত।

একমাত্র বিশ্ব-স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই জগতের স্বাস্থ্য সমস্যার চূড়ান্ত নিরসন হতে পারে, এই উদ্দেশ্যে ইহা স্থাপন করা হয়েছে। রোগ নিবারণের জন্য কর্মক্ষেত্রে দলে দলে লোক রোগ বিতাড়ন কাজ করে চলেছে রাষ্ট্রসংঘের পরিচালনায়।

এর আর একটি শ্রেষ্ঠ কাজ হোল পৃথিবীর সব দেশের চিকিৎসকদের কাছে অতি আধুনিক ও উন্নত প্রণালীর চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্যাদি পরিবেশন করা। বিশ্ববাসীর জন্যে একটি স্বাস্থ্য ও রোগমুক্ত সুন্দরতর পৃথিবীর সৃষ্টি করা যায় বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার ক্রমপ্রসারী কর্মপ্রচেষ্টায়।

বিশাল কর্মক্ষেত্রগুলির কার্য্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে যে সব শিশু অনাথ হয়েছে, তাদের সাহায্য করার জন্যে রাষ্ট্রসংঘ একটা অর্থভাণ্ডার (ফাণ্ড) খুলেছেন; আর সেই ভাণ্ডার থেকে এখনও অর্থ দান করা হচ্ছে নিরাশ্রয় শিশুদের শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যে।

শিক্ষা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক জ্ঞানের ব্যাপক প্রচারও রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম উদ্দেশ্য। ভবিষ্যৎ জীবন-গঠনের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশুদের স্বাস্থ্য মন ও দেহ গঠনের উদ্দেশ্যে স্বভাবসুন্দর উদ্যান রচনার কাজে তাদের লাগানো রাষ্ট্রসংঘের আর একটি শিশুমঙ্গল কার্য। শিশুদের দুগ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য

সরবরাহ করাও রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ একটি কাজ। ভাষাগত অসুবিধা ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে ভাবের আদান প্রদানও রাষ্ট্রসংঘের কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষিসংস্থা আপনাদের খামার, বনভূমি মৎস্যসম্পদ থেকে আরো ভালো খাদ্যাদি সংগ্রহে সাহায্য করে।

যাতে পশু উৎপাদন, বনভূমির সুবিধা ও মৎস্যের চাষ অধিক পরিমাণে হয়, সে বিষয়েও রাষ্ট্রসংঘ মোটেই উদাসীন নয়। মৎস্যের চাষ যাতে উত্তমরূপে হয় সেজন্য আবশ্যকীয় আধুনিক যন্ত্রপাতিও এই সংস্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধীবরদের জন্য সরবরাহ করে থাকেন।

খাঁটি দোহুদ্ধ স্বাস্থ্যের পক্ষে অপরিহার্য। এই দুগ্ধের জন্য গোপালনও রাষ্ট্রসংঘের কর্মক্ষেত্রের একটি অন্যতম বিশিষ্ট অংশ। বিভিন্ন দেশে দুগ্ধ সরবরাহ যাতে ঠিকমত হয়, সেজন্য উপযুক্ত কারখানাও স্থাপিত হয়েছে।

বিভিন্ন দেশে পতিত ও অনুর্বর জমি যাতে চাষের সুবিধা পায় ও ফসল উৎপাদনের উপযুক্ত হয়, সেজন্য কৃষি-উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রসংঘ যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি প্রণালী রাষ্ট্রসংঘ প্রবর্তন করেছেন। এর ফলে পৃথিবীর কৃষিপদ্ধতি ও আবাদের চাষের উপযুক্ত পতিত জমিগুলির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

আণবিক শক্তির দ্বারা যাতে জগতে মঙ্গলজনক কার্যাবলী সার্থক করা যায়, তার জন্যও রাষ্ট্রসংঘ বদ্ধপরিকর।

বিদ্যুৎ পরিচালিত যন্ত্রপাতির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনে যাতে জনগণের সুখসুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান সম্ভবপর হয় ও তদ্দ্বারা বিশ্বের যথেষ্ট মঙ্গল সাধিত হয়, এই উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তিকে বিশেষ ভাবে এ কাজে নিয়োগ করেছেন শান্তিকামী রাষ্ট্রসংঘ। যে সব দেশে এর অভাব ছিল, সে সব দেশ আণবিক শক্তির দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তুত যাত্রী ও মালবাহী জাহাজ নাভানক আণবিক শক্তিকে শান্তি ও মঙ্গলজনক কার্যে নিযুক্ত করবার আর একটি নিদর্শন।

সকল স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে সংবাদের আদান প্রদানের দ্বারা আপনারও যাতে উপকার হয়, সেকাজ আণবিক শক্তির সাহায্যে সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে যে সব বাস্তুহারা উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়ে দুর্বহ জীবন যাপন করছে, তাদের সাহায্যের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সর্বদা উৎসুক।

বিভিন্ন দেশের শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলি যাতে দ্রুত উন্নতি ও প্রসার লাভ করতে পারে, সে বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার বিশেষ লক্ষ্য। শ্রমিকদের বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞানলাভ করার বিষয়েও রাষ্ট্রসংঘ নিশ্চেষ্ট নন। বাস্তুহারাদের নানাভাবে শিক্ষিত করে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদানও রাষ্ট্রসংঘের আর একটি কর্মপন্থা। নূতন গৃহ, নূতন জীবনের সূচনা,—এই সব প্রকৃত সাহায্যই রাষ্ট্রসংঘ বাস্তুহারাদের করে থাকেন।

শ্রমিক জীবনে স্বাস্থ্যোন্নতি, উপযুক্ত বেতন, স্বাস্থ্য ছুটিছাটা ও উপযুক্ত পেনসনদান আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘের উদ্দেশ্য।

আন্তর্জাতিক অর্থবিনিময় সংস্থা ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এর কাজ হচ্ছে কোন দেশে নূতন

কোন নির্মাণকার্যে বা অর্থের অনটনে সেই দেশকে টাকা ধার দেওয়া। এই ব্যাঙ্ক উন্নয়নশীল সরকারের আমিনে সেখানে বাঁধ নির্মাণ, কারখানা স্থাপন ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জন্য টাকা দিয়ে থাকেন।

টাকাকড়ির আদান প্রদান ব্যাপারে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (ফাণ্ড) সকল দেশের সরকারকে সেই সেই দেশের অর্থের সুবিনিয়োগ-কালে সাহায্য করে থাকেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে মুদ্রা বিনিময়ের কাজও এঁরা করেন।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কর্পোরেশন কোন দেশের সরকারকে জামীন ছাড়াও অর্থ সাহায্য করে থাকে। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত থেকে নূতন নির্মাণে অর্থসঙ্কট মোচন, স্থানীয় কলকারখানা স্থাপন ও দেশের উন্নতি সাধন রাষ্ট্রসংঘের কাজ।

আন্তর্জাতিক পোষ্টাল ইউনিয়ন পৃথিবীর সবদেশের ডাকঘর-সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য দান করার ভার নিয়েছেন। বহু দুর্গম স্থানে দ্রুত চিঠিপত্রবিলির ব্যবস্থা ও ডাকঘরের উন্নতি বিধান করাই এর কাজ।

আন্তর্জাতিক তার ও বার্তার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মাধ্যমে টেলিভিশনের ব্যবস্থা করে থাকেন। এর দ্বারা এই প্রতিষ্ঠান রেডিও, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের কাজে আন্তর্জাতিক সংবাদ বিতরণের সমস্যা দূর করার সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক বেসামরিক আকাশ-যান পরিচালনা-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন দেশের সরকারকে শূন্যে যাতায়াত সম্পর্কীয় নানা সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকেন। শূন্যপথে যাতায়াত যাতে আরও নিরাপদ হয় আর নূতন ধরণের নিয়ন্ত্রণযোগ্য যন্ত্রপাতি যাতে আকাশযানে ও এয়ার ষ্টেশন সমূহে ব্যবহৃত হয় তার ব্যবস্থা এঁরা করে থাকেন।

পৃথিবীর আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান আবহাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করেছেন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে যাতে আবহাওয়া খবর দ্রুত পৌঁছিয়ে দেওয়া যায়, সেজন্য এই প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

বিভিন্ন দেশের সরকারের মধ্যে সমুদ্রযাত্রার পরামর্শ-প্রতিষ্ঠান সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিষয়ে অনেক সুখসুবিধা দান করেন। নানা দেশের মধ্যে সামুদ্রিক চুক্তি সম্পাদন করে তাঁরা এমন সব আইন কানুন রচনা করেছেন, যা সকলেই মেনে নেন।

রাষ্ট্রসংঘের কর্মসূচী সকল দেশ মেনে চললেও, কতকগুলি বিষয় পরিত্যাগ করতে হয়েছে এইজন্য যে, উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র পাওয়া যায় নি। যেখানেই নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেখানেই রাষ্ট্রসংঘ এগিয়ে গেছেন। পৃথিবীতে যাতে শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যের মধ্যে উন্নততর জীবন-প্রণালী লাভ করা যায়, রাষ্ট্রসংঘের লক্ষ্য সেই দিকে।

যদিও রাষ্ট্রসংঘের বহুমুখী প্রচেষ্টা ও কর্মসূচীর অনেকগুলির উল্লেখ করা হল, এখনও অনেক কিছু আছে যা স্থানাভাবে বলা হল না।

যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেকে ছিলেন ও আছেন, যাঁরা রাষ্ট্রসংঘের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

এডলাই ষ্টিভেনসন্—ইনি রাষ্ট্রসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত। তিনি তাঁর ন্যায়নিষ্ঠা ও দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র সুপরিচিত। রাষ্ট্রসংঘের নিয়মাবলী রচনার জন্য তাঁর সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

এলিনর রুজভেল্ট—ইনি পরলোকগত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টের সহধর্ম্মিণী। এই মহীয়সী নারী বহুদিন যাবৎ মানবহিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। ইনি রাষ্ট্রসংঘে আমেরিকার প্রতিনিধি ছিলেন।

রালফ বাঙ্ক—ইনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ। রাষ্ট্রসংঘের গঠনকার্য্যে এঁর সহায়তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে রাষ্ট্রসংঘের আণ্ডার সেক্রেটারী।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের যাঁরা রাষ্ট্র সংঘের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে চারটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম।

ট্রিগভি লাই নরওয়ে-বাসী, রাষ্ট্রসংঘের প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল।	ডাগ হ্যামারজোলট সুইডেন-বাসী। মিঃ লাই-এর পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল হন। রাষ্ট্র সংঘের কাজে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান।	কাউণ্ট ফোকে বার্ণাডোট (সুইডেন বাসী) ইনি ১৯৪৮ সালে জেরুসালেমে আরব ইহুদী সংঘর্ষে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় প্রাণ হারান।	রবার্ট গাভিনার (ঘানা-বাসী) বর্ত্তমানে রাষ্ট্র সংঘের কার্য্য পরিচালনার ভার নিয়েছেন।

মেক্সিকোর অরণ্যে যারা শিকারে বা কাজে যেত, তারা প্রায়ই খুব্‌ত একপ্রকার কঠিন জ্বরে। সে জ্বর একবার ধরলে কোন ঔষধেই সারত না।

এ জ্বরের জন্যে কি করা যায় এই কথাই তখন চিকিৎসকমহলে চিন্তার বিষয় হয়ে পড়ল।

এর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হলে, গবেষণা করতে হলে চাই সুস্থ শরীর,—চাই আত্মোৎসর্গের প্রেরণা।

জোসেফ কনরাড্‌ নামে একটি যুবক তার দেহভরা স্বাস্থ্য আর অটুট জীবনীশক্তি নিয়ে এগিয়ে এলেন।

—এতে তোমার জীবন যেতে পারে জান?—মৃদুস্বরে বললেন চিকিৎসকের দল।

—আমি সব সময়েই প্রস্তুত। আমার জীবন দিয়ে যদি আর্ত্তের উপকার করতে পারি,—সেইটেই আমার সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার জিনিষ।

—তুমিই আমেরিকার শ্রেষ্ঠ নাগরিক। তুমিই উজ্জ্বল করলে দেশ ও জাতির মুখ।

জোসেফ কনরাড্‌ প্রাণ দিলেন বটে, কিন্তু সেই দুঃসাধ্য জ্বরের ঔষধ আবিষ্কার হল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের সারা বছরের কাজ

রাষ্ট্রসংঘের ঐতিহাসিক ঘটনা হচ্ছে বছরের বারটি মাসই আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাওয়া।

রাষ্ট্রসংঘের উপর সাধারণের লক্ষ্য শুধু জেনারেল এসেম্‌ব্লি আর সিকিউরিটি কাউন্সিল নিয়ে। এই দুইটি রাষ্ট্রসংঘ সংস্থার যেমন প্রয়োজনীয় দায়িত্ব আছে, রাষ্ট্রসংঘের দৈনন্দিন কার্যাকলাপ—যদিও সেগুলি খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে ছাপা হয় না—সেগুলিও কিছু কম নয়, সেগুলি এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়কেই বুঝায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইং ১৯৬২ সালে কাউন্সিল ও এসেম্‌ব্লি ছাড়া অন্ততঃ পঞ্চাশটি বিভিন্ন সংস্থা রাষ্ট্রসংঘের প্রধান কার্যালয়গুলিতে সমবেত হয়েছিল। কতকগুলির বিষয় এসেম্‌ব্লি উত্থাপন করেন,—যেমন ঔপনিবেশ শূন্যের সমাপ্তি,—এবং সারা বছর-এর তথ্যাদি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রস্তুত করণ। অপর সংস্থাগুলি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের অধীনে কাজ করে গেছেন। শুধু রাষ্ট্রসংঘের সম্পাদিত কাজগুলির তালিকার দ্বারাই দেখা যায় যে, এই প্রতিষ্ঠান বৎসরের ৫২ সপ্তাহ ধরে শুধু এর কার্য্যপন্থার নির্দিষ্ট নীতিই অনুসরণ করে এসেছেন, যথা :

১। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষণ।

২। জনগণের সমাধিকার ও শান্তিরক্ষার আগ্রহ এবং এতদুদ্দেশ্যে বিশ্বশান্তির কার্যপন্থাকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন।

৩। সর্বরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবিক সমস্যাগুলির জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভ এবং মানবিক অধিকার সম্প্রসারণের ও জাতি, নারী পুরুষের বৈষম্য, ভাষা ও ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থা।

৪। সর্ব রাষ্ট্রের মধ্যে একতা স্থাপন করে এই সকল সাধারণ উদ্দেশ্যগুলির সাফল্যের জন্য কেন্দ্রশক্তি রূপে কার্য করা। শান্তিরক্ষার কাজে অনেক সময় দেখা যায় যে, একটা সঙ্কটজনক সমস্যার নিরসন না হতেই আর একটি সমস্যা এই বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিজড়িত হয়ে পড়েছে।

ওয়েষ্ট নিউগিনির সম্পর্কে যে সঙ্কটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং যার ফলে ডাচ ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে দারুণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, ইং ১৯৬২ সালে সেক্রেটারী জেনারেল ইউ থাণ্ট, সেটা নিবারণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তার পরে দ্রুতভাবে ইউ থাণ্ট, এবং রাষ্ট্রসংঘ কম্বোডিয়া ও থাইল্যাণ্ডের সীমানা নির্ধারণের বিসম্বাদ, কিউবার সঙ্কট এবং কঙ্গোর সমস্যা দূরীকরণে আগ্রহশীল হন।

ইং ১৯৬২ সালে এসেম্‌ব্লি ২১ জন সভ্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। রাষ্ট্রসংঘের ইতিহাসে এটি হলো সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দল। এই দলের কাজ হোল রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষার কাজগুলি সম্পন্ন করার জন্য অর্থনৈতিক সাহায্য করবার কি উপায় আছে, সেটা জ্ঞাত হওয়া ও এই সেক্সী যাতে হেড্‌ কোয়ার্টারস-এ মিলিত হয়ে যত সত্বর সম্ভব তার রিপোর্ট দাখিল করেন, তার ব্যবস্থা করা।

আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের অনুসরণীয় ভূমিকায় দেখা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ণধার বা

সরকারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সংঘ পরিদর্শনে এসেছেন। বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণ যাঁরা আমেরিকায় এসেছেন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে, এবং যাঁরা সাধারণভাবে এসেছেন, তাঁরাও সেক্রেটারী জেনেরালের দপ্তর পরিদর্শন করে গেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলনে প্রায়ই যোগদান করেছেন।

রাষ্ট্রসংঘ সকল দেশের লোকের মধ্যে যাতে স্বমর্যাদা বর্ত্তমান থাকে, এ ব্যাপারে হেড্ কোয়ার্টারসে অনেক সভায় আলোচনা হয়েছে। ট্রাষ্টিশিপ্ কাউনসিল, যাতে এখন মাত্র তিনটি দেশের অবস্থা বিবেচিত হচ্ছে, যথা প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, নাইজ, এবং অষ্ট্রেলিয়ার আয়ত্তাধীনে নিউগিনি, এরও অধিবেশন হচ্ছে।

ইং ১৯৬২ সালে এসেমব্লি সভ্য সংখ্যা বাড়িয়ে ২৪ জন করবার মনস্থ করেন। যত সত্বর সম্ভব কমিটি গঠন শেষ হলে পরপর নূতন সভার অধিবেশন আরম্ভ হবে।

আরও একটি সংস্থা যার কাজ স্বায়ত্তশাসনহীন রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে বিবরণ সংগ্রহ করা, এই বৎসরে এরও সভার অধিবেশন হবে হেড্কোয়ার্টারসে। এর সঙ্গে থাকবে লোকসংখ্যা কমিশন।

অবশিষ্ট সংস্থাগুলির অধিবেশন জেনারেল এসেম্ব্লি দ্বারা স্থির করা হবে। বিভিন্ন অধিবেশনের বিবরণ সংগ্রহ করে পরবর্তী অধিবেশনে দাখিল করাই এর কাজ।

ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এসিয়া এবং সুদূর পূর্বদেশের সম্পর্কে রিপোর্ট ও বিশেষভাবে উল্লিখিত এজেন্সীগুলির রিপোর্ট রাষ্ট্রসংঘের হেড্ কোয়ার্টারসে পাওয়া যাবে। প্রায়ই রাষ্ট্রসংঘের কোন না কোন বিষয়ের একজন বিশেষজ্ঞকে ভার দেওয়া হয় যাতে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট বিষয়ের সাম্প্রতিক উন্নতি সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করেন।

কিউবা, কঙ্গো অথবা মধ্য প্রাচ্য সম্পর্কে রাষ্ট্রসংঘের কার্যাবলী মাঝে মাঝে সারা দুনিয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের বেশীর ভাগ কাজই নিষ্পন্ন হয় দৈনন্দিন কর্মপন্থার কমবেশী নিয়মানুসরণে।

বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক টলষ্টয়কে একবার জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি যে যুদ্ধ ও শান্তির কথা নিয়ে উপন্যাস লিখেছেন, আপনিই বলুন, পৃথিবীতে সত্যি লোকে কি চায়? যুদ্ধ চায়, না শান্তি চায়।

টলষ্টয় হেসে বললেন—পৃথিবীতে বাস করতে হলে শান্তির চেয়ে বেশী কাম্য আর কি হতে পারে?

—তবে মানুষ যুদ্ধে মেতে ওঠে কেন?

—শান্তির মাহাত্ম্য সহজেই বুঝতে বলে।

—তবে কি দুটোরই প্রয়োজন?

—না, শুধু শান্তির। তবে যে পথে সহজেই শান্তি আসতে পারে, সে পথ ছেড়ে মানুষ ছোটে ভুলপথে। যুদ্ধের ভীষণতা ভাল করে বোঝবার পর যে শান্তি আসে, সেইটেই হোল স্থায়ী শান্তি। পৃথিবীতে অনেক রণতাণ্ডব দেখা গেছে, এবার আসছে শান্তির দিন, মানুষ বুঝেছে শান্তির আশীর্বাদ।

খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রাষ্ট্রসংঘ

বিংশ শতাব্দীর এই সপ্তদশকে 'রাষ্ট্রসংঘ উন্নয়নের দশ বছর' পরিকল্পনার কাজ চলছে। এই উন্নয়ন পরিকল্পনায় পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সমৃদ্ধি ও উন্নতিতে সমস্ত রাষ্ট্রের সমবেত প্রয়াস নিয়োজিত হয়েছে। একদিকে যখন এই সমবেত আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা চলেছে সেই সময় রাষ্ট্রসংঘ মানুষের চিরকালের শত্রু খাদ্যাভাব, ব্যাধি, অজ্ঞতা ও দারিদ্র্য চিরতরে দূর করার জন্য এগুলির ওপর সুসংহত আক্রমণ হানার আয়োজন করছে।

খাদ্যাভাবের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের প্রধান ভূমিকা ও দায়িত্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার। এটি রাষ্ট্রসংঘেরই একটি বিশেষ এজেন্সি বা সংস্থা। রাষ্ট্রসংঘের যেসকল বিশেষ সংস্থা পল্লী অঞ্চলের মানুষের একেবারে কাছাকাছি এসে কাজ করে, বিশেষ করে যেসব স্বল্পোন্নত দেশে খাদ্যোৎপাদন, খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিজনিত সমস্যা অত্যন্ত তীব্র সেই সকল দেশের মানুষের সঙ্গে যারা ঘনিষ্টভাবে মিশে কাজ করে, খাদ্য ও কৃষিসংস্থা তাদেরই অন্যতম।

সম্প্রতি প্রামাণ্য হিসাবে দেখা গেছে, সমগ্র বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ৫০ কোটি লোক বর্তমানে পর্যাপ্ত খাদ্য পায়না, আর এর দ্বিগুণ সংখ্যক লোক অপুষ্টিজনিত রোগ ভোগ করে।

খাদ্যাভাব যে দূরীভূত হয়নি তার প্রধান কারণ, খাদ্য ও কৃষি ব্যবস্থার কারিগরি উন্নতির সুফলগুলি এতদিন পর্যন্ত মূলতঃ ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা ও ওসেনিয়ার অপেক্ষাকৃত উন্নত কয়েকটি দেশ এবং দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও আফ্রিকার মুষ্টিমেয় কয়েকটিমাত্র দেশ ভোগ করে এসেছে। এর ওপর আবার আছে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা। জনসংখ্যা বর্তমানে বছরে প্রায় ৫ কোটি ৪০ লক্ষ করে বাড়ছে।

সমস্যার গুরুত্ব যে কতখানি স্বর্গতঃ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট তা উপলব্ধি করেছিলেন। ১৯৩০ সালের মে মাসে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করলেন। ৪৪টি রাষ্ট্র ভার্জিনিয়ার হট স্প্রিংসে এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং খাদ্যাভাব ও অপুষ্টি দূর করার জন্য একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে দ্বিতীয় সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে কানাডার কুইবেকে। এই সম্মেলনেই রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সূচনা হল আনুষ্ঠানিকভাবে।

১৯৪৫ সালে যখন এই সংস্থার গঠন হল তখন এর সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ৪২, আর ১৯৬২ সালের ১লা আগস্ট এর সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০০ এবং সহযোগী সদস্যসংখ্যা ৪। সংস্থার নিয়মিত কার্যকলাপে সাহায্যের জন্য প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র তার জাতীয় আয়ের অনুপাতে অর্থদান করে থাকে। শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন সংস্থার বর্তমানে ডিরেক্টর জেনারেল।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হল জীবনযাত্রার মান উন্নত করা, কৃষি পণ্যোৎপাদনে ও বণ্টনে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পল্লীগ্রামের অধিবাসীদের পুষ্টিবিধান ও তাদের অবস্থার উন্নতিসাধন করা। এই

সংস্থা বিভিন্ন দেশের সরকার, বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও কৃষিনেতাদের ব্যবহারের জন্য খাদ্য ও কৃষিপণ্য এবং কারিগরি সমস্যাদি সম্পর্কে মৌল তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে, কৃষি পণ্যে ঘাটতি ও উদ্বৃত্ত প্রভৃতি সমস্যার সমাধানে বিভিন্ন সরকার যাতে সমন্বেতভাবে চেষ্টা করে সেদিকে লক্ষ্য রাখে, এবং অনুরোধ জানালে সংস্থার নিজস্ব কারিগরি কর্মী উন্নতিশীল দেশে গিয়ে তাদের কারিগরি উপদেশ ও সাহায্য দিয়ে থাকে। এই সব বিশেষজ্ঞের পরামর্শ অনুসারে বহু দেশেই চাউলের উৎপাদন যথেষ্ট বেড়ে গেছে। সঙ্কর ভুট্টা ও উন্নততর গম চাষের ফলে খাদ্যের সরবরাহও বৃদ্ধি পেয়েছে।

তেহরানে সর্বপ্রথম যে বৃহৎ আধুনিক ধরণের ডেয়ারী স্থাপিত হয়েছিল তা খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় সম্ভব হয়েছিল। এই ডেয়ারী থেকেই শহরের ছোট ছেলেমেয়েদের জীবাণুমুক্ত দুধ সরবরাহ করা হয়। অপর একজন বিশেষজ্ঞ সুইজ্ঞ হিমাগারে পনীর ও মাখন প্রস্তুত করার জন্য একসঙ্গে অনেকগুলি ডেয়ারী প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছিলেন। এই ডেয়ারীগুলি থেকে নেপালী পশু-পালকদের অর্থ সংস্থান হয়ে থাকে।

সংস্থার বিশেষজ্ঞরা সারা বিশ্বে কৃষি ও বন ব্যবহার উন্নতিতে সহায়তা করেছেন। ইরাকে খেজুর প্যাক করার উন্নততর কৌশল এবং ইকুয়েডরে অধিক অবক্ষয় নিবারণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির বিরাট এলাকায় সেচ, বন তৈরী, কৃষি পদ্ধতির আধুনিকীকরণ, উন্নততর বীজ, সার এবং উন্নততর যন্ত্রশক্তি ব্যবহার প্রভৃতিতে সাহায্য করা হয়েছে। সংস্থার কারিগরি বিশেষজ্ঞগণ ভারত, সিংহল, সুদান ও অন্যান্য আরও অনেক দেশে ছেলেদের শিখিয়েছেন কেমন করে মাছ ধরা নৌকায় বিদ্যুৎচালিত মোটর ব্যবহার করে বেশী মাছ ধরা যায়।

রাষ্ট্রসংঘ বিশেষ তহবিলের বহু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যে রূপদান করে থাকে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। সংস্থা মৃদসম্পদ ও জলসম্পদ পর্যালোচনা করে, গবেষণাকেন্দ্র এবং বন ও কৃষি বিদ্যালয় স্থাপনেও সাহায্য করে। গাছ-গাছড়ার রোগ দূরীকরণে এবং মরুভূমির পঙ্গপাল বিতাড়নে সংস্থার কাজও বেশ গুরুত্বপূর্ণ।

অনেক সময় খাদ্য ও কৃষি সংস্থার পরিকল্পনা রাষ্ট্রসংঘের অন্যান্য বিশেষ সংস্থার পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে। যেমন, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা স্কুলে জলখাবাররূপে দুধ বিতরণ পরিকল্পনায় এবং পুষ্টি শিক্ষাদানের পরিকল্পনায় রাষ্ট্রসংঘের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশুরক্ষা তহবিলের সঙ্গে সহযোগিতা করে।

বুভুক্ষা থেকে মুক্তির সংগ্রামে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা

যুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবীতে দীর্ঘদিন খাদ্যের ঘাটতি চলেছিল। অতি সম্প্রতি খাদ্যের উৎপাদন কিছু বাড়ছে বটে, কিন্তু জনসংখ্যাও এর সঙ্গে তাল রেখে সমানে বেড়ে চলেছে। দূরপ্রাচ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে খাদ্য উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। দূরপ্রাচ্যের কোন কোন দেশে কিছু কিছু চাউলের উদ্বৃত্ত যে দেখা যাচ্ছে এবং ঐ সকল দেশ যে চাউল রপ্তানিও করছে তার অর্থ এই নয় যে এই সব দেশে জনগণের প্রয়োজনের তুলনায় বেশি চাউল আছে, বরং এই কারণেই উদ্বৃত্ত হচ্ছে যে ঐসব দেশের লোকদের ক্রয় ক্ষমতা নেই। খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে মানুষের উপার্জন ক্ষমতার প্রশ্ন।

খাদ্যের ব্যাপারে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি সবচেয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তা হল রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা। এই সংস্থার সূচনার মূল উৎস খুঁজতে হলে ফিরে যেতে হবে লীগ অব নেশনস্ বা জাতিসংঘের যুগে। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের প্রথম দিকে খাদ্যপুষ্টি বিজ্ঞান এমন একটা উন্নত স্তরে এসে পৌঁছেছিল যে একদা যে সমস্ত ব্যাধি দুর্জ্ঞেয় ছিল সেগুলি নিরাময়ে ও দূরীকরণে এর বাস্তব প্রয়োগ খুবই চমকপ্রদ হয়েছিল। এই সময় বিশ-ত্রিশ বছর ধরে নানা আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল, বিশেষ করে খনিজ পদার্থ ও ভিটামিনের ক্ষেত্রে।

জাতিসংঘের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যক্তি এ নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ সুরু করেছিলেন। তাঁদের গবেষণার ফলে খাদ্যের সঙ্গে স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনের সম্পর্ক কি এবং দারিদ্র্য ও অপুষ্টির মধ্যে সম্পর্ক কি, এসব বিষয়ে অনেক নতুন তথ্য জানা গেল।

এই সময় পৃথিবীব্যাপী একটা মন্দা চলছিল। এতে কৃষির দিকটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিল কৃষি বিজ্ঞানকে পুষ্টিবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে কৃষকেরা অধিকতর পরিমাণে উন্নততর খাদ্য উৎপাদন করতে পারবে। এর ফলে মন্দাবস্থার পুনরাবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনা কম থাকবে। প্রস্তাবটি জাতি সংঘে যথেষ্ট আগ্রহের সঞ্চার করল।

কিন্তু কিছু কার্যকরী কাজ সুরু করার আগেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল। এর অনতিকাল পরই প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট চতুর্বিধ স্বাধীনতা ও মুক্তির কথা ঘোষণা করলেন। এর মধ্যে তৃতীয়টি ছিল অভাব থেকে মুক্তি। প্রাকযুদ্ধকালে খাদ্য, পুষ্টি ও কৃষি উৎপাদন সংযুক্তির প্রস্তাবটি পুনরুজ্জীবিত হল। খাদ্য নিয়ে তখন পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রেরই মাথা ব্যথা। কাজেই সেই পরিস্থিতিতে নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা হিসেবে খাদ্য ও কৃষি সংস্থাই যে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হবে এ খুবই স্বাভাবিক।

দরিদ্র মানুষেরা যাতে অধিকতর পুষ্টিকর খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করে উন্নততর জীবন যাপন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে খাদ্য এবং কৃষি, বন ও সমুদ্রের অন্যান্য পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ সহজ করে তোলাই খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রাথমিক লক্ষ্য।

কৃষি, পুষ্টি এবং ব্যক্তি বিশেষ ও পরিবারের কল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় আর যে সমস্ত বিষয় নিয়ে সাইয়্যা-অর্থনীতি-বিজ্ঞানীরা মাথা ঘামান সেগুলি শান্তি প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য। পুষ্টির জন্য কি কি প্রয়োজন, খাদ্যবস্তুর পর্যালোচনা, সাইয়্যা-অর্থনীতি শিক্ষাদান, পরিপূরক খাদ্য পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা তথাকথিত অনুন্নত দেশগুলিতে তথ্য সরবরাহ করে ও এসমস্ত বিষয়ে

সংগঠনে সহায়তা করে। নিকট প্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্যের অধিবাসীদের পুষ্টি ও গার্হস্থ্য-অর্থনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য সংস্থা শিক্ষাসূচী পরিচালনা করেছে।

এমন অনেক পরিকল্পনা আছে যা কার্যকরী করা কোন একটিমাত্র সংস্থার পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ যে কারিগরি ও আর্থিক সম্পদ এ জন্য প্রয়োজন হয় তা কোন একটিমাত্র সংস্থার নেই। এরকম ক্ষেত্রে খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদস্যদের অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতায় কাজ করতে হয়। যেমন, রাষ্ট্র-সংঘের জরুরী শিশুরক্ষা তহবিলের সহযোগিতায় খাদ্য ও কৃষি সংস্থা শিশুদের মধ্যে খাদ্য বিতরণ, দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি প্রভৃতি নানাবিধ কাজ করছে। রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতায় খাদ্য ও কৃষি সংস্থা অনেকগুলি দেশে মৌল শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনা করেছে এবং বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার সঙ্গে একযোগে প্রোটিনের অভাবজনিত ব্যাধি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বিশেষ বিশেষ দেশে কারিগরি সাহায্যও দিয়ে থাকে। যেমন, ভারতের উত্তর প্রদেশ সরকারকে ফলমূল টিনজাত করার এক সমবায় পরিকল্পনা সংগঠন ও পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিল। এইভাবে ফলমূলের অপচয় বন্ধ করা হল।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা কৃষিপণ্য উৎপাদন, উক্ত পণ্য বাজার জাত করা, মাছের চাষ ও বন আবাদ প্রভৃতি বিষয়ে যেমন কাজ করে থাকে, তেমনি পুষ্টি ও গার্হস্থ্য-অর্থনীতিক্ষেত্রেও এদের বিচরণ অব্যাহত। এদের কাজের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া গেল :

ভারত ও সিংহলে মেশিন গণ ট্রাক্টর কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, দূরপ্রাচ্য ও নিকটপ্রাচ্যে গবাদি পশুর সংক্রামক ব্যাধি দূরীকরণ, ভারত ও সিংহলে জেলেরা যাতে অধিক পরিমাণে মাছ ধরতে পারে সেজন্য নৌকায় যান্ত্রিকীকরণ ও উন্নততর গিয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন, তাইল্যাণ্ড ও হাইতিতে পুকুরে, বিলে ও বন্যাপ্লাবিত ধানক্ষেতে মাছের চাষের উন্নতিসাধন, লাইবেরিয়া ও চিলিতে মাছ বাজার জাত করার উন্নততর ব্যবস্থা প্রবর্তন, নিকটপ্রাচ্য ও মধ্য আমেরিকার পঙ্গপাল নিয়ন্ত্রণ।

এছাড়া সুদৃঢ় বন আবাদ নীতি গঠন, সুষ্ঠু বন সংগঠন ও পরিচালন এবং বনশিল্পের উন্নয়নে খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বহুদেশকে সাহায্য দিয়েছে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা একটি সমবায় বিশেষ। কোন ব্যক্তিবিশেষ এর সদস্য নয়, বিভিন্ন দেশের সরকার এর সদস্য। নগদ অর্থ বা পণ্যাদি দিয়ে এই সংস্থা কোন দেশকে সহায়তা করে না, এ সাহায্য করে কারিগরি জ্ঞান আর উপযোগ। কাজেই এই সংস্থার সাহায্য নিয়ে কোন দেশই মনে করতে পারবেনা যে বাইরের কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রভাব তার ওপর এসে পড়েছে। প্রত্যেকটি সদস্যরাষ্ট্রই তার নিজের সংস্থার সেবাই নিচ্ছে, কারণ ঐ রাষ্ট্র সংস্থাকে নিয়মিত চাঁদা দিয়ে সাহায্য করছে, সময় সময় অন্য প্রকার সাহায্যও করছে। তাই সংস্থার নীতি ও কার্যসূচী নির্ধারণে ঐ সব রাষ্ট্র নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারে।

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা প্রকৃত অর্থেই আন্তর্জাতিক। এই সংস্থার যে সকল কর্মী অকুস্থলে গিয়ে কাজ করে তাদের ৫০টিরও বেশী সংখ্যক দেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে।

সমস্যা নির্ধারণে এবং ঐ সকল সমস্যার বাস্তব সমাধানের পন্থা সন্ধানে বিভিন্ন দেশের সরকারকে সাহায্য করাই খাদ্য ও কৃষি সংস্থার প্রধান কাজ।

———

অনাহার ও তার প্রতিকারে রাষ্ট্রসংঘ

আদিম যুগ থেকে খাদ্য সমস্যাই মানুষের সব চেয়ে বড় সমস্যা। যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় কত পাপ, কত অনাচার, কত অপরাধ যে করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। মানুষের প্রগতির পথে সভ্যতার পথে বুভুক্ষা দাঁড়িয়েছে তার বিভীষিকার মূর্তি ধরে। এই বুভুক্ষা করেছে দুর্বলের উপর পীড়ন, শান্তির নীড় জনপদ ও গ্রামের উপর নির্মম আক্রমণ। পরের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে মানুষ এই বুভুক্ষার তাড়নায়। সেখানে সে নীতিকথা শোনেনি, নিষেধ মানেনি, করুণায় আর্দ্র হয়নি, শুধু বীভৎস মূর্তিতে সমাজের সমস্ত শৃঙ্খলা ও শান্তি ধ্বংস করে দেখিয়েছে তার দানব-রূপ। সংসারের সব অাশা মুলতে হয়ত সে পেরেছে, কিন্তু পারেনি জঠর-জ্বালা। তাই আজ অতীতের ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে জনবিপ্লবের মূল উৎস খুঁজতে গিয়ে আমরা পেয়েছি বুভুক্ষার ক্ষুব্ধ চিৎকার,—তার ক্ষিপ্ত আর্তনাদ, মানবিকতার বেদীমূলে নির্মমতার তাণ্ডব নৃত্য।

কিন্তু কেন এমন হয়? শস্য-শ্যামলা বিশাল পৃথিবীর বুকে কত খাদ্য সম্পদ, ফলমূল, পশুপক্ষী, মৎস্য তবু খাদ্যের অভাব হয় কেন? তবু লোকে অনাহারে মরে কেন? দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া কেন নেমে আসে ধরিত্রীর বুকে?

আদিম যুগে যখন মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় নিজের জীবন বিপন্ন করেও অরণ্যে শিকার করতে যেত, যখন আপন হাতে শস্যের বীজ জমিতে ছড়িয়ে কঠোর শ্রমে নিজেই চাষ করে শস্য উৎপাদন করত, মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে লড়তে যেত সমুদ্রের অতলে, যেত পাহাড়ের গুহায়,—তখনও এই বুভুক্ষার তাড়নায় মানুষের যে অবস্থা ছিল, আজ সভ্যতার আলোকপাতে যখন পৃথিবী নবরূপ ধারণ করেছে, কৃষিক্ষেত্রে নূতন নূতন কৃষিযন্ত্রের আমদানি হয়েছে, মানুষ বিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছে খাদ্য-সমস্যার নিরাকরণে, এখন তবে মানুষ অনাহারে মরে কেন, কেন দুর্ভিক্ষের নির্মম কশাঘাতে মানুষ ক্ষিপ্ত বিপর্যস্ত হয়ে দেশ হতে দেশান্তরে ছুটে যাচ্ছে এক মুষ্টি খাদ্যের জন্যে?

বিশেষজ্ঞেরা নির্ণয় করেছেন কৃষির নিয়মিত উৎপাদন দ্বারা মানুষ তার বুভুক্ষা দূর করতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিধ্বস্ত গ্রামগুলির মাঠে মাঠে চলল কৃষির সাধনা। ইউরোপ মেতে উঠল কৃষির উৎকর্ষ নিয়ে। কিন্তু ব্যাপকভাবে কৃষির সুফল পাবার আগেই নেমে এল আবার ইউরোপের বুকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রুদ্র অভিশাপ। আবার চলল ধ্বংসের রণতাণ্ডব। মানুষ নিক্ষিপ্ত হোল বুভুক্ষার মৃত্যুকূপে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, পৃথিবীর লোক শান্তির আশ্বাসবাণী শুনে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। কিন্তু ক্ষুধার খাদ্য কৈ? সমস্ত অভাবনিপীড়নের মধ্যে মানুষ খুঁজেছে শুধু একমুষ্টি খাদ্য। এখানে সকল নীতি ও উপদেশবাণীর শান্ত স্বরকে ডুবিয়ে দিয়ে উঠছে তার আর্ত-ভয়াল চিৎকার "মৈ ভুঁখা হুঁ" "মৈ ভুঁখা হুঁ।"

পৃথিবীতে এমন অনেক দেশ আছে, যার পতিত অনুর্বর ভূমিতে সামান্য চেষ্টায় সোনা ফলানো যায়। এখন বৈজ্ঞানিক মহলে এ প্রচেষ্টাও চলছে,—যাতে মানবদেহকে বল ও পুষ্টি দিয়ে কর্মক্ষম করে

তোলা সম্ভব হয়। যে সব সাধারণ শস্য মানুষের প্রয়োজনে আসে, সে সব যদি আরও পুষ্টিকর হয়, তবে দেশ ও জাতির অনেক উপকার হয়। পশুপক্ষী-পালন, ও তাদের দ্বারা খাদ্যের অভাব কতকাংশে পূরণ করার চেষ্টাও চলছে।

খাদ্য সমস্যার সমাধান না হলে মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অনেক কুখাদ্য খেতে আরম্ভ করে তার ফলে নানা সংক্রামক রোগ দেখা দেয়।

খাদ্যের মধ্যে যদি জীবনী শক্তির রসায়ণ না থাকে তবে সে খাদ্য মানুষের দেহে পুষ্টি সাধন করে না। কুখাদ্য অখাদ্য খেয়ে কত মানুষ যে অকালে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, অর্ধেক পৃথিবীর লোক অর্ধভুক্ত বা অভুক্ত থেকে গেছে। আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, প্রভৃতি দেশের বনসম্পদ যথেষ্ট, কিন্তু এই বনসম্পদকে উপযুক্ত ভাবে খাদ্য সমস্যার সমাধানে গ্রহণ করলে অনেক উপকার হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখছেন।

রাষ্ট্রসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বনজাত ও কৃষিজাত দ্রব্যে যাতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যসার থাকে, তার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টা করছেন ও নানা গবেষণা ও উদ্ভাবনের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রেও তা সম্ভব হচ্ছে। উদ্ভিদ্ প্রোটিন ও জৈব প্রোটিন যাতে মানুষ প্রচুর পরিমাণে পায়, তারও ব্যবস্থা হচ্ছে। তা'ছাড়া সব দিক দিয়ে এই বুভুক্ষা সমস্যার সমাধানের জন্যে রীতিমত প্রচেষ্টা চলছে।

আজ জগতের বিশেষজ্ঞেরা এই জগৎব্যাপী বুভুক্ষা নিরোধের উপায় বার করতে গিয়ে দেখছেন,—যতদিন না মানুষ অপর মানুষকে ভাই বলে আলিঙ্গন করতে পারবে, যতদিন না মানুষ অপরের দুঃখে কাতর হয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরবে, যত দিন না মানুষ ঈর্ষাদ্বেষ হিংসা ভুলে যাবে, ততদিন বিশ্বের বুকে বুভুক্ষার এই তাণ্ডবলীলা চলবে। সবদেশ যদি পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে একদেশের উদ্বৃত্ত শস্য অপরদেশকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। একদেশের অভাব অন্য দেশ মেটাতে পারে। আজকালকার বৈজ্ঞানিক যুগে যান বাহনের যথেষ্ট সুবিধা হয়েছে,—কাজেই একদেশের অভাব অন্য দেশ অল্প সময়ের মধ্যেই দূর করতে পারে। কাজেই এই প্রচেষ্টার মূলে রাষ্ট্রসংঘের দান অসাধারণ। রাষ্ট্রসংঘের কাজ আজ বিশ্বের অনুন্নত রাষ্ট্রগুলিকে আবশ্যকমত সাহায্য দান, রোগদূরীকরণ, কৃষিকার্যের উন্নতি করে আধুনিকতম যন্ত্রপাতি প্রভৃতির সুশিক্ষার প্রসার,—আর সব চেয়ে যা প্রয়োজনীয় সব রাষ্ট্রের মধ্যে-সব জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন।

আশাকরা যায় একদিন সব চেয়ে যে বড় অভিশাপ সেই বুভুক্ষা পৃথিবীর বুক থেকে তা চিরতরে অন্তর্হিত হবে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ যে কাজ করে যাচ্ছেন, তার ফলে পৃথিবীতে ভবিষ্যতে মানুষের ক্ষুধার তাড়নায় মৃত্যু আর ঘটবেনা। যেখানে খাদ্যের অভাব ঘটবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘ এগিয়ে যাবে সেখানে তার কর্ম প্রচেষ্টা নিয়ে, নানাদিক দিয়ে সাহায্য করবে সেই রাষ্ট্রের জনমণ্ডলীকে।

সারা দুনিয়ার সব চেয়ে বড় সমস্যা হোল খাদ্য সমস্যা,—সেই সমস্যার সমাধানকল্পে বিশ্বের মানবগোষ্ঠী যদি একই মানবতা মন্ত্রে দীক্ষা নেয় তবে পৃথিবীতে অশান্তির কারণ আর কিছু থাকবে না। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করে জমিতে সার দেওয়া, বনজঙ্গল আগাছা কেটে নষ্ট করা, চাষীদের আর্থ্য সম্পদ বৃদ্ধি করা, কৃষি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন ও আলোচনা, এইগুলিই খাদ্য সমস্যা দূর করবার উল্লেখযোগ্য উপায়।

রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিকগণ বিশেষ গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মানুষের যত রকম সমস্যা ও সংকট আছে, তার মধ্যে সব চাইতে বড় হোল বুভুক্ষা বা খাদ্য সমস্যা। সুতরাং যদি এই সমস্যার সমাধান করা না যায়, তবে সহস্র চেষ্টা করলেও বিশ্বের সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা সুদূর পরাহত। যে-দিন বিশ্বের কোটী কোটী ক্ষুধার্ত নরনারীর মুখে খাদ্য পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে, সেই দিনই রাষ্ট্রসংঘ সক্ষম হবে বিশ্বে সত্যিকার শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। তাই তাঁরা তাঁদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে ব্যাপক ভাবে খাদ্য সমস্যার নিরসনে আজ সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। তাই রাষ্ট্রসংঘ আজ তার শান্তি-পতাকাতলে সমবেত হতে বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাচ্ছে,—চাই সকলের সমবেত চেষ্টা, চাই সকলের মধ্যে কল্যাণ সাধনের ঐকান্তিকতা—যাতে ক্ষুধাতাড়নায় লোকে ভুলে না যায় মৈত্রীকরুণার বাণী। বুভুক্ষার অভিশাপ বিশ্বের বুক থেকে সরিয়ে দিয়ে আনতে হবে সর্বজাতির মধ্যে মহামিলনের আশীর্বাদ।

সেজন্য সমগ্র বিশ্বের লোক উন্মুখীব হয়ে চেয়ে আছে আজ রাষ্ট্রসংঘের দিকে।

আমেরিকার স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম্ লিঙ্কন প্রতিদিন নিজে খাবার আগে জেনে নিতেন বাড়ীতে কেউ অভুক্ত আছে কিনা।

যখন শুনতেন বাড়ীর কেউ অভুক্ত নেই, তখন প্রশ্ন করতেন—প্রতিবাসীদের মধ্যে কেউ উপবাসী আছেন কিনা?

"না"—এই উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করতেন—"আচ্ছা, আরও খবর নিয়ে দেখ, পাড়ায় কেউ উপবাসী আছে কিনা, যদি কেউ থাকে তাকে সোজা নিয়ে আসবে আমার বাড়ীতে।

বাড়ীর সকলে কিন্তু এটা বিশেষ পছন্দ করতেন না, তাঁরা আলোচনা করতেন—তবে কি তিনি বাড়ীটাকে অতিথিশালা করতে চান?

যখন একদিন কথাটা তাঁর কানে এল, তিনি বল্লেন—দেখ, যেদিন দেখব, আমেরিকায় কেউ অভুক্ত নেই, সেদিন বুঝব আমার দেশসেবা সার্থক হয়েছে, দেশে যথার্থ শান্তি এসেছে।

॥ প্রকাশিত হল ॥

উপনিষদের দর্শন

রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য **শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়** কর্তৃক সহজবোধ্য ও প্রাঞ্জল পরিবেশন। উৎকৃষ্ট সংস্করণ। [৭·০০]

॥ আমাদের অন্যান্য বই ॥

ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত-সাহিত্য

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত সাহিত্য আকাদমী পুরস্কারপ্রাপ্ত বই : [১২·০০]

বৈষ্ণব পদাবলী

সাহিত্যরত্ন **শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়** সম্পাদিত প্রায় চার হাজার পদের সঙ্কলন, টীকা, শব্দার্থ ও বর্ণানুক্রমিক সূচী-সম্বলিত পদাবলী সাহিত্যের সর্বশেষ আকর-গ্রন্থ : [২৫·০০]

বঙ্কিম রচনাবলী

প্রথম খণ্ডে সমগ্র উপন্যাস মোট ১৪খানি একত্রে [১২·০০]

রমেশ রচনাবলী

রমেশচন্দ্র দত্তের সমগ্র উপন্যাস মোট ৯ খানি একত্রে [৯·০০]

উভয় রচনাবলীই **শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল** সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক সাহিত্যকীর্তি আলোচিত :

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা-সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ও বহু রঙীন চিত্র-সংযোজিত আধুনিক সংস্করণ :

রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত [৯·০০]

শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শনের সরল আলোচনা :

রবীন্দ্র দর্শন [২·৫০]

বাঙলা সাহিত্য-চর্চার নিত্যসঙ্গী

সংসদ বাঙ্গালা অভিধান [৮·৫০]

SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ [১২·৫০]

সাহিত্য সংসদ ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিকাতা-৯

শ্রীআয়ুর্বেদমের

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

* মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখে
* নিদ্রাহীনতা দূর করে
* কেশপতন রোধ করে
* অকালপক্কতা বন্ধ করে

দেশবরেণ্যগণ কর্তৃক ব্যবহৃত ও উচ্চ প্রশংসিত

মানে ও গন্ধে অতুলনীয়

একবার ব্যবহার করুন।

বড় বড় ষ্টেশনারী দোকানে পাওয়া যায়।

শ্রীআয়ুর্বেদম.

২৭৯এ, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৬ ফোন : ৫৫-৩২৯৪

গল্প-ভারতী

অগ্রহায়ণ—১৩৭০

সম্পাদক :

সহঃ সম্পাদক : শ্রীকল্যাণ রায়

মূল্য এক টাকা

শ্রীসুধাংশু কুমার রায় চৌধুরী কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেড ২৭১বি, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত এবং কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৯. শিবনারায়ণ দাস লেন. কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

পরিকল্পনা অনুযায়ী
পরিবার
গঠন করুন

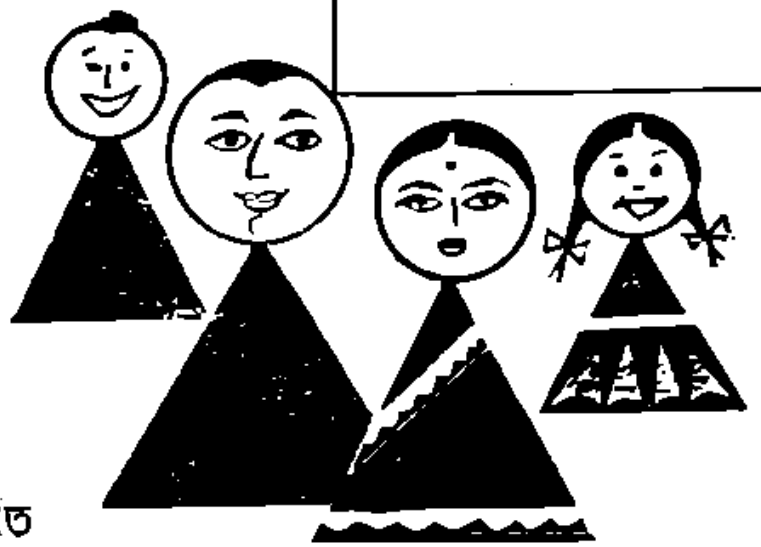

এতে

প্রত্যেকেই অধিকতর সুযোগ সুবিধে পাবে

আপনি কি চান যে

১। আপনার ছেলেমেয়ে স্বাস্থ্যবান হোক ;

২। উপযুক্ত খাদ্য ও শিক্ষা লাভ করুক ;

৩। প্রতিটি শিশুর যতটুকু সুযোগ সুবিধে পাওয়া উচিত এরাও তাদের জীবনে তা লাভ করুক ;

৪। বিবাহিত জীবন সুখী ও সুসমঞ্জস হোক ;

তাহলে নিকটবর্তী

পরিবার
পরিকল্পনা
কেন্দ্রে

গিয়ে

আপনার পরিবারের আকার সীমিত রাখা সম্পর্কে পরামর্শ নিন

এই সংখ্যায়

সম্পাদকীয়—	৫০৫
উদাত্ত আহ্বান—	৪০৯
অমৃত কথা ও কাহিনী—	৪১০
জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৪১১
অন্তরীক্ষে (ব্যঙ্গচিত্র)—	৪০৭
পুরাতন পাতা—আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন সমস্যা—প্রমথ চৌধুরী	৪১১
নির্মোক—রজত রায়চৌধুরী	৪১৩
ক্ষিতিমোহন সেন—শ্রীশান্তা দেবী	৪৩০
বীরবলের কৌতুক—বরুচি	৪৩২
জীবনের যন্ত্রশালায় (উপন্যাস)—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৩৭
নীড়—মানবেন্দ্র পাল	৪৪১
চিত্র বিচিত্র—মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ	৪৪৬
শুক্তি-সৈকত (উপন্যাস)—যোগিনাথ মৈত্রেয়	৪৫২

এমন সুন্দর কেশগুচ্ছের অধিকারী হবে

আপনিও শুনবেন

"বাঃ সত্যই সুদর্শন"

রুক্ষ অবাধ্য চুলকে সহজে সুন্দর ও মসৃণ করে এবং কেশমূল সতেজ সজীব রেখে চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে কেয়ো- কার্পিন অদ্বিতীয়।
কেশ পরিচর্যায় এই তেল ব্যবহারে চুল দিনে দিনে ঘন, চিক্কণ ও সুন্দর হয়।

কেয়ো-কার্পিন

মহাফলপ্রদ ভেষজ কেশ তৈল

কেয়ো কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা দিল্লী · বোম্বাই মাদ্রাজ · পাটনা · লক্ষ্ণৌ · কটক

নিম-এর তুলনা নেই

- 'নিম টুথ পেষ্ট'-ই হল একমাত্র টুথ পেষ্ট যার মধ্যে নিমের বীজবারক, দুর্গন্ধনাশক ও কষায় গুণের সঙ্গে আধুনিক দন্ত-বিজ্ঞান-সম্মত ঔষধাদির সার্থক সমন্বয় ঘটেছে।
- মাড়ীর পক্ষে অস্বস্তিকর 'টার্টার' নিরোধে এবং দন্তক্ষয়কারী জীবাণু-ধ্বংসে এই টুথ পেষ্ট সব চেয়ে বেশী সক্রিয়।
- 'পাইওরিয়া' ও 'কেরিজ' নিরোধক উপাদানগুলি এই টুথ পেষ্টে আছে।
- ব্যবহারে দাঁত খুব ঝক্‌ঝকে হয় অথচ 'এনামেল'-এর ক্ষতি হয় না।
- মুখের দুর্গন্ধ দূর ক'রে প্রশ্বাস সুরভিত করে।

এই সব বিবিধ বৈশিষ্ট্যের জন্য 'নিম টুথ পেষ্ট'-এর সঙ্গে অন্য কোন টুথ পেষ্টের তুলনাই চলে না।

এই টুথ পেষ্ট যেমন গুণে সেরা, তেমনি দামেও সুবিধা।

পত্র লিখলে নিমের উপকারিতা সম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাঠান হয়

নিম টুথ পেষ্ট

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা-২৯

অনেক কালি-ই আসবে
যাবেও অনেক কালি।
কালির সেরা **সুলেখা**
থাকবে চিরকাল-ই॥

I.S. 1221

সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

কলিকাতা • দিল্লী • বোম্বাই • মাদ্রাজ

BW

বিপদ সম্পর্কে

সজাগ থাকুন

আমাদের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক
জীবন ধারণ পদ্ধতি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করুন

DA63/F 20

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুশারেশ্ব

ডি. ওরিয়েন্টাল রিসার্চ অ্যান্ড
কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী, লিঃ

মডার্ণ ডেকরেটরস
৬৫ এ, ডব্লু. সি. ব্যানার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-২৫৪৮

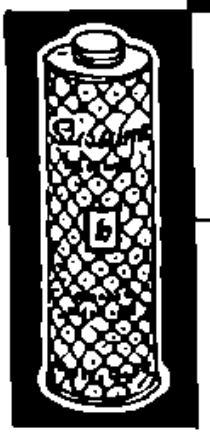

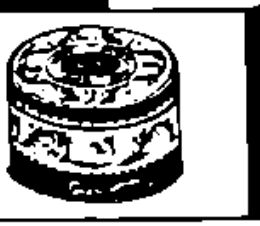

সুষমা

প্রসাধন সামগ্রী

সুষমা ফাউণ্ডেসন ক্রীম
সুষমা স্নো (শকুন্তলা)
সুষমা টয়লেট পাউডার
সুষমা ট্যালকম পাউডার

লিলি কেমিক্যাল ওয়ার্কস - কলিকাতা-৩

দ্বিজেন্দ্র জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সাহিত্য সংসদ-এর শ্রদ্ধার্ঘ

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যাবতীয় রচনা দুইখণ্ডে সঙ্কলিত। উভয় খণ্ডই সম্পাদনা করিয়াছেন দ্বিজেন্দ্র সাহিত্যের গবেষক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় এবং তৎকর্তৃক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-কথা ও সাহিত্য-সাধনা আলোচিত এবং প্রতিটি বই বিশ্লেষিত।

প্রথম খণ্ডের সূচী

নাটক : পাষাণী, তারাবাই, রাণা প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, সাজাহান, মেবার-পতন

প্রহসন : কল্কি অবতার, বিরহ, প্রায়শ্চিত্ত

কবিতা : আর্য্যগাথা (১ম), আর্য্যগাথা (২য়) আষাঢ়ে, হাসির গান

গদ্য রচনা : একঘরে, কালিদাস ও ভবভূতি পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচী

নাটক : সীতা, ভীষ্ম, সোরাব রুস্তম, নূরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল বিজয়, পরপারে, বঙ্গনারী

প্রহসন : ত্রহস্পর্শ, পুনর্জন্ম, আনন্দ বিদায়

কবিতা : মন্ত্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী, গান

গদ্য রচনা : বিলাতের পত্র, চিন্তা ও কল্পনা পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

ইংরেজি কবিতা : Lyrics of Ind

প্রতিটি খণ্ডের দাম সাড়ে বার টাকা

প্রথম খণ্ড ১৯৬৪, ৭ই জানুয়ারী বাহির হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড ডিসেম্বর ১৯৬৪ সনের মধ্যে বাহির হইবে।

উভয় খণ্ডই লাইনো ব্লকে মজবুত কাগজে ঝরঝরে ছাপা : কয়েকটি সুন্দর ছবি সমন্বিত, স্বর্ণাঙ্কিত রেক্সিন বাঁধাই ; সুন্দর প্রচ্ছদপট ও শোভন সংস্করণ। সংগ্রহে রাখার মত বই।

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

॥ আমাদের বই সর্বত্র পাওয়া যায় ॥

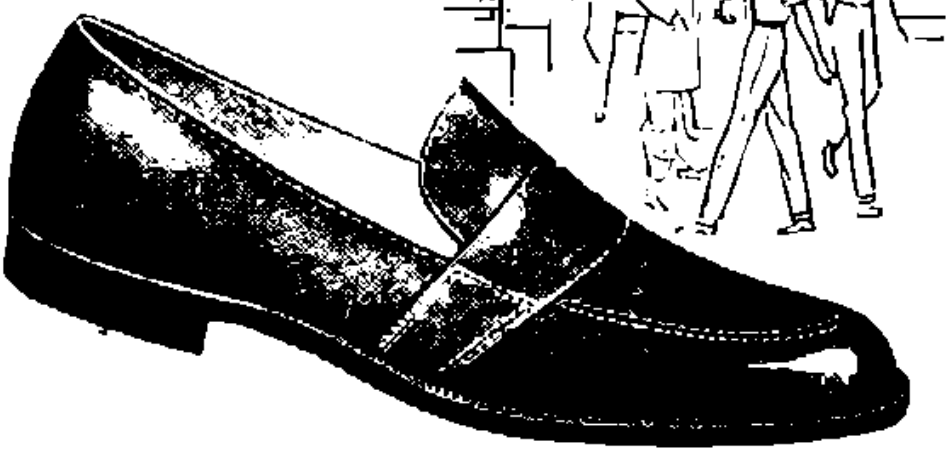

দীর্ঘ ব্যবহারের নির্ভরতা

[illegible] দীর্ঘ ব্যবহারও তোমার অভিযোগ করবে, সেই কারণ আমরা বলি এর বৈশিষ্ট্য। [illegible]

'Bata

LONGLIFE

সংসারের অতি প্রয়োজনীয় সামগ্রী

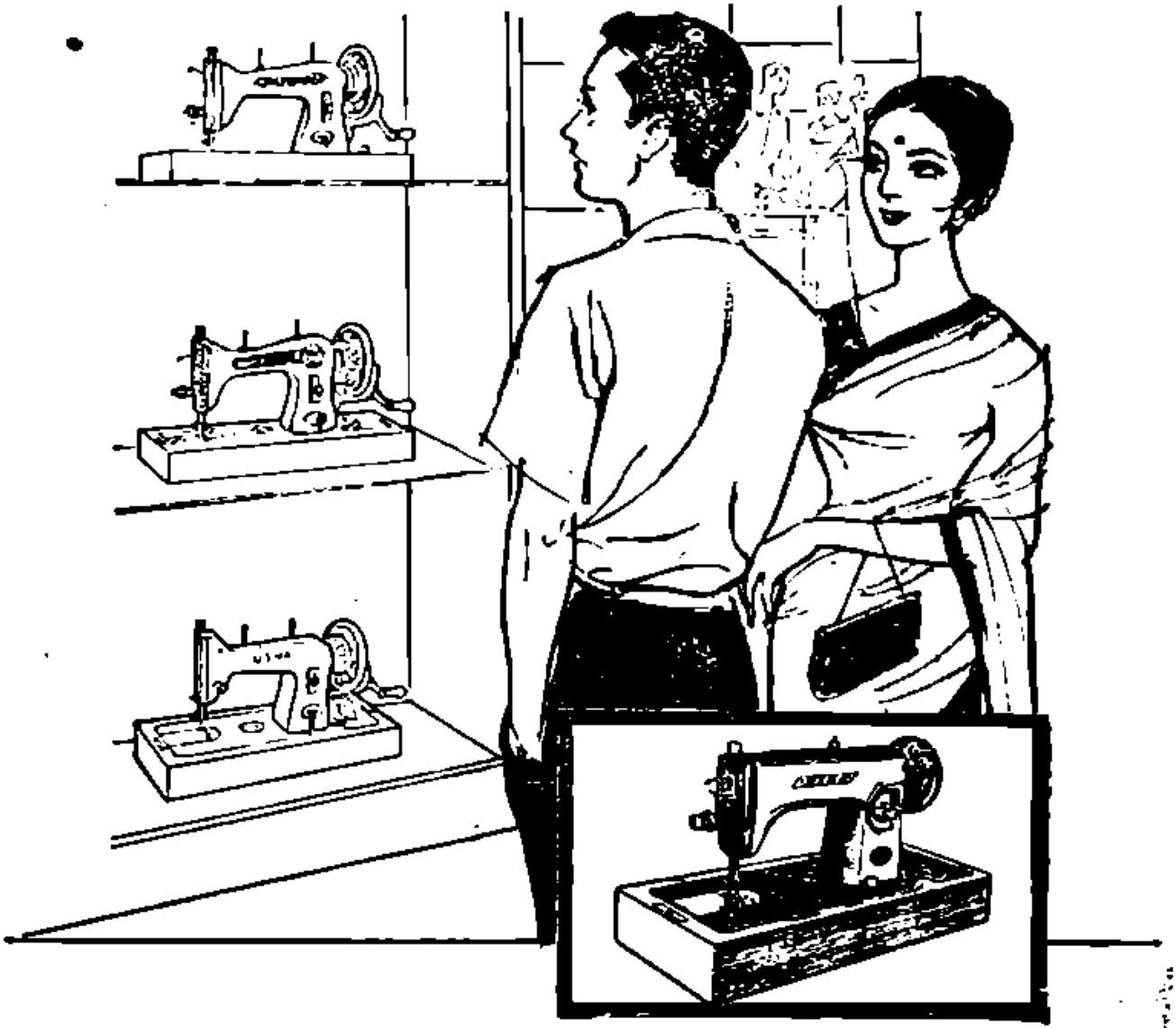

কোনও রকম আতিশয্যের আগে ঘরের একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী হচ্ছে একটি সেলাই কল। আজ ঘরে ঘরে সেলাই-এর প্রচলন হয়েছে। উষা সেলাই কল এই প্রেরণায় যথেষ্ট উৎসাহ দান করেছে। বহুদিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষালব্ধ বিভিন্ন ধরনের উষা সেলাই কল সেলাই করায় আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে। উষা সেলাই কল কিনে ঘরের শ্রী বৃদ্ধি করুন।

আকর্ষণীয় মেয়াদী কিস্তির সুযোগ গ্রহণের জন্য আপনার নিকটবর্তী বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

উষা কিনুন আরামে সেলাই করুন। **উষা** আমেরিকা, ইংলণ্ড, পশ্চিম জার্মানী সহ ৫০টিরও অধিক দেশের মেয়েরা উষা কলে সেলাই করেন।

জয় ইঞ্জিনিয়ারীং ওয়ার্কস লিঃ, কলিকাতা-৩১

উঃ
কি সাংঘাতিক
কাশি!

এইতো
টাসানল
খান

যন্ত্রণাদায়ক কাশি থেকে দ্রুত ও দীর্ঘস্থায়ী উপশম পাবার জন্য টাসানল কফ সিরাপ খান। টাসানল আপনার ফুসফুস ও গলার প্রদাহ কমিয়ে চট করে আপনাকে আরাম দেবে। এর কার্য্যকরী উপাদানগুলো আপনার শ্লেষ্মা তুলে ফেলতে সাহায্য করবে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার কাশি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে।

আঃ কি অপূর্ব
আরামদায়ক এই

টাসানল
কফ সিরাপ

প্রস্তুতকারক : মার্টিন এণ্ড হ্যারিস প্রাইভেট লিঃ
রেজিষ্টার্ড অফিস : মার্কেন্টাইল বিল্ডিংস, লালবাজার, কলিকাতা-১

B.P.208

গল্প-ভারতী
অগ্রহায়ণ ১৩৭০

সম্পাদকীয়

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২)

মাত্র ৪০ বছর পূর্ণ করবার আগেই যে মহাপুরুষ চিরন্তন প্রাণের স্পর্শে দেশকে জাগিয়ে গিয়েছেন তাঁকে স্মরণ করে এই সংখ্যা উৎসর্গ করি।

গল্প-ভারতীর পাতায় তাঁর দিব্য জীবন ও বাণী বহুভাবে বহুবার মুদ্রিত হয়েছে, তবু যেন শেষ নাই। তাঁর সহকর্মী কবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি—

"আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব
ফুরায়ে গেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব॥"

গীতাঞ্জলির এই প্রথম গান ইংরেজী অনুবাদে Nobel পুরস্কার পেয়েছে ৪০ বছর আগে (১৯১৩)। তবে বহু পূর্বে কবি তাঁর নৈবেদ্য কবিতাখানি পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন (১৯০০-০১) তখন বিবেকানন্দের জীবননির্বাণ (১৯০২) পর্ব্ব চলছে ও নির্বাণের পর প্রথম স্মরণ সভায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই সভাপতিত্ব করেন সেকথা লিখেছি—(Bengali 15 July 1902)। ভগ্নী নিবেদিতাও ভাষণ দেন। সেটি রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্র-ভাষণ বাংলায় ছিল তাই অনুলিখিত হয়নি। গভীর আধ্যাত্মিক যোগ দুজনের ছিল, তার কথা নানা সভায় বলেছি। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" বইখানির উচ্চ প্রশংসা কবি করেছেন—তা দীনেশচন্দ্র সেন শুনেছেন ও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করেছেন। দীনেশ সেন নিবেদিতার ভক্ত ছিলেন ও তাঁদের পাড়ায় কালীপূজার সময় নারীশিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা হয় দেখেছেন। শ্রদ্ধেয়া সারদাদেবী ও পরমহংসদেবের সঙ্গেও পরিচয় ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেদিন ঝাঁটপুর গ্রামে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছি সেখানে বাবুরাম মহারাজের মাতৃদেবীর ভিটায় যজ্ঞশিখা প্রজ্বলিত করে বাবুরাম তাঁর সমবর্ত্মী বিবেকানন্দ প্রভৃতি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন ১৮৮৬ সালে। ঘোষ ও মিত্র জমিদার ঘরের উত্তরাধিকারীগণ আমাদের সবই দেখালেন। সেজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই। যে যে ঘরে পরমহংসদেব ও সারদা দেবী গ্রামে থাকতেন সেই বাড়ী মন্দিরাদিও দেখেছি ও স্বামী বিবেকানন্দ মধুমেহ রোগে শেষ শয্যা গ্রহণ করলে যে প্রসিদ্ধ ডাক্তার বিপিন ঘোষ চিকিৎসা করেন তাঁর বাড়ীও দেখেছি। বন্ধু অধ্যাপক ৺পঞ্চানন মিত্র ও শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র আগেই এসব কথা ও ঝাঁটপুর তীর্থের কথা আমায় বলেছিলেন। মাটির

কোম্পানীর ছোট রেল চেপে সব দেখে এসেছি ও বেলুড় মঠ-মিশন প্রতিষ্ঠার সব কাহিনী শুনে গ্রামের সভায় মনীষী রম্যা রলাঁর গ্রন্থ রচনার কথাও শুনিয়ে এসেছি। আমার দীন-জীবনের সেই পরম আশীর্বাদ।

যে বহুবাজার দত্ত বাড়ীর আমি দৌহিত্র সন্তান তার রাজাবাবু প্রাণেন্দ্র দত্ত। তাঁর শিশু মহেন্দ্রলাল সরকার এম্, ডি. এ্যালোপ্যাথি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি ধরেন ও পরমহংসের চিকিৎসা করেন শুনেছি। Beregny Co. সেই হোমিওপ্যাথিক ডিস্‌পেনসারী আজও লাল বাজারে আছে।

ডাঃ সরকার ১৮৭৬ সালে Indian Association for the Cultivation of Science প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় বিজ্ঞানের সেই আদিপর্ব্বের কথা বৈজ্ঞানিক প্রমথনাথ বসুর জীবনীতে আমি লিখেছি ও Asiatic Society of Bengal এর সম্পাদক-রূপে বহু তথ্য উদ্ধার করেছি।

১৯০২ সাল থেকে ১৯১১ পর্য্যন্ত ভগ্নী নিবেদিতা সেই যোগ রক্ষা করে অকালে Lady Bose এর ক্রোড়ে দেহত্যাগ করেন ও রবীন্দ্রনাথই প্রবাসীতে তাঁর প্রথম যোগ্য স্মারক প্রবন্ধ লেখেন। কারণ ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে নিবেদিতার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল অবনীন্দ্র ঠাকুর মশাই তার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এবং তাঁর দাদামশাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বহস্তে যে চিঠি লেখেন বিবেকানন্দের জয়ধ্বনি করে আমেরিকায় তাঁর সাফল্য শুনে সেটি ভূপেন দত্ত তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের ভক্ত কৈলাসবাবু মশাই (বিবেকানন্দের সম্পর্কে মামা) তাঁদের ঠাকুর দালানেই তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা চালাতেন। তাই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ওঁদের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর দৌহিত্রী সরলা দেবীর সঙ্গে বিবেকানন্দের পত্রালাপ প্রসিদ্ধ। খৃষ্টান পণ্ডিতা রমাবাইকে শিখণ্ডী রেখে মিশনারীরা ভারত-নারী বিষয়ে অপপ্রচার করে জেনে স্বামিজী সরলা দেবীকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চেষ্টা করেন সে কথা সরলা দেবীর মুখে শুনেছি। তাঁর মামা রবীন্দ্রনাথ তাই বিবেকানন্দকে আত্মীয় ভাবতেন ও সেই মর্ম্মে রম্যা রলাঁ (Rolland) কে উচ্চ প্রশংসা করে এসেছেন নিজে শুনে এসেছি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের মহড়ার সুগায়ক নরেন্দ্র দত্তের নিমন্ত্রণ হত সে সব কথা 'সুরের গুরু রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকে লিখেছি। আরো সন্ধান করলে জোড়াসাঁকোর ওস্তাদদের সঙ্গে শিমুলিয়া গায়কদের যোগ স্থাপিত হবে।

পরমহংস যুগ থেকে বিবেকানন্দ ও ত্রৈলোক্য সাম্যাল ও নব-বৃন্দাবন অভিনয়ের যুগ অবধি বহু গান ও পারমার্থিক সঙ্গীত ও বাণী সংগ্রহ বাকী আছে। কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বর থেকে কিছু প্রকাশ করেন। তবু বহু নিরুদ্দেশ হয়ে আছে। সেটি স্বামী প্রজ্ঞানন্দকে জানিয়ে এসেছি— সব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পাখোয়াজের সঙ্গে গীত হ'ত। গাইয়ে স্বামিজীরা ব্রত নিয়ে লুপ্ত রত্নোদ্ধার করুন।

রামমোহন রায় থেকে গবেষণা সুরু করতে হবে। 'প্রবাসী'তে কিছু ছাপা হয়েছে। নিধুবাবুর কালের হিন্দী গানের সুরও অনেক তার মধ্যে শুনি। তিনি দেওয়ান রামমোহনের সঙ্গী ছিলেন ও তাঁর পর থেকে আদি ব্রাহ্ম-সমাজের কৃষ্ণ ও বিষ্ণু ওস্তাদরা উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ধারা বইয়ে এসেছেন। পরে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদারা বহু ব্রহ্ম-সঙ্গীতে দিব্য সুর সংযোগ করে গেছেন।

হিরণ্ময়ী দেবী

সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ দ্বারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক চিন্তায় দেশকে ডুবিয়ে দাও।

আমাদের সর্ব্বপ্রথম কাজ হবে — আমাদের উপনিষদ, আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র, আমাদের পুরাণ প্রভৃতিতে যে সব মহান্ সত্য অন্তর্নিহিত আছে সেগুলিকে বের করে নিয়ে আসা।

বের করে আনতে হবে গ্রন্থরাজি থেকে, বের করে আনতে হবে মঠ-মন্দির থেকে, বের করে আনতে হবে মুনিঋষির তপোবন থেকে, আর সামান্যসংখ্যক লোকের অধিকার থেকে এবং দেশময় ছড়িয়ে দিতে হবে।

এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যে, দাবানলের মত দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে, উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব্ব থেকে পশ্চিমে, হিমালয় থেকে কেপকমোরীনে, সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সারা ভূখণ্ডে সেসব সত্য দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

—স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃত কথা ও কাহিনী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কথা

যাদের চৈতন্য হয়েছে, তারা পাপ পুণ্যের পার। তারা দেখে ঈশ্বরই সব করছেন। এক জায়গায় একটি মঠ ছিল। মঠের সাধুরা রোজ মাধুকরি (ভিক্ষা) করতে যায়। একদিন একটি সাধু ভিক্ষা করতে করতে দেখে যে, একজন জমিদার একটি লোককে ভারি মারছে। সাধুটি ভারি দয়ালু; সে মাঝে পড়ে জমিদারকে মারতে বারণ করলে। জমিদার তখন ভারি রেগে রয়েছে, সে সমস্ত কোপটা সাধুটির গায়ে ঝাড়লে। এমন প্রহার করলে যে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রৈল। কেউ গিয়ে মঠে খবর দিলে, তোমাদের একজন সাধুকে একজন জমিদার ভারি মেরেছে। মঠের সাধুরা দৌড়ে এসে দেখে সাধুটি অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। তখন তাহারা পাঁচজনে ধরাধরি করে তাকে মঠের ভিতর নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে শোয়ালে। সাধু অজ্ঞান, চারিদিকে মঠের লোকে বিমর্ষ হয়ে বসে আছে, কেউ কেউ বাতাস কচ্ছে। একজন বল্লে, একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক। মুখে দুধ দিতে দিতে সাধুর চৈতন্য হল। চোখ মেলে দেখতে লাগল। একজন বললে, ওহে দেখি, জ্ঞান হয়েছে কিনা? লোক চিনতে পারছে কি না? তখন সে সাধুকে খুব চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, মহারাজ তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু আস্তে আস্তে বলছে, 'ভাই', যিনি আমাকে মেরেছিলেন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন।' ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এরূপ অবস্থা হয় না।"

• • •

—শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে? শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। তাই শাস্ত্রের মর্ম সাধুমুখে, গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। তখন আর গ্রন্থের কি দরকার? একজন একখানি চিঠি পেয়েছিল, কুটুম বাড়ী তত্ত্ব করতে হবে, কি কি জিনিস লেখা ছিল। জিনিস কিনতে দেবার সময় চিঠিখানা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কর্তাটি খুব ব্যস্ত হয়ে চিঠির খোঁজ আরম্ভ করলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেকজন মিলে খুঁজলে। শেষে পাওয়া গেল। তখন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্নে চিঠিখানি হাতে নিলেন; আর দেখতে লাগলেন, কি লেখা আছে। লেখা এই, পাঁচসের পাঠাবে। একখানা কাপড় পাঠাবে। আরও কত কি। তখন আর চিঠির দরকার নাই, চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অন্যান্য জিনিসের চেষ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ? যতক্ষণ সন্দেশ কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেষ্টা। শাস্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু খবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ করতে হয়। তবে তো বস্তুলাভ। সব সন্ধান জেনে তারপর ডুব দাও। পুকুরের অমুক জায়গায় ঘটিটা পড়ে গেছে। জায়গাটি ঠিক করে দেখে নিয়ে সেইখানে ডুব দিতে হয়।"

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের কথা

—"কোন রাজার একটি খুব বলবান হাতী ছিল। সে হাতীটা পাঁচশত সাধারণ হাতীর সাথে লড়তে পারত। যুদ্ধে যাবার সময় তার দাঁতে ধারাল অসি, তার কাঁধে লম্বা ছোরা, তার পায়ে বর্শা ও তার সেজে সৌহ-বন্দুক বেঁধে দেওয়া হ'ত। মাহুত এই মহৎ জন্তুটিকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত দেখে আনন্দিত হল এবং উহার শুড়ে তীরের সামান্য আঘাতে মারাত্মক হবে জেনে সে হাতীটাকে শিখিয়েছিল শুড়টি কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে তুলে রাখতে। কিন্তু যুদ্ধকালে হাতী একটি অস্ত্র ধরে ফেলবার জন্য তার শুঁড় প্রসারিত করেছিল। এতে মাহুত সন্ত্রস্ত হয়ে—রাজার সঙ্গে পরামর্শ করলে। উভয়ের বিচারে এই স্থির হল যে, হাতীটা আর যুদ্ধে ব্যবহৃত হবার যোগ্য নয়। আরো বাহুল, মানুষ যদি তার জিহ্বা সংযত রাখত তাহলে তার প্রভূত কল্যাণ হত। সেই রণ-হস্তীর মত হও; যে মধ্যভেদী বাণ থেকে নিজের শুঁড় বাঁচিয়ে চলে। সত্যনিষ্ঠার দ্বারা সাধুলোক অসাধুসঙ্গ থেকে রক্ষা পায়। যে সংযত ও শান্ত হাতী রাজাকে তার শুঁড়ে চড়তে দেয় ঠিক তার মত যে মানুষ ধর্মানুশীলনে শ্রদ্ধাবান সে সারাজীবন বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে টিকে থাকে।

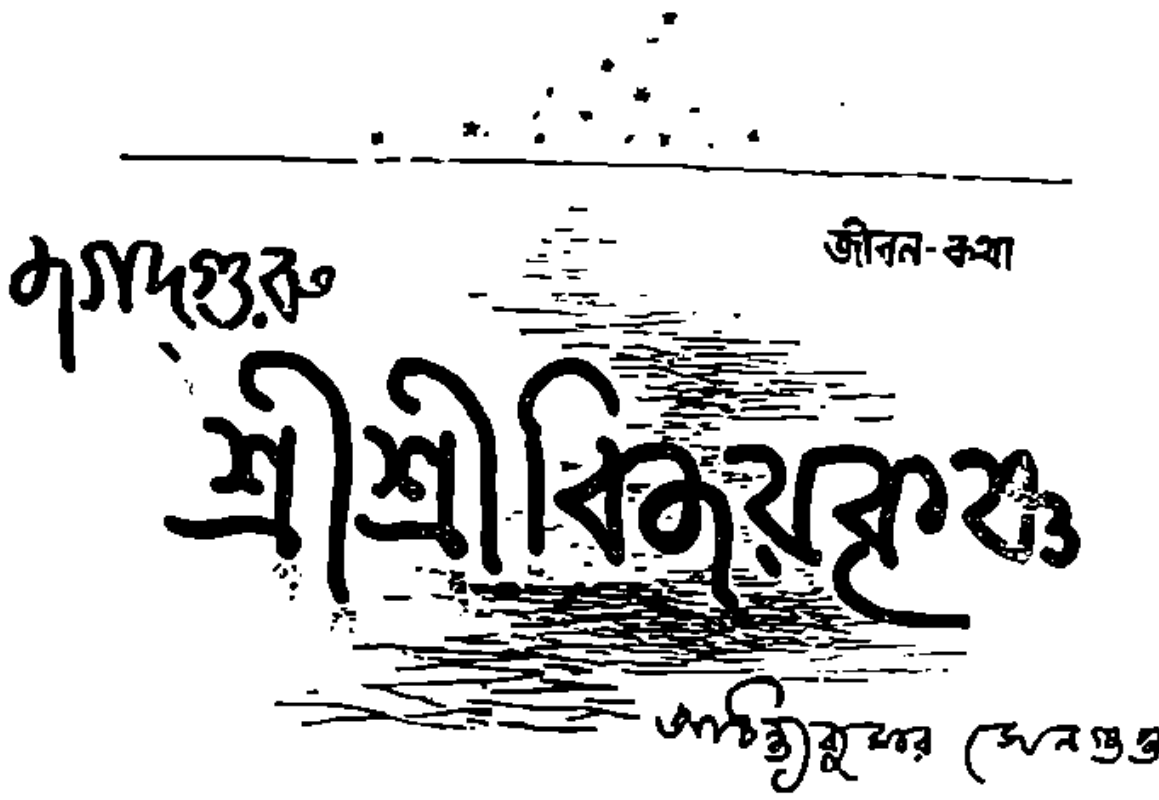

বিজয় পদত্যাগপত্র দাখিল করল। থাকব না প্রচারক।

সেই পত্রে লিখল: 'সত্যস্বরূপ জ্ঞানপ্রেমমঙ্গলময় সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা; যার আর তাই ব্রাহ্মধর্মের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ঈশ্বরের সত্তাসাগরে নিমগ্ন থেকে জীবন যাপন করাই একমাত্র কাজ।

ব্রহ্মলাভ শুধু মানুষের নিজের চেষ্টায় হয় না। ঈশ্বরের কৃপার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে যথাসাধ্য সাধন ভজন করাই একমাত্র পথ। আমি পরমহংস বাবাজীর প্রদর্শিত যোগসাধনের পথ অবলম্বন করেছি। এই সাধনে বাহ্যিক কোনো সংস্রব নেই, এ সম্পূর্ণ আভ্যন্তরিক আধ্যাত্মিক বস্তু। তবে ভূতশুদ্ধির জন্যে কিছুদিন প্রাণায়াম করতে হয়। কিন্তু সেটা আমাদের সাধন নয়। তাই বাইরের লোকের সামনে আমরা সাধন করি না। বাইরের লোক আসল তত্ত্বকথা কিছুই বুঝবে না, শুধু বাইরের প্রাণায়ামটুকু দেখবে। তাই দেখে যদি তাদের প্রাণায়ামে অশ্রদ্ধা হয় তাহলে তাদেরই আধ্যাত্মিক অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা।

আমরা কোনো সম্প্রদায় মানি না। যে কেউ আন্তরিক ব্যাকুল হন, হিন্দু ব্রাহ্ম মুসলমান খৃষ্টান, সকলেই এ সাধন পেতে পারেন। পাপ আচার পাপ চিন্তা পাপ কল্পনা আর অহঙ্কারই এ সাধনার ব্যাঘাত।

এতে গুরুবাদের লেশমাত্র নেই। ঈশ্বরই একমাত্র গুরু আর সকলে তাঁর নির্বাচিত উপদেষ্টা ও পথপ্রদর্শক। যেমন বৃক্ষ লতা নদী পর্বত গ্রহ নক্ষত্র নানা উপায়ে শিক্ষা দেয় তেমনি মানুষও এক অনুরূপ উপায়। মানুষের মধ্যেই যোগশক্তি প্রবলতম। তাই শক্তিশালী মানুষকে গুরু বলে স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই। স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি তো ঈশ্বরের দান কিন্তু তাতে একটা কুটো পড়লে তা তুলে নিতে মানুষ নারে।

গুরুজনদের শ্রদ্ধাভক্তি করা ধর্মসঙ্গত। পদধূলি নেওয়া সম্বন্ধে আমাদের কোনো নিষেধ নেই। আত্মার যে অবস্থায় পদধূলি নিতে ইচ্ছে হয় সেই বিনীত অবস্থা অত্যন্ত সুন্দর ও উপকারী। এইজন্য কাকে উপকার হচ্ছে দেখলে পদধূলি নিতে বাধা দিই না। আমিও সকলের পদধূলি নিয়ে থাকি। আমাকে যিনি যখনই প্রণাম করেন, এ প্রণাম বিশ্বগুরুর প্রাপ্য এই অর্থে আমি 'ওঁ গুরু' 'ওঁ গুরু' উচ্চারণ করে থাকি। একটি প্রণামও নিজে পাই না, নিজে নিই না।

উচ্ছিষ্টভোজন উচিত মনে করি না, তবে বাপ-মা যদি আদর করে উচ্ছিষ্ট দেন আর যদি কোনো শ্রদ্ধেয় ধর্মাত্মার ভুক্তাবশেষকে প্রসাদ বলে মনে হয় তবে তা আহার করি। সে আহারে ক্ষতি নেই বরং উপকার আছে।

আমার ঈশ্বর সর্বব্যাপী। যদি দেবতার মন্দিরে কালী দুর্গা বা অন্য প্রতিমার সামনে আমার ব্রহ্মস্ফূর্তি হয়, আমি আত্মহারা হয়ে সেখানেই গড়াগড়ি দিই। যেখানেই তাঁর দর্শন পাই সেখানেই আমি তন্ময় হই, ক্ষুদ্র স্থানবিচার থাকে না।

কালী দুর্গা নামে ভগবানকে ডাকতে আমি কোনো দোষ দেখি না। যখন যে নামে প্রাণে আরাম পাই তখনই সে নামে ডাকি। তবে ব্রাহ্ম সমাজে উপাসনার সময় ঐ সব নাম ব্যবহার করেছি বলে মনে হয় না।

রাধাকৃষ্ণ ভাব যোগসাধের শ্রেষ্ঠ সহায়। এত বড় ভাব আর কোথাও দেখিনা। রাধা ভক্ত কৃষ্ণ ভগবান। সর্ব প্রযত্নে আমি ঐ ভাবসাধনের চেষ্টা করি। যারা ঐ আধ্যাত্মিক ভাবে উপাসনা গান তাদের নিয়ে আমি একত্র রাধাকৃষ্ণের গান গাই। তবে ব্রহ্মমন্দিরে ঐ নাম গ্রহণ করিনি।

যাই হোক, যদিও সাধারণ ব্রহ্মসমাজের সঙ্গে আন্তরিক যোগ ক্ষুণ্ণ হবার নয়, আমি সামাজিক সম্বন্ধ প্রচারকপদ পরিত্যাগ করলাম। এখন থেকে যা ধর্ম প্রচার করব তা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে।

বিজয়ের কৈফিয়ৎ গ্রাহ্য হল না। পদত্যাগপত্র গৃহীত হল।

কলকাতায় ব্রাহ্ম সমাজ পরিত্যাগ করলেও পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজ সাদরে গ্রহণ করল গোঁসাইকে।

ঢাকায় প্রচার নিবাসে এসে উঠল বিজয়।

রাষ্ট্র হয়ে গেল বিজয় পৌত্তলিক হিন্দু হয়ে গিয়েছে, ব্রাহ্মসমাজে তার স্থান হয় কী করে?

'সাধারণের নিকট নিবেদন' এই নামে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করল বিজয়। লিখল, আমি পৌত্তলিক হিন্দু হয়ে গিয়েছি এ কথা সম্পূর্ণ অসত্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্যেই তার সঙ্গে বাইরের সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, কিন্তু মনে প্রাণে আমি এখনো ব্রাহ্ম। আমার কোনো সম্প্রদায় নেই, সব সম্প্রদায়ই আমার। আমি সকলের সেবক, সব সমাজের। যেখানে যতটুকু সত্য ততটুকুই আমার ব্রাহ্মধর্ম।

আমি জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধী। একমাত্র পরমেশ্বরকেই উপাসনার লক্ষ্য ও সাধন বলে জানি। তিনিই একমাত্র গুরু, তবে বিশ্বসংসারের আর সকল পদার্থের মত মানুষের থেকেও ধর্ম শিক্ষা করি। যারা ধর্মোপদেশ দেয় তাদের যথোচিত ভক্তি শ্রদ্ধা করা উচিত বলে মনে করি। কালী দুর্গা বা রাধাকৃষ্ণের নাম আমি সজনে কি নির্জনে কখনো জপ করি না। রাধাকৃষ্ণের পৌরাণিক অশ্লীল ভাব অত্যন্ত ঘৃণা করি কিন্তু রাধাকৃষ্ণের মধ্যে সাধক ও পরমেশ্বরের প্রেম-সম্বন্ধীয় যে আধ্যাত্মিক রূপক আছে তার ভাব অত্যন্ত উঁচু বলে মনে হয়। নিরাকার পরব্রহ্মকে উদ্দেশ করে যে কেউ যে নামে ডাকুক সে সেই নামে তাকে লাভ করবে। ঈশ্বরের আবার নাম কী। যে নামে ডাকুক ঈশ্বরকে বোঝালেই হল। অর্থ অন্ত

কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করলেই তা বর্জনীয়। সকল প্রকার অবতারবাদ, অভ্রান্তগুরুবাদ ও মধ্যবর্তীবাদে মানবাত্মার অধোগতি হয় বলে বিশ্বাস করি।

মাঘোৎসবে সকালে কীর্তনের দল নিয়ে হরিনাথ মজুমদার এসে হাজির। চলতি নাম কাঙাল ফিকিরচাঁদ। গান বাঁধতে যেমন ওস্তাদ তেমনি গান গাইতে।

প্রচারনিবাস লোকে লোকারণ্য।

কাঙাল গান ধরেছে, 'মা নই আমি সে ছেলে। যার আছে সাধনের জোর, সে কি মা তোর ভয় করে তুই ভয় দেখালে?'

ঘরের ভিতরে বাইরে সবাই বসে, শুধু গোঁসাই দাঁড়িয়ে আছে তার আসনে। দু'গাল বেয়ে চোখের জল পড়ছে। বাঁ হাত বুকের উপর, ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ব্রহ্মতালুতে। থেকে থেকে শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে লম্ফ দিয়ে উঠছেন, স্থির হয়ে দাঁড়ালেই কাঁপছেন থর থর করে। পড়ে যাবার উপক্রম হলেই ভাবাক্রান্ত পণ্ডিত ধরে ফেলছেন হাত বাড়িয়ে।

কতক্ষণ পরে গোঁসাই খলখল করে হেসে উঠল। এমন উদ্দাম দীর্ঘ হাসি শোনেনি কেউ কোন দিন।

হঠাৎ ডান হাত নামিয়ে নিয়ে এসে সামনের দিকে ইঙ্গিত করে গোঁসাই বললে, 'ঐ দেখ ঐ দেখ, তোমরা সকলে দেখে নাও, পাগলা এসেছে। ঐ যে পাগলা দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেতে চায়। ধর ধর ধর—' 'সামনের দিকে তাকালো গোঁসাই, পরে আবার নিরস্ত হয়ে বললে, 'না, ফিরেছে। বাব্বাঃ কত বড় গরু। ওটা কেমন দেখ, কপালে একটা চোখ, সেটার জ্যোতি কত, সূর্যের মত। মত আবার কী, সূর্যই তো! উঃ, কত বড় শিং। আর, আহা, ঐ দেখ নন্দী-ভৃঙ্গী, প্রথমে মনে করেছিলাম ওরা কেউ নয়, এখন দেখছি—পাগলার সঙ্গেই আসছে!' সামনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে নমস্কার করছে আর বলছে: 'আবার দেখ আমার মা এসেছেন। আহা, কত যোগী কত ঋষি মার চার দিকে নাচছে, শ্রীচৈতন্য, বাল্মীকি, নারদ, বশিষ্ঠ—বাড়ির সামনে সবটা ভরে গেল। মাকে নিয়ে সবাই আনন্দ করছেন। তামাসা দেখ, মাও নাচছেন। ঐ দেখ, ডাকছেন, মা আমাকে ডাকছেন—মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল গোঁসাই।

প্রণাম করে বসল স্থির হয়ে। ক্ষণে-ক্ষণে হাসছে আর কাঁদছে নিরর্গল। তারপরেই সমাধি-শান্ত হয়ে গেল। এগারোটা বাজে তবু সমাধি ভাঙে না!

কে আর কত বসে থাকবে, যে যার বাড়ি ফিরে চলল। গোঁসাই নির্বিচল।

কুলদানন্দ ছিল সেখানে, তার মনে সংশয় জাগল, এ কী কাণ্ড! নিরাকার ব্রহ্মবাদীদের প্রধান আচার্য হয়ে তাদেরই মন্দিরে এ কী পৌত্তলিকতা! নইলে নন্দী-ভৃঙ্গী কী, নারদ-বাল্মীকিই বা কে! ব্রাহ্মরা এ সব সহ্য করছে কী করে?

ব্রাহ্ম নবকান্ত বাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করল। রজনীবাবুর কাছেও।

তাঁরা বললেন, 'মাঘোৎসবটা হয়ে যাক, তারপর দেখে নেব।'

দুপুরে আবার গেল কুলদা। দেখলে সবাই পাত পেড়ে খেতে বসেছে, কিন্তু কেউ খাচ্ছে না। বারদীর কুঞ্জলাল নাগ খোল বাজিয়ে গান করছে। খোলে নানারকম আওয়াজ বেরুচ্ছে, মনে হচ্ছে একটা খোল নয়, যেন অনেক খোল একসঙ্গে বাজছে একতালে। ভাতের গ্রাস হাতে ধরা, সবাই বাহ্যজ্ঞানহীন বিশ্লিষ্ট হয়েছে। কেউ কাঁদছে, কাঁপছে, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, কেউ কেউ বা উচ্ছিষ্ট পাতার উপর গড়িয়ে

পড়ছে! এ কী ভূতের কাণ্ড! কুঞ্জলাল উন্মত্ত হয়ে লাফাচ্ছে আর খোল বাজাচ্ছে। কিরিচাঁদ পড়ে আছে লাটাই হয়ে। গোঁসাই তার আসনে সমাহিত।

কতক্ষণ পরে চোখ চাইল গোঁসাই। বললে, 'অতলস্পর্শ মহাসাগরে এক গণ্ডূষ মাত্র জলে গিয়ে পড়েছিলাম। সাগরের যে ঢেউ, এক ধাক্কায় আবার তীরে এনে ফেলেছে। আহা, যাঁরা এই সাগরে গিয়ে পড়েছেন, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে কত তাঁরা নাচছেন, কত তাঁরা আনন্দ করছেন—'

সন্ধ্যার সময় আবার সেই মা-মা, সেই শৈশব কাতরতা। মা, তুমি আমাকে কেন ডাকছ? তুমি আমাকে হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাবে? ঐ মুনি-ঋষিদের মধ্যে গিয়ে কি আমি বলতে পারি? আমার সাধ্য কী সেখানে বসি। আমি যে পাপী—নিতান্ত পাপী—

বলতে-বলতে ডাকতে-ডাকতে কাঁদতে-কাঁদতে আবার সমাহিত গোঁসাই।

রাত বাড়তে লাগল, মন্দিরগৃহ ফাঁকা হয়ে গেল, তবু বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলনা, বেদীর উপর বসে রইল নিশ্চেতন। কিংবা কে জানে, চৈতন্যময়!

কিন্তু গোঁসাইয়ের বক্তব্য কী স্পষ্ট করা দরকার। কুঞ্জলা ও আরো অনেকে তাকে ধরল আপনার বক্তব্য বক্তৃতায় প্রাঞ্জল করুন। 'সাকার ও নিরাকার উপাসনা' সম্পর্কে বলুন। ও সব বলতে পারব না, গোঁসাই 'না' করে দিল। তা হলে, বেশ, 'পৌত্তলিকতা ও ব্রহ্মজ্ঞান' সম্বন্ধে বলুন। সাম্প্রদায়িক ভাবের কোনো কথাই বলতে পারব না। গোঁসাই দৃঢ় থাকল।

'তা হলে ব্রহ্মোপাসনা নিয়ে বলুন।'

'বেশ, আমি ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মবাদী বিষয়ে বক্তৃতা দেব।'

সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে। মন্দিরের ঘরে-বারান্দায় তিলধারণের স্থান নেই। চার পাশের মাঠও ভরে গিয়েছে। ক্যাথলিক চার্চের পাদ্রী বার্ণার্ডও এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে। কী না জানি বলে! কী না জানি তার ব্যাখ্যা ব্যঞ্জনা!

কিন্তু দু-এক কথা বলতে-না-বলতেই বালকের মত কাঁদতে লাগল বিজয়কৃষ্ণ। 'যে ব্রহ্মের মহিমার কণিকামাত্র বর্ণনা করতে গিয়ে, পার না পেয়ে, বেদ উপনিষদ, অনির্বচনীয় বলে ক্ষান্ত হয়েছে, সেই ব্রহ্মের কথা আমি বলব? ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি, অজ্ঞান আমি—আমার মুখে আপনারা সেই ব্রহ্মের কথা শুনবেন?' বলেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল। কিছুতেই ভাবের আবেগ রোধ করতে পারলনা। শেষে নিরস্ত হয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বসে পড়ল। যুক্তকরে সবাইকে বললে, 'আমাকে আপনারা আশীর্বাদ করুন। দয়া করে আমার মাথায় সকলে পদাঘাত করুন, আমার অহঙ্কার চূর্ণ করে দিন। আমি ভয়ানক অভিমানী—তাঁর কথা বলব? তাঁর কথা বলতে আমি স্পর্ধা করি? আমি তাঁর কী জানি। আমি ছাই। আমি ছাই।'

পুরাণপুরুষের স্তব করতে গেল, কয়েকটা শ্লোক বলেই কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল। শুধু ত্বং হি ত্বং হি বলতে বলতে চলে গেল সমাধিভূমিতে।

চন্দ্রনাথ হার্মোনিয়ম বাজিয়ে গান ধরল তবু গোঁসাইয়ের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলনা।

লোক উঠে যেতে লাগল। কেউ-কেউ বললে, 'বক্তৃতা শুনে যে উপকার হত তার চেয়ে ঢের বেশি উপকার হল গোঁসাইজিকে প্রত্যক্ষ করে।'

ব্রাহ্মসমাজ থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠল। যে লোক পৌত্তলিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, শাস্ত্র

অভ্রান্ত বলে, হিন্দুদের আচার পদ্ধতিকে প্রশ্রয় দেয় তাকে দিয়ে সমাজের কোনোই শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সুতরাং প্রচারকের আসনে সে কী করে বসে?

গোসাই সরে দাঁড়াল। প্রচারক থাকতে চাই না। নির্জনে সাধন-ভজনে দিন কাটিয়ে দেব।

ঘরে গোসাই নেই, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা তাঁর শূন্য আসনকে নমস্কার করল।

মনোরঞ্জন তেলী ব্রাহ্ম, তার এ কী গৌত্তলিকতা?

কুলদা ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, 'আপনি না আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম?'

'তাতে কী?'

'তাতে কী মানে? আসনে কেউ নেই, তবু ওখানে নমস্কার করলেন কেন?'

'আমি কি আসনকে নমস্কার করলাম?' মনোরঞ্জন বললে, 'আমি গোসাইকে নমস্কার করলাম। ব্রাহ্ম হয়ে কি গোসাইকে নমস্কার করা যায় না?'

'ওখানে গোসাই কোথায়? গোসাই তো পাশের ঘরে।'

'তা হোক। গোসাই স্মরণ করে আমি ওখানে নমস্কার করেছি।'

'তা হলে তো সেই বিগ্রহকেই প্রণাম করা হল। ব্রাহ্ম হয়ে আপনি তা বলতে সাহস করেন? তা হলে হিন্দুদের কুসংস্কারী বলেন কেন?'

তুমুল তর্ক চলছে, পাশের ঘর থেকে গোসাই বলে উঠলেন: 'শূন্য আসনের সামনে কেউ যেন না নমস্কার করেন। মিছে আলোচনা ও অশান্তি বাড়িয়ে লাভ নেই।'

আবার আরেক দিন শূন্য আসনের সামনে কুলদা দেখতে পেল এক জোড়া খড়ম। যেমন বড়ো তেমনি পুরোনো।

'এ খড়ম কার?'

মুক্তকেশী দেবী বললেন, 'ব্রহ্মচারী গোসাইকে দিয়েছেন।'

'কে ব্রহ্মচারী?'

'ব্রহ্মচারীকে চেন না? বারণীর ব্রহ্মচারী।'

'তার কথা গোসাই কী করে জানলেন?' কুলদা কৌতূহলে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল।

'সমাধি অবস্থায় জানলেন যে একজন মহাপুরুষ বারণীতে গোপন হয়ে আছেন, তাই তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন।'

'কিন্তু খড়ম?'

মুক্তকেশী বললেন, 'ব্রহ্মচারী বললেন তিনি গোসাইয়ের পিতামহের খুড়ো হন। পূর্ব পুরুষের চিহ্ন বলে ঐ খড়ম তাঁকে দিয়েছেন।'

'পিতামহের খুড়ো—ব্রহ্মচারীর বয়েস কত?'

'একশো ছাপ্পান্ন বছর।'

ঢাকা ছেড়ে বিজয়কৃষ্ণ চলে এল কলকাতা। কলকাতা থেকে বর্ধমান।

বর্ধমানে দেখল পলাশ গাছে অজস্র ফুল ফুটে আছে। প্রগাঢ় রক্তিম সমারোহ।

বিজয়ের ভগবতী দর্শন হল। ভাবাবেশে মূর্ছিত হয়ে পড়ল।

আরেক দিন মহারাজার গোলাপ বাগানে গিয়ে গোলাপ বৈচিত্র্য দেখে অনুরূপ ভাবাবেশ।

বর্ধমান থেকে গোঁসাই চলে এল বারভাঙা। উঠল রাধাকৃষ্ণবাবুর বাড়িতে। আর সে বাড়িতেই তার ডবল নিমোনিয়া হল।

চাকায় খবর এসে পৌঁছুল, দুটো ফুসফুসই পচতে আরম্ভ করেছে। অবস্থা খারাপ। বাঁচবার আশা নেই বললেই চলে।

গোঁসাইয়ের ভক্ত শ্যামাচরণ বকসি তখুনি ছুটল বারভাঙায়। ব্রহ্মচারীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল: 'আমার গুরুদেবকে দয়া করে বাঁচান।'

ব্রহ্মচারী হাসল। বললে, 'তা, তিনি গেলেনই বা। আমিই তো রয়েছি।'

'আমরা আপনাকে চাইনা। ওঁকে চাই।'

'গুরুর জন্যে কী স্বার্থত্যাগ করতে পারিস?'

'গুরুর জন্যে আমার অর্ধেক পরমায়ু দিয়ে দিতে পারি।'

ব্রহ্মচারী নিশ্বাস ফেলে বললে 'সময় শেষ করে এসেছিস। এখন আর কী হবে?'

শ্যামাচরণ আকুল চোখে কেঁদে ফেলল।

'তার ঘরে তো কই তাকে দেখতে পেলুম না।' বললে ব্রহ্মচারী, 'হয় হয়ে গেছে, নয়তো তার গুরু তাকে দেহ ছেড়ে থাকবার শক্তি দিয়েছেন। আচ্ছা, তুই যা। দেখি কী করতে পারি?'

ব্রহ্মচারী ঘর বন্ধ করে দিল। সবাইকে ডেকে বললে, যত দিন ভিতর থেকে দরজা না খুলি কেউ দরজায় ঘা দিও না বা খুলতে চেষ্টা কোরো না।'

টেলিগ্রাম পেয়ে যোগজীবন, কুঞ্জ, প্রসন্ন—সবাই রওনা হয়ে গেছে। হঠাৎ যোগজীবন আকাশ-পথে ব্রহ্মচারীকে দেখতে পেল।

ঐ দেখ ব্রহ্মচারীও যাচ্ছেন বারভাঙায়।' বলে উঠল যোগজীবন।

আর তবে ভয় নেই।

এদিকে গোঁসাইয়ের জ্ঞান নেই। নাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাক্তার বললে, 'বড় জোর আর আধঘণ্টা।'

রাধাকৃষ্ণবাবু একতারা বাজিয়ে সজল কণ্ঠে কাতর প্রাণে ভগবানের নাম গান করতে লাগল। আর সকলে সাইতে না পেরে কাঁদতে লাগল।

কারা যেন সব এসেছে। একবার দেখা দিচ্ছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। একজন তো বারভাঙার ব্রহ্মচারীর মত। আরেকজন বুঝি মানস-সরোবরের পরমহংস। আর আরো দুজন? এরা বোধহয় আরো দুজন সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষ।

গোঁসাইয়ের দেহ স্থির, অসাড়, নিস্পন্দ।

হঠাৎ কী হল কে জানে, দু একবার মাথা নাড়া দিয়েই চকিতে গোঁসাই লাফিয়ে উঠল। হরিবোল! হরিবোল! বলে মাচতে লাগল উদ্দাম হয়ে।

এ কী হল? এ কী অসম্ভব ব্যাপার!

ডাক্তারবাবুদের ডেকে নিয়ে এল!

আর ডাক্তারবাবু। সবাই হুঙ্কারে গর্জনে মেতে উঠল হরিকীর্তনে। হরিবোল! হরিবোল! সমস্ত ব্যথা ও ব্যাধির হরীতকী—হরিবোল! হরিবোল!

ডাক্তারবাবুরা এল হন্তদন্ত হয়ে।

তারা তো হতবাক। মরে যাওয়া রুগী শুধু উঠে দাঁড়ায়নি, উদ্দণ্ড নৃত্য করছে।

আমরা কোথায় আছি! বিজ্ঞান কোথায় আছে। (ক্রমশঃ)

অন্তরীক্ষে

অশ্লীল সাহিত্য

চটকরে বইটা মুড়ে দিন তো!

সংবাদপত্রে সুরুচি

দুর্নীতিদমন কমিশন

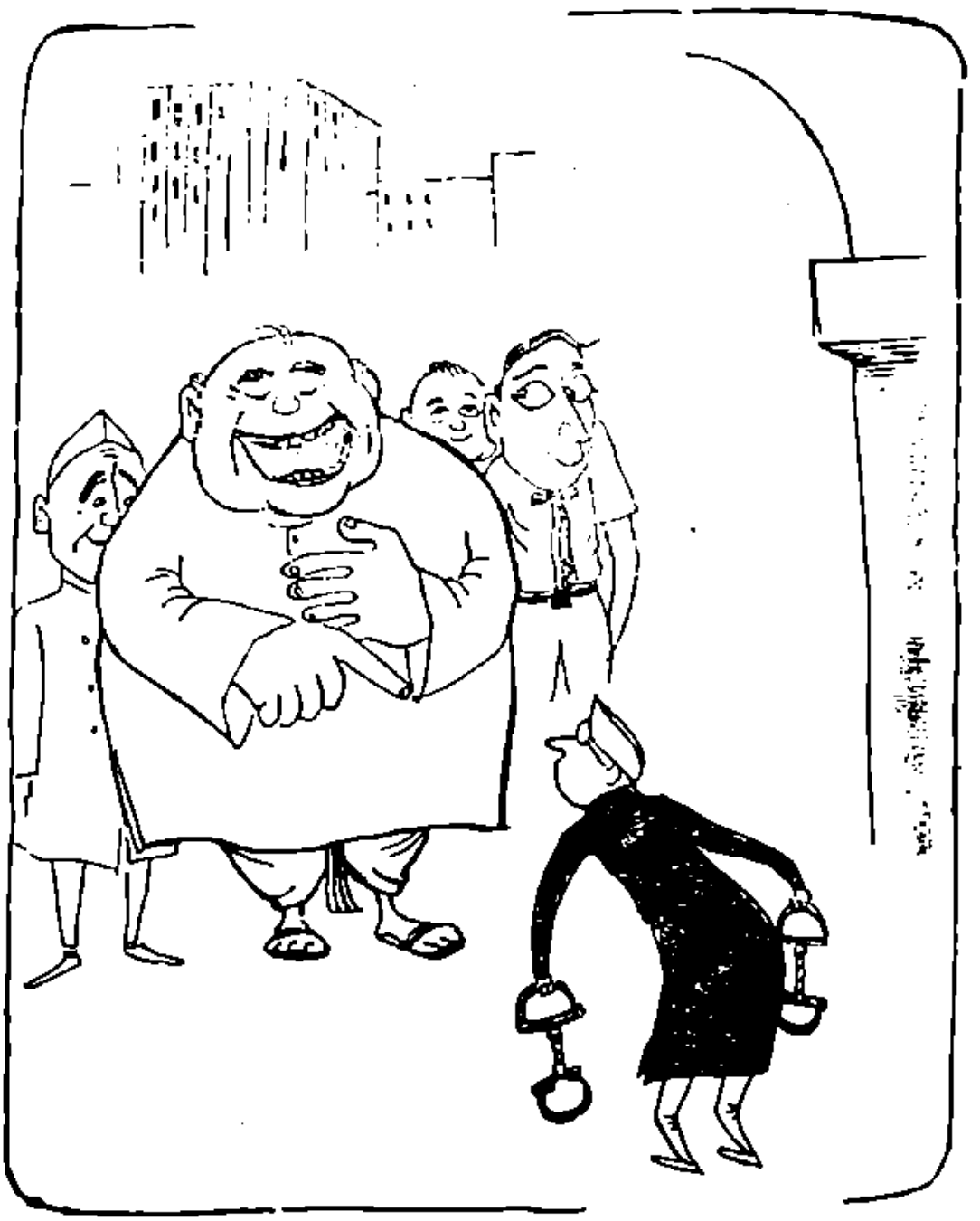

আরে, আরে দেখ, আমাদের জন্য সোনার হাতকড়া এনেছে।

পুরাতনপাঠা

আমাদের শিক্ষা ও বর্তমান জীবন সমস্যা

প্রমথ চৌধুরী

…আমাদের জাতীয় দৈন্যের অনুসন্ধান করতে হলে স্কুল কলেজের বাইরে বহুদূরে যেতে হবে, এবং জীবনের অপর সকল ক্ষেত্রে গিয়ে পড়তে হবে। যুবকদের জীবন সংগ্রামের উপযোগী করে গড়া অবশ্য শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ, কিন্তু একমাত্র অর্থের দিকে নজর রাখলে আমরা শিক্ষার সকল অঙ্গ এবং সম্ভবত উত্তমাঙ্গই দেখতে পাব না। দেশশুদ্ধ স্কুল কলেজকে রাতারাতি Technical School-এ পরিণত করলে আমরা সভ্যতার উচ্চতম শিখরে এক লম্ফে যে আরোহণ করব না সে কথা বলাই বৃথা, যে কথা বলা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, উক্ত উপায়ে আমরা যে শিল্প বাণিজ্যে চোখের পলক না ফেলতেই ইউরোপের উপর টেক্কা দেব তার কোনই সম্ভাবনা নেই। একমাত্র Technical School এর শিক্ষাও যে বিশেষ কোনো কাজের হয় না, এ হচ্ছে ইউরোপের পরীক্ষিত সত্য। টেকনিকাল স্কুলে শিখে নাকি লোকে শুধু টেকনিকাল স্কুলের মাষ্টারি করতেই শেখে! হাতে কলমে শিল্প শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে কারখানা আর তার বৈজ্ঞানিক অংশ শেখবার যথার্থ স্থান হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। এই কারণে যারা কারখানায় কাজ করে তাদের সেই কাজের Science শেখবার জন্য কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে এক একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। কেননা একদিকে যেমন হাতে ধরে না শিখলে যথার্থ শিল্পী হওয়া যায় না, অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাবে বড় শিল্পী হওয়া যায় না। এই সব কারণে আমার মতে শিক্ষা সম্বন্ধে মূল প্রশ্নটা হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্কের সম্বন্ধটা কি? ইহলোকে মস্তিষ্ক আমাদের একমাত্র নিয়ন্তা, হস্তপদাদি সব তার আজ্ঞাবহ অনুচর মাত্র।

শিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য কি, সে বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, শিক্ষাকে মানব জীবনের কোনো একটি সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের উপায় স্বরূপ মনে করলে সে শিক্ষা নিষ্ফল হয়, নয় তার ফল ভাল হয় না। আমাদের মনোমত কোনো একটি বিশেষ ছাঁচে সকলকে ঢালাই করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়, কেন না সে উদ্দেশ্য সাধন করবার এ যুগে কোনো উপায় নেই। ইউরোপে দেখা গিয়েছে যে, ও-হেন চেষ্টার ফলে শিক্ষকদের সেই মনগড়া ছাঁচ অধিকাংশ স্থলে ভেঙ্গে গিয়েছে এবং যেখানে ভাঙ্গেনি, সেখানে যারা ঢালাই হয়ে এসেছে তারা মানুষ না হয়ে জড়পদার্থ হয়েছে এবং তাদের নিয়ে যথেষ্ট ভুগতে হয়েছে। মানুষ ধাতু নয়, কিন্তু দেহমনে একটি Organism, এবং সেই Organism এর স্ফূর্তির সহায়তা করাই শিক্ষার একমাত্র কাজ; এক কথায় শিক্ষার ধর্ম হচ্ছে ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি সাধনের দ্বারা জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। মনে রাখবেন যে, আমরা যাকে জাতি বলি সে আসলে হচ্ছে কতকগুলি ব্যক্তির সমষ্টি এবং তা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যখন মনের ও শক্তির পার্থক্য এবং তারতম্য আছে তখন শিক্ষারও এক উদ্দেশ্য হতে পারে না। শিক্ষার সেই ব্যবস্থাই সুব্যবস্থা যাতে বহু লোকের ব্যক্তিত্ব স্ফূর্তি লাভ করে এবং যার ফলে জাতীয় শক্তি নানাদিকে বিকশিত হয়ে ওঠে এবং জাতীয় জীবন

অপূর্ণ বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য লাভ করে। সকলের মাথাই যে ইউনিভার্সিটির ঘুরে মোড়াতে হবে এমন কোনোই কথা নেই। দেশশুদ্ধ লোকের মানুষ হওয়া চাই কিন্তু সকলেরই পণ্ডিত হবার দরকার নেই। শিক্ষার এ উদ্দেশ্য যে সকলে সহজে মানতে চান না, তার কারণ, এ দেশে আজও সকলে মানুষকে জীব হিসেবে দেখেন না, অনেকেই যন্ত্র হিসেবেই দেখেন।

তারপর অপরাপর জীবের সঙ্গে মানুষের একটি প্রকাণ্ড তফাৎ আছে। মানুষের অন্তরে মন বলে একটি পদার্থ আছে, জীবজগতের অন্য কোনো প্রাণীর ভিতর তা নেই। পশুপক্ষীরা আজ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যে যেখানে ছিল, আজও ঠিক সেইখানেই রয়েছে। কিন্তু মানবসমাজ এই তিন হাজার বৎসরের মধ্যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পকলায় আয়ে বয়ে রসে যে এতটা ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠেছে, মানুষ যে আজ এ পৃথিবীর অধিষ্ঠাতৃ প্রভু, সে পরিণতির মূলে আছে তার মানসবল। মানুষের উন্নতির কারণ এই যে তার মনকে শিক্ষা দেওয়া যায়, অর্থাৎ—তার আত্মশক্তিকে কোটানোও যায়, বাড়ানোও যায়। আমরাই কেবল একমাত্র শ্রেষ্ঠীর প্রাণী যারা তাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে, এবং তা পরস্পরকে আদান-প্রদান করতে পারে। আমরাই শুধু মনের কারবার করতে পারি এবং সেই জ্ঞানের মূলধনও বাড়াতে পারি। শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, আজ যারা ছেলে আর কাল যারা মানুষ হবে, পূর্ব্ব পুরুষের সঞ্চিত জ্ঞানের তাদের উত্তরাধিকারী করা, এবং সেই সঙ্গে তাদের অন্তরে নূতন জ্ঞান সঞ্চয় করা ও নূতন কর্ম্ম কৌশল লাভ করবার প্রবৃত্তি ও শক্তির উদ্বোধন করা। যে যতটা জ্ঞান আত্মসাৎ করতে পারে এবং যতটা কর্ম-শক্তি লাভ করতে পারে সে ততটা শিক্ষিত। কিন্তু দুই-ই হচ্ছে আসলে মনের জিনিষ এবং দুয়ের ভিতর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয় করাই বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। একটা ইংরাজি বচন আমাদের মনের উপর এ যুগে অন্য রকম আধিপত্য লাভ করেছে, সে হচ্ছে Struggle for existence. একথা নিত্য শুনতে পাওয়া যায় যে, সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যা আমাদের Struggle for existence এর সহায়। ঐ মস্ত কথাটার সাদা অর্থ হচ্ছে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা জীব মাত্রেরই অস্থি মজ্জাগত, এবং যেহেতু আমরাও জীব সে কারণ ও প্রবৃত্তি আমাদের পক্ষেও স্বাভাবিক। কিন্তু পশু পক্ষীর সঙ্গে আমাদের প্রভেদ এই যে আমাদের ভিতর উপরন্তু আর একটি প্রবৃত্তি আছে, যার নাম আত্মোন্নতির প্রবৃত্তি। আমরা শুধু আত্মরক্ষা করেই সন্তুষ্ট থাকিনে, মনে ও চরিত্রে মনুষ্যত্বের নিম্নস্তর হতে উচ্চস্তরে ওঠবার প্রচেষ্টাও আমাদের প্রকৃতিতে স্বাভাবিক। এবং শিক্ষা হচ্ছে এই প্রচেষ্টার প্রধান সহায়। যদি কেউ বলেন তা বটে, আগে আত্মরক্ষা পরে আত্মোন্নতি। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এ দুয়ের ভেতর পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ নেই। আত্মোন্নতির প্রচেষ্টাই যে আত্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়, এর প্রমাণ মানব জাতির সভ্যতার ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে দেয়।...

নির্মোক

রজত রায় চৌধুরী

ঝাপসা চোখের দৃষ্টি আস্তে আস্তে স্পষ্ট হয়ে এল। হাতের রুমালে আর একবার চোখ মুছলেন কনকেন্দু। গাড়ীর পিছনের কাঁচ দিয়ে একবার তাকালেন। অপসৃয়মান অট্টালিকার মাঝে হারিয়ে গিয়েছে লাল রঙের তিনতলা বাড়ীটি। ফুরিয়ে গিয়েছে পঁয়ত্রিশ বছরের আনা গোনা। আজ কনকেন্দু নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এখন সম্মুখে অখণ্ড অবসর। অপর্যাপ্ত সময়।

সিটের পাশে দুটি প্রস্ফুটিত পুষ্পস্তবক। বাইরের বাতাস ভেতরে এসে লুটোপুটি খাচ্ছে। একটা মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছেন কনকেন্দু। ফুলের গন্ধ। কোলের ওপর খান তিনেক দর্শনের বই ছিল। সেগুলিকে পাশে সরিয়ে রাখলেন তিনি।

বইগুলো বেছেছে ভবতারণ। ভবতারণই আজকের অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল। সকলের হয়ে সে আজ সংক্ষিপ্ত একটা ভাষণও দিয়েছিল। ভবতারণ বলেছে, অবসর গ্রহণ করবার পরও আমরা কনকেন্দুর সক্রিয় সাহায্যের প্রত্যাশা রাখি। যে ভরসা তিনি এতদিন দিয়ে এসেছেন অফিসে থেকে, গৃহে থেকেও তিনি যেন অনুরূপ আশ্বাস দিয়ে আমাদের নিরাপদ করেন। এখানকার ক্ষমতা হয়ত তার ফুরিয়েছে, কিন্তু মানুষ হিসেবে মানুষকে ভরসা ও বিপদমুক্ত করবার শক্তি তার শেষ হয়ে যায়নি।

গাড়ীতে ওঠবার সময় প্রায় শ'খানেক লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। কনকেন্দু ভাবলেন, সরমা নেহাৎ মিছে কথা বলত না।

বলত, তোমার ওই অফিস আমার সতীন। আমি বড়ি ধরে বসে থাকব—একমিনিট দেরী হলে তোমার অফিস যাওয়া আমি বন্ধ করে দেব।

কনকেন্দু হাসতেন।

—যেন যা হোক। উত্তর দিলে না যে? বাবারে বাবা, লোকে অফিস থেকে পালাতে পারলে বাঁচে আর উনি অফিস ছেড়ে আসতেই চান না। কেন? অফিসে তোমার কে আছে শুনি? ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়তেন কনকেন্দু। বলতেন, সবে অফিসার হয়েছি, ফাঁকি দিলে চলে?

—ফাঁকি? তোমার অফিসের ওয়ার্কিং আওয়ারস্ তো দশটা থেকে পাঁচটা। পাঁচটার পর অফিস থেকে বেরুলে ফাঁকি দেওয়া হয়? না হয় চাকরি করি না, তাই বলে কি?…

হো হো করে হেসে উঠতেন কনকেন্দু। বলতেন, বেশ তো। তোমার আদেশমত পাঁচটার একমিনিট দেরী করব না।

দেরী অবশ্য অনেকদিন হয়েছে। তবে একথা আগে থাকতেই টেলিফোনে জানাতেন কনকেন্দু। নেহাৎ যদি কখনও কাজের ঝামেলায় ভুলে গিয়েছেন, বাড়ী গিয়েই সরমার অনেক অভিযোগের সুমুখে পড়তে হয়েছে তাকে। সরমা বিশ্বাস করত না তার কৈফিয়ৎ।

বলত, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। আমাকে চিন্তায় ফেলতে তোমার একটুও বাধে না। অফিসে

তোমার কি যাদু আছে তুমিই জানো—বলতে বলতে সরমার চোখে বাষ্পোচ্ছ্বাস ঘনিয়ে আসত। কনকের সুরে অভিমানের রাঙা'স মিশে তাকে উদ্বেল করে তুলত।

কনকেন্দু বিরক্ত হতে পারতেন না। বিব্রত হয়ে সরমার কাছে নিজের সমস্ত জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে সান্ত্বনাতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

আত্মীয়-স্বজনেরা গোপনে বলাবলি করত, এতো আর নূতন কিছু নয়, এ চিরকালের বিধান। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর আঁচল ধরেই সব পুরুষ সংসার রঙ্গমঞ্চে জীবন কাটিয়ে দেয়—কনকেন্দু তার ব্যতিক্রম হবে কি করে?

একথা কনকেন্দুর কাছে গোপন থাকেনি। ব্যতিক্রম হতে চাননি তিনি। হবার চেষ্টা করলে তার ফলাফল কি হবে তা বিলক্ষণ জানতেন তিনি। তাই অন্য পথের আশ্রয় নিয়েছিলেন। নিজের স্বভাবকে তিনি বদল করতে পারেননি। কেবল সংসারের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে আর সরমার সঙ্গে মনোমালিন্যের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন।

তার উত্তর-চল্লিশের প্রৌঢ়ত্বে সরমা গৃহিণী হয়ে এল এ সংসারে। শুধু সংসারে নয়, কনকেন্দুর জীবনের সমস্ত কার্যিরার ওপরও যেন।

এলোমেলো জীবনে এল সুসামঞ্জস্য। সংসারে ছন্দ। কনকেন্দুকে যেন ঘসেমেজে ঝকঝকে করে তুললেন সরমা। আর তার বছর কয়েকের মধ্যেই গেজেটেড অফিসার হয়ে গেলেন কনকেন্দু।

অফিসের সহকর্মিরা বললে, দাদা, খাওয়াচ্ছেন কবে?

—যেদিন খুশি, মৃদু হেসে কনকেন্দু বললেন।

—বেশ তো, সামনের মাসে। কি বলেন দাদা। ওহে বিভূতি একটা লিস্ট করে ফেলো; কিন্তু দাদা, আপনার বাজেট কত?

—বাজেট? আবার নিঃশব্দে হাসলেন কনকেন্দু। আনন্দের উৎসব বাজেট করে হয় না শিবেন্দু।

—এই তো কথার মত কথা। সত্য, শিব কনকেন্দু লাহিড়ী।

সকলের সমস্বরে আনন্দোচ্ছ্বাস।

বাড়ীতে সরমা বললে, তোমার প্রমোশন হল, আমায় কি প্রেজেন্ট দেবে?

—সবই তো তোমার। কিছু কি বাকি রেখেছি—সহাস্যে বললেন কনকেন্দু।

—ও সব ফাঁকা কথায় ভুলি না। তুমি প্রেজেন্ট দেবে, তোমার পছন্দ মত।

—বেশ তো গাড়ী বার করতে বলো।

—ও! খুব যে দরাজ হাত দেখছি।

একটা আত্মপ্রত্যয়ের হাসি বুঝি ফুটে উঠল কনকেন্দুর মুখে। বললেন, আমার অফিসের সবাই কিন্তুবলে, জানো;—বলে কনক লাহিড়ী একটা মানুষ বটে, এমন দরাজ হাত আর কারুর দেখলাম না।

—হুঁ। সরমা ধীর পায়ে সেখান থেকে সরে গেল।

সরমা চলে যেতেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন কনকেন্দু। সরমা নিশ্চয় রাগ করেছে। তবু হাসি হাসি মুখে কনকেন্দু পাশের ঘরে এলেন। বললেন, কি হল, এখনও কাপড় বদলাওনি।

সরমা নিরুত্তর। আরো একটু এগিয়ে সরমার কাছে এসে দাঁড়ালেন কনকেন্দু। একটু দ্বিধাভরে একটা হাত তার কাঁধে রাখলেন। বললেন, ওই সামান্য কথায় তুমি রাগ করলে?

সরমা সরে গিয়ে দাঁড়াল। অল্প ভেজা কণ্ঠে বললে, আমি তোমার কে? তোমার সব কিছুই অফিস। অফিসই তোমার সব।

কনকেন্দু একদিন বললেন, ভাবছি চাকরি ছেড়ে দেব।

—ছেড়ে দেবে। কেন?

—তোমার জন্য।

—আমার জন্যে? ইজিচেয়ারের হাতলের ওপর এসে বসেছিল সরমা। উঠে দাঁড়াল এবার। ভুরু কুঁচকে বললে, আমার জন্য!

—তুমি আমার অফিসকে পছন্দ করো না—তাই ভাবছি।

সরমা অনেকক্ষণ চেয়ে রইল কনকেন্দুর মুখের ওপর। বললে, তোমার চাকরিতে আমি অপছন্দ করিনে; সোজা কথাই বলি—অফিস বাইরের—ঘরের ভেতর আমি অফিসের কোন কথা শুনতে রাজি নই। কিন্তু তাই বলে এত বড় শাস্তি তুমি আমায় দিতে চাও?

—শাস্তি! তোমায়?

—হ্যাঁ, আমায়। তোমার সম্মানে লোকে আমার সম্মান করে তা বুঝি তোমার সহ্য হয় না।

কনকেন্দু থতমত খেয়ে গেলেন। ভাবলেন-আর নয়। আর অফিসের কোনো প্রসঙ্গ মুখে তিনি আনবেন না। ধীরে ধীরে দুটো জগৎ তিনি গড়ে তুললেন। একটা বাইরের, একটা ভেতরের। এদুটো যেদিন মিলবে সেদিন যদি প্রলয় ঘটে তো ঘটুক। বর্তমানের শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকুক।

অফিস যাবার আগে তার কোট প্যাণ্ট হাতের কাছে গুছিয়ে রাখত সরমা। টাইটাকে নেড়ে দেখতো বাঁধা ঠিক আছে কিনা। তারপর সিঁড়ির মুখে এসে বলত, দেরী করো না যেন।

আজই তার শেষ। আর কোনদিন সরমার মুখ থেকে শুনতে হবেনা একথা।

একটা ঝাঁকুনি দিল গাড়ীটা। হঠাৎ লাল আলোর সঙ্কেত তাকে থামতে বাধ্য করেছে। কনকেন্দুর চোখে আবার ভদ্রার ছায়া চুপিচুপি নেমে এল; মনের তলে যুগান্তের ইতিহাস।

সরমা বললে, একি? পঞ্চাশ টাকা কম কেন?

—কম? ও-বলছি, বলে আরাম করে চেয়ারে বসে বললেন, আমাদের তারাপদ, তারাপদর বউয়ের হঠাৎ হাসপাতালে যাবার দরকার হয়েছিল। জীবন-মরণ সমস্যা। অনেক টাকা খরচ হয়েছে। ওকেই দুঃসময়ে দিয়েছি। এখন ভগবানের কৃপায় বৌটি সুস্থ হয়ে উঠুক।

একনাগাড়ে বলে থামলেন তিনি। সরমা একটি কথাও বললে না। চা-পর্ব শেষ হবার পর বললে, এতদিনে বুঝলাম, এতদিন চাকরি তোমার—সকলের ঘরে শূন্য কেন? কেন তুমি এক পয়সাও জমাতে পারোনি। শোনো, এবার থেকে, কনকেন্দুর চোখের ওপর চোখ রেখে বললে, বুঝে শুনে খরচ করতে হবে। যা হবার হয়ে গেছে, কিন্তু আর নয়, বুঝতে পেরেছ?

কনকেন্দু নিঃশব্দে চেয়ে রইলেন। মনের তলে একটা শঙ্কা নড়ে উঠল। বলতে গেলেন, সেতো নিশ্চয়, সে তো নিশ্চয়—কিন্তু বলতে পারলেন না।

—আর শোনো, ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খোলো। চেক আর তোমায় ভাঙাতে হবে না। যা করবার আমিই করবো—

কনকেন্দু বুঝতে চেষ্টা করলেন সরমাকে। সরমা বলল, কি দেখছ অমন করে? বুঝতে পারোনি আমার কথা? তোমার না হয় সাধ-আহ্লাদ কিছু নেই, আমি তো সেসব জলাঞ্জলি দিইনি—বলেই কিন্তু লজ্জা পেল সরমা। কনকেন্দুর বুকের ভেতরটাও কেমন যেন সহসা ফাঁকা হয়ে গেল। এমন এক শূন্যতা সমস্ত সুখের ভেতরও ছিল। একটি শিশুর কলকাকলী। দুজনেই মৌনমুখে নতদৃষ্টিতে বসে রইল। দুজনের হৃদয় কাঁদতে লাগল। দুজনেই বুঝল। কেউ কিছু বলতে পারল না।

অফিসের সহকর্মিরা বলত, দাদা কি ভুলে গেলেন আমাদের?

—কেন বলো তো?

—এটা কোন মাস খেয়াল রেখেছেন?

এবার নির্মল হাসি ফুটে উঠত প্রশস্ত ললাটের ওপর। বলতেন, আমাদের বার্ষিক উৎসব এসে গেল না! বেশ। কাল নিও।

সহকর্মিরা চলে গেলে তিনি ফোন করতেন সরমাকে। তারপর ছুটির পর তার গাড়ী ছুটে চলত শিয়ালদহ।

সেদিন বাড়ী ফিরে বড় অন্যমনস্ক থাকতেন কনকেন্দু। নির্জন বারান্দায় বসে তিনি অন্বেষণ করতেন নিজেকে। নিজের কার্যধারাকে। নিজের ভালো আর মন্দকে।

সরমা এসে বলত। বলত, এমন চুপচাপ বসে আছ যে? শরীর ভালো আছে তো? জোর করে হাসবার চেষ্টা করতেন কনকেন্দু।—এমনি বসে আছি। বসো তুমি।

মাইনে পেয়ে চেকটা এনে দিতেন সরমার হাতে। সরমা হাসিমুখে বলত, এবার তোমার জন্য একজোড়া গরম সুট করতে হবে।

—কি দরকার। আমার যা আছে তাই যথেষ্ট। অনর্থক পয়সা নষ্ট।

—এতে আবার পয়সা নষ্ট কোথায়? তুমি বড় কৃপণ।

—একথা কিন্তু কেউ স্বীকার করবে না।

—সে জানি। কৃপণ তুমি নিজের বেলায়। নিজের দিকে তোমার কোন নজর নেই। আমি না থাকলে বোধহয় গাড়ীও কিনতে না।

গাড়ীর কথা মনে পড়ায় চোখ খুললেন কনকেন্দু। বিয়ের বছরখানেক বাদে সরমার জেদাজেদিতে একটা পুরোনো গাড়ী কিনেছিলেন। তারপর এই নূতন গাড়ীটা সে-ও কতদিন হয়ে গেল। তার অবসর নেবার মতন এ গাড়ীটারও অবসর নেবার সময় এসে গেছে।

একদিন অফিস থেকে বাড়ী আসবার সময় সবে গাড়ীর দরজায় হাত দিয়েছেন, অক্রূরচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন।

—কি খবর? ভালো তো সব।

—খবর ভালোও বটে, আবার মন্দও বটে।

ভালো-মন্দ দুই-ই শুনলেন কনকেন্দু, বললেন, কোন মেয়ে?

—মেজ মেয়ে। সেই সেবার যার টাইফায়েড হয়েছিল।

—বেশ তো পাঠিয়ে দাও। ছেলেটি তো ভালোই।

—ভালো তো। কিন্তু মুস্কিল কোথায় তা তো বুঝতেই পারছ।

—হুঁ। কত কন পড়ছে?

—আমার তো মনে হচ্ছে হাজার খানেক ঘাটতি পড়বে।

—হুঁ। বেশ। নিও। বলে মাথা নীচু করে গাড়ীতে উঠলেন কনকেন্দু।

—কিন্তু দাদা। ওপক্ষ দেরী করতে নারাজ। সামনে ভাদ্র মাস। অথচ আজ শ্রাবণের দশ তারিখ হয়ে গেল।

—দিন ঠিক করেছো?

—একেবারে শেষের দিন মাসের। কিন্তু তুমি অনুগ্রহ না করলে তো কিছুই সম্ভব হবে না।

অস্ফুটে হেসে উঠলেন কনকেন্দু, বললেন, মানুষকে অনুগ্রহ করার ক্ষমতা আমার নেই অক্রূর। আমি শুধু মানুষের কর্তব্য করি। যাক্—কাল নিও। কেমন? গাড়ী চলতে শুরু করল। হঠাৎ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কনকেন্দু বললেন, ও অক্রূর। তুমি আজকাল আছ কোথায়? সেই ঠনঠনের কাছে তো?

—কোথায় আর যাব। ওখানেই আছি।

এরপর গাড়ীর মুখ ঘুরে যেত। প্রথমে বৌবাজার, সেখান থেকে ঠনঠনে, তারপর বাগবাজারে নিজের বাড়ী।

সিঁড়ির মুখে সরমা দাঁড়িয়ে থাকত। বলত, দেরী যে!

—কাজ ছিল, বলে কনকেন্দু টাইয়ের ফাঁস আলগা করতেন।

—কাজ। কাজ। কেবল কাজ। বাবারে বাবা। একটা ফোন করবার পর্যন্ত ফুরসুত নেই—রাগে গরগর করত সরমা।

সংসারের অর্থনীতিতে কনকেন্দুর বুদ্ধি অচল। তিনি আয়ের পথ জানেন, ব্যয়ের পথ জানেন না। রোজগার করেছেন কিন্তু সঞ্চয় করেননি কিছুই—এতথ্য জানবার পর সংসারের হাল ধরবার পর থেকে আয় ব্যয়ের ব্যালান্সশীটখানা তৈরী করবার ভারও নিয়েছিল সরমা। সংসারের ডেবিট ক্রেডিটে সে কনকেন্দুর চেয়ে অভিজ্ঞা, এ মত সে নিজেই ব্যক্ত করত।

প্রতিদিন অফিস যাবার সময় পানের কৌটোর সঙ্গে একটা টাকা পকেটে ঢুকিয়ে দিত সরমা। বলত, সন্দেশ খাও তো রোজ। না, সেটাও দানছত্র হয়।

কনকেন্দু এ কথা শুনে উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন।

অফিসেও কখনও কখনও এমন হাসি হাসতেন কনকেন্দু। সহকর্মিরা বলত, দাদা সুখী লোক। সংসারের ঝামেলা কম। নির্ঝঞ্ঝাট ফ্যামিলি। তাই হাসতে পারেন প্রাণ খুলে।

—ঠাট্টা করছ? কনকেন্দু প্রশ্ন করতেন।

—কি যে বলো। তুমি চলে গেলে আমাদের কি দশা হবে ভাবছি।

আজকের বিদায় অভিনন্দন সভায় তাই অনেকেরই চোখে জল এসেছিল। আজ সারাদিন তার ঘরে লোকের আনাগোনার বিরাম ছিল না। সকলেই তাদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছেন। কনকেন্দু ভাবলেন, এরপর তার সারাদিন কাটবে কেমন করে? এই সব চেনামুখগুলো, এদের সুখ-দুঃখের খবরাখবরগুলো তিনি পাবেন কেমন করে? জীবনের পঁয়ত্রিশবছরের মায়া কি একদিনে ছেঁড়া যায়।

ড্রাইভারের ডাকে চোখ খুললেন কনকেন্দু। বাড়ী পৌঁছে গেছেন তিনি। রুমালে চোখ-মুখ মুছে উপরে উঠে এলেন।

সরমা আজ আর কোন কথা বলল না। ফুলের মালাটা তাদের দুজনের একটা ফোটোতে পরিয়ে দিল। ফুলের সোহাগুলি ফুলদানিতে। বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

ক'দিন বাদে একদিন রাতে সরমা বললে, সামনের মাসে উত্তর-ভারত ভ্রমণে বেরুব। সারা জীবন তো কলকাতায় কাটালে। এবার একটু পুণ্য কর। আমার বহুদিনের ইচ্ছে। কনকেন্দু নিঃশব্দে হাসলেন।

—যেন যা হোক্। চুপ করে আছ যে?

—যাবো তো। কিন্তু টাকা কোথায়?

—টাকার জন্ত তোমায় ভাবতে হবে না।

—বলছ। কিন্তু টাকা আমারও কিছু আছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর গ্রাচুয়িটীর টাকা পেতে অবশ্য দু'চার মাস দেরী হবে। তাছাড়া সেটাকাও…

—আবার তাছাড়া কি? তোমার টাকা যবে হয় পাবে। আপাততঃ আমার টাকায় চল।

একথার আর জবাব দিলেন না কনকেন্দু। জবাব দেবার প্রয়োজন বোধহয় আর হবে না। জবাব যেন দমকা বাতাসের মত এল পরের সপ্তাহে। তৎক্ষণে যাবার আয়োজন অনেকখানি তৈরী। বার্থ রিজার্ভেশন হয়ে গেছে। আপাততঃ হরিদ্বার। তারপর আরও অনেক বাসনা আছে সরমার। কদিন ধরে জিনিসপত্র গোছাচ্ছে সরমা। কি কি দরকার হতে পারে তার একটা লিস্ট করেছে সে। বারবার কাটাকাটি করছে। আবার নূতন লিস্ট তৈরী করছে। এমন দিনে বাড়ির সামনে এক সকালবেলায় কয়েকজন লোক এসে ভিড় করল। সকলেই একই উদ্দেশ্যে এসেছে। সকলেই খোঁজ করে একজনের। সকলেরই চাহিদা এক।

ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন কনকেন্দু। বললেন, বসুন শেঠজী। বসুন চতুর্বেদী। বসুন মিঃ সান্যাল।

সবাই বসল গম্ভীর মুখে।

চতুর্বেদী বললে, আপনি শুনলাম রিটায়ার করেছেন, শেঠজী বলছিলেন।

মিঃ সান্যাল: হ্যাঁ, আমায় ফোনে জানালেন মিঃ চতুর্বেদী।

কিন্তু… তাকে বাধা দিয়ে কনকেন্দু বললেন, আমারই একটু ভুল হয়ে গেছে মিঃ সান্যাল, বলে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, আরও মাস তিনেক ওয়েট করতে হবে, তার জন্ত যা ইণ্টারেস্ট লাগে—

বাধা পড়ল।

প্রায় সকলেই সমস্বরে বললে, কারবার ওয়েট করা ইম্পসিবল্।

—কিন্তু আমার কথাটা শুনুন।

—না, স্যার, আপনার হাণ্ড নোটের মেয়াদ শেষ। আপনার অফিসে খোঁজ করে আপনার বাড়ীর ঠিকানা পেয়েছি। এরপর আর আমরা ওয়েট করতে পারি না।

—কিন্তু টাকা তো আপনারা পাবেনই। গ্রাচুয়িটীর টাকা রিজাসাইজ করলেই দিয়ে দেব। তাছাড়া প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা পেতেও মাস তিনেক লাগবে।

—ও তো স্যার আপনার জমানো টাকা। আপনার ঘরে কি আর দশ বিশ হাজার টাকা নেই।

—ঠিক ঠিক। মাথা নাড়ল চতুর্বেদী। আপলোক রেলকোম্পানীর অফিসার আপনার ঘরমে রুপেয়া নেহি হ্যায়—এ কি সাচ্চা বাত আছে!

—তার মানে? আমি মিথ্যা কথা বলছি। গর্জন করে উঠলেন কনকেন্দু।

—কথা বলে কি লাভ স্যার। মিটিয়ে দিন চলে যাই।

—হাঁ। মিঃ লাহিড়ী। আর আপনি তো শুনলাম বাইরে যাচ্ছেন—এরপর আর আপনাকে কোথায় পাব?

—তার মানে? আমি টাকা না দিয়ে পালাব? আপনারা আমায় পেয়েছেন কি?

এমন সময় ভেতরের দরজার আড়াল থেকে একটা চাপা উত্তেজিত নারীকণ্ঠ ভেসে এল: নিবারণ তোর বাবুকে ভেতরে ডেকে আন।

কনকেন্দু আস্তে আস্তে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সরমা মুখ তুলল না। বলল, কত? ক' হাজার?

—প্রায় হাজার কুড়ি হবে।

—তুমি ওদের বসতে বল। আমি নিবারণকে দিয়ে ঘণ্টা কয়েকের ভেতর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—তুমি দেবে? তুমি? প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন কনকেন্দু।

—আমি দেব সাধ্য কি? দেবে তুমি, বলে মুখ তুলল সরমা। চোখের জলের ভেতর দিয়ে অপরূপ হাসির ছটা। বললে, আমার কাছে গচ্ছিত ছিল।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পত্নীর উপর ভার ছিল স্বামীর খাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

যতক্ষণ না রুজভেল্টের খাওয়া শেষ হত ততক্ষণ তিনি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন, কোন কারণেই বাইরে যেতেন না।

একদিন রুজভেল্ট তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আমার খাবার সময় তোমাকে যে বাড়ীতে আটকে থাকতে হয়, এতে নিশ্চয় তোমার অন্য কাজের অসুবিধা হয়?

—তাতে আর কি হয়েছে? আর কিছু নয়, আমায় একটা সেবাশ্রমের কিছু কাজ করতে হয়।

—বটে! আশ্চর্য হলেন রুজভেল্ট। তা' হলে তোমাকে আর আমার খাওয়ার সময় থাকতে হবে না। আমার এ কাজ তো আর সেবাধর্মের চেয়ে বড় নয়।

পত্নী বুঝলেন স্বামীর মনোভাব। সেবাধর্মের দিকে তিনি আরও ঝুঁকে পড়লেন। রুজভেল্ট এতে সুখীই হলেন।

ক্ষিতিমোহন সেন

শ্রীশান্তা দেবী

ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়কে যখন প্রথম দেখি তখন তিনি সবে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। দুই এক বৎসর আগে কি ঠিক সেই বছরেই তা আজ মনে নেই। সেবার আশ্রমে রবীন্দ্রনাথের "রাজা" অভিনয় প্রথম হয়। তখন অভিনয় দেখতে মেয়েরা বিশেষ কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতনে যেতেন না। আমরা কয়েকটি মেয়ে আমার পিতৃদেবের সঙ্গে গিয়েছিলাম। অন্য দলের মেয়েও কেউ কেউ এসে পড়েছেন গিয়ে দেখলাম। "রাজা" অভিনয়ে ক্ষিতিবাবু সেবার "ঠাকুরদাদা"র পার্ট নিয়েছিলেন। সেইজন্য আশ্রমে তাঁকে সকলেই "ঠাকুরদা" বলে ডাকা সুরু করে। শুনেছি তিনি অল্প বয়সে যখন কাশীতে বাস করতেন তখন সেখানেও তাঁকে অনেকে "ঠাকুরদা" বলতেন।

কলকাতার অল্পবয়স্কদের যে দল সেবার আশ্রমে গিয়েছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন প্রশান্ত-চন্দ্র মহলানবিশ। তখন তাঁরা ছাত্রাবস্থা। কিন্তু তিনি এই ছেলে মেয়েদের দলপতির স্থান অধিকার করে-ছিলেন। সকলে না হলেও অনেকেই তাঁর কথা মত চলত ফিরত।

ক্ষিতিমোহন বাবুর বিশেষ গুণাবলী আমরা কিছুই জানতাম না। প্রশান্তচন্দ্রই আমাদের তাঁর বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছিলেন। ক্ষিতিবাবুর ভাণ্ডারে যে নানা সাধুভক্তের বাণীর পুঁজি আছে তা আমরা তখনই জানলাম। শুনলাম আশ্রমের নীচু বাংলায় তিনি "দাদু" "কবীর" প্রভৃতির দোঁহা পড়ে এবং ব্যাখ্যা করে শোনাবেন। আমরা উৎগ্রীব হয়ে সভায় বসলাম। ক্ষিতিবাবু তাঁর রত্নভাণ্ডার থেকে যে সব সম্পদ আমাদের সামনে মেলে ধরলেন অল্প বয়স হলেও আমরা বুঝলাম যে এসব রত্ন অনেক সন্ধান করে আহৃত, আমাদের তা সম্পূর্ণ অপরিচিতও। ক্ষিতিবাবুর ব্যাখ্যা করার আশ্চর্য্য ক্ষমতায় তার মৌলুয় যেন আরও বেড়ে উঠ্‌ল। খনির গর্ভের হীরাকে জহুরী যখন কেটে পালিশ করে তখন তার রূপ যেমন ঠিকরে পড়ে এও অনেকটা তাই।

কিন্তু দোঁহাপাঠ ত অল্প সময়েই শেষ হয়ে গেল। তারপর দেখা মিলল তাঁর অন্যক্ষেত্রে অন্যরূপে। আমরা একদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথের দলের সঙ্গে বনের দিকে বেড়াতে গেলাম। উন্মেষ কবির সান্নিধ্য লাভ এবং গান শোনা। দলে দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ক্ষিতিমোহন বাবু প্রভৃতি বড়রাও কয়েকজন ছিলেন। কবি সরস হাস্য পরিহাসে সকলকে মাতিয়ে রেখেছিলেন। রস সম্ভোগ করলেও তাঁর সূক্ষ্ম রসিকতার পাল্টা জবাব দেবার সাহস বিশেষ কারুর ছিল না। কিন্তু ক্ষিতিবাবু এ বিষয়ে একটুও পিছপা ছিলেন না। কথার প্যাঁচের খেলায় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। যে কোন কথাই হোক না কেন ধ্বনি বা অর্থ কোন একটা দিক দিয়ে তিনি তার মর্ম নিয়ে একটা কথার খেলা লাগিয়ে দিতেন।

মাঠের মাঝখানে যখন গানের আসর বসল তখন অধিকাংশ গানই গাইলেন কবি, কিছু দিহুবাবুও গাইলেন। ক্ষিতিবাবুকে কবি গান করতে বলায় তিনি বলেন, "আমের সময় কেউ আমসী খায় না।" কবি কিন্তু ছাড়লেন না। শেষ পর্য্যন্ত ক্ষিতিবাবুকে গান করতেই হল।

ক্ষিতিবাবুকে "রাজা ও রাণী" প্রভৃতি আরও কয়েকটি নাটকে অভিনয় করতে দেখেছি। তিনি অভিনয় ত ভাল করতেনই তাঁর চেহারাও এই সব পোষাকে খুলত চমৎকার। সরস বাক্য বিন্যাস তাঁর সহজাত ছিল, কাজেই অভিনয়ে তিনি বাক্ পটুতায় অর্দ্ধেক সিদ্ধি অনায়াসেই লাভ করতেন।

ক্ষিতিবাবুর একটি নেশা ছিল দেশ ভ্রমণ। ভারতবর্ষের বাইরে চীন জাপান ছাড়া তিনি বোধ হয় যান নি। কিন্তু ভারতের নানা তীর্থে—প্রতি ছুটিতে ঘুরে বেড়ান তাঁর একটা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। গৃহিণীকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। এমনি ঘুরে ঘুরেই তিনি বোধহয় সাধু ভক্তদের অনেক সন্ধান পেয়েছিলেন। প্রথম জীবনে কাশীতে বাস এবং কাশীতে অধ্যয়ন অবশ্য তাঁকে সব চেয়ে বেশী খোরাক দিয়েছিল।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এসে তিনি যখন প্রথম সপরিবারে বসবাস করলেন সে সময় আমরা প্রায়ই ওখানে যেতাম। তখন অধ্যাপকদের জন্য ওরূপল্লী হয় নি। রবীন্দ্রনাথের "দেহলী" বাড়ীর পাশেই খড়ের চালের একটি মাটির বাড়ী ছিল, তাতেই বিবাহিত অধ্যাপকরা অনেকে থাকতেন। কারুর ছিল একখানা ঘর, কারুর বা দুখানা। ক্ষিতিবাবুর দুখানা ঘর ছিল। চারটি পুত্র-কন্যা নিয়ে সস্ত্রীক তিনি সেই দুটিতে বাস করতেন। তাছাড়া তাঁর দুই ভ্রাতৃপুত্র তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আত্মীয় স্বজন অনেকেই আসতেন এবং বাস করতেন। অতি সাদাসিধে ভাবেই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করতেন। বাড়ীর সকলেই অন্ন-বিস্তর কাজে গৃহিণীকে সাহায্য করতেন।

শান্তিনিকেতনে যে উৎসবাদি হত তার প্রাচীন পদ্ধতিগুলি ক্ষিতিবাবুই ওখানে প্রবর্ত্তন করেছিলেন। আজ দেশে অনেকে নিজ নিজ উৎসবে তা গ্রহণ করেছেন।

'দাদু' 'কবীর' প্রভৃতির বাণী পাঠ আগে বাংলা দেশে চলিত ছিল না। ক্ষিতিমোহন বাবুর পাঠ-মাধুর্য্যে অনেকে এগুলির প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্ম সমাজে ক্ষিতিমোহন বাবুর পাঠ দীর্ঘকাল একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছিল। প্রতি উৎসবেই তাঁর দিন থাকত। লোকও হত অন্যান্য সাধারণ দিনের চেয়ে অনেক বেশী।

বিবাহ শ্রাদ্ধাদিতেও ক্ষিতি বাবুর ডাক পড়ত বড় বড় বাড়ীতে। তাঁর পরিচালিত অনুষ্ঠান না হলে তাঁর অনুরাগীরা তুষ্ট হতেন না। তাঁর বিদ্যা, তাঁর সংগ্রহ, তাঁর বাক্যবিন্যাস এবং তাঁর গলার স্বর সবই এই অনুষ্ঠানগুলির সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলত। মানুষ শোকে সান্ত্বনা ও উৎসবে আনন্দ পেয়ে তৃপ্ত হত।

ক্ষিতিবাবুর কথা বলবার অনেক আছে। এই ছোট লেখাতে তা বলা সম্ভব নয়। শুধু কয়েকটি কথা লিখলাম।

বীরবলের কৌতুক

বররুচি

একদিন সন্ধ্যায় সম্রাট আকবর এবং বীরবল প্রাসাদ কাননে বেড়াচ্ছিলেন। মাঘ মাস। দারুণ শীত পড়েছে। দিল্লীর বৃদ্ধতম অধিবাসীও বলছে তেমন শীত আর কখনো পড়েনি।

কথায় কথায় টাকার কথা উঠল। টাকায় কি না হয়। টাকাই হল সংসারের সার, টাকার জন্যে মানুষ যে কোন ঝুঁকি নিতে পারে।

বীরবলের এই মন্তব্য শুনে সম্রাট বললেন তোমার অভিমত ঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, ঐ যে সামনে পুষ্করিণী, ওর মধ্যে সারা রাত গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে এমন লোক কাউকেই পাবে না, যত অর্থই তুমি তাকে দিতে স্বীকৃত হও না কেন। কারণ পুকুরের জল জমে যাচ্ছে আর তাতে করে যে লোক পুকুরে থাকবে সেও জমে মারা যাবে। সুতরাং মারা যাবার আগেই সে পুকুর থেকে উঠে পড়বে।

সত্যিই পুষ্করিণীর কাঁচের মত স্বচ্ছ জল দেখে মনে হচ্ছিল, জমে বরফ হয়ে যেতে তার আর দেরী নেই।

বীরবল বললেন—সম্রাট, অর্থের উত্তাপের আশায় কেউ কেউ হয়ত এই শীতের রাত্রেও পুকুরে থাকতে রাজী হতে পারে।

—অসম্ভব। তেমন কাউকেই তুমি খুঁজে পাবে না। যদি পাও, সে যত টাকা চায় আমি দেব।

পরদিন সকালবেলা রাজসভায় বৈঠকেও কথাটা উঠল। একজন পারিষদ ঠাট্টা করে বললে—সে রকম লোক বীরবলের মস্তিষ্কেই আছে, বাস্তব-জগতে নেই। এই প্রচণ্ড শীতে কেউ সারা রাত পুকুরে থাকতে রাজী হবে না।

দুপুরবেলা অনেক খোঁজাখুঁজি করে বীরবল একজনকে সংগ্রহ করলেন এবং বিকালের আসরে তিনি লোকটিকে হাজির করলেন। সম্রাট তাকে বললেন—সারা রাত গলা ডুবিয়ে পুকুরে থাকতে হবে। মনে রেখো, কোন আগুন বা আগুনের শিখা বা ঐ ধরণের জলন্ত জিনিষ রেখে তুমি উত্তাপ সংগ্রহ করতে পারবে না।

লোকটি রাজী হল। সম্রাট পুকুরের চারধারে পাহারা দাঁড় করিয়ে দিলেন, যাতে লোকটা কোন রকমে সর্ত লংঘন না করতে পারে।

রাতের বেলা লোকটা জলে নামল। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শীতের চোটে প্রহরীরা পর্যন্ত ঠক ঠক করে কাঁপছে তিনচার খানা করে মোটা কম্বল গায়ে জড়িয়েও।

সকাল হল। লোকটি জল থেকে উঠল। বাদশা সভায় নামলেন। খবর শুনে অবাক হলেন। বেঁচে আছে লোকটা। প্রহরীরা জানাল সর্ত ভঙ্গ হয় নি।

সম্রাট লোকটিকে বললেন—কি করে বেঁচে রইলে হে! ঠাণ্ডায় জমে মারা যাও নি, এটা আশ্চর্য লাগছে।

করজোড়ে লোকটি বলিল—দু তিনবার মারা যাবার মত অবস্থা হয়েছিল খোদাবন্দ্। কিন্তু একটা উপায় অবলম্বন করে আমি সে অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম।

কৌতূহলী সম্রাট শুধোলেন—কি সে উপায়?

লোকটি বললে—প্রাসাদের সাত তলার একটি ঘরে সারা রাত আলো জ্বলেছিল। হুজুর! পুকুরের দিকে ছিল সেই ঘরটি। ঘরের গবাক্ষ দিয়ে সেই বাতিটি দেখা যাচ্ছিল, সেই বাতির আলোর দিকে চেয়ে চেয়ে আমি রাত কাটিয়ে দিয়েছি খোদাবন্দ্।

সঙ্গে সঙ্গে একজন পারিষদ বলে উঠল—লোকটা সর্ত পালন করেনি সম্রাট।

আকবর বললেন—কেমন করে?

পারিষদটি বললে—লোকটা ওই আলো দেখে উত্তাপ সংগ্রহ করেছিল। সর্ত ছিল সে কোন মতেই কোন কিছু থেকে তাপ নিতে পারবে না।

—ঠিক। ঠিক। বাদশা মাথা নাড়লেন।

বীরবল তো অবাক। কিন্তু সম্রাট আকবর একবার যখন বেঁকে দাঁড়ান তখন তাঁকে সোজা করে কার সাধ্য। সাত তলার ঘরে যে আলো জ্বলছিল তাই থেকে লোকটা তাপ নিয়েছে, অতএব সে টাকা পাবে না। লোকটা নিরাশ হয়ে চলে গেল।

বীরবল অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। দরবার থেকে বেরিয়ে এসে লোকটিকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—তুমি দুঃখ পেও না পুরস্কারের টাকা তুমি ঠিকই পাবে। দু একদিন সবুর কর।

পরদিন দরবারে বীরবলের দেখা পাওয়া গেল না। সম্রাট তাঁর খোঁজ করলেন, মনে করলেন, কোন বিশেষ কাজে আটকে পড়েছেন বীরবল।

তার পরের দিনও যখন বীরবল এলেন না তখন আকবর বিচলিত বোধ করলেন। কোন খবর নেই, সন্ধান নেই, গেল কোথায় লোকটা।

একজন সভাসদ হাসি হাসি মুখে বললেন—কী আর বলব, খোদাবন্দ্। বীরবল শেঠের মাথার গোলমাল হয়েছে বোধহয়।

—মাথার গোলমাল। সে আবার কি! সে কি পাগল হয়ে গেছে?

সভাসদটি বললেন—ঠিক পাগল নয় সম্রাট! শুনলাম সে এমন সব আজগুবি অসম্ভব কাজ করবার চেষ্টা করছে যার মধ্যে পাগলামির পরিচয় ফুটে উঠছে।

—কী রকম।

সভাসদ বললেন—নদীর ধারে বীরবল শেঠকে দেখা গেছে। দু'চারজনে বলাবলি করছিল, তাই শুনে জানলাম।

—কি বলাবলি করছিল?

—তারা দেখেছে, নদীর পাড়ে বীরবল খুব উঁচু তিনটে বাঁশ আড়া আড়ি লাগিয়ে একটা খাচার মতো খাটিয়েছেন আর তারই তলায় ঝুলিয়ে দিয়েছেন একটা হাঁড়ি। হাঁড়ির মধ্যে জল দিয়ে চাল ভরা হয়েছে। বীরবল শেঠ মাটিতে কাঠির আগুন জেলে বলছেন, দেখ, সকলে দেখ, কী চমৎকার ভাত সেদ্ধ হচ্ছে।

সম্রাট যারপরনাই চিন্তিত হয়ে বললেন—এর মানে কি।

—মানে এই জনাব যে, অতিরিক্ত মাথা খাটিয়ে খাটিয়ে বীরবল শেঠের মাথা গুলিয়ে গেছে।

সম্রাট বললেন—স্বচক্ষে তো একবার ব্যাপারটা দেখা দরকার।

পারিষদ সমভিব্যাহারে সম্রাট আকবর নদীর ধারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দেখলেন, সভাসদের কথা মিথ্যা নয়। বীরবল উবু হয়ে কাঠের আগুনে ফুঁ দিচ্ছেন।

সম্রাট বললেন—বীরবল! এ কি হচ্ছে?

বীরবল জবাব দিলেন—ভাত রাঁধছি জাঁহাপনা।

সম্রাট বললেন—তুমি তো আচ্ছা মূর্খ! ওই হোগায় তিরিশ হাত উঁচুতে ভাতের হাঁড়ি খাটানো আর নীচে মাটিতে এই এতটুকু আগুন তাতে ওই ভাত কোন জন্মে সেদ্ধ হবে? আগুনটা ভাতের হাঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছোনো চাই তো! তবে তো হাঁড়ির জল ফুটবে। নির্ঘাৎ তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।

বীরবল জবাব দিলেন—এ কী অসম্ভব সম্রাট?

—আলবৎ অসম্ভব।

বীরবল বললেন—কিন্তু আমি তা মনে করি না, গত পরশুর আগের রাত্রে প্রাসাদের সাত তলার ঘরে যে আলো জ্বলছিল তার উত্তাপ পুকুরে গলা ডুবিয়ে থাকা লোকটিকে গরম করে বাঁচিয়েছিল। সুতরাং অত দূর থেকে অতখানি উত্তাপ যদি আসতে পেরে থাকে তাহলে এই সামান্য ব্যবধানে এই কাঠের আগুনের উত্তাপে বাঁশের ডগায় ঝোলানো হাঁড়ির ভাত কেন ফুটবে না সম্রাট?

এই রূপক নাট্যের তাৎপর্য অন্য কেউ না বুঝুক, বুদ্ধিমান সম্রাটের বুঝতে বিলম্ব হল না।

মাথা নেড়ে সম্রাট বললেন—আমি বুঝেছি। নাটক বন্ধ কর। সভায় চল। আমার জন্যেই তো এই নাটকের আয়োজন করেছিলে! তা আমি তো দেখলাম।

করজোড়ে বীরবল বললেন—কিন্তু আমার ভাত জাঁহাপনা?

সম্রাট বললেন—ভাত সেদ্ধ হয়ে গেছে। ও আর দেখতে হবে না। কাঠের আগুনের কী কম তাপ। পুকুরে ডোবা সেই লোকটাকে খবর দাও। সে এসে তার প্রাপ্য পুরস্কার নিয়ে যাক! সেদিন আমার বিচারে ভুল হয়েছিল।

দুহাত তুলে বীরবল বললেন—দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।

উপন্যাস

শৈলানন্দ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরের দিন থিয়েটার। অনেক টাকার টিকিট কিনে প্রকাশ একেবারে সুমুখের সারিতে গিয়ে বসলো সরমাকে নিয়ে। কলকাতার থিয়েটার। জাকজমক যথেষ্ট। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখে, লোকজন খুব কমই এসেছে থিয়েটার দেখতে। এত টাকার টিকিট না কিনলেই হতো।

থিয়েটার আরম্ভ হলো। পৌরাণিক নাটক। কুরু-পাণ্ডবের ঘটনা নিয়ে লেখা।

সরমার মন্দ লাগছিল না।

প্রকাশ বললে, 'নাটকটা ভাল জমেনি।'

সরমা বললে, 'কেন, বেশ তো হচ্ছে। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখবো।'

ভাল হোক্ মন্দ হোক্ শেষ পর্যন্ত দেখা মানেই খানিকটা ভুলে থাকা। কলকাতায় এসে অবধি সরমার শুধুই মনে হচ্ছে অজয়ের কথা। এই শহরেই সে বাস করছে। হাট খোলা কোথায় কতদূর তা জানে না। 'সদানন্দ অনাথ-আশ্রমের' সাইন্ বোর্ডটা দেখলেই সে চিনতে পারবে। কিন্তু কে-ই বা যাচ্ছে সেখানে, আর কেমন করেই বা যাবে?

প্রকাশ চব্বিশঘণ্টাই কাছে কাছে রয়েছে। তাকে লুকিয়েও যে একটিবার দেখে আসবে তারও উপায় নেই।

কাজেই থিয়েটার সিনেমা যাদুঘর চিড়িয়াখানা দেখে যতক্ষণ ভুলে থাকা যায় ততক্ষণই ভাল।

কিন্তু এ আবার কি হলো? বেশ চলছিল নাটকের অভিনয়; এদিকে ভীম অর্জুন, ওদিকে দুর্যোধন দুঃশাসন—সকলেই বেশ ভাল অভিনয় করছিল, দ্রৌপদীর গলাটা একটু ধরা-ধরা, চেহারাটাও তত ভাল নয়। তা হোক্। সরমা তাদের কথাগুলো শুনছিল মন দিয়ে। মহাভারতের গল্প সে জানে। বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ কুন্তী এসে দাঁড়ালো কর্ণের কাছে।

রবীন্দ্রনাথের লেখা কর্ণ-কুন্তী সংবাদ সরমা পড়েনি। পড়া থাকলে বুঝতে পারতো—নাট্যকার হুবহু যেন সেই সব কথাগুলোই তুলে দিয়েছেন।

কুন্তী কর্ণের কাছে তার জন্মবৃত্তান্ত বললেন। অকপটে স্বীকার করলেন, 'আমি অন্যায় করে-

ছিলাম বৎস, তোমার শৈশবে আমি লোকলজ্জা ভয়ে তোমাকে পরিত্যাগ করেছিলাম। তাম্রপাত্রের ওপর শুইয়ে তোমাকে আমি ভাসিয়ে দিয়েছিলাম নদীর স্রোতে। অন্যত্রে তুমি লালিত-পালিত হয়েছ সত্য, কিন্তু তার চেয়েও বড় সত্য—তুমি আমার পুত্র। তুমি আমার প্রথম সন্তান।'

কর্ণ ভর্ৎসনা করলেন তাঁর জননীকে। বললেন, 'তবে আর কেন, এসেছ আমার কাছে? আসতে তোমার লজ্জা হলো না?'

প্রকাশ অনেকক্ষণ থেকেই উস্‌খুস্ করছিল। এবার বললে, 'চল আর দেখতে হবে না। নাটকটা তো লিখতেই পারেনি, তার ওপর চুরি করেছে রবীন্দ্রনাথ থেকে।'

সরমা যেন নিজেরই কথা শুনছিল কুন্তীর মুখে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছিল তার। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। চুপ করে উঠে দাঁড়ালো শুধু।

প্রকাশ তার পিঠে হাত দিয়ে বললে, 'চল।'

প্রকাশ চললো আগে আগে, সরমা তার পেছনে। দু'দিকে সারি সারি চেয়ারের মাঝখান দিয়ে পথ। আলো সেখানে একরকম ছিল না বললেই হয়। সরমা সেই আবছা অন্ধকারে তার ছোট রুমালটি দিয়ে চোখদুটো মুছে নেবার চেষ্টা করলে।

দোরের কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে প্রকাশ বললে, 'এসো।'

এসো বলে পেছন ফিরতেই ধরা পড়ে গেল সরমা।

'এই নাটক দেখেই তোমার চোখে জল এসে গেল? মেয়েরা না থাকলে থিয়েটারগুলো চলতো না বোধহয়।'

রুমালটা সরমা তখন লুকিয়ে ফেলেছে।

সেদিন ছিল রবিবার। ম্যাটিনী শোতে থিয়েটার দেখছিল তারা। বাইরে বেরিয়ে দেখে তখনও দিনের আলো।

প্রকাশ বললে, 'এর চেয়ে ভালো একটা সিনেমা দেখলেই ভাল হতো। দেখবে নাকি? কিনবো টিকিট?'

সরমা বললে, 'না। কিছু দেখতে হবে না চল।'

ফুটপাথ ধরে হেঁটে হেঁটেই যাচ্ছিল দু'জনে। হঠাৎ একটা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে প্রকাশ থামালে তাকে। ট্যাক্সি তখনও এত দুর্লভ হয়নি কলকাতা শহরে। ট্যাক্সি-ড্রাইভারেরাই তখন চড়বার মানুষ খুঁজে বেড়াতো।

দু'জনেই চড়ে বসলো।

প্রকাশ জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায় যাবে বল।'

যেখানে যাবার ইচ্ছা, সেখানে যাবার উপায় নেই। মুখ ফুটে বলবারও তো নেই যে, হাটখোলার রাস্তা দিয়ে চল অন্তত। সরমা বললে, কোথায় যাবে তা আমি কবে বলবো? আমি কি চিনি কলকাতার রাস্তা?

প্রকাশ হাসলে একটুখানি। বললে, 'তাও তো বটে! তুমি যে দেহাতী মেয়ে—গাঁইয়া।'

গাড়ীটা তখনও বেশীদূর যায়নি, প্রকাশ হঠাৎ বলে বললো, 'দাঁড়াও।'

গাড়ী দাঁড়াতেই সরমা জিজ্ঞাসা করলে, 'দাঁড়ালে যে ?'

রাস্তার ধারেই মস্ত একটা কাপড়-জামার দোকান। সেই দোকানটা দেখিয়ে প্রকাশ বললে বাবো। তোমার একটা ভাল শাড়ী কিনে দিই।'

'না আমার শাড়ী চাই না।'

প্রকাশ বললে, 'আমি দিতে চাইছি, তুমি নেবে না ?'

চুপ করে রইলো সরমা।

প্রকাশ বললে, 'থাকো তাহলে গাড়ীতে বসে। আমি আনছি। তুমি পছন্দ কর।'

এই বলে আর কিছু বলবার অবসর না দিয়ে প্রকাশ ঢুকলো গিয়ে দোকানের ভেতর।

চারটে চাকাওলা ছুটো কাঠের গাড়ী পড়ে রয়েছে রাস্তার ধারে। হঠাৎ সেই দিকে নজর পড়তেই সরমা আর সেদিক থেকে মুখ ফেরাতে পারলে না। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সেই গাড়ী ছুটোর দিকে। দড়ি দিয়ে বাঁধুনে-টানা গাড়ী। ঠিক এইরকম গাড়ী সে দেখেছে সেই সন্তানন্দ অনাথ-আশ্রমের উঠোনে। অজয় বলেছিল, ওই গাড়ীতে চড়ে কলকাতার পথে পথে গান গেয়ে গেয়ে তারা ভিক্ষে করতে বেরোয়।'

ভাবতে গিয়েই চোখদুটো তার জলে ভরে এলো। আর ঠিক সেই সময়েই অজয়ের গলার আওয়াজ : 'মা !'

চোখ ফেরাতেই দেখে গাড়ীর দোরের কাছে অজয় দাঁড়িয়ে।

দোকান থেকে একই রঙের জামা গায়ে দিয়ে ছোট ছোট অনেকগুলি ছেলে বেরুচ্ছে। তাদের সঙ্গে একজন লোক—গলায় হারমোনিয়াম ঝোলানো।

সরমার বুঝতে বাকি রইলো না—নতুন জামা কেনবার জন্যে দোকানে ঢুকেছিল তারা।

অজয় তখন গাড়ীর দোর ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে।

প্রকাশ তো এক্ষুনি বেরিয়ে আসবে দোকান থেকে।

তা আসুক। যা হয় হবে। সরমা গাড়ীর দোরটা খুলে দিলে। অজয় গাড়ীতে ঢুকেই একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো মার কোলের ওপর।

'মা, তুমি আর এলে না কেন ?'

সরমা বললে, 'আসবো আবার আসবো। এবার—'

কথাটা শেষ করতে পারলে না সরমা। গলাটা কে যেন চেপে ধরলে। ছেলের মাথাটা বুকের ওপর চেপে ধরে থর থর করে কাঁপতে লাগলো। চোখদুটো তার জলে ভরে এসেছে তখন।

গলায় হারমোনিয়াম ঝোলানো লোকটি দেখতে পেয়ে ছুটে এলো গাড়ীর কাছে। গাড়ীর দরজা খোলাই ছিল। ডাকলে, 'অজয়। ও কি হচ্ছে ? চলে এসো।'

অজয় তবু আসছে না দেখে লোকটি হাত বাড়িয়ে অজয়ের একখানা হাত চেপে ধরলে। ধরেই তাকে টেনে আনলে গাড়ী থেকে।

অজয় ডাকতে লাগলো, 'মা। মা !'

সরমা তখন কি করবে কিছুই বুঝতে পারছে না।

এদিকে ঠিক সেই সময় প্রকাশ বেরিয়ে এলো দোকান থেকে কাগজে-মোড়া একটা প্যাকেট হাতে নিয়ে।

অজয় কিছুতে যেতে চাচ্ছে না, ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে আর সেই লোকটি তার হাতে ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য ছেলেরা সব সেই টানা গাড়ীটার কাছে চলে গেছে।

গাড়ীর কাছে এসে প্রকাশ বললে, 'ওরা সব অনাথ আশ্রমের ছেলে। দোকানে জামা কিনছিল দেখলাম।'

সরমা কোনও কথা বললে না। তখনও সে তাকিয়ে আছে অজয়ের দিকে।

গাড়ীতে উঠে বসলো প্রকাশ। 'মা বলে ভিক্ষে চাইছিল বুঝি? আহা বেচারা। মা-বাবা নেই তো! কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে ওরা—অনাথ-আশ্রমে থাকে।'

ড্রাইভারকে বললে, 'চলো। সোজা।'

গাড়ী ছেড়ে দিলে।

'আহা হা, খুব ভুল হয়ে গেল। একটা টাকা দিয়ে দিলে হতো। থাক্‌গে। ভাখো এই শাড়ীটা আনলাম তোমার জন্যে।'

প্যাকেট খুলে শাড়ীটা সরমার কোলের ওপর ফেলে দিলে প্রকাশ। সে তখন তাকে খুশী করবার জন্যে ব্যস্ত।

সরমার চোখের জল তখনও শুকোয়নি।

শাড়ীটা একবার নাড়াচাড়া করে দেখলে সরমা। ভাল কি মন্দ—পছন্দ হয়েছে কি হয়নি—কোনও মন্তব্যই সে প্রকাশ করলে না মুখ দিয়ে। নীরবে যেমন বসেছিল সরমা তেমনি বসে রইলো।

তার এই ব্যবহারে প্রকাশ খুশী হবে না তা সে জানে। জানে তার স্বামীর কাছ থেকে এই অযাচিত উপহার পেয়ে তার আনন্দিত হওয়া উচিত। আর সব চেয়ে বেশি করে জানে—তার এই অন্যমনস্কতা তার এই ঔদাসীন্য হয়ত বা তার স্বামীর মনে একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে পারে, যে-প্রশ্নটিকে বারবার সে এড়িয়ে চলতে চায়। অনাথ-আশ্রমের যে-ছেলেটা 'মা' বলে তার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সে যে শুধু ভিক্ষা চাইবার জন্য আসেনি, অন্য কোনও গোপন রহস্য হয়ত-বা সেখানে থাকতেও পারে—সেকথাটা প্রকাশের মনে উদয় হওয়া স্বাভাবিক।

যদি তার স্বামী তাকে প্রশ্ন করে বসে, কি ভাবছো? ওই ছেলেটার কথা?

কী জবাব দেবে সে?

হ্যাঁ, ওই ছেলে আমার নিজের ছেলে। আমারই পেটের সন্তান।

ব্যস, ছোট, এই সত্য কথাটি সমস্ত রহস্যের জাল ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পারে। তাদের দুই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান,—এই সত্যটি প্রকাশ করবার জন্য তার মনের মধ্যে অহরহ যে প্রাণান্তকর যাতনা,—সব-কিছুর নিরসন হয়ে যায় একটি মুহূর্তে।

কিন্তু পারে না—সরমা কিছুতেই পারে না তা প্রকাশ করতে।

তার বাপের মানা।

অন্নদাতা পিতা তার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে।

বাপের পায়ে হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে সরমা—এই পরম সত্যটি সে চিরজীবন গোপন করে রাখবে তার স্বামীর কাছে।

কিন্তু এমনি বিচিত্র মানুষের মন—এই সেদিনও যে-মানুষ একটি তাজা সকেটের ওপর 'ভবেশ' নামটি দেখে স্ত্রীর ওপর অহেতুক সন্দেহে একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠেছিল, সেই প্রকাশ আজ তার চোখের সামনে স্ত্রীর এই অস্বাভাবিক ভাবান্তর লক্ষ্য করেও চুপ করে রইলো। মুখ দিয়ে একটি কথাও বললে না। শাড়ীটা আবার তেমনি কাগজের মোড়কে মুড়ে সরিয়ে রাখলে।

'এদিকে যখন এসেছি, চল তোমাকে দক্ষিণেশ্বরটা দেখিয়ে আনি।'

সরমার মন তখন বুঝি এই রকম একটি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানই করছিল। বললে, 'চল।'

গাড়ী চলছিল কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে সোজা ধর্মতলার দিকে।

প্রকাশ ড্রাইভারকে বললে, 'গাড়ী ফিরিয়ে নাও। আমরা দক্ষিণেশ্বর যাব।'

গাড়ী চললো দক্ষিণেশ্বরের দিকে।

সদানন্দ অনাথ-আশ্রমের আর্থিক অবস্থা তখন অত্যন্ত কাহিল। প্রতিমাসে যাঁরা নিয়মিত অর্থ সাহায্য করতেন তাঁদের দু' একজন মারা গেছেন, উত্তরাধিকারী ছেলেরা হয়েছেন অন্য ধরণের মানুষ, অনাথ-আশ্রমে টাকা দেওয়াটাকে অপব্যয় মনে করেন। আবার কোথাও-বা অবস্থা বিপর্যয়ে দান-খয়রাতের সামর্থ্য গেছে ফুরিয়ে। গৌরমোহন দিবারাত্রি ছুটে বেড়াচ্ছেন বড়লোকের দোরে-দোরে। নতুন একজন লোক পেয়েছেন। ভদ্রলোকের গলাটি ভাল, গান রচনা করতে পারেন, গানে সুর দিতে পারেন। রোজই তাঁকে ছেলেদের নিয়ে বেরোতে হয় কলকাতার পথে-পথে গান গেয়ে ভিক্ষা করবার জন্যে।

সেদিন থেকে অজয়ের কি যে হয়েছে, কাঠের গাড়ীতে কিছুতেই সে আর বসতে চায় না। বলে, 'আমি হেঁটে হেঁটে যেতে পারব।'

বড় ছেলেদের সঙ্গে হেঁটে হেঁটেই চলে সে।

হেঁটে হেঁটে চলে আর এদিক ওদিক তাকায়। সেদিনের মত যদি দেখা হয় তার মায়ের সঙ্গে।

এবার দেখা হলে কিছুতেই সে আর গাড়ী থেকে নামবে না।

রাস্তার ধারে গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকলেই সে সতৃষ্ণ নয়নে সেইদিকে তাকায়। খোঁজে তার মাকে।

সেদিন অমনি বেরিয়েছে পথে। সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন। ছেলের দল আশ্রমের দিকে ফিরছিল।

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে চলছে গাড়ীঘোড়া বাঁচিয়ে।

সুমুখের বাড়ীতে বড়লোক এক বৃদ্ধ মারা গেছেন। গেটের সুমুখে ফুল দিয়ে সাজানো খাটের ওপর তাঁর মৃতদেহ কাঁধে তোলা হচ্ছে। অনেক লোক জড়ো হয়েছে রাস্তার ওপর। দুজন লোক আঁচল ভর্তি পয়সা নিয়ে মুঠো মুঠো ছুঁড়ে দিচ্ছে এদিক-ওদিকে। পয়সা কুড়োবার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে।

অনাথ-আশ্রমের ছেলেরাও ছুটে গেল পয়সা কুড়োতে।

গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে যে-ভদ্রলোক ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি নতুন মানুষ। ছেলেদের কারও নাম জানেন না। হেই হেই বলে চীৎকার করে তিনি এগিয়ে গেলেন তাদের বারণ করতে।

ছোট ছেলেরা কাঠের গাড়ীতে বসে রইলো।

মেয়েরা দাঁড়িয়ে ছিল দোতলা বাড়ীর বারান্দায়। তাদেরই মধ্যে বর্ষীয়সী এক মহিলা ডাকলেন, 'শোনো!'

হারমোনিয়ামটা বাগিয়ে ধরে ভদ্রলোক ওপরের দিকে তাকালেন। বললেন, 'আমাকে ডাকছেন?'

'হ্যাঁ বাবা শোনো, এই টাকাটা নিয়ে যাও।'

টাকার নামে তিনি এগিয়ে গেলেন।

মহিলা বললেন, 'ডান দিকের সিঁড়ির কাছে তুমি দাঁড়াও বাবা, আমি যাচ্ছি।'

সিঁড়ির নীচে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি। চোখ রাখলেন ছেলেগুলোর দিকে।

মহিলা নেমে এলেন হাতে একটি দশ টাকার নোট নিয়ে।

'তুমি কি 'গৌর নিতাই মঠ' থেকে এসেছ বাবা?'

ভদ্রলোক বললেন, 'না মা, আমি সদানন্দ অনাথ-আশ্রম থেকে এসেছি। অনাথ ছেলেদের নিয়ে পথে পথে গান গেয়ে ভিক্ষে করি।'

মহিলা বললেন, 'তা হোক্। অনাথ ছেলেদের কাজে লাগবে। এই দশটি টাকা নিয়ে যাও।'

'রসিদ দেবো মা?'

'না বাবা রসিদ চাই না। তুমি যাও।'

ভদ্রলোক ফিরে এলেন রাস্তায়।

মৃতদেহ নিয়ে লোকজন তখন চলে গেছে। গোলমাল থেমেছে। ছেলেরা আবার কাঠের গাড়ীর কাছে ফিরে এসেছে।

আবার সুরু হলো গান। আবার তারা এগিয়ে চললো।

ঘাটখোলার দিকে যেতে হবে তাদের। বড় রাস্তা ছেড়ে তারা একটা ছোট রাস্তায় ঢুকবে।

বাঁকের মুখে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'দাঁড়ালে কেন? চল।'

ছেলেটি বললে, 'অজয়কে দেখতে পাচ্ছি না তো?'

'তোমরা তো সাতাশ জন এসেছিলে? গোনো'

গোনা হলো। ছাব্বিশ জন।

অজয় নেই।

কোথায় গেল সে?

রাস্তার এদিকে ওদিকে খোঁজ পড়ে গেল।

বড় ছেলে যারা—বড়ি বয়ে গাড়ী টানছিল, তারা রাস্তাটা খুঁজে এলো। 'অজয়' 'অজয়' বলে চীৎকার করলে, একে-ওকে জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু কোথাও তার খোঁজ না পেয়ে ফিরে এলো।

অজয়কে কোথাও পাওয়া গেল না।

(ক্রমশঃ)

নীড়

মানবেন্দ্র পাল

বিয়েটা ভালোবেসেই হয়েছিল। অবশ্য তেমন কোনো রোমাঞ্চকর ঘটনার পটভূমি ছিল না। অল্প দিনের আলাপ। প্রথম দর্শনেই মোহসৃষ্টি, তার পর পূর্বরাগের পালা। শেষ পর্যন্ত বিয়েও হল—সামাজিকতারও ত্রুটি কিছু হল না। কিন্তু দাম্পত্য জীবনটা যেন জমল না। অর্থাৎ এই ধরণের ভালোবেসে বিয়েগুলো যেমন রসময় হওয়া উচিত বলে অনভিজ্ঞ রসিকেরা মনে করেন, এ তেমন যেন হল না। নিতান্তই সাদা মাটা জীবন। বিয়ের দুদিন পরেই নতুন বৌকে দেখা গেল রান্নাঘরে। রান্না করছে, বাটনা বাটছে, কাপড় কাচছে সবই করছে। গুন্‌গুন্ গান নেই, সেতার বাজানো নেই, এবেলা ওবেলা স্বামীর সঙ্গে বেড়ানো নেই। আর স্বামীকে পাবেই বা কী করে? কতটুকু বাড়ি থাকে? সারা সপ্তাহ কলকাতায় কাটিয়ে শনিবার বাড়ি আসে। একটা দিন মাত্র রবিবার থাকে। তারপর সোমবার ভোরে চলে যায়। মাত্র একটি দিন—কিন্তু এই একটি দিনই ইচ্ছে করলে স্বর্গ সুখে ভরে দেওয়া যেতে পারত। কিন্তু কে জানে তেমন ইচ্ছে এদের হয় কিনা! আত্মীয়-বন্ধুরা বুঝতে পারে না কোথায় লক্ষ্যিকারের চিড়টা।

শ্রীলেখার সমস্ত গঠনে বিধাতা যদি এককণা রূপও না দিতেন তাহলেও শুধু ওর বড় বড় দুটি চোখের দিকে যে একবার তাকাতো সে-ই মুগ্ধ না হয়ে যেত না। আশ্চর্য করুণ দুটি চোখ। গভীর শান্ত তার দৃষ্টি। সে চোখের দিকে তাকালে মনে হয়, এ যেন ভালোবাসবার—বিশ্বাস করবার চোখ।

ছোট্ট সংসার শ্রীলেখার। বৃদ্ধা শাশুড়ি আর স্বামী। স্বামী থাকে কলকাতায়—আর এরা থাকে দেশের বাড়িতে। এখানে আকাশ অনেক নীল—চারিদিকে প্রকৃতির সবুজ। বাতাস এখানে হাহা করে হেসে লুটোপুটি খায় বড় বড় জানালা দিয়ে ঢুকে। কিন্তু এই হাওয়া শাশুড়ির সহ্য হয় না। তাই তাঁর জানালা প্রায়ই বন্ধ করে রাখতে হয়। আর শ্রীলেখা ভাবে, হায়রে এখন বাতাসকে ঘর ছাড়া করেও মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। হে ভগবান, তেমন বয়েস আসবার আগেই যেন আমার মৃত্যু হয়।

একে পাড়াগাঁ। লোকজন তেমন নেই। থাকলেও তেমন প্রাণ খুলে মেশা যায় না। শিক্ষারই হোক, কিম্বা রুচিরই হোক একটা অদৃশ্য পাঁচিল আছে বৈকি। এ ছাড়া আর আছে ঐ শাশুড়ি। কাজেই এ বাড়িতে শ্রীলেখা নিঃসঙ্গ ছাড়া কি! তবু নিজের ঘরখানি নিয়ে সে সর্বদা ব্যস্ত। দুবেলা ঝাঁট দিচ্ছে—যেন একটা খড়কুটোও না পড়ে থাকে। শুধু ঝাঁট নয় দুবেলা মেঝে মোছা। তার পর বিছানা। এই বিছানার বিলাসটি তার চিরকালের। বালিশ একটি নয় দুটি। ওয়াড়টি ধবধবে কর্সা হওয়া চাই। ওয়াড়ের ওপর একটি তোয়ালে—যাতে ওয়াড় ভেদ করে বালিশের খোলে তেল না ধরে। বিছানার চাদর এমন ভাবে পাততে হবে যেন চাদর কোথাও এতটুকু উঁচুনিচু অসমান হয়ে না থাকে। বেড্-কভারটির মুং পর্যন্ত নিজের মনের মতো হওয়া চাই। নীলচে কিম্বা খয়েরী। এখানে মেলে না। অভিরামকে বলে বলে কলকাতা থেকে আনিয়েছে।

ওপাশে বড় ড্রেসিং টেবিলের ওপর সেতারের কলসীতে কোনদিন গোলাপ—কোনোদিন বা রজনী গন্ধার বাড়। চৈত্রের সন্ধ্যায় মালী বাগান থেকে মুঠো মুঠো বেলফুল এনে দেয়। কাঁচের প্লেটে সেগুলি

সাজিয়ে রেখে মেয় নিজের বিছানার কাছেই। বড় বড় খোলা জানালা দিয়ে ঘামী মেটের মশারি ভেদ করে সেই গন্ধ আসে। অথচ বিছানায় সে তো একা। কবে শনিবার আসবে!

শনিবারও আসে, কিন্তু এর চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন বড় কিছু দেখা যায় না।

বেশ একভাবে দিন কাটছিল। হঠাৎ এই সুখের মধ্যে একটি ছোট্ট শত্রুর আবির্ভাব হল। শত্রুটি ছোট্ট, কিন্তু সামান্য নয়। আরও অসামান্য এই জন্যে যে, তার নাগাল পাওয়া যায় না। শ্রীলেখা অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু এ শত্রুটিকে কিছুতেই তাড়াতে পারেনি।

একেবারে যে অসহায় হয়ে পারেনি, তা নয়; ইচ্ছে করলে অনায়াসে চাকর বাকর কাউকে দিয়ে কী মালীকে দিয়েই শত্রুটাকে তাড়ানো যেত, কিন্তু বাধ সাধলেন মা। বললেন—থাক্ না, ঘরে এসেছে, থাক্। পায়রা বড় লক্ষ্মীমন্ত।

ব্যাস! হয়ে গেল। পায়রাটি দিব্যি বাসা বাঁধল তারই ঘরের ঘুলঘুলিতে। সারা দুপুর শুধু একটি শব্দ—বক্ বক্‌ম বক্—বক্ বকম্ বক্!

শ্রীলেখা মাঝে মাঝে শূন্যে মুষ্টি তুলে ধমক দেয়—হুস্! যাঃ—

পায়রা ঘাড় বেঁকিয়ে মটরের মতো গোল গোল লাল চোখ ঘুরিয়ে শুধু একবার তাকায়। কিন্তু নড়ে না।

এই পায়রাটাই শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে প্রচণ্ড শত্রুতা আরম্ভ করল। যত রাজ্যের খড়কুটো নিয়ে আসবে আর ঘরময় ছড়াবে। শ্রীলেখা যতবার ঝাঁট দেবে ততবারই আবর্জনা জমবে। নাঃ, আর পারা যায় না। শুধু খড়কুটো হলেও তো পারা যেত। কিন্তু নোংরামির কি আর শেষ আছে? ঠিক বিছানার ওপরেই ঘুলঘুলিটা। সেদিন তো অমন মেটের মশারিটাই নষ্ট করে দিল। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। সেই আরক্ত কাজলকালো চোখে রোষ ঘনিয়ে ওঠে। কিন্তু পায়রাটা তাতে ভয় পায় না। ঘুলঘুলির মধ্যে নিজের নীড়খানির মধ্যে আরাম করে বসে ডাকে—বক্ বক্‌ম বক্।

শ্রীলেখা খানিকটা কাগজ দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারে। —দূর্ হ।

কাগজের চাঙা অতদূর পৌঁছয় না। দেওয়ালে লেগে মেঝের ওপর পড়ে। পায়রাটা ডাকে —বক্ বক্‌ম্…।

নাঃ এমন শত্রু নিয়ে ঘরে টেঁকা যায় না। সারা দুপুর মাথার ওপর বসে আলাবে। আগে আগে সকাল হলেই উড়ে যেত, ফিরত সন্ধ্যের মুখে। এখন আর নড়তে চায়না। শ্রীলেখা গাল দেয়! :—মরণ! বড় আস্কারা পেয়েছ, না?

পায়রা অকারণে ডানা ঝাপ্‌টে ওঠে। অমনি একরাশ ঘাস পাতা টুস টুস করে উপড়ে পড়ে মেঝেতে।

নাঃ, পাগল করে দেবে! এ ঘরে টিকতে দেবেনা কিছুতেই। শ্রীলেখা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মনে মনে বলে—থাকো, তুমিই থাকো। যত খুশি পার নোংরা করো।

নিজের ঘর ছেড়ে শ্রীলেখা বেরিয়ে আসে। কিন্তু কোন্ ঘরে যাবে? ও ঘরে শাশুড়ি তো ঘুমোচ্ছেন। ওপাশের ঘরটা বড় স্যাঁত সেঁতে। তা হলে?

হ্যাঁ, আর একটা ঘর অবশ্য আছে। কিন্তু সে ঘরে শ্রীলেখা একটুতেই ঢোকে না। সে ঘরটি তার স্বামীর নিজস্ব ঘর। সে ঘরে তালাও ঝোলে না, প্রবেশের নিষেধও নেই। কিন্তু

বিয়ের পর যেদিন প্রথম অভিরাম অত্যন্ত উৎসাহে তাকে এই ঘরে নিয়ে এসে তার শখের সঞ্চয়গুলি দেখিয়ে ছিল, সেদিন থেকে দারুণ আতঙ্কে আর শ্রীলেখা ও ঘরমুখো হয়নি। ওটা যেন ঘাসের ঘর নয়—মৃত জীবের কবরখানা। কী নেই! হরিণের শিঙ, বাঘের চামড়া থেকে আরম্ভ করে হরেক রকম পাখির দেহ। বহু পয়সা খরচ করেছে এর জন্যে। মরা পাখির পেটের ভেতর থেকে নাড়ীভুঁড়ি বের করে নিয়ে কৃত্রিম মাল মসলা পুরে ঠিক জীবন্ত পাখিটির মতো সাজিয়ে রাখা। দেখলেই বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে ওঠে। কিন্তু আরও ভয়ংকর জিনিস রয়েছে—ঘরে ঢুকে যদিকে চোখ ফেরালেই লক্ষ্যে পড়বে পাশাপাশি তিনটে বন্দুক। এই তো শীতের দিন আসছে। আর কি পাত্তা মিলবে! গত বছর গিয়েছিল হাজারিবাগ আর রাঁচির কাছাকাছি ডালটনগঞ্জে, তার আগের বছর জলপাইগুড়িতে শিকারের সন্ধানে। ফিরে এসে সে কী গল্পের ঘটা! ইচ্ছে করে করে শোনানো—কেমন করে শিকার করেছে হরিণ, ভালুক কিম্বা বনমুরগি। দুহাতে কান চাপা দিয়ে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে থেকেছে শ্রীলেখা। এইসব শখের শিকারের কথা, অকারণে জীবহত্যার নির্মমতা ওকে গভীর ভাবে আঘাত করে। কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। কিন্তু নির্মম পুরুষ তবু ছাড়েনি। এ বছরও তৈরি হচ্ছে। যাবে সুবর্ণরেখার ধারে। খবর পেয়েছে ওখানে নাকি কুমীর মেলে যথেষ্ট! শ্রীলেখা শুনেই গেছে, কোনো উত্তর দেয় নি।

হ্যাঁ, ঐ সেই ঘর। কিন্তু সে ঘরের ত্রিসীমানা এড়িয়ে চলে শ্রীলেখা; তাই শেষ পর্যন্ত তাকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতে হল। রাখাটা খারাপ করে দিলে ঐ পায়রাটা—আর ঐ ঘরটা, ওদিক দিয়ে না এলেই হবে।

পায়রাটার ছানা হয়েছে।

এবার কিন্তু শ্রীলেখার ততটা বিরক্তি বোধ হল না, যতটা দেখা দিল তার বিস্ময়।

—ও, তাই তুমি ঘর থেকে নড়তে চাইতে না! মনে মনে শ্রীলেখা বলে। কিন্তু এর মধ্যে কবেই বা ডিম পাড়ল, কবেই বা ডিমে তা দিল—কবেই বা ডিম ফুটে ছানা বেরোল! হঠাৎ একদিন ঘুম ভেঙে শোনে টি টি শব্দ! আরে, পায়রাটার ছানা হল নাকি।

তাড়াতাড়ি খাটের ওপর একটা চেয়ার এনে তার ওপর উঠে দাঁড়িয়ে দেখে হ্যাঁ ঠিক তাই!

বেশ মজা লাগল শ্রীলেখার। পায়রাটা আজ তাকে দেখে ভয় পেয়েছে। কেমন ছানাটাকে আগলে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে!

তার পর থেকে শ্রীলেখার সময় কাটে বেশ অদ্ভুত ভাবে। কেবল লক্ষ্য করে পায়রাটাকে। অকালে উড়ে যায় জানালা দিয়ে। আবার কিছুক্ষণ পরে ফিরে আসে ঠোঁটে করে খাবার নিয়ে। সেই খাবার ছানাকে খাওয়ায় অল্পে অল্পে। সামনে দারুণ বর্ষাকাল। এখন থেকে খাবার সংগ্রহ করেও রাখতে হবে বৈকি! সারা দুপুর পায়রাটা যায় আর আসে। ভারী মজা লাগে শ্রীলেখার।

কয়েক দিন পর একদিন শ্রীলেখা স্নান করে ঘরে ঢুকেছে। হঠাৎ চমকে উঠল কী যেন দাঁড়িয়েছিল আর একটু হলেই! কী ওটা! ঝুঁকে পড়ল। পাখির ছানাটা। আহা কখন পড়ে গিয়েছে বাসা থেকে। মা-টাও নেই। ছানাটা কী আর বেঁচে আছে? না না, আছে। ঐ যে

বুকের কাছটায় বুক বুক করছে। কিন্তু সাদা গায়ে লাল লাল ওগুলো কী? সর্বনাশ! পিঁপড়ে। গা শিউরে উঠল। আহারে! তাড়াতাড়ি ছানাটাকে হাতে তুলে নিয়ে পি পড়ে ছাড়াতে লাগল। তারপর হাতের আঁজলায় করে জল এনে ফোঁটায় ফোঁটায় ছানাটার মুখে দিতে লাগল। আঃ, এতক্ষণে বাঁচল। নিজের খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠল। তার পরও কতক্ষণ ছানাটাকে টেবিলের ওপর রেখে লক্ষ্য করতে লাগল। শেষে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হল, তখন আর একদিনের মতো আবার খাটের ওপর চেয়ার এনে তার ওপর দাঁড়িয়ে ছানাটাকে তার বাসায় তুলে দিলে। হায় ছানাটার মা এ উপকারটা দেখতে পেল না!

ছানাটা বড় হল।

পাখা ঝাপটাতে শিখল, চোখ মেলতে পারল। এখন কিন্তু শ্রীলেখার আর তেমন ভালো লাগেনা বাচ্চাটাকে। ওটা এখন না পূর্ণাঙ্গ পায়রা—না কচি ছানা। দেহটাই বেড়েছে, কিন্তু দেহের সৌন্দর্য এখনো আসেনি।

শুধু ভালো না লাগা নয়, এখন যেন বিরক্তি ধরে যাচ্ছে ঐ বাচ্চাটার ওপরে। ছোট ঘুলঘুলি, তার মধ্যে দুটো পায়রা। ধরবে কেন? ঘরদুটোয় মেঝে ভর্তি হয়ে যায়। তার ওপর আছে বাচ্চা-পায়রার পাখা ঝাপটানি। তাতেও কম জিনিস উড়ে এসে ঘর নোংরা করে না। মেটের মশারি এখন দুবেলা কাচতে পারলে হয়। শ্রীলেখা বিরক্ত হয়ে বলে—আর কেন বাপু, এবার উড়ে গেলেই তো হয়।

কয়েকদিন পর দেখা গেল মা পায়রাটা বাচ্চাটাকে ওড়া শেখাচ্ছে। সারা ঘরে সেদিন কী দৌরাত্ম্য! বাচ্চাটা একটুখানি উড়ছে আবার পড়ে যাচ্ছে। মা পায়রাটা গিয়ে একটু ঠোকরাচ্ছে আবার বাচ্চাটা উড়তে চেষ্টা করছে। উড়ে একবার বসছে খাটের ওপর—একবার বসছে টেবিলের ওপর। শ্রীলেখা তাড়া দেয় হুস্! অমনি বাচ্চাটা উড়ে গিয়ে বসে আলনার ওপরে।

একদিন কিন্তু মা পায়রাটা সকাল বেলায় সেই যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরল না। বাসায় বাচ্চা ছিল মজুত। তাই বাচ্চাটার অসুবিধে হল না। তবু সে বাসা থেকে নেমে উড়ে উড়ে ঘরের মধ্যেই এখানে ওখানে বসছিল। বাইরে যাবার শক্তি তার তখনো হয় নি। শ্রীলেখার মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবল, আহা বাচ্চাটা তার মাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে! আর মা-টা কী নিষ্ঠুর! দিব্যি ডিম পেড়ে, বাচ্চা ফুটিয়ে, তাকে একটু বড়ো করে দিয়ে তারপর একদিন উধাও। কিন্তু বাচ্চার মা? কে জানে! তারই কি আবার সে পেয়েছে? মায়ের স্নেহ পেয়েছে—মায়ের স্নেহ দান করার সৌভাগ্য এখনো যে তার হয় নি।

একদিন সকাল বেলা হঠাৎ শ্রীলেখা দেখল বাচ্চা পায়রাটা নেই। সেও উড়ে গেছে। নীড় শূন্য।

প্রথমটা কেমন খারাপ লাগল শ্রীলেখার। ক'টা দিন বেশ কেটে গেল। নিঃসঙ্গ ঘুপুরগুলো পায়রাদুটোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কেটে যেত বেশ। কিন্তু নিশ্চিন্তও হল। বাঃ, আপদ বিদেয় হয়েছে। আর ঘর নোংরা হবে না।

কিন্তু অবাক হয়ে গেল বিকেল বেলায়। আরে বাচ্চাটা ফিরে এসেছে আবার।

একটু খুশি হল, আবার বিরক্তও হল। আঃ, আপদ দূর হয়েও হয় না।

পরের দিন সকাল বেলা আবার উড়ে গেল, আবার ফিরল বিকেলে। এমনি রোজ।

সে দিন শনিবার। গত সপ্তাহে অভিরাম আসতে পারেনি। এ শনিবারে একটু বেলাবেলিই এসেছে। শ্রীলেখার মনটা আজ একটু অন্যরকম ছিল। দু সপ্তাহ পর মিলন!

কিন্তু প্রথমেই সুর কেটে গেল। অভিরাম ঘরে ঢুকেই বললে—এঃ ঘরের অবস্থা কী করে রেখেছ!

শ্রীলেখা লজ্জিত হয়ে বললে—কী করব, পায়রাটার জ্বালায় আর পারি না।

অভিরাম আর কিছু বলল না। শুধু একবার ঘুলঘুলিটার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

কিন্তু পায়রার বাচ্চাটার ওপর আক্রোশ শ্রীলেখার গেল না। পরের দিন সকাল বেলা পায়রাটা উড়ে যেতেই সে নিজে চেয়ারের ওপর উঠে বাসাটা ভেঙে দিলে। আর ঘুলঘুলির মুখটা একটা কাগজ দিয়ে এঁটে দিলে যাতে পায়রা আর ঢুকতেই না পারে।

সেদিন সারা দুপুর শ্রীলেখা খুব ঘুমিয়ে ছিল। স্বামী শুয়েছিল কিছুক্ষণ। তারপর কখন উঠে গেছে। একটু বেশি ঘুমিয়ে পড়েছিল শ্রীলেখা। হঠাৎ ঘুম ভাঙল। বাইরে অসময়ে ভীষণ ঝড়। তাড়াতাড়ি উঠে খোলা জানালার কাছে দাঁড়ালো। আকাশ জুড়ে কালো কুচকুচে মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে—মেঘ ডাকছে গুম্‌গুম্ করে। এখুনি দুর্যোগ শুরু হবে।

হঠাৎই শ্রীলেখার নজর পড়ল ঘুলঘুলিটার দিকে। কাগজটা ফেঁসে গেছে। ফাঁসল কী করে?

এক মুহূর্তে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আহা বাচ্চাটা কখন অভ্যাসমতো ঘরে এসেছিল। প্রাণপণে ঠুকরে ঠুকরে চেষ্টা করেছে আবরণটা ছিন্ন করবার। পারেনি। শেষে উড়ে গিয়েছে।

কিন্তু কোথায় উড়ে গেল? এই দারুণ দুর্যোগে সেই বাসাহারা অনভ্যস্ত পায়রাটা কোথায় এতটুকু আশ্রয়ের জন্যে খুঁজে খুঁজে ফিরছে!

বাইরে এই সময় প্রবল ভাবে বৃষ্টি নামল। ওদিকে প্রবল ঝড়ে নারকেল গাছগুলো পাগলের মতো দোলছে দুলছে, আম কাঁঠালের শাখায় শাখায় প্রলয় নৃত্য! কলাগাছগুলো একে একে ভূমিসাৎ হয়ে যাচ্ছে। ছাতের নালা দিয়ে তোড়ে জল পড়ছে! জলের ছাট খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে মেঝে ভিজিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শ্রীলেখার সে দিকে হুঁশ নেই। সে সেই বৃষ্টির ছাটের মধ্যে দাঁড়িয়ে একহাতে চোখের ওপর বৃষ্টির ছাট আড়াল করে ঘোলার মতো বিবর্ণ আকাশের চারিদিকে কাকে যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় পিছনে অভিরামের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।—অমন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছ কেন?

শ্রীলেখা একবার পিছন ফিরে তাকালো। দেখল ভারী রেমিংটনের রাইফেলটা পরিষ্কার করতে করতেই ওঘর থেকে স্বামী উঠে এসেছে।

শ্রীলেখা তৎক্ষণাৎ তার দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। যেন তাকে দেখেই নি, যেন তার কথা শোনেই নি এমনি ভাবে সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল।

অভিরাম এগিয়ে এসে শ্রীলেখার কাঁধে হাত রেখে বললে, কী দেখছ অমন আকাশের পানে চেয়ে?

রুদ্ধ কণ্ঠে শ্রীলেখা বললে—সে তুমি বুঝবে না।

খোলা জানালা দিয়ে ঝড় এসে ঘুলঘুলির মুখের সেই কাগজের আবরণটুকু উড়িয়ে নিয়ে গেল। শূন্য ঘুলঘুলিটা খাঁ খাঁ করতে লাগল।

চিত্র বিচিত্র

মৃত্যুঞ্জয় ভরদ্বাজ

প্রাণভয়ে লোক ছুটছে। খবর আসছে, মঙ্গলগ্রহ থেকে ভীষণ দানবাকৃতি "মানুষরা" ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র নিয়ে পৃথিবীতে নেমে এসে পৃথিবীর মানুষকে নির্মূল করে ফেলছে। কেউ তাদের গতিরোধ করতে পারছে না। অতএব, যারা বেতারে এই খবর শুনছে তারাই প্রাণভয়ে দৌড়োচ্ছে, পালাচ্ছে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে। সে এক মহা হুলুস্থুল ব্যাপার।

কিছুদিন আগে আমেরিকার অনেকগুলি শহরে এক সঙ্গে এই রকম পালাই পালাই আহি আহি রব উঠেছিল। প্রকৃত কারণ শুনলে হাসবেন। রেডিওতে অভিনয় হচ্ছিল। সেই বেতার অভিনয়ে প্রযোজক এমন কতকগুলি অভিনয় কৌশল ও আঙ্গিক ব্যবহার করেছিলেন যার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রোতা অভিনয়কে অভিনয় বলে মনে করে দিশেহারা হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে সেই অঞ্চলে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিল।

ব্যাপারটা হল এই : এইচ্. জি ওয়েলস্ এর একটি বই আছে—The war of the worlds। মঙ্গলগ্রহ থেকে অদ্ভুত মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কিম্ভূতকিমাকার দানবের দল একদা কেমন করে কী ভাবে পৃথিবীতে নেমে এসে প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবী ধ্বংস করে ফেলেছিল, কেমন করে মানুষকে পরাজিত করবার পর অবশেষে তারা জীবাণুদের হাতে লাঞ্ছিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তারই এক কাল্পনিক কাহিনী অনুকরণীয় ভঙ্গীতে ও ভাষায় ওয়েলস্ উক্ত গ্রন্থে বিবৃত করেছেন।

নবাগতপ্রায় চিত্রাভিনেতা অরসন্ ওয়েলস্ সেই কাহিনীকে বেতারের উপযোগী করে অভিনয়ের আয়োজন করেন। "সংবাদ প্রচার", "প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ", "বিশেষ ঘোষণা" প্রভৃতি কয়েকটি প্রচার ব্যবস্থা তিনি অভিনয়ের আঙ্গিকরূপে ব্যবহার করেছিলেন। সেই ব্যবস্থাগুলিই যে শেষ পর্যন্ত এমন কাণ্ড বাধাবে তা বোধ হয় তিনিও কল্পনা করতে পারেন নি।

সহজ শান্তভাবে অভিনয় সুরু হল। ওয়েলস এক ছোট উদ্বোধনী ভাষণে গ্রন্থকারের মর্মকথা হিসাবে বললেন যে বিংশ শতাব্দীতে নানা অঘটন ঘটছে, বিজ্ঞান-জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে, বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন না, পৃথিবীর গতি কোন্-দিকে, তবে তাঁরা আশা ও আশঙ্কা করছেন, শিগগিরই একটা বড় রকম কিছু ঘটবে। বক্তৃতা শেষ হলে এক "ঘোষক" (রেডিওর ঘোষক নয়, অভিনেতা ঘোষক) আবহাওয়ার সংবাদ জানালেন তারপর গানবাজনা শোনা যেতে লাগল।

দুতিন মিনিট পরেই গানবাজনা থেমে গেল এবং "বিশেষ সংবাদ" প্রচারিত হল, সংবাদে জানা গেল, শিকাগোর এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানবিদ এই মাত্র মঙ্গলগ্রহে উপরি উপরি কয়েকবার তীব্র আলোকরশ্মির বিস্ফুরণ দেখেছেন এবং সেই সঙ্গে বিস্ফোরণের আওয়াজও পেয়েছেন, অভিনয় সমস্ত বাদ করছেন তিনি।

পরক্ষণেই আর এক "বিশেষ সংবাদ" : এই মাত্র খবর পাওয়া গেল, ট্রেনটনের বাইশ মাইল দূরে গ্রোভারমিল নামক জায়গায় এক খামের গোলার কাছে আকাশ থেকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের গোলা পড়েছে। একশ দুশো মাইল দূর থেকে তার চোখ ঝলসানো আলো আর কানফাটা শব্দ শোনা গেছে।

তার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই "প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ" সুরু হল : প্রত্যক্ষদর্শী সেই আগুনের গোলার কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন, গোলাটা ঠিক গোল নয়, লম্বা ধরণের প্রকাণ্ড চোঙা, ভীষণ তার আকৃতি তার গা দিয়ে প্রচণ্ড উত্তাপ বেরুচ্ছে। লোকজন ছুটে পালাচ্ছে। চার দিকে গোলমাল……

"প্রত্যক্ষদর্শী" ক্ষণেকের জন্যে থেমে আবার বলতে সুরু করলেন : চোখের সামনে এ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখছি ··নক্ষত্রগ্রহ থেকে যে চোঙাটা পড়েছে তার ভিতর থেকে কী যেন বেরুচ্ছে···কি ওটা ? কে ও ? মানুষ তো নয়···কিন্তু হাত পা আছে বলে মনে হচ্ছে···মুখ দেখা যাচ্ছে না·· কালো মুখোশের ভিতর থেকে লাল লাল দুটো গোল আলো দেখা যাচ্ছে···একটার পিছনে একটা···ক্রমাগত বেরুচ্ছে··· বিরাট ভালুকের মতো আকৃতি···ভীষণ আকার, বর্ণনা করা যায় না···

"প্রত্যক্ষদর্শীর" কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন "ঘোষকের" গলা শোনা গেল : "ভয়ঙ্কর খবর জানাচ্ছি। মঙ্গলগ্রহের সাংঘাতিক দানবরা পৃথিবীতে নেমেছে। কয়েকজন পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাদের ধরবার জন্যে এগিয়ে গিছল। কিন্তু কী রোমাঞ্চকর ব্যাপার দানবদের কপাল থেকে এমন তীব্র আলো ঠিকরে বেরুলো যার ছোঁয়া লাগামাত্র পুলিশ কজন প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। আমাদের প্রত্যক্ষদর্শী সংবাদদাতাও সেই আগুনের ছোঁয়া লেগে প্রাণ হারিয়েছেন।

তারপর ঘনঘন "সংবাদ" আসতে লাগল : মঙ্গলীয় অদ্ভুতদর্শন জন্তুরা চারদিকে আগুন ছড়িয়ে দিচ্ছে। বিষাক্ত গ্যাসে আকাশ ভরে গেছে। অনবরত মানুষ মরছে। ইতিমধ্যে নিউজার্সির সেনাবাহিনী বেরিয়ে মঙ্গলগ্রহের রাক্ষসদের প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছে। চতুর্দিকে উত্তেজনা আর বিশৃঙ্খলা।··সৈন্যরা এগিয়ে গেল। তারপর এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার···মঙ্গলগ্রহের সেই বিরাট চোঙাটার গায়ে যেন হাতপা গজালো এবং সেটা ভীষণ গর্জন করতে করতে সৈন্যদের দিকে ধাবিত হল। তার তাপে পড়ে সৈন্যরা গিয়ে গেল, তার আগুনের তাপে তাদের শরীর ঝলসে কালো হয়ে গেল, সাত শ' সৈন্যের মধ্যে তিনচারজন মাত্র কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়েছে শোনা গেল।

"সংবাদ" চলতে লাগল : সৈন্যদের শেষ ক'রে সেই বিকট দর্শন ভয়ঙ্কর বৃহৎ দানব নিউইয়র্কের দিকে ছুটল। তার সংঘাতে লোক ভেঙে পড়ল, বড় বড় আকাশছোঁয়া বাড়ি গুঁড়ো হয়ে গেল, হাজার হাজার মানুষ মঙ্গলদানবের দেহ থেকে নির্গত বিষের ধোঁয়ায় প্রাণ হারাল। নিউ ইয়র্ক সহরের বেতার শালার ছাদের ওপর দাঁড়িয়ে একজন "ঘোষক" সেই সব ধ্বংসলীলার বিবরণ দিতে লাগলেন : "শত্রুকে দেখা যাচ্ছে···ঘুরে···পাঁচটা ভীষণাকার চোঙা হাতগুলোর ওপর দিয়ে আসছে। কোন কিছুই তাদের পথ রোধ করতে পারছে না।···এইমাত্র আর এক ভীষণ দুঃসংবাদ এলো। মঙ্গলগ্রহ থেকে বিষবাষ্প ভরা পঁচিশ তিরিশ হাত লম্বা আর দুইমানুষ ভর চওড়া চোঙা দেশের নানা স্থানে পড়ছে···চারিদিকে আগুনে ঝলসে যাচ্ছে···আর রক্ষা নেই···সহর ধ্বংস হতে দেরী নেই···কালো বিষের ধোঁয়ায় আকাশ ভরে উঠল···চারিদিকে নরনারীর আর্ত চীৎকার···ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাহাড়ের মতো আকার নিয়ে এগিয়ে আসছে···এগিয়ে আসছে···আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না···

"ঘোষকে"র কণ্ঠস্বর থেমে গেল। গম্ভীর গলায় আর একজন "ঘোষণাকারী" জানালেন: "এই মাত্র যে ঘোষকের কথা আপনারা শুনছিলেন, তিনি মঙ্গলগ্রহের বিষের ধোঁয়ার দম আটকে মারা পড়েছেন।"

কলম্বিয়া ব্রডকাস্টিং কোম্পানী কর্তৃক সেই অভিনয় প্রচারিত হচ্ছিল। প্রায় ষাট লক্ষ লোক সেই অনুষ্ঠান শুনেছিল, তার মধ্যে প্রায় বিশ লক্ষ অভিনয়কে সত্যি বলে মনে করেছিল। সেই বিশলক্ষ নরনারীর বাস এক জায়গায় নয়, নানা বিভিন্ন সহরে ও মফঃস্বলে। তাই বহু স্থানেই প্রচণ্ড ত্রাস আর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, পুলিসের হাঁড়িতে, বেতার আপিসে, খবরের কাগজের দপ্তরে টেলিফোন আসার বিরাম ছিল না, চারিদিকে আর্তকণ্ঠের নিনাদ, কি করব, কোথায় যাব, মঙ্গলীয় মুহূর্মুহু এসে পড়ল, এই আতঙ্কে ক্রন্দনরতা মায়েরা তাদের বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভগবানকে ডাকতে লাগল, লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পাগলের মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াতে লাগল, অনেকে ভিজে কম্বলে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে ঘরে শুয়ে কাঁপতে লাগল, (ভিজে কম্বলে নাকি বিষের ধোঁয়া প্রতিরোধ করা যাবে, এই কথা মুখে মুখে চাউর হয়েছিল), যাদের মোটর ছিল তারা মোটরে চেপে বেদিকে দুচোখ যায় ছুটতে লাগল। সে এক ভীষণ হুলুস্থুল ব্যাপার, রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ভীড়ের চাপে পড়ে কত মানুষ যে অজ্ঞান হয়ে গেল তার সংখ্যা নেই।

রাত আটটা নাগাদ অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস তার বিভিন্ন কেন্দ্রের সম্পাদকদের জানাল যে চারিদিকের এই যে হুলুস্থুল ব্যাপার তার মূলে কোন সত্যি নেই, War of the world নামক বইখানির বেতার অভিনয়ের ফলেই এই রকম অবিশ্বাস্য ঘটনা সমূহের সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কথা বিশেষ বুলেটিনে সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হোক।

একটি নাটক প্রচার করতে গিয়ে যে এই রকম মহাবিপর্যয় কাণ্ড ঘটবে তা বেতার কর্তৃপক্ষ স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। বিব্রত বিমূঢ় অবস্থায় তাঁরা ঘন ঘন বিশেষ ঘোষণায় জানাতে লাগলেন যে শ্রোতারা অনর্থক আতঙ্কিত হয়েছেন, যা শুনে তাঁরা বিচলিত হয়েছেন তা সত্যিকারের সংবাদ নয়, তা একটি অভিনয়।

অভিনয়ের প্রযোজক অরসন্ ওয়েলস ও সেই অভিনয়ের আয়োজন করে সে রাতে কম বিব্রত ও বিপন্ন হন নি। যখন লোকে বুঝলে যে ব্যাপারটা ভুয়ো, ধাপ্পা, তখন মার মার শব্দে তারা বেতার-কেন্দ্রে ধেয়ে এলো। কোথায় অরসন্ ওয়েলস, দেখি একবার বাছাধনকে আমাদের এক গাঁড়ে মারবার করি। ছুটে এলো খবরের কাগজের সংবাদদাতারা! ওয়েলস আর তাঁর সঙ্গীরা তখন আপিস বাড়ির একটা অন্ধকার মহলে এক রুদ্ধদ্বার ঘরে লুকিয়ে বসে আছেন। অনেক রাত্রে খিড়কি দরজা দিয়ে বেরিয়ে তাঁরা বাড়ি পালালেন।

মামলা যদিও শেষ পর্যন্ত আদালতে পৌঁছোয় নি, তাহলেও ওয়েলসকে অনেকগুলো ক্ষতি পূরণের মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সর্ব সমেত যার অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ৭ লক্ষ ৫০ হাজার ডলার। কাগজে কাগজে বহু লেখালেখি অনেক দুঃখ প্রকাশ সেই সঙ্গে কিছু হাসিমস্করা—কিছুদিন দেশে অন্য কথা ছিল না। অরসন্ ওয়েলস বেচারা তো অনেকদিন দোকানের মুখ দেখতে পারেন নি।

শুকতারা

(উপন্যাস)

বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

লোকটার মনে এক একসময়ে কতগুলো চিত্র ফুটে উঠতে থাকে। চিত্রগুলো একের পর এক বেশ সুসমঞ্জসভাবে গাঁথা গল্পের মতো মনে আসে। অবশ্য বেশীর ভাগ সময়েই তার মনের মধ্যে যেন দানবের লড়াই চলে। চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। একসঙ্গে বহুরকম চিন্তা তাল বেতালের মতো দাপাদাপি করে মস্তিষ্কের মধ্যে। একটি ধরতে না ধরতেই আর একটির সুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভুঁই ফোঁড়ের মতো আরও কতকগুলো আজব চিন্তা মাথার মধ্যে গজিয়ে ওঠে। কোনটাই শেষ পর্যন্ত ভাল ভাবে ধরা যায় না, দাঙ্গার মতো তারা হুড়োহুড়ি করে, দাপাদাপি করে। তার মাথার মধ্যে তখন দারুণ যন্ত্রণা হতে আরম্ভ করে। যন্ত্রণার চোটে সে আজে বাজে বকে। ছটফট করে বেড়ায় রাস্তায় রাস্তায়।

তবে মাঝে মাঝে পুরোন কথাগুলো একের পর এক এসে দাঁড়ায়। শোভাযাত্রার মিছিলের মতো সবাই সারি দিয়ে একটি সুষ্ঠু ধারার শান্ত ভাবে তার মনের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে। তখন সে সেই ঘটনাগুলো চুপচাপ বসে বসে দেখে। প্রাণে শান্তি পায়। কিন্তু কতক্ষণ? খানিক পরেই সেই শৃঙ্খলাবদ্ধ চিন্তার সারি আবার ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যায়। তখন আবার সুরু হল হুড়োহুড়ি দাপাদাপি, হট্টগোল। আবার মাথার যন্ত্রণা।

তবে এটা সে দেখেছে, যখন বাইরের প্রকৃতিটা ভীষণ হয়ে ওঠে, তখন তার মনে এই চিন্তার শৃঙ্খলাটা আসে। মে মাসের দুপুর। তুত্তুকুড়ীর রাস্তায় সে সময়ে আকাশ থেকে আগুন ঝরে পড়তে থাকে। সেই আগুনের তরল স্রোত হলহল করে বয়ে যায় সারা সহরের ওপর দিকে। কাক পাখীটা পর্যন্ত এই দুপুরে রাস্তায় নামে না। গাছের ছায়ায় সবাই আশ্রয় খোঁজে তখন। ব্যবসা বাণিজ্যের জায়গা গুলোতে দুপুরের খাবার অবকাশটি বেড়ে যায়। সাড়ে বারোটা থেকে তিনটে অবধি আড়তে আড়তে লোক জনের যাতায়াত অনেক কম। নদীওয়ালা নায়ার আর পিল্লেমাররা দুপুরের খাওয়া সেরে, তাকিয়ার ওপর আড় হয়ে ঘুমোয়। ঝিম ধরে বন্দরের ভিতর। নৌকোর মাঝি মাল্লারা সব কাজ ফেলে চুকে পড়ে নিজেদের আস্তানায়। কয়লা তোলা কুলীর দল আশ্রয় নেয় সাইনে দাঁড়িয়ে থাকা ওয়াগনটার কামরাতে। বন্দরের রাস্তায় এসময়ে শুটকী মাছ আর পেঁয়াজ বওয়া গরুর গাড়ীর

চাকার আওয়াজ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকে। অনেক দেরীতে দেরীতে শোনা যায় মাত্র দু একটা গাড়ীর চাকার ক্লান্ত টানা—ক্যাঁচ কোঁচ আওয়াজ। সারা সহর এ সময় যেন শ্মশানের মতো খাঁ খাঁ করে। শ্মশানের চিতার আগুন ধক্ ধক্ করে সর্বত্র জ্বলে। সে দেখে সেই আগুনের শিখাগুলো লক্ লক্ করে আকাশ ছাড়িয়ে উঠছে! উঃ কি আনন্দ কি তৃপ্তি! জ্বলুক! জ্বলুক! জ্বলে পুড়ে যদি সমস্ত সৃষ্টিটা ছারখার হয়ে যায় তবে বোধ হয় তার বুকের জ্বালাটা কিছু শান্ত হয়।

সে তখন বন্দরের যেন গেটের পাশে রাস্তার জমন্ত ধুলোর ওপর বসে থাকে। তার মনে পড়তে থাকে অনেক কথা। একজন যুবকের কথা তার মনে পড়ে সবচেয়ে বেশী করে। বেশ একহারা গড়ন, তপ্ত কাঞ্চনের মতো গায়ের রং। চ্যাটাল বুকের পাটা সারা শরীরে মেদের চিহ্ন মাত্র নেই। যেন একটা লোহার গায়ে মোড়া শক্ত লাঠি। যেমন ঋজু তেমনি উন্নত। ঈষৎ লম্বাটে মুখে বুদ্ধির আলো ঝলমল করছে। ছোট ছোট দুটো চোখ যেন ধারাল দুটো ছুরির ফলা। নাক, ঠোঁট আর চিবুক,—একই ভাবে গড়া। গাঁতন তাদের গড়ন, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ অভিব্যক্তি বাঞ্ছক। সমস্ত চেহারাটায় একটা ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে—সে ব্যক্তিত্বটা হল একজন তীক্ষ্ণ, উন্নত প্রকৃতির যুবা পুরুষের।

যুবা পুরুষটির কথা মনে হতেই আর একটি মুখ এসে দাঁড়াল তার চোখের সামনে। সমস্ত ঘটনাটি এত স্পষ্ট হয়ে উঠল—এতো জীবন্ত হয়ে উঠল যে লোকটি স্থান কাল পাত্র সব ভুলে ডুবে গেল সেই ঘটনাস্রোতে।

মার্গশীর্ষ মাস (মার্গ শীর্ষ-অগ্রহায়ণ) দিনটা হল বৈকুণ্ঠ একাদশীর। না দিন তখনও সুরু হয়নি, ভোরের আলো সবে মাত্র আবছা হয়ে পুবের আকাশে উঁকি ঝুঁকি মারছে। পুবদিকে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে শুকতারাটা। তার সবুজ আলো তখনও এতটুকু ম্লান হয়নি। উষার কপালে যেন একটি প্রকাণ্ড পান্নার টিপ্‌লির মতো দেখাচ্ছে সেটা। শীতটা ভোরের দিকে সামান্য একটু বেশী পড়েছে তার ওপর উত্তুরে হাওয়া দিচ্ছে ঝির ঝির করে। এই আবছা অন্ধকারেই লোক চলাচল সুরু হয়ে গেছে ত্রিচিকপল্লী আর শ্রীরঙ্গমের রাস্তার রাস্তায়। রাতের ট্রেনগুলো সারা রাত্র যাত্রী বয়েছে উত্তর দক্ষিণ পুব পশ্চিম থেকে। যাত্রীরা গাদি দিয়ে বসে ছিল ত্রিচি আর শ্রীরঙ্গমের মাটকর্মে। অন্ধকার একটু পাতলা হতেই মোট পুঁটুলী নিয়ে ষ্টেশনের দিকে চলেছে।

ভোরের শীতটা একটু বেশী করে লাগছে কাবেরীর তীরে। ঠাণ্ডা হাওয়া কাবেরীর বুকের ওপর দিয়ে এসে ঢেউ তুলছে তার পাড়ের নারকেল বনের মাথায়। শ্রীরঙ্গমের ঘাটে তো আজ কথাই নেই। লোকের ভীড় এর মধ্যেই জমতে আরম্ভ করেছে।

ভোরাই বাতাসটা যুবকটির বড় ভাল লাগে। ভাল লাগে এই ব্রাহ্ম মুহূর্তটিকে। কিন্তু দেখার সময় হয় না।

জীবনের বেশীর ভাগ ব্রাহ্ম মুহূর্তগুলোই কেটে যায় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। যুবকটি এসে দাঁড়াল ত্রিচি শ্রীরঙ্গম সেতুর ওপর। নজর দিল কাবেরীর জলে। কাবেরীর জলে তখন আলো ছায়ার খেলা সবে সুরু হয়েছে। তার ঘোলাটে সেরুয়া রঙ তখনও ভাল করে দেখা দেয়নি। যুবকটির মনে হল এ যেন কাবেরী নয়। এ হল কালিন্দী যমুনা। সেতুর নীচে কাবেরীর জলে ঘূর্ণী উঠছে সেখানে সেতুর স্তম্ভ ধাক্কা খেয়ে জলে কুলকুল আওয়াজ উঠছে। যুবকটি শুনতে পেল সেই কুলকুল আওয়াজ। মনে মনে একবার উচ্চারণ করল "কালিন্দী কল কল্লোল কোলাহল কুতূহলী"। হ্যাঁ,

বাঁধিকের ঘাটেও কোলাহল উঠেছে। যাত্রীরা স্নানের জন্যে জমা হতে সুরু করেছে। কেউ কেউ তরণী করে নেমেও গেছে জলে।

স্নান সারতে হবে। অবগাহন স্নান। কিন্তু ঐ ভীড়ের মধ্যে নয়। বিশেষ করে যে ভীড়ের মধ্যে স্ত্রী লোকের সংখ্যা বেশী। স্ত্রী জাতিকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলে যুবকটি। আর তাইতো যে পথে বেশীর ভাগ লোক যায় সে পথে হাঁটতে যুবকটির প্রচণ্ড আপত্তি। যে ঘাটে সকলে স্নানের জন্যে, সে ঘাট তার জন্যে নয়। সে ডানদিকের নারাল জমিটার দিকে নজর ফেলল। কাবেরী পুলের ওপর থেকে একটা সরু রাস্তা গড়িয়ে নেমে গেছে। উঁচু রাজপথে প্রায় চল্লিশ ফুট নীচে কাবেরীর পাড়—তার পাশেই প্রকাণ্ড নারকেলের বাগান। নারকেল বাগানের মধ্যেও ইতিমধ্যে আলো ছায়ার খেলা সুরু হয়ে গেছে। যুবকটি কাবেরীর বাঁধ ধরে এগিয়ে গেল কিছুটা। এদিকটা তার অজানা। তা হোক এইখানেই সে আঘাটায় নেমে স্নান করবে। নীচে নেমে সে দেখল পায়ে চলা একটি পথের চিহ্ন রয়েছে। সে চিহ্নটা চলে গেছে কিছু দূরে। সেখানে গিয়ে কাবেরীর কোলে নেমে গেছে। তা হলে কেউ কেউ তার মতো নতুন পথসন্ধানী এদিকে আসে। সে পথটা ধরে এগিয়ে চলল। পিছনে প্রকাণ্ড নারকেল বাগানটির তখন ঝির ঝির করে আওয়াজ উঠছে। না এখানে একদম জনমানব নেই। কেউ এদিকে স্নান করতে আসবে না। মনের আনন্দে এখানে স্নান করব আজ। ভাবল যুবকটি। ঝিচি শ্রীরঙ্গম রাস্তার কোলাহলও এখানে এসে পৌঁছবে না। নারকেল গাছের আড়াল দিয়ে সে মনের আনন্দে এগিয়ে চলল। একটু খানি এগিয়ে তাকে কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। নারী কণ্ঠে সঙ্গীতের একটা কলি গুন্ গুন্ করে ভ্রমর গুঞ্জনের মতো গুন্‌গুনিয়ে উঠল তার কানের পাশে। সে চমকে উঠল। এখানে কে গান গায়? এই নির্জন নারকেল বাগানের মধ্যে। সে একটা নারকেল গাছের পাশে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে চেয়ে দেখল সেই আবছা অন্ধকারে কাবেরীর জলে গা ডুবিয়ে দুটি স্ত্রীলোক স্নান করছে। প্রথমে তার মনটা বিরূপ হয়ে উঠল। ভাবল, কি আপদ স্ত্রীলোক সর্বত্র। কোথাও গিয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই।

যুবকটি যেখন গান গাইছে তাদের মধ্যে একটি কিন্তু পরক্ষণেই যুবকটির কর্ণপটসঙ্গীতে শিক্ষিত কান আর মন মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। মেয়েটি স্বাভাবিক সুরে প্রায় আপন মনে গাইছে। তারী মিঠে তার গলার আওয়াজ। ভূপালম্ রাগে শান্ত গভীর সুর ঝির ঝির বাতাসের সঙ্গে ভোরের আলোয় মিশে যাচ্ছে। মেয়েটি ঠিক প্রাণ্ডয়ের প্রথম গানটিই গাইছে। নিখুঁত মীড় আর গমকের সঙ্গে ভেসে আসছে তার কথা গুলো—

মার্গড়ী ভীজেন মাহীনীবৈদ্যা নারায়ণা
নিন্নাডনোদু বির! গোদ্দু মীনো নেরীক্কৈমীর।

মেয়েটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এই চরণ দুটি অনেকবার গাইল। তারপর এল পরের চরণে।

সির মাদগুম্ আংগোড়ী ছেল্‌বাস্‌দিক মিম্‌কাল্!
কুরবেল্ কোড্ডেওড়ীমান্ নন্দগোপালন্ কুমারন্;
এরাম্ব কাঁী বলোদৈ ইলঞ্চ চীমন্;
কারমেনিপ্পসেংকাল্ কাদীরম্ বিরুম্ পোল্ মুখাত্তান্।

এই কটি চরণও সে বহুবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইল। যুবকটি বাঁশী শোনা সাপের মতো সঙ্গীত মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নারকেল গাছটার আড়ালে। বাইরে যেতে সে সংকোচ বোধ করতে লাগল। যদি তাকে দেখে এই সঙ্গীত থেমে যায়। এই গানটি তার ছোট বেলা থেকে সে অন্ততঃ হাজার বার শুনেছে হাজার গলায়। কিন্তু এই রকম মিঠে গলায় এই রকম গানে ও কালে নিজের সব সত্তা ডুবিয়ে দিয়ে গান গাওয়া সে জীবনে আর শোনেনি। মার্গশীর্ষ মাসে তামিলনাদের ব্রাহ্মণ কুমারী মাত্রেই এই ভোর বেলা নদীতে স্নান করে এসে মন্দিরে মন্দিরে থিরুপ্পাওয়ই আর থিরু ভাম্ পাওয়ের গান করে থাকে। কিন্তু এমন নির্জন পরিবেশে, ভোরের এই অলৌকিক আবহাওয়ায় এমন গান যুবকটি জীবনে শুনেছে বলে মনে করতে পারল না। সুরভঙ্গ, সঙ্গীত সেবী যুবক মুগ্ধ হয়ে গেল?

মেয়েটি আপন মনে বিভোর হয়ে গাইছে এক গলা জলে দাঁড়িয়ে। কাবেরীর জলের কুল কুল আওয়াজের মতো তার গলায় স্বাভাবিক সুরের নির্ঝরিণী বইছে কুলকুল করে। সে গাইছে—

নারায়ণনৈ, নমক্কে পারৈ তরুবান্;
পারোম্ পকারুম পারিন্দে লো রেলোরায়।

এই দুটোই গানের শেষ চরণ। মেয়েটি যেন কিছুতেই শেষ চরণ দুটি ছাড়তে চায় না। নারকেল গাছের আড়ালে যুবকটি তন্ময়ক্ষণে বুঁদ হয়ে গেছে গান শুনে। তার জ্ঞান কাল পাত্র জ্ঞান চলে গেছে। এক একবার ভাবছে এতদিন পরে স্বয়ং ভক্তিমতী আণ্ডাল্ কি নতুন করে জন্ম নিয়ে এল? এতো বিশুদ্ধ সুরে এতো মিষ্টি করে এতো প্রাণ মাতানো গান গাইছে কে এ স্ত্রীলোক?

এদিকে পূবের আলো জোরাল হয়েছে। যুবকটির খেয়ালই নেই যে শুকতারাটি অস্ত গেল কখন? কাবেরীর ওপাড়ে ত্রিচির বাড়ী ঘর গুলো স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে। ওপার থেকে একটি নাদেস্বরমের (সানাই এর) আওয়াজ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। প্রভাতী ভোড়ী রাগের আলাপ চলছে তাতে।

মেয়েটি গান শেষ করল। যুবকটির এতক্ষণে খেয়াল হয়েছে এমন করে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তার উচিত হয় নি। এমনিতে সে অপদস্থ হবার পাত্র নয় কিন্তু এই বিশেষ অবস্থায় পড়ে তাকে একটু চিন্তিত হতে হল।

স্ত্রীলোক দুজনের মধ্যে একজন হল বয়ঃজ্যেষ্ঠা, দেখে মনে হয় যে দাসী। সে জল থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ডাক দিল—আম্মা ওঠো, ঠাণ্ডা জলে আর থেকো না। তরুণী জবাব দিল চল যাচ্ছি যাচ্ছি।

যুবকটি ভটস্থ হয়ে উঠল। ওরা যদি উঠে এসে এই অবস্থায় আমাকে দেখে কি মনে করবে? ভাববে হয় তো আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের স্নান দেখছি। ছি ছি; কি অভব্যতা। ভাবল যুবকটি মনে মনে। সঙ্গে সঙ্গে গাছের আড়াল থেকে জলে নজর ফেলতেই প্রভাতের তরুণ আলোতে স্পষ্ট চোখে পড়ল কাবেরীর বুক থেকে যেন যুগল সূর্যোদয় হচ্ছে। যুবকটি ধ হয়ে গেল। নারীর এত সৌন্দর্য সে জীবনে আর দেখেনি। কুমার সম্ভবে "বাসো বাসানাং তরুণার্ক রাগম্" কথাগুলো তার পড়াই ছিল কেবল। আজ সে প্রত্যক্ষ করল সেই ছবিটিকে।

সর্বদা আত্মসচেতন যুবকটি কোন কালে স্ত্রীজাতিকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দেয়নি। তার আচার আচরণের মধ্যেও সে যথা সম্ভব এড়িয়ে চলেছে স্ত্রীজাতিকে। তার সব সময়েই মনে হয়েছে কোন

নারীর ওপর আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ হল নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দেওয়া। সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য নিয়ে যখন সে এম, এ, পাশ করে তখন কাব্য ও নাটকের নায়কদের সে খানিকটা অনুকম্পার সঙ্গেই গ্রহণ করেছিল। নারীদের সম্বন্ধে তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে তারা যে কোন পুরুষের থেকে নিকৃষ্টতর জীব। অতএব যে সব পুরুষ এই নিকৃষ্টতর জীবদের পাল্লায় পড়ে ঘুরে মরে তারা অনুকম্পার যোগ্য বলে তার মনে হয়েছিল। এ নিয়ে সহাধ্যায়ী বহু ছাত্রের সঙ্গে তার তর্কের শেষ ছিল না কোন ছাত্র যদি এসে বলত যে সে প্রেমে পড়েছে তখনি তার তীক্ষ্ণ নাকের ডগা কুঁচকে উঠত নিদারুণ ঘৃণায় আর বিদ্রূপে। সে বলত—পুরুষে আবার প্রেমে পড়ে নাকি? তোমার দেহে কোথাও একটি ব্যাধি লুকিয়ে আছে। তুমি এক্ষুনি ডাক্তার দেখাও।

আজ এই মুহূর্তে সেই সরলা আত্মসচেতন যুবক কিছুক্ষণের জন্য আত্মসংযম হারিয়ে কোন গাছের আড়াল থেকে সে দেখতে লাগল তরুণীটির অনবদ্য কমনীয় রূপ। ইতিমধ্যে সূর্যের উদয় হয়েছে। তারই কয়েকটা ছিটা কাবেরীর সেবরা জল ডিঙিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে এপারের পাড়ে। নারকেল গাছগুলোর চিরোল চিরোল পাতার ওপরে। তরুণীটি আস্তে আস্তে সেই পাড়ের ওপর এসে দাঁড়াল। সিক্ত বস্ত্র ভেদ করে তার দেহের লাবণ্য যেন গলে গলে পড়ছিল তার সারা অঙ্গ থেকে। যুবকটি অবাক হয়ে দেখতে লাগল সেই বরাঙ্গীকে। রোদের একটা ছটা পড়ে মনে হচ্ছে যেন তার সমস্ত শরীরটা জ্বলছে। যেন কাঁচা সোনায় কেউ আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। জ্বল জ্বল করে সেই সোনার রঙটা জ্বলে উঠেছে, আর তার গা বেয়ে গলে পড়ছে তরল সোনার স্রোত। মেয়েটি নদীর দিকে পিছন ফিরতেই তার সমস্ত মুখখানা ছেলেটির চোখে পড়ল। পুরুষ ঈষৎ ডিম্বাকৃতি মুখ। জোড়া ভুরুর নীচের অংশটি বেশ ভারী। তার নীচে শান্ত কোমল দুটি চোখ। মাঝারী আকারের সুন্দর নাক। তাতে দু'পাশে দুটি হীরে বসান মুকুতি (নাক ছবি)। ঝকঝকে করে উঠছে মাঝে মাঝে সূর্যের আলোতে। সেই নাকের নীচে কোটা পদ্মের পাপড়ীর মতো সামান্য উল্টে যাওয়া ঈষৎ ভারী দুটি ঠোঁট। ছোট্ট হাঁ। তারই নীচে অপূর্ব সুন্দর চিবুক। এই রকম মুখশ্রী একমাত্র দেখা যায় বঙ্গিমেই। ভারী ভুরু আর ভারী ঠোঁট মিলে সারা মুখ খানায় একটা বিশেষ রকম আকর্ষণের সৃষ্টি করেছে। এ মুখ একবার দেখলে হাজার বার দেখতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটি তার মেঘের মতো একরাশ কালো চুল পড়ল, মুছল। পাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ভিজে কাপড় ছেড়ে শুকনো কাপড় পরল। তারপর ভিজে কাপড় কাবেরীর জলে ধুয়ে নিয়ে নিঙড়ে হাতের ওপর ফেলে বললে—চল, রঙ্গাম্মা এবার যাই। বড্ড দেরী হয়ে গেল। মন্দিরে বোধ হয় মঙ্গল আরতি শেষ হয়ে গেছে। যাই বল রঙ্গাম্মা আমার কিন্তু কাবেরীর জলে নামলে আর উঠতে ইচ্ছে করে না। জলটা কি সুন্দর গরম দেখেছ।

রঙ্গাম্মা বললে—চল চল, আর দেরী করলে মায়ের কাছে বকুনি খেতে হবে। মায়ের হয়তো স্নান করা হয়ে গেছে। আমার জন্যে বসে আছেন। আমি বাড়ী ফিরে তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যাব। দেরী হলে বড্ড রাগ করবেন।

নারী দুটি চঞ্চল পায়ে কাবেরীর সেতুর দিকে চলতে লাগল। যুবকটির পাশ দিয়েই তারা চলে গেল এগিয়ে।

যুবকটির আত্ম অহঙ্কারে প্রচণ্ড ঘা লাগল এবার। নিজের কাছে তার নিজেকে অপরাধী বলে

মনে হল। বার বার ইচ্ছে করতে লাগল এদের কাছে গিয়ে বলে—আমি এখানে অজান্তেই বসে পড়েছিলাম। আমার কোন দুরভিসন্ধি ছিল না। আমায় তোমরা ক্ষমা কর।

কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। মেয়ে দুটি হন হন করে এগিয়ে গিয়ে উঠল পুলের ওপর। তারপর সটান শ্রীরঙ্গমের রাস্তা ধরে চলতে লাগল।

এতক্ষণে যুবকটির মনে আর একটি ভাব এল। তার সমস্ত মনটা মাথা কুটতে লাগল এই ভেবে কেন মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে তার ঠিকানাটা নিয়ে নিলুম না। পরক্ষণেই মনে হল—তাতেই বা কি হত? ওই ভাঙা ভুরু আর ঈষৎ ওল্টানো পুরু ঠোঁট এ থেকে স্পষ্ট ধারণা হয় মেয়েটি দেবদাসী সম্প্রদায়ের। বয়স বোধ হয় ষোল সতের হবে। এতো বয়স অবধি কিন্তু অরক্ষিতা আছে! কিন্তু ভাগ্যবান সেই পুরুষ ও যার ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

পরক্ষণেই তার মনটা—ছি ছি করে উঠল। এ সব কি ভাবছে সে? পুরুষের পৌরুষের কাছে, বুদ্ধি আর বীর্যের কাছে নারী কি? কিছুই না। এমনিতেই নারী অতি নিকৃষ্ট জীব। তাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম হল দেবদাসী সম্প্রদায়ের নারীরা। যাদের একমাত্র পেশা হল দেহ বিক্রয়। ছি-ছি সেই দাসী সম্প্রদায়ের একটা মেয়েকে দেখে তার মন মুগ্ধ হবে? ছেলেটি এবার নিজের ওপর কঠোর হল। এক ঝাঁপে নদীর ওপর আছড়ে পড়ে স্রোতে গা ভাসিয়ে অনেকক্ষণ সাঁতার দিল। জোরে জোরে গা রগড়ে স্নান করল অনেকক্ষণ ধরে। মনে হচ্ছিল যেন সে তার গা থেকে কোন নোংরা সাফ করছে রগড়ে রগড়ে।

স্নান সেরে সে গেল মন্দিরে। রঙ্গনাথজীকে দর্শন করে তবে ঘরে ফিরবে।

রঙ্গনাথনের মন্দিরে ইতিমধ্যে লক্ষ লোকের ভীড় জমে গেছে। মূল মন্দিরের মধ্যে থিক থিক করছে লোক। লোকে লোকারণ্য। বেশীর ভাগই মুণ্ডিত মস্তক, নামধারী বৈষ্ণবদের ভীড়। বাজনা বাজছে। সংকীর্তন হচ্ছে। রঙ্গনাথজী ব্রহ্ম, গরুড় আর শ্রীজীকে নিয়ে চতুর্দোলে চেপে বার হয়েছেন মন্দির পরিক্রমায়। ধর্মোন্মাদ লোকের ভীড় চাপ বেঁধে ছুটছে তাঁর সামনে পিছনে। যুবকটি ভীড় বাঁচাবার জন্যে মন্দির প্রাঙ্গণের একটা উঁচু থাম ধরে পরিক্রমা পথের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল। নীচু দিয়ে জনস্রোত বইছে। সেই স্রোতে ভেসে চলেছে বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, শিশু। ভীড় তার সামনে এসে গেল। যুবকটির চোখ অনায়াসেই সেই ভীড়ের মধ্যে একটা মুখ খুঁজে বেড়াতে লাগল। চতুর্দোলায় রঙ্গনাথন বালকের কাঁধে চেপে সামনে এসে পড়েছেন। যুবকটি ভীড়ে পিষ্ট হতে লাগল কিন্তু শক্তিমান যুবক সে সব অগ্রাহ্য করেই হাত জোড়া করে প্রণাম নিবেদন করল রঙ্গনাথকে। রঙ্গনাথন তখন তার একেবারে চোখের সামনে। পরিষ্কার দর্শন। রঙ্গনাথনের মুখের দিকে তাকিয়ে যুবকটি অবাক হল। একি, বিগ্রহ হাসছে! রঙ্গনাথের সারা মুখ যেন একটা চাপা কৌতুকে মৃদু হাস্যময় হয়ে উঠেছে। একি কৌতুক! যুবকটি দু'হাতের তালু দিয়ে দু'চোখ রগড়ে নিল ভাল করে। তাকিয়ে দেখল আবার মূর্তির দিকে। মূর্তি তখনও ভীড়ের চাপে তার চোখের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সামনে এগুতে পারছে না। আর ভুল হবার নয়। রঙ্গনাথের সারা মুখ চাপা রঙ্গে হাস্যময়।

সারা শরীর তার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। মনে মনে বললে একি রঙ্গ হে রঙ্গনাথন!

যুবক নিজেকে বিস্মৃত হল। ভুলে গেল নিজের অস্তিত্ব ক্ষণকালের জন্য। প্রচণ্ড একটা বিস্ময়ের স্রোতে সে যেন ঐ জন স্রোতের সঙ্গে ভেসে চলতে লাগল। শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

শুধু দুটি মুহূর্ত। এই মুহূর্ত দুটির মধ্যে পাথরের দেবতা জীবন্ত হয়ে তার মুখের ওপর রঙের হাসি ছুড়ে মেরে গেল। একি রঙ হে তোমার রঙনাথন। পরক্ষণেই নিজের মধ্যে ফিরে এল সে। তার আধুনিক শিক্ষিত মন কিছুতেই এ ব্যাপারটিকে সহজে গ্রহণ করতে পারল না। সে ধাম ছেড়ে নীচে আসবার আগেই আর একবার স্ত্রীলোকদের ভীড়ের মধ্যে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। যাকে চোখে খুঁজছে সে নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল নিদারুণ ভীড়ের চাপে একজায়গায় একটি মহিলা প্রায় পিষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম করেছে। রঙনাথনের চিন্তা ভুলে গিয়ে অন্য চিন্তা মন থেকে ছেড়ে ফেলে তখুনি ভীড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে তারপর প্রচণ্ড শক্তিতে ভীড় ঠেলে সেই জায়গার দিকে এগুতে লাগল। দু'হাতে গায়ের যতো জোর আছে সব দিয়ে সে উন্মত্ত জন স্রোতকে কোন রকমে ঠেকিয়ে স্ত্রীলোকটির কাছে পৌছল। ততক্ষণে স্ত্রীলোকটি দম ফুরিয়ে আসা মাটুর মতো টলতে টলতে পাক খাচ্ছিল। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার ঠিক একটু আগেই যুবকটি তাকে ধরে ফেলল। অনেক কষ্টে সে একহাতে সেই স্ত্রীলোকটিকে নিয়ে আর একহাতে ভীড় সরিয়ে তাকে একটি ধারে এনে ফেলল। তারপর সমস্ত পিঠটি সে বাড়িয়ে দিলে জন স্রোতের দিকে। স্ত্রীলোকটিকে সে সিংহের মতো নিজের কোলের কাছে আগলে রাখল। সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ের মতো জনস্রোতের পর জনস্রোত বয়ে গেল তার পিঠের ওপর দিয়ে। মেরুদণ্ড যেন তার ভেঙে যাবার উপক্রম। শেষে ভীড় কমে যেতে সে স্ত্রী লোকটিকে আস্তে আস্তে বার করে নিয়ে এল। স্ত্রীলোকটি তার হাত ধরে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে এল।

মন্দিরের অন্ধকার থেকে বাইরে আসতেই যুবকটি দেখল স্ত্রীলোকটি একটি সম্ভ্রান্ত বংশের মহিলা। বয়স প্রায় পঞ্চাশ। মাথার চুল গুলো বেণীর ভাগ সাদা। দেহ যেন মোমে মাজা হরি-তালের প্রতিমা। পরণে বহুমূল্য মহীশূর সিল্কের শাড়ী। নাকে বড় বড় দুটো হীরের নুকুতি। হীরে দুটির দাম কম করে হবে হাজার দশেক টাকা। গলায় বহুমূল্য মুক্তার হার। ভদ্র মহিলার বয়স হয়েছে কিন্তু তাঁর সারা অঙ্গে যৌবনশ্রী যেন স্থির হয়ে আছে। সৌম্য শান্ত মুখ। বড় বড় পদ্ম পাপড়ির মতো চোখ। কিন্তু সে চোখে কোন অভিব্যক্তি নেই। এতো কিছুতেও তাঁর মুখের সেই শান্ত ভাবটি যায়নি। যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন—বাবা, তুমিই কি স্বয়ং রঙনাথন্?

যুবকটি তড়িতে জিভ কেটে বললে—অমন কথা বলবেন না। আমি সামান্য মানুষ। কিন্তু আপনি ঐ ভীড়ের মধ্যে অমন করে গেলেন কেন? ঐ ভীড়ে ঢোকা কি সহজ কথা!

মহিলাটি বললেন—

আমি যে চোখে দেখি না বাবা। আমার দুচোখ যে অন্ধ। ভীড় এড়াতে পারার আগেই তারা এসে পড়ল আমার ওপর। কিন্তু আমি যে এতক্ষণে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। আমার মনে হচ্ছিল আমি যেন সমুদ্রের প্রচণ্ড ঢেউয়ের মধ্যে পড়ে ডুবে যাচ্ছিলাম। তলিয়ে যাচ্ছিলাম। বাতাস নিতে না পেরে দম আটকে আসছিল, কষ্ট হচ্ছিল ভীষণ। ভাবছিলাম জলে ডুবলাম কেমন করে? হঠাৎ দেখি শ্রীরঙনাথন এসে আমার সামনে হাজির। হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। মুচকে হাসতে লাগলেন রঙনাথন। তাঁর হাত ধরতেই আমার সমস্ত কষ্ট ঘুচে গেল। বুকভরে নিশ্বাস নিলাম আবার। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম বাবা, তুমিই কি রঙনাথন?

যুবকটির সারা শরীর আবার শিউরে উঠল। রঙনাথনের একি পরিহাস! এই রকম পরিহাসের হাসি তিনি তার মুখের ওপরও তো ছুড়ে দিয়েছেন কিছু ক্ষণ আগে—

যুবকটি বললে, মা বলুন আপনার বাড়ী কোথায়; আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। কিন্তু আমার অবাক লাগছে আপনি দু'চোখে কিছুই দেখেন না অথচ বিগ্রহ দেখতে এলেন কেন?

মহিলা বললেন—বাইরের চোখ দিয়ে তো আমি ভগবানকে দেখতে আসিনি বাবা। এসেছিলাম অন্তরের চোখে দেখতে। তা আমার দেখা হয়েছে। আমার কি আমার হাত ধরে এনেছিল। তাকে একটু খোঁজ করতে পারেন? আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

যুবকটি একটু এগিয়ে বড় দরজাটার কাছে যেতেই দেখল দাসী স্ত্রীলোকটি হাউ মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বার হয়ে আসছে। মহিলাকে দেখেই সে হুমড়ি খেয়ে জড়িয়ে ধরল। আইয়ো আম্মা, তুমি যে আমার হাত ছেড়ে কোথায় চলে গেল। ঐ ভীড়ের ভিতর কি মানুষ টেঁকতে পারে? তাছাড়া তুমি তো চোখে কিছু দেখনা। ভাবনায় চিন্তায় আমি তো পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলাম মা। একজন পাণ্ডা আমায় বললে মন্দিরের কাছারিতে গিয়ে বসতে। আমি সেখানেই যাচ্ছিলাম। তা তুমি এখানে এলে কেমন করে?

মহিলাটি যুবকটিকে দেখিয়ে দিয়ে বললে—ইনি নিয়ে এসেছেন। ইনি জীবন্ত রঙ্গনাথন। যুবকটি দাসীটিকে দেখে চমকে উঠল। আজ ভোরে কাবেরীর তীরে সেই অপূর্ব লাবণ্যময়ী যুবতীটির সঙ্গে এই দাসীকে সে দেখেছে স্নান করতে। এরই নাম রঙ্গাম্মা। না, এত শীঘ্র একথা ভোলবার নয়।

মহিলাটি যুবকের হাত নিজের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন—দয়া করে আমার বাড়ীতে আসবেন বাবা। আপনার পায়ের ধুলো পড়লে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব।

যুবকটি ভাবছিল নানা কথা। ভোর বেলার সেই কাবেরীর কূল সেই নারকেল বাগান সেই অপূর্ব সুন্দরী যুবতী আর তার অপূর্ব মধুর সঙ্গীত; আনমনে জিজ্ঞাসা করল, আপনার ঠিকানা।

মহিলাটি বললেন—শ্রীরঙ্গম থেকে যে রাস্তাটি জম্বুকেশ্বম্ শিবের মন্দিরে গিয়ে ঢুকেছে তারই পাশে প্রথম গলিতেই আমার বাড়ী। নাম বললেন—রুক্মিণী আম্মাল। যে কেউ আমার বাড়ী দেখিয়ে দেবেন।

যুবকটি সেই রকম আন্‌মনা থেকেই জবাব দিল—আচ্ছা আমি আসব। আজই সন্ধ্যাতে। মহিলা বললেন—আমি আপনার জন্যে প্রতীক্ষা করব।

ইতিমধ্যে কথা বলতে বলতে তারা মন্দিরের বাইরে এসে পড়েছে। দাসী একটা কুদরৈ ভাণ্ডি (ঘোড়ার গাড়ী) ডেকে নিয়ে এল। মহিলাটি দাসীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়লেন।

যুবকটি তাদের চলে যাওয়া পথের ওপর দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। এইটিই তাহলে রঙ্গনাথের রঙ্গ। যাকে মনে মনে চাইছিলাম এতক্ষণ ধরে, সকাল থেকে যার মুখ মনের অবচেতনে ঘুরে মরছিল—তারই বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দিলেন রঙ্গনাথ! এইটিই হল তাঁর রঙ্গ! কিন্তু এ কেমন করে সম্ভব!

সারাদিন যুবকটি এই ঘটনাগুলো নিয়ে মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে লাগল। তার বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মান মন আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধি দুয়ে কিছুতেই মিল হল না। শুধু সংস্কৃত সাহিত্য তো নয়; যুবকটি বুদ্ধিবাদী পাশ্চাত্য দর্শনের ও যে বড় ভক্ত। তার সেই দর্শনের সঙ্গে আজ সকালের বিগ্রহের জীবন্ত রূপ দর্শন—কিছুতেই সে মেলাতে পারলে না। শেষে সে সন্ধ্যা

খেলাতে রাজকুমার Hamlet এর মতো সিদ্ধান্ত করল—There are more things in Heaven and earth than are dreamt in our philosophy.

• • •

সারাদিন ধরে তার মনের মধ্যে আরও একটা লড়াই চলল। তার অহংকারী আত্মসচেতন মন যে স্ত্রীলোকের রূপে মুগ্ধ হবে, এ কিছুতেই সে সহ্য করতে পারছিল না। অথচ তার অন্তরের মধ্যে আর একটা সত্তা মাথা কুটে মরছিল প্রভাতের সেই মূর্তিমতী উষাকে আবার একবার দেখবার জন্যে। মাঝে মাঝে সে নিজেকে ধিক্কারও দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত কিনা তার মতো একজন উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবি যুবা মজল একজন দাসীর ঘরের মেয়ের রূপে। পরক্ষণেই মনে হল অনেক ব্রাহ্মণ কন্যাতো সে দেখেছে জীবনে, ঐ রকম অদ্ভুত সুন্দরী ঐ রকম অনবদ্য আকর্ষণ শক্তির অধিকারিণী নারী তার চোখে দ্বিতীয় পড়েছে কি? সে এবার মনে মনে অত্যন্ত কঠোর হল। না দাসীর বাড়ী কিছুতেই যাওয়া চলবে না। তার মায়ের কথা মনে পড়ল, ওরা মায়াবিনীর জাত। ওদের পাল্লায় পড়লে আর রক্ষে নেই। তাই সকালে মহিলাটিকে কথা দেওয়া সত্ত্বেও সে তাঁর বাড়ীতে যাবার কথা মন থেকে ঝেড়ে ফেললে।

দাসীদের প্রতি তার চিরকালের ঘৃণা। ছেলেবেলা থেকে সে দেখেছে তার বাবাকে। ঝিরু মঙ্গলম্ এর একজন ছোট খাট সিয়ংদার (জমিদার) তার বাবা। সম্পত্তির যা আয় হয়, ব্যয় করেন তিনি তার থেকেও বেশী। নিত্য বাড়ীতে আহুত, অনাহুত, স্ববাহুতের দল আসে, খায় দায় থাকে চলে যায়। আবার নতুন দল আসে। দীয়তাং ভুজ্যতাং চলে অষ্ট প্রহর। নিত্য বেশ কয়েক 'শ লোকের পাতা পড়ে বাড়ীতে। সদলবল চলে হৈ হৈ। প্রচণ্ড রাশভারী লোক তিনি। ব্যক্তিত্বে ও অকপটের সেরা ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিত্বের সে কিছুটা পেয়েছে তার বাপের কাছ থেকে। এছাড়া আছে পাণ্ডিত্য। সংস্কৃত কাব্য দর্শনে তার বাবার অনুরাগ গভীর। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগও তাঁর একটা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাড়ীতে বড় বড় ওস্তাদ আনিয়ে কাছারী ডাকা তাঁর একটা অনেককালের প্রিয় অভ্যাস। তারপর আছে দান-ধ্যান। গরীব দুঃখীর কষ্ট তিনি নিজের চোখে দেখতে পারেন না। পরের দুঃখ দেখলে ঐ অতবড় রাশ ভারী মানুষটা শিশুর মতো চঞ্চল হয়ে উঠেন। কিভাবে সেই দুঃখ দূর করা যায় তারই চেষ্টা করবেন হাজার উপায়ে। যতক্ষণ না সে দুঃখ দূর হয় ততক্ষণ তাঁর যেন খেয়ে ঘুমিয়ে শান্তি থাকে না। এই ব্যাপারে তিনি মুঠো মুঠো টাকা খরচ করেন। অর্থের ওপর বাবার কোন মোহ নেই, কোন দরদ নেই। ও যেন হাতের ময়লা।

কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় দোষ যে তিনি দাসী অনুরক্ত। সারাদিনের কাজকর্ম, পূজা, আরাধনা, অবগাহন শেষ করে সন্ধ্যা বেলায় তিনি পাতলা ধুতি পরবেন ও তাকক্কজ্ (কাছা কোঁচ) দিয়ে গায়ে মাখবেন চন্দন আর অগুরু। সারা গরীর একখানা দামী অম্বরত্রে (চাদরে) ঢেকে উঠেন গিয়ে তাঁর নিজস্ব গরুর গাড়ীটিতে। গাড়ীটিরও আবার বৈশিষ্ট্য আছে। গাড়ীটা তৈরী করান হয়েছে তাঞ্জোরের এক বিখ্যাত কাঠের মিস্ত্রীকে দিয়ে। তার আকৃতি চুড়ো উঁচু রথের মতো। চারদিক ঢাকা কিন্তু জানলা আছে চারটে চারদিকে, তাতে লাগান দামী পর্দা। সারা গাটা তার বিচিত্র কারুকার্যে ভরা। দেখবার মতো একটি রথ। গাড়োয়ান একজন পাণ্ড্য। সবাই তাকে ডাকে কড়বা (বুড়ো) বলে। তাকে দুবকটি অন্তরাবধি ঐ রকম বুড়োই দেখে আসছে। সে গাড়ীতে বলদ জুড়ে হাঁকিয়ে নিয়ে চলবে। পিছনে পিছনে বাড়ীর একজন চাকর দৌড়বে হাতে রূপোর পানের ডিবা আর তর্জার কৌটা নিয়ে। পানের ডিবা তো নয়

যেন একটা ছোট খাট সিন্দুক। তার মধ্যে আছে নরম দিকে সরু, মিঠে পানের দানা। সেগুলো থাকে নীচেকার খাকে। তার ওপর আর ও একটা খাক। তাতে চৌকো চৌকো সুপারী। তার মধ্যে আছে ঝিঁঝির পাখার মতো পাতলা করে কাটা চাকা চাকা সুপারী। এই সুপারী আর জর্দা আনান মাদ্রাজের এক চেট্টিয়ারের দোকান থেকে। একটা খোপে থাকে গোলাপী রঙের সুবাসিত চুন। তার বাবার পানের বিলাস—এই অঞ্চলে বিখ্যাত। তিনি পান খান দিনে প্রায় ডুশো।

কড়বা গাড়ী নিয়ে যাবে সহরের আর এক প্রান্তে। সেখানে শান্ত নির্জন পরিবেশে সুপারী গাছের ঘেরা সুন্দর একটি বাংলো বাড়ী। তার বাবার গাড়ী সটান গিয়ে ঢুকবে সেই বাড়ীর গেটের ভিতর। বাড়ীটা অবশ্য এখানকার প্রথা অনুযায়ী তৈরী। তার চারদিকে লোহার বড় নীচু ছাদ, নীচু দরজা। কিন্তু বাগানটা দেখবার মতো। সেই বাগানে নেই হেন ফুলের গাছ নেই। যুবক সেখানে বহুবার গিয়েছে ছেলেবেলায় তার বাবার সঙ্গে। সেখানকার সবচেয়ে বড় আকর্ষণের বস্তু ছিল তার কাছে শুভ্র মল্লিকার গাছ। বাগানের একটা অংশ জুড়ে করে আছে প্রায় ডুশেক শ' শুভ্র মল্লিকার গাছ। তাতে ফুলে ফুলে ছয়লাপ। তাদের মিষ্টি গন্ধ সারা এলাকাটা মাতিয়ে রেখেছে। বাবার গাড়ী গিয়ে থামতেই একটি নারী ঘর থেকে বের হয়ে এসে তাঁর হাত ধরে নামিয়ে নিয়ে ভিতরে যাবে। নারীটির মুখশ্রী এমন কিছু উল্লেখ যোগ্য নয়। কিন্তু তনুশ্রী অনবদ্য। সে শুনেছে ভরত নাট্যমে আর কর্ণাটক সঙ্গীতে এ অঞ্চলের একজন বিখ্যাত নারী হলেন কনকাম্মাল। কনকা ছিলেন বাবার রক্ষিতা দাসী। তিনি আর তাঞ্জিলনাদের বহু বিখ্যাত নর্তকী, কুম্ভকোনাম নৃত্যতন্ত্রীর সবচেয়ে সুদক্ষা শিল্পী বরলক্ষ্মী ছিলেন গুরুস্থানীয়া। বাবা নিজে হলেন দক্ষিণের একজন সেরা সঙ্গীতকার। তার হাতে বেহালা জীবন্ত হয়ে উঠত। বিরু মঙ্গলমের সেরা পক বাদ্য(মৃদঙ্গ) বাজিয়ে দণ্ডপানি আর ঘটবাদ্যের ওস্তাদ বাল সু ব্রাহ্মনিয়ম্ ছিলেন তাঁর দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। কড়বা গাড়ী হাঁকিয়ে নিয়ে ওঁদের ও নিয়ে আসত। ওঁরা এলে বসত নাচ কিম্বা গানের আসর। কোনদিন গান গাইত কনকাম্মাল, কোন কোন দিন নর্তকী হয়ে নাচত। বন্ধু দুজন না আসা অবধি বাবা পরিষ্কার ধবধবে পাতা বিছানাতে শরীর এলিয়ে দিতেন। কনকাম্মাল তাঁর চন্দনলিপ্ত গায়ে হাত বুলোতেন পরম যত্নের সঙ্গে। বাবা দু' চোখ বুজিয়ে গভীর আরামে সেই যত্ন টুকু উপভোগ করতেন। যুবকটি ছেলেবেলায় কয়েকবার দেখেছে এ দৃশ্যটা। তার ভাল লাগেনি। ভাল লাগেনি তার মায়ের কথা ভেবে।

বাড়ীতে মায়ের অবস্থা একেবারেই ভিন্ন রকম। মা হলেন বাবার আপন মামাতো বোন, কিন্তু তবু তিনি বাবাকে ভয় করতেন যমের মতো। কেন যে করতেন তা যুবক বুঝতে পারেনি কোন দিন। অল্পভাষী, গম্ভীর, রাশভারী লোক বলে বাবাকে এ অঞ্চলের সবাই অল্পবিস্তর ভয়ের ও শ্রদ্ধার চোখে দেখত। কিন্তু তার মায়ের ভয় ছিল যেন সবার থেকে বেশী। মায়ের অনেকটা খাটো হলেও মা ছিলেন সুন্দরী। কিন্তু বাবার সামনে এলে তিনি যেন কিরকম সেঁতিয়ে যেতেন। বাবার কাছে যেঁষা দূরে থাক, মা সব সময়ে মুখ লুকিয়ে রাখতেন বাবার চোখের আড়ালে। বাবা যখন কখনও কোন কাজে তাকে ডেকে পাঠাতেন তিনি এসে দাঁড়াতেন দরজার পাশে। সামনে আসতে চাইতেন না। একটা প্রশ্ন কয়েক-বার করার পর তিনি জবাব দিতেন প্রায় অস্ফুট স্বরে। দিদি সায়রা বড় হবার পর মায়ের প্রতিনিধিত্ব করত সেইই। মায়ের মনের মধ্যে যেন কি একটা ছিল। তিনি দিবা রাত্র শাপমন্যি করতেন কনকাম্মালকে তাঁর দুর্ভাগ্যের জন্য দোষ দিতেন কনকাম্মালকে। কনকাম্মালকে তিনি প্রকাশ্যে উল্লেখ করতেন বেশ্যা বলে।

অথচ বাবার সঙ্গে কনকের ব্যবহার ছিল যেমন অকুণ্ঠ তেমনি মধুর। কনক বাবার সেবা করত। তাঁর অত্যন্ত কাছে থেকে শিশু বয়সেও সে অবাক হত এই সেবায় মা কেন এতো ভয় করে? কনকাম্মাল তো বাবাকে এতটুকুও ভয় করে না। ছেলেমেয়েরা মায়ের সঙ্গে বেশীর ভাগ থাকত বলে—তাদের বাবার রক্ষিতা কনকাম্মালকে তারাও তাদের মা'য়ের মতো সহ্য করতে পারত না। বাবা তাদের অবশ্য প্রায়ই নিয়ে যেতেন কনকের কাছে। কনকের নিজের ছেলে মেয়ে ছিল না। তিনি আকুল আগ্রহে শিশুদের বুকে তুলে নিতেন।

একদিনকার কথা মনে আছে। কনক দিদি সাবরাকে কোলে তুলে নিতে গিয়েই থমকে গেলেন। সাবরা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। বললে—যাব না তোমার কাছে। মা বলেছে তোমাকে ছুঁতে নেই, তুমি খেব রাড়িয়া (দেবদাসী সম্প্রদায়ের অসম্মান সূচক নাম)।

কনকের চোখে জল এসে গেল। বাবার মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। বাবা তক্ষুনি কড়বাকে বলে সাবরাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিলেন। যুবকটির মনে আছে কনক সেদিন একমাত্র তাকেই বুকে চেপে ধরে কি কান্নাটাই কেঁদেছিল। শিশুকালে তার মনটা সোটানার দুলত। একদিকে কনক আর একদিকে মা। শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেন মা।

বড় হয়ে যখন জ্ঞান হল তখন লেখা পড়ার ভিতর দিয়ে, সমাজ সামাজিকতার ভিতর দিয়ে যুবকটি বুঝল—দাসী সম্প্রদায় হল বারবনিতার সম্প্রদায় যাদের একমাত্র পেশা হল লোকের মনোরঞ্জন করা—নাচে গানে আর প্রয়োজন হলে দেহ দিয়ে। পরে যতো বয়স বাড়তে লাগল ততই দেখতে লাগল—নাচ-গানের ওপর সাধারণ লোকের কোন আসক্তি নেই। তারা চায় দেহ সম্ভোগ। ধনী জমিদার, ব্রাহ্মণ আর পাণ্ডা পুরোহিতদের এই দৈহিক লালসা তৃপ্ত করে এই দাসীসম্প্রদায়। এক আধজন মন্দিরের দেবতাকে আত্মসমর্পণ করে বটে, কিন্তু তাহ'লে কোটিকে গুটিক। তা দিয়ে তো আর সাধারণ দাসীকে বিচার করা যায় না। সাধারণ দাসী হল যে কোন একজন আর যে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির রক্ষিতা—এই-ই তার পরিচয়।

কাজেই দাসী সম্প্রদায়ের প্রতি তার এল একটা ঘৃণার ভাব। সেই ঘৃণার ভাবটা বাড়তে বাড়তে তাদের ওপর একটা প্রচণ্ড বিরুদ্ধ মনোভাবের সৃষ্টি করেছিল যুবার মনে। তাই তার বাবার হাজার গুণ থাকা সত্ত্বেও সে তার বাবাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারত না। তাঁর এই দাসী আসক্তির জন্য। কোন ভদ্রলোক যে দাসীর বাড়ী যাবে এটা সে তার শিক্ষিত মন নিয়ে কিছুতেই সহ্য করতে পারত না।

(ক্রমশঃ)

চলতি দুনিয়া

পৃথিবীর যে সব সুপণ্ডিত পুরাতত্ত্ববিদ মনে করেন মানব সভ্যতার বিকাশ মাত্র পাঁচ হাজার বছরের তাঁরা চমকিত হয়ে উঠেছেন আনাটোলিয়ায় আট হাজার বছরের একটি প্রাচীনতম নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারে। ধ্বংসস্তূপ খননের কালে দেখা গেছে আট হাজার বছর আগের সেই মানব সভ্যতা আরম্ভ হয়েছিল আরও হাজার কতক বছর আগে। যাঁরা মনে করেন প্রস্তর যুগে কোন মানবীয় সভ্যতা ছিল না, তাঁরা যে ভ্রান্ত, এই আধুনিকতম আবিষ্কারই তার প্রমাণ (The excavations have proved that a lively cultaral life existed aready in the settlements of the Stone Age.) পৃথিবীর কোথায় কি যে মাটির নীচে লুকিয়ে আছে তার সন্ধান ক্রমশঃ পাওয়া যাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার ইতিহাসও বদলে যাচ্ছে। এই প্রাচীনতম নগর (The oldest town known to science) এখন সারা দুনিয়ার পুরাতত্ত্ববিদদের কাছে বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—স্বাধা

• • •

আল্পস্ পর্বত শ্রেণীর উপর দিয়ে ঝুলন্ত রেলগাড়ীর (cable railways) বিস্তার বড় কম নয়। অষ্ট্রিয়ার পাহাড় গুলিতেও এই রকম ব্যবস্থা হয়েছে। এতে যাত্রীরা নিরাপদে পাহাড়ের সু-উচ্চ স্থান গুলিতে অনায়াসে যাতায়াত করতে পারে। প্রাকৃতিক দৃশ্য দর্শনের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে পর্যটনও সুগম হয়। তবে ঝুলন্ত রেলগাড়ী যে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর সন্দেহ কি? পাশ্চাত্য দেশে এই ধরনের রেলগাড়ী বছরে প্রায় সাতকোটী যাত্রী বহন করে (carrying some 70 million passengers annually). এসব ঝুলন্ত রেলগাড়ীতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে টিকিট বিক্রয়ের কাজও হয়, বিশেষ কোন হাঙ্গামা নেই, (fares are being collected mechanically). এই বৈজ্ঞানিক যুগে বিজ্ঞান যে মানুষকে কতদিকে সাহায্য করে, এও একটা তার উজ্জ্বল নিদর্শন।

—স্বাধা

• • •

আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে ডিজেল-ইঞ্জিন বা বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন রেলগাড়ীতে সব চেয়ে বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে, কিন্তু সুসভ্য ইংলণ্ডদেশ এখনও বাষ্প চালিত ইঞ্জিনকে ছাড়ে নি। (Britains steam locomotives are still in service). এর কারণ অবশ্য রেলওয়ে কর্তারা ভাল করেই বুঝেছেন। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের বহু দোষ থাকলেও গুণও আছে অনেক। খাস ইংলণ্ডে যদি এখনও ঐ সব ইংলণ্ডে যদি এখনও ঐ সব বাষ্পচালিত পুরানো ইঞ্জিনের কদর থাকে, তবে এর মূলে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে, একথা মানতেই হবে।

—স্বাধা

• • •

আজ কালকার দিনে মা যদি অল্পশিক্ষিতা হন আর মেয়ে যদি আজকালকার উচ্চশিক্ষিতা হয় তা' হলে যে সম্ভাব্য পারিবারিক অশান্তি দেখা দেয় তার জন্য দায়ী কে, এই কথাই এখন ভাবিয়ে তুলেছে সমাজ হিতৈষীদের। মেয়েরা উচ্চশিক্ষিতা হয়ে যদি মায়ের প্রতি অসম্মান দেখায় তবে তাদের সে শিক্ষার মূল্য কি? (daughter's education worths a jot if she has not learnt the basic lesson of respect for her parents) আর তা' ছাড়া মায়েদেরও উচিত মেয়েরা কেন তাঁদের প্রতি অশ্রদ্ধা জানায় তার মূল কারণ খুঁজে বের করা, (should try to find out why she resents her mother) অনেক সময় অল্পশিক্ষিতা মায়ের প্রতি শিক্ষিতা মায়ের আচরণ যে খুবই অপমানজনক হয় (behaves most imsultingly to her mother) তার অনেক দৃষ্টান্ত আধুনিক যুগে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সর্বত্র। মা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে যে সম্মানের অধিকারিণী যদি তাঁকে না দেখানো হয় তা হলে যে কত অন্যায় করা হয় এবং তার ফলে সমাজের যে কত গুরুতর ক্ষতি হতে পারে তা সমাজহিতৈষী মাত্রই জানেন।

—কেয়িনা

• • •

ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা আসে কোথা থেকে এ বিষয় অনেক গবেষণা করে সমাজহিতৈষী ও শিক্ষাব্রতীরা স্থির করেছেন যে ছেলেমেয়েদের প্রথম থেকেই অপরাধের দিকে বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তুলতে পারলে আর ভবিষ্যতে তাদের আইনের কবলে পড়তে হয় না। (Educationalists and sociologists are going new ways in their efforts to prevent young people from coming into conflict with the law.) বর্তমান যুগে নানা অপরাধে মাত্রা যে ভাবে বেড়ে চলেছে তাতে সকলেরই চিন্তিত হবার কথা। কিশোর কিশোরী তরুণ তরুণীদের মধ্যে নৈতিক অপরাধের মাত্রাও কম নয়। শাস্তি দিলে অপরাধের দিকে ঝোঁক বেড়ে যায়, অপরাধের খুঁটিনাটি তথ্য জানতে পেরে তারা যতটা মজা ও আনন্দ পায় ততটা অনুতপ্ত হয় না। এটা আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের অভিমত। সুতরাং অপরাধ নিবারণই আগে দরকার। (Prevention is better than punishment). কিন্তু গোপনে ছেলেমেয়েদের যে সব লীলাখেলায় অপরাধ চলে তার সন্ধান মেলে কে?

—স্বাগা

• • • •

সত্যিই অসুস্থ না হয়ে কেউ যদি কেবলই মনে করেন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন তবে সেটাই হয় বেশী মারাত্মক—আজকালকার ডাক্তারেরা এই কথাই বলে থাকেন। এইরূপ মানসিক অবস্থা থেকে সত্যিই হয়ত একদিন রোগ দেখা দিতে পারে। রোগে আক্রান্ত হয়েছে মনে করে কেউ যদি অনবরত ঔষধ খেয়ে যান তা হলে আসল রোগের চিকিৎসা হল কি? রোগটা হচ্ছে মনের, কিন্তু সেটা ধরা পড়বার আগে বহুদিন ধরে বৃথাই ঔষধ খেয়ে চলে (were often unnecessarily dosed with drugs for prolonged periods before the actual cause of the illness—mental depression—was recognised). নিজেকে আগে থেকেই রোগাক্রান্ত মনে করে রোগী কোন সামাজিক কাজে যোগ দেন না, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেশেন না, এমন কি তাঁর চারপাশে কি ঘটনা ঘটছে তারও খবর রাখতে চান না, (retires from social activities, avoids friends, and

takes little or no interest in what is happening around). আজকালকার চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাই সত্যিকার রোগের চেয়ে রোগীর মানসিক অবস্থাটাই বেশী বিচার্য হয়ে পড়েছে।

—জেমিনা

• • • •

আধুনিক রঙ্গমঞ্চে সেকেলে ধরণের নাটকগুলির অভিনয় দর্শকেরা আর দেখতে চান না। স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক পরিণতি। আজকালকার নাট্যসাহিত্য আর আগের মত আবেগ-উচ্ছ্বাস শব্দঝঙ্কার বহুল হয়ে ওঠে না, মানবচরিত্রের জটিল মনস্তত্ত্ব নিয়েই এখন তার অগ্রগতি। (Modern drama, which bears little resemblance to its original form, has become psychological drama, a form of dramatic art in which the innermost emotions of man's complex soul are revealed.) তবে সেকস্‌পীয়ার রচিত কয়েকটি যুগোত্তর নাটক সম্বন্ধেও একথা অকপটে বলা যায় যে মানবহৃদয়ের চিরন্তনলীলা সেগুলিতে এমনভাবে পরিস্ফুট হয়েছে কালের গতিতে তাকে বেঁধে রাখা যায় না। তবে আজকালকার নাট্যসাহিত্যের গতি যে অন্তর্মুখীন্, তাতে আর সন্দেহ নেই।

—ফালা

• • • •

ছেলেচুরির হিড়িক সব দেশেই আছে, এটা এমন এক জঘন্য অপরাধ, যার শাস্তি সেকাল কোডের কোন ধারাতেই পর্যাপ্ত নয়। মানুষের সামাজিক জীবনে এর চেয়ে ঘৃণ্য অপরাধও আর নেই, এর চেয়ে তীব্র অভিশাপও আর দেখা যায় না। অনেক সময় সুসজ্জিত ভদ্রবেশী দুষ্কৃতেরা এই কাজ করে থাকে। বড় লোকের ছেলে চুরি করে তারা মোটাটাকা আদায়ের ফন্দি করে। অনেক ক্ষেত্রে টাকা পেলেও সাক্ষ্যসাবুদ নষ্ট করবার জন্যে তারা চুরি করা ছেলেকে খুন করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এদের দলে স্ত্রীলোকও আছে, তবে সন্তানবতী নারীকে দিয়ে দুষ্কৃতের দল এসব কাজ বড় একটা করায় না কারণ তারা জানে কোন মা-ই সহজে অপর মায়ের কোল থেকে সন্তান ছিনিয়ে নিতে পারে না। (No mother could do such a terrible thing. She would know how a mother felt.) সর্বদেশের আইন এই সব শয়তানের দলকে ধরবার জন্যে এখন সদা জাগ্রত হয়ে আছে।

—উওম্যান্

• • • •

পাশ্চাত্য দেশে হাসপাতালে যে সব রোগীর আত্মীয় বা বান্ধব তাঁকে দেখতে যান তাঁদের জন্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এক বিশেষ নিয়ম করে দিয়েছেন যে তাঁরা যতক্ষণ রোগীর শয্যাপার্শ্বে থাকবেন ততক্ষণ যেন মৃদুহাস্যে তাঁকে আশ্বস্ত করেন, বেশীকথা না বলেন, আবার স্নেহপূর্ণ ব্যবহার দেখান। (Friends and acquaintances would just be natural smile, stop to talk and show a bit of affection.) এতে রোগীর মনে সান্ত্বনা আসবে আর সেটা তার আরোগ্যের পথ সুগম করবে। তাই হাসপাতালের একমাত্র উপদেশ যেটা রোগী দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় সেটি হ'ল—রোগীদের স্বাস্থ্য লাভে সাহায্য করুন, (Help them to health.)

—উওম্যান্ ওন্

ইংলণ্ডের বেসরকারী স্কুলগুলির নৈতিক অবস্থার এখন এমন পরিবর্তন হয়েছে যে সেগুলিকে ছেলেদের স্বাস্থ্য হানিকর বললেও অত্যুক্তি হয় না, এতে সারাটা দেশেরও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। (Unhealthy for the country and unhealthy for the boys themselves) সেখানকার ছেলেদের বোর্ডিংগুলির অবস্থাও তথৈবচ। দুঃখের বিষয় এ সব গোপনীয় ব্যাপারে কান না দিয়ে অনেক বাপ-মা ছেলেদের সুশিক্ষালাভের জন্যে বোর্ডিংয়ে পাঠান (There are some parents who have to send their children to boarding schools.) এবিষয়ে দেশের লোক সচেতন না হলে নৈতিক অবস্থা আরও খারাপ হতে পারে। (It might even make things worse than they are now.) উচ্চশ্রেণীর ছেলেদের (middle and upper class boys) উপরই বেশি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

—ওভারসীজ্ ডেলি মিরর

• • • •

চিকিৎসা বিজ্ঞানে আজকাল যে সব বিস্ময়কর কৃতিত্ব দেখা যাচ্ছে কিছুদিন আগেও সে সম্বন্ধে লোকে অবিশ্বাসের হাসি হেসে সম্পূর্ণভাবে যাকে গল্প বলে ধরে নিত। কিন্তু বর্তমান যুগে কিছুই আর অবিশ্বাস করা চলেনা! এমন একটা ঘটনা ঘটেছে ইংলণ্ডের এসেক্স প্রদেশের ডাগেনহাম নামক স্থানে। জিন্ রো নাম্নী এক বিবাহিতা মহিলা রেলদুর্ঘটনায় কোমরের নিম্নদেশে এমন আঘাত পান যে অস্ত্রোপচারের সাহায্যে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হয় এবং তাতে তিনি বেঁচে যান বটে কিন্তু নড়বার চড়বার কোন শক্তিই তাঁর থাকে না। চিকিৎসকেরা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, তাঁর সন্তান-সম্ভাবনা আর রইল না। কিন্তু তবুও শ্রীমতী হাল ছাড়েন নাই। সেই অস্ত্রবিজ্ঞানের সাহায্যেই আবার পুত্রমুখ দেখতে পেয়েছেন। এ ব্যাপার নিয়ে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসক মহলে বেশ একটা আলোড়ন হয়েছে।

—সান্‌ডে মিরর্

• • • •

প্রগতিশীল রুশদেশে সিনেমায় যাতে জাতির কোন সামাজিক ছায়াচিত্র দেখানো না হয় তার জন্যে জনসাধারণ খুব সচেতন হয়ে উঠেছে। সে দেশের দর্শকেরা নিম্নশ্রেণীর বাজে ছবি দেখতে একান্ত নারাজ। এ নিয়ে তারা রীতিমত প্রতিবাদ জানিয়েছে। জনসাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর ছবি চায় না, কারণ এগুলি তাদের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করে আর মনে অবসাদ আনে। (The public are condemning a multitude of second-rate films which either exasperate audiences or cast them down into a somnolence, boredom or dejection.) কোন কৌতুকচিত্র যদি দর্শকের কাছে বাজে বলে মনে হয় তারা তখন জোর গলায় চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়—"Not a comedy but a producer's tragedy." এ সম্বন্ধে জনসাধারণ লেখক, সুরশিল্পী ও অভিনেতৃবর্গকে (authors, musicians and artists) অনুরোধ জানিয়েছে। তারা এখন স্বাভাবিক জীবনযাত্রার উন্নততর, উজ্জ্বলতর ও অধিকতর আনন্দদায়ক (better, brighter and more entertaining) ছায়াছবি পাবার দাবী জানাচ্ছে।

—ডেলি মিরর্

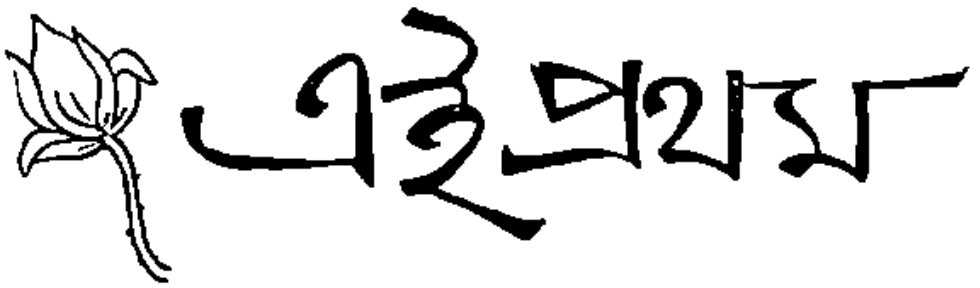

অভিষেক

শ্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

লজ্জা করছে, ভীষণ লজ্জা করছে শেলির। তবু ভাল লাগছে বার বার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের এই শাড়ি পরা নতুন ছবিটা দেখতে। গত বছর পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজিতে অনেক কম নম্বর পেয়েছিল সে। তখন ভীষণ লজ্জা করেছিল তার। আর কেঁদেছিল সারাক্ষণ। কিন্তু আজকের এই লজ্জার সঙ্গে মধুর হাসি বিলিক দিয়ে উঠছে তার চোখে মুখে ঠোঁটের কিনারে। বা কাঁধের উপর দিয়ে আঁচল টেনে এনে বার বার শাড়িটা জড়িয়ে নিচ্ছে গায়ে। একটুখানি গায়ের কাপড় এলোমেলো হয়ে গেলেই সমস্ত শরীরে মনে রোমাঞ্চ জাগছে। মনে হচ্ছে কাল পর্যন্ত ফ্রক পরে কি করে কাটাল সে! তাদের পাশের বাড়ির সন্ধ্যা আজ তিন বছর হল শাড়ি পরছে। শেলিরই সমবয়সী সন্ধ্যা। সন্ধ্যার সঙ্গে একসঙ্গে শাড়ি পরবে বলে বায়না ধরেছিল শেলিও মার কাছে: ম্যামী, আমি শাড়ি পরব এবার থেকে সন্ধ্যা আর ফ্রক পরবে না—ওর বাবা কি সুন্দর দু'খানা শাড়ি কিনে এনেছেন ওর জন্যে!

সতীরাণী নয়, মিসেস রয় কাজল মাখানো চোখ তুলে আর পেন্সিলের সাহায্যে টেনে দেওয়া ভুরু কুঁচকে তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে।

ম্যামীর এই বিশেষ ভঙ্গীটা শেলির খুব পরিচিত। তার কোন বেয়াড়া আব্দার না রাখার শাসন ব্যবস্থা এটা। এই শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত দেখলে মুহূর্তে নিজেকে গুটিয়ে নেয় শেলি। গুটিয়ে নেয় মন আকুলি বিকুলি করা সখের আলখাল্লাকে। কিন্তু সেদিনের মন আকুল করে উপছে ওঠা ঢেউটাকে চট করে থামিয়ে দিতে পারেনি। সন্ধ্যার হাসি ভরা মুখ আর শাড়ি দু'খানা তার মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

তাই ক্ষীণকণ্ঠে একবার চেষ্টা করেছিল শেলি: ম্যামী ……

লিপষ্টিক মাখা ঠোঁট দু'টি এবার মুখর হয়ে উঠেছিল: তুমি দিন দিন বড় অবাধ্য হচ্ছ শেলি। জানো আমি পছন্দ করিনা এসব।

ব্যস্, এই-ই যথেষ্ট। আর ঠোঁট ফাঁক করার সাহস হয়নি শেলির। শেলি তো ছেলেমানুষ। মাত্র ষোল বছর বয়স তার। শেলির বাবা ব্যারিষ্টার সোমনাথ রয় যার দাপটে বাদী-বিবাদী পর্যন্ত এক-পক্ষে হয়ে যায় তারও কি সাহস আছে মিসেস রয়-এর মুখের উপর একটিও কথা বলার? না নেই। অন্তত শেলি দেখেনি একবারও। জ্ঞান হবে অবধি বাড়িতে সর্বত্র দেখছে মার কঠিন শাসন ব্যবস্থা। শেলি কিংবা শেলির বাবার দ্বারা তার এতটুকু নড়চড় হলে মার অসহযোগ আন্দোলন। নড়চড় অবশ্য হয়না, হবার উপায় নেই। সোমনাথ রয় নিবিরোধী মানুষ। বাড়ির কোন কিছু নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন না কোনদিন। মাসান্তে মোটা টাকা স্ত্রীর হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকেন।

শুধু একমাত্র সন্তান শেলি সম্বন্ধে একটুখানি স্নেহের দুর্বলতা আছে তাঁর। যার কাছে আব্দার করে কোন জিনিষ সে যদি না পায় এবং দৈবাৎ সেই ব্যাপারটা তাঁর কর্ণগোচর হয় তাহলে মাঝে মাঝে মিসেস রয়-এর কথার ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করেন তিনি: ছেলেমানুষ বায়না করেছিল দিলেই পারতে……

কথাটা শেষ করতে অবকাশ দেননা মিসেস রয়। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন: দেখ কোর্টে তোমার বিচার চলে বলে বাড়িতেও চলবে বলে মনে কোরনা। যা জানো না তা নিয়ে কথা কইতে এসো না—শেলিকে জানোয়ার করে তুলতে পারব না আমি।

ব্যারিষ্টার রয়-এর ক্ষীণ কণ্ঠ মুহূর্তে ডুবে যায়। ডুবে যায় কোন অতলে। ভেসে ওঠার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না আর। কিন্তু অবাক কাণ্ড ঘটতে দেখল শেলি পিসীমা এ বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

পিসীমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে মার উচ্চকণ্ঠ যেন কোন খাদে নেমে গেল। সবচেয়ে যা আশ্চর্য করল শেলিকে পিঠের উপর পরম অবহেলায় পড়ে থাকা মার শাড়ির আঁচলটা মাথার উপর টেনে দেখে।

কিন্তু শেলির বিস্মিত বিহ্বল মুখখানা ঠোঁট ফাঁক করার আগেই তার উপর মিসেস রয়-এর বিচিত্র ভঙ্গীমার শাসন ব্যবস্থা জারী হয়ে গেল। —ঠোঁট টিপে দাঁড়িয়ে রইল শেলি।

পিসীমা এসে একেবারে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলেন ওঁকে। বললেন: ওমা, আমার শিউলি ফুলটা বুঝি এতবড় হয়ে গেছে! হ্যাঁরে সমু, মেয়ের বিয়ে দিবি তো এবার!

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল শেলি নীচু হয়ে পিসীমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে তার ড্যাডি।

পিসীমার অগোচরে ড্যাডির কাছে মামী বলছে শুনতে পেল শেলি: দেখ তুমি যদি প্রতিবাদ না করো তো বাধ্য হয়ে আমাকেই দিদির মুখের উপর কথা বলতে হবে। একফোঁটা মেয়ে শেলি, তার বিনা বিয়ের ঠিক করছেন উনি! কিছুতেই আমি এ হতে দেব না—মনে থাকে যেন ওর নয় শেলি আমার মেয়ে। কি, কথা বলছ না যে?

হাসলেন সোমনাথ রয়। হাইকোর্টের দক্ষ ব্যারিষ্টার। বললেন: কি শুনতে চাও বলো।

বিচিত্র ভঙ্গীমাতে বাঁ হাত কোমরে দিয়ে ডান হাত টেবিলের উপর রেখে রণং দেহি মূর্তিতে দাঁড়ালেন মিসেস রয়। দু'চোখে আগুন জ্বেলে বললেন: দেখ ভাকা সাজতে চেও না—আমি শুনতে চাই তুমি তোমার দিদির কথার প্রতিবাদ করবে না আমার উপর ভার ছেড়ে দেবে!

আবারও হাসলেন সোমনাথ রয়। শান্ত কণ্ঠে বললেন: জানো তো সেকেলে লোকেরা একটু বেশী কথা কইতে আলোচনা করতে ভালবাসে। কিন্তু একালের লোকেরা ঠিক তার বিপরীত চরিত্র। তারা কথা বলে কম কিন্তু কাজ করে বেশী। সুতরাং দিদি মুখে যাই বলুন না কাজে তোমার সঙ্গে পেরে উঠবেন না।

তখনকার মত চুপ করে গেলেও সোমনাথ রয়-এর কথায় নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না মিসেস রয়। ক'দিন মাত্র বাড়িতে পদার্পণ করেই পিসীমা যে ভাবে শেলিকে গ্রাস করেছেন তাতে প্রতি মুহূর্তে মিসেস রয়-এর আশংকা হচ্ছে যে অচিরেই শেলি শিউলিতে পরিণত হয়ে যাবে। তের বছরের অক্লান্ত চেষ্টার

সেদিকে গড়ে তুলেছেন তিনি। এ কৃতিত্ব একা তাঁরই। সোমনাথ রয়-এর সমর্থন কিংবা সহযোগিতা কিছুই পাননি এ কাজে। বরং প্রথম প্রথম কিছু বিরোধিতাই করেছেন সোমনাথ রয়। দিদির দেওয়া শিউলি নামটাকে বর্জন করতে চাননি সহজে। অনেক কাঠখড় সেজন্য পোড়াতে হয়েছে মিসেস রয়কে।

বিয়ের বছরেই বিধবা হয়ে যারো বছরের মেয়ে বাপের বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। বিধবা মেয়েকে রাণীর আদরে বাড়িতে রেখেছিলেন সোমনাথ রয়-এর বাবা। মেয়ের সামান্য কথাও বাড়ির সকলের কাছে ছিল হুকুমের সামিল। পিতা তার একচুলও নড়চড় হতে দিতেন না। একটি মাত্র সন্তান, সে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে চিরতরে স্থান পেয়েছিল। পিতামাতার দুঃখের আর সীমা পরিসীমা ছিলনা সেজন্যে। সোমনাথ-এর জন্ম হয়েছিল অনেক পরে।

জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথও দিদির স্নেহ শাসনেই অভ্যস্ত হয়ে বড় হয়ে উঠেছেন। দিদি যেটা বারণ করেন সেটা খারাপ আর দিদি যেটা পছন্দ করেন সেটাই ভাল বলে মেনে নিতে শিখেছিলেন। কোনদিন কোন প্রতিবাদের কথা মনের অবচেতন কোণেও উঁকি দেয় নি। পিতামাতার মৃত্যুর পরেও কোন পরিবর্তন হয়নি। দিদি যেমন বাড়ির সর্বময়ী ছিলেন তেমনিই রেখেছিলেন সোমনাথ রয়। নিজের বিয়ের ব্যাপারেও দিদির মতেই মত দিয়েছিলেন।

কিন্তু সতীরাণী সইতে পারলেন না। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করবার মত সৎসাহস না হলেও কাজে-কর্মে বিপরীত আচরণ করতে লাগলেন। শঙ্কিত হলেন সোমনাথ রয়। বাড়ির বাইরে তিনি সুদক্ষ ব্যারিষ্টার। সারা হাইকোর্ট জুড়ে নাম ডাক তাঁর। কিন্তু বাড়ির ভেতরে কোনদিন নিজের ব্যক্তিত্বকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেননি। দিদির প্রখর ব্যক্তিত্ব তাঁকে আড়াল করে রেখেছিল। এজন্যে সোমনাথের কোন ক্ষোভ ছিল না। তিনি জানতেন তাঁর উপর দিদির যে স্নেহ তার মাঝে কৃত্রিমতার তেজাল নেই কণামাত্রও।

কিন্তু সতীরাণী নিজের উগ্র ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দিদির কবল থেকে সোমনাথকে একটু একটু করে সরিয়ে আনলেন।

কন্যাসমা ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে সোমনাথের দিদি কোন কলহ করলেন না। কোর্ট থেকে ফিরে জলযোগ সেরে রোজকার মতই সকালের চোখ বুলিয়ে যাওয়া খবরের কাগজখানা মনোযোগ দিয়ে পড়তে সুরু করেছিলেন সোমনাথ রয়। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন দিদি। বললেন: সনু, কৈলাসবাবুর মা আর স্ত্রী কাশী যাচ্ছেন, ওই সঙ্গে আমিও তীর্থ করতে যাই কি বল!

পাড়ার কৈলাসবাবু মারা গেছেন। মাত্র দু'মাস গত হয়েছে। উপযুক্ত রোজগেরে পাঁচছেলে রেখে গিয়েছেন ভদ্রলোক। একটিমাত্র মেয়ের বিয়েও হয়ে গেছে অনেকদিন। তবে ভদ্রলোকের অপরাধ যে বৃদ্ধা জননী আর প্রৌঢ়া স্ত্রীকে রেখে গেছেন ছেলেদের সংসারে। তাই ষোলবয় কৈলাসবাবুর সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যেই তাঁদের কাশী যাওয়া। দিদির মুখের দিকে তাকাতে পারলেন না সোমনাথ রয়। তাঁর তিন বছরের ফুটফুটে ছোট্ট মেয়েটি যে দিদির কত প্রিয় তা তাঁর অজানা ছিল না। আদর করে দিদিই নাম রেখেছেন শিউলি। তাঁকে ছেড়ে শিউলিকে ছেড়ে দিদির চলে যাওয়া যে কত গভীর বেদনার সে কথা সোমনাথের অজানা নয়। তাই কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললেন: শিউলিকে ছেড়ে থাকতে পারবে দিদি? হাসলেন সোমনাথ রয়-এর দিদি। বললেন কত বয়স হল আমার হিসেব আছে কিছু! তোর চেয়ে পনের বছরের বড়। তোর যদি চল্লিশ হয়তো আমার পঞ্চান্ন। ক'

বছরই বা বাঁচব আর, তীর্থধর্ম করব কবে ? তুই আর অমত করিসনি সমু, আমার যাবার ব্যবস্থা করে দে ভাই !

সোমনাথ জানতেন দিদি যখন একবার মুখ ফুটে কাশী যাবার কথা উচ্চারণ করেছেন তার নড়চড় হবে না আর। জ্ঞান হতে তিনি দেখে আসছেন দিদির কথা অপরের কাছে আদেশ আর নিজের কাছে স্থির সিদ্ধান্ত। সুতরাং তার পরিবর্তন হলনা। কাশীবাসী হলেন সোমনাথ রায়-এর দিদি।

এই সুদীর্ঘ তের বছরে দিদির অভাব সহ্য হয়ে গেছে সোমনাথ রায়-এর। প্রথম প্রথম বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগত। কারণে অকারণে কেউ সমু বলে হঠাৎ ডেকে উঠত না। বহুদিনের অভ্যাসমত একাদশী পূর্ণিমাতে কল মিষ্টি নিয়ে বাড়ি ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত পায়ে উঠতে গিয়ে মনে পড়ে যেত দিদি নেই বাড়িতে। বড় খারাপ লাগত। নিস্তব্ধ রাতে নিদ্রিত শয্যায় শুয়ে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়ে ফেলতেন। তের বছর ধরে কালের প্রলেপে একটু একটু করে সব সহ্য হয়ে গেল। নতুন জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। শিউলি শেলিতে পরিণত হয়ে গেল।

শান্তিময় না হলেও নিরবিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করছিলেন সোমনাথ রায়। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টে বুঝি শান্তি লেখেননি বিধাতা। তের বছর পরে এখানে হঠাৎ দিদির উপস্থিতিতে এই কথাই মনে হচ্ছে সোমনাথের।

মার একান্ত আপত্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিসীমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ফিরতে লাগল শেলি। পিসীমার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে ঢোকবার সময় তিনি বলেন : আমায় শিউলি মা, জুতোটা খুলে ঘরে আয় কেমন ? অনভ্যস্ত খালি পায়ে শেলির চলাফেরা করতে অসুবিধা দেখে পিসীমা আদর করে বলেন : খুব আদাতনে পড়েছিস্ আমার জন্যে কি বল !

সবেগে মাথা নাড়ে শেলি : না গো—খালি পায়ে থাকতে আমার ভালই লাগে। মা বকে যে। জানো পিসীমা বলেই নেয়ে যায়। মনে পড়ে যায় মা বলেছেন আপনি বলে কথা বলতে পিসীমার সঙ্গে। তাই একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে আবার সুরু করে শেলি : জানেন পিসীমা…

বাধা দেন পিসীমা :

না জানেন না, জানো না বললে আমি একজনের সঙ্গে কথাই বলব না—।

দু'হাতে পিসীমাকে জড়িয়ে ধরে শেলি : না লক্ষ্মীসোনা পিসীমা রাগ কোরনা। জানো কাল আমার জন্মদিন। ২৫শে মতেম্বর আমি জন্মেছি।

শেলির গায়ে মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে পিসীমা বলেন : তোদের মত ইংরিজি তারিখের হিসেব আমি রাখিনি মা। আমার হিসেবে তোর জন্মদিন পরশু ৭ই অঘ্রাণ।

কৌতুহলে শেলির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বলে : আমার জন্মদিনের কথা তোমার মনে আছে পিসীমা ?

আদর করে পিসীমা বলেন : পাগলী মেয়ে, মনে থাকবে না—আমার হাতেই তো জন্মালি তুই। আমার কাছ থেকে জন্মদিনে কি নিবি বল ! আমার ইচ্ছে একখানা টুকটুকে লালপাড়ী দি, কিরে শাড়ি তোর পছন্দ তো শিউলি ?

জন্মদিনে পিসীমার দেওয়া সেই শাড়িখানা নিয়েই নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করেছিল শেলি। আস্ত একখানা শাড়ি নিজের করে কাছে পেয়ে আনন্দে আকুল দিশাহারা হয়ে পড়েছিল সে। প্রথমে দু'হাত দিয়ে শাড়িখানা বুকে জড়িয়ে ধরেছিল। ঠোঁটে, গালে ঘসেছিল বার বার।

তারপর আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই প্রথম নিজের ঝকঝকে মূর্তিটা দেখে লজ্জা হয়েছিল তার। তাড়াতাড়ি শাড়িটা খুলে নিয়ে পরতে সুরু করেছিল। বাঁ কাঁধের উপর দিয়ে

আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে ডান হাত দিয়ে ধরেছিল। আয়নায় ফুটে ওঠা নিজের শাড়িপরা ছবিটার পানে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল শেলি। কত বড় হয়ে গেছে সে। ছিঃ ছিঃ কি করে এতদিন ফ্রক পরে রইল। মনে হচ্ছে আর কোনদিন ফ্রক পরতে পারবে না।

অনেক ক্ষণ পরে দরজা খুলে শেলি বাইরে বেরোতেই বেয়ারা বললে: মিসি বাবা, সাহেব আপনাকে ডাকছেন এখুনি। দু'জন নতুন সাহেব এসেছেন।

বিব্রত হয়ে পড়ল শেলি। শাড়িপরা অবস্থায় প্রথমে পিসীমার কাছে যাবে মনে করেছিল। এখন কি করবে সহসা বুঝে উঠতে পারল না। শাড়ি ছেড়ে ফ্রক পরে এখন সে যেতে পারবে না কিছুতেই। অথচ না গেলে ড্যাডি দুঃখ পাবেন। অপমানিত হবেন নতুন অতিথির সামনে। মায়ীর কথার অবাধ্য হবার মত সাহস না থাকলেও যদি কোনদিন কোন কারণে অবাধ্য হতে হয় তাহলে কোন দুঃখ হয়না তার। কিন্তু তার ষোল বছরের জীবনে ড্যাডিকে কোনদিনও তার উপর এতটুকুও রাগ করতে দেখেনি। তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে কখনও বাধ্য করেন না তিনি। তার অনিচ্ছা বুঝলে নিজে থেকেই বলেন: তোর যখন ইচ্ছে নেই তখন এটা করবার দরকার নেই মা। তাই ড্যাডির কথায় অবাধ্য হতে হলে বড় দুঃখ হয় তার। হয়তো না, নিশ্চয়ই রাগ করবেন না। তবু আজ এই এলোমেলো ভাবে শাড়ি পরেই বাইরের লোকের সামনে যাবে সে। যা হবার হোক। অভ্যাসের ফ্রকপরা শেলির মত ছুটে যেতে পারল না শেলি। একপা একপা করে কুণ্ঠিত পায়ে এসে দাঁড়াল সোমনাথ রয়-এর চেয়ারের পেছনে।

চোখে না দেখলেও সোমনাথ মেয়ের উপস্থিতি অনুভব করলেন। ঘাড় ফিরিয়ে কন্যার নতুন সাজ দেখে এক লহমা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হাত ধরে সামনে টেনে আনলেন তাকে। সামনের চেয়ারে বসে থাকা ভদ্রলোক দুজনের দিকে তাকিয়ে বললেন: এই আমার মেয়ে শিউলি। ডাকি শেলি বলে।

শেলির মুখের পানে তাকিয়ে আবার বললেন সোমনাথ: এই দেখ্, সেই যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু অবিনাশ এর কথা বলেছিলাম তোকে—আমার মাথার গাটা মেরে ফুলিয়ে আলু করে দিয়েছিল এ হচ্ছে সেই ডাক্তার অবিনাশ চৌধুরী।

আর উনি হচ্ছেন আমাদের অবিনাশের একটি মাত্র ছেলে এবছর ডাক্তারী পাশ করেছেন ডাঃ অতনু চৌধুরী। অবিনাশের পাশে বসা সুন্দর যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন সোমনাথ।

নিজের শাড়িপরা দেহটা নিয়ে এত বিব্রত লজ্জিত হয়েছিল শেলি যে কোনদিকে তাকাতে পারছিল না। অবিনাশ চৌধুরীই দু'হাত বাড়িয়েহাসিমুখে ডাকলেন: এসো তোমা, আমার কাছে। তোমার বাবা আমার যা পরিচয় দিলেন তারপর বোধ হয় আমার কাছে আসতে ভরসা হচ্ছে না কেমন?

সস্নেহে সাহসে মেয়েকে অবিনাশের দিকে ঠেলে দিলেন সোমনাথ: যাও শেলি, প্রণাম কর কাকাবাবুকে!

কাছে এসে শেলি পায়ের কাছে নীচু হবার আগেই দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরলেন অবিনাশ চৌধুরী। বললেন: কাকাবাবু বলতে আমি কিন্তু শুনব না সোমনাথ—আমাকে বাবা বলতে হবে। এই লক্ষ্মী ঠাকরুণটিকে আমি প্রাণধরে পরের হাতে দিতে পারব না, আগে থাকতে বলে রাখছি কিন্তু!

চকিতে অবিনাশের পাশের চেয়ারে বসে থাকা মানুষটার মুখের উপর দৃষ্টি পড়ে গেল শেলির। মুগ্ধ মধুর দুটি সুন্দর চোখের উজ্জ্বল আলোতে মুহূর্তে নতুন এক সাম্রাজ্যের সিংহাসনে অভিষেক হয়ে গেল তার।

দেশ-বিদেশ

আমেরিকার মেয়েদের জীবন

মার্কিন নারীজাতির কাছে জীবনের উদ্দেশ্য এখন আর অস্পষ্ট নেই। জীবনের অর্থ নিয়ে পুরুষেরা মাথা ঘামাতে পারে, কিন্তু আমেরিকার মেয়েরা জানে তাদের ব্রত স্বামীর সুখে দুঃখে সহায় হওয়া, তারা আরও জানে মাতৃত্বের মধ্যেই নারীজাতির চরম সার্থকতা। মা ও স্ত্রীরূপে নিজেদের দায়িত্ব যে কতখানি সে সম্পর্কে আমেরিকার মেয়েরা খুবই সচেতন। তাই সহধর্মিণীরূপে নিজেকে কল্পনা করতে আমেরিকার মেয়েরা গর্ববোধ করে।

আমেরিকার অধিকাংশ নারীর জীবন পর্যালোচনা করলে এ পরিচয় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গৃহকর্ত্রীরূপে গৃহস্থালীর কাজকর্ম পরিচালনার মধ্যেই আমেরিকার নারীজাতি জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে। পতি পুত্র পরিবার পরিবৃত হয়ে পরম পরিতৃপ্তির জীবনই তার একান্ত কাম্য। সমস্যা যে তার জীবনে নেই এমন নয়, কিন্তু সমস্যার ওপর সে গুরুত্ব দেয় না, সমস্যাকে এড়িয়ে থাকতেই চায়।

আমেরিকার গৃহকর্ত্রীরা খুবই পরিশ্রমী। অলস জীবন যাপন করাকে তারা অপরাধ বলে মনে করে। বিবাহিতা মেয়েরা চাকরি করা পছন্দ করে না। তারা নিজের নিজের সংসার নিয়েই সুখী। অথচ সংসারের চৌহদ্দির মধ্যে থেকেও তারা নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন বলেই মনে করে, এমন কি কুমারী জীবনে চাকরি করেও যে স্বাধীনতা তাদের ছিল, বিবাহিতা জীবনের স্বাধীনতা তার চেয়েও বেশি বলে তারা মনে করে।

সংসারকে রমণীয় করে তুলতে তাদের যত্নের আর ত্রুটি নেই। চাকর-বাকর প্রায় কারুরই নেই। নিজের হাতেই তাদের সবকিছু করতে হয়। অথচ সংসারের দৈনন্দিন কাজগুলি সেরেও তারা অনেকখানি সময় দেয় ঘরের বাইরের অন্য নানাবিধ কাজে। যেমন, তারা ক্লাবে যায়, বেসবল খেলা দেখতেও হাজির থাকে, ছেলেমেয়েদের পৌঁছে দেয় নাচ-গানের স্কুলে, সামাজিক অনুষ্ঠানে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, স্কুলে অভিভাবক-শিক্ষক আলোচনা সভায় যোগ দেয়, গির্জায় গিয়ে উপাসনা করে।

ঘর-সংসারের প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে মার্কিন মেয়েদের বেশির ভাগই শনি-রবিবার বাদে অন্যান্য দিন সকালে কয়েক ঘণ্টা কাটায় ঘর-দুয়ার পরিষ্কার ক'রে, কেউ বা কাপড় কাচে, আবার কেউ বাসন-পত্র ধোওয়া-মোছা করে। এছাড়া ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা তো আছেই।

বিকেলের দিকেও প্রায় অনুরূপ কাজেরই পুনরাবৃত্তি—ঘর-দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা কাপড়-চোপড় কাচাকাচি করা, ছেলেমেয়েদের পরিচর্যা সবই আছে। বাসন-কোসন ধোওয়া মোছার কাজটি বেশির ভাগ মার্কিন মেয়ে বিকেলের দিকেই করে থাকে। এছাড়া বিকেলের দিকে আবার অতিথি-অভ্যাগত, বন্ধু-পরিজনদের আসা-যাওয়া থাকে। এদের সঙ্গে গল্প গুজবে বিকেল ও সন্ধ্যার কিছুটা সময় কেটে যায়।

আমেরিকার গৃহকর্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে বাড়ীর বাইরে যে না আসে তা নয়, কিন্তু তারা সাধারণতঃ সন্ধ্যাটা পরিবারের অন্য সকলের সঙ্গে বসে কাটাতে চায়।

স্বামী, সন্তান, সংসার এই নিয়েই মার্কিন রমণীরা সন্তুষ্ট। তাদের যা কিছু আনন্দ-সুখ, দুঃখ-বেদনা, চিন্তা-উদ্বেগ, পরিকল্পনা সবই এদেরকে ঘিরে। বিশ্বের জীবনযাত্রায় মার্কিন নারীর দান কতখানি তা নিয়ে তাদের মাথাব্যথা নেই, আমেরিকার জীবন প্রবাহে তাদের দান যদি স্বীকৃত হয়ে থাকে সেইখানেই তাদের জীবন সার্থক হয়েছে বলে তারা মনে করে।

রাজনীতি চর্চা আমেরিকার মেয়েদের কাছে একটা বিলাসিতার মত। এদিকে সময় দিতে তারা চায় না। রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেই তারা চায়। শতকরা ১০ জন মহিলা সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে। শতকরা ৬ জন রাষ্ট্রনৈতিক পদের চাকুরিতে অধিষ্ঠিত হতে ইচ্ছুক।

আমেরিকার মেয়েদের শতকরা ৮৬ জন সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক তাদের ছেলেমেয়েদের বেসরকারী স্কুলে পাঠায়।

শতকরা প্রায় ৭০ জন মার্কিন মহিলার বিভিন্ন প্রকার শখ আছে। সেলাইবোনা, বই পড়া ও বাগানের কাজ অধিকাংশেরই শখ।

মার্কিন মেয়েরা প্রায় সকলেই সংবাদপত্র পাঠ করে। তারা শুধু যে মেয়েদের পাতাগুলিই পড়ে তা নয়, বিশ্বসংবাদও তাদের পাঠ্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। শতকরা প্রায় আশী জন মহিলা সাময়িক পত্রিকাদি নিয়মিত পড়ে থাকে। এছাড়া তারা বইপত্র তো পড়েই।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও যৌনব্যাধি নিবারণে আমেরিকার মেয়েরা এসেছে। কারখানা প্রভৃতিতে শিশুশ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করার জন্য এবং মেয়ে শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা হ্রাস করার জন্য তারা সংগ্রাম করেছে। দেশের সকল মানুষ যাতে টাটকা খাবার ও খাঁটি ওষুধ পায় সে জন্য তারা আন্দোলন চালিয়েছে।

মার্কিন নারী সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আমেরিকার নারীরা জনসাধারণের প্রয়োজন সম্পর্কে সরকারকে যথেষ্ট সচেতন করে তুলেছে এবং দুর্নীতির বিরোধিতায় সরকারকে তৎপর করেছে।

কমনওয়েলথ কলা উৎসব

মিঃ ইয়ান হাণ্টার ডাইরেক্টর জেনারেল হিসাবে ১৯৬৫ সালের কমনওয়েলথ কলা উৎসবের প্রধান সংগঠক হয়েছেন, তিনি একণে ভারত সফরে এসে নয়াদিল্লিতে অবস্থান করছেন, তিনি ২০ শে ডিসেম্বর প্রত্যাবর্তন করবেন।

দিল্লিতে অবস্থান কালে মিঃ হাণ্টার টুরিজম বিভাগের উৎসাহে লাল কেল্লার বিভিন্ন অংশ আলোকিত করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীত পরিবেশন ও ঐতিহাসিক কাহিনী সম্পর্কে ধারা বিবরণীর ব্যবস্থা করে টুরিষ্ট চিত্ত আকৃষ্ট করার পরিকল্পনা প্রস্তুত করবেন। তিনি এই বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ বলে ব্রিটেনে খ্যাত।

মিঃ হাণ্টার অতীতে এডিনবরা উৎসব এবং সিটি অব লণ্ডন উৎসব পরিচালনা করেছেন। তিনি ফেব্রুয়ারী মাসে কমনওয়েলথ শিল্প উৎসব সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনার জন্য ভারতে প্রত্যাবর্তন করবেন। নয়া দিল্লিতে ইতিমধ্যে তিনি এই বিষয়ে সঙ্গীত নাটক আকাদমির সেক্রেটারি ডাঃ নারায়ণ মেনন ও শিক্ষা মন্ত্রী মিঃ এম. সি. চাগলার সহিত আলোচনা করেছেন। তাঁহারা সকলেই

এই উৎসব পরিকল্পনায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং সকলেই ভারতীয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

১৯৬২ সালেও মিঃ হাণ্টার একবার দিল্লি পরিদর্শনে আসেন, এবং উৎসব সম্পর্কে অধ্যাপক হুমায়ুন কবির ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সহিত আলোচনা করেন।

মিঃ হাণ্টার পরবর্তী বৎসর পাকিস্তান, সিংহল, মালয়েশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় কতিপয় দ্বীপ পরিদর্শন করবেন।

১৯৬৫ সালের এই উৎসবটি যুগপৎ লণ্ডন, কার্ডিফ, গ্লাসগো এবং লিভারপুলে ১৬ই সেপ্টেম্বর হইতে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

মেদারল্যাণ্ডের গণ সংযোগ মাধ্যম

বেতার এবং টেলিভিশনের মতো দুটি গণ সংযোগের মাধ্যম, নেদারল্যাণ্ডে যে রকমভাবে পরিচালিত হয়, বিশ্বের আর কোন দেশে তেমনভাবে হয় না। সরকার বা বেতার ও টেলিভিশন শিল্প এগুলি নিয়ন্ত্রণ করেন না। পাঁচটি সমিতি এগুলি পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেকটি সমিতির এই সম্পর্কে নিজস্ব পরিচালনা বোর্ড, আইন কানুন ও সদস্যবৃন্দ রয়েছে। এঁরা শ্রোতা ও দর্শকদের জন্য দুটি বেতার অনুষ্ঠান এবং একটি টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার করেন।

১৯২০ সাল থেকে যখন বেতার প্রচার সুরু হয় তখন থেকেই এই রকম ব্যবস্থা চলে আসছে এবং তাতেও এর উন্নতি কোন রকম ভাবে ব্যাহত হয় নি। একটি রোমান ক্যাথলিক, একটি সমাজতন্ত্রী সমিতি, দুটি প্রটেষ্টাণ্ট সমিতি এবং আর একটি সাধারণ রেডিও ব্রডকাষ্টিং সমিতি এই পাঁচটি বড় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ দেশের পাঁচটি প্রধান ও আদর্শ বেতার ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়।

এই পাঁচটি বড় বড় সমিতি বেতার প্রচারের সময়গুলি পূর্ণ রাখে এবং গত ১২ বছর যাবৎ এরাই টেলিভিশন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করছে। সরকার বেতার ও টেলিভিশন প্রচারের অনুমতি দেন, বেতার ও টেলিভিশনের লাইসেন্স দেন, প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিকে তাঁদের সংক্ষিপ্ত বেতার প্রচারের সময় বণ্টন করেন।

সদস্যগণের এবং শুভানুধ্যায়ীগণের চাঁদা ও দানে এবং এঁদের দ্বারা প্রকাশিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান পত্রিকাগুলির আয়ে এই সমিতিগুলির ব্যয় নির্বাহ হয়।

বেতারে বিজ্ঞাপন প্রচার করা নিষিদ্ধ।

এই অপূর্ব ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিশেষ করে সাম্প্রতিক কালে নানা রকম সমালোচনা করা হচ্ছে। কেউ অভিযোগ করেন, আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি সব যথোচিত ভাবে প্রচার করা হয় না। অন্যান্য আদর্শগুলি প্রচার করার জন্যও সময় দেওয়া হোক। অন্যরা বলেন, 'এতোগুলি ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানের পেছনে কেন এতোগুলি টাকার অপচয় করা হচ্ছে? একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাতে সকলের প্রতিনিধি নেওয়া হোক।' আর এক দল বলেন, 'বেতারের বিজ্ঞাপন প্রচারেরও ব্যবস্থা করা হোক। কারণ, একমাত্র টেলিভিশনেই এতো বেশী টাকা খাটাতে হয় যে, বেতার প্রচার সমিতিগুলি হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই টাকা জোগাতে পারবে না।' বর্তমান বছরে বেতারে বিজ্ঞাপন প্রচার করার ব্যবস্থা প্রায়

গ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু রোমান ক্যাথলিক, সমাজতন্ত্রী এবং প্রটেষ্ট্যাণ্ট সমিতিগুলি এতো বেশী শক্তিশালী যে তাঁরা এই ব্যবস্থা বানচাল করে দেয়।

কাজেই বর্তমান বেতার প্রচার ব্যবস্থাই আপাততঃ চালু থাকবে। এই ব্যবস্থা ভবিষ্যতেও চলবে কিনা অথবা নতুন একটা প্রচারের মাধ্যমের জন্য শিল্প জগৎ যে রকম ভাবে চেষ্টা করছে তারাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে কিনা তা ভবিষ্যতই বলতে পারে। শিল্পগুলি ইতিমধ্যেই অন্য একটা ব্যবস্থা করে ফেলেছে। গত কয়েক বছর যাবৎ তাঁরা নেদারল্যাণ্ডের উপকূল এলাকার বাইরে একটি জাহাজ থেকে, যারা গানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসামূলক বিজ্ঞাপন, সারা দিন ধরে প্রচার করেন। 'রেডিও ভেরোনিকা' নামে পরিচিত এই ব্যবসাভিত্তিক ট্রান্সমিটারটি প্রকৃতপক্ষে নেদারল্যাণ্ডে প্রচলিত আইনের আওতার বাইরে থেকে কাজ করছে এবং সরকারের নানা রকম ভীতি প্রদর্শনের বাইরে থেকে বেশ একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

বিখ্যাত ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্ণার্ড যে শুধু অভিনয় করতেই ভালবাসতেন তা নয়, গানেও তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল।

থিয়েটারে যোগ দেবার আগে একবার প্যারীর রাস্তায় খুব ভোরে তাঁকে তুষার পাতের মধ্য দিয়েই ইকোল্ টাওয়ারের দিকে যেতে হয়। যে রাস্তায় তাঁকে যেতে হচ্ছিল, সেখানে রাস্তা মেরামতের জন্যে গাড়ী চলতে পারে না।

অল্প বয়স তখন তাঁর। দারুণ শীত। মোটা কাপ্ড় কোট গায়ে দিয়েও সারা বার্ণার্ডের শীত ছাড়ছিল না। তখন তিনি দ্রুতপায় চলতে চলতে আরম্ভ করলেন একখানি গান—'ভুলনা আমাকে কুয়াসা ও তুষারপাতের মধ্যে'—(Forget me not in mist and snow).

সে সুর শুনতে পেলেন প্যারীর আর্ট থিয়েটারের জন্ বোর।

তখনি দরজা খুলে সারা বার্ণার্ডের সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি, বল্লেন,—এস আমার সঙ্গে,—আপত্তি না থাকলে মোটা টাকার গানের চুক্তিটা করে ফেলে এখনি।

সারা বার্ণার্ড প্রথম যৌবনের সে চুক্তিটা কখনও ভোলেন নি।

চমক

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আর্জেন্টিনা জাহাজে যাচ্ছিলেন এক বিয়াট্ সাংস্কৃতিক দল মেলবর্ন্ থেকে, লণ্ডনের মে ফেয়ারে যোগ দিতে। তার মধ্যে অনেক সপরিবার নেতাও ছিলেন। সেই জাহাজে ছিল বহুমূল্যবান রাষ্ট্রীয় দলিলপত্র।

বৃহস্পতি সাগর পার হয়ে ফিয়েস্টার যোজকের মধ্য দিয়ে জাহাজ যখন বিস্তৃত উপসাগরে পড়েছে তখন একটা প্রবল ঝড়ের আশঙ্কায় জাহাজের ক্যাপ্টেন বিচলিত হয়ে পড়লেন।

একে উপসাগরের চির চঞ্চল উদ্দাম ঢেউগুলির বিশেষ দুর্নাম আছে তার উপরে ঝটিকা প্রবাহের আশঙ্কা!

এবার ঝটিকার তাণ্ডব নৃত্য সুরু হল। জাহাজের যাত্রীদের তখন মানসিক অবস্থা শোচনীয়। তাঁরা ভয় বিহ্বল হয়ে বার বার জাহাজের ক্যাপ্টেনকে আবহাওয়ার অবস্থা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

জাহাজের ক্যাপ্টেন শুধু জানালেন, অবস্থা যে রকম তাতে ঈশ্বরকে স্মরণ করা ছাড়া আর কোন পথ নাই। তিনি রক্ষা করলে জাহাজ এ দারুণ সঙ্কট থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারে, নইলে সলিল সমাধি অবশ্যম্ভাবী।

সমুদ্র যেন মেতে উঠল প্রলয় তাণ্ডবে। জাহাজের পাল গেল ছিঁড়ে, মোচার খোলার মত জাহাজ ভাসতে লাগল উত্তাল তরঙ্গে কখনও কাত হয়ে, কখনও সোজা হয়ে, কখন নাগর দোলার মত দুলে দুলে।

যাত্রীদের মধ্যে কান্নাকাটি, হাহাকার পড়ে গেল। এ নিদারুণ অবস্থায় লাইফ্-বোট নামানো আরও বিপদ-জনক। আপার ডেক্ ও লোয়ার ডেক্ ভরে গেল আতঙ্কে কম্পমান যাত্রীদলে। স্ত্রীলোক ও শিশুরা কান্নাই জুড়ে দিলে।

একটু পরে ঝড় কিছু থামল বটে, কিন্তু সমুদ্রের অবস্থা ভীষণ হয়ে উঠ্‌ল। বড় বড় তরঙ্গ জাহাজের চারপাশে উদ্দাম নৃত্য আরম্ভ করল। জাহাজের উপর কেউ থাকতে পারে না। যাত্রীরা গড়াগড়ি খেতে লাগল।

সেই সময়ে ক্যাপ্টেনের কাছে ছুটে এলেন একজন বৈজ্ঞানিক; এসে বল্‌লেন, ক্যাপ্টেন এই মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচবার কোন উপায় আছে?

—কি উপায়? এ যে অবস্থা তাতে জাহাজ ডুববেই।

—তবে শুনুন। আমি শুনেছি এ জাহাজে বহু তেলের পীপা আছে?

—হাঁ, আছে, প্রায় একশ'।

—তা' হলে এখনি পীপা থেকে তেল বার করে জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে দিন। এছে অবস্থা তাতে এ ছাড়া আর বাঁচবার কোন উপায় নেই। আপনি দ্বিধা করছেন কেন? শুনুন আমি একজন বৈজ্ঞানিক। আমি যা বলছি এই মুহূর্তে তাই করুন।

শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ প্রবল ঝটিকা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ বিকট শব্দে জাহাজকে আক্রমণ করল।

বিহ্বল ও নিরুপায় হয়ে ক্যাপ্টেন ছুটে গেলেন ডেকের দিকে। খালাসীদের বল্‌লেন—তেলভর্তি যত পীপা আছে সব ফেলে দাও সমুদ্রে।

খালাসীরা সমস্বরে বল্‌লে—কি বল্‌ছেন ক্যাপ্টেন?

—"দ্বিরুক্তি করো না"—বলে চীৎকার করে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্বাক নিষ্পন্দ যাত্রীদল এই কাণ্ড দেখল। একশ পীপা তেল ছড়িয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে।

নিমেষে এ কি পরিবর্তন! জাহাজের চারধারে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ উন্মত্ত তরঙ্গরাশি যেন হঠাৎ স্তিমিত হয়ে গেল। কিন্তু দূরের তরঙ্গগুলি তখনও তেমনি উত্তাল হয়ে নাচছে।

বৈজ্ঞানিক ও ক্যাপ্টেন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে এই পরিবর্তন দেখলেন। জাহাজ রক্ষা পেল।

তখন চারদিক থেকে ছুটে এল যাত্রীর দল। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে সে কী বিপুল উল্লাসধ্বনি। বৈজ্ঞানিককে ঘিরে তাদের সেকি অভিনন্দন।

জাহাজ তখন আস্তে আস্তে আবার এগিয়ে চল্‌ল তার গন্তব্য পথে।

কিশোর ছেলেটি—মরিস্ সেভালস্ সমুদ্রের তীরে বসে সারাদিন কি যেন শোনে!

পাড়াপড়শীরা তার বাপমার কাছে গিয়ে বলে,—তোমার ছেলেটার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে।—নাওয়া খাওয়া নেই, শুধু কান পেতে শুনছে সাগর গর্জন। লেখাপড়াতেও দেখছি একেবারে মন নেই।

বাপ মা বলেন,—খোকা, কেন তুই বসে থাকিস্ সারাদিন ওখানে? কি শুনিস্ বল্‌ত?

ছেলেটি শুধু বলে, ক'দিন পরে তোমাদের জানাব।

একদিন গভীর রাত্রে শুধু বাপ মা নয়, প্রতিবেশীরাও শুনতে পেলে বেহালায় এক অপূর্ব সুর,—সাগরের তরঙ্গ যেন আছড়ে পড়ছে বেলাভূমিতে। সেই উচ্ছ্বাস, সেই গর্জন।

অবাক্ হয়ে—ছুটে সকলে এলেন ছেলেটির কাছে,—বাবা তার পিঠ চাপড়ে বল্‌লেন,—মরিস্, আশীর্বাদ করি তোর এ সাধনা সঙ্গীতরাজ্যে নূতন আলোক সম্পাত করুক।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

অল্‌ডাস হাক্‌সলির জীবন দর্শন

অমল হালদার

গত ২৩শে নভেম্বর অল্‌ডাস হাক্‌সলির জীবনাবসান হয়েছে। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের তরুণদের, বিশেষ করিয়া তরুণ সাহিত্য স্রষ্টাদের মহলে তাঁহার যে অসামান্য সমাদর ছিল পরবর্তী তিন দশকে তাঁহার প্রতিপত্তি অবশ্য ঠিক সে রকমটা ছিল না। বরং যে আগ্রহ জৈব তৃষ্ণা ও জীবন জিজ্ঞাসা নিয়ে সাহিত্য জীবন তিনি সুরু করেছিলেন, সমাপ্তির অধ্যায়ে তাতে এসেছিল একটা সুষম শান্তি ও প্রোজ্জ্বল প্রত্যয়ের সুর, যা ইদানীংকালে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলিয়া নিন্দিত হইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অল্‌ডাস শুধু একজন মহান সাহিত্য স্রষ্টা নন, তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানী মনীষী যিনি বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাবাদের সঙ্গে জীবন মুক্তির আদর্শকে মিলাইতে চাহিয়াছিলেন। তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যে সাংস্কৃতিক রাখিবন্ধন এবং এই শতাব্দীর মানুষকে একটি নূতন জীবন দর্শনে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

স্বনামধন্য বিজ্ঞানীর তিনি পৌত্র। তাঁর সহোদর জুলিয়ানও সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। কিন্তু অল্‌ডাস বিজ্ঞানের বাস্তবসীমা অতিক্রম করিয়া আরো উর্ধ্বে মহত্তর কোন সত্য আছে কিনা, তারি সন্ধানে জীবনভোর হাতড়িয়ে ফিরেছেন এবং ধ্বনিকাপাতের অল্প আগের একটি নিবন্ধে তিনি বলেছেন যে, জীবনটা শুধু খোঁজা নয়, পাওয়াও। আসলে প্রাপ্তি বলতে কি বোঝায়, সেটাই অপ্রমত্ত মন নিয়ে আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে।

বিজ্ঞান গতি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে, তার সুযোগ সর্ব-মানবের মধ্যে ব্যাপ্ত করার প্রয়োজন তিনি স্বীকার করেছেন। শোষণ পীড়ন ও শত্রুমুক্ত নূতন পৃথিবীর আদর্শকে তিনি স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই প্রশ্ন তুলেছেন, খাদ্য, বাসস্থান, সামাজিক ন্যায়বিচার ও বৈষয়িক সাম্য হলেই কি জীবনের দাবী, সমস্ত ক্ষুধার সমাপ্তি? তা হলে যতই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হচ্ছে অশান্তির পরিসর দুনিয়ায় ততই কেন বাড়ছে? কেন মানুষ আকাঙ্ক্ষিত নির্বেদ লাভ করছে না?

এই কেনর স্বরূপ অনুধ্যানই অল্‌ডাসের প্রধান সাহিত্য কর্ম।

১৮৯৪ সালে অল্‌ডাস হাক্‌সলি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের হাক্‌সলি পরিবার শিক্ষায়, আভিজাত্যে খুবই নাম করা। হাক্‌সলির বাবা লিওনার্ড হাক্‌সলি কর্ণধিল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করতেন। ঠাকুর্দাটি এইচ হাক্‌সলি ছিলেন জীব বিজ্ঞানের অধ্যাপক। সাহিত্যিক মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাথু আর্নল্ড ছিলেন সম্পর্কে তাঁর দাদামশায়। এ ছাড়া তাঁর ভাই বিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্‌সলির নাম তো সকলেরই জানা। ব্রিটেনে তাঁকে লেখাপড়া শেখবার জন্য পাঠানো হয় এবং বেলিয়ল থেকে তিনি গ্রাজুয়েট হন। তরুণ বয়স থেকেই তিনি কবিতা সাহিত্যে বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। সাহিত্য পত্রিকা হইলের

তিনি সেই সময় নিয়মিত লেখক ছিলেন। উনিশশো ষোল সালে তাঁর কাব্য সংকলন 'দি বার্নিং' বইলেস প্রকাশিত হয়। এর পরের বছর তিনি অকস্‌ফোর্ড পোয়েট্রির সম্পাদকমণ্ডলীর একজন মনোনীত হন। এই সময়ে তিনি ইংলণ্ডের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

রিচার্ড আলডিংটন, লিনক্লিড ম্যাকন, উইণ্ডাহাস লিউস, গোডিয়ের ব্রেজকা, রবার্ট গ্রোডস, ব্লেজের ভাই প্রমুখদের সাহিত্যগত আলোচনা সেই সময়কার তার জীবনে একটা নিয়মিত ঘটনা।

এ-ছাড়া কুইলেসের প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজ জরিয়ান গোয়েট্রির লেখকবৃন্দরা তাঁদের দলকে প্রায়ই জৈব সমালোচনা করে আক্রমণ করতেন। হাক্সলি সেই সব সাহিত্য সভায় বিতর্কে অংশ গ্রহণ করতেন। তার অসবার্ট সিটিওয়েল তার লাকটায় ইন্-দি-নেকস্ট রুম রচনায় আলডাসের চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন। হাক্সলির চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় বলেছেন, Interestedly disinterested aloof. শুধু তাই নয় পোষাক পরিচ্ছদে কোথায় যেন একটা উদ্ভতভাব।

আর আলাপ করলে তো রক্ষে নেই। সাহিত্য, রাজনীতি, দর্শন নিয়ে এমন বিতর্ক জেঁকে বসবেন, সেখান থেকে পাশ কাটানো ভয়ানক শক্ত। অপরপক্ষ বুদ্ধিমান হলে নীরব শ্রোতা হয়ে বিপদমুক্ত হতে পারতেন। কিন্তু সাধারণ গসিপ্ বা ব্যাকাল আলোচনায় তিনি বড় একটা উৎসাহ দেখাতেন না। যৌন বিষয়ক আলোচনায় তাঁর মতো জুড়ি পাওয়া খুব শক্ত ছিল। নিষ্ঠুর ভাবে বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব নির্ভর মন মানুষ ও জীব জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণাকে যথেচ্ছভাবে ছুরি চালিয়ে বাচাই করেছেন। এ-কথা ভয়ানকভাবে সত্য যেহ তাকে ভাবিয়েছে প্রচুর। তাঁর নাস্তিবাদী মন যান্ত্রিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে ব্যঙ্গ করে একটা মূল্যবোধের ধারায় নর-নারী সমাজকে বাঁধতে চেয়েছিলেন। বলা যায় অনিবার্য পতন থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন। হাক্সলির উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হল এই-ই।

ইংলণ্ডের উচ্চ মধ্যবিত্ত সমাজ ও তার অভিজাতজাত সিনিসিজম কখনো তীক্ষ্ণস্বরে কখনো বা সোজাসুজিও প্রকাশ করে ফেলেছেন। ঘটনা হিসাবে এ-কথা সত্য তিনি শেষ জীবনে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের এক মস্ত ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর অস্থির ও সংশয়ী মন এই হিন্দুধর্মের কাছে শান্তি বারি পেয়ে হয়ত সুস্থির হয়েছিল। কিন্তু সমসাময়িক কালের লেখক হিসাবে তিনি নতুন যুগের লেখকদের কাছে প্রায়ই অচেনা ছিলেন।

এ-যুগ তাকে কি চোখে দেখে—সে সম্পর্কে লণ্ডন ম্যাগাজিন গত ১৯৪৩ সালে একটা সিম্পোসিয়েমের ব্যবস্থা করেছিলেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন—এ্যাডাস্ উইলসন, জন ওয়েন, সিটার কুইনেক প্রমুখ সাহিত্য রথীগণ।

হাক্সলির প্রথম যুগের উপন্যাসের মধ্যে 'ক্রোম ইয়োলো' বইটি স্মরণীয়। এই উপন্যাসে নীতি কাব্যের কথার শোনা যায়। তার হায়কিউলিস ও লাডলি লিসিয়স্-এর প্রক্ষিপ্ত কাহিনী সহজেই পাঠকের মনোহরণ করে। পরবর্তী উপন্যাসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'এটিক-হেড' ও 'যোজ ব্যারেণ লীডস্'। এই দুটি উপন্যাসে হাকস্‌লি সংলাপ রচনায় ও ব্যঙ্গাত্মক মূল্য স্থাপনে দক্ষতা দেখিয়েছেন। 'পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্ট' হাকস্‌লির সবচেয়ে ব্যাতনামা উপন্যাস। এই উপন্যাসটি হাকস্‌লি প্রতিভার প্রকৃত প্রতিভূ। উপন্যাসটিকে হতাশাবাদের পর্যালোচনা তথা আধুনিক জীবনযন্ত্রণার চিত্ররূপ বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে বিদ্ধ করে হাকস্‌লি উপন্যাসটির মাধ্যমে বলেছেন যে, হাজার বছরের খৃষ্টীয় সভ্যতা

মানুষকে কেবল আত্ম অন্বেষণের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এতকাল মানুষ নিজেদের স্বাভাবিক আইন ও শান্তি অপেক্ষা আত্মদমনকারী নৈতিকতাকেই—বড় ও শ্রদ্ধার যোগ্য বলে মনে করে এসেছে। তারই ফলে মানব-জীবন পূর্ণ হয়েছে ভণ্ডামি বিকৃতি অ্যাডিক্সন ও লাম্পট্যের পঙ্কিলতায়। নিজেদের আধ্যাত্মিক জীবরূপে প্রমাণ করবার ব্যর্থ প্রয়াসের ফলে মানুষ ক্রমশঃ আত্ম ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম—'ব্রেভ নিউ ওয়ার্লড'। এই উপন্যাস দিয়ে তার সাহিত্য জীবনের সূচনা এবং 'এণ্ডস এণ্ড মীনস, সায়েন্স' 'সিবাটি এণ্ড পীস' ও 'পেরিনীয়াস ফিলসফি' প্রভৃতি ধার্মনিক নিবন্ধে তাঁহার পরিসমাপ্তি। এই দীর্ঘ পরিক্রমার পথে তিনি প্রেম, দেশাত্মবোধ, যৌন-কামনা, ধর্ম, বিজ্ঞান, কম্যুনিজম্, বিপ্লব ও বিশ্ব-বিবর্তন হতে সুরু করে আত্মা ঈশ্বর, যোগ সন্ন্যাস, বৈরাগ্য নির্বাণ, অবতারবাদ ও মোক্ষ পর্যন্ত, এমন প্রসঙ্গ কমই আছে যাহার আলোড়ন না বাচাই করে দেখিয়েছেন। তাঁর বিদ্যা যেমন প্রচুরায়ত ও প্রায় সারা দুনিয়ার সারস্বত লোকে পরিব্যাপ্ত, বোধি তেমনি দীপ্ত জড়তা মুক্ত ও লোচ্চার।

এটা অবশ্যই ঠিক যে বাসনা বর্জন করে মোক্ষ বা পরম শান্তি লাভকেই তিনি চরম লক্ষ্য বলে জীবনের শেষ ধাপে নামতে আরম্ভ করেছিলেন এবং সেই কারণেই যুক্তিবাদীদের সমাজে শেষ পর্যন্ত অনিতাদুরাগ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, তার চিন্তা ও প্রত্যয়ের মধ্যে ফাঁকি বা মেকী কিছু নাই। সার্বভৌম সমাদর উপেক্ষা করিয়াও তিনি নিজ প্রত্যয়কে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন।

শিল্প স্রষ্টা হিসাবেও হাক্সলি স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সিকাডাস কবিতা সংগ্রহে, লেডা আখ্যান কাব্যে এবং দি ওয়ার্লড অফ নাইট নাটকে হয়ত তাঁর বৈশিষ্ট্য বেশী নেই। তার ক্রেস্টিং পাইলেট নামক অপূর্ব ভ্রমণ কাহিনীর যেমন তুলনা হয় না, তেমনি লঘু নিবন্ধগুলিও তাঁর সোনার টুকরার মতো সমুজ্জল।

তিনের দশকে বাংলা গদ্য রচনার জন্মই হয়েছিল হাক্সলির প্রভাবে; যেমন তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত বিতর্ক—বহুল উপন্যাসের আদর্শেই জন্মেছিল বাংলার প্রজ্ঞাশ্রয়ী উপন্যাস সাহিত্য।

হাক্সলি ভারতীয় সাহিত্য ও দর্শনের অনুশীলন করেছিলেন, শুধু তাই নয় ভারতের নানা সহরে, এমন কি কলকাতাতেও এসেছিলেন। তাঁর লোকান্তর যুগন্ধর একটি সাংস্কৃতিক সত্তার উপর প্রশান্তির যবনিকাপাতস্বরূপ।

পুস্তক সমালোচনা

ভারতের নৌ শিল্প—ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। কিতাব মহল পাবলিশার্সের পক্ষে শ্রীহরিদাস সিংহ নাহর কর্তৃক ৪৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৬২। মূল্য পনের টাকা।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ প্রাচ্য অঞ্চলে নানা বিষয়ে প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ প্রাধান্য পারত্রিক চিন্তা ধারার মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। ঐহিক বিষয়েও ভারতীয়গণের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেষ্ঠত্ব শিল্পোৎপাদন ও বাণিজ্য এবং সমুদ্র যাত্রা ও উপনিবেশ স্থাপনে পরিণতি লাভ করে। বহির্বাণিজ্য, সমুদ্র যাত্রা এবং উপনিবেশ স্থাপনের প্রধান অঙ্গরূপ রূপে নৌশিল্পের যে বিস্ময়কর উন্নতি তৎকালে হয় তার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস কোথাওও ছিলনা। শাস্ত্রগ্রন্থে ও সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত উল্লেখের মধ্যে এবং প্রত্নতত্ত্বের বস্তুপুঞ্জে চিহ্নিত হয়ে এই ইতিহাস লুক্কায়িত ছিল। অধ্যাপক ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে Hisory of Indian Shipping গ্রন্থে সর্বপ্রথম এ সকল উৎস অনুসন্ধানের লিপিবদ্ধ ফল—ভারতীয় নৌশিল্পের একটা গ্রহণ যোগ্য ইতিহাস প্রকাশ করেন। আলোচ্য গ্রন্থ মূলতঃ ঐ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ হইলেও এর আলোচনা আধুনিক কাল অবধি পরিস্তৃত।

কোন অনালোচিত বিষয়ের তথ্য সংগ্রহ ও বিচার দ্বারা সম্পূর্ণাঙ্গ কালানুক্রমী ইতিহাস রচনা দুঃসাধ্য, যদিও অসম্ভব নয়। ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় সেই দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করে ইতিহাস-প্রিয় বুদ্ধিজীবী পাঠকদের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন। এখন সেই গ্রন্থের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় বাঙ্গালী পাঠকদের পক্ষে ঐ সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটল।

ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য তিনি কোথায়ও নিজ মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। উৎস গ্রন্থ, শিলালিপি অথবা মুদ্রা থেকে ভারতীয়গণের নৌ-যাত্রার উল্লেখ আহরণ করে তার বঙ্গানুবাদ দিয়েছেন। এই বঙ্গানুবাদের অনুসরণে কোন কোন উদ্ধৃতির প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে পাঠকেরা ঐ সকল তথ্যের মূল রচনার সঙ্গেও পরিচিত হতে পারেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করতে পারেন গ্রন্থ প্রণয়নে লেখক কী অসাধারণ ধৈর্য ও নিষ্ঠা প্রয়োগ করেছেন।

প্রাচীন ভারতের বন্দরগুলি বিভিন্ন দেশাগত বণিক ও নাবিকদের কোলাহলে পূর্ণ থাকত। মৌর্য যুগে বন্দর ও পোতাশ্রয় নিয়ন্ত্রণের নানাপ্রকার বিধি ব্যবস্থা ছিল। নৌ-নির্মাণ-শিল্পে ব্যবহৃত কাষ্ঠের শ্রেণীভেদের বিবরণ এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূল থেকে আধুনিক কালের মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ অবধি ভারতীয় নৌবহরের বাণিজ্য এবং উপনিবেশ স্থাপনে কর্মতৎপরতার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের এই গৌরবময় ইতিহাসের বর্ণনায় ইতিহাসের কোন সূত্র নির্ধারণ অথবা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারসহ মন্তব্যের প্রয়োজন না হতেও পারে। এখানে পাঠক তাঁর বুদ্ধি ও ক্ষমতা অনুসারে উহা উপলব্ধি করতে পারেন।

কিন্তু মুঘল যুগের নৌশিল্পের পর্যালোচনায় ঐরূপ সূত্র নির্ধারণ এবং বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় রাজনীতির তৎকালীন নিয়ামকদের দূরদৃষ্টির আলোচনার প্রয়োজন ছিল। সমুদ্রে নৌচালনায় এবং নৌযুদ্ধে মারাঠাগণ (এবং বাঙ্গালীরাও) দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে। মারাঠারা কেন সমুদ্রের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ না করে জলদস্যুর ভূমিকা গ্রহণ করল, ইয়োরোপীয় কারিগর অপেক্ষা ভারতীয় কারিগর উৎকৃষ্ট জাহাজ নির্মাণে দক্ষ হলেও কেন সমুদ্রে ইয়োরোপীয়দের প্রতিরোধের চেষ্টা হয়নি তার ইতিহাসসম্মত আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে ভারতীয় নৌশিল্প। শিল্পপ্রকরণ এবং নির্মাণ সম্বন্ধীয় আলোচনা এগ্রন্থে অতি সামান্য—অনুল্লেখযোগ্য। উৎস গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি বলে এ পুস্তকে ও এবিষয়ের স্বল্পতা।

তথাপি এগ্রন্থে বাংলা ভাষায় ভারতীয় নৌশিল্প এবং ভারতীয় বন্দর, বাণিজ্য, সমুদ্র যাত্রা ও উপনিবেশ স্থাপন সম্বন্ধে আলোচনা দীর্ঘদিনের অভাব মোচন করবে। ইংরাজী ভাষায় এসকল মূল্যবান তথ্যের দুর্বীবগা থেকে মুক্তি বাঙ্গালী পাঠককে অবশ্যই আনন্দ দেবে।

উৎকৃষ্ট কাগজে লাইনো টাইপে ঝরঝরে মুদ্রণ এবং আর্ট পেপারে বহু চিত্র গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করলেও মূল্য কিছু বেশী ধার্য হয়েছে বলা চলে।

স্বামী বিবেকানন্দ

॥ সচিত্র সংযোজন ॥

উনিশ বছর আগে যে বীর সন্ন্যাসীকে স্মরণ করে আমাদের যাত্রা সুরু করি, তাঁরই শতবার্ষিকী উৎসবে তাঁর অমর জীবনের অমৃতকাহিনীর পুনরাবৃত্তি করে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি।

আজিকার দিনে সারা ভারতের হৃদয়বান্ তরুণ-তরুণীদের নিকট আমাদের একান্ত আবেদন, তাঁরা যেন কিছুকালের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে ক্ষান্ত হন ও স্বামীজীর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে প্রতি পল্লীনগরে জনসাধারণের মধ্যে তাঁর মৈত্রী ও উন্নয়নের বাণী প্রচার করে দিশাহারা জাতিকে আত্মস্থ করবার প্রেরণা জোগান। তা'হলেই ভারতের মন্ত্রগুরু স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি সত্যিকার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানানো হবে।

বিবেকানন্দ জীবন-কাহিনী

হে বীর-সন্ন্যাসী, তোমাকে স্মরণ করিয়া তোমাকে প্রণাম করিয়া, আমাদের যাত্রা আরম্ভ করিলাম···তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের বাণী-সাধনা যেন সত্য হয়, সার্থক হয়···

এই অক্ষম যুগে, এই অক্ষম দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, মৃতদের মহাদেশে তুমি মহা-জীবনের অগ্নিবাণী বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছ।

নির্ব্বাপিত-প্রাণ-মন্ত্রের ভস্মস্তূপ সরাইয়া, হে পরতপা, তুমি আবার দিব্য-অগ্নিকে জ্বালাইয়া গিয়াছ,

সে অগ্নি যাহাতে আর না নিভিয়া যায়, তাহার মহা-দায়িত্ব তোমার দেশবাসীদের উপর দিয়া গিয়াছ,

এই বিশ্বাসে—

যে-মন্ত্রের সূচনা হয় একদা এই ভারতভূমিতে, এই ভারত-ভূমিতেই হইবে তাহার সুযোগ্য পরিসমাপ্তি ··অমৃতের সন্তান আবার ফিরিয়া পাইবে অমৃতের অধিকার।

(১)

উনবিংশ শতাব্দীর কলকাতা···গৌরমোহন মুখার্জ্জীর গলিতে দত্তদের বাড়ী···

বাড়ীতে মহাধুমধাম···আনন্দ···

বাড়ীর কর্ত্তা দুর্গাচরণ দত্তের একটি পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে···প্রথম সন্তান···

বাড়ীর মেয়েরা সন্ধ্যাবেলা জটলা করে ঠিক করলো, ঘটা করে ছেলের ভাত দিতে হবে···

তাই সবাই মিলে কর্ত্তাকে ধরতে চল্লো···

কিন্তু তিনি কোথায় ?

বিকেল থেকে তাঁর দেখা নেই·····সন্ধ্যা হলো, তবুও দুর্গাচরণ বাড়ীতে ফিরলেন না····· রাত্রি গভীর হয়ে এলো তবুও তাঁর দেখা নেই···

রাত ভোর হয়ে গেল·····

দুর্গাচরণের কোনও খবর পাওয়া গেল না···

সপ্তাহ গেল, মাস গেল, বৎসর গেল·· দুর্গাচরণের আর কোন খবর পাওয়া গেল না···

শিশু-সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে তার জননী পথ চেয়ে বসে থাকেন, যদি কোন দিন ফিরে আসেন···

২)

বিশ্বের যিনি নিয়ন্তা তাঁর নাম স্মরণ করে জননী বালকের নাম রাখলেন বিশ্বনাথ···

বিশ্বনাথ তখন তিন বছরের বালক···জননী ঠিক করলেন যাঁর নামে বালকের নাম, কাশীতে সেই কাশীশ্বর বিশ্বনাথকে দর্শন করে আসবেন···

কাশীতে যখন এসে পৌঁছলেন, তখন পথের শ্রমে তিনি ভেঙ্গে পড়েছেন···সেদিন রেল-হীন পথে ভ্রমণ খুব সহজ ব্যাপার ছিল না···

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যেতে পথেই তিনি অবসন্ন হয়ে পড়লেন···চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হয়ে গেল···কাশীর পথের ধুলোয় তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন···

মূর্চ্ছা ভাঙলে দেখেন, এক সন্ন্যাসী তাঁকে সেবা করছেন···সন্ন্যাসীর সেবায় তিনি জ্ঞান ফিরে পেলেন···জ্ঞান ফিরে পেয়ে উদ্ধার কর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে, তাঁর মুখে আর কথা সরে না··· পলকহীন চোখে তিনি সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন···

তাঁর সর্ব-দেহ যেন মুখর হয়ে ওঠে, ওগো এতদিন পরে এমনি করে দেখা দিলে !

শুশ্রূষা ছেড়ে সন্ন্যাসীও চমকে উঠে দাঁড়ান···অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, মায়া, মায়া···

এতদিন পরে এমনিভাবে স্বামী-দর্শনে মূর্ছা নারী আনন্দে লুটিয়ে পড়ে···মাথা তুলে দেখে, সামনে অজানা লোকের জনতা···সন্ন্যাসী নেই !

সন্ন্যাসীর পায়ের ছাপ তখনও ধূলোয় লেগে আছে···সেই ধূলো তুলে নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে নারী ফিরে এলো ঘরে···

(৩)

দিন যায়···

গৌরমোহন মুখার্জ্জির গলিতে দত্ত বাড়ীর সিদ্ধী দরজা খুলেই রাখেন···সন্ন্যাসী সজ্ঞান দেখলে, ডেকে সেবা করেন···

একদিন সন্ধ্যার মুখে সহসা সেই বাড়ীর দরজায় বাড়ীর এক পুরাতন বন্ধু দেখা দিলেন··· বিশ্বনাথের জননীকে ডেকে বল্লেন, বৌদি দেখ কাকে ধরে এনেছি···জোর করে ধরে এনেছি···

তাঁর পেছন দাঁড়িয়ে, সন্ন্যাসী···দুর্গাচরণ···

দেখতে দেখতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সবাই দুর্গাচরণকে ঘিরে দাঁড়ালো···এবার আর তোমাকে যেতে দেবো না···

সন্ন্যাসী হাঁ-না কোন কথাই বলেন না···

বাড়ীর ভেতরে যে-ঘরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো, বাইরে থেকে সে-ঘরে চাবি দিয়ে দেওয়া হলো···

সন্ন্যাসী হাঁ-না কোন কথাই বলেন না·····

তিনদিন ধরে সেই ঘরেই খাওয়া-দাওয়া দেওয়া হয়···সন্ন্যাসী তা স্পর্শ করেন না···

তিনদিন পরে দরজা খুলে দেওয়া হলো···যে ধরা দেবে না, তাকে দরজা বন্ধ করে ক'দিন ধরে রাখা যায় ?

সেইদিন রাত্রির অন্ধকারে সন্ন্যাসী আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন···আর ফিরলেন না···

এই ঘর-ছাড়া বিবাগী বৈরাগী হলেন বিবেকানন্দের পিতামহ···

(৪)

মার মলিন মুখের দিকে চেয়ে বালক বিশ্বনাথ নিজেকে নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলতে লাগলেন ···পুত্রের কৃতিত্বে নিরুদ্দিষ্ট পিতার কথা সকলে ক্রমশ ভুলে গেল···

যুবক বিশ্বনাথ আজ হাইকোর্টের এটর্নী···

হাইকোর্টের এটর্নী কিন্তু একহাতে বাইবেল আর এক হাতে হাফেজ···

যা উপার্জ্জন করেন, দুহাতে বিলিয়ে দেন ··

পত্নী ভুবনেশ্বরী দেবী ঠাকুর দেবতা, পূজা-অর্চ্চনা, অতিথি—অভ্যাগত নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত—

সন্ধ্যাবেলা বাড়ীর মেয়েরা তাঁকে ঘিরে বসে, তিনি রামায়ণ মহাভারতের গল্প বলেন…

রামায়ণ মহাভারত তাঁর কণ্ঠস্থ…

সব সুখের মধ্যে এক বেদনা…পুত্রহীনার বেদনা কত ঠাকুর মানৎ করেন…কত ক্রিয়াকাণ্ড করেন,

হে ঠাকুর, পুত্রের মত পুত্র দাও ·

কাশীতে ছিলেন বিশ্বনাথের এক কাকীমা। তিনি ভুবনেশ্বরীকে লিখে পাঠালেন, বৌমা, কাশীতে এসে একবার বীরেশ্বর শিবের মাথায় ফুল চড়াও দেখি…

ভুবনেশ্বরী সেই আহ্বানে কাশীতে এলেন। রোজ ভক্তিভরে বিশ্বেশ্বর শিবের মাথায় গঙ্গা জল ঢালেন আর বলেন, হে ঠাকুর, বন্ধ্যানারীর অন্তরের কামনা পূরণ কর…

একদিন স্বপ্নে দেখেন, তাঁর ইষ্ট দেবতা, দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দেবার জন্য স্বয়ং এসেছেন…দেখতে দেখতে সেই মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হয়ে একটি দিব্য বালকের মূর্ত্তি ধারণ করলো…তিনি দুহাত দিয়ে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন…

স্বপ্নের কথা তিনি সযত্নে অন্তরে লুকিয়ে রাখেন…কারণ স্বপ্ন নয়, সত্যই দেবাদিদেব তাঁর আহ্বান শুনেছেন…পুত্র-সম্ভাবনায় তাঁর সর্ব্ব-দেহ-মন ব্যাকুল হয়ে উঠল…নিত্য তিনি জপ করেন, শিব, শিব…

সেদিন মকর সংক্রান্তি…তখনো সূর্য্যোদয় হতে দু' মিনিট বাকি আছে…দলে দলে পুণ্য লোভাতুর নর-নারী চলেছে মকর স্নানে…

সেই সময় (৩ ১৮৬৩ সালের ১২ই জানুয়ারী, সোমবার) সেই দিব্য-লগ্নে মাতা ভুবনেশ্বরীর অঙ্কে জন্মগ্রহণ করলো এক ভুবন বিজয়ী শিশু বিবেকানন্দ যাঁর নাম…

(৫)

যথাকালে শিশুর নামকরণ হলো, নাম হলো নরেন্দ্রনাথ।

মা আদর করে ডাকেন, বিলে;…

কিন্তু কি দুরন্ত ছেলে…সমস্ত বাড়ী একা সে তোলপাড় করে তোলে…যা বায়না ধরবে, তা চাই-ই…কোন কথা শুনবে না, কোন ধমক মানবে না, কোন আদরে ভুলবে না…যা বায়না ধরবে, যতক্ষণ তা না পাবে, বাড়ী মাথায় করে তুলবে…কে তাকে আনায়! বাড়ী শুদ্ধ লোক অস্থির হয়ে ওঠে… এমন কি অমন যে স্নেহময়ী জননী, তাঁরও ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়…

রেগে তিনি বলে ওঠেন, শিব ঠাকুর নিজে না এসে, তাঁর একটা ভূতকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু হঠাৎ একদিন ভুবনেশ্বরী সেই ভূতের একটা ওষুধের সন্ধান পেয়ে গেলেন…

যেমন ভূত, তেমনি ওষুধ…

বায়না নিয়ে ভূত যখনই চেঁচাত…শিব, শিব, বলে মাথায় একটু জল দিয়ে দিলেই ভূত ঠাণ্ডা হয়ে যেতো…

যেন পাথরের শিব-শিব!

(৬)

বিলের কত যে খেয়াল! সব চেয়ে বড় হলো, সাধু সন্ন্যাসী দেখলেই তাঁদের ডেকে আনা, হাতের কাছে যা পাবে তাই দিয়ে দেবে···

কোন্ দিন কি দিয়ে দেবে, ভুবনেশ্বরী ঘরকে জানিয়ে দিলেন, ফের যদি সাধু-সন্ন্যাসীদের দেবার জন্যে কোন জিনিসে হাত দিবি, তো তোর একদিন কি আমার একদিন!

অভিমানী বিলের মনে সে কথা গিয়ে লাগলো। পরেরদিনই দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময় এক সাধু এসে দাঁড়ালো।

—খোকাবাবু, ভিখ মিলে···

খোকাবাবুর মনে পড়লো, মার কথা···বাড়ীর কোন জিনিসে সে হাত দিতে পারবে না··· কিন্তু সাধু লোক তার কাছে চেয়ে শুধু হাতে ফিরে যাবে?

বিলের পরণে ছিল মাত্র একখানি ধুতি···সে খানি খুলে সাধুকে ছুঁড়ে দিয়ে বালক ছুটে ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

পুত্রের সহসা সেই দিগম্বর মূর্ত্তি দেখে এবং তার কারণ অবগত হয়ে, ভুবনেশ্বরী ছেলের ব্যবস্থা করলেন।

দরজার ছেকল দিয়ে বিলেকে ঘরে আটক রাখা হলো। রাস্তার ওপরেই ঘর ঘরের জানলার ওপর দাঁড়ালে রাস্তা সব দেখা যায়···বিলের হলো মজা···রাস্তায় সাধু-সন্ন্যাসী দেখলেই জানলা দিয়ে ডাকে—ঘরের মধ্যে যা পায়, জানলা গলিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়···নীচে ভিখারীর ভিড় জমে যায়···তারা পরমোল্লাসে খোকাবাবুর জয়ধ্বনি করে···সে জয়-ধ্বনি ভুবনেশ্বরীর কাণে গিয়ে পৌঁছয়— ছুটে এসে ছেলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে যান—

আর কি করে শাসন করবেন ভেবে পান না।

(৭)

মাঝে মাঝে হঠাৎ বিলেকে খুঁজে পাওয়া যেতো না···সারা বাড়ীতে খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যেতো···

আনাচে কানাচে, ঘাটে মাঠে, এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় লোক ছুটোছুটি করে হায়রাণ···

শেষকালে হয় ত দেখা গেল, বাড়ীর এক অন্ধকার ঘরে অন্ধকার এক কোণে বালক বিলে চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে আছে···সমাধিমগ্ন ঋষি

কত বালকের কত খেলা—বিলের কিন্তু সব চেয়ে ভাল লাগে এই ধ্যান-ধ্যান খেলা···

ছাদের ওপর, চিলে-কোঠায়, তক্তাপোসের তলায়, যেখানে বালক জানে তার নির্জ্জনতা সহসা কেউ ভাঙতে আসবে না, সেখানেই সে ধ্যানে বসে পড়ে

কে তাকে শেখালো এই খেলা?

কোন অনাদি রহস্যের সিন্ধুতলে, জন্ম-জন্মান্তরের নিঃসীম নীল জলে, জীবন ও মৃত্যুর খেয়া পারাপারে তার উত্তর নিহিত আছে, কে জানে?

মাঝে মাঝে তার বন্ধুদেরও বিলে এই খেলায় ডেকে নিতো।

একবার এক মাঠের ধারে। এক গাছতলায় বিলে তার বন্ধুদের নিয়ে ধ্যান-ধ্যান খেলা বসেছে। সংসার বিরাগী বিজ্ঞ ঋষিদের মত চোখ বুঁজে, কমল আসনে তারা সবাই বসেছে···যার ধ্যান আগে ভেঙ্গে যাবে, সে যাবে হেরে···তাই সবাই চোখ মিট্ মিট্ করে দেখছে অন্য ঋষির ধ্যান ভাঙ্গলো কিনা।

এমন সময় একজন ঋষি দেখলেন, গাছের পাশে কি যেন নড়ে উঠলো···চকচকে কালো···

চকচক কালো জিনিসটি ফণা তুলে দাঁড়ালো—ওরে, কেউটে, কেউটে,···পালা···

চীৎকার করতে করতে ধ্যানী ঋষিরা ছুটতে লাগলো···যত ছোটে, তত চেঁচায় ···

কিছুদূর এসে, তারা পেছন ফিরে দেখে, বিলে তেমনি বসে আছে···নিশ্চল, নিথর···

বিলের ভাবনায় তারা কেঁদে ফেলো · চেঁচামিচিতে লোকজন ছুটে এলো···

তারা গাছতলায় গিয়ে দেখে, বিলে তখনও চোখ বুঁজে বসে আছে।

ডেকে তার ধ্যান ভাঙ্গাতে হলো।

—ধন্যি ছেলে বাবা! কেউটে দেখে তোর ভয় করলো না? বিস্মিত বিলে বলে, কেউটে? কই, আমি তো দেখতে পাইনি! মাতা ভুবনেশ্বরী পুত্রকে বুকে জড়িয়ে স্মরণ করেন, শিব, শিব!

(৮)

কখনো সন্ন্যাসী · কখনো রাজা···

রাজা সাজতে বিলের বড় ভাল লাগে ··

বাড়ীর পুজোর দালান···উঠোন থেকে থাকের পর থাক সিঁড়ি উঠেছে দালান পর্য্যন্ত ··

সিঁড়ির সব চেয়ে উঁচু ধাপে···একটা কাঠের চৌকি···রাজ-সিংহাসন···

সেখানে বসবে একা রাজা···একা বিলে···সে রাজা···সে অর্জ্জেছে রাজ-টীকা নিয়ে···মানুষকে শাসন করতে···আজ্ঞা করতে···

বন্ধুদের মধ্যে যেছে সে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করে···তারপর সেনাপতি পাত্র-মিত্র···

যে যার সম্মান অনুযায়ী ধাপের পর ধাপ নীচে বসে ··

সন্ন্যাসী আজ রাজা···আজ আর চোখ বুঁজে চুপ করে বসে থাকা নয়—আজ সে শাসক—তার কণ্ঠস্বরে আদেশ—তার ভঙ্গীতে অগ্নি-দীপ্তি · অপরাধীকে সে দেয় কঠোর দণ্ড—ক্ষমা নেই। যে অপরাধী তাকে পেতেই হবে শাস্তি—যে দেখিয়েছে বীরত্ব, তাকে খুলে দেয় নিজের গলার মুক্তাহার, দিকে দিকে পাঠায় সৈন্যদের—শত্রুদের করতে পরাজিত—

সে নিজে অজেয়···একক···পুরুষ সিংহ···

(৯)

বিলের আজ সাত বছর বয়স···

সমগ্র মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ তার কণ্ঠস্থ···রামায়ণ, মহাভারত সর্গকে সর্গ অনর্গল সে আবৃত্তি করে যায়···

সভায় কথক ঠাকুর রামায়ণ গাইছেন·· কোথায় ভুল করে ফেলেছেন বালক বিলে তখুনি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁকে সংশোধন করে দেয়···

মাষ্টার মশাই যা বলেন, বিলে পর মুহূর্ত্তেই তা স্মরণ থেকে বলে দেয়···

স্মরণ-শক্তি দেখে লোকে অবাক হয়ে যায়…

কেউ কেউ বলে জাতিস্মর ··

বিলের দৃষ্টি সব দিকে…

এটর্নীর বৈঠকখানা…নানা জাতের লোকের ভিড়…হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান · ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বৈদ্য ··

বিলে দেখে, এক এক জাতের লোকের জন্য এক একটা আলাদা হুঁকো…কেন এমন আলাদা ব্যবস্থা ?

কোন কোন দিন দেখে, এক জাতের হুঁকো ভুলে অন্য জাতের লোকদের দেওয়ার জন্যে চাকর ভয়ানক বকুনি খেলো,…যেন সে কি সর্ব্বনাশ করেছে।

বিলে বুঝতে চেষ্টা করে, বুঝতে পারেনা…ব্রাহ্মণের—হুঁকোয় শূদ্র মুখ দিলে, কি সর্ব্বনাশ হয় ? কেন এত জাত ? আর জাতে জাতে এত তফাৎই বা কেন ?

ভাবতে ভাবতে একদিন সে ঠিক করলো, গোপনে সে নিজেই পরীক্ষা করে দেখবে…সব জাতের হুঁকো থেকে সে এক-একটান তামাক খাবে—দেখবে, তার কি সর্ব্বনাশ হয় !

গোপনে অবসর বুঝে, তামাক তৈরী করে, প্রত্যেকটি হুঁকো থেকে এক-একটান তামাক খায়…

কৈ…তার মাথায় তো বাজ পড়লো না ? তার হাত-পা তো খসে গেল না ? যেমনটি ছিল, সে তো ঠিক তেমনি আছে…

তবে, এসব হলো ছোঁয়াচুরি মিথ্যে কথা…ভুল ··

অন্তত বিলে এসব আর মানবে না…

(১০)

পাঠশালা…সেখান থেকে বিদ্যাসাগর মশায়ের মেট্রোপলিটান্ ইন্‌স্টিটিউশান্…

বিদ্যাসাগর মশাই তখন নিজে সেই স্কুলে পড়ান…

একদিকে স্কুল…আর একদিকে আখড়া…কুস্তির আখড়া…নবগোপাল মিত্তিরের আখড়া ·· পাড়ার ছেলেরা তাঁর তত্ত্বাবধানে রোজ নিয়মিত ডন, বৈঠক, কুস্তি করে…

বিলে আর ছোট ছেলে নয় ··সে আজ নরেন…রীতিমত ডন-বৈঠক করে, কুস্তি করে… পালোয়ানদের সঙ্গে গা ঘসে—দলের চাঁই…

মিত্তির মশাই তারই হাতে ছেড়ে দেন আখড়া…

নরেন বলতে ছেলেরা অজ্ঞান…তার একটা কথায় তারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারে…

স্কুলে নরেন…আখড়ায় নরেন…আড্ডায় নরেন…থিয়েটারে নরেন…যাত্রামারিতে নরেন ·· এক দণ্ড স্থির নয়…

এমন সময় এলো প্রবেশিকা পরীক্ষা…আর তিনদিন বাকি…জ্যামিতির একটা পাতাও পড়া হয়নি…ইউক্লিডের চারখানা বই নিয়ে নরেন ঘরে ঢুকলো…চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে পড়ে ইউক্লিডের চারখানা বই ঝাড়া মুখস্ত করে ফেল্লো…

(১১)

সেখান থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ···মাত্র এক বছরের জন্যে ··তার পর জেনারেল এসেম্বলী ···আজ যার নাম স্কটিশচার্চ্চ কলেজ ··

ষোলো বছরের ছেলে···কিন্তু দেখলে মনে হয়, পরিপূর্ণ যুবক···সুপ্রশস্ত বক্ষ···মাংসল পেশী··· দীর্ঘঋজু দেহ···

কলেজের ছেলেরা নরেনকেই জানে তাদের দলপতি। বলে, নরেনকে না হলে কলেজের আসর বসেনা···গান জমে না ··

আহমেদ খান আর বেণীগুপ্ত, সে-যুগের দুই বড় ওস্তাদ ··তাদের কাছে রীতিমত নাড়া বেঁধে নরেন গান শেখে···

যে-কোন বাজনা দাও, সে অনায়াসে বাজিয়ে যাবে···

কিন্তু বাজনায় কি হবে? নরেনের খালি গলা···সেই তো বাজনা···তার উদার গম্ভীর মধুর আওয়াজ কখনো মেঘের মত ডাকে, কখনো মৃদঙ্গের মত বলে, কখনো বা সাগরের মত আছড়ে পড়ে···সে-কণ্ঠস্বর যে শোনে সেই আপনার হয়ে যায়—বাড়ীতে, পাড়ায়, কলেজে, সর্বত্র, নরেন যেখানে থাকে, সে থাকে সকলের আগে···

কিন্তু তার সঙ্গীরা বুঝতে পারে, তাদের সঙ্গে থাকলেও, নরেন রহস্যময় হয়ে উঠতে থাকে ··

তার বাইরের সে-চাঞ্চল্য, যেন তাদের কাছে নেই···যত দিন যায় ··ততই সঙ্গীদের কাছে নরেন রহস্যময় হয়ে উঠতে থাকে···তার বাইরের সে-চাঞ্চল্য, যেন হঠাৎ কোথায় উবে গেল···তার গাম্ভীর্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভীত হয়ে উঠলো···

দুরন্ত ক্ষুর-ধার নদী···কোন্ দূর পর্বত থেকে আজ তাতে নেবেছে সৈরিক ঢল···টল টল জল···স্থির অতল···

তার বাইরের বেগ ভেতর নিয়েছে টেনে···

তাই ভেতরে চলেছে তার তীব্র ভাঙা কলরব···বাইরে কিছুই যায় না দেখা···

সহসা এই বিপুল ধরণী তার অনন্ত আত্মীয়তা···যেদিকে যেভাবে যত বিস্তৃত তার বিনোদ বিচিত্রতা···অন্তরের একটি মহা-বিন্দুতে সংহত হয়ে পড়ে···একটি জিজ্ঞাসা, একটি অনুভূতি, একটি স্পর্শ ··নিখিলের সব বিচিত্রতাকে অপহরণ করে নেয়···বহু মানবের মধ্যে মানব সহসা হয়ে যায় নিঃসঙ্গ ··পরম একক।

সেই এক জিজ্ঞাসা, এক অনুভূতি, এক স্পর্শের জন্য অন্তরাত্মা হাহাকার করে ওঠে ·····জন্ম-জন্মান্তরের রহস্য-সিন্ধুর অতল গর্ভ থেকে মহা-পদ্মের সৌরভের মত আসে আহ্বান·····

বাইরের সমস্ত চাঞ্চল্যের আড়ালে আজ সেই আহ্বান নরেন্দ্রকে অন্তরমুখী করে তুলেছে···

কোথা থেকে, কি ভাবে এলো সে আহ্বান, কে বলবে তার ইতিহাস?

বহু বহু যুগ আগে, আমাদেরই এই দেশে, আমরা দেখতে পাই, সেই আহ্বানের আদিম প্রকাশ, সেই জিজ্ঞাসার জীব-জন্ম বিশ্ব-মিতা ঋষিদের অন্তর-গুহায়, হে হিরণ্ময় পুরুষ, কোথায় তুমি? কে তুমি? কি সম্বন্ধ তোমার—আমার?

সে জিজ্ঞাসা আজ নরেন্দ্রের চৈতন্যের মর্ম-মূলে তুলেছে আলোড়ন···বেঁধেছে বাসা ··

কে দেবে তার উত্তর···?

(১২)

সে দিন কলেজে অধ্যক্ষ সাহেব অনুপস্থিত···তিনি ইংরেজী কাব্য পড়ান···তাঁর বদলে অধ্যাপক উইলিয়াম হেষ্টি সেদিন ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ পড়াচ্ছেন···

ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের "এক্স্কারশন্" কবিতা···তাতে ইংরাজ কবি সমাধি অবস্থার উল্লেখ করে বলছেন, প্রকৃতির ধ্যান করতে করতে চকিতের জন্যে সমাধির সেই মহাশান্তি উপলব্ধি করেছি···

হেষ্টি সাহেব ছাত্রদের বোঝাচ্ছিলেন, মনের সেই সমাধি অবস্থা কাকে বলে·····

"মনের একাগ্র পবিত্রতা এবং একমুখিনতা থেকে এই অবস্থার উপলব্ধি হয়···আজকাল তার পরিচয় বিরল বলেই চলে··· আমি আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মধ্যে শুধু একটি মানুষের কথা জানি, যিনি অন্তরের এই পরম অবস্থা অর্জন করেছেন, তিনি হলেন দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস··· যদি তোমরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে জানতে চাও, সেখানে গিয়ে তাঁকে দর্শন করতে পার!"

নরেন্দ্র একমনে হেষ্টি সাহেবের বক্তৃতা শুনছিলেন সেই প্রথম শুনলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নাম···

(১৩)

দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গার তীরে সন্ধ্যা নেমে এসেছে—ওপারে দু'একটি করে আলো জ্বলে উঠেছে··· এপারে ঘনায়মান অন্ধকারে এক উন্মাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে···

গঙ্গার জলে নেমে, গঙ্গাজলের অঞ্জলী নিয়ে উন্মাদ তারস্বরে কাদের যেন ডাকে, ওরে আয়, ওরে তোরা আয়!

গঙ্গার তরঙ্গ তীরে তীরে ভেঙে পড়ে···

আকাশে চাঁদ উঠে···

উন্মাদ জল থেকে উঠে তীরে তীরে ঘুরে বেড়ায়···আর মাঝে মাঝে ডেকে উঠে···জননী যেমন দূরে যাওয়া ছেলেকে—ঘরে ফিরিয়ে আনিবার জন্যে ভগবানকে ডাকে···তেমনি করে জগৎমাতার নাম স্মরণ করে উন্মাদ ডাকে, মাগো বেলা যে যায় তারা আসবে কবে?

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব আজ দুর্লভ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন কিন্তু সে সাধনা তাঁর নিজের মুক্তির জন্যে নয়, স্বর্গলাভের জন্যে নয়, সিদ্ধাই এর অলৌকিক শক্তির জন্যে নয়···

সহস্র ভেদ কণ্টকিত ধরণীতে খুঁটেছে মিলনের শতদল··· মরণশীল মানবের হৃদয়ে তিনি খুঁজে পেয়েছেন মরণ জয়ের পথ—নিখিলের কল্যাণের বীজমন্ত্র···

তিনি তাঁর ধ্যান নেত্রে দেখেছেন, সেই বীজ-মন্ত্রকে পৃথিবীর ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেবে যারা। ধ্যানের জগতে তিনি দেখেছেন তাদের জন্মগ্রহণ করতে···যারা এলে, তিনি হবেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষের অগ্রদূত···ধরণী কুন্তীর দৈব সন্তান···যারা নতুন করে রচনা করবে জীবন নিয়ে নতুন মহাভারত···

তাই সহস্রের আসা যাওয়ার মধ্যে—তিনি উদগ্রীব আগ্রহে অপেক্ষা করে আছেন, কখন তারা আসবে···

দিনের বেলায় লোকজনের মধ্যে কোন রকমে সে বিরহ আলোকে তিনি ঢেকে রাখেন কিন্তু যখন সন্ধ্যা নামে, দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরে যাত্রীরা যে যার গায় ফিরে। তিনি আর থাকতে পারেন না··· গঙ্গার তীরে তীরে উন্মাদের মত ঘুরেবেড়ান আর চীৎকার করে ডাকেন, ওরে আয়, ওরে তোরা আয়···

মহামুক্ত—সে আহ্বানে হয়ে উঠে ব্যাকুল···

(১৪)

মেঘেতে ছিল জল মাটিতে ছিল তৃষ্ণ···মেঘ আর মাটিতে একদিন হয় দেখা···

কলকাতার সিমলা পাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ী···তিনি ঠাকুরকে নিয়ে এসেছেন তাঁর বাড়ীতে···সে খবর ছড়িয়ে পড়ে পাড়ায় দলে দলে লোক আসে ঠাকুরকে দেখতে···

ঠাকুর গান শুনতে ভালবাসেন, তাই মিত্তির মশাই বেরিয়েছেন একজন ভাল গায়ককে ধরে আনতে···

পাড়ায় বিশ্বনাথ দত্তের ছেলে নরেন খুব ভাল গান গায়, তিনি পরম্পরায় শুনেছিলেন···তাই ছুটলেন তাকে আনতে···

সাধু সন্ন্যাসী মানুষ গান শুনতে চান···মিত্তির মশাই অনুরোধ করেন···

সাধু দেখে দেখে নরেন্দ্রের মন তিক্ত হয়ে উঠেছিল—আনায়াসে ভিখ্ মিলবে তাই সবাই সাধু···

নরেন্দ্রের অত গরজ নেই সাধু সন্ন্যাসীকে গান শোনাতে···কিন্তু মিত্তির মশাই নাছোড়বান্দা··· অগত্যা নরেন্দ্র রাজী হয়···

গান যতক্ষণ হয় ঠাকুর একদৃষ্টিতে নরেনের দিকে চেয়ে থাকেন···তার মন বলে উঠে, এই তো সেই···এই তো সেই···তাঁর প্রতীক্ষার ধন···

গান শেষ হতেই নরেনের কাছে এগিয়ে গিয়ে তিনি ভাল করে তাঁর অঙ্গ লক্ষণ সব দেখেন··· সর্ব অঙ্গে ভগবৎ লক্ষণ···দেখতে দেখতে তাঁর দেহে রোমাঞ্চ জেগে ওঠে···

আকুল আগ্রহে বলেন, হ্যাঁরে, আসবি দক্ষিণেশ্বরে—?

নরেন্দ্র নিস্পৃহ···

(১৫)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্ম সমাজের মধ্য দিয়ে একেশ্বর বাদ প্রচার করছেন···

বাংলা দেশের সেই সময়কার তরুণদের মনের সামনে জীবন ও ধর্মের এক নতুন আদর্শ তিনি তুলে ধরেছেন···সমাজকে ভেঙ্গে চুরে এক নতুন জীবন্ত রূপ দিতে হবে···

নরেন্দ্রের শিক্ষিত মনে তার প্রভাব এসে পড়লো ··

একদিন সমাজের ধর্মকার্য শেষ হয়ে গেলে নরেন্দ্র মহর্ষির সামনে উপস্থিত হলেন ··

সরাসরি সোজা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?

মহর্ষির কাছেও স্পষ্ট করে সে কথার উত্তর তিনি পেলেন না ··

অন্তরের চাঞ্চল্য বাড়ে, বাইরেটা তত স্থির হয়ে আসে···

বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রের ভাবান্তর দেখে দ্রুত বিবাহের আয়োজন করেন···

আয়োজন যখন প্রায়ই শেষে আসছে, সেই সময় নরেন্দ্র আপত্তি জানালেন, বিয়ে তিনি করবেন না মাতাপিতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যেও নয়।

তাঁদের পরমাত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু যখন বুঝলেন কি নিদারুণ ধর্ম পিপাসা থেকে নরেন্দ্র এই কঠোর আদর্শ গ্রহণ করতে চলেছেন, তিনি আর বাধা দিলেন না। বল্লেন তা হলে এখানে সেখানে ঘুরে না বেড়িয়ে, দক্ষিণেশ্বরে যাও ··রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে···

নরেন্দ্রের মনে পড়লো, সুরেন মিত্তিরের বাড়ীর সেই আধ পাগলা লোকটা·· কথা নেই, বার্ত্তা নেই—তুই তুই করে বললো···

সেই সঙ্গে মনে পড়লো, কলেজে হেষ্টি সাহেবের সেই অভিজ্ঞতা·· মনের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে···ঘুরে ফিরে খালি সেই আধ পাগলা লোকটার চেহারা মনে পড়ে—

সুরেন মিত্তির বারবার করে অনুরোধ করেন, ঠাকুর নিজে তোমাকে নেমন্তন্ন করেছিলেন ··

একদিন নরেন্দ্র ঠিক করলেন, দক্ষিণেশ্বরে যাবেন তিনি···

(১৬)

নরেন্দ্রকে দেখে ঠাকুরের আনন্দ আর ধরে না·· একটার পর একটা নরেন্দ্র গান গেয়ে যান, ঠাকুর তন্ময় হয়ে শোনেন···

বিশেষ কিছু কথাবার্ত্তা আর হয় না···

গান শেষ হয়ে গেলে যাবার জন্তে নরেন্দ্র উঠলেন···

হঠাৎ ঠাকুর উঠে এসে তাঁর হাত ধরে টানতে টানতে একেবারে ঘরের বাইরে বারাণ্ডায় চলে এলেন ··

সেখান থেকে পাশের একটা ঘরে ঢুকে খিল দিয়ে দিলেন···

বন্ধ ঘরে দুজনে একা ··

নরেন্দ্র অবাক · পাগলের একি খেয়াল আবার ··

চেয়ে দেখেন, পাগলের দু চোখ দিয়ে জল ঝড়ে পড়ছে···

নরেন্দ্র নিঃস্পন্দ নির্বাক ··

হঠাৎ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে পাগলা বলে উঠে, যেন কতকালের পরিচিত তিনি—হাঁরে এমনি করে আমাকে বসিয়ে রাখতে হয়? এত নিষ্ঠুর তুই? বিষয়ী লোকের কথা শুনে শুনে কাণ যে ঝালা পালা হয়ে গেল? প্রাণের কথা কইবো একটা লোকও পাই না ··

নরেন্দ্রের বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত যেন চলে গেল···এ উন্মাদ বলে কি? আমি এটর্নী বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র—আমাকে এ পাগল এ সব কি বলে?

তাড়াতাড়ি খিল খুলে ঘর থেকে কিছু মিষ্টি নিয়ে এসে, নরেন্দ্রের মুখে তুলে দিয়ে বলে, আয়, নিজের হাতে তোকে খাইয়ে দিই?—

নরেন্দ্র বলেন, দিন না আমার হাতে, বন্ধুরা সব রয়েছে, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে খাব!

পাগল কাঁদতে কাঁদতে বলে তারা খাবে 'খন · তুই খা···আয়

মা যেমন কোলের ছেলেকে খাইয়ে দেয়,তেমনি করে ঠাকুর নিজের হাতে নরেন্দ্রকে খাইয়ে দেন···

খাওয়ানো হয়ে গেলে বলেন, বল্ তুই একলা শিগ্‌গির আসবি আমার কাছে? বল?

নরেন্দ্র বিহ্বলের মত বলেন হাঁ!

ঘরে ফিরে এসে আবার সকলের সঙ্গে তাঁরা দুজনে বসেন। নরেন্দ্রের মনে ঝড় উঠেছে···

ভুল ঝড় · কে এ উন্মাদ? কেন তার স্পর্শে তাঁর চৈতন্যের মর্ম্মমূল পর্য্যন্ত এমন আলোড়িত হয়ে উঠেছে?

হঠাৎ নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?

এ প্রশ্ন নরেন্দ্র বহুবার বহু লোককে করেছেন···উত্তর কি হতে পারে, তাও তাঁর জানা হয়ে গিয়েছিল···

কিন্তু এই জীবনে প্রথম সেই উন্মাদের মুখে এই প্রশ্নের এমন সহজ উত্তর শুনলেন যে, তিনি নিজেই অবাক হয়ে গেলেন ··

—ওরে এই তোকে যেমন ঠিক সামনে দেখছি···তেমনি করে তাঁকে দেখেছি—ঠিক এমনি করেই তাঁকে দেখা যায়। তোর সঙ্গে যেমন কথা কইছি, ঠিক তেমনি করেই তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায় ··

নরেন্দ্র এ উত্তর শোনবার জন্ত আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না ··সহসা তাঁর মনে হলো, তাঁর পায়ের তলা থেকে যেন মাটী সরে গিয়েছে · চোখের সামনে জগতের বস্তুপুঞ্জ যেন তার সীমা রেখা সব হারিয়ে ফেলেছে ··

বিহ্বলের মত নরেন্দ্র সে রাত্রি বাড়ী ফিরে এলেন···

ওধারে দক্ষিণেশ্বরে, গঙ্গার তীরে, ঝাউতলায়, অন্ধকারে উন্মাদ ঘুরে বেড়ায় আর কাঁদে, ওরে তুই আয়, তোকে না দেখে আর থাকতে পারছি না···আয়···

(১৭)

বিংশ শতাব্দীর বস্তুযুগের ইতিহাসের মধ্যে দুটি মানুষের এই মিলনের কথা···আত্মার অমর কাব্য···

—শ্রীমণেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

একবার চোখ খুলে দেখ, সর্বগ্রস্থ ভারতভূমিতে অন্নের জন্তে কি হাহাকারটা উঠেছে। ঐ অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার জন্তেই আমি লোকগুলোকে রজোগুণতৎপর হতে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে চিতায় চিতায় দেশ উৎসন্ন হয়ে গেছে—তার তোরা কি করছিস ? দেশের লোককে আগে অন্নসংস্থান করার উপায় শিখিয়ে দে, তারপর ভাগবৎ পড়ে শোনায়। কর্মতৎপরায়ণ যারা ঐহিক অভাব দূর না হলে, ধর্মকথায় কেউ কান দেবে না।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামীজীর চিঠি

স্বামী বিবেকানন্দের বহু রচনার মধ্যে তাঁর লেখা চিঠিগুলি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। তাঁর রচিত বহু তত্ত্বকথার অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝবার জন্যে হয়ত বিশেষ মননশীলতার প্রয়োজন হয়, ধীশক্তি দিয়ে তাদের উপলব্ধি করতে হয়। কিন্তু তাঁর চিঠির ভাষা এমনই ঋজু, অকপট এবং অন্তর্ভেদী যে তার আবেদন সোজাসুজি মনের মধ্যে প্রবেশ করে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে। চিঠিগুলির মধ্যে দিয়ে তিনি মানুষকে অভয়-মন্ত্র শুনিয়েছেন, বারংবার বলেছেন, ভয় নেই, কারো ভয়ে তুমি ভীত হবে না, কল্যাণকর্মে যে নিযুক্ত থাকে তার মার নেই, তুমি বীর, তোমার পুরুষকার জাগ্রত হোক, তুমি মানুষ হও। আর শুধুই কি অভয়মন্ত্র? কেমন করে কাজ করতে হবে, কোন্ পথে চলতে হবে, সংগঠনকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাবার জন্যে কোন্ কোন্ কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে, সুদূর পাশ্চাত্ত্য দেশে বসেও তার পুংখানুপুংখ নির্দেশ তিনি পাঠিয়েছেন সতীর্থদের কাছে! এই সব চিঠির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর মানসলীলার নানা অপরূপ ছবি, মাতৃবন্দনায় হোমাগ্নি শিখার মতো তাঁর মনের আবেগ দেশের দুঃস্থ জনসাধারণের প্রতি তাঁর অন্তরের উদ্বেলিত করুণা এবং সর্বোপরি দেশের মানুষকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হবার জন্যে তাঁর উদাত্ত আহ্বান। এই চিঠিগুলি শুধু চিঠি নয়, এগুলি যেন বিদ্যুতের প্রবাহ যার স্পর্শে (অর্থাৎ পঠনে) আমাদের মনে শিহরণ জাগে, অবাক বিস্ময়ে ভাবি, আমাদেরই মতো দেহধারী একটি মানুষের মধ্যে এ কী অলৌকিক পৌরুষ, অমিতবীর্য, অসাধ্যসাধনকারী কর্মশক্তির প্রকাশ। বিবেকানন্দ যেন শুধু একটি নাম নয়—বিবেকানন্দ অটল বিশ্বাস, অক্ষয় গতি, অফুরন্ত শক্তি এবং অদম্য কর্মক্ষমতার যেন এক মূর্ত বিগ্রহ।—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

১২ ডিসেম্বর, ১৭৯৯

প্রিয় মিসেস বল,

আপনি ঠিকই ধরেছেন—আমি নিষ্ঠুর, বড়ই নিষ্ঠুর। আর আমার মধ্যে কোমলতা প্রভৃতি যা কিছু আছে, তা আমার ত্রুটী। এই দুর্বলতা যদি আমার মধ্যে আরও কম, অনেক কম থাকত! হায়! উহাই আমার দুর্বলতা এবং উহাই আমার সব দুঃখের আকর। ভাল কথা, মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের উপর কর বসিয়ে আমাদের উচ্ছেদ করে দিতে চায়। সেটা আমারই দোষ, কারণ আমিই ট্রাষ্ট করে মঠটিকে সাধারণের হাতে তুলে দিই নি। আমি যে মধ্যে মধ্যে—আমার ছেলেদের প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করি, তজ্জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত; কিন্তু তারাও জানে যে, সংসারে সবার চাইতে আমি তাদের ভালবাসি।

দৈবের সহায়তা সত্যই হয়ত আমি পেয়েছি: কিন্তু উঃ! তার প্রত্যেকটী বিন্দুর জন্য আমাকে কী পরিমাণেই না রক্ত মোক্ষণ করতে হয়েছে। উহা না পেলে হয়ত আমি অধিকতর সুখী হতাম এবং মানুষ হিসাবে আরো ভাল হতাম। বর্ত্তমান অবস্থা অবশ্য খুবই হতাশাচ্ছন্ন বলে মনে হয়; তবে আমি নিজে যোদ্ধা, যুদ্ধ করতে করতেই আমার প্রাণ দিতে হবে—হাল ছাড়া চলবে না; এই কারণেই ত ছেলেদের উপর আমি মেজাজ ঠিক রাখতে পারি না। আমি ত তাদের যুদ্ধ করতে ডাকছি না—আমি তাদের আমার যুদ্ধে বাধা না দিতে বলছি।

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নাই। কিন্তু হায়, এমন আমি চাই যে, আমার ছেলেদের মধ্যে অন্ততঃ একজন আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়ে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করুক।

আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। ভারতবর্ষে কোন কাজ করতে হলে আমার উপস্থিতি প্রয়োজন। আমার স্বাস্থ্য এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা ভাল; হয়ত সমুদ্রযাত্রায় আরো ভাল হবে। যা হোক, এবার আমেরিকায় কেবল বন্ধুবান্ধবদের উত্যক্ত করা ভিন্ন আর বিশেষ কোন কাজ করিনি। আমার পারোশ্বাবদ অর্থ সাহায্য জো-র নিকট হতেই হয়ত পাব, তাছাড়া নিঃ লেগেটের নিকট আমার কিছু টাকা আছে। ভারতবর্ষে কিছু অর্থ সংগ্রহের আশা এখনো রাখি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আমার যে সব বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁদের কাছে এখনো আমি যাইনি। আশা করি, প্রয়োজনীয় পঞ্চাশ হাজার পুরাবার জন্য পনর হাজার টাকা সংগ্রহ করতে পারব এবং ট্রাষ্টের দলিল হয়ে গেলেই মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সও কমে যাবে। আর যদি এ অর্থ সংগ্রহ করতে নাও পারি, তথাপি আমেরিকায় নিরর্থক না বসে থাকার চেয়ে চেষ্টা করতে করতে মরাও শ্রেয় মনে করি। আমার জীবনের ভুলগুলি খুবই বড় বটে; কিন্তু তাদের প্রত্যেকটির কারণ অত্যধিক ভালবাসা। এখন ভালবাসার উপর আমার বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। হায়! যদি আমার কিছু মাত্র তা না থাকত! ভক্তির কথা বলেছেন! হায়! আমি যদি নির্বিকার ও কঠোর বৈদান্তিক হতে পারতাম! যাক্ এ জীবন শেষ হয়েছে; পরজন্মে চেষ্টা করে দেখব। আমার দুঃখ এই—বিশেষতঃ আজকাল—যে, আমার বন্ধু বান্ধবগণ আমার নিকট হতে আশীর্ব্বাদ অপেক্ষা অপকারই বেশী পেয়েছে, যে শান্তি ও নির্জ্জনতা চিরদিন খুঁজছি, তা আমার অদৃষ্টে জুটল না।

বহু বৎসর পূর্ব্বে আমি হিমালয়ে গিয়েছিলাম, আর ফিরব না এই মনে করে। এদিকে ভগ্নী আত্মহত্যা করল, সে-সংবাদ আমার নিকট পৌঁছল, আর আমার সেই দুর্ব্বল হৃদয় আমাকে সেই শান্তির আশা থেকে বিচ্যুত করল। সে দুর্ব্বল হৃদয়ই আবার, আমি যাদের ভালবাসি তাদের জন্য কিছু সাহায্য ভিক্ষা করতে আমায় ভারত থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাই আমি আমেরিকায়! শান্তির আমি পিয়াসী; কিন্তু ভক্তির আলয় সেই আমার হৃদয়টি আমায় তা হতে বঞ্চিত করেছে। সংগ্রাম ও যাতনা, যাতনা ও সংগ্রাম! যাক্, তাই যখন আমার নিয়তি তখন তাই হোক, আর যত শীঘ্র এর শেষ হয়, ততই মঙ্গল। লোকে বলে আমি ভাবপ্রবণ, কিন্তু অবস্থার কথা ভাবুন দেখি! আপনি আমাকে কতই না ভালবাসেন আমার প্রতি কতই না সদয়। অথচ আমিই কিনা আপনারই এত বেদনার কারণ হলাম! আমি এতে ব্যথিত। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—তার ত অন্যথা হবার নয়! এখন আমি গ্রন্থি ছেদন করতে চাই অথবা সে চেষ্টায় শরীরপাত করব।

—আপনারই সন্তান বিবেকানন্দ

পুঃ—মহামায়ার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। সানফ্রান্সিস্কো হয়ে ভারতবর্ষে যাবার খরচ আমি জো-র নিকট ভিক্ষা লব। যদি সে তা দেয়, তবে অবিলম্বে জাপান হয়ে ভারতের দিকে যাত্রা করব। এতে একমাস লাগবে। ভারতের কাজ জানবার মত এবং হয়ত উহা অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সেখানে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারব বলে আশা রাখি—অন্ততঃ যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় আমি তাকে এখন দেখছি, সে অবস্থায়ই রেখে যেতে পারব। কাজের শেষটা যেন বড় তমসাচ্ছন্ন ও বড় বিশৃঙ্খল হয়ে আসছে—অবশ্য আমার আকাঙ্ক্ষাও ছিল তাই। কিন্তু ভগবানের দয়ায় একথা মনে করবেন না যে, আমি মুহূর্ত্তের জন্যও হাল ছাড়ব। কাজ করে করে অবশেষে রাস্তায় পড়ে মরবার জন্য ভগবান যদি আমায় তার ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়া করে থাকেন, তবে তার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। বর্ত্তমানে আপনার চিঠি পেয়ে আমি এত আনন্দে আছি যে, এরূপ আনন্দ বহু বৎসর উপভোগ করিনি। ওয়াহি গুরুজীকে ফতে, গুরুজীর জয় হোক, হ্যাঁ, যে অবস্থাই আসুক না কেন—জগৎ আসুক, নরক আসুক, দেবতারা আসুন, যা আসুন—আমি সংগ্রাম চালিয়েই যাব, কখনো হার মানব না। স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে সংগ্রাম করে রাবণ তিনজন্মে মুক্তি লাভ করেছিল। মহামায়ার সঙ্গে সংগ্রাম ত গৌরবের বিষয়!

আপনার ও আপনার স্বজনবর্গের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক। আমি যতটুকুর যোগ্য তার চাইতে অনেক, অনেক বেশী আপনি আমার জন্য করেছেন।

ক্রিশ্চিনও তুরিয়ানন্দকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

বিবেকানন্দ

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

১৮৯৫

অভিন্নহৃদয়েষু,

এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভারতবর্ষে যত কার্য্য হয় না হয়, কার্য্য এদেশে। কাহারও এক্ষণে আসিবার দরকার নাই। আমি দেশে গিয়ে কয়েক জনকে তৈয়ার করে দুবার ভারতের পাশ্চাত্য দেশে কোন ভয় থাকিবে না। গুপ্তনিধির কথাই লিখছিলাম। হরি সিং প্রভৃতি সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্ব্বাদ দিবে। ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে থাকিবে না। কার বাপের সাধ্য খেতড়ির রাজাকে দাবায়? মা জগদম্বা তার শিয়রে। কাশ্মীরও চিঠি পেয়েছি—কাশ্মীরে যদি সেণ্টার (কেন্দ্র) করতে পার ত বড়ই ভাল হয়। সেখানে পার একটা সেণ্টার কর।...এখন এ দেশে আর বিলেতে আমার সোড়া বেঁধে গেছে; কার সাধ্যি কি তা টলায়? নিউইয়র্ক এবার তোলপাড়! আসছে গরমিতে লণ্ডন তোলপাড়! বড় বড় হাতী বিলকুল ভেসে যাবে। পুঁথি পাঠায় কি খবর রে দাদা? তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি, দুদ্দাড়ে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এইত সবে সন্ধ্যা রে ভাই দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি lower classদের education (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পার তা হলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে—বিদ্যা দেখাতে পার? বড় মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে যে করে করে খরচ হয়ে গেছে। ...

কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করে মিলে মিশে চলে যাও—এ দুনিয়া বড়ই ভয়ানক, কাউকেই বিশ্বাস নাই। ভয় নাই, মা আমার সহায়—এমন কাজ এবার হবে যে, তোরা অবাক হয়ে যাবি।

ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ্র করে লেগে যাও। কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ

পুঃ—সারদা কি বাঙ্গলা কাগজ বার করবে বলছে? সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না বোধ হয় ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে Criticise (বিরুদ্ধ সমালোচনা) করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল। দল ভাঙ্গবার ঐটি মূলমন্ত্র। "ও কি জানে" "সে কি জানে" "তুই আবার কি করবি"—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকি হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া-বিবাদের মূলসূত্র।

স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত

দার্জিলিং
এন, এন, ব্যানার্জির বাড়ী
২০শে মার্চ, ১৮৯১

প্রিয় শশী,

তোমরা অবশ্যই এতদিনে মান্দ্রাজে পঁহুছিয়াছ। বিলগিরি অবশ্যই অতি যত্ন করিতেছে ও সদানন্দ তোমার সেবা করিতেছে। পূজা-অর্চ্চা পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে মান্দ্রাজে করিতে হইবে। রজোগুণের লেশ মাত্র যেন না থাকে। আলাসিঙ্গা বোধহয় এতদিনে মান্দ্রাজে পঁহুছিয়াছে। কাহারও সহিত বাদ-বিবাদ করিবে না—সদা শান্তিভাব আশ্রয় করিবে। আপাততঃ বিলগিরির বাটীতেই ঠাকুর স্থাপনা করিয়া পূজাদি হউক, তবে পূজার ঘটা একটু কমাইয়া সে সময়টা পাঠাদি ও লেক্‌চার প্রভৃতি কিছু কিছু যেন হয়। কান কুঁকতে যত পার ততই মঙ্গল জানিবে। কালজ দুটার তত্ত্বাবধান করিবে ও যাহা পার সহায়তা করিবে। বিলগিরির দুটি বিধবাকন্যা আছেন। তাঁদের শিক্ষা দিবে ও তাঁদের দ্বারা ঐ প্রকার আরও বিধবারা যাহাতে সংস্কৃত ও ইংরেজী স্বয়ং পড়িয়া শিক্ষা পায়, এ বিষয়ে যত্ন সবিশেষ করিবে। কিন্তু এ সর্ব্বকার্য্য তফাৎ হইতে। যুবতীর সাক্ষাতে অতি সাবধান। একবার পড়িলে আর গতি নাই এবং ও অপরাধের ক্ষমা নাই।

গুরুকে কুকুর কামড়াইয়াছে শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম; কিন্তু শুনিতেছি যে, ঐ কুকুর হলা নহে তাহা হইলে ভয়ের কারণ নাই। যাহা হউক, পঙ্গাধরের প্রেরিত ঔষধ সেবন করান যেন হয়। প্রাতঃকালে পূজাদি অগ্রে সারা করিয়া সপরিবার বিলগিরিকে ডাকাইয়া কিঞ্চিৎ গীতাদি পাঠ করিবে। রাধাকৃষ্ণ প্রেম শিক্ষার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। শুদ্ধ সীতারাম ও হরপার্ব্বতীতে ভক্তি শিখাইবে এ বিষয়ে কোন ভুল না হয়। যুবক-যুবতীদের রাধাকৃষ্ণ লীলা একেবারেই বিষের ন্যায় জানিবে। বিশেষ বিলগিরি প্রভৃতি রামানুজীয়া রামোপাসক, তাঁদের শুদ্ধ ভাব যেন কদাচ বিনষ্ট না হয়।

বৈকালে ঐ প্রকার সাধারণ লোকের জন্য কিছু শিক্ষাদি দিবে। এই প্রকার ধীরে ধীরে "পর্ব্বতমধিরুহ্যতে"

পরমশুদ্ধ ভাব যেন সর্ব্বদা রক্ষিত হয়। ঘুণাক্ষরেও যেন বামাচার না আসে। বাকী প্রভু সকল বুদ্ধি দিবেন, ভয় নাই। বিলগিরিকে আমার বিশেষ দণ্ডবৎ ও আলিঙ্গনাদি দিবে। ঐ প্রকার সকল ভক্তদের আমার প্রণামাদি দিও। আমার রোগ অনেকটা এক্ষণে শান্ত হইয়াছে একেবারে সারিয়া যেতেও যাইতে পারে প্রভুর ইচ্ছা। আমার ভালবাসা, নমস্কার, আশীর্ব্বাদাদি জানিবে।

চিরদিবসমতি
বিবেকানন্দ

পুনঃ ডাক্তার নঞ্জুণ্ড রাওকে আমার বিশেষ প্রেমালিঙ্গন ও আশীর্ব্বাদ দিবে ও তাহাকে যতদূর পার সহায়তা করিও। তামিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে যাহাতে সংস্কৃত বিদ্যার বিশেষ চর্চ্চা হয় তাহা করিবে। ইতি বি

ভারতী—সম্পাদিকাকে লিখিত

ওঁ তৎসৎ

রোজ ব্যাঙ্ক

বর্দ্ধমান রাজবাটী, দার্জ্জিলিং

৬ই এপ্রিল, ১৮৯৭

মান্যবরাসু,

মহাশয়ার প্রেরিত 'ভারতী' পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভগবানের কৃপায় মহাশয়বাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবন সংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্ঘাতার সমর্থক অতি বিরল, উৎসাহদাত্রীর কথা ত দূরে থাকুক; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগা দেশে। এজন্য বঙ্গ-বিদুষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষা অধিক শ্লাঘ্য।

"প্রভু করুন, যেন আপনাদের মত অনেক রমণী এদেশে জন্ম-গ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত 'ভারতী' পত্রিকায় সংসর্গী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে; তাহা এই—পাশ্চাত্য দেশে ধর্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যেই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্যরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চিরধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্ম্মতা (practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুরাণে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহাভেদ বুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয় হীন, নিজের মাংসপিণ্ড—শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারিনা।

তথাপি উপস্থিত অবস্থায় যথা দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে; কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখ পূর্ণ সংসারের ভয়ে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। একদিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নি বর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানী বালিকা কখনও পুতুল ভাঙে না। যে মহাভাগে, আমার ও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগত ভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদ-বিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত

যথাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটি কোটি স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার ন্যায় ক্ষুদ্রজীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সহৃদয়তা, অকপটতা ও অনন্ত প্রেম বিশ্ব বিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটি কোটি কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্জ্জনাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্যদেশে গমন অনিশ্চিত; যদি যাই, তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য। এদেশে লোকবল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নরনারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতাবাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতে ও সঙ্কুলান না হওয়ায় ৩০০৲ টাকার একবিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহার ও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনা ও করিতেছিনা, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই ঘোষণা করিতেছি। ইতি

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভুসন্নিধানে
ভবৎ-কল্যাণ-কামনাকারী
বিবেকানন্দ

ঠাকুর বলতেন, "যে সত্য কথাটি ধরে আছে সে ভগবানের কোলে শুয়ে আছে"।

—শ্রীশ্রীমা

ধর্ম মানে চরিত্র, সেইটাই প্রকৃত শক্তি।

—স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী অভেদানন্দকে লিখিত

ইউ.এস. এ

নভেম্বর ১৮৯৪

প্রিয় কালি (অভেদানন্দ)

ধন্যবাদ, তোমার চিঠিতে অনেক কথাই জানলাম।...তোমরা সকলেই বিস্ময়কর কর্মকুশলতা দেখিয়েছো। আর শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্য মিথ্যা হবে কেমন করে? তোমাদের মধ্যে আগুন তেজ ও বীর্য আছে। শশি সাম্রাজ্যের সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান কিছুই অশোচ্য থাকে না। কিন্তু সে তার নিজের ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপন করুক, ক্ষতি কি? "তোমাদের যাত্রাপথে আমার আশীর্বাদ তোমাদের অনুসরণ করবে।" দ্বিতীয়ত, আমি তোমার চিঠির মর্ম সম্পূর্ণ ধরতে পারলাম না। আমাদের জন্যে একটি মঠ নির্মাণের কাজে আমি নিজে টাকা সংগ্রহ করব, এর জন্যে যদি লোকে আমার সমালোচনা করে, তা কোনদিক দিয়েই আমাদের গায়ে না লাগা উচিৎ। তোমাদের মনকে উর্ধ্বে স্থাপন কর, সংহত কর, কোন ক্ষতি তোমাদের কেউ করতে পারবে না। তোমাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যেন প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে। জনসাধারণের বিরুদ্ধ সমালোচনার প্রতি ঔদাসীন্যের মনোভাব থাকলেই যথেষ্ট। আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি কালিকৃষ্ণ বাবুর গভীর অনুরাগ আছে এবং তিনি একজন মহৎ লোক, তাঁকে আমার বিশেষ প্রীতি জানিও। তোমাদের মধ্যে যদি অনৈক্যের মনোভাব না থাকে, তাহলে গুরুর কৃপায়, আমি জোর দিয়ে বলছি, তোমাদের কোন ভয় নেই। প্রেরণাসি বহু বিস্তারি। প্রকৃতির নিয়ম। মানসিক ধৈর্য বজায় রেখো। বালকবুদ্ধি লোকেরা তোমাদের বিরুদ্ধে কি বলে তার প্রতি লেশমাত্র মনোযোগ দিও না। ঔদাসীন্য, ঔদাসীন্য, ঔদাসীন্য। আমি স্মৃতিমধ্যে শশিকে (রামকৃষ্ণানন্দ) বিস্তারিত লিখেছি। আমাকে আর খবরের কাগজ প্রভৃতি পাঠিও না। চেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। ভারতেও যেমন এখানেও তেমনি, সেই পথ চলা, এখানে আবার অপরের বোঝা কাঁধে উঠেছে! এখানে আমি বহুর মধ্যে একজন তার বেশি কিছু নই। এখানে সংবাদপত্র প্রভৃতি আমাদের সম্বন্ধে যা লেখে, সেগুলি আমি অগ্নিদেবকে সমর্পণ করি। তোমরাও তাই কোরো। সেটাই হবে ঠিক কাজ।

গুরু মহারাজের কাজের জন্যে জনসাধারণের কাছে কিছু প্রচার প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল। তা হয়েছে এবং ঐ পর্যন্তই ভাল। এখন, প্রাকৃতজন আমাদের সম্বন্ধে আবোল তাবোল কি বলছে, তার প্রতি কিছুতেই তোমরা কর্ণপাত করবে না। আমি যাই করি, যা কিছু জমাই, রাস্তার লোকের কথায় তার কাজে কি ব্যাঘাত ঘটবে? প্রিয় ভাইটি আমার, তুমি এখনো ছেলে মানুষ, আর আমার

চুলে পাক ধরেছে। ঐ সব লোকেদের উক্তি এবং মতামতের উপর আমার কতখানি আস্থা, তা এই থেকেই তুমি আন্দাজ করতে পারবে। তোমরা যদি কোমর বেঁধে আমার পিছনে এসে দাঁড়াও তাহলে, সমগ্র পৃথিবী যদি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাতেও ভয় নেই। আমি শুধু এইটুকু বুঝি যে আমাকে অতি উচ্চ মনোভাব পোষণ করতে হবে, আমার বিবেচনায় তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চিঠি লেখা আমার উচিৎ নয়। হ্যাঁ, ভাল কথা, গুণনিধি কোথায়? তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর এবং পরম স্নেহ ভরে তাকে মঠে নিয়ে এসো। তার আন্তরিকতা সন্দেহাতীত এবং সে একজন পণ্ডিত লোক। দু'খণ্ড জমি সংগ্রহের জন্যে তুমি সবিশেষ চেষ্টা করবে, সেজন্যে লোকেরা যা বলে বলুক আমার পক্ষে বা বিপক্ষে সংবাদ পত্রে কেউ লেখে লিখুক, তা লক্ষ্য করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। আর, স্নেহের ভাইটি আমার, আমি তোমাকে ধীরবার অনুরোধ করছি, আর আমাকে কুড়ি কুড়ি খবরের কাগজ পাঠিও না। বিশ্রামের কথা তুমি এখন বল কি করে? যখন এই দেহ পরিত্যাগ করব তখনই বিশ্রামের সময় আসছে। এই মনোভাব নিয়ে উৎসব অনুষ্ঠান কর, যাতে করে সমগ্র দেশ উৎসাহ উদ্দীপনায় মেতে থাকে। সাবাস্! সত্যিই চমৎকার! (প্রেমের বন্যায় নিন্দুকেরা ভেসে যাবে। তোমরা হাতীর সমান তাতে ভুল নেই, শিঁপড়ের কামড়কে ভয় কিসের?

মনে রেখো, দুটো চোখ, কানও দুটো, কিন্তু মুখ একটা। ঔদাসীন্য! ঔদাসীন্য! ঔদাসীন্য। "যারা কল্যাণকর্ম করে তারা কখনো দুঃখ পায় না, প্রিয়।" ভয়? কাকে ভয় করব? এখানে ধর্মধ্বজীরা এবং তাদের সমগোত্রিয় লোকেরা চীৎকার করে ক্ষান্ত হয়ে গেছে—সারা বিশ্বও একদিন স্তব্ধ হবে।

"নীতিনিপুণ (চতুর) ব্যক্তিরা নিন্দাই করুক, আর সুখ্যাতিই করুক, লক্ষ্মী প্রসন্না হোন বা না হোন, মৃত্যু আজই আসুক অথবা শতবর্ষ পরে আসুক—যিনি ধীর তিনি কখনো ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হন না।"

দূতদের সঙ্গে বেশীর পর্যন্ত যাবার দরকার নেই—তাদের কাছে বিদায় করবারও প্রয়োজন নেই। গুরুই সব জোগান দিচ্ছেন, ভবিষ্যতেও দেবেন। কিসের ভয়, ভাই? বড় বড় বাধার মধ্য দিয়েই সব মহৎ কাজ সাফল্যলাভ করেছে। "হে বীর! তোমার পৌরুষ প্রকট কর, যে সব হতভাগ্য কাম-কাঞ্চনের বশীভূত তারা উপেক্ষার পাত্র।" এখন আমি এ দেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছি, সুতরাং এখন আর সাহায্যের প্রয়োজন নেই।

তোমাদের কাছে আমার একটি মাত্র প্রার্থনা এই যে, যে ভ্রাতৃপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমরা আমার সাহায্য করবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়েছো এবং তোমাদের সেই মনোবৃত্তির মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের যে সক্রিয় আবেগ উৎসারিত হয়েছে তাকে তোমাদের প্রভুর সেবায় নিয়োজিত কর। যতক্ষণ না নিশ্চিত উপলব্ধি করছ যে ফল অবশ্যই ভাল হবে, ততক্ষণ মনের কথা প্রকাশ কোরো না। সবচেয়ে বড় শত্রুর প্রতিও মুখরোচক মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করো। খ্যাতি, অর্থ, ভোগ—প্রত্যেক মর্ত্যবাসী কামনা করে, এবং এর দ্বারা যদি দু'দিকই সামলানো যায় (অর্থাৎ ঈশ্বর আর ধনেশ্বরকে যদি সমভাবে ভজনা করা যায়) তাহলে তো প্রত্যেক মানুষই খুবই আগ্রহ প্রকাশ করবে। "কেবলমাত্র সেই মহান সত্ত্ব-ই তাঁর কাজ করতে পারেন, অপরের মধ্যে গুণের পরমাণুকে যিনি পর্বত প্রমাণ করতে পারেন, এবং যিনি পৃথিবীর মঙ্গল ছাড়া আর কোন বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করেন না।" অতএব, নির্বোধের

দল, যাদের বুদ্ধি অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, তারা তাদের বালকোচিত খেলায় মত্ত থাকুক, যখন তারা বুঝবে, গায়ে ছ্যাঁকা লাগবার সম্ভাবনা, তখন তারা আপনা থেকেই সরে পড়বে। তারা চাঁদের উপর থুথু ফেলবার চেষ্টা করুক—সে থুথু তাদেরই গায়ে এসে পড়বে। তাদের যাত্রা শুভ হোক! তাদের মধ্যে যদি কিছু সারবস্তু থাকে তাহলে তাদের সাফল্য ঠেকায় কে? কিন্তু যদি ঈর্ষ্যাপ্রসূত সুতগর্ভ বড়াই সার হয়, তাহলে তাদের সব চেষ্টাই বৃথা হবে। নরমোহন জপমালার সূত্র পাঠিয়েছে। ভাল কথা। কিন্তু তোমাদের জানা উচিৎ আমাদের দেশে যে ধরণের ধর্ম চালু, তা এখানে চলে না। মানুষের রুচির সঙ্গে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। তুমি যদি তাদের হিন্দু হোতে বল তাহলে তারা তোমায় ঘৃণা করবে—আমরা যেমন পাদ্রীদের ঘৃণা করি। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের কতকগুলি ভাব-ধারাকে তারা পছন্দ করে—ঐ পর্যন্ত, তার বেশি কিছু নয়। পুরুষেরা, বেশির ভাগই, ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না। স্ত্রীলোকেরা কিছু আগ্রহশীলা, ঐ পর্যন্ত, কিন্তু বেশি পরিমাণে নয়। অদ্বৈত মতে কয়েক সহস্র লোকের বিশ্বাস আছে। কিন্তু তুমি যদি পুণ্য রচনাবলী, জাতিবর্ণ অথবা নারীদের সম্বন্ধে দুর্বোধ্য রীতিবহুল আলাপ সুরু কর, তাহলে সঙ্গেই তারা তোমাকে পরিহার করে দূরে চলে যাবে। সব কিছুই আস্তে আস্তে ক্রমে ক্রমে এগোয়। তিতিক্ষা, শুচিতা এবং অধ্যবসায়।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

তানসেন

মেটারলিঙ্কের স্ত্রীর গান বাজনার খুব সখ। তিনি একদিন তাঁর স্বামীকে বল্লেন: আমার জন্যে একজন গানের মাষ্টার ঠিক করে দাও না।

মেটারলিঙ্ক বল্লেন: কেন আমাকেই মাষ্টার রাখ না!

স্ত্রী বল্লেন: দূর! তাই কি হয় নাকি? তুমিত সাহিত্য নিয়েই থাক,—গানের কি বোঝ?

মেটারলিঙ্ক হাসলেন। কিছু বল্লেন না।

এর ক'দিন পরে একটা পার্টিতে একজন ভাল বেহালা বাদক বেহালা বাজাবেন এই কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল।

মেটারলিঙ্কের স্ত্রী বল্লেন: চল না, পার্টিতে বেহালা শুনে আসি।

মেটারলিঙ্ক বল্লেন: তুমি আগে যাও, আমি পরে যাচ্ছি। বেহালার বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সারা প্রেক্ষাগৃহ স্তব্ধ হয়ে গেল। আর লোকে বিমুগ্ধ বিহ্বল হয়ে চেয়ে রইল। বেহালা বাদককে দেখেই স্ত্রী দাঁড়িয়ে দেখে চমকে উঠলেন,—এ কী! এ যে মেটারলিঙ্ক স্বয়ং। কী চমৎকার বাজাচ্ছেন তিনি।

শিকাগো বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে বিবেকানন্দ

হিন্দুরা পৌত্তলিক, ধর্ম তাদের মাটির পুতুলের মতনই নির্জীব ও অসার—এই ছিল পাশ্চাত্যের ধারণা। দীর্ঘকালের পুঞ্জিভূত জড়তায় হীনপ্রভ মুমূর্ষুপ্রায় জাতি পরাধীনতার বন্দীশালায় আবদ্ধ! তার ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিস্মৃতির অন্ধকারে উপেক্ষা-ধূলি সমাকীর্ণ।

কার উদাত্ত কণ্ঠে বহু শতাব্দীর সেই শাশ্বত বাণী ধ্বনিত হলো?—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং। নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।" 'হে প্রভু, ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়েও সকল নদী যেমন একই সমুদ্রে পতিত হয়, তেমনি ভিন্ন রুচির সরল ও কুটিল প্রভৃতি নানা পথাবলম্বীদেরও তুমিই একমাত্র গন্তব্যস্থান।'

ভারতীয় তরুণ সন্ন্যাসী কণ্ঠের এই মহান বাণী পাশ্চাত্যের পণ্ডিতজন থেকে সাধারণজনকেও বিস্মিত করে তুললে।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" 'যে যেভাবে মত নিয়েই আসুক না কেন, আমি তাকে সেইভাবেই গ্রহণ করি।'

আজ থেকে সত্তর বছর আগে উত্তর-আমেরিকার অন্তঃপাতী শিকাগো নগরে অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসভায় ভারতীয় ঋষি-আত্মার পবিত্র বাণীকে প্রচার করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বপ্রেমের এবং মহান মৈত্রীর আন্তরিকতার অকৃত্রিম সুরে তিনি যখন আমেরিকাবাসীদের 'ভগ্নী এবং ভ্রাতৃবৃন্দ' বলে সম্বোধন করলেন তখন সকলেই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্কের নৈকট্যের বন্ধনকে গভীর ভাবে অনুভব করলেন। সেদিন সমগ্র আমেরিকাবাসীর সঙ্গে ভারত-আত্মার যে মিলন ঘটালেন স্বামীজী—সেই মিলনই উভয় দেশের মধ্যে প্রগাঢ় পরিচিতির সেতুবন্ধ। ভারতের মুক্তি-আন্দোলন সম্পর্কে আমেরিকাবাসীর প্রত্যক্ষ আগ্রহের মূলে ছিল পূর্ব যুগের এই পরিচিতি। সমকালীন ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আমেরিকা যে বহুপ্রকার সাহায্য পাঠাচ্ছে তার অন্তর্নিহিত কারণও সেদিনের ইতিহাসেই পাওয়া যাবে।

১৮৯৩ সালের সেই ধর্ম-মহাসভায় স্বামীজী প্রদত্ত বক্তৃতাবলী ভারত-আত্মার শাশ্বতবাণী। তরুণ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ সেই বাণীর মূর্ত প্রতীক।

প্রথম দিনের বক্তৃতায় স্বামীজী বিশ্বভ্রাতৃত্বে সকলজনকে আহ্বান করে চিরন্তন ধর্মের স্বরূপকে প্রকাশ করে বলেন,

"সাম্প্রদায়িকতা সঙ্কীর্ণতা ও ধর্ম-মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুদিন থেকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছে—কতবার পৃথিবীর মাটি এর জন্যে নরশোণিতে সিক্ত হয়েছে, সভ্যতা বিপন্ন হয়েছে এবং সমগ্রজাতিকে হতাশায় নিমগ্ন করেছে, তার ইয়ত্তা নেই। এই সব ধর্ম-শয়তান যদি না থাকত, তাহলে মানুষ আজ আরো কত উন্নততর হতে পারত, সমাজ কতখানি এগিয়ে যেতে পারত। এই ধর্ম-সভায়; আজ এর মৃত্যুকাল; এবং আমি সর্বতোভাবে আশা করি যে, এই ধর্ম-সমিতির সম্মানার্থে আজ যে ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত, তা সকল ধর্মোন্মত্ততা তরবারি কিংবা লেখনী মুখে অনুষ্ঠিত সকল প্রকার নির্যাতন এবং বিদ্বেষকে বিদূরিত করে একই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে মহা মিলনের সেতু রচনা করবে।"

স্বামী বিবেকানন্দের এই উদাত্ত আহ্বানের মধ্যে সর্ব মানবের আধ্যাত্মিক মিলনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখে আমেরিকার কবি শ্রীমতী হ্যারিয়েট মনরো তাঁর মনের ভাবকে অকপটে প্রকাশ করে গেছেন এই বলে—

'গেরুয়া বসনধারী সুদর্শন সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিতে উঠে সকলের মন জয় করে নিলেন, সারা শহর মুখরিত হল তাঁর নামে। তাঁর বক্তৃতায় তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ শক্তি, সঙ্গীতময় গম্ভীর কণ্ঠস্বর, সংযত ভাবাবেগ, পাশ্চাত্য জগতের সামনে তাঁর প্রথম প্রস্তুত সেই বাণীর অসীম সৌষ্ঠব—এই সবকিছুর মধ্যে আমরা অপূর্ব সুদুর্লভ এক আবেগে অভিভূত হলাম। শ্রেষ্ঠ বাগ্মিতার সে এক চরম নিদর্শন।'

১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে স্বামীজী হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে যে ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন —তা বেদান্ত দর্শনের মূল কথা।

'আমি' 'আমি' 'আমি'—মুদ্রিত চক্ষে আমি যদি আমার সত্তা সম্বন্ধে চিন্তা করবার চেষ্টা করি, তা হলে আমার মনে এই ভাবেরই উদয় হয় যে এই দেহই আমি। কিন্তু বেদ বলেন, না, আমি হচ্ছি দেহমধ্যস্থ আত্মা—আমি দেহসর্বস্ব নই। দেহ মৃত্যুশীল; কিন্তু আমি মৃত্যুতীর্ণ। আমি এই দেহের মধ্যে আছি; কিন্তু যখন দেহের মৃত্যু ঘটবে আমি তখনও বিদ্যমান থাকব এবং পূর্বেও আমি ছিলাম।'.....

'হিন্দু নিজেকে আত্মা বলে বিশ্বাস করে। সেই আত্মাকে তরবারি ছেদন করতে পারে না, অগ্নিদগ্ধ করতে পারে না, জল আর্দ্র করতে পারে না, এবং বায়ু শুষ্ক করতে পারে না।'

'হিন্দুর বিশ্বাস সেই আত্মা এমন একটি বৃত্ত, যার পরিধি অনির্দেশ্য; কিন্তু যার কেন্দ্র দেহ মধ্যে অবস্থিত, এবং সেই কেন্দ্রের দেহ থেকে দেহান্তরে যাওয়ার নামই মৃত্যু।'

হিন্দুধর্ম বিষয়ে স্বামীজীর সুবিখ্যাত ভাষণে বেদান্ত দর্শনের মূল কথা, আত্মার স্বরূপ ও মানুষের নিয়তি সম্বন্ধে হিন্দু ধর্মের মূল ধারণাগুলি ব্যক্ত হয়। তিনি বলেন যে, যে দিকে লক্ষ্য স্থির রেখে মানুষ চলবার চেষ্টা করছে সেটা হচ্ছে একাত্মবোধের অনুভূতি। মানুষের অমর আত্মা, নিত্য শুদ্ধ, মুক্ত, কারণরহিত ও জাগ্রত জ্ঞানের আধার। মৃত্যুতে মানব-জীবনের দেহান্তর ঘটে মাত্র, ইহ জন্মের গতি নির্ধারিত হয় অতীতের কর্মফলে, এবং ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হয় বর্তমান জীবনের প্রভাবে। ক্ষুদ্র আত্মকেন্দ্রিক 'আমি'র অবসান ঘটাতে হবে যাতে করে বিশ্ব-আত্মার সঙ্গে সমধর্মী যে মানব-সত্তা তার উপলব্ধি করা যায়।'

'বেদ শিক্ষা দেন: আত্মা ব্রহ্ম স্বরূপ, কেবল জড় পদার্থে আবদ্ধ। এই আবদ্ধতার শৃঙ্খল চূর্ণ হলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। এই পরিত্রাণের অবস্থার নাম মুক্তি—সকল প্রকার অপূর্ণতা, মৃত্যু ও দুঃখের হাত থেকে মুক্তি।'

'পূর্ণ হলে মানুষের কি অবস্থা হয়? তিনি অনন্ত আনন্দময় জীবন যাপন করেন। সমুদায় লাভাপেক্ষা পরম লাভ সেই পরমানন্দ ঈশ্বরের সঙ্গে একীভূত হয়ে তিনি পরমানন্দের অধিকারী হন—সকল হিন্দু এ-বিষয়ে একমত। ভারতের সকল সম্প্রদায়ের এই হচ্ছে মূলতত্ত্ব।'

তিনি আরও বলেন, 'আমরা যে শুধু বিশ্বজনীন সহনশীলতা ও উদারতাতে আস্থাবান তা নয়, সব ধর্মের সত্যকেই আমরা স্বীকার করি। পৃথিবীর সকল জাতির সকল ধর্মের নির্যাতিতকে যে দেশ আশ্রয় দিয়েছে সেই দেশে জন্মেছি বলে আমি গর্ব অনুভব করি।'

সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত সত্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন বিবেকানন্দ।

শিকাগো সম্মেলনে তিনি শুধু মাত্র আধ্যাত্মবাদমূলক বিশ্ব-মৈত্রীর বাণীই প্রচার করেন নি, তিনি বিশ্ব-মানবের অভাব অভিযোগের প্রতিও উদাসীন ছিলেন না। সাধারণ লোকের আধ্যাত্মিক পূর্ণাঙ্গতা লাভের পূর্বে মানব সমাজের চরম দারিদ্র্য ঘোচানোর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁর ধরণী কাঁপে যে ব্যথার বাণী ধর্ম-সম্মেলনে ব্যক্ত হয়েছিল—প্রাচ্যদেশের তা বাস্তব চিত্র।

'প্রাচ্যের আসল সমস্যা ধর্ম নয়, ধর্ম সে দেশের লোক অপর্যাপ্তভাবে পেয়েছে; তাদের আসল সমস্যা হচ্ছে অন্নের সমস্যা।.....অনাহারক্লিষ্ট জনগণকে ধর্মোপদেশ দেওয়া, দর্শনের গভীরতত্ত্ব তাদের শোনানো, এসব হচ্ছে জনসাধারণকে অবমাননা করার নামান্তর।'

যারা ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামীর দ্বারা আবদ্ধ, যারা অনুদার তাঁদেরকে লক্ষ্য করে স্বামীজী বলেন, 'ভগবানকে পূজা করার ভান করার চেয়ে বর্বরজাতির লোকেদের মত অলীক দেবতার পূজা করাও ভাল।'

বহুত্বের মধ্যে একত্বই প্রকৃতির নিয়ম—এই মহাপ্রকৃতিকেই হিন্দুগণ উপলব্ধি করেছেন। সেই সমন্বয়ের মহান বাণী স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যের ঘরে পৌঁছে দিয়ে বিশ্বপ্রেম এবং বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পবিত্র বন্ধনে সমগ্র মানব সমাজকে একটি সুখী পরিবারে গঠন করতে চেয়েছিলেন—শিকাগো বক্তৃতা তাই সমগ্র বিশ্বের মানবতা এবং সামাজিকতার এক মূল্যবান ইতিহাস-সম্পদ।

বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের প্রতি ভাবগ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ

সম্পাদকীয়

গভীরতম বেদনার সঙ্গে আমরা অবগত হইলাম স্বামী বিবেকানন্দ আর ইহজগতে নাই। গেরুয়া বসনে সুসজ্জিত শিকাগো ধর্মমহাসভায় বরমাল্যে বিভূষিত স্বামীজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্নেহ-ভাজন প্রিয়তম শিষ্য, নবহিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা নরজীবন ত্যাগ করিয়া তাঁর গুরুর সান্নিধ্যলাভ করিয়াছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সহস্র সহস্র সভাসকে তিনি তাঁর গুরুদেবের মহিমা ও প্রেমের কথা কীর্তন করিয়াছেন ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁর বিজয় পতাকা উত্তোলন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মহাপুরুষ এবং সনাতন হিন্দুধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা কল্পে তাঁর অবদান ছিল বিপুল। যদিও বর্তমান হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ও প্রবাহের উৎপত্তি হইয়াছিল তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় ও মহিমান্বিত গুরুদেবের কাছ হইতে তিনি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে ও অধ্যবসায়ে সেই গৌরবোজ্জ্বল কর্মধারাকে অব্যাহত রাখিয়াছিলেন। যদি বর্তমান হিন্দুধর্মের ভক্তরূপে আমরা পাইয়া থাকি বহু ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী ভাই ও ভগ্নীকে, যদি প্রাচীন হিন্দুধর্ম ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর অন্তরে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া থাকে তবে এই আনন্দময় বহু আকাঙ্ক্ষিত মহামিলনের কৃতিত্ব হইল স্বামীজীর। স্বামীজীর তিরোধান হইল সভাই ঋষিজনোচিত। বিগত শুক্রবার তিনি তাঁর নিত্যকার সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসার পর একটু দেহের অসুস্থতা বোধ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আহ্বান করিলেন তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ ও ভক্তবর্গকে তাঁর শয্যাপার্শ্বে ও জানাইলেন তাঁর নরজীবনের এইবার শেষ। তিনবার গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি ধীরে ধীরে শান্তভাবে মহাপ্রয়াণ করিলেন। দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও তাঁর বিয়োগ ব্যথা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি আর তাঁর শোকগ্রস্ত ভক্ত ও প্রিয়জন দিগকে এই সর্বজন বিদিত কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চাই যে "ভগবৎ প্রিয়জনদেরই মৃত্যু হয় সর্বাগ্রে"।

—দি বেঙ্গলী ৮ই জুলাই ১৯০২

দি বেঙ্গলী—কলিকাতা সংস্করণ

১৫ই জুলাই ইং ১৯০২

বাং ৩১ আষাঢ় ১৩০৯ সাল

বিবেকানন্দ স্মৃতিসভা

বিগত শনিবার ভবানীপুরের একসেলসর ইউনিয়ন স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দের এক স্মৃতিসভার আয়োজন করেন। সাউথ সুবারবান স্কুলগৃহের সুপ্রশস্ত কক্ষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ও বিপুল সংখ্যায় ছাত্রেরা এতে যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। ইউনিয়নের সহকারী সভাপতি বক্তা শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র মিত্র মহাশয় স্বামীজীর উদ্দেশে সমগ্রজাতির শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইয়া এক বক্তৃতা করেন। তিনি সকলকে বলেন পাশ্চাত্যের অনুকরণে শুধু তাঁর মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা বা তৈলচিত্র স্থাপন করিয়া তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইলে চলিবে না এই বিরাট মহামানবের উপদেশ ও জীবনাদর্শকে অন্তরে গ্রহণ করিয়া তাঁর সেই মহান্ আদর্শের পথে অগ্রসর হইতে হইবে যাহা জড়বাদী পাশ্চাত্য জগতেও বিপুল আলোড়ন আনিয়াছে।

সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে ভগিনী নিবেদিতা পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজীর অসামান্য সাফল্যের গোপন রহস্যটুকু উদ্ঘাটিত করেন এবং তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে নির্ভীক ও দুর্বার দেশপ্রেম ছিল মহান্ স্বামীজীর বিশেষ উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ বাঙ্গালী যখন দেশের কাজে কোন সামান্য বিপদের সম্ভাবনার চিন্তায় একেবারেই মূর্ছা যায়।

সভাপতি মহাশয় বাংলায় বক্তৃতা করেন ও তাঁর ওজস্বিনী ভাষায় উপরোক্ত ভাবেই স্বামীজীর কর্মবহুল জীবন ও তাঁর শিক্ষাদীক্ষার উল্লেখ করেন। তারপর সভার সমাপ্তি হয়।

এক টুকরো আলাপ

নরেন্দ্র—হ্যামিল্টনের লেখায় পড়লাম, A learned ignorance is the end of philosophy and the beginning of religion.

শ্রীরামকৃষ্ণ—এর মানে কি গো?

নরেন্দ্র—দর্শনশাস্ত্র পড়া শেষ হলে মানুষটা পণ্ডিত-মূর্খ হয়ে দাঁড়ায়, তখন ধর্ম ধর্ম করেন। তখন ধর্মের আরম্ভ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-Thank you! Thank you!

আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রাচীন ঋষিবৃন্দ-আমাদের বেদ উপনিষদে সুবিপুল আধ্যাত্মিকতা আছে। এই মহাগৌরব সত্ত্বেও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমরা আজ দুর্বল - অতিশয় দুর্বল। আমাদের এই দুর্বলতার এক তৃতীয়াংশ কারণ আমাদের শারীরিক দুর্বলতা ····তোমরা আগে দৈহিক বল অর্জন কর। তারপর ধর্ম করবে। লোহার মতন পেশী ও ইস্পাতের মতন স্নায়ু আর বজ্রের মতন মন তোমাদের লাভ করা চাই। স্বামী বিবেকানন্দ

"এযুগে বিবেকানন্দই জ্ঞানচর্চার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। বেশ অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে এখন বেদান্ত উপনিষদের চর্চা চাই। আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে। তবেই মৃত্যুভয় থাকবে না—অপরকে ভালবাসতে পারবে। তা নয় খালি নিজে, নিজের বউটী ছেলেটী। দুনিয়া যাক আমার কি? এর ঔষধ হচ্ছে ভালবাসা। "Love thy neighbour as Thyself". এই ভালবাসা এখন সন্ন্যাসীদের ভেতরেও নেই। বেদান্ত চর্চা করতে হবে—গাছতলায় বসে নয়—। এবং এ শুধু সন্ন্যাসীদের জন্য নয়। বাড়ীতে স্ত্রীপুত্রের ভিতর, পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যে প্রচার করতে হবে। প্রত্যেক মা প্রত্যেক ছেলেকে এই শেখাবে। তবেই আমাদের দেশের মঙ্গল হবে।" —স্বামী অভেদানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ

"স্বামীজীর জন্মশতবার্ষিক উৎসবে অর্ধ শতাব্দী পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, এই দুর্ভাগা হতভাগ্য সমাজকে তিনি যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় সেখানেই আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, শাসক ও শাসিতের সংঘর্ষ, দুই দুইটা মহাযুদ্ধ, ব্রিটিশ প্রতাপের বিলয়, ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ, পরিবর্তন কিছু কম হইল না। কিন্তু আমাদের ভারতবর্ষ, সেই ভারতবর্ষই রহিয়া গেল! কোটী কোটী নরনারী তাহাদের দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য লইয়া, সহিষ্ণু ভারবাহী বলদের মত সূতিকাগার হইতে শ্মশান পর্যন্ত মন্থর পদে চলিয়াছে, চোখে নৈরাশ্যের নিষ্প্রভ দৃষ্টি শতাব্দীর দুর্বহ বোঝার মেরুদণ্ড বক্র।

আমরা সম্বৎসর পর আর একটা পালপার্বনের মত বিবেকানন্দ জন্মতিথির উৎসব করি, কিন্তু যাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া যাহাদের ব্যথায় ব্যথিত হইয়া তিনি নির্বিকল্প সমাধি পর্যন্ত উপেক্ষা করিয়াছিলেন, যাহাদের কল্যাণের জন্য তিনি পাপ করিয়া খৃষ্টানদের মত অনন্ত নরকে যাইবার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন, হায় তাহারা, তাঁহাকে আজও চিনিতে পারিল না, চিনিবার চেষ্টাও করিল না!!

স্বামীজী বলিয়াছেন, আমি সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছি। যেখানেই গিয়াছি, বেদনায় আমার হৃদয় আপ্লুত হইয়াছে। ভয়াবহ দারিদ্র্য এবং মনুষ্যত্বের দুর্গতি দেখিয়া আমি অশ্রুনিরোধ করিতে পারি নাই। এই সব দেখিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে, যে ইহাদের দারিদ্র্য ও দুর্গতি মোচন না করিয়া ইহাদের নিকট ধর্মপ্রচার করা বৃথা।"

ধর্ম যদি অন্নবস্ত্র সমস্যা সমাধান করিয়া সাধারণকে দারিদ্র্যের পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিতে নাই পারিল, তাহা হইলে লোকে প্রচলিত ধর্মই ধর্মত্রষ্ট হইল।

আজ স্বামীজীর জন্ম-শতবার্ষিকীতে স্বাধীন ভারতের বিষাদময় চিত্র দেখিয়া কে বিবেকের দংশন অনুভব করিবে কাহার চৈতন্য হইবে সেই কথাই ভাবিতেছি। জীবনের সর্বশেষ সায়াহ্নে করুণাকাতর স্বামীজী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিলেন "আজ যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকিত—তাহা হইলে সে বুঝিত বিবেকানন্দ কি করিয়া গেল।"

অম্ল অজীর্ণ, পেটের গোলমাল, বুক জ্বালা থেকে

সত্বর আরামের জন্য

ফিলিপ্‌স

অথবা

মিল্ক অফ্‌ ম্যাগনেসিয়া

ট্যাবলেট

৪ ট্যাবলেটের প্রতি
প্যাকেটের মূল্য ২০ নয়া পয়সা

ফিলিপ্‌স ট্যাবলেটে আছে খাঁটি ফিলিপ্‌স মিল্ক অফ্‌ ম্যাগনেসিয়া যা পরিবারের সকলের পক্ষে সবচেয়ে দ্রুত কার্যকরী ও নির্ভরযোগ্য অম্লনাশক।

যখনই অম্লজনিত বদহজম আপনাকে পীড়া দেবে তখনই শুধু কয়েকটি ফিলিপ্‌স ট্যাবলেট চিবিয়ে খেয়ে ফেলুন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আপনার অস্বস্তিকর বুক জ্বালা আর পেট ফাঁপা ভাব কমে যাবে, পাকস্থলী সুস্থ হবে এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর হবে।

বাড়ীর সকলের জন্য সুবিধাজনক প্যাক ৭৫ ও ১৫০ ট্যাবলেটের বোতলে পাওয়া যায়।

প্রস্তুতকারক রেজিষ্টার্ড ব্যবহারকারী:
ম্যাক্স মেডিকেল স্টোর্স (ম্যানু:) প্রাঃ লিঃ

এখন

অধিকতর নিরাপত্তার জন্য
এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকে পাওয়া যায়।

পাইওনীয়ার

হোসিয়ারী সামগ্রী
সব সময় ব্যবহারোপযোগী
রকমারী গেঞ্জী, টী-সার্ট, টেনিস-সার্ট,
চেন সার্ট, ড্রয়ার এবং ট্রাঙ্ক্।
সেই সঙ্গে দেখিবেন—শীতে ব্যবহারোপযোগী
'ইন্টারলক' কোয়ালিটি এবং 'ALWOOL'
উলেন গেঞ্জী।

যাবতীয় পাইওনীয়ার হোসিয়ারী সামগ্রী স্ট্যাণ্ডার্ড সাইজ অনুযায়ী তৈরী এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ধৌত। প্রথম গাত্রাবরণ হিসাবে এই প্রকার হোসিয়ারী দ্রব্যাদিই ব্যবহার করা উচিত। আপনার নিকটস্থ ডিলারের নিকট আজই যেখুন—

দক্ষিণ কলিকাতা

ভবানীপুর হোসিয়ারী মার্ট—রূপালী সিনেমার পার্শ্বে; রঞ্জিৎ স্টোর্স—লেক মার্কেট; পোষাক স্টোর্স, শোভনালয় এবং বাঙ্গীগঞ্জ মিলিনেরি—গড়িয়াহাট জংশন।

মধ্য কলিকাতা

কমলালয় স্টোর্স—ধর্মতলা স্টোর্স—৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট; মহম্মদ মসীরুদ্দিন—১০৩, এস, এন্, ব্যানার্জি রোড; এইচ, আমেদ এণ্ড সন্স—সি ৫/৬, নিউ মার্কেট; দেশানা—লিণ্ডসে ষ্ট্রীট; ইস্টবেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—৩, নির্জাপুর ষ্ট্রীট; ইস্রাণী স্টোর্স—২১/১, নির্জাপুর ষ্ট্রীট; কমলালয় লিঃ; অমরদেব স্টোর্স; শ' হোসিয়ারী এবং ইণ্ডিয়ান পাইওনীয়ার্স—কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট; বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স—২১১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (চনঠনিয়া)।

উত্তর কলিকাতা

আর, এল, সাহা এণ্ড কোং—রাধা সিনেমা বিল্ডিং; হোসিয়ারী এণ্ড টেক্সটাইল এম্পোরিয়াম—হাতীবাগান বাজার; ন্যাশনাল ভ্যারাইটি স্টোর্স এবং মডার্ণ মিউজিয়াম—মিনার সিনেমার সন্নিকট।

বড়বাজার

কস্তুরচাঁদ আনন্দীলাল; অশোকা; ভাওয়ারীলাল অমরচাঁদ; বাবুলাল বিনয়কুমার; বিজয় ট্রেডিং কোং; রামগোবিন্দ কৃষ্ণদত্ত; রাজলক্ষ্মী হোসিয়ারী; রামেশ্বর লাল বিরমানন্দ, পান্নালাল আগরওয়াল; মহাবীর স্টোর্স; নন্দী ব্রাদার্স; ক্যালকাটা হোসিয়ারী স্টোর; প্রাণজীবন ব্রাদার্স; বিহারীলাল রাধেরমন; বাঁতিয়া স্টোর্স; ভারত স্টোর্স; মহাদেওপ্রসাদ হরারাম ঘেত্রী; অরুক অরোরা; চম্পালাল রামরতন; বেঙ্গল হোসিয়ারী এজেন্সী; নিউ ভারতলক্ষ্মী হোসিয়ারী।

চীনাবাজার—দে ব্রাদার্স, শরৎচন্দ্র দে, ভোলানাথ মুখার্জি এণ্ড ব্রাদার্স।

পাইওনীয়ার নিটিং মিলস্ লিমিটেড

পাইওনীয়ার বিল্ডিংস্, কলিকাতা—২ : : ফোন : ৫৬-২৯৮৩

অটুট বন্ধুত্ব

যেখানে দুজনের রুচির মিল, সেখানেই বন্ধুত্ব বেশী স্থায়ী হয়। এই সাইকেলের বেলাতেই দেখুন না।
র‍্যালে সাইকেলের উৎকর্ষ সম্বন্ধে সকলেই একমত। কারণ সুদৃশ্য ও নিখুঁত এই সাইকেলটি বছরের পর বছর ব্যবহারের পরেও সমান নির্ভরযোগ্য থাকে।

র‍্যালে

বিশ্ববিখ্যাত বাইসাইকেল

SRC-59 BEN

= আসন্ন-প্রকাশ করেকটি বই =

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের	জরাসন্ধের		প্রবোধকুমার সান্যালের
নূতন ব্যোমকেশ উপন্যাস	সাম্প্রতিকতম গ্রন্থ		নবতম উপন্যাস
মগ্ন মৈনাক	**ছবি**		**কাঁচকাটা হীরে**
সৈয়দ মুজতবা আলীর	তারাশংকরের	নীহাররঞ্জন গুপ্তের	কালীপদ ঘটকের
নবতমা	নূতনতম উপন্যাস	নবতম উপন্যাস	কয়লাখনির পৃষ্ঠপটে লেখা উপন্যাস
টুনি মেম	**সংকেত**	**ঝড়**	**মৃদঙ্গার**
তরুণকুমার ভাদুড়ীর		অপূর্বমণি দত্তের	
নূতন উপন্যাস		সেকালের দিল্লী-সিমলার চাঁসি কারায় এশানো কাহিনী	
সন্ধ্যাদীপের শিখা		**স্বর্গ হইতে বিদায়**	

মিত্র ও ঘোষ : ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

চ্যবনপ্রাশ

আজও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যৌষধি

শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ বিশুদ্ধ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

চ্যবনপ্রাশ সর্দ্দি, কাসি, শ্বাস-কাস স্বরভঙ্গ এমনকি দুরারোগ্য ফুস-রোগেও বিশেষ ফলপ্রদ। যে সমস্ত শিশুদের দেহ ক্ষীণ, (Rickets) চ্যবনপ্রাশ তাদের পরম বন্ধু। ক্ষয়রোগ, দুর্ব্বলতা, রক্তপিত্ত ও ধাতুঘটিত রোগে ইহা মন্ত্রের মত কাজ করে। শক্তিহীন, ক্ষীণাঙ্গ ও জরাগ্রস্ত লোকের পক্ষে ইহা অমৃততুল্য রসায়ন। চ্যবনপ্রাশ সুস্থ শরীরে সেবন করিলে বল, বীর্য, মেধা, কান্তি, বৃদ্ধি হয়। ইহা পুরুষ, স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ সকলের পক্ষেই সকল ঋতুতে সমান উপযোগী।

বহু প্রশংসাপত্রের মধ্যে মাত্র কয়েকটি—

প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়াছি। ঔষধটি শাস্ত্রীয় ব্যবস্থায় যত্নসহকারে প্রস্তুত করা হইয়াছে জানিয়াছি।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুক্ত রমা-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ইতিমধ্যেই বিশেষ ফলপ্রদ বলিয়া বাজারে সুপ্রমাণিত হইয়াছে।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি ডক্টর রাধাবিনোদ পাল মহাশয় বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে আমি বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর কালিদাস নাগ এম. এ ডি. লিট্ বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করে বিশেষ উপকার পেয়েছি।

ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম. এ. (কলি) ডি. লিট্, (লণ্ডন) বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্ কর্তৃক প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় বলেন :— বাজারে প্রচলিত চ্যবনপ্রাশ অপেক্ষা শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ বহুগুণে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই।

ডক্টর ভালকীবল্লভ ভট্টাচার্য এম. এ. পি. এইচ্. ডি বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ আমার পরিবারের মধ্যে অনেকে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহারা এই ঔষধের উপকারিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদমের চ্যবনপ্রাশ আমি ব্যবহার করিয়াছি। ইহার কার্য-কারিতা প্রশংসনীয়।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ পি এইচ্. ডি বলেন :— শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্ প্রতিষ্ঠানের চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিলাম। ইহা ব্যবহার করিয়া সর্দ্দি কাশির উপকার হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ এম, এ মহাশয় বলেন :— "শ্রীআয়ুর্ব্বেদম্" নামক প্রতিষ্ঠান হইতে শাস্ত্রোক্ত উপাদানে বিশুদ্ধ-ভাবে প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি।

মূল্য : প্রতি সের—১৬৲ এক পোয়া শিশি—৩৲ অর্ধ পোয়া শিশি—২৲
এক ছটাক শিশি—১৲ ভি. পি. খরচ স্বতন্ত্র।

শ্রীআয়ুর্ব্বেদম

সিনকম সম্পর্কে তথ্যাদি

সিনকম—২ নামক কৃত্রিম উপগ্রহটির আকৃতি ঢাকের মত। এর এক প্রান্তে রয়েছে অ্যান্টেনা, যার সাহায্যে বার্তাদি বিনিময় সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান হচ্ছে। অপর প্রান্তে রয়েছে 'অ্যাপোজি রকেট নজ্‌ল' এবং চারটি অ্যান্টেনা। এই অ্যান্টেনাগুলি ভূতল থেকে নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিমেট্রি ব্যবস্থার অংশ।

গঠনের বিচারে উপগ্রহটি দুটি অংশে বা ইউনিটে বিভক্ত। বাইরের অংশে রয়েছে সৌর কোষগুলি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং জেট পরিচালন ব্যবস্থা। ভিতরের ইউনিট বা সিলিণ্ডারটির সঙ্গে রয়েছে অ্যাপোজি মোটর এবং আরও নানারকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

উপগ্রহটিতে বিবিধ বার্তা বিনিময় ব্যবস্থা, নিয়ামক ব্যবস্থা এবং টেলিমেট্রি ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এর ফলে মহাকাশযানটি অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য হয়েছে। বিবিধ ব্যবস্থাবলীর ফলে একটি যন্ত্রাংশে কাজ না করলে অপর একটি যন্ত্রাংশ সে জায়গায় কাজ করে।

গঠন : আকৃতি—ঢাকের মত, পরিমাপ—ব্যাস ২৮ ইঞ্চি, উচ্চতা ১৫½ ইঞ্চি, মোট ওজন—১৮৭ পাউণ্ড (রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময়), ওজন (অ্যাপোজি মোটর কেস ও ইন্ধন বাদে)—৮৬ পাউণ্ড।

বিদ্যুৎশক্তি : সৌরকোষ—৩,৮৪০টি ; সৌরকোষ উৎপাদিত বিদ্যুৎ—২৫ ওয়াট, ব্যাটারীর মোট ক্ষমতা—৩৪ ওয়াট।

কক্ষপথে পরিক্রমা : পৃথিবী থেকে সর্বোত্তম দূরত্ব—২২,১১০ মাইল, পৃথিবী থেকে সর্বনিম্ন দূরত্ব—২,৮০০ মাইল, গতিবেগ—ঘণ্টায় ৬,৮০০ মাইল, পৃথিবী পরিক্রমা—১,৪৪৪ মিনিট অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা ১৪ মিনিট।

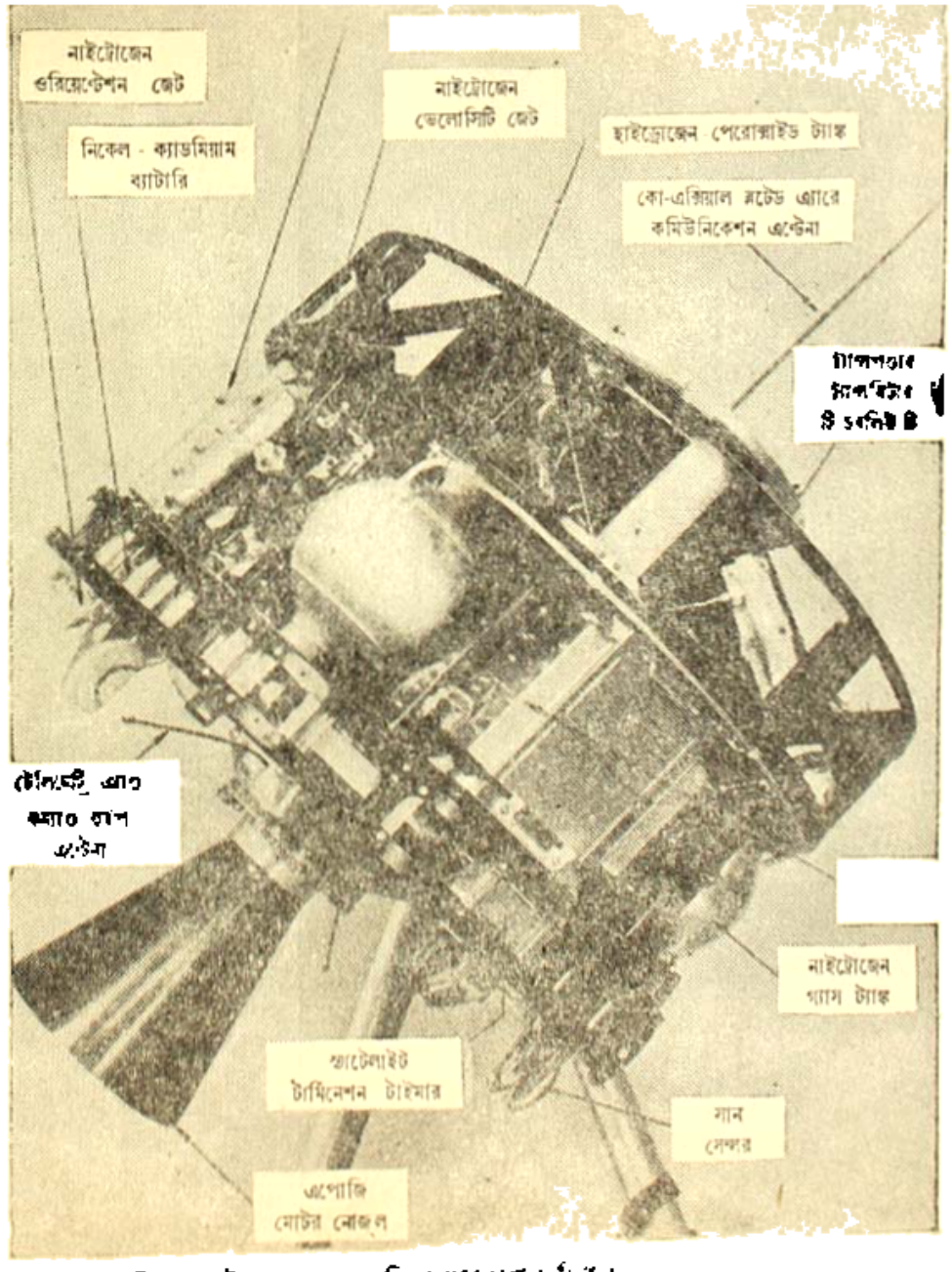

সিনকম উপগ্রহে যন্ত্রপাতি সমাবেশের চিত্র।
সৌর ব্যাটারিগুলি ছবিতে দেখানো

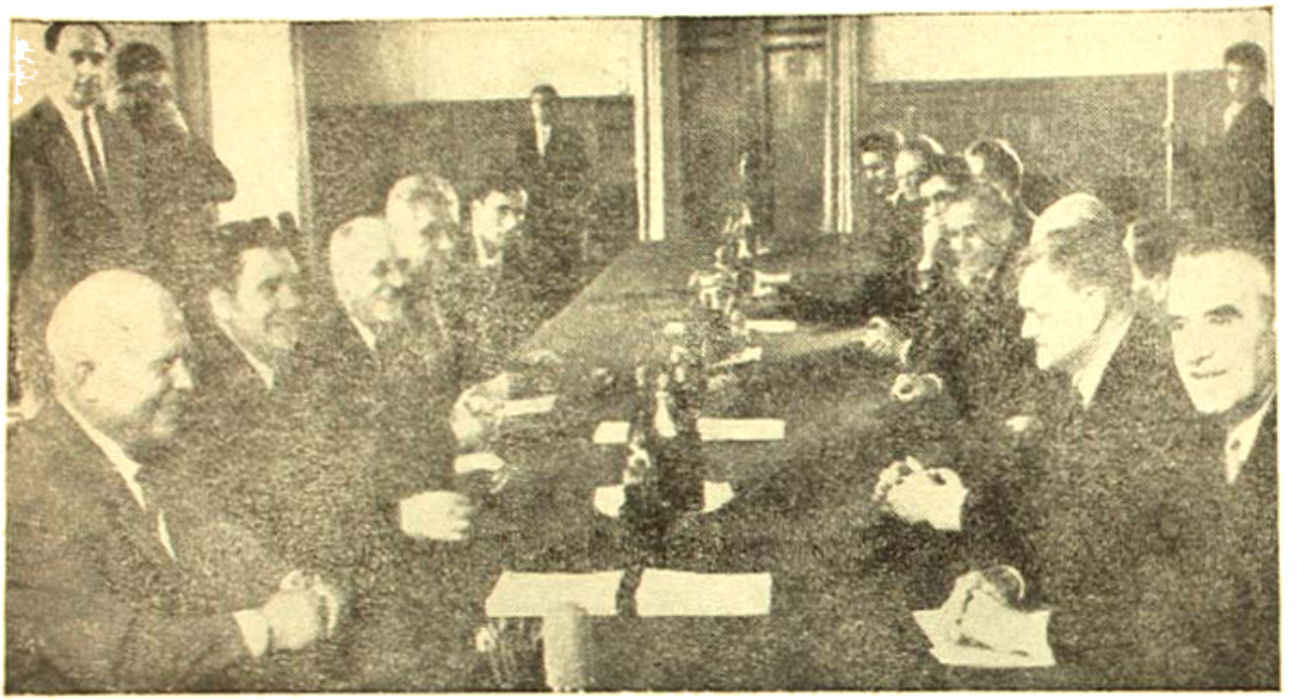

পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ সম্পর্কিত আলোচনায় বন্ধ্যে বৈঠকে মিলিত সোভিয়েট, বৃটিশ ও মার্কিণ নেতৃবর্গ। ছবিতে (বামদিক) চেয়ারম্যান ক্রুশ্চভ ; (দক্ষিণে) লর্ড হেলশাম ও মিঃ হ্যারিম্যান।

ভূমিক্ষয় নিবারণের উদ্দেশ্যে বিকানীর রাজ্যের এই বালিয়াড়িতে তেল ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পরে এখানে বৃক্ষ রোপন করা হবে এবং তার ফলে হাওয়ায় বালু উড়িয়ে নেওয়া বন্ধ হবে।

মস্কো থিয়েটার ইনষ্টিট্যুটের ছাত্র অউরবেক রাইবায়েক
কথাকলি ভঙ্গিতে স্বর্গ ঈগল নৃত্য করছেন।

দেশ-বিদেশ :

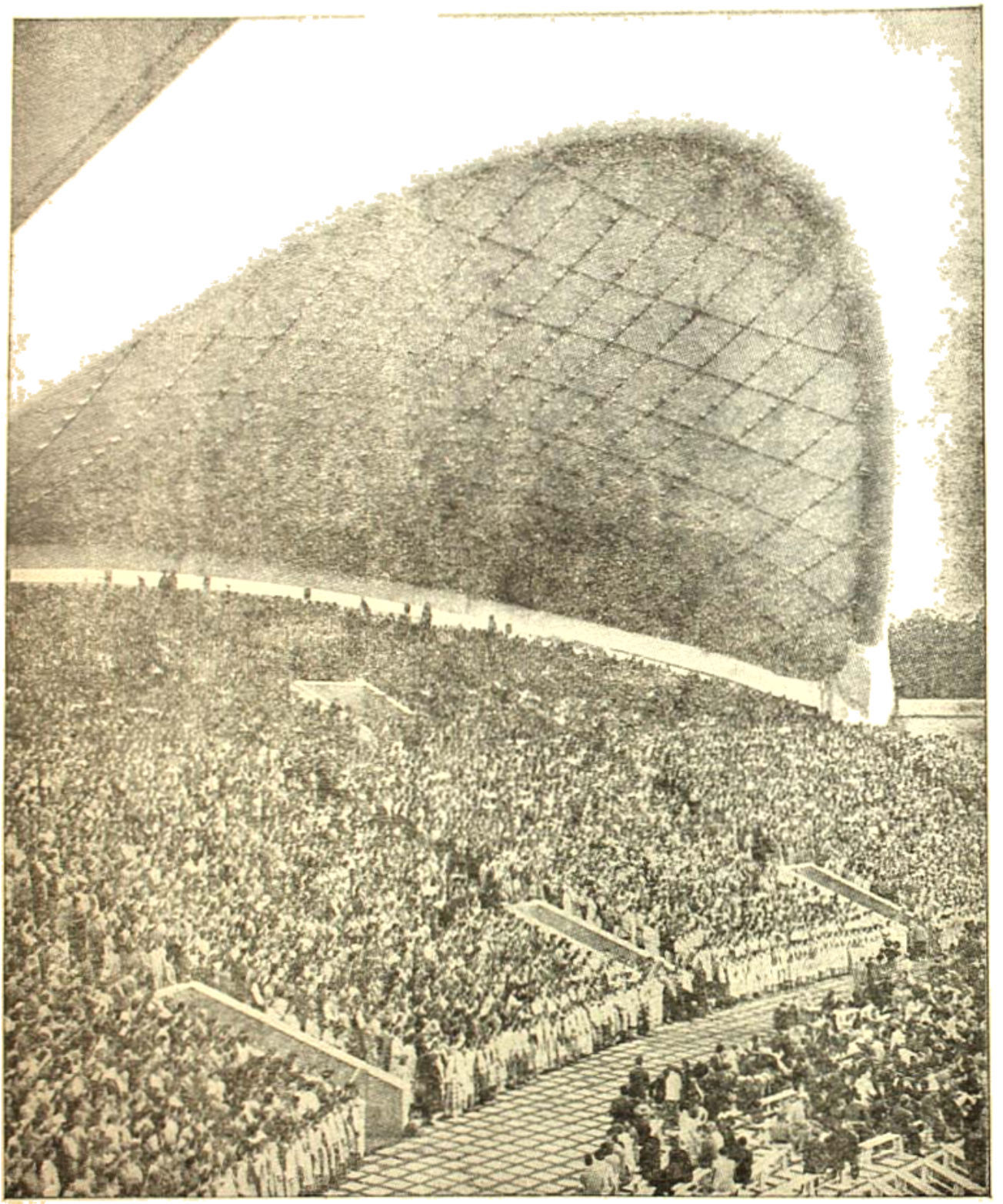

সোভিয়েত রাশিয়ার বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির চিরাচরিত সঙ্গীত উৎসবে
হাজার হাজার ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন।

চিত্রে ভারত

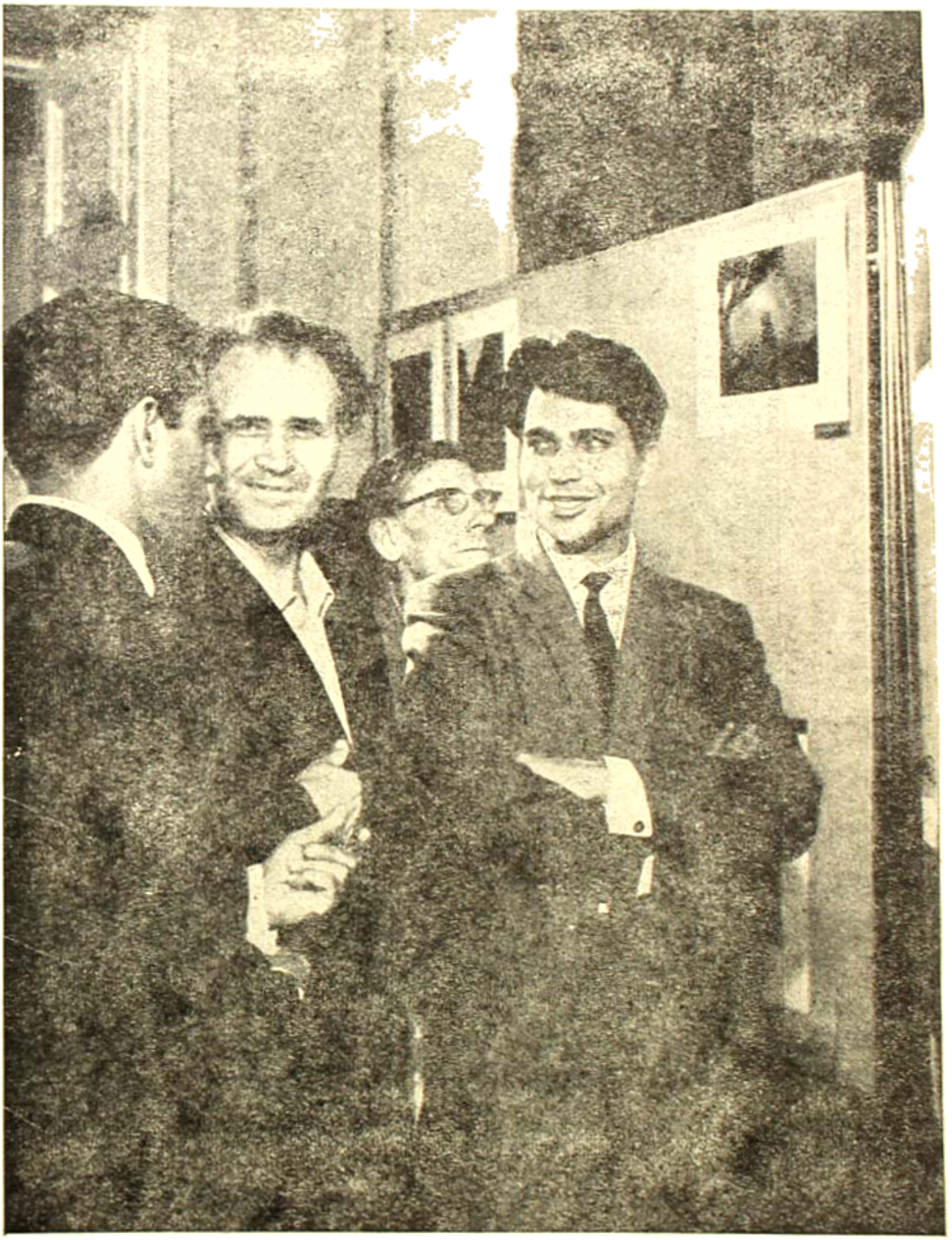

সম্প্রতি মস্কোর মৈত্রী-ভবনে প্রখ্যাত আলোক-চিত্রশিল্পী শ্রীহিমেন্দ্র শাহার তোলা ফটোগুলির একটি সুন্দর প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী টি. এন. কাউল।

মস্কোয় ভারতীয় শিল্পমেলা ঃ

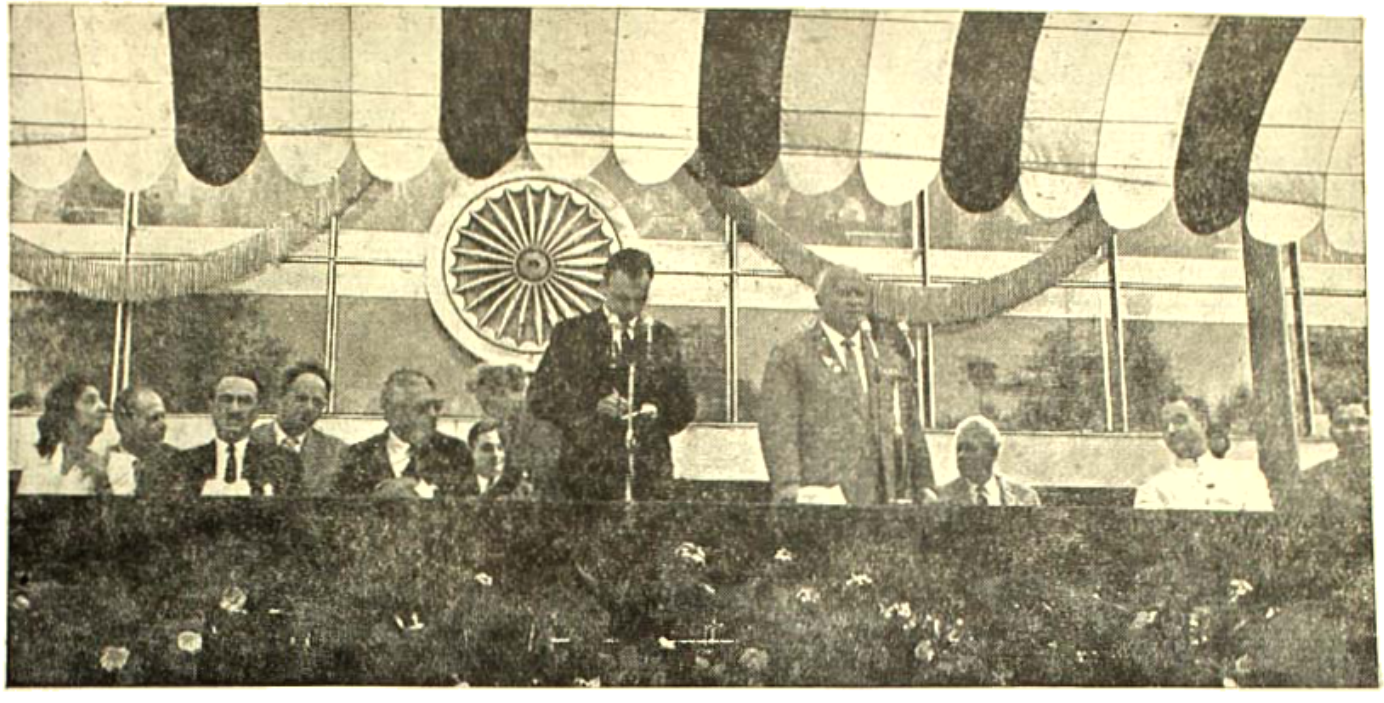

মস্কোতে ভারতীয় শিল্পমেলার উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে সোভিয়েত রুশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রী এন. এস. খ্রুশ্চভ ভাষণ দিতেছেন।

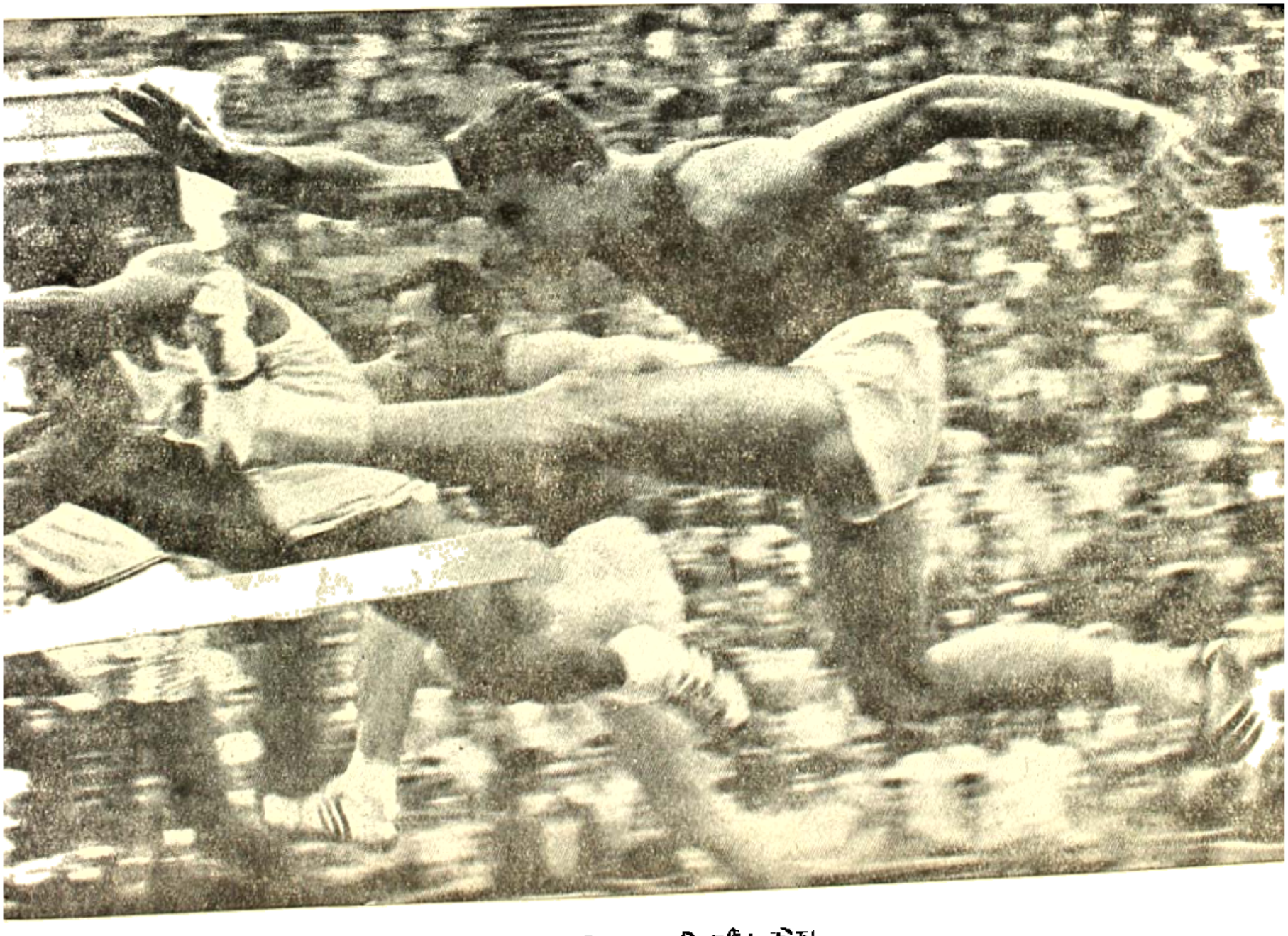

[illegible] একটি কঠিন ক্রীড়া

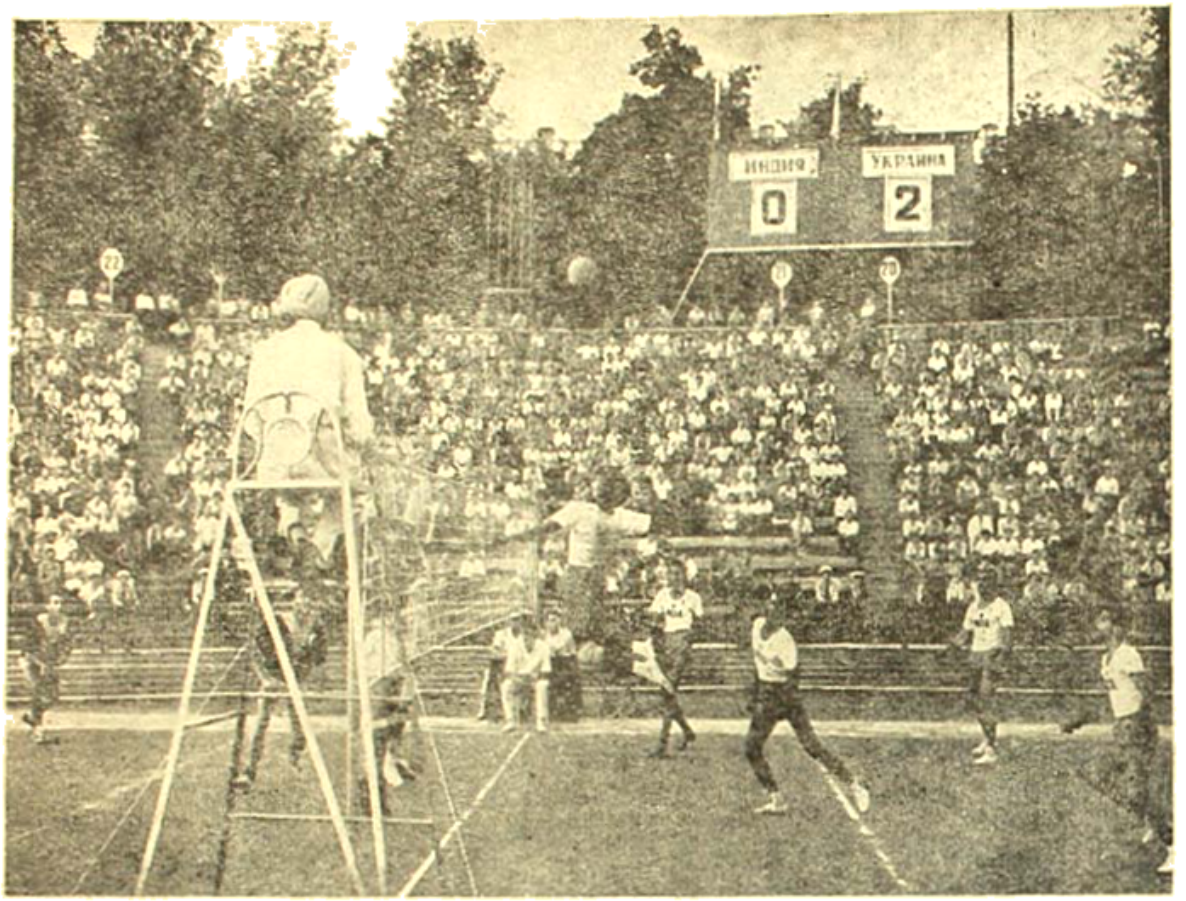

ভারতীয় ভলিবল টিমের সোভিয়েত সফরকালে উক্রাইনের খেলায় একটি উত্তেজনাকর দৃশ্য। ভারতীয়রা আক্রমণ করছেন।

উক্রাইনের ক্রীড়াশিক্ষক মিখাইল পিমেনোফ বহু ভারতীয় ভলিবল খেলোয়াড়কে শিক্ষা দিয়েছেন। কিয়েফে পুরণো বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হল।

ব্রিটিশ ভাস্কর্য

অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

ব্রিটিশ ভাস্কর্যের উল্লেখে আজ প্রথমেই যাঁদের নাম স্মরণে আসে—তাঁরা হলেন জ্যাকব এপস্টিন, হেনরি মুর, ক্লাক্ড ডবসন, এরিক গিল। এঁরাই ব্রিটিশ ভাস্কর্যের স্বতন্ত্র-ঐতিহ্যের স্রষ্টা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

কারণ, প্রাচীন বৃটিশ ভাস্কর্যের যা নিদর্শন পাওয়া যায়, তাতে ইউরোপের গ্রীকো রোমান শিল্প ঐতিহ্যের প্রবল প্রভাবে ব্রিটেনের দেশজ স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত। ব্রিটেনের প্রাচীন ইতিহাসে রোমান আধিপত্য এর কারণ। উদাহরণ স্বরূপ গ্লাস্টারশায়ারের সেন্টারের কাছে প্রাপ্ত ঘোড়সওয়ারের মূর্তি খোদিত ড্যানিকাস আলা ইণ্ডিয়ানা'র কথা উল্লেখ করা যায়। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের এই মূর্তিটিকে "ইণ্ডিয়ানা" (ভারতীয়) নামটি খোদিত থাকায় কিছু মনালোড়ক দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পধারার সঙ্গে এর আকস্মিক সাদৃশ্য আবিষ্কার করলেও আসলে যে এটি আদি ও অকৃত্রিম রোমান ভাস্কর্য শিল্পের ধারারই বাহক তা অনুরূপ অন্যান্য ঘোড়সওয়ারের মূর্তিগুলির সঙ্গে তুলনা করলেই বোঝা যাবে। সিস্টারেই ড্যানিকাস মূর্তির পাশে থ্রেসিয়ান ঘোড়সওয়ার মূর্তিটির কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। ব্রিটেনের প্রাচীন ভাস্কর্যের ইতিহাস তাই প্রধানতঃ রোমক শিল্প ও শিল্পী-পুষ্ট শিল্প-কলার ইতিহাস।

ড্রম-বাদক—উইলিয়াম মোসকোম্বে জন্

রোমের সঙ্গে ব্রিটেনের শিল্পধারার এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ মধ্যযুগের শেষ কাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থেকেছে। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইতালীতে শিল্পক্ষেত্রে যে রেনেসাঁস বা পুনর্জাগৃতির সূচনা হয়েছিল, তার প্রভাবও ইওরোপের অন্যান্য দেশের মতোই ইংল্যাণ্ডেও পড়েছে। রেনেসাঁ শিল্পের বৈশিষ্ট্য হল মানুষ ও তার কৃতির মর্যাদার স্বীকৃতি। শিল্পে এই মানব প্রাধান্য কিছুটা পরিমাণে প্রাচীন গ্রীক শিল্পের আদর্শকে পুনরুজ্জীবিত করে ইওরোপের শিল্পধারায় এক বলিষ্ঠ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছিল। ইতালী থেকে এই রেনেসাঁ শিল্পধারা ইওরোপের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়লেও ইতালীর শিল্প-ঐতিহ্যগত মধ্যযুগীয় মিস্টিসিজমের সঙ্গে মানবতার সংমিশ্রণ সর্বত্র সুচারু ভাবে সম্পন্ন হয় নি। আর ইংলণ্ডে সে শিল্প আন্দোলন হয়েই বিলম্বে এবং আরোপিত আকারে গিয়ে পৌঁছেছিল। ব্রিটেন রেনেসাঁ-শিল্পকে আত্মস্থ করতে পারেনি, বিদেশী শিল্প ও ভাস্কর্যের যথা হলবেন, হবেন্স ভ্যান ডাইক ও লেলি-র মাধ্যমে রেনেসাঁ শিল্পের সেখানে বস্তুতঃ আমদানীই ঘটল ব্রিটেনের শিল্প

In science, read, by preference, the newest works ; in literature, the oldest. The classic literature is always modern.

—Bulwer

দেশ-বিদেশ :

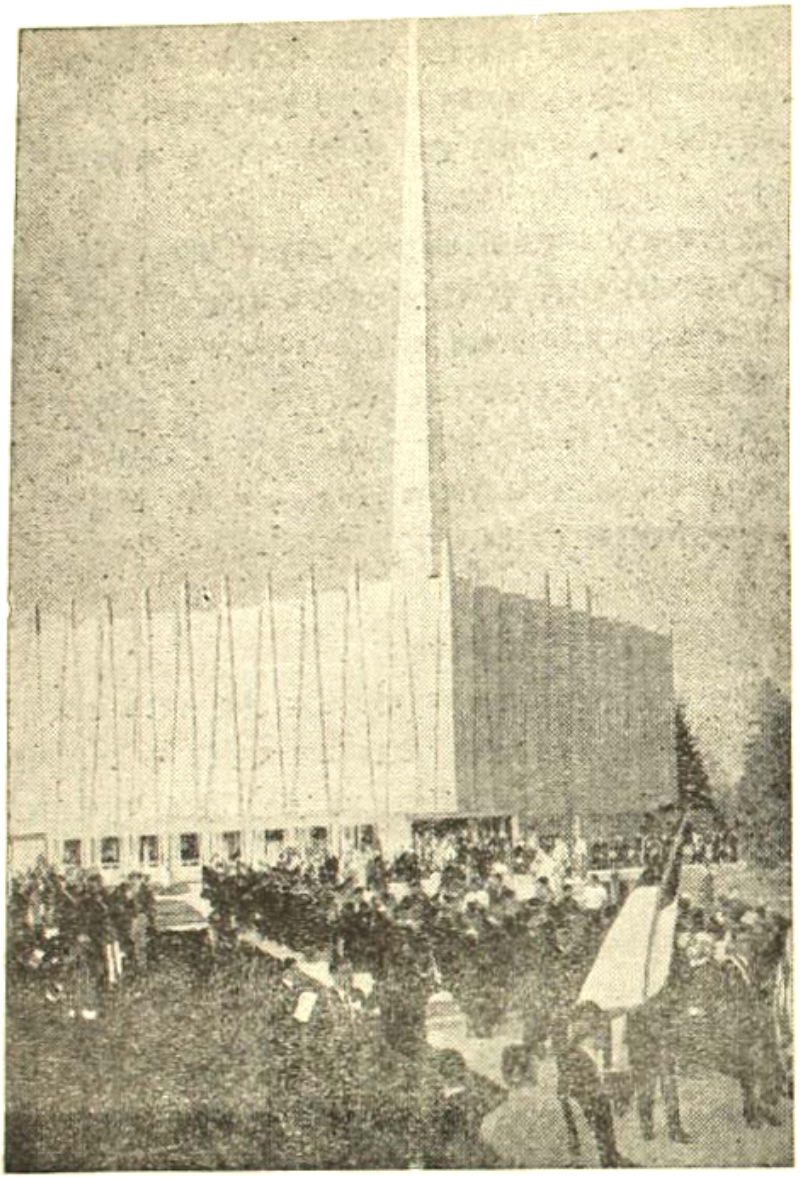

ক্রাইস্ট চ্যাপেলের সামনে দিয়ে "নোবেল হল অব সায়েন্সের" দিকে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

গত মে মাসে আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের মিনেসোটা রাজ্যের ক্ষুদ্র সহর সেন্ট পিটারস্থিত গুস্তভাস অ্যাডলফাস কলেজের বিজ্ঞান ভবন যা হল অব সায়েন্স আলফ্রেড নোবেল-এর নামে উৎসর্গ করা হয়। অনুষ্ঠানে ২৬ জন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী সমাগত হয়েছিলেন। এই উপলক্ষ্যে আমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এতগুলি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আজ পর্যন্ত অন্য কোথাও দেখা যায়নি।

সুইডেনের অধিবাসী আলফ্রেড বার্নার্ড নোবেল ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ও শিল্পপতি। তিনি প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করে গিয়েছেন। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, ভেষজ বিজ্ঞান এবং সাহিত্য ও শান্তির ক্ষেত্রে যাঁদের কাজকর্ম মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকর বলে পরিগণিত হবে, তাঁদের মি: নোবেল তাঁর উইলে সঞ্চিত অর্থের আয় থেকে ঐ পাঁচটি ক্ষেত্রে পাঁচটি সমপরিমাণ অর্থের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করে গেছেন। পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হলে সমগ্র বিশ্বের সকলেই পুরস্কার পেতে পারেন। এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্যই তিনি আজ বিশ্ববিখ্যাত।

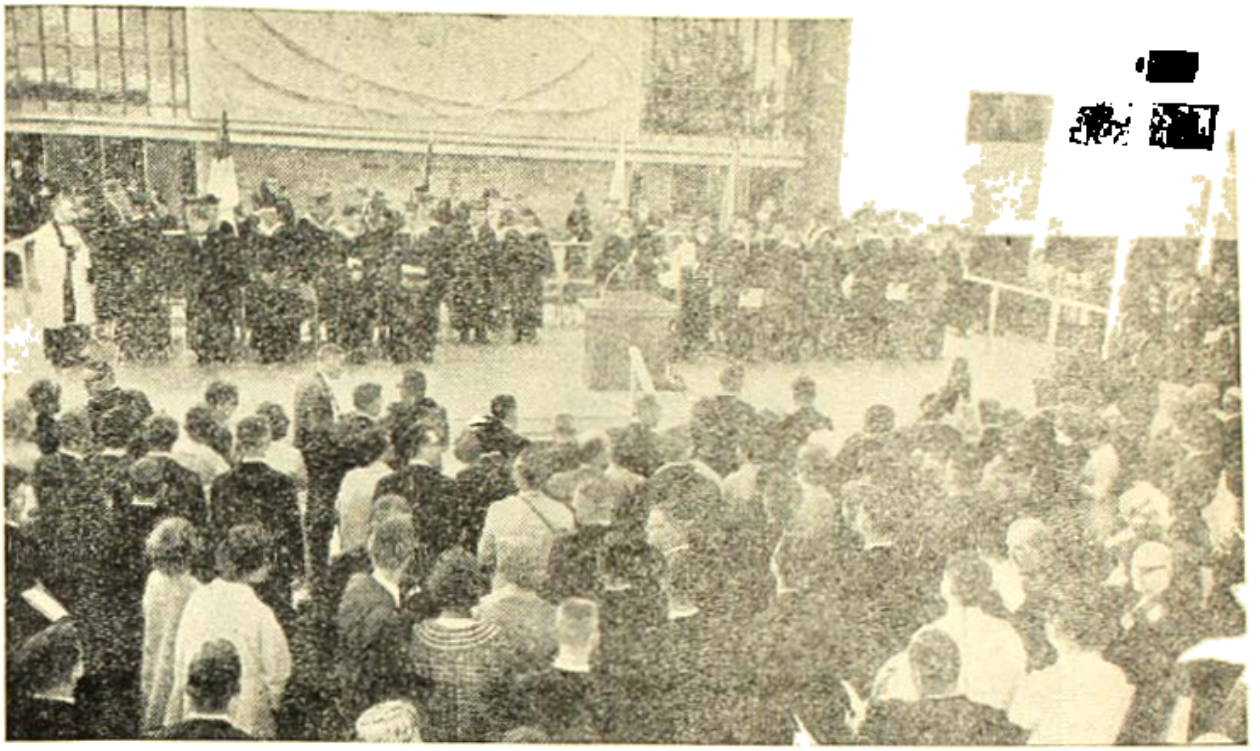

ছাত্র এবং শিক্ষকবৃন্দ ও নব প্রতিষ্ঠিত [illegible] হলের দিকে যাচ্ছেন।

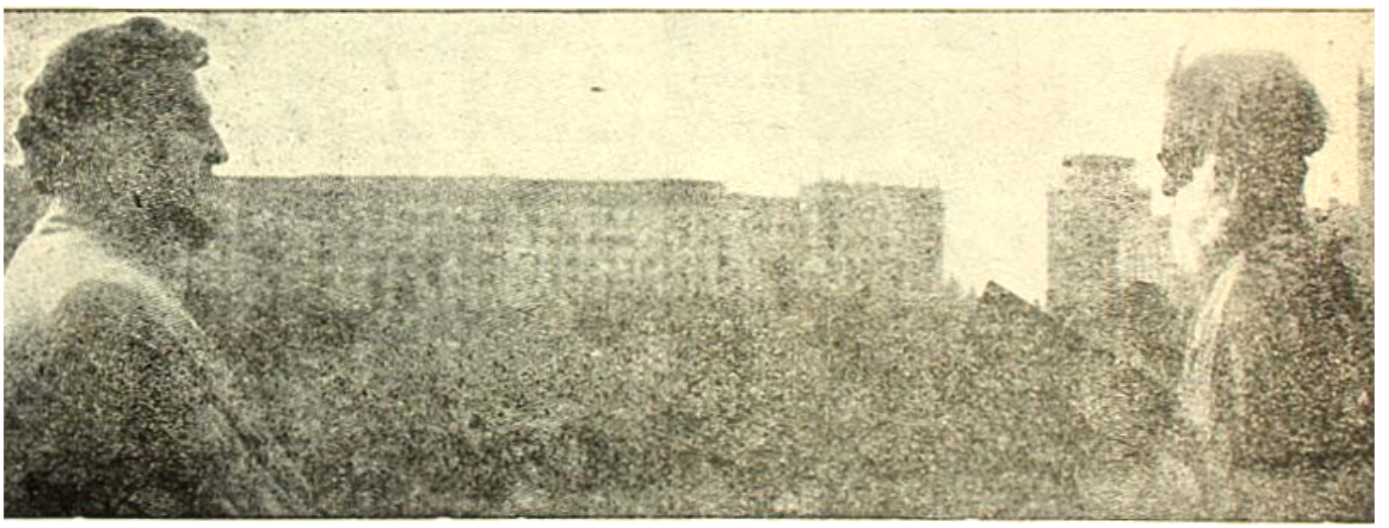

কিছুদিন পূর্বে মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে হাজার হাজার ছাত্র জমায়েত হন আর্কিমিডিসের জন্মোৎসব পালন উপলক্ষে। আর্কিমিডিসের ভূমিকায় দেখেছিলেন স্নাতকোত্তর ছাত্র লোগিনফ। অপর একজন ছাত্র ভি. মেরশিন (তিনিও প্রাচীনকালের গ্রীকদের পোশাকে ছিলেন) 'আর্কিমিডিস'কে অভিনন্দিত করেন।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ জেনারেল অরুণ চৌধুরী
মার্কিন বৈমানিকদের স্মারক-চিহ্ন উপহার দিচ্ছেন।

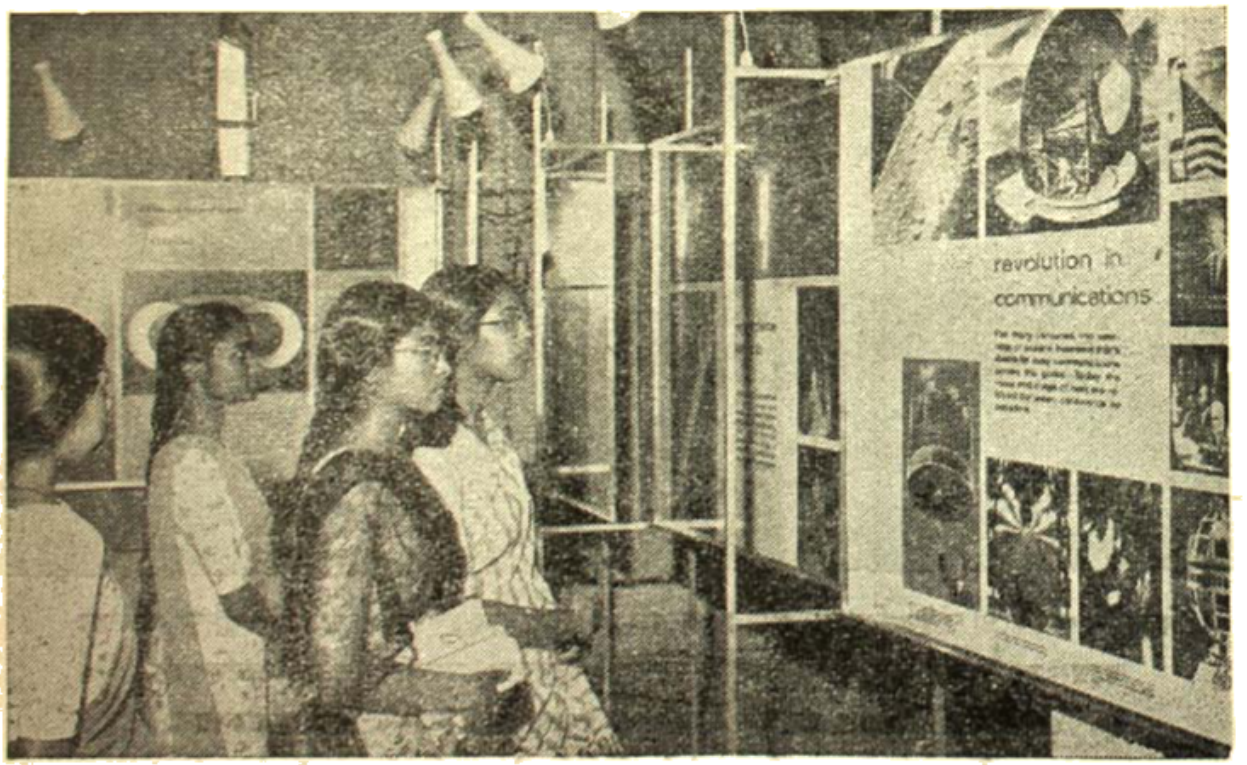

রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রদর্শনীতে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্যানেলে।

বিমানযোগে লাদাকে ভারতীয় সেনাবাহিনীদের কাছে কিভাবে সরবরাহ করা হচ্ছে তারই একটি দৃশ্য।

একজন বিমান বাহিনীর সদস্য সি-১৩০ পরিবহন বিমানকে সঙ্কেত পাঠাচ্ছেন।

দেশ-বিদেশ :

"ইলিয়ড এর "হিরো" নাটকের অভিনয়ের কুশিলবদের পুরস্কার দান করছেন
রাজস্থানের রাজ্যপাল ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ।

খেলাধুলা :

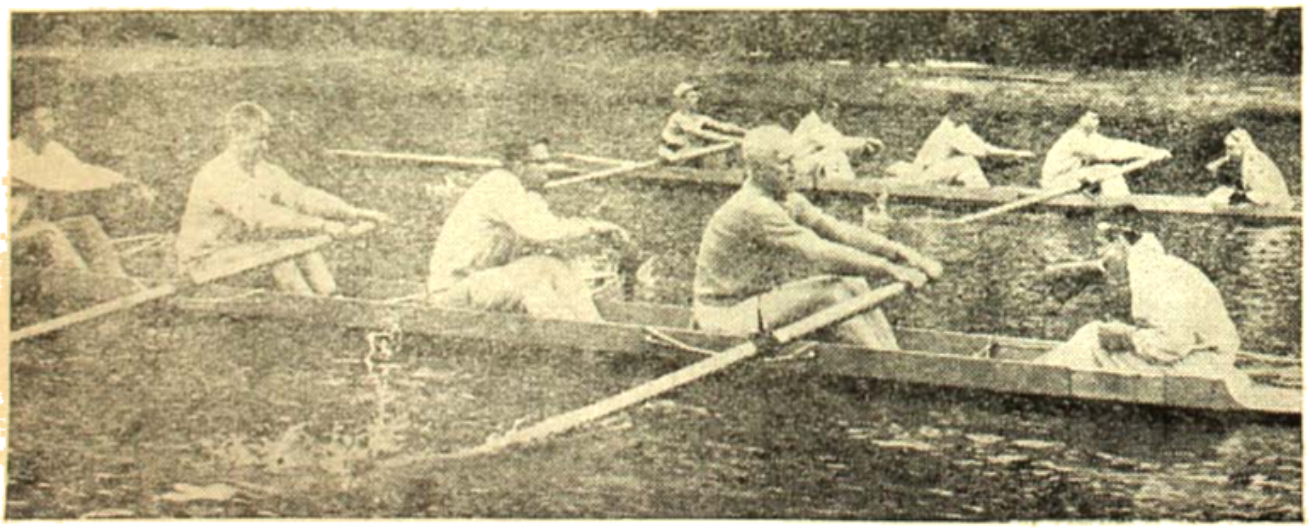

একেডিটার বিদ্যালয়ের দলটির সঙ্গে বাইচ খেলার এক মহড়ায় অক্সফোর্ড ব্রাদার্সের আমির দিচ্ছেন।

মহিষাসুরমর্দিনী

পুজোয় চাই নতুন জুতো

Bata

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

ক্যান্থারল

হেয়ার টনিক ও ব্যাকব্রাশ

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

লাবণি

ভ্যানিশিং ও কোল্ড ক্রীম

লাবণি (স্নো) ভ্যানিশিং ক্রীমের ব্যবহারে শুধু যে মুখের পাউডারকে দীর্ঘস্থায়ী করে তাই নয়, আপনার মুখের সাথে সর্বদায় এক মধুর সুষমা এনে দেবে।

রাত্রে লাবণি কোল্ড ক্রীমের আত্যাহিক ব্যবহারে আপনার ত্বকের মালিন্য দূর করে তাকে সজীব ও সুন্দর করে তুলবে।

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ

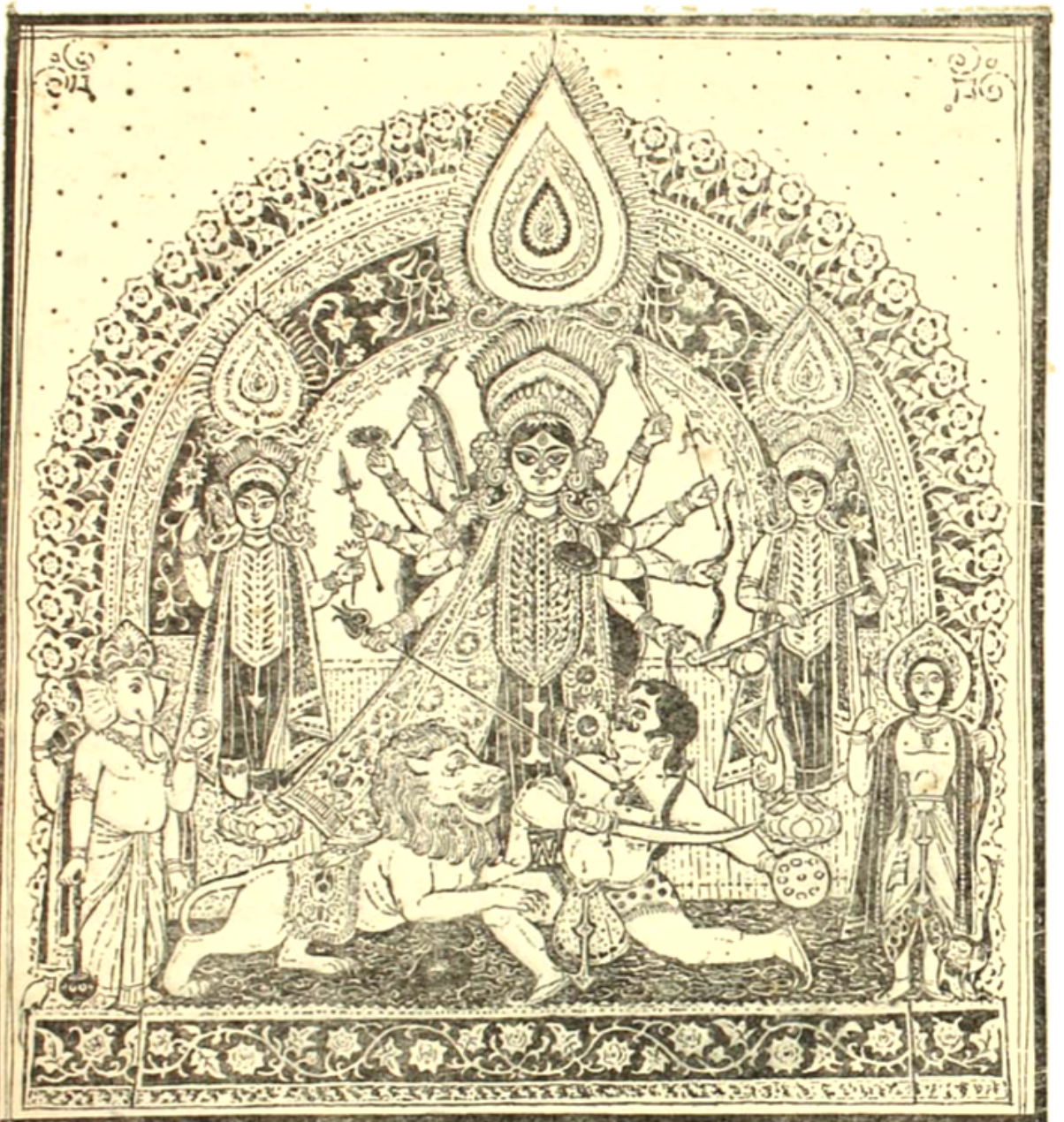

"...ওই কি মা? মা ওই মা! চিনিলাম, ওই অমরে জননী জন্মভূমি - ওই মৃন্ময়ী - মৃত্তিকাকলেবরা - অনন্ত রত্নভূষিতা - কঙ্কাল কালকান্তে বিচ্ছুরা! বজ্রমুষ্টিত দশভুজা - দশদিকে - দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা অস্ত্রে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রুবিমর্দিত বীরজন কেশরী, শক্তি নিম্নে। এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না - আজি দেখিব না, কাল দেখিব না - কালস্রোত যাবে না, যখন দেখিব না - কিন্তু একদিন দেখিব - দিগ্ভুজা, নানা প্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী - দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যা বিজ্ঞানরূপিণী, সঙ্গে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্য-সিদ্ধিরূপী গণেশ। আমি সেই কালস্রোতে দেখিলাম এই ভুবনমোহিনী রূপপ্রতিমা।"

এই বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাদীপ্তিতে দেখা দেবী বঙ্গপ্রতিমা প্রায় শতবর্ষ পরে আজ আমাদের সমক্ষে জাগ্রত! দেবতোষণ ডাবর নিরাপদ নিষ্কণ্টক মর্ত্তমর্ম থেকে।

কে, সি, দাস, প্রাইভেট লিমিটেড
রসোমালাই-এর স্রষ্টা
কলিকাতা, বোম্বাই

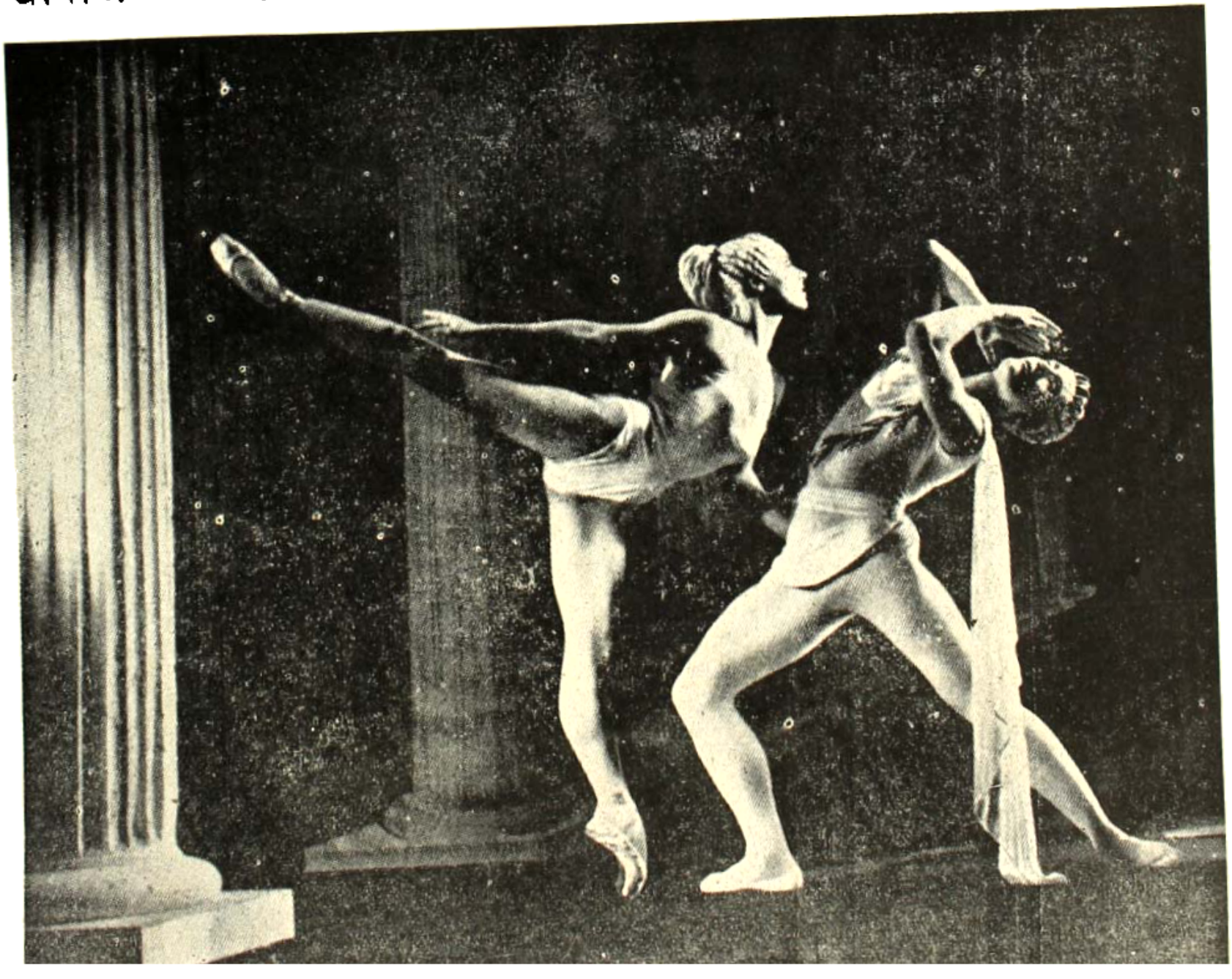

ব্যালে নৃত্যের

ফ্রান্সের অনুপম ব্যালে নৃত্যের একটি নিদর্শন

প্যারিসের রঙ্গমঞ্চে ফরাসী শিল্পীদের ব্যালে

আমেরিকা

ব্রিটেন

ব্রিটেন

ব্যালে নৃত্যের অপরূপ ছন্দে জনৈক শিল্পী

অপূর্ব নৃত্যভঙ্গিমায় ব্যালে শিল্পীযুগল

একটি ঐতিহাসিক তৈলচিত্রে ব্রিটেনের ব্যাপ্ত

화보 1

রাশিয়ান ব্যালেরিনা মায়া প্লিসটাসকিয়া হংস নৃত্যের একটি অনুপম ছন্দে

বিষয়ে নির্ভুল ভাবে কাজ করতে সাহায্য করবে। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকরা সেই দিকে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। মহাকাশ পথে আজ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে একটি আর্থগ্রহস্টেশন—যেটি চন্দ্রলোকে যাত্রার পথে প্রথম সোপান।

চাঁদে যাবার রাস্তা

পৃথিবীর মত ২৭ টি গোলক যদি এক সরলরেখা বরাবর পাশাপাশি সারি দিয়ে রাখা যায় তাহলেই পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত একটি পুল তৈরি হতে পারে। সেই পুলের দৈর্ঘ্য

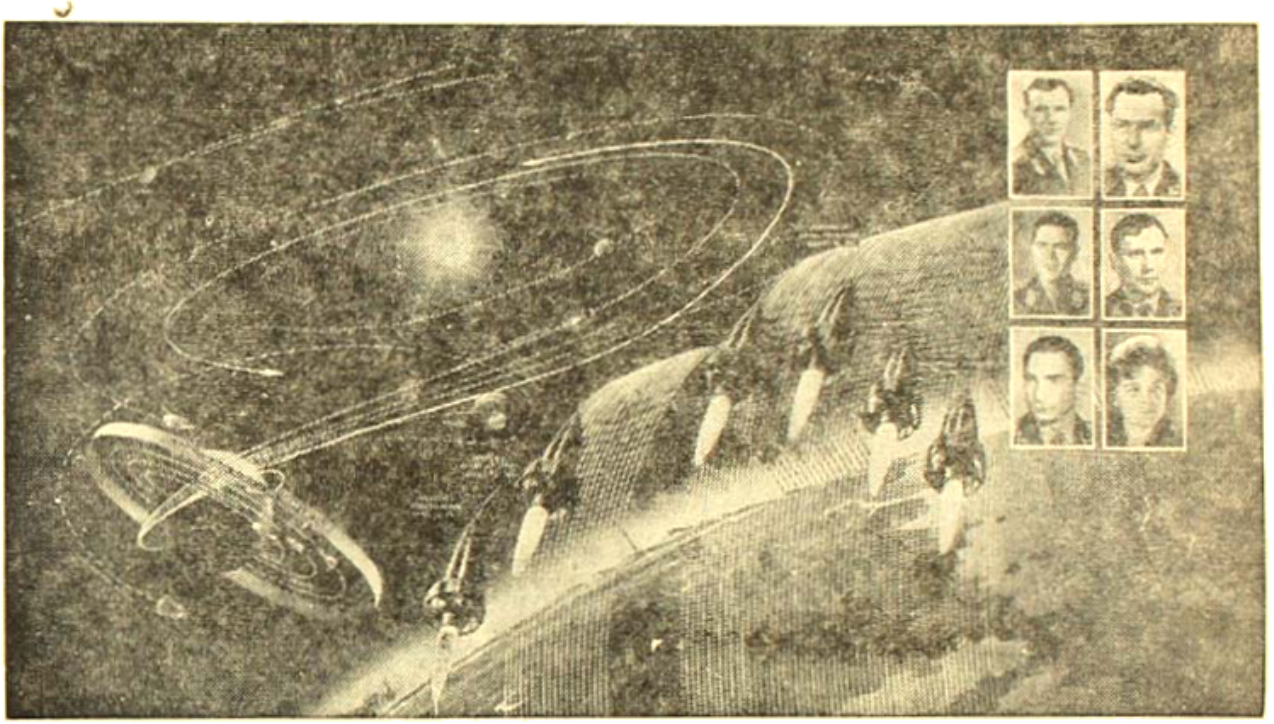

পৃথিবীর ঘেরের ৯ গুণ। মহাজাগতিক মানদণ্ডের মাপে সে দূরত্ব নেহাতই নগণ্য। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবী থেকে চাঁদে যাওয়াটা সম্ভবত এক মামুলী ব্যাপার হয়ে যাবে কলকাতা থেকে দিল্লী যাবার মত। কিন্তু মঙ্গল বা শুক্রে যাওয়া অত সহজ হবেনা। সে রাস্তা উত্তর মহাসাগরের জাহাজপথের মতই দুর্গম।

সৌরমণ্ডলে এ পর্যন্ত যে ৩০টি উপগ্রহের কথা আমরা জানি সেগুলির মধ্যে চাঁদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। চাঁদ আয়তনে এত বিরাট যে তাকে পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহগুলি অনেক ছোট; এমনকি মঙ্গলের "ফোবস" ও "ডিমস" নামে যে ২টি উপগ্রহ আছে সেগুলির ব্যাস মাত্র ১০।১২ মাইল এবং মঙ্গল থেকে সেগুলির দূরত্ব ১২।১৪ হাজার মাইল মাত্র। আমরা যদি মঙ্গল গ্রহের বাসিন্দা হতাম কিম্বা মঙ্গলের সঙ্গে পৃথিবী যদি উপগ্রহ বন্ধন করে নিত তাহলে মহাকাশে স্টেশন পেতে আমাদের খুবই সুবিধা হয়ে যেত; এত কষ্ট করে আর্থগ্রহ স্টেশন তৈরি করতে হোত না।

বিশ্ব-সাহিত্য

দেশ-বিদেশ :

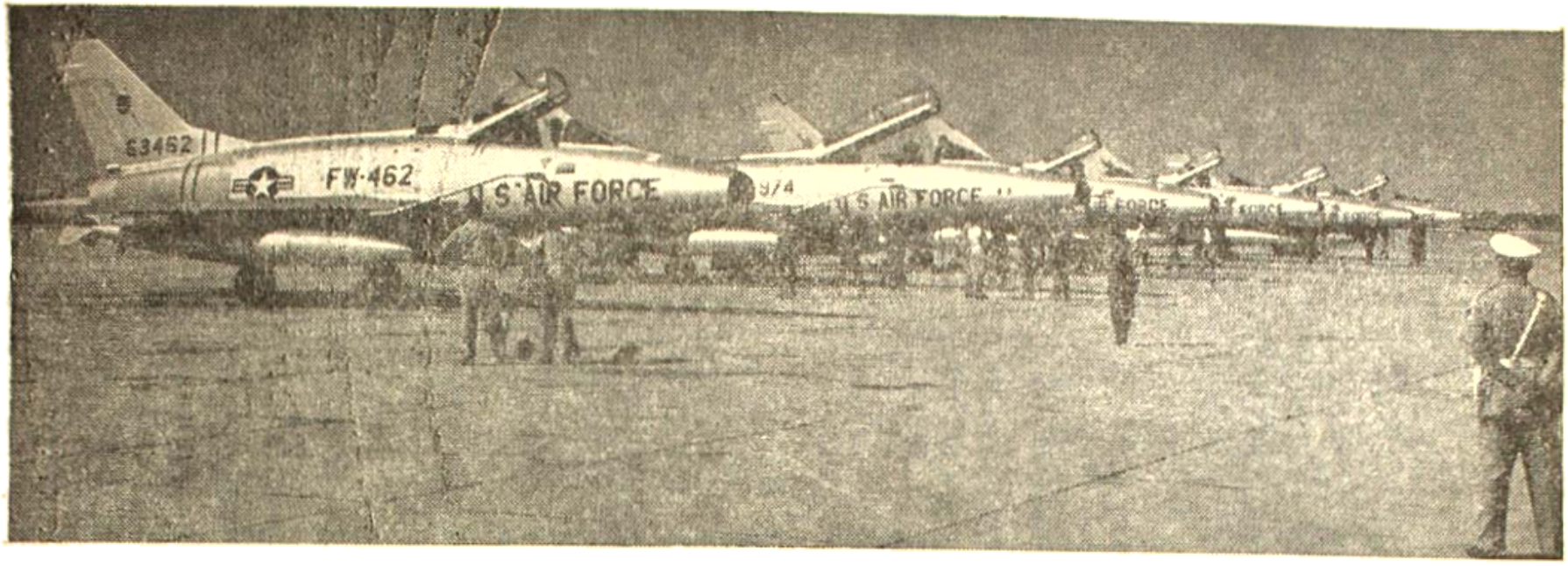

মার্কিণ বিমান-বাহিনীর "এফ—১০০" শ্রেণীর ১৮টি জেট বিমানযুক্ত বিমান প্রতিরক্ষা মহড়া'র যোগদানের জন্য নবাগিন্নীর পালাম বিমান ঘাঁটিতে এসে পৌঁছেছে—এখানে তাদের কয়েকটিকে দেখা যাচ্ছে।

দেশ বিদেশ:

নয়াদিল্লীতে আর্ট কার্ণিভ্যালে শিশুরা ছোট ছোট টুকরো জুড়ে নানারকম জিনিষ তৈরী করছে। খেলনাগুলির পরিকল্পনাকারী মি: ভিক্টর ডি এ্যামিকো নিবিষ্টচিত্তে তাদের কাজ দেখছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট পত্নী মিসেস কেনেডী এই উপহারটি দিয়েছেন।

দেশ-বিদেশ :

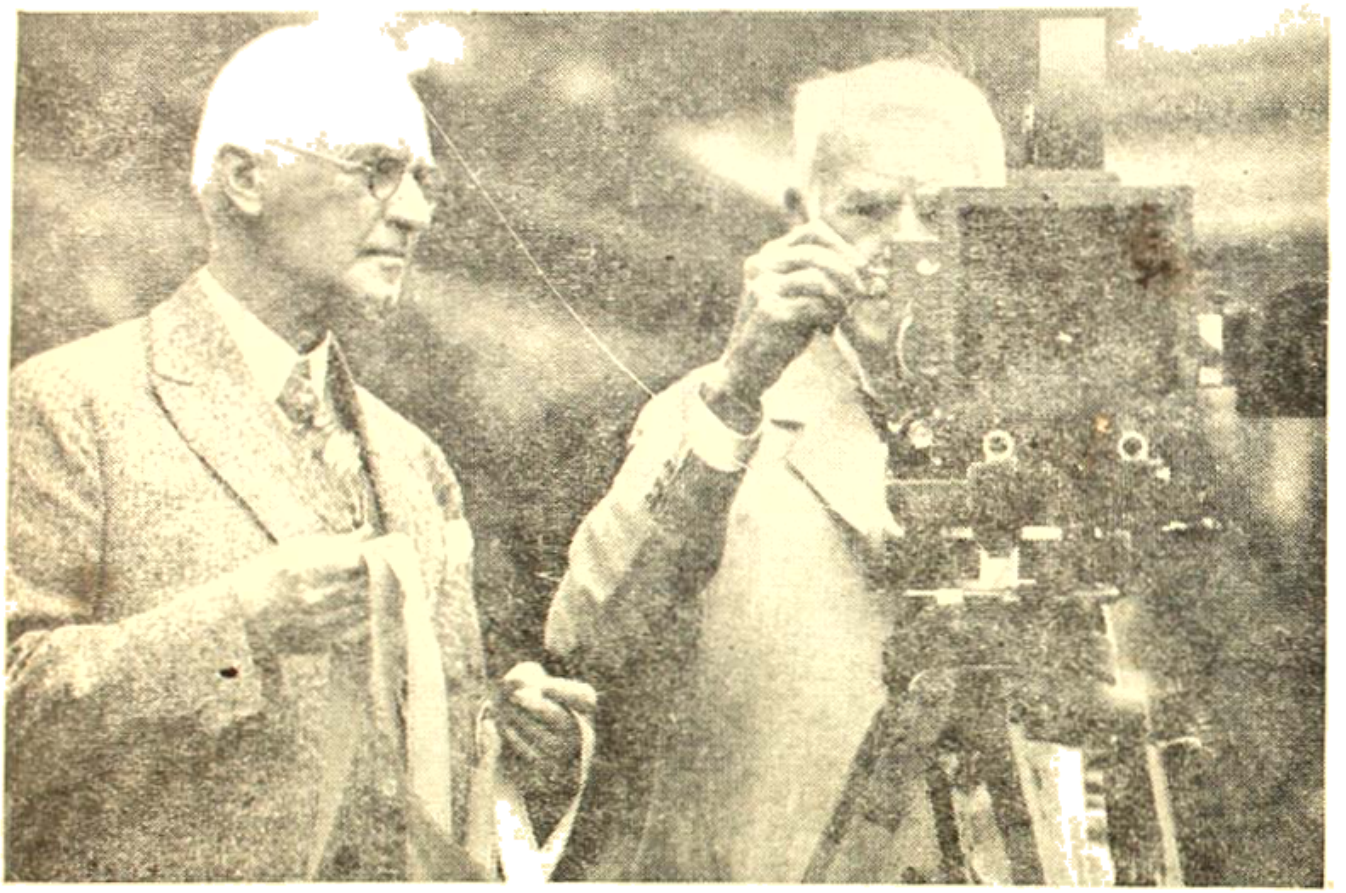

১৯২৮ সালে জর্জ ইস্টম্যান উদ্ভাবিত প্রথম কোডা-কালার ফিল্মে
ছবি তুলছেন টমাস আলভা এডিসন (ধক্কিণে)।

বহু রাষ্ট্র, ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় ভবনকে আরও সুন্দর করার জন্য অনেক মূল্যবান উপহার দিয়েছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের জেনারেল এসেম্বলি ভবনের তোরণপথে অবস্থিত গ্রীস্ কর্তৃক প্রদত্ত জিউসের প্রতিমূর্ত্তি তার একটি নিদর্শন।

UNITE
NATIO

প্রতিটির রাষ্ট্রসঙ্ঘের অভ্যর্থনা
খুলে দেখানো হয় তাদের সকল কথা
বুঝিয়ে দেবার জন্যে বিশটি রাষ্ট্রের ষাট জন
মহিলা প্রতিনিধি সব সময়েই প্রস্তুত

U N

/
7

প-ভারতী

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

জীবনের যজ্ঞশালায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শুক্তি-সৈকত (উপন্যাস)
যোগিনাথ মৈত্রেয়

ব্যঙ্গচিত্র।

স্বামী বিবেকানন্দ (সচিত্র সংযোজন)

ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বামীজী (১৮৯৯)

এই সংখ্যায়

চলতি দুনিয়া—	৪৬০
এই প্রথম—অভিষেক—শ্রীগীতা বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৬৪
দেশ-বিদেশ—	৪৬৯
চমক—	৪৭৭
সাহিত্য ও সাহিত্যিক—অল্ডাস হাক্সলির জীবনদর্শন—অমল হা	৪৭৯
পুস্তক সমালোচনা—	৪৮২
স্বামী বিবেকানন্দ (সচিত্র সংযোজন)	৪৮৩
বিবেকানন্দ জীবন-কাহিনী—	৪৮৫
স্বামীজীর চিঠি—	৪৯৬
শিকাগো ধর্ম-সম্মেলনে বিবেকানন্দ—	৫০৬
স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণ—	৫১০
বিবেকানন্দ স্মৃতিসভা—	৫১১
স্বামী বিবেকানন্দ—	৫১২

ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

দেশ-বিদেশ :

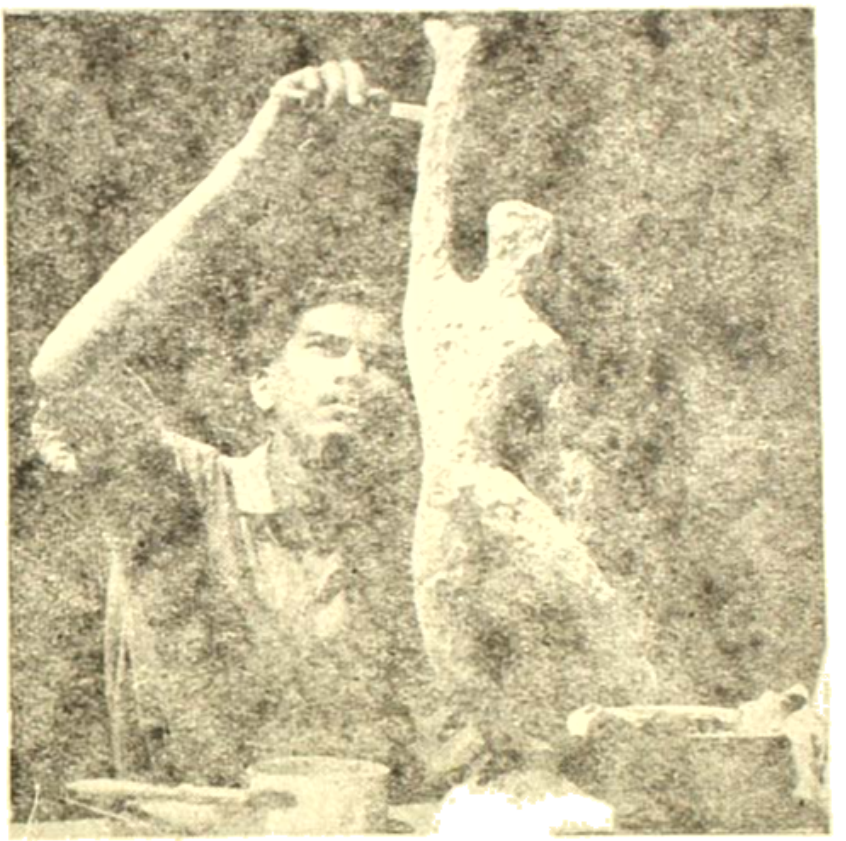

রুড়কী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ কিশোর শিল্পী অমলকান্ত নায়েক
এবং তার শিল্প-কল্পনা মহাকাশ।

দেশ-বিদেশ :

এব্রাহাম লিঙ্কনের ঐতিহাসিক গেটসবার্গ ভাষণের শতবার্ষিকী উৎসব

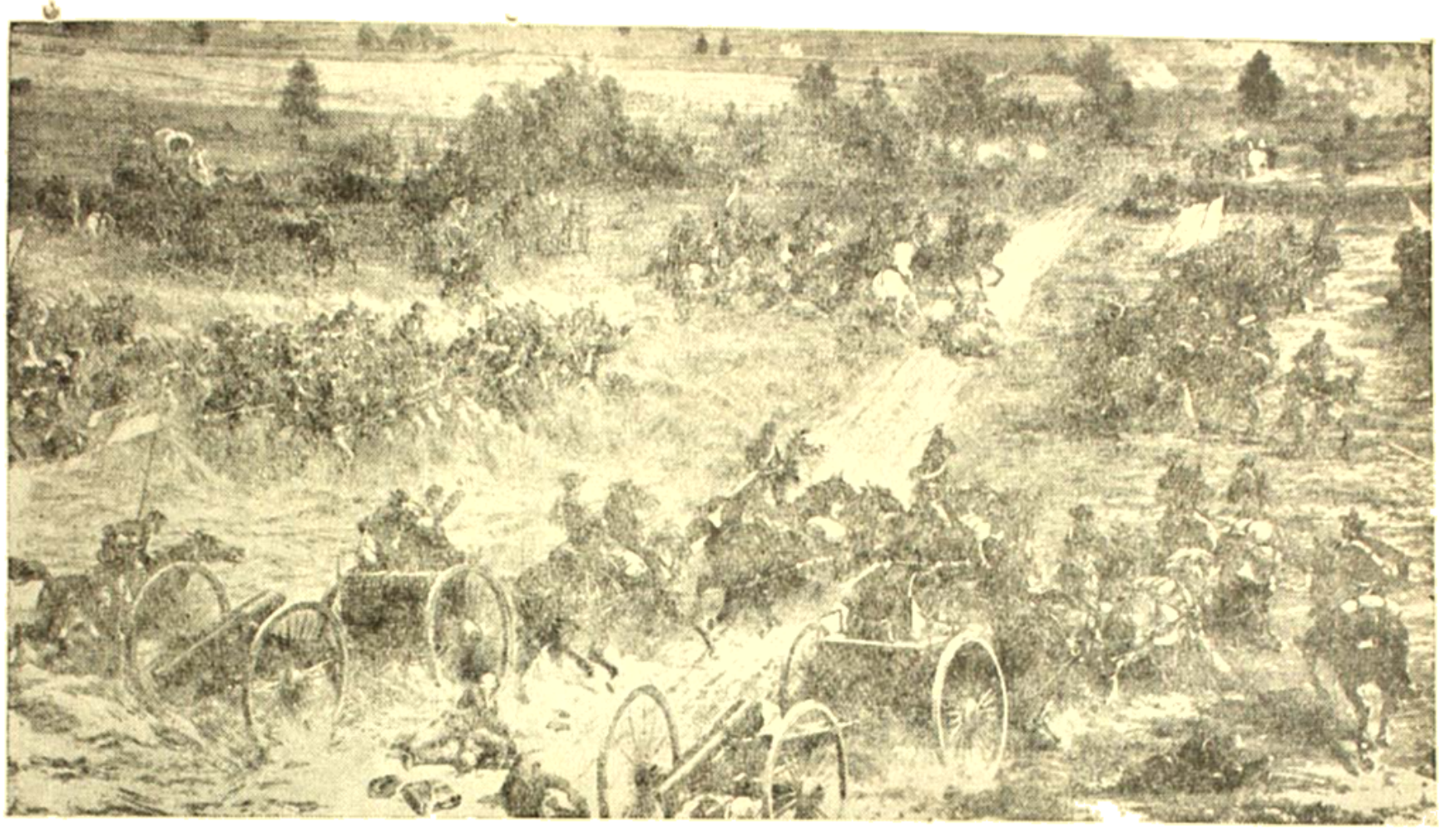

আমেরিকান শিল্পীর হাতে আঁকা এই ছবিতে ঐতিহাসিক গেটসবার্গ যুদ্ধের একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

দেশ-বিদেশ :

মহাকাশ-বিজ্ঞান ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী

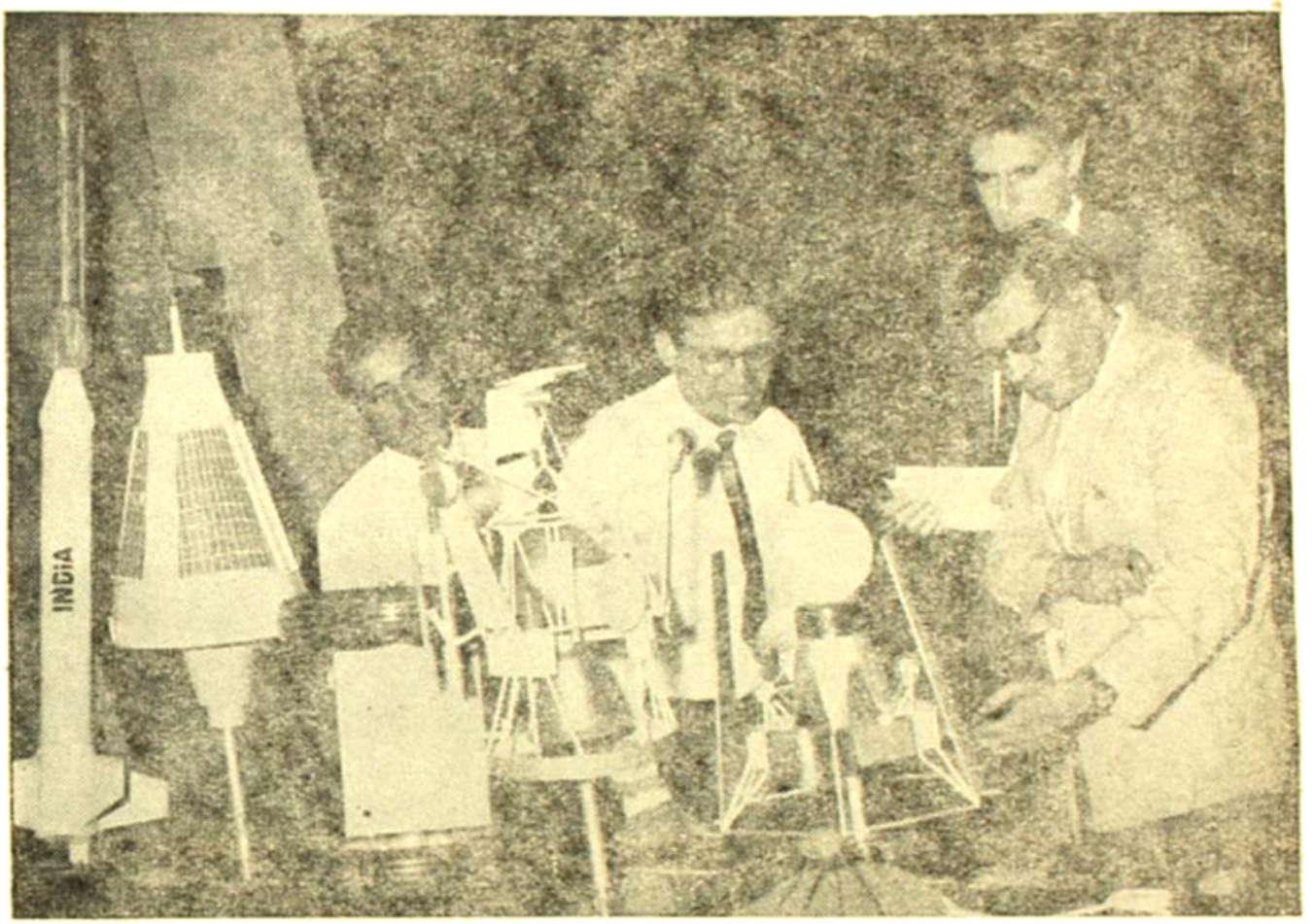

যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা এবং ভারতের পরমাণু শক্তি বিভাগের যুক্ত উদ্যোগে গত ১১ই নভেম্বর কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে এক ভ্রাম্যমান প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সাহা ইন্‌স্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ডিরেক্টর ডা: বি, ডি, নাগচৌধুরী। মহাকাশে যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক অভিযান পরিচালনার সঙ্গে বিশ্বের বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে গিয়ে ডা: নাগচৌধুরী বলেন : 'বর্তমান মাসেই ত্রিবান্দ্রমের কাছাকাছি থুম্বা পাহাড় থেকে দুই পর্যায়ের ভারতের প্রথম তথ্যসন্ধানী রকেটটি মহাকাশে প্রেরণ করা হবে। সুতরাং এই সময়ে প্রদর্শনী দেখাবার ব্যবস্থা করা ঠিকই হয়েছে।' ছবিতে (ডান দিক থেকে) : ডা: নাগচৌধুরী একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মডেল দেখাচ্ছেন। তাঁর পশ্চাতে কলিকাতাস্থ ইউ এস আই এস-এর পাবলিক এফেয়ার্স অফিসার মিঃ গিলবার্ট এক্‌ অস্টিনকে দেখা যাচ্ছে। মডেলটির বিষয় বুঝিয়ে দিচ্ছেন ভারত সরকারের পরমাণু শক্তি কমিশনের মিঃ ও, পি, এন কাপা এবং ডা: আর, এল, হামলে।

খেলাধূলা :

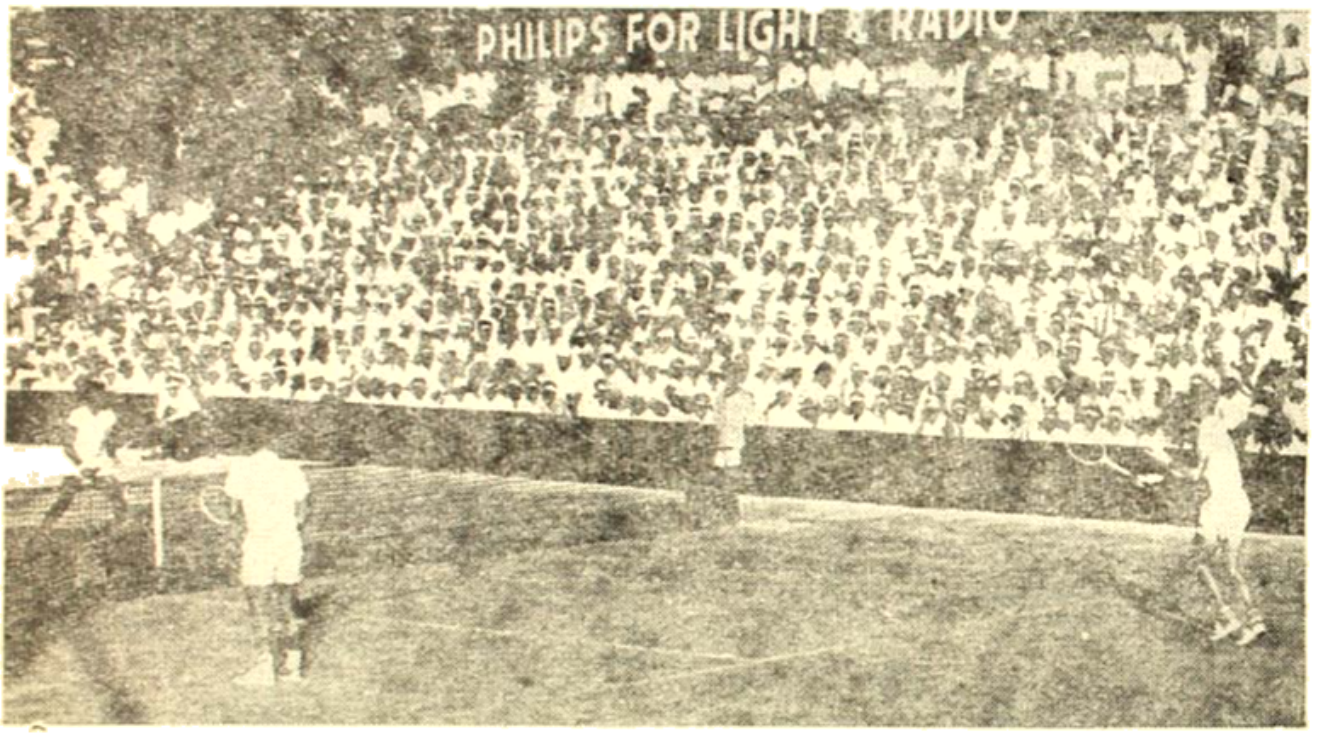

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা : ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আঞ্চলিক প্রতিযোগিতায় ডাবলস-ফাইন্যাল খেলাটি হয় বোম্বাই শহরে। ভারতীয় জুট জয়ন্ত মুখার্জি এবং প্রেমজিত লালের বিরুদ্ধে খেলেন চাক ম্যাকিন্‌লে আর ডেনিস রল্‌স্টন। বিপক্ষের একটি বার ফিরিয়ে দিচ্ছেন রল্‌স্টন (দক্ষিণে) এবং তাঁর দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছেন ম্যাকিন্‌লে। এই খেলায় এবং আরও চারটি সিঙ্গলসের খেলায় জয়ী হন মার্কিণ খেলোয়াড় দুইজনই। তার ফলে এঁরা অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন আগামী ডিসেম্বর মাসে, অস্ট্রেলিয়ার এডেলাইড শহরে।

শিকাগো ধর্ম্মমহাসভার সমাপ্তির পর ভাবাবিষ্ট স্বামীজী (১৮৯৩)

তপস্যারত স্বামীজী

ভক্তশিষ্যবৃন্দসহ স্বামীজী
মাদ্রাজ—১৮৯৭

স্বামী বিবেকানন্দ (চিকাগো ১৮৯৩)

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্য

স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য্যের আকর। স্নো, ক্রীম, পাউডার, রুজ, লিপ্‌ষ্টিক প্রভৃতি সৌন্দর্য্যচর্চ্চার বিভিন্ন উপাদান ত্বকের চটক বাড়ায় মাত্র—দেহের প্রকৃত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে ইহারা অক্ষম। কারণ দীপ্ত স্বাস্থ্য এবং পরিপূর্ণ জীবনীশক্তিই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের ভিত্তি।

দীপ্ত স্বাস্থ্য লাভ করিতে হইলে নিয়মিত ব্যায়াম ও পুষ্টিকর খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন।

লক্ষ্মী ঘি

দুগ্ধজাত বিশুদ্ধ ও পুষ্টিকর খাদ্য

লক্ষ্মী দাস প্রেমজী

মার্কা প্রস্তুতকারক

ঊনত্রিংশ বর্ষ।
প্রথম সংখ্যা।
আষাঢ়। ১৩৭০

গল্প-ভারতী

এই সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ —

স্মৃতিদোলায়
প্রেমেন্দ্র মিত্র

জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

এই রং এই রূপ (বড় গল্প)
আশাপূর্ণা দেবী

জীবনের যজ্ঞশালায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

শুক্তি-সৈকত (উপন্যাস)
বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়

নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার (সচিত্র)

বিবিধ (সচিত্র সংযোজন)

লিলির

রিচ

নোনতা

বিস্কুট

লিলি বিস্কুট কোং.প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-৪

পরিকল্পিত উন্নয়ন

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশী কর্মসূচী, প্রতিরক্ষার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অংশ এবং পরিকল্পনার অবশিষ্ট অংশও প্রতিরক্ষার সঙ্গে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।

শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা এবং প্রতিরক্ষা শক্তির উৎসগুলি সকলতর করার জন্য পরিকল্পনাকে এখন আরো সুসংহত করা হয়েছে।

ইস্পাত এবং মেশিন টুল, ধাতু এবং কাঁচামালের উৎপাদন বাড়ানো হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারীং এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পগুলির উৎপাদন—ক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগানো হবে।

পরিকল্পিত উন্নয়ন হ'ল প্রতিরক্ষার মূল ভিত্তি। আরও দ্রুততা এবং দক্ষতার সঙ্গে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করার অর্থ হ'ল—আপনি একদিকে যেমন প্রতিরক্ষা গড়ে তুলবেন তেমনি দেশকে প্রকৃত শক্তিশালী ক'রে তুলবেন।

জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য

Literary dissipation is no less destructive of sympathy with the living world, than sensual dissipation. Mere intellect is as hard-hearted and as heart-hardening as mere sense; and the union of the two, when uncontrolled by the conscience and without the softening, purifying influences of the moral affections, is all that is requisite to produce the diabolical ideal of our nature. —Anon.

বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা

পঞ্চম মহাকাশচারী ভালেরি বীকোভস্কি

দেশ-বিদেশ :

মহাকাশবিজয়ী তিনজন—ভালেরি বীকোভস্কি, পাভেল পপোভিচ ও আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ ও নবনিযুক্ত মার্কিন, রাষ্ট্রদূত
চেস্টার বোলস্

দেশ-বিদেশ :

ভারত মহাসাগর সমীক্ষা

'আবহাওয়া-জাহাজ' থেকে ঝড়ের পূর্বাভাস জ্ঞাপন

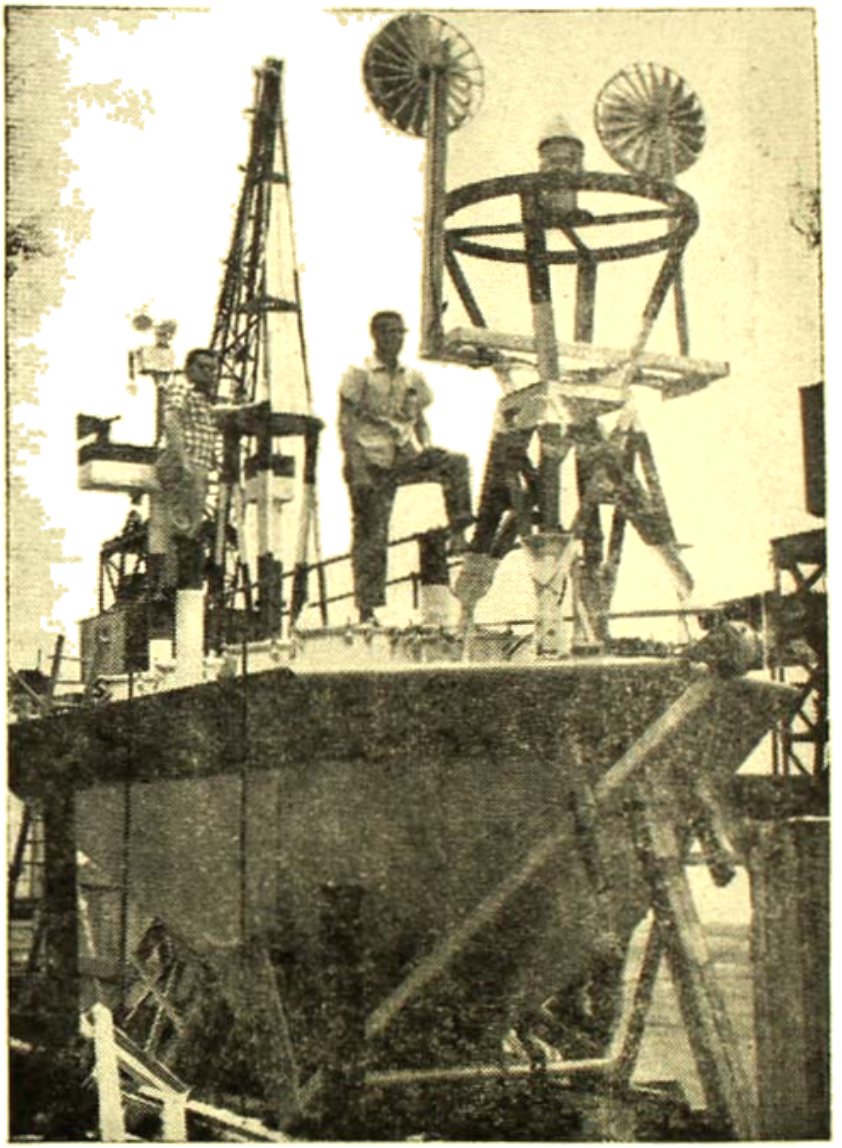

মাদ্রাজ বন্দরে "নোম্যাড" নামক আবহাওয়া জাহাজটিকে যন্ত্রপাতি বসিয়ে তৈরী করা হচ্ছে। ডেকের উপরে মার্কিন বিশেষজ্ঞ দু'জন, জন ম্যালোনে (বামে) এবং রবার্ট এ স্মিথকে দেখা যাচ্ছে। এঁরাই নোম্যাডকে কাজে লাগাবার জন্যে যথাযথ সাজসজ্জায় সজ্জিত করে তুলছেন।

খেলাধুলা :

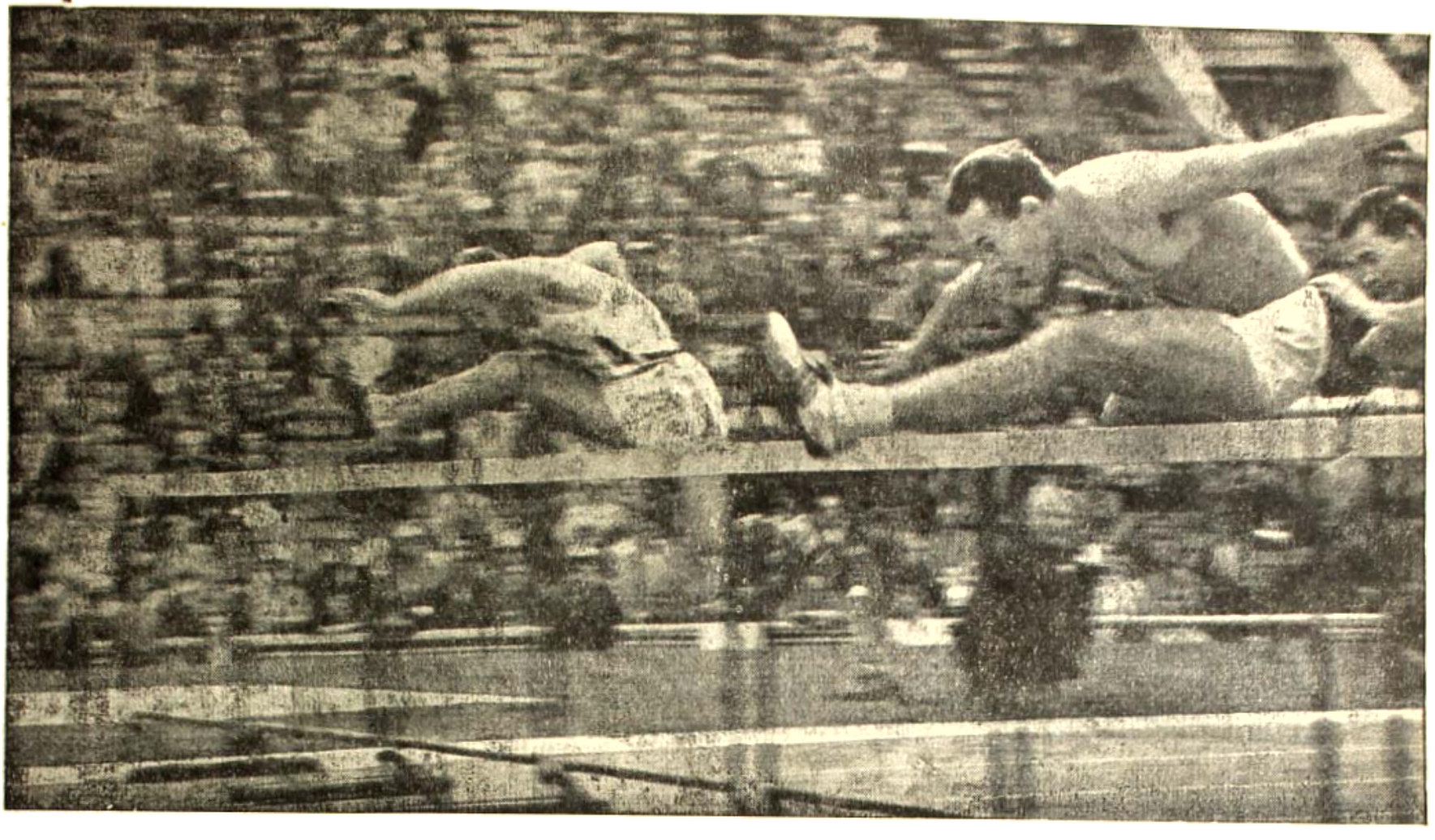

রাশিয়ার বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ ভ্লাদেমির ভ্রাতৃদ্বয়ের সম্মানে অনুষ্ঠিত কিড এ্যাত টাকের প্রতিযোগিতার একটি দৃশ্য

খেলাধুলা :

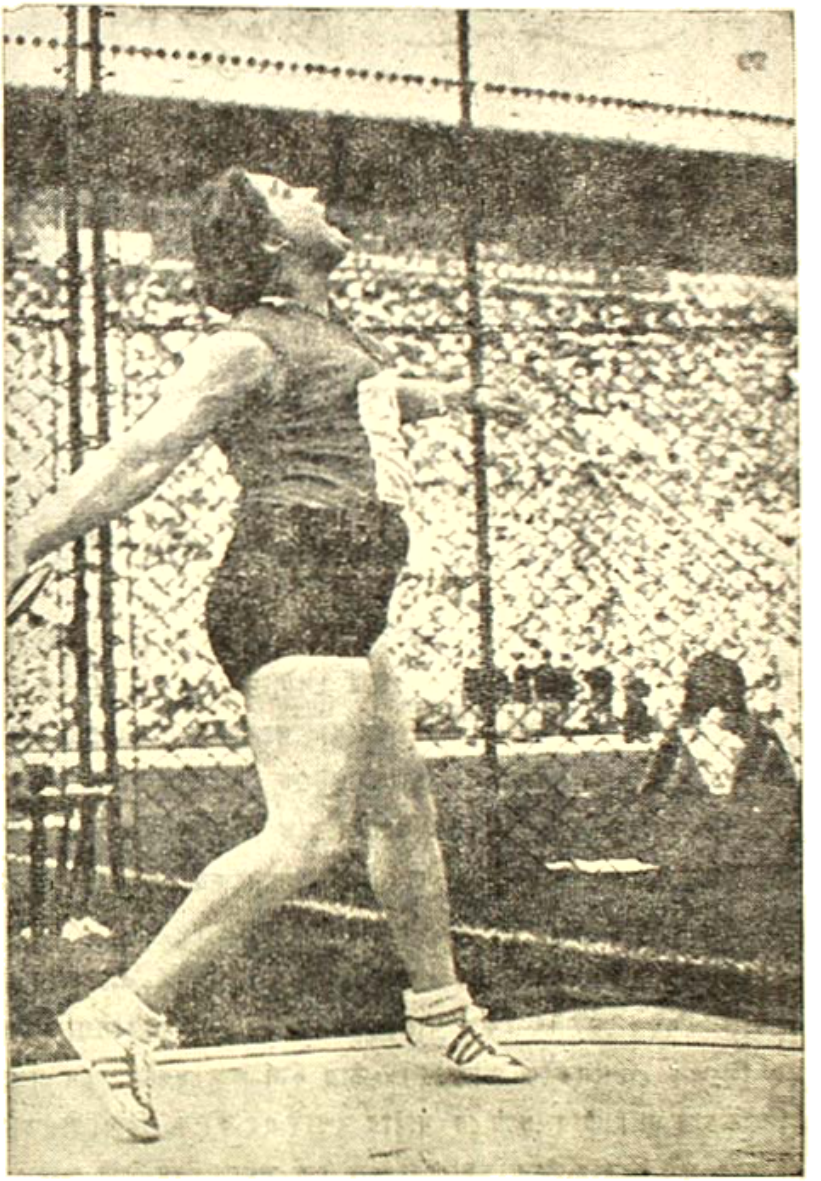

বিখ্যাত সোভিয়েত মহিলা খেলোয়াড় তানায়া প্রেস —
সোভিয়েত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক
খেলায় ডিসকাস থ্রোয়িং-এ জয়লাভ করেন

ঐতিহাসিক ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পর মস্কো বিমানবন্দরে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী করমর্দন করছেন।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

দেশ-বিদেশ

মস্কোয় ভারতীয় শিল্পমেলা

জেট বিমানে করেই হোক বা অন্যভাবেই হোক, মস্কো থেকে ভারতের দূরত্ব কম নয়। ৩২০০ মাইল। কিন্তু আজ মস্কোর কোনও লোক যদি ভারতবর্ষ দেখতে চান, তাহলে তাঁকে কষ্ট করে ভারতে আসতে হবে না। তাঁর বাড়ীর পাশেই এমন এক প্রদর্শনী চলছে, যেটা ভারতের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। ভারতের প্রাচীন গৌরবের নমুনা আর বর্তমান যুগের সাফল্যের নিদর্শন, সবকিছুই আসা যাবে মস্কোর সোকোলিনি উদ্যানে ভারত সরকার কর্তৃক আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে।

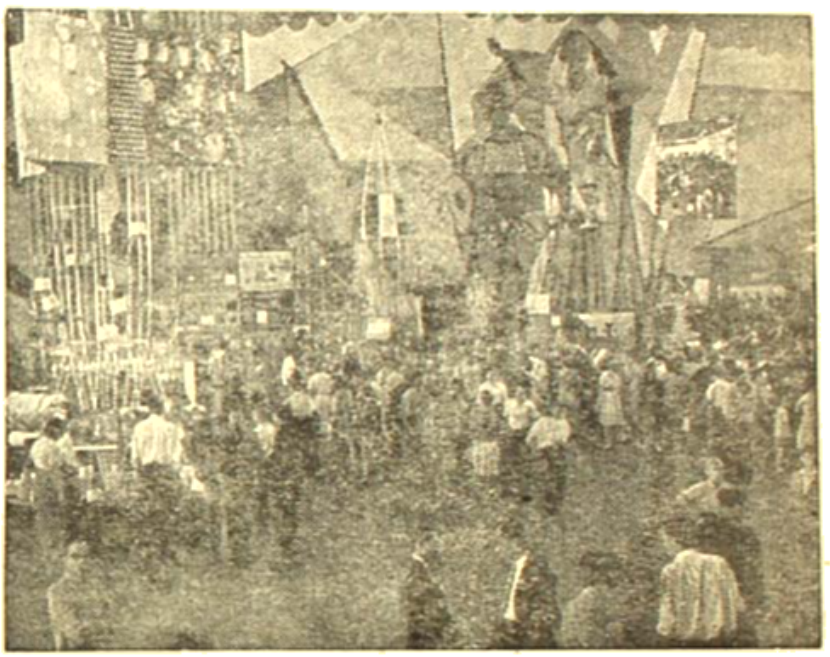

মস্কোয় ভারতীয় শিল্পমেলা

প্রদর্শনীর বিশেষ সম্মান

তাঁর শত কাজের মধ্যেও সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী শ্রীক্রুশ্চেভ প্রদর্শনীটির উদ্বোধন করেন। এটা শুধু প্রদর্শনীর পক্ষেই গৌরবের কথা না, এর থেকে বোঝা যায় ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছা কত আন্তরিক গভীর, কত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার ও ভারত সরকার যে ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, শ্রীক্রুশ্চেভ তাঁর বক্তৃতায় তার উল্লেখ করেন। এমন কি প্রদর্শনীটিও ভারত সোভিয়েত সহযোগিতার নিদর্শন। এই দুই দেশের শিল্পী, কারিগর এবং কর্মীরা হাতে হাত মিলিয়ে প্রদর্শনীটি দাঁড় করিয়েছেন। মস্কোর বুকে ভারতবর্ষের এই ক্ষুদ্র সংস্করণ সম্ভব হয়েছে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মণ্ডলের প্রদর্শনী বিভাগ এবং সোভিয়েত বাণিজ্য সংস্থার সহযোগিতার ফলে।

ষোল হাজার হাজার লোক এই প্রদর্শনী দেখতে আসছেন। স্বাধীনতার পরে আমাদের অগ্রগতি সোভিয়েত জনগণ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছেন। প্রদর্শনী খোলার প্রথম পাঁচ দিনেই ৪ লক্ষেরও বেশী লোক এটা দেখেছেন। দিনকে দিন ভীড় বাড়ছে।

প্রবেশ পথে

প্রবেশ দ্বারে খোদাই করা ৩টি হাতী, কোয়ারার কাছে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি আর পেছনে শ্রীনেহরু শ্রীক্রুশ্চেভের করমর্দনরত ছবি। প্রদর্শনীর বিভিন্ন অংশে আছে ভারতের ঐতিহ্যের পরিচয় বর্তমান অগ্রগতির নমুনা এবং ভবিষ্যতের স্বপ্ন।

শান্তিনিকেতনে সংস্কৃতি ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান

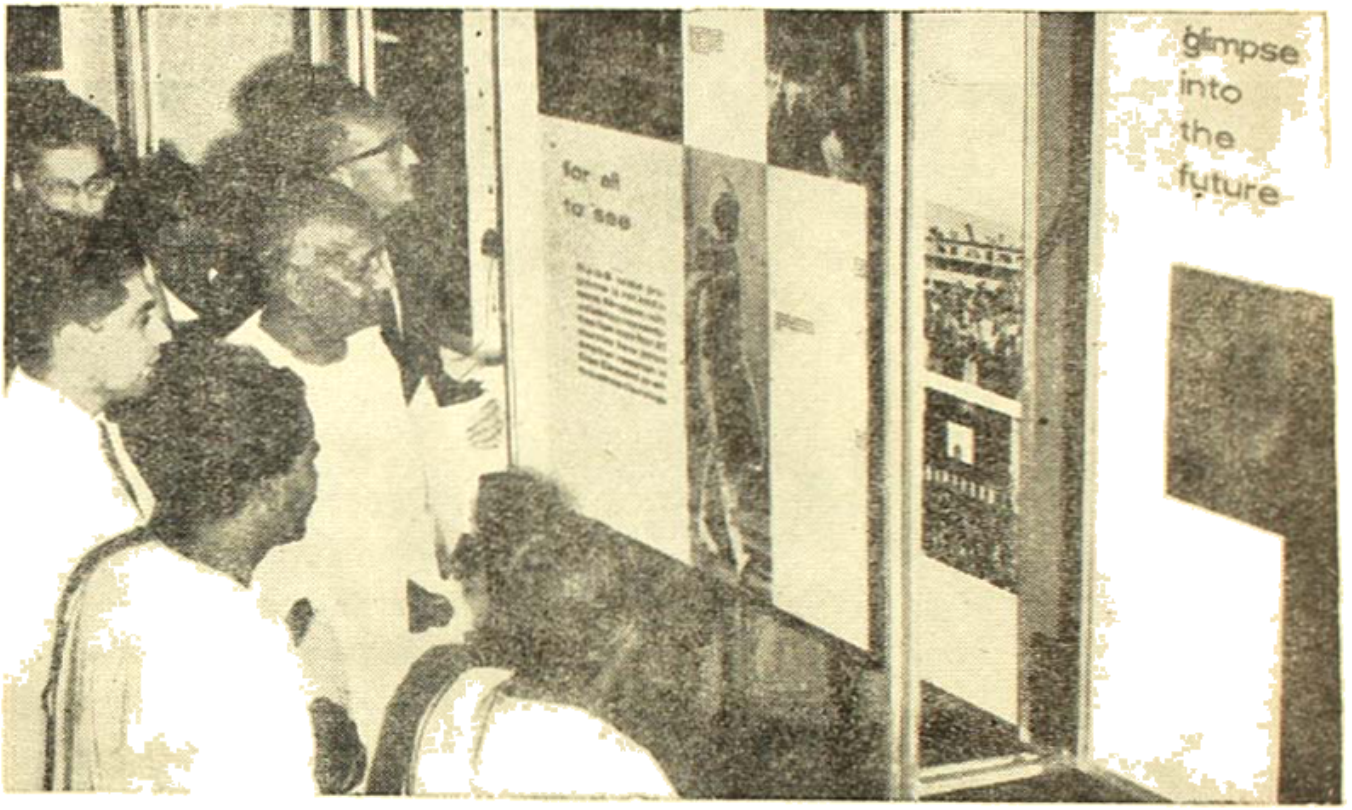

গত ২৪শে জুলাই সন্ধ্যায় শান্তিনিকেতনের বিচিত্রা ভবনের প্রেক্ষাগৃহে বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীসুধীরঞ্জন দাস, বিশ্বভারতী এবং ইউনাইটেড স্টেটস্ ইনফরমেশন সার্ভিসের যুক্ত উদ্যোগে আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে অভিনন্দিত করেন ইউ এস আই এস-এর পাবলিক এফেয়ার্স অফিসার মিঃ সিলবার্ট এফ অস্টিন এবং অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দান করেন কলিকাতাস্থ প্রধান মার্কিন বাণিজ্য দূত মিঃ উইলিয়াম ও ব্যাকস্টার। এ উপলক্ষ্যে আমেরিকায় জ্যোতির্পদার্থ বিজ্ঞান, মহাকাশ বিজ্ঞান এবং সমুদ্র সম্পর্কে যে সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে "আমেরিকান সায়েন্টিফিক কোয়েস্ট" শীর্ষক একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এছাড়া আমেরিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য পুস্তকের প্রদর্শনী, চলচ্চিত্র, আলোচনা বৈঠক, কুইজ প্রতিযোগিতা ছিল এই অনুষ্ঠানের অন্যান্য অঙ্গ। (ছবিতে) শ্রীসুধীরঞ্জন দাস (মধ্যে), তাঁর বামে মিঃ ব্যাকস্টার ও অন্যান্য দর্শকবৃন্দ প্রদর্শনীটি দেখছেন।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট কেনেডি সকাশে যুক্তরাষ্ট্রে সফররত ভারতীয় পার্লামেন্টের সদস্যগণ।
ছবিতে (বাম থেকে দ্বিতীয়) স্পীকার হুকুম সিং, মিসেস ভায়োলেট আলভা,
যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বি. কে. নেহেরু।